শতবর্ষের সেরা

রহস্য উপন্যাস

সম্পাদনা অনীশ দেব



শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস

৩

শতবর্ষের সেরা

রহস্য উপন্যাস

৩

সম্পাদনা

অনীশ দেব

পত্র ভারতী

SHATABARSHER SERA RAHASYA UPANYAS 3

Edited by

Anish Deb

ISBN No. 978-81-8374-064-7

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সুদীপ্ত দত্ত

নামাঙ্কন

সৈকতশোভন পাল

মূল্য

৩৫০.০০

Publisher

PATRA BHARATI

3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799

e-mail : patrabharati@gmail.com

Website : bookspatrabharati.com

Price Rs. 350.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

"I cannot live without brainwork. What else is there to live for ?"

—Mr. Sherlock Holmes
The sign of four (chapter I)
Sir Arthur Conan Doyle

"মাথার কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারি না। এ ছাড়া বেঁচে থেকে কী লাভ?"

—মি. শার্লক হোম্‌স
দ্য সাইন অফ ফোর (প্রথম অধ্যায়)
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল



অচেনা মানুষ



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

কর্নেল সেন বললেন, 'জায়গার নামটা আমি বলব না। ধরে নাও, বিহার আর পশ্চিম বাংলার সীমান্তের কাছাকাছি কোনও অঞ্চল। সময়টা শীতকাল—নভেম্বর মাস, খুব জাঁকিয়ে শীত তখনও পড়েনি। গাড়িতে আমি একা ছিলাম—'

রঞ্জন বলল, 'কেন, জায়গাটার নাম বলতে আপনার আপত্তি কী? পটভূমিকা সম্পর্কে ভালো ধারণা না হলে গল্প জমে না।'

কর্নেল সেন চুরুটের ছাই ঝাড়লেন, তারপর বললেন, 'প্রথম কথা, এটা গল্প নয়। আমি ঠিক গল্পের মতন গুছিয়ে বলতেও পারব না—যদিও অনেক সত্যি ঘটনা গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর হয়। কিন্তু লেখকেরা যে-রকম কায়দাকানুন করে আগাগোড়া সাসপেন্স বজায় রাখতে পারেন, সেরকম ক্ষমতা তো আমার নেই! আমি ঠিক যে-রকম দেখেছিলাম, সেই রকম ভাবেই বলে যাব। তা ছাড়া, জায়গাটার নাম-ধাম আমি বলতে চাই না, কারণ যে ঘটনা আমি বলতে যাচ্ছি, তার মধ্যে এমন অনেক লোকজনের নাম থাকবে, তাঁরা অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন। তাঁদের চিনিয়ে দেওয়া ঠিক রুচিসম্মত হবে না। আমি অবশ্য নামটাম বদলেই বলব ঘটনাটা। ঘটেছিল বছর পনেরো আগে—যেখানে এটা হয়েছিল, সেখানে কাহিনিটা এখনও প্রচলিত। ওখানকার একটি বিশিষ্ট পরিবার এর সঙ্গে জড়িত। এক হিসেবে আমিই সেই পরিবারের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। যাকগে, গোড়া থেকেই শুরু করা যাক।

আমি রামগড় থেকে ঘুরতে-ঘুরতে পুরুলিয়ার দিকে আসছিলাম। ধরে নাও চাস রোডেই কোথাও সেই বাংলোটা। আশেপাশে কোনও শহর নেই—বাংলোটা বলতে গেলে জনশূন্য মাঠের মধ্যে। তখনও ওসব জায়গায় ইলেকট্রিক যায়নি। এখনও গেছে কিনা আমি জানি না। ডাকবাংলোটা নতুন তৈরি হয়েছে, বেশ ছিমছাম চেহারা। আমি সেখানেই সে রাতের জন্য বসতি নেব ঠিক করলুম।'

আমি বললাম, 'কর্নেল সেন, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন।'

কর্নেল সেন অবাক হয়ে বললেন, 'চমৎকার বাংলা বলি? এরকম কথা তো কেউ আমাকে আগে বলেনি। চমৎকারের কী দেখলে?'

'না, আপনার কথার মধ্যে বেশি ইংরেজি শব্দ থাকে না। বেশ ঝরঝরে সহজবোধ্য ভাষা।'

'বাঃ, বাঙালির ছেলে হয়ে এটুকু বাংলা বলতে পারব না কেন?'

'আপনি এতদিন আর্মিতে ছিলেন। আর্মির লোকেরা খুব সাহেব হয়। ইংরেজি ছাড়া আর কিছু বলতে চায় না। তা ছাড়া আপনি অনেক দিন বাংলাদেশের বাইরে ছিলেন—'

কর্নেল সেন হাসলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, 'আর্মির লোকরা খুব সাহেব হয়? তা অবশ্য অনেকটা ঠিক। নানা জায়গার লোক থাকে—তাই ইংরেজিটাই হয় সকলের সাধারণ ভাষা। কিন্তু ইংরেজিতে কথা বললেই যে সাহেবদের মতন চালচলন দেখাতে হবে তার কোনও মানে আমি বুঝতে পারি না। আর যারা মাতৃভাষা ভুলে যায়, তাদের আমি ঘৃণা করি।'

'যাই বলুন, আর্মির লোকজনের মধ্যে আপনি একজন ব্যতিক্রম!'

'বারবার আর্মির লোক আর্মির লোক বলছ, তাতে মনে হতে পারে, আমি বোধহয় বন্দুক-মেসিনগান নিয়ে যুদ্ধ করেছি। তা নয়—আমি একজন ডাক্তার। কিছু দিন আর্মিতে চাকরি করেছি!'

'আপনি ডাক্তার? তা কিন্তু জানতাম না। রঞ্জন যখন বলেছিল, ওর মামা আসছেন, কর্নেল সেন—তখন আমি ভেবেছিলাম তিনি নিশ্চয়ই একজন ঝানু সোলজার।'

'না, আমি যুদ্ধ করিনি। আর্মিতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবারই র‍্যাংক থাকে। আমি অবশ্য পুরোপুরি কর্নেল নই। লেফটেন্যান্ট কর্নেল। অতখানি উচ্চারণ করার অসুবিধে বলে অনেকে শুধু কর্নেল বলে। যাই হোক, আর্মির লোক বলে সবাইকে কিন্তু এক শ্রেণিতে ফেলবে না। আমি নেফা

অঞ্চলে একজন সত্যিকারের আর্মি কর্নেল দেখেছিলাম, তিনি অগাধ পণ্ডিত, ট্রাইবালদের কত চর্চা করেছেন, যদিও বাইরে সে বিদ্যা জাহির করেন না। সেনাবাহিনীর অফিসার র‍্যাংকে সাধারণত ভালো-ভালো ছাত্ররাই যায়।'

রঞ্জন আমাকে ধমকে দিয়ে বলল, 'তুই বড্ড গল্পের মাঝখানে বাধা দিস। মামাবাবু, আপনি গল্পটা বলুন!'

রঞ্জনের মামা কর্নেল সেন থাকেন লাডাকে। ওখানে একটি সরকারি হাসপাতাল পরিচালনা করেন। পশ্চিম বাংলার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ খুবই কম। কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। বছর পঞ্চাশেক বয়স, সুপুরুষ, সুঠাম স্বাস্থ্য। কথাবার্তায় অত্যন্ত ভদ্র। বিয়ে-থা করেননি, গরিব-দুঃখীদের চিকিৎসার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু ওঁর কথাবার্তায় সে সব কিছুই প্রকাশ পায় না। নিজের সম্পর্কে উনি খুবই কম কথা বলেন। ব্যবহারের মধ্যে বেশ মার্জিত ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে—কিন্তু তার মধ্যে কোনও কঠোরতা নেই।

রঞ্জন ওর মামাবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে আজ রাত্রে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। আর একজন বন্ধু এবং তার স্ত্রীকেও বলেছিল, কিন্তু তারা আসতে পারেনি। কয়েক দিন ধরেই আবহাওয়া বেশ খারাপ যাচ্ছে। আজ সারা দিনে বৃষ্টি হয়ে গেছে কয়েকবার। রাত ন'টা থেকে বৃষ্টি নামল অসম্ভব তোড়ে। রঞ্জনের বাড়ির সামনে এককোমর জল জমে গেল। আমার বাড়ির সামনেও নিশ্চয়ই এতক্ষণ একবুক জল। রঞ্জন বলল, 'তাহলে সুনীল, তোকে আজ আর বাড়ি ফিরতে হবে না। ফোন করে দে এখানেই থেকে যাবি!'

রঞ্জনের মামাবাবুর সঙ্গে গল্পে এত জমে গিয়েছিলুম যে আমার বাড়ি না ফেরায় বিশেষ আপত্তি হল না। খাওয়াদাওয়ার পর বাইরের ঘরে জমিয়ে বসলাম। মামাবাবু চুরুট ধরিয়েছেন এবং গোড়াতেই আমাদের সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন।

মামাবাবু ঘুরেছেন অনেক দেশ। আর্মিতে ঢোকার আগে উনি ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, তারপর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে চষে বেড়িয়েছেন সারা ভারতবর্ষ। আমরা অনুরোধ করলাম, 'মামাবাবু আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা—তার থেকে দারুণ একটা গল্প বলুন আমাদের। শুনতে-শুনতে যদি গা ছমছম করে তাহলে বৃষ্টির দিনে জমবে।'

মামাবাবু বললেন, 'আমি আর কী বলব! আমি তো গল্প বলতে জানি না। তোমরাই বরং বলো—পশ্চিমবাংলার খবরটবর কী। আমরা তো অত দূর থেকে খবর পাই না।'

রঞ্জন বলল, 'পশ্চিম বাংলার খবর একঘেয়ে হয়ে গেছে। ও নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আপনি একটা গল্প বলুন!'

'কিন্তু আমি যে গল্পটল্প বলতে জানি না।'

আমি বললাম, 'গল্প মানে কী? বানিয়ে বলতে হবে না—আপনি আপনার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলুন না। আপনি জীবনে এত কিছু দেখেছেন—'

মামাবাবু খানিকটা ভেবে বললেন, 'আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি বটে কিন্তু সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে খুব কাছাকাছি জায়গায়—বিহার আর পশ্চিম বাংলার সীমান্তেই এক জায়গায়। জায়গাটার নাম বলব না—'

আমি রঞ্জনকে বললাম, 'তোর বউকে ডাকবি না? মাধবীকে ডাক!'

রঞ্জন বলল, 'ও থাক। ও তো একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়বে। বেশি রাত জাগতেই পারে না—'

'ডাক না, ঘুম পেলে উঠে যাবে না হয়!'

মাধবী দরজার পাশ থেকে বলল, 'আমি এক্ষুনি আসছি। চাকরের খাবারটা দিয়েই আসছি। মামাবাবু, আমি না এলে আরম্ভ করবেন না কিন্তু!'

মাধবী এসে বসার পর মামাবাবু স্মিত ভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, 'মাধবী থাকলে আমার গল্পটা বলতে একটু অসুবিধে হবে অবশ্য। তাহলে এটা বরং থাক। আমি অন্য আর কোনও ঘটনার কথা বলা যায় কিনা ভেবে দেখি। এর মধ্যে কিছুটা মেয়েঘটিত ব্যাপার আছে—'

মাধবী আদুরে গলায় বলল, 'মামাবাবু, আমি বাচ্চা মেয়ে নই। ওদের সামনে যা বলতে পারেন, আমার সামনে তা পারেন না?'

'ছেলেদের সামনে যা বলা যায় মেয়েদের সামনেও কি আর তা—'

'মামাবাবু, আপনি জানেন না, আজকাল ছেলেরা মেয়েদের সামনে আর কিছু ঢাকাঢুকি রাখে না। সব বলে দেয়। এমনকী স্বামীরা অন্য মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করলেও সে-কথা বউদের কাছে লুকোয় না।'

মাধবী রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করল। কর্নেল সেন হাসতে-হাসতে বললেন, 'তাই নাকি? বাঃ, এ তো বেশ ভালোই ব্যাপার! এতটা বদলে গেছে? কিন্তু আমার তবু একটু বাধো-বাধো ঠেকবে। আমি তো একটু পুরোনো কালের লোক! আচ্ছা দেখা যাক—'

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তা বলে মামাবাবু গল্পটা কিন্তু সেনসার করে বলবেন না! একেই তো সিনেমার সেনসারের জ্বালায় আমরা অস্থির।'

বয়সে অনেক বড় হলেও কর্নেল সেন এসব কথা বেশ সহজ ভাবে নিতে পারেন। রঞ্জনের কথা শুনে আন্তরিক ভাবে হেসে উঠলেন।

এবার গল্প শুরু হল। কর্নেল সেন চুরুটে অল্প ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়, উনি অতীতে ফিরে গেছেন। উনি বসেছেন একটা ইজিচেয়ারে, জানলার পাশে। রঞ্জন আর আমি একটা সোফায়। আর একটা সোফায় মাধবী পা গুটিয়ে বসেছে আরাম করে।

কর্নেল সেন বললেন, 'তখন আমার বয়স হবে তেত্রিশ কি চৌত্রিশ। আমি তখন রামগড়ে পোস্টেড। আমার এক কাকা থাকতেন পুরুলিয়ায়। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসছিলাম। গাড়ি নিয়ে একা বেরিয়ে পড়েছি। অনেক পথঘাট তখন নতুন তৈরি হচ্ছে। ঠিকমতো পথের হদিশ পাওয়া যায় না। এক-এক জন এক-একটা ভুল রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ঘণ্টা ছয়েকের পথ, কিন্তু বেলা বারোটাতে বেরিয়েও অনেক ঘুরতে হল। রাত ন'টার সময়েও বিহারের সীমানা পার হতে পারিনি। রাস্তা একেবারে ফাঁকা, আলো নেই—একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। আজকাল নিশ্চয়ই ওসব রাস্তায় সারা রাত গাড়ি চলে—'

রঞ্জন বলল, 'না, মামাবাবু। ট্রাক ড্রাইভাররা ছাড়া রাত্রে কেউ গাড়ি চালাতে সাহস করে না ওইসব রাস্তায়। বিশেষত বর্ডারের কাছে প্রায়ই ডাকাতি হয়।'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমার কাছে অবশ্য ডাকাতি করার মতন বিশেষ কিছু ছিল না। তবু, গাড়িটা কেড়ে নিয়ে যদি রাস্তায় একা ছেড়ে দেয়, সেও এক ঝামেলা। হঠাৎ একটা ডাকবাংলো চোখে পড়ল। তখন ভাবলাম, ডাকবাংলোতে রাতটা কাটিয়ে ভোরে বেরোলেই হবে।

পি ডব্লু ডি-র ইন্সপেকশান বাংলো। এইসব বাংলোতে আগে থেকে রিজার্ভ করার দরকার হয় না। খালি থাকলে ঢুকে পড়া যায়। আর বাংলোটা এমন ফাঁকা মাঠের মধ্যে যে সেখানে নিশ্চয়ই সচরাচর কেউ রাত্রিবাস করে না।'

কর্নেল সেনের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। তিনি সেটা ধরাবার জন্য একটু থামলেন। সেই সুযোগে আমি আর রঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চোখাচোখি করলাম। আমি আর রঞ্জনও বহু বাংলোতে থেকেছি, আমাদেরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। দেখা যাক, রঞ্জনের মামাবাবুর অভিজ্ঞতাটা কী ধরনের।

কর্নেল সেন বললেন, 'গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলাম ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডে। সেখানে ইলেকট্রিক নেই, বারান্দায় হ্যাজাক জ্বলছে। ঘর তালাবন্ধ। জনমনুষ্য দেখা গেল না, চৌকিদার, চৌকিদার বলে

দুবার হাঁক দিলাম। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বোঝাই গেল, এইসব ডাকবাংলোতে কালেভদ্রে কেউ আসে। এত রাত্রে বোধহয় কেউই আসে না। চৌকিদারটা তাই আড্ডা মারতে গেছে। কিংবা নেশাটেশা করে হয়তো ঘুমিয়ে আছে। কারওর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ভাবলাম চলে যাব কিনা। কিন্তু সারাদিন ঘুরে তখন আমার খুবই ক্লান্তি এসেছে, তার ওপর একটা জ্বর-জ্বর ভাব। এদিকে টিপটিপ করে বৃষ্টি নামল হঠাৎ। শীতকালের বৃষ্টিতে জানোই তো কীরকম শিরশিরে শীত করে। কপালে হাত দিয়ে মনে হল, জ্বরই এসেছে। এখন শরীর চাইছে বিছানা।

ডাকবাংলোর চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে গেলাম। ডাকবাংলোটা দেখেই মনে হল নতুন তৈরি হয়েছে—বছরখানেকও হবে না—সবকিছুই ঝকঝক করছে। একটু দূরে একটা টালির ঘর—সাধারণত এরকম ঘরে চৌকিদার থাকে। সেখানে গিয়ে দেখি, সে ঘরের দরজাটাও বন্ধ। দুবার ঠেলা দিলাম, আবার ডাকলাম চৌকিদারকে। কোনও সাড়া নেই। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ, নিশ্চয়ই ভেতরে কেউ আছে, কিন্তু খুলছে না। বেশ কয়েকবার ধাক্কাধাক্কি করলাম দরজায়, তাতে কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা, কিন্তু চৌকিদারটা উঠল না।

মহা বিরক্তিকর অবস্থা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ যখন, তখন ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই মানুষ আছে। অথচ আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন—এ নিয়ে একটা সন্দেহ আমার মনে জাগা উচিত ছিল, কিন্তু সে সময়ে আমি ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি। শরীর ভালো ছিল না, মেজাজও ভালো ছিল না।

সেখান থেকে চলে আসছি, হঠাৎ চোখে পড়ল ডাকবাংলোর পেছনে দেওয়াল ঘেঁসে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার গায়ের রং কালো কুচকুচে, ঠিক যেন অন্ধকারে মিশে আছে। বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ।

জিগ্যেস করলাম, 'কে ওখানে? তুমি চৌকিদার নাকি?'

লোকটা কোনও সাড়া দিল না। আমি এগিয়ে গেলাম। লোকটি তখন নীচু হয়ে মাটি থেকে কী যেন খুঁজছে। আমি তার সামনে গিয়ে বললাম, 'এই, চৌকিদার কোথায়?' লোকটি মুখ তুলে বলল, 'আমিই চৌকিদার!'

প্রচণ্ড রাগ হল! ধমক দিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি চৌকিদার তো এতক্ষণ সাড়া দাওনি কেন?'

'হুজুর আমি কানে শুনতে পাই না।'

কানে শুনতে না পাওয়া একজন মানুষের দোষ না। কিন্তু কানে-কালা লোকদের চৌকিদারের চাকরি দেওয়ারও কোনও মানে হয় না। কিন্তু তা নিয়ে তখন রাগারাগি করে লাভ নেই।

'কানে শুনতে পাও না, কিন্তু আমাকে তো দেখতে পেয়েছিলে? নাকি চোখেও দেখতে পাও না?'

'আমি এখানে একটা জিনিস খুঁজছিলাম, তাই আপনাকে দেখতে পাইনি।'

'এত রাত্রে কী খুঁজছ এখানে?'

'আমার ক'টা পয়সা পড়ে গেছে। একটা সিকি কিছুতেই পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, কামরা খুলে দাও। আমি আজ রাতে এখানে থাকব।'

'কামরা তো রিজার্ভ আছে।'

'রিজার্ভ আছে? কার নামে রিজার্ভ আছে?'

'আছে এক সাহেবের নামে।'

লোকটার ভাবভঙ্গি আমার ভালো লাগছিল না, বিশ্বাস হল না ওর কথা। বললাম, 'কোথায়, রিজার্ভেশন স্লিপ কোথায়? সেটা তো বাইরে ঝোলাবার কথা।'

লোকটা বলল, 'এখানে ঘর খালি নেই। সাত মাইল দূরে আর একটা ডাকবাংলো আছে, আপনি সেখানে যান না—জায়গা পেয়ে যাবেন।'

আমি বললাম, 'কেন, সেখানে যাব কেন? এখানে তো দুটো ঘরই খালি দেখছি—বাইরে থেকে তালা ঝুলছে।'

'ওই দুটো কামরাই এক সাহেবের নামে রিজার্ভ আছে। সাহেব হঠাৎ এসে পড়লে আমার নোকরি চলে যাবে।'

স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। যে-কোনও কারণেই হোক আমাকে থাকতে দিতে চায় না। এক ধমক দিয়ে বললাম, 'রিজার্ভ আছে? কই, সেই চিঠি দেখাও।'

লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণ আমার সব কথা সে বেশ শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু এখন আবার কালা সেজে গেল। জেদ চেপে গেল আমার। আমি বললাম, 'দেখাও স্লিপ। কথা শুনতে পাচ্ছ না?'

আমার পরনে সামরিক বাহিনীর পোশাক। সেই সময় আমি আবার মোটা গোঁফ রাখতাম। সুতরাং আমাকে হেলাফেলা করতে পারে না। বুঝতেই পারলাম, লোকটা ভয় পেয়েছে। নির্বোধ চোখে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, 'যাও, চাবি নিয়ে এসো। যদি রিজার্ভ করা থাকেও, এত রাত্রে কেউ আসবে না। আমি কাল সকালেই চলে যাব। ঘর খুলে দাও।'

পাশাপাশি দুটো ঘর, সামনে টানা বারান্দা। বৃষ্টি চেপে এসেছে। আমি দৌড়ে বারান্দায় উঠলাম। চৌকিদারটা চাবি আনতে গেছে তো গেছেই। আসার আর নাম নেই। খালি ডাকবাংলোটা খুলে দিতে ওর আপত্তির কারণটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। ও তো আমার কাছে কিছু বকশিশ পাবেই। তা ছাড়া যদি খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে দেয়, তারও কিছু ভাগ পাবে।

আবার ডাকলাম চৌকিদারকে। কিন্তু সত্যিই যদি কানে কালা হয়, তাহলে শুনতে পাবে না। এই বৃষ্টির মধ্যে ওকে যদি আবার ডাকতে যেতে হয়—

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল, চৌকিদার তখনও এল না। ও কি আমাকে এখানেই সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়? বারান্দায় একটা চেয়ারও নেই যে বসব। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ব্যথা করে। একবার ভাবলাম, মাইল সাতেক দূরে যখন আর একটা বাংলো আছে, তখন সেটাতেই যাব কিনা। এই বিদ্‌ঘুটে বাংলোর চাইতে সেটা নিশ্চয়ই ভালো হবে। কিন্তু, এই চৌকিদারটা যেন দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে—আমি চলে যাই কিনা। আমি ঠিক করলাম, এখানেই থাকব। গলা চড়িয়ে হাঁক দিলাম, চৌকিদার—

শেষপর্যন্ত লোকটি এল চাবি নিয়ে। সেইসঙ্গে রেজিস্টার বুক। সেটা খুলে দেখলাম, মাস দেড়েক আগে একজন সার্কেল অফিসার এসেছিলেন সপরিবারে, তারপর আর কেউ আসেনি। অনেক সময় অবশ্য বাইরের লোক এলে এরা খাতায় নাম এনট্রি করে না, টাকাটা নিজেই নিয়ে নেয়। আমার বেলায় অবশ্য খাতাটা আগেই এনেছে—সম্ভবত আমার সামরিক পোশাক দেখে।

ওর আসতে এত দেরি হল কেন—একথা জিগ্যেস করার আগেই লোকটা বললে, 'হুজুর, চাবি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

যে লোক কানে শুনতে পায় না, এবং সময় মতন চাবি খুঁজে পায় না—সে ডাকবাংলোর চৌকিদার হিসেবে খুবই অযোগ্য। লোকটির চেহারা দেখলে কিন্তু খুব বোকাসোকা মনে হয় না। যাই হোক আমি ঠিক করলাম, আর মেজাজ গরম করব না। একটা মাত্র রাত কাটাবার তো ব্যাপার। আমি লোকটিকে বললাম, 'এখানে তো বিশেষ কেউ আসেই না দেখছি। তুমি এটা রিজার্ভ আছে বলে আমাকে মিথ্যে কথা বলছিলে কেন?'

'না, হুজুর, একটা চিঠি এসেছিল। আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে তুমি ঘর খোলো। দুটো তো ঘর রয়েছে। তা ছাড়া আমি কাল সকালেই চলে যাব।'

লোকটি একটি ঘর খুলল। সেই ঘরটা অবশ্য ভালোই, আমার কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, তবু আমি জিগ্যেস করলাম, 'পাশের ঘরটা কীরকম, খোলো তো?'

'হুজুর, ও-ঘরটা পরিষ্কার করা নেই।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না। আমার সঙ্গে শুধু একটা সুটকেস, মালপত্র কিছু বিশেষ নেই। বিছানাও নেই। আমার ধমক খেয়ে লোকটি কম্বল বার করে দিল।

'তোমার নাম কী?'

'রামদাস।'

'ঠিক আছে, তুমি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'না! হুজুর, খাবারের ব্যবস্থা কিছু নেই। এখানে কিছু পাওয়া যায় না।'

'যারা এখানে আসে, তারা খায় কী? কাছাকাছি গ্রাম নেই?'

'আছে দু-মাইল দূরে। এত রাতে সেখানে কিছু পাওয়া যাবে না।'

'তুমি অন্তত একটু চা বানিয়ে দিতে পারবে?'

'চা, দুধ কিছু নেই।'

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, লোকটি আমার সঙ্গে কোনও সহযোগিতাই করতে চায় না। বকশিশের লোভও নেই ওর? আমার অবশ্য খিদে খুব একটা ছিল না। কিন্তু এক কাপ গরম চা পেলে ভালোই লাগত। তা ছাড়া খাবার পাওয়া যাবে না শুনলেই খিদে পেতে শুরু করে। রামদাসের ওপর রাগ আমার ক্রমশ বাড়ছিল। ওর নামে কমপ্লেন করা উচিত। খালি থাকতেও যদি ডাকবাংলোয় এসে দরকারের সময় জায়গা পাওয়া না যায় কিংবা খাবারের ব্যবস্থা না থাকে— তাহলে এগুলো তৈরি করার মানে কী? তা ছাড়া লোকটি যদি আমার সঙ্গে একটু ভালো ভাবে কথা বলত তাহলেই আমি ওকে ক্ষমা করতে পারতুম।

কিন্তু লোকটা সবসময় গুম মেরে আছে। কিছু জিগ্যেস. করলে ভালো উত্তর দেয় না।'

রঞ্জন হঠাৎ বলে উঠল, 'মামাবাবু, আপনার বোধহয় ডাকবাংলো সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞতা নেই। নইলে ওরকম বাংলোয় আপনার থাকা উচিত হয় কি?'

মাধবী বলল, 'আপনার ভয় করছিল না? অত ফাঁকা জায়গায়, চৌকিদারটা পাজি—'

কর্নেল সেন হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কেন ভয় কেন? আমার সঙ্গে তো দামি জিনিসপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। তা ছাড়া মিলিটারির লোকদেরই লোকে ভয় পায়।'

রঞ্জন বলল, 'আমি জানি, ওইরকম বাংলোয় এমন সব ঘটনা ঘটে—'

রঞ্জনকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, 'তুই চুপ কর তো। ওইখানে নিশ্চয়ই সেরকম একটা কিছু ঘটেছিল, নইলে উনি এই বাংলোর অভিজ্ঞতার কথাটাই বা বলবেন কেন?'

মাধবী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এটা ভূতের গল্প নয় তো?'

'কেন, ভূতের গল্প হলে তোমার আপত্তি আছে?'

'তাহলে কাল সকালে শুনব! ভূতের গল্প আমার রাত্রিতে শুনতে ভালো লাগে না'—

রঞ্জন তার স্ত্রীকে বলল, 'তাহলে খুকুমণি তুমি শুতে যাও না, কে তোমাকে আটকে রেখেছে! এটা নির্ঘাত ভূতের গল্প।'

আমি রঞ্জনকে বললাম, 'আঃ চুপ কর না! গল্পটা শুনতে দে—'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমি এরকম ফাঁকা জায়গায় অনেক বার একা রাত কাটিয়েছি, ভূত-টুতের দেখা পাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কখনও দেখা হয়নি। তবে ভূতের ভয় পেয়েছিলাম একবার। এক্ষুনি বলছি সেই কথা। সেদিন সেই বাংলোতে চৌকিদারের ব্যবহার আমার

খুব অদ্ভুত লেগেছিল। ও যেন আমাকে ওখান থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ওর কাছ থেকে কোনও সাহায্যই পাওয়া যাবে না। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। তুমি যাও!' তারপর চৌকিদার চলে যাওয়ার পর আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর আসতে চায় না। খালি পেটে সহজে ঘুম আসতে চায় না।

একবার দরজা খুলে বাইরে এলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। গাড়িটার সব দরজা লক করা আছে কিনা দেখলাম। চৌকিদারের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। কম্পাউন্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। চারদিকে অসম্ভব চুপচাপ। বড় রাস্তা দিয়ে একটাও গাড়ি যাচ্ছে না। বাংলোর কম্পাউন্ডের ওপাশে একটা উঁচু বাঁধের মতো। ওপরে উঠে দেখলাম, পাশেই একটা খাল। তার উলটো দিকে আট-দশটা খড় ও টিনের বাড়ি। চৌকিদারটা মিথ্যেবাদী, ও বলেছিল গ্রাম দু-মাইল দূরে। অথচ এত কাছেই তো বাড়ি রয়েছে।

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। কেন জানি না, খুবই অস্বস্তি লাগছে, কিছুতেই শুতে ইচ্ছা করছে না। আর মনে হচ্ছিল, ঘরের মধ্যে একটা যেন ক্ষীণ গন্ধ পাচ্ছি। ঘরে ঢোকার পর থেকেই গন্ধটা নাকে আসছিল। আগে ঠিক খেয়াল করিনি। ডেটলের গন্ধের মতন। অবশ্য আমি ডাক্তার মানুষ, ডেটলের গন্ধ শোঁকা অভ্যাস বলেই বোধহয় কল্পনা করেছিলাম সেটা। নইলে, অত রাত্রে বাংলোর মধ্যে ডেটলের গন্ধ আসবে কোথা থেকে।

আমার ঘরের তিনটে দরজা বারান্দার দিকে। উলটো দিকে আর একটা বাথরুমের—বাকি দরজাটা খুলে দেখতে হল। সেটা খুলতেই আমি চলে এলাম পাশের ঘরে। দরজাটার ছিটকানি লাগানো ছিল না।

পাশের ঘরে এসে চৌকিদারটার ওপর আমি আরও রেগে গেলাম। ও বলেছিল, এই ঘরটা অপরিষ্কার হয়ে আছে। কিন্তু ঠিক তার উলটো; সেই ঘরটিই বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মনে হয় সেদিন বিকেলেই সাফ করা হয়েছে। এই ঘরে ডেটলের গন্ধ আরও বেশি। এদিক-ওদিকে তাকিয়েও এই গন্ধের কোনও কারণ বুঝতে পারলাম না। দুটো খাট পাশাপাশি জোড়া দিয়ে তার ওপর নিখুঁত ভাবে বিছানা পাতা। ধপধপে চাদর। চৌকিদারটার মিথ্যে কথা বলার মানে কী! এ-ঘরে কি অন্য কেউ থাকে? চৌকিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অনেক সময়ে বাইরের লোক ডাকবাংলোয় পাকাপাকি আস্তানা গাড়ে। হোটেলের চেয়ে অনেক সস্তা হয়। কিন্তু এখানে এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে কে থাকতে আসবে? তা ছাড়া, ঘরটায় এমন কোনও জিনিসপত্র নেই যা থেকে বোঝা যাবে সেখানে কেউ নিয়মিত থাকে।

আমার গোঁ চাপল যে আমি এ-ঘরটাতেই থাকব। আমার ঘরে সিঙ্গল খাট, ওই ঘরে ডবল খাট—হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যাবে। পাশের ঘর থেকে আমার সুটকেস ও জামাকাপড় নিয়ে এলাম। এই ঘরটায় দরজায় বাইরে থেকে তালাবন্ধ, তবু আমি ছিটকিনি দিয়ে দিলাম ভেতর থেকে। অন্য সব দরজাটরজাও আটকালাম, হ্যাজাকটা সম্পূর্ণ না নিভিয়ে খুব কমিয়ে রেখে দিলাম টেবিলের ওপরে। সুটকেস থেকে আমার রিভলভারটা বার করে রেখে দিলাম বালিশের নীচে।'

রঞ্জন জিগ্যেস করল, 'আপনার সঙ্গে বুঝি সবসময় রিভলভার থাকে?'

কর্নেল সেন বললেন, 'তখন থাকত। বিহার শরিফে একবার গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলাম—তারপর থেকে গান পারমিট করিয়ে নিয়েছিলাম।'

মাধবী জিগ্যেস করলে, 'কী হয়েছিল বিহার শরিফে?'

কর্নেল সেন বললেন, 'সে গল্প শোনোনি? সেবার তো রঞ্জনের কাকা—অর্থাৎ তোমার খুড়শ্বশুর শৈলেনও আমার সঙ্গে ছিল। বিহার শরিফের কাছে গুণ্ডাদের পাল্লায় পড়েছিলাম। প্রাণেই মেরে ফেলত—শৈলেনের কাঁধে তো ছুরিও মেরেছিল—'

আমি বললাম, 'সেটা অন্য গল্প। সেটা এখন থাক। এখন আগে এই ডাকবাংলোর গল্পটাই

শোনা যাক।'

কর্নেল সেন বললেন, 'ঠিক বলেছ, সে-ই ভালো। এক গল্পের মধ্যে অন্য গল্প এসে যাচ্ছিল। ডাকবাংলোর ঘটনাটাই বেশি চমকপ্রদ। সেই রাত্রে বেশ কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঘুমটা গাঢ় হয়নি। নতুন জায়গায় গেলে মানুষের সাধারণত পাতলা ঘুমই হয়। এটা হচ্ছে এক ধরনের সহজাত ডিফেন্স ইন্সটিংকট। যাই হোক, ঘুমের মধ্যেই অস্পষ্ট ভাবে একবার মনে হল, কাছাকাছি একটা গাড়ির আওয়াজ। একবার মনে হল, দূরের রাস্তা দিয়েই যাচ্ছে গাড়িটা, আবার মনে হল, বাংলোর কম্পাউন্ডেই ঢুকেছে। তাহলে কি যাদের আসবার কথা ছিল তারা এসেছে? কিন্তু এত রাতে? একটুক্ষণ কান পেতে অপেক্ষা করার পর আর কোনও আওয়াজ পেলাম না। লোকের পায়ের আওয়াজ কিংবা বারান্দায় উঠে চৌকিদারকে ডাকাডাকি তো শুনতে পাব। তার কিছুই না। তখন বুঝতে পারলাম, আমারই মনের ভুল। রাস্তা দিয়ে কোনও গাড়ি চলে গেছে আমি ভেবেছি বাংলোতে এসেছে। রাত্রিবেলা, বিশেষত নির্জন জায়গায়, দূরের আওয়াজও কাছের মনে হয়।

এইসব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। কিন্তু সেটাও ঠিক শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ঘুম নয়। কিছু একটা অস্বস্তি থেকেই গিয়েছিল। কোথায় যেন খুটখাট শব্দ শুনছি, কে যেন কোনও একটা ভারী জিনিস ধরে টানছে, কেউ ফিসফাস করে কথা বলছে। একবার চোখ মেলে তাকিয়ে ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করলাম। কোথাও কিছুই নেই। সবই আমার মনের ভুল। ভুতুড়ে ডাকবাংলো নিয়ে অনেক গল্পটল্প পড়েছি তো—মনের মধ্যে সেগুলোই বোধহয় কাজ করছিল। বাংলার থেকেই ইংরেজিতেই এসব গল্প বেশি আছে। ভুতুড়ে ডাকবাংলো সাধারণত খুব পুরোনো হয়। কিন্তু এই বাংলোটা প্রায় নতুন। নতুন বাড়ি ভূতদের সহ্য হয় না।

আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলামও। এবার ঘুম ভাঙল স্পষ্ট একটা অনুভূতিতে। মুখের ওপর সুড়সুড়ির মতন ভাব, কেউ যেন আমার মুখের ওপর চামর বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ মেলে তাকালাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম আশেপাশে। কোথায় কিছু নেই! এটাও আমার মনের ভুল ছাড়া আর কী-ই বা হবে। তাহলে হয়তো স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখবার মানে কী? রাতদুপুরে আমার মুখে চামর বোলাতে আসবে কে? ভূতের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই? তা ছাড়া খুব ছেলেবেলায় মুশকিল আসানদের হাতে চামর দেখতাম, তারপর তো আর দেখিইনি।

এবার মনটা শান্ত করে আবার ঘুমোবার উদ্যোগ করলাম। কিন্তু চোখ বোজবার পরই মনে হল, না, মনের ভুল হতেই পারে না! আমার মন তো এতখানি কল্পনাপ্রবণ নয়। স্পষ্ট অনুভব করেছি, আমার মুখে চামরের মতন কিছু একটার ছোঁয়া লেগেছে। এটা একটা বাস্তব অনুভূতি। অর্থাৎ সত্যিই এরকম কোনও জিনিস আছে এই ঘরের মধ্যে। কী হতে পারে? কোনও পাখিটাখি নয় তো! চোখ খুলে তাকালাম আবার! এই ঘরের মধ্যে পাখি কী করে আসবে? ব্যাপারটা যতক্ষণ না কোনও নিষ্পত্তি করতে পারছি, ততক্ষণ আর ঘুম আসবে না।

তারপর ভাবলাম, যদি পাখি বা বাদুড়টাদুড় কিছু হয়, তাহলে একটুক্ষণ অপেক্ষা করলেই আবার তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে। চোখ খোলা রেখে স্থির হয়ে শুয়ে রইলাম। ঘরের মধ্যে বা বাইরে কোথাও কোনও শব্দ নেই। অদ্ভুত নিস্তব্ধ রাত। হঠাৎ মনে হল, আমি খুব ক্ষীণ একটা নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার নিজের নয়, অন্য কারওর। এক বার, দু-বার, তিন বার—

ধড়মড় করে উঠে বসলাম, হ্যাজাকের মৃদু আলোয় ঘরটা আবছায়া। ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পেলাম আমার শিয়রের কাছে দেওয়াল ঘেঁষে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার মাথার চুল খোলা। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, সেই চুলের ঝাপটা লেগেছিল আমার মুখে।'

মাধবী বিবর্ণ মুখে বলল, 'ভূত?'

রঞ্জন তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চুপ।'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়েছিল। এবং স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। নইলে, আমার তখন যুবক বয়স, মাঝ রাত্রে ঘরের মধ্যে একটি যুবতী মেয়েকে দেখে অন্য কিছুও তো মনে হতে পারত। আমরা যতই শিক্ষিত হই আর কুসংস্কার মুক্ত হওয়ার বড়াই করি, এক-এক সময় আমাদেরও যুক্তিবোধ নষ্ট হয়ে যায়।

মেয়েটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, ভদ্রঘরের মেয়ে, মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। একটা কালো রঙের শাড়ি পরে আছে, চুলগুলো সব খোলা, চোখ-মুখে রীতিমতন ভয়ের চিহ্ন। মেয়েটি দু-হাত জোড় করে আছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে। পাগল হতে পারে, কিংবা বিপদে পড়ে কেউ আশ্রয় চাইতে পারে—কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম কেন জানও? মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে? আমি তো সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছি শোওয়ার আগে।

রক্তমাংসের কোনও মানুষের পক্ষে তো দেওয়াল কিংবা দরজা ভেদ করে ঢোকা সম্ভব নয়! দরজাটা খোলা, স্পষ্ট দেখছি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। এটা কী করে সম্ভব? তবে কি অলৌকিক বা অশরীরী কিছু? আমার গলা শুকিয়ে গেল, হাত-পা কিছুই নড়াতে পারলাম না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও তাকিয়ে আছে সোজাসুজি আমার চোখে। মনে হয়, তার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম, আর যাই হোক, ভূত নয়, রক্তমাংসেরই মেয়ে। হয়তো পাগল, কিংবা ডাইনি জাতীয় কিছু—

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম, 'কে? কে আপনি?'

সেই অস্পষ্ট আলোতেও মনে হল মেয়েটির ঠোঁট কাঁপছে। কিন্তু কিছু বলল না। আমি আবার জোরে জিগ্যেস করলাম, 'কে আপনি?'

'শুনুন'—

মেয়েটি কথা শেষ করল না। হঠাৎ একটা দৌড় লাগাল। দৌড় শুরু করতেই আমি ভেবেছিলাম, ও বুঝি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নখ দিয়ে আমার চোখ অন্ধ করে...। ভয়ে আমি মুখ ঢেকে ফেলেছি।

মেয়েটি কিন্তু দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেল মাঝখানের দরজা দিয়ে। ওই দরজাও তো আমি বন্ধ করেছিলাম।

ভয়ে আমার বুক রীতিমতন ঢিপঢিপ করছে। কিছুতেই সামলাতে পারছি না নিজেকে। এ কথাগুলো স্বীকার না করলে মিথ্যে বলা হত। আমি ভিতু লোক নই। কিন্তু সেদিন ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। মেয়ের বদলে ঘরের মধ্যে পুরুষমানুষকে দেখলে বোধহয় ভয় পেতাম না। হঠাৎ রিভলভারটার কথা মনে পড়ল। মনে পড়তেই সাহস ফিরে এল কিছুটা।

বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বার করে খাট থেকে নামলাম। প্রথমে আমার পা দুটো কাঁপছিল খুব। আস্তে-আস্তে সেটা কমল। একবার ইচ্ছে হল, কোনওরকমে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ি। কিন্তু আবার এটাও অনুভব করলুম, মনের এই ভীরুতা না কাটাতে পারলে সারা জীবন একটা লজ্জা থেকে যাবে। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত দেখা দরকার। একটা রক্তমাংসের মেয়েই তো—তাকে এতটা ভয় পাওয়ার কী আছে। হ্যাজাকটা বাড়িয়ে দিয়ে সেটা বাঁ হাতে নিয়ে এলাম পাশের ঘরে।

মেয়েটি সেই ঘরেই অপেক্ষা করছিল, আমি খাট থেকে নেমে দু-এক পা এগোতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওখানে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করছিল আমাকে। ও ঘরের দরজাও খোলাই ছিল, কেননা আমি ছিটকিনি খোলার শব্দ পাইনি। শুধু দরজার একটা পাল্লায় আওয়াজ হল দড়াম করে।

পাশের ঘরে এসে আমি চুপ করে দাঁড়ালাম। তক্ষুনি বাইরে না বেরিয়ে দেখতে লাগলাম দরজাগুলো। কোনও দরজাই ভাঙা নয়। তাহলে ছিটকিনি খুলল কী করে? আমি প্রত্যেকটা বন্ধ করেছি। নাকি করিনি? অনেক সময় বেশি সাবধানী হতে গেলে আসল ব্যাপারেই ভুল হয়ে যায়। আমি যে একবার বাইরে গিয়েছিলাম—তারপর ভেতরে ঢুকে আর দরজা বন্ধ করিনি? তা প্রায় অসম্ভব বলা যায়। অথচ মেয়েটি ঢুকল কী করে ভেতরে? দরজা না ভেঙে বা দেওয়াল ভেদ করে তো কেউ ঘরে ঢুকতে পারে না। কিংবা বাইরে থেকে ছিটকিনি খোলার কোনও উপায় আছে! এই সমস্যার সমাধান আমি আজও করতে পারিনি।

ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়েই আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কে? কীজন্য এসেছেন?'

বাইরে থেকে কোনও উত্তর এল না। কোনও শব্দও নেই। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অলৌকিক বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। তখন আমার উচিত ছিল ভালো করেই দরজা-জানলা আবার বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়া। মন থেকে ব্যাপারটা একেবারে মুছে ফেলা।

কিন্তু এ যে একবার ধারণা হয়ে গেল, ছিটকিনি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দরজা দিয়ে মেয়েটি ঢুকেছে, তাহলে তো আবার বন্ধ করলে আবার ঢুকতে পারে। কোনও রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে যে বন্ধ দরজা না ভেঙে কিংবা দেওয়াল ভেদ করে আসা সম্ভব নয়, এই যুক্তিবোধটা আমার দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

আমি বাইরের বারান্দায় চলে এলাম। সেখানেও কেউ নেই। তবু আমি চিৎকার করলাম, 'কে? কে ওখানে?'

কোনও সাড়া নেই। তখন আমার চোখ পড়ল আমার গাড়িটার ঠিক পেছনেই আর একটা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে আগে সেটা আমি দেখতে পাইনি। তাহলে তো আর অলৌকিক বলে মনে করা যায় না। একটা জলজ্যান্ত জিপগাড়ি তো সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে। এবং গাড়ি যখন আছে তাতে নিশ্চয়ই কেউ এসেছে।

বারান্দায় সিঁড়ি দিয়ে দু-এক পা নেমে গিয়ে দেখলাম, জিপগাড়িটা খালি, ভেতরে কেউ নেই। যারা এসেছে, তারা গেল কোথায়? কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন? ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চৌকিদারের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। বেশ চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'চৌকিদার, চৌকিদার!'

চৌকিদার তো আগেই বলে রেখেছে যে সে কানে শুনতে পায় না। সুতরাং তার সাড়া না দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু চৌকিদারের ঘরে নিশ্চয়ই অন্য কেউ-না-কেউ আছে। আমি প্রথম যখন দরজা ধাক্কা দিয়েছিলাম, তখন ওর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ওর বউটউ হতে পারে। কিন্তু সে তো শুনতে পারে আমার চিৎকার। সে ডেকে দিতে পারছে না। এত রাত্রে ওর ঘরে আলো জ্বলছেই বা কেন?

জিপগাড়িটার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আমি এসেছিলাম। এমনসময় মনে হল জিপগাড়িটার পেছন থেকে কিছু একটা শব্দ হল। এই প্রথম আমি অন্য ভাবে সতর্ক হয়ে উঠলাম। জিপগাড়িটার পেছনে কেউ লুকিয়ে আছে। এবং নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টু বদমাইস লোক। আমার ডাকে যখন সাড়া দিচ্ছে না তখন ওদের কুমতলব থাকাই স্বাভাবিক।

আমার হাতে রিভলভার ছিল। কিন্তু ওরা জিপের পেছন থেকে খুব সহজেই আমাকে গুলি করতে পারে। আমি মাথা নীচু করে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ঘরের মধ্যে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলাম, 'আপনারা কে? কথা বলছেন না কেন?'

এবারও কেউ সাড়া দিল না। এই সাড়া না দেওয়ার ব্যাপারই আমার কাছে সবচেয়ে অস্বাভাবিক লাগছিল। চৌকিদারকে ডেকেও সাড়া পাওয়া গেল না। মাঝরাত্রে যারা জিপে করে আসে, তারাও সাড়া দেয় না। কিন্তু ওদের যদি চুরি করার মতলব থেকে থাকে—তাহলে আমি যখন বাইরে বেরিয়ে ছিলাম, তখন ওরা আমাকে সহজেই ঘায়েল করতে পারত। একলা মেয়েটাকে

প্রথমে ঘরের মধ্যে পাঠিয়ে আমাকে বাইরে টেনে এনেছে।

যাই হোক, এরা ডাকাত হলেও আমাকে একাই আত্মরক্ষা করতে হবে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চৌকিদারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। খালের ওপারে কয়েকটা ঘরবাড়ি আছে বটে, কিন্তু এখান থেকে চ্যাঁচালেও তারা শুনতে পাবে না। কিংবা শুনতে পেলেও সাহায্য করতে আসবে কিনা সন্দেহ। সাধারণত কেউ আসে না।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নজর রাখলাম জিপগাড়িটার ওপর। গাড়িটার পেছনে মানুষের নড়াচড়া আর ফিসফাস কথা শোনা যাচ্ছে একটু-একটু। ওরা ক'জন আছে? সেই মেয়েটাও গিয়ে ওখানে লুকিয়েছে? মেয়েটাকে দেখে আর যাই হোক, ডাকাত দলের সঙ্গিনী বলে মনে হয়নি। বরং ওর মুখে বেশ একটা ভয়ের চিহ্ন দেখেছিলাম, আমাকে কিছু একটা বলতেও চেয়েছিল। 'শুনুন' বলেই আর শেষ করতে পারেনি, ছুটে পালিয়েছে। কী ওদের মতলব? যদি ডাকাত হয় তাহলে আমাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েও ওরা ছেড়ে দিল কেন? আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না কেন? কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়!

দরজার ছিটকিনিটা খিল লাগিয়ে দিলাম। সে ঘরের খাটখানা এনে ঠেকিয়ে দিলাম দরজার সঙ্গে। তারপর চলে এলাম পাশের ঘরে। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে টেবিলটা টেনে এনে সেখানে আটকে দিলাম। বাথরুমের দরজাটার সামনে পরপর দাঁড় করিয়ে দিলাম দুটো চেয়ার। আমার কাছে চব্বিশটা বুলেট আছে। যদি কেউ দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করতে পারা যাবে। অন্তত দু-এক জন ঘায়েল না হয়ে আমাকে কিছু করতে পারবে না।

ওইসব চেয়ার-টেবিল টানাটানি করার সময় আমার সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল চৌকিদারটার ওপর। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই ডাকাতদলের যোগসাজশ আছে। কিন্তু তাহলে আবার ও আমাকে এই ডাকবাংলোয় থাকতে বারণ করেছিল কেন? এত রাত্তিরে ওর ঘরে আলোই বা জ্বলছে কেন? চৌকিদারের ব্যবহারটাই বেশ রহস্যময়। যাই হোক, তখন কিন্তু আমার আর সে রকম ভয় করছিল না। আমি রীতিমতন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

বাইরের দিকে দরজাটা সবচেয়ে ভালো ভাবে গার্ড করা দরকার। এ-ঘরে দুটো খাট আছে। দুটো খাটকেই টেনে এনে যদি দরজার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে অনেকটা দুর্গের মতো হবে।

বিছানাটা পাট করে রেখে আমি একটা খাট প্রথমে টেনে সরাতে গেলাম। একটু সরাতেই দেখলাম, তলায় একটা ডেডবডি!'

মাধবী চেঁচিয়ে উঠল, 'কী?'

কর্নেল সেন নির্লিপ্ত ভাবে বললেন, 'একটা ডেডবডি। একজন পুরুষমানুষ, বছর তিরিশেক বয়স। পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, সুপুরুষ বলা যায়—মেঝেতে একটা চাদর পেতে তার মৃতদেহটি শোয়ানো, রক্তটক্ত কিছু নেই—সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা, লোকটির চোখ চেয়ে আছে—হঠাৎ দেখলে তাকে মৃত বলে মনে হবে না। কিন্তু আমি তো ডাক্তার মানুষ, আমি একপলক তাকিয়েই তার মুখে মৃত্যুর চিহ্ন দেখতে পেলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম, কেন একটু আগে ঘরের মধ্যে ডেটলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। রক্তটক্ত সব ধুয়ে ডেটল দিয়ে ঘর মোছা হয়েছে। লোকটির জামাটামা তখনও ভিজে-ভিজে—বুলেটের গর্তটা ঠিক বুকের মাঝখানে নয়, গলার কাছে। যে তাকে মেরেছে, সে রিভলভার চালানোয় খুব অভিজ্ঞ নয়। কিংবা হয়তো ধস্তাধস্তি হয়েছিল।

খাটটা সরিয়েই সেই মৃতদেহটা দেখতে পেয়ে আমি দু-একটা মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।'

রঞ্জন বলল, 'ব্যস। এখন এই পর্যন্ত!'

আমি রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালাম।

মাধবী জিগ্যেস করল, 'তার মানে?'

রঞ্জন বলল, 'তোমার তো ঘুম পেয়ে গেছে! গল্পটা আজ এই পর্যন্ত থাক। আবার কাল শুনবে।'

মাধবী সোজা হয়ে বসে চোখ বড়-বড় করে বলল, 'আমার ঘুম পেয়েছে? তোমাকে বলেছে! এখন কেউ ঘুমোতে পারে?'

রঞ্জন হাসতে-হাসতে বলল, 'এই রকম দারুণ সাসপেন্সের জায়গায় গল্প থামিয়ে দিলে কী চমৎকার হবে বলো তো! শুয়ে-শুয়ে সারারাত তারপর কী হল, তারপর কী হল ভাববে! আসল গল্পের চেয়েও নিজের মনে-মনে অনেক গল্প তৈরি হবে! সেটাই ভালো না?'

মাধবী ধমকে উঠল, 'তুমি চুপ করো তো! বড্ড বাজে বকো! এই পর্যন্ত শুনে বাকিটা কেউ না শুনে পারে? সেই মেয়েটা কোথায় গেল?'

রঞ্জন আমার দিকে ফিরে বলল, 'তুই কী বলিস সুনীল? আজ এই পর্যন্ত থাক। না হলে সারারাত কেটে যাবে। মামাবাবুকে তো বিশ্রাম দেওয়া উচিত!'

কর্নেল সেন চুপ করে বসে আছেন। আমি বললাম, 'তার চেয়ে এক কাজ করলে হয়। মাধবী বরং একটু কফি বানাক! এখন একটু গরম হলেই জমবে। না হয় সারারাত জাগা হবে আজ! কর্নেল সেন, আপনার আপত্তি আছে?'

কর্নেল সেন বললেন, 'কিছুমাত্র না। কফির আইডিয়াটা খুব ভালো। এখন একটু গরম কফি পেলে মন্দ হত না!'

রঞ্জন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই হোক তবে। মাধবী উঠে পড়ো!'

মাধবী আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'খালি আমাকে খাটানো. এত রাত্রে রান্নাঘরে ঢুকতে আমার ভয় করছে!'

॥ ২ ॥

বৃষ্টি থামেনি। সমানে পড়ছে। রাস্তাঘাট সব থইথই। মনে হচ্ছে আজ রাত্রেই কলকাতা প্লাবনে ডুবে যাবে। কাল সকালেও বাড়ি থেকে বেরোনো যাবে কিনা সন্দেহ। আজকের রাতটা গল্প জমাবার পক্ষে চমৎকার। কফির কাপ হাতে নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে বৃষ্টির দৃশ্য দেখলাম।

কফি শেষ হওয়ার পর কর্নেল সেন চুরুট ধরালেন। আমি আর রঞ্জনও সিগারেট জ্বেলে নিলাম। মাধবীর আর তর সইছিল না, ব্যগ্র ভাবে বলল, 'এইবার বলুন, তারপর কী হল?'

কর্নেল সেন বললেন, 'ওই অবস্থায় ওইরকম পরিবেশে খাটের তলায় হঠাৎ একটা ডেডবডি দেখতে পেলে অন্যদের পক্ষে খুব ভয় পাওয়ার কথা। আমিও দু-একটা মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ওটা দেখার পর আমার বরং ভয়টা একেবারেই কেটে গেল। আগে যে অলৌকিক কিছু বা ভূতটুত সম্পর্কে মনের মধ্যে একটু ছমছমে ভাব হয়েছিল, সেটা আর রইল না। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার কাছে ডেডবডি একটা রিয়ালিটি। অর্থাৎ একটা মানুষের মৃতদেহ দেখলেই মনে হয় যে তার মৃত্যুর একটা কারণ আছে। সে কিছুক্ষণ আগে বেঁচে ছিল। একটা মৃতদেহ হঠাৎ দেওয়াল ভেদ করে আসে না বা হঠাৎ উপে যায় না।

তখন গুন্ডা বদমায়েশের চিন্তাই আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। মৃতদেহটার দিকে আর মনোযোগ না দিয়ে আমি খাটটা টেনে এনে দরজার সঙ্গে লাগিয়ে দিলাম। রিভলভারটা হাতে তৈরি রেখে দেখতে লাগলাম, আর কোনও দিক থেকে কেউ ঢুকতে পারবে কিনা। একটা জানলা আছে, কিন্তু সেই জানলাটা ভেঙে ফেলা অসম্ভব নয়। আর জানলাটা একটু উঁচুতে বলে, সেটার সামনে

অন্য কিছু রাখারও উপায় নেই। আমি জানলার পাশে গিয়েই দাঁড়ালাম। জানলা ভেঙে যদি ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে প্রথমেই আমি গুলি করব। ওদের লোকসংখ্যা যদি খুব বেশি না হয়, তাহলে সারা রাত আমি লড়ে যেতে পারব।

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। মাঝরাত্রে এক জায়গায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই ক্লান্ত লাগে। কিন্তু আমাকে ক্লান্ত হলে চলবে না, সারা রাতই একরকম দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বেশ বুঝতে পারলাম, এই নির্জন বাংলোয় একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত কাল রাত্রে। দিনেরবেলা ওরা ডেডবডিটা সরাবার সুযোগ পায়নি—এখন সেটা সরাতে এসেছে। অর্থাৎ একটা বিশ্রী খুনের ঘটনা, এর মধ্যে একটি মেয়েরও ভূমিকা আছে। যারা এক রাত্রে কাউকে খুন করে পরের রাত্রে ডেডবডি সরাতে আসে, তারা সাঙ্ঘাতিক লোক। মাঝখান থেকে হঠাৎ আমি এসে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। জড়িয়ে তো পড়ছি, এখন এর মধ্য থেকে বেরোব কী করে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা।

ওদিক থেকে আর কোনও শব্দটব্দ না পেয়ে আমি মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। ডাক্তার মানুষ তো, এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। চোখের সামনে এরকম একটা ডেডবডি পড়ে থাকলে পরীক্ষা না করে দেখা পর্যন্ত শান্ত হতে পারি না। সব দেখেশুনে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হলাম।'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'মামাবাবু, সত্যি কথা বলুন তো, তখন আপনার ভয় করছিল না? ঘরের মধ্যে একটা মড়া।'

কর্নেল সেন বললেন, 'না, মড়া দেখে ভয় পেলে আমাদের চলে না। তবে, ঘরের বাইরে জ্যান্ত লোকগুলো সম্পর্কেই ভয় পাচ্ছিলাম।'

'সেই মেয়েটার কী হল? তার আর কোনও পাত্তা পেলেন না?'

কর্নেল সেন বললেন, 'হ্যাঁ পেলাম। একটু বাদে, জানলায় একটা শব্দ হতেই আমি চট করে উঠে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। মনে হল, কেউ যেন জানলার খড়খড়ি তোলার চেষ্টা করছে। আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, 'আমার কাছে রিভলভার আছে, জানলা খোলার চেষ্টা করলেই আমি গুলি করব।'

তখন সেই মেয়েটির গলা শুনতে পেলাম। সে বলল, 'শুনুন!'

এখন আর তাকে আমি পেত্নি-টেত্নি ভাবতে পারছি না। সুতরাং ভয় না পেয়ে বললাম, 'বলুন।'

'দরজাটা একটু খুলবেন?'

'না। আপনারা কে?'

'ঘরের মধ্যে যে দেহটা আছে আমি সেটা নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আপনার সঙ্গে আর কে আছে?'

'কেউ নেই। আমি একা।'

'আপনি একা তো এই ডেডবডি নিয়ে যেতে পারবেন না।'

'আপনি একটু সাহায্য করবেন। সঙ্গে আমার জিপ আছে।'

এটা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হল না যে মেয়েটির সঙ্গে অন্য লোক আছে। একজন বা তারও বেশি। তাদের নড়াচড়ার শব্দও আমি শুনতে পেয়েছি। কিন্তু ওরা মেয়েটিকে প্রথমে এগিয়ে দিচ্ছে বিশেষ কারণে। চৌকিদারের কাছ থেকেই হোক বা আমার গাড়িটা থেকেই হোক—ওরা বুঝতে পেরেছিল যে আমি মিলিটারির লোক। সুতরাং আমার কাছে বন্দুক রিভলভার থাকবেই। ওরা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি যে আমি একজন ডাক্তার। যাই হোক, ওরা ভেবেছে, মিলিটারির লোক সাধারণত মাথাগরম হয়। ওদের মধ্যে কোনও পুরুষকে সামনে দেখতে পেলে প্রথমেই হয়তো আমি

গুলি করতে পারি। একটি মেয়েকে দেখলে আর যাই হোক, প্রথমেই কোনও পুরুষমানুষ গুলি ছুড়তে পারে না।

যে-কোনও উপায়েই হোক, আমার ঘরের দরজা খুলে ওরা মেয়েটিকে ভেতরে পাঠিয়েছিল। মেয়েটি একলাই বোধহয় ডেডবডিটা টেনে নিয়ে যেত, তার আগে সে দেখে গিয়েছিল, আমি জেগে আছি কিনা। সেই সময় তার চুল এসে লেগেছিল আমার মুখে।

যাই হোক, আমি জেগে ওঠবার পর মেয়েটি যদি খুব কান্নাকাটি করে কোনও একটা গল্প বানিয়ে বলত, আমি হয়তো বিশ্বাসও করে ফেলতাম। আমার তখন যা বয়স, সেই বয়সের ছেলেরা যুবতী মেয়েদের কথা সহজেই বিশ্বাস করতে চায়! বিশেষত মেয়েদের চোখের জল দেখলে তো কথাই নেই। কী, ঠিক বলছি না?

মেয়েটা যদি কান্নাকাটি করে একটা রোমহর্ষক গল্প বানিয়ে বলতে পারত, তাহলে ওকে হয়তো আমি সাহায্যও করতে পারতাম। একা কোনও মেয়ে বিপদে পড়লে, লোকে কিছুটা অন্যায়ের ঝুঁকি নিয়েও তাদের সাহায্য করতে চায়। কিন্তু মেয়েটি তার পার্ট ভালো করে প্লে করতে পারেনি। ঘরের মধ্যে ওকে যখন আমি দেখলাম, তখন ও দেওয়াল ঘেঁষে হাতজোড় করে বলেছিল, 'শুনুন—।' তারপর কথা শেষ করতে পারেনি, দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখনই আমি সাবধান হয়ে গেলাম।

এখনও, জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটি ভালো করে অভিনয় করতে পারছে না। কথা বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে। কেউ যেন পাশে থেকে তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কে?'

মেয়েটি বলল, 'সে কথা আপনার জেনে দরকার নেই। আমার স্বামী হঠাৎ আত্মহত্যা করেছেন। আমি তাঁর ডেডবডিটা নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আত্মহত্যা করলেও পুলিশে খবর দিতে হয়। খবর দিয়েছেন?'

'আপনি এর মধ্যে জড়াবেন না। আপনি দরজাটা খুলে দিন! আমি ওকে নিয়ে যাই। তারপর আপনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।'

আমি তখন বললাম, 'ঠিক আছে, বাইরে সারা রাত অপেক্ষা করুন। সকালবেলা দেখা যাবে কী করা যায়।'

মেয়েটি আবার বলল, 'আপনি শুধু-শুধু ব্যাপারটা জটিল করছেন। আমি ডেডবডিটা নিয়ে গেলে—আপনার কথা কেউ জানতেও পারবে না।'

কর্নেল সেন একটু থামলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমরাই বলো তো, তখন আমার কী করা উচিত ছিল? আমার কি দরজা খোলাই উচিত ছিল?'

রঞ্জন বলল, 'নিশ্চয়ই না। ওই রকম অবস্থায় দরজা খোলা তো পাগলামি। খুনের ব্যাপারে আপনি একজন সাক্ষী হয়ে গেলেন। ওরা আপনাকেও শেষ করার চেষ্টা করত। মেয়েটাকে আড়াল করে লোকগুলো ঢুকত, ওদের কাছেও রিভলভার বা বন্দুক নিশ্চয়ই ছিল। কারণ খুনটা হয়েছিল গুলি করে। এমনকী মেয়েটাও আপনাকে গুলি করতে পারত। মেয়েদের বেশি ভালো ভাবার তো কোনও কারণ নেই!'

মাধবী বলল, 'কিন্তু মামাবাবু, আপনাকেও তো ওরা জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারত। ওরা যদি তখন পালিয়ে গিয়ে গোপনে পুলিশে খবর দিত—তাহলে পুলিশ এসে দেখত ঘরের মধ্যে আপনি একা আর একটা ডেডবডি—'

কর্নেল সেন বললেন, 'মাধবী, তুমি এক বিষয়ে ঠিকই বলেছ। যে-কোনও সাধারণ লোক ওই অবস্থায় পড়লে ওইরকম ভাবতে পারত। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি একজন ডাক্তার। এইসব ক্ষেত্রে ডাক্তারদের চিন্তাভঙ্গি একটু অন্য রকম হয়। মৃতদেহটি পরীক্ষা করেই আমি বুঝেছিলাম,

লোকটিকে খুন করা হয়েছে অন্তত ষোলো থেকে কুড়ি ঘণ্টা আগে। পোস্টমর্টেমে সেটা ধরা পড়বেই— তখন মৃত্যুর সময়টা আরও নির্ভুল ভাবে বলা যায়। ষোলো থেকে কুড়ি ঘণ্টা আগে আমি ছিলাম ওই ডাকবাংলো থেকে অনেক দূরে। সেটা প্রমাণ করতে কোনও অসুবিধে হবে না। সুতরাং খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ভয় আমার ছিল না। আমার ভয় ছিল আমি নিজেই না খুন হয়ে যাই।

আমি মেয়েটিকে বললাম, 'আমি দরজা এখন কিছুতেই খুলব না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারপর দেখা যাবে।' মেয়েটি আর কোনও উত্তর দিল না। আমি শুনতে পেলাম সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বেশ কিছুক্ষণ কান্নার পর সে ধরা-গলায় বললে, 'আপনার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি। আপনি আমাকে এইটুকু সাহায্য করবেন না? আমার স্বামীর দেহটা আমাকে নিয়ে যেতে দিন।'

আমি এখন আর মেয়েটির অভিনয়ে ভুললাম না। রুক্ষ গলায় বললাম, 'আপনার স্বামীর দেহ কি কার দেহ, সেসব আমি কিছু জানি না। সকালবেলা বোঝা যাবে। এখন আমি দরজা খুলব না।'

এতক্ষণ বাদে একজন পুরুষের কথা শুনতে পাওয়া গেল। আমাকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'আপনি যদি না খোলেন, আমরা দরজা ভেঙে ঢুকব।'

তখন আমার ভয় পাওয়ার কোনওই মানে হয় না! আমিও ভয় দেখিয়ে ধমক দিয়ে বললাম, 'প্রথম যে ঢুকবে, তার নির্ঘাত মরণ আছে আমার হাতে। সে চেষ্টা না করাই ভালো।'

পুরুষটি আবার বলল, 'আপনি কেন এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছেন? দরজা খুলে দিন, আমাদের জিনিস আমরা নিয়ে চলে যাই। আপনি চুপচাপ ঘুমোবেন, আপনার কেউ কোনও ক্ষতি করবে না।'

আমি বললাম, 'কাল সকালের আগে কিছু হবে না। সকালের আগে আমি দরজা খুলব না।'

পুরুষটি যদিও বাংলায় কথা বলছিল, কিন্তু টান শুনলেই বোঝা যায় যে বাঙালি নয়। মেয়েটি কিন্তু খাঁটি বাঙালি। মৃতদেহটা যার, সেও বাঙালিই। ব্যাপারটা আমার কাছে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল। যাই হোক, আমার কথা শুনে লোকটি আর কিছু বলল না।

তারপর আবার চুপ। মনে হল, একটু বাদে কে যেন নেমে গেল বারান্দা দিয়ে। আবার কেউ যেন ফিরে এল। আবার চুপচাপ। আমি উৎকণ্ঠ হয়ে রইলাম, সামান্য শব্দও যে আমার কান না এড়ায়। কিন্তু মনে হল, জানলা বা দরজা ভাঙার চেষ্টা আপাতত ওরা ত্যাগ করেছে। ওরা অপেক্ষা করছে আমার কোনও দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নেওয়ার জন্য। এমনি ভাবে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কেটে গেল।

'শেষপর্যন্ত আমি কী করলাম জান? শুনলে বোধহয় তোমরা বিশ্বাসই করবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম!'

মাধবী আঁতকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? ঘুমিয়ে পড়লেন? ওই অবস্থায়?'

কর্নেল সেন বললেন, 'কী করব। ঘুমের ওপর কি কারওর হাত আছে? ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার শরীরটাও সেদিন বিশেষ ভালো ছিল না। ঘুমে চোখ টেনে আসছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে আর না পেরে, আমি দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়েছিলাম। তারপর কখন যে এক ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই। ঘরের মধ্যে একটা মড়া, বাইরে কতকগুলো গুণ্ডা বদমাইশ। তার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।'

রঞ্জন বলল, 'ব্যস এই পর্যন্ত। এবার চলো, আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি।'

মাধবী রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি চুপ করো তো! তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে তো, তুমি যাও। আমরা শুনব। তারপর কী হল মামাবাবু?'

রঞ্জন বলল, 'আমার একটুও ঘুম পায়নি। কিন্তু গল্প খুব জমে উঠলে আমার মনে হয়, শেষ হলেই তো ফুরিয়ে যাবে। ভালো বই যে কারণে আমি তারিয়ে-তারিয়ে পড়ি। আজ এই পর্যন্ত শোনা হল, আবার কাল সকালে বাকিটা শুনব। না হলে কাল সকালে কী করব? যা বৃষ্টি কাল সকালেও তো বেরোনো যাবে না।'

মাধবী বললে, 'কাল সকালে সুনীলদা গল্প বলবে। আজ রাতে আমরা এটা শেষপর্যন্ত না শুনে শুতে যাব না।'

কর্নেল সেন মুচকি হেসে বললেন, 'এটা শেষ হতে-হতে কিন্তু সারা রাত কেটে যেতে পারে।'

'তা হোক। একটুও ঘুম পাচ্ছে না।'

আমি রঞ্জনকে বললাম, 'ভাই, আমারও নেশা লেগে গেছে। এখন এই পর্যন্ত শুনে আর থাকা যায় না। ডিটেকটিভ বই পড়তে-পড়তে আমি অনেক রাত কাবার করে দিই।'

কর্নেল সেন বললেন, 'ডিটেকটিভ বইয়ের মতন এ-গল্পে সেরকম কোনও জটিল প্লট অবশ্য নেই! পরে যখন কেস উঠল'—

রঞ্জন তার মামাবাবুকে বাধা দিয়ে বলল, 'শেষের কথা এখন বলবেন না। আপনি পরপর বলুন। ঘুমিয়ে পড়লেন, তারপর কী হল?'

॥ ৩ ॥

কর্নেল সেন আবার হেসে মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারপর আর কী? আসলে গল্পটা বেশি বড় নয় মোটেই। এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে। বসে-বসে সেই যে ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর আর কিছু মনে নেই। এর মধ্যে জানলা ভেঙে ঢুকে আমাকে মেরে ফেলতে পারত। কিংবা জানলা ভাঙার শব্দে আমি হয়তো জেগে উঠতাম। সেসব কিছুই হয়নি। ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখলাম যে রীতিমতন সকাল হয়ে গেছে; গল্পটা এখানেই শেষ। এবার ঘুমোতে যেতে পারো!'

মাধবী সবিস্ময়ে বলল, 'গল্প শেষ মানে? মড়াটা কী হল। নেই?'

কর্নেল সেন বললেন, 'মড়াটা ভূত হয়ে পালায়নি। সেটা তখনও সেখানেই পড়ে আছে। কিন্তু এরপর তো পুলিশ-টুলিশের ব্যাপার। আমি ডাকবাংলোর অভিজ্ঞতার কথা বলব বলেছিলাম। সে গল্প এখানেই শেষ। ডাকবাংলোর এরকম রোমাঞ্চকর রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা তোমাদের কখনও হয়েছে? ডাকাতদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত গুলি ছোড়াছুড়ি করতে হয়নি অবশ্য, কিন্তু গোটা রাত অজানা অচেনা এক লোকের মৃতদেহের সঙ্গে এক ঘরে কাটিয়ে ছিলাম। ঘরের বাইরে কয়েকজন রহস্যময় নারী-পুরুষ। তারপর আবার ঘুম। এরকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কি সচরাচর মানুষের হয়? এইটুকুই গল্প! এরপর থানা-পুলিশ, আইনের ব্যাপার—তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।'

মাধবী বলল, 'না মামাবাবু, ওসব চলবে না। তারপর কী হল বলুন।'

রঞ্জন বলল, 'তারপর আর কী? গল্প তো শেষ হয়ে গেছে। এই গল্পের নামে 'একরাত্রির অভিজ্ঞতা।' তুমি বাচ্চা মেয়ের মতন তারপর, তারপর জিগ্যেস করছ কেন? বাচ্চারাই তো গল্প শেষ হওয়ার পরও জিগ্যেস করে তারপর কী হল।'

মাধবী এত চটে গেছে যে চটাস করে এক চড় বসাল স্বামীকে।

আমিও আর ধৈর্য রাখতে পারছিলাম না। কর্নেল সেনকে জিগ্যেস করলাম, 'গল্প তো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আপনি ও-ঘর থেকে বেরোলেন কী করে? ওরা তখনও ছিল না বাইরে?'

কর্নেল সেন চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, 'আমি অনেকক্ষণ দরজা খুলিনি। তারপর জানলার

খড়খড়ি তুলে দেখলাম। দেখতে পেলাম না কাউকে। জিপটাও নেই, তবে আমার গাড়িটা ঠিকই আছে। মনে হল ওরা চলে গেছে।

দিনের আলোয় মৃতদেহটা ভালো করে দেখলাম। লোকটি বিশেষ যন্ত্রণা পেয়ে মরেনি, গুলি লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ হারিয়েছে। তার মুখে-চোখে একটা বিস্ময়ের ছাপ—যেন মৃত্যুর জন্য সে তৈরি ছিল না। রিভলভার বা বন্দুকের গুলি তার গলার কাছ দিয়ে ঢুকে ব্রেনের দিকে চলে গেছে। চেহারা দেখলে মনে হয়, লোকটি সাধারণত মধ্যবিত্ত ঘরের। টাকাপয়সার জন্য কেউ তাকে খুন করেছে—এমন মনে হয় না। যে মেয়েটি কাল রাত্তিরে এসেছিল, সে কি সত্যিই এর স্ত্রী?

ডাকবাংলোই একটা সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহটি ঢেকে দিলাম। তারপর সাবানটাবান নিয়ে আমি ঢুকলাম বাথরুমে। বাইরে তখনও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজা খুললাম। ওরা আশেপাশে লুকিয়ে থাকতেও পারে। হয়তো আমাকে ঘর থেকে বার করার জন্য প্রলোভন দেখাচ্ছে। কিন্তু আমিই বা কতক্ষণ ঘরের মধ্যে বন্দি থাকব?

তখন সকাল প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে গাড়ি যাচ্ছে টের পাচ্ছি। দিনের আলোয় অতটা ভয় করে না। রিভলভারটা পকেটে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

কেউ কোথাও নেই। বাংলোটার চারপাশ ঘুরে দেখলাম ভালো করে। আর কোনও লুকোনো জায়গা থাকা সম্ভব নয়। রাত্রির আগন্তুকদের তো খুঁজে পাওয়া গেলই না, চৌকিদারটারও কোনও পাত্তা নেই। তার ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে জিনিসপত্তর পড়ে আছে, কিন্তু তার কোনও চিহ্ন নেই কোনওখানে। গতকাল যখন আমি তার ঘরের দরজাটা ঠেলেছিলাম, তখন দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তার বউটউ কেউ ছিল। দুজনেই সকালবেলা উঠে কোথায় গেল? পালিয়েছে?

কাল সন্ধ্যার পর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় পেট চিনচিন করছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার চা খাওয়া অভ্যাস। চায়ের তেষ্টায় মরে যাচ্ছি। কী করব, কিছুই ভেবে পেলাম না।

সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল অবশ্য আমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে আবার গাড়িতে উঠে চম্পট দেওয়া। তাই না?'

রঞ্জন বলল, 'সেটা আপাতত খুব সহজ মনে হলেও আসলে খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পরে ধরা পড়লে অনেক বেশি গুরুতর অভিযোগ—'

কর্নেল সেন বললেন, 'কিন্তু পরে ধরা পড়ার সম্ভবনা খুবই কম। তোমরা ডিটেকটিভ বইতে পড়ো, ছোটখাটো সূত্র ধরে পুলিশ চটপট এক-একজনকে গ্রেফতার করে ফেলে। আসলে কি তাই হয়? শুধু আমাদের দেশে কেন, বিদেশেও সবসময় হয় না। আমি যদি সকালবেলায় উঠে সেই বাংলো থেকে সরে পড়তাম, তাহলে আর আমার খোঁজ পাওয়ার সাধ্য ছিল না কারওর। আমাকেও কোনও ঝামেলায় পড়তে হত না। ওই খুনের কোনও কিনারা হত কিনা তাও সন্দেহ। আশেপাশে কত ফাঁকা জায়গা—আততায়ীরা যদি রাত্রির অন্ধকারে ডেডবডিটা সরিয়ে মাঠের মধ্যে কোথাও গভীর গর্ত করে পুঁতে দেয়—কে আর তার খোঁজ পাবে? টাকা দিয়ে চৌকিদারের মুখ বন্ধ করে রাখা যায়। মাঝখান থেকে আমি এসে পড়াতেই সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

আমার বয়স তখন কম, সেই সময়ে ঝামেলা এড়াবার বদলে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াতেই বেশি ঝোঁক চাপে। সুতরাং আমি সকালবেলা উঠে পালিয়ে যাইনি। তা ছাড়া একটা নিয়ম আছে, তুমি যদি হত্যা বা এই ধরনের ক্রাইম সংঘটিত হতে দেখো, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশকে জানানো কর্তব্য। না জানালে, আইনের চোখে তুমিও অপরাধী। আজকাল অবশ্য এসব কেউ মানে না—খুনজখম এত বেশি হচ্ছে যে লোকে দেখলেও চোখ ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু আমরা পুরোনো কালের মানুষ, আমাদের এথিক্স আলাদা।

বাংলোর ঘরে ফিরে এসে আমি ডেডবডিটা আবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম।

লোকটির পকেটে কাগজপত্তর কিছু নেই। তার পরিচয় জানবার কোনও চিহ্ন রাখা হয়নি। বুলেটটা তার দেহের ভেতরেই রয়েছে। ঘরের মধ্যে তার ব্যবহৃত একটা জিনিসও নেই।

এই রহস্যটার শেষ না জেনে বাংলো থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার। গত রাত্রির সেই মেয়েটির পরিচয় জানবার জন্য ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছিলাম। তা ছাড়া এরকম অবস্থায় পড়লে সবারই একটু-একটু ডিটেকটিভ হওয়ার সাধ জাগে। ভেবে-ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। লোকটির সঙ্গে কোনও লাগেজ নেই কেন? ডাকবাংলোয় এসে যদি কেউ ওঠে, বিশেষত স্বামী-স্ত্রী—তাদের সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র তো থাকবেই। সেগুলো যদি কেউ সেরিয়ে ফেলতে পারে—তাহলে ডেডবডিটাই বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখল না কেন; কিংবা ফেলে গিয়েও আবার নিতে আসবে কেন?

ঘর থেকে আবার বাইরে এলাম। কথা বলার মতন একটা লোক পেলে ভালো হত। কিন্তু কেউ নেই ধারে কাছে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে বটে, কিন্তু আমি তো আর হঠাৎ কোনও গাড়িকে জোর করে থামিয়ে বলতে পারি না—'ও মশাই, দেখবেন আসুন, এখানে একটা ডেডবডি পড়ে আছে!' সুতরাং আমাকেই থানায় খবর দিতে যেতে হবে। থানা কত দূরে তাও জানি না।

ডাকবাংলোর ঘরের তালাচাবি ঘরের মধ্যেই পড়েছিল। সেগুলোর বদলে আমি আমার নিজের সুটকেসের তালাটা ঘরের দরজায় লাগিয়ে দিলাম। অন্য সব দরজাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ।

গাড়িতে উঠে ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডটা ছাড়াতেই খালের ওপারে সেই ঘর বাড়িগুলোর কিছু লোকজনের চিহ্ন দেখা গেল। সেখানে গিয়ে থানার খবরটা জিগ্যেস করব কিনা ভাবছি, এমন সময় রাস্তার ওপরেই একজন বুড়ো মতন লোককে দেখা গেল।

গাড়িতে বসে লোকটিকে ডাকলাম। গ্রাম্য চাষি শ্রেণির মানুষ, মুখে-চোখে খুব একটা বুদ্ধির ছাপ নেই। তাকে জিগ্যেস করলাম, 'থানা কোথায় বলতে পারো?'

সে হাত তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিল।

'কত দূরে?'

'দু-ক্রোশ তিন ক্রোশ হবে।'

দূরত্ব সম্পর্কে গ্রামের লোকদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তিন ক্রোশ যখন বলছে—তখন অন্তত মাইল দশেকের কম নয়। আমি তাকে বললাম, 'চলো, আমার সঙ্গে একটু থানায় চলো—'

বলেই বুঝতে পারলাম খুব ভুল করেছি। লোকটি ভয়ার্ত সন্দেহ-মাখা চোখে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। গ্রামের লোক সাধারণত থানার নাম শুনলেই ভয় পায়—তারপর তাকে বিনা দোষে থানায় যেতে বলা! লোকটি আর কোনও কথা না বলে হনহন করে চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে বললাম, 'এই যে, শোনো-শোনো—। তোমাকে থানায় যেতে হবে না। একটা কথা শোনো!'

পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে লোকটির হাতে দিয়ে বললাম, 'তুমি একটা কাজ করতে পারবে ভাই? আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ওই বাংলোটায় একটু অপেক্ষা করতে পারবে? আমার কিছু জিনিসপত্তর রেখে গেলাম—'

আমি চাইছিলাম বাংলোটার ওপর কেউ একটু নজর রাখুক। কিন্তু ডেডবডিটার কথা ওকে বলতে পারি না। ওকে ঠিক বোঝানোই মুশকিল! লোকটি বিনা বাক্যব্যয় টাকাটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখল, নোটখানা জাল কিনা। আমি তাকে বললাম, 'এখানে একটু থেকো কিন্তু—আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।' লোকটি তারও কোনও উত্তর দিল না।

আমি গাড়ি ছাড়ার একটু পরেই পেছনে তাকিয়ে দেখি লোকটা মাঠের ওপর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে। ওর বেশ মওকায় পাঁচটা টাকা লাভ হয়ে গেল।'

মাধবী খিলখিল করে হেসে উঠল।

কর্নেল সেন বললেন, 'হাসছ? খুব বোকার মতন কাজ করে ফেলেছিলাম, তাই না? কিন্তু

আগের রাত্রে ওইরকম একটা অভিজ্ঞতা হওয়ার পর তার পরদিন সব ব্যাপারে মাথা ঠিক রাখা শক্ত।

থানা অবশ্য খুব বেশি দূরে নয়, মাইল পাঁচেকের মধ্যেই, আমার গাড়ি সেখানে থামতেই গেটের সেপাই আমাকে দেখে লম্বা একটা স্যালুট দিল। বুঝলাম, আমার মিলিটারি পোশাকের মহিমা। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, একজন সাব ইনস্পেক্টর টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে এক মনে শ্যামাসংগীত গাইছে। আমাকে দেখেই তটস্থ হয়ে উঠল। আমি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই বলে উঠল, 'বসুন স্যার, আমাদের বড়বাবুকে ডাকছি।'

বড়বাবু এলেন লুঙ্গি পরে। বিশাল বপু। অত সকালেই পান চিবোচ্ছেন। মফস্বলে ছোট থানায় এরকমই ঢিলেঢালা ব্যাপার চলে। অন্তত তখনকার দিনে চলত। বড়বাবু অর্থাৎ ও. সি. আমাকে আপ্যায়ন করে বসালেন। বিগলিত ভাবে বললেন, 'বসুন স্যার, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চা খাবেন তো! ওরে, চা নিয়ে আয়! সিঙাড়া খাবেন? এই সময় গরম সিঙাড়া ভাজে!'

আমি বললাম, 'চা খাওয়ার সময় নেই। আমি একটা খুনের ঘটনা রিপোর্ট করতে এসেছি।'

বড়বাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, 'খুন? আমার এরিয়ায়? এ কী অসম্ভব কথা!'

বড়বাবু চ্যাঁচামেচি করে থানায় সব্বাইকে ডেকে জড়ো করলেন। তাদের সামনে আমাকে পুরো ঘটনাটা বলতে হল।

মোটমাট থানা থেকে ফিরে আসতে আমার মিনিট পঞ্চাশেক সময় লেগেছিল। বড়জোর এক ঘণ্টা। দারোগাকে ঘটনার গুরুত্ব কিছুতেই বোঝানো যায় না। বারবার বলতে লাগলেন, তাঁর এরিয়াতে চাষাভুষোরা মাঝে-মাঝে খুনোখুনি করে বটে, কিন্তু গত দু-তিন বছরের মধ্যে কোনও ভদ্দরলোক খুন হয়নি। আমি শেষকালে একটু রাগের সঙ্গেই বললাম, 'আগে ডেডবডিটা দেখবেন চলুন—তারপর বিচার করবেন সেটা ভদ্রলোকের কিংবা চাষাভুষোর! আমার কাছে একটা খুন হয়েছে, সেইটাই বড় কথা, সেটা ভদ্দরলোক কিংবা চাষার—তাতে কিছু যায় আসে না।'

এর পরেও দারোগা আমাকে চা না খাইয়ে ছাড়বেন না। আমার চা-তেষ্টা পেয়েছিল বটে, কিন্তু দেরি করতেও ইচ্ছে করছিল না। দারোগাবাবু বললেন, 'আরে মশাই ডেডবডি তো আর পাখা মেলে উড়ে পালাবে না! চা-টা নষ্ট করবেন কেন?

তারপর দারোগাবাবু গেলেন পোশাক বদলাতে। তাতে লাগল মিনিট দশেক। ফিরে এসে জিব কেটে বললেন, কিন্তু যাব কীসে? আমাদের গাড়িটা তো খারাপ হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে।' আমি বললাম। 'চলুন। আমার গাড়িতে চলুন।'

ফিরে এসে প্রথমেই আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ করলুম। দরজায় আমার তালাটা লাগানো নেই। আমার তালার কোনও চিহ্নই নেই, দরজায় ডাকবাংলোর নিজস্ব ডবল তালা লাগানো। তার চাবি আমার নেই। অর্থাৎ এর মধ্যেই কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

আমি দারোগাকে বললাম, 'তালা ভাঙতে হবে। এই তালার চাবি তো এখন পাওয়া যাবে না।'

দারোগাবাবু জানালার খড়খড়ি তুলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলেন। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার বলে এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তিনি আমাকে বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? তালা ভাঙা কি অত সহজ?'

দারোগা হাঁক দিলেন, 'চৌকিদার, এ চৌকিদার!'

আশ্চর্যের ব্যাপার, চৌকিদার রামদাস তার ঘর থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে এল। আমাকে সে একেবারে গ্রাহ্যই করল না। দারোগার সামনে লম্বা এক সেলাম দিয়ে বলল, 'জি হুজুর?'

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, 'সকালবেলা কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

কোনও উত্তর না দিয়ে সে হাবার মতন তাকিয়ে রইল। লোকটি অতি ধূর্ত, সুবিধাজনকভাবে

সে সব কথা কানে শুনতে পায় না। দারোগার ডাক শুনতে পেল, আমি চেঁচিয়ে মরলেও শুনতে পায়নি। এখনও আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না।

আবার তাকে জিগ্যেস করলাম, 'কাল রাতে কিছু শুনতে পাওনি? অতবার ডাকলাম তোমাকে—'

চৌকিদার তাও কোনও উত্তর দেয় না।

দারোগা তাকে জিগ্যেস করলেন; 'এই বাবুকে চিনতে পারছ না?'

চৌকিদার মাথা নেড়ে বলল, না।

'কোনওদিন দেখোনি?'

'আজ্ঞে না।'

আমি স্তম্ভিত। লোকটা বলে কী! রাগে শরীর জ্বলছিল। কিন্তু এখন বেশি রাগ না দেখানোই ভালো। যথাসম্ভব শান্ত ভাবে বললাম, 'কাল রাতে আমি এখানে ছিলাম, আর তুমি বলছ, আমাকে কখনও দেখোনি?'

'আজ্ঞে না হুজুর!'

'ঠিক আছে। তুমি খুব শয়তান, না? বুঝবে পরে মজা, খাতা নিয়ে এসো। বাংলোর খাতা কোথায়? সেখানে আমি নাম লিখেছি।'

দারোগা বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। সেসব পরে হবে। এখন দরজা খুলে দাও।'

চৌকিদারটার কী স্পর্ধা। সে নিরীহ ভাবে জিগ্যেস করল, 'আপনি থাকবেন হুজুর?'

দারোগা বললেন, 'থাকব কি না সে আমি পরে বুঝব। এখন দরজা খোলো তো!'

দরজা খোলা হল। মৃতদেহটা সেখানে নেই।'

মাধবী চমকে উঠে বলল, 'নেই? ওর মধ্যেই সরিয়ে ফেলেছে? ইস মামাবাবু, আপনি কেন ডাকবাংলো ছেড়ে চলে গেলেন?'

রঞ্জন ধমকে উঠে বলল, 'বাজে বোকো না! চুপ করে শোনো—ডাকবাংলো ছেড়ে না গেলে পুলিশে খবর দিতেন কী করে?'

মামাবাবু বললেন, 'শুধু যে মৃতদেহটা নেই তাই-ই নয়। কোনও কিছুই নেই। আমার সুটকেস, জামাকাপড় সব উধাও। আমি যে ওই ডাকবাংলোয় এক রাত কাটিয়েছি—তার সব চিহ্নও লোপাট করে দিয়েছে। এমনকী, বাথরুমে আমি আমার সাবান টুথব্রাশ রেখে গিয়েছিলাম, সে দিকেও ওরা নজর দিতে ভোলেনি। চেয়ার টেবিল খাট সব ঠিক জায়গায় বসানো। ওরা খুব নিপুণ হাতে কাজ সেরেছে।

দারোগা আমার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, 'কী মশাই, কী ব্যাপার?'

আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছি ঠিকই। সেটাকে সামলে উঠে চৌকিদারকে জিগ্যেস করলাম, 'কী হে রামদাস, মড়াটা কোথায় গেল!'

'আমি তো কিছু জানি না হুজুর!'

'কিচ্ছু জানো না? এখানে একটা খুন হয়নি?'

'খুন? কী বলছেন হুজুর!'

'আমার জিনিসপত্তরগুলো কোথায় গেল? আমার সুটকেস?'

উত্তর না দিয়ে আবার হাবার মতন তাকিয়ে রইল রামদাস। লোকটা দারুণ অভিনয় করতে পারে। এখন দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানে না।

'যাও বাংলোর খাতা নিয়ে এসো।'

চৌকিদার দৌড়ে গিয়ে খাতা নিয়ে এল। যা মনে-মনে আশঙ্কা করছিলাম, তাই। খাতার একটা পাতা খুব সাবধানে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। সেটা অবশ্য প্রমাণ করা খুব শক্ত নয়, কিন্তু দারোগাকে

বোঝবার ব্যাপারে তাতে কোনও কাজ হবে মনে হয় না।

তবু আমি দুর্বলভাবে বললাম, 'দেখুন এই খাতা দেখে মনে হয়, এখানে ছ-সাত মাসের মধ্যে কোনও ভিজিটার আসেনি। সেটা সম্ভব? লাস্ট এনট্রি রয়েছে মার্চ মাসের।'

দারোগাটি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'হুঁ, সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু খুনের অভিযোগ দায়ের করতে হলে একটা ডেডবডি অন্তত থাকা দরকার। সেটাই তো পাওয়া যাচ্ছে না। একটা ডেডবডি তো আর উধাও হয়ে যেতে পারে না?'

'এরা এর মধ্যে এসে সরিয়ে নিয়ে গেছে।'

'এই দিনের আলোয়? ভেরি আনলাইক্‌লি। ভেরি আনলাইক্‌লি!'

'আপনি ওই চৌকিদারকে ভালো করে জেরা করুন। ও সব জানে। ওর কাছ থেকে সব বার করা যাবে। কাল রাত্রে এখানে একটি জিপগাড়ি এসেছিল। তাতে একটি মেয়ে এবং আরও কয়েক জন লোক ছিল—চৌকিদার সে সব কথা জানে—ওর ঘরে আলো জ্বলছিল তখন, আমার ডাকে সাড়া দেয়নি—' দারোগাবাবু আকস্মিক ভাবে হেসে উঠে বললেন, 'আর যাই বলুন, আপনার ওই মেয়েটির কথা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। রাতদুপুরে একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে কাঁদবে আবার উধাও হয়ে যাবে—ও নিশ্চয়ই আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। ওসব তো গল্পে হয়। পাঁচকড়ি দে-র কী যেন গল্প আছে না, "নীলবসনা সুন্দরী" না কী যেন—'

আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, 'আমি যা বলছি, তার প্রত্যেকটা কথা সত্যি। এখানে একটা খুন হয়ে গেছে—ব্যাপারটা আপনি হালকা ভাবে নেবেন না।'

'কিন্তু একটা কিছু ভিত্তি তো থাকা দরকার। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, আপনি যাকে দেখে ছিলেন, সে হয়তো সত্যি-সত্যি মরেনি। কোনও কারণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে চলে গেছে।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমি একজন ডাক্তার। কে মারা গেছে আর কে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—এটা একজন ডাক্তার প্রায় খালি চোখেই বলে দিতে পারে। যেমন আপনাকে দেখে আমি বলতে পারি, আপনার ডায়াবেটিস আছে।'

দারোগাটি চমকে বললেন, 'অ্যাঁ? আপনি দেখেই বুঝতে পারেন? ধরেছেন তো ঠিকই। বছরখানেক হল ডায়াবিটিসে ভুগছি! ভাত, আলু, মিষ্টি—সব বন্ধ। জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল। এখানে ডাক্তার-বদ্যিও তেমন ভালো নেই। বাইচান্‌স আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়েইছে—একটা ভালো ওষুধ বাতলে দেবেন কিন্তু। অন্তত দু-বেলা ভাত যাতে খেতে পারি—যাকগে, তাহলে এখন কী করা যায় বলুন তো? আপনার একটা কিছু ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই।'

আমি দারোগাবাবুকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, 'বসুন, দু-একটা কথা বলা যাক। আপনার লোকদের বলুন, চৌকিদারের ওপর যেন নজর রাখে। ওকে পালাতে দেওয়া ঠিক হবে না।'

দারোগাবাবু চেয়ারে বসে আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। তারপর আরাম করে সেটাকে টান দিয়ে বললেন, 'এখানে বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করা যাবে না। কাল দুটো স্মাগলিংয়ের কেস ধরা পড়েছে। সেখানে এনকোয়ারিতে যেতে হবে। বলুন স্যার, কী বলবেন।'

আমি বললাম, 'শুনুন, আপনাকে সকালবেলা দশ মাইল দূরের থানা থেকে ডেকে এনে কিছুই দেখাতে পারলাম না—এতে মনে হতে পারে যে আমি আপনার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে সেরকম কোনও মধুর সম্পর্ক আমার নয়। তা ছাড়া ঠাট্টা রসিকতা করে এতটা সময় নষ্ট করার মতন সময়ও আমার হাতে নেই। আর এক হতে পারে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি সবকিছুই ভুল দেখছি, ভুল শুনছি। কিন্তু আপাতত নিজেকে আমার পাগল বলেও মনে হচ্ছে না। আমি জরুরি কাজে পুরুলিয়া যাচ্ছিলাম। সেসব আমার মাথায় উঠে গেছে। এখন এই ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না। আপনি থানায়

অতক্ষণ দেরি না করলে বোধহয় আমরা আসামিদের হাতেনাতে ধরতে পারতাম। আপনি যদি ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিতে না চান, তাহলে আমি এখানকার ডিস্ট্রিক্ট কোয়ার্টাসে যাব।'

দারোগা মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। তারপর বললেন, 'আমার এখন তাহলে কী করা উচিত বলুন তো? আপনার সব কথা যদি সত্যিও হয়, তা হলেও তো মনে হচ্ছে—এটা ভৌতিক কারবার। ভূতের সঙ্গে পুলিশ কী করবে? আমি মশাই বামুনের ছেলে, আমি ভূত-প্রেত, ঠাকুর-দেবতা সব মানি।'

'সে আপনি যাই মানুন, এক্ষুনি গোটা বাংলোটা, চৌকিদারের ঘর সার্চ করে দেখুন। এই চৌকিদারকেও কি আপনার ভূত বলে মনে হয়? সে কাল রাত্রে জেগে ছিল, কিন্তু আমার ডাক শুনেও আসেনি। আজ সকালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল—এখন আবার জলজ্যান্ত হয়ে ফিরে এসে বলছে কিছুই জানে না। চৌকিদারকে ভালো ভাবে জেরা করুন।'

'তাহলে কি আপনি বলছেন, চৌকিদারই যত নষ্টের গোড়া। ও ব্যাটাই খুন করেছে?'

'না, সে কথা আমি বলতে চাইছি না। তবে, ও নিশ্চয়ই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত। ও অনেক কিছু জানে।'

দারোগা আড়মোড়া ভেঙে উঠলেন। সঙ্গের লোকদের সার্চ করার হুকুম দিলেন। এবং নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য হঠাৎ ঠাস করে এক চড় মারলেন চৌকিদারের গালে। হুংকার দিয়ে বললেন, 'বল, হারামজাদা! কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল, বল।'

ডাকবাংলোটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। চৌকিদারের ঘরেও কিছু নেই। ওরা কাজ করেছে নিখুঁতভাবে। পুলিশের চোখে আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টাও করেছে বেশ ভালো ভাবে।

এই সবকিছুর মধ্যে আমি সেই মেয়েটির অনেকখানি ভূমিকা দেখতে পাচ্ছিলাম। এত তাড়াতাড়ি ঘরদোর পরিষ্কার ভাবে গুছিয়ে যাওয়া কোনও পুরুষের কাজ নয়, তাহলে দু-একটা ভুল থেকেই যেত। মেয়েরা সাধারণত ভুল করে না। মেয়েটি কি তাহলে সর্বক্ষণ কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেকে আমার গতিবিধি লক্ষ করছিল?

চৌকিদারের ঘরের জানলার পাশে একটা ছোট্ট হলদে রুমাল পাওয়া গেল। মেয়েলি রুমাল, লেসের কাজ করা—কিন্তু কোনও নামটাম লেখা নেই। দারোগাবাবু ওটাকে পাত্তা দিলেন না। রুমালটুমাল থেকে সূত্র খুঁজে বার করা শুধু বইতেই দেখা যায়। বাংলোর কম্পাউন্ডে জিপগাড়ির চাকার দাগ—অন্তত আমার গাড়ি ছাড়া অন্য গাড়ির চাকার যে দাগ আছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। দারোগাবাবুর কাছে ওরও কোনও মূল্য নেই।

কিন্তু অপরাধীদের কাজ যতই নিখুঁত হোক, একটা-না একটা ভুল তারা করবেই। এ ক্ষেত্রেও তারা একটা মারাত্মক ভুল করে গেছে। এরকম ছেলেমানুষি ভুলের কথা কল্পনাই করা যায় না।

দারোগাবাবু বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমাকে শেষপর্যন্ত পাগলই ভেবে বসেছিলেন হয়তো। তিনি তখন ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু ফিরতে হলে আমার গাড়িতেই ফিরতে হবে। আসবার সময়ই সেটা কড়ার করে নিয়েছেন। আমার তখন যাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। হার স্বীকার করে চলে যাব? দারোগাবাবু তাঁর লোকজনকে চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি করার জন্য খুব হম্বিতম্বি করছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখে সবসময় একটা মৃদু-মৃদু হাসি। ওই হাসিটাই আমার অসহ্য লাগছিল।

অক্লান্ত ভাবে আমি নিজেই চতুর্দিকে খুঁজে দেখছিলাম। ডাকবাংলোর কম্পাউন্ড ছেড়ে উঠে গেলাম সেই বাঁধটার ওপর। নীচেই খাল। সেই খালের জলে একটা কী যেন কালো মতন জিনিস ভাসছে। দু-তিনটে বাচ্চা ছেলে জলের মধ্যে নেমে লাঠি দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে সেই জিনিসটা।

আমি তরতর করে নীচে নেমে গেলাম। তারপরই চেঁচিয়ে ডাকলাম দারোগাবাবুকে।

খালের জলে ভাসছে আমার সুটকেসটা। অপরাধীরা আমার সব জিনিসপত্র সরিয়ে

ফেলেছিল—ডাকবাংলোতে আমার থাকার প্রমাণ লোপ করবার জন্য। আমার জিনিসপত্রগুলো ওদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কোনও একটা দুর্বলতায় ওরা সঙ্গে নিয়ে যায়নি, ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে খালের জলে। খালের জল বেশি নয়, স্রোতও নেই, সুটকেসটা ভেসে যায়নি। গ্রামের ছেলেরা ওই জিনিসটা দেখতে পেয়ে তোলার চেষ্টা করছে মহা উৎসাহে।

মোটা শরীর নিয়ে দারোগাবাবুর নেমে আসতে সময় লাগল। নেমে হাঁসফাস করতে লাগলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার? এটা কী?'

'আমার সুটকেস! এবার প্রমাণ হল তো, এই বাংলোতে কাল রাত্রে আমি ছিলাম। চৌকিদার আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলছে!'

দারোগা এর উত্তরে কী বললেন জানো? বললেন, 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এতেও কিন্তু খুনের ব্যাপারটার কিছুই প্রমাণ হয় না।'

শুনেই আমার রাগ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিলাম। এবার আমি প্রায় ধমকেই বললাম, 'আপনার ব্যাপারটা কী বলুন তো? খুনটুন কিছু হয়নি এটাই আপনি প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত! নাকি খুন যে করেছে, সেই আসামিকে ধরতে চান?'

এরা সব শক্তের ভক্ত। ধমক খেয়েই দারোগাটির সুর বদলে গেল। তটস্থ হয়ে বললেন, 'সে কী বলছেন? খুন হলে খুনিকে ধরব না? একটা মার্ডার কেস ধরতে পারলে আমার প্রমোশন হয়ে যাবে। কত দিন ধরে বদলির চেষ্টা করছি এখান থেকে। খুন হওয়া মানে তো আমার গুড লাক! তবে আমাদের এখানে তো এরকম কেসটেস বিশেষ হয় না...'

সুটকেসটা তোলা গেল সহজেই। চৌকিদারকে ডাকা হল। দারোগাবাবু তাকে গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করলেন, 'কীরে, তুই যে কিছু জানিস না বললি? এই সাহেবের সুটকেস এখানে এল কী করে?'

চৌকিদারের সেই এক উত্তর, 'আমি কিছু জানি না হুজুর।'

'জানিস না মানে? তুই বাংলোর চৌকিদার হয়েছিস—আর বাংলো থেকে জিনিসপত্তর উধাও হয়ে খালের জলে ভাসবে?'

'আমি সকালেবেলা তেল আনতে গিয়েছিলাম। তখন কেউ চুরি করেছে!'

'তাহলে তখন যে বললি, এই সাহেবকে তুই কখনও দেখিসনি? অ্যাঁ? কী ব্যাপারটা কী? সাহেব তাহলে রাত্তিরে এখানেই ছিলেন?'

চৌকিদার আবার চুপ। দারোগা তখন চৌকিদারকে এমন মারতে শুরু করলেন যে আমাকেই থামাতে হল। আমি বললাম, 'ওকে এত মেরে কী হবে? মারলে ও কি বলবে?'

দারোগা হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'আপনি জানেন না। এরা মার ছাড়া কিছু বোঝে না। এই জমাদার, বাঁধো একে। থানায় চলুক, সেখানে গিয়ে বুঝবে।'

খালের ও-পাশে তখন রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। যে বাচ্চা ছেলেগুলো সুটকেসটা তোলার চেষ্টা করছিল, তাদের একজনকে ডেকে আমি জিগ্যেস করলাম, 'এই খোকা, শোনো। সকালবেলা এখানে একটা জিপগাড়ি দেখেছ?'

ছেলেটি বললে, 'হ্যাঁ। রায়বাবুর জিপ।'

'রায়বাবু মানে, কোন রায়বাবু?'

ছেলেটি আবার বললে, 'রায়বাবুর জিপগাড়ি।'

আমি দারোগাকে বললাম, 'এই ছেলেটির নাম-টাম জেনে নিন। পরে এর কথা কাজে লাগবে। রায়বাবুর জিপ যে বলছে, রায়বাবু কে? মনে হচ্ছে এখানে প্রায়ই আসে। ওরা চেনে।'

দারোগা বললেন, 'খোঁজ নিতে হবে। খোঁজ নিলেই বেরিয়ে পড়বে।'

পরে যখন আদালতে মামলা ওঠে, তখন ওই ছেলেটির সাক্ষী খুব কাজে লেগেছিল। ওই

ছেলেটি দেখেছিল, চলন্ত জিপগাড়ি থেকে সুটকেসটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল খালের মধ্যে। এবং সেই জিপগাড়ির মধ্যে যারা ছিল, তাদেরও সে শনাক্ত করেছে।

শুধু তাই নয়, ওইখানে আর একটাও খুব জরুরি খবর পাওয়া গেল। ভিড় ঠেলেঠুলে এগিয়ে এল সেই বুড়ো। যাকে আমি পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম। তোমরা তখন ওকে পাঁচটা টাকা দেওয়ার কথা শুনে হেসেছিল। ও কিন্তু ওর কাজ ঠিকই করেছে। গ্রামের সরল সাধারণ লোক টাকা নিলে তার বিনিময়ে কাজটা ঠিকই করে। এটা আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। লোকটাকে সেই পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম বলে খুনের কিনারা করতে সাহায্য হয়েছিল অনেকখানি। দূরে কোনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলোর দিকে লক্ষ রেখেছিল।

সেই বুড়ো লোকটি বলল, সকালবেলা সে রায়বাবুর জিপ আসতে দেখেছে এখানে। খানিকটা বাদে আবার চলে গেছে। রায়বাবুকেও সে চেনে। রায়বাবু হচ্ছেন পি ডবলু ডি-র ওভারসিয়ার বাবু।

আমি দারোগার চোখের দিকে তাকালাম। তাঁর চোখ-মুখ এখন চিন্তাসংকুল। তিনি বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। পি ডবলু ডি অফিসে সুখেন রায় নামে একজন ওভারসিয়ার ভদ্রলোক আছেন বটে। তাঁর একটা জিপগাড়িও আছে। কিন্তু তাঁর জিপে এইসব...'

আমি বললুম, 'চলুন, আর দেরি না করে সেই সুখেন রায়ের কাছে যাওয়া যাক। তার কাছেই সবকিছু জানা যাবে।'

একজন কনস্টেবলকে সেখানে পাহারায় রেখে আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার আগে আমি দারোগাবাবুকে বললাম, আপনি আপনার কনস্টেবলকে বলুন যেন চৌকিদার রামদাসকে সে কোনওক্রমেই চোখের আড়াল না করে। কারণ লোকটা বোকা সেজে থাকলেও আসলে অতি ধূর্ত। একটু সুযোগ পেলেই আরও হয়তো প্রমাণ লোপ করবার চেষ্টা করবে। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই সে ডাকবাংলোর ঘরখানা এমন পরিষ্কার করে ফেলেছিল যে আমিই প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি যে একটা গালগপ্প বানিয়ে বলছি না সেটা দারোগাবাবুকে বিশ্বাস করানোই শক্ত হয়ে উঠেছিল।

গাড়িতে দারোগাবাবুকে বেশ গম্ভীর আর দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখা গেল। এমনিতে তিনি বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন, কিন্তু গাড়িতে একটাও কথা বললেন না। আমার মনে হল, দারোগাবাবুর চেনাশোনা স্থানীয় লোকেরাই এর সঙ্গে জড়িত, তিনি এরকম সন্দেহ করছেন। সেটা অমূলকও নয়। মৃতদেহটা ফেলে যাওয়া এবং আবার ফিরে এসে সেটা সরাবার জন্য ব্যস্ততাতেই সেটা বোঝা যায়। দূর অঞ্চলের লোক হলে হয় আততায়ীরা মৃতদেহটা ফেলেই পালাত অথবা সঙ্গে করে নিয়ে যেত। কাছাকাছি জায়গার লোক বলেই তারা ঘরদোর পরিষ্কার করে মৃতদেহটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল খাটের নীচে। অন্য দিকের সব ব্যবস্থা সেরে এসে আবার রাত্রির অন্ধকারে সরিয়ে ফেলবে—এই ছিল প্ল্যান। দূরের লোক হলে তাদের পক্ষে একটা সুবিধে ছিল। তারা সব চিহ্ন বিলোপ করে মৃতদেহটা ফেলে রেখে যদি সরে পড়তে পারত—তাহলে মৃত ব্যক্তিটির পরিচয় খুঁজে বার করতে-করতেই সময় লেগে যেত বেশ কয়েক দিন। ততদিনে আততায়ীরা পগার পার হওয়ার পক্ষে পেয়ে যেত অনেক সুযোগ। কিন্তু স্থানীয় লোক হলে মৃতদেহটি দেখেই সবাই চিনে ফেলবে। তখনই তার সঙ্গে জড়িত অন্য লোকদের ওপর পড়বে পুলিশের দৃষ্টি।'

কর্নেল সেন হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কী, আমার অ্যানালিসিস ঠিক হচ্ছে?'

রঞ্জন বলল, 'পারফেক্ট। এরকুল পোয়ারোও ঠিক এই কথাই বলতেন।'

কর্নেল সেন বললেন, 'সেই সময়ে আমিও প্রায় ডিটেকটিভ হয়ে উঠেছিলুম। না হয়েও উপায়ও ছিল না। কারণ, আমাদের দারোগাবাবুটি আগাগোড়া একটুও বুদ্ধির পরিচয় দেননি। অথচ রহস্যটার একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলুম না। গ্রামটামের দিকে আমাদের থানাপুলিশের যা অবস্থা—তাতে সেখানকার মানুষ যে পটাপট খুন করে না কেন, আমি বুঝতে

পারি না। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কেউ খুন করলে, তাকে ধরার সাধ্য পুলিশের নেই। তবে, সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের গ্রামদেশের মানুষেরা সাধারণত শান্ত প্রকৃতির—কথায়-কথায় খুনজখম করে না। কখনও রাগের মাথায় হয়তো কাউকে মেরে বসে—সেটা এমনই প্রকাশ্য ভাবে হয় যে ধরা পড়তেও দেরি হয় না। জটিল, কুচক্রী ধরনের খুন শহরেই বেশি হয়।

যাই হোক, আমার এ-গল্প শেষ হয়ে এসেছে। এটাও এমনকিছু জটিল খুনের কাহিনি নয়। মাঝখান থেকে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে একটু জট পাকিয়ে গিয়েছিল। অভিজ্ঞতাটা আমার পক্ষে হয়েছিল সাংঘাতিক। নইলে, তোমাদের বইতে যেসব খুনের গল্প থাকে তার মধ্যে কখনও বুদ্ধিমান খুনিরা সুটকেসটা ফেলে যাওয়ার মতো কাঁচা কাজ করে? কিংবা, ডিটেকটিভের জন্য এতটা সুবিধে করে দিয়ে যায়? কিন্তু জীবনে বাস্তব ঘটনায় এরকম ভুল অনেক বার হয়।

সুটকেসটা ফেলে না গেলে খালের পাশের গ্রামের লোকদের জেরা করার কথা আমাদের মনে আসত না হয়তো। আর তারা নিজে থেকে এগিয়ে এসে যে কিছু বলত না—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রামের লোককে জেরা করে ওই জিপগাড়িতে কজন লোক ছিল এবং তাদের চেহারার বর্ণনাও আমরা পেয়ে গেলাম।'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'ডাকাতরা সবাই ধরা পড়েছিল শেষপর্যন্ত?'

রঞ্জন বলল, 'তুমি কী করে জানলে এটা ডাকাতদের ব্যাপার?'

'যারা রাত্তিরবেলা জিপে করে বন্দুক নিয়ে এসে আক্রমণ করে, তারা ডাকাত ছাড়া কী?'

'আর সেই ডাকাতদলের লিডার হচ্ছে একটা মেয়ে? মেয়ে ডাকাত? এ যে হিন্দি সিনেমা?'

কর্নেল সেন হাসতে-হাসতে বললেন, 'কিন্তু ডাকাতরা কীসের জন্য ওই বাংলোতে আসবে। কারওর কাছে তো বেশি টাকাপয়সা নেই!'

'যে লোকটা খুন হয়েছে, সে হয়তো কোনও ব্যবসায়ী! সঙ্গে অনেক টাকা ছিল।'

রঞ্জন বলল, 'মামাবাবু, আপনি মাধবীর কথা শুনবেন না। যে-রকম বলছিলেন সেই রকম বলে যান।'

'পি ডবলু ডি অফিসে পৌঁছে সুখেন রায়কে পাওয়া গেল না! দারোগার সঙ্গে ওই অফিসের অনেকের চেনা। দারোগাবাবু যে ওখানে খুনের তদন্ত করতে এসেছেন, সে-কথা কেউ বুঝতে পারেনি। তিনিও বুঝতে দেননি। অফিসের লোকেরা দারোগাবাবুকে খাতির করে বসালেন, এমনকী চায়ের অর্ডারও হয়ে গেল। বোঝা গেল দারোগাবাবুটি মাঝে-মাঝে ওখানে এমনই আসেন।

কথায়-কথায় দারোগাবাবু বললেন, 'সুখেনকে দেখছি না কেন? সুখেন কোথায়?'

অফিসের একজন বলল, 'সুখেন পাটনায় হেড অফিসে কী একটা ব্যাপারে তদবিরে গেছে। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে!'

দারোগাবাবু উদাসীন ভাবে বললেন, 'তাহলে কী হবে! সুখেনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের একটু দরকার ছিল। সেই জন্যই এসেছিলাম। কাজটা তাহলে হল না। একটা জরুরি বাড়ির প্ল্যান করানো দরকার এনার। সুখেনের কিছু টাকা রোজগার হয়ে যেত। ওহে রণধীর, সুখেন কবে নাগাদ ফিরবে, তাও বলতে পারো না?'

রণধীর নামের কর্মচারীটি বলল, 'দিন দশেক তো লাগবেই।'

'কীসে গেছে? ট্রেনে?'

'না, ও জিপগাড়িটা নিয়ে গেছে।'

দারোগাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলুন, ওঠা যাক তাহল। কাজ তো হল না।'

সেই অফিস থেকে বেরিয়ে এসে দারোগাবাবু বললেন, 'এবার? এখানেও তো কিছু পাওয়া গেল না।'

আমি বললাম, 'সুখেন রায় কোনও ছুটির দরখাস্ত করে গেছে কিনা সেটা আপনার দেখা

উচিত ছিল। যদি সে ট্যুরেও গিয়ে থাকে, তাহলে অফিসে তার ট্যুর প্রোগ্রামের একটা রেকর্ড থাকবে— সেগুলো আপনি চেক করে দেখলেন না। একটা লোক তো এমনি-এমনি অফিস ছেড়ে আউট স্টেশনে যেতে পারে না।'

দারোগার কী করা উচিত, না উচিত সে সম্পর্কে আমার উপদেশ দেওয়া তিনি এখন আর একটুও পছন্দ করলেন না। ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে। কিন্তু আমার কথা উপেক্ষা করতেও সাহস পেলেন না। হাজার হোক আমি মিলিটারির লোক। মিলিটারির সম্পর্কে আমার দেশের লোকের বেশ ভয় ও শ্রদ্ধা আছে।

তিনি আমার কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'এইসব মফস্বলের ছোটখাটো অফিসে কি আর সব নিয়মকানুন মানে? আপনাদের স্যার, বড়-বড় ব্যাপার, সবকিছু স্ট্রিক্ট্। কিন্তু এসব জায়গায় এরা বিনা দরখাস্তে ছুটি নেয়—নিজস্ব দরকারে কোথাও গেলেও সেটা ট্যুর হিসেবে দেখায়—নিজেদের মধ্যে সবকিছু ম্যানেজ করে নেয়।'

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'তবু আপনার চেক করে দেখা উচিত।'

আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে দারোগাবাবু এবার একা গেলেন। একটু বাদে ফিরে এসে বললেন, 'না সেসব কিছু নেই। সুখেন ফিরে এসে দরখাস্ত করে দেবে বলে গেছে। এসব এখানে প্রায়ই হয় বলল।'

'কিন্তু সুখেন রায় যে জিপগাড়ি নিয়ে পাটনা গেছে, সেই জিপগাড়িই আজ সকালবেলা বাংলোর সামনে দেখা গেল কী করে?'

'বোঝাই তো যাচ্ছে, ওই চাষাভুষোরা ভুল দেখেছে। সুখেনের জিপগাড়ি ওখানে মাঝে-মাঝে যায় তো—সুখেনের সুপারভিশানেই তো বাংলোটা তৈরি হল। গাঁয়ের লোক তো বেশি গাড়িটাড়ি দেখে না—তাই যে-কোনও জিপগাড়ি দেখলেই ভাবে সুখেনের গাড়ি।'

'গ্রামের দু-এক জন লোক কিন্তু সুখেনকেও ওই গাড়িতে বসে থাকতে দেখেছে। জিপের পেছনদিকে হেলান দিয়ে বসে ছিল।'

'ওই খুনি গুণ্ডাদের দলে সুখেনও থাকবে আপনি ভাবছেন? আমি সুখেনকে চিনি—সে একটা পিঁপড়েও মারতে চায় না।'

আমি কোটের পকেট থেকে আমার ডায়েরি বার করে ব্যাপারটা নোট করলাম। তারপর দারোগাবাবুকে বললাম, 'এবার তাহলে আমাকে পুরো ঘটনাটি আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্সে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। আমি নিজের চোখে একটা ক্রাইম ঘটতে দেখেছি। ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন হিসাবে সেটা কর্তৃপক্ষকে জানানো আমার কর্তব্য। সুতরাং ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্সে একবার যেতেই হবে আমাকে।'

দারোগাবাবু বললেন, 'তা তো নিশ্চয়ই। অবশ্য আমরাও ওপর মহলে রিপোর্ট পাঠাব। আপনি তো আমাদের জানিয়েছেনই। আমরা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশানের পর ওপর মহলের হাতে কেসটা দিয়ে দেব। তবে মুশকিল হচ্ছে এই ডেডবডিটিরই কোনও ট্রেস পাওয়া গেল না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আপনারা জানাবেন সে তো ভালো কথাই। আমিও আমার তরফ থেকে জানিয়ে দিয়ে বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চাই। চলুন তাহলে, আপনাকে থানায় নামিয়ে দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারে যাই।'

দারোগাবাবু চিন্তিত ভাবে বললেন, 'যাবেন? চলুন! বুঝতেই পারছি, আপনার সন্দেহ কিছুতেই মিটছে না। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন, আমরা যে তদন্ত শুরু করব—তার একটা ভিত্তি কী আছে, আপনার মুখের কথা ছাড়া? বাংলোর চৌকিদারটা অবশ্য একটা কিছু অপকর্ম করেছে ঠিকই— নইলে আপনার সুটকেস খালের জলে পাওয়া যাবে কেন? আপনি তো আর নিজে সেটা ফেলেননি! গ্রামের লোক কী জিপগাড়ি-টাড়ি দেখেছে—সে-কথা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। চৌকিদারের ওই

বদমাইসির সঙ্গে তো আর খুনের ব্যাপারটা এক করা যায় না! আচ্ছা এক কাজ করা যাক। যাওয়ার আগে একবার সুখেনের বাড়িটি ঘুরে যাওয়া যাক চলুন। আপনার আপত্তি নেই তো?'

ছোট্ট ঘিঞ্জি শহরটির নাম আমি তোমাদের কাছে ইচ্ছে করেই বলছি না। তবে বিহার বা পশ্চিম বাংলার ছোটখাটো শহর তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই। একইরকম হয়। সুতরাং অনুমান করে নিতে তোমাদের অসুবিধে হবে না।

যেতে-যেতে দারোগাবাবু বললেন, 'সুখেন রায় এখানে বছর দু-এক হল বদলি হয়ে এসেছে। অত্যন্ত নিরীহ, ভদ্র ছেলে। কোনও সাতে-পাঁচে নেই। লোকজনের উপকার করতে পারলে সুখী হয়। অফিসের কাছেই তার কোয়ার্টার পাওয়ার কথা, কিন্তু কোয়ার্টার খালি নেই বলে বাড়ি ভাড়া করে আছে। এখানে সেরকম কোনও ভালো বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। যে বাংলোটায় আপনি উঠেছিলেন, সেটা প্র্যাকটিক্যালি সুখেনেরই তৈরি। সুখেনই দেখাশুনা করে বানিয়েছে। চলুন, সুখেন যদি পাটনায় না গিয়ে বাড়িতেই বসে থাকে—আপনি তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হবেন। সত্যিই ভালো ছেলে।'

শহর একটু ছাড়িয়ে সুখেন রায়ের বাড়ি। বাড়িটার চেহারা সত্যিই ভালো নয়। সিমেন্টের দেওয়াল কিন্তু খাপরার ছাদ। তাও বেশ জরাজীর্ণ অবস্থা। সামনে একটু বাগানের মতন। সেই বাগানের এক কোণে একটি জিপগাড়ি দাঁড় করানো।

জিপগাড়িটি আমার আর দারোগাবাবুর একসঙ্গে চোখে পড়ল। দারোগা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'সুখেন বাড়িতেই আছে মনে হচ্ছে। পাটনায় যায়নি। ওর এখানে এসে ভালোই হল—ওর কাছ থেকেই সবকিছু জানা যাবে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'এই জিপগাড়িটি কি সুখেন রায়ের নিজের? না অফিসের?'

দারোগাবাবু বললেন, 'অফিসেরই। তবে, ও নিজেই সবসময় প্রায় ব্যবহার করে। অফিসের গাড়িটা কেনা হয়েছে, কিন্তু ড্রাইভারের পোস্ট এখনও স্যাংকশান করা হয়নি। জানেন তো গভর্নমেন্টের ব্যাপার। সুখেন ছাড়া আর কেউ গাড়ি চালাতে জানে না। তাই গাড়িটি সর্বক্ষণ ওর কাছেই থাকে।'

বাগানের গেট খুলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম, দারোগাবাবু এগিয়ে গেলেন বাড়ির দরজার দিকে। আমি গেলাম জিপটি একটু পরীক্ষা করতে। কাল রাত্তিরে আমি এই জিপটিই যে দেখেছিলাম তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ডান দিকের মাডগার্ডটা একদম তোবড়ানো। এতক্ষণ আমার মনে ছিল না এ-কথা—এখন দেখামাত্র মনে পড়ল যে কাল রাত্রেও আমি এটি লক্ষ করেছিলাম। গ্রামের লোকদের পক্ষেও জিপটি চেনা এইজন্যই সহজ।

দরজা খুলল একটি মেয়ে। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। জীবনে এরকম ভাবে চমকে গেছি খুবই কম বার। আর যাই হোক, এখানে এই অবস্থায় মেয়েটিকে আমি দেখার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

তাকে দেখে আমি অতি কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। এই সেই কাল রাত্রে দেখা মেয়েটি। আজও তার চুলগুলো খোলা। সদ্য স্নান করেছে মনে হয়। একটি কালো রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছে। ভেজা চুলে জ্বলজ্বল করছে টাটকা সিঁদুর।

মেয়েটিকে দিনেরবেলা দেখে বুঝলাম, এ মেয়ে সাধারণ নয়। কাল রাত্রে ওকে অলৌকিক মনে হয়েছিল। এখন সেরকম কিছু মনে হয় না বটে, কিন্তু ছোট্ট শহরের একজন ওভারসিয়ারের বউ হিসাবে তাকে একদম মানায় না। খুব একটা সুন্দরী বলা যায় না তাকে। কিন্তু তার আঁটসাঁট স্বাস্থ্য ও চোখে-মুখে এমন একটা কিছু আছে, যা পুরুষদের মাথায় আগুন জ্বালায়। এই মেয়ে অনেক ঘর ভাঙে।

মেয়েটি আমাকে একদম গ্রাহ্যই করল না। আমাকে সে চিনতে পেরেছে কিংবা জীবনে আগে

কখনও দেখেছে, এরকম কোনও চিহ্নই নেই তার মুখে। আমার মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'কী খবর? আসুন! আসুন! অনেক দিন আসেননি এদিকে!'

দারোগাবাবু বললেন, 'এসেছিলাম এদিকে তাই ভাবলাম তোমাদের এদিকে একবার ঘুরে যাই।'

আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি একজন ডাক্তার। এখানে এসেছেন একটি কাজে। আর এ হচ্ছে করবী, আমাদের সুখেন রায়ের মিসেস। করবী খুব ভালো চা বানায়। এপাশে কাজকর্মে এলেই একবার এদের বাড়িতে চায়ের লোভে আসি। কী করবী, এখন একটু চা হবে নাকি? নতুন লোককে সঙ্গে করে এনেছি।'

করবী এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেতরে আসুন।'

মেয়েটি দরজার একপাশে সরে আমাদের জন্য জায়গা করে দিল। ভেতরে ঢোকার সময় আমি মেয়েটির গা থেকে খুব হালকা ডেটলের গন্ধ পেলাম। আশ্চর্য এই ডেটলের গন্ধটা কাল রাত থেকে আমাকে পেয়ে বসেছে। এই গ্রামদেশে এত ডেটলের ব্যবহার হয়! মেয়েটি তো একটু আগেই স্নান করেছে, তারপর আবার ডেটল মেখেছে? মেয়েটির কপালে সিঁদুর—অথচ কাল রাত্রে মৃতদেহটিকে বলেছিল ওর স্বামী!

বসবার ঘরে একটি চৌকি পাতা, দুটি চেয়ার ও একটি টেবিল। অনেক রকমের বইপত্তর চারিদিকে ছড়ানো। মফস্বলের এ ধরনের চাকুরিজীবীদের বাড়িতে সাধারণত এত বই দেখা যায় না।

দারোগাবাবু আরাম করে বসলেন চৌকিতে। আমি বসলাম চেয়ারে। দারোগাবাবু জিগ্যেস করলেন, 'সুখেন কোথায়?'

করবী বলল, 'ও তো পরশু পাটনা চলে গেছে।'

দারোগাবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'পাটনা গেছে? জিপ নিয়ে যায়নি? ওর অফিস থেকে যে বলল সুখেন পাটনায় দশ দিনের ট্যুরে গেছে জিপ নিয়ে?'

করবী বলল, 'না শেষপর্যন্ত নিল না। জিপেই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়ার সময় বলল ওর শরীরটা ভালো লাগছে না—অতটা একা ড্রাইভ করতে পারবে না। তাই ট্রেনেই গেল।'

দারোগাবাবু বললেন, 'ইদানীং ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না দেখছি। প্রায় ভুগছে, এই বয়সের ছেলে, এরমধ্যে হার্টের অসুখ যদি হয়।'

করবী দৃঢ় স্বরে বলল, 'না, হার্টের কিছু হয়নি। অনেক সময় উইন্ডের জন্য ওরকম ব্যথা হয়। আমি বলেছি, এবার পাটনায় ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আসতে।'

দারোগাবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বুঝলেন মশাই, সুখেনের বয়স বেশি না—কিন্তু মাঝে-মাঝে বুকে এমন ব্যথা হয় যে দেখলে ভয় লাগে। ব্যথার চোটে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি বারবার বলেছি, ভালো মতন চিকিৎসা না করলে কোনদিন রাস্তাঘাটে অজ্ঞান হয়ে বেঘোরে মরবে।'

তারপর করবীর দিকে ফিরে বললেন, 'সুখেন আজ বাড়ি থাকলে ইনি ওর বুকটা দেখে দিতে পারতেন। ইনি খুব বড় ডাক্তার।'

আমি চুপ করে রইলাম। করবীও কোনও কথা বলল না।

দারোগাবাবু চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন, আমি অবশ্য চায়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছি। সকালবেলা বেশি চা খাওয়া অভ্যাস নেই আমার। করবীর তৈরি বিখ্যাত চা খেতেও আমি প্রলুব্ধ হইনি।

তা ছাড়া, আমার আর সাসপেন্স সহ্য হচ্ছিল না। সেখানে আমরা বসেছিলাম এমন ভাবে যেন কিছুই হয়নি। চা খেতে-খেতে বিশ্রম্ভালাপ। সবই আমরা অভিনয় করছিলাম!

দারোগাবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, 'করবী, আজকের কাগজ এসেছে নাকি? কাল নাকি

পাটনায় খুব মারামারি হয়েছে—রেডিয়োতে বলছিল—'

করবী বলল, না, কাগজ তো সেই বিকেলবেলা দেয়।'

'করবী, সুখেনের কাছ থেকে জিপগাড়িটা কেউ এরমধ্যে ধার করে নিয়েছিল নাকি?'

করবী আশ্চর্য হয়ে বলল, গভর্নমেন্টের জিপগাড়ি—অন্য কেউ ধার নেবে কী করে?'

'কাল সন্ধ্যাবেলা গ্রামের দু-এক জন এই জিপগাড়িটাকে নাকি ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।'

'তা হতেই পারে না।'

দারোগাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ সবটাই আমার ভুল। করবী আগেই গরম জল বসিয়ে এসেছিল, এবার উঠে গিয়ে চা করে নিয়ে এল। আমি খাব না বলেছিলাম, তবু আমার জন্য এনেছে। হাসিমুখে অনুরোধ জানাল, খান না এক কাপ! অপূর্ব অভিনয়।

সেই অভিনয় ভেঙে দিয়ে আমি করবীকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি আমাকে আগে কখনও দেখেছেন?'

করবী অবাক হয়ে বলল, 'আপনাকে? না তো!'

'আমি কিন্তু আপনাকে দেখেছি।'

করবী সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ভাব বদলে ফেলে বলল, 'তা হতেও পারে। আপনাকেও আমার একটু-একটু চেনা লাগছে। আপনি কি রাঁচীতে প্র্যাকটিস করেন? কিংবা ওখানে আমাকে দেখেছেন কখনও? আমরা রাঁচীতে থাকতাম—বিয়ের আগে।

'আমি বললাম, 'না রাঁচীতে আপনাকে দেখিনি। আপনাকে আমি দেখেছি কাল রাত্রে। এখানে যে একটি ডাকবাংলো আছে, সেখানে!'

করবী বিমূঢ় ভাবে দারোগাবাবুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে। আস্তে-আস্তে বলল, 'ডাকবাংলোয়? আমাকে? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।'

'না, আমার অত সহজে ভুল হয় না।'

'কিন্তু আমি বাড়ি ছেড়ে ডাকবাংলোয় কেন যাব বলুন তো! আমি তো কাল বাড়ি থেকে একবারও বেরোইনি।'

'আমি কিন্তু আপনাকে কাল ডাকবাংলোতেই দেখেছি। আপনিও আমাকে দেখেছেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। এখন কিছুই মনে পড়ছে না?'

করবী এবার দৃঢ় গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। আপনি কী বলতে চান কী? আমি ডাকবাংলোয় যাব কেন? আমার স্বামী বাইরে গেছেন...'

একজন মহিলার স্বামী বাইরে ট্যুরে গেছেন, আর মহিলাকে যদি রাত্রিবেলা একটি ডাকবাংলোতে দেখা যায়—সেটা নিশ্চয়ই একটি কলঙ্কের অপবাদ। একজনের বাড়িতে বসে এরকম অভিযোগ করার মধ্যে চূড়ান্ত অভদ্রতা আছে। কিন্তু এটা তো ভদ্রতা-অভদ্রতার প্রশ্ন নয়। এর মধ্যে একটা খুনের ব্যাপার জড়িত।

কাল রাত্রে করবীর মুখে একটা আতঙ্কের চিহ্ন দেখেছিলাম, আজ সেসব কিছু নেই। বরং একটা তেজি অহংকারী ভাব। আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যেন আমি একটি ভণ্ড প্রতারক, কোনও ভদ্রমহিলার নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছি।

কিন্তু আমার পক্ষে উত্তেজিত হওয়া এখন একেবারেই উচিত নয়। আমি নীচু গলায় বললাম, 'দেখুন, শুধু মিথ্যের বোঝা বাড়িয়ে আর কোনও লাভ নেই। বরং আপনি সব কথা খুলে বলুন, তাহলে আপনাকে আমরা হয়তো কোনও সাহায্য করতে পারি।'

করবী বলল, 'আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'হয়তো আপনার স্বামী পাটনায় শেষ পর্যন্ত যাননি। তাঁর কোনও বিপদ হয়ে থাকতে পারে।'

'এ-কথা আপনি বলছেন কেন?'

দারোগাবাবু একেবারে চুপ। আস্তে-আস্তে চায়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছেন। কথাবার্তা সব আমাকেই বলতে হচ্ছে। আমি এবার জিগ্যেস করলাম, 'আপনার কাছে কি জিপগাড়িটার চাবি আছে, না আপনার স্বামী নিয়ে গেছেন?'

করবী বলল, 'চাবি নিয়ে যাবে কেন? চাবি আমার কাছেই রেখে গেছে।'

'চাবিটা একবার দেখাবেন?'

'কেন বলুন তো?'

'হয়তো গাড়ির চাবিটা চুরি হয়ে গেছে—কাল কেউ চুরি করে জিপগাড়িটা নিয়ে গিয়েছিল কিনা সেটা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।'

'না, চুরি হয়নি।'

করবী উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে চাবিটা নিয়ে এল। সেটা আমি নিয়ে দারোগাকে বললাম, 'এটা আপনার কাছে রাখুন।'

করবীকে জিগ্যেস করলাম, 'তাহলে আপনি বলছেন গাড়িটা চুরি হয়নি?'

'না।'

আপনি গাড়ি চালাতে জানেন?

'না।'

এবার আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে বললাম, 'একটা ব্যাপার খুব মন দিয়ে শুনুন। কাল রাত্তিরে এই জিপগাড়িটা ডাকবাংলোর কম্পাউন্ডে ছিল—আমি নিজে দেখেছি। সেটা যদি যথেষ্ট প্রমাণ না হয়—আজ সকালেও এই জিপগাড়িটাকে ডাকবাংলোর কাছে যেতে গ্রামের অনেক লোক দেখেছে, তারা সবাই সাক্ষী দেবে। আপনার স্বামীর অফিসের আর কেউ গাড়ি চালাতে পারে না। তাহলে এই জিপটাকে বাংলো পর্যন্ত কে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? সেটা আপনার জানা উচিত, যেহেতু চাবি আপনার কাছে—'

করবী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আমাকে এইভাবে জেরা করার কী অধিকার আছে আপনার সেটা জানতে পারি কি?'

দারোগাবাবু তখনও একেবারে চুপ। আমি পকেট থেকে নোটবইটা বার করলাম এইবার। কলমটা খুলে বললাম, 'অধিকারের প্রশ্ন পরে। দারোগাবাবু যতক্ষণ বাধা না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমি কতগুলো প্রশ্ন করে যাব। আপনি উত্তরগুলো ভেবেচিন্তে দেবেন। কারণ সেগুলো আমি লিখে রাখছি। এবং দারোগাবাবু তার সাক্ষী থাকছেন। এবার শুনুন। কাল রাত্রে আমি ডাকবাংলোর যে ঘরে ছিলাম, তার খাটের নীচে একটি ডেডবডি ছিল—সেটা কি আপনার স্বামী সুখেন রায়ের? আপনি জানলার বাইরে থেকে বলেছিলেন, আপনারই স্বামীর দেহ—'

করবীর সিঁথিতে তখনও সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। আজ সকালেই স্নান করে নতুন করে সিঁদুর লাগিয়েছে। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলল, 'আপনি এইসব উদ্ভট কথা হঠাৎ আমাকে বলতে এসেছেন কেন? আমি আপনার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নই। আপনি অন্য কাউকে দেখেছেন বা কোথায় কী দেখে এসেছেন—সে সম্পর্কে আমি কিছু শুনতে চাই না।'

আমি বললাম, 'ডেডবডিটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেই ডেডবডিটা আপনি সরাতে গিয়েছিলেন, তাও দেখেছি। এই ঘটনাটা পুলিশের ওপর মহলে আমাকে জানাতেই হবে। আপনি আমার কথার উত্তর দিতে না চান—সেটা আলাদা কথা। পরে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবেই।'

দারোগাবাবু এতক্ষণ বাদে কথা বললেন। একটি বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের সিগারেটটি নিভিয়ে ফেললেন চায়ের কাপে। তারপর বললেন, 'করবী আর কোনও লাভ নেই। দি গেম ইজ আপ! এই ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। তুমি সব কথা অস্বীকার করলে এঁকে পাগল ভাবতে হয়। সেটা

উনি মেনে নেবেন কেন? তোমাদের ব্যাডলাক, ইনি মাঝখানে এসে পড়েছেন। আমাকেও তো চাকরি বাঁচাতে হবে! তাও বাঁচাতে পারব কিনা জানি না।'

করবীর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। এক ফুঁয়ে যেন কেউ নিভিয়ে দিল একটা মোমবাতি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সেটিকে খুব ঘৃণার দৃষ্টি বলা যায় না। দারুণ হতাশা, দারুণ দুঃখ মিশে আছে সেই দৃষ্টিতে। পুরো দু-তিন মিনিট তাকিয়ে রইল আমার চোখে-চোখে। শেষ পর্যন্ত আমিই চোখ সরিয়ে নিলাম।

খুব অস্ফুট ভাবে করবী বলল, 'আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে। বিশ্বাস করুন। আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে।'

করবীর প্রতি আমার কোনও রকম দয়া হল না। আমি বিদ্রূপের সুরে বললাম, 'প্রথমে জানা দরকার, যিনি মারা গেছেন, তিনি আপনার সত্যি-সত্যি স্বামী কি না। স্বামী হোক বা যে-ই হোক, আত্মহত্যা করার পক্ষে খুব চমৎকার পরিবেশ বটে। আপনি যখন ডেডবডিটি সরাবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন আপনার সঙ্গে অন্য লোক ছিল, তারা কে?

করবী সে কথার উত্তর না দিয়ে আবার বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে।'

আমি দারোগার দিকে ফিরে বললাম, 'সুখেন রায়ের কি রিভলভার ছিল? সেটা আপনার জানার কথা।'

দারোগাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না, ছিল না।'

'আমি ডেডবডির গলায় বুলেটের ক্ষত দেখেছি। এবং ডেডবডির কাছে কোনও রিভলভার ছিল না। এটি আত্মহত্যা?'

দারোগা বললেন, 'করবী, আর মিথ্যে কথা বলে ওঁকে ভোলাতে পারবে না। বললাম না, ব্যাড লাক, তোমরা শক্ত মানুষের পাল্লায় পড়েছ। ডেডবডিটি কোথায়?'

করবী কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। করবীকে এখন কিছুতেই চোখের আড়াল করা যায় না। এ মেয়ে অতি সাঙঘাতিক, কখন কী করে বসবে, ঠিক নেই। এমনকী আত্মরক্ষার তাগিদে আমি আমার রিভলভারটা পকেটে শক্ত করে ধরে রইলাম। দারোগাবাবুর মুখ-চোখে একটা উদাসীন ভাব। পারতপক্ষে আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। করবী একটার-পর-একটা ঘর পেরিয়ে যেতে লাগল। বসবার ঘরের পরেই বড় ঘর, তার পেছনে আর একটি ছোট্ট ঘর। সেই ঘরে খাটের ওপরে কফিনের আকারে একটি বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে শোয়ানো রয়েছে ডেডবডিটি। চিনতে আমার দেরি হল না। এক রাত আমি এর সঙ্গে এক ঘরে কাটিয়েছি। গলায় বুলেট-বেঁধা সুখেন রায়ের মৃতদেহ। সেটা যে করবীর স্বামী সুখেন রায়েরই দেহ, অন্য কারওর নয়—সেটা দারোগাবাবুর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বডিটি আস্তে-আস্তে ডিকমপোজ করতে আরম্ভ করেছে। পাছে দুর্গন্ধ টের পাওয়া যায়, তাই ঘরের মেঝেতে অনেকখানি ডেটল ছড়ানো।

আমি স্তম্ভিত ভাবে তাকালাম করবীর দিকে। কী বিস্ময়কর এই মেয়েটি! স্বামীর মৃতদেহ ঘরের মধ্যে শোয়ানো। আর মেয়েটি স্নান করে সিঁদুর পরে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে বসেছিল হাসিমুখে। আমি যদি সুর না বদলাতাম, তাহলে এখনও হয়তো ওই গল্পই চলত।

করবীর মুখে কিন্তু কোনও ভাবান্তর নেই। কিংবা তার তখনকার মুখের চেহারার বর্ণনা দিতে পারি, এমন ভাষাজ্ঞান নেই আমার। সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মৃত স্বামীর মুখের দিকে। তার ঘরসংসার, ভবিষ্যৎ সবই শেষ হয়ে গেল।

একটু বাদে করবী আস্তে-আস্তে বলল, 'ওকে কবর দেওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। কিন্তু সময় পেলাম না। ওর নিজের দোষেই ও মরেছে। ওর যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়, তার জন্য আমি কী করতে পারি!'

দারোগাবাবু বললেন, 'থাক, এখন ওসব কথা থাক। ডেডবডিও থানায় নিয়ে যেতে হবে। করবী, তুমিও তৈরি হয়ে নাও। তোমাকে থানায় যেতে হবে।

'আমি তৈরিই আছি।'

'সুরযলাল কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'সুরযলাল পালিয়ে-টালিয়ে যায়নি তো?'

'আমি জানি না।'

মাধবী হঠাৎ মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'দারোগাবাবু আগে থেকে সব জানত তার মানে? সেও কি ওদের সঙ্গে ছিল নাকি?'

রঞ্জন বলল, 'আঃ! এমন বেটপকা কথা বলো। সেটা বুঝতে পারছ না এখনও?'

কর্নেল সেন মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, দারোগাবাবু ওদের সঙ্গে আসল ক্রাইমের সময় ছিলেন না বটে—কিন্তু সবই জানতেন। ওরা সবাই দারোগাবাবুর পরিচিত। ডাকবাংলোর ঘরটায় আমি যখন ডেডবডিটাকে সঙ্গে নিয়ে দরজা জানলা আটকে রয়েছি, তখন ওরা কোনওক্রমেই সুবিধে করতে না পেরে, আমার আগেভাগে থানায় গিয়ে সব জানিয়েছিল—এবং দারোগাবাবুর পরামর্শ নিয়েছিল।

আমি যখন থানায় যাই, তখন দারোগাবাবু ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে বেরোতে দেরি করেছেন। যাতে সেই সময় ওরা ডেডবডিটা সরিয়ে সব প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ পায়। সেই জন্যই গাড়ি খারাপটারাপ ইত্যাদি ছুতো বার করেছিলেন।

আর একটা জিনিসও আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম। ওরা যে খালের জলে আমার সুটকেসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল—সেটাও নেহাত বোকামি করে নয়। তার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য ছিল। তখন পরিপূর্ণ দিনের আলো, সেই সময় ওরা জিপে করে এসে ডাকবাংলো থেকে সুখেন রায়কে নিয়ে যাবে—এটা কারওর-না-কারওর চোখে পড়বেই। সুখেনের মৃতদেহটা ওরা জিপের পেছনে এমন ভাবে হেলান দিয়ে শুইয়ে এনেছিল যে কেউ চট করে বুঝতে না পারে যে সে মরে গেছে। ওই জিপটাও গ্রামের লোকের চেনা। সুতরাং কেউ-না-কেউ আমাদের বলে দিতে পারত সেই কথা। সুটকেসটা ফেলে আসাও আমাদের দেরি করানোর চেষ্টা। ওরা সময়ের সঙ্গে রেস দিচ্ছিল। যেমন করে হোক, আমাদের দেরি করিয়ে দিয়ে ডেডবডিটাকে পুঁতে ফেলতে পারলেই ওরা অনেকটা নিরাপদ হতে পারত। কোনও ডেডবডি পাওয়া না গেলে খুনের অভিযোগ টেঁকে না! ব্যাপারটা আমার এক রাত্তিরের দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু শেষপর্যন্ত এসেও ভাগ্য ওদের প্রতি বিরূপ হয়েছে। রাত্রিবেলা অন্ধকারে ওইরকম গ্রামাঞ্চলে একটা ডেডবডি পুঁতে ফেলা খুব শক্ত নয়—কিন্তু দিনের আলোয় অনেক অসুবিধে। ওরা স্থানীয় মুসলমানদের কবরখানায় একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল—সেই সময়েই আবার একটি মুসলমান শিশুকে সেখানে গোর দেওয়া হচ্ছে। কবরখানায় অনেক লোকজন। এরকম আশঙ্কা ওদের মনে একবারও জাগেনি। কবরখানাটা নির্জন পড়ে থাকে সাধারণত। কিন্তু সেদিনই যে একটা বাচ্চা ছেলে মারা যাবে আর ঠিক ওই সময়েই তাকে কবর দিতে আনা হবে এ আর ওরা জানবে কী করে। এত চেষ্টা করেও ওরা শেষরক্ষা করতে পারল না। বাধ্য হয়ে ওদের ফিরে আসতে হয়। শেষপর্যন্ত ওরা নির্ভর করেছিল করবীর অভিনয়দক্ষতার ওপরে। করবী যদি ভুলিয়েভালিয়ে আমাদের ফেরত পাঠাতে পারে। স্নান করা সিঁদুর পরা একটি মেয়েকে দেখে কি কল্পনা করা সহজ যে স্বামীর মৃতদেহ পাশের ঘরে শোয়ানো আছে?'

মাধবী বলল, 'সত্যি বাবা, কল্পনাই করা যায় না। কোনও মেয়ে এরকম করতে পারে? আপনি কী করে সন্দেহ করলেন কে জানে!'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমি খেপে গিয়েছিলাম বলা যায়। ওরা সবাই মিলে এমন একটা ষড়যন্ত্র করেছিল, যেন আমি একটা পাগল। আগের দিন রাত্রে কিছুই ঘটেনি, ঘরের মধ্যে কোনও ডেডবডি ছিল না—সবই যেন আমি বানিয়ে বলছি। তাই আমি শেষপর্যন্ত না দেখে ছাড়তে চাইনি।'

রঞ্জন জিগ্যেস করল, 'তারপর কী হল?'

কর্নেল সেন বললেন, 'ডেডবডির কাছে একজন কনস্টেবলকে পাহারায় বসিয়ে দারোগাবাবু করবীকে বললেন, 'চলো।'

করবী সহজ ভাবে বলল, 'যাচ্ছি, চলুন। আমি এক গেলাস জল খেয়ে আসি।'

কিন্তু আমি করবীকে চোখের আড়াল হওয়ার সুযোগ দিতে চাই না। জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় জল আছে? আমি এনে দিচ্ছি, আপনি এখানে দাঁড়ান।'

করবী অবাক হয়ে বলল, 'কেন, আপনি এনে দেবেন কেন?'

আমি বললাম, 'বাড়িতে আর কেউ নেই? আপনার স্বামী চলে গেলে আপনি একা থাকেন?'

করবীর বদলে দারোগাবাবু বললেন, 'একজন ঠিকে ঝি এসে কাজটাজ করে দিয়ে যায়, তাই না? সে বোধহয় এখন নেই।'

করবী বলল, 'এ-ঘরেই জল আছে। আমি নিজে গড়িয়ে নিচ্ছি।'

কলসি থেকে করবী জল গড়াল আমাদের দিকে পিছন ফিরে। আমি দ্রুত গিয়ে ওর কাছে গিয়ে বললাম, দাঁড়ান, জলটা আগে খাবেন না। আমি আগে দেখব—'

করবী পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর হেসে উঠল শব্দ করে। হাসতে-হাসতে বলল, 'ও আপনি ভাবছেন আমি আত্মহত্যা করব? হা-হা-হা—। আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। আমি মরতে চাই না—আত্মহত্যা করতে চাইলে অনেকদিন আগেই করতাম! ঠিক আছে, আমি জল খাব না—এই নিন দেখুন—'

করবী জলসুদ্ধ গেলাসটা ছুড়ে মারল আমার মুখের দিকে। আমি তাড়াতাড়ি মাথা সরিয়ে নিয়েছিলাম বলে গেলাসটা আমার চোখে লাগেনি, কিন্তু ঘাড়ে লাগল। করবী আমার চোখেই মারতে চেয়েছিল—আমার চোখই তো ওদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। বড় কাঁসার গেলাস, আমার ঘাড়ের কাছে একটু কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, জলে জামাকাপড় ভিজে গেল।

আমি করবীর চোখে-মুখে হিস্টিরিয়ার চিহ্ন দেখতে পেলাম। দারোগাবাবু তাড়াতাড়ি এসে করবীর হাত চেপে ধরে ধমক দিয়ে বললেন, 'এই করবী, কী হচ্ছে কী? এখন আর এসব করে কী লাভ হবে। তোমাদের ভরাডুবি হয়েছে। এখন চলো—সুরযলাল কোথায়?'

করবী খরচোখে তাকিয়ে বলল, 'সুরযলাল কে আমি তা জানি না। আপনি কার কথা বলছেন?'

দারোগাবাবু একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ছাড়লেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলুন, সুরযলালকে ধরা যাক। এমনি বড় ভালো ছেলে সুরযলাল—এরা ঝোঁকের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেলেছে—শাস্তি পেতেই হবে—মার্ডার ইজ মার্ডার—'

করবী দৃঢ় গলায় বলল, 'আমার স্বামী আত্মহত্যা করেছে। কেউ তাকে খুন করেনি। এর সঙ্গে সুরযলালের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'ঠিক আছে, এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি তোমাদের জন্য ভালো উকিল ঠিক করে দেব'খন।'

করবী কিন্তু কিছুতেই আমাদের সঙ্গে সুরযলালের বাড়িতে যেতে রাজি হল না। একেবারে বেঁকে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, তাকে মেরে ফেললেও সে সুরযলালের বাড়িতে যাবে না। অথচ করবীকে একা রেখে যাওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। দারোগাবাবু আমাকে বললেন, 'তাহলে স্যার, আপনিই একটু থাকুন এখানে, ওকে চোখে-চোখে রাখুন।'

আমি ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বললাম, 'আমি আর একা ওর সামনে থাকতে পারছি না।'

করবী বিচিত্র গলায় হেসে বলল, 'ভয় নেই, আমি পালাবও না, আত্মহত্যাও করব না। আমি এখানেই থাকব।'

দারোগাবাবু এবার আর কোনও ঝুঁকি নিলেন না—সেপাইকে ডেকে করবীর হাতে দড়ি বাঁধলেন, তারপর সেই অবস্থায় বসিয়ে রাখলেন জিপগাড়িতে। সেপাইটি সেখানে পাহারায় রইল।

সূরযলালকে ধরার জন্য খুব একটা হ্যাঙ্গাম করতে হল না। কাছেই সূরযলালের বাড়ি। স্থানীয় অবস্থাপন্ন কাঠের ব্যবসায়ীর ছেলে সে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, দোহারা সুন্দর চেহারা। মুখে বেশ একটা সরল ভাব আছে। ঠিক ক্রিমিন্যাল টাইপ সে নয়, গ্রাম্য বড়লোকের ছেলে, বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে বখে গেলে যা হয় আর কী!

সূরযলাল যেন আমাদের প্রতীক্ষাতেই ছিল। দাঁড়িয়েই ছিল দোতলার বারান্দায়।

দারোগাবাবু গিয়ে ডাকতেই সে বেরিয়ে এল। পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা। ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বলল, 'খেল খতম হো গিয়া?'

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন, স্যার। যা হওয়ার সে হোবেই, কেউ রুখতে পারবে না। ঠিক কিনা?'

দারোগাবাবু জিগ্যেস করলেন, 'হরিনাথ ফিরেছে? না এখনও পালিয়ে আছে?'

সূরযলাল হাতজোড় করে বলল, 'আমি ওর কথা কিচ্ছু জানি না। বিশওয়াস করুন। হরিনাথের কথা জানি না।'

'ঠিক আছে। সে দেখা যাবে পরে। বুদ্ধুরাম কোথায় গেল?'

সূরযলালের বাড়ির সামনেই একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় মাটিতে একটা লোক বসে ছিল। ময়লা, ছেঁড়াখোঁড়া খাঁকি প্যান্ট-শার্ট পরা। দারোগাবাবু তাকে ডাকতেই সে হাউমাউ করে কেঁদে এসে বলল, 'সাহেব, আমি কিছু জানি না। আমি শুধু গাড়ি চালিয়ে ছিলাম! আমাকে ছেড়ে দিন, ঘরে আমার বালবাচ্চা আছে!'

দারোগাবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, 'চল ব্যাটা, বাড়ি থেকে জিপটা নিয়ে চল থানায়।'

সূরযলালের বাড়ির লোকজন ততক্ষণে নেমে এসে ভিড় করেছে। একটি যুবতী মেয়ে কেঁদে-কেঁদে বারবার দারোগাবাবুর হাত জড়িয়ে ধরতে লাগল। সম্ভবত সে সূরযলালের স্ত্রী। মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। এক হিসাবে তাকে করবীর চেয়েও সুন্দরী বলা যায়—কিন্তু করবীর মতন মানুষকে পাগল করার ক্ষমতা বোধহয় তার নেই। নইলে তাকে ছেড়ে তার স্বামী করবীর কাছে যাবে কেন? মেয়েটি কেঁদে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল, কিছুতেই তাকে থামানো যায় না। সূরযলালের মা খুব বুড়ি, তিনি এসে অভিশাপ দিতে লাগলেন আমাদের সবাইকে। সূরযলাল বলল, 'আর দেরি করছেন কেন দারোগাবাবু, চলেন-চলেন! ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

তোমরা কেউ এরকম পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই পড়োনি। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। এতক্ষণ বাদে আমার নিজেকে একটু অপরাধী লাগতে লাগল। এরা সবাই ভাবছে, আমিই ওদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী। আমিই এতগুলো সংসার ভেঙে দিচ্ছি। কিন্তু খুনের ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত, তাদের তো শাস্তি পেতেই হবে!

আমি সবাইকে আমার গাড়িতে চাপিয়ে থানায় নিয়ে গিয়ে তুললাম।'

॥ ৪ ॥

কর্নেল সেন গল্প থামিয়ে নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলেন। ওঁর মুখটা একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। একটা হাই তুলে বললেন, 'রাত বেশি নেই। এবার একটু শুয়ে পড়া যাক!'

মাধবী বলল, 'কিন্তু কে খুন করল? ওই মেয়েটি, না সূরযলাল?'

কর্নেল সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রঞ্জন তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'মামাবাবু, বলবেন না, বলবেন না। ফট করে এক কথায় খুনির নাম বলে দিলে এই ধরনের গল্পের কোনও মজা থাকে না। ডিডাকশান করে যদি না বেরিয়ে আসে—। এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি আছে। সূরযলাল, বুদ্ধুরাম, হরিনাথ এদের কথা তো এইমাত্র শুনলাম। এদের সঙ্গে করবীর কী সম্পর্ক সেটা এখনও জানা হল না। তা ছাড়া খুনের একটা মোটিভ থাকে—'

কর্নেল সেন বললেন, 'তাহলে সেসব আবার কাল হবে। আমার একটু ক্লান্ত লাগছে এখন। অনেকক্ষণ বকবক করেছি।'

রঞ্জন বলল, 'এখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। এখন আর শুয়ে লাভ নেই। ঘণ্টা কয়েক বাদেই ভোর হয়ে যাবে। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাকি রাতটা গল্প করেই কাটানো যাক। আর এক কাপ করে কফি হবে নাকি?'

মাধবী বলল, 'না, না, এত রাত্তিরে আর কফি খায় না!'

রঞ্জন হাসতে-হাসতে বলল, 'তোমাকে বানাতে হবে বলে ভয় পাচ্ছ তো? তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাকো। সুনীল বানিয়ে দেবে। সুনীল খুব ভালো কফি বানায়।'

আমি বললাম, 'ভ্যাট। আমি এখন উঠতে পারব না। তুই নিজে যেতে পারছিস না? তোর নিজের বাড়ি—আর আমি কফি বানাব?'

'না, না, তুই ভালো বানাস কিনা তাই বলছিলাম।'

'কফি বানানোর আবার ভালো আর খারাপ কী? আমি নিজে কোনওদিন বানিয়ে খাইনি—

রঞ্জন অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বলল, 'মামাবাবু, আপনি কফি খাবেন তো?'

'আপত্তি নেই।'

জল চাপিয়ে এসে রঞ্জন বলল, 'মামাবাবু এবার বলুন, খুনের মোটিভ কী? খানিকটা অবশ্য বোঝাই যাচ্ছে—'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমি তো এতক্ষণ বললাম, এবার তোমরাই বলো না, বাকিটা কী হতে পারে।'

'ঠিক আছে, আমরা সেটা চেষ্টা করব। আপনি আমাদের আর কয়েকটা তথ্য সাপ্লাই করুন। যেমন সুখেন রায় লোকটা কেমন ছিল—'

মাধবী বলল, 'ওই করবী বলে মেয়েটার শেষ পর্যন্ত কী হল? ফাঁসি হয়েছিল?'

কর্নেল সেন হেসে ফেলে বললেন, 'তার মানে তুমি ধরেই নিচ্ছ যে করবীই খুন করেছিল?'

রঞ্জন বলল, 'মাধবী, তুমি থামো তো! আগে মামাবাবুকে আর একটু বলতে দাও—তারপর তো খুনি কে সেটা বুঝবে!'

মাধবী বলল, 'আমায় আর কিছু বলতে হবে না। আমি ঠিক জানি, মেয়েটাই খুন করেছে।'

রঞ্জন বলল, 'আঃ, তুমি থামো তো! এইসব ক্রাইম স্টোরি ফলো করা মেয়েদের কর্ম নয়। মামাবাবু, এটা কিন্তু আপনার ভারী অন্যায়! এতক্ষণ গল্প বেশ চলছিল, হঠাৎ গল্পের শেষ দিকে দুমদাম করে সূরযলাল, হরিনাথ, বুদ্ধুরাম এই এতগুলো ক্যারেকটার এনে ফেললেন। এদের সম্পর্কে আগে আভাস দেওয়া উচিত ছিল। খুনি কখনও লাস্ট দৃশ্যে আসে না।'

'কিন্তু আমি তো গল্প বানাতে জানি না। বানানো গল্প হলে লেখকরা ভেবেচিন্তে চরিত্র ঠিক করে। কিন্তু আমার জীবনে ব্যাপারটা যেভাবে ঘটেছিল, আমি সেই ভাবেই বললাম। সূরযলাল বা হরিনাথ বা বুদ্ধুরামের কথা তো আমি নিজেও আগে জানতে পারিনি।'

'ওই দারোগাটির সঙ্গে ওদের কতখানি সম্পর্ক সেটাও ভালো ভাবে জানা দরকার।'

কর্নেল সেন বললেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মানুষগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা

করার জন্য আমি তোমাদের আর একটু জানিয়ে দিচ্ছি। মামলা চলার সময় আমাকে বেশ জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল—তাই আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম। সব বলতে গেলে তো এক মহাভারত হয়ে যাবে। সংক্ষেপে কিছু-কিছু বলছি।

সেদিন ওদের সবাইকে নিয়ে থানায় আসার পথে দারোগাবাবু আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'স্যার আমাকে ফাঁসাবেন না। আমার চাকরিটা অন্তত বাঁচিয়ে দেবেন। আমি নিতান্ত মায়ায় পড়েই কেসটা চেপে যেতে চাইছিলাম। নইলে আমার আর অন্য কোনও স্বার্থ নেই। বিশ্বাস করুন! আমি এদের সবাইকেই আগে থেকে চিনি। সুখেনকেও আমি স্নেহ করতাম। এরা ঝোঁকের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেলেছে, নইলে এরা কিন্তু কেউই মানুষ খারাপ নয়। আমি তাই ভেবেছিলাম, একজন যখন মরেই গেছে, তাকে তো আর বাঁচানো যাবে না—তবে শুধু-শুধু এদেরও জীবনটা নষ্ট করে কী হবে। আর একটা সুযোগ যদি দেওয়া যায়—পুলিশ অফিসার হিসাবে কেসটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করে আমি অন্যায় করেছি ঠিকই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে কোনও স্বার্থ নেই। টাকাপয়সার ব্যাপারও নেই। পুলিশ হলেও আমারও তো একটা মানুষের প্রাণ আছে। আমি ওদের ওপর মায়া করেই—'

দারোগাবাবু একটা কথা অন্তত ঠিক বলেছিলেন, ওরা কেউই ঝানু ক্রিমিন্যাল নয়। হত্যাকাণ্ড ঝোঁকের মাথাতেই হয়েছে। ওরা যদি খাঁটি ক্রিমিন্যাল হত তাহলে ওরা আমাকেও ছাড়ত না। আমাকে মেরে ফেললেই ওদের ঝামেলা চুকে যেত। ওইরকম নির্জন ডাকবাংলোয় একটা খুনও যা, দুটো খুনও তাই, আমাকে মারার সুযোগও ওরা পেয়েছিল। ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে দেখার পর আমি যখন খানিকটা অসাবধান ভাবে বাইরে বেরিয়ে ছিলাম—তখন ওরা জিপের আড়ালে লুকিয়ে অনায়াসেই আমাকে গুলি করতে পারত। রিভলভার ছিল সুরযলালের কাছে। আমাকেও মেরে ফেলে দুটো লাশ একসঙ্গে পুঁতে ফেলায় ঝঞ্ঝাট আর কী ছিল! আমি যে সেই রাত্রে ওই ডাকবাংলোয় থাকব—তা তো আর কেউ জানত না। কিন্তু কথায়-কথায় মানুষ খুন করার অভ্যাস সত্যিই ওদের নেই। কিংবা, আমি মিলিটারির লোক বলেই ওরা ভয় পেয়েছিল কিনা কে জানে। সত্যিকারের ক্রিমিন্যালরা অবশ্য ওইরকম অবস্থায় কিছুই পরোয়া করে না। সুরযলালের গান লাইসেন্স ছিল বটে কিন্তু সে ঠিকমতন রিভলভার চালাতে জানত কি না—সেটাই একটা সন্দেহের ব্যাপার। খুব ক্লোজ রেঞ্জে ফায়ার করা এক কথা—আর দূর থেকে কাউকে গুলি করতে গেলে রীতিমতন প্র্যাকটিস থাকা দরকার।

সুখেন রায় লোকটি ছিল খুব নিরীহ আর শান্ত ধরনের। বেশ জনপ্রিয় ছিল সে। তার নম্র ব্যবহার আর বিদ্যাবুদ্ধির জন্য সবাই ভালোবাসত তাকে। খুবই গরিব পরিবারের ছেলে সে, কোনও রকমে লেখাপড়া শিখে চাকরি জুটিয়েছে। বউটিও তার সুন্দরী। সংসারে কোনও ঝামেলা নেই। লোকের চোখে সে মোটামুটি সুখী মানুষ। পেশায় ওভারসিয়ার হলেও তার ঝোঁক ছিল নানা রকমের বই পড়ার—সামান্য মাইনে পেলেও সে সেই টাকার মধ্যে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে অনেক বই ও পত্রপত্রিকা আনত বাইরে থেকে।

সুখেন রায়ের বাড়িতে রীতিমতন একটা আড্ডা ছিল। আড্ডার অন্যতম আকর্ষণ ছিল অবশ্য তার বউ করবী এবং করবীর হাতে বানানো চা। করবীর বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সে। ষোলো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়—তখন সে রোগা পাতলা একটি গ্রাম্য লাজুক মেয়ে। বিয়ের পর সুখেন রায় নানান জায়গায় বদলি হয়েছে—করবী সেই সব জায়গায় লোকজনের সঙ্গে মিশে আস্তে-আস্তে বেশ চটপটে হয়ে উঠেছে। লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারে, পুরুষদের আড্ডায় সমানে যোগ দিতে পারে। মফস্বল জায়গায় এরকম মেয়ে তো সহজে চোখে পড়ে না। অবিবাহিত মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে আড্ডায় যোগ দিতে পারে না, আর বিবাহিত মেয়েরা বাচ্চাকাচ্চা সামলাতেই ব্যস্ত। করবীর ঝামেলাও ছিল না—তারপর সে একটু-আধটু গানটানও গাইতে পারে।

এমনিতে সুখেন রায়ের সংসারটাকে সুখের সংসারই বলা যেতে পারত। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার—খুব একটা অভাবের টানাটানি ছিল না। সুখেন রায়ের সংস্পর্শে থেকে করবী খানিকটা লেখাপড়াও শিখেছিল। বন্ধুবান্ধব আসে বাড়িতে, হইচই আনন্দ হয়—সব মিলিয়ে অভিযোগ করার মতন কিছু নেই।

কিন্তু ওই যে বললাম কিছুক্ষণ আগে, করবী ঠিক সাধারণ মেয়ে নয়। তার স্বভাব ও শরীরের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষের মধ্যে আগুন জ্বালায়। সাধারণ শান্তশিষ্ট বাড়ির বউ হয়ে থাকবার মতন মেয়ে সে নয়। তা ছাড়া বিয়ের পর আট বছরের মধ্যেও তার কোনও ছেলেপুলে হয়নি। স্বাস্থ্য খুব ভালো। সব মিলিয়ে তার মধ্যে একটা ছটফটানি ছিল। ছোট্ট সংসারের গণ্ডি ছাড়িয়ে সে উপচে পড়তে চাইত।

পুরুষেরা আকৃষ্ট হত তাকে দেখে। এই ধরনের মেয়েদের দেখে প্রলুব্ধ হওয়ার মতন রসিক পুরুষের অভাব নেই কোনও দেশে। সুখেন রায় যেখানে-যেখানে ট্রান্সপার হয়েছে, তার অনেক জায়গাতেই দু-একটা ছোটখাটো গোলমাল হয়েছে করবীকে নিয়ে। সেজন্য কতটা দোষ করবীর আর কতটা অন্য পুরুষদের—তা বলা যায় না। সে একবার ধরাও পড়েছে সুখেনের কাছে, তখন করবী অনুনয়বিনয় করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। সুখেনই অনেক সময় ইচ্ছে করে বদলি হয়ে গেছে এক-এক জায়গা থেকে। লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করার মতন স্বভাব সুখেনের নয়। যেখানেই দেখেছে কোনও লোক করবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে চাইছে—সেখান থেকেই সে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে কোনওক্রমে। বউকে কোনও শাস্তি দিতে চায়নি। আবার, তার বাড়িতে যে আড্ডা বসে, এটাও সে বন্ধ করে দিতে চায়নি কখনও, কারণ সে নিজেই আড্ডা দিতে ভালোবাসত। মোট কথা, স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসত সুখেন। তার এই ধরনের ছোটখাটো দোষত্রুটিও সে ক্ষমা করতে পারত। করবীও স্বামীকে ভালোবাসত—এ-কথাও ঠিক। নইলে সুখেনকে ছেড়ে কখনও সে চলে যায়নি কেন? যেতেও তো পারত। সেরকম সুযোগও তার ছিল। সব মিলিয়ে করবী মেয়েটা অদ্ভুত ধরনের। স্বামীর প্রতি ভালোবাসাও ছিল তার, আবার অতৃপ্তিও ছিল। অতৃপ্তিটা কখনও-কখনও বেড়ে গেলেই গোলমাল দেখা দিত।

সুখেন তার স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যেত না। ট্যুরে যাওয়ার কথা সব বাজে। কোনওদিন সে স্ত্রীকে একলা বাড়িতে রেখে ট্যুরে যায়নি, মৃত্যুর আগের দিনও না। করবীকে বাপের বাড়িতেও পাঠাত না সে—যদিও করবীর বাপের বাড়িতে বিশেষ কেউ ছিল না—তাব বাবা-মা দুজনেই মারা গেছে অল্প বয়সে। দাদার সংসারে মানুষ।

সুরযলালের সঙ্গে তার ঠিক কতখানি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—তা জানা যায়নি শেষপর্যন্ত। আদালতে হাজার জেরাতেও ওরা এ-সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি। এমনকী সুরযলালই জোর করে করবীর দিকে ঝুঁকেছিল, না করবীই আকৃষ্ট করেছিল তাকে—তাও বলা যায় না। তবে, দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ছিল। সুরযলাল অনেকবার এসেছে ওদের বাড়িতে, সুখেনের উপস্থিতিতেই।...

ব্যাপারটা তোমাদের পক্ষে অনুমান করা নিশ্চয়ই শক্ত হবে না। সুখেনের বাড়িতে নিয়মিত আড্ডা বসত, তার সুন্দরী স্ত্রী করবী চা তৈরি করে খাওয়াত সবাইকে। আড্ডার লোভে না হোক, চায়ের লোভেই তো যেতে পারে অনেকে—'

রঞ্জন ফস করে বলে উঠল, 'কিংবা যে বানিয়ে দেয় তার লোভেও কেউ-কেউ যেতে পারে। আপনি যেরকম বলছেন, তাতে মেয়েটি...'

কর্নেল সেন মাথা নীচু করে মৃদু হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা বোধহয় সেই রকমই দাঁড়িয়েছিল। ওই আড্ডার মধ্যে কেউ-কেউ একটু ঝুঁকে পড়ে করবীর দিকে। সুখেন বোধহয় সেদিকে নজর দেয়নি। অন্যান্য পুরুষমানুষদের মধ্যে সুরযলালই করবীকে বেশি আকৃষ্ট করতে পারবে। তার সুন্দর চেহারা,

পয়সাকড়ি যথেষ্ট আছে, ফূর্তিবাজ। সুখেনকে লুকিয়েও যে সে করবীর সঙ্গে দেখা করত—'

মাধবী ধড়ফড় করে উঠে পড়ে বলল, 'এই যা...। জল গরম হয়ে উথলে পড়ে যাচ্ছে—তোমার খেয়ালই নেই। তোমার দ্বারা যদি একটু কাজ হয়—'

রঞ্জন বলল, 'ও, জল চাপিয়ে ছিলাম, না? যাও, যাও, কফি বানিয়ে নিয়ে এসো, এসব কি আর পুরুষমানুষের কাজ!'

মাধবীর কফি বানিয়ে আনার অপেক্ষায় আমরা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। মনে-মনে আমি করবী নামে মেয়েটির চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম। এই গল্পের প্রথম দিকে তার চরিত্রটা অনেকখানি রহস্যে মোড়া ছিল। এখন আস্তে-আস্তে স্পষ্ট হয়ে আসছে। মেয়েটির জীবন তার সংসারকে ছাপিয়ে আরও বড় হয়ে উঠছিল। অন্য ধরনের পরিবেশে পড়লে কিংবা অন্য রকমের সুযোগ পেলে এই ধরনের মেয়েরাই দেশনেত্রী হয়, সমাজসেবিকা হয় কিংবা ফিল্মস্টার বা ডাকাতদলের সর্দারনিও হতে পারে। যেসব মেয়ে সংসার ছাড়িয়ে আরও বড় হয়ে ওঠে, তারাই জীবনে বড় কিছু করে। এখানে, দুর্ভাগ্যবশত বেচারি অবৈধ প্রেম আর খুনখারাপির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল সেন বললেন, 'সূরযলাল সম্পর্কে বিশেষ কোনও বদনাম আগে শোনা যায়নি। তার বাবা কাঠের ব্যাবসা করে কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর সূরযলাল ব্যাবসার দিকে বেশি মন না দিয়ে টাকাপয়সা ওড়াবার দিকে মন দেয়। অল্প বয়সেই বিয়ে হয় ওদের। স্ত্রীটি সুন্দরী, দুটি বাচ্চাও আছে। কিন্তু ঘরে মন টেঁকে না সূরযলালের। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফুর্তি করে, মদটদ খায়। তার মা এখনও বেঁচে আছেন বলে বাড়িতে ওসব চলে না—মাঝে-মাঝেই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাইরে চলে যেত। এইসব সত্ত্বেও সূরযলালের মনটা উদার—অনেককে সে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। কখনও কারওর কোনও ক্ষতিটতি করেনি। মোটামুটি ভাবে তার জীবনটা কেটে যেতে পারত—কিন্তু সুখেন রায় তার স্ত্রীকে নিয়ে ওই ছোট্ট শহরে বদলি হয়ে আসার ফলেই তার জীবনেও সবকিছুই বদলি হয়ে গেল। সূরযলাল রাশি-রাশি টাকার জিনিস কিনে উপহার দিয়েছে করবীকে। করবীও সেসব নিতে আপত্তি করেনি—।'

কর্নেল সেন মাধবীর দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, 'সূরযলালের সঙ্গে করবীর অবৈধ মিলনের কোনও সুযোগ কখনও ঘটেছিল কিনা তা জানা যায়নি। যদিও সূরযলালের বউ তার সাক্ষ্যে বলেছিল, 'ওই ডাইনিই তার স্বামীর সর্বনাশ করেছে।'

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজন লোকের শেষপর্যন্ত আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। তার নাম হরিনাথ।

এই হরিনাথ ছিল সুখেনের অফিসেরই সহকর্মী। কিন্তু সে সূরযলালের ফুর্তির সঙ্গী একজন। সূরযলালের টাকায় আমোদআহ্লাদ করাই ছিল তার প্রধান কাজ। ঘটনার দিন রাত্রিতে সে ডাকবাংলোতে উপস্থিত ছিল। কিন্তু গুলি চলার পরই সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সেই যে পালিয়েছে, আর কেউ তার কোনও খোঁজ পায়নি। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও ধরতে পারেনি তাকে—চাকরিটাকরি সব ছেড়ে সে অবাক কাণ্ড করেই রইল।

এই তো শুনলে লোকগুলির পরিচয়। এবার তোমরা—'

রঞ্জন জিগ্যেস করল, 'আর সেই বুদ্ধুরাম?'

কর্নেল সেন হাসতে-হাসতে বললেন, 'সে কিছু না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সূরযলাল বা করবী কেউই গাড়ি চালাতে জানে না। সুতরাং ডেডবডিটা আর জিপগাড়িটা সরানোর জন্য একজন ড্রাইভার দরকার। এটা একটা মজার ব্যাপার। এটা থেকেই বুঝতে পারবে, কত ছোটখাটো ঘটনার জন্য কত বড়-বড় ব্যাপার ফাঁস হয়ে যায়। করবীর পক্ষে গাড়ি চালাতে না জানা অস্বাভাবিক কিছু নয়—কিন্তু সূযরলাল বড়লোকের ছেলে—তাদের নিজেদের কোম্পানির দু-তিনটে ট্রাক আছে—সে তো

গাড়ি চালাতে জানতেও পারত। তাহলেই, খুনের রাত্রেই সে বডিটা সরিয়ে ফেলতে পারত—আমি ডাকবাংলোয় গিয়ে কিছুই দেখতে পেতাম না। ওরা পুরো ঘটনাটাই চাপা দিয়ে দিতে পারত, বিশেষ করে দারোগাবাবুর সঙ্গে যখন ওদের খাতির। কিন্তু তা হতে পারল না, সুখেন রায় একমাত্র গাড়ি চালাতে জানত ওদের মধ্যে—সে মারা যাওয়ার পর গাড়ি চালাবে কে? এই জন্যই সূরযলাল অনেক টাকাকড়ি দিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে বুদ্ধুরামকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তার পরদিন। লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি কম—সে হয়তো কিছুই ফাঁস করত না শেষপর্যন্ত। বেচারা তার পুরো টাকা পায়নি বলে সেই টাকার লোভে বসে ছিল।'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'তাহলে কি ওই হরিনাথ নামের লোকটাই খুন করেছে!'

রঞ্জন বলল, 'তা হতেই পারে না।'

মাধবী বলল, 'কেন হতে পারে না?'

'তার কারণ হরিনাথ বলে কোনও লোকের অস্তিত্বের কথা আমরা জানতুমই না। হঠাৎ গল্পের শেষের দিকে একটা লোকের কথা শোনা গেল। আর সে-ই খুনি হয়ে গেল।—এটা হয় না। ডিটেকটিভ গল্পে এটা খুব ব্যাড ফর্ম।'

কর্নেল সেন বললেন, 'কিন্তু রঞ্জন, এটা তো গল্প নয়। জীবনের সব ঘটনা কি গল্পের নিয়ম মেনে চলে? আমি হয়তো ঘটনাটা ঠিক মতন সাজিয়ে বলতে পারিনি—'

মাধবী বলল, 'খুন না করলে ওই লোকটা পালাবে কেন? লুকিয়েই বা থাকবে কেন?'

রঞ্জন বলল, 'ভয় পেয়ে পালিয়েছে! ওইসব কাণ্ডমান্ড দেখে ওর পিলে চমকে গিয়েছিল—'

কর্নেল সেন বললেন, 'লোকটা একেবারে চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে জন্মের মতন পালিয়ে গেল—এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার নয়?'

রঞ্জন নিরাশ ভাবে বললে, 'তাহলে মামাবাবু, আপনি বলছেন, ওই হরিনাথই খুন করেছে?'

'না, সে-কথা আমি বলছি না। আদালতেও সে-কথা বলা হয়নি। যে পালিয়ে যায় তার প্রতিই বেশি সন্দেহ জাগে—সেই জন্যই হরিনাথের নামটা প্রথম মনে আসে। কিন্তু খুনের একটা মোটিভ থাকা চাই তো। সেই হিসাবে হরিনাথের পক্ষে খুন করার কোনও কারণই নেই বলতে গেলে। সে একটা সাধারণ ফূর্তিবাজ লোক। সূরযলালের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে মদ্য পানটান করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। অবিবাহিত লোক, সংসারের কোনও বন্ধনও নেই। লোকের মুখে আমি যা শুনেছি—হরিনাথের চেহারাটাও ছিল বেশ খারাপ—লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারা, মুখের একপাশে একটা পোড়া দাগ। এইসব লোক সাধারণত নারীর প্রীতি বা ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্তত অবৈধ প্রেমের নায়ক হিসাবে এদের কল্পনা করা যায় না। তা ছাড়া, যতদূর জানা গেছে, মেয়েদের ব্যাপারে হরিনাথের দুর্বলতাও ছিল না বিশেষ। সুতরাং তার পক্ষে হঠাৎ সুখেন রায়কে খুন করার কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

হরিনাথের কোনও পুরোনো ক্রিমিন্যাল রেকর্ডও নেই। সম্ভবত জীবনে প্রথম চোখের সামনে একটা মানুষকে অপঘাতে মরতে দেখে তার মাথার গোলমাল হয়ে যায়। দেখেশুনে ভয়ের চোটে সে সেই যে এক দৌড় দেয়—কোথায় গিয়ে থেমেছে, তার ঠিক নেই। কিংবা হয়তো এখনও দৌড়োচ্ছে।'

মাধবী বলল, 'তাহলে কে খুন করেছে বলুন! আর সাসপেন্স ভালো লাগছে না।'

রঞ্জন বলল, এখন না। বলে দিলেই তো সব ফুরিয়ে গেল!'

কর্নেল সেন বললেন, 'আমি তো ঘটনাটা সব খুলে বললাম তোমাদের। লোকজনদেরও চিনিয়ে দিলাম। এই কাহিনির এই কজনই পাত্রপাত্রী। এদের সম্পর্কে আমি যেটুকু জেনেছি তা সবই বলেছি তোমাদের। এর বাইরের আর কেউ এর সঙ্গে জড়িত নয়, অন্য কেউ খুন করেনি।

এদের মধ্য থেকেই খুনিকে খুঁজে নিতে হবে। এবার তোমরাই বলো কে খুন করেছে?'

মাধবী সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'আমি ঠিক জানি, ওই মেয়েটাই খুন করেছে!'

কর্নেল সেন, রঞ্জন আর আমি একসঙ্গে হেসে উঠলাম। রঞ্জন বলল, 'তোমার ওই মেয়েটার ওপর খুব রাগ, তাই না!'

মাধবী বলল, 'নিশ্চয়ই! যে মেয়ে স্বামীর মৃতদেহ পাশের ঘরে রেখে নিজে বাইরের লোকের সঙ্গে হেসে গল্প করতে পারে—সে সব পারে!'

আমি বললাম, 'মাধবী, তোমাকে যদি বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হত—তাহলে তুমি নিশ্চয়ই মেয়েটাকে ফাঁসি দিতে, তাই না?'

'দিতুমই তো!'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা মাধবী, তুমি যে বলছ করবীই খুন করেছে, কিন্তু কীভাবে খুন করেছে, সেটাও তো তোমাকে বলতে হবে। শুধু-শুধু একজনকে খুনি বললেই তো আর হয় না!'

মাধবী বলল, 'এ তো খুব জলের মতন বোঝাই যাচ্ছে। অসভ্য পাজি মেয়েটার সঙ্গে সুরযলালের নিয়মিত দেখা হত গোপনে। সুখেন কখনও অফিসের কাজে বাইরে গেলে তো আর কথাই নেই! সেবার যখন সুখেন বাইরে গেল—'

রঞ্জন বলল, 'সুখেন তো আসলে যায়নি বাইরে—'

'আঃ, আমাকে বলতে দাও না! সুখেন পাটনায় যাওয়ার নাম করে বাইরে লুকিয়েটুকিয়ে ছিল। সুরযলাল রাত্তিরে ওদের বাড়ি যেই এসেছে—সুখেনও ঢুকে পড়েছে। ধরা পড়ে গিয়ে বেগতিক দেখে করবী অমনি সুরযলালের পিস্তল নিয়ে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। ও মেয়ে সব পারে!'

আমি বললুম, 'কিন্তু মাধবী, এর সঙ্গে ডাকবাংলোর সম্পর্ক কী?' ঘটনাটা ওদের বাড়িতে না ঘটে ডাকবাংলোয় ঘটল কেন? করবীর পক্ষে বাড়িতে থাকাই তো সুবিধেজনক।'

'বাড়িতেই তো হয়েছে। তারপর ডেডবডিটা ডাকবাংলোয় নিয়ে কিছু একটা করার মতলব ছিল।'

'মাধবী, আগাথা ক্রিস্টি তোমাকে দেখলে লজ্জা পেতেন! মেয়েরা এমন ভালো ডিটেকটিভ গল্প লিখতে পারে, আর তোমার এই বুদ্ধি।'

রঞ্জন বলল, 'তোমার মেয়েটার প্রতি একটুও সহানুভূতি হচ্ছে না? আমার কিন্তু একটু-একটু হচ্ছে।'

'তা তো হবেই। তোমরা পুরুষমানুষরা...'

আর একদফা হেসে রঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুনীল, তুই বল কে খুন করেছে।'

আমি বললাম, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুই বল না!'

রঞ্জন বলল, 'আমার ধারণা, এই ঘটনায় করবীর ভূমিকাটা একটু বড় করে দেখানো হচ্ছে। আসলে এর মধ্যে টাকাপয়সার কোনও ব্যাপার জড়িত। সুরযলাল, সুখেন, হরিনাথ, বুদ্ধুরাম, আর ডাকবাংলোর চৌকিদার এরা সবাই মিলে কোনও অবৈধ ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। এসব জায়গায় এরকম হয়। ওই ব্যাবসার ব্যাপারেই কোনও গোলমাল হয়, সুখেন বোধহয় বিট্রে করেছিল—তাই সুরযলাল আর অন্যরা মিলে সুখেনকে মেরে ফেলে। তারপর সুরযলালই কোনও বুদ্ধি খাটিয়ে করবীকে ওই ডাকবাংলোয় ডেকে নিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ফেলে খুনের ঘটনার সঙ্গে। করবী তখন নিজে বাঁচবার জন্যই বাধ্য হয়ে সহযোগিতা করে ওদের সঙ্গে। মামাবাবু যে সুখেনকে ভালো লোক বলছেন, তারই বা প্রমাণ কী! বাইরে থেকে দেখে অনেককে ভালো মনে হয়। সুখেনই হয়তো নিজের বউকে অন্যদের সামনে এগিয়ে দিত।'

কর্নেল সেন বললেন, 'রঞ্জন, তোমার থিয়োরিটা একেবারে অবাস্তব। এটা চমকপ্রদ বটে

কিন্তু একটুও সত্যি নয়। ওদের মধ্যে কোনও ব্যাবসার সম্পর্ক যে ছিল না সেটা আমি ভালো ভাবেই জেনেছি।'

রঞ্জন হতাশ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুনীল, তুই তাহলে বল।'

আমি বললাম, 'আমি ভাই পারব না। আমি ধাঁধার উত্তর দিতে পারি না একদম।'

'ধাঁধা কোথায়? লজিক্যাল অ্যানালিসিস করলেই তো পাওয়া যায়।'

'ওইটাই যে আমি পারি না। আমি যখন ডিটেকটিভ গল্প-টল্প পড়ি—কোনওদিন আগে থেকে বুঝতে পারি না খুনি কে—। তা ছাড়া মানুষকে চেনা অত সহজ নয়। কোন মানুষ কখন কীরকম ব্যবহার করবে—তা কেউ বলতে পারে না। আমার তো মনে হচ্ছে, ওদের মধ্যে যে কেউ খুন করতে পারে—করবী, সুরযলাল—এমনকী হরিনাথের পক্ষেও কোনও কারণে খুন করা অসম্ভব নয়। তার মনের মধ্যে কী জটিলতা ছিল, তা তো আমরা জানতে পারব না। বুদ্ধুরামও যদি খুন করে, তাতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

কর্নেল সেন বললেন, 'এরকম ভাবে ভাবলে অবশ্য সবাইকেই সন্দেহ করতে হয় কিংবা কোনও মানুষকেই সন্দেহ করা যায় না। একথা ঠিক, বাইরে থেকে দেখে আর মানুষকে কতটা বোঝা যায়! ভেতরে-ভেতরে মনের মধ্যে তার কী খেলা চলছে, সেটা কেউ জানতে পারে না। তবে, অন্য একটা দিক থেকেও রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা যায়। ক্রাইমের সময় এবং ঘটনাটা যদি রিকনস্ট্রাক্ট করা যায়, তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হতে পারে। আমি যেদিন ডাকবাংলোটাতে হাজির হয়েছিলাম—তার আগের রাত্রে অর্থাৎ যেসময় খুনটা হয়েছিল—সেই সময়কার ঘটনা যদি কল্পনা করা যায়—তাহলে খুনিকে সহজেই দেখতে পাওয়া যাবে। চরিত্রগুলো যদি চেনা যায়, তাহলে তাদের ব্যবহার কীরকম হবে, সেটাও অনেকটা কাছাকাছি আন্দাজ করা যায়। কোনও মানুষই তার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যবহার সহজে করে না। বাইরে ভালো মানুষ আর ভেতরে-ভেতরে হিংস্র শয়তান—এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। অনেক উত্তেজক ডিটেকটিভ গল্পে পড়েছি—প্রথম দিকে ঘটনাটা যা মনে হয়েছিল, শেষের দিকে তার সম্পূর্ণ একটা উলটো ব্যাখ্যা দেওয়া হল। রঞ্জনও সেই টেকনিকেই বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, বাস্তবে ওরকম ব্যাপার খুব কমই ঘটে। আমি তোমাদের যে ঘটনা বললাম, এটা কিন্তু পুরোপুরি বাস্তব—এর মধ্যে অদ্ভুত অপ্রাকৃত কিছু নেই। আগের রাত্রে কী-কী ঘটেছিল, সেটা টুকরো-টুকরো ভাবে আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু পুরো ছবিটা ফুটিয়ে তোলার জন্য ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আমার নেই। সুনীল, তুমি তো গল্প উপন্যাস লেখো—তুমি কল্পনায় সেই রাত্তিরটার একটা ছবি ফোটাতে পারবে না?'

আমি বললাম, 'গল্প-উপন্যাস লেখা এক কথা আর অন্যের মুখে একটা ঘটনা শুনে সেটাকে বাস্তবের মতন ভাবা অন্য একটা ব্যাপার। আমি বোধহয় এটা পারব না।'

রঞ্জন বলল, 'পারবি, চেষ্টা কর না।'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ, আপনি বলুন। আপনার যদি ভুল হয়, আমরা ধরে দেব।'

রঞ্জন বলল, 'এইরকম ভাবে আরম্ভ কর। ডাকবাংলোয় কে আগে গিয়েছিল, সুখেন, না করবীর সঙ্গে সুরযলাল—'

॥ ৫ ॥

ওদের পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত আমাকেই গল্পের বক্তার ভূমিকা নিতে হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি চরিত্রগুলোর কথা ভেবে নিলাম। সুরযলাল—হঠকারী বড়লোকের ছেলে, ইয়ারবন্ধুদের পাল্লায় পড়ে টাকা ওড়াচ্ছে। সুখেন রায়—শান্তশিষ্ট বই-পড়া যুবক, বাড়িতে পুত্রহীনা সুন্দরী স্ত্রী। করবী

তার স্বামীকে ভালোবাসে—অথচ ছোট্ট সংসারের একঘেয়ে জীবনে মন টেঁকে না। হরিনাথ অন্যের পয়সায় মদ খায়—সুখেনকে অপছন্দ করার যথেষ্ট কারণ আছে তার। নিজের চরিত্রের বিপরীত ধরনের লোক দেখলেই অনেকের রাগ হয়। চৌকিদার রামদাস—

আমি মুখ তুলে বললাম, 'কর্নেল সেন, আমার আরও দু-একটা ব্যাপার জেনে নেওয়ার আছে। চৌকিদার রামদাস কি বিবাহিত? আপনি পরে নিশ্চয়ই খবর পেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। চৌকিদারের বউ মারা গিয়েছিল অনেক দিন আগে। সে একা থাকত।'

'কিন্তু আপনি যখন তার ঘরের দরজা ঠেলে ছিলেন, তখন দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।'

'তাই ছিল।'

'অর্থাৎ ঘরের মধ্যে কেউ লুকিয়ে ছিল। আপনি সে সময়ে ও ব্যাপারে মনোযোগ দেননি। আর একটা কথা। এই গল্পের মধ্যে ডাকবাংলোটার বেশ অনেকখানি ভূমিকা আছে। কেননা, সুখেন, করবী আর সূরযলাল এরা স্থানীয় লোক—ডাকবাংলো ব্যবহার করে বাইরে থেকে যারা আসে। তা ছাড়া সুখেন, করবী আর সূরযলাল এরা থাকে কাছাকাছি বাড়িতে। সুখেন যদি ট্যুরের নাম করে অন্য কোথাও গিয়ে থাকে, তাহলে তার বাড়িতে এসব ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। তবু, ডাকবাংলোটার ভূমিকা আমি আন্দাজ করতে পারি। কারণ আমি ওই ধরনের বাংলোতে অনেক বার থেকেছি। রঞ্জনেরও অভিজ্ঞতা আছে। আচ্ছা, সুখেন রায় যে বাড়িটাতে থাকত সেই বাড়িটা, আপনি বলেছেন, খুব ভালো নয়। ঠিক কীরকম? বৃষ্টি হলে ছাদ থেকে জল পড়তে পারে?'

কর্নেল সেন হেসে বললেন, 'তুমি ঠিক লাইনেই এগোচ্ছ। হ্যাঁ, সুখেনের বাড়িটা ওইরকমই।'

কর্নেল সেনের কাছে প্রশ্ন করে আমি আরও কয়েকটা তথ্য জেনে নিলাম।

তারপর আর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি পটভূমিটা মনে-মনে ছকে নিলাম। আস্তে-আস্তে চরিত্রগুলো আমার চোখের সামনে নড়াচড়া করতে লাগল। গল্প-উপন্যাস লেখার সময় আমি চরিত্রগুলোকে যেমন রক্তমাংসের চেহারায় কিছুক্ষণ দেখে নিই, তাদের সঙ্গে কথা বলি—এখানে সুখেন, করবী, সূরযলাল, রামদাস প্রভৃতির সঙ্গে আমার একে-একে পরিচয় হল, আমি যেন চেনাশুনা লোকদের মতনই ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মুখ তুলে এবার কর্নেল সেনের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'দেখুন, সেই সন্ধ্যাবেলার দৃশ্যটা আমি ফুটিয়ে তুলতে পারি। কিন্তু তাতে এই রহস্য-কাহিনির কোনও সমাধান হবে কিনা জানি না!'

মাধবী বলল, 'ঠিক আছে, আগে শুনেই দেখি না।'

আমি শুরু করলাম।

'বিহারের ওই ধরনের ছোটখাটো শহরে শীতকালে যারা থেকেছে, তারাই বুঝতে পারবে কীরকম দুর্দান্ত শীত পড়ে, ড্রাই কোল্ড যাকে বলে। হাড় কনকনিয়ে দেয়। যে সময় ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটা যদিও নভেম্বর মাস, খুব বেশি শীত পড়ার কথা নয়। কিন্তু বৃষ্টি পড়লে ওসব জায়গায় নভেম্বরেও খুব শীত লাগতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। সেইসঙ্গে কনকনে হাওয়া। কর্নেল সেন, আপনিই বলেছেন যে পরের দিন আপনি যখন ডাকবাংলোতে গিয়েছিলেন, তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সুতরাং তার আগের দিনও বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। মোট কথা, আমি ধরেই নিচ্ছি যে বৃষ্টি পড়ছিল সেই সন্ধ্যাবেলা—তাতে আমার গল্পের সুবিধে হয়।'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরুন না, কে আপত্তি করছে?'

'সুখেন তার বসবার ঘরের চৌকিতে শরীর এলিয়ে বই পড়ছে। এইসব ছোটখাটো জায়গায় সন্ধ্যার পর আর কেউই থাকে না। বৃষ্টির জন্য সেদিন আর কেউ আড্ডা দিতেও আসবে না।

করবী এ-ঘরে ও-ঘরে একবার যাচ্ছে আর একবার আসছে। কখনও একটু বসছে সুখেনের পাশে, আবার উঠে যাচ্ছে ভেতরে। তার কোনও কাজ নেই। সন্ধ্যাটা আর কাটতেই চায় না। দুজন

মানুষের রান্না, তাও কখন শেষ হয়ে গেছে। সুখেনের মতন তার বই পড়ার অত নেশা নেই।

করবী একবার বসবার ঘরে ঢুকে সুখেনকে বলল, 'এখন খেয়ে নেবে?'

সুখেন বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'এক্ষুনি? ক'টা বাজে?'

টেবিলের ওপর রাখা হাতঘড়িটা দেখে বলল, 'মাত্র সাতটা। এর মধ্যেই খেয়ে নেব!'

সুখেনের মুখটা শুকনো। সেদিন তাকে খানিকটা মনমরা দেখাচ্ছিল। এক হাতে বই, এক হাতে সিগারেট—মাঝে-মাঝেই সে অন্যমনস্ক হয়ে তাকাচ্ছিল বাইরের দিকে। অফিস থেকে পাটনা যাওয়ার জন্য ছুটি নিয়েছে, অথচ পাটনায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার।

করবী বলল, 'হ্যাঁ তাড়াতাড়ি খেয়েই নাও। আমি আজ রাত্তিরে এখানে থাকব না।'

সুখেন বলল, 'আজ আবার বেরোবে? আজ থাক না—'

করবী বলল, 'না, আজ আমার এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি!'

সুখেন বলল, 'আজ রাত্তিরে আর বেরিয়ে কাজ নেই। কালকে বরং তুমিও আমার সঙ্গে চলো পাটনায়।'

'সে কালকের কথা কালকে। আজ রাত্তিরে আমার একটু থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে। তোমাকে কত করে বলছি, আর একটা বাড়ি দেখো।'

'আজকের রাতটা অন্তত...'

করবী বলল, 'না, চলো। বৃষ্টি পড়ছে, বেশি জোরে বৃষ্টি নামলে আবার আজ ছাদ থেকে জল পড়বে।'

'আজ আমার শরীরটা ভালো নেই, গা ম্যাজম্যাজ করছে—আবার গাড়ি চালাতে হবে।'

'কী হয়েছে কী! জ্বর হয়েছে নাকি?'

করবী স্বামীর কপালে হাত রাখল। তারপর বলল, 'জ্বর তো নেই। চলো, ওখানে গিয়ে আরাম করে শোয়া যাবে। এই শীতের মধ্যে—'

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। সামান্য দু-একটি টুকিটাকি জিনিস সঙ্গে নিল শুধু। বিছানাপত্তর ডাকবাংলোতেই সব আছে। মাঝে-মাঝেই ওরা বাড়ি ছেড়ে ডাকবাংলোয় এসে থাকে। ওদের নিজের বাড়ির থেকে ডাকবাংলোয় থাকা অনেক বেশি আরামপ্রদ, বিশেষত শীতকালে।

নির্জন জায়গায় ডাকবাংলোগুলোতে এসব ব্যাপার খুব স্বাভাবিক। বাইরের লোকজন যেখানে কম আসে, সেখানে স্থানীয় সরকারি অফিসের কোনও কর্মচারীই পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে যায়। একটা ঘর শুধু খালি থাকে। এইসব বাংলো আবার অনেক সময় অসামাজিক লোকদেরও আড্ডা হয়। চৌকিদারকে বকশিশ দিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে তারা সন্ধ্যার পর এসে আড্ডা জমায়, মদ্যপান করে, মেয়েদের নিয়ে অবৈধ কাণ্ডকারখানার পক্ষেও বেশ সুবিধাজনক জায়গা। আমাদের গল্পের এই বাংলোটা সেই ধরনের।'

রঞ্জন ফস করে জিগ্যেস করল, 'তুই কী করে বুঝলি যে সেই বাংলোটা এই ধরনের? তুই কি সেখানে গেছিস? বাংলোটা কোন জায়গায় তার নামই তো আমরা কেউ জানি না।'

আমি বললাম, 'আমি সে বাংলোতে যাইনি বটে। কিন্তু সবকিছু শুনে মনে হচ্ছে বাংলোটা এই ধরনেরই। এরকম অনেক বাংলো আমি দেখেছি—সেখানে স্থানীয় কোনও সরকারি কর্মচারী নিজের কোয়ার্টার বানিয়ে নিয়েছে একেবারে।'

কর্নেল সেন বললেন, 'সুনীলকে বাধা দিয়ো না। আমার মনে হচ্ছে, সুনীল ঠিক রাস্তাতেই এগোচ্ছে। এ পর্যন্ত যা বলেছে, তা মিলে যাচ্ছে, তুমি বলে যাও।'

'করবী আর সুখেন যখন পৌঁছাল, তখন সেই বাংলোয় আগে থেকেই আরও লোক এসে রয়েছে। সাধারণত, বাংলোতে যদি অন্য লোক এসে যায়, তাহলে আর করবীরা সেখানে সেদিন

থাকে না। ফিরে যায়। এতটা এসে আবার ফিরে যেতে হবে বলে সুখেন বিরক্ত হয়ে উঠছিল, এমন সময় দেখতে পেল, যারা এসেছে, তারা ওদের চেনা লোক। ওদের চেনা সূরযলাল আর হরিনাথ মদের বোতল নিয়ে আড্ডা জমিয়েছে। সূরযলালের বাড়িতে ওসব চলে না, তাই সে ডাকবাংলোতে আসে মাঝে-মাঝে। চৌকিদার রামদাস তাদের খাবারটাবার বানিয়ে দেয়—সূরযলাল কথায়-কথায় বকশিশ দেয় পাঁচ টাকা-দশ টাকা।

সুখেন আর করবীকে দেখে সূরযলাল হইহই করে উঠল। এমন ভাবে সে আপ্যায়ন করতে লাগল যেন বাংলোটা তার নিজের। হাত বাড়িয়ে বলল, 'আইয়ে ভাবীজি, আইয়ে সুখেনদাদা—আজ কত সৌভাগ্য আমাদের যে আপনারা এসেছেন—'

সুখেন বলল, 'আমরা এসে ডিসটার্ব করলাম না তো?'

'কী যে বলেন!'

সুখেন নম্র ধরনের মানুষ। সে ইচ্ছে করলে চৌকিদারকে হুকুম দিয়ে বাংলোতে এই ধরনের লোকদের আসা বন্ধ করে দিতে পারে। তার বদলে সে নিজেই সংকুচিত হয়ে রইল।

একটা চেয়ারে আরাম করে বসে, আর একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়েছে সূরযলাল। ছোট টেবিলে দুটি মদের বোতল ও কয়েকটি গেলাস। হরিনাথ ঠিক অনুগত ভৃত্যের মতন সূরযলালকে গেলাসে মদ ঢেলে দিচ্ছে, জল মেশাচ্ছে। হরিনাথ নিজেই খেয়ে ফেলেছে অনেকটা। সে সুখেন আর করবীকে দেখে বলল, 'এই যে, দাদা আর বউদিও এসে গেছেন! তাহলে জমবে ভালো আজ!'

করবী ওদের সঙ্গে একটাও কথা বলল না। চলে এল তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে! ভুরু কুঁচকে স্বামীকে বলল, 'ওরা আবার এখানে কেন? ওদের চলে যেতে বলো।'

করবী বেশ গলা উঁচু করেই কথা বলেছিল। সুখেন ফিসফিস করে বলল, 'এই আস্তে যাঃ, তা কি বলা যায়! থাক না!'

করবী বিরক্ত হয়ে বলল, 'ধ্যাৎ! ভালো লাগে না! এখানে একটু নিরিবিলিতে ঘুমোতে এসেছি—তার মধ্যে আবার জ্বালাতন! ওরা সারা রাত হইহল্লা করবে।'

'না, না, সারা রাত থাকবে না! খানিকটা বাদে চলে যাবে নিশ্চয়ই!'

'মোটেই যাবে না! দেখো তুমি।'

এর আগেও দু-এক বার সুখেন আর করবী ডাকবাংলোতে এসে সূরযলালদের দেখতে পেয়েছে। তবে, আগে যখন আলাপ পরিচয় ততটা বেশি ছিল না, তখন সূরযলাল সুখেনকে খানিকটা সমীহ করত। ওরা এলে ডাকবাংলো ছেড়ে চলে যেত তাড়াতাড়ি। মাসখানেক আগে এক রাত্রে ওরা রাত তিনটে পর্যন্ত ছিল—শেষপর্যন্ত সুখেনই ওদের জিপে পৌঁছে দিয়ে আসে।

করবী বলল, 'তুমি কিন্তু আজ ওদের পৌঁছে দিয়ে আসতে যাবে না কিছুতেই। একা-একা থাকতে আমার ভয় করে। ওদের বলো তাড়াতাড়ি চলে যেতে—এখন বেশি রাত হয়নি, হেঁটেই চলে যেতে পারবে।'

করবী বেশ রেগে গেছে। সুখেন তার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করল। সুখেনের ভদ্রতাবোধ আছে। সে মুখ ফুটে ওদের চলে যেতে বলতে পারবে না।

দরজার বাইরে থেকে সূরযলাল বলল, 'এই সুখেনদাদা, আসুন একটু গপসপ করি। এক্ষুনি কি নিদ যাবে নাকি?'

সুখেন করবীকে বলল, 'একটু বাইরে গিয়ে ওদের সঙ্গে বসা যাক। মোটে তো সাড়ে আটটা বাজে।'

করবী বলল, 'তুমি যাও। আমার ভালো লাগছে না।'

সুখেন বাইরের বারান্দায় ওদের সঙ্গে এসে বসল। কয়েকখানা চেয়ার বাইরে বার করা হয়েছে। ইচ্ছে করেই আলো জ্বালেনি। বৃষ্টি পড়ছে অশ্রান্ত ভাবে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। চাদরমুড়ি

দিয়ে চেয়ারে পা গুটিয়ে বসতে বেশ আরাম লাগে।

সুরযলাল মদের বোতল দেখিয়ে বলল, 'দাদা, একটু খাবেন নাকি?'

সুখেন বলল, 'না ভাই, আমি ওসব খাই না। আমার ভালো লাগে না।'

হরিনাথ এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার হেসে উঠে বলল, 'না খেলে বুঝলেন কী করে যে ভালো লাগে না। আগে খেয়ে দেখুন। তবে তো বুঝবেন।'

সুখেন বলল, 'না, তার দরকার নেই।'

হরিনাথ নিজের গেলাসের সবটুকু মদ ঢক করে শেষ করে দিয়ে বলল, 'ওফ্, গলা জ্বলে গেল! মাইরি সুখেনদা, এ-জিনিস খেলে যেমন কষ্ট, না খেলেও সেরকম কষ্ট। তবে, বুঝলেন, খেয়ে কষ্ট পাওয়াটাই বেটার! আর সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।'

সুখেন জিগ্যেস করল, 'হরিনাথ তুমি কোথা থেকে এসব খাওয়া শিখলে?'

হরিনাথ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'এসব কি কাউকে শেখাতে হয়? ভালোবাসা কি কাউকে শেখাতে হয়? মানুষ আপনি-আপনি ভালোবাসে।'

'আমি তো আপনি-আপনি শিখলাম না!'

'আপনি চেষ্টা করলেন না তা শিখবেন কী। মেয়েমানুষ ছাড়া যেমন ভালোবাসা জমে না।'

সূরযলাল ততক্ষণে আর একটা গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে জল মিশিয়ে বলল, 'নিন দাদা, একটু চেখে দেখুন! ভাবীজি রাগ করবেন বলে ভয় পাচ্ছেন? হা—হা—'

'না, না, তার জন্য নয়।'

'ভাবীজির কাছে পারমিশান সিক করে লিন।'

'ও কিছু বলবে না। এমনিই আমি খাব না—'

সুখেন আড়চোখে তার ঘরের জানলার দিকে তাকাল। জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে। করবী শুয়ে পড়েনি, বোঝাই যায়। ঘরের মধ্যে তার চলাফেরার খুটখাট শব্দ। সুখেন মনে-মনে শঙ্কিত হল, করবী বোধহয় খুব রেগে যাচ্ছে। তারা এসেছিল এখানে নিরিবিলিতে শান্তিতে ঘুমোতে। তা ছাড়া সুখেনের নিজেরই আজ শরীরটা ভালো নয়—তারই ইচ্ছে করছিল শুয়ে পড়তে। কিন্তু এরা বাইরে বসে থাকলে কি আর হঠাৎ উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমোনো যায়!

সামনে একটা প্লেটে শুকনো করে ভাজা মুরগির মাংস জমা আছে। সূরযলাল নিজের বাড়িতে মাংস খেতে পারে না বলে ডাকবাংলোতে এসে খায়। প্লেটটা সুখেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এক টুকরো মাংস মুখে দিন। তারপর গেলাসে একটু চুমুক দিন, দেখবেন কীরকম ভালো লাগে। গ্যারান্টি দিচ্ছি!'

সুখেন হাত দিয়ে গেলাসটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'না ভাই, তোমরা খাও না! তোমরা আনন্দ করছ, তাতে তো আমি বাধা দিচ্ছি না! আমাকে এর মধ্যে জড়ানো কেন? আমি গরিব লোক, আমার এসব বড়লোকি নেশা কি পোষায়?'

সূরযলাল থতমত খেয়ে গেলাস সরিয়ে নিয়ে বলল, 'থাক! তবে থাক। আমি কি আপনাকে জুলুম করছি! আমি বলছিলাম কী, লাইফ তো খুব শর্ট, এর ভিতরে একটু ফূর্তি মজা যদি না করা যায়।'

সুখেন গরিব-বড়লোকের কথাটা তোলায় হরিনাথের খোঁচা লেগেছে। সে সরু চোখে সুখেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কেন খাবেন না তা আমি জানি। পেটে-পেটে ইচ্ছে থাকলেও—'

সূরযলাল বলল, 'কেন-কেন?'

হরিনাথ ব্যঙ্গ করে বলল, 'ও খাবে না। বউয়ের ভয় পাচ্ছে। আমাদের তো বউ নেই—'

এই ধরনের খোঁচা মারলে মানুষের পৌরুষে লাগে। সুখেন দুর্বল ধরনের পুরুষ। তা ছাড়া

হরিনাথ তার দুর্বল জায়গাতেই খোঁচা মেরেছে। সুখেন সত্যিই করবীকে বেশ ভয় পায়। আজ করবী রেগে আছে বলে সে এমনিতেই মনে-মনে অস্থির। তবু বউয়ের নামে খোঁচা মারলে অনেক পুরুষই হঠাৎ সাহসী হয়ে যায়। গেলাসটা তুলে নিয়ে অবহেলার সঙ্গে বলল, 'খাওয়ার মধ্যে কী আছে? খেলেই হয়। কিন্তু আমার এসব ভালো লাগে না—'

হরিনাথ বলল, 'একটু টেস্ট করেই দেখুন না ভালো লাগে কি না!'

সুখেন গেলাসটা তুলে একসঙ্গে সমস্ত মদ গলায় ঢেলে দিল। বিষম খেল সঙ্গে-সঙ্গে।

সূরযলাল ব্যস্ত হয়ে হা-হা করে উঠল। বলল, 'করলেন কী, করলেন কী! সবটা একসঙ্গে —আপনি নতুন—'

সুখেন দুর্বলতা ঢাকবার জন্য বলল, 'আমার কিছু হয়নি। এমনি বিষম খেয়েছি।'

সূরযলাল বলল, 'এ-জিনিস আস্তে-আস্তে খেতে হয়। পানি কা মাফিক ঢকঢক করে আপনি মেরে দিলেন।'

সুখেন বলল, 'খেলাম তো। কিছু তো হল না আমার! তোমরা এসব খেয়ে কী আনন্দ পাও?'

সুখেনের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। সে নিজেও আগে কল্পনাই করতে পারেনি যে সামান্য একগেলাস পানীয়র এতখানি তেজ। রীতিমতো ভয় ধরে গেছে তার, কিন্তু কিছুতে সেটা ওদের সামনে প্রকাশ করবে না। বারবার সে ফাঁকা অহংকার দেখিয়ে বলতে লাগল, এসব খেলে তার কিছু হয় না। এসব জিনিসের জন্য টাকা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। ইচ্ছে হলে সে এক বোতলও খেয়ে ফেলতে পারে। এসব খাওয়ার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই।

হরিনাথ বলল, 'এই তো দাদা, বেশ কল্‌জের জোর আছে। তাহলে আগে খাব না খাব না করছিলেন কেন?'

'সত্যি, আমি আগে কখনও খাইনি।'

'আর একটু খান।'

'না, আর দরকার নেই।'

'খান না। এই সূরযলাল দাও, দাদাকে দাও।'

সূরযলাল আবার ঢেলে দিয়ে বলল, 'নিন, সঙ্গে একটু মাংস খেয়ে নিন। মাংস না খেলে লিভার ঠিক থাকে না।'

হরিনাথ বলল, 'একটু-একটু মাংস চাখবেন আর গেলাসে একটু-একটু চুমুক দেবেন। ও রকম গোঁয়ারের মতন কেউ এক ঢোকে খায়! আস্তে-আস্তে খেলে জিনিসটার স্বাদ পাবেন ঠিক।'

'আমি আর খাব না। '

'এই যে বললেন, ইচ্ছে করলে এক বোতল খেয়ে ফেলতে পারেন? আর এক পেগেই হয়ে গেল! আপনার কিছু নেশা হয়েছে বলুন?'

'কিছু হয়নি।'

'তাহলে আর ওটুকু খেয়ে কী ভালো হল? আর একটা খান।'

এইভাবে সুখেন তিন-চার গেলাস খেয়ে ফেলল। এবং ক্রমাগত বলতে লাগল, 'আমার কিছু হয়নি! আমার কিছু হয়নি!' হরিনাথ মিটিমিটি হাসছে। এই হরিনাথ ধরনের লোকরা অন্যদের নেশা ধরিয়ে দিয়ে বেকায়দায় ফেলে খুব আনন্দ পায়। সে কথার মার প্যাঁচে সুখেনকে ক্রমাগত খাইয়ে যেতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর করবী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ক্রুদ্ধ গলায় স্বামীকে বলল, 'তোমরা এখানে বসে-বসে গল্প করবে, আর আমি একা ঘরে শুয়ে থাকব? এবার চলে এসো— অনেক রাত হয়েছে।'

সূরযলাল হাসতে-হাসতে বলল, 'ভাবীজি, আপনার কি ঘরের মধ্যে ভয় করছে নাকি?

আপনাদের বাংলাতে যাকে বলে ব্রহ্মদৈত্য—এখানে সেই একটা ব্রহ্মদৈত্য আছে কিন্তু।'

করবী সুরযলালের কথা গ্রাহ্য না করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কী, তুমি বসে-বসে এইসব ছাইভস্ম খাচ্ছ!'

সুখেন জড়িত গলায় বলল, 'একটুখানি শুধু টেস্ট করেছি। কিন্তু আমার কিছু হয়নি। কিছু যে খেয়েছি—তা টেরই পাচ্ছি না। কেন যে ওরা এইসব খেয়ে পয়সা নষ্ট করে!'

'বুঝেছি! আর খেতে হবে না, তুমি এবার ওঠো।'

'কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ আমি মাতাল হয়ে যাব? হাঃ—হাঃ—হাঃ? অত সহজ নয়! তুমি কিছু বুঝতে পারছ? আমি নর্মাল, কমপ্লিটলি নর্মাল।'

'ঠিক আছে, তোমার কিছু হয়নি। কিন্তু এখানে আর কত রাত পর্যন্ত বসে থাকবে?'

'কেন, তোমার ঘুম পাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি একলা-একলা ঘুমিয়ে পড়ো! আমি একটু বাদে যাচ্ছি।'

'একলা-একলা ওই ঘরে থাকতে আমার বুঝি ভালো লাগে?'

'তাহলে তুমি এখানেই একটু বোসো!'

'না! তুমি ওঠো বলছি!'

সুরযলাল বলল, 'ভাবীজি এত রাগারাগি করছেন কেন? বসুন না। আপনিও একটু বসুন না।'

হরিনাথও বলল, 'বসুন বউদি, একটু বসুন। আমরা তো আর খানিকটা বাদে চলে যাব।'

ওদের অনুরোধে করবী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসল। সুরযলাল তার দিকে মুরগির প্লেটটা বাড়িয়ে দিল—করবী সেটা ছুঁয়েও দেখল না।

সুরযলাল সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। ওদের বংশে কেউ কখনও মদ তো দূরের কথা মাছমাংসও ছোঁয়নি। সুরযলাল এর মধ্যে ওর সবক'টারই ভক্ত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে হরিনাথ তার প্রধান শাগরেদ। সুরযলালের আত্মীয়স্বজনরা বলে যে বাঙালিদের সঙ্গে মিলেমিশেই তার এই অধঃপতন।

হরিনাথ বলল, 'বউদি, আপনার স্বামীটি কিন্তু বেশ খেতে পারে। ঢকঢক করে মেরে দিল কীরকম! আপনিও একটু খাবেন নাকি!'

করবী বলল, 'ছিঃ!'

করবীর সেই ছিঃ বলার মধ্যে এমন একটা দর্প এবং অবহেলা ছিল যে কেউ আর অনুরোধ করতে সাহস পেল না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। করবী আসার পর সব গল্প থেমে গেছে। সুরযলাল আর হরিনাথ খেয়ে যাচ্ছে, সুখেনের গেলাস খালি। হরিনাথ বলল, 'দাদা আর একটু নেবেন নাকি?'

সুখেন করবীর দিকে চেয়ে বলল, 'থাক, আর না!'

করবী সুখেনের দিকে প্রখর চোখে তাকিয়ে আছে। মুখে কিছু বলল না। সুখেন অপরাধীর মতন একটু হাসল।

সুরযলাল গেলাসে ঢেলে দিয়ে বলল, 'নিন আর একটু নিন। ভাবীজি কিছু বলবেন না!'

সুখেন গেলাসটা তুলে নিয়ে বলল, 'আর খেয়েই বা কী হবে? এত খেয়েও তো কিচ্ছু হচ্ছে না! তোমরা ভেবেছিলে আমি এক চুমুক দিয়েই বেহেড হয়ে যাব।'

হরিনাথ হাসতে-হাসতে বলল, 'সত্যি দাদার কলজের জোর আছে।'

এই সময়ে দূরে কিছু লোকের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ওরা সতর্ক হয়ে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে-ভিজতে চার-পাঁচ জন লোক হেঁটে আসছে

বাংলোর কম্পাউন্ড দিয়ে।

সূরযলাল চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'কে?'

কোনও উত্তর নেই।

গেলাস নামিয়ে রেখে ওরা সবাই তাকিয়ে রইল লোকগুলোর দিকে। ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

সূরযলাল গলা চড়িয়ে আবার জিগ্যেস করল, 'কৌন হ্যায়?'

এবারও সাড়া না পেয়ে সূরযলাল পকেট থেকে রিভলভার বার করল। রাতবিরেতে কোথাও বেরোলে এটা সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। রিভলভারটা হাতে নিয়ে সূরযলাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুম লোগ কৌন হ্যায়? খাড়া হো যাও! মত আও ইধার!'

লোকগুলো থমকে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে উত্তর দিল এবার। ওরা নিরীহ গ্রামের লোক। শর্টকাট করার জন্য বাংলোর কম্পাউন্ড দিয়ে যায়। ওদের অন্যায় হয়ে গেছে, বাবুরা আছে জানলে আসত না!

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর হরিনাথ হেসে বলল, 'তুমি একেবারে বন্দুক বার করে ফেললে ওদের দেখে?'

সূরযলাল বলল, 'বিশ্বাস নেই! চোর-ডাকাতের তো কমতি নেই।

'সুখেন রিভলভারটা হাতে নিয়ে বললে, 'দেখি তো! গুলি ভরা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'এটা তো অনেক পুরোনো কালের জিনিস দেখছি।'

'আমার পিতাজির ছিল।'

'তোমার টিপ কীরকম? কখনও ছুড়েছ এটা?'

'না দাদা, আভিতক কোনও মানুষের দিকে ছুড়তে হয়নি। শুধু ভয় দেখালেই হয়!'

'পাখিটাখি শিকার করেছ তো? নাকি তাও করোনি?'

সূরযলাল বলল, 'দাদার তো বন্দুক-পিস্তল সম্বন্ধে বহুত জ্ঞান দেখছি। রিভলভার দিয়ে কি কেউ পাখি শিকার করে? বাড়িতে আমার আর একটা শট গান আছে। চলুন, আপনাকে একদিন শিকারে নিয়ে যাব। আপনি মারতে পারবেন তো?'

সুখেন বললে, 'আমি কোনওদিন বন্দুক-পিস্তল হাতে ছুঁয়েই দেখিনি এর আগে। তোমারটাই প্রথম হাতে নিলাম।'

করবী বলল, 'ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে না। রেখে দাও। হঠাৎ গুলিটুলি যদি বেরিয়ে যায়—'

সূরযলাল বললে, 'না হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যাবে না। সেফটি ক্যাচ তোলা আছে। এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

রিভলভারটা হঠাৎ নামিয়ে রেখে সুখেন হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। একটা হেঁচকি তুলে বলল, 'এ কী, আমার মাথা ঘুরছে কেন?'

সূরযলাল বলল, 'আপনার তাহলে বেশি হয়ে গেছে। আর খাবেন না।'

সুখেন উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল, করবী তাড়াতাড়ি তাকে ধরল। সুখেনের চোখদুটো সম্পূর্ণ লাল, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্তের মতন। আস্তে-আস্তে বলল, 'করবী, আমার মাথা ঘুরছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না।'

করবী ধমক দিয়ে বলল, 'কেন ওসব খেতে যাও? এমনিতেই তোমার শরীর খারাপ—'

'ওরা যে বলল।'

'ওরা বললেই তুমি খাবে?'

'আমি এতক্ষণ খাচ্ছিলুম, কিন্তু টের পাইনি!'

'চলো, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে চলো।'

'আমার ভীষণ গরম লাগছে।'

'এত শীতের মধ্যে তোমার গরম লাগছে? জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দেব?'

সুরযলাল খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। সে উঠে এসে বলল, 'না, না, ভাবীজি, এখন পানি লাগালে অচানক ঠান্ডা লেগে যাবে। আপনি ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিন। সুখেনদাদা, ভয় পাবেন না। থোড়া বাদ সব ঠিক হয়ে যাবে। এরকম সবারই এক-এক দিন হয়।'

সুখেন অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'আমার এতক্ষণ কিছু হয়নি, হঠাৎ এরকম হল কেন? শেষ গেলাসটায় কিছু মিশিয়ে দিয়েছ নাকি?'

সুরযলাল অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কী মিশিয়ে দেব?'

হরিনাথ বলল, 'তখনই বুঝেছি। যেরকম ঢকঢক করে খাচ্ছিলেন—'

সুখেন তবু বলল, 'কিন্তু এতক্ষণ আমার কিছু হয়নি! হঠাৎ এরকম হল কেন? নিশ্চয়ই এবার আলাদা কিছু ছিল।'

সুরযলাল বলল, 'কারওর-কারওর এরকম হঠাৎই হয়।'

করবী বলল, 'এতক্ষণ তোমার কিছু হয়নি মানে কী? তোমার কথা জড়িয়ে গিয়েছিল।'

'মোটেই না।'

'ঠিক আছে। তুমি এখন ঘরে চলো!'

'আমাকে ওরা কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। ওদের কিছু হল না, শুধু আমারই—একা এরকম হল কেন? আমার গা গুলোচ্ছে, অসম্ভব গুলোচ্ছে—'

সুরযলাল কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'দাদা আমাদের নামে মিথ্যে দোষ দিচ্ছেন। আপনাকে বললাম, আস্তে-আস্তে খেতে—'

সুখেন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'আস্তে-আস্তেই তো খেয়েছি! আগেরগুলোতে আমাকে শুধু জল দিয়েছ। আমি খেয়েই বুঝেছি স্রেফ জল। কিন্তু শেষবারটায়, ওঃ, গলা জ্বলে যাচ্ছে—কী দিয়েছিলে বলো! বিষ খাইয়েছ আমাকে!'

'আপনি কী বলছেন? যান গিয়ে একটু শুয়ে পড়ুন, সব ঠিক হয়ে যাবে!'

'চোপ! আমি সব জানি!'

করবী জোর করেই স্বামীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। শুইয়ে দিল খাটে। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল মুখ। খাটে শুয়ে-শুয়েই মাটির দিকে মুখ নীচু করে বমি করল সুখেন। সে সব পরিষ্কার করল করবী।

তারপর বলল, 'আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়ো।'

সুখেন চিৎকার করে বললে, 'না ঘুমোব না! ওরা আমাকে কী খাইয়ে দিয়েছে? বলো! বলো!'

করবী বলল, 'তুমি খেতে গেলে কেন? তুমি কি কচি খোকা? তোমাকে জোর করে খাওয়াতে পারত কেউ?'

'তা বলে যা-তা কিছু একটা খাইয়ে দেবে?'

'চুপ। আস্তে কথা বলো।'

'কেন, আমি আস্তে কথা বলব কেন? আমি কি কাউকে ভয় করি?'

'সেকথা হচ্ছে না। এখন না ঘুমোলে তোমারই আরও শরীর খারাপ হবে।'

'আমার শরীর খারাপের জন্য তুমি তো ভারী কেয়ার করো! আমাকে ওরা বিষ খাইয়ে দিল, তুমি কিছু বলতে পারলে না?'

'আমি তোমাকে ওসব ছাইভস্ম খেতে বারণ করিনি?'

'কোথায় বারণ করলে? শেষ গেলাসটা খাওয়ার আগে আমি তোমার চোখের দিকে তাকালাম। তখন তুমি আমাকে বারণ করতে পারতে না?'

'করিনি?'

'না, করোনি! তুমি দেখছিলে, আমি খাই কিনা! সেইজন্যই তো আমি খেলাম?'

'তুমি খুব বুঝেছ তাহলে।'

সুখেনের কথাবার্তা অন্যরকম হয়ে গেছে। কোনওদিন সে করবীকে ধমকায় না, তার নামে স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ জানায় না। আজ সে বেপরোয়া। চোখদুটো লাল। হেঁচকি ওঠা এখনও বন্ধ হয়নি।

করবীর হাতটা চেপে ধরে সুখেন আস্তে-আস্তে দৃঢ় গলায় বলল, 'সত্যি করে বলো তো, সুরযলাল এখানে যে আজ থাকবে. তুমি আগে থেকেই জানতে, না?'

'বাঃ, আমি তা জানব কী করে?'

'নিশ্চয়ই জানতে! সেই জন্যই আজ এখানে আসার জন্য তোমার এত গরজ!'

'কী যা তা বলছ। গরজের আবার কী আছে। বৃষ্টি পড়লেই তো এখানে আসি।'

'আজ আমার শরীর খারাপ, আসতে চাইনি—তাও তুমি জোর করে—'

'শরীর খারাপ নিয়েও তুমি ওইসব খেলে? তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

'আমি না খেতে চাইলেও ওরা আমাকে জোর করে খাওয়াত!'

'আজেবাজে কথা বোলো না। এখন ঘুমোও।'

'আমি আজেবাজে কথা বলছি? আমি সব বুঝি! সুরযলাল যে এখানে আসবে, তা তুমি খুব ভালো করেই জানতে। তাই তুমি জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ। আমি জানি, আমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভালো লাগে না। আমি জেগে থাকলে তোমাদের অসুবিধে হবে—তাই আমাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে—'

'আমি তো এসেই ওদের দেখে বলেছিলাম, তুমি ওদের চলে যেতে বলে দাও! তখন বললে না কেন?'

'আমি বললেও ওরা শুনত না। তুমি ওদের আসতে বলেছ—আমার কথা ওরা শুনবে কেন! আমার কথা কেউ শোনে না! আমায় কেউ ভালোবাসে না!'

'আচ্ছা পাগলামি করছ তো আজ। আমি এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি এসব কিছু জানতাম না—এবার তোমার বিশ্বাস হবে?'

সুখেন হঠাৎ হু-হু করে কাঁদতে আরম্ভ করল। অবোধ শিশুর মতন বারবার বলতে লাগল, 'আমি জানি, তুমি আমাকে ভালোবাসো না। তুমি আমাকে ভালোবাসো না।'

করবী ধৈর্য ধরে ভিজে তোয়ালে দিয়ে আবার মুখ মুছিয়ে দিল সুখেনের। তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। অস্ফুট গলায় বলল, 'শোনো, তাকাও আমার চোখের দিকে। কিছু দেখতে পাচ্ছ না! বুঝতে পারো না, আমি তোমায় সত্যিই ভালোবাসি?'

'সত্যি-সত্যি বলছ?'

'তিন সত্যি করব?'

'আমার গা ছুঁয়ে বলো।'

'এই তো গা ছুঁয়ে বলছি।'

'না, পুরোটা বলো। আমার বুকে হাত ছুঁইয়ে রেখে বলো, আমি তোমায় ভালোবাসি। যদি মিথ্যে কথা বলো, তাহলে আমি মরে যাব।'

'এই যে বলছি, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

করবীর হাতখানা বুকে চেপে রেখে সুখেন আবার কাঁদতে লাগল।'

গল্প থামিয়ে আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মেয়েদের মন বোঝা খুব শক্ত। হয়তো করবী তার স্বামীর কাছে সত্যি কথাই বলেছিল। সে হয়তো সুরযলালের সঙ্গে আগে থেকে কোনও ষড়যন্ত্রই করেনি—সবটাই একটা গোলযোগ। করবী তার স্বামীকে ভালোবাসে—এবং দুশ্চরিত্রা—একইসঙ্গে এরকম দুটি ব্যাপার থাকা অস্বাভাবিক নয়।'

মাধবী বলল, 'তার মানে? এ আবার কী অদ্ভুত কথা?'

'এরকম অদ্ভুত মানুষও আছে। করবী তার স্বামীকে ভালোবাসত—যেরকম অধিকাংশ মেয়েই ভালোবাসে। কিন্তু করবীর জীবনটা তার সংসারের ওই ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখতেও পারেনি। সেই জন্যই সুরযলালের সঙ্গে—। তা ছাড়া, একটি মেয়ে কি একসঙ্গে একাধিক পুরুষকে ভালোবাসতে পারে না? মেয়েদের ভালোবাসা কি এত কম যে একজনকে দিয়েই ফুরিয়ে যাবে?'

'ওকে ভালোবাসা বলো না। ওর অন্য নাম আছে।'

'কী নাম?'

'তা আপনি ভালোরকমই জানেন!'

'তাহলে ভালোবাসা কাকে বলে—তা নিয়ে আগে আলোচনা করা দরকার।'

কর্নেল সেন বললেন, 'সেটা কিন্তু হবে অ্যাকাডেমিক আলোচনা, সেটা এ-গল্পের সঙ্গে খাপ খাবে না।'

রঞ্জন আমাকে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে আর গল্পের মধ্যে টীকাটিপ্পনী দিতে হবে না। শুধু গল্পটাই বলে যাও।'

আমি বললাম, 'সুখেনকে যে ওরা বিষ-টিস কিছু খাইয়েছে তা-ও মনে হয় না। প্রথম-প্রথম মদ খেতে গিয়ে লোকে হঠাৎ এইরকম ভাবে আউট হয়ে যায়।

সুখেন করবীর সঙ্গে আরও অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক মান-অভিমান করল। তারপর বলল, 'আমি আজ সারা রাত ঘুমোব না।'

করবী বলল, 'বেশ তো ঘুমিয়ো না।'

'দরজা-টরজা সব বন্ধ করে দাও!'

'দিচ্ছি।'

'আলো নিভিয়ে দাও। তুমি এসে শোও আমার পাশে।'

কিন্তু কোনও নেশাগ্রস্ত লোকের পক্ষে সারা রাত জেগে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষত বিছানায় শুয়ে-শুয়ে। করবী সুখেনের কথামতন আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সুখেনের পাশে। সুখেন তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আজ একটুও ঘুমোব না। সারা রাত গল্প করব।' কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুখেন ঘুমিয়ে পড়ল।

নেশাগ্রস্ত লোকেরা একবার ঘুমিয়ে পড়লে সাধারণত সারা রাতের মধ্যে আর জাগে না। সুখেনও যদি না জাগত, তাহলে সবকিছুই অন্য রকম হত। পরদিন সকালে আবার সবকিছুই স্বাভাবিক। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা সন্দেহ থেকে যেত মনের মধ্যে—কিন্তু মানুষের জীবনে তাতে বড় রকমের কোনও পরিবর্তন ঘটে না।

বাইরের বারান্দায় বসে হরিনাথ আর সুরযলাল আরও কিছুক্ষণ বসে খেল। ঘরের মধ্যে সুখেন আর করবীর সব কথাই তারা শুনতে পেয়েছে। সুরযলালের মুখখানা গম্ভীর। হরিনাথ কিন্তু বেশ খুশি-খুশি। অন্য কেউ অসুবিধেয় পড়লে তার বেশ আনন্দ হয়।

সুরযলাল ব্যাজার ভাবে বলল, 'কী ঝঞ্ঝাট রে বাবা! উনি খেলেন কেন? আমরা কি ওঁকে জোর করে খাওয়াতে গেছি?'

হরিনাথ বলল, 'এদিকে শালা কত বারফট্টাই। খেলেও আমার কিছু হয় না। এবার বোঝো, কিছু হয় কি না। আবার বলে কিনা আমরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছি! যত সব নভিসের কাণ্ড!'

'এই হরিয়া, তুই শালা ওকে বেশি-বেশি খাইয়েছিস?'

'মোটেই না! আমি নিজে কম খেয়ে অন্যকে বেশি দেব—আমি তেমন পাত্তর নই! শেষকালে নিজের মাল শর্ট পড়ে যাবে—'

'তাহলে হঠাৎ ওরকম আউট হয়ে গেল কেন?'

'কলজের জোর নেই, শুধু মুখে বড়-বড় কথা!'

'আজ আর জমবে না। চল, ঘর যাই।'

'এত রাত্তিরে ঘর যাব? রামদাস খাবার দিল না এখনও। খাবার-টাবার খাই, তারপর আর একটু মাল খাব।'

'আমার আর ভালো লাগছে না।'

একটু বাদে রামদাস এসে গরম-গরম মাংস আর রুটি দিয়ে গেল। সূরযলাল কিছুই খেল না প্রায়, হরিনাথ খেল চেটেপুটে। তারপর গেলাসে আবার মদ ঢেলে দুটো চুমুক দিয়ে বলল, 'আর পারছি না, পেট অ্যাইসা ভরে গেছে! চলো শুয়ে পড়া যাক।'

সূরযলাল কোনও উত্তর দিল না।

হরিনাথ বলল, 'চলো ওস্তাদ, এবার শুয়ে পড়ি? তুমি না যাও, আমি যাচ্ছি। তোমার ইচ্ছে হলে এসো!'

হরিনাথ চলে যাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে রইল একা। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত থমথমে। বৃষ্টি থেমে গেছে একটু আগে। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারল মলিন চাঁদ। তারপর একটি-দুটি তারা। হাওয়া দিচ্ছে বেশ জোরে। সূরযলাল গায়ের শালটা জড়িয়ে নিল ভালো করে।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে খুব ক্ষীণভাবে খুট করে শব্দ হল দরজা খোলার। সূরযলাল পেছন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। আবার একটা সিগারেট ধরাল। দরজা খুলে বাইরে এল করবী। হালকা পায়ে এগিয়ে এসে বসে পড়ল সূরযলালের পাশে। কোনও কথা বলল না, সূরযলালের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে টানল দু-একবার। তারপর সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে।

করবীর গায়ে গরম জামা নেই, শীতে সে কাঁপছে। সূরযলাল নিজের শালটা খুলে এগিয়ে দিল করবীর দিকে। করবী সেটা একসঙ্গে জড়িয়ে নিল দুজনের গায়ে। দুজনে হাত রাখল পরস্পরের কাঁধে।

করবী বলল, 'তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়তে তাহলে জীবনে তোমার সঙ্গে আর কথা বলতাম না।'

সূরযলাল বলল, 'আমি রাতভর এখানে জেগে থাকতে পারতাম।'

'ওকে অত মদ খাওয়ালে কেন?'

'আমি তো খাওয়াইনি। হরিনাথ খাইয়েছে। আমি একবার শুধু বলেছিলাম।'

'আর কোনওদিন খাওয়াবে না।'

'আচ্ছা।'

'তুমিও এত বেশি খাবে না। আজ খুব বেশি খেয়েছ?'

'এখনও পুরা হয়নি। তুমি এসেছ তো, তাই আর একটু খাব।'

'বৃষ্টি থেমে গেছে। মাঠের মধ্যে একটু হাঁটতে ইচ্ছে করছে।'

'চলো।'

বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল ওরা দুজনে। দুজনের গায়ে একই চাদর জড়ানো—যমজ মূর্তির মতন ওরা ঘুরতে লাগল সামনের বাগানে। আকাশে অস্বচ্ছ আলো, হু-হু করছে শীতের

হাওয়া—তার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে এক স্বাস্থ্যবান যুবক ও এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী। বাকি সবাই এখন ঘুমন্ত।

তবু, মাঝরাত্রে সুখেনের নিয়তি তাকে জাগিয়ে দিল। এমননিতেই তার গাঢ় ঘুম, আজ এত নেশা হওয়া সত্ত্বেও তার ঘুম ভাঙার তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। পাশ ফিরতে গিয়ে দেখল বিছানায় অনেকখানি শূন্যতা। ঘর অন্ধকার, অথচ করবী বিছানায় নেই। ঘরের মধ্যে হ্যাজাকটাও করবী ঘুমোতে যাওয়ার সময়ই নিভিয়ে দিয়েছিল—বারান্দার হ্যাজাকটাও এখন নেভানো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সুখেন ধড়মড় করে উঠে বসল।

সুখেনের তখনও পুরো নেশা, মাথা টলমল করছে। তবু সে খাট থেকে নেমে নিঃশব্দে চলে এল পাশের ঘরে। সে ঘরও অন্ধকার। খাটের ওপর বিশ্রী ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছে হরিনাথ।

সুখেন বেরিয়ে এল বারান্দায়। বারান্দার এক কোণে মেঝের ওপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে করবী, তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে সুরযলাল। সুরযলালের হাতে মদের গেলাস, সেটা উঁচু করে দিচ্ছে করবীর মুখের কাছে। করবী আলতো করে চুমুক দিয়ে খানিকটা খেল, তারপর মুখ নীচু করে চুমু দিল সুরযলালের ঠোঁটে।

ওরা এমনই নিশ্চিন্ত এবং ভাবে বিভোর ছিল যে সুখেনের আসার ব্যাপারটা টেরই পায়নি। সুখেন প্রায় এক মিনিট থমকে থেকে ওদের দেখল। যেন সে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। কিংবা, করবী যেন তার স্ত্রী নয়, অন্য একটি মেয়ে ও পুরুষের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে ফেলেছে সে। বৃষ্টি থেমে গেছে, অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়—বারান্দার কোণে ওদের ওই অন্তরঙ্গ ভঙ্গি এক হিসাবে খুব সুন্দর।

একটি মেয়ে আর একটি ছেলে যদি ওরকম অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে থাকে তাহলে দূর থেকে সেটা লুকিয়ে দেখতে যে-কোনও লোকেরই ভালো লাগবার কথা। একমাত্র নিজের স্ত্রীকে ওই অবস্থায় পরপুরুষের সঙ্গে বসে থাকতে দেখলে স্বামীর ভালো লাগে না। সুখেন যেন ব্যাপারটা প্রথমে ঠিক বিশ্বাসই করতে পারেনি। তাই প্রথমে কয়েক মুহূর্ত সে বিভোর হয়ে তাকিয়ে ছিল সেদিকে। তারপর তার বুকের মধ্যে চড়াৎ করে উঠল।

হঠাৎ সুখেনের চোখ পড়ল চেয়ারের ওপরে রাখা রিভলভারটার দিকে। সেটা তুলে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে সে বিকৃত গলায় বলল, 'খুন করব! আজ দুজনকেই খুন করব!'

ওরা দুজনে ছিটকে সরে গেল দুপাশে। সুরযলাল উঠে দাঁড়াবার আগেই গুলি চালাল সুখেন।

সিমেন্টের মেঝেতে সেই গুলির শব্দ হল প্রচণ্ড। গুলি সুরযলালের গায়ে লাগেনি।

সুরযলাল লাফিয়ে উঠে সুখেনকে ধরার চেষ্টা করল কিন্তু সুখেন ততক্ষণে রিভলভারটা ঠিক ভাবে ধরে লক্ষ্য স্থির করছে। সুরযলাল চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়ান! এ কী করছেন। একটা কথা শুনুন!'

সুখেন আবার গুলি করতে যাওয়ার আগেই করবী এসে তার সামনে দাঁড়াল, হাত তুলে বলল, 'কী করছ, দাঁড়াও! সুরয অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল আমি ওর কপালে জল দিয়ে—'

সুখেন উন্মত্তের মতন বলল, 'সরে যাও! আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি আগে ওকে মারব। তারপর তোমাকেও—'

করবী সুরযলালকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি ভুল দেখেছ। পাগলামো কোরো না—তুমি খুনের দায়ে পড়বে—'

'আমার ফাঁসি হোক। কিছু যায় আসে না। আমি ভুল দেখেছি? আমি চিরকালই ভুল দেখি। সরে যাও—'

'না, আমি সরব না। তুমি আমাকে মারো আগে। সুরয, তুমি চলে যাও—'

'সর হারামজাদি—'

'না, আমি সরব না। তুমি আমাকে মারতে চাও মারো—।'

করবীর এইটুকু বিশ্বাস আছে যে সুখেন কিছুতেই তার ওপর গুলি চালাতে পারবে না। যত অন্যায় করুক, তবু করবীর ওপর সুখেনের সাঙঘাতিক দুর্বলতা। সুখেন পিস্তলটা হাতে ধরে, 'সরে যাও, সরে যাও' করছে, কিন্তু গুলি চালাতে পারছে না। তার হাত কাঁপছে। করবী এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে সুখেনের দিকে। অসম্ভব তার মনের জোর, এগোতে-এগোতে সে বলছে, 'সূরয, তুমি পালিয়ে যাও, তুমি পালিয়ে যাও—।'

প্রথম গুলির আওয়াজ শুনে হরিনাথও জেগে উঠেছিল। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে। সে আছে সুখেনের পেছন দিকে। করবী তাকে চোখের ইশারায় বলার চেষ্টা করল, পেছন থেকে সুখেনের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিতে। কিন্তু হরিনাথের সে সাহস নেই।

করবী সুখেনের একেবারে কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওটা আমাকে দিয়ে দাও।'

সুখেন বলল, 'সরে যাও! খুন করে ফেলব। একদম খুন করে ফেলব আজ! হারামজাদি—'

সূরযলাল পালিয়ে যায়নি। সে বলল, 'সুখেনদাদা, ওটা রেখে দিন। আমি আপনাকে সব কুছ বলছি। মাথা খারাপ করবেন না—'

সুখেন বলল, 'আমি তোমাকে খুন করব, শয়তান কাঁহাকা!'

করবী বলল, 'তাহলে আগে আমাকে মারো। আমাকে মারছ না কেন? এই তো আমি এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছি—'

'তোমাকেও মারব। দুজনকেই একসঙ্গে। আগে ওই কুত্তাটাকে—'

তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। সুখেন করবীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে গিয়েও পারল না। করবীই ধরে ফেলেছে তাকে, অন্য হাত দিয়ে করবী খপ করে কেড়ে নিতে গেল রিভলভারটা, সুখেন সেটা সরিয়ে জোরে চেষ্টা করতেই গুলি ছুটে গেল। গুলি ফুঁড়ে গেছে সুখেনের গলা দিয়ে। ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল সে। রিভলভারটার শব্দ হল ঠক করে।

হরিনাথ তক্ষুনি দৌড়ে এসেছে বাইরে। একটি কথাও না বলে হরিনাথ ছুটতে লাগল মাঠ ভেঙে। সূরযলাল এগিয়ে এল, করবীর কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, 'মর গয়া? তুমি মেরে ফেললে? একদম মেরে ফেললে?'

করবী হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে সুখেনের পাশে। সুখেনের প্রাণ বেরিয়ে গেছে গুলি লাগার সঙ্গে-সঙ্গে। আর একটা কথাও সে উচ্চারণ করতে পারেনি। গলার ক্ষত থেকে, মুখ থেকে রক্ত তখনও বেরোচ্ছে গলগল করে। একটু আগে মানুষটা এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এখন আর তাকে চেনাই যায় না।

করবী মুখ নীচু করে বলল, 'এ কী? মরে গেল? একদম মরে গেল?'

সূরযলাল বলল, 'তুমি রিভলভারটা কেড়ে নিতে পারলে না শুধু? তুমি ওকে মারলে কেন?'

করবী রক্তহীন বিবর্ণ মুখে সূরযলালের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'আমি মেরে ফেললাম? আমি তোমাকে বাঁচাতে চাইলাম, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম—এখন তুমি বলছ, আমি মেরে ফেলেছি?'

পাগলের মতন হয়ে গেল করবী, সূরযলালের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে গুম-গুম করে কিল মারতে লাগল। সূরযলাল অতি কষ্টে তাকে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে শান্ত করলে একটু, তারপর দুজনে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করল, দেখল সুখেনের দেহ। মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনও উপায়ই নেই। ওরা দুজনে ঘোর-লাগা চোখে তাকাল পরস্পরের দিকে। করবী বলল, 'সব শেষ। আমার এখন কী হবে?'

সূরযলাল করবীকে ধরে দাঁড় করাল। তারপর বলল, 'চলো, আমরা জলদি এখান থেকে চলে যাই।'

করবী বলল, 'চলে যাব? তারপর ওর কী হবে?'

'সেসব পরে ব্যবস্থা করলেই হবে। এখন চলো।'

কিন্তু সূরযলালের চেয়ে করবীর বুদ্ধি বেশি। সে বুঝতে পেরেছিল, এইভাবে পালিয়ে বাঁচা যায় না। পালাবার আগে একটা কিছু প্ল্যান ঠিক করে নিতে হবে।

ততক্ষণে চৌকিদার রামদাস এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। সূরযলাল বলল, 'আমাদের বাঁচতেই হবে।' তারপর রামদাসের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথা ফাঁস করবি তো তোর জবান ছিঁড়ে দেব!'

এরপর করবী আর সূরযলাল একসঙ্গে বাঁচবার চেষ্টা করেছে। কেউ কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।'

কথা থামিয়ে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। ভালো করে একটা টান দিয়ে বললাম, 'এর পরের ব্যাপার তো বোঝাই যাচ্ছে। মৃতদেহটা সরানোই ওদের প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু ডাকবাংলোর আশেপাশে কোথাও পুঁতে ফেলতে সাহস করেনি। ডাকবাংলোর কাছে খোঁজাখুঁজি হবেই। জিপগাড়িটা নিয়েও মুশকিল, ওটা সরাতেই হবে, কিন্তু কেউ গাড়ি চালাতে জানে না। সবকিছু ধুয়ে মুছে ওরা পরিষ্কার করে রাখল। ডেডবডিটা লুকিয়ে রাখল খাটের নীচে। ঠিক হল, পরের রাত্তিরে সব ব্যবস্থা হবে। করবী ওইখানেই রয়ে গেল, সূরযলাল গেল সব ব্যবস্থা করতে। সূরযলাল আর না ফিরতেও পারত। সূরযলালের টাকাপয়সা আছে অনেক। ওইসব জায়গায় টাকাপয়সার জোরে অনেক কাজ হাসিল করা যায়। সূরযলাল টাকা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করে নিজে যদি সবকিছু অস্বীকার করত, তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা খুব সহজ হত না। কিন্তু সূরযলাল তা করেনি। সে ফিরে এসেছিল। ইতিমধ্যে কর্নেল সেন সেখানে হাজির হয়েই সব গোলমাল পাকিয়ে দিলেন। একে উনি মিলিটারির লোক—এবং ওঁর সঙ্গেও রিভলভার। ওঁকে কিছুতেই নিরস্ত্র করা গেল না। আমার ধারণা, কর্নেল সেন যখন প্রথম ডাকবাংলোটাতে হাজির হন, তখন করবী চৌকিদারের ঘরেই লুকিয়ে ছিল। কী, ঠিক বলছি?'

কর্নেল সেন বললেন, 'তোমার বর্ণনা মোটামুটি ঠিক বলেই মনে হয়। অন্তত বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি বলছ খুনটা আসলে অ্যাকসিডেন্ট? ওরা কেউ খুন করেনি?'

রঞ্জন বলল, 'ভেরি আনলাইকলি! সুনীল যেভাবে চরিত্রগুলো এঁকেছে, তাতে মনে হয়, ধরা পড়লেও ওরা কেউ চট করে সুখেনকে খুন করবে না। তার কোনও দরকার ছিল না। রিভলভারটা যদি ওখানে না থাকত—আচ্ছা, রিভলভারে কারও হাতের দাগ পাওয়া যায়নি?'

কর্নেল সেন বললেন, 'সে হাতের দাগের কোনও মূল্য নেই। ওদের তো ও সম্পর্কে আইডিয়া নেই—তাই রিভলভারটা ওরা সবাই ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। সবারই হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। সুতরাং ও থেকে কিছু প্রমাণ করা যায় না।'

মাধবী বলল, 'অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট বাজে কথা। আমি বলছি, ওই করবীই খুন করেছে। আগে থেকে প্ল্যান করেই খুন করেছে।'

আমি হাসলাম। রঞ্জন বলল, 'তোমার করবীর ওপর খুবই ঘেন্না দেখছি। এখনও তুমি ভাবছ, ওই করবীই নিজের হাতে ইচ্ছে করে তার স্বামীকে খুন করেছে? আমার কিন্তু মেয়েটাকে অত খারাপ মনে হয় না। তা ছাড়া, স্বামীকে খুন করার দরকার কী? ও তো অনায়াসেই সুখেনকে ছেড়ে সূরযলালের সঙ্গে থাকতে পারত। অনেক বিবাহিতা মেয়েরা করে না এরকম? এজন্য কি খুন করার দরকার হয়?'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'মামাবাবু, আপনি এবার সত্যি করে বলুন তো, ওই মেয়েটাই খুন করেনি?'

কর্নেল সেন বললেন, 'প্রকৃতপক্ষে ওদের দুজনের মধ্যে কে খুন করেছে, তা শেষ পর্যন্ত

কিছুতেই প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। সুনীলের অ্যাকসিডেন্টের থিয়োরিটাই ঠিক হতে পারে। এমনকী আত্মহত্যা করাও অসম্ভব নয়। করবী আর সূরযলাল দুজনেই শেষপর্যন্ত বলে গেছে যে সুখেন আত্মহত্যা করেছে। এই কথা থেকে একচুলও নড়েনি। রিভলভার থেকে দুটো গুলি খরচ হয়েছিল। একটা গুলি সুখেনই ছুড়েছিল সূরযলালের দিকে। গায়ে লাগেনি। সূরযলাল রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য গুলি করে এরকম একটা থিয়োরিও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল। তাতে সূরযলালের ওপর ঠিক হত্যার অভিযোগ আসত না, কিন্তু সূরযলাল সে-কথা কিছুতেই স্বীকার করেনি। সে বারবার বলেছে, সুখেন আত্মহত্যা করেছে—তার বা করবীর ওতে কোনও হাত নেই। মৃতদেহটা লুকোবার চেষ্টা করেছিল কেন? ওরা ভয় পেয়ে মাথা গুলিয়ে ফেলেছিল—এই ওদের বক্তব্য।

বিচারের সময় ওদের যদি দেখতে তোমরা। করবী আর সূরযলাল পরস্পরের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থাকত শুধু, যেন পরস্পর এক সাঙঘাতিক বন্ধনে বাঁধা। আর কারও সঙ্গে একটাও কথা বলত না, কোনওরকম অপরাধী বা অনুতপ্ত বা ক্ষমাপ্রার্থীর ভাব ছিল না তাদের মধ্যে! সরকার পক্ষের উকিল ওদের জেরা করে একেবারে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চেয়েছে। এমন সব জঘন্য অভিযোগ এনেছে দুজনের নামে যে, তা কল্পনা করা যায় না। সূরযলাল আরও তিন-চারটি দুশ্চরিত্রা মেয়ের সঙ্গে নাকি কত কী কাণ্ড করেছে—এসব কথাও বলেছে করবীর সামনে, তবু ওরা এক চুলও বিচলিত হয়নি। পরস্পরের নামে কক্ষনও কোনও দোষারোপ করেনি। শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতন দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকত।'

মাধবী জিগ্যেস করল, 'শেষ পর্যন্ত ওদের শাস্তি হয়নি?'

কর্নেল সেন বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছিল। খুনের অভিযোগ অবশ্য প্রমাণিত হয়নি। অন্যান্য সব কারণ মিলিয়ে করবীর জেল হল তিন বছর, আর সূরযলালের পাঁচ বছর। করবী আড়াই বছর পরেই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। সূরযলাল তখন আবার একটা ভুল করে। এমনিতে ছটফটে স্বভাবের মানুষ, করবী জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার খবর নিশ্চয়ই কোনও উপায়ে ওর কাছে পৌঁছেছিল। ও তখন জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে। ধরাও পড়ে যায়। তাতে ওর শাস্তি বেড়ে যায় আরও কয়েক বছর। জানি না আর কোনওদিন ওদের দুজনের দেখা হয়েছে কিনা।

করবী জেলের বাইরে ঘুরে বেড়াবে আর ও জেলের মধ্যে বন্দি থাকবে, এই চিন্তা বোধহয় সূরযলালের কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না।'

একটুক্ষণ আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। রঞ্জন বলল, 'আচ্ছা মামাবাবু, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন। সুনীল এমনভাবে করবী আর সূরযলালের কথা বলে গেল, যেন ও একেবারে সবসময় ওখানে উপস্থিত ছিল ওদের সঙ্গে...ডায়ালগ পর্যন্ত।'

আমি বললাম, 'ওটা লেখকদের লাইসেন্স! কোনও ছেলে আর মেয়ে যখন কোনও নির্জন জায়গায় বসে কথা বলে, তখন কি কোনও লেখক আড়াল থেকে তাদের কথা শোনে? কিংবা তাদের পাশে গিয়ে বসে থাকে? তবু, ওদের সেই নির্জনে বসে থাকা ও কথাবার্তা হুবহু ফুটিয়ে তোলা হয় কী করে? লেখকরা মানুষের চরিত্র স্টাডি করে। তারপর সেই চরিত্র অনুযায়ী লেখকরা তাদের প্রেমের দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। আমি ওদের ব্যাপারটা ঠিক বানাইনি, বলতে-বলতে এমনিই মনে আসছিল, যেন হুবহু হত্যাকাণ্ডটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এবং সত্যি কথা বলতে কী জানিস, করবী মেয়েটার ওপর আমার খানিকটা সহানুভূতিও এসে যাচ্ছিল।'

মাধবী ভঙ্গি করে বলল, 'তা তো আসবেই! পুরুষ তো!'

কর্নেল সেন বললেন, 'করবী মেয়েটির মধ্যে অসাধারণ একটা কিছু ছিল। তাকে নিছক একটা খারাপ মেয়ে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শহরে থেকে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেলে ও হয়তো বড় একটা কিছু করতে পারত। এই ধরনের মেয়েকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে অনেক বড়-বড় কাণ্ড ঘটে। ওর প্রতি খানিকটা সহানুভূতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমারও বোধহয় একটু-একটু আছে—

যদিও আমার জন্যই ওরা ধরা পড়েছিল।

তোমাদের আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। করবীর সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হয়েছিল। ওই ঘটনার বছর পাঁচেক পর। লছমনঝোলায় এক মহিলাকে আমার হঠাৎ খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। গঙ্গার ঘাটের একবারে শেষ ধাপে জলে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—লাল পাড়ের গরদের শাড়ি পরা, একগোছা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। বোধহয় ওই চুল দেখেই আমি চিনতে পারলাম। করবী। ওকে দেখে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার জন্যই ওর জীবনে একটা বিপর্যয় এসেছে। আমাকে ওর পছন্দ করার কথা নয়। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ডেকে বললাম, 'এই যে, শুনুন!'

তখন তার চেহারা একটুও খারাপ হয়নি, আকর্ষণীয়। মুখ ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে। আমাকে চিনতে না পারার কথা নয়, কিন্তু সেরকম কোনও ভাব দেখাল না। চোখের দিকে তাকিয়ে রইল দু-এক পলক, বড় অদ্ভুত সেই দৃষ্টি। তারপর জলের মধ্যে নেমে গেল। জানো তো ওখানকার গঙ্গায় কীরকম স্রোত, তার মধ্যেই সাঁতার কেটে দূরে চলে গেল অবলীলাক্রমে। আমি কোনও কথা বলার সুযোগ পেলাম না।

তবে, আমার ধারণা ওই মেয়ে যেখানেই থাকবে, আশেপাশের লোকের জীবনে বিপদ ডেকে আনবে। কিছু দিন বাদেই লছমনঝোলায় একজন ব্যবসায়ী খুন হয়। আমার বিশ্বাস করবী সেই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। সেবারে অবশ্য আমি আর গোয়েন্দাগিরি করতে যাইনি।

তারপর তো অনেক বছর কেটে গেছে—করবী বেঁচে থাকলে এখন তার যথেষ্ট বয়স। কিন্তু এখনও আমার মাঝে-মাঝে তার সেই চেহারাটা মনে পড়ে। সেই সকালবেলা স্নান করার পর চুল খোলা, জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।'

রঞ্জন উঠে গিয়ে জানলার পরদা সরিয়ে দিল। বাইরে তাকিয়ে বলল, 'ভোর হয়ে এসেছে। আলো ফুটেছে।'

কর্নেল সেনও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো, তাহলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো যাক! অনেক দিন সূর্য ওঠা দেখিনি।'

ছায়া-ছায়া রাতে



কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

আর ভালো লাগছে না কলকাতা।

ভীষণ একঘেয়ে লাগছে বাসবের। বিরক্তিকর মনে হচ্ছে।

মহানগরীর ক্রমবর্ধমান জনস্রোতের চাপে ও যেন ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। কাজেও মন বসাতে পারছে না আর।

তাছাড়া বাসব ক্লান্ত—ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একনাগাড়ে কাজ করে চলেছে বেশ কিছুদিন ধরে। অবশ্য ক্লান্তিবোধটা তখন ওর মনে হয়নি। সম্প্রতি জটিল এক খুনের তদন্তের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটানোর পরই—অর্থাৎ হাতের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ওর মনে হচ্ছে আর কলকাতায় নয়। এখন দূরে কোথাও গিয়ে এই ক্লান্ত শরীরকে দিতে হবে পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

কোথায় যাওয়া যায়?

এই বিরাট দেশে যাওয়ার জায়গার অবশ্য অভাব নেই, তাই বাসব ভাবছে। ঠান্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে সবে, কাজেই কোনও হিল স্টেশনে যাওয়া চলবে না। তবে—।

হঠাৎ বাসবের মনে পড়ে গেল হীরকের কথা।

হীরক চৌধুরী। ওর বাল্যবন্ধু।

আগ্রায় থাকে সে।

এক্সপোর্ট ইমপোর্টের বিরাট ব্যাবসা আছে তার।

বহুবারই হীরক আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাসবকে আগ্রায় বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সময় করে উঠতে পারেনি বাসব। একটা-না-একটা কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে থেকেছে।

মাস ছয়েক আগে শেষবারের মতো দেখা হয়েছিল ওদের।

হীরক এসেছিল কলকাতায়।

বেশ অভিমানের সুরেই বাসবকে বলেছিল, জানি, তুমি এখন একজন মস্ত মানুষ। আমার মতো সাধারণ লোকের সঙ্গে আর বন্ধুত্ব রাখতে চাও না।

কেন, তোমার মনের মধ্যে এ ধারণা কেন বদ্ধমূল হল হীরক? বাসব প্রশ্ন করেছিল।

না হওয়ার, তো কোনও কারণ নেই। বন্ধুত্বটা যদি সত্যি তুমি আমার সঙ্গে বজায় রাখতে চাইতে, তাহলে এতদিনে কি একবার তোমার পক্ষে ঘুরে আসা সম্ভব হত না?

উচ্চহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে তুলেছিল বাসব। বলেছিল, এ কিন্তু তোমার রাগের কথা। সময় নেহাতই করে উঠতে পারিনি, তাই, নইলে একবার আগ্রায় গিয়ে পড়তে পারলে তুমি ভেবেছ সহজে আমায় তাড়াতে পারবে—।

ও ধরনের কথা তো আমি অনেকদিন ধরেই শুনেছি। হীরক বলল, আসছ নাকি সামনের শীতে?

নিশ্চয়ই। এবার আর আমার কথার নড়চড় হবে না দেখে নিয়ো।

হ্যাঁ, আর ভেবে লাভ নেই।

বাসব আগ্রায় যাবে। বহু দূরত্বের বাধা অতিক্রম করে মানুষ তাজমহল দেখতে যায়। আর ও সামান্য কলকাতা থেকে আগ্রায় এতদিনে গিয়ে উঠতে পারেনি।

হীরকের রাগ করাটা অন্যায় নয়।

বাসব কালবিলম্ব না করে হীরককে একটা টেলিগ্রাম করে দিল। তারপর স্যুটকেশ আর হোল্ডঅল নিয়ে চেপে বসল গিয়ে তুফান এক্সপ্রেসে।

ট্রেনে খুব বেশি ভিড় ছিল না। সহজেই তাই রিজার্ভেশন পাওয়া গিয়েছিল।

ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্ট। একটা বার্থ খালি ছিল। বাসব ছাড়া আর দুটো বার্থে দুজন মারোয়াড়ি

ভদ্রলোক ছিলেন। খালি বার্থটাও অবশ্য সম্পূর্ণ খালি নেই। পাটনা থেকে আগ্রা অবধি রিজার্ভ হয়ে রয়েছে ওটা।

বাসব নিজের বার্থে একটা ক্রাইম-ফিকশান নিয়ে আড় হয়ে শুলো। দুরন্ত গতিবেগ নিয়ে তখন আপ তুফান এক্সপ্রেস স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করে চলেছে।

প্রায় রাত দশটার সময় তুফান এক্সপ্রেস পাটনায় এসে থামল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কামরায় প্রবেশ করলেন এক ভদ্রলোক। দীর্ঘকায় স্যুট-পরিহিত যুবক শ্রেণীর ভদ্রলোকটি চতুর্থ বার্থের অধিকারী, বাসব অনুমান করল।

ভদ্রলোক ফেল্টের হ্যাটটা হুকে আটকে, টাই-এর বন্ধনটা ঢিলে করতে-করতে নিজের বার্থে গিয়ে বসলেন।

বাসব আগেই দরজার বাইরে আটকানো স্লিপে ভদ্রলোকের নামটা দেখে রেখেছিল—অজয় সোম।

ট্রেন আবার গতি নিল।

অজয় সোম গলাটা ঝেড়ে নিয়ে ইংরেজিতে বললেন, ম্যাচবক্স আপনার কাছে আছে?

মারোয়াড়ি ভদ্রলোক দুজন নিদ্রিত ছিলেন। কাজেই প্রশ্নটা যে ওকেই করা হয়েছে, বাসব বুঝতে পারল।

ও পকেট থেকে ম্যাচবক্সটা বার করে এগিয়ে ধরল।

এই সূত্রে জমে উঠল আলাপ।

অজয় সোম পেশায় অ্যাটর্নি।

কথা প্রসঙ্গে হীরকের কথা উঠতেই তিনি জানালেন, হীরক চৌধুরীকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। তার বাড়িতে যাওয়া-আসা আছে তাঁর। উপস্থিত তিনি আইনঘটিত ব্যাপারে পাটনা গিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে।

আজ ফিরছেন।

বাসবের পরিচয় পেয়ে সবিশেষ আনন্দিত হলেন অজয় সোম। খবরের কাগজের দৌলতে ওর কার্যকলাপের বিষয়ে অনেক কিছুই জানা ছিল তাঁর।

প্রায় দেড় ঘণ্টা লেট ছিল ট্রেনটা। মেকআপ করতে-করতে শেষ পর্যন্ত কুড়ি মিনিটে এসে দাঁড়াল, যখন আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করছে তুফান এক্সপ্রেস।

হাসিমুখে প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল হীরককে। সে এসে বাসবকে জড়িয়ে ধরল।

স্টেশনের বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

দশ মিনিটের বেশি লাগল না হীরকের বাড়ি পৌঁছতে।

চমৎকার বাড়িখানা। সম্পূর্ণ বিদেশি কেতায় সাজানো।

অকৃতদার হীরক এখানে একলাই থাকে।

পরের দিন থেকেই আগ্রার দ্রষ্টব্যগুলো একে-একে দেখতে আরম্ভ করল বাসব। মমতাজের অমর স্মৃতি তাজের বুঝি আর তুলনা নেই। বাসব চাঁদের আলোয় অপরূপ তাজমহলকে প্রাণ ভরে দেখেছে।

মেহরোত্রা বিল্ডিংএর চারতলার দুখানা ঘর নিয়ে অজয় সোমের চেম্বার। অবশ্য চেম্বারের ঠিক পিছনে আরও দুখানা ঘর আছে প্রাইভেট ইউজের জন্যে।

ওতেই থাকেন অজয় সোম। একাই থাকেন।

তিনি অবিবাহিত। আগ্রায় বাঙালি মহলে সুপাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। মেয়ের বাপেদের আনাগোনা একরকম তাঁর কাছে নিয়মিত ছিল। অনেক লোভনীয় অফারকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। বিয়েতে তাঁর অনিচ্ছা থাকার দরুণ যে তিনি এরকম করেছেন তা নয়, আসলে নিজের পত্নী নির্বাচন অজয় সোম করে ফেলেছেন, কাজেই অন্যত্র বিয়ে করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু তিনি আগ্রার অধিবাসী নন। এখানে একরকম উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন বলা চলে।

গয়ার লোক অজয় সোম। পড়াশুনো করেছেন কলকাতায়। তাঁর বাবা বিজয় সোম, গয়ার জজকোর্টে কাজ করতেন। সামান্যভাবে জীবন আরম্ভ করলেও, শেষ বয়েসে তিনি বড়বাবু হয়েছিলেন।

কাছারির কোনও-কোনও দপ্তরের বড়বাবুদের হাতে কাঁচা পয়সা আসার প্রচুর সুযোগ থাকে। বিজয় সোমও সে সুযোগে বঞ্চিত ছিলেন না।

অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে প্রচুর কালো পয়সা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

অজয় সোম নিজের কলেজ জীবন শেষ করার মাস দুয়েকের মধ্যেই বিজয় সোম মারা গেলেন। স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিলেন। আর কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না তাঁর।

পৃথিবীতে অজয় সোম তখন সম্পূর্ণ একা।

কিন্তু তাঁর অসহায়তাকে কাটিয়ে দিল বিজয় সোমের অপর্যাপ্ত অর্থ। গয়াতেই তিনি নিজের কর্মজীবন আরম্ভ করলেন। চেম্বার খুলে বসলেন।

একটি বছর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করার পরও কোনও মক্কেলের সাক্ষাৎ তিনি পেলেন না। অজয় সোম বুঝলেন এখানকার ব্যবসা তাঁকে এবার গোটাতে হবে। কিন্তু করবেন কী তিনি? চাকরি? চিরদিন স্বাধীনভাবে থাকার পর চাকরির বন্ধন কি তাঁর সইবে?

এইরকম মনের অবস্থা নিয়ে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি সত্যিই একদিন চেম্বার বন্ধ করে দিলেন। এবং বেরিয়ে পড়লেন গয়া থেকে। অনির্দিষ্টভাবে বেরিয়ে পড়লেন।

পরবর্তী কালে অজয় সোমকে দেখা গেল আগ্রার বিশিষ্ট অ্যাটর্নি রূপে। তিনি এখানে এসে কীভাবে যে নিজের ব্যাবসা জমিয়ে ফেললেন সে আরেক ইতিহাস।

বেলা তখন সাড়ে বারোটা পার হয়ে গেছে। মিঃ সোম নিজের চেম্বারে বসে একমনে কাজ করে চলেছেন।

এই সময় সুইংডোর ঠেলে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘাড় তুলে তাঁকে দেখতে পেয়েই ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ সোম।

প্রৌঢ়-ভদ্রলোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললেন, বসো, বসো অজয়—।

অজয় সোম বসলেন।

এখানে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পরিচয় দেওয়াটা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। ইনি বঙ্কিম রুদ্র। আগ্রার সুবিখ্যাত চিকিৎসক। ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী।

বঙ্কিম রুদ্র পকেট থেকে একটা সিগার বার করে নিজের মুখে গুঁজে দিলেন। তারপর লাইটারের সাহায্যে তাতে অগ্নিসংযোগ করে, মন্থরভাবে অল্প একটু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, খুব ব্যস্ত ছিলে নাকি?

আজ্ঞে, ভাল্লা এস্টেটের প্রপার্টির ব্যাপারটা নিয়ে—।

ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা কী হল?

প্রায় কম্প্রোমাইজ হয়ে এসেছে। আর দু-একটা সিটিং-এর পরই সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যাবে আশা করছি।

হুঁ। ভাল্লা আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। যাক, এই মূল্যবান প্যাকেটটা রেখে দাও।

ডাঃ রুদ্র নিজের পকেট থেকে একটা সিল করা সরু খাম বার করে অজয় সোমের

হাতে দিলেন।

আপনাকে আজ কেমন একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে?—প্যাকেটটা হাতে নিয়ে মিঃ সোম বললেন।

মনটা বিশেষ ভালো নেই। বহুদিন পরে আজ চন্দ্রকান্তর কথা বারবার মনে পড়ছে।

কে চন্দ্রকান্ত?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র।—চিনবে না তুমি তাকে। আজকের আমার এই বৈভবের মূলে সে আছে, অজয়। তবু আমি তাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু কই, পারি না তো!

আত্মগত ভাবেই কথাটা বললেন তিনি।

মিঃ সোম আর কিছু বললেন না। অনুমান করলেন, যে-কোনও কারণেই হোক ডাক্তারের মেজাজ আজ ভালো নেই।

সিগারটা নিভে গিয়েছিল। পকেট থেকে লাইটার বার করে আবার সিগারে অগ্নিসংযোগ করলেন ডঃ রুদ্র। বললেন, আমি এখন উঠলাম। প্যাকেটটা যত্ন করে রেখে দিয়ো।

তিনি আর কিছু না বলে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অপলক দৃষ্টিতে তাঁর গমনপথের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। অজয় সোম। তারপর নিজের দৃষ্টি সরিয়ে আনলেন ওয়াল ক্লকটার দিকে।—একটা পাঁচ।

লাঞ্চ-টাইম হয়ে গেছে।

পাশের ঘরের আর্টিকল ক্লার্করা এতক্ষণে নিশ্চয়ই খেতে চলে গেছে। তাঁর লাঞ্চ অবশ্য রেডি আছে। ওপাশের জলি-বোর্ডের দরজাটা ঠেলে ভেতরে গেলেই হয়।

মিঃ সোম ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে হাত দুটো ভালো করে ধুয়ে ফেললেন। তারপর নিজের অ্যাপার্টমেন্টে গেলেন লাঞ্চের উদ্দেশে।

ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

বহুক্ষণ আগেই নিজের টেবিলে ফিরে এসেছেন অজয় সোম। এতক্ষণ একটার পর একটা টেলিফোন রিসিভ করে যাচ্ছিলেন তিনি। কোনওটা নিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আবার কোনওটা পুরোনো ক্লায়েন্টের নানা বিষয়ের তাগাদা।

টেলিফোন কলগুলো অ্যাটেন্ড করবার পর অজয় সোমের মনে পড়ল ডাঃ রুদ্রের দিয়ে যাওয়া প্যাকেটটার কথা।

টেবিলের ওপর রেখেই লাঞ্চে গিয়েছিলেন, এখন সেটা আয়রন-চেস্টে তুলে রাখবেন তিনি।

কিন্তু কোথায় প্যাকেটটা?

টেবিলের ওপর প্যাকেটের সন্ধান পাওয়া গেল না। তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন মিঃ সোম। বৃথা চেষ্টা—।

সর্বনাশ! এখন কী হবে? মাথায় হাত দিয়ে বসলেন মিঃ সোম।

ক্লায়েন্টের জিনিস হারিয়ে ফেলার মতো গর্হিত কাজ আর কী হতে পারে। বিশেষত ডাঃ রুদ্রের জিনিস।

কেন লাঞ্চে যাওয়ার আগে প্যাকেটটা আয়রনচেস্টে বন্ধ করে দিলেন না। রাগে বিরক্তিতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে অজয় সোমের।

কে নিতে পারে প্যাকেটটা?

ডাঃ রুদ্র চলে যাওয়ার পর ঘরে আর কেউ আসেনি। তাছাড়া দরজার বাইরে বেয়ারা অপেক্ষা

করছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে প্রবেশ করলে তার চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়।

বেল বাজালেন মিঃ সোম। কিন্তু বেয়ারার সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার বেল বাজালেন তিনি। এবারেও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

মিঃ সোম সুইংডোর ঠেলে বাইরে এলেন।

টুল খালি। বেয়ারার চিহ্নমাত্র নেই সেখানে।

কোথায় গেল সে? প্যাকেটটা সে-ই কি নিয়ে সরে পড়েছে? কিন্তু কেন? প্যাকেটের মধ্যে কিছু নোটের তাড়া ছিল না। তবে—।

কী করবেন এখন অজয় সোম?

এ নিয়ে বিশেষ চেঁচামেচি করা চলে না—সম্মানের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। জানাজানি হলে ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে।

এই সময় ভয়চকিত মুখে একজন ক্লার্ক ঘরে প্রবেশ করল।

মিঃ সোম মুখ তুলে বললেন, কিছু বলবেন, বিকাশবাবু?

বিকাশবাবু কাঁপা গলায় বললেন, অফিস ঘরের পিছনের প্যাসেজটায় হরিপদ অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে স্যার।

হরিপদ—অর্থাৎ সেই নিখোঁজ বেয়ারাটি।

সেকী?

তাই তো দেখলাম। মাথার একপাশটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে—।

চলুন তো দেখি।

ব্যস্তভাবে বিকাশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ সোম ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অফিসের কয়েকজন কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সত্যিই মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে হরিপদ। তার কপালের একটু ওপর থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। এরকম অভাবনীয় দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না অজয় সোম। তাঁরই অফিসে যে একটা রক্তাক্ত ঘটনা ঘটতে পারে, কল্পনার অতীত ছিল তাঁর।

স্যার—।

বিকাশবাবুর দিকে মুখ ফেরালেন তিনি।

ডাক্তারকে খবর দেব?

নিশ্চয়ই। ডাঃ মিরচান্দানীকে রিং করে দিন। তিনি যেন এখুনি এসে পড়েন।

॥ দুই ॥

সন্ধ্যা ঘন হয়ে গেল। গায়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে নিজের ঘরের হ্যারিংটন চেয়ারে বসে রয়েছেন ডাঃ রুদ্র। শরীর ও মন দুই আজ তাঁর ভালো নেই। তাই চেম্বারে আর যাননি। মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প করছেন। মনকে একটু অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করছেন আর কী।

সুমিত্রা—বড় আদরের মেয়ে তাঁর। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর অসীম যত্নে ওকে মানুষ করেছেন তিনি। থার্ড ইয়ারে পড়ছে। মেধাবী ছাত্রী হিসেবে ওর সুনাম আছে।

গল্প-গুজবের পর সুমিত্রা একটা ফরেন ম্যাগাজিন থেকে একটা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা পড়ে শোনাচ্ছিল বাবাকে। ডাঃ রুদ্র সিগারে টান দিতে-দিতে শুনছিলেন।

শুনতে-শুনতে বোধ হয় কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। সুমিত্রা পত্রিকার পাতা থেকে চোখ তুলে অনুযোগ ভরা গলায় বলল, তুমি কিচ্ছু শুনছ না বাবা। আমি শুধু বকে মরছি।

আমি শুনছিলাম বইকি।

মোটেই শুনছিলে না।

পাগলি মেয়ে।

সকাল থেকেই দেখছি শুধু তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছ। কী এত ভাবছ বাবা?

সিগারটা অ্যাশট্রের ওপর রাখলেন ডাঃ রুদ্র। বললেন, কী আবার!

বলো না কী ভাবছিলে?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

কেন জানি না, কয়েকদিন থেকে পুরোনো দিনের বহু ঘটনা বারবার আমার মনে পড়ছে। তাই বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি।

তোমার শরীরও নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছে বাবা। হয়তো দুর্বলতার জন্যেই এই সমস্ত হচ্ছে।

হতে পারে। শরীরে একটু ক্লান্ত ভাব যে এসেছে বুঝতে পারছি।

তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। আগ্রার বাইরে থেকে ঘুরে এলে আরও ভালো হয়।

আমি তাই ভেবেছি। কয়েকদিন কলকাতা থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না।

সুমিত্রা হেসে ফেলল, তোমার যেমন কথা! কলকাতায় কেউ হাওয়া বদল করতে যায় নাকি?

ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়।

ডাঃ রুদ্রর আর কিছু বলা হল না। তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোন স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে নিম্নস্বরে কথা বললেন কার সঙ্গে। কথা শেষ করে আবার ফিরে এলেন তিনি নিজের চেয়ারে। বললেন, বেবি, এবার তুমি নিজের ঘরে যাও। আমি একটু একলা থাকব।

এক কাপ ওভাল্টিন এনে দেব বাবা?

ওভাল্টিন আর এখন খাব না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডিনার সেরে ফেলব ভাবছি।

সুমিত্রা আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সামনেই টানা বারান্দা। বারান্দার প্রায় শেষ প্রান্তে ওর ঘর।

নিজের ঘরের দিকে ও কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র, চাকর এসে খবর দিল অজয়বাবু ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছেন।

কী যেন ভাবল সুমিত্রা। তারপর দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এল ড্রইং রুমের উদ্দেশে।

অজয় সোম কারপেটের দিকে তাকিয়ে কোচের ওপর বসেছিলেন। সুমিত্রা ধীর পায়ে ঘরে প্রবেশ করল। হালকা গলায় বলল, অ্যার্টনিপ্রবর, কী এত চিন্তা করছেন?

অজয় মুখ তুললেন। বললেন, ভাবছি—।

আপনারা এত কী ভাবেন বলুন তো? বাবাও গোমড়া মুখ করে কী সমস্ত ভাবছেন। আবার আপনিও—।

ঠাট্টা নয় সুমিত্রা। বেশ সিরিয়াস একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

সিরিয়াস?

হ্যাঁ। আজ দুপুরে তোমার বাবা আমাকে সিল করা একটা খাম দিয়ে এসেছিলেন। আমি সেখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছেন, কীভাবে?

ঠিক হারিয়ে যে ফেলেছি, তা নয়। চুরি গেছে।

কী ছিল খামের মধ্যে?

তা তো আমি জানি না। ডাঃ রুদ্র প্রায়ই ওই ধরনের খাম আমার কাছে জমা রাখেন। খামগুলি নাকি মূল্যবান।

এরপর অজয় সোম আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা সুমিত্রাকে বলে গেলেন।

সুমিত্রা অবাক হয়ে বলল, রক্তারক্তি অবধি গড়িয়েছে! পুলিশে খবর দেননি কেন?

জানাজানি হয়ে গেলে আমার ব্যবসার অবস্থা কীরকম শোচনীয় হয়ে উঠবে তা জানো? মক্কেলের কাগজপত্র হারিয়ে ফেলা গুরুতর অপরাধ। তাছাড়া পুলিশে খবর দিলেই কথাটা ডাঃ রুদ্রর কানে উঠবে। আমার অন্যমনস্কতার দরুন তিনি আমার ওপর অত্যন্ত বিরূপ হবেন।

আচ্ছা, হরিপদর কাছ থেকে তো এ সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে?

তা অবশ্য পারে। কিন্তু এখনও তার জ্ঞান ফিরে আসেনি।

আপনি এক কাজ করলে পারেন।

কী বল তো?

বলছিলেন না, পাটনা থেকে ফেরার পথে ট্রেনে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিখ্যাত অপরাধতত্ত্ববিদ্ বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর সাহায্য...।

মন্দ পরামর্শ নয়। তাঁর সাহায্য এক্ষেত্রে অবশ্য নেওয়া চলতে পারে।

মিনিট কয়েক আরও কথাবার্তা বলার পর অজয় সোম উঠে পড়লেন। যাওয়ার আগে অবশ্য সুমিত্রাকে সাবধান করে গেলেন, এই কথাটা যাতে ডাঃ রুদ্রর কানে না ওঠে।

সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে।

সন্ধ্যার মুখে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হল।

আজ আর কোথাও বেরুবে না বাসব। এই দুর্যোগে কোথায় বা যাবে। আর সে যাওয়ার আনন্দই বা কী। তাছাড়া বৃষ্টি হওয়ার দরুণ শীত চতুর্গুণ বেড়ে গেছে।

বাসব কম্বল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে খাটের ওপর গদিয়ান হয়ে বসল। সিগারেট ধরাল একটা। হীরক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রেসিং গাউনের ফিঁতেটা বাঁধতে-বাঁধতে বলল, তারপর কী রকম বুঝছ?

বাসব সিগারেটের দীর্ঘটান দিয়ে বলল, খুবই খারাপ বুঝছি ভাই।

কেন?

শুনেছিলাম, উত্তর ভারতের শীত খুবই জোরালো। তবে তার ওয়েট যে এতখানি বুঝতে পারিনি।

আমি কিন্তু বছরের পর বছর এখানে কাটিয়ে চলেছি।

তা কাটাবে না কেন। তোমার গায়ে আছে গন্ডারের চামড়া। ও চামড়া ভেদ করার ক্ষমতা শীতের বাবারও নেই।

দুজনে জোরে হেসে উঠল।

কলিং বেল বেজে উঠল ঠিক সেই মুহূর্তে।

হীরকের কুর্গি চাকর এসে সংবাদ দিল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। হীরক পার্লারের দিকে গেল। কয়েক মিনিট পরে ওখান থেকেই চেঁচিয়ে ডাকল বাসবকে।

অনিচ্ছার সঙ্গে বাসব বিছানা থেকে উঠে পার্লারে আসতেই দেখতে পেল, অজয় সোম বিমর্ষভাবে একটা কোচে বসে রয়েছেন।

হীরক বলল, মিস্টার সোমের সঙ্গে তো তোমার আলাপ আগেই হয়েছে।

বিলক্ষণ। কয়েকশো' মাইল একইসঙ্গে এলাম আমরা। কেমন আছেন, মিস্টার সোম?

ভালোই।

উঁহু, মুখ দেখে তো খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে না।

হীরক বলল, খুবই গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন উনি। তোমার কাছে এসেছেন সাহায্যের আশায়।

সাহায্য?

সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে—অজয় সোম বললেন, খুবই কুণ্ঠিত হচ্ছি মিস্টার ব্যানার্জি। তবে—।

কুণ্ঠাকে মিথ্যে প্রশ্রয় দিচ্ছেন মিস্টার সোম। কোনও ব্যাপারে আমার সহযোগিতা আপনার যদি প্রয়োজন হয়, নিশ্চয়ই পাবেন। কী হয়েছে বলুন তো?

আমার অফিস থেকে প্রয়োজনীয় একটা খাম চুরি গেছে।

খাম?

অত্যন্ত মূল্যবান খাম।

ও। তারপর—।

অফিস রুমের টেবিলের ওপরই খামটা ছিল। ভেবেছিলাম লাঞ্চে যাওয়ার আগে সেফে রেখে দেব। কিন্তু ভুলে যাওয়ার দরুন—।

লাঞ্চ থেকে ফিরে এসে দেখলেন খামটা টেবিলের ওপর নেই, এই তো?

হ্যাঁ।

আপনার বেয়ারা কী বলে? আপনি লাঞ্চে যাওয়ার পর ঘরে কেউ ঢুকলে সে নিশ্চয়ই দেখতে পেত।

সে দেখতে পেয়েছিল কি না বলতে পারছি না। কারণ কে তাকে মারাত্মক ভাবে আহত করে রেখে গেছে। এখনও তার জ্ঞান হয়নি।

ছুরি-টুরি মেরেছে নাকি?

না। কপালের একটুও পরে কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।

হুঁ। বাসব বলল, আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছে দেখা যাচ্ছে। ভালো কথা, আপনি বলছিলেন, খামটা খুবই মূল্যবান। ওতে কী ছিল?

তা বলতে পারব না। ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র আমার কাছে ওটি জমা রেখেছিলেন অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু হিসেবে।

ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র কে?

হীরক এতক্ষণ পরে কথা বলল, আগ্রার সুবিখ্যাত ডাক্তার। তাছাড়া মিঃ সোমের উড বি ফাদার-ইন-ল!

আই সি। কবে ডাক্তার রুদ্র আপনার কাছে খামটা জমা রাখেন?

চুরি যাওয়ার ঘণ্টা খানেক আগে। মিস্টার ব্যানার্জি' এর একটা বিহিত আপনাকে করে দিতেই হবে। নইলে—।

বাসব মৃদু হাসল।

বলল, নইলে ভাবী শ্বশুর মশাইয়ের কাছে আপনার পজিশন বেশ কিছুটা অকোয়ার্ড হয়ে উঠবে। ওয়েল, কাল দুপুরে আমি আপনার অফিসে যাব। দেখি কতদূর কী করা যায়। অজয় সোম উঠে দাঁড়ালেন।

আরেকটা কথা—বাসব বলল, আমি কাল না যাওয়া পর্যন্ত আপনি আপনার চেম্বারের কোনও কিছু নাড়াচাড়া করবেন না।

বেশ।

অজয় সোম বিদায় নিলেন।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হীরকের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি চেনো নাকি ডাক্তার রুদ্রকে?

আগ্রার কে না চেনে তাঁকে।

আমি ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বলছি।

আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতাই আছে ভদ্রলোকের।

কী সূত্রে? কোনও বড় রকম অসুখে-টসুখে পড়েছিলে নাকি?

না। ব্যবসার সূত্রে। আমার থ্রু দিয়ে বহু ওষুধপত্র বিদেশ থেকে আনিয়েছেন ডাক্তার রুদ্র।

নিজের মেয়ের জন্যে নিশ্চয়ই উপযুক্ত পাত্রই নির্বাচন করেছেন তিনি।

নিশ্চয়ই। অজয় সোমের মতো ছেলে পাত্রের বাজারে সত্যিই বিরল। ওঁর উপযুক্ততা সম্বন্ধে আমার অন্তত কোনও দ্বিমত নেই।

বাসব আর কিছু বলল না। সিগারেটে বারকতক ঘন-ঘন টান দিল।

হীরক উঠে দাঁড়াল।

বলল, আমি অফিস রুমে যাচ্ছি। একটা স্টেটমেন্ট টাইপ করতে হবে। তুমি ততক্ষণ সিগারেটের ধোঁয়ার কারিকুরিতে ব্যস্ত থাক।

হীরক পার্লার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাসব চিন্তার সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিল। অজয় সোমের খাম চুরি কিন্তু ওর চিন্তার বিষয় নয়। ও ভাবছে, তাজমহলের অপূর্ব কারুকার্যের কথা। মানুষের অন্তরে কত নিখুঁত শিল্প-চেতনা থাকলে, এইরকম একটা স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার নিটোল পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলা সম্ভব হয়।

একসময় ওর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল।

পোর্টিকোতে গাড়ি থামার শব্দ হল। এই দুর্যোগ মাথায় করে আবার কে এল।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে পোর্টিকোর দিকে এগিয়ে গেল। সত্যি, মূল্যবান একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ি থেমে নামলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। লম্বায় তিনি প্রায় ছ' ফুট হবেন। কালো নিরেট চেহারা। কাঁচায়-পাকায় মেশানো ঘন চুল মাথায়। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা।

বাসবের দিকে তিনি তাকিয়ে বললেন, আপনি হীরক চৌধুরীর বন্ধু—কলকাতা থেকে এসেছেন?

বাসব বিস্মিত গলায় বলল, হ্যাঁ।

আমার অনুমান মিথ্যে হয়নি। আপনিই তাহলে সুবিখ্যাত বাসব বন্দ্যোপাধ্যায়?

সুবিখ্যাত কি না জানি না। তবে ওই নামটা আমারই।

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে পার্লারের একটা কোচে গিয়ে বসেছেন। বললেন, আমি ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র।

ডাক্তার রুদ্র! বাসবের মনের মধ্যে একটা তীব্র কৌতূহল উঠানামা করতে লাগল। ভদ্রলোক এই সময় এখানে এসেছেন ওরই সন্ধানে নাকি? কেন?

ও বলল, আপনার নাম শুনেছি। পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম।

আমি আপনার কাছে এসেছি বিশেষ প্রয়োজনে। অবশ্য এর দরুন যা পারিশ্রমিক হবে তা আমি দেব।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে আমি সবসময় পরের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি তা নয়। এবার বলুন, আপনার আগমনের উদ্দেশ্যটা,।

ডাঃ রুদ্র চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে এনে রুমাল দিয়ে লেন্স দুটো পরিষ্কার করলেন। তারপর চশমাটা আবার চোখে দিয়ে বললেন, এই দুর্যোগ মাথায় করে কেন আমি এখন এখানে এলাম, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনার তীব্র কৌতূহল হচ্ছে?

স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ আগে আমি আমার মেয়ের কাছে শুনলাম, আপনি কলকাতা থেকে এখানে এসেছেন। উঠেছেন হীরকের বাড়িতে; তাই কালবিলম্ব না করে এখানে চলে এলাম।

আপনার উপস্থিতিতে আমি আনন্দিত। কিন্তু এখনও আপনার এখানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা আমার অজানা।

এবার সে কথাই বলব। আমাকে কেউ মেরে ফেলতে চায়।

॥ তিন ॥

বাসব এ ধরনের কথা আশা করেনি।

ও বিস্মিত গলায় বলল, মেরে ফেলতে চায়?

সেই কথাই বলতে এসেছি আপনাকে। মূর্তিমান মৃত্যু ছায়ার মতো আমাকে অনুসরণ করে চলেছে।

বলেন কী?

কিন্তু আমি বাঁচতে চাই মিস্টার ব্যানার্জি। সুস্থ সবলভাবে বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই।

আপনি অস্থির হবেন না ডাক্তার রুদ্র। প্রকৃত ব্যাপারটা আমায় খুলে বলুন। কে আপনাকে মেরে ফেলতে চায়?

তা তো নির্ণয় করতে পারছি না। মাসখানেক আগে চেম্বারে বসে রুগি দেখছিলাম। টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা কানের কাছে ধরতেই শুনতে পেলাম কে বলছে, আপনি নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছেন ঋণ পরিশোধের জন্যে?

আমি বললাম, কে তুমি—কীসের ঋণ?

উত্তর হল, আপনার স্মরণশক্তির প্রশংসা করতে পারছি না। ঋণ পরিশোধের জন্যে প্রস্তুত থাকুন।—আর কিছু না বলে লাইনটা কেটে দিল সে। এরপর থেকে বহুবার টেলিফোনে আমি এইরকম কথাবার্তা শুনেছি। কয়েকটা চিঠিও পেয়েছি। তাতে আমায় মৃত্যুভয় দেখানো হয়েছে।

বাসব বলল, আপনি একজন প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক। শহরের অন্যান্য ডাক্তাররা হয়তো আপনার প্রতি জেলাস। তাদের মধ্যে কেউ আপনাকে নার্ভাস করবার জন্যে এরকম করতে পারে।

আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু কালকের রাত্রের ঘটনার পর আর সে সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে পারছি না।

কালকের রাত্রের ঘটনা?

রোজকার মতো কাল রাত্রেও একটা আমি এগারোটার সময় শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কীসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি—বেডরুম ল্যাম্পের আলোটা চোখে সয়ে আসতেই লক্ষ করলাম, একটা ছায়ামূর্তি আমার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি হয়তো চেঁচিয়ে উঠতাম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বারান্দার বড় আলোটা জ্বলে উঠল। পায়ের শব্দ হল। ছায়ামূর্তিও কাল বিলম্ব না কারে আরেক পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল।

হুঁ। বারান্দায় কে এসেছিল সে সময়ে?

আমার ছেলে সঞ্জীব।

আপনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?

না। নিজের প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করে পুলিশের কাছে যাইনি। তারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাসই করবে না। মাঝ থেকে সারা শহরে এই নিয়ে হইচই পড়ে যাবে। এমনকী আমি নিজের বাড়ির কাউকে বলিনি।

ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ডাক্তার রুদ্র—অতীতে আপনি কী কারুর কোনও ক্ষতি করেছিলেন?

ক্ষতি! কই না। এ প্রশ্ন করছেন কেন?

যে আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে ঋণ পরিশোধের কথা বলছে, বললেন না? তাই প্রশ্ন করলাম।—হ্যাভ ইট।—বাসব সিগারেট কেসটা এগিয়ে ধরল।

নো, থ্যাঙ্কস।

ডাঃ রুদ্র পকেট থেকে সিগার বার করলেন।

বাসব সিগারেট ধরিয়ে আবার বলল, আপনাকে যে প্রাণে মারতে চায়, নিশ্চয়ই তার এতে কোনও লাভ আছে। অকারণে মানুষ মানুষকে খুন করতে চায় না। আপনি ভেবে দেখুন, কেন সেই অদৃশ্য লোকটি আপনাাকে খুন করতে চায়। কোন ঋণ পরিশোধের কথা সে বলছে। এ সম্বন্ধে যদি কোনও ব্যাক রেফারেন্স থাকে তো বলুন?

আমার কিছুই মনে পড়ছে না। সে যদি আমাব কাছ থেকে কিছু টাকা দাবি করে, তাহলেও আমি স্বস্তি পাই। টাকাটা দিয়ে এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার একটা পন্থা পাওয়া যায়।

এরপর কয়েক মিনিট নীরবে কাটল।

ডাঃ রুদ্র সিগার ধরালেন।

বাসব সিগারেটে কয়েকবার ঘন-ঘন টান দিয়ে বলল, আপনি আমাব কাছ থেকে কী ধরনের সাহায্য চাইছেন?

উপস্থিত আমি আপনার কাছ থেকে সুপরামর্শ চাই।

পরামর্শ। খুব সাবধানে থাকবেন এইটুকু এখন বলতে পারি।

সাবধানেই আছি। বডি গার্ডের মতো একজনকে সবসময় নিজেব সঙ্গে-সঙ্গে রাখছি।

এখনও সে সঙ্গে আছে?

হ্যাঁ। গাড়িতে অপেক্ষা করছে।

নিউলি অ্যাপয়েন্টেড কেউ?

না। অনেক দিন ধরে আমার কাছে আছে, আমার সেক্রেটারি সুব্রত রায়।

শুনুন, ডাক্তার রুদ্র, আমি একটা কথা ভাবছি।

কী বলুন?

এবার যখন সেই অদৃশ্য লোকটি আপনাকে টেলিফোন করবে, ঋণ পরিশোধের কথা বলবে, আপনি তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবেন। বলবেন, ঋণ পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছেন আপনি। কীভাবে এবং কোথায় তা করতে হবে জানালে আপনি খুশি হবেন।

কিন্তু...

ভয় পাবেন না। বাকি ব্যবস্থাটা আমিই করব। শুধু ফোনে কথাবার্তা হওয়ার পরই আমাকে জানাবেন।

ঘড়িতে এই সময় সত্রাসে ন'টা বাজল।

তাই জানাব।

ডাঃ রুদ্র উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি যে বেনামী চিঠিগুলো পেয়েছেন, সঙ্গে তার একখানাও আছে কি?

আছে। আপনাকে দেখাব বলে একটা চিঠি সঙ্গে এনেছি।

তিনি পকেট থেকে খামে মোড়া একটা চিঠি বার করে বাসবের হাতে দিলেন। তারপর বিদায় নিলেন।

বাসব তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক যা কিছু বলে গেলেন সবই কি সত্যি? হয়তো বা! বাসব চিন্তিত মনে হীরকের উদ্দেশে অফিসরুমের দিকে গেল।

পরের দিন বেলা ন'টার সময় বাসব অজয় সোমের চেম্বারে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হল। কাল তাঁকে ও কথা দিয়েছিল।

হীরকের জন্যে ও অপেক্ষা করছে। সে বাজার থেকে ফিরে এলেই দুজনে যাত্রা করবে অজয় সোমের চেম্বারের উদ্দেশে। ঠিকানাটা জানা থাকলে অবশ্য বাসব একাই চলে যেত কিন্তু ঠিকানা ওর জানা নেই, তাই হীরকের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ঘড়িটা ড্যামেজ হওয়ায় সে বাজারে গেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হীরক ফিরে এল।

গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বলল, কী হে, দেরি করে ফেললাম?

তেমন কিছু নয়। তুমি আর গাড়ি থেকে নেমো না।

বাসব গিয়ে বসল হীরকের পাশে।

এখান থেকে খুব বেশি দূর নয় অজয় সোমের অফিস। শ'ছয়েক গজের মধ্যেই হবে।

মিঃ সোম ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

বাসব ও হীরককে দেখে সাদরে আহ্বান জানালেন তিনি।

বাসব খুঁটিয়ে দেখল ঘরখানা। ওয়ালনাট কালারের ডিস্টেম্পার করা দেওয়াল। উত্তর দিকে পরপর দুটো জানলা। পুব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রতি দিকে একটা করে দরজা। পুবদিকের দরজাটা দিয়েই ওরা ঘরে ঢুকেছে।

জানলা ঘেঁষে কোণাকুণিভাবে সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা রাখা। যথা নিয়মে টেবিলের ওপর যা কিছু থাকা উচিত সবই রয়েছে।

বাসব মিঃ সোমের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার হরিপদ কেমন আছে বলুন?

ভালো আছে। কথা বলতে পারছে।

তাই নাকি! ওকে জিগ্যসবাদ কিছু করেছিলেন?

হ্যাঁ। ও যা বললে, তার সারমর্ম হল, একটার কিছু আগে ও ওই প্যাসেজটায় গিয়েছিল খৈনি খেতে। দরজার পাশে টুলে বসে খৈনি খেতে ওর সংকোচ হয়। রোজই হরিপদ মাঝে-মাঝে উঠে গিয়ে খৈনি খেয়ে আসে। গতকাল ওইরকম খৈনি খাওয়ার সময় কে ওর মাথার পিছনে আঘাত করে। সঙ্গে-সঙ্গে হরিপদ জ্ঞান হারায়।

আচ্ছা, এর আগে ডাঃ রুদ্র ওই ধরনের আর কোনও খাম আপনার কাছে জমা রেখেছেন?

কম করে আরও ত্রিশখানা খাম উনি আমার কাছে জমা রেখেছেন।

ডাঃ রুদ্রকে পরিষ্কারভাবে খাম হারিয়ে যাওয়ার কথাটা বললে কেমন হয়?

অজয় সোম করুণভাবে হাসলেন। বললেন, আপনি তো আগেই বুঝতে পেরেছেন, কথাটা আমি কেন তাঁর কাছে প্রকাশ করতে চাই না। উনি অত্যন্ত খামখেয়ালি লোক। হয়তো এই কারণেই আমাদের বিয়েটা ভেঙে যেতে পারে।

বাসব আর কিছু বলল না। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে কী যেন পর্যবেক্ষণ করল ও। তারপর টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী একটা তুলে নিল।

বস্তুটা আর কিছু নয়। ছোট একটা কাচের টুকরো। স্টেপল মেশিন আর দোয়াতদানের মাঝামাঝি জায়গায় সেটা পড়েছিল। বাসব তাকিয়ে বলল, টেবিলের ওপর সমস্ত কিছুই রয়েছে, শুধু পেপার ওয়েটের অনুপস্থিতিতে একটু অবাক হচ্ছি। টেবিলের ওপর কোনও পেপার ওয়েট ছিল না নাকি?

পেপার ওয়েট—অজয় সোম বিস্মিত দৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই ছিল।

কী আশ্চর্য, সেটা গেল কোথায়?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু সিল করা খামই নয়, ওই সঙ্গে একটা পেপার ওয়েটও হারিয়েছে।

কিন্তু...।

বাসব কথার মোড় ঘোরাল।—হরিপদ কোন অঞ্চলের লোক?

ওড়িশার সম্বলপুর জেলায় বাড়ি।

কত মাইনে দেন?

কুড়ি টাকা।

বাসব হাই তুলল।

হুঁ। আচ্ছা, সেদিন ডাঃ রুদ্র আপনার অফিসে এসে বেশ সাধারণভাবে কথাবার্তা বলছিলেন?

একটু চিন্তা করে অজয় সোম বললেন, তাঁকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বোধ হয় খুব সুস্থ ছিলেন না। হঠাৎ একবার বললেন, আজ বারবার চন্দ্রকান্তর কথা মনে পড়ছে।

চন্দ্রকান্ত! সে কে?

আমার পরিচিত কোনও লোক নয়।

এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। এবার আমরা ফিরে যাব মিস্টার সোম। এসো হীরক—।

একটু চা খেয়ে যাবেন না?

চা—আজ থাক।...ভালো কথা, আপনার ভাবী শ্বশুরমশাই কাল আমার কাছে এসেছিলেন।

কেন? অজয় সোমের চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

তিনি নিজের প্রাণের আশঙ্কা করছেন। কে নাকি তাঁকে বার-বার খুন করার ভয় দেখাচ্ছে।

কই, আমি তো এ সম্বন্ধে কিছু জানি না!

কথাটা বিশেষ জানাজানি হয়নি।...আচ্ছা, চলি—।

বাসব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

ফেরার পথে হীরক প্রশ্ন করলে, কিছু আন্দাজ করলে?

কেন, তুমি কিছু বুঝতে পারোনি?

আমি! কই, না!

বড় রকমের একটা গলদ আমার চোখে পড়েছে হীরক। যেমন অজয়বাবু আমাদের কাল বলেছিলেন, তিনি গিয়ে দেখলেন মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে হরিপদ, কপালের কিছু ওপরে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। এই কথা বলেছিলেন তো?

হ্যাঁ, আমার পরিষ্কার মনে আছে।

অথচ তিনি আজ বললেন, হরিপদ তাঁকে বলেছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে তাকে আঘাত করে।

তাই তো বললেন শুনলাম।

কাজেই ভেবে দেখ স্টেটমেন্ট ডিফার করছে কি না। মাথার পিছন দিকে আঘাত করা হয়ে থাকলে ক্ষত সামনের দিকে হতে পারে না।

তাহলে বলতে হয় মিঃ সোম আমাদের কাছে মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন।

আবার হরিপদও মিথ্যে কথা বলে থাকতে পারে। উত্তেজনার দরুন খেয়াল না করে মিঃ সোম তার কথাই রিপিট করে গেছে আমাদের কাছে হয়তো।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

হীরক বলল, এখন কী করবে ভাবছ?

ভাবছি হরিপদকে যে ডাক্তার চিকিৎসা, করছেন তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলব।

বাসব আর কিছু বলল না।

চিন্তিত মনে সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং রচনা করতে লাগল।

সারাটা দিন নীরবেই কাটিয়ে দিল বাসব।

হীরক বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখল বাসব তখনও চিন্তিত মুখে জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের যা টুকরো জমেছে, তাতে সহজেই চোখ কপালে উঠতে পারে।

কী হে, এখনও ভাবনার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, হাবুডুবু খেতে-খেতে সমুদ্রের তলা থেকে কিছু নুড়ি কুড়িয়ে আনতে পেরেছি, হীরক।

কীরকম?

আমি দুপুরবেলা মিঃ সোমকে ফোন করে ডাক্তারের ফোন নম্বরটা জেনে নিলাম। তারপর তাঁকে ফোন করে প্রশ্ন করলাম, হরিপদর মাথায় ক্ষতটা কীভাবে হয়েছে এবং কোন দিকে হয়েছে। অবশ্য তার আগে তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হাতুড়ি বা ওই ধরনের কিছু দিয়ে হরিপদর কপালের ডান পাশে আঘাত করা হয়েছে।

তারপর?

তারপর আর কী, কতকগুলো জিনিস আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে।

অর্থাৎ—?

অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই গট-আপ। হরিপদ খাম-চোরকে বিলক্ষণ চেনে।

মহা আশ্চর্য হয়ে হীরক বলল, কী বলছ তুমি? তাই যদি হবে, তাহলে হরিপদ খাম-চোরের নাম করছে না কেন?

বললাম না, সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো। ডাক্তার আমায় এ কথা বলেননি যে, হরিপদকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন হাতুড়ি বা ওই ধরনের কিছু দিয়ে। এখন ভেবে দেখো, পেপারওয়েট দিয়ে আঘাত করা যায় কি না? তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মিঃ সোমের টেবিলের পেপারওয়েটটা অদৃশ্য হয়েছে।

তুমি বলতে চাও পেপারওয়েট দিয়ে হরিপদকে আঘাত করা হয়েছিল।

কারেক্ট। এবার তুমি বলো, যদি কেউ তোমার সামনে থেকে আঘাত করতে আসে, তাহলে কি তুমি তার মুখ দেখতে পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে হরিপদ দেখতে পেয়েও যখন স্বীকার করছে না, তখন ব্যাপারটা গট-আপ বলেই কী তোমার মনে হয় না? শোনো, আমার থিয়োরি অনুসারে ঘটনাটা এই ভাবে ঘটেছে, খাম-চোরের সঙ্গে হরিপদর আগে থেকে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা ছিল। মিঃ সোম লাঞ্চে যাওয়ার পরই চোর ঘরে ঢুকে খামটা তুলে নেয় টেবিলের ওপর থেকে, ওই সঙ্গে পেপার ওয়েটটাও। পরিকল্পনা মতো চোর পেপারওয়েট দিয়ে হরিপদকে আঘাত করে চম্পট দেয়। এরকম করার উদ্দেশ্য হল, কেউ যাতে হরিপদকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে না পারে।

হীরক বলল, হরিপদকে তাহলে মর্মান্তিক শারীরিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

হয়েছে বইকি। তবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হল, যদি মিঃ সোম খামটা আগেই তুলে রাখতেন তাহলে কী হত। এ একটা কোয়েন্সিডেন্স। চোর ডাঃ রুদ্রকে অনুসরণ করে অজয় সোমের অফিসে এসেছিল এবং কোনওক্রমে সে বুঝতে পেরেছিল, খামটা টেবিলের ওপর রেখেই মিঃ সোম লাঞ্চে গেছেন। এরপর উপরোক্ত পন্থায় সে খামটা সরিয়েছিল।

হীরক কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়।

হীরক এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল—হ্যালো—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলুন—আমি হীরক চৌধুরী কথা বলছি—ও, মিস্টার সোম, কী ব্যাপার—কী, কী বললেন, ডাঃ রুদ্র মারা গেছেন—মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়—পুলিশ এসেছে—আমি বাসবকে নিয়ে এখুনি ওখানে যাব—বেশ, আমরা যাচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে হীরক বলল, ডাঃ রুদ্র—।

মারা গেছেন। মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়, শুনলাম।

কী অদ্ভুত কাণ্ড। ভাবতেই পারা যায় না এ কথা।

আমিও বুঝতে পারিনি। কাল রাত্রে যখন সমস্ত কিছু আমায় বলে গেলেন, তখনও অনুমান করিনি তিনি আজই মারা যাবেন।

মিঃ সোম তোমায় ওখানে যেতে রিকোয়েস্ট করলেন, যাবে নাকি?

সিগারেটের ছাই ছাড়তে-ছাড়তে বাসব বলল, স্বর্গে গিয়েও ঢেঁকি রেহাই পায় না, হীরক। ভেবেছিলাম আগ্রায় এসে কিছুদিন বিশ্রাম করব, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ঘটে উঠছে কই। চলো, যাওয়াই যাক।

॥ চার ॥

বাসব ও হীরক যখন ডাঃ রুদ্রের বাড়ি এসে পৌঁছলো, তখন সাড়ে সাতটা।

গেটের বাইরে কয়েকটা পুলিশ-ভ্যান পার্ক করা হয়েছে। ওরা দুজন গেটের বাইরেই গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির মধ্যে গেল। ভেতর থেকে একটা চাপা কোলাহল ভেসে আসছে। বারান্দায় পা দেওয়ার পরই মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের।

তিনি বললেন, এই যে আপনারা এসে পড়েছেন। কী বিশ্রী কাণ্ডটাই যে ঘটে গেল—

খুবই দুঃখের কথা। তিনি যে এইভাবে—।

বাসব হীরককে বাধা দিয়ে বলল, তিনি কী সত্যিই স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি মিস্টার সোম?

না, তিনি খুন হয়েছেন।

এই সময় একজন পুলিশ-কর্মচারী এগিয়ে এলেন ওদের দিকে।

অজয় সোম পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনিই বিখ্যাত বাসববাবু। যাঁর কথা একটু আগে আপনাকে বলছিলাম। আর ইনি হলেন ইন্সপেক্টর প্রেমপ্রকাশ।

নমস্কার বিনিময় হল।

ইন্সপেক্টর প্রেম বললেন, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি মিস্টার ব্যানার্জি। এখন পরিচিত হয়ে আনন্দিত হচ্ছি।

বাসব মৃদু হেসে বলল, এই আনন্দ উভয়ত মিস্টার প্রেম।

এরপর দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হল দুজনের মধ্যে।

ফোন পেয়ে মাত্র মিনিট কুড়ি হল এখানে এসেছে পুলিশ। এখনও কারুর জবানবন্দি নেওয়া হয়নি। যতদূর ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করা গেছে তাতে, কেসটা খুবই জটিল মনে হয়েছে ইন্সপেক্টর প্রেমের। বাসব এসে পড়ায় তিনি খুশি হয়েছেন। তদন্তে ওর সাহায্য মিঃ সোমের মতোই তাঁর কাম্য।

বাসব বলল, চলুন, এবার ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।

ইন্সপেক্টর বাসবকে স্টাডিতে নিয়ে এলেন।

ঘরখানা বেশ ছোট। দেওয়ালের সঙ্গে ফিক্সড করা আলমারিগুলোয় কেতাবের সারি।

দুটো বড়-বড় জানলা পাশাপাশি। কাচের শার্সি আঁটা।

একটি মাত্র দরজা। তার একটা পাল্লা আধভাঙা অবস্থায় একপাশে ঝুলছে।

ঘরের মাঝখানে সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিল, খানকয়েক গদিমোড়া চেয়ার তার চারপাশে। তার একখানায় বসে, টেবিলের ওপর মুখ রেখে পড়ে আছেন ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র। মনে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন যেন তিনি।

বাসব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মৃতদেহটা দেখতে-দেখতে বলল, কোনও উন্ড আছে কি?

না।

মার্ডার সম্বন্ধে স্যাঙ্গুইন হচ্ছেন কীভাবে? এমন তো হতে পারে উনি হঠাৎ হার্টফেল করেছেন?

ইন্সপেক্টার বললেন, ডাক্তার রুদ্রকে পটাশিয়াম সায়ানাইড দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

কোনও ডাক্তার পরীক্ষা করেছেন কি?

হ্যাঁ। ডাক্তার রুদ্রের ছোট ভাই ডাঃ বিনয় রুদ্র আমাদের জানিয়েছেন একথা।

ওয়েল ইন্সপেক্টার, আমি বাড়ির সকলকে কিছু-কিছু প্রশ্ন করতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পারেন। আমি সকলের স্টেটমেন্ট নিতামই, আপনিই নিন। আমি বরং নোট নিচ্ছি।

বেশ। প্রথমে তাহলে ডাঃ বিনয় রুদ্রকেই ডেকে পাঠান।

পরিবারের প্রায় সকলেই এতক্ষণ এখানেই ছিলেন। পুলিশ আসার পর যে যার নিজের ঘরে চলে গেছেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বিনয় রুদ্র এলেন। রোগা, লম্বা চেহারা। গায়ের রং ফরসা। চোখে চশমা। বয়েস চল্লিশের মধ্যেই। ম্রিয়মাণ মুখ।

বসুন ডাক্তার রুদ্র।

বাসবের অনুরোধে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

আমি পুলিশের লোক নই। আপনার দাদার হত্যাকাণ্ড বেসরকারি ভাবে তদন্ত করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছি।

বিনয় রুদ্র কিছু বললেন না।

বাসব আবার বলল, আপনাকে গোটাকতক প্রশ্ন করতে চাই।

বলুন?

শুনলাম, আপনিই প্রথমে বুঝতে পারেন, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, হত্যা। এরকম সিদ্ধান্ত আপনি কীভাবে করলেন?

একজন ডাক্তার হিসেবে। বডিতে সায়ানাইডের কিছু সিম্পটম লক্ষ করে আমি মার্ডার সম্বন্ধে স্যাঙ্গুইন হয়ে পড়ি।

ও। এমন হতে পারে তো, আপনার দাদাকে কেউ খুন করেনি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন?

আত্মহত্যা করার একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই।

আপনি বলতে চাইছেন, আত্মহত্যা করার মতো শোচনীয় মনের অবস্থা আপনার দাদার ছিল না?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন বিনয় রুদ্র।

বাসব আবার বলল, আপনারা কখন এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পারলেন?

ছটার সময়। বাড়ির পুরোনো চাকর দাদাকে চা দিতে যায়। ওই সময় তিনি রোজ দ্বিতীয়বার চা খেতেন। কিন্তু বার-বার ডেকে এবং দরজায় ধাক্কা দিয়েও তাঁর কোনও সাড়া না পেয়ে আমাদের ডাকে।

তারপর?

আমরাও অনেক ডাকাডাকির পর সাড়া না পেয়ে অনন্যোপায় হয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই।

হুঁ। আপনি আপনার দাদাকে জীবিত অবস্থায় শেষবার কখন দেখেন?

বিকেল পাঁচটায় সময়।

সে সময় উনি কোথায় ছিলেন?

চেম্বারে বসে রুগি দেখছিলেন।

বিকেলের দিকে কতক্ষণ তিনি চেম্ব্যারে থাকতেন?

চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা। কোনও-কোনও দিন ছ'টা।

তারপর কী করতেন?

ক্লাবে যেতেন। টেনিস তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

আপনি কি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন?

এই ধরনের প্রশ্নের পব প্রশ্নে বেশ বিরক্ত বোধ করছিলেন বিনয় রুদ্র। কিন্তু মুখে সেভাব প্রকাশ না করে বললেন, আমি একটি ওষুধের কারখানার সঙ্গে যুক্ত আছি।

ধন্যবাদ বিনয়বাবু। আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এবার আপনি যেতে পারেন।

বিনয় রুদ্র ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, ইন্সপেক্টর প্রেম বললেন, এবার কাকে ডাকা যায় বলুন, ডাক্তার রুদ্রর ছেলে সঞ্জীববাবুকে, না মেয়ে সুমিত্রা দেবীকে?

বাসব বলল, আগে ঘরখানা ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া যাক। তারপর আবার কাউকে ডাকা যাবে।

ও সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল।

টেবিলের ওপর মাত্র গুটি কয়েক জিনিস আছে। একটা প্যাড, খানকয়েক ফাইল, কালিব দোয়াত, খানতিনেক পেন্সিল। একটা ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, আর এক বাক্স টুথপিক।

একখানা বই মাটিতে পড়ে রয়েছে। মারা যাওয়ার আগে বোধহয় বইখানা পড়ছিলেন ডাঃ রুদ্র।

বইখানা তুলে নিল বাসব। রাইডার হ্যার্গাডের লেখা ব্ল্যাড শ্যাডো। বহুল প্রচারিত রোমাঞ্চকর উত্তেজনামূলক উপন্যাস। বইখানার মলাটের ওপর সুদৃশ্য জ্যাকেট।

প্রেমপ্রকাশ প্রশ্ন করলেন, কীরকম বুঝছেন?

বাসব চিন্তিত গলায় বলল, আমি ভাবছি হত্যাকারী কোন পথ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল।

আমিও ভাবছি তাই। জানলা দুটো ভেতর দিক থেকে বন্ধ, দরজাটাও বন্ধ ছিল। অথচ—

বাসব আরেকবার ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। আর কোনও পথ নেই ঘরের মধ্যে আসার। তবে কি হত্যাকারী ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল হাওয়া হয়ে?

ধরে নেওয়া যায় যদি হত্যাকরী ঘরের মধ্যে না এসেই ডাঃ রুদ্রকে হত্যা করবার পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিল, তাহলে টেবিলের ওপরে বা মেঝেয় একটা গেলাসের সন্ধান পাওয়া যেত।

কেন?

জলের গেলাসে সায়ানাইড মিশিয়ে রাখাটাই সহজ। জল খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু নিজে থেকেই এসে পড়ে। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু তো দেখছি না।

আত্মহত্যার ওপর আমরা জোর দিতে পারি নাকি? ইন্সপেক্টর প্রেম বললেন, উনি নিজেই হয়তো সায়ানাইড পাউডার ইউজ করেছিলেন।

এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। বাসব বলল, আমি বিশেষভাবে জানি, অর্থাৎ গতকালই তিনি আমায় এমন গোটাকতক কথা বলছিলেন, যার ওপর নির্ভর করে আমি বলতে পারি তিনি বেঁচে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়া তাঁর মতো বিজ্ঞ লোক আত্মহত্যা করার আগে নিশ্চয়ই একটা চিঠি লিখে রেখে যেতেন।

কথা বলতে-বলতে বাসব ঝুঁকে পড়ল মেঝের দিকে। একটা কাঠি পড়ে রয়েছে। ইঞ্চি আড়াই লম্বা একটা কাঠি।

বাসব কাঠিটা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বলল, মিস্টার প্রেম, এবার আপনি ডেডবডি মর্গে পাঠাতে পারেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হল। অবশ্য তার আগে পুলিশের ফটোগ্রাফার মৃতদেহ ও ঘরের কয়েকটা ছবি তুলতে ভুললেন না। এবার কাকে ডাকব বলুন?

এবার কাকে ডাকব বলুন?

সঞ্জীব রুদ্রকে।

খবর পাঠাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সঞ্জীব রুদ্র এলেন। স্বাস্থ্যবান যুবক। বয়েস আন্দাজ তিরিশ।

বাসব মৃদু গলায় বলল, আপনাকে এসময় বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত মিস্টার রুদ্র। প্রয়োজনের তাগিদে এটুকু করতে হয়েছে জানবেন।

দেখুন, আমার মনের অবস্থা ভালো নেই। যা বলতে চান, তাড়াতাড়ি বলুন।

আপনার বাবা নিহত হয়েছেন—নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন হত্যাকারী ধরা পড়ুক?

মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন সঞ্জীব রুদ্র।

তাহলে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে গোটাকতক প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন?

বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টা অবধি—অর্থাৎ অনুমান করা যাচ্ছে যেসময় আপনার বাবা নিহত হন, সে সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

নিজের ঘরে।

তারপর?

হইহল্লা কানে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শুনি, হাজার ডাকাডাকির পরও বাবা স্টাডি থেকে বেরুচ্ছেন না। তখন বাধ্য হয়ে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলি।

স্টাডিতে ওই দরজা ছাড়া আর কোনও গুপ্ত প্যাসেজ আছে?

না।

আপনি কী কাজকর্ম করেন সঞ্জীবাবু?

নর্দান ইন্ডিয়া আয়রন অ্যান্ড স্টিলের আমি ফোরম্যান।

বাসব প্রশ্নের মোড় ঘোরাল।—পরশু রাত্রে—বোধহয় তখন দেড়টা, আপনি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বারান্দার আলো জ্বেলেছিলেন কেন?

মহা আশ্চর্য হয়ে সঞ্জীব বললেন, আপনি একথা জানলেন কীভাবে?

জেনেছি নিশ্চয়ই কোনও সূত্রে। আমার প্রশ্নর উত্তর এখনও আপনি দেননি।

সেদিন শরীর আমার ভালো ছিল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিলাম। হঠাৎ মনে হল বারান্দা দিয়ে কে যেন দ্রুতপায়ে চলে যাচ্ছে; ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বারান্দায় আলো জ্বাললাম। কেউ কোথাও নেই। ঘরে ফিরে আসছি, আবার মনে হল, এবার সিঁড়ি দিয়ে কে যেন—থামলেন সঞ্জীব রুদ্র।

সিঁড়ি দিয়ে কাকে নেমে যেতে দেখলেন?

দেখলাম—।

বলুন, থামলেন কেন?

দেখলাম কাকা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন।

কাকা মানে—বিনয়বাবু?

হ্যাঁ।

হুঁ। আপনার কাকা কি বিবাহিত?

না, অনেক চেষ্টা করেও বাবা ওঁর বিয়ে দিতে পারেননি।

আপনার বাবার সম্পত্তি এখন নিশ্চয়ই আপনি আর আপনার বোন পাবেন?

আমি যতদূর জানি, বাবা নিজের স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত কিছু তিন ভাগে ভাগ করে গেছেন। আমার, সুমিত্রা ও কাকার মধ্যে।

আচ্ছা, টেবিলের ওপর ওই টুথপিকের বাক্সটা কেন বলতে পারেন?

বাবার সবসময় দাঁত খোঁচানো একটা অভ্যেস ছিল। তাই আমাদের বাড়ির যেখানে-সেখানে টুথপিকের বাক্স আপনি দেখতে পাবেন।

ধন্যবাদ সঞ্জীববাবু। আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ বিরক্ত করলাম। আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।

একটি কথাও না বলে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সঞ্জীব রুদ্র।

ইন্সপেক্টর প্রেম বললেন, বাপের মৃত্যুতে ছেলে তেমন শোকাহত হয়েছে বলে মনে হল না।

বাসব হাসল। বলল, ওরকম পয়সাওলা বাপ পটল তুললে শোক একটু বিলম্বেই আসে ইন্সপেক্টার। চলুন, সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে দেখাটা করে নিই।

সুমিত্রা নিজের ঘরে শোকে মুহ্যমান হয়ে বসেছিল।

সুগঠনা, সুরূপা মেয়েটি। এই দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

চাকরের মুখে খবর পাঠিয়ে, বাসব ও ইন্সপেক্টার তার ঘরে প্রবেশ করল। সময়োচিত সান্ত্বনা দেওয়ার পর বাসব বলল, আপনার বাবার হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা আমরা চাই। কাঁপা গলায় সুমিত্রা বলল, আমি আর আপনাদের কী সাহায্য করতে পারি?

আমার গোটাকতক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেই প্রচুর সাহায্য করা হবে।

বলুন?

আপনার সঙ্গে ডাক্তার রুদ্রর শেষ কখন দেখা হয়?

পাঁচটার কিছু পরে। বাবা তখন চেম্বারে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন।

কোনও কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে?

বাবার শরীর ভালো ছিল না, আমি তাঁকে চেম্বারে যেতে নিষেধ করছিলাম।

তিনি কি আপনার কথা শুনেছিলেন?

হ্যাঁ। প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেও, পরে আমার কথা মেনে নিয়েছিলেন।

ডাঃ রুদ্র কি চেম্বারের কাজ শেষ হওয়ার পর কোথাও বেরুতেন?

মাঝে-মাঝে ক্লাবে যেতেন, নইলে হিসেবপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

হিসেবপত্র!

বাবা অত্যন্ত হিসেবি লোক ছিলেন। রোজকার আয় হিসেব করে চেম্বারের ড্রয়ারে রাখতেন। তারপর কয়েক দিনের জমা টাকা একদিন ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতেন।

ইদানীং বাড়ির কারুর সঙ্গে আপনার বাবার মতান্তর হয়েছিল?

আজই সকালে কাকার সঙ্গে কী একটা টাকার ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। উনি কখনও কাউকে বকতেন না। যদি বা—।

কথা ক'টা বলতে-বলতে গলা বুজে এল সুমিত্রার। কয়েক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

আপনার মনের অবস্থা অনুমান করতে আমার কষ্ট হচ্ছে মিস রুদ্র। সত্যি, খুবই দুঃখের কথা। তাঁর মতো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন এইভাবে শেষ হবে কে জানত।

সুমিত্রা নীরব রইল।

বাসব আবার বলল, আপনার সঙ্গে অজয়বাবুর বিয়ের কথা হচ্ছে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা মিস রুদ্র, প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র কি অজয়বাবুর কাছে গচ্ছিত রাখতেন আপনার বাবা?

আমি ওবিষয়ে সঠিক কিছু জানি না।

এবার আমরা উঠব। আমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে। আসুন ইন্সপেক্টার—দুজনে আবার স্টাডিতে ফিরে এল।

ঘরে কেউ নেই। হীরক ও অজয় সোম পাশের ঘরে যে যার চেয়ারে বসে।

বাসব বলল, আপনি সকলের কথাই তো শুনলেন। কোথাও বেখাপ্পা কিছু চোখে পড়ল কি?

ইন্সপেক্টার বললেন, কই, তেমন...।

স্টেটমেন্টগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে গেলেই আপনি গোলমালটা ধরতে পারবেন। বেশ, আমিই বলছি আপনাকে পরিষ্কার করে। বিনয়বাবু আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, তিনি ডাঃ রুদ্রকে শেষ দেখেন পাঁচটার সময়। তখন তিনি চেম্বারে রুগি দেখছিলেন। অথচ ঠিক ওই প্রশ্নের উত্তরেই সুমিত্রা দেবী বললেন, পাঁচটার কিছু পরে তাঁর অনুরোধে ডাঃ রুদ্র চেম্বারে গেলেন না।

তাই তো। এখন ধরে নিতে হবে দুজনের মধ্যে একজন মিথ্যে কথা বলছেন। কে তিনি—?

তিনি যেই হোন—ও আলোচনা উপস্থিত মুলতুবি থাক। এখন বলুন ডাঃ রুদ্রের চেম্বার এখান থেকে কত দূরে?

বিন্দুমাত্র দূরে নয়, এই বাড়িতেই তাঁর চেম্বার।

আই সি। চলুন, সেখানে একবার যাওয়া যাক।

পোর্টিকোর ডান ধারের তিনখানা ঘর নিয়ে চেম্বার।

প্রথমটি রুগিদের ওয়েটিংরুম, তারপরের ঘরটিতে ডাক্তার বসতেন আর সব শেষের ঘরখানা ডিসপেনসারি।

বাসব খুঁটিয়ে দেখল ঘর তিনটি। ইন্সপেক্টারও সজাগ দৃষ্টি রেখে ঘরগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের চেম্বার যেরকম হওয়া উচিত, এটি তার ব্যতিক্রম নয়। চমৎকার ভাবে সাজানো যথাযথ।

বাসব ডাক্তারের বসবার ঘরের টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। পুরু কাচ দিয়ে টেবিলের ওপরের ভাগটা ঢাকা। এক ধারে পর-পর তিনটে দেরাজ। বাসব ওপরকার দেরাজটা টেনে দেখল—বন্ধ। চাবি দিয়ে বন্ধ। পরেরটা অবশ্য টানতেই খুলে গেল। অনেক কিছু রয়েছে তার মধ্যে। হিসেবের খাতা, প্যাড, কিছু মেডিক্যাল জার্নাল। খানকতক চিঠিও রয়েছে, আর রয়েছে একখানা ফটোগ্রাফ।

ছবিটা খুবই পুরোনো, ফেড হয়ে গেছে। আধাবয়সি কোনও লোকের ছবি। ভদ্রলোক বলিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন।

বাসব চিঠিগুলো তুলে নিল। হপ্তা-দুয়েকের মধ্যেই এসেছে সেগুলো। সবই ওষুধ কোম্পানি থেকে আসা চিঠি।

চিঠিগুলো রেখে হিসেবের খাতাটা এবার হাতে নিল ও। তারিখের নীচে-নীচে দৈনিক সমস্ত হিসেব তাতে লেখা রয়েছে। এমনকী এক আনা বা দু'পয়সার হিসেবও বাদ পাড়েনি।

বাসব হিসেবের খাতা থেকে মুখ তুলে বলল, খুবই সিস্টেমেটিক ছিলেন ডাঃ রুদ্র। খুঁটিনাটি কিছুই তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত না।

প্রেমপ্রকাশ বললেন, আমি যতদূর শুনেছি, ভদ্রলোক খুবই কৃপণ ছিলেন।

বাসব এবার নীচের দেরাজটা টেনে দেখল—সেটাও বন্ধ।

চলুন, এবার যাওয়া যাক, এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। মিস্টার প্রেম, আপনি শুধু বন্ধ দেরাজ দুটো খোলাবার ব্যবস্থা করুন। পরে একসময় এসে ও-দুটো পরীক্ষা করে যাওয়া যাবে।

॥ পাঁচ ॥

কোচের ওপর আড় হয়ে বসে সিগারেট টানছে বাসব। হীরক আরেকটা কোচে বসে।

দুজনেই চুপচাপ।

শেষে হীরকই নীরবতা ভঙ্গ করল। বলল, কী হে, কিছুই বলছ না যে?

কী শুনতে চাও, বলো?

ডাঃ রুদ্রর হত্যা সম্বন্ধে কীরকম কী বুঝলে?

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, ডাঃ রুদ্রকে কে খুন করেছে, তা এখন আমার কাছে প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল খুনের মোটিভ কী?

মোটিভ?

নিশ্চয়ই, মোটিভ একটা থাকতে হবে বইকি। কারণ না থাকলে কর্ম হয় না হীরক।

তা বটে।

সম্পত্তির লোভে কেউ তাঁকে খুন করেছে, একথা বলা চলে না। ডাঃ রুদ্র কোনওরকম গোলমাল না রেখে তিন ভাগে সম্পত্তি ভাগ করে গেছেন শুনলাম। কাজেই সম্পত্তির লোভে কেউ তাঁকে খুন করেনি। রাগের মাথায় কেউ এ কাজ করেছে, তাই বা বলি কীভাবে।

খুন করার পদ্ধতিতে এমন চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গেছে, যাতে সহজেই অনুমান করা যায়, হত্যাকারী অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে, সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাহায্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। আচমকা কোনও ঘটনা হলে সে কখনই এতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারত না।

তোমার কী মনে হয়—হীরক বলল, অজয় সোমের খাম চুরি যাওয়া ও এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে?

যদিও এখনও ও বিষয়ে কিছু ভেবে দেখিনি, তবে দুটো ঘটনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যাক, এখন ডাঃ রায় সম্বন্ধে গোটাকতক কথা আমায় বলো দেখি?

কী কথা, বলো?

তাঁর আর্থিক অবস্থা কি খুব ভালো ছিল?

তিনি রীতিমতো ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

এখানে কতদিন ধরে প্র্যাকটিস করেছেন?

তা বছর আটেক হবে।

বাসব বিস্মিত গলায় বলল, মাত্র বছর আটেক! তার আগে কোথায় ছিলেন?

কলকাতার কোন এক কোম্পানির মাইনে করা ডাক্তার ছিলেন।

অথচ তিনি অত্যন্ত ধনশালী! তাঁর এই আশানুরূপ অবস্থাটা একটু সন্দেহজনক নয় কি হীরক?

তুমি বলতে চাইছ, সারা জীবন চাকরি করার পর মাত্র আট বছর প্র্যাকটিস করে কারুর এতটা ধনী হওয়া সম্ভব নয়?

এক্সজ্যাক্টলি। তবে পৈত্রিক সূত্রে তিনি যদি অর্থশালী হয়ে থাকেন, স্বতন্ত্র কথা।

তা-ও নয়। কতবার তাঁর মুখে শুনেছি—হীরক বলল, তিনি নাকি স্কুলের মাস্টারের ছেলে ছিলেন।

হুঁ। বাসব আর কিছু বলল না। একটা সিগারেট ধরাল।

বেশ কয়েক মিনিট নীরবে কেটে যাওয়ার পর ও ঘড়ির দিকে তাকাল। দুটো দশ।

বলল, চলো, অজয় সোমের অফিস থেকে একবার ঘুরে আসি।

অজয় সোম অফিসেই ছিলেন। সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ওদের। তাঁকে কিছুটা ম্রিয়মান দেখাচ্ছে।

বাসব একটা চেয়ারে বসে বলল, হরিপদ নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠেছে? তাকে একবার ডেকে পাঠান।

হরিপদ! সে তো ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে।

বাড়ি গেছে! কীরকম?

কাল ও আমায় বলল, দিন দশেকের ছুটি দিন, বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। হাওয়া বদলালে অসুস্থ শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। তাই ওকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

কাজটা আপনি খুব ভালো করেননি মিস্টার সোম। তাকে ছুটি দেওয়ার আগে অন্তত একবার আমাকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত ছিল।

মিঃ সোম বললেন, সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

তার ঠিকানা জানেন?

সম্বলপুর জেলার কোন একটা গ্রামে তার বাড়ি, এর বেশি আমি কিছু জানি না।

বাসব আর ও-প্রসঙ্গ তুলল না। বলল, রুদ্র পরিবারের সঙ্গে আপনার আলাপ কী সূত্রে?

ব্যবসা সূত্রেই। আমি এখানে অফিস খোলার পরই ডাঃ রুদ্র ক্লায়েন্ট হিসেবে আমার কাছে আসেন। তারপর পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হবওয়ার পর আমি তাঁর বাড়িতে যাওয়া-আসা আরম্ভ করি।

আচ্ছা, ডাঃ রুদ্রের কী ধরনের কাজকর্ম আপনি করতেন?

তিনি নিয়মিত আমার কাছে কাগজপত্র জমা রাখতেন। ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয়ে কোনও গোলমাল বাঁধলে, সেগুলো দেখাশোনা করতে হত। তাছাড়া তাঁর উইলটিও আমার সাহায্যে তৈরি হয়েছে।

উইলের বিষয় কিছু বলতে এখন নিশ্চয়ই আপনার কোনও আপত্তি নেই।

উইল পড়ার আগে কোনও কিছু বলাটা অবশ্য উচিত নয়। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি আপনাদের বলছি—তাঁর নগদ ছ'লক্ষ টাকা, তিনখানা বাড়ি ও ত্রিশ হাজার টাকার গহনা তিন ভাগে তিনি ভাই ও দুই ছেলেমেয়েকে দিয়ে গেছেন।

বাসব একটু থেকে বলল, আর কাগজপত্র, যা তিনি আপনার কাছে জমা রাখতেন, সেগুলো সম্বন্ধেও আমার আগ্রহ রয়েছে।

ও বিষয় আপনাকে জানাবার মতো আমি জানি না। কাগজপত্র সমস্তই তিনি শিল করা খামে আমায় দিয়ে যেতেন।

এখন অবশ্য একটা কাজ করা যেতে পারে, আপনি খামগুলোর মধ্যে থেকে একটা নিয়ে আসুন। খুলে দেখা যাক কী আছে তাতে।

অজয় সোম চেয়ার ছেড়ে আয়রন সেফের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দেওয়ালের সঙ্গে ফিক্সড করা আয়রন সেফ। বিচিত্র গঠনের চাবির সাহায্যে তার পাল্লা খুললেন তিনি। একটা মুখ-আঁটা খাম বের করলেন।

খামের মুখ ছেঁড়া হল। ভেতরে পাওয়া গেল একটা হ্যান্ডনোট।

টাকা ধার দেওয়ার দলিল। বাসব দলিলটা পরীক্ষা করল। জনৈক ধরনীধর দুবেকে আট হাজার টাকা ধার দেওয়া হয়েছে—দলিলটা তারই।

বাসব কয়েক মিনিট চিন্তা করে বলল, মনে হচ্ছে, সমস্ত খামগুলোতে হ্যান্ডনোটই আছে। বোধহয় সেদিন আপনার চেম্বার থেকে যে খামটা চুরি গেছে, তাতেও কোনও হ্যান্ডনোট ছিল।

হীরক বলল, ডাঃ রুদ্র টাকা ধার নেওয়ার ব্যবসা করতেন ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে।

আমি অবাক হচ্ছি, অজয় সোম বললেন।

আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি না, বাসব বলল, এবার তাহলে উঠি। বেশ কিছুক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম।

না, না, বিরক্ত আর কী। আমি এর একটা আশু মীমাংসা চাই মিস্টার ব্যানার্জি!

আপ্রাণ চেষ্টা আমি করছি মিস্টার সোম। এসো হীরক—।

ফেরার পথে হীরক প্রশ্ন করল, ডাক্তার রুদ্র টাকা ধারের ব্যাবসা করতেন, এতে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ না কেন?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমি আগেই তোমার কাছে ডাঃ রুদ্রর অত্যধিক ধনশালী হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছি। আশ্চর্য হচ্ছি এই জন্যে যে, এখন বুঝতে পারলাম তাঁর অর্থাগমের অন্যতম কারণটা কী, তবে ওই সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন এখানে অ্যারাইজ করছে, তিনি যখন টাকা ধারের ব্যবসা করতেন, তখন তাঁর কাছে মোটা টাকাই মজুত ছিল। এই মোটা টাকাটা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন?

তাই তো!

আমার মনে হয়, কোনও বাঁকা পথ দিয়ে টাকাটা তাঁর কাছে এসেছিল।

হীরক কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

বাসব তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, সঞ্জীব রুদ্র দ্রুতপায়ে অজয় সোমের অফিসের দিকে যেতে-যেতে, ওদের দেখতে পেয়েই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

বাসব গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, কোথায় চলেছেন এত ব্যস্তভাবে?

নিজের থতমত ভাবটা অসীম বলে সংযত করে নিয়েছেন ততক্ষণে সঞ্জীব রুদ্র। বরং মুখে কিছুটা বিরক্তির ভাবই ফুটে উঠেছে।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কোথাও একটা কাজে যাচ্ছি নিশ্চয়ই।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। ডাঃ রুদ্রর সেক্রেটারি—সুব্রত রায় নাম বোধ হয় ভদ্রলোকের, তাঁকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

বেশ।

আর দাঁড়ালেন না সঞ্জীব। দ্রুত অন্তর্হিত হলেন সেখান থেকে।

বাসব ও হীরক মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

শেষে হীরক বলল, ভীষণ রগচটা ছেলে। ওর ওই স্বভাবের জন্যে ডাক্তার কম আক্ষেপ করতেন না।

হুঁ। থানায় চলো।

ওরা থানায় পৌঁছবার আগেই ইন্সপেক্টর প্রেমপ্রকাশ থানায় ফিরেছেন।

বাসব পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা দেখতে চাইল।

রিপোর্ট এগিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর।

পটাশিয়াম সায়ানাইডে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সময় নির্দেশ করা হয়েছে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে।

বাসব রিপোর্ট থেকে মুখ তুলে বলল, কীভাবে ডাঃ রুদ্রকে হত্যা করা হয়েছিল বলে আপনি অনুমান করেন।

পটাশিয়াম সায়ানাইড দিয়ে।

আমি বলতে চাইছি ডাঃ রুদ্রর শরীরে সায়ানাইড গেল কীভাবে। যেক্ষেত্রে হত্যাকারী স্টাডির মধ্যে প্রবেশ করেনি বলে আমরা ধরে নিয়েছি।

ইন্সপেক্টর বললেন, ও বিষয় কোনও সিদ্ধান্ত এখনো আমি করিনি।

আমি কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

কীরকম?

ডাঃ রুদ্র নিজের অভ্যাসের দোষেই মারা গেছেন।

আপনার কথাটা ঠিক ফলো করলাম না।

তাঁর সর্বদা দাঁত খোঁটবার অভ্যাস ছিল। বাড়ির সর্বত্র টুথপেকের বাক্সের ছড়াছড়ি। একথা জানা ছিল হত্যাকারীর, সে ডাঃ রুদ্রর অভ্যাসটাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছে।

অর্থাৎ—?

আপনি বোধ হয় লক্ষ করে থাকবেন, সেদিন আমি মৃতদেহ পরীক্ষা করার সময় মেঝে থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়েছিলাম।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—।

আমার শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র আছে। বাসব বলল, তাকে কাছ-ছাড়া করি না। আগ্রাতেও এনেছি। ওই কুড়িয়ে পাওয়া কাঠিটা কাল রাত্রে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখলাম। কাঠির গায়ে সায়ানাইডের সন্ধান পাওয়া গেছে।

আপনি বলতে চান—দ্রুত বেগে প্রেমপ্রকাশ বললেন, বই পড়তে-পড়তে ডাঃ রুদ্র নিজের অভ্যাসমতো টেবিলের ওপর রাখা টুথপিকের বাক্স থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়ে দাঁতে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেছেন?

ঠিক তাই?

টুথপিকের বাক্সর প্রত্যেকটা কাঠিতেই তাহলে সায়ানাইড মাখানো ছিল বলতে হবে। নইলে বেছে-বেছে বিষ মাখানো কাঠিটাই ডাঃ রুদ্র তুলে নেবেন, এটা কোনও যুক্তিসঙ্গত কথা নয়।

তাই তো ছিল। প্রত্যেক কাঠিতেই সায়ানাইড মাখানো ছিল। আপনি বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ভালো কথা, ডাঃ রুদ্রর দেরাজে যে ফটোগ্রাফখানা পাওয়া গেছে, সে সম্বন্ধে কিছু খোঁজ করেছিলেন নাকি?

আলাদা-আলাদাভাবে আমি বাড়ির প্রত্যেককে ছবিটা দেখিয়েছিলাম, কিন্তু কেউই ছবির মধ্যেকার লোকটির পরিচয় দিতে পারলেন না।

আশ্চর্য। যাই হোক, ডাঃ রুদ্রর অতীত সম্বন্ধে আমাদের খুব ভালোভাবে খোঁজ-খবর করা দরকার।

আমি তার ব্যবস্থা করেছি। দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে কিছু খবর পাওয়া যাবে—

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে কেসটা ইন্সপেক্টরের দিকে এগিয়ে ধরল। প্রেমপ্রকাশ একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালেন।

হীরক সিগারেট খায় না।

ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে প্রেম বললেন, আমার চাকরি-জীবনের চোদ্দ বছর চলেছে। বহু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আমি করেছি। তবে এই ধরনের রহস্যময় খুনের সম্মুখীন এই আমায় প্রথম হতে হল। হত্যাকারী সম্পূর্ণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে চমৎকারভাবে কাজটা সম্পন্ন করেছে। এমন একটা ক্লু কোথাও নেই, যার ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি।

বাসব বলল, আমাকে অবশ্য বহুবারই অনেক রহস্যেরই সামনাসামনি হতে হয়েছে, তবু এ ঘটনার সঙ্গে পূর্বের আর কোনও ঘটনার সিমিলারিটি নেই, একথা বলতে পারি।

বাসব এরপর ইন্সপেক্টারকে অজয় সোমের খাম চুরি থেকে হরিপদর ছুটি নেওয়া অবধি সমস্ত কিছু বলল।

সমস্ত শুনে প্রেমপ্রকাশ বললেন, আমাদের তাহলে এখন অন্যতম কাজ হল হরিপদকে খুঁজে বার করা।

আমার দৃঢ় ধারণা হরিপদকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই সময় চা এল।

ট্রের ওপর তিনটে চায়ের কাপ বয়ে আনল একজন কনস্টেবল। ইন্সপেক্টর বোধ হয় আগেই এবিষয় কোনও ইশারা দিয়ে রেখেছিলেন।

চা খেতে-খেতে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলল।

কথা প্রসঙ্গে প্রেমপ্রকাশ বললেন, কিন্তু একটা ব্যাপার খুবই আশ্চর্যজনক।

কী বলুন তো?

মারা যাওয়ার আগে ডাঃ রুদ্র বই পড়ছিলেন। সময়টাও ছিল বিকেল। দরজা বন্ধ করে বিকেলবেলা গল্পের বই পড়ার কী সার্থকতা থাকতে পারে?

একটু চিন্তা করে বাসব বলল, আপনি ভালো পয়েন্ট রেজ করেছেন। আমার মনে হয়, উনি দরজাটা বন্ধ করেছিলেন বই পড়ার জন্যে নয়। বই পড়ার আগে হয়তো অন্য কিছু করছিলেন, যা সকলকে তিনি জানতে দিতে চান না। তাই তাঁকে দরজা বন্ধ করতে হয়েছিল।

তা হতে পারে।

শহরতলির একাংশ।

আগ্রার শহরতলি। বৈভবের ছোঁয়াচ এখানে কিছুটা ম্লান। নিম্ন শ্রেণির লোকেদের আবাস-বহুল অঞ্চলের পথগুলি ইট বাঁধানো।

এখানে নানা দেশীয় লোকের বসবাস। তাদের মধ্যে বুঝি শিখেদের সংখ্যাই বেশি। বোধ হয় তারা রিফিউজি।

লোকালয় ছাড়িয়ে স্মল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের সাহায্যপুষ্ট কয়েকটা যন্ত্রশালা। সেগুলো পেরিয়ে একটা ট্রাকের গ্যারেজ। কুড়ি-বাইশটা ট্রাক জড়ো হয়ে রয়েছে সেখানে।

ক্লিনাররা সেগুলো ধোয়া-মোছা করছে।

ট্রাকগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনেই একসারি ঘর। অ্যাসবেস্টাস ছাওয়া ঘরগুলোর সংখ্যা খান ছয়েকের বেশি হবে না। সবশেষের ঘরখানার দরজায় একটা ফলক আটকানো। তাতে ইংরেজিতে বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'অফিস'।

সন্ধ্যা তখন হয়-হয়।

বোধ হয় পাঁচটা হবে। শীতের বিকেল। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তাই মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অফিস-ঘরে আলো জ্বলছে।

টেবিলের সামনে বসে একজন যুবক শ্রেণির লোক খাতায় কী সব লিখছে। কাজের মধ্যে

সে এতটা ডুবে রয়েছে যে দরজা পেরিয়ে একজন লোক ঘরে ঢুকেছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই।

আগন্তুকের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যেই।

ময়লা জামা-কাপড় গায়ে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

বিশেষত্ব বিবর্জিত মুখ।

ঘরে ঢুকেই আগন্তুক গলাখাঁকারি দিল।

মুখ তুলে চাইল যুবকটি। তারপর পরিষ্কার হিন্দিতে বলল, এই যে হরিপদ, কোথায় ছিলে ক'দিন?

ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলল, এই নিয়ে চারবার এলাম এখানে। আপনারা কোথায় থাকেন তাই বলুন?

আমরা? আমি অন্তত খুবই ব্যস্ত ছিলাম হপ্তাখানেক।

আপনার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি খুঁজছি সিংজিকে।

তিনি তো আগ্রার বাইরে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে।

হরিপদ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ফিরতে দেরি হলে চলবে কেন? আমার টাকাটা দেবে কে?

টাকা! যুবকটি এবার আশ্চর্য হল। টাকা তোমায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার কীসের টাকা?

ওই অল্প টাকায় এত বড় দায়িত্বের কাজ করিয়ে নেওয়া যায় না বীরচাঁদবাবু।

তুমি আবার দায়িত্ব নিলে কোথায়?

দায়িত্ব নিইনি মানে—।

দায়িত্ব নিয়ে যে কাজ করবার, সেই করেছে। তবে বলা চলতে পারে শারীরিক কষ্ট তোমার একটু হয়েছে। তার জন্যে আমরা দায়ী নই। তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই এরকম করতে হয়েছিল।

এত কথা শুনে আমার লাভ নেই, আরও কয়েক হাজার টাকা আমার চাই।

বীরচাঁদের চোখ কপালে উঠল।—আরও কত?

বললাম তো কয়েক হাজার।

শোনো হরিপদ, তোমাকে যা দেওয়ার আমরা দিয়েছি—আর কিছু দেওয়া হবে না। তুমি দেশে ফিরে যাও, তোমার এখন গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই উচিত।

আপনাদের প্রত্যেকটি কথা আমি শুনে এসেছি, কিন্তু আর নয়।

আর নয় মানে—?

হরিপদ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, মানে এবার আমার কথা আপনাদের শুনতে হবে। আপনারা টাকাটা যদি আমায় না দেন, তাহলে আমি—।

তাহলে তুমি--।

পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হব। আমি যা জানি সমস্ত প্রকাশ করে দেব।

ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবে তুমি?

সহজে না দিলে এ ছাড়া আমি কী করতে পারি বলুন?

বীরচাঁদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজার দিকে চোখ পড়তেই আর কিছু বলা হল না। ঠিক চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক শিখ ভদ্রলোক। পরনে ওস্টেডের স্যুট। সারা মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। চোখে চশমা, মাথায় চকোলেট রং-এর পাগড়ি।

তিনি বাইরে থেকেই প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে, বীরচাঁদ?

প্রশ্ন অবশ্য ইংরেজিতেই করলেন তিনি।

বীরচাঁদ সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল।

শিখ ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

তিনি হরিপদকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হিন্দিতে বললেন, কত টাকা চাই তোমার?

আজ্ঞে, চার হাজার।

চার হাজার টাকা পেলে তুমি নিশ্চয়ই দেশে ফিরে যাবে?

হরিপদ ঘাড় নাড়ল।

এসো।

হরিপদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

॥ ছয় ॥

আকাশের গায়ে কে যেন হাজার-হাজার বোতল কালি ঢেলে দিয়েছে।

গুরুগম্ভীর শব্দে মেঘ ডাকছে থেকে-থেকে। বিদ্যুতের ঝিলিক মারছে বারবার। ওই সঙ্গে বৃষ্টিও হচ্ছে টিপটিপ করে।

রাত তখন গভীর।

রুদ্র-বাড়ির সকলেই তখন যে যার বিছানায় গভীর ঘুমে অচেতন। এই দুর্যোগের রাতে, প্রচণ্ড ঠান্ডায় ঘুম গভীর হওয়াই স্বাভাবিক।

বাসব বাড়ির পিছন দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের ধারে এসে দাঁড়াল। গ্রেটকোটে ওর সারা দেহ আচ্ছাদিত। মাথায় ফেল্টের হ্যাট। ও একলা। হীরককে আর ডাকেনি। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় বেচারার নাজেহাল অবস্থা হত অনর্থক।

সকলের অলক্ষ্যে এই বাড়ির একটা ঘর পরীক্ষা করবার ইচ্ছে আছে বাসবের। ওর পরিকল্পনায় এই দুর্যোগের রাত নানা দিক থেকে সহায়ক হবে বিবেচনা করে ও এই নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে।

অনেক চেষ্টার পর পাঁচিল টপকে বাসব বাগানে এল।

অন্ধকারে আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে—বিরাট দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা। বিদ্যুৎ চমকাল। স্পাইর‍্যালের সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। ওর সাহায্যেই ওকে ওপরে উঠতে হবে। অবশ্য সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ নিশ্চয়ই। ব্যালেন্স করে কিছুটা পথ কারনিসের ওপর দিয়ে গিয়ে বারান্দার রেলিংটা ধরতে হবে।

বাসব গ্রেট কোটের কলার আরেকটু তুলে স্পাইর‍্যালের সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়েছে মাত্র—মনে হল মৃদু পায়ের শব্দ হচ্ছে কাছেই। কে যেন সতর্কতার সঙ্গে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

বাসব সিঁড়ির কাছ থেকে সরে এসে, দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার দরুন বাসবের চোখ অন্ধকারে বেশ সয়ে এসেছিল। ও দেখল, একটা জমাট কালো ছায়া দ্রুত স্পাইর‍্যালের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চলল।

সিঁড়ির ওপরকার শেষ ধাপে উঠে সে কী কৌশলে বাইরের দিকে থেকে দরজা খুলে ভেতরে গেল, নীচে থেকে বাসবের পক্ষে তা লক্ষ করা সম্ভব হল না।

আগন্তুক ল্যাট্রিন পার হয়ে বারান্দায় এল।

বারান্দার শেষমুখে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে নেমে গেল আগন্তুক। পদক্ষেপে তার বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। অন্ধকারের মধ্যে বেশ সহজভাবেই এগিয়ে চলেছে। যেন সবই তার অত্যন্ত পরিচিত।

সামনেই একটা তালাবন্ধ ঘর।

আগন্তুক নিজের পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল। দরজায় তালা ঝুলছে। বেশ বড় সাইজের আলিগড়ের তালা। সে সহজ ভঙ্গিতে আবার পকেটে হাত চালিয়ে দিল। বাঁ-হাতে টর্চটা তখন। এবার ডান হাতের মুঠোয় চাবির গোছা।

দরজায় যে তালা লাগানো থাকবে একথা অজানা ছিল না আগন্তুকের। কয়েকটা চাবি পরীক্ষা করবার পরই একটা লেগে গেল। খুলে গেল তালাটা।

ঘরে প্রবেশ করল আগন্তুক।

অভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে সে একটা বই তুলে নিল। গ্লসি পেপারের জ্যাকেট দেওয়া মোটা বই। বইটা নিয়ে সে যেই পিছন ফিরতে গেছে—কে চাপা গলায় বলল, বইখানা আমায় দিন।

কে!—চমকে উঠল আগন্তুক।

হাত দুয়েক দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় জন আবার বলল, ইতস্তত করে কোনও লাভ নেই। বইখানা আমার দিকে এগিয়ে ধরুন।

আপনি যে আসবেন, তা আমি জানতাম। তবে আজই বুঝতে পারিনি।

এই শীতেও প্রথম আগন্তুকের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

এত করেও কি শেষ রক্ষা হবে না? সে বইটা এগিয়ে ধরল। দ্বিতীয় জন নিজের হাত প্রসারিত করল বইটা নেওয়ার জন্যে। এই অমূল্য মুহূর্ত হাতছাড়া করতে চাইল না প্রথম আগন্তুক। সে দ্বিতীয় জনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। আরম্ভ হল ধ্বস্তাধস্তি।

এদিকে—

এদিকে আগন্তুক অদৃশ্য হওয়ার পর, বাসব কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল আগেকার জায়গায়, তারপর সেও স্পাইর‍্যালের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

ল্যাট্রিন পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল বাসব।

এখন কোন দিকে যাবে? আগন্তুক কোনদিকে গেছে আন্দাজ করা দুষ্কর। সে কাজে এই দুর্যোগ মাথায় করে ও এখানে এসেছিল, সে-কাজ আজ মুলতুবি থাক। বরং যে নতুন পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়েছে, সে বিষয় অনুসন্ধান করাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু—আগন্তুককে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? এই অন্ধকার রাজ্যে সে কোথায় মিলিয়ে গেছে কে জানে। এই বাড়ির সম্বন্ধে বাসব হীরকের কাছ থেকে যে মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছিল, তারই ওপর নির্ভর করে ও এগিয়ে চলল।

তখনও চলেছে ঝটাপটি।

বইটা ছিটকে পড়ল একধারে।

ঘুম ভেঙে গেল সুমিত্রার।

কীসের একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল।

বিছানায় উঠে বসল সুমিত্রা।

বাইরে মেঘ ডাকছে। জানলার কাচ ভেদ করে বিদ্যুতের ঝিলিক ক্ষণে-ক্ষণে ঘরখানাকে আলোকিত করে তুলছে। কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল তার।

কিন্তু ওকী—পাশের ঘরে একটানা কীসের শব্দ হচ্ছে?

পাশের ঘরটা স্টাডি। ওই ঘরে ডাঃ বঙ্কিম রুদ্র নিহত হয়েছেন। ও ঘরে তো কারুর ঢোকার উপায় নেই। পুলিশ তালা দিয়ে গেছে। তবে শব্দ হচ্ছে কীসের!

তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে কেউ—চোর নাকি?

কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে খাট থেকে নামল সুমিত্রা। ঘরের আলো জ্বালল। তীব্র আলোয় ভরে গেল ঘরখানা। ওই সঙ্গে সম্পূর্ণ সাহসও ফিরে এল।

দরজা খুলে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুমিত্রা। বারান্দায় আলোর সুইচের দিকে এগিয়ে গেল। এখনও শব্দটা হচ্ছে। কিন্তু সুইচ অবধি পৌঁছতে পারল না ও। তার আগেই স্টাডি থেকে কে একজন বেরিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর পড়ল। ছিটকে পড়ল একধারে সুমিত্রা। মাথাটা ঠুকে গেল দেওয়ালের সঙ্গে।

সেই অবস্থাতেই ও লক্ষ করল, আরেকজন লোক স্টাডি থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে গেল।

নিজের বেশবাশ সংযত করে উঠে দাঁড়াল সুমিত্রা। একজন নয়—দু-দুজন লোক স্টাডিতে ঢুকেছিল। কী নিতে ঢুকেছিল ওরা? ও-ঘরে তো টাকা-পয়সা কিছু নেই।

সুমিত্রা দ্রুত পার্লারের দিকে এগিয়ে গেল।

দারোয়ানদের ডেকে এখনো যদি লোক দুটোকে আটক করা যায়, সে বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠল সুমিত্রা। পার্লার পেরিয়ে পোর্টিকোতে এল ও।

তখনো বিদ্যুৎ ঝলসে চলেছে।

ওকী....কে...কে ওখানে...।

আবার বিদ্যুতের ঝলকানি। পুরো দৃশ্যটা তার চোখের ওপর পরিষ্কার হয়ে উঠল।

ভয়ে দম আটকে আসতে লাগল সুমিত্রার। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। ও অস্ফুট শব্দ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বাসব অন্ধকার হাতড়ে সিঁড়িটা খুঁজে পেল শেষে।

টর্চ সঙ্গে এনেছিল, কিন্তু পাঁচিল টপকে বাগানের মধ্যে ঢোকবার সময় পকেট থেকে পড়ে গেছে সেটা।

সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এসেছে বাসব, হঠাৎ গুরুভার কিছু পতনের শব্দ ওর কানে গেল।

বাসব দ্রুত নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। শব্দ লক্ষ করে ছুটে চলল।

জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে তখন।

পোর্টিকোর আলো জ্বলছে।

বাসব পোর্টিকোতে পৌঁছে দেখল, সঞ্জীব রুদ্র সুইচের কাছ থেকে সরে আসছেন। তাঁর ভয়চকিত দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ। বাসব তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল, পোর্টিকোর শেষ প্রান্তে ছিন্নমূল লতার মতো পড়ে আছে সুমিত্রা।

বাসব এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে সুমিত্রার পাল্‌সটা দেখল—ঠিকই চলছে। সামান্য মূর্ছা। সঞ্জীব রুদ্র ওকে এই সময় এখানে দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন।

বাসব বলল, আসুন, আমরা ধরাধরি করে মিস রুদ্রকে পার্লারের সোফায় শুইয়ে দিই। ভয়ের কিছু নেই, মুখে জলের ঝাপটা দিলেই এখুনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

ওর কথাই ঠিক।

সোফায় শুইয়ে মুখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এল সুমিত্রার। ভীত চোখে তাকাল ও। বাসবের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভয় বিস্ময়ে পরিণত হল। বলল, আপনি—।

বাসব একটু হাসল। সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, কী হয়েছিল মিস রুদ্র? আপনি ভয় পেয়েছিলেন কেন?

আমি...আমি দেখলাম পোর্টিকোতে কে একজন—।

পোর্টিকোতে কে একজন—?

কে একজন পড়ে রয়েছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক—!

সেকী। আমরা তো কিছু দেখতে পেলাম না। তুমি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ। সঞ্জীব বললেন।

না, ভুল আমি দেখিনি। বিদ্যুতের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম। তাছাড়া দুজন লোককে স্টাডি থেকে পালাতে দেখেছি।

বাসব দ্রুত চিন্তা করল, ও দেখেছে একজনকে, অথচ সুমিত্রা বলছে দুজন। ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।

বাসব বলল, হয়তো আমরা দেখতে পাইনি। চলুন, গিয়ে দেখা যাক। সুমিত্রা দেবীর কথাটা সত্যি কি মিথ্যে এখুনি প্রমাণিত হয়ে যাবে।

সঞ্জীব রুদ্রকে সঙ্গে নিয়ে ও আবার পোর্টিকোতে এল।

বিদ্যুৎ তখন আর চমকাচ্ছে না। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্রবল ধারায় বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

বাইরের আলোটা জ্বাললেন সঞ্জীব। সুমিত্রার কথার সত্যতা প্রমাণিত হল।

বৈদ্যুতিক আলোয় পরিষ্কার চোখে পড়ল, একধারে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা দেহ। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে স্রোতের আকারে বয়ে চলেছে রক্তের ধারা।

বাসব দেহটাকে সোজা করে দিল।

সঞ্জীব রুদ্র বিস্মিত গলায় বললেন, একী! এ কী হরিপদ!!

অজয়বাবুর বেয়ারা হরিপদ?

হ্যাঁ। কিন্তু সে...।

সঞ্জীববাবু, আর কথা নয়, এখুনি গিয়ে পুলিশে রিং করুন।

পুলিশ এল।

বাসব ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল প্রেমপ্রকাশকে।

মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হল।

ইন্সপেক্টর বললেন, হরিপদ শেষপর্যন্ত এ বাড়িতে খুন হল!

আমার মনে হয়, এ বাড়িতে খুন সে হয়নি। দেখছেন না কীরকম পজিশনে মৃতদেহ পড়েছিল। তাছাড়া সে এ বাড়ির লোক নয়। সে কখনো এ বাড়িতে এসেছে কি না এ বিষয়েও আমার প্রচুর সন্দেহ আছে।

আপনি বলতে চান খুন হওয়ার পর তার মৃতদেহ এখানে বয়ে আনা হয়েছিল?

হ্যাঁ। বৃষ্টি না হলে আমরা বাগানের কোথাও-কোথাও রক্তের দাগ দেখতে পেতাম। কারণ মাথায় যেরকম প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছে, তাতে রক্ত পড়তে-পড়তে আসাই স্বাভাবিক।

আরেকটা প্রশ্ন অ্যারাইজ করে তাহলে এই প্রসঙ্গে, মৃতদেহ এখানে বয়ে আনার পূর্ব মুহূর্তেই হরিপদকে হত্যা করা হয়েছিল। নইলে রক্ত চুঁইয়ে পড়ার কোনও সার্থকতা থাকে না।

নিশ্চয়ই। বেশ কিছুক্ষণ আগে তাকে খুন করা হলে রক্ত জমাট বেঁধে যেত।

এরপর প্রেমপ্রকাশ বাড়ির সকলকে নানা ধরনের প্রশ্ন করলেন, কিন্তু সে রকমের উল্লেখযোগ্য কোনও উত্তর পাওয়া গেল না কারুর কাছ থেকে।

বাসব সঞ্জীব রুদ্রকে প্রশ্ন করল, সুব্রত রায়কে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

তিনি কি এ-বাড়িতে থাকেন না?

না।

বাসব ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন, স্টাডিটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

সুমিত্রা নিজেকে সামলে নিয়েছে।

ওকে বিশ্রাম করতে সুযোগ দেওয়া হল।

বাসবকে অনুসরণ করে প্রেমপ্রকাশ স্টাডিতে এলেন।

সারা ঘরে লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা। চেয়ারগুলো উলটে পড়েছে। টেবিরে ওপরকার কিছু জিনিস মেঝের এখানে-ওখানে ছড়ানো। ঘরের মধ্যে যেন গজকচ্ছপের মহারণ হয়ে গেছে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা একটা বই তুলে নিল। রাইডার হ্যাগার্ডের ব্ল্যাক শ্যাডো। যে বইখানা মারা যাওয়ার আগে পড়ছিলেন ডাঃ রুদ্র।

ও চিন্তিত মনে বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করল বারকতক। প্রেমপ্রকাশ মেঝেয় ছড়িয়ে পড়া জিনিসগুলো টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পায়ার কাছে কী একটা চকচক করছে।

কী ওটা? হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন তিনি।

রতি তিনেক ওজনের একটা লাল পাথর।

ইন্সপেক্টর দেখালেন পাথরটা বাসবকে। ও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে পাথরটা ফিরিয়ে দিল। কোনও মন্তব্য করল না।

কীরকম বুঝছেন? প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টর।

আর কোনও মন্তব্য করতে ভরসা পাচ্ছি না। বাসব বলল, ঘটনার গতি এখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।—এই টেবিলের ড্রয়ারগুলো, বোধ হয় চাবি বন্ধ আছে। আমি ওগুলো পরীক্ষা করতে চাই। ডাক্তার রুদ্রর পকেটে যে চাবির গোছা পাওয়া গিয়েছিল—সেটা অবশ্য থানায় আছে। তবে, এখানে ডুপ্লিকেট চাবি পাওয়া যায় কি-না, তার অনুসন্ধান করা হল।

সুমিত্রার কাছে ছিল ডুপ্লিকেট চাবি।

ডাঃ রুদ্র প্রায়ই চাবি হারাতেন। তাই এক সেট ডুপ্লিকেট চাবি সুমিত্রার কাছে থাকত। সেই চাবির সাহায্যেই দেরাজগুলো খোলা হল। অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর একটা দেরাজ থেকে খান তিনেক ডায়েরি পাওয়া গেল। অবশ্য বাজারে যে ধরনের ডায়েরি কিনতে পাওয়া যায়, এই ডায়েরিগুলো সে-ধরনের নয়।

মোটা-মোটা বাঁধানো খাতা। তারিখ দিয়ে-দিয়ে প্রত্যেক দিনের বিবরণ লেখা রয়েছে।

রোজনামচা।

এগুলো আমি কয়েকদিনের জন্যে নিজের কাছে রাখতে চাই।

বেশ তো।

দেরাজ বন্ধ করা হল। এ ঘরের কাজ এখনকার মতো শেষ হয়েছিল।

ফেরার পথে ইন্সপেক্টর বললেন, আপনার একটা থিওরিতে কিন্তু গলদ বেরিয়েছে।

কীরকম?

টুথপিকের বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। কোনও কাঠির গায়ে সায়ানাইডের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বলেন কী। তা কী করে সম্ভব?

পরীক্ষার ফলাফল তো তাই।

কিন্তু একটা টুথপিকের বাক্সর এতগুলো সাধারণ কাঠির মধ্যে থেকে বেছে-বেছে সায়ানাইড

মাখানো কাঠিটাই ডাক্তার রুদ্র তুলে নেবেন, তা তো হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও গোলমাল আছে।

বাসব মিনিট খানেক গভীরভাবে কী চিন্তা করল, তারপর আবার বলল, একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে জাগছে। যদিও...শুনুন ইন্সপেক্টর, ওই টুথপিকের বাক্সর গায়ে যে সমস্ত আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়, সেগুলো সংগ্রহ কববার ব্যবস্থা করুন।

বেশ।

ডাঃ রুদ্রর অতীত সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর নিয়েছিলেন নাকি?

হ্যাঁ। কিছু খোঁজখবর নিয়েছি। আগ্রায় আসবার আগে তিনি কলিন্স অ্যান্ড হো কোম্পানির মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন।

কত টাকা মাইনে পেতেন?

তিনশো পঞ্চাশ টাকা।

তিনি ধনী ছিলেন না প্রমাণিত হল। তিনি হঠাৎ আগ্রায় এসে এত বড় চেম্বার খুলে বসলেন, এতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি না। কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, ভদ্রলোক কোথা থেকে সকলকে হাজার-হাজার টাকা ধার দিচ্ছিলেন। তিনি এখানে এসে নিশ্চয়ই রাতারাতি গুপ্তধন পেয়ে যাননি?

প্রেমপ্রকাশ নীরব রইল। ডাঃ রুদ্র যে টাকা ধার দেওয়ার ব্যাবসা করতেন, এ-কথা ইন্সপেক্টরকে আগেই বলেছিল বাসব।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর সুমিত্রা নিজের ঘরে ফিরে এল।

এতক্ষণ ও পার্লারে ছিল। শরীর এখন বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে।

ও ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল।

একলা শুয়ে ভয়-ভয় করছে। যেসমস্ত ঘটনা বাড়িতে ঘটে চলেছে, তাতে ভয় না করাই আশ্চর্য। অজয়বাবুর বেয়ারা এবাড়িতে খুন হল! বাবাকে যে খুন করেছে, একাজ কি তারই? কেন, এমন ঘটেছে?

কার স্বার্থের জন্যে বাবা মারা পড়লেন?...আর ভাবতে পারে না ও। কেমন নিজেকে অসহায় বোধ করে। ঘরে বড় আলোটা জ্বলছিল। সুমিত্রা বড় আলোটা নিভিয়ে নাইট ল্যাম্প জ্বালল। ঘুম কি আসবে?

এই সময় পিছন থেকে ওর কাঁধে কে হাত রাখল।

সুমিত্রা—।

কে!

চমকে সুমিত্রা মুখ ফেরাল।

আমি।

নাইট ল্যাম্পের মোলায়েম আলোর মধ্যেও সুব্রতকে চিনতে কষ্ট হল না সুমিত্রার।

তুমি!!

অনেকক্ষণ থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

কী দুঃসাহস তোমার। এত রাত্রে...কেউ যদি দেখে ফেলত?

সুমিত্রার সামনে এসে দাঁড়াল সুব্রত।

নিজের হাত দুটো ওর কাঁধের ওপর রেখে বলল, আজকাল আমার সঙ্গে তোমার মোটেই দেখা হয় না। চোখের দেখার কথা বলছি না। আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই, মিত্রা। ঠিক এখনকার মতো খুব কাছে।

সুব্রত খুব কাছে সরে এল সুমিত্রার।

তবুও এত দুঃসাহস কি ভালো?

এই শেষ। আর হয়তো দুঃসাহসের পরিচয় দিতে পারব না।

কেন, কেন এ-কথা বলছ তুমি?

আমি কয়েকদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব ভাবছি।

চলে যাবে! কেন?

এখানে আর থেকে কী করব বল? তোমার বাবা মারা যাওয়ার পরই, আমার এখানকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

সুব্রত হাসল।

তুমি কোথায় যাবে সুমিত্রা? তোমার অর্থ-সম্পদ, অজয় সোম, সবই তো এখানে রইল।

সুব্রতর বুকে মুখ রাখল সুমিত্রা।

ভেজা গলায় বলল, না, না, তুমি আমাকে যেভাবেই উপহাস করতে চাও না কেন, আমি তোমার কোনও কথায় কান দেব না। তুমি যদি এখান থেকে যাও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। তুমি কি আজও আমায় বুঝতে পারলে না!

অমনি কান্না! সুব্রত ওর মুখটা তুলে ধরল।—এবাড়িতে চাকরি নিয়ে ঢোকার প্রথম অবকাশেই তোমায় আমি বুঝতে পেরেছি সুমিত্রা। আমি ভুলিনি, আলাপের সেই প্রথম মুহূর্ত। তোমার হাত কেটে গিয়েছিল। ডাক্তার রুদ্র আদেশ দিলেন, ব্যান্ডেজ করে দিতে। অদ্ভুত মমতা ভরা দৃষ্টি নিয়ে তুমি আমার কার্যকলাপ লক্ষ করলে। কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল আমার শার্টের ওপর। বিশ্বাস করো, সে শার্টটা আজও আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

তবে কেন—কেন তুমি আমাকে...।

তুমি সিরিয়াসলি ধরে নিলে কথাটা? আচ্ছা বোকা মেয়ে যা হোক। আমি তোমাকে কখনও একলা ছেড়ে যেতে পারি?

এই...এবার তুমি যাও। জানাজানি হয়ে গেলে ভীষণ লজ্জার বিষয় হবে।

পুলিশ চলে গেছে?

হ্যাঁ। অজয়বাবুর বেয়ারা—।

খুন হয়েছে তো? আমি জানি। ক্রমেই তোমাদের বাড়িটা রহস্যের খাসমহল হয়ে উঠছে। শোনো, একটা কাজ করতে হবে তোমাকে!

বলো?

তোমার কাছে তো চাবি আছে। ডাঃ রুদ্রর ডায়েরিগুলো আমায় সংগ্রহ করে দিতে হবে।

ডায়েরিগুলো?

হ্যাঁ, মিত্রা। তুমি একটু আশ্চর্য হচ্ছ, বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে বলব—সব কথাই বলব পরে। তবে...।

সুব্রতর কথা শেষ হল না, দরজায় করাঘাত হল কয়েকবার।

সুব্রতর কাছ থেকে সরে এল সুমিত্রা।

ওর সুন্দর মুখের রেখায়-রেখায় ভয়ের ছায়া নেমে এল।

সুব্রত এধার-ওধার তাকিয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেল।

চাপা গলায় বলল, আমি জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।

ফ্রেঞ্চ উইন্ডো।

সুব্রত আর কালবিলম্ব না করে জানলার পাল্লাটা খুলে বাগানে নেমে পড়ল।
দরজায় আবার বারকতক করাঘাত হল।
জানলার পাল্লাটা বন্ধ করে দরজা খুলে দিল সুমিত্রা।
সামনেই দাঁড়িয়ে সঞ্জীব রুদ্র ও অজয় সোম।

॥ সাত ॥

সঞ্জীব টেলিফোন করেছিলেন অজয় সোমকে।

হরিপদ খুন হয়েছে শুনে কালবিলম্ব না করে মিঃ সোম চলে এসেছেন এখানে।

দরজার গোড়ায় দুজনকে দেখে বিস্মিত গলায় বলল সুমিত্রা, কী হয়েছে?

সঞ্জীব রুদ্র বললেন, তোমার ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ পেলাম?

কথাবার্তার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল।

শুনেছি বলেই প্রশ্ন করছি।

এত রাত্রে আমার ঘরে কে আসতে পারে?

কিন্তু...।

দাদা! গম্ভীর গলায় সুমিত্রা বলল, তুমি যা বলতে চাইছ, তার অর্থ কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা তুমি জান?

অজয় সোম বলে উঠলেন, ও নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই সঞ্জীব। আমরা হয়তো ভুল শুনেছি।

সঞ্জীব রুদ্র আর কিছু বললেন না।

গম্ভীর মুখে চলে গেলেন সেখান থেকে।

মিঃ সোম বললেন, ঘরে আসব?

আসুন।

তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটা চেয়ারে বসলেন।

বললেন, নিশ্চয়ই তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম, না? এইরকম একটা দুর্ঘটনার পর কারুর চোখেই ঘুম আসতে পারে না।

সুমিত্রা মনের মধ্যে অসহিষ্ণুভাব অনুভব করলেও, বেশ শান্তভাবেই বলল, আপনি কি আমায় কিছু বলবেন?

হ্যাঁ। যদিও আমার বক্তব্যের পক্ষে পরিস্থিতি তেমন অনুকূল নয়। তবুও আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে।

বলুন?

তোমাকে এ বিষয়ে কিছু না বললেও চলত। এসব স্থলে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করাই বিধেয়। কিন্তু এখন তুমি প্রায় তোমার নিজের গার্জেন। কাজেই—।

অজয় সোমের ভণিতায় কিছুটা বিরক্ত বোধ করল সুমিত্রা।

ও অধীর গলায় বলল, আপনার কথাটা ঠিক ধরতে পারছি না। পরিষ্কার করে বললে ভালো হয়।

পরিষ্কার করেই বলেছি। আমি আর দেরি করতে চাই না। ম্যারেজের ডেটটা—।

বিয়ের তারিখ!! আপনি কী বলছেন, মিস্টার সোম? মাত্র কয়েকদিন আগে বাবা মারা গেছেন—।

না, না, আমি এই মুহূর্তে কিছু বলছি না। তারিখ একটা নির্দিষ্ট করে রাখলে—।

আমায় ক্ষমা করবেন। ও বিষয় আলোচনা এখন আমি করতে চাই না।

অজয় সোম উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল সুমিত্রা। সত্যি, তোমার এই মনের অবস্থাতে এখন ও বিষয় আলোচনা চলতে পারে না। আচ্ছা, আমি চলি। তুমি বিশ্রাম করো।

নানা কথা ভাবতে-ভাবতে সুমিত্রা দরজাটা বন্ধ করল।

বেশ কিছুক্ষণ আগে সকাল হয়েছে।

চা-পর্ব শেষ করে বাসব ও হীরক নানারকম আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছে।

একসময় বাসব প্রশ্ন করল, যেদিন ডাক্তার রুদ্র মারা যান, সেদিনকার সমস্ত কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে?

আছে বইকি।

ভেবে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি ও প্রেমপ্রকাশ যখন মৃতদেহ পরীক্ষা করে সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, তখন তুমি ও অজয় সোম ড্রইংরুমে বসেছিলে, তাই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, সেসময় কি অজয় সোম বসে থাকতে-থাকতে একবার উঠে গিয়েছিলেন?

হীরক একটু ভেবে বলল, তোমরা চলে যাওয়ার পরই অজয় সোম উঠে গিয়েছিলেন।

হুঁ। কোন দিকে গিয়েছিলেন, কিছু মনে আছে?

যতদূর মনে পড়ছে পোর্টিকোর দিকে।

বাসব আর কিছু বলল না।

কলিংবেল বেজে উঠল।

হীরক উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

একজন দীর্ঘকায় সুরূপ যুবক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হীরককে দেখে সে বলল, বাসববাবু আছেন কি?

আছেন। আসুন।

যুবকটি ভেতরে এল।

বাসবের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সুব্রত রায়।

সুব্রতকে বার কয়েক আগে দেখেছিল হীরক।

লম্বায় সে প্রায় ছ'ফিট। তামাটে গায়ের রং। সুশ্রী মুখশ্রী। সুরুচিকর জামাকাপড় গায়ে। বাঁ-হাতের পাতায় ব্যান্ডেজ করা।

বাসব বসতে অনুরোধ করল সুব্রতকে।

সুব্রত বলল, সঞ্জীববাবুর মুখে খবর পেলাম, আপনি আমায় ডেকেছেন?

হ্যাঁ। ডাক্তার রুদ্রর হত্যাসংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে গোটাকতক প্রশ্ন করব।

কিন্তু আমি হত্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু জানি না।

আমার প্রশ্ন ডাক্তার রুদ্রকে কেন্দ্র করেই থাকবে মিস্টার রায়।

বলুন, কী জানতে চান?

আপনি ডাক্তার রুদ্রর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন,. কিন্তু সচরাচর ডাক্তারদের প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখতে দেখা যায় না।

অ্যাপায়েন্টমেন্টের সময় আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম।

আপনাকে কী ধরনের কাজ করতে হত?

আমি...আমি...একটু ইতস্তত করল সুব্রত।

আপনি মিথ্যে সংকোচ করছেন মিস্টার রায়।

ডাক্তার রুদ্রর তেজারতি কারবার ছিল। আমাকে ওদিকটা দেখতে হত।

সমস্ত লেন-দেনের দলিল কি আপনার সামনে তৈরি হত?

প্রায় সমস্তই। কাউকে-কাউকে আবার গোপনেও টাকা দিতেন—তার সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতেন না।

আপনি কতদিন ডাক্তার রুদ্রর কাছে কাজ করছেন?

বছর চারেক হবে।

আপনার আগে কেউ একাজে নিযুক্ত ছিল?

না।

বাসব সিগারেটের কেসটা পকেট থেকে বের করে, এগিয়ে ধরে বলল, চলে নাকি?

আমি সিগারেটে অভ্যস্ত নই।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আপনি স্থানীয় লোক।

না। আমি কলকাতা থেকে এসেছি।

আপনি কলকাতা থেকে আগ্রায় এলেন কেন? ডাক্তার রুদ্র কি পেপারে সেক্রেটারি পদটির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

না। আমি এক পাঞ্জাবি বন্ধুর অনুরোধে আগ্রায় এসেছিলাম। চাকরির তখন আমার খুব প্রয়োজন ছিল। চাকরি খুঁজছিলাম। দৈবাৎ একদিন ডাক্তার রুদ্রর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল এক কাওয়ালি মহ্‌ফিলে। উনি কাওয়ালি শুনতে খুব ভালোবাসেন। তারপর একদিন ওঁর কাছে গিয়ে চাকরির আবেদন করলাম। উনি আমার আবেদন মঞ্জুর করেন।

ডাক্তার রুদ্রর বাড়ির লোকেদের সম্বন্ধে আমি আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

সুব্রত একটু থেমে বলল, বাড়ির লোকেদের সম্বন্ধে—ডাক্তার রুদ্র ছেলে আর নিজের ছোট ভাইয়ের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

কীভাবে বুঝলেন?

প্রায়ই তাঁদের সম্বন্ধে আমাকে নানা কথা বলতেন।

কী বলতেন?

বলতেন, দুনিয়ার একটা জিনিসই ওরা চিনতে শিখেছে সুব্রত, তা হল, টাকা। নিজেরা ভালোভাবে রোজগার করতে পারে না, শুধু আমার টাকার ওপর লোভ। আমার বাপ গরিব ছিলেন, আমি যা কিছু সংগ্রহ করেছি সমস্ত নিজের চেষ্টায়। ওদের সে চেষ্টা আছে? আমি কিছু না দিয়ে গেলে তো ওরা না খেতে পেয়ে মরবে।

আর মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলতেন না?

সুমিত্রা দেবীকে উনি ভালোবাসতেন।

বাসব সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, মিস্টার সোমের সঙ্গে সুমিত্রা দেবীর বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে শুনলাম। এর মধ্যে কোনওরকম প্রণয়ঘটিত ব্যাপার আছে নাকি?

মিস্টার সোমকে ডাক্তার রুদ্র অত্যন্ত পছন্দ করতেন। বিয়ের ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন।

ও। দুর্ঘটনার দিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?

সুদের তাগাদায় গিয়েছিলাম।

ইদানীং কি ডাক্তার রুদ্র নিজের প্রাণের আশঙ্কা করছিলেন? এ বিষয়ে কিছু বলেছিলেন আপনাকে?

না। তবে তাঁর মুখে ভীত ভাব লেগে থাকত। তিনি সবসময় আমাকে কাছে-কাছে রাখতেন।

ধন্যবাদ মিস্টার রায়। বাসব বলল, আপনার এই সাহায্যের জন্যে আমি আনন্দিত।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল।—আমি এখন যেতে পারি নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাসব বঙ্কিম রুদ্রর ডায়েরিগুলো নিয়ে বসল গিয়ে নিজের বিছানায়। এবার এগুলো ও পড়ে দেখবে।

যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।

হীরক কাজে বেরিয়ে গেছে ঘণ্টা দুয়েক আগেই।

তিনটে মোটা-মোটা খাতায় বছর চোদ্দোর রোজনামচা ধারাবাহিকভাবে লেখা রয়েছে।

বাসব চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল।

সর্তকতার সঙ্গে এক একটি পাতা পড়তে লাগল।

হঠাৎ এক জায়গায় ওর দৃষ্টি হোঁচট খেল।

৮ই জুন, ১৯৪৯

চন্দ্রকান্ত রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভালোই হল। ধনী লোক। মনে হয় তার সাহায্যে কিছু গুছিয়ে নিতে পারব। অফিস থেকে পাওয়া ওই কটা টাকায় এতবড় সংসার চালানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিছু বাড়তি টাকা চাই।

১১ই জুন, ১৯৪৯

চন্দ্রকান্তকে যতটা দরাজ ভেবেছিলাম, সে ঠিক ততটা নয়। বেশ হাতটান আছে। টাকা ছাড়া আর সব ব্যাপারে সে অবশ্য খুব প্রাণখোলা।

১৮ই জুন, ১৯৪৯

কিন্তু এত টাকা চন্দ্রকান্ত পাচ্ছে কোথা থেকে? খোঁজ নিয়ে দেখেছি তার কোনও জমিদারি নেই। বিরাট কোনও ব্যবসা নেই। তার আছে ছোট একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান। তার থেকেই এত টাকা আয় হচ্ছে বিশ্বাস হয় না।

বাসব চিন্তিত হল।

ওর মনে পড়ল, প্রশ্নের উত্তরে অজয় সোম বলেছিলেন, তাঁর চেম্বারে একবার ডাঃ রুদ্র চন্দ্রকান্তর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই রহস্যের নাটকে চন্দ্রকান্ত কোনও রোলে অ্যাক্ট করছে কি না কে বলতে পারে। ও আবার ডায়েরির পাতা ওলটাতে লাগল।

১৬ই জুন, ১৯৪৯

মনে হচ্ছে, চন্দ্রকান্তর অর্থাগমের পথটা আমি জেনে ফেলেছি। লোহালক্কড়ের ছোট দোকানটা আসলে লোকের চোখে ধাঁধা সৃষ্টি করার জন্যেই। সে কোনও একটা জিনিস ব্ল্যাক করে লক্ষ-লক্ষ টাকা করেছে। কিন্তু জিনিসটা যে কী বুঝতে পারছি না।

৩রা জানুয়ারি, ১৯৫০

আমি ধৈর্য ধরেছিলাম। জানতাম শেষপর্যন্ত চন্দ্রকান্তকে আমার কাছে আসতে হবে। আমার অনুমান মিথ্যে হয়নি। সে প্রস্তাব করেছে একটা লোকের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করতে।

এতে নাকি আমার আশাতীত লাভের সম্ভাবনা। বুঝতে পারলাম না, একটা লোকের চিকিৎসা করে আমি কীভাবে আশাতীত লাভবান হব।

৮ই জানুয়ারি, ১৯৫০

আজ কথাটা ভাঙল চন্দ্রকান্ত আমার কাছে।

সে বলল, তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। একজন পেশেন্টকে চিকিৎসা করে কীভাবে বহু টাকা রোজগার করা যাবে, তাই না? যাবে। তবে চিকিৎসা করে নয়। যাতে রুগির চিকিৎসা খুব বেশিদিন করতে না হয়, সেই পথ ধরে।

আমি বিস্মিত ভাবে বললাম, অর্থাৎ—?

রুগিকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

সেকী?

শোনো বঙ্কিম, আমি যে রুগিটির কথা বলছি, তার নাম কৈলাস বর্মা। তার কাছে যে প্রচুর অর্থ আছে, তা নয়। তবে এমন একটা জিনিস আছে, যা আমরা সংগ্রহ করতে পারলে লক্ষ-লক্ষ টাকা পকেটস্থ করতে পারব।

কিন্তু...

কোনও কিন্তু নয়। 'কিন্তু'কে প্রশ্রয় দিয়ে কেউ কখনো বড়লোক হতে পারেনি। আমার কথাই ধরো, বাঁকা পথ দিয়ে প্রচুর টাকা আমার কাছে আসে। তাই আমার মান, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই সমান আছে। টাকাই হল সব। আর তুমি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঘরে টাকা আনছ—তবুও কি পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছ?

আমি ঘামতে লাগলাম।

চন্দ্রকান্ত আবার বলল, এত বড় সুযোগ জীবনে তুমি পাবে না। কৈলাস বর্মার কাছে একটা নকশা আছে। ওই নকশাই আমাদের টার্গেট।

নকশা!!

অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসেই অবশ্য এ সমস্ত পড়া যায়। তবু আমি যা বলছি, তা বর্ণে-বর্ণে সত্যি। ও নকশা অনেক টাকার সন্ধান দেবে আমাদের।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সবই বলব। বেশ কিছু পিছিয়ে আরম্ভ করতে হবে আমাকে। নিশ্চয়ই তুমি ধৈর্য ধরে শুনবে। এবার আমি বাংলার ইতিহাস নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

আমি তখন বিস্ময়ের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছি।

বললাম, বলো, আমি শুনছি।

চন্দ্রকান্ত আরম্ভ করল ঃ পাল-সাম্রাজ্য তখন ভেঙে পড়ছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব আর গুপ্তহত্যা সুমহান ঐতিহ্যশালী এই বংশের রাজপুরুষদের শিরায়-শিরায় বাসা বেঁধেছে তখন। চলেছে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে মৃত্যু-মহোৎসব। এইভাবেই চলত হয়তো—পাল বংশের শেষ পালটিও সিংহাসনের নেশায় বুকের রক্তে গৌড়বঙ্গের মাটি লাল করে তুলত হয়তো—কিন্তু তা হল না। দুরন্ত ঘোড়ার দুর্বার গতিবেগকে কঠোর হাতে সংযত করার মতো, এক অবিশ্বাস্য মুহূর্তে এই হানাহানির রঙ্গমঞ্চে উদয় হয়ে রক্তের গতিবেগকে রুদ্ধ করলেন এক অসামান্য পুরুষ—ইনিই মহেন্দ্র পাল। সংযতবাক বিরাটদেহী মহেন্দ্র সিংহাসনের আনাচে-কানাচের সমস্ত মলিনতা দূর করে বৃহৎ চক্রান্তকারীদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন।

অচিরেই সন্ধান পাওয়া গেল কুচক্রীর। তিনি আর কেউ নন, মহা অমাত্য ইন্দ্রকান্ত বর্মা। কিন্তু তাঁকে ধরা গেল না। এমনকী ইন্দ্রকান্তর প্রাসাদে গিয়ে রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করার মতোও কিছু পাওয়া গেল না। শূন্য বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। ইন্দ্রনাথ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শেষপর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে এবং মহেন্দ্র পালের সিংহাসনে আরোহনের উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হয়েছে, তখন তিনি নিজের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র এবং প্রচুর ধনরত্নসহ গৌড় ত্যাগ করলেন।

সঙ্গে তিনি যে ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা রাজার সম্পদ। অরাজকতার সুযোগ নিয়ে রাজকোষ থেকেই এ সমস্ত অপহরণ করেছিলেন ইন্দ্রকান্ত।

চন্দ্রকান্ত থামল।

বললাম, তারপর—?

তারপর গৌড় থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন ইন্দ্রকান্ত। চলে এলেন মহেন্দ্রের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। তিনি আগ্রার কাছে চৌপুরায় এসে ঘর বাঁধলেন। অতি সাধারণভাবে জীবন আরম্ভ করলেন, এবং সমস্ত ধনরত্ন বিশেষ একস্থানে লুকিয়ে রাখলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন ইন্দ্রকান্ত। ধনরত্ন যেখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তার একটা নকশা তৈরি করলেন। কিন্তু এমনই বিধির বিধান—নকশা তৈরি করার পরের দিনই তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল তাঁর বিছানায়। গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন তিনি। তবে সৌভাগ্যক্রমে নকশাটা খোয়া গেল না।

এরপর হাত বদল হতে-হতে নকশাটা উপস্থিত হয়েছে বর্মা-বংশের শেষ বর্মা কৈলাস বর্মার কাছে। এতদিন কেউই নকশাটাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু কৈলাস স্বতন্ত্র চরিত্রের লোক। তিনি এ বিষয়ে খোঁজখবর নেবেন ঠিক করেছিলেন—হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়ে রয়েছে।

বললাম, এতে আমার ভূমিকাটা কী?

তোমাকে কী করতে হবে আমি আগেই বলেছি। কৈলাস বর্মা নকশাটা রেখেছে তার বিছানার তোশকের সঙ্গে সেলাই করে। একথা আমি জানি। বাড়িতে তার ঘাটের যাত্রী পিসি ছাড়া আর কেউ নেই। তুমি কৈলাশের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করবে, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। তারপর সময় বুঝে তার একটা ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে। নকশাটা উদ্ধার করার এই হল একমাত্র উপায়।

না-না, এ ভাই আমার দ্বারা হবে না।

এত ভাবপ্রবণ হলে মানুষ বড় হতে পারে না। এই কাজটা করে দিতে পারলে, আমি তোমায় হাজার কুড়িক টাকা দিতাম নিশ্চয়ই। যাই হোক, ভেবে দেখো, সময় দিচ্ছি কয়েক দিন।

কুড়ি হাজার!!

১০ই জানুয়ারি, ১৯৫০
চন্দ্রকান্তর প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত রাজি হতে হল। কুড়ি হাজার টাকার লোভ সামলাতে পারলাম না। নিদারুণ অভাবে নুয়ে রয়েছি, টাকার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সাহস কোথায়?

১১ই জানুয়ারি, ১৯৫০
কৈলাস বর্মার চিকিৎসার ভার নিয়েছি। লোকটা হয়তো এমনিতেই বাঁচবে না। গ্যাংগ্রিন হয়েছে।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৫০
বিষিয়ে উঠেছে কৈলাস বর্মার শরীর। ঘায়ের মুখ দিয়ে রক্তের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছি কি না, সে গবেষণার এখন প্রয়োজন নেই। তবে লোকটার পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে আর খুব বেশি বিলম্ব নেই।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৫০
আজ সকালে মারা গেছে কৈলাস। নকশাটা পাওয়া গেছে।

এবার কুড়ি হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

২১ শে জানুয়ারি, ১৯৫০
নকশাটা দিয়েছি চন্দ্রকান্তকে।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫০
টাকা দেওয়ার ব্যাপারে চন্দ্রকান্ত আমায় ঘোরাচ্ছে। আজ নয় কাল, এই তার মুখের বুলি। ফাঁকি দেবে নাকি আমায়?

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫০
আজ পরিষ্কার চন্দ্রকান্ত আমায় বলল, এত সহজে, এত মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়া যায় না বঙ্কিম। সময় হলে আমি ঠিকই দেব। বেশি গোলমাল করবার চেষ্টা করলে নিজেই বিপদে পড়বে। ভুলে যেও না, তুমি একজনকে পরিকল্পনা করে খুন করেছ।

আমি স্তম্ভিত হলাম। বুঝলাম, আমায় টাকার আশা ছাড়তে হবে।

রাগে ফুলতে লাগলাম।

এরপর ডায়েরিতে মাস দুয়েকের মধ্যে চন্দ্রকান্ত সম্বন্ধে আর কোনও উল্লেখ নেই। বাসব পাতার পর পাতা উলটে গেল। শেষে এপ্রিলের প্রথম দিকে আবার উল্লেখ পাওয়া গেল।

২রা এপ্রিল, ১৯৫০
আজ চন্দ্রকান্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতো আমার কাছে এল।

বলল, আমার পিছনে পুলিশ লেগেছে।

কেন?

পুলিশ কীভাবে সন্ধান পেয়েছে আমি একজন চোরা-কারবারি।

ও।

এখন ভাই তোমরা সাহায্য না পেলে আমি বাঁচব না।

আবার সাহায্য!

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, এ ব্যাপারে আমি আর কী সাহায্য করতে পারি বলো?

তুমিই পারো। দু-একদিনের মধ্যেই আমার বাড়ি সার্চ হবে। আমি তোমার কাছে জরুরি কাগজপত্রভরা দুটো বাক্স রাখতে চাই।

কিন্তু—

বিশ্বাস করো, এই গোলমাল মিটলেই আমি তোমার কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে দেব।

ভরসা করি এবার তুমি নিজের কথা নিশ্চয়ই রাখবে?

নিশ্চয়ই।

কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলাম ওর প্রস্তাবে।

৩রা এপ্রিল, ১৯৫০
বিচিত্র গঠনের দুটো লোহার বাক্স আমার কাছে রেখে গেলে চন্দ্রকান্ত। বাক্স দুটোর ওপর যাতে আমি সবসময় নজর রাখি সে-বিষয়ে বার-বার অনুরোধ করল।

আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হল। এরকম বাক্সে কেউ কাগজপত্র রাখে নাকি?

রাত্রে বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, আমি ছেনি আর হাতুড়ি সংগ্রহ করে, অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বাক্স দুটোর ডালা ভেঙে ফেললাম।

কিন্তু আমার বাকরোধ হয়ে গেল বাক্সর মধ্যে দৃষ্টি পড়তেই। অজস্র নোট! সবই একশো টাকার। বাক্সর মধ্যে থাকে-থাকে সাজানো রয়েছে। কত শত লোকের বুকের রক্ত, হাজার হাজার টাকার রূপ নিয়ে কালো বাজারের বাঁকা পথ দিয়ে এসে এই দুটো

লোহার বাক্সর মধ্যে জমা হয়েছে। গুণলাম নোটগুলো। গুণতে-গুণতে রাত তিনটে বেজে গেল।

দুটো বাক্স মিলিয়ে দু-লক্ষ আটাশ হাজার টাকা রয়েছে।

কৈলাশ বর্মার নকশাটাও পাওয়া গেল।

৮ই এপ্রিল, ১৯৫০

হাসিমুখে এল চন্দ্রকান্ত। বলল, যাক, পুলিশের ঝামেলা মিটেছে। বেটাদের একচোট খুব ঠকানো গেছে। আজ ভাই বাক্স দুটো আমি নিয়ে যাব।

আমি নির্বিকার গলায় বললাম, কোন বাক্স?

আকাশ থেকে পড়ল চন্দ্রকান্ত।—কোন বাক্স মানে? আমার সেই লোহার বাক্স দুটো—

তোমার লোহার বাক্স আমার কাছে আছে!

ঠাট্টা নয় বঙ্কিম। বাক্স দুটো দাও ভাই।

কী বিপদ! এক কথা কেন বারবার বলছ। আমার কাছে তোমার কোনও বাক্স থাকলে নিশ্চয়ই দিয়ে দিতাম।

ব্যাকুলভাবে চন্দ্রকান্ত বলল, আমি তোমার টাকা দিতে দেরি করেছি। সত্যি, অন্যায় হয়েছে। সে জন্যে তুমি তোমাকে এভাবে বিপদে ফেলো না। আমি আজই তোমায় টাকা দিয়ে দেব।

তার বারবার অনুরোধ, অনুনয়-বিনয়ে আমার মন টলল না। আমি বাক্স দুটোর কথা অস্বীকার করলাম বারবার।

সে আমার পা জড়িয়ে ধরল। বলল, আমাকে নয়, আমার ছেলের ওপর দয়া করো। তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিও না।

আমি নিজের সংকল্প পরিবর্তন করলাম না। নিজের কথায় অটল রইলাম।

১০ই এপ্রিল, ১৯৫০

আজ খবর পেয়েছি চন্দ্রকান্তর নাকি মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। রাস্তাঘাটে টাকা-টাকা করে চেঁচাচ্ছে সে।

এতে কি আমার কোনও দোষ আছে?

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫০

আজকেই পেলাম সংবাদটা।

রাস্তায় পাগলামি করে বেড়াবার সময় মোটর চাপা পড়ে মারা গেছে চন্দ্রকান্ত। আমি নিজেকে অদ্ভুত হালকা বোধ করলাম। খুব বড় একটা সমস্যা মিটল।

কলকাতায় আমার আর থেকে লাভ কী? চাকরি ছেড়ে দিয়ে আগ্রায় পাড়ি দিলে কেমন হয়?

নকশার নির্দেশ অনুসারে আগ্রার কাছেই পোঁতা আছে সেই ধনসম্পত্তি। অবশ্য নকশার গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে পথটা খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু...আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

সত্যিই যদি গুপ্তধন থাকবে, তাহলে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কেউ এ-ব্যাপারে সচেষ্ট হয়নি কেন?

মাঝের কয়েক বছর বিরতির পর আবার নকশার উল্লেখ পাওয়া গেল ডায়েরিতে ১৯৫৮ সালে।

*

১৮ই মার্চ, ১৯৫৮
তোড়জোড় করে বেরিয়েছিলাম। কাউকে নকশা সম্বন্ধে কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এইরকম অভিযানে বেরুতে গেলে, অনিবার্যভাবে একজন সহকারির প্রয়োজন দেখা দেয়। কাজেই সহকারি হিসেবে যাকে মনোনীত করেছি, তাকে সমস্ত কথা বলতে হল। নকশার নির্দেশ অনুসারে আমরা বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ গোলমাল দেখা দিল। আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এখনকার মতো অভিযান মাঝপথেই স্থগিত রাখতে হল। পরে আবার তোড়জোড় করে একাজে নামতে হবে।

॥ আট ॥

এরপর ডায়েরিতে তিন বছরের মধ্যে ও-বিষয়ে আর কোনও উল্লেখ নেই।

খাতাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করল বাসব।

শেষে আবার উল্লেখ পাওয়া গেল, ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে।

৩রা অক্টোবর, ১৯৬১।
আজ একটা চিঠি পেয়েছি।

এক অজ্ঞাত পত্রলেখক আমায় ভয় দেখিয়ে লিখেছে, আমাকে নাকি সে হত্যা করবে।

কে এই পত্রলেখক? কেন সে আমাকে হত্যা করবে?

চন্দ্রকান্তর ছেলে নয়তো? আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছে কি?

২৬শে অক্টোবর, ১৯৬১।
আমি পাগল হয়ে যাব।

প্রত্যহ আমায় কে টেলিফোন করছে। বারংবার মৃত্যুভয় দেখাচ্ছে।

৮ই নভেম্বর, ১৯৬১।
আর আমি পারছি না। কাজে মন বসছে না।

টেলিফোন আর চিঠি পেয়ে-পেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি।

চন্দ্রকান্ত, আমি ভুল করেছিল.ম ভাই। যে কোনও শাস্তিই এখন আমার প্রাপ্য। তবে আমি বাঁচতে চাই—এই রূপ, রস, গন্ধময় পৃথিবীতে আমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৬১।
বুঝতে পেরেছি, কে আমাকে এইভাবে দিনের পর দিন ভয় দেখাচ্ছে। প্রাণে মারবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাকে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। সম্পূর্ণ মুখ বন্ধ করে, নিজের জীবন দিয়েই হয়তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ডায়েরি বন্ধ করল বাসব।

আর কোনও উল্লেখ নেই ও-বিষয়ে কোথাও।

ও চিন্তিত মনে একটা সিগারেট ধরাল।

*

এখন আর কলেজ যাচ্ছে না সুমিত্রা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর লঘুপদে ও বাগানে এল।

কাল রাত্রে সুব্রত জানলা টপকে চলে যাওয়ার পর থেকে ওর মন মোটেই ভালো নেই। নানারকম চিন্তা ওকে উতলা করে তুলেছে।

সুমিত্রা এখন বাগানে চলেছে একটা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে। গতকাল কিছু বোতল ভাঙা কাচ ও জানলা দিয়ে ফেলেছিল বাগানে। সেগুলো নিশ্চয়ই জানলার তলায় ছড়িয়ে রয়েছে।

কাল সুব্রত ওখানেই লাফিয়ে পড়েছিল।

ওর কোনও শারীরিক ক্ষতি হয়নি তো?

জানলার তলায় এসে দাঁড়াল সুমিত্রা।

এ কী, এখানে এত রক্তের দাগ কেন? সুব্রত কি আহত হয়েছে? পায়ে ওর জুতো ছিল, কাজেই পায়ের তলা কাটতে পারে না। নিশ্চয়ই পা-মুড়ে ও পড়ে গিয়েছিল কাচের ওপর।

মনের মধ্যে কেমন আকুলতা অনুভব করে সুমিত্রা।

যদি ক্ষত মারাত্মক হয়ে থাকে? একলা থাকে সুব্রত, কে ওকে পরিচর্যা করছে। সুমিত্রা যাবে। হ্যাঁ, যাবে সে সুব্রতর সঙ্গে দেখা করতে।

বাগান পেরিয়ে সুমিত্রা গেটের কাছে এল। এবার একটা রিকশা ডেকে নিতে হবে।

গেটের সামনেই সঞ্জীব রুদ্র দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওকে দেখে বললেন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

একটু বেরুচ্ছি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমার গন্তব্যস্থলটা কোথায়?

কোথাও একটা যাচ্ছি নিশ্চয়ই।

কোথায় যাচ্ছ সেটা আমি জানতে চাই!

সুমিত্রা বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর হাত দিয়ো না দাদা। আমার বয়েস হয়েছে। মিথ্যে সবসময় আমায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছ!

বিয়ে না হওয়া অবধি তোমাকে পাহারা দিয়ে চলতে হবে বইকি!

অনেকগুলো কথা ওর ঠোঁটের আগায় ভিড় করে এল। কিন্তু অসীম বলে নিজেকে সংযত করল সুমিত্রা। তারপর গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল।

বিছানায় শুয়ে আছে সুব্রত।

জ্বর হয়েছে।

সকালে খুব অল্প জ্বর ছিল। হীরকের বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পরেই ওর শরীর বেশিমাত্রায় খারাপ হয়ে পড়ে। তাড়সে জ্বর এসেছে। মিত্রার জানলার তলায় যে কাচের গাদা আছে কে জানত। লাফিয়ে পড়ার সময় বেকায়দায় পা-হড়কে পড়ে গিয়েছিল সুব্রত। পা ও হাতের চেটোর কোথাও-কোথাও কেটে গেছে কাচে। উত্তেজনার দরুন প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। বাসায় ফিরে দেখল জামাকাপড় রক্তে জবজব করছে।

কোনওরকমে ডেটলের সাহায্যে রক্ত বন্ধ করে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিয়েছিল সুব্রত। তারপর সকালে উঠেই চলে গিয়েছিলে বাসবের কাছে।

অবশ্য জ্বর এখন কমে গেছে। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে ও।

হঠাৎ দরজার কাছে শব্দ হতেই চোখ ফেরাল সুব্রত।

কী আশ্চর্য! সুমিত্রা!

সুমিত্রা ঘরে প্রবেশ করে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কী হয়েছে তোমার?

শুকনো একটু হেসে সুব্রত বলল, জ্বর। কিন্তু তুমি—তুমি যে এখানে আসতে পারো এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মিত্রা।

সুমিত্রা বিছানার ওপর গিয়ে বসল। ওর কপালের ওপর হাত রেখে বলল, কেন—কেন বিশ্বাস করতে পারছ না?

কারণ,—আড়চোখে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলল, যারা প্রাসাদে বাস করে, মোজাইকের ফ্লোরে হাঁটে, তাদের পক্ষে...।

এই...একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? আচ্ছা, তোমার কোথাও কেটে গেছে কি? জানলার তলায় রক্তের ছোপ দেখলাম!

তাই বুঝি ছুটে এলে?

হ্যাঁ, তাই। সব তাতেই শুধু ঠাট্টা—।

সুব্রতর গায়ের ওপর কম্বল ছিল। কম্বলের মধ্যে থেকে ও ব্যান্ডেজ জড়ানো হাতটা বের করল।

খুব গভীর ক্ষত, না? সুমিত্রার গলায় উৎকণ্ঠা।

খুবই অগভীর। চামড়া ছিঁড়ে গেছে মাত্র। এছাড়া পায়ে কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে।

সুব্রতর আহত হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল সুমিত্রা। বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

হচ্ছিল, এখন আর হচ্ছে না। তুমি যতক্ষণ থাকবে মোটেই আমার কষ্ট হবে না।

ধরো, আমি যদি আর না যাই, এখানেই থেকে যাই। তাহলে তুমি কী করবে শুনি?

সুব্রত বালিশের ওপর থেকে মাথাটা সরিয়ে এনে সুমিত্রার কোলের ওপর রাখল। বলল, আমি এই অসুস্থ শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়ব। যেখান থেকে হোক খুঁজে আনব একজন পুরুত। সাতে পাকে ঘুরিয়ে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা একটা করে নেব নিজেদের মধ্যে, তারপর আমার খালি বাক্সর চাবিটা তোমাকে গুছিয়ে দেব।

সুমিত্রা সুব্রতর চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে বলল, বাবা, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠবার উপায় নেই।

কিন্তু আমি এক-একসময় তোমার কথা ভেবে অবাক হই।

কোন কথা?

তোমার বোকামির কথা আর কী।

অর্থাৎ—?

অজয় সোম একজন প্রতিষ্ঠিত অ্যাটর্নি। রূপবান এবং প্রতিপত্তিশালী। তাকে ছেড়ে তুমি—তোমার সিলেকশান মোটেই প্রশংসনীয় হয়নি, মিত্রা।

অল্প একটু হেসে সুমিত্রা বলল, এবার তোমার গুণাবলীর বিবরণটা দাও, তবে বুঝতে পারা যাবে, আমার সিলেকশানটা ঠিক হয়েছে কি না।

আমার!—ম্লান হাসল সুব্রত।—দেওয়ার মতো কোনও ব্যাক-রেফারেন্স আমার নেই। তোমার পাশে দাঁড়াবার প্রচুর অযোগ্যতা আমার আছে।

ছাই আছে। সিরিয়াস হয়ে পড়লে তো?

আমি এক-এক সময় ভেবেছি, তুমি তো কিছুই জানো না আমার সম্বন্ধে। কী আমার বংশ-পরিচয়, কোথাকার লোক আমি...।

তার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তুমি ভীষণ ছেলেমানুষ।

সুমিত্রা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।—এই...তোমাকে কতবার বলেছি না, আমাদের দুজনের

মধ্যে যখন কথা হবে, একান্ত আমাদের দুজনের কথা, সেখানে আর কারুর কথা উঠবে না।

সুব্রত গাঢ় কণ্ঠে বলল, তুমি আমার সমস্ত এলোমেলো করে দিয়েছ মিত্রা। কেন এখানে আমি এসেছিলাম, কী আমার পরিকল্পনা ছিল, এখন আমার কিছুই মনে পড়ে না। আমি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছি। তুমি ঠিকই বলেছ, তোমার ও আমার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে কোনও বিভেদের কথা উঠতে পারে না—উঠতে পারে না কোন অজয় সোমের নাম।

এই তো গুড বয়ের মতো কথা।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কেটে গেল।

সুমিত্রা সুব্রতর মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে।

শেষে নীরবতা ভঙ্গ করল ও।—কী খাবে তুমি আজ? বার্লি?

হুঁ।

কেনা আছে ঘরে?

না।

আমি যখন ফিরব, চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। ওর হাতেই কিনে পাঠিয়ে দেব বার্লি। সকাল থেকে উপোস করে আছ নিশ্চয়ই?

একটু আগে ফল খেয়েছি। শোনো, তোমাকে যে বলেছিলাম ডাঃ রুদ্রর ডায়েরিগুলোর কথা—খুঁজে দেখেছিলে?

কী করে দেখব? স্টাডি-রুমে যে পুলিশ তালা দিয়ে গেছে।

ও।

কিন্তু ডায়েরিগুলো নিয়ে তুমি কী করবে, বলছ না তো?

নষ্ট করে ফেলব।

নষ্ট করে ফেলবে!

সুব্রত অন্যমনস্ক ভাবে বলল, হুঁ। ডায়েরিগুলোতে যা লেখা আছে, তা আর কারুর চোখে পড়ুক আমি চাই না।

কেন? তুমি হেঁয়ালি করো না লক্ষ্মীটি, আমায় বুঝিয়ে বলো কী হয়েছে। সুব্রত আর কিছু বলার অবকাশ পেল না।

এই সময় দরজার কাছ থেকে কে গম্ভীর গলায় বলল, সুমিত্রা—।

চমকে দুজনেই মুখ ফেরাল।

দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে অজয় সোম, এবং তাঁর পাশেই সঞ্জীব রুদ্র।

দুজনেরই মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

মনে-মনে সুমিত্রা সংকুচিত হল। সুব্রত ততক্ষণে উঠে বসেছে।

অজয় সোম বললেন, তুমি এখানে?

সুমিত্রা নিজের সংকুচিত ভাব কাটিয়ে ফেলেছে।

ও সহজভাবেই বলল, আপনারা এখানে?

সঞ্জীব ফেটে পড়লেন, বললেন, সুমিত্রা, চলে এসো আমার সঙ্গে।

কেন, দাদা?

কেন, জিগ্যেস করতে লজ্জা করছে না তোমার?

লজ্জা! কীসের লজ্জা!

বোকা মেয়ে, কণামাত্র বুদ্ধি-বিবেচনা তোমার শরীরে থাকলে তুমি এভাবে কথা বলতে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে—চলে এসো তুমি। আর এক সেকেন্ড তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই।

উত্তেজনার দরুন একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ দাদা, আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেতে এখানে

এসেছি, এবং নিজের ইচ্ছেতেই ফিরে যাব। তোমার ব্যস্ততার কোনও কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

অপমানে সারা মুখ কালো হয়ে উঠল সঞ্জীব রুদ্রর।

তুমি ভাবছ এই অপমান আমি মুখ বুজে সয়ে যাব?

কী হচ্ছে সঞ্জীব?—এতক্ষণে কথা বললেন অজয় সোম।—চলো, আমরা ফিরে যাই।

সঞ্জীব রুদ্রর কানে বোধহয় সে-কথা গেল না। তিনি আগের ভাব বজায় রেখে বললেন, বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যে তুমি এতটা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করবে আমরা কল্পনা করিনি। একটা স্ট্রিট বেগার, আমাদের বাড়িতে চাকরি করে, তার সঙ্গে...ছি, ছি—।

মিস্টার রুদ্র—সুব্রত বলল, আপনি অবশ্যই আপনার বোনকে কিছু বলতে পারেন, কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনি বোধহয় কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন না।

সুমিত্রার সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে অজস্র কথা দ্রুত ওঠানামা করছে। ও তবু সংযত গলায় বলল, আমাদের মুখে এসব কথা মানায় না। ঠাকুরদা স্কুল-মাস্টার ছিলেন, বাবা জীবনের বেশির ভাগ সময়ই চাকরি করেছেন। আর তুমি—তুমি এখনও চাকরি করছ। সুতরাং পরের বাড়িতে দাসত্ব করাব খোঁটা তোমার মুখে মানায় না।

সঞ্জীব, চলে এসো। তুমি ক্রমেই ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলছ।—অজয় সোম সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি দুঃখিত সুব্রতবাবু।

তিনি একরকম জোর করে সঞ্জীব রুদ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ঘরের মধ্যে একটা থমথমে নীরবতা নেমে এল। শুধু ওয়ালক্লকের একটানা টিকটিক শব্দ—সময়ের গতিবেগ যে ঠিক-ঠিক চলেছে সেকথাই জানিয়ে যাচ্ছিল।

বন্ধ জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুমিত্রা।

সুব্রত ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নরম গলায় বলল, খুবই বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। তুমি একটু নরম হয়ে কথা বললেই পারতে।

সুব্রতর দিকে ফিরে দাঁড়াল সুমিত্রা।—কেন—কেন আমি নরম হব বলতে পারো? ওরা কি ভেবেছে, আমি মাংসের টুকরো? আমাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করবে, অথচ আমি প্রতিবাদ করতে পারব না?

মিত্রা—।

আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। দিনের পর দিন—দাদার জোরজুলুম আমি অনেক সয়েছি। এ সমস্তই অজয় সোমের উসকানি, তা আমি জানি। যে-কোনও উপায়ে সে আমায় বিয়ে করতে চায়।

যেতে দাও ওসব কথা—যা হওয়ার হয়ে গেছে।

আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছি, মানুষ কতটা নীচে নেমে গেলে এইভাবে পরের আস্তানায় চড়াও হয়ে জুলুম করতে পারে! তাও যদি না আমি কিছু জানতাম। বাবাকে কে খুন করেছে সে সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?

না তো?

এ ব্যাপারের মধ্যে দাদা...।

কী বলছ তুমি?

এ সম্বন্ধে আমার একটা পরিষ্কার ধারণা আছে।

কীরকম?

গতমাসে কথা প্রসঙ্গে বাবা আমায় হঠাৎ বললেন, ভাবছি উইলটা পালটাব। অপদার্থদের কতকগুলো টাকা দিলে মরেও আমার শান্তি হবে না। দাদা এ কথা শুনেছিল বারান্দা থেকে। পরে আমাকে বলেছিল, বাবা আমাদের অপদার্থ বলতে পারেন না। তাঁকে কোনওমতেই উইল পালটাতে

দেওয়া হবে না।

তারপর?

তারপর আর তিনি উইল পালটাবার সুযোগ পেলেন কোথায়। অর্থাৎ, তাঁকে সুযোগ আর দেওয়া হল না।

তুমি এ-কথা বলেছ নাকি পুলিশকে?

না।

তাহলে আর এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। এবার একটা রিকশা ডাকিয়ে দিচ্ছি, বেলা থাকতে-থাকতেই বাড়ি ফিরে যাও।

আমি এখানেই থাকব।

বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে সুব্রত।

তুমি এখানে থাকবে! কিন্তু—।

তুমি মিথ্যে কিন্তু হচ্ছ,—সুমিত্রা স্বাভাবিক গলায় বলল, একটু আগে তুমি বলছিলে না, আমি এখানে থাকতে চাইলে, একজন পুরুত ডেকে আনবে। বেশ তো, যাও না, ডেকে নিয়ে এসো—।

সুব্রত ওকে কাছে টেনে আনল।—তুমি কি ভাব আমি পারি না। এখুনি পারি ডেকে আনতে একজন পুরুত। কিন্তু মিত্রা, সুষ্ঠু সামাজিক নিয়মে আমাদের বিয়ে সকলের সামনে হোক, আমরা কি তাই চাইব না?

কিন্তু এই ঘটনার পর বাড়ি ফিরে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করছে। ওরা যদি—।

তোমার কোনও ভয় নেই, কোনও অনিষ্টই এখন কেউ করতে সাহস করবে না। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

সুমিত্রা সুব্রতর কাছ থেকে সরে এল, বলল, বেশ।

তুমি রাগ করলে মিত্রা?

রাগ!—মিষ্টি করে হাসল সুমিত্রা।—তোমার ওপর রাগ আমি করতে পারি না, তা তো তুমি জানো। তুমি ঠিকই বলেছ, এখন আমার বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত। তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না, শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি।

সুব্রত বিছানার ওপর গিয়ে বসল।

সুমিত্রা দরজার কাছ বরাবর গিয়ে আবার বলল, চাকরটাকে ডেকে নেব, ও বোধহয় বাইরেই কোথাও আছে। ওর হাত দিয়ে বার্লি কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

॥ নয় ॥

সন্ধ্যার পর হীরকের বাড়িতে প্রেমপ্রকাশ এলেন।

বাসব ও হীরক কোনও একটা বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। ইন্সপেক্টরকে দেখে ওরা সাড়ম্বরে আহ্বান জানাল।

একটা কোচে বসলেন প্রেমপ্রকাশ।

বললেন, কেসটার সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এলাম।

বেশ তো। যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুলতে বলেছিলাম—তোলা হয়েছে নাকি? বাসব প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, কাল আপনাকে প্রিন্টের কপি দিতে পারব আশা করি। হরিপদর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন?

ওর মৃত্যু সম্বন্ধে আমি মোটামুটি একটা থিয়োরি খাড়া করেছি। মনে হয় ভবিষ্যতে আমার থিয়োরি নির্ভুল প্রমাণিত হবে।

হীরক বলল, তোমার থিয়োরিটা কী?

আমি আগেই বলেছি খাম-চোরের সঙ্গে হরিপদর পরিচয় ছিল। তার সাহায্যেই চোর খামটা চুরি করতে পেরেছিল, এবং চোরের পরামর্শেই হরিপদ অজয় সোমের কাছ থেকে দেশে যাওয়ার ছুটি চেয়ে নিয়ে, আগ্রাতেই গা-ঢাকা দিয়েছিল। গা-ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য হল—খাম-চোর নিশ্চিত ভাবে জানত, পুলিশের জেরায় পড়লে হরিপদ বেফাঁস কিছু বলে ফেলতে পারে—তাই এই ব্যবস্থা। আমার মনে হয়, হরিপদ এবিষয়ে খুবই সজাগ ছিল যে খাম-চোর এখন তার হাতের মুঠোয়। এবং পুলিশের কাছে সমস্ত প্রকাশ করে দেবে এই ভয় দেখিয়ে সে চোরকে ব্ল্যাকমেল করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হরিপদ বুঝতে পারেনি, শক্তিমান প্রতিপক্ষকে এভাবে ঘাঁটানো তার উচিত হচ্ছে না। এই কারণেই শেষপর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না—প্রেমপ্রকাশ বললেন, হরিপদর মৃতদেহ ডাঃ রুদ্রর বাড়িতে ফেলে আসার কী সার্থকতা।

আপাতদৃষ্টিতে এর কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলেও আমার ধারণা, হত্যাকারীর মনের মধ্যে যে গভীর আত্মপ্রত্যয় আছে, তারই সূক্ষ্ম বিকাশ ঘটেছে এতে। অর্থাৎ হত্যাকারী—এখানে ভুলে গেলে চলবে না, খাম-চোর ও হত্যাকারী একই ব্যক্তি। ঘটনার গতির প্রতি দৃষ্টি রেখে এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হরিপদকে হত্যা করার পর তার মৃতদেহ কোথাও ফেলতেই হত। তাই হত্যাকারী পরিস্থিতিটাকে আরও জটিল করে তোলবার জন্যে মৃতদেহ ওখানে ফেলে এসেছিল। এক্ষেত্রে সে কতটা রিস্ক নিয়েছিল ভেবে দেখুন। মৃতদেহ বয়ে আনার সময়, যে কোনও মুহূর্তে তা ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবু সে এ-কাজ করেছিল পুলিশ ও আমাকে ধাঁধায় ফেলবার জন্যেই।

আপনি বলতে চান খাম-চোর, ডাঃ রুদ্র আর হরিপদ—দুজনকেই খুন করেছে?

আগেই বলেছি, ঘটনার গতি দেখে তাই মনে হচ্ছে।

হরিপদর ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ডাঃ রুদ্রকে খুন করবার মোটিভ কী?

হত্যাকারীর মোটিভ আমি প্রথমে ধরতে পারিনি। কিন্তু ডাঃ রুদ্রর টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসার কথা জানবার পর এবং অজয় সোমের কাছে গচ্ছিত সমস্ত খামের মধ্যেই হ্যান্ডনোট আছে বুঝতে পারার পরেই, আমি হত্যার মোটিভ ধরে নিয়েছি।

আমি আপনাকে ঠিক ফলো করলাম না।

যে-খামটা চুরি গেছে, সহজেই অনুমান করে নেওয়া চলে তার মধ্যেও অন্যান্য খামের মতো হ্যান্ডনোট ছিল। এখন আপনি চিন্তা করে দেখুন, চোর হ্যান্ডনোট সমেত খাম কেন চুরি করবে? নিশ্চয়ই সে বেশ মোটা টাকা ডাঃ রুদ্রর কাছ থেকে ধার নিয়েছিল। অবশ্য টাকা শোধ দেওয়ার ইচ্ছে তার ছিল না, তাই কৌশলে হ্যান্ডনোট সমেত খামটাকে সে সরিয়েছিল।

ইন্সপেক্টর বললেন, খামটা যখন সে চুরি করতেই পেরেছিল, তখন ডাঃ রুদ্রকে খুন করার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

বিরাট একটা উদ্দেশ্য ছিল। ডাঃ রুদ্রকে খুন না করলে সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যেত। খাম চুরি যাওয়ার কথা ডাঃ রুদ্রর কানে গেলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন এ কাজটা কার—যে টাকা ধার নিয়েছে, সে-ই তাঁকে এইভাবে ফাঁকি দিতে চায় অনুমান করে নিতে কষ্ট হত না তাঁর। তিনি পুলিশের কাছে তার নাম প্রকাশ করে দিতে পারতেন। সুতরাং তাঁর মুখ বন্ধ করা হত্যাকারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। অবশ্য এ-ছাড়া আরও কারণ থাকতে পারে তাঁকে খুন করার।

প্রেমপ্রকাশ বাসবের দিকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কত সহজভাবে আপনি

রহস্যের গ্রন্থিগুলো খুলে চলেছেন, ভাবলেও অবাক হতে হয়।

বাসব হাসল, ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসি। বলল, আসলে আজকাল অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই আমাকে সাহায্য করে।

চা এল। হীরকের চাকর মঙ্গলময় ট্রেতে করে তিনকাপ চা দিয়ে গেল।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল।—চলবে নাকি?

চা-এর কাপ তুলে নিতে-নিতে প্রেমপ্রকাশ বললেন, না।

এতক্ষণে হীরক কথা বলল, হরিপদর মৃতদেহ যেদিন ডাঃ রুদ্রর বাড়িতে পাওয়া যায়, সেদিন স্টাডিতে চোর ঢুকেছিল—ও বিষয়ে কিছু ভেবেছ নাকি?

বাসব সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলল, সেদিন ও-বাড়িতে আমি আগে থেকেই উপস্থিত ছিলাম, একথা আমি তোমায় বলেছি। ইন্সপেক্টর, আপনিও জানেন। আমার চোখের সামনেই একজন লোক স্পাইর‍্যালের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কিছু পরে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম, কিন্তু ওপরে উঠে আর তার দেখা পেলাম না। সে তখন স্টাডিতে গিয়ে ঢুকেছিল। পরে আমরা স্টাডিরুমটা পরীক্ষা করে দেখেছি সারা ঘরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। মনে হয় একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে যেন। আমি সহজেই বুঝতে পারলাম, আমার দেখা আগন্তুকটি ছাড়াও, আরেকজন সজাগ হয়েছিল, তাই বোধ হয় আগন্তুক স্টাডিতে ঢোকার পরই দুজনের মধ্যে হাতাহাতি বেধে যায়। কিন্তু কোন বস্তুটিকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব, তা বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ বস্তু সংগ্রহ করবার জন্যেই আগন্তুক ওখানে গিয়েছিল, এবং একই কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও সেখানে উপস্থিত হয়েছিল।

বস্তুটি কী?

সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই। ঘরের এক কোণে রাইডার হ্যাগার্ডের 'ব্ল্যাক শ্যাডো' বইখানা পড়ে থাকতে দেখলাম। এই বইখানাই মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ডাক্তার রুদ্র পড়ছিলেন বলে ধারণা করা হয়েছে। বইটিকে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমি তুলে এনেছিলাম, কিন্তু নেড়েচেড়ে দেখে তার মধ্যে থেকে কিছুই পাইনি।

বাসব সিগারেটে ঘন-ঘন বারকতক টান দিল।

ইন্সপেক্টর বললেন, সেদিন ঘরে আরেকটা জিনিস কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল, ছোট লাল রঙের একটা পাথর। আমি অভিজ্ঞ জহুরিকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি, ওটা চুনি।

বাসব ও বিষয়ে কোনও মন্তব্য করল না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনাদের এখন আমি এক বিচিত্র কাহিনি বলব। বরং বলতে পারেন, একজন বরেণ্য লোকের চরিত্র উদঘাটন করব।

হীরক ও প্রেমপ্রকাশ সাগ্রহে তাকালেন ওর দিকে।

সেদিন গোটা তিনেক ডায়েরি স্টাডিরুমের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ার থেকে আমি বের করে নিয়ে এসেছিলাম।

হ্যাঁ, আপনি নিয়ে এসেছিলেন বটে। ইন্সপেক্টর বললেন।

সেই ডায়েরি থেকেই আপনাদের কিছু বলব।

বাসব ডাঃ বঙ্কিম রুদ্রর ডায়েরিতে যা পড়েছিল, সমস্ত বলে গেল একে-একে।

সমস্ত শুনে আকাশ থেকে পড়লেন প্রেমপ্রকাশ।

বললেন, এ যে ভাবতেও পারা যায় না মিস্টার ব্যানার্জি। ডাক্তার রুদ্রর মতো লোক বলতে গেলে দুজন লোকের হত্যাকারী!

পৃথিবী বিচিত্র জায়গা ইন্সপেক্টর, এবং তার চেয়ে অনেক বেশি বিচিত্র হল মানুষের মন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যেখানেই আমি জোর দিয়ে কোনও একটা বিষয়ের ওপর নিজের

আস্থা আনবার চেষ্টা করেছি, পরে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে ঠকতে হয়েছে।

এই কেসে ওই ডায়েরিগুলো কোনও আলোকপাত করতে পারবে বলে ভরসা করেন?

বাসব বলল, ভুলে যাবেন না, ডায়েরিতে উল্লিখিত সেই নকশাটির সন্ধান এখনও আমরা পাইনি। কে বলতে পারে ওই নকশার সন্ধানেই সেদিন স্টাডিতে দুজন আগন্তুকের আগমন হয়েছিল কিনা। আরেকটা কথা, ডাক্তারের চেম্বার থেকে আমরা যে ফটোগ্রাফখানা পেয়েছি—তার পরিচয় আর আমার অজানা নেই।

কে সে?

চন্দ্রকান্ত।

কীভাবে বুঝলেন?

সুব্রতবাবুকে দেখে।

সেকী! সুব্রতবাবুর সঙ্গে চন্দ্রকান্তর কী সম্পর্ক?

বাসব তরল কণ্ঠে বলল, পিতাপুত্রের।

হীরক বিস্মিত গলায় বলল, তা কী করে সম্ভব!

অসম্ভব নয় বলেই। আজ সকালে যখন সুব্রত রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন—প্রথম দর্শনেই মনে হল এ-মুখ কোথায় যেন আগে দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। দুপুরে একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ল। আমি থানায় গিয়ে ছবিটা দেখে এলাম। ছবিটা দেখে আমার সন্দেহ দূর হল। ফটোর মধ্যেকার মানুষটির সঙ্গে সুব্রত রায়ের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করলাম। তাছাড়া ছবিটির পিছনে পেন্সিল দিয়ে ইংরেজিতে মিস্টার রায় লেখা ছিল। কাজেই তিনি নিশ্চয়ই চন্দ্রকান্ত—আর সুব্রত রায় তাঁর ছেলে। অবশ্য আমার অনুমান ঠিক না-ও হতে পারে।

কিন্তু এই সহজ জিনিসটা—হীরক বলল, যা তোমার চোখে পড়ল, ডাক্তার রুদ্র তা বুঝতে পারেননি?

নিশ্চয়ই পেরেছিলেন, হয়তো সুব্রত রায়কে এ বিষয়ে কিছু জানতে দেননি।

কেন?

এক কাজ করা যেতে পারে—বাসব বলল, সুব্রত রায়কে ডায়রেক্ট চার্জ করা যেতে পারে। তাহলে তোমার 'কেন'র উত্তরটা হয়তো পাওয়া যাবে।

তুমি সরাসরি সুব্রতবাবুকে গিয়ে জিগ্যেস করতে চাও এ বিষয়ে?

হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর বললেন, এ প্রস্তাব মন্দ নয়।

ইন্সপেক্টর, আপনি তাঁর ঠিকানা জানেন নাকি?

জানি। লেখা আছে থানার ডায়েরিতে। তবে মনে নেই। কারণ আমি তাঁর বাসায় যাইনি একবারও। থানায় ডেকে পাঠিয়ে কথা বলেছিলাম। যাই হোক, আমি এখুনি ঠিকানা জোগাড় করে নিচ্ছি।

প্রেমপ্রকাশ টেলিফোন স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন একটা নম্বর। ডাঃ রুদ্রর বাড়ির সঙ্গে সংযোগ করলেন তিনি। ওপ্রান্তে ফোন ধরলেন ডাঃ বিনয় রুদ্র।

ইন্সপেক্টর তাঁর কাছ থেকে জেনে নিলেন সুব্রতর ঠিকানাটা।

সুব্রতর এখন জ্বর নেই।

তবু শুয়ে আছে বিছানায়। ভাবছে আজকের সকালের ঘটনার কথা।

ওই সঙ্গে সুমিত্রার মনের জোরকে বাহবা না দিয়ে পারছে না সুব্রত। সত্যি, অদ্ভুত চরিত্রের এই মেয়েটি।

অলসভাবে শুয়ে-শুয়ে চিন্তা থেকে চিন্তান্তরে চলে যায় ও। কত কথা মনে পড়ে। কলকাতা থেকে আগ্রায় আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না সুব্রতর। ও এখানে আসে একটা ঋণ পরিশোধের তাগিদে।

কিন্তু সবই গোলমাল হয়ে গেল। ভেস্তে গেল সমস্ত পরিকল্পনা। সুমিত্রা ওকে নব-জীবন দিল যেন। নিজের অজান্তেই ও এক অন্যপথে পা বাড়াল। সুমিত্রার মায়া-পরশে জীবনের সুনির্দিষ্ট পথ দিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সুব্রত।

এইভাবেই বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ ভাবনার সমুদ্রে সাঁতার দিত ও। কিন্তু এই সময় চাকর ঘরে প্রবেশ করতে চটকা ভাঙল ওর।

চাকরটির ভীতচকিত ভাব। সে জানাল, বাইরে পুলিশ এসেছে।

পুলিশ! পুলিশ কেন? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?

আজ্ঞে।

এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই চাকরকে অনুসরণ করে প্রেমপ্রকাশ, বাসব ও হীরক ঘরে এল।

সুব্রত বসতে বলল সকলকে।

তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

ইন্সপেক্টর বললেন, আপনি কি অসুস্থ?

একটু জ্বরভাব হয়েছিল।

আপনাকে এ-সময় বিরক্ত করতে আসায় আমরা দুঃখিত। গোটাকতক কথা জেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের এখানে আসতে হল।

আমি এখন এমন কিছু অসুস্থ নেই। আপনারা কুণ্ঠিত হবেন না। কী জানতে চান বলুন?

বাসব বলল, আপনার সঙ্গে আমার একবার কথা হয়ে গেছে। তবু আরেক দফা আসতে হল। আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

বেশ তো। বলুন?

শেষজীবনে আপনার বাবার কি মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছিল?

ইতস্তত করে সুব্রত বলল, হ্যাঁ।

আপনি সেসময় তাঁর কাছেই ছিলেন?

আংশিকভাবে ছিলাম।

আপনার বাবার নামটা কী ছিল?

চন্দ্রকান্ত রায়।

বাসব ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল।

শুনুন মিস্টার রায়, আপনার বাবার সঙ্গে ডাক্তার রুদ্রর প্রথমে কী ধরনের সম্পর্ক ছিল, এবং পরে অর্থঘটিত ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কীভাবে বিচ্ছেদ ঘটে, তা আমরা জানি। এখন বলবেন কি, আপনি এখানে এসে ছিলেন শুধু চাকরির সন্ধানে, না ডাক্তার রুদ্রকে...।

বাসবকে বাধা দিল সুব্রত : আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ডাক্তার রুদ্রকে খুন করেছি?

প্রমাণ ছাড়া, আমি বলতে চাইলেও আপনি খুনি প্রতিপন্ন হবেন না মিস্টার রায়। একটা খুনের তদন্ত করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। নানারকম প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে থেকেই আমাদের আসল উত্তরটা জেনে নিতে হয়। কাজেই—।

সুব্রত কিছু বলল না।

বাসব আবার বলল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আপনার পরিচয় আমাদের জানা ছিল। আপনাকে প্রশ্ন করে শুধু সত্যকে যাচাই করা হল। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমি আপনাকে প্রথম দর্শনেই প্রায় চিনতে পারলাম, অথচ ডাক্তার রুদ্র—

তিনিও আমাকে চিনতে পেরেছিলেন।

মিস্টার রায়,—বাসব বলল, আপনি যদি প্রথম থেকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেন, তাহলে আমাদের বিশেষ সুবিধে হয়।

৷৷ দশ ৷৷

সুব্রত একটু চিন্তা করল।

তারপর বলল, বেশ, আমার আপত্তি নেই। শুনুন—।

বাবা মারা যাওয়ার পরই সুব্রতর পক্ষে আর শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। ওখানেই বি-এ পড়ছিল ও।

শান্তিনিকেতনে ফিরে না যাওয়ার কারণ হল আর্থিক অনটন।

অথচ প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ ও, এবং বরাবরই নিজের বাবাকে একজন ধনী ব্যক্তি বলে জানে সুব্রত। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভোজবাজির মতোই সমস্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা মিলিয়ে গেল। এবং দু'চারজন পাওনাদার ওর কাছে এল। বেশ কিছু টাকা তাদের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত।

কিছুই বুঝতে পারে না সুব্রত।

হাওয়ার একটা ফুৎকারে যেমন প্রদীপ নিভে যায়, তেমনি চন্দ্রকান্তর জীবনদীপ নিভে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও অবাক হয়ে লক্ষ করছে, সংসারের সমস্ত তেলও ফুরিয়ে গেছে ওই সঙ্গে।

পাওনাদারদের তাগাদা বাড়তে লাগল ক্রমেই। তাদের ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠল। কাজেই শেষ সম্বলের ওপর টান পড়ল। বাড়ি বিক্রি করে দিতে হল সুব্রতকে। ধার শোধ হল। এখন চাকরির সমস্যা। বেঁচে থাকতে গেলে অবশ্যই চাকরির প্রয়োজন। অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক ধরাধরির পর শেষে চাকরি পাওয়া গেল।

বিশিষ্ট এক মার্কেন্টাইল ফার্মে ডেসপ্যাচ ক্লার্কের পদ। দক্ষিণা একশো পঁচিশ টাকা।

চলে যাচ্ছিল। কয়েকটা বছর মোটামুটিভাবে কেটে গেল।

এইভাবে জীবনটাও কেটে যেত বোধ হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ প্রবাহ বজায় থাকল না। দৈবাৎ একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ওর জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেল বলা চলে।

বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। সুব্রত আস্তানা গেড়েছিল তাই বেলেঘাটার এক বস্তিতে। টিনের ছাদওয়ালা ছোট্ট ঘর। চারধারে নোংরা পরিবেশ। তবু এই আওতায় নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছিল ও।

আসবাবপত্র ঘরে বিশেষ ছিল না। একটা তক্তাপোষ, দুটো চেয়ার আর দুটো তোরঙ্গ। তোরঙ্গ দুটোর মধ্যে একটাতে ওর ব্যবহারের জিনিস থাকে, অন্যটায় কাগজপত্র, দলিলদস্তাবেজ আছে যত রাজ্যের। এগুলো জমা করে রাখার কোনও সার্থকতা নেই। তবু কাগজপত্রগুলোকে নষ্ট করে ফেলেনি, চন্দ্রকান্তর স্মৃতিবিজড়িত বলেই।

সেদিন শনিবার।

কীসের একটা ছুটি ছিল।

বেশ বেলাতেই ঘুম থেকে উঠল সুব্রত। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে এখন কী করবে ভাবছিল—হঠাৎ ওর খেয়াল হল, কাগজভর্তি ট্রাঙ্কটা এই অবকাশে ঘেঁটেঘুঁটে দেখলে কেমন হয়। ট্রাঙ্কের ডালা খুলে, তাড়া-তাড়া কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল ও। সমস্তই ব্যবসা সম্পর্কীয় কাগজপত্র।

হঠাৎ সুব্রতর দৃষ্টি পড়ল একটা অর্ধসমাপ্ত চিঠির ওপর। কী আশ্চর্য, চিঠিটা ওকে লিখেছিলেন চন্দ্রকান্ত। কিন্তু যে কোনও করণেই হোক চিঠিটা তিনি শেষ করেননি।

সুব্রত অর্ধসমাপ্ত চিঠিটা তুলে নিল নিজের চোখের সামনে ঃ

বাবা সুবু,

তোমাকে যে কোনওদিন এভাবে চিঠি লিখতে হবে ভাবিনি। কিন্তু পৃথিবীতে অচিন্তনীয় ঘটনাই ঘটছে অহরহ।

আমার আশা ছিল তোমাকে আমি মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলব। এ বিষয়ে যে আমার চেষ্টার অভাব নেই, তা তুমি লক্ষ করে থাকবে। তবে বোধ হয় শেষরক্ষা করতে পারলাম না।

তুমি বড় হয়েছ। তোমাকে সমস্ত কথা পরিষ্কার করে লেখা বাঞ্ছনীয় মনে করছি। আজ আমি কপর্দকশূন্য। ক্রমেই দেনায় ডুবে যাচ্ছি। বন্ধুকে বিশ্বাস করে আজ আমার এই বিপদ। আমার কাছ থেকে তুমি বঙ্কিম রুদ্রর কথা শুনে থাকবে। সেই অভিন্নহৃদয় বন্ধুটি আমাকে দু'লক্ষ আটাশ হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে। আমাকে পথের ভিখারি করে ছেড়েছে।

আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। মাথার মধ্যে ক্রমেই গোলমাল অনুভব করছি! বোধ হয়...

চিঠি এখানেই শেষ হয়েছে।

এতদিন পরে সুব্রত বুঝতে পারল, বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর্থিক অনটনের কারণটা কী। বঙ্কিম রুদ্রর কথা বহুবার শুনেছে ও চন্দ্রকান্তর মুখে। শেষপর্যন্ত তিনিই ওদের মর্মন্তুদ পরিস্থিতির জন্যে দায়ী!

এখন বারবার মনে হচ্ছে সুব্রতর, এত তাড়াতাড়ি হয়তো বাবা মারা যেতেন না। টাকার শোকে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই, বঙ্কিম রুদ্রই বাবার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল সুব্রতর।

এখন ওর কী কর্তব্য?

ঘুম এল না সারারাত। কর্তব্য নির্ধারণের চিন্তায় পায়চারি করেই কাটিয়ে দিল। ভোরবেলা ওর মন একটা বিষয়ে একাগ্র হল। এর প্রতিশোধ ও নেবে। বঙ্কিম রুদ্রকে দু-লক্ষ আটাশ হাজার টাকা হজম করতে দেওয়া হবে না। চন্দ্রকান্তর আত্মার তৃপ্তির জন্যে চূড়ান্তভাবে একটা কিছু করবে সুব্রত।

প্রায় এক হপ্তা লেগে গেল বঙ্কিম রুদ্রর সমস্ত খোঁজখবর নিতে।

বহু কষ্টে তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। পাওয়া গেল তাঁর বর্তমান ঠিকানা।

একমাসের ছুটি নিল সুব্রত। ওর এতদিনের চাকরি জীবনে ছুটির বড় একটা প্রয়োজন হয়নি।

ছুটি নিয়ে কী করবে ও। বরং কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে, অনেক কিছু ভুলে থাকার সম্ভাবনা। সহজেই ছুটি মঞ্জুর হল।

আগ্রায় চলে এল সুব্রত।

এক কাওয়ালির আসরে ডাঃ রুদ্রর সঙ্গে আলাপ হল। সরাসরি চাকরির প্রার্থনা করল তাঁর কাছে। ডাঃ রুদ্র ওকে চাকরি দিলেন। নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে বহাল করলেন সুব্রতকে। ও সুযোগের অপেক্ষায় রইল। অবশ্য কীভাবে ডাঃ রুদ্রর ওপর প্রতিশোধ নেবে, এ বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। কাজেই সে বিষয়ে সুব্রত বিশেষ চিন্তিত ছিল। কিন্তু সে চিন্তা বেশিদিন স্থায়ী হল না।

সুমিত্রা সমস্ত এলোমেলো করে দিল। ডাঃ রুদ্রর সুগঠনা সুন্দরী মেয়েটি। আগ্রায় আসার প্রধান উদ্দেশ্য থেকে ক্রমেই সরে যেতে লাগল ও। ধীরে-ধীরে সুমিত্রা ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। গভীরভাবে ওকে ভালোবেসে ফেলল সুব্রত।

কয়েকদিন থেকে খুবই শীত পড়ছে।

বেলা তখন দশটা।

সুব্রত একমনে কাজ করে যাচ্ছিল।

ডাঃ রুদ্র ঘরে এলেন। ওর পাশে এসে বললেন, এখন তুমি খুব ব্যস্ত আছ, সুব্রত?

আজ্ঞে...

তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

সুব্রত ডাঃ রুদ্রর দিকে তাকাল। চোখ-মুখ শুকনো। ক্লান্ত চেহারা।

বলুন?

তুমি যখন আমার কাছে কাজ করতে এলে, তখন আমি তোমার সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর নিইনি। আজ ওবিষয়ে আমার কিছু আগ্রহ রয়েছে।

আমার পরিচয়...

তোমার আপত্তি আছে নাকি?

না। তবে—।

ডাঃ রুদ্র পাউচ থেকে টোবাকো বার করে পাইপে ভরতে-ভরতে বললেন, আমি জানি, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছ।

শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে হিমপ্রবাহ বয়ে গেল সুব্রতর।

ও অসংলগ্ন গলায় বলল, আমার অভাব ছিল। চাকরি দিয়ে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য আর কী থাকতে পারে।

সিগারে অগ্নিসংযোগ করলেন ডাঃ রুদ্র। বললেন, তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ো না সুব্রত। প্রথম দর্শনেই আমি তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম। আমি জানি তুমি কে।

সুব্রত ঘামতে লাগল।

এই প্রচণ্ড শীতেও সারা গা ওর ঘামে জবজবে হয়ে উঠল। একটা কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল না।

ডাঃ রুদ্র আবার বললেন, তোমাকে চিনতে পারার পরও, তোমাকে চাকরি দিলাম কেন, এ-প্রশ্ন তোমার মনে উঠতে পারে। তোমাকে আমি ঠিক চাকরি দিইনি, দিয়েছিলাম কার্যোদ্ধারের সুযোগ।

সুযোগ।

হ্যাঁ, সুযোগ। তুমি চন্দ্রকান্তর ছেলে। আমি তোমাদের কতবড় সর্বনাশ করেছি, সে-কথা জানতে

পেরেই তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে এসেছিলে—কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তিন বছর প্রায় পার হতে চলেছে, কই, তুমি তো আমার কোনও ক্ষতি করলে না?

আপনি কী বলছেন, আমি...।

বারবার অস্বীকার করবার চেষ্টা করো না। তোমার মতো অবস্থায় পড়লে, আমারও মাথায় রক্ত উঠে যেত।

দেখুন, আমি...।

আমার সারা মন অনুশোচনায় ভরে গেছে। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি সুব্রত, চন্দ্রকান্ত আমায় যতই বিপথগামী করবার চেষ্টা করুক না কেন, তবু আমি ওর যে ক্ষতি করেছি তার ক্ষমা নেই।

সুব্রত নিজেকে সংযত করে ফেলেছে এতক্ষণে।

ও শান্ত গলায় বলল, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, স্যার। এখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

লাভ আছে সুব্রত। একটা পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার দায়ে আমি অভিযুক্ত। শাস্তি আমাকে পেতে হবে বইকি, যদিও আমি বাঁচতে চাই—তবুও অনেক চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—তোমার হাত থেকে যে কোনও শাস্তি আমাকে নিতেই হবে।

আপনি আর একথা বলবেন না, স্যার। আমিও স্বীকার করছি, আপনার ওপর আক্রোশ নিয়েই আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখন ওটা আর কোনও সমস্যাই নয়।

তোমার উদারতা আছে সুব্রত। কিন্তু এখন আমি নিজের নৈতিক দিকটা কীভাবে অস্বীকার করব!

পকেট থেকে রিভলবার বের করলেন ডাঃ রুদ্র।

পরিবেশটা সম্পূর্ণ নাটকীয় হয়ে উঠল।

রিভলবারটা টেবিলের ওপর রেখে তিনি বললেন, এই যন্ত্রটা কোল্টের ০·৪২ ক্যালিবারের। সায়লেন্সার লাগানো আছে। তুমি এর সাহায্যে মনের ক্ষোভকে এই মুহূর্তে মেটাতে পারো। ঘরে আর কোনও সাক্ষী নেই।

আমার মনেও আর কোনও ক্ষোভ নেই স্যার। অন্যায় হলেও আমি আপনার ডায়েরি থেকে কিছু-কিছু পড়েছি। বাবা নিজের স্বার্থের জন্যে আপনাকে বিপথগামী করেছিলেন—আপনাকে ঠকিয়েছিলেন। আপনি প্রথম সুযোগেই তাই তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কাজেই...।

ঠিক সেই সময় সুমিত্রা ঘরে এল—সুব্রত হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

সুমিত্রা রিভলবারটার দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করল, বাবা, রিভলবার কেন এখানে?

মেয়ের এই প্রশ্নে ডাঃ রুদ্র অসহায়ভাবে এধার-ওধার তাকাতে লাগলেন।

তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সুব্রত বলল, ওটা দোকানে দিতে হবে, ট্রিগার ভালো কাজ করছে না।

সুব্রত নিজের বক্তব্য শেষ করল।

প্রেমপ্রকাশ বললেন, ডাঃ রুদ্র মারা যাওয়ার কতদিন আগে আপনার সঙ্গে এই কথাগুলো হয়েছিল?

মাসখানেক আগে বোধ হয়।

বাসব বলল, তিনি জানতেন আপনার সঙ্গে সুমিত্রা দেবীর ঘনিষ্ঠতার কথা?

না, আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত কিছু গোপন রেখেছিলাম।

আপনি যখন ডাঃ রুদ্রের ডায়েরি পড়েছেন, তখন নকশার বিষয় সমস্ত কিছু জানেন। ও সম্বন্ধে তিনি আপনাকে কিছু বলেছিলেন?

না।

কে তাঁকে প্রাণের ভয় দেখাচ্ছিল, বলতে পারেন কি?

না, অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ডাঃ রুদ্রকে ভয় দেখানো হচ্ছিল—যাতে তাঁর মনে হয়, এ সমস্ত কাজ আমারই।

বাসব বলল, আপনার এই সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ সুব্রতবাবু। ভরসা করি, আপনি. আমাদের কাছে কিছু লুকিয়ে যাননি।...আমরা এখন উঠলাম।

আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

সুমিত্রার ভয় ছিল, বাড়ি ফেরার পর হয়তো দাদা আরও কিছু বলবে। কিন্তু সঞ্জীব রুদ্র আর কিছু বলেননি। থমথমে গম্ভীর মুখ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন শুধু।

এক হিসেবে এই ঘটনা সুমিত্রার পক্ষে বেশ লাভজনক হয়েছে। যে কথাটা প্রকাশ করতে ওকে সংকোচের বেড়ায় আটকে পড়তে হত, অর্থাৎ সুব্রতর সঙ্গে ওর বিয়ের কথাটা দাদা বা কাকাকে বলতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হত, এক্ষেত্রে তার আর কোনও অসুবিধা রইল না, সমস্ত কিছুই পরিষ্কার ভাবে জানাজানি হয়ে গেল। ভালোই হয়েছে।

এই সময় চাকর এসে একটা মুখবন্ধ খাম দিয়ে গেল সুমিত্রাকে।

খামের ওপর ওরই নাম লেখা। সুমিত্রা বেশ অবাক হয়েই খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে একটা কাগজ বার করল—চিঠি!

ওকে আবার কে চিঠি লিখল! চিঠির শেষের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে আনল সুমিত্রা—লেখক অজয় সোম। অজয় সোম ওকে চিঠি দিয়েছেন? কেন? অনিচ্ছার সঙ্গেই ও চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করল ঃ

সুমিত্রা,

উপায়হীন অবস্থায় তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম। সামনাসামনি হয়তো এতগুলো কথা গুছিয়ে আমি বলতে পারতাম না, কিংবা বলতে পারলেও তুমি ধৈর্য ধরে শুনতে চাইতে না।

আমি এতদিন সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম। বুঝতে পারিনি যে তুমি সুব্রতবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তোমাদের দুজনের আগামী জীবন আনন্দময় হোক, এই আমার কামনা।

তবে আমি তোমাদের একজন পারিবারিক বন্ধু হিসেবে এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। সুব্রতবাবু আপাতদৃষ্টিতে একজন ভালোলোক। কিন্তু তুমি তাঁর অতীত সম্পর্কে কিছু জানো কি? সম্প্রতি আমি তাঁর সম্বন্ধে গোটাকয়েক এমন কথা জানতে পেরেছি, যাতে মনে হয় তিনি তোমাকে বিয়ে করার পরিবর্তে, অন্য কিছু করার পরিকল্পনা রাখেন।

আমার জানা নেই, এমন কোনও বিশেষ কারণে তিনি তোমাদের পরিবারের সর্বনাশ করতে চান। তাই আগ্রায় এসে ছল করে তোমার বাবার কাছে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। আমি এমন অনেক কিছু জানি, যা লিখতে আমার সংকোচ হচ্ছে। একথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই না যে ডাঃ রুদ্রকে তিনি হত্যা করেছেন। তবে এটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এবং এখনও তাঁর সম্বন্ধে সাবধান

না হলে ভবিষ্যতে পরিবারের সকলের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি। এখানেই শেষ করলাম।

অজয় সোম

চিঠিটা পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সুমিত্রা। আরেকবার পড়ল।

অজয় সোমের ধৃষ্টতায় ওর শরীর রি-রি করে উঠল। স্বীকার করতেই হয় লোকটার সাহস আছে। কিন্তু—এখানে যে বড়রকম একটা কিন্তুর খোঁচা রয়েছে। একটা লোকের নামে ডাহা এতগুলো মিথ্যে কথা লিখতে কেউ সাহস করবে? সুব্রতর নামে অজয় সোম যে সমস্ত কথা লিখেছেন, তা প্রমাণিত না হলে, বড়রকম একটা লিগ্যাল অফেন্স খাড়া হতে পারে। মিঃ সোম একজন আইনজ্ঞ হয়ে কি এতবড় ভুল করবেন?

কিন্তু সুব্রত—প্রাণচঞ্চল মনোরম সুব্রত। সে কী—? তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে ও। সে-ও তো সুমিত্রাকে কত গভীরভাবে চায়। সুব্রতর মনে কি এত পাপ থাকতে পারে? বাবাকে সে খুন করেছে, একথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

এ বিষয়ে অজয় সোমের সঙ্গে কথা বলবে সুমিত্রা। সুব্রতর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তিনি প্রমাণিত করতে পারবেন কি না, তাও জেনে নেবে। একটা চিঠির কয়েক ছত্রই ওর এবং সুব্রতর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল সুমিত্রা, টেলিফোন-স্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর একটা কথা মনে পড়ল, সুব্রত ডাঃ রুদ্রর ডায়েরির খোঁজ করছিল। এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করেছিল ও। কেন—?

আরেক দিনের একটা দৃশ্য ওর মনের পরদায় ভেসে উঠছে। একটা রিভলবারকে মাঝামাঝি রেখে সুব্রত আর ডাঃ রুদ্রর মধ্যে কথা হচ্ছিল। ডাঃ রুদ্রর মুখের ভাব ছিল থমথমে, সুব্রতও কেমন চঞ্চল ছিল। কেন—?

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল সুমিত্রা।

॥ এগারো ॥

টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন অজয় সোম।

চিঠি পাওয়ার পরেই যে সুমিত্রা তাঁকে ফোন করবে, একথা তিনি ভাবতে পারেননি। চিঠিতে কিছুটা কাজ হয়েছে বুঝতে পারা গেল। মিঃ সোম সুমিত্রার প্রশ্নের উত্তরে সুব্রতর যা কিছু জানেন, সমস্তই বললেন।

অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানতার সঙ্গেই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তিনি। আগে যদি তিনি বুঝতে পারতেন সুব্রত তাঁর প্রতিপক্ষ, তাহলে কবে এই কাঁটাটিকে তুলে দিতেন। এ ধরনের প্রতিবন্ধককে খুব বড় প্রতিবন্ধক বলে মনে করতেন না তিনি।

একটা ইংরেজি প্রবাদ তাঁর জানা ছিল। ইংরেজরা বলে, শীতের হাওয়া আর মেয়েদের মনকে বিশ্বাস নেই। সুব্রতর দিকে এখন সুমিত্রার মনের হাওয়া বইছে, তিনি যেভাবে কল নেড়েছেন, তাতে হাওয়া যে তাঁর দিকে ঘুরবে না, কে বলতে পারে?

রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি সঞ্জীব রুদ্রর দিকে তাকালেন।

সঞ্জীব বসেছিলেন ঠিক তাঁর সামনে।

কিছু বলতেও বোধ হয় যাচ্ছিলেন সঞ্জীব রুদ্র। কিন্তু বলা আর হল না—ঘরে প্রবেশ করলেন

এক ভদ্রলোক। বেঁটে, নিরেট চেহারার প্রৌঢ় আগন্তুককে দেখে অজয় সোম সাদরে আহ্বান জানালেন।

আসুন, আসুন মিস্টার ভাটিয়া—কী সৌভাগ্য!

মিঃ ভাটিয়া আসন গ্রহণ করলেন।

বললেন, বিশেষ কাজেই আপনার কাছে এলাম।

বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে?

চশমা নাকের ওপর ঠিক ভাবে বসাতে-বসাতে বললেন, মৃত ডাক্তার বঙ্কিম রুদ্র আপনার ক্লায়েন্ট ছিলেন?

হ্যাঁ। ইনিই তাঁর ছেলে সঞ্জীব রুদ্র। কিন্তু কী হয়েছে বলুন তো?

ভাটিয়া ও সঞ্জীবের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হল।

কেন জানি না, ডাক্তার রুদ্র আপনার ক্লায়েন্ট হয়েও জীবনের শেষ বৈষয়িক কাজটা আমাকে দিয়ে করিয়ে গেছেন।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, রূপনারায়ণ ভাটিয়া আগ্রার একজন খ্যাতনামা প্রবীণ এটর্নি।

অজয় সোমের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। তিনি বললেন, আপনার কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

তিনি আমাকে দিয়ে একটা উইল করিয়েছেন।

উইল! বিস্মিত গলায় সঞ্জীব বললেন, কিন্তু বাবার উইল তো মিস্টার সোমের কাছেই আছে।

মিঃ সোম বললেন, আপনার কথা আমারও বুঝতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কারণ তিনি বেশ কিছুদিন আগেই আমাকে দিয়ে উইল করিয়েছেন।

জানি।—মিঃ ভাটিয়া বললেন, তিনি আমাকে সে-কথা বলেছিলেন। আমার কাছে তিনি গিয়েছিলেন, মারা যাওয়ার দিন দশেক আগে। উইল তখুনি তৈরি হয়। সাক্ষীদের দিয়ে সই করানো হয়। আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম, আপনার নিজের এটর্নি থাকতে আপনি আমার কাছে এলেন যে? এর অবশ্য কোনও যুক্তিপূর্ণ উত্তর তিনি আমায় দেননি। যাই হোক, তাঁর নির্দেশ অনুসারে আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে এসেছি।

অজয় সোম কেমন একটু দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ডাঃ রুদ্রর এই সামঞ্জস্যহীন কার্যকলাপ।

তিনি বললেন, তাঁর নির্দেশ কী?

সঞ্জীব রুদ্রও মনের মধ্যে উত্তেজনা বোধ করছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু বলা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না।

তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর ন'দিন পরে আমি যেন উইল পড়ি। কাল সেই ন'দিন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে কাল সন্ধ্যার সময় ডাক্তার রুদ্রর বাড়ির সকলকে বাড়িতেই থাকতে বলেন, তাহলে আমার বিশেষ সুবিধে হয়। সঞ্জীববাবু এখানে রয়েছেন, ভালোই হল। ইনিও এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

উইল রেজিস্ট্রি হয়েছে? অজয় সোম প্রশ্ন করলেন।

নিশ্চয়ই। ভালো কথা, ডাক্তার রুদ্রর সেক্রেটারি সুব্রত রায়কেও বলবেন উপস্থিত থাকতে।

বেশ। আপনার বক্তব্য আমি সকলকে জানিয়ে দেব।

এরপর আর রূপনারায়ণ ভাটিয়া অপেক্ষা করলেন না।

বিদায় নিলেন।

সঞ্জীব রুদ্র ও অজয় সোম বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালেন।

সন্ধ্যা তখন সাতটা।

মিঃ ভাটিয়ার অপেক্ষায় সকলে বসে রয়েছেন ড্রইংরুমে।

বিনয় রুদ্র, অজয় সোম, সঞ্জীব রুদ্র, সুব্রত, সুমিত্রা সকলেই উপস্থিত ঘরে। তাছাড়া ইন্সপেক্টর প্রেমও রয়েছেন, তাঁর অনুরোধে বাসব ও হীরকও এসেছে।

কথাবার্তা বিশেষ হচ্ছে না। অনেকেই গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন।

সাতটা দশে রূপনারায়ণ ভাটিয়া ঘরে এলেন। তাঁর হাতে ব্রিফকেস। তিনি সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসলেন।

আপনারা সকলেই ঘরে উপস্থিত রয়েছেন, এবার আমি ডাঃ বঙ্কিম রুদ্রর উইল পড়ব।

তিনি ব্রিফকেসের মধ্যে থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। বললেন, এই উইলের বলে ডাঃ রুদ্রর আগেকার উইল বাতিল হয়ে গেল। এই সর্বাধুনিক উইলটি পড়ার আগে আপনাদের যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তো আমায় করতে পারেন।

কেউ কোনও প্রশ্ন করলেন না।

মিঃ ভাটিয়া উইলের ভাঁজ খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন ঃ

আমি ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র রুদ্র সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে আমার শেষ উইল করিতেছি। ইহার সহিত কোনওরূপ প্ররোচনা জড়িত নাই।

আমার নগদ ছয় লক্ষ টাকা, তিনখানি বাড়ি ও ত্রিশ হাজার টাকার গহনা এই উইলের আওতায় পড়িবে। আমার পুত্র শ্রীসঞ্জীব রুদ্রকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও দশ হাজার টাকার গহনা দেওয়া হইল। আমার ভ্রাতা ডাঃ বিনয় রুদ্রকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও দশ হাজার টাকার গহনা দেওয়া হইল। এক লক্ষ টাকা, ক্যান্টনমেন্টস্থিত আমার বসত বাটী ও দশ হাজার টাকার গহনা আমার কন্যা শ্রীমতী সুমিত্রা রুদ্র পাইবে। আমার প্রিয়পাত্র শ্রীঅজয় সোমকে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হইল। ক্যান্টনমেন্টের আরও দুইখানি বাড়ি ও পঁচাত্তর হাজার টাকা একটি চক্ষুচিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে ব্যয়িত হইবে। এই কার্যভার আগ্রার সুবিখ্যাত অ্যাটর্নি শ্রীরূপনারায়ণ ভাটিয়া ও আমার ভ্রাতা ডাঃ বিনয় রুদ্রর ওপর ন্যস্ত রহিল। শ্রীঅজয় সোমের নিকট আমার ত্রিশটি হ্যান্ডনোট রহিয়াছে, সেগুলি হাসপাতালের সাহায্যার্থে নিয়োজিত থাকিবে। বাকি তিন লক্ষ টাকা আমার বন্ধুপুত্র শ্রীসুব্রত রায় পাইবে।

আইন ঘটিত সমস্ত কার্য শ্রীরূপনারায়ণ ভাটিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহাই আমার নির্দেশ।

ভবদীয়
ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র রুদ্র
রুদ্র হাউস, আগ্রা।

উইল পড়া শেষ করলেন রূপনারায়ণ।

সকলেই নির্বাক।

কারুর মুখে কথা না থাকলেও, অনেকের মুখেই অমাবস্যার ঘন অন্ধকার নেমেছে দেখা গেল। উইলের এই অদ্ভুত রদবদলে সকলেই বিস্মিত। সুব্রতও। ঘটনার কী অচিন্তনীয় বিন্যাস। আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন—তাঁর টাকা অতিরিক্ত মাত্রায় ফিরে এসেছে দেখে কত আনন্দিত হতেন। বন্ধুকে নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে ক্ষমা করতেন।

উইলটা আবার ব্রিফ কেসের মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ ভাটিয়া। সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এখনকার মতো আমার কাজ শেষ হয়েছে। কাল থেকেই প্রবেট নেওয়ার ব্যাপার আরম্ভ করা যেতে পারে।

তিনি বিদায় নিলেন।

সুমিত্রা লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। একটা কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে খারাপ দেখাবে বিবেচনা করে বাসবের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি চলি। আপনারা উঠবেন নাকি?

বাসব বলল, এবার আমরাও উঠব।

সুব্রত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

অজয় সোম বললেন, লোকটার ভাগ্যের জোর আছে বলতে হবে। এখানে চাকরি করতে এসে শেষপর্যন্ত লক্ষপতি হয়ে গেল।

বিনয় রুদ্র বললেন, ইদানীং বোধ হয় দাদার মতিভ্রম হয়েছিল। নইলে—।

হীরক বলল, উপস্থিত এটাই সুখের কথা যে, ডাক্তার রুদ্র কাউকে বঞ্চিত করেননি। কম-বেশি সকলকেই কিছু দিয়েছেন।

বাসব বলল, এবার আমি আপনাদের একটা অনুরোধ করব। আগামী কাল সকালে আপনারা আবার সবাই এখানে উপস্থিত থাকবেন। আমি ডাক্তার রুদ্রর খুন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

ঘর থেকে বেরিয়ে সুব্রত টানা করিডোর পার হয়ে সবে পার্লারে পা দিয়েছে—

শোনো—।

ফিরে দাঁড়াল সুব্রত।

করিডোরে আলো ছিল না। পার্লারের আলোয় কিছুটা স্বচ্ছ ভাব সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র। সেই মোলায়েম স্বচ্ছতার মাঝে ছায়ায় গড়া মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সুমিত্রা।

এক অভূতপূর্ব আবেগে সুব্রতর মন নেচে উঠল।

ও নরম গলায় বলল, মিত্রা—।

আমার সঙ্গে এসো।

সুমিত্রার পিছু-পিছু ওর ঘরে এল সুব্রত।

ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে সহাস্যে সুমিত্রা বলল, তুমি এখন একজন মস্ত ধনী, তাই না?

সুব্রত ওকে কাছে টেনে আনল।

হ্যাঁ, মিত্রা। তোমার বাবার অনুগ্রহে।

একটা কথা বলব? তার কিন্তু সঠিক উত্তর চাই।

একটা কেন, তোমার হাজারটা কথার উত্তর দিতে আমি বিন্দুমাত্র গররাজি নই।

সুব্রতর কাছ থেকে সরে এল সুমিত্রা।

তুমি আগ্রায় কেন এসেছিলে?

কেন এসেছিলাম!—বিস্মিতভাবে সুব্রত বলল, তুমি তো জানো, চাকরির সন্ধানে এসেছিলাম।

আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছ তুমি! কারুর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই কি তুমি এখানে আসোনি?

সুব্রতর বুকের রক্ত শরীরের চতুর্দিকে যেন চলকে পড়ল।

ও দ্রুত গলায় বলল, কে বলেছে তোমায় একথা?

কে বলেছে, তা তো বড় কথা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তোমার উদ্দেশ্যটা তাই ছিল কি না?

সুব্রত নিজের মনকে দৃঢ় করল। বলল, যদি বলি ছিল না, তাহলে উদ্দেশ্যটা আমার তাই ছিল, এটা প্রমাণ করার মতো লোক উপস্থিত পৃথিবীতে কেউ নেই। কিন্তু আমি তোমার অভিযোগ অস্বীকার করব না। ওই ধরনের একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এখানে এসেছিলাম। সে অনেক কথা

মিত্রা। তবে আমি বলব না যে, আমরা মতো অবস্থায় পড়লে প্রত্যেক মানুষই এইরকম সিদ্ধান্ত করত। আমি ডাক্তার রুদ্রর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে এখানে এসেছিলাম ঠিকই—নিজের ভুল বুঝতে আমার বেশি বিলম্ব হয়নি। তুমি বিশ্বাস করো, তোমার বাবাকে আমি খুন করিনি।

কথা কটা বলেই ও দরজার দিকে পা বাড়াল।

সুমিত্রা ব্যস্ততার সঙ্গে ডাকল।—এই শোনো—শোনো বলছি!

না মিত্রা। অবিশ্বাস মানুষের মনকে কোথায় নিয়ে যায়, তা আমি জানি। তুমি আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ, আমার এখানে আর অপেক্ষা করা চলে না।

সুব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুদ্র হাউসের বাইরে ফুটপাতের পাশে ইন্সপেক্টার প্রেমপ্রকাশের জিপ পার্ক করা ছিল।

উইল পর্ব শেষ করে বাসব ও হীরককে সঙ্গে নিয়ে প্রেমপ্রকাশ বাইরে এলেন। কিন্তু জিপে যাওয়ার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

ওদের গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্যে অজয় সোম ও বিনয় রুদ্র এসেছিলেন।

জীপের সামনের সিটে ড্রাইভার ছিল। মুভিং সিটটা সরিয়ে হীরক ও প্রেমপ্রকাশ পিছনে গিয়ে বসলেন। বিনয় রুদ্র সামনের সিটটা টেনে ধরে সকলকে উঠতে সাহায্য করছিলেন। বাসব উঠে বসতে যাবে ঠিক সেই সময় ওর মুভিং-সিটটা ওর ঘড়ির ওপর এসে পড়ল।

অন্য হাত দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করলেও, ঘড়ির কাচ ভেঙে গেল।

বিনয়বাবু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর হীরক বলল, ঘড়িটা সিরিয়াসলি ড্যামেজ হল নাকি?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছি সিটটা একটু বিগড়েছে,—প্রেমপ্রকাশ বললেন, দিন তিনেক আগে আমার হাতের ওপরও পড়েছিল। তখন ঠিক করে রাখলে আর এই বিপত্তি ঘটত না। আমি দুঃখিত মিস্টার ব্যানার্জি।

আপনি ব্যস্ত হবেন না ইন্সপেক্টার। ভালো কথা, আমি আপনাকে একটা খাম দিচ্ছি, তার থেকে ফিঙ্গার প্রিন্টটা তুলতে হবে।

বাসব নিজের পকেট থেকে কাপড়ে জড়ানো খামটা বের করে প্রেমপ্রকাশের হাতে দিল।

তিনি বললেন, আগে যে প্রিন্টটা তুলতে দিয়েছিলেন, তার কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পেয়েছেন নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। এই প্রিন্টটা কালকের মধ্যে পেলেই ভালো হয়।

বেশ।

ইন্সপেক্টর ওদের নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

বাসব ও হীরক এসে ড্রইংরুমে বসল।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে অলসভাবে বলল, এই নতুন উইল পড়ার ব্যাপারে কী বুঝলে?

দুটো জিনিস আমার চোখে পড়েছে।—হীরক বলল, প্রথম ডাক্তার রুদ্র অজয় সোমের ক্লায়েন্ট হওয়া সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে উইল করিয়েছেন। এমনকী অজয় সোমের প্রতি একটু উপেক্ষা ভাবই দেখানো হয়েছে। এতে আমি অবাক হচ্ছি। দ্বিতীয়, এতগুলো টাকা সুব্রতবাবুকে দিয়ে ডাক্তার রুদ্র নিজের অতীতের অপরাধকে সুন্দরভাবে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছেন।

হুঁ।

হরিপদর মৃত্যু সম্পর্কে কিছু ভেবে দেখলে নাকি?

একটা মোক্ষম সূত্র পেয়েছি।

কীরকম?

পোস্টমর্টেটের রিপোর্টে আছে, শক্ত কিছু দিয়ে হরিপদর মাথার পিছন দিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা হয়েছিল, মৃত্যু হয়েছে তাতেই। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ক্ষতস্থানে তেলতেলে একটা পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে। ওই তেলতেলে পদার্থটা ক্রুডঅয়েল জাতীয়।

এতে কী প্রমাণ হচ্ছে?

অনেক কিছু। তুমি জানো, মোটরপার্টস্ ইত্যাদি ধোয়ার কাজে ক্রুডঅয়েল প্রয়োজন হয়। এখন একটু চিন্তা করে দেখো, ক্ষতস্থানে ক্রুডঅয়েলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই যা দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল তাতে ক্রুডঅয়েল লেগেছিল।

তারপর?

ক্রুড অয়েল যেখানে পাওয়া যায়, গ্যারেজ বা মোটরের কারখানাতেই এর সন্ধান পাওয়া যাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল সেটা হাতুড়ি জাতীয় কিছু এবং তার আমদানি হয়েছিল কোনও মোটরের গ্যারেজ বা কারখানা থেকেই।

তুমি বলতে চাও হত্যাকারী কোনও মোটর গ্যারেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, আমি জোর দিয়ে একথা বলতে চাই না। তবে হত্যাকাণ্ড যে কোনও গ্যারেজের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হীরক দ্রুত বলল, তোমায় একটা কথা বলা হয়নি।

কী?

কাল থেকে একটা লোক ক্রমাগত আমাকে অনুসরণ করছে।

অনুসরণ করছে! কীরকম?

প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি।—হীরক বলল, বুঝতে পারলাম দুপুরের দিকে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসবার সময়। আমি গাড়িতে উঠলাম, সেও ট্যাক্সিতে উঠল। আমি যে-যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেলাম, সেও কিছু দূরত্ব রেখে আমাকে অনুসরণ করে গেল। তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে আমি একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম, দেখি সেখানেও সে উপস্থিত।

লোকটা কেমন? কী জাতীয়?

শিখ। সারা মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরতি। মাথায় পাগড়ি। চোখে রঙিন চশমা। পরনে সুট।

এবার আমি তোমাকে একটু অবাক করে দেব।—বাসব বলল, তুমি লোকটাকে কাল থেকে দেখেছ, আর আমি ওর কীর্তিকলাপ লক্ষ করছি দিন পাঁচেক ধরে।

বলো কী!

ওই লোকটা আমাদের ওপর অত্যন্ত খর দৃষ্টি রেখেছে কেন, বুঝতে পারছি না। কে ও? যদি কোনও গুন্ডা-শ্রেণীর লোক হয়, তাহলে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। তবে—

বাসব চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

উঠলে যে?

বাজারে যাব।

বাজারে যাবে! কেন?

এখানে বাইয়ের বাজার কেমন? বিদেশি বই-টই পাওয়া যায় তো?

তা পাওয়া যায়। কোনও বই কিনতে চললে নাকি?

হ্যাঁ। রাইডার হ্যাগার্ডের একটা বই।

এ ক'দিনেই বাসবের খামখেয়ালি স্বভাবের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়ে পড়েছিল হীরক। তবুও

সে বলল, রাইডার হ্যাগার্ডের বই। কেন?

বাসব মৃদু হেসে বলল, নিশ্চয়ই পড়ব না বলে। কাল আবার তোমাদের বাজার বন্ধের দিন, তাই আজই বইটা কিনে আনতে হচ্ছে। ভালো কথা, তুমি ঘড়িটা মেরামত করিয়েছিলে কোথায়? ঠিকানাটা দাও দেখি। এই ফাঁকে আমি ঘড়িটা দিয়ে আসি দোকানে।

হীরক ঠিকানাটা বলে দিল।

বাসব রওনা হল বাজারে।

সেইদিন রাত্রে।

দুটো বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে বাসব ও হীরক।

বাসব অনেকক্ষণ জেগেছিল। নানা চিন্তা ওঠা-নামা করছিল ওর মনের মধ্যে। একসময় ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়।

উচ্চরবে কোথায় তিনটে বাজল।

শীতের নিশুতি রাত্রি। ঝিমিয়ে রয়েছে।

খুট করে একটা শব্দ হল। মৃদু, খুব চাপা। ঘুম ভেঙেছে কী কারুর?

ঘরে নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। হালকা আলোয় সারা ঘরখানা মায়াময়।

শব্দের তালে দরজাটা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল ছায়ামূর্তি। ভারী লম্বা কোটে সারা শরীর আচ্ছাদিত তার। মাথায় ফেল্টের হ্যাট। কোটের কলার খাড়া হয়ে রয়েছে। হ্যাট ও কলারের মাঝখানে মুখখানা সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

ছায়ামূর্তি ম্যানটল্‌পিসের দিকে এগিয়ে গেল।

সে কী খুঁজল যেন সেখানে। ওখান থেকে আবার বইয়ের তাকের কাছে এগিয়ে গেল। অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করল বইগুলো। ঈপ্সিত বস্তুটি পাওয়া গেল না বোধ হয়। ঘরের এখানে-সেখানে খোঁজ করে পাশের ঘরে চলে গেল ছায়ামূর্তি।

পাশের ঘরটি ড্রইংরুম।

ঘর অন্ধকার। পকেট থেকে টর্চ বের করল সে।

আলো ফেলে-ফেলে কী খুঁজে বেড়াতে লাগল চতুর্দিকে।

শেষে—।

শেষে শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। শো-কেসের মাথায় একটা বই রাখা রয়েছে। মোটা বইখানার মলাটের ওপর চকচকে কাগজের জ্যাকেট।

সাগ্রহে বইখানা তুলে নিল সে। ডান হাতে ধরা বইখানার ওপর, বাঁ-হাতে ধরা টর্চের আলো ফেলল ছায়ামূর্তি। রঙিন জ্যাকেটের ওপর বড়-বড় অক্ষরে লেখা, 'ব্ল্যাক শ্যাডো'—রাইডার হ্যাগার্ড। বইটা কোটের পকেটে রেখে দিল।

সুচারুরূপে কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। এখন আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই।

ছায়ামূর্তি বাইরে যাওয়ার বন্ধ দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু বিপর্যয় ঘটল ঠিক সেই মুহূর্তে। টিপয়ের ওপর অ্যাশট্রে রাখা ছিল। ছায়ামূর্তি দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তার সঙ্গে ধাক্কা খেল। ঝন-ঝন শব্দ তুলে অ্যাশট্রেটা পড়ে গেল মাটিতে। ঘুম ভেঙে গেল হীরকের।

কীসের একটা শব্দ হল! ওকি, ড্রইংরুমে আলোর ঝলকানি দেখা গেল না? হীরক বিছানার ওপর উঠে বসল। আবার আলো জ্বলে উঠল। কে যেন বাইরের দরজা খুলছে! চোর নাকি?

হীরক বিছানা থেকে নামতে যাবে—কে তার হাতে চেপে ধরল। চমকে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল বাসব।

বাসব নিজের ঠোঁটের গোড়ায় আঙুল তুলে তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

মিনিট পাঁচেক কাটল এইভাবে। পাশের ঘরে আর কোনও আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে না। কোনও শব্দ হচ্ছে না। চোর বোধ হয় সরে পড়েছে।

বাসব বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালল। সারা ঘর বয়ে গেল আলোর বন্যায়।

হীরক বিস্মিত গলায় বলল, তুমি যেতে দিলে লোকটাকে?

তাই তো দিলাম।

কী যে হেঁয়ালি করো বুঝতে পারি না।

আমি জানি, কে এসেছিল। উঃ, খুব ঠকানো গেছে লোকটাকে।

কী যে বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। কে লোকটা?

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, রক্ত-মাংসেরই কেউ একজন। এখন কিন্তু তোমায় আমি তার নামটা বলব না। শুধু বলতে পারি, সে কী চুরি করে নিয়ে গেছে।

কী?

'ব্ল্যাক শ্যাডো' বইটা। এতে কী প্রমাণ হল জানো? প্রমাণ হল, আমার থিয়োরি কাঁটায়-কাঁটায় কারেক্ট। কিন্তু এখন দেওয়াল ঘড়িটা কী বলছে বলো তো, তিনটে দশ। কাজেই আমরা অনায়াসে আরও কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারি। প্লিজ হীরক, আলোটা নিভিয়ে দাও ভাই। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

অসংখ্য প্রশ্ন হীরকের মনের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু বাসবের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ও আর একটা কথাও বলবে না। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এল হীরক।

॥ বারো ॥

পরের দিন কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল হীরক মনে না পড়লেও সাংঘাতিক খারাপ গেল দিনটা। অবশ্য সারা দিনের মধ্যে কিছু হয়নি। বিপর্যয় যা ঘটবার সন্ধের সময় ঘটল।

হীরকের বাড়ির কাছেই মস্ত একটা কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়ি আছে। কম্পাউন্ডের ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছ রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। পথটাও জনবিরল। এটাকে একটা করিডোর রোড বলা চলতে পারে। অর্থাৎ একটা বড় রাস্তা থেকে আরেকটা বড় রাস্তার মাঝখানের প্যাসেজ।

পায়ে হেঁটেই আজ অফিস থেকে ফিরছিল হীরক। গাড়ি নিয়ে সকালে বাসব বেরিয়েছিল বলে গাড়ি নিয়ে তার পক্ষে অফিস যাওয়া সম্ভব হয়নি।

এই প্যাসেজটা যে সব সময় জনবিরল থাকে তা নয়। তবে আজকের কথা স্বতন্ত্র। একে শীতের সন্ধ্যা, তার ওপর সারা আকাশ মেঘে-মেঘে কালো হয়ে রয়েছে। বৃষ্টি নামবে যে কোনও মুহূর্তে। কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে কেউ বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না।

একটা গানের লাইন গুনগুনিয়ে ভাঁজতে-ভাঁজতে ঝাঁকড়া গাছগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে হীরক—আচম্বিতে তার ঘাড়ের ওপর কে লাফিয়ে পড়ল। অত্যন্ত দ্রুত হাত চালিয়ে কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগটা টেনে বার করল আততায়ী। তারপর হাত থেকে ফোলিওটা ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা।

হীরক বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ পেল না।

তবে আবছা আলোতেই সে দেখতে পেয়েছিল আততায়ীকে। সে আর কেউ নয়, তাকে অনুসরণকারী সেই শিখ। ধুলো ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল হীরক। এই প্রচণ্ড শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছিল সে। এই আকস্মিক বিপদের জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। লোকটা দিন দুয়েক

ধরে তার পিছু নিয়েছে, কিন্তু তাই বলে সে-যে তাকে এইভাবে আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, স্বপ্নেও ভাবেনি হীরক।

দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে এল সে।

এখন তার কর্তব্য কী?

পুলিশে খবর দেবে—না, তার আগে বাসবের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করে নেওয়া ভালো। ওর পরামর্শ ও সাহায্য অপরিহার্য।

বাসব বাড়ি ছিল না, কোথায় বেরিয়েছিল।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ও ফিরে এল।

হীরক ঘটনাটা সবিস্তারে বলল ওকে।

বাসব সমস্ত শুনে চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করল, কত টাকা ছিল ব্যাগে?

একশো কুড়ি টাকা আর কিছু খুচরো।

ফোলিওতে কাগজপত্র ছাড়া আর কী ছিল?

আর কিছু ছিল না। ভাবনা কাগজপত্রগুলোর জন্যই। ব্যাবসার সমস্ত দরকারি কাগজ—

বড় রকম লাভের আশায় ফোলিওটা হাতিয়েছে সে। যখন দেখবে, ওতে টাকা-পয়সা কিছু নেই, তখন কাগজপত্রগুলো কোথাও ফেলে দেবে বলে আমার ধারণা।

এখন তাহলে কী করা যায়?—হীরক শুকনো মুখে প্রশ্ন করল।

এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পুলিশে খবর দেওয়া। আমিও অনুসন্ধান করে দেখছি, তবে এইসব ছিঁচকে চোরদের ধরা খুব শক্ত হবে।

পুলিশ খবর দেওয়া হল।

পরের দিন সকালে প্রেমপ্রকাশ এলেন বাসব ও হীরককে জিপে তুলে নিয়ে ডাঃ রুদ্রর বাড়ি যাওয়ার জন্যে। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুসারে গতকালই বাসব সকলের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করবে ঠিক করেছিল, কিন্তু গতকাল নানা কারণে পরিকল্পনাটাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই আজ ব্যবস্থা হয়েছে।

জিপে হীরকের বাড়ি থেকে রুদ্র-হাউসে পৌঁছতে মিনিট সাতেক সময় লাগে। গাড়িতে কোনও কথাই হল না—তিনজনেই নির্বাক। ফোলিও-চোরের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি পুলিশ দ্রুত অনুসন্ধানের কাজে নেমেছে। বাসব ঘটনাস্থল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে এখনও কোনও যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য করতে পারেনি।

কাউকে ডাকাডাকি করতে হল না, ড্রইরুমে সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সুব্রতকে খবর দেওয়া হয়েছিল, সেও উপস্থিত আছে ঘরে।

প্রেমপ্রকাশ আসনে গ্রহণ করলেন প্রথমে, তারপর বাসব ও হীরক।

বাসব বলল, আপনারা হয়তো বেশ কিছুক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন—আমি দুঃখিত। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক। জীবনে আমায় বহু রহস্যের গোলাকধাঁধায় ঘোরাফেরা করতে হয়েছে। যদিও অহমিকার কথা, তবু বলব, প্রতিবারই আমি সেই সমস্ত রহস্যের সাফল্যজনক সমাধান করেছি। ডাঃ রুদ্রর হত্যাকাণ্ডও নিঃসন্দেহে রহস্যমূলক ঘটনা। আমি এখনও এর সমাধানে পৌঁছতে পারিনি, এ নিয়ে অনেকেরই আমার প্রতি উপেক্ষা থাকা স্বাভাবিক—আছেও। কিন্তু এখানে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমি ভগবান নই। তথ্য ও তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই আমাকে কাজ করতে হয়। যদি সেই তথ্যই আমার কাছে অন্যভাবে পরিবেশিত হয়, তাহলে আমার কার্যধারাও ভুল পথে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে তাই হওয়ায় আমি একটু বিপথগামী হয়ে পড়েছিলাম। অর্থাৎ...

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অজয় সোম বললেন, আপনি বলতে চাইছেন, আমাদের মধ্যে কেউ আপনাকে ভুল বা মিথ্যে কথা বলে বিপথে চালিত করেছে?

শুধু তাই নয়, অনেকে আবার আমার কাছে অনেক কিছু সম্পূর্ণ চেপে গেছেন।

আপনি কাকে-কাকে মিন করছেন?

বাসব অল্প একটু হাসল। বলল, কাউকে বাদ দিতে পারলে খুশি হতাম। আপনাদের অনুরোধেই আমি এ-কাজে যুক্ত হয়েছি, অথচ আপনারাই আমাকে অফ ট্র্যাকে ফেলবার চেষ্টা করেছেন।

আপনি কী বলতে চাইছেন জানি না, অজয় সোম বললেন, আমি যেমন আপনাকে এ-কাজে নিয়োজিত করেছি, তেমনি সাধ্যমতো সাহায্য করতেও কুণ্ঠিত হইনি।

আমার অভিযোগ আপনাকে বাদ দিয়ে নয়, মিস্টার সোম।

আমাকে!! আকাশ থেকে পড়লেন অজয় সোম।

আপনি বিস্মিত হচ্ছেন মিস্টার সোম? বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, অবশ্য আপনাকে আর কিছু বলবার আগে সুব্রতবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। মিস্টার রায়--

সুব্রত বাসবের আহ্বানে মুখ তুলল।

আপনি সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, কোনও কথাই না লুকিয়ে সমস্ত কিছু আপনাকে বলেছেন, তাই না?

নিশ্চয়ই, আমার যা কিছু জানা ছিল সমস্ত আপনাকে জানিয়েছি।

আমি আপনার ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে চাই, মিস্টার রায়। সেদিন একটা কথা আপনি আমার কাছে লুকিয়ে গিয়েছিলেন।

কোন কথা?

হরিপদর মৃতদেহ যেদিন এই বাড়িতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যেদিন স্টাডিতে চোর ঢুকেছিল— সেদিন রাত্রে আপনি শুধু সুমিত্রা দেবীর ঘরেই যাননি, আরেকটি উদ্দেশ্যও আপনার ছিল।

উদ্দেশ্য?

স্টাডি-রুমে আপনি ঢুকেছিলেন এবং সেই ঘরে উপস্থিত দ্বিতীয়জনের সঙ্গে আপনার ঝটাপটি হয়েছিল। য়্যাম আই কারেক্ট, মিস্টার রায়?

সুব্রত একটু ইতস্তত করে বলল, আপনি ঠিকই বলছেন। হয়তো আমার ও-কথাটা চেপে যাওয়া উচিত হয়নি।

এখন বলবেন কি, ঘটনাটা কী ঘটেছিল, কেন এই ঝটাপটির সূত্রপাত?

আপনি জানেন, সুমিত্রার সঙ্গে অজয়বাবুর বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে, অথচ ওর ঘনিষ্ঠতা আমার সঙ্গে। ডাঃ রুদ্র মারা যাওয়ার পর আমার এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া কমে গেল। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সুমিত্রার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ। শেষে একদিন মরিয়া হয়ে এলাম এ-বাড়িতে রাত্রে। সবে সুমিত্রার দরজায় করাঘাত করতে যাব, মনে হল কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি সরে এলাম আড়ালে। দেখলাম, ওপর থেকে একটা ছায়ামূর্তি নেমে এসে স্টাডির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর তালা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। মনের মধ্যে দারুণ সন্দেহ জাগল আমার। আমি সন্তর্পণে ভেতরে গেলাম। দেখি সে কী সব খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা বই তুলে নিল— আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর।

সে লোকটা কে ছিল আপনি বলতে পারেন?

বেশ সহজ ভাবে সুব্রত বলল, পারি, তবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তার নাম এখানে প্রকাশ করতে পারব না।

হুঁ। এবার আমি আপনার বিস্ময় দূর করব মিস্টার সোম—তবে আপনাকে একটা প্রশ্ন করার পর। ডাঃ রুদ্র যেদিন খুন হন, আমি এলাম এখানে তদন্তে। আমি ও ইন্সপেক্টর তদন্ত আরম্ভ করলাম,

আমি সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম—পরে হীরকের মুখে শুনেছি, আপনি সে সময় ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম।

বেশ, আপনার কথাই মেনে নেওয়া গেল। এবার আমি বলব, আপনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির-জন্যে এই জটিল পরিবেশকে আরও কত জটিল করে তুলেছেন।

কোন উদ্দেশ্য! অজয় সোম বললেন, কী বলতে চাইছেন আপনি?

বাসব সে কথায় কান না দিয়ে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল, আপনার ডান হাতের মধ্যের আঙুলে একটা আংটি ছিল, সেটা কোথায় বলবেন কি?

অজয় সোমের ডান হাতের মধ্যে আঙুল যে একটা আংটি ছিল, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আংটিটা উপস্থিতি যথাস্থানে না থাকলেও, দীর্ঘদিন তার ওখানে উপস্থিতি বুঝতে পারা যায়, চামড়ার ওপর হালকা দাগ দেখে।

ওর ওই প্রশ্নে সকলে বিস্মিত হলেন।

ভ্রু কুঁচকে মিঃ সোম বললেন, খুলে রেখেছি।

এমনি খুলে রেখেছেন, না আংটির পাথরটা পড়ে যাওয়ায় খুলে রাখতে বাধ্য হয়েছেন? দেখুন তো, এই চুনিটা কি না?

সকলেই দেখলেন বাসবের হাতের চেটোয় একটা লাল পাথর চকচক করছে।

অজয় সোম অধীর ভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাসব তাঁকে বাধা দিয়ে আবার বলল, অনর্থক আপনি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করছেন মিস্টার সোম। আমি জানি, স্টাডি রুমে সেদিন আপনার সঙ্গে সুব্রতবাবুর ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় এই পাথরটা আপনার আংটি থেকে খসে পড়ে।

ঘরের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল।

বিনয় রুদ্র বললেন, মিস্টার সোম সেদিন স্টাডিরুমে ঢুকেছিলেন।

সুব্রতবাবু, এবার নিশ্চয়ই সেই রাতের আগন্তুকের নাম প্রকাশ করতে আপনার আপত্তি নেই? অজয়বাবু ছিলেন, তাই না?

সুব্রত ঘাড় নাড়ল।

অজয় সোম ঘামতে আরম্ভ করলেন।

বাসব বলল, শুধু তাই নয়, যে বস্তুটি পেয়েও আপনি হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়েছিলেন,তারই সন্ধানে গত পরশু রাত্রে, আপনাকে যেতে হয়েছিল আমাদের ওখানে। শুনলে আশ্চর্য হবেন, তখন আমরা আপনাকে দেখেছিলাম। ইচ্ছে করলেই ধরতে পারতাম, কিন্তু ধরিনি।

মিস্টার সোম কীসের সন্ধানে এরকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মিস্টার ব্যানার্জি? সুমিত্রা প্রশ্ন করল।

আপনার বাবার 'ব্ল্যাক শ্যাডো' বইখানার জন্যে।

বই! কেন?

তাতে একটা নকশা আছে।

নকশা!

ঘরের মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠল।

অবশ্য এত চেষ্টা করেও নকশা সংবলিত সেই বইখানি মিস্টার সোম পাননি। যে-খানা আমাদের ওখান থেকে নিয়ে গেছেন, তা হল আমারই সদ্য কেনা ওই নামের আরেকটা বই।

বাসব নিজের কোটের পকেট থেকে একটা বই বের করল।

এই হল আসল বই। এর মলাটের ওপর যে চকচকে জ্যাকেট রয়েছে, তারই উলটো দিকে নকশাটা আঁকা আছে। জনশ্রুতি মিথ্যে না হলে, পাল সম্রাটের কোষাগার লুণ্ঠন করা বিপুল ধনরত্নের সন্ধান পাওয়া যাবে এর সাহায্যে। এখন আমি বইখানা ইন্সপেক্টর প্রেমের হাতে নিয়ে অনুরোধ করব,

তিনি যেন নকশাখানা ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণা-দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁরাই এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখবেন।

বাসবের হাত থেকে নিলেন বইখানা প্রেমপ্রকাশ।

ঘরে নীরবতা নেমে এল।

কয়েক মিনিট কেউ কিছু বললেন না।

শেষে অজয় সোমই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন ধরা গলায়, আপনার ক্ষমতার আমি প্রশংসা করি মিস্টার ব্যানার্জি। লোভে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। নকশাটা হাতে পাওয়ার জন্যে আমি অনেক কিছু করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ডাক্তার রুদ্রকে আমি খুন করিনি। ও বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

আপনি উতলা হবেন না মিস্টার সোম। ব্যাড স্টার মানুষকে অনেক সময় বিপথগামী করে দেয়। এবার আমি বিনয়বাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

বিনয় রুদ্র ভীতভাবে এধার-ওধার তাকালেন। বললেন, বলুন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন, ডাক্তার রুদ্রকে শেষ দেখেন বিকেল পাঁচটার সময়, তখন তিনি চেম্বারে বসে রুগি দেখছিলেন।

হ্যাঁ, তাই বলেছিলাম।

অথচ ঠিক এই একই প্রশ্নের উত্তরে সুমিত্রা দেবী আমাকে জানিয়েছেন, বিকেল পাঁচটার সময় ডাক্তার রুদ্র চেম্বারে আর গেলেন না। কার কথাটা ঠিক?

একটু থতমত খেয়ে বিনয় রুদ্র বললেন, সুমিত্রার। আমি ভুল বলেছিলাম।

আপনি এরকম স্থূল প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলেন কেন?

না...মানে..., আমতা-আমতা করতে লাগলেন তিনি।

অকারণে কেউ মিথ্যে কথা বলে না। এখন বলবেন কি, আপনি কেন আমায় মিথ্যে কথা বলেছিলেন?

দেখুন...মানে...।

আমি জানি, উনি কেন মিথ্যে কথা বলেছিলেন—সঞ্জীব।

সকলে সবিস্ময়ে সঞ্জীব রুদ্রর দিকে তাকালেন।

তিনি আবার বললেন, পাঁচটার সময় কাকা নিজেই বাবার চেম্বারে ছিলেন।

সঞ্জীব!—প্রায় চিৎকার করে উঠলেন বিনয় রুদ্র।

কিন্তু আপনি,—বাসব বলল, আপনি জানলেন কীভাবে একথা?

আমার দোতলার ঘর থেকে বাবার চেম্বার দেখা যায়।

ওখানে তিনি কী করছিলেন সেসময়?

তা আমি দেখতে পাইনি। উনি আমার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কিছু করছিলেন।

বিনয়বাবু, এই অভিযোগের উত্তরে আপনার বক্তব্য কী?

বিনয় রুদ্র কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

বাসব আবার বলল, আপনি আপনার দাদার চেম্বারে গিয়েছিলেন, মোটেই তা দোষণীয় নয়। তবে প্রকৃত কথাটা চেপে গিয়ে আরেকটা মিথ্যের অবতারণা করে আমাকে বিপথগামী করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ আপনার দাদা ওই সময় চেম্বারে ছিলেন একথা বলে, নিজের চেম্বারে অনুপস্থিতি প্রমাণ করতে যাওয়াটা সন্দেহজনক নয় কি?

একটা ছোট ব্যাপারকে নিয়ে এত কথা বাড়াচ্ছেন কেন, মিস্টার ব্যানার্জি?—সুমিত্রা বলল।

বাসব মৃদু হাসল। বলল, এই ব্যাপারটার মধ্যে অর্থ-অর্থ না গন্ধ থাকলে আমি কথা বাড়াতাম না।

অর্থাৎ?

সকলে উৎসুক হয়ে তাকাল বাসবের দিকে।

আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা সম্পূর্ণ আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার। এ বিষয়ে নাক গলানোর প্রয়োজন আমার ছিল না—যদি না ঘটনাচক্রে আমার তদন্তের আওতায় এই ব্যাপারটা এসে পড়ত। সুমিত্রা দেবীর মুখে আমি শুনেছি, ডাক্তার রুদ্র প্রতিদিনকার আয় নিজের চেম্বারের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ারে জমা রাখতেন। তারপর কয়েকদিনের টাকা জমা হয়ে গেলে, ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি এবং পরে ইন্সপেক্টর সেক্রেটারিয়েটের ড্রয়ারগুলোতে একটা পয়সাও দেখতে পাইনি। নিশ্চিতভাবে ওখানে কিছু টাকা থাকার কথা। কিন্তু ছিল না। এবার আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ডাক্তার রুদ্রর সঙ্গে ওইদিনই টাকা চাওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল বিনয়বাবুর। এখন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন, ডাক্তার রুদ্রর অনুপস্থিতিতে তাঁর চেম্বারে বিনয়বাবুর উপস্থিতি এবং ড্রয়ার থেকে টাকা অদৃশ্য হওয়া কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

কারুর মুখে কথা নেই।

বিনয় রুদ্র মাথা নত করে বসে রইলেন।

বাসব উড়ে দাঁড়াল।

এই অপ্রীতিকর কথাটা উল্লেখ করার জন্যে মর্মাহত। এবার আমরা বিদায় নেব। আসুন ইন্সপেক্টর, এসো হীরক।

বাসব দরজার দিকে এগিয়ে এল। প্রেমপ্রকাশ ওকে অনুসরণ করলেন। হীরকও।

মিনিট কয়েক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধভাবে কেটে গেল।

তারপর—।

তারপর ফেটে পড়লেন সঞ্জীব রুদ্র, কাকা, তুমি—তুমি বাবার টাকা চুরি করেছিলে?

বিনয় রুদ্র কিছু বললেন না।

সুমিত্রা বলল, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমার মনে হয়—।

না, সবকিছু ধামা-চাপা দেওয়া যায় না। এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, সেদিন রাত্রে আমি কাকাকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে ঠিকই দেখেছিলাম। তুমি তাহলে বাবার ঘরে ঢুকেছিলে সেদিন? টাকার সন্ধানে নিশ্চয়ই।

বিনয় রুদ্র মুখ খুললেন।

বেশ সহজভাবেই বললেন, আমি দাদার ঘরে টাকার সন্ধানেই গিয়েছিলাম। দুর্ঘটনার দিন ড্রয়ার থেকে হাজার তিনেক টাকা আমিই নিয়েছি। দাদার কাছ থেকে কয়েকবার টাকা চাওয়ার পর না পেয়ে এই কাজ আমায় করতে হয়েছে। কিন্তু কেন এ কাজ আমায় করতে হয়েছে, তা তুমি জানো?

কেন?

তোমার জন্যে?

আমার জন্যে! আকাশ থেকে পড়লেন সঞ্জীব রুদ্র।

তোমার বিস্মিত ভাব দেখে সত্যি আশ্চর্য হচ্ছি সঞ্জীব! বাসববাবু অবশ্য নিজের কর্তব্য করেছেন—আমি শুধু ভাবছি, তোমার ব্যবহারের কথা। তুমি সকলের সামনে আমাকে চোর বলতে দ্বিধা করলে না, অথচ আমি টাকাটা তোমার জন্যেই নিয়েছিলাম। তোমার কি একবারও মনে হচ্ছে না, যেসব পাওনাদারেরা তোমার পিছনে ফেউয়ের মতো লেগেছিল, তারা আর তোমায় কেন বিরক্ত করছে না।

একটু থেমে আবার বিনয়বাবু বললেন, তুমি কেন টাকা ধার নিয়েছিলে জানি না। তবে আমি টাকাটা যে কোনও উপায়েই হোক শোধ দিতে বাধ্য হলাম দাদার সম্মানের কথা চিন্তা করেই।

সঞ্জীব রুদ্রর চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

কেউ আর কারুর দিকে যেন তাকাতে পারছেন না। কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তে ক্রমেই সাপ বেরিয়ে পড়ছে! শেষে সমস্ত কিছুকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে সুব্রতই বলল, মিথ্যে কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, ডাক্তার রুদ্রর হত্যাকারী এখনও অদৃশ্য। ও বিষয়ে বাসববাবুকে আমাদের কিছু প্রশ্ন করা উচিত ছিল।

অজয় সোম উপেক্ষার ভঙ্গিতে বললেন, প্রশ্ন করে লাভ কী। যথা সময়েই হত্যাকারীর নাম—

সুব্রত উঠে দাঁড়াল। সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ও ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। অ্যাটর্নি-বাড়ি ওকে যেতে হবে এখুনি। ভাটিয়া গতকালই খবর পাঠিয়েছিলেন কিন্তু যাওয়া হয়নি। কাজেই এখন তাঁর ওখানে একবার না গেলেই নয়।

সেদিনের পর সুমিত্রার সঙ্গে আর সুব্রতর কোনও কথা হয়নি। সুব্রত ইচ্ছে করেই এদিকে আসেনি। কী দরকার—সুমিত্রা নিজের মনের ভাব একরকম প্রকাশ করে দিয়েছে, কাজেই—।

রূপনারায়ণ ভাটিয়ার অফিস থেকে বেরিয়ে সুব্রত সোজা নিজের বাসায় ফিরে এল।

বেশ ক্লান্ত লাগছে। এখন খেয়ে দেয়ে স্রেফ ঘুম। কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে বিস্মিত হল সুব্রত। বিস্মিত হওয়ারই কথা, সুমিত্রা বিছানার ওপর বসে রয়েছে। হাসছে অল্প-অল্প।

দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হল। সুব্রত হতবাক হয়ে গেছে।

সুমিত্রা বলল, হাঁ করে কী দেখছ? আমি কি কুতুবমিনার, না চিড়িয়াখানার বেবুন? মজার জিনিস দেখে আশ আর মিটছে না বুঝি?

সুব্রত জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, তুমি আবার কেন এলে? আমি কী মতলব নিয়ে আগ্রায় এসেছিলাম, তা তো তুমি জেনে ফেলেছ। সত্যি, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তুমি যা জেনেছ, তাতে এক তিল মিথ্যে নেই। তাই বলছিলাম—

থামলে কেন? তোমার বক্তৃতার আরম্ভ বেশ ভালো হয়েছে। আমি শুনছি, তুমি বলো!

তাই আমি ভাবতে পারিনি, তুমি আমার কাছে আবার আসবে। এখনও কি কোনও প্রশ্নের উত্তর বাকি আছে। বলো, আমি আর সঠিক উত্তর দেব।

হ্যাঁ আছে, অনেক প্রশ্ন। সারা জীবন ধরে তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে।—সুমিত্রা সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল। তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু! আমি না হয় গোটাকতক প্রশ্নের উত্তরই চেয়েছিলাম, তাই বলে মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে রাখতে হবে বুঝি! আমি কি একবারও বলেছিলাম, হে আর্যপুত্র, তোমার মনে কখনো কোনও কু-অভিসন্ধি ছিল, তাই তোমার সঙ্গে সারা জীবনের মতো সম্পর্ক শেষ করলাম?

সুমিত্রার কথা বলার ভঙ্গিতে সুব্রত হেসে ফেলল।

কিন্তু...।

এখনও কিন্তু! আর কোনও কিন্তু নয়। আমি আর কত বেহায়া হব বলতো! অজয় সোম আমায় বাজিয়ে দেখছিল, তোমার বিরুদ্ধে আমার কাছে বলে তার দিকে আমার মনকে ফেরাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু—।

সুব্রতর মন স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে। ও হালকা গলায় বলল, তুমিও তো কিন্তুর বেড়াজালে আটকে পড়লে মিত্রা। অজয় সোমের ওপর একটু করুণা কি হয় না তোমার?

এ জীবনে করুণা দেখাবার অবকাশ কোথায়?

তাও তো বটে।

এইভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু বকে মরব বুঝি? একজন ভদ্রমহিলা তোমার বাসায় এসেছেন, কোথায় তাঁকে জিগ্যেস করবে, ম্যাডাম, এই অবেলায় এসেছেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব কি?

খিদে-তেষ্টায় আপনার মুখ একেবারে শুকিয়ে উঠেছে! তা নয়...।

তুমি খেয়ে আসোনি নাকি? আশ্চর্য হয়ে সুব্রত প্রশ্ন করল।

কই আর খেয়ে এলাম।

খুব অন্যায় করেছ। এত বেলা হয়ে গেছে, বাড়ির লোকেরা তোমার জন্যে ভাবছেন।

ভাবতে তাঁদের বয়ে গেছে। আমি অবাক হচ্ছি তোমার ব্যবহারে। কই, একবারও তো প্রশ্ন করছ না, কেন খেয়ে এলাম না?

সত্যি তো! তুমি কেন খেয়ে এলে না, মিত্রা?

কেন আবার, তোমার সঙ্গে খাব বলে। তোমার গোমড়া মুখে হাসি ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা তো আমায় করতে হবে।

সুমিত্রার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সুব্রত।

তারপর সবলে ওকে জড়িয়ে ধরল।—মিত্রা—সত্যি, আমি তোমায় সবসময় বুঝতে পারি না, মিত্রা!

॥ তেরো ॥

রুদ্র-হাউস থেকে বেরিয়ে ইন্সপেক্টর প্রেমপ্রকাশ বাসব ও হীরককে নিয়ে হীরকের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

হীরক বলল, অনেক বেলা হল, মধ্যাহ্নের আহারটা এখানেই সেরে নিন, ইন্সপেক্টর।

সহাস্যে বাসব বলল, উপযুক্ত প্রস্তাব। হীরককে অতিথি-সৎকারের একটা সুযোগ দিন মিস্টার প্রেম।

প্রেমপ্রকাশ হেসে বললেন, বেশ তো। বাঙালি-খানার ওপর আমার দুর্বলতা চিরদিনের। তবে শ্রীমতীকে একটা ফোন করতে হবে। নইলে—।

নিশ্চয়ই, বাসব সহাস্যে বলল, মিছিমিছি দাম্পত্য-কলহকে প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

খাওয়াটা বেশ জুতেরই ছিল।

পান মুখে তিনজনে ড্রইংরুমে এসে বসল।

প্রেমপ্রকাশ বললেন, এবার কেসটার সম্বন্ধে আমি কিছু বলুন, আমরা শুনি।

খুবই ভালো প্রস্তাব—হীরক বলল, আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই জট পাকিয়ে রয়েছে। একটু বুঝিয়ে বল।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আজকের ঘটনার একটা সূত্র নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করা যাক। যেমন, নকশার কথা ধরা যেতে পারে। উপস্থিত পরিস্থিতিটাকে অত্যন্ত জটিল করে রেখেছে এই নকশা। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্যে দায়ী ডাঃ রুদ্র নিজেই। ডায়েরিতে লক্ষ করেছি, তিনি যখন নকশার ওপর নির্ভর করে গুপ্তধনের সন্ধানে যাওয়া মনস্থ করেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যে কোনও লোককে সহকারী হিসেবে নেওয়া যায় না। নিজের ছেলে আর ভাইকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁদের ওপর তাঁর আস্থা ছিল না। শেষে তিনি অজয় সোমকেই নিজের সহকারী মনোনীত করেন। যদিও ডায়েরিতে এ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই। তবু এখন নিশ্চিতভাবে তাঁর মাম আমরা ধরে নিতে পারি। তাঁকে কীভাবে সন্দেহ করেছিলাম আপনারা শুনেছেন। যাই হোক, মিঃ সোমকে নিয়ে ডাঃ রুদ্র অভিযানে বেরোলেন,

কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক অভিযান পরিত্যক্ত হল। এদিকে পুরো ব্যাপারটা জেনে যাওয়ায় মিঃ সোমের প্রচণ্ড লোভ হল, যে কোনও উপায়ে হোক নকশাটা হাতাবেন তিনি। চেষ্টা করেছিলেন— তিনি জানতেন 'ব্ল্যাক শ্যাডো'র মলাটের ওপর যে জ্যাকেট আছে, তারই ভেতর দিকে আঁকা আছে ম্যাপটা। তবে ডাক্তারের সতর্ক চোখ এড়িয়ে সেটা সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই ডাক্তারের মৃত্যুর পর কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়লেন অজয় সোম। অবশ্য তার আগে ভয় দেখিয়ে কয়েকখানা চিঠি তিনি ডাঃ রুদ্রকে পাঠিয়েছিলেন।

বাসব থামল। সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। আবার বলতে আরম্ভ করল, ওই চিঠিগুলোর মধ্যে একটা চিঠি ডাঃ রুদ্র আমাকে দিয়েছিলেন। সেই চিঠিটার ওপর থেকে আমি মিঃ প্রেমের সাহায্যে হাতের ছাপ তুলি। সেই ছাপের সঙ্গে হুবহু মিল হয়ে যায় 'ব্ল্যাক শাডো'র ওপরকার মলাটে যে হাতের ছাপ পাওয়া যায় তার সঙ্গে। কাজেই বুঝতে পারা গেল পত্রলেখক ও স্টাডিতে প্রবেশকারী একজন আগন্তুক অভিন্ন ব্যক্তি। আমি ভাবতে লাগলাম এই ব্যক্তিটি কেন? হরিপদ মারা যাওয়ার পরের দিন হঠাৎ আমার চোখে পড়ল মিঃ সোমের আঙুলে আংটিটা নেই। চোখে পড়বার কারণ হল, ওই চুনিযুক্ত আংটিটা আমার আগেই লক্ষ করা ছিল। আঙুলে আংটি অনুপস্থিত দেখার সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল স্টাডিতে কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটার কথা। তবে কি—মিঃ সোমই কী তাহলে স্টাডিতে ঢুকেছিলেন। কেন? রাইডার হ্যাগার্ডের বইটাকে ঘরের এককোণে পড়ে থাকতে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হল। আমি বইটা ভালোভাবে পরীক্ষা করতেই বুঝতে পারলাম, মলাটের জ্যাকেটের তলায় ম্যাপটা আঁকা রয়েছে। মিঃ সোম সম্বন্ধে স্যাঙ্গুইন হওয়ার ব্যাপারে আমি তাঁর হাতের ছাপ সংগ্রহ করলাম। সংগ্রহ করা খুব শক্ত হল না। এবার তাঁর হাতের ছাপের সঙ্গে, পত্রলেখক ও আগন্তুকের হাতের ছাপ মেলালাম। হুবহু এক।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ডাঃ রুদ্র মারা যাওয়ার পর মিঃ সোম নকশাটা সংগ্রহ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। চরম সাহসের পরিচয় দিয়ে স্টাডিতে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু কার্যোদ্ধার হল না। সুব্রতবাবু কোথা থেকে এসে সমস্ত গোলমাল করে দিলেন। যাই হোক, অজয় সোম অনুমান করে নিলেন বইখানি আমি নিয়ে গেছি। তাই তাঁর এবাড়িতে শুভাগমন হল। কিন্তু এবারও তিনি সফল হতে পারলেন না। বাজার থেকে আমার কিনে আনা অন্য একটা 'ব্ল্যাক শ্যাডো' তিনি নিয়ে গেলেন।

আর বিনয় রুদ্র—তিনি টাকা চুরি করতে গিয়েছিলেন কেন? প্রেমপ্রকাশ প্রশ্ন করলেন।

কোনও ব্যক্তিগত কারণেই বোধ হয়। ও বিষয়ে আমি অনুসন্ধান করিনি।

কিন্তু এতে ডাঃ রুদ্রর হত্যারহস্য সরল হল না। মিঃ সোমের নকশার প্রতি লোভ ছিল। তিনিই কি—

নকশা সংক্রান্ত উপকাহিনিটি সমসাময়িক ঘটনা হওয়ায় হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। আসলে দুটি হল ডিফারেন্ট ইস্যু। হত্যার সঙ্গে ও ব্যাপারের কোনও যোগ নেই।

হীরক বলল, তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু ডাঃ রুদ্রকে একজন খুন তো করেছে, কে সে?

বাসবকের কানে যেন কথাটা গেল না।

ও অন্যমনস্কভাবে বলল, তোমার কাছে টাইম-টেবল আছে?

টাইম-টেবল!!

থাকলে দাও।

টাইম-টেবল কী করবে?

আহা, দাওই না।

হীরক উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে টাইম-টেবলটা এনে দিল।

টাইম-টেবল্ হাতে নিয়ে বাসব পাতা উলটে-উলটে কীসব দেখল, তারপর বলল, এখান থেকে টুন্ডলা কতদূর?

প্রেমপ্রকাশ বললেন, মাইল কুড়ি হবে।

ওয়ালক্লকটার দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, তুফান কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগ্রা পাস করে যাবে। ও গাড়িটা আর ধরা যাবে না। আপনি আমাকে মোটরে টুন্ডলা পৌঁছে দিতে পারেন ইন্সপেক্টর?

টুন্ডলা! ওখানে যাবেন কেন?

না গিয়ে কী করি বলুন? আগ্রা থেকে কলকাতায় ফেরার আজ আর তো কোনও ট্রেন নেই। সন্ধ্যা আটটার সময় টুন্ডলা থেকে ভেস্টিবিউল এক্সপ্রেস পাস করে। আমাকে ওটা অ্যাভেল করতে হবে।

সেকী!—বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল হীরক।—তুমি কলকাতা ফিরবে কীরকম? এদিকে কেসটার কী হবে?

আমিও কিছু বুঝতে পারছি না, মিস্টার ব্যানার্জি। সত্যিই তো, আপনি চলে গেলে কেসটার কী হবে? প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টার।

কেস তো আমি সলভ করে ফেলেছি। কোনও রহস্যই এখন আমার কাছে রহস্য নয়। অবশ্য যাওয়ার আগে আমি সমস্তই বলে যেতাম।

আপনি জানেন, ডাক্তার রুদ্রকে কে খুন করেছে?

জানি বইকি। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই জানি।

বলেন কী!

হত্যাকারীকে শেষপর্যন্ত আমি ধরতে পারতাম কি না সন্দেহ, যদি না সে ছোট্ট একটা ভুল করত—অবশ্য তাকে ভুল না বলে ওভার-চালাকিও বলা যেতে পারে। আমার সম্বন্ধে হত্যাকারীর ধারণা খুব অস্পষ্ট থাকার দরুনই সে এই চালাকিটা খেলতে গিয়েছিল।

কীরকম?

আপনারা আগেই শুনেছেন, ডাক্তার রুদ্রকে খুন করার মোটিভ কী। তিনি গোপনে হুন্ডির ব্যবসা করতেন। ঠেকায় পড়লে অনেকে তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করত। হত্যাকারীর অনেক টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ধরুন, পঁচাত্তর হাজার টাকা। সে টাকাটা ধার নেয়। এখানে ভেবে নিতে হবে, ডাক্তার রুদ্র যাকে-তাকে এত টাকা ধার দিতে পারেন না। সে নিশ্চয়ই তাঁর পরিচিত ব্যক্তি ছিল—কাজেই এত টাকা ধার তিনি তাকে সহজেই দিয়েছিলেন।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল।

প্রেমপ্রকাশ ও হীরক ওর কাহিনিতে তন্ময়।

বাসব আবার আরম্ভ করল, টাকাটা কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ধার করেনি হত্যাকারী। তার পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। সে জানত, ডাক্তার রুদ্র হ্যান্ডনোটগুলো কোথায় জমা রাখেন। তারপর হরিপদর সাহায্যে সে কীভাবে হ্যান্ডনোটটা চুরি করেছিল এবং ডাক্তার রুদ্রকেই বা কেন খুন করেছিল, সেকথা আপনারা আমার মুখ থেকে আগেই শুনেছেন। আর এও শুনেছেন, হরিপদ তার হাতে হত হল কেন।

হীরক বলল, কিন্তু হত্যাকারী কে সে কথা তো তুমি বলছ না একবারও?

এখনও বুঝতে পারনি, হত্যাকারী কে?

না।

ইন্সপেক্টর আপনি—?

সলজ্জভাবে হেসে প্রেপ্রকাশ বললেন, আমি এখনও অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছি মিস্টার ব্যানার্জি।

বেশ, এবার আমি সরল করে বলছি। এখন আমাদের দেখতে হবে, ডাক্তার রুদ্র পঁচাত্তর হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন নিজের পরিচিত এমন কোন্ ব্যক্তিকে। বিনয়বাবু ও সঞ্জীবাবুকে সন্দেহের লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ নিজের ভাই আর ছেলেকে কিছু টাকা ধার দেওয়া যায় না। সুব্রতবাবু তাঁর কর্মচারী, তাঁকে তিনি এত টাকা ধার দিতে পারেন না। অজয় সোম যদি টাকাটা ধার নিতেন, তবে তাঁর কাছে হ্যান্ডনোটটা নিশ্চয়ই ডাক্তার রুদ্র জমা রাখতে যেতেন না। তবে কে?—কে সেই চক্রান্তকারী এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, এ যজ্ঞের প্রধান হোতা হল, আমারই পরম বন্ধু হীরক চৌধুরী। ঘরের মধ্যে যেন এভারেস্টের চূড়াও ভেঙে পড়ল।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন প্রেমপ্রকাশ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হীরক। তীব্র গলায় বলল, আমি!!

হ্যাঁ ভাই, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি চমৎকার একটি পরিকল্পনার সাহায্যে, নিজের স্বার্থের অনুকূলে ডাক্তার রুদ্র ও হরিপদকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছ!

আমি খুন করেছি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

বাকচাতুর্যে তুমি আমাকে ঘায়েল করতে পারবে না, হীরক। তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার মতো প্রচুর প্রমাণ আমার হাতে আছে।

মরণাহত হায়নার মতো হীরকের চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলে উঠল।

ভব্যতার মুখোশ ছিঁড়ে অবয়বের প্রতিটি রেখায়-রেখায় ফুটে উঠল দানবীয় বিকাশ। নিরুদ্ধ গলায় সে চিৎকার করে উঠল ঃ আমাকে ডাক্তার রুদ্রর হত্যাকারী প্রমাণিত করবার কী প্রমাণ তোমার কাছে আছে?

বলেছি তো, প্রচুর প্রমাণ! তোমার আত্মপ্রত্যয়ই তোমার পতন ঘটাল। আমাকে আরও গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে মারার জন্যে যদি ডাক্তার রুদ্রর টেবিলের ওপর থেকে টুথপিকের বাক্সটা বদলে না নিত, তাহলে বোধ হয় তোমাকে এক তাড়াতাড়ি ধরতে পারতাম না। সবচেয়ে স্থূল প্রমাণ হল তোমার ফোলিও ব্যাগটা। যার মধ্যে আছে তোমার ব্যবসার কাগজপত্র—যা পড়ে বুঝতে পারা যায়, তোমার ব্যবসায় বিরাট টাল যাওয়ার কথাটা, বুঝতে পারা যায় সেই টাল সামলে ছিলে তুমি ডাক্তার রুদ্রর কাছ থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা নিয়ে। আমি মর্মাহত হীরক, গতকাল তোমাকে জনৈক শিখের ছদ্মবেশে আক্রমণ করার জন্যে। অবশ্য তার আগেই তোমাকে অনুসরণ করে শহরতলির ট্রাক গ্যারেজটা দেখে এসেছিলাম—যেখানে হরিপদকে খুন করা হয়েছিল। তোমার সহকারী বীরচাঁদকে সহজেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। সেই হবে তোমার বিপক্ষে সবচেয়ে বড় সাক্ষী।

প্রেমপ্রকাশ উঠে দাঁড়ালেন।

হীরক কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তার মুখের ওপরকার হিংস্র ভাবটা মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমেই। তার পরিবর্তে ধীরে-ধীরে ফুটে উঠেছে একটা ম্লান অনুশোচনার ছায়া।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে মাথা নত করল।

প্রেমপ্রকাশ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। আসুন, মিস্টার চৌধুরী।

হীরক বাসবের দিকে মুখ তুলল।

বাসবও ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টর প্রেমকে অনুসরণ করল।

সন্ধ্যা নামছে ধীরে-ধীরে।

শীতের বিষণ্ণ সন্ধ্যা।

অ্যাসফাল্টে মোড়া পথের ওপর দিয়ে কুয়াশা কাটতে-কাটতে এগিয়ে চলেছে অজয় সোমের

স্টুডিবেকার। গাড়িতে অবশ্য অজয় সোম নেই। বাসবকে টুণ্ডলাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে গাড়িটা শুধু চেয়ে নেওয়া হয়েছে তাঁর কাছ থেকে। পুলিশের জিপে এই শীতে এতখানি পথ যাওয়া রীতিমতো কষ্টকর, তাই...।

স্টিয়ারিংএর সামনে বসে স্টুডিবেকারকে চালিত করছেন ইন্সপেক্টর প্রেম স্বয়ং। ড্যাসবোর্ডের আলোয় তাঁর মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

বাসব রয়েছে পিছনের সিটে।

ওর দুপাশে সুমিত্রা ও সুব্রত।

কিছুতেই ছাড়ল না। সমস্ত জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর, যখন সকলে শুনল বাসব আজই কলকাতা ফিরে যাচ্ছে, তখন টুন্ডলা অবধি ওকে পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহ থেকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না তাদের দুজনকে।

বেশ দ্রুতবেগেই গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

কখনো-কখনো অপর দিকে থেকে বা পিছন দিক থেকে দু-একখানা গাড়ি স্টুডিবেকারকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

সকলে চুপচাপ।

বাসব নির্বিকার ভাবে সিগারেট টানছে।

একসময় সুমিত্রা বলল, ভাবতেই পারা যায় না, হীরকবাবু বাবাকে খুন করেছেন?

বাসব বলল, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম মর্মান্তিক কেস এল এটি। হাজার হলেও হীরক আমার বন্ধু। তার জীবন ফাঁসির দড়িতে শেষ হবে আমি ভাবতেও পারিনি।

ওঁর ফাঁসি হবে?

না হওয়ার তো কোনও কারণ নেই। আর যদি একান্তই না হয়, তাহলে দীর্ঘ কারাবাস নিশ্চিত।

সুব্রত বলল, পুরো ব্যাপারটাই এখন আমার কাছে হেঁয়ালি। আপনি হীরকবাবুকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলেন?

প্রেমপ্রকাশ বললেন, বিস্তারিতভাবে বলুন মিস্টার ব্যানার্জি।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ফেলে দিয়ে আরম্ভ করল, বঙ্কিম রুদ্র খুন হয়ে যাওয়ার পর আমি গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম কার পক্ষে একাজ করা সম্ভব। আর হত্যার মোটিভই বা কী? এদিকে অজয় সোমের অফিস থেকে একটা খাম চুরি গিয়েছিল এবং অদৃশ্য হয়েছিল তাঁর আহত বেয়ারা হরিপদ। হঠাৎ আমার মনে হল, খাম চুরির সঙ্গে রুদ্রর মৃত্যুর কোনও যোগ নিশ্চয়ই আছে। আমি অজয় সোমের অফিসে গিয়ে তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা ডাঃ রুদ্রর খামগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম, প্রত্যেকটি খামের মধ্যে হ্যান্ডনোট রয়েছে। কাজেই অনুমান করে নেওয়া গেল, চুরি যাওয়া খামটার মধ্যেই ছিল একটা হ্যান্ডনোট। চোর টাকা ধার নিয়ে, শোধ না দেওয়ার অপচেষ্টাতেই এরকম করেছে। ওই সঙ্গে তাকে ডাঃ রুদ্রকেও খুন করতে হয়েছে, কারণ হ্যান্ডনোট চুরি যাওয়ার কথা তাঁর কানে উঠলেই তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন কে চোর। তাই তাঁর মুখ এইভাবে বন্ধ করা ছাড়া উপায় ছিল না। হত্যার পদ্ধতিতে হত্যাকারী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। আর দশজনের মতো সেও জানত, কাঠি নিয়ে দাঁত খোঁটা ডাক্তারের অভ্যাস আছে। সে তাঁর অভ্যেসটুকুকে মূলধন করল। স্টাডির টেবিলের ওপর একটা টুথপিকের বাক্স রাখা থাকত। হত্যাকারী এক সময় বাক্সটা বদলে দিয়ে এল। একাজ করতে তার খুব বেশি অসুবিধে হয়নি। কারণ ও-বাড়িতে তার বিশেষ যাওয়া-আসা ছিল।

আমি স্টাডিতে একটা কাঠি কুড়িয়ে পেয়েই বুঝতে পেরেছিলাম হত্যাকারী কীভাবে ডাঃ রুদ্রকে প্রাণে মেরেছে। টুথপিকের বাক্সের প্রতিটি কাঠিতেই সায়ানাইড মাখানো ছিল। ডাঃ রুদ্র বাক্স থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়ে দাঁতে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেছেন। কিন্তু ইন্সপেক্টর আমাকে অবাক করে দিলেন। তিনি রিপোর্ট দিলেন, পরীক্ষা করে জানা গেছে বাক্সের মধ্যেকার অন্যান্য কাঠিতে

সায়ানাইড মাখানো নেই। এ তো সম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া যায়, বাক্সর সমস্ত কাঠির মধ্যে একটাতেই সায়ানাইড মাখানো ছিল, তবে আরেকটা সমস্যা দেখা দেয়, এতগুলো কাঠির মধ্যে থেকে ডাক্তার সায়ানাইড যুক্ত কাঠিটাই বা তুলে নিলেন কীভাবে—এরকম কোয়েন্সিডেন্স কী সম্ভব? আমি ভাবতে লাগলাম। আবার আমার মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। কেউ বাক্সটা বদলে নেয়নি তো? কখন বদলাল? দরজা বন্ধ অবস্থায় ডাঃ রুদ্র মারা গেছেন। দরজা ভাঙার পর বাড়ির সকলে পুলিশ না আসা পর্যন্ত একই সঙ্গে ছিলেন। হত্যাকারীর পক্ষে তখন কাজ গোছানো সম্ভব হয়নি নিশ্চয়ই, তবে সে নিজের কার্যোদ্ধার করল কখন? ভাবতে-ভাবতে আমি এর সমাধান পেলাম। আমি ও ইন্সপেক্টর যখন স্টাডিটা পরীক্ষা করবার পর সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তখন কয়েক মিনিটের জন্যে স্টাডি খালি ছিল। তখন ড্রইংরুমে অজয় সোম ও হীরক অপেক্ষা করছিল, আর সকলে যে যার নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। এই সময়েই হত্যাকারী বাক্স বদলাবার সুযোগ নিয়েছে। তাহলে কি অজয় সোমই একাজ করেছেন?

একটানা এতক্ষণ বলবার পর বাসব থামল।

একটা সিগারেট ধরাল ও। তারপর আবার আরম্ভ করল, আমি টুথপিকের বাক্সর ওপর থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুলতে বললাম ইন্সপেক্টরকে। এদিকে আমি প্রায় সকলেরই হাতের ছাপ সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম। ইন্সপেক্টর যখন আমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্টের কপি দিলেন, তখন দেখা গেল কারুর হাতের ছাপের সঙ্গেই এই প্রিন্ট মিলছে না। তবে কি কোনও বাইরের লোক ডাঃ রুদ্রকে খুন করেছে? বাইরের লোকের মধ্যে একমাত্র হীরক—। কিন্তু হীরককে সন্দেহ করা চলে না। তবুও আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, আমরা তখন সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন অজয় সোম বাথরুমে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই কি হীরক টুথপিকের বাক্স বদলে আমাকে বিপথে চালিত করবার চেষ্টা করেছিল? হীরকের হাতের ছাপ সংগ্রহ করতে অসুবিধে হল না—এবার মেলাতেই, তার হাতের ছাপের সঙ্গে টুথপিকের বাক্সর ছাপের হুবহু মিল হল। আমি হীরক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। বুঝলাম, নিজের ওপর অত্যন্ত আস্থাশীল হয়ে পড়ার দরুন সে নিজের পতন ঘটিয়েছে। খাম চুরির ব্যাপারে যখন আমি অজয় সোমের অফিস-ঘর পরীক্ষা করছিলাম, তখন টেবিলের ওপর খুব পাতলা একটুকরো ভাঙা কাচের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আমার মনে পড়ল, হীরকের ঘড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে দোকানে মেরামত করতে দিয়েছিল। আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ভাঙা কাচের টুকরোটা ঘড়ির। বোধ হয় মিঃ সোমের টেবিলের ওপর থেকে তাড়াতাড়ি খামটা তুলে নিতে গিয়ে, স্টেপল মেশিন বা আর কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে হীরকের ঘড়ির কাচ ভেঙে গিয়েছিল। তখন বাধ্য হয়ে বিনয়বাবুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আমাকে ঘড়ির কাচটা ভাঙতে হল। কোনও কৌশলের প্রয়োজন হল না। সহজেই হীরকের কাছ থেকে পাওয়া গেল ঘড়ির দোকানের ঠিকানাটা। নইলে আগ্রার অজস্র ঘড়ির দোকানের মধ্যে ওই ঘড়ির দোকানটার সন্ধান পাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হত। দোকানদারের হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে আমি কুড়িয়ে পাওয়া কাচের টুকরোর সঙ্গে হীরকের ঘড়ির ভাঙা কাচ মিলিয়ে নিলাম—এক সেলের। ঘড়িওয়ালা অবশ্য অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওই কাচের সন্ধান পেয়েছিল।

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নিয়ে বাসব আবার বলে চলল, ডাঃ রুদ্রর কাছ থেকে সে এত টাকা ধার নিয়েছিল কেন? ছদ্মবেশে হীরকের পিছু নিলাম। দুদিনের মধ্যেই সন্ধান পেলাম শহরতলির মোটর গ্যারেজের। সে গ্যারেজটা বোধ হয় তার বেনামিতে ছিল, কারণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হীরক শিখের ছদ্মবেশ গ্রহণ করত অন্য একটা ভাড়া করা ঘরে। তারপর গ্যারেজে যেত। এর মধ্যে হরিপদ খুন হয়েছিল। হীরক তাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই। হরিপদ যে কোনও মুহূর্তে পুলিশের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিতে পারে। গ্যারেজের সন্ধান পাওয়ার পর একদিন রাত্রে আমি ওখানে হানা দিলাম, যদি কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু আঙুলের ছাপের নির্ভর করলে চলবে না। আরও প্রমাণ চাই। প্রচুর খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পাওয়া গেল

না। হীরকের অনুপস্থিতিতে খুঁজলাম—বৃথা চেষ্টা। আমার দৃষ্টি পড়ল ফোলিও ব্যাগটার ওপর। ব্যাগটা হীরক চোখের আড়াল করে না। বোধহয় ওতে আশাজনক কিছু পাওয়া যেতে পারে। অগত্যা ব্যাগটা পথে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করলাম—কাড়লামও। ওই সঙ্গে মানিব্যাগটাও কাড়তে হল। যাতে হীরক মনে করে এটা কোনও পেশাদার গুন্ডার কাজ, টাকা কেড়ে নেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। ফোলিওটা হাতে পাওয়ার পর আর কিছু বুঝতে বাকি রইলে না। অনেক কাগজপত্র পাওয়া গেল—দেখলাম, বছরখানেক ধরে তার বেশ লোকসান যাচ্ছিল। তাই সে ব্যবসাকে বাঁচানোর জন্যে ডাঃ রুদ্রর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। ফোলিওর মধ্যে আরও পাওয়া গেল, ক্রেপ, স্পিরিটগাম, কাঁচি ইত্যাদি। ছদ্মবেশ নেওয়ার উপকরণ। এরপর হীরক কীভাবে ধরা পড়ল আপনারা জানেন।

বাসব থামতেই প্রশংসমান দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা বলল, আপনার প্রতিভা প্রশংসার অনেক উর্ধ্বে মিস্টার ব্যানার্জি। তবু বলব, অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় আপনি দিয়েছেন। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি না, হরিপদর মৃতদেহ আমাদের বাড়িতে ফেলে আসার কী সার্থকতা। নদীতে ভাসিয়ে দিলেই তো হত।

তা অবশ্য হত, বাসব বলল, আমি দেখেছি—অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে হত্যাকারা নিজেদের বাহাদুরি জাহির করবার লোভ সংবরণ করতে পারে না। অপরাধীরা কোনও-না-কোনও দুর্বল মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। এখানেও তাই হয়েছে। নইলে হরিপদর মৃতদেহ ওখানে ফেলে আসার আর কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আরেকটা কথা—সুব্রত বলল, হীরকবাবুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে আপনি ছদ্মবেশ পরতেন কোথায়?

থানায়, মিস্টার প্রেমকে সামনাসামনি বসিয়ে। ছদ্মবেশ নিখুঁত হচ্ছে কি না, তাঁর সুচিন্তিত অভিমত নিয়ে তবে রাস্তায় বেরুতাম।

টুন্ডলা প্রায় এসে গেছে।

শহরতলির মধ্যে দিয়ে তখন গাড়ি চলেছে।

প্রেমপ্রকাশ বললেন, আপনার প্রচুর সুখ্যাতি আমি শুনেছিলাম, মিস্টার ব্যানার্জি। এখন দেখেছি একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। আপনার সঙ্গে কাজ করে অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। ভবিষ্যতে আমাদের আর দেখা হবে কি না কে জানে।

নিশ্চয়ই হবে, বাসব অল্প একটু হেসে বলল, খুব তাড়াতাড়িই আবার আমাদের দেখা হবে। অবশ্য সুব্রতবাবু আর সুমিত্রা দেবী যদি তাদের বিয়েতে আমাকে আমন্ত্রণ জানান—তবেই!

সুমিত্রা মুখ নত করল।

বলল, ও-কথা বলে আমাদের লজ্জা দেবেন না, মিস্টার ব্যানার্জি।

লজ্জা দিইনি ভাই। আসলে ব্রাহ্মণের ছেলে তো, একপেট খাওয়ার সম্ভাবনা কোথাও দেখা দিলে, মনটা কেমন আনচান করতে থাকে? তাই শুভদিনটিতে পাত পাতার পাকাপোক্ত ব্যবস্থাটা ইঙ্গিত দিয়েই পাকাপাকি করে নিচ্ছিলাম আর কী।।

বাসবের কথায় প্রেমপ্রকাশ ও সুব্রতর হাসি সংবরণ করা সম্ভব হল না। সুমিত্রাও যোগ দিল দুজনের সঙ্গে।

স্টুডিবেকার তখন শহরের মাঝপথ দিয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ট্রেনের আর খুব বেশি দেরি নেই।

প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

লোকটাকে আমি ভীষণ-ভীষণ ঘেন্না করি।
কেন?
লোকটা একটা নরপশু।
ধারণাটা হল কেন?
কেন আবার! অভিজ্ঞতা থেকে জানি।
আপনার সঙ্গে ওর বিবাহিত জীবন কতদিনের?
মাত্র সাত দিনের।
মাত্র সাত দিন বাদেই আপনি চলে আসেন?
বিয়ের মানে ফুলশয্যার পরদিন সকালেই চলে আসার কথা। আসিনি। লোকলজ্জা বাধা হয়েছিল।
লোকটা আপনার ওপর ফিজিক্যাল টর্চার করেছিল কি?
মানে মারধর?
হ্যাঁ।
মারধরের চেয়ে অনেক বেশি।
আপনি কি বলতে চান লোকটার সেক্স একটু বেশি?
একটু বেশি? একটু বেশি বললে কিছুই বলা হয় না।
তা হলে খুব বেশি?
আমি আর কিছু বলতে চাই না। লজ্জার কথা এ ভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে লোকটা নরপশু, জেনে রাখুন।
বুঝলাম, আপনি তার দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন।
হ্যাঁ। আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল।
এটা কতদিন আগেকার ঘটনা?
দেড় বছর।
এই দেড় বছরের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি?
ওর সঙ্গে নয়। তবে ওর বাড়ির কেউ-কেউ আমার কাছে আজও আসে, খোঁজখবর নেয়। তারা আমার জন্য দুঃখিত।
লোকটির সঙ্গে আপনার শেষ দেখা তা হলে দেড় বছর আগে?
হ্যাঁ।
আপনি ডিভোর্সের মামলা করেননি?
না।
কেন?
ডিভোর্স করেই বা কী হবে বলুন। আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না।
তাই বা কেন?
একবারের অভিজ্ঞতায় আমি এত আতঙ্কিত যে আর ও কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না।
আপনি কি ভজনবাবুর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পান?
হ্যাঁ পাই। ওর বাড়ির লোকেরা খারাপ নয়, তারাই একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মাসে-মাসে টাকা দিয়ে যায়।
ভজনবাবু নিজেই আসেন টাকা দিতে?
না-না। তার অত সাহস নেই। আসে ওর ছোটভাই পূজন।
আপনি তো চাকরি করেন।

করি।

কোথায়?

আলফা নেটওয়ার্ক-এর মার্কেটিং ডিভিশনে।

সেটা কেমন চাকরি?

ভালোই। আমি একজন একজিকিউটিভ।

তা হলে ভজনবাবুর সাহায্য না হলেও চলে?

কেন চলবে না?

আপনার বাপের বাড়ির অবস্থাও তো ভালোই দেখছি।

খারাপ নয়। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার, সুরেকা ইন্ডাস্ট্রিজের ওয়ার্কস ডিরেক্টর। আমার দাদা আমেরিকার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।

ভজনবাবুর সাহায্য তবু আপনি নেন?

কেন নেব না? সে আমার জীবনটাকে নষ্ট করেছে। তার কিছু ক্ষতিপূরণ তো ওকে করতে হবে।

তা তো বটেই। এ বার একটা ডেলিকেট প্রশ্ন।

বলুন।

ইজ হি ক্যাপেবল অফ মার্ডার?

তা কী করে বলব? আমার সঙ্গে পরিচয় তো সামান্য।

আপনি তো ওকে নরপশু বললেন।

তা তো বলেইছি।

আপনার কি মনে হয় লোকটা খুব হিংস্র?

অন্তত একটা ব্যাপারে তো তাই।

একটা ব্যাপার থেকেও তো কিছু আন্দাজ করা যায়।

এবার আমাকে একটু মুশকিলে ফেলেছেন।

কেন বলুন তো!

লোকটাকে কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে খুব নিরীহ মনে হয়।

সেটা কেমন?

এমনিতে চুপচাপ, মাথা নীচু করে থাকে।

তাতে কি নিরীহ বলে প্রমাণ হয়?

না। তা হয় না।

তাহলে?

ফুলশয্যার পরদিন সকালে আমার অবস্থা দেখে ওর এক বোন সব কথা বাড়ির লোককে বলে দেয়। ওর বাড়ির লোক ওকে খুব বকাঝকা করেছিল। লোকটা খুব যেন অপরাধবোধে কাতর হয়েছিল। তবে সেটা অভিনয়ও হতে পারে।

আমার জানা দরকার লোকটা খুনটুন করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে কি না।

তা জানি না।

এবার একটা কথা বলি।

বলুন।

খুন সবাই করতে পারে না। খুন করার জন্য একটু আলাদা এলেম দরকার হয়। এক ধরনের মানসিকতার।

তা হবে।

এ-লোকটার সেই মানসিকতা আছে কি না আমি সেইটে জানার চেষ্টা করছি।

বলেছি তো, লোকটাকে আমি ভালো করে চিনি না।

একটা কথা।

বলুন।

আপনি একজন শিক্ষিতা মহিলা, আপনার পরিবারও বেশ কালচারড। আপনি ভজনবাবুর মতো একজন গ্যারেজ মালিককে বিয়ে করলেন কেন?

গ্যারেজ মালিক হলেও ভজন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার।

একসময়ে ভালো মোটর তৈরির কারখানায় কাজ করত। তারপর নিজে স্বাধীনভাবে ব্যাবসা শুরু করে। শুনেছি ওর গ্যারেজে নতুন ডিজাইনের দু-তিনটে গাড়ি তৈরি করে চড়া দামে বিক্রি করেছে।

শুধু সেই কারণ?

আমার বাবা স্বাধীনচিত্ত পুরুষকে খুব পছন্দ করেন।

শুধু প্রফেশনের দিকটা ছাড়া আপনারা আর কিছু দেখেননি?

এটা নেগোসিয়েটেড ম্যারেজ ছিল। আমি বাবার মতে মত দিয়েছিলাম মাত্র। লোকটার যে-সব বিবরণ পেয়েছিলাম তাতে খারাপ লাগেনি।

বিয়ের আগে আপনারা পরস্পরকে দেখেছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনার পছন্দ হয়েছিল?

চেহারাটা খারাপ লাগেনি। বিনয়ী ভাবটাও তো ভালোই মনে হয়েছিল।

ওঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে সে তো জানেন।

হ্যাঁ।

আপনি ওর মোটর গ্যারেজে কখনও গেছেন?

না। যাওয়ার মতো সময় তো পাইনি। বিয়ের পরই তো চলে এলাম।

কারখানাটা কোথায় তা জানেন?

শুনেছি, কলকাতার বাইরে বারাসাতের কাছে কোথায় যেন।

হ্যাঁ। খুনের ডিটেলসটা জানেন কি?

না। শুনেছি একটি মেয়ে খুন হয়েছে।

হ্যাঁ। তার আগে একটা প্রশ্ন।

বলুন।

আপনি শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসার পর পুলিশে ভজনবাবুর বিরুদ্ধে একটা ডায়েরি করেন।

হ্যাঁ, রাগের মাথায় করেছিলাম।

তাতে কি ওর সেক্সচুয়াল ব্রুটালিটির উল্লেখ ছিল?

ছিল। কিন্তু রাগে অন্ধ হয়ে ডায়েরি করেছিলাম। পরে কেলেঙ্কারির ভয়ে উইথড্র করি।

হ্যাঁ, আমরা তা জানি। পুলিশ ভজনবাবুকে ধরেও আপনার বাবার অনুরোধে এক রাত্তির পরেই ছেড়ে দেয়।

আমরা পারিবারিক দুর্নামের ভয়ে এটা করি।

এই খুনের ঘটনার পর কি আপনার শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ আপনার কাছে এসেছিল?

না।

খুনটা হয়েছে সাত দিন আগে। এর মধ্যে কেউ আসেনি?

পূজন মাঝে-মাঝে আসে, কিন্তু ঘন-ঘন নয়। গত সাত দিনে কেউ আসেনি।

এ বার একটা সেনসিটিভ প্রশ্ন।

বলুন।

লজ্জা পাবেন না তো।

লজ্জা পেলে জবাব দেব না।

ভেরি গুড।

প্রশ্নটা কী?

ভজনবাবু যে সেক্সচুয়াল ব্যাপারে স্যাডিস্ট গোছের মানুষ তা আপনার কথা থেকেই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন, যার সেক্সচুয়াল আর্জ এত বেশি সে তো নিশ্চয়ই প্রস কোয়ার্টারে যায়।

এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

সমস্যা হল এরকম মানুষেরা নিজেদের সামলে সংযত রাখতে পারে না।

প্রস কোয়ার্টারে গেলে হয়তো যায়। আমি কী করে জানব বলুন।

কোনও হিন্ট পাননি?

না।

সমস্যা হল, পুলিশ এই অ্যাঙ্গেলটা ভালো করে দেখেছে, কিন্তু ওঁর প্রস কোয়ার্টারে যাওয়ার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

প্রস কোয়ার্টারে গেলে ভজনবাবুর বিরুদ্ধে কেসটা আরও শক্ত হত। উনি যে স্যাডিস্ট তা প্রমাণ করার সুযোগ থাকত।

আমি তো বলেইছি লোকটাকে ভালো করে চেনার কোনও সুযোগ আমার হয়নি। যে মেয়েটা খুন হয় সে কি প্রস?

না।

তা হলে এ প্রসঙ্গ কেন?

মেয়েটিকে খুন করার আগে ব্রুটালি রেপ করা হয়।

ওঃ!

ইজ ইট জাস্ট লাইক ভজনবাবু?

কী করে বলব বলুন। আমাকে তো খুন করেনি।

মারধর বা হাত মুচড়ে দেওয়া, গালাগাল করা, এসব?

আমাকে প্লিজ, এসব প্রশ্ন করবেন না। আমার পক্ষে ডিটেলস বলা সম্ভব নয়। রুচিতে বাধে।

সরি। কিন্তু এটা তো জানেন যে, এটা মার্ডার কেস।

হ্যাঁ। কিন্তু আমার পক্ষে এর বেশি বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু কোর্টে যে আপনাকে এসব অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা হবে।

কোর্টে! কোর্টে কেন আমি যাব?

আপনাকে পুলিশ সাক্ষী হিসেবে ডাকবে।

সে আমি পারব না।

ভয় পাচ্ছেন?

ভয় নয়। এসব বিচ্ছিরি ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আমি কিন্তু কিছু বলতে পারব না।

সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আপনার সাক্ষ্যের ওপর অনেকে কিছু নির্ভর করছে।

কী নির্ভর করছে?

মোটিভ অফ মার্ডার।

আমার ওপর নির্ভর করবে কেন? আমার সঙ্গে লোকটার তো কোনও সম্পর্কই নেই।

সম্পর্ক যে নেই তার কারণটাই তো আমাদের দরকার। ভজনবাবু যে একজন স্যাডিস্ট সেটা প্রমাণ করতে পারলে পুলিশের কাজ সহজ হয়ে যায়।

প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন। খুন যদি ও করে থাকে তো সেটা পুলিশ প্রমাণ করুক। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

পুলিশ তার কাজ করবে। পুলিশকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।

মেয়েটা কে?

ভালো প্রশ্ন। এ প্রশ্ন অনেক আগেই আপনি করতে পারতেন।

আপনি আমাকে এত প্রশ্ন করছেন যে, আমি প্রশ্ন করার সুযোগই পাচ্ছি না।

সরি ম্যাডাম। এসব ঘনটা ঘটলে লোককে বিরক্ত না করে উপায় থাকে না কি না।

বুঝেছি। এ বার বলুন মেয়েটা কে।

একজন টিন এজার। ষোলো-সতেরোর বেশি বয়স নয়। খুব চঞ্চল আর একটু ডানপিটে গোছের মেয়ে। ভজনবাবুর গ্যারেজের পর একটা খেলার মাঠ। মেয়েটার বাড়ি ওই মাঠটা পেরিয়ে। মেয়েটার নাম রিঙ্কু। খুব মড মেয়ে। তার বাবার চিংড়ি মাছের ব্যাবসা আছে। মোটামুটি পয়সাওলা লোক। মেয়েটা একটা সাইকেলে চড়ে পাড়ায় চক্কর দিয়ে বেড়াত। পোশাকও পরত খুব উগ্র। কখনও শর্টস আর কামিজ। কখনও জিনস আর টি শার্ট।

কেমন মেয়ে?

যেটুকু জানা যায়, বখাটে টাইপের মেয়ে। বাবা ডিভোর্সি। মা আবার কাকে বিয়ে করে বাইরে কোথাও থাকে। মেয়েটা বাবার কাছে থাকত।

একমাত্র মেয়ে?

হ্যাঁ, বোধহয় খুব আদরেরও। দেখতেও খারাপ ছিল না। সাক্ষ্যপ্রমাণ বলছে, মেয়েটার বেশ অ্যাট্রাকটিভ চেহারা ছিল এবং যথারীতি পাড়া-বেপাড়ার ছেলেরা তার পিছনে ঘুরঘুর করত। রিঙ্কুর বদনাম ছিল, সে ছেলেদের সঙ্গে ফ্রিলি মেলামেশা করে। বাবার কোনও শাসন ছিল না। ভদ্রলোক নিজের কাজ নিয়ে হিমশিম খেতেন, মেয়ের দিকে নজর দেওয়ার সময় ছিল না।

বাড়িতে আর কেউ নেই?

রিঙ্কুর ঠাকুমা আর দাদু ও বাড়িতে থাকেন। তাদের থাকা নিয়েই রিঙ্কুর মা আর বাবার মধ্যে বনিবনার অভাব দেখা দেয়। তারপর অশান্তি বেড়ে-বেড়ে শেষ অবধি ডিভোর্স।

রিঙ্কুর বাবা আর বিয়ে করেননি?

না। তিনিও আপনার মতোই। বিয়ের অভিজ্ঞতা তিক্ত হয়েছিল বলে আর বিয়ে করেননি। তা বলে তাঁর বিয়ের বয়স যায়নি। হি ইজ ওনলি ফর্টিফোর।

এবার আমার করণীয় কী বলুন। সাক্ষী দিতে হবে শুনে আমার ভীষণ ভয় করছে।

ভয় কীসের?

সাক্ষী-টাক্ষী দিলে তো পাবলিসিটি হবে। পুরোনো কথা উঠবে।

তা উঠবে।

সেইটেই ভয় পাচ্ছি। এ ঘটনার সঙ্গে তো আমার কোনও সম্পর্কই নেই। তবু কেন যে আপনারা আমাকে ইনভলভড় করতে চাইছেন।

উপায় নেই বলে।

লোকটা কি এখন জেলে?

পুলিশ কাস্টডিতে। আপনি চাইলে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

দেখা করব? সে কী কথা! আমি ওর সঙ্গে দেখা করব কেন?

লোকটা আপনার কাছে হয়তো কিছু বলতে পারে।

প্লিজ, আমাকে এসব কাজে জড়াবেন না। আমি ওর ছায়াও মাড়াতে চাই না।

ম্যাডাম, কাজটা অপ্রীতিকর হলেও আমার কিছু কৌতূহল আছে।

আমি পারব না। মাপ করবেন।

আগে একটু শুনুন। দিন সাতেক আগে ঘটনাটা ঘটে। ভজনবাবুর মোটর গ্যারেজের পাশের মাঠে মেয়েটির ডেডবডি পাওয়া যায় সকালবেলা। মাঠটায় কিছু আগাছার জঙ্গল আছে, তার মধ্যে। মেয়েটি বাড়ি না ফেরায় সারা রাত লোকজন এবং পুলিশও তাকে অনেক খুঁজেছিল। পায়নি।

শুনতেই আমার খারাপ লাগছে। ডেডবডি কথাটা শুনেই আমার মনটা কেমন করে উঠল। আহা, ওইটুকু একটা মেয়েকে মারে কেউ?

মানুষের ভিতরে একটা পশু তো থাকেই। আর সেই পশুটাকে ধরার জন্যই আপনার সাহায্য প্রয়োজন।

পশুটা কি ওই ভজন?

তাই মনে হচ্ছে।

আপনাদের হাতে প্রমাণ নেই?

একেবারে প্রমাণ ছাড়া তো ভজনকে ধরা হয়নি।

প্রমাণই যদি থাকে তা হলে ওকে শাস্তি দিলেই তো হয়। আমার সাহায্যের কী দরকার?

প্রমাণ আছে, আবার নেইও।

সে আবার কী?

ভজনবাবুর গ্যারেজটা একটু নির্জন জায়গায়। প্রায় এক বিঘা জমি নিয়ে গ্যারেজ। অনেক সফিস্টিকেটেড যন্ত্রপাতি আছে। ডিজাইনার গাড়ি তৈরি করার জন্য ভজনবাবু কিছু অর্ডার পাচ্ছিলেন। দেশি-বিদেশি গাড়ির মোটর নিয়েও বোধহয় এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। গ্যারেজটা আরও বড় করার জন্য পাশের মাঠটা কেনারও চেষ্টা করছিলেন।

আমি এত সব জানি না। তবে পূজন বলেছিল ওর গ্যারেজ বড় হচ্ছে।

হ্যাঁ, বেশ বড় গ্যারেজ।

ওর কি অনেক টাকা?

হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি তো দেড় বছরের?

এক বছর আট মাস।

গত দেড় বছরের মধ্যেই ভজনবাবু অনেক টাকা করেছেন। আর বোধহয় সেই কারণেই লোকটার পিছনে ওখানকার ক্লাব এবং মস্তানেরা লেগে গিয়েছিল। তারা টাকা চাইত, উনি দিতেন না।

এসব আমার জানা ছিল না।

আপনার জানার কথা নয়। তবে মাস ছয়েক আগে ভজনবাবুর ওপর হামলা হয় এবং উনি কয়েকটা গুণ্ডাছেলের হাতে মার খান!

হ্যাঁ, এ রকম একটা কী যেন পূজনের কাছে শুনেছিলাম। বেশি মাথা ঘামাইনি।

ভজনবাবু লোকটি খুব বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাবসাদার নন। তা যদি হতেন তা হলে গুণ্ডা মস্তানদের কিছু চাঁদা দিয়ে হাতে রাখতে পারতেন। সে পথে না গিয়ে উনি কনফ্রন্টেশনের পন্থা নিয়েছিলেন। এমনিতে নিরীহ হলেও বেশ একগুঁয়ে আর জেদি। তাই না?

তা তো বটেই।

যাই হোক, এই ঘটনার পর গ্যারেজটা প্রায় উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়। ভজনবাবু আপস-রফা করতে রাজি হননি, টাকাও দেননি। উনি পুলিশকেও হাত করার চেষ্টা করেননি বলে প্রোটেকশনও পাননি।

এতসব জেনে আমার কী হবে?

লোকটার চারিত্রিক আউটলাইনটা আপনার সম্পূর্ণ জানা নেই বলেই বলছি।

তা হলে বলুন।

লোকটা বিপদের ঝুঁকি নিয়েই ওখানে গ্যারেজ চালাতে লাগলেন। ভজনবাবু একটা রিভলভার কিনেছিলেন। লাইসেন্সও ছিল। আর ওঁর গ্যারেজের কর্মচারীরা—কী জানি কেন—ওঁর খুবই অনুগত। তারাও ওঁকে প্রোটেকশন দিতে লাগল। ফলে গ্যারেজের সঙ্গে লোকালিটির একটা শত্রুতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। গ্যারেজে বারকয়েক বোমা পড়েছে, আগুন দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, জনসাধারণকে খেপিয়ে তুলে অবরোধের চেষ্টাও হয়েছে, তার চেয়ে বড় কথা পলিটিক্যাল প্রেশারও ওঁর বিরুদ্ধে ছিল। জনসাধারণের অভিযোগ ওই গ্যারেজে চোলাই তৈরি হয়, সমাজবিরোধী কাজ হয় ইত্যাদি।

সত্যিই হত নাকি?

বোধহয় না।

তা হলে আপনি কী বলতে চাইছেন?

বলতে চাইছি ভজনবাবুর শত্রুর অভাব নেই।

সে তো হতেই পারে।

আর শত্রুতা ছিল বলেই ভজনবাবু ইদানীং গ্যারেজেই থাকা শুরু করেছিলেন। গ্যারেজের ভিতর দিকে ওঁর যে অফিসঘরটা আছে সেখানে চৌকি পেতে বিছানা করে নিয়েছিলেন। রান্নাবান্নাও নিজেই করে নিতেন। ওঁর জবানবন্দি অনুসারে গ্যারেজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওঁর গ্যারেজে থাকাটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। লোকটাকে সাহসী বলতে হয়। কী বলেন?

আমি কী বলব বলুন। আপনার মনে হলে হতে পারে।

গ্যারেজে দুজন কর্মচারী রাতে পাহারা দিত। আর ভজনবাবু তো সপ্তাহে চার-পাঁচ দিনই থাকতেন। যেদিন ঘটনাটা ঘটে সেদিনও ভজনবাবু গ্যারেজে ছিলেন।

গার্ডরাও ছিল তো!

দুঃখের বিষয় সেদিন দিবাকর নামে যে কর্মচারীটির গার্ড দেওয়ার কথা ছিল তার মায়ের অসুখ বলে সে আসেনি। ছিল রতন নামে দ্বিতীয় গার্ডটি।

মেয়েটির সঙ্গে কি ভজনের আলাপ ছিল?

ছিল। মেয়েটা প্রায়ই নাকি গ্যারেজে হানা দিত। সে ভজনবাবুকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দিতে বলত। এবং ভজনবাবু মাঝে-মাঝে রিঙ্কুকে গাড়ি চালানো শেখাতেনও। শোনা যায়, রিঙ্কু ভালো গাড়ি চালাতে শিখে গিয়েছিল।

বাঃ, তা হলে আর সন্দেহ কী?

সন্দেহের অবকাশ বিশেষ নেই। কারণ ঘটনার দিন সন্ধেবেলা গ্যারেজের উল্টো দিকের বাড়ির সনাতন মল্লিক দেখেছেন যে, রিঙ্কুর সাইকেলটা গ্যারেজের ফটকের কাছে দাঁড় করানো।

তা হলে তো মিলেই যাচ্ছে।

যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনাটা সন্ধেবেলা ঘটেনি। ঘটেছে একটু বেশি রাতে। অন্তত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাই বলে।

আপনি বড্ড ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলেন শবরবাবু।

হ্যাঁ, ওইটে আমার দোষ। তবে আসল ঘটনা বের করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো করে বুঝিয়ে বলা দরকার মিসেস আচার্য।

আমাকে প্লিজ, মিসেস আচার্য বলবেন না। আমার নাম বিভাবরী ভট্টাচার্য।

জানি। ডিভোর্স করেননি বলে মিসেস আচার্য বলে ফেলেছিলাম।

কোর্টের ডিভোর্স না হলেই কী? আমি মনে-মনে তো কবেই ওকে পরিত্যাগ করেছি।

তা বটে। ডিভোর্সের প্ল্যান আছে কি?

এসব শুনে—মনে হচ্ছে, ডিভোর্সটা করে রাখলেই ভালো হত।

তা ঠিক। তবে ডিভোর্স হয়ে থাকলেও আমরা আপনাকে সাক্ষী মানতাম।

উঃ, কী যে মুশকিল!

সরি ম্যাডাম।

আপনি আমার প্রবলেমটা বুঝতে পারছেন তো শবরবাবু?

পারছি বিভাবরী দেবী। কিন্তু প্রবলেমটা আমাদের সকলেরই। আপনি এক্সপোজারকে ভয় পাচ্ছেন, কোর্ট কাছারিতে যেতে অপছন্দ করছেন, কিন্তু আমাদের যে উপায় নেই।

ঠিক আছে বলুন।

রিঙ্কুর সাইকেলটা খুব দামি এবং রেসিং মডেলের।

ওরকম দামি সাইকেল ওই অঞ্চলে কারও নেই। সুতরাং ওই লাল রঙের সাইকেলটা সহজেই চোখে পড়ত। বুঝতে পারছেন?

পারছি। সন্ধেবেলা গ্যারেজে সাইকেলটা দাঁড় করানো ছিল।

হ্যাঁ।

তা হলে তো প্রমাণই হয়ে গেল যে, রিঙ্কু ভিতরে ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে তাই।

আবার আপাতদৃষ্টি কেন?

পুলিশের মনটা বড্ড খুঁতখুঁতে। এই যে ধরুন না আমার মোটরবাইকটা এখন আপনাদের বাড়ির সামনে দাঁড় করানো আছে, আর আমি ভিতরে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। মোটরবাইকটা যে চেনে সে ওটা দেখে বলতেই পারে যে, শবর দাশগুপ্ত এখন বিভাবরী ভট্টাচার্যের বাড়িতে বসে আছে। কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে, মোটরবাইকটা আর কেউ টেনে এনে রেখেছে বা আমিই ওটা রেখে দিয়ে বাসে উঠে বাড়ি চলে গেছি। সুতরাং এটাকে ফুল প্রুফ বলে ধরা যায় না।

আপনারা সোজা জিনিসটাকে প্যাঁচালো করতে ভালোবাসেন।

তা নয়। আসলে দুনিয়ায় সহজ সরলভাবে কিছুই ঘটে না। তা যদি ঘটত তা হলে আমাদের কত পরিশ্রম বেঁচে যেত বলুন।

তা বটে। একটু চা খাবেন? অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলছেন।

কফি হলে হত। বেশির ভাগ বাড়িতেই চা-টা ভালো হয় না।

আপনি ভীষণ ঠোঁটকাটা তো!

খারাপ চা খাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই ঠোঁটকাটা হতে হয়েছে।

আচ্ছা, কফিই করে আনছি।

আনুন।

বিভাবরী উঠে যাওয়ার পর শবর ঘরটা আবার দেখল। সচ্ছল পরিবারের বৈঠকখানা যেমন হয় তেমনই সাজানো। সোফাসেট, সেন্টার টেবিল, নীচু বুক কেস, দেয়ালে কিছু ওয়াল ডেকোরেশন। বুক কেসের ওপর কাঠের তৈরি বাঁকুড়ার ঘোড়া। তার পাশে দুটো স্টিল ফ্রেমের ছবি। একটা ছবি বিভাবরীর মা আর বাবার। অন্যটা বোধহয় কম বয়সে বিভাবরী আর তার দাদার।

বিভাবরী কফি এনে বলল, শুধু দুধের কফি। চলবে তো!

শবর একটা চুমুক দিয়ে বলল, ব্রাঃ। চিনিটা খুব পারফেক্ট হয়েছে তো! চিনিতেই গণ্ডগোলটা বেশি হয়।

বিভাবরী একটু হেসে বলল, রিঙ্কুর সাইকেলের গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

শবর বিভাবরীর দিকে তাকাল। মেয়েটির চেহারা খুবই ভালো। খুব লম্বা নয়, তেমন ফর্সাও

বলা যায় না, কিন্তু মুখখানা খুব ঢলঢলে। চোখ দু-খানা টানা এবং দৃষ্টিটা মায়ায় মাখানো। অ্যাট্রাকটিভ। হ্যাঁ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ।

কী দেখছেন?

ভাবছি আপনার মতো একজন সুন্দরী মহিলার ভাগ্যটা সুন্দর হল না কেন। কী যেন কথায় আছে, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর—না কী যেন।

বিভাবরী একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল, আমি সুন্দরী হলে বলতে হয় আপনি সুন্দরী কথাটার মানেই জানেন না।

তা হতে পারে। তবে যা চোখের পক্ষে স্নিগ্ধকর, তাই আমার সুন্দর বলে মনে হয়। যাকগে। হ্যাঁ, খুব আনইজি সাবজেক্ট।

যা বলছিলাম। রিঙ্কুর সাইকেল। গ্যারেজে রিঙ্কুর সাইকেলটা সন্ধে থেকেই ছিল। বা তারও আগে থেকে। অন্তত সন্ধে থেকে যে ছিলই তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

রিঙ্কুকে কেউ গ্যারেজে ঢুকতে দেখেনি?

খুব ভালো প্রশ্ন। না, আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষদর্শীকে পাইনি যে রিঙ্কুকে গ্যারেজে ঢুকতে দেখেছে। জায়গাটা একটু নির্জন। উল্টোদিকে মল্লিকবাবুর বাড়ি, আশেপাশে আর বাড়ি নেই। একধারে ডোবা, অন্য ধারে একটা বাড়ির ভিত হয়ে পড়ে আছে। লোকজন বিশেষ চলাচল করে না। ভজনবাবুর গ্যারেজেই যা লোকের যাতায়াত। সেদিন রবিবার গ্যারেজ বন্ধ থাকায় লোকজনও ছিল না।

রতন না কী যেন নাম—সে কী বলে?

রতন ডিউটিতে এসেছিল রাত ন'টা নাগাদ।

সে সাইকেলটা দেখেনি?

দেখেছে। তবে রিঙ্কু ভিতরে ছিল কি না সে জানে না।

কেন, তার তো খোঁজ করা উচিত ছিল।

সে যা বলেছে তা মোটামুটি এ রকম, সে রাত ন'টার কিছু পরে গার্ড দিতে আসে। ফটক খোলাই ছিল। একটা বাতি মাত্র জ্বলছিল বলে জায়গাটায় আলো আঁধারি ছিল। সে ফটকের কাছে একটা পুরোনো গাড়িতে বসে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ সাইকেলটা তার নজরে পড়ে। ও দিকে ভজনবাবুর ঘরের দরজা তখন বন্ধ। তার ধারণা হয়েছিল রিঙ্কু ভজনবাবুর ঘরে বসে গল্প-টল্প করছে।

ইস্ লোকটা যদি তখন গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিত তা হলে বোধহয় মেয়েটা বেঁচে যেত।

ধাক্কা না দিলেও সে পা টিপে-টিপে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওঃ। তারপর?

সে শুনতে পায়, ভিতরে একটি মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে ভজনবাবুর কথা হচ্ছে। কথা বা তর্কাতর্কি।

তর্কাতর্কি?

হ্যাঁ। অন্তত রতন তাই বলছে।

মেয়েটার গলা তো নিশ্চয়ই তার চেনা।

না চেনার কথা নয়। তবে সেটা যে রিঙ্কুরই গলা এটা সে হলফ করে বলতে পারছে না।

এরপরও কি কোনও সন্দেহ আছে শবরবাবু?

না, সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সন্দেহ তো প্রমাণ নয়।

সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।

আছে। আর সেটাই আমাদের তুরুপের তাস।

রতন মেয়েটাকে দেখেনি, ভালো কথা। কিন্তু রেপ এবং খুনের পর লাশটা যখন মাঠে নিয়ে ফেলা হল, তখন তো তার চোখ বুজে থাকার কথা নয়।

বলছি ম্যাডাম। কথাটা খুবই সত্যি। রতন জানিয়েছে, রাত দশটার কিছু পরে ভজনবাবু দরজা খুলে বেরিয়ে তাকে ডাকেন। রতন খুব কাছাকাছি যাওয়ার আগেই ভজনবাবু তাকে কোকাকোলার ক্যান আনতে পাঠান। ধারে কাছে কোকাকোলার ক্যান পাওয়া যায় না। তাকে বেশ কিছুটা দূরে যেতে হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে সে ফিরে এসে ভজনবাবুর দরজায় নক করে। ভজনবাবু দরজা খুলে ক্যানগুলো নেন। তখন ঘরে কেউ ছিল না।

তার মানে কী দাঁড়াল?

দুইয়ে-দুইয়ে যোগ করলে চারই হয় ম্যাডাম। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ওই চল্লিশ মিনিটের মধ্যে খুন এবং গুম দুটোই হয়েছিল।

উঃ মাগো! কী সাঙঘাতিক লোক।

হ্যাঁ, খুবই সাঙঘাতিক লোক। আর এই কথাটাই আপনাকে আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে হবে।

আমাকে না হলেও তো হয়। রতনই তো সাক্ষী আছে।

রতন আমাদের খুব ইম্পর্ট্যান্ট সাক্ষী। কিন্তু তার একটা কথা গোলমেলে।

কোন কথাটা?

যে-মেয়েটার কণ্ঠস্বর সে ভজনবাবুর ঘরের ভিতর শুনতে পেয়েছিল সেটা রিঙ্কুর কি না এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়।

ওটা তো সামান্য ব্যাপার। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, হয়তো তাই গলাটা ভালো শুনতে পায়নি।

সেটা খুব সম্ভব।

ভজনের সঙ্গে রিঙ্কুর কী কথা হচ্ছিল?

শবর একটু হেসে বলে, শুনতে চান? এসব টপ সেক্রেট কি আপনার শোনা উচিত?

উচিত না হলে বলবেন না।

আরে রাগ করছেন কেন? রতন শুনতে পায় মেয়েটা বেশ চিৎকার করেই বলছে, কেন আপনি আমাকে বিয়ে করবেন না? আপনাকে করতেই হবে। জবাবে ভজনবাবু বেশ উত্তেজিত গলায় বলছিলেন, এসব কী বলছ পাগলের মতো? তোমাকে আমি ওভাবে কখনও ভাবিইনি! তুমি বাড়ি যাও, আমাকে এভাবে বিরক্ত কোরো না। জবাবে মেয়েটা বলছিল, আপনি একটা কাপুরুষ, নপুংসক, আপনার ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই, ইত্যাদি। ডিটেলস পুলিশের খাতায় লেখা আছে।

ও বাবা! রিঙ্কু আবার ওকে বিয়েও করতে চেয়েছিল?

চাইতেই পারে। ভজনবাবুর বয়স বোধহয় আঠাশ-উনত্রিশ, তাই না?

ওরকমই।

বয়সের একটু তফাত হত, কিন্তু বিয়ে হতেই পারে।

তা পারে, বিয়েই না হয় করত, মারল কেন?

সেটাই প্রশ্ন। আপনি বলতে পারেন কেন মারল?

না। কিন্তু ভজন কী বলছে?

ওঁর মুখ থেকে খুব বেশি কথা বের করা যায়নি। উনি বলছেন, সেইদিন সন্ধেবেলা ওঁর ঘরে যে-মেয়েটি ছিল সে রিঙ্কু নয়।

তবে কে?

তা উনি বলতে রাজি নন।

বলবে কী করে? সত্যি কথা বললে তো প্রমাণই হয়ে গেল।

আমাদেরও সন্দেহ মেয়েটা রিঙ্কুই।

এখনও সন্দেহ?

নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত না হলে সন্দেহ কথাটাই ব্যবহার করা ভালো।

সে আপনারা করুন। আমি জানি মেয়েটা রিঙ্কুই।

শবর একটু হাসল, তারপর বলল, ভজনবাবুকে ফাঁসিতে লটকানোর জন্য আপনি যে একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি।

হব না! একটা মেয়েকে রেপ করে যে খুন করেছে তার কি ফাঁসি হওয়া উচিত নয়?

ফাঁসি বা যাবজ্জীবন যাই হোক, সব সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন না করতে পারলে জজ তো আর সেই হুকুম দেবেন না।

আপনি রিঙ্কুর সাইকেলের কথাটা কি ভুলে যাচ্ছেন?

না, আমি কিছুই ভুলি না, রিঙ্কুর সাইকেলটাও একটা মস্ত এভিডেন্স। কিন্তু ভজনবাবু বলছেন, সাইকেলটা যে ওখানে ছিল তা তিনি জানতেন না। সে ব্যাপারে কিছু বলতেও পারেন না।

বেশ কথা তো!

হ্যাঁ। পুলিশ কেস সাজালে ভজনবাবু যে বিপদে পড়বেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেস সাজানোর ব্যাপারে আমাদের ফুলপ্রুফ হওয়া দরকার।

ফুলপ্রুফ হওয়ার জন্য আর কী-কী দরকার?

ভালো হত একজন আই উইটনেস পেলে।

গ্যারেজের উলটোদিকে যে-লোকটা থাকে সে কিছু দেখেনি?

না। আরও একটা কথা।

কী কথা?

পুলিশের কুকুর কিন্তু ভজনবাবুর গ্যারেজের দিকে যায়নি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তবে বর্ষাকাল তো এবং সেদিন রাত্রেও বৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই গন্ধের ট্রেলটা মুছে যেতেই পারে।

সে তো পারেই। আমার যেন মনে হচ্ছে আপনি ঘটনাটা সম্পর্কে তেমন নিশ্চিত নন!

আমাকে বলতে পারেন সন্দেহ-পিশাচ।

তাই দেখছি, পুলিশ কি এইরকমই?

না। আমি এইরকম।

তা হলে আপনি ক্রিমিনালদের ধরবেন কী করে?

সবসময়ে যে ক্রিমিনালদের ধরা যায় এমন নয়, অনেক ফাঁকফোকর দিয়ে তারা রেহাই পেয়ে যায়। ওই ফাঁকফোকরগুলোই ভরাট করার চেষ্টা করছি।

আমার তো মনে হচ্ছে এটা ওপেন অ্যান্ড শাট কেস।

শবর মৃদু হেসে বলল, হলে তো ভালোই হত। এবার একটা কথা জিগ্যেস করছি, একটু ভেবে জবাব দেবেন।

নিশ্চয়ই। আমি তো এতক্ষণ কো-অপারেট করেছি।

হ্যাঁ। আপনি নার্ভাস হননি।

এবার প্রশ্ন করুন।

ফুলশয্যার রাতে ভজনবাবুর যে পরিচয় আপনি পেয়েছিলেন তা খুবই খারাপ এবং ভয়ঙ্কর।

হ্যাঁ।

কিন্তু তারপরও আপনি আরও সাতদিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন।

হ্যাঁ।

আপনি কি ভজনবাবুর ঘরেই রাতে থাকতেন? আই মিন, একসঙ্গে?

পাগল নাকি? আমি ওর ঘরে শুতাম। কিন্তু ও চলে যেত ওর ভাই পূজনের ঘরে। বাড়ির লোকেরাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এই সাতদিনের কথা কিছু মনে আছে?

কেন থাকবে না? মাত্র তো দেড় পৌনে দুই বছরের ঘটনা।

সেই অভিজ্ঞতাটা কীরকম? মানে রিগার্ডিং ভজনবাবু।

ও কিন্তু কখনও আমার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেনি, এমনকী লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতও না।

ওই সাতদিনে আপনার সঙ্গে ভজনবাবুর কথা হত কি?

না। আমার কাছাকাছি আসত না।

আপনি এই সাত দিন শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন কেন? মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে?

না। প্রবলেমটা মানিয়ে নেওয়ার মতো ছিল না। সাতদিন ছিলাম, শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অনুরোধে। ওর ভাই পূজন আর বোন দেবারতি আমাকে খুবই ভালোবাসত। শ্বশুরমশাই অসুস্থ মানুষ, শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু শাশুড়ি খারাপ ছিলেন না। খুব ভালোমানুষ গোছের।

এই সাতদিনে ভজনবাবুর বিশেষ কোনও গুণ বা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে কি?

না।

ভালো করে ভেবে দেখুন। দেয়ার মে বি এ ভাইটাল ফ্যাক্ট।

কিছু মনে পড়েছে না তেমন। তবে—।

তবে কী? থামলেন কেন?

ও সকালবেলা রোজ পাড়ার কুকুরদের পাঁউরুটি খাওয়াত।

বাঃ, এই তো একটা কথা জানা গেল। আর কী?

নাঃ, আর কিছু নয়।

॥ দুই ॥

নমস্কার সনাতনবাবু।

আরে, আসুন, আসুন। নমস্কার, নমস্কার।

একটু বিরক্ত করতে এলাম।

বিরক্ত কীসের? আপনারা আইনের রক্ষক, আপনাদের একটু সাহায্য করব এ তো সৌভাগ্য।

শবর সনাতনবাবুর মুখোমুখি চেয়ারে বসল।

একটু চা বা কফি?

না, ধন্যবাদ।

ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?

না-না, ব্যস্ত হবেন না, আই অ্যাম অলরাইট।

তারপর বলুন।

ভজনবাবুর সঙ্গে আপনার কেমন পরিচয়?

খুব একটা নয় মশাই। যৎসামান্য। বাড়ির উলটোদিকে একটা গ্যারেজ থাকায় খুবই ডিস্টার্বড হতে হয়। দিনরাত দুমদাম শব্দ হচ্ছে, কলকব্জা চলছে, মিস্ত্রিদের হল্লাও আছে।

আপনি কি গ্যারেজটা তুলে দেওয়ার জন্য একটা মামলা করেছিলেন?

ঠিক মামলা নয়। আমার স্ত্রী হার্টের রুগি, জোরালো শব্দ তাঁর পক্ষে ক্ষতিকারক। সেটা জানিয়ে পুলিশে একটা রিপোর্ট করি। ভজনবাবুকে একটা উকিলের চিঠিও দিই।

তার আগে কি ভজনবাবুর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল?

হয়েছিল।

কীরকম কথা?

প্রথমে তো লোকটাকে ভালোমানুষ বলেই মনে হয়েছিল। আমি ওঁকে মাঝে-মাঝে বলতাম লোকালিটির মধ্যে গ্যারেজ থাকায় পাড়ার লোকের অসুবিধে হচ্ছে, উনি যেন হাইওয়ের দিকে গ্যারেজটা সরিয়ে নেন।

উনি কী বলতেন?

উচ্চবাচ্য করতেন না। চুপচাপ শুনতেন।

তারপরই ঝগড়া লাগে?

ঝগড়া ঠিক ওঁর সঙ্গে হয়নি।

তবে কার সঙ্গে?

ভজনবাবুর একজন কর্মচারী আছে, তার নাম রাখাল।

খুব লম্বা চওড়া?

হ্যাঁ সে-ই। ও হচ্ছে ঘাটপুকুরের মস্তান।

ঝগড়া হল কেন?

একদিন দুপুরে ওরা একটা গাড়ির বডি তৈরি করছিল। সে সাঙঘাতিক দুমদাম শব্দ। আমার স্ত্রী দুপুরে ঘুমোতে পারেননি, শব্দে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি অফিস থেকে ফিরে ঘটনা শুনে গ্যারেজে যাই। তখন রাখালের সঙ্গে কথা হয়

কী কথা হল?

আমি বললাম, এরকম চলবে না। রাখালও তেড়া-তেড়া জবাব দিচ্ছিল। তারপর ঝগড়ার মতো হল।

তখন কি ভজনবাবু গ্যারেজে ছিলেন?

না।

ঝগড়াটা কতদূর গড়িয়েছিল?

আমরা ভদ্রলোক, ছোটলোকদের সঙ্গে কি ঝগড়ায় পারি? রাখাল আমাকে দেখে নেবে বলে শাসিয়েছিল।

আপনি কী করলেন?

পাড়ার নাগরিক কমিটিকে জানালাম। তারা পরদিন গিয়ে ভজনবাবুকে ধরল।

ফলাফল কী হয়েছিল?

ভজনবাবু রাখালকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। রাখাল ক্ষমাও চাইল। কিন্তু গ্যারেজের শব্দটার যে সমস্যা ছিল তার তো সমাধান হল না। ভজনবাবু বললেন, আপনারা একটা টাইম বেঁধে দিন, আমরা সেই সময়েই গাড়ির বডির কাজ করব অন্য সময়ে করব না।

তা হলে তিনি কো-অপারেট করতেই চেয়েছিলেন।

তা বলতে পারেন। তবে ওটা আই ওয়াশ। গ্যারেজে শব্দ তো সারাদিনই হত। বডির কাজই তো শুধু নয়।

আপনার একটি মেয়ে, তাই না?

হ্যাঁ। তার বিয়ে হয়ে গেছে।

আপনার জামাই কন্ট্রাক্টর তো।

সবই তো জানেন তা হলে।

জানি। জানাটাই আমাদের কাজ।

সনাতনবাবু আপ্যায়িতের হাসি হেসে বললেন, আপনারা জানবেন না তো কে জানবে?

আপনার জামাই বিজয়বাবু চাঁপাডালির মোড়ের কাছে থাকে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি চান আপনার মেয়ে-জামাই আপনার কাছাকাছি কোথাও এসে থাকুক, যাতে বিপদে-আপদে তারা আপনাদের দেখাশোনা করতে পারে।

কী আশ্চর্য! হ্যাঁ, তাই। আপনি সত্যিই—।

দাঁড়ান, কথাটা শেষ করার পর আপনার হয়তো ততটা ভালো লাগবে না।

আরে বলুন না। ভালো না লাগার কী আছে?

আপনি মেয়ে-জামাইয়ের জন্য এ-পাড়ায় একটু বড় একটা প্লট খুঁজছেন, তাই তো!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই।

আপনার জামাই ভজনবাবুর গ্যারেজের জমিটাই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছিল। কিন্তু ভজনবাবু জমি বিক্রি করতে রাজি হননি।

আমার জামাই ওকে দুনো টাকা অফার করেছে। তাও রাজি হয়নি। এতে কোনও অপরাধ হয়নি তো!

আরে না। অপরাধ কিসের? তবে ভজনবাবুর গ্যারেজটা তুলে দিতে পারলে আপনার অনেক সুবিধে।

সনাতন চুপ।

এবার ঘটনার দিনের কথা।

বলুন না কী বলতে হবে। পুলিশকে একদফা বলেছি।

সেদিন রাতে রিঙ্কু খুন হয়।

হ্যাঁ মশাই। কী নৃশংস ব্যাপার। ফুটফুটে মেয়েটা পাড়া দাপিয়ে বেড়াত। তাকে কেউ ওভাবে খুন করে? লোকটার ফাঁসি নয় মশাই, শূলে চড়ানো উচিত ওকে।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু শূলে চড়াতে গেলে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার।

সোজা কেস মশাই। আমরা সবাই জানি।

কী জানেন?

খুন আর রেপ ওই ভজনই করেছে।

কী ভাবে জানলেন?

রিঙ্কুর তো যাতায়াত ছিলই ওর কাছে। সেদিন সন্ধে থেকে আটকে রেখেছিল ঘরে। তারপর রেপ করার পর মেরে ফেলে।

কী করে বুঝলেন? কোনও চিৎকার শুনেছেন?

চিৎকার! না, সেরকম কিছু শুনিনি।

এ-জায়গাটা খুব নির্জন। রাতে আরও নির্জন। সামান্য শব্দ হলেও শোনার কথা।

তা ঠিক। তবে আমার ঘরে অনেক রাত অবধি টিভি চলে। আমার শাশুড়ি ইনসোমনিয়ার রুগি। তিনি সন্ধে-রাত্তির থেকেই টিভি ছেড়ে বসে থাকেন। টিভি-র শব্দে—।

বুঝেছি। রিঙ্কুকে আপনি সেদিন গ্যারেজে ঢুকতে দেখেছেন?

না, দেখিনি। তবে সাইকেলটা দেখেছি।

সেটা জানি। রিঙ্কু কি খুব ঘন-ঘন গ্যারেজে আসত?

খুব ঘন-ঘন। রোজই আসত।

আপনার কি ধারণা মেয়েটা ভজনবাবুর সঙ্গে ইনভলভড ছিল?

মেয়েটার একটু ফস্টিনস্টি করার মতো ছিল। আর ভজনবাবু তো অতি বাজে লোক। শুনেছি ওর চরিত্রদোষ আছে বলে বউয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে।

ভজনবাবুর সঙ্গে রিঙ্কুর ঘনিষ্ঠতা কীরকম ছিল জানেন?

গাড়ি চালাতে শেখাত, ঢলাঢলিও করত, গ্যারেজে বসে আড্ডা মারত। তাই নিয়ে অশান্তিও হয়েছে।

কীরকম অশান্তি?

পাড়ার ছেলেরা ভজনবাবুর ওপর কয়েকবারই চড়াও হয়েছে।

কেন?

রিঙ্কুর সঙ্গে ওর খারাপ সম্পর্ক বলে।

রিঙ্কুর বাবা কি কখনও ভজনবাবুকে কিছু বলেছে?

শচীনন্দন? ও কি একটা মানুষ? সারাদিন তো চিংড়ির ভেড়িতেই পড়ে থাকত। সংসার ভেসে গেলেও খেয়াল করত না। একটু সাবধান হলে মেয়েটা বাঁচত।

রিঙ্কুর সাইকেলটা খুনের পরদিনও গ্যারেজে ছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনি কি আগের দিন জানতে পেরেছিলেন যে রিঙ্কুকে পাওয়া যাচ্ছে না?

না। আমার কানে আসেনি।

পাড়ার ছেলেরা যখন জানতই যে রিঙ্কু প্রায়ই ভজনবাবুর গ্যারেজে আসে তখন তারা গ্যারেজে রিঙ্কুর খোঁজ করল না কেন বলুন তো।

জানি না মশাই। ওখানেই তো আগে খোঁজা উচিত ছিল।

রিঙ্কু কি কখনও আপনার বাড়িতে আসত?

না। এ-বাড়িতে তার সমবয়সী তো কেউ নেই, কেন আসবে?

ওদের পরিবারকে আপনি কতটা চেনেন?

ভালোই চিনি। আমরা কয়েকজন প্রথম এ-জায়গায় বাড়িঘর পত্তন করি। শচীনন্দন আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু ভালোই আলাপ আছে।

যাতায়াত আছে?

কালেভদ্রে। যে যার ধান্ধায় ব্যস্ত, সময়টা কোথায়? শচী তো থাকেও না এখানে। মাছের ভেড়িতে পড়ে থাকে।

সেই রাতে অস্বাভাবিক কোনও চিৎকার বা শব্দ শোনেননি তো!

না মশাই, মনে তো পড়ছে না।

ভালো করে ভেবে দেখুন তো, রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে কোনও সময়ে খুব কুকুর ডাকছিল কি?

সনাতন মল্লিক ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে সোৎসাহে বলে উঠলেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এগারোটার পরে কিছু কুকুর খুব ডাকছিল বটে। তবে তারা কিন্তু রোজই ডাকে। সেদিন হয়তো একটু বেশি ডাকছিল।

আর কোনও অস্বাভাবিক শব্দ?

না, মনে পড়ছে না।

রিঙ্কুর কোনও বিশেষ ছেলেবন্ধু ছিল কি?

সে আমি কী করে জানব? পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের জিগ্যেস করুন। ওরা হয়তো বলতে পারবে।

আপনার কি মনে হয় ভজনবাবু খুন করতে পারেন?

না পারার কী আছে? ও লোক সব পারে।

আপনার স্ত্রীর অসুখটা কি জটিল?

হার্ট প্রবলেম। অ্যানজাইনা।

আপনার শাশুড়ি তো সারা রাত জেগে থাকেন!

হ্যাঁ।

তিনি মধ্যরাতে কোনও শব্দ শুনেছেন কি?

না। পুলিশ তাঁকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সেই ভয়ে তিনি মধ্যমগ্রামে তাঁর বড় মেয়ের বাড়িতে গিয়ে আছেন।

আপনার স্ত্রী বাড়িতে আছেন?

আছেন।

তাঁকে ডাকুন।

তাঁকেও জেরা করা হয়েছে।

জানি। আমার দু-একটা প্রশ্ন মাত্র।

ডাকছি।

সনাতনবাবু ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। মধ্যবয়স্কা সাধারণ চেহারার ভদ্রমহিলা। মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে।

মাপ করবেন, আপনি অসুস্থ, তবু বিরক্ত করছি।

অসুস্থতা তেমন কিছু নয়। প্রশ্ন করতে পারেন।

ভজনবাবু কেমন লোক?

ভালো নয়। গ্যারেজটার জন্য আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। ওঁকে বলছি বাড়ি বিক্রি করে অন্য জায়গায় বাড়ি করতে।

গ্যারেজের শব্দে আপনার অসুবিধে হত, সে তো বুঝলাম। ভজনবাবুকে কতটা চিনতেন?

চিনতাম একটু-আধটু। দেখতাম প্রায়ই।

দেখে কি মনে হত?

মনে আবার কী হবে! চেহারাটা ভালো। একটা মারুতি গাড়ি করে আসা-যাওয়া করত। ইদানীং তো থাকতই এখানে।

কখনও আলাপ হয়নি?

তা হবে না কেন?

কী সূত্রে আলাপ?

আমরা বছর চারেক হল এ-বাড়ি করেছি। ভজনবাবু তার বছরখানেক আগে এখানে গ্যারেজ করেন। বাড়ি করার মেটেরিয়াল আমরা ওঁর গ্যারেজেই রাখতাম। তখন ওর ব্যাবসা বড় হয়নি।

ওর ক্লায়েন্টরা কীরকম?

ইদানীং তো দেখতাম বেশ বড়লোক মাড়োয়ারিরা আসছে। শুনেছি ওঁর খদ্দেররা বেশিরভাগ বড়লোক।

ঘটনার দিনের কথা মনে আছে?

থাকবে না কেন? তবে আমরা কিছু দেখিওনি, শুনিওনি।

রিঙ্কুকে যে সন্ধেবেলা থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না এ খবর কি জানতেন?

না। আমাদের কেউ বলেনি। রিঙ্কুরা একটু তফাতে থাকে। মাঠের ওপাশে। পাড়াটা আলাদা।

রিঙ্কুকে তো চিনতেন!

হ্যাঁ। ছোট থেকে দেখছি। ওর মা যখন এখানে থাকত তখন কয়েকবার গেছি ওদের বাড়িতে। ওর মা-ও আসত।

মা কেমন মহিলা?

খারাপ তো তেমন কিছু দেখিনি। দেখতে সুন্দর ছিল, আর উগ্র সাজগোজ করত।

আর কিছু?

না। আর কী বলুন!

ভজনবাবু সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারেন?

না।

রিঙ্কু মেয়েটা কেমন ছিল?

ভালো নয়। বড্ড উড়নচণ্ডী।

সে কি খুব ঘন-ঘন ভজনবাবুর কাছে আসত?

হ্যাঁ। রোজ। দুজনের তো খুব ভাব ছিল দেখেছি।

কীরকম ভাব?

মাখামাখি ছিল বেশ।

কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন?

দুজনে গাড়ির সিটে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে গাড়ি চালাত দেখেছি।

রিঙ্কুর অনেক ছেলে-বন্ধু ছিল কি?

ও বাবা, সে অনেক ছিল।

তারা ভজনবাবুকে হিংসে করত না?

করত বোধহয়। গ্যারেজে তো কতবার বোমা পড়ল, হামলা হল। কেন হাঙ্গামা হত কে জানে বাবা।

সেই হামলার লিডারশিপ কে দিত বলতে পারেন?

না। হাঙ্গামা হলে আমরা জানালা দরজা বন্ধ করে দিই। গ্যারেজটার জন্য আমাদের খুব অশান্তি হচ্ছে।

গ্যারেজটা উঠে গেলে কি আপনাদের সুবিধে হয়?

হবে না? খুব হয়। দিন না উঠিয়ে।

ভজনবাবু কনভিকটেড হলে গ্যারেজ উঠেও যেতে পারে।

তাই হোক বাবা। ক'দিন গ্যারেজটা বন্ধ বলে খুব শান্তিতে আছি।

শচীনন্দনবাবু, আপনার শোকটা যে কতখানি তা বুঝতে পারছি। এ সময়ে আপনাকে ডিস্টার্ব করা হয়তো উচিত নয়। আপনার অস্বস্তি হলে আমি আপনাকে প্রশ্ন করবও না।

শচীনন্দনের বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ হলেও শরীরে অতিরিক্ত চর্বির জন্য বয়স্ক বলে মনে হয়। মাথায় টাক। প্রচুর কেঁদেছেন বলে চোখ দুটো এখনও রক্তিম। মুখে গভীর শোকের ছাপ। দৃষ্টিতে শূন্যতা। মাথা নেড়ে শচীনন্দন বলল, না, কোনও অসুবিধে হবে না। কী জানতে চান বলুন।

আপনার ডিভোর্স কত দিন হয়েছে?

বছর সাত-আট।

ডিভোর্সের কারণটা কী?

আমার মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে এ ব্যাপারের কী সম্পর্ক?

হয়তো সম্পর্ক নেই। ইচ্ছে না হলে বলার দরকার নেই।

শচীনন্দন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, টু কাট এ লং স্টোরি শর্ট, আমার স্ত্রী শ্যামলী আর একজন লোকের প্রেমে পড়েছিল।

লোকটা কে?

শুনেছি ওর পূর্বপ্রণয়ী। তার নাম সুজিত।

তাঁরা এখন কোথায় থাকেন?

কানপুর।

রিঙ্কুর খবর তাঁকে দেওয়া হয়েছে কি?

হ্যাঁ। শ্যামলী তো তিন-চার দিন হল চলেও এসেছে। এই বাড়িতেই আছে।

ওঁর হাজব্যান্ডও এসেছেন কি?

না। ওর এ পক্ষের দুটো মেয়েকে নিয়ে এসেছে।

ডিভোর্সের পর উনি রিঙ্কুর কাস্টডি চাননি?

না। বোধহয় সুজিতের ইচ্ছে ছিল না।

শুনেছি আপনি রিঙ্কুর দেখাশোনা করার সময় পেতেন না।

ঠিকই শুনেছেন। আমার ব্যাবসাটা বড়। মাছের ব্যাবসা। একা মানুষ, সামাল দিতে হিমশিম খাই। তবে রিঙ্কুর দেখাশোনা আমার মা আর বাবাই করেন। ঝি-চাকরের অভাব নেই।

শ্যামলীদেবীর সঙ্গে কি আপনার বাবা-মা'র বনিবনা ছিল না?

না। আজকালকার মেয়েরা শ্বশুর-শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু মা-বাবাকে আমি ফেলি কী করে বলুন!

ডিভোর্সের কারণ সেটাই নয়তো?

সেটা অপ্রধান কারণ। আমি শ্যামলীর জন্য আর একটা বাড়ি করে দিচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে তাকালে দেখতে পাবেন বাড়িটা খানিকটা হয়ে পড়ে আছে। বলেছিলাম, কাছাকাছি আলাদা থাকো, তা হলে খিটিমিটিও লাগবে না, সম্পর্কটাও ভালো থাকবে। ও রাজি ছিল। কাজেই ডিভোর্সের কারণ আমার মা-বাবা হতে পারে না।

বুঝলাম। রিঙ্কু সম্পর্কে আপনি কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন?

মেয়েটা চঞ্চল ছিল। ডাকাবুকোও।

অবাধ্য ছিল কি?

একটু ছিল।

আপনাকে কেমন ভালোবাসত?

খুব। বলেই শচীনন্দন দু-হাতে মুখ ঢেকে রইল। কান্না চাপার চেষ্টা করতে লাগল।

শবর চুপ করে বসে রইল।

মিনিট কয়েক পরে ধাতস্থ হয়ে শচীনন্দন বলল, ওর সম্পর্কে পাড়ায় দুর্নাম শুনবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, রিঙ্কু খারাপ ছিল না। আদর পেয়ে-পেয়ে একটু স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছিল মাত্র।

এরকম হতেই পারে। আপনি কি জানেন ভজনবাবুর সঙ্গে ওর কীরকম রিলেশান ছিল?

কী করে বলব? ভজন মাঝে-মাঝে আমার বাড়িতে আসত। একটু গম্ভীর আর চুপচাপ মানুষ। আমার ওকে খারাপ লাগত না।

রিঙ্কু কি কখনও বাড়ির কাউকে জানিয়েছিল যে ও ভজনবাবুকে বিয়ে করতে চায়?

না, সেরকম ভাবে কিছু জানায়নি। তবে—।

তবে কী?

আমার মায়ের কাছে ও প্রায়ই ভজনবাবুর গল্প করত।

কীরকম গল্প?

ভজনকে যে ও খুব পছন্দ করে সেই কথা বলত।

পছন্দটা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছেছিল কি না জানেন?

শচীনন্দন একটু থতমত খেয়ে বলল, আমি মাকে ডাকছি। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।

শচীনন্দন গিয়ে তাঁর মাকে ডেকে আনলেন। মায়ের সঙ্গে ছেলের মুখশ্রীর অদ্ভুত মিল। মা অবশ্য রোগা মানুষ, বয়স মধ্য ষাট। মুখে গভীর শোক থম ধরে আছে।

মাসিমা, কিছু মনে করবেন না।

না বাবা, বলো।

ভজনবাবুর সঙ্গে রিঙ্কুর সম্পর্ক কেমন ছিল?

কী করে বলব? খারাপ কিছু তো মনে হয়নি।

ভজনবাবুকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

তাকেও খারাপ লাগেনি। মিশুকে ছিল না এই যা।

রিঙ্কু কি তাকে ভালোবাসত বলে মনে হয়? মানে রিঙ্কুর কথায় তেমন কিছু ধরা যেত কি?

শচীনন্দনের মা মাথা নেড়ে বললেন, বলতে পারব না বাবা। আজকালকার মেয়েদের কি অত সহজে বোঝা যায়? তা ছাড়া রিঙ্কুর বয়সটাই বা কী বলো! বুদ্ধিশুদ্ধি তো ছিল না।

রিঙ্কু কি বোকা ছিল?

তাও নয়। লেখাপড়ায় বেশ মাথা, কথাবার্তায় চৌকশ, আবার আগুপিছু না ভেবে হুটহাট এক-একটা কাজ করে বসত।

কিছু মনে করবেন না, ভজনবাবু ছাড়া আর কোনও ছেলের প্রতি ওর সফ্‌টনেস ছিল কি?

ওসব জানি না বাবা। তবে ছেলেছোকরাদের সঙ্গে মিশত খুব।

শচীনন্দন বলল, এসব জেনে আর কী হবে? খুনি তো ধরাই পড়ে গেছে।

সেটা ঠিক। তবে আমাদের কেস সাজাতে হলে সব রকম সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে নিতে হবে। কোনওখানে ফাঁক থাকলে সেই রন্ধ্র দিয়ে দোষী পার পেয়ে যায়।

পার পেয়ে যাবে কোথায়? পুলিশ ছাড়লেও এ-পাড়ার লোক ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

মৃদু হেসে শবর বলল, হ্যাঁ, জনগণের আদালতে তো সেরকমই হয়। শচীনন্দনবাবু, ভজনবাবুর গ্যারেজে বারকয়েক হামলা হয়েছে। কেন জানেন?

চাঁদার জন্য। ব্যাবসা করলে বেকার ভাতা না দিয়ে রেহাই নেই। সেটা নিয়েই গন্ডগোল। ও তো মারও খেয়েছে।

কে মেরেছিল?

হাবু আর জগুর দল।

আর কারও সঙ্গে ভজনবাবুর শত্রুতা ছিল কি?

গ্যারেজটার জন্য পাড়ার লোকেদের অসুবিধে হচ্ছিল। আরও কী-কী সব যেন, অত ডিটেলসে জানি না। তবে অশান্তি ছিলই।

ভজনবাবু কি একটু মারকুট্টা একরোখা লোক?

তা বোধহয় একটু আছে।

ব্যক্তিগতভাবে আপনি কি মনে করেন যে ভজনবাবুই আপনার মেয়েকে ওরকম নৃশংসভাবে মেরেছে?

শচীনন্দন অনেকক্ষণ ভাবল। খুব চিন্তিত। তার পর মৃদু গলায় বলল, আর কে মারবে?

সম্ভাবনার কথা বলছি।

আপনারা কি আর কাউকে সন্দেহ করছেন?

আরে না।

আমার মেয়েকে মেরে কার কী লাভ বলুন! রিঙ্কু হয়তো দুষ্টু একটু ছিল, কিন্তু এত বড় শাস্তি ওর হল কেন? মেয়েটা আমার—।

শচীনন্দন হঠাৎ কান্নায় কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

মা এসে ছেলেকে দু-হাতে ধরে বলল, ওকে এবার রেহাই দাও বাবা। গত আটদিন ধরে ওর যে কী অবস্থা!

ঠিক আছে মাসিমা।

আপনি কি তদন্তের ব্যাপারে কথা বলবেন?

শ্যামলী নামক মহিলাটির মুখে শোক ও রাগের মাখামাখি লক্ষ করল শবর। রাগটাই বেশি। বেশ সুন্দর ঢলঢলে মুখশ্রীতে একটু কাঠিন্যও আছে। গম্ভীরভাবে শবরের দিকে চেয়ে বলল, আপনাদের উচিত রিঙ্কুর বাবাকেও অ্যারেস্ট করা।

কেন?

কেন সেটা আবার জিগ্যেস করছেন। ব্যাবসা-ব্যাবসা করে স্বার্থপর লোকটা মেয়েটার দিকে একটু নজরও রাখল না! ও যদি মানুষ হত তা হলে মেয়েটার এ রকম পরিণতি হত বলে ভাবেন?

আপনি একটু শান্ত হন।

শান্ত হব? কী ভেবেছেন আপনারা? খুনির ফাঁসি হোক, একশোবার হোক, কিন্তু যার অবহেলার ফলে আমার ফুলের মতো মেয়েটা মরল সে কেন রেহাই পাবে?

ঠিক কথা। সে-প্রশ্ন আপনাকে আমারও করতে ইচ্ছে করছে।

তার মানে?

আপনি যখন শচীনন্দনবাবুকে ছেড়ে চলে যান তখন রিঙ্কু মাইনর। আপনি ইচ্ছে করলেই তো মেয়েকে নিয়ে যেতে পারতেন। নেননি কেন?

নিইনি বলেই মেয়েটাকে অবহেলা করা হবে? শুধু আমারই তো মেয়ে নয়, ওরও তো!

এটা আমার প্রশ্নের জবাব হল না। আমি জানতে চাই, আপনি মেয়েকে নেননি কেন?

মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে শ্যামলী বলল, আমার অসুবিধে ছিল।

কীরকম অসুবিধে?

এ-প্রশ্নের জবাব কি দিতেই হবে?

না দিলেও কিছু করার নেই। ইচ্ছে না হলে বলবেন না।

আমার সেকেন্ড হাজব্যান্ড রাজি ছিল না।

আপনি কানপুরে থাকেন?

হ্যাঁ।

অত দূর থেকে মেয়ের খবর কীভাবে নিতেন?

চিঠি লিখে।

শচীনন্দনবাবুকে চিঠি লিখতেন?

না।

তা হলে?

পাড়া-প্রতিবেশীদের লিখতাম।

পার্টিকুলারলি কাকে?

সে আছে। রিঙ্কু একটু বড় হওয়ার পর ওকেই লিখতাম।

রিঙ্কু জবাব দিত?

হ্যাঁ।

সে কি আপনার জন্য ফিল করত?

নিশ্চয়ই।

আপনার ডিভোর্স কতদিন হয়েছে?

আট বছর।

রিঙ্কুকে আপনি কত বছর দেখেননি?

চার বছর আগে এসে দেখে গেছি।

চার বছর লম্বা সময়। মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হত না?

হবে না! সবসময়ে তো ওর কথা ভাবতাম। কিন্তু ওখানে আমার নিজস্ব একটা ব্যাবসা আছে।

কীসের ব্যাবসা?

বাচ্চাদের ড্রেস তৈরির ব্যাবসা।

টাকা কে দিয়েছিল?

সুজিত—মানে আমার হাজব্যান্ড।

উনি কি আপনার আগের চেনা?

হ্যাঁ। ছেলেবেলা থেকে।

ওকেই আগে বিয়ে করলেন না কেন?

সেটা দিয়ে এই তদন্তে কী দরকার?

কখন কোনটা কাজে লাগে তার ঠিক কী?

বিয়ে করিনি বাধা ছিল বলে।

কীসের বাধা?

আমার বাবা রাজি ছিলেন না।

কেন, জাতের বাধা ছিল?

না।

তবে?

সুজিতকে আমার বাবা পছন্দ করতেন না।

আপনার বাবা বেঁচে আছেন?

না।

ঠিক আছে, আমি আপনার আর সময় নষ্ট করব না।

লোকটার ফাঁসি কবে হবে?

কার ফাঁসি?

ওই লোকটার। যে আমার মেয়েকে খুন করেছে!

ফাঁসি দেওয়ার মালিক আমি নই।

ওকে আমার হাতে ছেড়ে দেবেন?

কেন?

আইনের ফাঁক দিয়ে হয়তো বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমার হাতে ছেড়ে দিন।

কী করবেন?

খুন করব।

শবর হাসল, লোকটাকে কেউই পছন্দ করে না দেখছি।

পছন্দ করার কথা নাকি? রেপ আর খুন দুটোর জন্য তো আর দুবার ফাঁসি হবে না। আমার হাতে ছেড়ে দিলে আমি আগে একটা-একটা করে ওর চোখ ওপড়াব, জিব টেনে ছিঁড়ব, পুরুষাঙ্গ কাটব...।

দাঁড়ান, অত উত্তেজিত হবেন না। অপরাধ এখনও প্রমাণ হয়নি।

সেটা আপনাদের ইনএফিসিয়েন্সির জন্য হয়নি। অত বড় একটা অন্যায় করল আর আপনারা এখনও প্রমাণই করতে পারলেন না।

আমরা অযোগ্য হতেই পারি। কিন্তু তবু এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা ভালো নয়।

সেইজন্যই তো বলছি, ওকে না হয় জামিনেই ছেড়ে দিন কয়েক দিনের জন্য।

ওকে মারলে আমাদের যে আপনাকে ধরতে হবে।

ধরবেন। মরতেও রাজি।

আপনি অযথা রেগে যাচ্ছেন।

অযথা? আপনার মেয়ে আছে?

থাকার কথা নয়। আমি বিয়ে করিনি।

তা হলে বুঝবেন কী করে?

মেয়ের বাবা নই বলে কি আপনাদের দুঃখের কারণটা বুঝতে পারব না?

ওর গ্যারেজটায় আমি আগুন লাগাব।

শবর শুধু হাসল।

শ্যামলী বলল, আচ্ছা, ওর সঙ্গে লক আপ-এ গিয়ে দেখা করতে দেবেন?

দেখা করতে চান?

খুব চাই। দরকার হলে ঘুষ দেব।

ঘুষ দিতে হবে না। তবে আমি চেষ্টা করব।

সত্যি করবেন?

করব।

থ্যাংক ইউ।

॥ তিন ॥

ছবিটা কার মিস্টার দাশগুপ্ত?

রিঙ্কু নামে একটা মেয়ের।

ও, সেই বারাসাতের মার্ডার কেসটা না?

হ্যাঁ, ছবিটা কেমন দেখছেন?

মেয়েটা তো দেখতে স্মার্ট অ্যান্ড লাভলি।

আর কিছু?

একটু দুষ্টু ছিল বোধহয়?

হ্যাঁ, তা ছিল।

আচ্ছা দাশগুপ্ত, এটা তো রাজ্য পুলিশের ব্যাপার, আপনি কেন ওদের কেস-এ ফেঁসে যাচ্ছেন? ইউ আর গোয়িং আউট অব ইওর বাউন্ডস টু হেল্প দেম, তাই না?

শবর একটু হাসল, হ্যাঁ মিস্টার ঘোষাল, ব্যাপারটা তাই।

এই এক্সট্রা দায়িত্ব নিলেন কেন? মেয়েটা কি আপনার চেনা?

না মশাই, আমি ফ্যাক খাটছি বলতে পারেন।

কিন্তু কেন?

রজতদার জন্য।

রজতদা মানে? ডি আই জি রজত গুপ্ত?

হ্যাঁ।

আপনাদের বদ্যিতে-বদ্যিতে বেশ ভাব, তাই না?

শবর হাসল, ঠিকই বলেছেন। বদ্যিরা অপেক্ষাকৃত স্মল কমিউনিটি, আর একটু বোধহয় ক্ল্যানিশও।

রজতবাবু নিশ্চয়ই আপনার আত্মীয় হন?

দূর সম্পর্কের।

ওই তো, বদ্যিরা সবাই সবার আত্মীয়, আর এ-মেয়েটা কি রজতবাবুর কেউ হয়?

না।

তা হলে ওঁর ইন্টারেস্ট কীসের?

ইন্টারেস্ট কেন তা আমি জানি না। আই ওয়াজ আসকড টু হেলপ।

সবই জানেন মশাই, বলবেন না।

শবর হাসল।

ছবিটা স্টাডি করছেন কেন?

ছবি অনেক সময় অনেক কথা বলে।

কেসটা কি খুব জটিল? মার্ডারারকে তো ধরেছেন।

আমি ধরিনি। লোকাল পুলিশ ধরেছে। সময়মতো না ধরলে লোকটা গণপিটুনিতেই খুন হয়ে যেত।

লোকে আজকাল বড্ড বেশি আইন হাতে নিচ্ছে।

হ্যাঁ। তার জন্য ওভার অল পরিবেশটাই দায়ী। লোকে পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়েছে। আইনের ওপর বিশ্বাস নেই, দেশে চোর ডাকাত খুনিও তো বাড়ছে।

হুঁ। লোকটার এগেনস্টে কেস দেওয়া হয়েছে?

না, তবে কেস জোরালো। প্রমাণ হয়ে যাবে।

তা হলে আর ভাবনা কী? কেস তো সোজা।

তা ঠিক, কিন্তু লোকটার কনফেশন বের করা গেল না।

তার কি কোনও প্রয়োজন আছে?

শবর একটু আনমনা চোখে ঘোষালের দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, মানুষ কতটা পেন সহ্য করতে পারে বলুন তো! আপনি তো এ বিষয়ে স্টাডি করেছেন।

হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?

কারণ আছে।

বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের বিভিন্ন সহ্যশক্তি। চিনাদের একটু বেশি সহ্যশক্তি আছে। ট্রাইবালদের মধ্যেও ফিজিক্যাল পেন সহ্য করার ক্ষমতা অনেক বেশি। কেন বলুন তো!

এই মার্ডার কেসের সাসপেক্ট ভজন আচার্য একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। ব্রাহ্মণরা নাকি খুব বেশি ব্যথা সইতে পারে না! মহাভারতে কী একটা গল্প আছে না?

হ্যাঁ, সেই বজ্রকীটের দংশনের গল্প তো! ব্রাহ্মণরা বোধহয় পেন সহ্য করার খুব বেশি ক্ষমতা রাখে না।

এ-লোকটা তা হলে এক্সেপশন।

তার মানে?

দিস ম্যান ওয়াজ ব্রুটালি মলড্ বাই দি পাবলিক দ্যাট ডে। কিন্তু হি কেপ্ট হিজ কুল কম্পোজার। ইনজুরি ছিল মারাত্মক, তবু কোনওরকম এক্সপ্রেশন ছিল না। হাবু বলে একটা গুণ্ডা

আছে ওখানে। সে আর লোকাল মস্তানেরাও ওকে বার দুই মেরেছে। একবার প্রচণ্ডভাবে, রড, পানচ্ সবই ব্যবহার করা হয়। হাবু আমাকে বলেছে, ভজন অত মার খেয়েও গ্যারেজের মুখে দাঁড়িয়ে তাদের আটকেছে। যে দিন ডেডবডি পাওয়া গেল সেদিনও হাটুরে মার খায় লোকটা। হাসপাতালে দিতে হয়েছিল।

হিরো নাকি?

না, হিরো বলা যায় না। তবে অদ্ভুত।

আর পুলিশের থার্ড ডিগ্রি?

হ্যাঁ, সেই কথাতেই আসছিলাম। খুনের আগের রাতে ওর গ্যারেজের ঘরে একটা মেয়ে ছিল। স্ট্রং সাসপিশন, মেয়েটা রিঙ্কু। কিন্তু ভজন আচার্যিকে দিয়ে সেটা বলানো যায়নি। গত কিছুদিনের মধ্যে লোকটাকে বারকয়েক ইনহিউম্যান টর্চার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু লোকটার যেন ফিজিক্যাল সেন্স বলে কিছু নেই। এরকম কি হতে পারে?

কারও-কারও সহ্যের ক্ষমতা খুব বেশি থাকতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছেন?

বুঝতে পারছি না।

যতদূর শুনেছিলাম, আপনাদের হাতে প্রমাণ সব এসে গেছে।

হ্যাঁ। লোকটা রেহাই পাবে না। আপনি বোধহয় জানেন না, লোকটা আবার স্যাডিস্ট। অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়।

তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং?

ওর স্ত্রী বলেন, লোকটার সেক্স খুব উগ্র এবং ভায়োলেন্ট, শি লেফট হিম ফর দ্যাট।

মাই গড!

রিঙ্কুকে খুন করার পিছনে এই স্যাডিজম ছাড়া আর কোনও মোটিভ পাচ্ছি না।

কেন, রেপ!

হ্যাঁ, রেপ। কিন্তু লোকটার অত সেক্স সত্ত্বেও সে প্রস কোয়ার্টারে যেত না কেন বলুন তো!

মে বি হি হ্যাড স্টেডি গার্ল ফ্রেন্ড। হাফগেরস্তও তো আছে। তাদের তো প্রস কোয়ার্টারে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া রেড লাইট এরিয়া তো বিশাল এবং সংখ্যাও কম নয়। সব কি খুঁজে দেখা সম্ভব?

তা ঠিক, সম্ভাব্য জায়গাগুলিতেই খোঁজ করা হয়েছে।

আপনি এত ব্রড অ্যাঙ্গেলে ভাবছেন কেন?

শবর মাথা নেড়ে বলল, ভাববার কোনও মানে হয় না।

এবার ঘোষালও একটু হাসল, মিস্টার দাশগুপ্ত, আমি আপনাকে চিনি। আপনার কোথাও একটা খিঁচ থেকে যাচ্ছে।

না, খিঁচ নয়। একটা কথা বলবেন?

কী কথা?

ভজন রেপ করে রিঙ্কুকে মার্ডার করল। কিন্তু তারপর সে স্পটে রয়ে গেল কেন? ও তো রাতেই কলকাতায় চলে আসতে পারত।

ইজি। কলকাতায় পালিয়ে এলে ওর ওপর সন্দেহ আরও বাড়ত। হয়তো ভেবেছিল, ভালোমানুষটি সেজে থাকলে লোকে সন্দেহ করবে না।

হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। সেটাই সম্ভব।

আপনার কোনও জায়গায় গ্যাপ আছে বলে মনে হচ্ছে কি?

শবর একটু চিন্তিত ভাবে বলল, না, ঠিক তা নয়। গ্যাপ কিছু নেই। কিন্তু কেসটা বড্ড সোজা আর সরল।

তা তো হতেই পারে। আমাদের দেশের ক্রিমিনালরা তো আর মাথা বেশি খাটায় না। তাদের বেশিরভাগ কাজই মোটা দাগের। আপনি অত ভাবছেন কেন?

শবর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভাবছি একটা কথা।

কী বলুন তো!

ভজন আচার্যি রোজ সকালে পাড়ার কুকুরদের ডেকে পাঁউরুটি খাওয়াত। কলকাতাতেও, বারাসাতেও।

সো হোয়াট? হি লাভড ডগস। এ তো হতেই পারে।

কলকাতায় একবার একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে ঠ্যাং ভাঙে। তাকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সি করে ভেটারনারি হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ভালো করে এনেছিলেন ভজনবাবু। উনি এসপিসিএ-র মেম্বার এবং অ্যানিম্যাল লাভার।

ঘোষাল একটু থমকাল, তারপর বলল, তা হলে তো ভাবতে হচ্ছে। অ্যানিম্যাল লাভাররা হোমিসাইড করতে পারবে না তা নয়। স্প্লিট পারসোনালিটি হতে পারে। তবে ইটস এ পয়েন্ট টু পন্ডার। কেসটা ডিটেলসে বলবেন?

শবর বলল।

রিঙ্কুর ছবিটা ভালো করে দেখে ঘোষাল বলল, হাউ ওল্ড ওয়াজ শি? সিক্সটিন?

হ্যাঁ।

ও কি ভজনবাবুকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?

হ্যাঁ।

তা হলে একটু ভাবতে হচ্ছে। পুলিশ কি এই অ্যাঙ্গেলটা দেখেনি?

লোকাল পুলিশ এত দেখতে চাইছে না। তাদের কাছে এটা একটা ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। ভজন আচার্যি কনভিকটেড হলে তারা বাহবা পাবে। একটা সলভড মার্ডার কেসকে কে কাঁচিয়ে দিতে চায় বলুন।

ঘোষাল একটু হেসে বলল, তা তো বটেই। আপনি কী করতে চান?

বুঝতে পারছি না।

রিঙ্কুর পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দেখেছেন?

হ্যাঁ।

স্টমাকে কিছু পাওয়া গেছে?

কী পাওয়া যাবে?

ধরুন অ্যালকোহল।

হ্যাঁ।

বয়ফ্রেন্ডদের ক্রস করেছেন?

দুজনকে। দুজনেরই ফুলপ্রুফ অ্যালিবাই আছে। কেউ-ই সেই রাতে বারাসাতে ছিল না। একজন শিলিগুড়ি গিয়েছিল দু-দিন আগে। অন্যজন আগের দিন মামাবাড়ি কোন্নগর।

আর কেউ?

না।

আচ্ছা, ডাক্তারি রিপোর্টে রেপ-এর রিপোর্টটা কী রকম? সিঙ্গল রেপ না গ্যাং রেপ?

সিঙ্গল।

ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল?

অ্যাপারেন্টলি।

ওয়াজ ইট হার ফার্স্ট টাইম?

হ্যাঁ, মেয়েটা উড়নচণ্ডী হলেও সেক্সটা আগে হয়নি।

আপনাকে জিগ্যেস করা উচিত নয়, তবু বলি, মেয়েটা নখ দিয়ে কাউকে খামচে দিয়েছিল কি না বা রেপিস্টের লালা বা লোম বা চুল কিছু পাওয়া গেছে কি না তা দেখেছেন?

হ্যাঁ। নখে দু-একটা হিউম্যান টিসু পাওয়া গেছে।

ভজনের সঙ্গে মিলেছে?

মেলানোর চেষ্টা হচ্ছে। স্টিল আন্ডার প্রসেস। তবে আমি যতদূর জানি, লোকাল পুলিশ আমাকে মুখে বললেও কাজে টিসু পরীক্ষা করা হচ্ছে না। ওঁরা এত ডিপে যাবেই বা কেন?

অর্থাৎ ভজনকে ওরা ঝোলাবেই?

হ্যাঁ।

দেন লেট দেম হ্যাঙ হিম।

তাই তো দিচ্ছি মিস্টার ঘোষাল। লোকটা হয়তো সত্যিই কাণ্ডটা করেছে কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে ব্যাপারটা প্রমাণ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হচ্ছে জিংগসটা একজন ভাঙলেও ভাঙতে পারে। কিন্তু সেই বিশেষ একজন খুবই স্টাবোর্ন।

কে লোকটা?

ওর স্ত্রী।

কী ভাবে? ওঁর স্ত্রী তো ওঁকে ঘেন্না করে শুনলাম।

হ্যাঁ তা করে।

তাহলে?

ভজনবাবু তাঁর স্ত্রীকে ঘেন্না করেন না।

তাহলে কী দাঁড়াল?

ডিফিকাল্ট ব্যাপার।

ভজনবাবু তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে কী বলেন?

তেমন কিছু নয়। আমি জিগ্যেস করেছিলাম ওঁর স্ত্রী কেন চলে গেলেন? ভজন সংক্ষেপে বলেছেন, আমার দোষে। শত চাপাচাপিতেও দোষটা অবশ্য কবুল করেননি। স্ত্রীর প্রতি অ্যাটিচুড কেমন তা জিগ্যেস করায় বলেছেন ও ভালো মেয়ে, আমি খারাপ।

ব্যস?

হ্যাঁ।

তাহলে ওঁর স্ত্রী কী করবেন?

ভজনবাবুকে ঘিরে একটা রহস্য রয়েছে। ওঁর ওই চুপচাপ থাকা, জেদি মনোভাব আর মার খাওয়ার ক্ষমতা আমাকে সমস্যায় ফেলেছে।

তাই তো দেখছি।

আমি যদি বিভাবরীকে রাজি করাতে পারতাম এবং উনি যদি লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলতেন তা হলে একটা কিছু বেরিয়ে আসতে পারত।

এটা কী করে বলছেন?

জাস্ট এ হান্‌চ্‌।

ও।

আরও একজন মহিলা ভজনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

তিনি কে?

রিন্টুর মা। শ্যামলী।

তিনি কেন দেখা করবেন?

বোধহয় ভজনবাবুকে নিজের হাতে খুন করতে চান।

আপনি রাজি হয়েছেন নাকি?

হয়েছি।

কেন?

ভজনবাবুকে শক দেওয়ার কোনও চেষ্টাই আমি ছাড়ছি না।

ও। আপনি সব সময়ে ডেনজার নিয়ে খেলা করেন।

অ্যান্ড হোয়াই নট?

ঘোষাল হাসল, ইটস ওকে ইফ ইট পে'জ। কিন্তু এসব তো পণ্ডশ্রম।

মনে হচ্ছে তাই।

বাই দি বাই, রেপ করার সময় যদি রিঙ্কু ভজনবাবুকে বাধা দিয়ে থাকে তা হলে ভজনবাবুর গালে বা গলায় পা পিঠে বা হাতে নখের দাগ থাকার কথা।

নিশ্চয়ই। তবে গণপ্রহারে ভজনবাবুর সারা শরীর এমনই ক্ষতবিক্ষত ছিল যে রিঙ্কুর নখের দাগের মতো সূক্ষ্ম জিনিস খোঁজা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার সামিল।

তাও তো বটে।

আরও একটা কথা।

কী বলুন তো!

রিঙ্কু যদি ভজনের প্রেমেই পড়ে থাকে তা হলে সেক্স-এর সময় বাধা দেবে কেন?

কিন্তু আপনিই তো বললেন যে ভজন ভায়োলেন্ট লাভার।

হ্যাঁ।

সেক্ষেত্রে বাধা দিতে পারেই।

সেটা ঠিক। তবু সব দিক ভেবে দেখতে হচ্ছে।

চার্জশিট তো নিশ্চয়ই ফাইল করা হয়নি?

না।

ভজনবাবু উকিল নিয়েছেন?

হ্যাঁ। ওর পরিবার জামিন চেয়েছে।

এখন আপনার অ্যাঙ্গেল অফ থটটা কী?

মাথা নেড়ে শবর বলল, আই অ্যাম ইন কনফিউশন।

শবর দাশগুপ্তর মুখে এ-কথা শুনব বলে ভাবিনি।

শবর মৃদু হেসে বলল, ঘটনাবলি নয়, আমাকে কনফিউজ করছে লোকটা। ভজন আচার্য।

লোকটাকে কি আপনার ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে না?

তা বলছি না। হতেই পারে।

রজতদা আসলে কী চাইছেন বলুন তো!

রজতদা ভেঙে কিছু বলেননি। তিনি আমাকে শুধু বলেছেন, এ-কেসটায় আমার একটা পারসোনাল ইন্টারেস্ট আছে। তুমি প্যারালেল ইনভেস্টিগেশন করো। আমি লোকাল থানাকে বলে দিচ্ছি তোমার সঙ্গে কো-অপারেট করতে।

ওঁর ইন্টারেস্টটা কোন দিকে তা বুঝতে পেরেছেন? ভিকটিম না সাসপেক্ট?

সম্ভবত সাসপেক্ট।

মাই গড! তাই আপনি মুশকিলে পড়েছেন!

অনেকটা তাই। ছবিটা আবার দেখুন তো দাদা।

ঘোষাল রঙিন ছবিটা তুলে নিয়ে দেখল। গায়ে একটা পোলকা ডটওয়ালা ঢিলা কামিজ,

পরনে নীল জিনস, একখানা সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো, পিছনে একটা মাঠ। মেয়েটার মুখে একটু হাসি।

কিছু মনে হয়?

না। ছবি তো স্থির জিনিস। একটা এক্সপ্রেশন মাত্র। এ থেকে কী বোঝা যাবে বলুন!

ইজ শি সেক্সি?

টিন এজাররা সবাই বয়সের গুণেই অ্যাট্রাকটিভ। যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা।

আমি মহিলাদের ব্যাপারে একটু অনভিজ্ঞ, তাই জিগ্যেস করলাম।

অনভিজ্ঞ থাকার দরকারটা কী? বয়স তো বোধহয় একত্রিশ-বত্রিশ হল!

ওরকমই।

তাহলে টোপরটা এ-বেলা পরে ফেললেই তো হয়।

ঘোষালদা, নিজের কথা ভুলে যাচ্ছেন। বছরখানেক আগেও আপনি ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে আতঙ্কিত ছিলেন।

হ্যাঁ দাশগুপ্ত, সেবার আপনি আমার পাশে না দাঁড়ালে মরতে হত।

ফ্যামিলি লাইফকে আমি একটু ভয় পাই।

ভয়ও আছে, ভরসাও আছে।

আমার এরকমই ভালো লাগে। সিঙ্গল, অ্যাকটিভ, ফ্রি।

দাঁড়ান আমার বউকে আপনার পেছনে লাগাব। সে খুব ভালো ঘটকী।

সর্বনাশ! আমি ওর কাছে যাব! একটা রেপিস্ট, খুনির কাছে আমি যাব কেন শবরবাবু? আমার তো ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই।

জানি, সব জানি। আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই।

কী সেটা?

সেদিন রাতে উনি সত্যিই রিঙ্কুর সঙ্গে কথা বলছিলেন কি না।

ওবভিয়াসলি রিঙ্কু। আর কে হবে!

মানছি। কিন্তু তবু সন্দেহের কোনও অঙ্কুর আমি রাখতে চাইছি না।

এটা আপনার বাড়াবাড়ি।

কোনও কিছুই বাড়াবাড়ি নয়। সত্যের শিকড়ে পৌঁছানো সব সময়েই কঠিন।

সত্যকে আপনি স্বীকার করতে চাইছেন না।

সত্য হলে অবশ্যই স্বীকার করব।

কিন্তু আমাকে টানাটানি করছেন কেন?

জেরা বা রুটিন প্রশ্ন করে ভজনবাবুর কাছ থেকে কিছুতেই কথাটা বের করা যাচ্ছে না। আপনি হয়তো জানেন না লোকটার সহ্যশক্তি অসীম। আমি কাউকে এত ফিজিক্যাল টর্চার সহ্য করার পরও এত শান্ত থাকতে দেখিনি।

তাতে কী হল?

লোকটাকে ক্র্যাকডাউন করাটাই আমার স্বার্থ। কেসটার যা অবস্থা ভজনবাবুর রেহাই পাওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি ওঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি না। লোকটার ফাঁসি হোক কি যাবজ্জীবন আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু লোকটার কাছ থেকে কথাটা বের করা যাবে না কেন?

এটা কি আপনার জেদ বা প্রেস্টিজ ইসু?

না একেবারেই তা নয়।

মেয়েটা যে রিঙ্কুই তা আপনার মনে হচ্ছে না কেন?

মনে হচ্ছে। আবার হচ্ছেও না।

বড্ড হেঁয়ালি করেন আপনি। আমার তো মনে হচ্ছে ভজন আপনাকে ঘুষ দিয়েছে।

শবর হাসল, মনে রাখবেন ভজনবাবু গুণ্ডা বদমাশদের হাতে মার খেয়েও তাঁদের চাঁদা দেননি। ঘুষ দেওয়ার লোক নন।

আমাকে কী করতে হবে?

জাস্ট মিট হিম।

মিট করে কথা-টথা বলতে হবে তো!

তা হবে।

কী বলব তখন?

যেমন মনে হয় বলবেন। প্রম্পট করার বা শিখে-পড়ে যাওয়ার দরকার নেই।

আমি যে ওর ওপর ভীষণ রেগেও আছি।

তা থাকুন না। কী যায়-আসে তাতে?

কোন লাইনে কথা বলতে হবে তা তো বুঝতে পারছি না।

নানা ধরনের কথা হতে পারে। বুদ্ধি খাটিয়ে বলবেন। বলার চেয়েও শোনাটা বেশ জরুরি।

ও আমাকে সব বলবে কেন?

উনি কারও সঙ্গেই কথা বলছেন না বিশেষ। আপনার সঙ্গেও না বলতে পারেন। তবে আমার একটা ধারণা, উনি আপনার ওপর টর্চার করেছেন বলেই একটু অপরাধবোধ থাকতে পারে।

নরপশুদের অনুতাপ থাকে না। রিঙ্কুকে মেরে কি ও অনুতপ্ত?

এ-প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। আপনি লোকটাকে দেখে বুঝতে চেষ্টা করুন।

আমার কী দরকার?

দরকারটা তো আপনার নয়, আমার।

আপনি আমাকে বড্ড মুশকিলে ফেললেন। আচ্ছা, একটা শর্তে দেখা করব।

কী শর্ত?

আমি আপনার কথা মানছি, বদলে আমাকে সাক্ষী হওয়া থেকে রেহাই দেবেন।

শর্তটা বেশ কঠিন। আমি চেষ্টা করব।

আপনি কি জানেন যে আপনি খুব নাছোড়বান্দা লোক?

জানি। আমার কাজটাই আমাকে আনপপুলার করে তোলে।

আমি কিন্তু আপনাকে ডিজলাইক করিনি। বরং আপনি হেটো মেঠো পুলিশের মতো নন বলে ফ্রিলি কথাও বলেছি।

তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

কবে যেতে হবে?

আজ এবং এখনই।

আমার যে ভয় করছে!

ভয় কী? লোকটা শোওয়ার ঘরে নরপশু হলেও এমনিতে এ সিক ম্যান।

তবু নার্ভাস লাগছে।

আমি কাছাকাছি থাকব।

গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা হবে তো।

শবর হেসে বলল, আপনি চাইলে তাই হবে। তবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে যদি চিন্তিত না হন তা হলে আমার ইচ্ছে আপনাদের দেখাটা হোক পুলিশ কাস্টডির বাইরে কোথাও।

সে কী! পুলিশ ওকে ছেড়ে দেবে?

আইনত ছাড়বে না। তবে আমার আন্ডারটেকিং-এ ছাড়বে। চলুন।

ঠিক আছে। সব রিস্ক কিন্তু আপনার।

নিশ্চয়ই।

আপনার খুব আত্মবিশ্বাস, তাই না?

না মিস ভট্টাচার্য, আত্মবিশ্বাস নয়। শুধু লজিক্যাল।

ঠিক আছে চলুন। আমি পোশাকটা পালটে আসছি। গাড়ি আছে?

আছে। পুলিশের জিপ।

ওতেই হবে।

শবর যখন বিভাবরীকে নিয়ে বেরল তখন বেলা দুটো। পথে বিভাবরী তেমন কথাটথা বলল না। শবর জিগ্যেস করল, স্টিল ফিলিং নার্ভাস?

হ্যাঁ।

ওঁর প্রতি আপনার ঘেন্নার ভাবটা এখনও আছে?

থাকবে না? আমি ভুলতে পারি না।

শবর গাড়ি চালাতে-চালাতে বলল, থানায় নয়, বারাসাতের একটা ফাঁকা বাড়িতে আপনাদেব দেখা হবে।

আপনি খুব রিস্ক নিচ্ছেন কিন্তু। থানাই ভালো ছিল। আমি সেফ ফিল করতাম।

আপনি সেফটি নিয়ে ভাববেন না। ইউ উইল বি সেফ।

বিভাবরী চুপ করে রইল।

॥ চার ॥

শবর যে বাড়িটায় নিয়ে এল বিভাবরীকে তা যে বড়লোকের বাগানবাড়ি তা দেখলেই বোঝা যায়। চারদিকে অনেকটা জমিতে ভারী সুন্দর নিবিড় গাছপালা। সামনে ফুলের বাগান। এই বর্ষাকালের শেষেও বাগানে ফুলের অভাব নেই। বাংলো প্যাটার্নের চমৎকার বাড়ির সামনে একটা মনোরম বারান্দা। তার পর ঘরটর।

এটা কার বাড়ি শবরবাবু?

একজন বড়লোকের। কেউ থাকে না। ফাঁকা পড়ে থাকে। শুধু মালি আছে।

জিপটা একেবারে বারান্দার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। শবর জিপ থেকে নেমে বলল, আসুন।

কেউ নেই তো এখানে দেখছি।

আসবে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

ভিতরে ঢুকে বিভাবরী চারদিকে চেয়ে দেখল। বৈঠকখানাটা কী সুন্দর করে যে সাজানো! বেশি আসবাব নেই। কিন্তু, রুচির পরিচয় আছে।

এখানে নয়, ভিতরের ডাইনিং হল-এ।

বিভাবরী বলল, ঠিক আছে।

ডাইনিং হলটাও দারুণ সাজানো। গ্লাস টপ মস্ত খাবার টেবিল ঘিরে গদি আঁটা চেয়ার। ভারী নরম। এয়ার কন্ডিশনার চলছে বলে ভ্যাপসা গরম থেকে এসে ভারী আরাম বোধ করল বিভাবরী। চারদিক নিস্তব্ধ।

কী খাবেন? চা, কফি বা কোল্ড ড্রিংক?

জল খাব। আর কিছু নয়।

একজন পরিচ্ছন্ন পরিচারক ট্রেতে একটা টাম্বলার আর ঝকঝকে কাচের গেলাস এনে রাখল সামনে। বিভাবরী খানিকটা জল খেয়ে বুঝল তার তেষ্টাটা নার্ভাসনেসের। বারবার তেষ্টা পাবে।

শবর তাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, আমি বা আর কেউ আর আসব না। ঘাবড়াবেন না। জাস্ট ফেস হিম অ্যান্ড টক।

বিভাবরী একটু হাসবার চেষ্টা করল, পারল না।

খাওয়ার ঘরের পিছন দিককার দেয়াল জুড়ে বিশাল চওড়া-চওড়া জানালা দিয়ে পিছনের সবুজ বাগান আর গাছপালার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। শুধুই সবুজ যেন ছেয়ে আছে চারদিক। ঘরে বাইরের প্রাকৃতিক আলো আসছে। আজও একটু মেঘলা বলে ঘরের আলোটার তীব্রতা নেই।

বিভাবরী বারবার ঘড়ি দেখছে। এক-একটা মিনিট যেন এক-একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। বিভাবরী ঢোক গিলছে বার-বার। একটু করে জল খাচ্ছে। ভাবছে লোকটাকে যে কী বলবে। মাথাটা এত তালগোল পাকিয়ে আছে যে, সে কথা বলতে পারবে কি না সেটাই সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় বৈঠকখানার দিককার ফ্লাশ ডোর খুলে দুজন পুলিশ ঢুকল। ঢুকে দরজার দুদিকে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক সেকেন্ড বাদে ক্রাচে ভর দিয়ে যে লোকটা অতি কষ্টে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে চেনার উপায় নেই যে, এ-লোকটা সেই ভজন আচার্য। মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে ব্যান্ডেজ, গালে স্টিকিং প্লাস্টার, পায়ে প্লাস্টার, ঠোঁট দুটো নীল হয়ে ফুলে আছে, একটা চোখও ব্যান্ডেজে ঢাকা। এত অবাক হল বিভাবরী যে বলার নয়।

ভজন ঘরে ঢুকতেই পুলিশ দুজন বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

ভজন দরজার কাছেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হাঁফাচ্ছে। তার পর দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে এল।

বিভাবরীর হয়তো উচিত ছিল উঠে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে ওকে বসতে সাহায্য করা। কিন্তু ভজনের অবস্থা দেখে এমনই ঘাবড়ে গেছে বিভাবরী যে, সে নড়তেও পারল না।

ভজন খুব শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছে। হাঁফাচ্ছে। এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের একটা ক্রাচ পড়ে গেল ঠন্‌ঠন্‌ করে। সেটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য নীচু হওয়ার ক্ষমতাও নেই লোকটার। ভারসাম্যহীন শরীরে কোনওরকমে চেয়ারের পিছনটা ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল সে। চেয়ার নিয়ে উলটেই পড়ে যেত, কিন্তু সেটা ঝুঁকে কোনওরকমে আটকাল। তার পর অতি কষ্টে চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ মাথাটা নুইয়ে শুধু শ্বাস নিতে লাগল। বড়-বড় শ্বাস। কথা বলার মতো অবস্থাই নয়। লোকটার যে এ দশা হয়েছে তা একবারও বলেনি শবর। কে এই অবস্থা করল? পুলিশ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে লোকটার দিকে চেয়ে রইল বিভাবরী। গত তেরো-চোদ্দো দিন দাড়ি কামায়নি বলে মুখটা দাড়িতে ঢাকা। গোঁফ নেমে ওপরের ঠোঁট আড়াল করেছে।

বিভাবরী খুব ধীরে উঠে গিয়ে মেঝে থেকে ক্রাচটা তুলে অন্য ক্রাচটার পাশে টেবিলের গায়ে হেলিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসে ক্ষীণ গলায় বলল, জল খাবে?

লোকটা মৃদু মাথা নেড়ে জানাল, খাবে না।

এ দশা করল কে? পুলিশ।

ভজন একবার তার ক্লান্ত মুখখানা তুলে বিভাবরীর দিকে তাকাল। হাঁ করা মুখে এখনও শ্বাস নিচ্ছে প্রবলভাবে। ফের মাথাটা যেন ঝুলে পড়ল আপনাথেকেই। কথা বলার মতো অবস্থায় এখনও আসেনি।

বিভাবরীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। এ-লোকটাকে সে ঘেন্না করে এসেছে এতদিন, আজ

বড্ড দুঃখ হচ্ছে। মানুষের এ রকম দুর্দশা দেখলে কারই বা না হবে! শবর কি তাকে ইচ্ছে করেই এই ঘটনার কথা বলেনি?

প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধ ঘরে ভজনের শ্বাসযন্ত্রের শব্দ হল। তার পর একটু কমে এল হাঁফধরা ভাবটা। মাথা নীচু করেই বসে রইল ভজন।

একটু জল খাও এবার।

ভজন ফের মাথা নাড়ল, খাবে না।

এ দশা কে করেছে তোমার?

ভজন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাঙা গলায় বলল, সবাই।

সবাই বলতে?

ভজন ফের চুপ করে থেকে আরও মৃদু গলায় বলল, সবাই।

এর পর ভজনের শরীরটা হঠাৎ একটু কেঁপে-কেঁপে উঠল। কাঁদছে নাকি? কান্নার মানুষ তো নয়! বিস্মিত বিভাবরী পলকহীন চেয়ে রইল।

কাঁপুনিটা কমে গেল। ভজন মুখ তুলল না।

তোমাকে কি পাবলিকও মেরেছে?

ভজন মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

পুলিশও?

ভজন মাথা নাড়া দিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

রিঙ্কুকে কি তুমি খুন করেছ?

ভজন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাত্র। জবাব দিল না।

বললে না?

কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে থেকে ভজন ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, বলে কী লাভ?

লাভ নেই?

ভজন মাথা নেড়ে না জানাল। তারপর অনেকক্ষণ বাদে মাথা নীচু অবস্থাতেই বিড়বিড় করে আপনমনে বলল, কতবার তো বলেছি। কেউ বিশ্বাস করে না।

বিভাবরী কী বলবে ভেবে পেল না। অনেকক্ষণ বাদে সে বলল, রিঙ্কু তোমার কাছে সেই রাতে এসেছিল কেন? বিয়ের প্রস্তাব দিতে?

ভজনের রি-অ্যাকশন হচ্ছে অনেক দেরিতে। হয়তো মাথায় বেশ জোরালো চোট পেয়েছে, রিফ্লেক্স কাজ করছে না। সময় নিচ্ছে। অনেকক্ষণ বাদে শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না।

রিঙ্কু নয়?

না।

তাহলে কে?

ভজন একটা হিক্কার মতো শব্দ করল। টেবিলের ওপব মাথাটা নামিয়ে যেন একটু ঘুমিয়ে নিতে লাগল। এই অবস্থায় কেন যে লোকটাকে এতদূর টেনে আনল শবর, কেন যে তাকে বসাল ওর মুখোমুখি! বিভাবরী উঠে ভজনের কাছে গিয়ে পিঠে হাত রেখে বলল, তোমার কি শরীর খুব খারাপ লাগছে?

ভজন কেঁপে উঠল। তার পর ধীরে-ধীরে মাথাটা তুলল। রক্তজবার মতো লাল ডানচোখটা দিয়ে বিভাবরীকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, না, ঠিক আছি।

একে কি ঠিক থাকা বলে?

ভজন চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে অতি মৃদু স্বরে বলল, আরও হবে। আরও কত হবে। এ তো কিছু নয়।

আর কী হবে তোমার?

ভজন ধীরে-ধীরে চোখের জল আর লালায় মাখামাখি বীভৎস মুখটা তুলল। লাল চোখে চেয়ে সেই ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এখনও মরিনি যে! মারবে না?

আমি জানতে চাই তুমি সত্যিই রেপ আর খুন করেছ কি না।

ভজন হাঁফধরা গলায় শুধু বলল, কী লাভ বলে? বিশ্বাস করবে না কেউ।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে চাইছি। সত্যি কথাটা বলো আমাকে।

ভজন মাথা নেড়ে শুধু না জানাল। তার পর কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে হঠাৎ ধীরে-ধীরে মুখ তুলে বিভাবরীর দিকে চাইল। দু-খানা কম্পিত হাত তুলে করজোড় করে রইল কিছুক্ষণ। দুটো হাত থরথর করে কাঁপছে।

ওরকম করছ কেন?

ভজন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। দু-চোখ বেয়ে জল পড়ছে। প্রায় অশ্রুত গলায় বলল, ক্ষমা...ক্ষমা...।

দু-খানা ক্রাচের দিকে কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিল ভজন। উঠবে।

বিভাবরী গিয়ে ক্রাচ দু-খানা এগিয়ে দিল। প্রায় ছ-ফুটের মতো লম্বা শক্ত সমর্থ শরীরটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। থরথর করে কাঁপছে শরীর। তিনবারের চেষ্টায় উঠল ভজন। দু-বগলে ক্রাচ।

বিভাবরী গিয়ে দরজা খুলে সেপাইদের ডাকল।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় যেন ভজনের কষ্ট হচ্ছিল অনেক বেশি। দুজন সেপাই না ধরলে শুধু ক্রাচে ভর করে বেরোতে পারত না সে।

পিছন থেকে অপলক চোখে চেয়ে ছিল বিভাবরী। এরকমভাবে কেউ কাউকে মারে? মানুষ এত নৃশংস? চোখে জল আসছিল তার, আবার একইসঙ্গে রাগে আগুন হয়ে যাচ্ছিল মাথা।

ভজন বেরিয়ে যাওয়ার পর বিভাবরী তার শরীরের কাঁপুনি আর দুর্বলতা টের পেল। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। হাঁফ ধরে যাচ্ছে।

দেখা হল ম্যাডাম?

বিভাবরী চোখ তুলে চেয়ে শবরকে দেখে বলল, আপনাদের নামে মামলা করা উচিত।

শবর হাসল, করুন না।

পুলিশ কেন মারবে? মারা তো বে-আইনি।

অবশ্যই। কিন্তু ভজনবাবুর বেশিরভাগ চোট পাবলিকের উপহার, পুলিশের নয়।

তাদের কেন ধরা হল না?

ক'জনকে ধরা যাবে বলুন। গোটা লোকালিটিটাই তো ইনভলভড।

ছিঃ শবরবাবু।

শবর একটু হাসল আবার। বলল, পাবলিকের হয়ে আপনার ধিক্কারটা আমি ঘাড়ে নিচ্ছি ম্যাডাম। সরি। এক্সট্রিমলি সরি।

আপনি আমাকে ওর এই অবস্থার কথা বলেননি কেন?

শোনার চেয়ে দেখা অনেক বেশি এফেক্টিভ। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বিভাবরী উঠল। শরীর ও মনের একটা বিকলতা টের পাচ্ছে সে। পা দুটো ভারী। মাথাটা একটু-একটু টলছে। জিপে বসে সে বলল, আপনার কি এখন কোনও জরুরি কাজ আছে?

না তো!

তা হলে আমি ওর গ্যারেজটা দেখতে চাই।

স্বচ্ছন্দে। কিন্তু দেখে কী করবেন?

এমনি কৌতূহল।

ঠিক আছে ম্যাডাম। এনিথিং ইউ সে।

গ্যারেজটা একটু প্রত্যন্ত জায়গায়। ছাড়া-ছাড়া বাড়িঘর, ফাঁকা জমি, ঝোপজঙ্গল, পুকুর।

বাঁ-ধারে বাঁশের বেড়া দেওয়া বেশ বড় একটা জায়গা। ফটকের সামনে দুজন সেপাই গাড়ির একখানা সিট পেতে বসে আছে। তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

এটাই ভজনবাবুর গ্যারেজ।

ভিতরে ঢোকা যাবে?

কেন নয়?

শবরের ইশারায় সেপাইরা ফটকের তালা খুলে দিল। বিকল মোটর গাড়ি, নানা যন্ত্রাংশ, তেল কালি, হাইড্রলিক প্রেস পেরিয়ে শেষ প্রান্তে ভজনের ঘর। সেপাইরা দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

আসুন ম্যাডাম।

ঘরে একটা সরু চৌকিতে সাধারণ বিছানা পাতা রয়েছে। একধারে চেয়ার-টেবিল। বইয়ের র‍্যাকে প্রচুর টেকনিক্যাল বই, কিছু পেপারব্যাক উপন্যাস, কিছু ম্যাগাজিন। বাঁ-ধারে মেঝের ওপর একটা বায়োগ্যাসের উনুন। কিছু বাসনপত্র।

বসুন ম্যাডাম।

বিভাবরী চেয়ারে বসল। তারপর ঘরটা ভালো করে দেখল। কিছুই দেখার মতো নয়। একজন পুরুষ মানুষের ঘর।

শবর বলল, সম্ভবত আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন সেই চেয়ারেই রিঙ্কু বসে ছিল সেই রাতে।

কী করে বুঝলেন?

প্রবাবিলিটির কথা বলছি।

কিন্তু মেয়েটা যে রিঙ্কুই তা কী করে বুঝলেন?

আপনার কী মনে হয়?

ও তো বলছে রিঙ্কু নয়।

তাহলে কে হতে পারে ম্যাডাম?

কী করে বলব? আপনি বলতে পারেন না?

শবর মৃদু একটু হাসল। বলল, রিঙ্কু হতেই পারে। রিঙ্কু তো ভজনবাবুকে ভালোবাসত বলেই মনে হয়।

আপনি কিছু লুকোচ্ছেন।

শবর ফের হাসল, আপাতত কিছু লুকোনোই থাক।

আচ্ছা, ভজনের সঙ্গে আমার কী কথা হল তা তো আপনি জানতে চাইলেন না!

শবর মৃদু-মৃদু হাসি হাসছিল। বলল, পরে জেনে নেওয়া যাবে।

তার মানে আপনার জানার কৌতূহল মিটে গেছে?

তা নয়। ভজনবাবু এখন খুব বেশি কথা বলার মতো মুডে নেই। সেটা জানি বলেই অনুমান করছি আপনাদের মধ্যে খুব বেশি কথা হয়নি। কিন্তু—।

কিন্তু কী?

আপনার অমত না থাকলে কয়েকদিন পর আপনি আর একবার ওঁর সঙ্গে মিট করুন। করবেন?

করব।

থ্যাঙ্ক ইউ। হি নিডস এ সিমপ্যাথেটিক হিয়ারিং।

তার মানে?

ওঁর মনটা অদ্ভুত। জোর করলে বা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে উনি ভিতরকার কপাট-বন্ধ করে

দেন। কোনও কনফেশনই তখন আদায় করা যায় না। কিন্তু এই কেসটার জট খুলতে হলে ওঁর মুখ খোলানো দরকার। আমরা যেটা পারছি না সেটা আপনি হয়তো পারতেও পারেন।

চেষ্টা করব।

কাইন্ড অফ ইউ।

এবার কি আমরা উঠব?

হ্যাঁ ম্যাডাম। চলুন।

ফেরার সময় বিভাবরী তেমন কথা বলছিল না। খুব ভাবছিল। আজ সে বড্ড নাড়া খেয়েছে ভজনকে দেখে। লোকটাকে তার আর ঘেন্না হচ্ছে না, কিন্তু ঘেন্না হচ্ছে তাদের যারা ওকে ওরকমভাবে মেরেছে।

শবরবাবু।

বলুন।

আমার মনে হয় না ভজন এ কাজ করেছে।

কী করে বুঝলেন?

যেভাবে আপনিও বুঝেছেন।

আমি কি বুঝেছি?

আপনিও বুঝেছেন বা অনুমান করেন যে ও খুন বা রেপ করেনি।

কী সর্বনাশ! এ যে গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি!

আমি জানি।

॥ পাঁচ ॥

রতন তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

বলুন স্যার।

মার্ডারের আগের রাতে তুমি শুনেছিলে ভজনবাবু একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন।

হ্যাঁ স্যার।

তুমি কি বলতে পারো দুজনের মধ্যে কে কাকে আপনি করে বা তুমি করে বলছিল?

স্যার, পুলিশকে তো বলেছি।

ব্যাপারটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ভালো করে ভেবে বলো।

এই রে। এত খুনখারাপি মারদাঙ্গায় মাথাটাই কেমন গুলিয়ে গেছে স্যার।

সেইজন্যেই বলছি ভালো করে ভেবে বলতে। অনেক সময়ে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর স্মৃতিটা পরিষ্কার হয়। যখন তুমি জবানবন্দি দিয়েছিলে তখন তুমি ঘাবড়ে যাওয়া অবস্থায় ছিলে।

ঠিক স্যার।

এবার শান্ত মাথায় ভেবে বলো।

দু-মিনিট সময় দেবেন স্যার? চোখ বুজে একটু ভাবব।

দুই পাঁচ যত মিনিট খুশি সময় নাও। তবু আসল কথাটা বলো।

রতন দু-মিনিটের বেশি ভাবল না। চোখ খুলে এক গাল হেসে বলল, মনে পড়েছে স্যার। মেয়েটা বাবুকে তুমি করে বলছিল, বাবু আপনি করে বলছিল।

আরও ভেবে বলো।

না স্যার মনে পড়ে গেছে।

তুমি কিন্তু পুলিশের কাছে উলটোটাই বলেছিলে।

তা হতেই পারে স্যার। তখন যা অবস্থা! বাবুর ফাঁসি হলে তো চাকরিটাও গেল স্যার। বাবু লোকটা খারাপ ছিলেন না।

ফাঁসি নাও হতে পারে।

একটু উজ্জ্বল হয়ে রতন বলল, তবে কি বাবু ছাড়া পাবেন?

সেটা তোমার ওপরেও খানিকটা নির্ভর করছে।

কী বলতে হবে বলুন।

সেই রাতে তুমি গ্যারেজের কাছাকাছি কোনও গাড়ি বা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে?

হ্যাঁ স্যার। সামনে নয় ঠিক, ওই পশ্চিম দিকে একটা অ্যাম্বাসাডার দাঁড় করানো ছিল। ডার্ক কালার।

আর কিছু?

না স্যার। গ্যারেজে এসেছে কি না ভেবে ড্রাইভারকে জিগ্যেস করলাম, কী হে, গ্যারেজে এসেছ নাকি? লোকটা বলল, না, সওয়ারি আছে।

প্রাইভেট গাড়ি?

এ মার্কা গাড়ি স্যার, ওরা ভাড়া খাটে।

গাড়িটা কখন দেখলে?

ডিউটিতে আসার সময়। তার পর যখন বাবুর জন্য কোক নিয়ে এলাম তখন গাড়িটা চলে গেছে।

বাঃ, ভেরি গুড।

আর কিছু বলতে হবে স্যার?

তুমি কি জানো তোমার বাবুকে বারাসাতে গ্যারেজ খুলতে কে সাহায্য করেছে?

সেটা ভালো জানি না। তবে শুনেছি বাবুর এক বন্ধু।

তার নাম জানো?

সুবীর-টুবির হবে। অত মেমারি নেই স্যার।

সুজিত হতে পারে কি?

রাখাল জানে। ও পুরোনো লোক।

রিঙ্কুকে কখনও মাতাল অবস্থায় দেখেছ?

না তো স্যার।

কখনও দেখনি? ভালো করে ভেবে বলো।

না স্যার। রিঙ্কুর বন্ধুরা হয়তো খেত।

তারা কারা?

অনেক ছিল। ইদানীং—।

বলেই থেমে গেল রতন।

থামলে কেন?

বলতে ভয় পাচ্ছি স্যার। কথা ফাঁস হলে আমার জান চলে যাবে।

ফাঁস হবে না। বলো।

ইদানীং রিঙ্কু হাবু জগুদের সঙ্গে ঘুরত। ওরা খুব খচ্চর।

ওদের সঙ্গে মিশত কেন?

বলতে পারব না স্যার। তবে রিঙ্কু একদিন গ্যারেজে গাড়ির বনেটে বসে কুল খেতে-খেতে বলেছিল, তোমাদের গ্যারেজে আর কেউ কখনও হামলা করবে না দেখো। আমি হাবু আর জগুকে হাত করেছি।

তুমি কী বললে?

আমি বললাম, খবরদার ওদের খপ্পরে যেয়ো না। তোমাকে শেষ করে দেবে।

রিঙ্কু কী বলল?

হাসল, পাত্তা দিল না। রিঙ্কু স্যার, কারও কথা শুনত না। বাবুর সঙ্গে বিয়েটা হলে বেঁচে যেত।

বিয়ে! বিয়ের কথা উঠেছিল নাকি?

না স্যার। আমার মনে হত, দুজনকে যেন মানায়।

কেন মনে হত?

কী জানি কেন মনে হত।

রিঙ্কু কি ভজনবাবুকে ভালোবাসত বলে তোমার মনে হয়?

হ্যাঁ স্যার, খুব মনে হয়। রিঙ্কু মাঝে-মাঝে বাবুর জন্য খাবার নিয়ে আসত, বই আনত, আর বাবুর কাছে এলেই খুব হাসিখুশি থাকত।

আর ভজনবাবু?

বাবু তো স্যার, সবসময়ে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সবসময়েই নানা চিন্তা। বাবু রিঙ্কুকে মাঝে-মাঝে বকুনিও দিত।

কী রকম?

বলত, আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করছ কেন, পড়াশুনো করোগে যাও। কিংবা বলত, এত উড়নচণ্ডী হলে জীবনে কষ্ট পাবে। এইসব আর কী।

ভজনবাবুর কাছে আর কোনও মেয়ে আসত কী?

গাড়ি সারাতে অনেকে আসত।

তারা ছাড়া?

না স্যার, বাবুর মেয়েছেলের দোষ তেমন ছিল না।

তোমার বাবু কি ঘন-ঘন ট্যুরে যেত?

মাঝে-মাঝে যেত স্যার।

ঠিক আছে।

কত বছর বয়সে আপনার বিয়ে হয় শ্যামলীদেবী?

কেন বলুন তো! এসবও কি তদন্তে দরকার হচ্ছে নাকি?

কে জানে কখন কোনটার দরকার পড়ে। বলতে না চাইলে অবশ্য—।

আমার বিয়ে হয় ষোলো বছর বয়সে।

এত কম বয়সে?

দেখতে সুন্দর ছিলাম বলে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি খুব পছন্দ করে ফেলেছিলেন। পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় তাই তাড়াহুড়ো করে বিয়ে হয়ে গেল। আর ওইটেই আমার জীবনের সর্বনাশের মূল।

সর্বনাশ কেন?

ষোলোতে বিয়ে, সতেরোয় মেয়ের মা, এই সুন্দর বয়সটা টেরই পেলাম না। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলুন তো! সাধে কি এদের ওপর এত রাগ আমার!

সুজিতবাবুর সঙ্গে আপনার চেনা কত দিনের?

প্রায় জন্ম থেকে। ও আমার চেয়ে এক বছরের বড়। আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম।

আপনি কবে ওঁর প্রেমে পড়েন?

এসব জেনে কী হবে আপনার?

প্লিজ!

আপনার কথাবার্তা পুলিশের মতো নয়, আর আপনি বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। সে জন্যই বোধহয় আপনি একজন বিপজ্জনক লোক। তবু আমি আপনাকে খুব একটা অপছন্দ করছি না। তাই বলছি, আমাদের শৈশব প্রেম।

আপনি সুজিতকে কখনও প্রেমের কথা জানিয়েছেন?

জানানোর কী? আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবেসেই বড় হয়েছি।

বিয়ের সময় কী রি-অ্যাকশন হল সুজিতবাবুর?

কী আর হবে? ও তো তখন সতেরো বছরের বাচ্চা ছেলে। সবে কলেজে ঢুকেছে। ওর পক্ষে কী আমাকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল?

আপনি?

আমি। আমি কেঁদে বিছানা ভাসিয়েছি। কিন্তু রুখে দাঁড়ানোর মতো মন তখনও তৈরি হয়নি।

আপনি কি ভজনবাবুকে চেনেন?

শ্যামলী হঠাৎ স্থির চোখে চেয়ে বলল, হঠাৎ এ-কথা কেন?

বলতে আপত্তি আছে কি?

ওকে কি আমার চেনার কথা?

বলা তো যায় না।

আমি আট বছর আগে চলে গেছি, ও তখন এখানে আসেনি।

সেটা জানি। যে জমিতে ভজনবাবুর গ্যারেজ তার মালিক ছিলেন সুজিতবাবুর কাকা বরুণ গুণ।

তা হতে পারে।

খবর হল, সুজিতবাবুই ভজন আচার্যকে জমিটা কিনতে সাহায্য করেন।

আমি অত জানি না।

সুজিতবাবু ও ভজনবাবুর মধ্যে পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল।

আমি সেসবের খবর রাখি না।

ভজনবাবু কানপুরে আপনাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেছেন।

শ্যামলী স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কিছু বলবেন না?

শ্যামলী একটুও না ঘাবড়ে তার দিকে সপাটে চেয়ে বলল, যদি তাই হয় তাতেই বা কী হল?

কী থেকে যে কী হয় কে বলতে পারে?

ভজনকে আমি চিনতাম। এবার কি ফাঁসি দেবেন আমাকে?

না। ফাঁসির দড়ি ভজনবাবুর জন্যই থাক। আপনি তো ওকে নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিলেন!

এখনও চাই।

যদি ভজনবাবু নির্দোষ বলে প্রমাণিত হন?

তবুও—।

বলেই থমকে গেল শ্যামলী। সুর পালটে বলল, তা হলে অন্য কথা। কিন্তু ও ছাড়া আর কেউ কালপ্রিট নয়।

ঠিক জানেন?

জানি।

খুনের রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

তার মানে?

কৌতূহল।

শ্যামলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কলকাতায়। তিলজলায় আমাদের একটা ফ্ল্যাট আছে।

রিঙ্কুর মৃত্যুর খবর কখন কীভাবে পেলেন?

প্রথমে খবরের কাগজে। তারপর টেলিগ্রাম পেয়ে কানপুর থেকে সুজিতও টেলিফোন করে।

আপনি তবু দু-দিন পরে বারাসাতে এলেন কেন? মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েও কি মা দেরি করতে পারে?

পারে, যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে।

কোয়াইট পসিবল। এবং খুব সম্ভব আপনি যে কলকাতায় আছেন তা শচীনন্দনবাবুকে জানাতে চাননি। আপনি ডিভোর্সি স্বামীর বাড়িতে উঠলেন কেন?

তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?

তা নয়, তবু প্রোটোকলে আটকায় হয়তো।

বারাসাতে আমার ওঠার জায়গা নেই। বাপের বাড়ি বা সুজিতের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া এ-বাড়িটা বিরাট বড়, নীচের তলার এই পোরশনটা আমার জন্য আলাদা করে করা হয়েছিল, বাড়ির অশান্তি এড়ানোর জন্য।

বুঝেছি। একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার।

কী বলুন তো!

রিঙ্কুর পেটে অ্যালকোহল পাওয়া গেছে।

কে বলল?

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট। একটু ডিলেইড রিপোর্ট।

তার মানে কী? কেউ ওকে মদ খাইয়ে রেপ করেছিল?

সেরকমই অনুমান।

ও।

ভজনবাবু মদ খান না।

ওতে কিছু প্রমাণিত হয় না।

ভজনবাবুর ফাঁসিটা দেখছি একটা পপুলার ডিমান্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কোন শালা রে? কোন শুয়োরের বাচ্চা?

পুলিশ। দরজা খোলো।

ফোট শালা পুলিশ। ফোট বাঞ্চোৎ, খানকির ছেলে।

সঙ্গে মদন নামে যে সেপাইটা ছিল সে চাপা গলায় বলল, স্যার, এ ডেনজারাস ছেলে। মদ খেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ফোর্স না নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। চলুন, ফোর্স নিয়ে আসি।

না মদন। গন্ধ পেলে পাখি উড়ে যাবে।

ঘর থেকে জঘন্য খিস্তি ভেসে আসছিল।

শবর কাঠের দরজাটায় একটা লাথি মারল। তাতে বোম ফাটার মতো একটা আওয়াজ করে দরজার তলার দিককার প্যানেলটা কিছু অংশ ফেটে গেল।

বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার রাত। শব্দ শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে 'কে-কে' আওয়াজ উঠল। দু-একটা দরজা খুলে টর্চ মারল কেউ-কেউ।

স্যার, এ-পাড়া কিন্তু খারাপ। অ্যান্টিসোশ্যালদের ডেন। সবাই ঘিরে ফেললে বিপদ হবে।

শবর নিস্পৃহ গলায় বলল, কিছু হবে না। ভয় পেয়ো না। এই সাহস নিয়ে পুলিশে চাকরি করো কী করে?

ভিতরের খিস্তি বন্ধ হয়েছে। এবার দরজার কাছ থেকে একটা মেয়ে গলা প্রশ্ন করল, কে?

দরজাটা খুলুন।

কেন খুলব?

তাহলে সরে দাঁড়ান। দরজা ভাঙা হবে।

হাবু বাড়ি নেই।

শবরের দ্বিতীয় লাথিতে দরজার খিল আর ছিটকিনি উড়ে গেল। দরজাটা পটাং করে খুলে হাঁ হতেই টর্চ হাতে ভিতরে ঢুকল শবর।

সামনেই একটা মেয়ে। বয়স বেশি নয়, উনিশ-কুড়ি।

তুমি কে?

আমি শেফালি, হাবুর বোন। দাদা বাড়ি নেই।

পথ ছাড়ো।

শবর তড়িৎ পায়ে দু-খানা ঘর ডিঙিয়ে উঠোনে নামল। উঠোনের পিছনে খোলা জমি। শবর মুখ ফিরিয়ে মদনকে বলল, ঘরটা সার্চ করো। ও পালিয়েছে, কিন্তু সাবধানের মার নেই।

ঠিক আছে স্যার।

শবর তার হোমওয়ার্ক করেই এসেছে। হাবুর সবরকম ঠেক তার জানা। জমিটা পেরিয়ে সে ডান দিকের একটা কাঁচা রাস্তায় উঠে এল। রাস্তা পেরিয়ে রেললাইন। লাইন পার হয়ে সে একটা নাবালে নেমে স্বাভাবিক পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল।

পাঁচু হালদারের বাড়িটা একতলা। সামনে ঘাসজমি আছে। পেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল শবর।

পাঁচু এবার পার্টির নমিনেশন পেয়েছে। ভোটে দাঁড়াবে। ক্ষমতাশালী লোক।

ভিতরে পাঁচুর গলা পাওয়া যাচ্ছিল, তা তুই এখানে এলি কেন?

কোথায় যাব?

বৃন্দাবনের কাছে চলে যা পিছন দিয়ে। পালা।

অত হুড়ো দিচ্ছেন কেন? যাচ্ছি। পুলিশ কি আর আপনার বাড়িতে আসবে?

যত্তো সব ঝামেলা। এখন গিয়ে গা-ঢাকা দে, কাল সকালে দেখা যাবে।

ফালতু আমার ওপর হামলা করছে পাঁচুদা।

এখন যা। কাল সকালে দেখব। যা।

একটা দরজা খোলার শব্দ হল পিছনদিকে।

পিছনে আধা জংলা পতিত জমি। কয়েকটা বড় গাছ। বৃষ্টি পড়ছিল। হাবু ছুটছিল প্রাণপণে। মাটি পিছল, বিপজ্জনক, পেটে মদের গ্যাঁজলা, ঠিক ব্যালান্স নেই শরীরের।

পিছন থেকে ছায়ামূর্তিটা কখন এগিয়ে এল সে বুঝতেই পারেনি। একটা মজবুত হাত তার কাঁধের কাছে জামাটা চেপে ধরল। তারপর একটা প্রবল ঝাঁকুনি। আপনা থেকেই প্যান্টের পকেটে হাত চলে গিয়েছিল হাবুর। রিভলভারটা ধরেও ফেলেছিল। কিন্তু বের করতে পারল না। তার আগেই একটা বিদ্যুৎগতির ঘুঁসি তাকে শুইয়ে দিল।

মিনিট দশেক পরে দুজনে বৃষ্টির মধ্যেই মুখোমুখি বসা। মাটির ওপরেই। জলকাদা থিকথিক করছে। ভিজে ঝুপুস হয়ে যাচ্ছে দুজন।

শবর শান্ত গলায় বলল, বলো।

কী বলব? ও আমাদের কাছে আসত। বন্ধুত্ব করতে চাইত। আমরা কী করব?

বন্ধুত্ব করতে চাইত কেন?

ও চাইত যাতে আমরা ভজন আচার্যর পিছনে না লাগি।

ওর ইন্টারেস্ট কী?

কী আবার! মহব্বত।

বুঝেছি। বলো।

ঘুরে-ফিরে আসছিল। বারবার আসত।

টাকাপয়সা দিত?

না।

তোমরা ওকে কিডন্যাপ করে বাপের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কথা ভেবেছিলে?

না। ওটা আমাদের লাইন নয়।

বলো।

আমার ওকে ভালো লাগত। ওকে চাইতাম। পুরুষচাটা মেয়েছেলে তো।

বুঝেছি। আগে বাড়ো।

মদ খেলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সেই দিন বিকেলে ও গ্যারেজের কাছে আমাকে থাকতে বলেছিল।

কেন?

সেদিন ওর পাঁচুদার কাছে যাওয়ার কথা ছিল।

সেটাই বা কেন?

গ্যারেজ নিয়ে লোকালিটিতে ঝামেলা হচ্ছে তার একটা মিটমাটের জন্য।

সেটা কি ভজনবাবু জানতেন?

বোধহয় না। ভজনবাবু ত্যাঁদোড় লোক, অন্যের সাহায্য নেবে না। মেয়েটাকে পাত্তা দিত না, কিন্তু মেয়েটা ওর জন্য পাগল ছিল।

আগে বাড়ো।

আমি স্কুটার নিয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওখানে ছিলাম। রিঙ্কু সাইকেলে এসে গ্যারেজে সাইকেলটা ঢুকিয়ে দিয়ে আমার স্কুটারে ওঠে।

কেউ তোমাদের দেখেনি?

বোধহয় না। গ্যারেজ ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে বাঁয়ে একটা জংলা জমি দেখেছেন তো! ওটা দিয়ে শর্টকাট হয়।

রিঙ্কুকে মদ খাওয়াল কে?

ও নিজেই খেতে চাইল। আমার কাছে ছিল একটা বোতল।

ও খেত নাকি মাঝে-মাঝে?

হ্যাঁ। ইদানীং খেত।

কোথায় খেলে?

ওই জঙ্গলে বসে।

পাঁচুবাবুর বাড়িতে যাওনি?

পাঁচুদা সেদিন ছিলেন না। কলকাতায় গিয়েছিলেন।

সেটা রিঙ্কু জানত?

না। আমি ওকে বলিনি।

কেন?

সেদিন ওকে খুব চাইছিলাম।

কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?

ওখানেই—।

রিঙ্কু বাধা দেয়নি?

হ্যাঁ। খুব চেঁচিয়েছিল, খিমচে দিয়েছিল। কিন্তু তখন আমি পাগল।

কখন মারলে?

প্রথমে মারিনি। ওখানে বসে-বসে ঘণ্টা দুই-তিন দুজনে ড্রিঙ্ক করি। অনেক কথা হয়।

প্রেমের কথা?

ওইরকমই সব। ও আমাকে বলছিল যে ও ভজনবাবুকে ভালোবাসে, তাই কিছু করার নেই। তবে আমার কথা ওর মনে থাকবে—এইসব।

আগে বাড়ো। কখন রেপ করেছিলে?

রাত ন'টা সাড়ে-ন'টা হবে। যখন চেঁচাল তখন মুখ চাপা দিতে হয়েছিল।

আগে বাড়ো।

ও বলেছিল সব কিছু বলে দেবে সবাইকে। আমি ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখন শালা আমিও তো মাতাল। কী কথায় কী কথা হল মাথায় কীরকম রক্ত চড়ে গেল।

গলা টিপে?

তাই হবে মনে হয়। কী করেছি খেয়াল নেই। ওখানে বসে আরও মদ খেলাম। রাত একটা নাগাদ বৃষ্টি নামল। তখন নিয়ে গিয়ে মাঠটায় ফেললাম।

লাশটা সরালে কেন?

মনে হয়েছিল ওখানে পুলিশের কুকুর আমার গন্ধ পাবে। মদের বোতলটাও অন্ধকারে কোথায় ছুড়ে ফেলেছিলাম। মনে হল, বোতল পেলে সর্বনাশ।

পুলিশের কাছে কনফেস করবে?

না করলে?

শোনো হাবু, কনফেস করলে তোমার সাজা হবে। যদি বাইচান্স তুমি ছাড়া পেয়ে যাও তাহলেও আমার হাত থেকে বাঁচবে না। আর কনফেস যদি না করো তাহলেও বাঁচবে না। আমি তোমাকে মারবই।

যদি সাজা হয়?

তাহলে আমার কিছু আর করার থাকবে না।

আমাকে রাতটা ভাবতে দিন।

শবর হাসল, পালাবে, না পাঁচুবাবুর বাড়ি যাবে? যা-ই করো, আমার হাত থেকে রেহাই নেই। শুনে রাখো, আমার চেয়ে বড় গুন্ডা এখনও জন্মায়নি। থানায় চলো।

এখনই?

হ্যাঁ। পাঁচুবাবু যদি তোমাকে ছাড়ানোর জন্য কাল সকালে থানায় আসে তাহলে তাকে বোলো, আমার হাতে তাঁর নির্ঘাত মৃত্যু। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

উনি আপনার কথা শুনে ভয় পাচ্ছিলেন।

খুব ভালো। চলো।

সময় দেবেন না একটু?

না। যা বললাম মনে রেখো।

॥ ছয় ॥

আপনাকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। কেন বলুন তো।

কীরকম?

স্যাড অ্যান্ড ক্রেস্টফলেন। মনে হচ্ছে কান্নাকাটিও করেছেন।

আপনি আমার এত বড় ক্ষতিটা কেন করলেন শবরবাবু?

ক্ষতি! সে কী! আমি কী করলাম?

মানুষটাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। দিব্যি ছিলাম। কেন আপনি আমাকে ওর কাছে নিয়ে গেলেন?

ম্যাডাম, রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া তো কিছু নয়।

ক'টা দিন ধরে আমি রাতে ঘুমোতে পারছি না, সবসময়ে কেমন অস্থির-অস্থির লাগছে। কেন?

ও রকম মার-খাওয়া চেহারা, ও রকম ভেঙে-পড়া, আর হাতজোড় করে ওই ক্ষমা চাওয়া— কী করে ভুলি। কতবার ইচ্ছে হয়েছে একাই গিয়ে দেখা করি, পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করি, কিংবা কী যে সব মাথামুন্ডু ভেবেছি।

এবং কেঁদেছেন।

হ্যাঁ।

কান্নার কী আছে?

বেশ করেছি কেঁদেছি। যে-কেউ কাঁদবে।

শবর হাসল, আর কী হল বলুন। কোনও সিদ্ধান্তে এলেন?

কী সিদ্ধান্তে আসব? আপনাদের মামলা কতদূর?

শেষের দিকে।

তার মানে কী? চার্জশিট দেওয়া হয়ে গেছে?

চার্জশিট তৈরি হচ্ছে।

তাহলে ওর রেহাই নেই?

না। উনি রেহাই পেলেই বা আপনার কী?

তা ঠিক। কিন্তু—।

কিন্তু কী?

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

তা তো হতেই পারে। কিন্তু তা বলে তো একজন ক্রিমিনালকে ক্ষমা করা যায় না।

ক্ষমা না হয় না-ই করলেন। অপরাধ করে থাকলে শাস্তি হোক। কিন্তু ওরকমভাবে মারে কেউ?

মানছি মারটা একটু বেশি হয়ে গেছে। অন্য কেউ হলে হয়তো মরেই যেত। ভজন আচার্য খুব শক্ত ধাতুতে গড়া। হার্ডেনড পারসন।

স্বাস্থ্য ভালো বলে বলছেন?

না। স্বাস্থ্যের চেয়েও মজবুত ওর মন। এ কারেজিয়াস ম্যান।

কী লাভ আর তাতে?

লাভ নেই অবশ্য।

কী পানিশমেন্ট হবে ওর বলুন তো! ফাঁসি?

যাবজ্জীবনও হতে পারে।

যাবজ্জীবন তো চোদ্দো বছর, তাই না?

হ্যাঁ। তবে ভালো বিহেভ করলে মেয়াদ কিছু কমে যায়।

কত কমবে?

চার পাঁচ বছরও হতে পারে।

তাও তো দশ বছর। কম কী?

হ্যাঁ। জীবনের সবচেয়ে প্রসপারাস সময়টায় দশ বছর আটক থাকাটা দুঃখজনক।

ওর দোষ কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে?

কিছু ফাঁক তো থাকবেই। তবে প্রমাণ হয়ে যাবে।

আমি ঠিক করেছি, আপনারা আমাকে সাক্ষী হিসেবে ডাকলে আমি ওর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলব না।

সে কী ম্যাডাম! আপনি যে ইম্পর্ট্যান্ট উইটনেস!

সেজন্যই আমি উলটো কথা বলব।

কী মুশকিল। আপনার সঙ্গে ওঁর মিট করানোটাই যে ভুল হল।

মিট করালেন কেন? আমার যে কী সর্বনাশ করলেন!

লোকটাকে কি ক্রিমিনাল মনে হয়নি আপনার?

তা বলছি না।

তাহলে কী বলছেন ম্যাডাম?

কী বলছি তা আমিও জানি না। সেই মেয়েটা কি রিঙ্কু?

কোন মেয়েটা?

রতন যার কথা শুনতে পেয়েছিল ওর ঘরে!

ডাউটফুল।

তাহলে একটা লুপ হোল তো আছে।

তা আছে। আমি জিপ নিয়ে এসেছি। আজ যাবেন?

হঠাৎ মুখখানা উজ্জ্বল হল বিভাবরীর। বলল, হ্যাঁ। আমাকে দু-মিনিট সময় দিন।

দু-মিনিট মাত্র! অত তাড়া নেই। মেয়েদের সাজতে একটু সময় লাগে জানি। টেক ইওর টাইম, আমি বসছি।

সাজব! সাজব কেন? জাস্ট পোশাকটা পালটে আসছি।

দু-মিনিটই লাগল। মুখে পাউডারটুকুও না ছুঁইয়ে বেরিয়ে এল বিভাবরী, চলুন।

জিপে বসে শবর বলল, আপনার ভিসিবল চেঞ্জ হয়েছে।

হয়েছে, আমিও তা জানি।

দ্যাটস গুড।

ও এখন কেমন আছে?

বেটার। মাচ বেটার।

ওর যদি যাবজ্জীবন হয় তাহলে গ্যারেজটার কী হবে?

আপনাদের যখন ডিভোর্স হয়নি তখন ওই গ্যারেজের ওপর আপনারও অধিকার আছে।

যাঃ।

আইন তো তাই বলে।

আমি গ্যারেজ নিয়ে কী করব? গাড়ির কিছুই জানি না।

তাই হলে বেচে দিতে পারেন। অনেক খদ্দের আছে। ভালো দামও পাবেন।

পাগল! ও অত সাধ করে গ্যারেজ করেছিল, বেচব কেন?

সেও ঠিক কথা। তা হলে বেচবেন না।

ও কি আমার কথা কিছু বলেছে?

হ্যাঁ।

কী বলেছে?

আপনাকে এই নোংরা মোকদ্দমায় টেনে আনার জন্য ভজনবাবু আমাদের ওপর একটু অসন্তুষ্ট।

ও।

উনি হয়তো আপনাকে এখনও ভালোবাসেন।

কী যে বলেন!

ভুলও বলে থাকতে পারি। আমি তো শুখা মানুষ।

আমি ভাবছি ও রিঙ্কুকে রিফিউজ করল কেন! আর রিফিউজ করে রেপই বা করবে কেন, খুনই বা করবে কেন?

আপনিই বলুন।

আপনারা ভালো করে তদন্ত করেননি।

আপনার ইনস্টিংট কী বলে?

বলে এটা অসম্ভব ব্যাপার।

আজ উনি অনেকটাই সুস্থ। ওঁকে জিগ্যেস করে দেখবেন।

আমার কাছে বলবে কেন?

কেন তার কোনও কারণ নেই। হয়তো বলবেন।

আমি কিন্তু আদালতে কিছু বলব না ওর বিরুদ্ধে।

মুশকিল।

কিছুতেই বলব না।

তাহলে তো সাক্ষী হিসেবে আপনাকে বাদ দিতে হয়।

তা কেন দেবেন? আমারও তো বক্তব্য আছে।

আপনি যে মামলা কাঁচিয়ে দেবেন।

দেবই তো।

মিস ভট্টাচার্য, আপনি কি ভজনবাবুর প্রতি সফট হয়ে পড়ছেন?

আমি সিমপ্যাথেটিক। ওকে আমার ক্রিমিনাল মনে হচ্ছে না।

লজিকটা কী?

ওই তো বললাম, যে ওকে বিয়ে করতে চায় তাকে ও হঠাৎ রেপ করতে যাবে কেন?

গুড লজিক। কিন্তু এমন তো হতে পারে সেই রাতের মেয়েটা রিঙ্কু ছিল না!

হতে পারে। আপনারা ঠিকমতো তদন্ত করলেন না যে!

শবর একটু হাসল।

হাসছেন যে!

ইউ হ্যাভ এ লজিক্যাল মাইন্ড।

তার মানে?

মেয়েটা হয়তো রিঙ্কু ছিল না।

প্রমাণ পেয়েছেন?

যদি বলি হ্যাঁ?

কেন হেঁয়ালি করেন বলুন তো! মেয়েটা কে?

শবর গাড়ি চালাতে-চালাতে বলল, আর একজন।

তার একটা নাম আছে তো!

আছে। শ্যামলী।

সে আবার কে?

শুনে শকড হবেন।

প্লিজ! বলুন না।

শোনার আগে সামনের হ্যান্ডেলটা শক্ত করে চেপে ধরুন।

ওমাঃ কেন?

জিপ খোলা গাড়ি। খুব চমকে গেলে যদি পড়ে-টড়ে যান!

আহা, এ-সময়ে কেউ ইয়ার্কি করে? বলুন না।

অবিশ্বাস্য।

ফের।

মেয়েটি বা মহিলাটি রিঙ্কুর মা।

অ্যাঁ।

ইটস এ ফ্যাক্ট।

যাঃ, আপনি একটা যাচ্ছেতাই।

মিস ভট্টাচার্য, শুনতে অদ্ভুত হলেও সত্যি।

কী করে?

লম্বা কাহিনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে শ্যামলী একটি দুর্ভাগা মেয়ে। অল্প বয়সে বিয়ে এবং মা হয়েছিল। স্বামীকে পছন্দ ছিল না। সংসার ভালো লাগত না। সুজিতের সঙ্গে বিয়ের আগের প্রেমটাও ওকে জ্বালাত। কিন্তু যখন সুজিতের সঙ্গে চলে গেল তখনও স্বপ্নটা ফের ভাঙল।

কেন, কী হয়েছিল?

সুজিতবাবুর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। এসব ক্ষেত্রে হয়ও না। খবর পেয়েছি, সুজিতবাবুর একজন মারাঠী মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কোনও একটা সময়ে সুজিতবাবুর বন্ধু ভজনের প্রেমে পড়েন তিনি। ফের একটা ভুল পদক্ষেপ। উনি ভজনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতেন, বিয়ে করার কথা বলতেন।

সুজিতের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে?

না। ওদের বিয়েও হয়নি, ডিভোর্সের প্রশ্ন নেই। দে ওয়্যার লিভিং টুগেদার ইন কানপুর। সুজিতবাবু বিয়ে না করায় ওঁর ইনসিকিউরিটি দেখা দিয়েছিল। সে দিন রাতে উনি একটা এসপার-ওসপার করার জন্য ভজনের গ্যারেজে হানা দেন।

আর সেদিনই রিঙ্কু—।

হ্যাঁ। কোয়াইট কো-ইন্সিডেন্স।

মহিলার কী হবে?

মহিলার বিরুদ্ধে তো কোনও চার্জ নেই।

ভজন শেষ অবধি স্বীকার করেছে?

হ্যাঁ। আমরা এসে গেছি।

এত তাড়াতাড়ি?

হ্যাঁ। আসুন।

ফের সেই সুন্দর বাংলো বাড়িটায় ঢুকল বিভাবরী। সেই ডাইনিং হল।

ও কখন আসবে?

এখনই। আমরা আজও কেউ সামনে থাকব না। ভয় করবে না তো!

ভ্রূ কুঁচকে বিভাবরী বলল, আপনি ভীষণ ইয়ার্কি করেন!

শবর হেসে চলে গেল।

আজ মাত্র একজন সেপাই এসে দরজাটা খুলে দাঁড়াল। দুই ক্রাচে ভর দিয়ে খুব ধীরে ঘরে ঢুকল ভজন। মুখটা নামানো।

আজ ভুল হল না বিভাবরীর। উঠে গিয়ে সে একটা চেয়ার টেনে বের করল। ধরে বসাল। ক্রাচ দু-খানা নিয়ে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে কাছে এসে বসল।

কেমন আছ?

ভজন মাথা নীচু করেই বলল, ভালো।

একটু ভালোই দেখল বিভাবরী। চোখের ব্যান্ডেজটা নেই। স্টিকিং প্লাস্টারও খুলে ফেলা হয়েছে। শুধু মাথার ব্যান্ডেজ আর পায়ের প্লাস্টার আছে। গলার স্বরটা স্বাভাবিক বলেই মনে হল।

শুনলাম সেই মেয়েটা নাকি রিঙ্কুর মা!

ভজন চুপ করে রইল।

তোমার ওপর দিয়ে কত ঝড় গেল। আমি তোমাকে আজ বলতে চাই যে, আমি তোমার জন্য কষ্ট পাচ্ছি।

ঘেন্না?

না, একটুও না। সেদিন ওভাবে ক্ষমা চাইলে কেন?

মনে হল।

যতবার দৃশ্যটা ভাবি ততবার চোখে জল আসে।

ভজন চুপ।

তোমার কী হবে বলো তো!

ভজন ধীরে-ধীরে তার ম্লান, করুণ, ব্যথাতুর মুখখানা তুলল।

কষ্ট পেয়ো না। আমার বুদ্ধির দোষ।

তোমার দোষ? নাকি পুলিশ মিথ্যে করে সাজিয়েছে?

মিথ্যেটা তো সত্যি হয়নি।

তার মানে?

পুলিশ খুনিকে ধরেছে।

কী বলছ?

হাবু বলে ছেলেটা।

কই, আমাকে শবরবাবু কিছু বলেননি তো।

ভজন একটু হাসল, সারপ্রাইজ দিতে ভালোবাসেন বোধহয়।

ভজনের দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বিভাবরী উত্তেজিত গলায় বলল, সত্যি বলছ? সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বিভাবরী। টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল।

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইল ভজন। কী করবে বুঝতে পারল না।

ছায়ার মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল শবর।

ম্যাডাম, দি ড্রামা ইজ ওভার।

চোখের জলে মাখামাখি মুখ তুলে তীব্র দৃষ্টি হেনে বিভাবরী বলল, আপনি কেন বলেননি আমাকে?

আপনি একজন অ্যান্টিরোমানটিক লোককে বিয়ে করেছেন দেখছি। এই সময়ে এঁর তো কিছু রোমান্টিক অ্যাডভানসেস করার সুযোগ ছিল। কিন্তু দেখুন কেমন পাথরের মতো বসে আছেন।

বিভাবরী ঝেঁঝে উঠে বলল, এরকমই ভালো।

ভজনবাবু রিলিজ হয়ে গেছেন। এবার চলুন মিস ভট্টাচার্য।

থাক আর ইয়ার্কি করতে হবে না।

কীসের ইয়ার্কি?

আপনি আমাকে এখন থেকে মিসেস আচার্য বলে ডাকতে পারেন।

ওয়াইকিকি



বুদ্ধদেব গুহ

লেখকের মন্তব্য

উনিশশো পঁচাত্তর সনের প্রথম শীতে ইউএস-এর উনপঞ্চাশতম রাষ্ট্র হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জে দিন দশেক কেটেছিল। গেছিলাম ছুটি কাটাতেই এবং হনলুলুর ওয়াইকিকি বীচ-এর 'হলিডে ইন্' মোটেলেই উঠেছিলাম। না জেনেই হাওয়াইয়ের আলোহা-সপ্তাহে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সৌভাগ্যবশত।

কানাডায় মনট্রিয়ালে, হনলুলু যাওয়ার কিছুদিন আগে, এক ভারতীয় রেস্তোরাঁতে, সত্যিই একটি ফুলওয়ালি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাকে বড়ই বেশি ভালো লেগেছিল। কিন্তু সহজবোধ্য কারণে তার নামটা এই উপন্যাসে বদলে দিতে হয়েছে। তাকে ভালোলাগার দাম প্রায় নিজের জীবন দিয়েই দিতে হচ্ছিল। তবুও, তার সঙ্গে আবারও দেখা হলে খুশিই হব।

'ওয়াইকিকি' ওয়াইকিকির অভিজ্ঞতানির্ভর প্রায় বাধ্যতামূলক রহস্য উপন্যাস। এর পটভূমি কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যি। যেসব পাঠক-পাঠিকা হনলুলু গেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

ভবিষ্যতে আর কখনও রহস্য উপন্যাস লিখব কী না, তা নির্ভর করবে পাঠক-পাঠিকাদের এই উপন্যাস সম্পর্কে মতামতের উপর।

এই উপন্যাস শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদেরই জন্যে। বইয়ের প্রচ্ছদেই তার সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছেন প্রকাশক।

হনলুলু

লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্ট থেকে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের প্লেনটা যখন এক চক্কর ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের ওপরে মেঘ ফুঁড়ে উঠছিল তখন হাওয়াইতে সত্যি-সত্যিই যাওয়া হয়ে উঠল ভেবে বেশ খুশি হয়ে উঠলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্র মেঘের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্লেন এখন চল্লিশ হাজার ফিট ওপর দিয়ে চলেছে। ওপরে নীল অসীম ব্রহ্মাণ্ড, নীচে মেঘের গালিচা। ঘণ্টা-পাঁচেক লাগবে যেতে। দুরত্ব তিন হাজার মাইল।

পৃথিবীতে যত এয়ারলাইনস আছে তার মধ্যে দেশীয় কোম্পানি হিসেবে ইউ এস এর ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের তুলনা হয় না। যেমন যত্ন, তেমনই খাওয়া-দাওয়ার ধূম। ইকনমি ক্লাসেও পানীয় নিখরচায় পাওয়া যায়। প্লেন ছাড়তে-না-ছাড়তেই এত বড় একটা পটাটো চিপসের প্যাকেট দিয়ে গেল এয়ারহোস্টেস যে ঘাবড়েই গেলাম। সঙ্গে ক্যানবিয়ার। তবু দেখতে-দেখতে চিপস শেষ হয়ে গেল। তারপর লাঞ্চ সার্ভ করার আগে আবার খাদ্য-পানীয়ের ছড়াছড়ি। বিনিপয়সায় পাওয়া যাচ্ছে, তাই একটু শ্যাম্পেন খেয়ে বড়লোকি করে নিলাম।

যখন দূর থেকে নীল জলজ দিগন্তে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ দেখা গেল সবুজে-সবুজ তখন বহুদিন দেশ-ছাড়া সবুজ-পিয়াসী চোখটা আনন্দে নেচে উঠল। বেলা তখন চারটে। প্লেনটা এসে ওআহু (Oahu) দ্বীপের হনলুলুতে নামল। হনলুলু সমস্ত হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী।

এই দ্বীপপুঞ্জ বিদেশিদের এ-দেশীয় ভাষায় বলা হয় হাওলস। ইংরিজি বানানটা Haoles। প্রথম হাওলস ইংরেজরা। তারপর ফরাসি, আমেরিকান, রাশান ইত্যাদি বহু বিদেশি এই সবুজ স্বর্গে পা রেখেছিলেন। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিয়েছিল রাজদন্ডরূপে।

আজকে আরেক অনামা অখ্যাত হাওলস প্লেন থেকে নামবে।

অতিকায় অ্যালবাট্রস পাখির মতো ডি সি টেন প্লেনটা ট্যাক্সিং করে এগিয়ে চলল টার্মিনালের দিকে, ডানায় হাওয়া কাটার সোঁ-সোঁ আর গলা-টিপে-ধরা ইঞ্জিনের ক্ষুব্ধ গুঞ্জরণের সঙ্গে।

হাওয়াইয়ান ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিদেশিরা প্রায় গত দুশো বছর ধরেই কর্তৃত্বের বীজ পুঁতে আসছিলেন ওই দ্বীপপুঞ্জে। প্রথম বিদেশি ইংরেজ ক্যাপ্টেন টমাস কুক, ইংল্যান্ডের প্লাইমাউথ থেকে সতেরোশো ছিয়াত্তরে সমুদ্র যাত্রা করে কেপ অফ গুড হোপ ঘুরে, ভারত মহাসাগর পেরিয়ে এসে টাসমানিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ফ্রেন্ডলি আইল্যান্ডস ছুঁয়ে তাহিতীতে এসে পৌছান।

তারপর তাহিতী থেকে কুক উত্তরে ভেসে এলেন তাঁর দুটি পালতোলা জাহাজে। সতেরোশো আটাত্তরের এক জানুয়ারির সকালে, তারিখটা আঠারোই; ডাঙা দেখা গেল প্রথম। আর কী সে ডাঙা। ফুলে-ফলে লতায়-পাতায় ঝর্নায় পাহাড়ে, প্রজাপতি আর নারীতে সে এক বর্ণ-গন্ধের উষ্ণ দেশ।

সেসব অনেক কথা। অনেক দিনের কথা। মনে করতে গিয়েও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

অনেকেরই ধারণা, হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই সমীচীন ছিল—হাওয়াইনদের কারণেই। কিন্তু উনিশশো আটান্ন সনে যখন আলাস্কা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল তখন যাঁরা হাওয়াইকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছিলেন তাঁদের লবি আরও জোরদার হল। অবশেষে উনিশশো পঞ্চান্নর এগারোই মার্চ, সেনেট আলাস্কার অন্তর্ভুক্তির বিলের হুবহু এক বিল পাস করলেন হাওয়াইকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে।

হনলুলু এয়ারপোর্টটি অতি আধুনিক। এবং বিশাল। হাওয়াই-এর চতুর্দিক থেকে এত লোক এখানে আসেন-যান যে এয়ারপোর্টের বিশালতা সহজেই অনুমেয়। প্লেন থেকে নামার পর বাসে করে আমাকে নিয়ে এসে বাইরের টার্মিনাল বিল্ডিং-এ পৌছে দিল। হনলুলু ছাড়া একমাত্র নিউইয়র্কের

কেনেডি এয়ারপোর্টেই এমন দেখেছি। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বললাম, ওয়াইকিকি বিচ-এ চলো।

টার্মিনাল বিল্ডিং-এ বাস থেকে নামতেই অনেক হাওয়াইন মেয়েরা আমাদের ঘিরে ধরে হাইবিসকাস ফুলের রং-বেরঙের মালা পরিয়ে দিয়ে স্বাগত জানাল। আসলে আমি ফালতু। কোনও এক ডেলিগেশানের মেম্বাররা সেই প্লেন থেকে নেমেছিলেন। মেয়েরা আমাকেও তাঁদের একজন বলে ভুল করে মালা পরাল। ভুল করে হলেও মালা কে না পরতে চায়? মেয়েরা হাসিমুখে কলরোলে বলল, 'আলোহা!' এক চালাক-চতুর সঙ্গী তার উত্তরে বললেন, 'মাহালো!'

ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে শুনলাম যে, আমি না জেনেই হাওয়াই-এর সব চেয়ে উৎসব মুখর সপ্তাহে এসে হাজির হয়েছি। অক্টোবরের শেষে হনলুলুতে আলোহা সপ্তাহ উদযাপিত হয়। হাওয়াইন ভাষায় আলোহা মানে স্বাগতম, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা সব কিছু। আর মাহালো মানে, ধন্যবাদ।

ট্যাক্সিটা চলেছে হু-হু করে। দু-পাশে দোকান আর হোটেল। পরে জেনেছিলাম যে, হাওয়াইতে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় শপিং-কমপ্লেক্স রয়েছে। এত হোটেলও বোধহয় পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই আছে। দেখতে-দেখতে ওয়াইকিকি বিচের পাশে সমুদ্রের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথে এসে পড়লাম। পথের এ-পাশে হোটেল, ও-পাশেও হোটেল। ডানদিকের হোটেলশ্রেণির ফাঁক-ফোঁক দিয়ে চোখে পড়ছে ওয়াইকিকি বিচের বালি আর নীল জল। আশ্চর্য! আমাদের দেশের সমুদ্রের পারের হাওয়াতে যেমন এক আর্দ্রতা ও নোনা গা-চিটচিটে ভাব থাকে, প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জের হাওয়াতে তেমন দেখলাম না। কারণটা আমার জানা নেই।

হলিডে ইন-এর লবিতে কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকেছি। পোর্টার স্যুটকেশটা হাতে তুলে নিয়েছে। এমন সময় মেয়েলি গলায় কে যেন বলে উঠল, হাই।

চারধারে তাকিয়ে দেখলাম। এখানে আমার চেনা লোক কে থাকতে পারে? কে ডাকল বুঝতে না পেরে ভাবলাম অন্য কাউকে কেউ ডেকেছে। পোর্টারের পিছন-পিছন এগিয়ে গেলাম। তখন পেছন থেকে হলুদ আর কালো প্রিন্টের ড্রেস পরে একটি মেয়ে দৌড়ে এসে বলল, হাই! তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না? কী খারাপ তুমি!

চিনতে, হঠাৎ দেখে, সত্যিই পারিনি। মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। পোশাকও একেবারে অন্য ছিল। সত্যিই লারাকে চিনতে পারিনি।

লারা বলল, হাউ নাইস টু হ্যাভ মেট উ্য হিয়ার। আলোহা! বলেই ওর হাতের একটা গাব্দা-গোব্দা পেপারব্যাক বই দেখিয়ে বলল, একা-একা বই পড়ে-পড়ে বোরড হয়ে গেলাম। তুমি এলে ভালোই হল।

পরক্ষণেই বলল, তোমার ঘরের নাম্বার কত?

আমি বললাম, জানি না। তারপর বললাম, তোমার কত?

ও ওর ঘরের নাম্বার বলল। তারপর বলল, ফ্রেশ হয়ে আমার ঘরে চলে এসো। একসঙ্গে চা খাব।

থ্যাঙ্ক উ্য, বলে আমি এগোলাম।

মনে-মনে খুবই খুশি হলাম। সত্যি কথা বলতে কী কানাডার মনট্রিয়ালে এক রাতে লারার সঙ্গে যখন আলাপ হয় সেই রাতের পর থেকে ওর কথা অনেকবার মনে হয়েছে। টোরোন্টো ও মনট্রিয়ালে আমি যে বন্ধুর হেপাজতে ছিলাম তাকে ওর সম্বন্ধে লিখেওছি বিভিন্ন জায়গা থেকে।

এমন হয় না? মাঝে-মাঝে হঠাৎ কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তখন মনে হয় যেন যুগ-যুগান্ত ধরে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলাম। যেন তাকে দেখা হওয়ার আগেও কতবার স্বপ্নে দেখেছি। এখনও এই ভীষণ ব্যস্ত, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু পৃথিবীতে কত না কত আশ্চর্য সুন্দর দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

লিফট দিয়ে উঠতে-উঠতে লারার কথা ভেবে এবং এখানে ওকে দেখে মনটা আমার খুশিতে ভরে উঠল। আমি মনে-মনে বললাম, মাহালো।

লারা

আমার ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে রাস্তা পেরিয়ে উলটোদিকে সমুদ্র ও তটভূমি দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার বাতিগুলো এক-এক করে জ্বলে উঠেছে। সমুদ্রতটে বিকিনি আর স্যুইম স্যুট পরে তখনও জোড়ায়-জোড়ায় মানুষ বসে আছে, চান করছে। দূরে সার্ফ-রাইডিং শেষ করে ফিরে আসছে নারী-পুরুষ। রবারের রং-বেরঙের ইনফ্লেটেড নৌকোয় ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের মা-বাবারা তাদের তীরে ফিরে আসতে বলছেন অন্ধকার হয়ে গেছে বলে।

ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে এবং কানাডাতে যেখানেই গেছি চারদিকে জোড়ায়-জোড়ায় মানুষ দেখে কেবলি মনে হয়েছে মানুষ, সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই কি এই সব দেশে যুগলেই জন্মায়? সকলেই এমন সঙ্গী পায় কী করে? সঙ্গীমাত্রই কী মনোমতো? না মন্দের ভালো না কি ওরা একা থাকার আনন্দকে ভুলে গেছে? ভয় পায় কি ওরা মুহূর্তের একাকিত্বকেও? ওদের কাউকেই, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, একা দেখা যায় না।

এসব দেশে একা-একা ঘুরে বেড়ালে বড় হীনমন্য লাগে। হাওয়াই-এর মতো আলোর দেশে, রঙের দেশে, একা-একা কাউকে ঘুরতে দেখলে লোকে ভাবে পুলিশের এজেন্ট, হাই-জ্যাকার বা টেররিসট কিংবা ক্রিমিনাল। সকলেই সন্দেহের চোখে তাকায়। তাও ভালো। কিন্তু অনেকে সম্পূর্ণ ইগনোর করে। অগ্রাহ্য করাটা অসহ্য।

বাইরে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে কত যে রঙের খেলা। গোলাপি হয়ে আছে সমস্ত আকাশ। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ওই আকাশ আর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের জন্মের গল্প। এ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, রূপকথার গল্প।

হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ আটটি দ্বীপ নিয়ে। সব চেয়ে বড় দ্বীপ হাওয়াই। তারপর মাউই। কাউয়াই, ওআহু, মোলোকাই, নিহাউ আর লানাই। হাওয়াই আর মাউই-এর মধ্যে আরও একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে।

এই প্রত্যেকটি দ্বীপই ভগবানদের সন্তান। পলিনেশিয়ানদের ভগবানদের মা এবং ওদের আলোর দেবতা আকাশে বসবাস করতেন। তাঁদের মিলনের প্রথম সন্তান হাওয়াই দ্বীপ আকাশ থেকে ঝপাং করে জলে পড়ে। মানে, ভূমিষ্ঠ না হয়ে জলস্থ হয়। তারপর আরও দু-বার গর্ভবতী হন ভগবানের মা এবং একই ভাবে মাউই ও কাহুলায়ে দ্বীপের জন্ম হয়।

ওই তিনটি সন্তান জন্ম দেওয়ার পর ভগবানের মা তাহিতীতে ফিরে যান। আলোর ভগবান আকাশেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু সঙ্গিনী তাহিতীতে যেতে-না-যেতেই আকাশের ভগবান অন্য একজন নারীর সঙ্গে সহবাস করেন। সেই সহবাসে লানাই দ্বীপের জন্ম হয়। এবং আরেকজন রমণীর সঙ্গে সহবাসে মোলোকাই দ্বীপের জন্ম হয়। কিন্তু অচিরেই আলোর ভগবানের এই দুশ্চরিত্রতার কথা জানতে পেরে ভগবানদের মা তাহিতী থেকে ফিরে আসেন এবং তাঁর প্রেমিককে শাস্তি দেওয়ার জন্যে নিজেও একজন পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হন।

আকাশে বিছানা পাতা যেত কিনা জানা নেই। ভগবানদের পক্ষে সবই সম্ভব। হয়ত উড়তে-উড়তেই মিলিত হতেন তাঁরা। যে দৈবিক প্রক্রিয়াতেই তাঁরা মিলিত হন না কেন, পরপুরুষের সঙ্গে মিলনের ফলে ওআহু দ্বীপের জন্ম হয়।

এর পর ভগবানদের মা ও আলোর দেবতার পুনর্মিলন হয়। পুনর্মিলনের পরই ভগবানদের মা অন্তঃসত্ত্বা হন। কাউই দ্বীপের জন্ম হয়। তারপর একাদিক্রমে নিহাউ, কাউলা ইত্যাদি দ্বীপের জন্মের পর মা বন্ধ্যা হয়ে যান। হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি সমাপ্ত হয়।

অবশ্য ভূতত্ত্ববিদরা যা বলেন, তার সঙ্গে এই মিষ্টি রোমান্টিক জন্ম ইতিহাস মেলে না। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদদের তত্ত্ব নিয়ে এখন নাই-ই বা ব্যস্ত হলাম, তার চেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিয়ে লারার ঘরে যাওয়া যাক, লারা কবে এসেছে, কে জানে? যবেই আসুক। এসেছে যে, তাতেই আমি ভীষণ খুশি।

লারার ঘরের সামনের বেল টিপলাম। ভিতর থেকে লারার চাপা গলা শোনা গেল, কাম-ইন্ প্লিজ। আমি দরজার নব ঘোরাবার আগেই ও নিজে এসে দরজা খুলল। বলল, কাম অন্ ইন্।

সাধারণ আমেরিকানরা ও কানাডিয়ানরা প্রচুর ভুল-ভাল ইংরিজি বলে। ইংরেজরাও বলে। ভারতীয় স্বল্পশিক্ষিত মানুষেরও বোধহয় ইংরিজিজ্ঞান ও দেশের অনেকের চেয়ে ভালো। তবে লারা স্বল্পশিক্ষিতা নয়, রীতিমত উচ্চশিক্ষিতা। কিন্তু অন্য সকলেই ভুল বলে তাই চালু হয়ে গেছে অনেক ভুল কথা। আমার যদি টাকা থাকত তবে প্রত্যেক আমেরিকান ও কানাডিয়ানদের নিজের পয়সায় আমি নেসফিল্ড সাহেবের গ্রামারের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান চ্যাপ্টার ফোটো-কপি করে প্রেজেন্ট করতাম।

নিছক আমেরিকান বলে প্রতিপন্ন করার জন্যে আমেরিকানরা এতদিনের ঐতিহ্যময় ইংরিজি ভাষাটার সর্বনাশ করেছে। জাতীয় পোশাক বা খাবার অন্য হতে আপত্তি দেখি না কিন্তু জোর করে একটা ভাষাকে বদলে নিজেদের জাতীয় ভাষা করে নেওয়ার মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতা কাজ করে বলেই মনে হয়।

জানালার পাশের সোফায় আমাকে বসাল লারা। ওর ঘরটা আমার ঘরের চেয়ে অনেক বড়। দুপাশে দুটো খাট। অ্যাটাচড বাথ, ড্রেসিং টেবল, একটা সোফাসেট। পুরোপুরি কার্পেটে মোড়া। কালারড মালটি-চ্যানেল টিভি। প্রত্যেক ঘরেই।

রুম-সার্ভিসে টেলিফোন করে চা আনতে দিল ও। বলল, কী খাবে আর?

আমি বললাম, কিচ্ছু না। ইউনাইটেড এয়ারলাইনস যা ফাঁসির খাওয়া খাইয়েছে তা বলার নয়।

লারা হাসল।

মনট্রিয়ালে আমি যখন লারার সঙ্গে পরিচিত হই, তখন লারার একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ছেলেটি ক্যানাডিয়ান ইনটারন্যাশানালের কুইন এলিজাবেথ হোটেলে কাজ করত তখন।

লারার সামনে বসে ভাবছিলাম। ও একটা কালো ফুল-হাতা ম্যাক্সি পরে ছিল সেই প্রথম দেখার রাতে। কালো বনেট মাথায় দিয়ে, গভীর রাতে লাল গোলাপ ফুল বিক্রি করছিল ও মনট্রিয়ালের ডাউন-টাউনের বারে-বারে। ইংলিশ লিটারেচারে মেজর করছিল তখন ও ইউনিভার্সিটিতে। জাজ-ব্যালের ক্লাস, এবং ওখানকার একটা অ্যামেচার ড্রামা গ্রুপে থিয়েটারও করত। একই সঙ্গে। ওর ব্যক্তিত্বের শালীন, ভদ্র সম্ভ্রান্ততা আমাকে প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ করেছিল। সৌন্দর্য তো করেই ছিল।

এমন ওই সব দেশেই সম্ভব। ইউনিভার্সিটিতে মেজর-করা পরমাসুন্দরী যুবতী মেয়ে রাত বারোটায় ডাউন-টাউনের বারে-বারে ফুল ফিরি করে পড়াশোনার খরচ তুলছে। অথচ তবু কুৎসা রটছে না, আমাদের দেশের আদেখলাদের মতো সুন্দরী মেয়ে দেখেই মান-সম্মান রহিত হয়ে মাছি পড়ার মতো তার ওপর হামড়ে পড়ছে না ধেড়ে মদ্দ পুরুষগুলো। কারণ ও দেশের পুরুষরা সেক্স-স্টার্ভড নয়।

ওই প্রথম দেখার পরও আরও দুবার দেখা হয়েছিল লারার সঙ্গে। একবার মনট্রিয়ালেই, একটি বারে। আরেকবার টোরোন্টোতে যখন ও উইক-এন্ডে এসেছিল, গো-গো ডান্স দেখতে গিয়ে।

ওয়েটার চা এনে দিল টি-কোজিতে জুড়ে, ট্রেতে সাজিয়ে।

সুগার-কিউব হাতে তুলে নিয়ে লারা বলল, হাউ মেনি?

আমি বললাম, ওয়ান, থ্যাঙ্ক ইউ।

লারা হাসল। বলল, থ্যাঙ্ক ইউ নয়। বলো, মাহালো। তারপর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ছোট্ট প্যাকেটটা খুলে দুধ ঢালল আমার কাপে। লেবুর স্লাইস নিল নিজের কাপে।

আমি বললাম, হঠাৎ? হাওয়াইতে এলে?

বাঃ আমার ছুটি যে। তাছাড়া তুমি বোধহয় জানো না ছোটবেলায় আমি আমার মায়ের সঙ্গে এখানে ছিলাম ছ'বছর। তখন হনলুলু অন্য রকম ছিল। আমার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী, মানে আমার সৎবাবার আনারসের ব্যাবসা ছিল ওআহুতে। আমার ছোটবেলার অনেক স্মৃতি ছড়ানো এখানে।

আমি বললাম, খুব ভালো হল। তুমি তাহলে আমার লোকাল গার্জেন হয়ে যাও। হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখী, আমি যে পথ জানি না।

লারা হেসে উঠল গানটির ইংরিজি তর্জমা শুনে। বলল, তোমাকে এবং মনট্রিয়ালে অন্যান্য ভারতীয়দের দেখে খুব ভালো লাগে আমার। তোমাদের দেশে যাব একবার।

আমি বললাম, এনি টাইম। এবং যদি আসো, বি মাই গেস্ট। আমি তখন তোমার লোকাল গার্জেন হব।

লারা চা শেষ করে বলল, ঘরে বসে কী করবে? চলো ওয়াইকিকির রাস্তা ধরে হেঁটে আসি। ভালো লাগবে। ওয়াইকিকিতেই ইনটারন্যাশানাল মার্কেট সেন্টার আছে একটা বিরাট গাছের তলায়। ওরিয়েন্টাল ট্রি। তুমি নাম জানবে হয়ত। চলো।

আমি উঠলাম। তারপর দুজনে করিডোর দিয়ে লিফটে নেমে, লবি পেরিয়ে এসে পথে পড়লাম।

সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছে কিন্তু হাওয়াটা আমাদের সমুদ্রতীরের হাওয়ার মতো অত জোর ও বিরক্তিকর নয়। বালি ওড়ে না। পাঞ্জাবির সঙ্গে পায়জামা লেপ্টে যায় না, শাড়ি উড়ে হাঁটু বেরিয়ে পড়ে না। না! ও সব জ্বালাতন নেই। তাই-ই বোধহয় ওয়াইকিকি পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত সমুদ্রতট—। চান করার, সার্ফ-রাইডিং-এর, ওয়াটার স্কিয়িং-এর এমন জায়গা কমই আছে সারা দুনিয়ায়।

লারা আর আমি পাশাপাশি হাঁটছিলাম। কত আলো, কত লোকজন। আমাদের দেশের মতো নারকেল গাছ, পামগাছ, বটগাছ। খুব ভালো লাগছিল অনেকদিন পর এসব গাছ দেখে। সমুদ্রের দিকের ফুটপাথে দেবকন্যার মতো দেখতে একটি পনেরো-ষোলো বছরের আমেরিকান মেয়েকে একটি অল্পবয়সি হাওয়াইয়ান ছেলে বটগাছ চেনাচ্ছিল, বলছিল, লুক দিস ইজ আ ব্যানিয়ান ট্রি।

মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে বটের ঝুরি ধরে টানাটানি করছিল।

ওদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে এবং হাওয়াইন ছেলেটির চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখে ফিক করে হেসে উঠলাম আমি।

মানে, হাসি চাপতে পারলাম না।

লারা অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

বলল, হাসলে কেন তুমি?

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম। আমাদের দিকে অনেকে তাকাল। লারা লজ্জা পেল।

বলল, বলোই না কেন হাসলে?

আমি বললাম, বাংলায় একটা মজার গল্প আছে। এই ছেলেটি মেয়েটিকে যেমন করে বটগাছ দেখাচ্ছিল তাতে আমার সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল।

কী গল্প বলো না? লারা আমার হাতে-হাত ছুঁইয়ে বলল।

আমি বললাম, চাঁদ দেখার গল্প। ছেলেটি মেয়েটিকে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখাচ্ছিল, বলছিল, আহা! দেখো কী সুন্দর চাঁদ, কী চাঁদের আলো, আহা!

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি বলে উঠেছিল, বুঝছি-বুঝছি; তুমি আমারে চুমু খাবা। চাঁদের বিকল্প বটগাছ।

এবার লারার হাসির পালা। শব্দ বেশি করছিল না কিন্তু ওর সারা শরীর দুলে উঠছিল হাসির দমকে। এবারও অনেকে তাকিয়ে দেখল আমাদের দিকে।

কিছুদূর গিয়ে আমরা রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের ফুটপাথে উঠলাম। একটা বিরাট বটগাছে নানা রকম আলো দিয়ে সাজিয়েছে। তার ছায়ায়-ছায়ায় কত যে দোকান। পোস্টাফিস, রেস্টুরেন্ট, জামা-কাপড় স্যুভিনির খেলনা, পাগো-পাগো, মু-মু, হাওয়াইয়ান রঙিন প্রিন্টেড শার্ট। দোকানে-দোকানে ছয়লাপ। কী সুন্দর করে যে সাজানো আলোয়-আলোয় সমস্ত জায়গাটা তা বলার নয়। ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁ ও বারও আছে।

হনলুলু শহরটা বট, নারকেল, খেজুর, রঙ্গন, করবী, হেনা আর চাঁপা গাছে ভরা। এই সব ট্রপিকাল ফুল-ফলের গাছ পশ্চিমীদের চোখে এক বিস্ময়। যারা এশিয়াতে এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে আসেনি কখনও তাদের এই ওরিয়েন্টাল হাওয়াই-এর গন্ধ বর্ণের তীব্র আমেজ মাতাল করে ফেলে।

আমি বললাম, তুমি তো হাওয়াই-এ আগে ছিলে। এই আলোহা উইক কী এক সপ্তাহই? সারা বছরে?

লারা বলল, না, প্রায় মাসখানেক। প্রত্যেক বছর একই সময় হয় না। একটু এদিক-ওদিক হয়। পাঁচটা প্রধান দ্বীপে এক-এক সপ্তাহ করে হয় তাই সবশুদ্ধ পাঁচ সপ্তাহ হয়েই যায়। এই আলোহা ফেস্টিভালের ইতিহাস আছে। প্রাচীনকালে এখানে 'মাকাহিকি' উৎসব হত প্রতি বছর। হাওয়াই-এর সর্দাররা, যাঁদের ভূমিকা ছিল রাজার পরেই; ওই সময় সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন দেবতা 'লোনার' নাম করে। কর-টর আদায় হয়ে গেলে কর-আদায়কারী সর্দাররা এবং সাধারণ করদাতারা সবাই একসঙ্গে মিলে উৎসবে মাততেন দেবতা লোনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে। তখন ওই উৎসবকে থ্যাঙ্কস-গিভিং উৎসব বলত লোকে। 'মাহালো' উৎসব।

তারপরই লারা বলল, তুমি থাকবে ক'দিন?

বললাম, কতদিন আর। ছুটি তো বছরে পনেরো দিনের। তার মধ্যে সাতদিন তো ওয়েস্ট-কোস্ট-এই কাটিয়ে এলাম।

লারা বলল, তাহলে আজ রাতে বসে তোমার জন্যে একটা প্রোগাম বানিয়ে ফেলি। আমিও তো মাত্র কালই এসেছি। কেনেথের আসবার কথা ছিল আজকে। ফ্লাইট নাম্বার জানায়নি বলে এয়ারপোর্টে যেতে পারলাম না। এত জায়গা থেকে এত ফ্লাইট আসে হনলুলুতে যে আন্দাজে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।

আমি বললাম, কেনেথ মানে? কেনেথ হচনার? যার কথা তুমি বলেছিলে? তোমার মনট্রিয়ালের বয়-ফ্রেন্ড?

হ্যাঁ। লারা বলল।

তারপর বলল, আজও যদি না আসে কেনেথ তাহলে রাতে ফোন করবে হয়ত। ও যদি আসে তাহলে তোমাকে আমার পক্ষে বেশি সঙ্গ দেওয়া সম্ভব হবে না।

আমি হাসলাম। বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। ও এলে, আমি যে এখানে এসেছি তা তোমাকে বুঝতেই দেব না, তোমাদের নির্জনতায় কোনও বিঘ্ন ঘটাবো না আমি।

লারা মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে। নানা রঙা আলোয় ওর হলুদ আর কালো ফুল-ফুল ড্রেসে ওকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। কাঁধ অবধি কালো চুল নেমে এসেছে। ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি যেন। ওর সুন্দর দাঁতের সারি, ওর হাসিতে টোল পড়া গাল, ওর গায়ের হালকা পারফ্যুমের গন্ধ

সব মিলে মিশে আমার নেশা লাগছিল।

লারা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বলল, তুমি রাগ করলে?

আমি হাসলাম। কিন্তু সত্যি বলতে কী হাসতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। বললাম, তুমি আমার কে? তোমার ওপর রাগ করার অধিকার কোথায় আমার?

ও চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে আমার হাতে-হাত রেখে বলল, পৃথিবীতে কোনও অধিকারই কেউ নিয়ে জন্মায় না। অধিকার সৃষ্টি করে নিতে হয়। তুমি বড় বোকা আর সেন্টিমেন্টাল। আজকের দিনের কোনও মানুষের সেন্টিমেন্ট আছে নাকি?

আমি বললাম, নেই বলেই মনে হয়। কিন্তু থাকলে আমি খুব খুশি হতাম। সেন্টিমেন্ট না থাকলে মানুষ কি মানুষ থাকে? পশুদের তো সেন্টিমেন্ট নেই। তাহলে পশুদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কোথায়?

লারা মুখ ফেরাল আমার দিকে। বলল, জানি না। তবে কথাটা ভাবার মতো। ভাবব এ নিয়ে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে আমরা ফিরলাম।

আমরা স্বীকার করি আর নাই-ই করি জেট প্লেনে ওড়া-উড়ি করলে শরীরের ওপর তার এফেক্ট কিছু নিশ্চয়ই হয়। মানুষ মাধ্যাকর্ষণে বন্দি স্থলচর জীব, সে যদি হঠাৎ চল্লিশ হাজার ফিট উঁচুতে উঠে ঘন্টায় প্রায় হাজার মাইল বেগে একটা প্রেসারাইজড এয়ারকন্ডিশানড বাক্সে বসে হাজার-হাজার মাইল ছোটাছুটি করে তবে তার শরীরে সেই উড়ুনতুবড়ির যাত্রার কী ফল হয় না-হয়, তা এখনও বোধহয় পুরোপুরি নিরূপিত হয়নি। লম্বা প্লেনজার্নির পর আমার ঘাড়ের কাছে ব্যথা করে, গা ম্যাজম্যাজ করে।

হোটেলের কাছে এসে লারা বলল, কী করবে এখন?

আমি বললাম, বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে থাকব পনেরো মিনিট।

লারা বলল, আমিও। ঘেমে গেছি একেবারে।

তারপর তুমি কী করবে? আমি বললাম।

লারা বলল, একটু কাচাকাচি করতে হবে। আন্ডারগার্মেন্টিস। তারপর তুমিও চান করে আমার ঘরে চলে এসো।

আমি বললাম, তুমিই এসো না কেন আমার ঘরে। তোমার ঘর তো কেনেথের পায়ের শব্দের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে। আমার ঘরেই এসো।

লারা অদ্ভুত চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর দুষ্টুমির হাসি হাসল।

বলল, ঠিক আছে। আমিই আসব।

হোটেলে ঢুকে লারা ওর ঘরে গেল।

হোটেলের নীচেই একটা স্টেশনারি-কাম-ড্রাগ-স্টোর-কাম-পোস্টাফিস আছে। অনেকদিন পর গোল্ড-ব্লক টোব্যাকো পেলাম এই দোকানে। ডিলস পাইপ ক্লিনার। ঘরে এসে টিভি-টা খুলে দিয়ে, জানালার তাকে দু-পা তুলে দিয়ে বসে পাইপ খেলাম কিছুক্ষণ।

তারপর শাওয়ার খুলে দিয়ে খুব ভালো করে চান করলাম। চান-টান সেরে খালি গায়ে একটা হাওয়াইয়ান শার্ট পরে ট্রাউজার গলিয়ে বসে-বসে টিভি দেখতে লাগলাম।

ওয়াল্ট ডিজনির একটা ছবি দেখাচ্ছিল। ইয়ালোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের পটভূমিতে।

ছবিটাতে বুঁদ হয়ে গেছি এমন সময় ফোনটা বাজল।

ভারি, খসখসে গলায় একজন পুরুষ বললেন, মে আই স্পিক টু লারা প্লিজ?

আমি বললাম, লারা তো এখানে নেই?

এখানেই তো থাকার কথা। উনি বললেন, বিদ্রূপের গলায়।

তারপর অভব্যভাবে ভদ্রলোক বললেন, ওঁকে বলুন বিছানা ছেড়ে এসে ফোনটা ধরতে। ফোন ধরতে জামাকাপড় পরার দরকার নেই।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না।

বললাম, আপনি কে বলছেন?

ভদ্রলোক বললেন, প্লিজ টেল হার ইটস কেনেথ ফ্রম টরোন্টো।

ইতিমধ্যে আমার ঘরের ডোর-বেলটা বাজল।

আমি বললাম, আপনি একটু ধরবেন ফোনটা?

উনি বললেন, না! ধরতে পারা সম্ভব নয়। লারাকে বলে দেবেন যে আমি ফোন করেছিলাম। বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে দরজা খুলে লারাকে বললাম যে, কেনেথ ফোন করেছিল।

লারার চোখ-মুখ খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠল। ও ফোনের কাছে দৌড়ে এল। এসেই বলল, কই? ছেড়ে দিয়েছে!

লারা হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, আমার ঘর থেকে তোমার ঘরে আসতে গিয়ে লিফটে আমার এক ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা। লিফটটা নীচেই নামছিল, ওর সঙ্গে নীচে নেমে গেলাম লবিতে। সেখানে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট গল্প করে সোজা তোমার ঘরে আসছি।

আমি বললাম। আমার ঘরের নাম্বার কী করে পেল কেনেথ?

তাই-ই-ত? অবাক হল লারা।

লারা বলল, ও আমাকে বলেছিল যদি ফোন করে তবে রাত দশটার পর করবে। লারার দিকে চেয়ে আমার কষ্ট হল।

আমি টেলিফোনের কাছে উঠে গিয়ে হোটেলের অপারেটরকে চাইলাম। বললাম, আমার ঘরে একটু আগে টোরোন্টো থেকে যে কল এসেছিল সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছু জানেন কি না?

মেয়েটি সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল যে, জানে।

বলল, একটু আগে টোরোন্টো থেকে কেউ ফোন করেন হোটেলের রিসেপশানে। বলেন, মিস লারা ডস এই হোটেলে উঠেছেন কিনা। ওঁরা বলেন যে, উঠেছেন। এবং লারার ঘরে কানেকট করে দেন ওঁকে। সেখানে নো-রিপ্লাই হয়। তখন রিসেপশানের মেয়েটি আমার ঘরে কলটি দিয়ে, ও বলে যে আমাদের দুজনকে একই সঙ্গে বাইরে যেতে দেখেছে তাই লারা ওঁর ঘরে না থাকলে হয়ত আমার ঘরেও থাকতে পারে।

ফোন নামিয়ে রেখে আমি লারাকে বললাম, অপারেটর যা বলল। কিন্তু কেনেথ আমাকে যেসব কথা বলেছিল তা আর ওকে বললাম না। বলতে খারাপ লাগল।

লারা কথা না বলে ওর ব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট অ্যাড্রেস বই বের করে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল চিন্তান্বিত মুখে। এরিয়া কোড তারপর নাম্বার।

তারপরই কেনেথের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কিন্তু কী বলছিল তা বুঝতে পারছিলাম না আমি। কারণ ও ফ্রেঞ্চে কথা বলছিল। তবে ও যে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারছিলাম।

মনট্রিয়ালে যারা থাকে, তাদের ফ্রেঞ্চ না জেনে উপায় নেই। ফরাসি দেশীয় লোকের আধিপত্য সেখানে। কানাডায় যখন কুইন এলিজাবেথ টু এসেছিলেন তখন মনট্রিয়ালে তাঁকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করেনি মনট্রিয়ালের লোকেরা। মনট্রিয়াল পুরোপুরি ফ্রেঞ্চ ডমিনেটেড, মনট্রিয়ালের আরেক নাম, প্যারিস অব কানাডা।

কথা বলতে-বলতে, দেখতে-দেখতে লারার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। লারার চোখ জলে ভরে গেল। লারা দু-বার তিনবার রাগত স্বরে বলল, পাঁর্দো? পাঁর্দো? পাঁর্দো?

তারপর নিজের হাতের মুঠি পাকিয়ে নিজের হাঁটুতেই ঘুষি মারতে লাগল।

আমি মিথ্যা অছিলায় বাথরুমে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। জল খেলাম বেসিন থেকে এক গ্লাস। হঠাৎ যখন ঠক করে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ পেলাম তখন বাথরুম থেকে ঘরে এসে দেখি লারা আমার দিকে পিছন ফিরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিয়ে আমিও অনেকক্ষণ চুপ করে ওর পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আস্তে ডাকলাম, লারা।

লারা উত্তর দিল না।

আমি গিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম, দু-চোখের জলে ওর সুন্দর গোলাপি পোশাকটা ভিজে যাচ্ছে।

আমি বললাম, কোন কুক্ষণে যে এসে তোমার এত বড় সর্বনাশ করলাম।

আমি বললাম, লারা আমাকে ক্ষমা করো। আমার খুবই খারাপ লাগছে।

লারা কথা বলল না।

লারা চেয়ারে বসে পড়ল। বসে, আমার দিকে জলভরা চোখে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর লারা প্রথম কথা বলল।

বলল, কেনেথ যেসব অপমানকর কথা বলছিল তার জবাবে তুমি কিছু বললে না কেন ওকে? আমাকে ও অপমান করতে পারে, আমি এক সময় ওর প্রেমিকা ছিলাম সেই অপরাধে, কিন্তু তোমাকে কোন সাহসে অপমান করল ও?

আমি বললাম, আমি তো কিছু মনে করিনি। তাছাড়া একজন অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে ফোনে ঝগড়া করার মানে কী হত? তাছাড়া তুমি যাকে ভালোবাসো, যে তোমার বন্ধু, তার সঙ্গে আমি কোন নির্বুদ্ধিতায় ঝগড়া করব? আমার কথা তুমি একেবারেই ভেবো না। সে আমাকে দেখেইনি কখনও, আমিও দেখিনি তাকে, তাই মান-অপমানের কথাই ওঠে না।

লারা বলল, আই পিটি হিম। ওকে ভালোবেসেছিলাম বলে আমি অনুতপ্ত, লজ্জিত, দুঃখিত। ও এত ভীরু যে সোজা কথাটা সোজা করে বলতে পারল না। বলতে পারল না যে, ও ক্রিস্টিনের খপ্পরে পড়েছে। আমি কী ওকে জোর করে আটকে রাখতাম? জোর করে কি কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারে, না কারো ভালোবাসা পেতে পারে?

আমি শুধোলাম, ক্রিস্টিন কে?

লারা বলল, ওদের কোম্পানিতেই কাজ করে। টোরোন্টো যাওয়ার পর থেকেই ও ক্রিস্টিনের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক উইক-এন্ডে ওর অ্যাপার্টমেন্টেই থাকে, বেড়াতে যায়। কী করব। ভালোবেসেছিলাম বলে দুঃখ পেতেই হবে।

আমি বললাম, লারা শান্ত হও। তুমি ভালো মেয়ে, মিষ্টি মেয়ে। তোমার কষ্ট দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।

লারা চোখ তুলে বলল, কেন? আমি তোমার কে? আমার কষ্ট দেখে তোমার কষ্ট হওয়া ভুল, মিথ্যা। আমার কষ্ট আমি একাই বইতে পারি। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আই ডোন্ট নিড ইওর সিমপ্যাথি। ফর দ্যাট ম্যাটার আই ডোন্ট নিড এনিবডিজ সিমপ্যাথি।

আমি চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম, লারা আমি তোমাকে কী-ই বা দিতে পারি? তুমি আমার কেউ নও। কেউ হবে না কোনওদিন। আমিও হব না তোমার। আর এক বছর পরই ফিরে যাব আমি আমার দেশে পড়াশোনা শেষ করে। আমি তোমাকে স্থায়ী কিছুই দিতে পারব না। কিন্তু তা বলে, যা দিতে পারি, একজন মানুষ অন্যজনকে যা দিতে পারে, ভালো ব্যবহার, ভালোবাসা, সমবেদনা, সাহচর্য তাই-ই বা দেব না কেন? আর দিতে গেলে তুমি ফিরিয়েই বা তা দেবে কেন?

কিন্তু আমি মুখে কিছুই বললাম না। চুপ করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুধু বললাম, লারা আমি সত্যিই বড় দুঃখিত। আমি তোমার সর্বনাশ হয়ে এলাম এই হাওয়াইতে। এ বড় লজ্জার।

লারা বলল, তুমি আমার ভালো করবারই কে আর সর্বনাশ করবারই কে? তুমি নিজের ইমপর্ট্যান্স বড় বেশি দিচ্ছ।

তারপরই আমাকে ধমক দেওয়ার মতো করে বলল হঠাৎ, ওয়াচ আউট! অর ইউ উইল হিট দ্যা সিলিং।

একটুক্ষণ পরে চুপ করে বসে থেকে লারা উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করার আওয়াজ হল কটাং করে। দরজার আওয়াজের সঙ্গে ছিটকে এল, গুড নাইট।

পশ্চিমের মানুষরা বড় বেশি আত্মনির্ভরশীল। একটু কম হলে বোধহয় ভালো হত। নিজের সব শোক, দুঃখ, অসুবিধা, সব ওরা একা-একা নিজেরাই বইতে চায়। অন্য কেউ তার হয়ে তা বইতে গেলে অপমানিত বোধ করে। এমন কী পথচলা ক্রাচে ভরকরা পুরুষকে সাহায্য করতে গেলেও সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। এদের চরিত্র আর আমাদের চরিত্র অন্যরকম। পশ্চিমে বেশ কিছুদিন থেকে বুঝতে পাই এটা।

আমি অবসন্ন ও বিষণ্ণ বোধ করছিলাম। লারা যদি পুরুষ হত তবে আমি ওর ঘরে গিয়ে থাকতাম আজ রাতে। ওকে ওর এই মানসিক বিপর্যয়ের সময় সাহায্য করতাম। ওকে হাসাতাম, ওকে নিয়ে বাইরে বেরোতাম, সারা রাত কোথাও কোনও রেস্টুরেন্টে কি নাইটক্লাবে গিয়ে হই-হই করে ওর মনের দুঃখ ভুলিয়ে দিতাম। কিন্তু চাঁদে যখন মানুষ পা দিচ্ছে, পৃথিবী যখন ভীষণ-ভীষণ-ভীষণ আধুনিকতার আত্মশ্লাঘায় ন্যুব্জ হয়ে রয়েছে ঠিক তখনই যেহেতু বিধাতা লারার শরীর আর আমার শরীর বিভিন্নভাবে গড়েছেন এই অপরাধে এই মুহূর্তে ওর জন্যে আমার কিছুই করার নেই।

আমার ঘরে কেনেথের কলটা দেওয়াতে বোধহয় ওদের সম্পর্ক যেটুকু ছিল, সেটুকুও নষ্ট হয়ে গেল। এ-কথাটা ভেবে আমি এমন স্তম্ভিত হয়েছিলাম যে তা বলার নয়।

আমি একবার উঠে, আবার টিভি-টা চালিয়ে দিলাম। তারপর জুতোটা খুলে পা-দুটো তুলে খাটের ওপরে পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বসলাম। সেই ছবিটা আবার শুরু হল, ডগ-ফিড, ক্যাট-ফিডের বিজ্ঞাপনের পর। যে জগত আমার নিজের, যে জগতে গেলে আমি বড় শান্তি পাই, যেখানে মানুষ নেই, নারী-পুরুষের শরীর মনের কোনও রকম বিভ্রাট নেই সেই আদিম অরণ্যের জগতে ফিরে গেলাম ওয়াল্ট ডিজনির ছবি দেখতে-দেখতে।

পুরানো হাওয়াই

কে যেন আমার মাথার কাছে কথা বলছিল, কারা যেন কথা বলছিল। গরমের সময় স্কুল ছুটি হল। আমি বন্ধুদের সঙ্গে বই-খাতা শ্লেট হাতে নিয়ে গ্রামের লাল মাটির পথ বেয়ে ধুলো উড়িয়ে ছায়া ঢাকা আমের বোলের গন্ধে ভরা ঘুঘু ডাকা, ফড়িং-ওড়া মন্থর দুপুরে বাড়ির দিকে ফিরে আসছিলাম।

এমন সময় আমার পিছনে, পাশে সামনে কারা যেন কথা বলে উঠল।

টুং-টুং-টাং-টুং করে দরজার বেলটা বাজল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি যে অবস্থায় কাল বালিশে পিঠ দিয়ে টিভি দেখছিলাম সেই অবস্থাতেই শুয়ে আছি। খালি পায়েই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললাম। টিভি-টা তখনও চলছিল।

দরজা খুলতেই দেখি লারা দাঁড়িয়ে।

চান করেছে। একটা সমুদ্রের গায়ের রঙের মতো নীল গাউন। প্রসাধন করেছে। ওর সারা শরীর থেকে পারফিউমের গন্ধ উড়ছে। আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লারা। বেশ লম্বাও। ওর মাথাটা

আমার বুকের কাছে।

লারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ও ঘরে ঢুকল। টিভি-টা চলছে দেখল, আমার বিছানা দেখল, পোশাক দেখল, তারপর কথা না বলে স্যুইচ টিপে টিভি-টা বন্ধ করে দিল। জানালার কাছে গিয়ে পরদা সরাল পুরোটা। এ-ঘরে পুবের রোদ আসে না, পশ্চিমের আসে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ওর বাঁ হাতের ঘড়ির ওপর ডান হাতের তর্জনী রেখে বলল, ক'টা বেজেছে জানো?

ক'টা? আমি বাচ্চাছেলের মতো বললাম।

লারা বলল, ন'টা।

তারপর ও চেয়ারে বসে বলল, কাল সারারাত কী করেছ? ঘুমোওনি? জামাকাপড়ও তো ছাড়োনি, টিভি-টাও চলছিল।

একটু থেমে বলল, কেন? ঘুমোওনি কেন?

আমি বললাম, নাঃ, ঘুমিয়েছিলাম তো। দেখছ না বেশিই ঘুমিয়েছিলাম। দেশ দেখতে এসে কেউ ইচ্ছে করে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করে?

কাল রাতে কী খেয়েছ? লারা শুধোল।

আমি বললাম, মনে নেই।

তুমি খাওনি। লারা বড়দির মতো স্নেহ-মাখা গলায় ধমক দিল।

তারপর বিড়বিড় করে নিজের মনে বকল, ইউ সিলি ফুল। ইটস আনবিলিভেবল।

আমি দাঁড়িয়ে স্যুটকেশটা খুলে জামাকাপড়ের চেঞ্জ বের করছিলাম, এমন সময় লারা চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এক দৌড়ে চলে এল, এসে দুটি হাত আমার দু-কাঁধে ছুড়ে দিয়ে ওর মুখটা আমার বুকে রেখে কী সব বিড়বিড় করে বলতে লাগল। সে সব আমার সম্বন্ধে এত ভালো-ভালো কথা যে আমার লিখতেও লজ্জা করছে।

আমি শুধু বললাম, দাঁত মাজিনি, মুখে গন্ধ; দাড়ি কামাইনি আমি।

লারাকে প্রথম দিন দেখেই ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসার অনেকানেক রকম আছে। সে এক অন্যরকম ভালোবাসা। যে কেউ কাউকে ভালোবেসেছে কখনও সেই-ই জানে যে ভালোবাসার জন যদি দৌড়ে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন শরীর ও মস্তিষ্ক অবশ হয়ে যায়। তখন ভালো লাগা যা করিয়ে নেয়, তাই-ই করে মানুষ। পুরুষ কী নারী।

লারা শান্ত হয়ে ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসল। বলল, এখন শুধুই মুখ-টুখ ধুয়ে দাড়িটা কামিয়ে নাও। চলো, লেটস গো ফর আ সুইম। ওয়াইকিকিতে এসে সুইম না করে চলে যাবে তা হবে না।

আমি বললাম, সুইম স্যুট নেই আমার।

লারা বলল, কিনে দেব আমি তোমায়। নীচের দোকানেই পাওয়া যায়।

আমি বললাম, বেশি বড়লোক হয়েছ না? তার চেয়ে চলো তুমি সাঁতার কাটবে আমি বিচে লাল-নীল ছাতার নীচে বসে বিয়ার খেতে-খেতে তোমাকে দেখব। আমিও কাটব সাঁতার, কল্পনায়; তোমার পাশে-পাশে।

বলেই বললাম, তুমি পাঁচ মিনিট বসো। আমি চান সেরে আসছি।

চান-টান করে নিয়ে আমি আর লারা ডাইনিং রুমে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। ফ্রুট-জুস, স্ক্রাম্বলড এগস উইথ ব্যাকন। টোস্ট ও কফি।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম বিচে।

চারদিকে কত আনন্দ, কত খুশি, কত রং-বেরঙের স্নানের পোশাক। মোটামোটা আমেরিকান

মেয়ে-পুরুষ সাঁতরাগাছির ওলের মতো জলে ভাসছে, রোদ পোয়াচ্ছে। নৈনিতাল আলুর মতো গোল-গাল জাপানিরাও কম নেই। চেঁচামেচি, জলের মধ্যে উলটো-পালটি, পপ-কর্ণ, নানা রঙা ক্যান্ডি, হট ডগ; কোকাকোলা ও বিয়ারের মোচ্ছব লেগেছে।

হঠাৎ-হঠাৎ রসভঙ্গ করে মাইক্রোফোনে হোটেল থেকে চিৎকার করছে, মিস্টার সো এন্ড সো, কল ফর ইউ ফ্রম নিউইয়র্ক, অথবা টোকিও।

সাহেব প্রশান্ত মহাসাগরের জল থেকে উঠে প্রাগৈতিহাসিক কচ্ছপের মতো থপথপ করে দৌড়ে গেলেন হোটেলে ফোন ধরতে। এদের মিনিটে দশ হাজার ডলার রোজগার বোধহয়। কাজ আর ছুটিকে টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীরা কখনও আলাদা করতে জানে না—যারা বড় ব্যবসায়ী। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম দেখিনি কোনও।

লারা আর আমি মুখোমুখি বসেছিলাম চেয়ারে। আমাদের চতুর্দিকে নীল সমুদ্র রোদে চিকচিক, সাদা ফেনা, ভেজা-গায়ের ছেলে-মেয়ে যুবতীরা। সানগ্লাসে বড়দের সকলেরই চোখ ঢাকা। এরা কে কোন দিকে চেয়ে আছে এবং কে কী ভাবছে তা বোঝার উপায় নেই। চতুর্দিকে নড়ে-চড়ে বেড়ানো মানুষগুলোকে ঠুলিপরা মনহীন অতিকায় কিলবিলে পোকা বলে মনে হচ্ছে।

ওয়াইকিকি বিচে বসে, লারার কথাই ভাবছিলাম। পশ্চিমের মেয়েরা শুধু আদর খেতে জানে যে, তাই-ই নয়, আদর করতেও জানে। আমি কোনও বাঙালি মেয়েকে জানি না যে লারার মতো প্রিয়জনকে দৌড়ে এসে এমন করে জমজমিয়ে চুমু খায়। আসলে আমাদের মেয়েরা বড় সংস্কারাবদ্ধ। প্রেমের মধ্যে শরীরের মধ্যে যে লুকোবার কিছু নেই, মনের মতোই তার বহিঃপ্রকাশ যে বিচিত্র ও মধুর তারা যেন জেনেও জানে না। এতে তারা তো ঠকেই কিন্তু তারা অন্যজনকে যে কতখানি ঠকায় তা তারা নিজেরা কখনও জানতেও পারে না। বহু বিবাহিত বাঙালি পুরুষ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে শুনেছি যে, তাঁদের কোনারক ও খাজুরাহের দেশের স্ত্রীরা তাঁদের সামান্যতম আবদারের জবাবে বলেন, 'আমার দ্বারা হবে না, অন্য মেয়ের কাছে যাও।' সত্যি-সত্যিই যে তাঁরা যান না, এটা তাঁদের স্ত্রীদের যে কত বড় সৌভাগ্য তা স্ত্রীরা জানেন না। এবং এ-বাবদে বাঙালি স্ত্রীদের একতার তুলনা নেই। পুরো জাতটাকে জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিসংবাদী ক্ষেত্রে একঘেয়েমি ও-প্রাণহীনতার শিকার করে রেখেছেন তাঁরা তাঁদের সংস্কারাচ্ছন্ন অনুদার মনোভাবে।

আশা করব বাঙালি স্বামী মাত্রই তাঁদের পক্ষ নিয়ে আমার এই সাহস প্রদর্শন সমর্থন করবেন এবং আমাকে স্ত্রীকুলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন।

আমি বললাম, বলো লারা তুমি কী খাবে?

লারা বলল, কোক।

আমি বললাম, যখন আমি কানাডাতে গেছিলাম তখন তোমাকে একদিনও সফট ড্রিঙ্কস নিতে দেখিনি। আজ হঠাৎ?

লারা হাসল। নীল গাউনটাতে ওকে লাল-নীল-হলুদ ছাতার নীচে প্রতিসরিত আলোতে এত ভালো দেখাচ্ছিল যে কী বলব।

বলল, তখন আমার চারধারে সব হার্ড পুরুষেরা ভীড় করেছিল। তোমার মতো সফট পুরুষ আমি দেখিনি। যে একজন স্বল্প পরিচিত মানুষের দুঃখে না খেয়ে থাকে—এতখানি ইনভলভড হয়।

তারপর হেসে বলল, আমি সফট ড্রিংকসই নেব।

আমি বললাম, আমিও তাহলে কোকই নেব। এই সবে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এলাম।

লারার দিকে তাকিয়ে মনে হল সত্যিই আমি হয়ত ওর কাল রাতের দুঃখের অনেকটাই শুষে নিয়েছি। আজ এই আলো হাওয়া। চারধারের এত আনন্দের মধ্যে কাল রাতের মন খারাপের কথা বোধহয় ও ভুলেই গেছে।

দেখতে-দেখতে ওর চোখে কী সব ভাবনা ভিড় করে এল। মুখটা হাসি-হাসি হয়ে উঠল, চোখ দুটো ভাবালু।

আমি ওর দিকে চেয়ে হাসলাম। বললাম, কোথায় চলে গেলে তুমি? কত দূরে?

ও বলল, জানো, ভাবছিলাম, আজ এখানে কত হইহই, বাড়ির পর বাড়ি, কংক্রিটের রাস্তা, বিজলি আলো—। এই সমুদ্রতটের আজকের চেহারা দেখে পুরোনো হাওয়াই-এর জীবনযাত্রার কথা মনে আনতেও বুঝি রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়। তাই না?

তারপর বলল, যে জীবনের কথা আমি বলছি ও ভাবছি সে জীবন অবশ্য আমার চোখে দেখা নয়, বইয়ে পড়া। তখন রাজা প্রথম কামেহামেহা পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হননি। আমি ভাবছি, ক্যাপ্টেন টমাস কুক যে হাওয়াইকে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই ঘুমন্ত, সুন্দর, ফুলে-ফলে পাখি, প্রজাপতিতে ঘেরা প্রাকৃত হাওয়াই-এর কথা।

একটি মেয়ে গলায় নরম কাপড়ের বাকলস আঁটা রাজহাঁসের মতো একটা পাখিকে নিয়ে বিচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

আমি বললাম, কী পাখি ওটা? কখনও তো দেখিনি?

লারা বলল, নেনে। তুমি জানো না?

আমি শুধোলাম, নেনে পাখি কী পাখি? তুমি তো এখানকার অনেক খবর রাখো।

লারা অবাক হল, বললে, 'নেনে' এখানকার ন্যাশনাল বার্ড। নেনে কিন্তু প্রাণীতত্ত্বের এক উজ্জ্বল আবিষ্কার ও বিস্ময়। এরা আসলে রাজহাঁস ছিল। কিন্তু এই আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত শক্ত লাভার দেশে বসবাস করার জন্যে এবং এদের পায়ের জোড়া পাতাকে বদলে নখের মতো করে ফেলেছে। বড়-বড় রাজহাঁসসুলভ ডানাগুলো স্বল্প দূরত্ব সহজে উড়ে বেড়ানোর জন্যে ছোটও করে নিয়েছে। কতদিনের সচেতন চেষ্টায় এই পাখিরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তা এরাই জানে। তবে প্রকৃতির মধ্যে সম্ভবকে অসম্ভব করার মন্ত্র খুঁজে পেয়েছে এরা। নেনেই হাওয়াই-এর সব চেয়ে বড় স্থলচর পাখি। এখন সমস্ত হাওয়াই-এ সাড়ে তিনশো মতো নেনে আছে। তবে ওআহু দ্বীপে নেই। শিকারি আর জংলি জানোয়ারদের দৌরাত্ম্যে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল ওরা। উনিশশো উনপঞ্চাশ সনে আইন করে নেনেকে রক্ষা করতে হয়। হাওয়াই-এর মোউনা-লোআ পাহাড়ের ঢালে হুয়ালালাইতে আর হালেআকালা ক্রেটারে এদের জন্যে অভয়াবাস করা হয়েছে। পোষা পাখিদের বাচ্চা হলেও সেই নেনের বাচ্চাদের এই সব অভয়াবাসে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়।

আমি উঠে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে আমাদের দুজনের জন্যে দুটো কোক নিয়ে এলাম। লারার কোকটা দিয়ে বললাম, এবার বলো যা বলছিলে। পুরোনো হাওয়াই-এর কথা। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমার হাওয়াই বেড়ানো বিফল হত। কিছুই জানতে শুনতেই পারতাম না জায়গাটা সম্বন্ধে। কী বলো?

লারা বলল, কেন? ফিরেও জানতে পারতে। বই পড়লেই জানা যায়। জানতে বাহাদুরি কী?

শুধু বই পড়লে এক রকম জানা হয় আর নিজের চোখে দেখলে অন্যরকম।

তা ঠিক। লারা বলল।

আমি বললাম, কথায়-কথায় কথা ঘুরে যাচ্ছে। বল, শিগগিরী বল।

লারা ওর কোকে একটা চুমুক দিয়ে বলল, আমরা যেখানে বসে আছি। সমুদ্রের ঢেউ আগে এখান অবধি আছড়ে পড়ত। ওয়াইকিকি সমুদ্রতট কিন্তু মানুষের তৈরি, তা জানো তো। সাঁতার কাটার, স্কিয়িং-এর সুবিধার জন্যে সানসেট বিচ থেকে ড্রেজারে করে বালি কেটে বার্জ-এ করে অনেক বছর ধরে সে বালি বয়ে এনে-এনে এখানের সমুদ্রকে ভরাট করে ওয়াইকিকি তৈরি হয়েছে।

আমি বললাম, তাই-ই বল। এসে অবধি মনে হচ্ছিল কী নেই, কী যেন পাচ্ছি না। খোদার ওপর খোদকারি। এই জন্যেই তো সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছিলাম না এর মধ্যে। আমাদের দেশের ফরেস্ট

ডিপার্টমেন্টের কর্তারা যেমন প্রকৃতিকে সুন্দরতর করতে সিমেন্ট দিয়ে পাথর দিয়ে লাল, নীল রং দিয়ে বনপাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সর্বনাশ করেন এরাও দেখছি তাই-ই করেছে। ছিঃ-ছিঃ। ঘেন্না হয়ে গেল ওয়াইকিকির ওপর।

লারা বলল, তুমি রাগছ কেন? তুমি তো আর সাঁতার কাটছ না। ছেলেমেয়ে পরিবার সকলকে নিয়ে সাঁতার কাটার জন্যে সেফ এন্ড সাউন্ড করে দেওয়া হয়েছে বিচটাকে অগভীর করে। খারাপ কী?

আমি বললাম, যাই-ই হোক। আমি এই মডার্ন ওয়াইকিকির কথা শুনতে চাই না। তুমি পুরোনো হাওয়াই-এর কথা বলো।

একটু চুপ করে থেকে লারা বলতে লাগল, মনে করো, ওই যেখানে কিয়স্ক কফি-বারটা আছে ওখানে একটা খড়ের ঘর। মনে করো, সমুদ্রের ধারের প্রথম ঘর। সকালের সমুদ্র দিগন্ত অবধি রোদে চিকচিক করছে। চারিদিকে কী নির্জনতা। কোলাহলহীন শান্তি। হু-হু করে নারকোল খেজুর পামের মাথায় দোল লাগিয়ে হাওয়া আসছে সমুদ্র থেকে। মেয়েরা ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একটি ছোট মেয়ে আধমাইল হেঁটে গেছিল জঙ্গলের ভিতরের ঝরনাতে কাঠের পাত্রে জল বয়ে আনতে। ঘরের কাছের ঠান্ডা হাওয়াতে তার মা হয়তো পেপার মালবেরির ঝোপের ছাল বাকড় কাঠের ওপর ধোপ দিচ্ছে। 'কাপা' কাপড় তৈরি করবে সে। ছালের ফালিগুলোকে জলে ভিজোনো হয়েছে, শুকোনো হয়েছে রোদে এবং কোটা হয়েছে আগে। এখন শেষবারের মতো ধোপ দেওয়া হচ্ছে ওগুলোকে। একটা চার ফলাওয়ালা কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে ধোপ দিচ্ছে সে। প্রত্যেকবার আছড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে সেই চারফলার প্রত্যেক ফলায় যে জ্যামিতিক প্যাটার্ন খোদাই করা আছে সেগুলোর ছাপ পড়ছে কাপাতে। মেয়েটির মা কাপা কাপড় ফাঁপা একটা কাঠের ওপর কাঠের একটা ডাণ্ডা দিয়ে বাড়ি মারছে।

তার সেই বাড়িমারার ধর-ধর শব্দের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকের উজ্জ্বল সবুজ নিরবচ্ছিন্ন ট্রপিক্যাল বনে-পাতায়। সমুদ্রের হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিধ্বনির টুকরোগুলিকে, মিশিয়ে দিচ্ছে পাথরে-পাথরে ছিটকেওঠা সমুদ্রের ফেনিল জলবিন্দু আর হাওয়ার সঙ্গে।

পুরোপুরি ধোপ দেওয়া ও কোটা হয়ে গেলে 'কাপা' কাপড়টি মেলে দেওয়া হবে রোদে শুকোবার জন্যে। আর যদি সময় থাকে তাহলে ওর ওপরে নানা রঙের নক্সাও কাটা হবে।

উলঙ্গ ছোট্ট-ছোট্ট শিশুরা গ্রামের পথে উঠোনে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। কুস্তি লড়ছে একে অন্যের সঙ্গে। কেউ-কেউ সগর্বে তার বাবা কি দাদাকে অনুকরণ করছে। পাথর গড়িয়ে-গড়িয়ে কার নিশানা ভালো তার পরখ করছে। বাঁশের চোঁচকে বর্শা মনে করে নিয়ে খেলার লড়াই লড়ছে একে অন্যের সঙ্গে।

একটু থেমে আরেক ঢোক কোক খেয়ে লারা বলল, হাওয়াইয়ান ছেলেমেয়েরা তখন যখনই হাঁটতে শিখত প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সমুদ্রে যেত। জল কি স্থল দুই-ই তাদের কাছে সমতুল ছিল। চারিদিকে প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টিত এই দ্বীপগুলোর বাসিন্দারা তখন সত্যি-সত্যিই উভচর ছিল বলতে গেলে। জল ও স্থলে ছিল তাদের সমান আয়াস।

মেয়েরা কাজেকর্মে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাঝে-মাঝে যাতায়াতের পথে তারা ছেলেমেয়েদের কাউকে বকে-ঝকে, কাউকে খেপিয়ে চলে যাচ্ছিল। শিশুরা তখন একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল না। তারা আনন্দের বাহক, আনন্দের মধ্যে সৃষ্ট এবং আনন্দের পরিপূরক ছিল।

ওদিকে বিকেলের ভরা রোদে বড় ছেলেরা তাদের ক্যানোটাকে সমুদ্র থেকে তীরে টেনে তুলে একটা নারকোলকুঞ্জের নীচে রাখল বালিতে। তারপর বাড়ির দিকে মুখ করে সকলে একসঙ্গে দৌড়ে আসতে লাগল দুড়দাড় করে। দৌড়বার কারণও ছিল। অনেক মাছ ধরা পড়েছিল। অথচ বছরের ঠিক এই সময়ে বেশি মাছ পাওয়ার কথা নয়। তাই ওদের আনন্দ। ওদের পারিবারিক

ভগবানের কৃপা ছাড়া এত মাছ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

এরপর, ওই যে বড় হোটেলটা দেখছ, ওইখানে সবুজ বনের মধ্যে যে সুঁড়িপথ ছিল তখন সেই পথ দিয়ে বাবা আর একটি বড় ছেলে ক্ষেত থেকে টারো আর যাম নিয়ে ফিরল। এত খাওয়ার যে রীতিমতো ভোজ লাগানো যায়। পুরুষেরা, বাবা ফেরা মাত্র তক্ষুনি 'ইমু' ঠিক করতে লেগে গেল। উনুনকে ওরা ইমু বলতো। যখন কাঠগুলো উজ্জ্বল লাল কয়লা হয়ে উঠল পুড়ে তখন মাছ, যাম আর টারো সবটাই পাতায় মুড়ে পাথরের ওপরের টকটকে লাল আগুনে দিয়ে দেওয়া হল ভাপে সেদ্ধ হওয়ার জন্যে। একটা মাছকে কিন্তু ইমুতে দেওয়া হল না। সে মাছটা পুরুষরা সকলে মিলে কাঁচা খেল মজা করে। মাথা-ল্যাজা, নাড়িভুঁড়ি, পিত্তি সব সমেত। ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে বা একাসনে খাওয়ায় মেয়েদের 'কাপু' ছিল। ছেলেদের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরই শুধু মেয়েরা খেতে পারত।

আমি বললাম, আগে আমাদের দেশের মেয়েরাও তাই-ই করত। কাপু মানে কী?

লারা বলল, কাপু মানে মানা, নিষেধ, ট্যাবু। তখন হাওয়াইয়ান সমাজে হাজার-হাজার কাপু ছিল। আড়াআড়ি করে লাঠি রেখে দিত এখানে সেখানে পুরুতরা। সেখানে যাওয়া কাপু ছিল সকলের। কত রকম যে কাপু ছিল তার ইয়ত্তা নেই।

আমি বললাম, এখন ভাগ্যিস কাপু নেই। থাকলে তুমি আমার সঙ্গে বসে এখানে কোক খেতে পারতে না।

যা বলেছ। হেসে বলল লারা।

তারপর একটু কোক খেয়ে আবার শুরু করল লারা।

এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ওকে সেই পুরোনো হাওয়াই যেন হাতছানি দিচ্ছে। প্রথমে শোনার আগ্রহ আমার যত ছিল এখন বলার আগ্রহ ওর তার চেয়ে বেশি।

রান্না হতে-হতে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। তারপর ধীরে-ধীরে সমুদ্রের ওপর পশ্চিম দিগন্তে নিভে গেল। আকাশে যদিও লালের ছোপ তখনও কিন্তু গ্রামের বাড়িগুলোতে প্রায় অন্ধকার নেমে এল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ঘুমোবার ঘরে সকলে যে যার মাদুরের ওপর বসে বা শুয়ে পড়ল। মেয়েরা কাপা কাপড় টেনে নিল কাঁধের ওপর রাতের শীতের ভয়ে। মেঝের মাঝখানে একটা শীষতোলা প্রদীপ জ্বলতে লাগল। কিন্তু মোমের তৈরি প্রদীপ নয়। পাথরের থালার ওপরে এক ছড়া কুকুই বাদামে আগুন লাগিয়ে দেওয়া প্রদীপ। এই প্রদীপ থেকে এক আবছা কাঁপা-কাঁপা আলো ঘরময় ছড়িয়ে গিয়ে নাচানাচি করছিল। দেওয়ালে নিজেদের নৃত্যরত ছায়া দেখে চমকে উঠছিল ছেলেমেয়েরা। প্রদীপ থেকে ওঠা ধুঁয়োয় পাতায় ছাওয়া ছাদ আর পাতার দেওয়ালের খাঁজ-খোঁজ ভরে উঠল।

যখন আবহাওয়াটা ঠিক গল্প শোনার মতো হয়ে উঠল তখন ছোটরা বয়োজ্যেষ্ঠকে ধরত, গল্প বলো। উমির গল্প বলো।

এই অবধি বলে, লারা কোকের গ্লাস শেষ করে ফেলল। ফেলেই বলল, আর না।

আমি বললাম, প্লিজ বলো। তোমার গল্প শুনতে-শুনতে আমি যেন কোথায় চলে গেছিলাম। সে হাওয়াইই দেখলাম না! আর আজ কী এই অ্যামেরিকান হাওয়াই দেখতে এলাম আমি!

বলো, লক্ষ্মীটি বলো, বলে আমি লারাকে অনুরোধ করলাম।

লারা হেসে বলল, আমি কী তোমার ঠাকুরদাদা যে তোমাকে উমির গল্প শোনাব?

আমি হেসে বললাম, শুধু ঠার্কুরদা কেন? তুমি আমার সব, লক্ষ্মীটি।

লারা ব্যাগ থেকে বের করে ওর সানগ্লাসটা পরে নিল। বলল, চোখে বড় চমক লাগছে। রোদটা লক্ষ-লক্ষ পায়ে সমুদ্রের ওপর এমন করে নাচছে না।

আমি বললাম, নাচলে নাচুক, তুমি সানগ্লাসটা খোলো তো। তোমার অমন চোখ দুটো না দেখা গেলে তোমার গল্পের মানেই বুঝতে পারব না আমি।

লারা হাসল। বলল, তুমি লোককে কমপ্লিমেন্ট দিতে জানো বটে।

আমি হাসলাম না। বললাম, আমরা চোখের দেশের লোক। আমাদের অভিধানে চলতি ভাষায় তোমাদের মতো থ্যাঙ্ক ইউ, প্লিজ-এর ছড়াছড়ি নেই। আমরা কাউকে কখনও মুখে বলি না, আই লাভ ইউ। মেক লাভ টু মি তো বলার প্রশ্নই ওঠে না।

লারা চোখ থেকে সানগ্লাসটা নামাতে-নামাতে অবাক গলায় বলল, তাহলে কী করে ওই সব বলো তোমরা?

আমি বললাম, সবই বলি। কিন্তু চোখ দিয়ে বলি। তোমাদের চেয়ে অনেক মিষ্টি করে অনেক লাজুক, নরম, সৌন্দর্যের সঙ্গে বলি। আমরা চোখ দিয়ে কথা বলি। মুখ দিয়ে নয়। চোখের ভিতর দিয়ে কথা শুনিও। তাই আমার সামনে কখনও চোখ ঢেকো না তুমি।

লারা আমার চোখের দিকে চাইল। এই প্রথম ও আমার চোখের দিকে এমন করে চাইল। মুখে অস্ফুটে বলল, ফ্যানটাস্টিক। ইট জাস্ট ডিড নট স্ট্রাইক মি। তোমার চোখ দুটো কী সুন্দর: কী এক্সপ্রেসিভ।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, এবার আমি সানগ্লাস পরে ফেলব কিন্তু।

তারপর বললাম, আমার চোখ জেলি-ফিশের চোখের মতো জানি আমি। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের চোখ ভারি সুন্দর। তুমি এসো আমাদের দেশে, তোমাকে দেখাব।

লারা বলল, যদিও হিংসে হচ্ছে তবে যাব হয়তো কখনও। একদিন সকালে দরজা খুলে দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার সামনে।

আমি বললাম, সেই সকালের জন্যে সব রাতে স্বপ্ন দেখব। সত্যিই এসো কিন্তু।

লারা বলল, আমিও সাহিত্যের ছাত্রী কিন্তু কথায় আমি তোমার ধারে কাছে যেতে পারব না।

আমি বললাম, তোমার কোন দুঃখ। কবি-সাহিত্যিকদের নিজেদের কথা নেই বলেই তারা পরের কথা লিখে মরে। তুমিও তো কবিতা। সাহিত্যের অনুপ্রেরণা। তুমি বা তোমরা আছ বলেই তো লেখকরা তোমাদের নিয়ে লিখতে পারেন। এই দুঃখেই তো কখনও লেখক হওয়ার বাসনা নেই। লেখকরা নায়ক-নায়িকার কথাই লেখেন, নিজেরা জীবনে কখনও নায়ক হতে পারেন না।

লারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেলল। নিজের প্রশংসাটা ওর ভালো লেগেছিল। কার না লাগে?

বলল, তোমার মতো অন্যকে ফ্লাশ করতে আমি কাউকে দেখিনি।

আমি বললাম, ফ্লাশ করবার মতো এমন কাউকে আমিও তো দেখিনি আগে।

লারা হাসতে-হাসতেই বলল, প্লিজ, প্লিজ, তুমি এমন করে বললে কোনও দুর্বল মুহূর্তে বিশ্বাস করে ফেলব এসব কথা।

আমি বললাম, অ্যাই! কথায়-কথায় অন্য কথায় চলে যাচ্ছি কিন্তু আমরা। তুমি উমির গল্পটা বলবে, না বলবে না?

বলছি, বলছি। বলে লারা শুরু করল।

বলল, বলছি শোনো।

অনেক অনেকদিন আগে সমস্ত হাওয়াই-এর রাজা ছিলেন একজন ভারি শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁর নাম লিওলা। একদিন তিনি হামাকুয়া জেলার এক গ্রাম্য বুনো জায়গা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। মেয়েটি তার পিরিয়ডস শেষ হওয়ার পর ঝরনায় চান করছিল। সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। তার নাম আকাহি।

আমি এই জায়গায় ফুট কেটে বললাম, ইতিহাসে কি এই রকম অশ্লীল খুঁটিনাটিও লেখা

ছিল? না তুমি বানিয়ে বললে?

লারা লজ্জা পেল।

বলল, বানালে আর ইতিহাস হবে কী করে? তোমার বিশ্বাস না হয়, হনলুলুর লাইব্রেরিতে চলে যাও। সত্য-মিথ্যা জানতে পাবে। হুবহু যা পড়েছি তাই-ই বলছি তোমাকে।

আমি বললাম, সরি, বলো, বলো, থেমো না।

ঝরনার পাশে দাঁড়ানো নিরাবরণ আকাহি হঠাৎ রাজাকে ওর দিকে আসতে দেখে বড় ভয় পেয়ে গেল। ভাবল সে নিশ্চয়ই কোনও কাপু ভেঙেছে এবং শাস্তি হিসেবে হয়তো বা তার প্রাণদণ্ডই হবে।

রাজাকে দেখামাত্রই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে না পড়লেই কাপু ভাঙা হত তখন। কিন্তু লিওলার আকাহিকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। রাজা সেই ইলিমা ফুলের মতো পেলব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। তাই তিনি আকাহির ভয় ভেঙে দিলেন।

রাজাকে দেখে আকাহিরও বড় ভালো লেগেছিল। আর রাজা তো সেই সুন্দরীকে দেখা মাত্রই কামাতুর হয়ে উঠেছিলেন। সেই ঝরনারই ধারে, পাখির ডাকের মধ্যে, ফুলের গন্ধের মধ্যে রাজা লিওলা আকাহির সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের অশান্ত কামজ্বরতপ্ত শরীরকে শান্ত করলেন।

পূর্ণ মিলনের পর লিওলা আকাহিকে বললেন যে, তার গর্ভে রাজার সন্তান আসতে পারে। বললেন, যদি মেয়ে হয়, তাহলে তার আসল বাবার পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। আর যদি ছেলে হয় তাহলে রাজার পরিচয় সে পাবে।

এই বলে রাজা তাঁর পরিধেয়র কিছু-কিছু অংশ ও মুকুটের অংশ দিয়ে গেলেন আকাহিকে পুরস্কার ও তাঁর মিলনের স্মারক স্বরূপ।

যথাসময়ে আকাহির সন্তান নিশ্চয়ই হল। এবং ছেলে হল। আকাহি ছেলের নাম রাখল উমি। আকাহির স্বামী অনেকানেক বেচারি স্বামীর মতোই উমিকে নিজের ছেলে ভেবে তার মতো করেই মানুষ করতে লাগল। সাধারণ মানুষের ঘরে ছেলেকে যেমন করে মানুষ করা হত তেমন করেই।

আকাহির স্বামী উমিকে প্রায়ই মারধর করত। একদিন উমি যখন বেধড়ক মার খাচ্ছে তখন আকাহি দৌড়ে এসে তার স্বামীকে বলল যে, উমি তোমার ছেলে নয়, ও রাজা লিওলার ছেলে। এ কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই আকাহির স্বামী বেচারির তো প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল। পাছে তার স্বামী আকাহির কথা অবিশ্বাস করে, তাই আকাহি রাজা লিওলার দেওয়া স্মারকগুলো এনে তার স্বামীকে দেখাল।

স্বামী বেচারির অবস্থা আরও শোচনীয় হল।

গল্পের এইখানে আমি হেসে উঠলাম।

লারা বলল, তুমি হাসলে কেন?

আমি বললাম, এবার থেকে বিবাহিত বন্ধুদের বলব যেন সাবধান হয়ে ছেলেমেয়েদের মারধর করে। রমণী জাতকে বিশ্বাস নেই।

লারা বলল, তা তো বলবেই! সব দোষ মেয়েদেরই। তোমরা তো সব সাধুসন্ত। ঝামেলা বাধিয়ে দিয়ে তোমরা ঝাড়া হাত-পায়ে ঘুরে বেড়াও। দোষের ভাগী হয় মেয়েরা; বোঝাও বয়ে বেড়ায়।

আমি বললাম, ঝগড়া কোরো না, গল্প বলো।

তার কিছুদিন পর, অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে উমির সঙ্গে তার বাবা রাজা লিওলার মিলন হল।

উমি পরে বিভিন্নরকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রাজা হলেন এবং তার উত্তরপুরুষকে উচ্চবংশমর্যাদা দেওয়ার জন্যে লিওলার এক মেয়েকেই, মানে উমির সৎবোনকে বিয়ে করলেন।

উমি রাজা হয়েও নিজে হাতে সাধারণ লোকদের সঙ্গে কাজ করতেন। চাষার কাজ। জেলের কাজ। হাওয়াই-এর ইতিহাসে মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে উমি এবং উমির রাজত্বকাল নানা কারণে।

অন্যান্য রাজারা তাদের সবচেয়ে প্রিয় মেয়েদের নিয়ে আসতেন উমির কাছে উমির স্ত্রী হিসেবে দান করতে। উমি রানি এবং অরানি কতজনের সঙ্গে যে সহবাস করেছিলেন তার লেখাজোখা নেই। উমির এতই ছেলেমেয়ে হয়েছিল যে পরবর্তী কালে যদি কোনও সাধারণ লোক বলত যে উমি-আ-লিওলা তাঁর পূর্বপুরুষ নন, তবে অন্য লোকে তাকে পাগল অথবা নীরেট-বুদ্ধি বলে ঠাওরাত।

উমি রূপকথার নয়, সত্যিকারেরই একজন বড়, বিখ্যাত এবং দয়ালু রাজা ছিলেন। হাওয়াইতে তাঁর এবং তাঁর রাজত্বকালের গল্প প্রায় রূপকথাতেই দাঁড়িয়ে গেছে প্রজন্মের মুখে-মুখে ছড়াতে-ছড়াতে। ইংল্যান্ডের কিং আর্থার এবং তাঁর নাইটস অফ দ্যা রাউন্ড টেবলের গল্পের মতো।

আমি যেন তখনও ঘোরের মধ্যে ছিলাম। লারার গল্প শুনতে-শুনতে কোথায় কত শত বছর পিছনে চলে গেছিলাম।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। অতীত থেকে ফিরে আসতে ইচ্ছা করছিল না।

লারাও চুপ করে ছিল। হাওয়ায় ওর চুলগুলো কপালে এসে পড়ছিল।

.তারপর লারাকে বললাম, তুমি পার্ল হারবার দেখেছ?

লারা হাসল। বলল, নিশ্চয়ই। তুমিও দেখে যেও।

তারপরই বলল, চলো কোথাও ছায়াতে গিয়ে বসি। রোদটা বড্ড কড়া হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, চলো।

লারা বলল, কয়েক ব্লক হেঁটে গিয়ে ইনটারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারেই যাওয়া যাক। তোমাদের ব্যানিয়ান ট্রির ছায়ায় ওপেন-এয়ার কাফেতে বসে গল্প করা যাবে। তুমি কোনও স্যুভেনির কিনতে চাও বাড়ির লোকের জন্যে তাহলে তাও কিনতে পারো। অনেকরকম দোকান আছে।

আমি বললাম, স্যুভেনির কিনে দেব কাকে? আর কতবছর পরে দেশে ফিরব তারই ঠিক নেই। এখন কিছুই কেনার মানে হয় না।

তা যা বলেছ। লারা বলল।

আমরা দশ মিনিট. হেঁটে গিয়ে বটগাছের ঠান্ডা ছায়ায় ঝিরঝিরে হাওয়ায় এসে বসলাম।

আমাদের দেশে কত গাছ-গাছালি কিন্তু আমাদের মধ্যে কত কম লোকই গাছপালা ভালোবাসি। কলকাতা শহরের বুকে ব্রিটিশরা যেসব গাছপালা পুঁতে গেছিলেন সেই সব গাছ বিনা দ্বিধায় আমরা কেটে ফেলেছি। নতুন গাছ লাগানোর কথা ভাবিনি। গাছ-গাছালি রেখেও যে একটা শহরকে বাড়ানো যায় কী করে তা আমরা সত্যিই জানি না। ভাবলেও খারাপ লাগে।

লারা বলল, বিয়ার খাওয়াচ্ছি আমি তোমাকে।

তুমি?

আমিও খাব। লারা বলল। যেন ও খেলেই ওর দাম দেওয়ার অধিকার বর্তে যাবে।

বেশ লাগছে এই পরিপূর্ণ অবকাশ। পড়াশোনা নেই, কাজ নেই, টেলিফোন নেই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই—নিরবচ্ছিন্ন ছুটি—শুধু ছুটি।

পশ্চিমের জগতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে না পড়লে বোধহয় জানতেও পেতাম না যে, ছুটিটা কত উপভোগের। আমরা কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলাতে বিশ্বাস করি না। এদেশের লোকে যখন কাজ করে, শুধুই কাজ করে। কাজের মধ্যে আড্ডা বা খেলা বা রাজনীতি কিছুই করে না। যারা সত্যি-সত্যিই প্রচণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে তারাই ছুটির মজা পুরোপুরি পায়। কাজের নিয়মানুবর্তিতা ও নেশা যাকে পায়নি, সে ছুটির আনন্দের গভীরতাও জানে না।

লারা ওর বিয়ারে চুমুক দিতে-দিতে বলল, পার্ল হারবারের ওপরে একটা ফিল্ম দেখেছিলাম ছোটবেলায়। ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা, মার্লন ব্রান্ডো আর কে যেন...।

আমি বলে উঠলাম, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার। আমিও দেখেছি। কী যেন নামটা? মনে পড়েছে 'ফ্রম হিয়ার টু ইটারনিটি।' তাই না?

ঠিক-ঠিক। লারা বলল।

লারা বলল, সকাল সাতটা পঞ্চান্ন। ডিসেম্বরের সাত তারিখ। ১৯৪১ সন। জাপানি বোম্বাররা টোরা, টোরা, টোরা মেসেজ নিয়ে মেঘে ঢাকা পাহাড়ের ফাঁক থেকে হঠাৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে এল পার্ল হারবারে। তার আগে অত নীচু দিয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট ফর্মেশানে উড়ে রাডারের চোখ এড়ানোর অমন দুঃসাহসিক চেষ্টা আর কোনও জাতের এয়ার ফোর্সই করেনি। চার হাজার লোক মারা গেছিল সেই আক্রমণে। আর ইউ-এস-এর প্যাসেফিক ফ্লিটের যে ক্ষতি হয়েছিল তার পরিমাপ ছিল না। যখন পার্ল হারবার যাবে তখন দেখতে পাবে অ্যারিজোনা মেমোরিয়াল। ইউ-এস-এস অ্যারিজোনা ছিল ইউ-এস-এর গর্ব। অ্যারিজোনা এবং অন্যান্য অনেক নৌ-জাহাজ একেবারে শেষ করে দিয়েছিল জাপানিরা। পার্ল হারবার বম্ব করেই জাপান ইউ-এস-এ-কে যুদ্ধে টেনে নামাল তাদের বিপক্ষে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পার্ল হারবার আক্রমণই জাপানের সর্বনাশের সূত্রপাত।

আমি লারাকে বললাম, তুমি যেরকম সন তারিখ মুখস্থ রাখো দেখছি তাতে মনে হয় তুমি ইতিহাসের ছাত্রী, সাহিত্যের নও।

লারা হাসল। বলল, ইতিহাসকে উপেক্ষা করা আর নিজেদের অতীতকে অবজ্ঞা করা একই কথা। ছাত্রী যে বিষয়েরই হই না কেন—ইতিহাস আমাকে ভীষণ টানে। হিসটরি রিপিটস ইটসেল্ফ। সমস্ত জাতের ভবিষ্যৎ তার ইতিহাসের মধ্যেই সুপ্ত থাকে, এতে কোনও ভুল নেই।

বিয়ার খেয়ে আমরা একটু দোকানগুলো ঘুরে-টুরে দেখলাম। লারাকে আমি একটা পাগো-পাগো কিনে দিলাম। সবুজ আর হলুদ হাইবিসকাস ফুলের ছাপ দেওয়া প্রিন্টের কাপড়ের। লারা একটা হাওয়াইন সার্ট কিনে দিল আমাকে। বেগুনি আর জংলা-ফুলের কাজের। একটা দোকানে বাঁশের নানা জিনিস ছিল। টিপিক্যাল হাওয়াইয়ান ডিজাইনের। আমার স্কুলে পড়া ছোট ভাইকে পাঠাবার জন্যে একটা মানি-ব্যাঙ্ক কিনলাম। কাঠের তৈরি, হালকা বাদামি রঙা, অপদেবতার মুখ খোদাই করা তাতে।

কেনাকাটা সেরে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে ফিরে চললাম।

হোটেলে পৌঁছে লারা বলল, দাঁড়াও। তোমাকে একটা বই প্রেজেন্ট করব। হাওয়াই সম্বন্ধে লেখা।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের দোকানে ঢুকে লারা বইটা চাইল।

বইটা আমার হাতে দিয়ে লারা বলল, আশ্চর্য কথা কী জানো? হাওয়াইয়ান ট্যুওরিস্ট ডিপার্টমেন্ট যে বাছা-বাছা বই-এর বিবলিওগ্রাফি তৈরি করে ওদের মুখপত্র ছাপিয়েছেন তাতে এই বইটিরই নাম নেই। অথচ বইটি কী ভালো!

লিফটের দিকে এগোতে-এগোতে লারা আমার হাত ধরে বলল, কাল তোমার সঙ্গে আমি সত্যিই খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আজ রাতে তোমাকে আমি কাহালা হিলটনে খাওয়াতে নিয়ে যাব।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, আমার জন্যে তোমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, কেনেথের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হল, আর তুমিই আমাকে খাওয়াবে?

লারা দুষ্টুমি করে হাসল। বলল, সর্বনাশ হল না লাভ হল কে বলতে পারে? আমি মুহূর্তে বাঁচার পক্ষপাতী। মুহূর্তের সমষ্টিই তো জীবন। এই মুহূর্তে সুখী হলেই সব মুহূর্তে সুখী। ভবিষ্যৎ-এর জন্যে বর্তমানকে মাটি করতে আমি কখনওই রাজি নই।

তারপর হঠাৎ, গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, বিশ্বাস করো, আমার মতো সুখী এই মুহূর্তে কেউ নেই।

আমি বললাম, তোমার সুখ যেন স্থায়ী হয়।

লারা বলল, হবে। আমি জানি যে, হবে।

দেবত্বের পরীক্ষা

লারাই বলেছিল যে আবার সন্ধের সময় আমার সঙ্গে দেখা হবে। মধ্যবর্তী সময়ে উই উইল বি অন আওয়ার ওওন।

আমি শুধিয়েছিলাম, কেন এমন স্বেচ্ছারোপিত বিচ্ছেদ?

লারা হেসে বলেছিল, কারণ বিচ্ছেদ মাত্রই মিলনকে মধুর করে।

তারপর বলেছিল, সমস্ত সময় একসঙ্গে থাকলে তুমি বোরড হয়ে যাবে। আমিও হয়ত বা। টু মাচ ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস কনটেমপ্ট। তোমার সম্বন্ধে আমি একইরকম মনোভাব নিয়ে যেতে চাই এখান থেকে। আশা করি তুমি আমার কথা বুঝবে।

আমি বলেছিলাম, বুঝব।

ঘরেই এক প্লেট ফিশ-ফ্রাই আনিয়ে নিয়েছিলাম। লাঞ্চের পর ঘরে শুয়ে-শুয়ে লারার দেওয়া বইটা পড়ছিলাম। সত্যি। আমরা বড় আনইনফর্মড। কোনও দেশ দেখতে আসার আগে সেই দেশ সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা করে তবেই আসতে হয়। রথের মেলা দেখতে আসার মতো নতুন দেশে এসে পাঁপড় ভাজা খেয়ে আর ঘাড়-নাড়া বুড়ি কিনে বাড়ি ফেরার কোনও মানে হয় না। আমেরিকায় আসার পর থেকে এ-দেশীয় মানুষদের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়া করে থাকেন তাঁদের এই একজাকটিং অ্যাটিচুডটা আমাকে বড় মুগ্ধ করে। ফাঁকিবাজী বা অগভীর ব্যাপার-স্যাপারকে এরা বেশ ঘৃণার চোখে দেখে।

বইটা পড়তে-পড়তে সত্যিই তন্ময় হয়ে গেছিলাম।

লারা যে উমি রাজার গল্প করছিল, সেই উমির রাজত্বকালের তিনশো বছর পর মানে সতেরোশো খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রায় সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। উমির রাজত্বকালের পর হাওয়াইতে আর বিশেষ উন্নতি হয়নি কোনও।

ক্যাপ্টেন তাঁর দুটি পালতোলা জাহাজ রেজলুশান ও ডিসকভারি নিয়ে তাহিতী ছেড়ে উত্তরমুখো রওয়ানা হয়েছিলেন। দুটো জাহাজই হুইটবি কলিয়ার্স—। তাদের গতিবেগ ছিল খুবই কম কিন্তু বড় শক্ত পোক্ত জাহাজ। সতেরোশো আটাত্তরের এক জানুয়ারির সকালে রেজুলেশানের লুক-আউট রিপোর্ট করল যে, স্থলচর পাখি দেখতে পেয়েছে সে। নারিকরা উৎসুক হয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে সামনে চেয়ে রইল। তারপর কচ্ছপের ভিড় দেখা গেল জলে। জাহাজের দুপাশে তারা সরে-সরে যেতে লাগল। এরও পরে যখন সমুদ্রের স্রোতে অনেক বেশি টান লক্ষ করল তখন যেসব পুরোনো নাবিক ছিল জাহাজে তারা নিঃসন্দেহ হল যে ডাঙ্গা আর বেশি দূরে নেই।

আঠারোই জানুয়ারির সকালবেলা দূরে ডাঙ্গা দেখা গেল। কুয়াশার ঘোমটার আড়াল থেকে ফিকে-নীল আর করমচা-লাল পাহাড় আর নরম সবুজ বনানী ঘেরা ওআহু দ্বীপ নাবিকদের অবাক করে দিল। তারা সব জাহাজের রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চেয়ে রইল সেদিকে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর মাটির গন্ধে বুঁদ হয়ে।

কিন্তু বিপরীত হাওয়া, পালতোলা জাহাজগুলোকে ওআহু দ্বীপের হাতছানি সত্ত্বেও উত্তরে

ভাসিয়ে নিয়ে গেল। উত্তরে কানাই দ্বীপ। অন্ধকারে ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ দুটো ওই কানাই দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে লাগল।

সেই রাতে কয়েকজন হাওয়াইয়ান তাদের ক্যানোতে থেবড়ে বসেছিল। মাছের জাল ফেলেছিল তারা। ওদের মধ্যে একজন, তার নাম মোআপু, মুখ তুলে হঠাৎ দেখল আলো ঝলমল, দুটি স্বর্গের পাখির মতো সাদা ডানার কী প্রাণী জলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে জাল-টাল ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ক্যানো চালিয়ে তীরে ভিড়ল। তারপর পড়ি কি-মরি দৌড়ে গিয়ে তাদের সর্দারদের এই অলৌকিক জলযানের খবর জানাল।

সকাল হতে-না-হতেই ছোট-ছোট ক্যানোতে দাঁড় বেয়ে দলে-দলে হাওয়াইয়ানরা সমুদ্রে ভেসে পড়ল। রেজুলেশান আর ডিসকভারির কাছাকাছি আসার সাহস ছিল না তাদের। তারা দূর থেকে তাদের ক্যানোতে বসে অবাক চোখে জাহাজ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া দড়িতে শুয়োর, মাছ, মিষ্টি আলু এইসব বেঁধে নবাগন্তুকদের ভেট পাঠাল। বদলে, তাদের ইংরেজরা ধাতুর টুকরো দিল।

হাওয়াইয়ানদের মধ্যে যারা ক্যানো নিয়ে আসেনি তারা তটে মহা ভিড়ভারাক্কার লাগিয়ে দাঁড়িয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। পালগুলোকে দেখে কেউ বলল, সূর্যের রশ্মি আটকে গেছে ওখানে। মাস্তুল দেখে অনেকে বলল যে, ওগুলো গাছ, সমুদ্রেও হেঁটে বেড়াচ্ছে।

শেষমেষ ওখানকার যে সর্দার—মানে ছোট রাজা—সে জনাকয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দড়ি ধরে জাহাজে উঠে এল। আর উঠে এসেই তো চক্ষুস্থির। ইংরেজদের মধ্যে কেউ-কেউ তেকোনা টুপি পরে ছিল। হাওয়াইয়ানরা ভাবল যে, মানুষগুলোর মাথাই তিনকোনা। ইংরেজদের পোশাক দেখে ভাবল ওগুলো গায়েরই চামড়া—ঢিলেঢালা হয়ে গেছে এবং মাঝে-মাঝে জিনিসপত্র রাখার থলে আছে সেই চামড়ায়। একজন নাবিক পাইপ খাচ্ছিল। তাকে দেখে হাওয়াইয়ানরা ভাবল যে, সে দেবতা লোনো আগ্নেয়গিরির আগুন মুখে নিয়ে এসেছেন। একটা মরা ষাঁড়ের চামড়া দেখে ভাবল যে, এই হাওলরা মানে বিদেশিরা কু-লঙ্গ কুকুরটাকেই বুঝি বা মেরে তার চামড়া নিয়ে এসেছে। কু-লঙ্গ কুকুর ওদের প্রবাদে আছে যে কুকুর মানুষখেকো। সাদা চামড়ার ক্যাপ্টেন জেমস কুককে দেখে ওরা ভাবল যে ইনি নিশ্চয়ই হাওয়াইয়ানদের পূর্বপুরুষদের কল্পিত রোমান্টিক পলিনেশিয়ান পিতৃভূমি থেকে এসেছেন।

এমন অভ্যর্থনা কুক জীবনে কখনও পাননি।

কুক এই ধনধান্যে পুষ্পেভরা দ্বীপের নাম রাখলেন স্যান্ডউইচ আইল্যান্ডস। ইংল্যান্ডের তৎকালীন চিফ অ্যাডমিরালিটি আর্ল অব স্যান্ডউইচের উৎসাহেই ক্যাপ্টেন কুক সেবারকার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। তাই তাঁরই নামে নাম রাখলেন। এদিকে দ্বীপবাসীরা নবাগন্তুকদের পোশাক-আশাক সাজ-সরঞ্জাম দেখে উৎসাহে একেবারে চেগে উঠেছিল। আগন্তুকরা যে কী বড়লোক তাদের কত কী যে আছে! তাদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে যা পাওয়া যায় তাই-ই নিতে তারা উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু সবচেয়ে যে বড় পুরুত দ্বীপের তিনি মানা করলেন। এই নবাগন্তুকরা মানুষ না ভগবান এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পুরুতমশাই দ্বীপবাসীদের নিরস্ত থাকতে বললেন।

পুরুতমশাই বললেন যে, আগে এদের পরীক্ষা করতে হবে। এমনই এক পরীক্ষা করবেন তিনি, তাতে ওরা মানুষ যদি হয় তো হাতে-নাতে ধরা পড়বে মানুষ বলে। ভগবান হলে তাও বোঝা যাবে।

পরীক্ষাটা কী?

না, মেয়েছেলে।

পুরুতমশাই বললেন, নবাগন্তুকদের মেয়েছেলে সেধে দিয়ে দেখা যাক ওরা তাদের নিয়ে কী করে। যদি মেয়েদের নিয়ে আমরা যা করি তাই-ই করে তবে যে ব্যাটারা মানুষ এ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকবে না।

পরীক্ষা নেওয়া হল।

প্রায় নগ্ন ঝাঁক-ঝাঁক পরম ইচ্ছুক ও উৎসুক নরম ফুলের মতো যুবতী মেয়েরা সাঁতরে এসে জাহাজের দড়ি ধরে জাহাজে উঠে আসতে লাগল। এবং বলা বাহুল্য আগন্তুক ইংরেজরা সেই ভগবান হওয়ার পরীক্ষায় মর্মান্তিকভাবে ফেল করল।

কিন্তু জাহাজে এত মেয়ে দেখে ক্যাপ্টেন কুক চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে তাঁর নাবিকদের মধ্যে অনেকেই সিফিলিস ও গনোরিয়ার রোগি। যাদের অসুখের কথা তিনি বিলক্ষণ জানতেন তাদের অত্যন্ত আপত্তি সত্ত্বেও আলাদা করে রাখলেন। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হল না। অভিসার শেষে মেয়েরা যখন আবার সাঁতরে তীরে ফিরে গেল সেই সুন্দরী হাসি-খুশি পবিত্র মুখগুলির আড়ালে ভবিষ্যতের এক কদর্য ব্যাধির বীজ বয়ে নিয়ে গেল তারা তাদের শরীরে। হাইবিসকাস ফুলের রং-বেরঙা হাসির আড়ালে চোখের জলের বিন্দু টলটল করে উঠল।

শুধু রেজলুশান জাহাজেই একশো বারো জন নাবিকের মধ্যে ছেষট্টি জনের যে ওই ব্যাধি ছিল তা তাদের পে-বুক থেকে জানা যায়। ক্যাপ্টেন কুকের আসার এক বছরের মধ্যে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত দ্বীপে গানোরিয়া ও সিফিলিস রোগ ছড়িয়ে যায়। এই রোগের কারণে পরবর্তী সময়ে হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জে জন্মহারও প্রচণ্ডভাবে কমে আসে।

ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজের পালগুলি কূল ছেড়ে সমুদ্রে অদৃশ্য হতে-না-হতেই চতুর্দিকের দ্বীপে এই দ্বীপবাসিরা অদ্ভুত দর্শন আগন্তুকদের আগমনের খবর পাঠিয়ে দিল দূতের মাধ্যমে। সেই পাখির ডাকের মতো ভাষায় কথা বলা পা ঢাকা সাদা লোকগুলোর কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়া হল। বলা হল যে, ওরা আগুন খায় এবং মুখ দিয়ে আগ্নেয়গিরির মতো ধুঁয়ো উদগীরণ করে।

তার সঙ্গী-সাথীরা দেবত্বর পরীক্ষায় ফেল করলেও হাওয়াইয়ানরা কিন্তু বিশ্বাস করেছিল যে ক্যাপ্টেন টমাস কুক নিজে মানুষ নন, ভগবানই। ভেবেছিল যে উনিই তাঁদের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান দেবতা 'লোনো'।

এই অবধি পড়ে বইটাকে পেজ-মার্ক দিয়ে রেখে দিলাম। রীতিমতো নেশা লেগে গেছে। মনেই হয় না ইতিহাস পড়ছি বলে।

কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তাই পুরোপুরি বঙ্গসন্তানের মতো এক ঘুম ঘুমিয়ে নেব ঠিক করলাম ভর দুপুরে। রাতে হোটেলে ফিরে আবার পড়ব বইটা।

ঘুমিয়ে যখন উঠলাম তখন প্রায় চারটে বাজে।

কাল থেকে লারার সঙ্গে-সঙ্গে থাকায় হাঁটা-চলা বিশেষ হয়নি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। সওনা-বাথ, সাঁতার অথবা স্কোরাশে গেলে হত। আজকেই খবর নিতে হবে কাছাকাছি কোথায় র‍্যাকেট ক্লাব আছে। আপাতত বড়-বড় পা ফেলে ঘণ্টাখানেক হেঁটে আসা মনস্থ করে চোখমুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হলিডে ইন-এর মেইন এনট্রান্স-এর সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা ডানদিকে চলে গেছে সেই রাস্তাতেই পা বাড়ালাম।

অচেনা অজানা জায়গায় একা-একা হাঁটতে আমার ভারি ভালো লাগে। বিশেষ করে ছুটিতে। কত কী যে চোখ ভরে দেখা যায়, কত মানুষজন দোকানপাট।

এই হাঁটায় কোনও গন্তব্যে পৌঁছবার হীনতা নেই। খবরদারি নেই ঘড়ির ওপর। মূল্যবান সময়কে পথের মেজাজের ওপর ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনতাকে পাথেয় করে এই রকম হাঁটার সুযোগ আজকের জীবনে খুব কম মানুষেরই আসে।

হাঁটতে ভীষণ-ভীষণ-ভীষণ ভালো লাগে এই কারণে যে, হাঁটাই মানুষের আদিমতম ও প্রাকৃততম ব্যায়াম। পায়ে হেঁটেই গুহামানব পাহাড় ছেড়ে নীচে নেমে এসেছে। পায়ে হেঁটেই চাষ করেছে—ফসল ফলিয়েছে। অস্ত্র বানিয়েছে তারা পাথর থেকে, লোহা থেকে, তারপর এই সেদিন পর্যন্তও প্রধানত পায়ে হেঁটেই লড়াই করেছে। পায়ে হেঁটেই মানুষ আর মানুষি অভিসারে গেছে—

আবার মিলনের পর আলো ছায়ার রুটিকাটা গালচের বনপথ ধরে যে যার পর্ণকুটিরে ফিরে এসেছে। তাই হাঁটতে থাকলেই আমি, এই সামান্য একজন মানুষ, মানুষের সার্বিক ইতিহাসের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। দারুন আনন্দিত হই এ-কথাটা ভেবেই।

আমাদের দেশের বাঙ্গালোর শহরের রাস্তাঘাট যেমন, হনলুলুর ভিতরের রাস্তাঘাটও অনেকটা তেমন। পাহাড় ও উপত্যকা সব নিয়েই শহর। এদিকে ওদিকে চলে গেছে পথ উঁচু-নীচু। জুইক-জুইক করে গাড়ি যাচ্ছে। সারা শহরে সর্বক্ষণ একটা মেলা-মেলা ভাব। চিউয়িংগাম চিবোনো আর চকোলেট মুখে আমেরিকানরা। বেঁটে-খাটো ব্যস্ত-সমস্ত দাড়ি-গোঁফহীন ফ্যাকাসে জাপানিরা। হরেকৃষ্ণ কাল্টের গেরুয়া বসনাবৃত শ্বেতাঙ্গিনি সন্ন্যাসিনী পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে হরে কৃষ্ণ হরে রাম ধ্বনি তুলে চাঁদা ওঠাচ্ছে। ভাড়া-করা কলগার্লের হাত ধরে সময়ের ওপর জবরদখল নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে পয়সা উসুল ও জীবন সার্থক করে চলেছে লাল-নাক, গাব্দা-গোব্দা সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো এক ধরনের মানুষ।

মানে, যে যার ধান্দায় এই হনলুলুতে লু-লু করে হনুমানের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও আনন্দে কেউ বাধা দেওয়ার নেই। হুলা-হুলা নাচছে কেউ-কেউ। হুলা-নাচিয়েদের সঙ্গে বা নাচ দেখছে খড়ের ঘাঘরা পরা কদলীকাণ্ডবৎ উরুসম্পন্ন হাওয়াইয়ান মেয়েদের। কেউ বা মাহিলাহি খাচ্ছে কোনও সরাইখানায় বসে। হাওয়াই-এর স্পেশ্যাল মাছের প্রিপারেশান। কেউ বা খাচ্ছে মাই-টাই। হাওয়াই-এর জাতীয় পানীয়। অথবা কেউ বা সন্ধে হব-হব সমুদ্রে গ্লাস-বটম বোটে করে রঙিন কোরাল-রিক দেখে চর্মচক্ষু সার্থক করছে। অন্য কেউ সঙ্গিনীর সঙ্গে সানসেট ডিনারে বসেছে পালতোলা ছোট্ট নৌকোয় আদিগন্ত সমুদ্রের ওপর, পশ্চিমের আকাশের ক্রিমসন-লাল পটভূমি পিছনে রেখে। ওয়াটার স্কিয়িং করছে কোনও শ্বেতাঙ্গিনি। রোদে পুড়ে যাওয়া তার এক জোড়া বাদামি সুডোল উত্তেজিত স্পন্দিত বুক উথাল-পাথাল হচ্ছে, তীব্র বেগে চলেছে সে সমুদ্রে নীল দুটি স্বর্ণকমল পা-ছুঁইয়ে দ্রুতধাবমান স্পিডবোটের দড়ি ধরে। আবু দাবি বা দুবাইয়ের কোনও বুড়ো ক্ষয়েরি শেখ তার প্রাইভেট এয়ার কন্ডিশানড মোটর বোটে বিশ্বের যাবৎ দেশের তাবৎ কচি-কচি সুন্দরিদের তেল-বেচা টাকা দিয়ে কিনে এনে বোটের খোলে রঙিন মাছের মতো ঢেলে দিয়েছে। মেয়েগুলো এক গামলা রঙিন কই মাছের মতো খলখল-খলখল করছে।

ক্ষয়েরি খচ্চরের মতো শেখ নিজে তার কাঁচঢাকা কেবিনে ভেলভেটের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ঢুকুর-ঢুকুর করে দেড় হাজার টাকা দামি বোতলের রয়্যাল স্যালুট হুইস্কি খাচ্ছে। হাওয়াইয়ান সূর্যাস্তর লালিমা দেখে, তাল খেজুড় উট আর তার অফিসিয়াল পয়লা নম্বরী বিবির মুখ এবং মাকাল ফলের মতো লাল মরুভূমির সূর্যাস্তর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে শেখ সাহেবের। তেল-সাম্রাজ্যে এখন সূর্য ডোবে না একদিনও। কিন্তু শেখসাহেব জানেন যে একদিন ডুববে। সব সূর্যই ডোবে একদিন না একদিন। তাই বেলা থাকতে-থাকতে শেখ সাহেব ভোগের চরম করে নিচ্ছেন যাতে বেলা পড়লে হজ যাত্রায় যেতে পারেন পরম নিশ্চিন্তে।

এক রাস্তা দিয়ে ঢুকে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে এসে ওয়াইকিকিতে পড়লাম। তারপর হনহনিয়ে হেঁটে হোটেলে ফিরে এলাম। বেশ ভালো হাঁটা হল। জামাকাপড় ঘামে ভিজে উঠল। মাথার চুলও। শরীরটা হালকা ও সুস্থ লাগতে লাগল। মন প্রসন্ন।

শাওয়ারের নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে চান করলাম। তারপর জামাকাপড় পড়ে লবিতে নেমে এলাম।

পৃথিবীর যে-কোনও জায়গার আন্তর্জাতিক হোটেলের লবিতে বসে আমি সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। কত রকম, কত জাতের কত চরিত্রের নারী পুরুষ যে দেখা যায় তা বলার নয়। বসে-বসে তাঁদের লক্ষ করতে এবং তাদের ফেসরিডিং করতে খুব ভালো লাগে আমার।

একটু পর লারা নামল সেজেগুজে। ওকে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

লারা হাসল আমাকে দেখে তারপর এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে।

আমি বললাম, তুমি পাগো-পাগোটা পরলে না কেন?

লারা বলল, কাহালা হিলটনে পাগো-পাগো পরে গিয়ে লাভ কী?

আমি বললাম, তাহলে আমরা যেদিন অন্য কোথাও যাব সেদিন পরো।

লারা একটু অবাক হল। তারপর বলল, বেশ!

লারাও আমার পাশে বসল, সোফায়। তারপর বলল, আমাদের গাড়ি আসবে সাড়ে-ছ'টায়।

কিসের গাড়ি?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

বাঃ রে, হোটেলে যাব না? তোমাকে কি অনাদর করতে পারি? তাই ক্যাডিলাক লিমুজিনের কথা বলে দিয়েছি।

আমি আঁতকে উঠলাম। বললাম, তুমি ভেবেছ কী? তুমি কি কোটিপতি ঠাউরেছ নিজেকে?

মোটেই না। তা হলে আর ফুল বিক্রি করে পড়াশুনা করি? কোটিপতি হলে কী আর ভাড়া করা ক্যাডিলাকে তোমাকে চড়াতাম আমি?

আমি বললাম, ইউ আর গ্রেট।

লারা হাসল। টোল পড়ল ওর গালে। বাহারে আঙুলগুলো নেড়ে এক সুন্দর ভঙ্গি করে বলল, নট অ্যাট অল।

লারা রিসেপশানে বলে রেখেছিল। একটি প্রায় সাড়ে ছ'ফিট লম্বা গুণ্ডার মতো নিগ্রো লোক লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি উঠে কাঁচের দরজা ফুঁড়ে এসে রিসেপশানে দাঁড়ালেন।

রিসেপশানের মেয়েটি মিস ডস বলে আস্তে ডাকল।

থ্যাঙ্ক ইউ! বলে লারা উঠল। আমিও উঠলাম।

কাঁচের দরজা এখানের সব জায়গাতেই অটোম্যাটিক। দরজার সামনে দাঁড়ালেই 'সুইশ' শব্দ করে দরজা আপনা আপনিই খুলে যায়। ভদ্রলোক বিরাট কালো ক্যাডিলাকের দরজা খুলে আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লারা আগে উঠল, তারপর আমি উঠলে দরজা বন্ধ করে দিল শোফার।

ভাঙা-ভাঙা হাসকি গলায় শুধোল লারাকে, হোয়্যার টু? মিস ডস? টু ক্যাসিনো?

মনে হল, লারা একটু বিব্রত হল।

বলল, নো। টু কাহালা হিলটন প্লিজ।

ওকে ম্যাম। বলল শোফার।

হু-হু করে চলতে লাগল গাড়িটা।

নিউইয়র্কের শো-রুমে এ-গাড়ি দেখেছি বহুবার। লস এঞ্জেলসেও দেখেছি। গাড়িগুলো এয়ার কণ্ডিশানড এবং হিটেড। যখন যেমন দরকার। একটা গাড়ির দাম ষাট হাজার ডলার। মানে আমাদের প্রায় পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার মতো। যেমন ভারি গাড়িটা, তেমন নিঃশব্দ গতি, তেমন পিক-আপ। মনেই হয় না যে গাড়িতে বসে আছি আর গাড়িটা অত জোরে চলছে। গাড়িটা এত লম্বা যে মনে হয় ড্রাইভার যেন আমাদের ওপর রাগ করে দূরে গিয়ে বসেছে।

প্রায় মিনিট বারো থেকে পনেরো বেশ জোরে গাড়ি চলার পর আমরা কাহালা হিলটনে গিয়ে নামলাম। শোফার এসে লারাকে দরজা খুলে নামালেন। আমি নিজেই নামলাম অন্য দিকের দরজা খুলে।

হিলটন সমস্ত পৃথিবীতে একটি পরিচিত নাম। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় শহরে হিলটনের একটি করে বা একাধিক হোটেল আছে। প্রথমে শহরের নাম বা জায়গার নাম পরে হিলটন। কাহালা হিলটন হিলটন-এর হোটেলগুলির মধ্যে ছোটখাটই কিন্তু তবুও এই হোটেল সম্বন্ধে বলবার অনেক

কিছুই আছে।

একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে এই বহুতল হোটেলটি। নিজস্ব তটভূমি আছে এর, যাতে হোটেলের বাসিন্দারা স্বচ্ছন্দে ও আরামে চান করতে, সার্ফ রাইডিং করতে, ওয়াটার স্কিয়িং করতে পারেন। সমুদ্র থেকে জল পাম্প করে এসে হোটেলের নিজের জলের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও হোটেলের মধ্যে ঝরনা পন্ড ইত্যাদি সব করা হয়েছে। দিনে তিরিশ লক্ষ গ্যালন জল পাম্প করে তোলা হয়। এদের নিজেদের যে হাইড্রোইলেকট্রিসিটি প্ল্যান্ট আছে তা থেকেই এই হোটেলের বিজলীর প্রয়োজন মেটে। সবচেয়ে কম যে ঘরের ভাড়া বেসমেন্টে—যেখান থেকে আকাশ কী সমুদ্র কিছুই দেখা যায় না—তাই-ই বেয়াল্লিশ ডলার দিনে। আমেরিকান প্ল্যানে। প্রায় চারশো টাকার মতো। বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট।

সবচেয়ে দামি ঘর প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট—দিনে ছ'শো ডলার অর্থাৎ পাঁচ হাজার চারশো টাকা।

এসব শুনে-টুনে আমি ভাবলাম যে, এ-হোটেল বুঝি ফাঁকাই থাকে। কিন্তু শুনলাম এখানে থাকতে হলে আগে থেকে রিজার্ভেশন না করে এলে ঘর পাওয়াই যায় না। সবচেয়ে ভালো লাগল হাইড-এওয়ে কটেজগুলো। প্রেমিক-প্রেমিকা নববিবাহিত দম্পতির এবং পরকীয়া প্রেমের নির্বিঘ্ন আশ্রয়।

ঝরনা পেরিয়ে, পুকুরের ওপর ব্রিজ পেরিয়ে এসে আমরা একতলার বিরাট ডাইনিং হল-এ পৌঁছালাম। ডাইনিং হল-এর একদিকটাতে পুরো কাঁচের দরজা। দরজার পরই সমুদ্রের তটভূমি। তারপরই জল।

আমরা বসার পর মিনিট পনেরোর মধ্যেই ডাইনিং হল-এর সবক'টি চেয়ারই প্রায় ভরে গেল। আমাদের টেবলে শ্যাম্পেন দিয়ে গেল ওয়েটার।

আমি লারাকে বললাম, ব্যাপারটা কী? এত বড়লোকি?

লারা বলল, আমি যে বড়লোক! বড়লোক কী মানুষ টাকায় হয়, বড়লোক হয় মনে।

এমন সময় হঠাৎ ডাইনিং হল-এর সব আলোগুলো নিভে গেল। কাঁচের মাটিসমান দরজাগুলো ইলেকট্রিকালি খুলে গেল। কোনও অদৃশ্য জায়গা থেকে বহুবর্ণ সার্চলাইটের আলো পড়ল সমুদ্রে এবং সমুদ্রতটে। আর সঙ্গে-সঙ্গে বাজনার তালে-তালে সুর মিলিয়ে নানা রঙা হাইবিসকাস ফুলের মালা গলায় পরে রঙিন ফুল-ফুল ছাপা কাপড়ের স্তনবন্ধনী এবং ঘাসের ঘাঘরা পরে জলকন্যারা যেন সমুদ্র থেকে নাচতে-নাচতে উঠে এল বাদামি তটভূমিতে। তারপর হুলা-হুলা নাচতে-নাচতে সোজা সেই খুলে-দেওয়া কাঁচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ডাইনিং হল-এর মধ্যে চলে এল। তারপর নাচতে-নাচতেই সোজা স্টেজে এসে উঠল। তারপর শুরু হল তাদের নাচ ও গান। নানারকমের।

ড্যানি কাহিলানী বলে একজন রোদ-পোড়া চেহারার সপ্রতিভ জলদকণ্ঠের গায়ক হাওইয়ান গিটার বাজিয়ে আমাদের গান শোনালেন। গলায় দারুণ গভীরতা ছিল ভদ্রলোকের। হাওয়াইতে গিটারের চল খুব। গিটারের উৎসস্থলও বোধহয় হাওয়াই-ই। ঠিক জানি না। তবে অনেকানেক গায়ক, নৃত্যরতা মেয়েদের সঙ্গে গিটার বাজিয়ে গান গাইলেন। মেয়েরা যখন নাচছিল তখন তাদের ঘাসের ঘাঘরা ফুলে-ফুলে উঠছিল—গলার রঙিন হাইবিসকাসের মালা দোল খাচ্ছিল।

শ্যাম্পেন দিয়ে ডিনার শেষ করতে-করতে গান বাজনার মধ্যে কখন যে রাত দশটা বাজতে চলল, হুঁশই ছিল না।

ফেরার সময় ক্যাডিলাক লিমুর্জিনের পেছনের সিটে বসে লারা আমার হাতটা ওর কোলে তুলে নিয়ে বলল, সময়টা ভালোই কাটল আমাদের! কী বলো?

আমি বললাম, ধন্যবাদ তো তোমারই প্রাপ্য।

তাপরই বললাম, কাল কিন্তু আমার তোমাকে খাওয়ানোর দিন।

লারা হাসল, বলল, বেশ! কোথায় খাওয়াবে?

হাওয়াইয়ান হাটে। আমি বললাম।

হোটেলের রিসেপশানের মেয়েটিকে জিগ্যেস করে আমি হাওয়াইয়ান হাট অর্থাৎ হাওয়াইয়ান কুঁড়েঘরের ঠিকানা যোগাড় করেছিলাম।

লারা বলল, ভালো। খুব মজা হবে। কিন্তু কাল সারাদিন কী করবে?

আমি বললাম, চল একটা ট্যুওর নিয়ে ঘুরে আসি। যাবে? ওহাউ ট্যুওর?

যাব। খুশি-খুশি গলায় লারা বলল।

তারপর বলল, যেখানে নিয়ে যাবে তুমি সেখানেই যাব। আমি এখন তোমারই ইচ্ছাধীন।

ক্যাডিলাকের নিগ্রো শোফার যখন হোটেলের সামনে এসে দরজা খুলে লারাকে নামাচ্ছিল তখন হঠাৎ লক্ষ করলাম তার কাঁধের ওপরের ফ্ল্যাপে ডি-আই-আই এই তিনটি অক্ষর লেখা।

লারা নামতেই শোফার তাকে বলল, ম্যাম, এনি মেসেজ ফর বস?

লারা অপ্রতিভ মুখে তাড়াতাড়ি বলল, নো! থ্যাঙ্ক ইউ।

শোফার গুডনাইট জানিয়ে চলে গেল।

আমি সিঁড়ি দিয়ে লবিতে উঠতে-উঠতে বললাম, ডি-আই-আই মানে কি? এরা কি ট্রাভেল এজেন্ট? না ট্যুওর কোম্পানি?

লারা কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, কে জানে? হবে ওইরকমই কিছু। ভাড়াগাড়ি সম্বন্ধে আমার কোনও ঔৎসুক্য নেই।

হঠাৎ আমার মনে হল, যখন ঝকঝকে পালিশ করা কালো হিরের মতো কালো ক্যাডিলাক গাড়িটা চলে যায় তখন যেন তার নাম্বার প্লেটে প্রাইভেট গাড়ির নম্বর দেখেছিলাম। ট্যাক্সির নয়।

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে লারা লিফটের দিকে এগোতে-এগোতে বলল, কী ভাবছ?

কিছু না। আমি বললাম।

মাঝে-মাঝে তুমি এত গম্ভীর হয়ে যাও যে ভালো লাগে না। লারা বলল।

আমি বললাম, সরি।

লারা বলল, আমার ঘরে চল। কফি খেয়ে যাবে অথবা একটা কনিয়াক। নাইটক্যাপ।

আমি ওর সঙ্গেই ওর ঘরে গেলাম।

রুম সার্ভিসে ফোন করে দুটো কনিয়াকের অর্ডার দিয়ে যখন রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও, তখন আমি বললাম, শোফার তোমাকে কী বলছিল নামবার সময়?

লারা চমকে উঠল। তারপর বলল, কী জানি? ওর বস-এর কথা বোধহয়। বুঝলাম না কী বলল।

কনিয়াকটা শেষ করে আমি উঠলাম। বললাম, গুড নাইট। ও উঠে এসে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বলল, ওন্ট উ্য কিস মি গুড নাইট?

বলেই দুটি হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল। আমি ওর ঠোঁটে-ঠোঁট রাখলাম। ও কীরকমভাবে যেন চুমু খেল আমাকে। ওর জিভটা আমার মুখের মধ্যে ঠেলে দিল। গা-শিরশির করে উঠল আমার ভালো লাগায়।

আমার ঘরে ফিরে আসতে-আসতে ভাবছিলাম কোনও বাঙালি মেয়ে কি লারার মতো চুমু খেতে জানে? বোধহয় না। নিশ্চয় করে বলতে পারছি না। কারণ দেশ ছেড়ে আসার আগে কারোরই চুমু পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

গোল্ডেন প্লোভার

কোন অজানা কাল হতে প্রতি শীতে ঝাঁকে-ঝাঁকে একরকম পাখি উত্তর ছেড়ে দক্ষিণে উড়ে আসত প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে। তারা আজও আসে। আবার গরমের সময় দক্ষিণ ছেড়ে উড়ে যায় তারা আলাস্কায়, সাইবেরিয়ার দক্ষিণ দিগন্তে। পাখিগুলোর গায়ের রং নরম ক্ষয়েরিতে মেশা সোনালি। তাদের নাম গোল্ডেন প্লোভার।

প্রতি শীতে তারা দু-হাজার মাইল পেরিয়ে হাওয়াইতে আসত। কোনও-কোনও ঝাঁক তারও দক্ষিণে চলে যেত আরও হাজার-দুই মাইল পেরিয়ে গিয়ে পলিনেশিয়ার নানা দ্বীপে। কেউ জানে না কত শতাব্দী ধরে এই গোল্ডেন প্লোভার পাখিরা তাদের বাৎসরিক যাত্রায় বেরোচ্ছে।

এই পাখিগুলোর বাৎসরিক যাত্রা নিশ্চয়ই পলিনেশিয়ানদের চোখ এড়ায়নি। তারা ভাবত যে পাখিগুলো যখন প্রতিবছর উত্তর থেকে উড়ে আসে এবং আবার গরমের শুরুতে উত্তরে ফিরে যায় তখন নিশ্চয়ই উত্তরে স্থলভূমি আছে। হাওয়াই-এর আবিষ্কারে গোল্ডেন প্লোভার পাখিদের ভূমিকা বড় কম নয়।

হাওয়াইয়ানদের পূর্বসূরী কারা তা নিয়েও কম জল্পনা-কল্পনা হয়নি। নানা মুনির নানা মত।

উনবিংশ শতাব্দীর মিশনারী-ওরিয়েন্টেড ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ইজরায়েলের দশটি হারিয়ে যাওয়া উপজাতি থেকে হাওয়াইয়ানদের উৎপত্তি। ডঃ পিটার ব্ল্যাক বিখ্যাত পলিনেশিয়ান অ্যান্থ্রপলজিস্টের ধারণা যে পলিনেশিয়ান ভাষার শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি হয়েছে মিশর মেসোপটেমিয়া এবং বালুচিস্থান থেকে। এবং খুবই উল্লেখযোগ্য এই যে তাঁর মতে প্রাচীন ভারতের ভিরহিয়া নামক জায়গা থেকে বিতাড়িত হতে-হতে কয়েকদল লোক বর্মা হয়ে, থাইল্যান্ড হয়ে, মালয় উপকূলে এসে পৌঁছয়। এবং সেখান থেকে আবার শত্রুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এসে এই বসবাসযোগ্য আশ্চর্য ভূখণ্ডের হদিস পায়। তারা যখন হাজার-হাজার বছর ধরে এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশের মধ্যে দিয়ে পালাতে থাকে তখন বিভিন্ন দেশীয় লোকেদের সঙ্গে তাদের বিবাহ বন্ধন হয়। এই প্রক্রিয়াতে তাদের শারীরিক চেহারা মানসিকতা এবং চারিত্রিক বিশেষত্ব সবই পাল্টে যায়।

আরেকদল ঐতিহাসিকের ধারণা যে, পলিনেশিয়ানরা এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কূল ছেড়ে ইন্দোনেশিয়ার দিকে চলে আসে।

আসলে যেখান থেকেই হাওয়াইয়ানরা এসে থাকুক না কেন, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই যে ইন্দোনেশিয়াকেই তারা জাম্পিং বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিল। যে-কোনও কারণেই হোক, ইন্দোনেশিয়ায় তারা না থেকে পূবে পলিনেশিয়াতে এসে হাজির হয়।

উনিশশো আটাত্তরের নভেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন কুক আবার হাওয়াইন আইল্যান্ডস-এ ফিরে আসেন। তাঁরা ফেরার পথে প্রথম যে দ্বীপ চোখে পড়ে তাঁর, তা হচ্ছে মাউই। কিন্তু মাউই-এর উপকূল প্রস্তরসঙ্কুল ও এবড়োখেবড়ো বলে সেখানে নোঙর করা হয় না। তাই দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে গিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মূল ভূখণ্ড হাওয়াইতে এসে পৌঁছন কুক। কূল দিয়ে যখন কুক ভেসে চলেছেন তখন সমস্ত কূল জুড়ে কৌতূহলী উৎসুক দ্বীপবাসীরা দাঁড়িয়ে। জাহাজ দুটো হামাকুয়া কূলের সবুজ পাহাড়ি ঢাল ও খাড়া নীচু উপত্যকার পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। দূরে মাথা উঁচু করা বরফ-ঢাকা মউনা-কিয়া পাহাড়ের চুড়োটা দেখা যায়। আরও এগিয়ে চওড়া ইংরিজি 'ভি' আকারের হিলো উপসাগরের পাশ দিয়ে চলে যান কুক।

ওইখান থেকে দূরের আগ্নেয়গিরি উৎক্ষিপ্ত কালো লাভায় ঢাকা পুনা আর কাউজেলার ভূমি দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে দক্ষিণপ্রান্তে ঘুরে ছিমছাম নিস্তরঙ্গ কোনও কূলে এসে পৌঁছন। তবুও নোঙর করতে ভীষণ বেগ পেতে হয়। অতি ধীরে-ধীরে জাহাজ দুটো নোঙর করার জন্যে

কূলের কাছে এগোতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে জাহাজে নাবিকদের একাকীত্ব ঘুচে যায়। দলে-দলে মেয়েরা সাঁতরে এসে দড়ি ধরে ওপরে উঠে আসে। এবং ওপরে উঠে নাবিকদের সবরকম খুশি করে।

মাউই দ্বীপেও এরকমভাবে মেয়েরা দড়ি ধরে ওপরে উঠে আসছিল কিন্তু ক্যাপ্টেন কুক তাদের অনুমতি দেন না। ডঃ স্যামওয়েল, জাহাজের ডাক্তার লিখে গেছেন যে তাতে মেয়েগুলো প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে তাদের সাধুসঙ্গ থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি করে।

আগেই বলেছি, হাওয়াইতে ক্যাপ্টেন কুককে ভগবান লোনো বলে মেনে নিয়েছিল দ্বীপবাসীরা। তাঁর জাহাজের উঁচু মাস্তুল ও সাদা পালগুলোকে দ্বীপবাসীরা ভগবান লোনোর উঁচু দণ্ড ও কাপা কাপড় বলে জানত। তাছাড়া কুক দু-দুবারই মাকাহিকি উৎসবের সময়ে হাওয়াইতে উপস্থিত হওয়ায় কুকের লোনোত্বে দ্বীপবাসীদের কোনওই সন্দেহ ছিল না।

সেবারও ক্যাপ্টেন কুক-এর জন্যে আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনার অভাব হয়নি কোনও। খাবার-দাবার, ফল মূল, শুয়োর এবং নাবিকদের জন্যে অগণিত মহিলাকুল কিছুরই কমতি ছিল না। কিন্তু সমস্ত অভ্যর্থনার মূলে ছিল কুকের তৎকালীন লোনোত্ব।

তাঁদের থাকাকালীনই অবশ্য দেবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগরূক হয়েছিল দ্বীপবাসীদের, বিশেষ করে পুরুতদের মনে। কোয়ালাকুয়া উপসাগরে নোঙর করার দু-সপ্তাহের মধ্যে ক্যাপ্টেন কুকের একজন সহকর্মী উইলিয়াম ওয়াটম্যান মারা গেলেন। ওয়াটম্যানকে ক্রিশ্চিয়ান মতানুসারে কবর দেওয়া হল। নৌসেনারা গার্ড অব অনার দিল ওয়াটম্যানকে। বন্দুক উলটো করে ধরে তারা ইউনিয়ন জ্যাক মোড়া ওয়াটম্যানের কফিনের সামনে-সামনে শোভাযাত্রা করে গেল। কিন্তু ওয়াটম্যানের মৃত্যু দ্বীপবাসীদের কাছে একটা কথা প্রাঞ্জল করে দিয়েছিল যে সাদা চামড়ার এই বিদেশীরা অমর নয়। অন্যান্য মরণশীল মানুষের মতো তারাও মরণশীল।

ওয়াটম্যানের কবরে দ্বীপবাসীরা একটা শুয়োর দিতে চেয়েছিল আহুতি হিসেবে তাদের প্রথানুযায়ী। কুক বারণ করেছিলেন। কিন্তু তারা ভরা রাতের প্রাঞ্জল অন্ধকারে কয়েকজন বয়স্ক হাওয়াইয়ান ওয়াটম্যানের কবরের ওপরে উঠে বসে। তারপর কবরের ওপর তারা একটা শুয়োর মারে। ছোট্ট আগুন করে শুয়োরটার নাড়িভুঁড়ি সেই আগুনে ফেলে শুয়োরটার মড়িটা কবরের ওপরে ফেলে রেখে যায়।

বিদেশিদের সম্বন্ধে দ্বীপবাসীদের মনোভাবের পরিবর্তনের আরও একটা বড় কারণ হয় তাদের কাপুর পর কাপু ভাঙ্গা। হাওয়াইতে কাপু ভাঙ্গা যে ভীষণ গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য হত তাই-ই নয়, যে কাপু ভাঙ্গে তাকে গলা টিপে অথবা মাথায় বাড়ি মেরে নিধন করা হত।

একদিন লাঠি আড়াআড়ি করে রেখে যে কাপু সৃষ্টি করেছিল পুরুতরা, ইংরেজরা সেই লাঠিগুলো তুলে নিয়ে গেল জাহাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। তাছাড়া জাহাজ দুটো অনেকদিন নোঙর করে থাকাতে দ্বীপবাসীদের স্বল্প ক্ষমতার ওপর প্রচণ্ড চাপেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের খাবার-দাবার সব কিছুতে বিদেশীরা ভাগ বসাতে তাদের ভাঁড়ার বাড়ন্ত হয়ে এল। নিজেদের দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা হল।

একদিন দ্বীপের লোকেরা ইংরেজদের ভুঁড়িওয়ালা পেটে আলতো করে টোকা মেরে বিনয়ের সঙ্গে তাদের এবার তীর ছেড়ে চলে যেতে বলল। শ্বেতাঙ্গদের ওরা বলল, যখন ওদের কাছে আবার যথেষ্ট খাবার-দাবার জমা হবে তখন যেন বিদেশিরা আবার আসে।

অনেক মেয়েদের মতোই একজন হাওয়াইয়ান মেয়ে যে জাহাজে নাবিকদের সঙ্গে নিয়ত সহবাসে লিপ্ত ছিল একদিন এসে এক গল্প করল সবাইকে। যখন একজন তার ওপরে শুয়ে চরম আদর করছিল তাকে তখন সে তার নখ ঢুকিয়ে দিয়েছিল নাবিকটির পিঠে। কী আশ্চর্য! নাবিকটা

অন্য দশজন মানুষের মতই ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল। নখ ঢোকালে যদি ব্যথা লাগে তাদের তাহলে তারা নিশ্চয়ই ভগবান নয়।

হাওয়াইয়ান দ্বীপের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারে ভগবানদের মরণশীল মেয়েছেলের সঙ্গে সহবাস করার কথা নয়। ভগবানদের শরীরে ব্যথা বা যন্ত্রণাও থাকে না।

ততদিনে দ্বীপশুদ্ধ লোকই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল যে কুক ভগবান হলেও যদি বা হতে পারেন, কিন্তু তাঁর নাবিকরা মোটেই ভগবান নয়।

সতেরোশো উনআশি সনের ফেব্রুয়ারির চার তারিখে কুক কোয়ালাকুয়া থেকে জাহাজ দুটির নোঙর তুললেন। তার ঠিক চার সপ্তাহ আগে নোঙর ফেলেছিলেন কুক।

কিন্তু বাহির সমুদ্রে বেরোতে-না-বেরোতেই প্রচন্ড হাওয়ার মধ্যে পড়ে জাহাজ দুটোর ভীষণ ক্ষতি হল। এমন ক্ষতি হল যে পাল মাস্তুল দড়াদড়ি সব মেরামত না করে ফিরে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই কুক বাধ্য হয়ে আবার কোয়ালাকুয়া উপসাগরে ফিরে এলেন।

যখন ফিরে এলেন তখন সমুদ্রতটে একজন লোকও ছিল না তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। একটি নৌকোয় কয়েকজন নাবিককে পাঠালেন কুক সেই স্তব্ধ, জনশূন্যতটে খবরাখবর নিয়ে আসার জন্যে। সেই নৌকোর নাবিকরা এসে খবর দিল যে, রাজা কালানিওপু যিনি গতবার ইংরেজদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেছিলেন তিনিই সমস্ত সমুদ্রতটে কাপু জারি করেছেন। সেখানে পা ফেলা নিষেধ, যাওয়া নিষেধ।

কুকের মন উদ্বেগে ভরে গেল কিন্তু নোঙর করে জাহাজ মেরামত না করে ফিরে যাওয়ারও কোনও উপায় ছিল না।

পরদিন রাজা কালানিওপু নিজে সমুদ্রতটে এসে ইংরেজদের বন্ধুভাবে আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু একটা ছোট ঘটনার পর দ্বীপবাসীদের মেজাজ বিগড়ে গেল আরও। ওই শ্বেতাঙ্গ বিদেশিদের প্রতি তাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক উষ্ণতা আগেই মরে গেছিল।

কয়েকজন নাবিক দ্বীপের ভিতরে গেছিল জল আনতে। রাজা তাদের কোনওরকম সাহায্য দিতে মানা করে দিলেন। তখন যে ছ'জন নৌ-সেনা ওই নাবিকদের রক্ষক হয়ে তীরে গেছিল তাদের রাইফেলে গ্রেপশট-এর বদলে বুলেট পুরতে আদেশ দিলেন কুক।

তখনকার মতো ক্যাপ্টেন কুক আর তাঁর বিশ্বস্ত অফিসার জেমস কিং সেই উত্তেজনাময় থমথমে আবহাওয়া শান্ত করলেন। কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত হতে-না-হতেই কুকের বাহিনির অন্য জাহাজ ডিসকভারি থেকে বন্দুকের ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা আওয়াজ শোনা গেল। কুক তাকিয়ে দেখলেন একটা ক্যানো তীরবেগে ওই দিক থেকে ডাঙ্গার দিকে চলে আসছে। নিশ্চয়ই হাওয়াইয়ানরা ওই জাহাজ থেকে কিছু চুরি করে পালাচ্ছিল, ওদের আটকাতে না পেরে ওই জাহাজ থেকে গুলি চালায়।

ইতিমধ্যে নানারকম গণ্ডগোল শুরু হল। কুক নিজে আবার জমিতে নেমে রাজা কালানিওপুর সঙ্গে দেখা করলেন। কুকের মতলব ছিল রাজাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে বন্দি করে ফেলতে পারলে প্রজারা আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু রাজাকে নিয়ে তিনি তীরের দিকে যখন এগিয়ে আসছেন তখন একজন নৌ-সেনার গুলিতে একজন হাওয়াইয়ান সর্দার মারা গেল। কোনও সর্দারকে মারা আর দ্বীপবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা সমগোত্রীয় বলে মনে করত তারা। এ ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েরা ও ছোট ছেলেমেয়েরা সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল। বর্শা, ছোরা, লাঠি, পাথর নিয়ে মাদুরের বর্ম পরে দলে-দলে দ্বীপবাসীরা সমুদ্রতটে দৌড়ে আসতে লাগল।

একজন যোদ্ধা ক্যাপ্টেন কুককে তরোয়াল তুলে মারার ভয় দেখাতেই কুক তার পিস্তল

বের করে তাকে গুলি করলেন। কিন্তু পিস্তলে ছররা পোরা ছিল। ছররাগুলো মাদুরের বর্মে আটকে গেল। লোকটার কিছুই হল না। তখন লোকটা সোল্লাসে সবাইকে বলল যে, দ্যাখো দেবতা লোনো আমাকে মারতে চাইল কিন্তু আমার কিছুই হল না। এই ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভীরু দ্বীপবাসীরা সাহসী হয়ে উঠল। সেই দিন সকালে কোয়ালাকুয়ার তটে প্রায় বাইশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার সশস্ত্র দ্বীপবাসী জমায়েত হয়েছিল।

কুক জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর পাশেই ছিলেন মোলসওয়ার্থ ফিলিপস। আরেকজন যোদ্ধা কুককে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করল, কুক তাকে গুলি করলেন কিন্তু ফসকে গেল গুলি। আক্রমণকারীর পাশের লোক মারা গেল গুলিতে। ফিলিপসও গুলি করে পর-পর দুজন আক্রমণকারীকে মারলেন। নৌকায় যে নাবিকরা ছিল তারাও গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। অন্য যারা তীরে ছিল তারা জলের দিকে পিছন ফিরে লাইন করে দাঁড়িয়ে গুলি ছুড়তে লাগল।

কুক প্রায় হাঁটু জলে চলে এসেছিলেন, এসে হাত তুলে গুলি চালানো বন্ধ করতে অর্ডার দিলেন।

ঠিক তখনই তাঁকে পিছন থেকে একটা মুগুরের বাড়ি মারল একজন মাথায়। কুক জলে পড়ে গেলেন।

যেই কুক জলে পড়লেন, অন্য আরেকজন দ্বীপবাসী তার ছোরা ক্যাপ্টেন কুকের পিঠে আমুল বসিয়ে দিল। জাহাজ থেকে ডাঙ্গায় নামার ঠিক এক ঘণ্টা পর কুক মারা গেলেন।

কুককে পড়ে যেতে দেখে দ্বীপবাসীরা উল্লাসে পাহাড় ফাটানো চিৎকার করে উঠল। কুককে ওরা টেনে ডাঙ্গার অনেক ভিতরে নিয়ে গেল এবং একে অন্যের সঙ্গে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে কুকের লাসে ছোরা বা বর্শা বসাতে পারে।

কুকের মৃত্যুতে ইংরেজরা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। চালর্স ক্লার্ক তখন অধিনায়ক হলেন কুকের জায়গায়।

সেদিন গভীর অন্ধকার রাতে রেজলুশান জাহাজের ওপর দুজন নার্ভাস প্রহরী অন্ধকারতর জল-কেটে একটা ক্যানো আসবার আওয়াজ শুনতে পেল। ওরা কাঁপা হাতে অন্ধকারে গুলি ছুঁড়ল আন্দাজে। গুলি একটুর জন্যে লাগলো না। যে দুজন দ্বীপবাসী ক্যানোটা চালিয়ে আসছিল তারা জাহাজের কাছাকাছি এসে ওপরে আসার অনুমতি চাইল। অনুমতি দেওয়া হল। লোক দুটো এক টুকরো কাপা কাপড়ে মুড়ে একটা ছোট পুঁটলি নিয়ে ঝোলানো দড়ি ধরে জাহাজে উঠে এল। লণ্ঠনের মিটমিটে আলোতে সেই পুঁটুলিটা খুলে দিল তারা। হতবাক ইংরেজরা বিস্ফারিত চোখে দেখল যে তার মধ্যে ক্যাপ্টেন কুকের শরীরের একতাল রক্তমাখা লাল-টকটকে মাংস।

ইংরেজরা কুকের মৃতদেহ নিয়ে দ্বীপবাসীদের এমন নরখাদকের মতো ব্যবহারে দুঃখিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। দ্বীপবাসীরা কিন্তু কুকের মৃতদেহকে তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী যথেষ্ট সম্মানই দেখিয়েছিল।

হাওয়াইতে যদি কোনও শ্রদ্ধার জন বা ভালোলাগার জন মারা যান, তাহলে ওখানকার প্রথানুযায়ী তাঁর হাড়-মাংস মুন্ডু-চামড়া সকলে ভাগাভাগি করে নিয়ে যায় ঘরে।

কুকের মাথা গেছিল রাজার বাড়িতে। মাথার খুলি গেছিল এক বড় সর্দারের বাড়ি। শরীরের অন্যান্য অংশ সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন সর্দারেরা। ও-দেশীয় প্রথানুযায়ী হাড় থেকে মাংস চেঁচে নিয়ে সেই মাংসও ভাগ করে নিয়েছিল ওরা। তারপর হাড়গুলো সব একসঙ্গে করে পুঁতে দিয়েছিল মাটিতে।

প্রতি শীতে নরম সোনালি-বাদামি গোল্ডেন প্লোভার পাখির ঝাঁকের গন্তব্য আদিগন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের কোরকের ফিকে-নীল আর করমচা-লাল জলজ হাওয়াই-এর আবিষ্কারক প্রথম হাওল ক্যাপ্টেন টমাস কুক-এর মর্মান্তিক পরিণতি এই-ই।

ডেরিল ড্যানার

সেদিন আর কনডাকটেড ট্যুরে যাওয়া হল না। লারার শরীরটা খারাপ হয়েছিল। খুব ভোরে উঠে অনেকক্ষণ চান করাতে ঠাণ্ডা লেগে গেছিল। ও ঠাণ্ডা দেশের লোক। হাওয়াই-এর উষ্ণ আবহাওয়ায় গরম-ঠাণ্ডার খেলায় কাবু হয়ে পড়েছিল।

ব্রেকফাস্টের পর ফোন করে ওর ঘরে গেছিলাম। ও মেরুন আর কালো খোপকাটা সুতীর একটা হাউস-কোট পরে বসেছিল সোফাতে। আমাকে দেখে বলল, এসো, এসো।

কিছুক্ষণ গল্প করার পরই দরজার ঘণ্টা বাজল।

লারা বলল, কাম অন ইন।

আমি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি একজন বেঁটেখাটো লোক বয়স্ক, শক্ত-সমর্থ চেহারা, দরজায় দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা গোরখা টুপি। চেহারা দেখে মনে হল হাফ-হাওয়াইয়ান।

আমাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, গুড মর্নিং টু ইউ, ইউ মাস্ট বি লারাজ ফ্রেন্ড।

ইতিমধ্যে লারাও উঠে এসেছিল সোফা ছেড়ে।

লারাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, হাই। সুইটি।

লারা এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক লারার গালে চুমু খেলেন। বললেন, তোমাকে বহুদিন পরে দেখে খুবই ভালো লাগল।

লারাও হাসল। কিন্তু লারার মুখ দেখে লারা যে ভদ্রলোককে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে তা মনে হল না। বরং তাঁকে দেখে উচ্ছল লারা কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

ভদ্রলোকের চোখ দুটো অদ্ভুত। আশ্চর্য জ্বলজ্বলে, বড়-বড় চোখ। চোখের নীচে কালি। মাথার গোরখা টুপিটার দিকে আমি অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম এই হনলুলুতে নেপালি টুপি উনি কী করে পেলেন? আড়াআড়ি করে দুটি রুপোলি ভোজালি টুপির সঙ্গে গাঁথা আছে দেখলাম। যেমন থাকে ওই কাপড়ের টুপিগুলোতে।

লারা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলল, মিট মিস্টার জিত্ বোস। ফ্রম নিউইয়র্ক। আর এই যে মিস্টার ডেরিল ড্যানার।

আমি মাথা নাড়লাম। অবাক হয়ে টুপিটার দিকে চেয়ে ছিলাম আমি।

তারপর উঠে বললাম, আমি এবার চলি।

লারার চোখ দেখে মনে হল ও চাইছিল না যে, আমি চলে যাই, কিন্তু ড্যানার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভেরি নাইস টু হ্যাভ মেট ইউ মিস্টার বোস।

আমি, সি ইউ...বলে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর সোজা লিফট নিয়ে নীচে।

হলিডে-ইন থেকে যখন বেরোচ্ছি দেখি পার্কিং লট-এ কালকের সেই কালো ক্যাডিলাক লিমুজিনটা দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই লম্বা-চওড়া নিগ্রো ড্রাইভারটি নিজের সিটে বসে মনোযোগ সহকারে খবরের কাগজ পড়ছে।

কেন জানি না, ড্যানার ভদ্রলোককে আমার ভালো লাগলো না একটুও। ওঁর চোখ দুটো এমন যে মনে হয় উনি একজন অসাধারণ লোক। অসাধারণ খারাপ লোকও হতে পারেন।

কলকাতা থেকে আসার আগে আমার পিসিমা বলে দিয়েছিলেন, খবরদার জিত্, মেমসাহেব বিয়ে করিসনি।

সে অনেকদিনের কথা। আজকের যুগে বিয়ে ব্যাপারটা অত চট করে হয় না। পশ্চিমি দেশে তো নয়ই এখন আমাদের দেশেও হয় না। তবে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে, ঘনিষ্ঠতা হতে তো কোনও বাধা নেই। দুজন মানুষের যদি একে অন্যকে ভালো লাগে, তারা মনে এমনকি শরীরেও যদি কাছাকাছি আসতে চায় একে অন্যের তাহলে তাতে কোনও দোষ দেখি না আমি। বিয়ে অনেক

গভীর ব্যাপার। সারা জীবনের ব্যাপার। রক্তের শরিক সৃষ্টির চিরায়ত নীড়ের ব্যাপার। যাযাবর পাখিদের মতো হয়ে গেছে এখন পৃথিবীর মানুষ-মানুষী। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেড়ায় তারা গোল্ডেন প্লোভার পাখিদের মতো, একটু উষ্ণতার খোঁজে। খড়কুটো মুখে করে তারা চিরদিনের নীড়ের চেষ্টায় প্রায়ই সচেষ্ট হয় না। এই পারমাণবিক যুগে এক একটা দিনই এক একটি নিটোল জীবন, মুক্তোর মতো। চিরস্থায়ী ভাবনা, চিরায়ত কামনা, মানুষের আর নেই। তারা সকলেই অস্থির, ক্ষণস্থায়ী, ছটফটে অপরিণত সম্পর্কের পরিণতির দিকে নিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে। কালকের কথা ভাবারই সময় নেই এখন মানুষের, সারা জীবনের কথা কে ভাবে? যখন জীবন, ভবিষ্যৎ সবকিছুই মানুষের নিজ-নির্ধারিত ছিল, তখন ওইসব ভাবনা ভেবে দিন কাটানো যেত। আজকে যখন দেশ, কাল, সমাজ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমন কি পৃথিবীর ভবিষ্যৎই অনির্দিষ্ট তখন ওসব ভাবনা ভাবা বোকামি ছাড়া আর কী?

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভালো করে দেখবার জন্যে। ট্যাক্সি ড্রাইভার একজন আমেরিকান। বিরাট গাড়িটার স্টিয়ারিং ধরে বড় বোলের পাইপ মুখে বসে আছে সে।

তার সঙ্গে গল্প করতে-করতে চললাম। নাম ম্যাট।

শুধোলাম, বিয়ে করেছ?

ও বলল, হোয়াট ফর?

আমি চমকে উঠলাম, কপালের দু-পাশের চুলে তার পাক ধরেছে এখনও বিয়ে করেনি কীরকম।

আমাদের দেশে তো এরকম ভাবাই যায় না। জন্ম মৃত্যুর মতো বিয়েও তো অবশ্যম্ভাবী, সেখানে কেউ খেতে পাক আর নাই-ই পাক, নিজে রোজগার করুক আর নাই-ই করুক, বৌকে খাওয়াতে পারুক আর নাই-ই পারুক, একটা বিয়ে না করে ফেলতে পারলে এবং ছেলেমেয়ে না হলে তো মানবজন্মই বৃথা। তাই সেদেশের মানুষ হয়ে কেন বিয়ে করব, এই কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলাম।

আমি বললাম, কেন, তুমি যথেষ্ট রোজগার করো না?

ও বলল, করব না কেন?

আমি বললাম, তুমি একা বোধ করো না? শারীরিক একাকিত্ব, মানসিক একাকিত্ব?

ও বলল, একেবারেই নয়। আমি আমার গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে থাকি। উই লিভ টুগেদার।

আমি বললাম, সে না হয় কয়েকদিন, কয়েকমাস, তারপর?

ও বলল, তারপর কি? পাঁচবছর তো হয়ে গেল।

ছেলে-মেয়ের বাবা হতে ইচ্ছা করে না? তোমার গার্ল ফ্রেন্ড মা হতে চান না?

ড্রাইভার বলল, আমাদের ওসব ফালতু বিলাস ও বড়লোকি নেই। আমরা দুজন নিজেদের বড়ই ভালোবাসি। আমার বান্ধবীও রোজগার করে, আমিও করি। নিজের-নিজের সব খরচা নিজের-নিজের। হ্যাঁ। কখনও কেউ কাউকে কোনও প্রেজেন্ট দিলাম, বা খাওয়ালাম-দাওয়ালাম সে অন্য কথা। দুজনেই আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কেউ কারও ওপরে নির্ভরশীল নই। যতদিন ভালো লাগে থাকব—যখন লাগবে না সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

আমি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লাম ওর জন্যে। বললাম, ধর দশবছর পর যদি তোমার সঙ্গিনী তোমাকে ছেড়ে চলে যায়?

ও হো-হো হেসে উঠল। তারপর বলল, ওঃ বয়। যেতে ও পারেই। আমিও যেতে পারি। কিন্তু গেলে আমারও সঙ্গিনীর অভাব হবে না, ওরও হবে না সঙ্গীর। এতে অসুবিধার কী?

হু-হু করে হাওয়া আসছিল ওয়াইকিকি বিচ থেকে—দোকান-বাজার-হোটেল সারি-সারি—মালটিস্টোরিড। জানালায় হাত রেখে আমি ভাবছিলাম যে, এদের সবচেয়ে বড় বন্ধন বোধহয় এদের

মুক্তিই। স্বার্থপর, অন্যের দায়মুক্ত সবরকম স্বাধীনতাময় জীবনে আনন্দ নিশ্চয়ই আছে। এ আনন্দটা একরকম। বড় স্বার্থপর আনন্দ এ। আমাদের দেশে এখনও কত ছেলেমেয়ে আছে যারা নিজের ভাইবোনেদের মানুষ করে তোলার জন্যে, নিজের বেকার ও অযোগ্য আত্মীয়স্বজনদের শুভার্থে চিরদিন নিজেদের সবদিক দিয়ে বঞ্চনা করে এসেছে ও করছে। কী জানি সেই আত্মবঞ্চনার মধ্যে যে এক বিশেষ সুখ আছে তা বোধহয় এই স্বার্থপরতার সঙ্গে ছিনিয়ে নেওয়া সুখের চেয়ে অনেক গভীর।

অথবা তাই-ই কি? আমাদের দেশেও কি একদল মানুষ ভার বইতে-বইতে অন্যের দায় নিজের কাঁধে চাপাতে-চাপাতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পর যখন যাদের জন্যে নিজেকে নিঃস্ব করল, সেই সব অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্ন লোকেদের দ্বারা অবহেলিত এমন কি অপমানিতও হয় তখন কী তারাও বড় দেরি করে হারানো-অতীতের দিকে চেয়ে হতাশার মধ্যে পা-ছড়িয়ে বসে ভাবে না যে, স্বার্থপর হওয়াই ভালো ছিল?

দেখতে-দেখতে ডোলমান্ডির আনারসের ফার্মে চলে এলাম। এত বড় যে আনারসের বাগান হয়, হতে পারে, তা না দেখলে ভাবা যায় না। যেদিকেই তাকাই না কেন আদিগন্ত আনারস। নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে ছন্দোবদ্ধভাবে লাগানো। মাইলের পর মাইল। তীরবেগে ট্যাক্সি ছুটিয়েও দেখা যায় দিগন্ত রেখাই শুধু প্রসারিত হচ্ছে; বাগান শেষ হচ্ছে না।

আনারস তোলা হয় হাতে, কিন্তু মেকানিকালি কনভেয়র বেল্টে করে সেগুলো ট্রাকে গিয়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে ক্যানিং ফ্যাকটরিতে।

হাওয়াই-এর প্রথম গভর্নর ছিলেন মিস্টার স্যানফোর্ড বি. ডোল্। উনিশশো সন থেকে উনিশশো তিন সন পর্যন্ত। তখনই মিস্টার ডোলের এক কাজিন এখানে এসে আনারসের চাষের পত্তন করেন। আজকে ওআহু ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ডোল কোম্পানির বাগান আছে। হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের একটা পুরো দ্বীপ লানাইর মালিকই এই কোম্পানি। আনারসের দ্বীপ করে ফেলেছেন সেখানে। পুরো ইউ-এস-এ-তে যত আনারস এবং আনারসের রস বিক্রি হয় তার যথাক্রমে পঁয়ষট্টি ভাগ এবং পঁচাশি ভাগই যায় হাওয়াই থেকে।

একসময় ব্রিটিশরা, রাশানরা এবং ফ্রেঞ্চরা তিমি মাছের ব্যাবসার জন্যে এখানে আসত। তখন এই নীল-সবুজ করমচা-লাল শান্ত মেঘাচ্ছন্ন ঘুমন্ত দ্বীপগুলোতে কে ভেবেছিল এত বড়-বড় কল বসবে, চাষাবাদ হবে এমন করে? ওসানোগ্রাফিক ইনস্টিটিউট হবে? এখন হাওয়াই-এর সবচেয়ে বড় রোজগারের সূত্র হচ্ছে—ইউ-এস-এর সামরিক ব্যয়। তারপরই ট্যুওরিজম।

হাওয়াই এখন বিশ্রাম ও ছুটি কাটানোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

ট্যাক্সিটা একটা মোড় ঘুরল। দেখি, মোড়ের মাথায় রাজা কামেহামেহার বিরট এক বারো-ফুট মূর্তি। লিই ফুলের মালায় ঢাকা। কাঁধের পিছনে বর্শা শোয়ানো, সামনে হাত প্রসারিত করা রাজা এখন কামেহামেহা।

এই কামেহামেহা নামটি হাওয়াইন ইতিহাসে কখনও বিস্মৃত হবে না। আগে প্রত্যেকটি দ্বীপ একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এক-একটা দ্বীপ উত্তরাধিকার সূত্রে এক একজন ছোট রাজা বা চিফদের দ্বারা শাসিত হত। কামেহামেহা ওইরকম একজন সর্দার বা ছোট রাজা ছিলেন। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি আস্তে-আস্তে সমস্ত হাওয়াইতে একাধিপত্য করেন।

বেলা বেশ বেড়ে গেছিল। গরমও বেশ। সমুদ্র থেকে হাওয়া আসছে হু-হু করে। ট্যাক্সির মিটারে ডলারের অঙ্কও হু-হু করে বেড়ে চলেছিল।

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, এবার কোথায়?

আমি বললাম, সোজা হোটেলে সবচেয়ে শর্ট-কাট দিয়ে।

হোটেলে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে নামবার সময় লক্ষ করলাম যে, সেই কালো ক্যাডিল্যাক লিমুজিনটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে তবে সকালে যেখানে ছিল সেখানে নয়।

আমি ইচ্ছে করে গাড়িটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম। শোফার কোলের ওপর খবরের কাগজটা ফেলে রেখেছিল কিন্তু তার চোখ ছিল গাড়ির ভিতরের আয়নায়। আয়না দিয়ে সে আমাকে লক্ষ করছিল।

আমি যেন ওকে দেখিইনি এমনভাবে ওর পাশ দিয়ে গিয়ে হোটেলের সিঁড়িতে উঠলাম। ওর পাশ দিয়ে আসার সময় ওর কাঁধের ডি-আই-আই লেখাটাতে আবার চোখ পড়ল।

আবার মন বলছিল যে লারা কোনও কথা আমার কাছে লুকিয়ে যাচ্ছে। এই ড্যানার নামের গোরখাটুপি পরা লোকটা এই কালো ক্যাডিলাক লিমুজিন, লারা এবং ড্যানারের মধ্যের সম্পর্ক — ওই সমস্তই আমার কাছে হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছিল।

ঘরে গিয়ে আমি টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে ড্যানার নামটা বের করে দেখলাম। 'ড্যানার' 'ড্যানার' পেয়েছি! ড্যানার ইনটিগ্রেটেড-ইনটার-ন্যাশনাল। ডি-আই-আই!

কিন্তু এই ড্যানার যে সেই ড্যানার বুঝব কী করে?

নাম্বারটা ডায়াল করলাম। সেক্রেটারি লাইন ধরল। বলল, গুড মর্নিং। ড্যানার ইনটিগ্রেটেড।

মে আই স্পিক টু মিস্টার ড্যানার? আমি বললাম।

বলেই বললাম, আমি কথা বলতে চাই না, আপনি শুধু মিস্টার ড্যানারকে জিগ্যেস করুন যে তাঁর গোরখা টুপিটা ফেলে এসেছেন কি না?

সেক্রেটারি মেয়েটি একটু অবাক হল। পরমুহূর্তেই বলল, না তো! ওঁকে তো টুপি মাথায় দিয়েই ঢুকতে দেখলাম।

আমি থ্যাঙ্ক উ্য বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

ততক্ষণে ড্যানারকে সেক্রেটারি নিশ্চয়ই ওই ফোন কলের কথা বলেছে। এবং ড্যানার কী ভাবছেন কে জানে।

টেলিফোনের বই থেকে কোম্পানির নাম, ঠিকানা ফোন নাম্বার টেলেক্স এবং মিস্টার ড্যানারের বাড়ির নম্বর টুকে নিয়ে আমি ডাইরিতে লিখলাম।

কেন জানি না, বারবারই আমার মনে হচ্ছিল যে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং সম্পূর্ণ না জেনে আমি একটা বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ছি। বিপদটা কিসের, কার কাছ থেকে এবং কী ধরনের সে সম্বন্ধে আমার কোনওই ধারণা ছিল না।

নিজের ঘরে ফিরে লারাকে ফোন করে পেলাম না ওর ঘরে। রিসেপশান থেকে বলল যে, ও বেরিয়ে গেছে, ফিরতে পাঁচটা-ছ'টা হবে।

হাওয়াইয়ান হাট

লাঞ্চের পর আমি নীচের লাউঞ্জে নেমে এসে দেখি সেখানে কুরুক্ষেত্র বেধেছে। বাচ্চাকাচ্চা বুড়ো ধাড়ি সব নানারঙা জামা গায়ে দিয়ে একটা ট্যাবলো সাজাতে লেগে গেছে বিরাট লাউঞ্জের মধ্যেখানে। ফুলে-ফুলে ছয়লাপ। কত রঙের যে কতরকম ট্রপিকাল ফুল তার ইয়ত্তা নেই।

রিসেপশানে জিগ্যেস করতে জানলাম যে কাল আলোহা প্যারেড হবে। ওয়াইকিকি বিচের রাস্তা বেয়ে প্রতিবছরে একবার করে যে প্যারেড হয়, সেই আলোহা প্যারেড। ট্রাডিশান অনুসারে প্রত্যেক হোটেলের রেসিডেন্টরা একটা করে ট্যাবলো সাজাবেন।

বেশ মজা লাগল আমার। মনে কত স্ফূর্তি থাকলে বড়রাও এমন ছেলেমানুষের মতো ট্যাবলো সাজাতে লেগে যেতে পারে তা ভেবে অবাক হলাম। বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে সকলে মিলে হাত লাগিয়েছে। শুনলাম হোটেলের বাসিন্দাদের নিয়ে একটা কমিটি হয়েছে। সকলে নাকি চাঁদাটাদাও

দিয়েছে। রেসিডেন্টদের চাঁদা ও হোটেলের টাকা নিয়ে এই কুরুক্ষেত্র হচ্ছে।

আমি ওর কাছাকাছি একটা সোফায় বসে ফুল সাজানো দেখতে লাগলাম। আর্যকন্যাদের মতো ফুটফুটে সব মেয়েরা, জ্বলজ্বলে স্বাস্থ্যের ছেলেরা ফুলের পাহাড় ঘিরে প্রজাপতির মতো নাচানাচি করছে। দেশের সরস্বতী পুজোর আগের দিন বাড়ির পুজোয় রাত জেগে ঠাকুর ও মণ্ডপ সাজানোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার।

একটি হাওয়াইন ছেলে ফুলের পাহাড়ের জিম্মায় ছিল। সেই-ই ফুল এগিয়ে দিচ্ছিল। এয়ার-কন্ডিশানড হোটেলের এয়ার-কন্ডিশানড লাউঞ্জ। তাই আজ ফুল সাজালেও কাল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই কোনও।

ছেলেটির সঙ্গে ফুল নিয়ে কথা শুরু করলাম। ওর ফুলের দোকান আছে এয়ারপোর্টে, হাসপাতালে, বাজারে। সে যে এ-দেশীয় ফুলের ওপরে অথরিটি তা জানা গেল, একটুক্ষণের মধ্যেই। পটাপট ফুলের নাম বলতে লাগল। বলল, হাওয়াই-এর প্রত্যেকটা দ্বীপেরই এক একটা করে ন্যাশানাল ফ্লাওয়ার আছে।

হাইবিসকাস, কটেজ রোজ, এয়ার প্লান্ট আরও কতরকম ভ্যারাইটির ফুল। ছেলেটি গরগর করে বলে যেতে লাগল।

হাওয়াই-এর, মানে মূল হাওয়াই দ্বীপের জাতীয় ফুল হচ্ছে লাল লেহুয়া (ওহিয়া)—লাল রঙা। মাউই-এর জাতীয় ফুল হচ্ছে লোকেলাণি-গোলাপি। মোলাকাই বেছে নিয়েছে হোয়াইট কুকুই ব্লসমস যে কুকুই বাদাম দিয়ে ওদের পূর্বপুরুষেরা মোমবাতির কাজ চালাত। কুকুই গাছকে এখানে মোম-বাদামও বলে—ক্যান্ডেলনাট। এ-গাছ থেকে পুরোনো দিনে তেল, আলো আর ওষুধ তৈরি হত।

কাহুলায়ে দ্বীপের জাতীয় ফুল হচ্ছে হিনাহিনা (বিচ হেলিয়োট্রোপ) ধূসর রাঙা। লানাই দ্বীপের পছন্দ কাউমাওআ, হলুদ-হলুদ আর সোনালি এয়ার প্লান্ট। আর হনলুলু যে দ্বীপে, সেই ওআহুর জাতীয় ফুল হচ্ছে ইলিমা। হলুদ ফুল! এই রকমই মোহিকানা দেখতে পার্পল—কাউআই দ্বীপের জাতীয় ফুল। আর নিহাউ দ্বীপের জাতীয় ফুল হচ্ছে হোয়াইট পাপ শেল—সাদা। সমস্ত দ্বীপ থেকে ফুল উড়ে আসে প্লেনে হনলুলুতে আলোহা সপ্তাহের জন্যে।

যেমন এক একটা ফুলের নাম মনপসন্দ তেমনই তাদের রং আঁখ-পসন্দ। রামধনুর কোনও রঙই বিভিন্ন মিশ্র হাইবিসকাসে অপ্রাপ্য নয়। এতরকম রঙের যে হয় হাইবিসকাস! দেখলে চোখ ও মন জুড়িয়ে যায়।

দেখতে-দেখতে ছেলেটার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল, ও বলল, ওদের কাজ শেষ হতে-হতে রাত আটটা বাজবে। তারপর এই ট্যাবলো টেনে নিয়ে যাবে গাড়ি সেখানে, যেখান থেকে প্যারেড শুরু হবে কাল। প্যারেড দেখবে তো?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই।

ও বলল, তোমাকে বটগাছ দেখাব।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, বটগাছের দেশের লোক আমি।

ও বলল, কোথাকার?

ইন্ডিয়ার, আমি বললাম।

ও বলল, সাটাজিৎ রে'র দেশের লোক?

রবীন্দ্রনাথকে বিদেশি তরুণরা জানে না। তারা সত্যজিৎকে জানে। পরে জানলাম, অবসর সময়ে ও একটা টিভি কোম্পানির ফটোগ্রাফারও।

ওর সঙ্গে গল্পে মেতে রয়েছি, এমন সময় সেই দীর্ঘকায় গুন্ডাদর্শন ক্যাডিলাক লিমুজিনের শোফার এসে আমাকে বলল, গুড আফটারনুন স্যার। আপনি কি মিস ডসকে দেখেছেন?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছিল যে, লারা হোটেলে নেই। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললাম, যে, না। আমি দেখিনি।

উনি কী ঘরে আছেন?

আমি বললাম, জানি না।

শোফার আমার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সোজা রিসেপশানের দিকে হেঁটে গেল।

রিসেপশানের অনেকগুলি মেয়ের মধ্যে একজনকে জিগ্যেস করল ও দেখলাম। কী উত্তর পেল অতদূর থেকে শোনা সম্ভব ছিল না। সেই মেয়েটি একটি সবুজ গাউন পরে ছিল। শোফার আমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম, কী বলল?

ও বলল, ঘরে নেই।

একটু পর বাইরে গিয়ে দেখি যেখানে লিমুজিনটা ছিল, সেখানে সেটা নেই।

লারা নিশ্চয়ই ওয়াইকিকি বিচের ওপরে যে গেটটা হোটেলের সেই গেট দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কেন? ও কেন ওরই জন্যে অপেক্ষমাণ ক্যাডিলাক লিমুজিন-এর আরাম অগ্রাহ্য করে অন্য দরজা দিয়ে শোফারের নজর এড়িয়ে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে? এ দেখছি এক রীতিমত রহস্যময় নাটকের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। জীবনে কখনও অভিনয় করিনি। অথচ...

লারাকে আজ হাওয়াইয়ান হাটে ডিনার খাওয়াব বলেছিলাম। ওয়াইকিকি বিচের দিকে রাস্তায় হোটেলেরই লাগোয়া একটা কফি ও স্ন্যাকস বার ছিল। সেখান থেকে এক কাপ কফি খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে এলাম। টি ভি খুলে দিয়ে লারার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পর ফোনটা বাজল।

মিঃ বোস?

ইয়েস। আমি বললাম পুরুষকণ্ঠের উত্তরে।

গুড আফটারনুন। ইডস ড্যানার হিয়ার। ডেরিল ড্যানার।

ইয়েস মিস্টার ড্যানার। হোয়াট ইজ ইট? আমি উৎকর্ণ হয়ে বললাম।

মিস্টার ড্যানার বললেন, লারার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

আমি বললাম, লারা তো এখানে নেই।

ওঃ নেই বুঝি?

তারপর বললেন, আমি কী আমার গোরখা টুপিটা আপনার ওখানে ফেলে গেছি?

সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলাম আমি। বললাম, গোরখা টুপি, আপনার? না তো! আপনি আমার ঘরে আসেনই নি! লারার ঘরে ফেলে গেছিলেন কি?

মিঃ ড্যানার বললেন, ও! আই অ্যাম সরি। তাহলে অন্য কোথাও ফেলে এসেছি।

আমি আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, আপনার কাছে ওই টুপির গল্প শোনা হল না। আবার কবে দেখা হবে?

মিঃ ড্যানার কাটা-কাটা গলায় বললেন, নিশ্চয়ই দেখা হবে মিঃ বোস। দেখা নিশ্চয়ই হবে।

'নিশ্চয়ই হবে' কথাটার ওপর বেশ জোর দিলেন মিস্টার ড্যানার। রিসিভারটা নামাতে না-নামাতে দরজার বেল বাজল, উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। রীতিমত হ্যান্ডসাম। ছিপছিপে। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। আমারই মতো বয়স হবে। পরনে একটা গ্রে-রঙা বিজনেস স্যুট। হাতে ব্রিফকেস, চোখে সানগ্লাস—ফোটো সান—যে চশমার রং আলোর সঙ্গে-সঙ্গে বদলায়।

ভদ্রলোক বললেন, সরি টু বদার ইউ। ইজ মিস ডস ইন?

আমি ততোধিক অবাক হয়ে বললাম, লারা তো নেই।

ভদ্রলোক সরি, আই এ্যাম রিয়্যালি সরি; বলে চলে গেলেন।

দু-মিনিট পরে আবার দরজার ঘণ্টা বাজল। দরজা খুলতেই দেখি রিসেপশানের সেই সবুজ গাউন পরা মেয়েটি দাঁড়িয়ে। যার সঙ্গে নিগ্রো শোফার কথা বলেছিল কিছুক্ষণ আগে।

মেয়েটি বলল, একসকিউজ মি স্যার, মিস ডস কি আছেন?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আছেন কী নেই তা আপনি রিসেপশান থেকে আমার ঘরে ফোন করেই তো জানতে পারতেন। কি পারতেন না?

মেয়েটি প্রথমে অপ্রস্তুত হল। তারপর বলল, আপনার ঘরের টেলিফোন বাজছে না—বোধহয় কোনও গোলমাল হয়েছে—।

বলতে-বলতেই, দরজায় মেয়েটি যখন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তখনই ফোনটা আবার বাজল।

মেয়েটি অপ্রতিভ অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে হাসির ভাব মুখে এনে বলল, ওঃ, ফোনটা তাহলে ঠিক হয়ে গেছে। পরক্ষণেই বলল, আই অ্যাম সরি টু ডিসটারব ইউ।

আমি দরজাটা লক করে দিয়ে রিসিভারটা তুললাম।

লারা ওপাশ থেকে বলল, হাই জিত তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে অবেলায়, না স্বপ্ন দেখছিলে কারও? ফোন ধরতে এতক্ষণ লাগল?

আমি বললাম, না, ঘুমোইনি। কী বলছ বল?

লারা বলল, কখন বেরোবে?

তুমি যখন আসবে? কখন আসবে?

এই ছ'টার মধ্যে। তারপর বলল, রাতে কোথায় যাবে?

আমি ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বললাম, পলিনেসিয়ান কর্ণারে।

ও বলল, কেন? হাওয়াইয়ান হাটে যাবে না?

আমি বললাম, নাঃ।

ও বলল, যাই-ই হোক, আমি আসছি।

বিকেল থেকে নানারকম রহস্যময় ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে দেখে ফোনে আমি বলতে চাইনি ওকে যে, হাওয়াইয়ান হাটেই যাব, কিন্তু লারাই নামটা বলে দিল। জানি না সবুজ গাউনের মেয়েটা তখন বন্ধ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল কি না?

টিভি-র দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম আমি। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে নানা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লারা হোটেলে পৌঁছে নিজের ঘর থেকে ফোন করল আমায়। বলল দশমিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি।

লারা যখন এল তখন একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। বিভিন্ন পোশাকে ওর সৌন্দর্য যে কত বিভিন্নতায় আমার চোখে ধরা পড়ছিল এ-ক'দিনের দিনে ও রাতে তা কী বলব! আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে ও বলল, হোয়াট? আর ইউ মুন-স্ট্রাক?

আমি বললাম, নো। লারা-স্ট্রাক।

ও দৌড়ে এসে আমাকে চুমু খেল। বলল, ইউ নটি ফ্লাশার।

আমি বললাম, আই মেন্ট ইট। রিয়্যালি, আই ডিড।

তারপর ওকে সোফায় বসিয়ে পর-পর যা ঘটেছে তাই-ই বলে গেলাম।

শুনতে-শুনতে লারার মুখটা চিন্তায়, ভয়ে কুঁকড়ে উঠল।

ও যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তার চেহারার বর্ণনা আরেকবার চাইল আমার কাছে। আমি আবার বলতেই ওর মুখ ফুটে বেরিয়ে এল, কেনেথ। নোওও, ইট কান্ট বি।

কেনেথ মানে? তোমার টোরোন্টোর বয় ফ্রেন্ড?

হ্যাঁ। কিন্তু আবারও বল ওর চেহারার কথা। কেনেথ হতেই পারে না।

আমি আবার ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা দিলাম।

লারা রিসেপশানে ফোন করল। রিসেপশান থেকে বলল, যে ওই নামে হলিডে ইন-এ কেউই চেক-ইন করেনি।

মেয়েটি বলল, বেনামেও উঠে থাকতে পারে।

পরক্ষণেই লারা আমার কাছে এসে বলল, জিত্ তুমি আমার কতখানি বন্ধু কেন জানি না, আমার বড় ভয় করছে।

মানে? আমি অবাক হয়ে শুধোলাম। বললাম, কীসের ভয়?

ও বলল, তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা অল্প দিনের, কিন্তু তোমাকে না বলেও আমার উপায় নেই। সত্যিটা তোমার জানা দরকার। আমার বড় বিপদ জিত্।

আমি বললাম, ব্যাপারটা বলো আমাকে।

ও বলল, চলো, যেতে-যেতে ট্যাক্সিতে বলব। দেওয়ালেরও কান আছে।

আমি বললাম, যাবে?

ও আমার হাত ধরে বলল, চলো।

আমরা লাউঞ্জে এসে নামতেই দেখি সেই নিগ্রো শোফার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

সে বাউ করে বিনয়ের সঙ্গে বলল, গুড ইভনিং ম্যাম। আমি আপনার জন্যে সকাল থেকে অপেক্ষা করে আছি।

লারা বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। আমরা ট্যাক্সি নিয়েই যাব।

লোকটি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আমার চাকরি যাবে। বস বলে দিয়েছেন যে, আপনি ট্যাক্সিতে যাতায়াত করলে আমার চাকরিই থাকবে না। আর আমার চাকরি না থাকলে....।

লারা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি ওর মুখের দিকে।

তারপর আমরা ক্যাডিলাক লিমুজিনের দিকেই এগিয়ে চললাম।

খুব সৌজন্যের সঙ্গে শোফার দরজা খুলে দিল লারাকে। তারপর আমিও বসলে বলল, হোয়্যার টু?

লারাই বলল, হাওয়াইয়ান হাট। আমি কিছু বললাম না।

হাওয়াইয়ান হাট একটা রেস্তোরাঁ। একেবারে ঘাসে ও শনে ছাওয়া একটা প্রকাণ্ড কুঁড়েঘরের মতো দেখতে তার ভিতরটাও, বাইরেটাও। ক্যাডিলাক লিমুজিনটা যখন নিঃশব্দে অথচ বেগে ছুটে চলেছিল হাওয়াইয়ান হাট-এর দিকে তখন লারা আমার হাতটা তুলে নিয়ে ওর কোলে রাখল।

দেখলাম, ওর হাতের পাতা দুটো ঠান্ডা, ঘামে ভেজা।

আমি আমার হাতের পাতা ঘষে-ঘষে ওর হাতের পাতা গরম করে দিলাম। তারপর আমার হাতের মধ্যে ওর হাতের পাতা নিয়ে চাপা দিলাম তাতে।

হাওয়াইয়ান হাটে যখন পৌঁছলাম আমরা তখনও শোফার খুব যত্ন করে দরজা খুলে লারাকে নামাল, তারপর বলল, আমি অপেক্ষা করছি।

আমরা ভিতরে ঢুকে একটা দুজনের মতো ছোট্ট টেবলে বসলাম। রেস্তোরাঁটি প্রায়ান্ধকার। তবে অন্ধকারের চেহারাটা কালো নয়, রঙিন। নানারঙা আলোর তরল রঙে। কুকুই বাদামের ছড়া দিয়ে বাতি জ্বালা উচিত ছিল ওদের। অবশ্য আগুন লাগার ভয় তাতে।

ড্রিঙ্কস-এর অর্ডার নিতে এল ওয়েটার। আমি মাই-টাই এর অর্ডার দিলাম। এখানের জাতীয় পানীয়। ওয়েটারে কাছেই শুনলাম যে, মাই-টাই তৈরি হয় ফলের রসের সঙ্গে হোয়াইট রাম মিশিয়ে। বোতলেও মাই-টাই পাওয়া যায়।

একটু পরেই স্টেজে হুলা ড্যানস আরম্ভ হল। পেছন দুলিয়ে ঘাসের ঘাঘরা উড়িয়ে উদ্দাম অথচ ছন্দোবদ্ধ নাচ। নাচের সঙ্গে-সঙ্গে বাজনাও বাজছিল।

আমি ওই গোলমালের মধ্যে লারাকে বললাম, এবার বলো। এই গোলমালে কেউ কিছু শুনতে পাবে না।

লারা এদিক-ওদিক তাকাল, যেন এই হাওয়াইয়ান হাটেও কোনও লোক ওকে নজরে রেখেছে।

কিন্তু ওর কথা শোনা হল না। আমাদের একেবারে পাশের টেবলেই এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসে বসলেন। এত কাছে যে ফিসফিস করে বললেও সেকথা শোনা যায়।

লারা মাই-টাই শেষ করে আমাকে বলল, গিভ মি অ্যানাদার ড্রিঙ্ক। আই ফিল লাইক গেটিং ড্রাঙ্ক টু-নাইট।

আমি ওয়েটারকে ডেকে আরও মাই-টাই-এর অর্ডার দিলাম। স্টেজে ততক্ষণে হুলা নাচ শেষ হয়ে গেছে। এখন সামোয়ান ফায়ার ডান্স হচ্ছে। সামোয়া আইল্যান্ডের লোকেদের এই আগুনের নাচ একটি দেখার মতো জিনিস

আমি মাই-টাই-এ চুমুক দিয়ে বললাম যে, কেনেথই কী তোমার জীবনে প্রথম পুরুষ?

লারা হেসে ফেলল। বলল, নাঃ।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে, এমন প্রশ্ন অসভ্য, ইতর লোকেরা করে কোনও মেয়েকে। আমি এও বুঝতে পারছিলাম না যে, লারার ব্যাপারে আমার এত ইন্টারেস্ট কিসের, কেন? আমি কি লারাকে...? লারাকে আমি কি...?

লারা আমার চোখের দিকে চেয়েছিল। একটা আশ্চর্য অভিব্যক্তিময় হাসিতে ওর সমস্ত মুখ দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। বলল, আমরা তোমাদের দেশের মেয়েদের মতো ভালো ও বোকা নই। অন্য শরীরের কাছে আসাটার কোনও দামই নেই আমার কাছে। আমাদের কাছে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, অনেকে এসেছে। কেউ এসেছে কোনও মুহূর্তের ভালোলাগায়, পরিবেশের অভিনবত্ব বা মাদকতায়, দয়ায় সমবেদনায় অথবা কৃতজ্ঞতায় কেউ-কেউ বা ঘৃণাতেও। আমার প্রতি ঘৃণা, তার নিজের প্রতি ঘৃণা। ওটা কিছুই নয়; আসলে ভালোবাসা তো মনের। মনের ভালোবাসা কেনেথকেই প্রথম বেসেছিলাম, হয়তো ভুল করে।

আমি লারার টেবলের ওপরে রাখা হাতে আমার হাত রাখলাম।

লারা বলল, আমি আসছি, একটু একসকিউজ মি।

বলেই, লেডিজ রুমের দিকে চলে গেল।

লারা চলে যেতেই একজন ওয়েটারের পোশাক পরা লোক অচিরে আমার কাছে এসে হাজির হল। তারপর বাউ করে বলল, একসকিউজ মি স্যার। হাউ ওয়েল ডু ইউ নো দিস লেডি? এন্ড ফর হাউ লঙ?

লারাকে আমি কতখানি চিনি এবং কতদিন হল চিনি এ-কথা ও জিগ্যেস করবার কে?

প্রথমে খুব রাগ হল আমার। ভাবলাম বলি যে দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস।

কিন্তু কিছু বলার আগেই লোকটি বলল, ওয়াচ আউট। টেক কেয়ার অফ ইওরসেল্ফ। শি ইজ ডেনজারাস।

বলেই লোকটা যে ট্রে-টা ধরে দাঁড়িয়েছিল, সেই ট্রে-টা নিয়ে চলে গেল।

লারা ফিরে এল। লারাকে আমি কিছু বললাম না, কারণ ও এমনিতেই যথেষ্ট চিন্তিত ছিল। কিন্তু এবার আমার চিন্তা শুরু হল।

এবার খাবার নিয়ে এল, যা অর্ডার করেছিলাম। হাওয়াইয়ান স্পেশালিটি। মাহি-লাহি। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, স্যালাড উইথ ড্রেসিংস সঙ্গে মাছ ভাজা। এই-ই মাহি-লাহি।

লারাকে বেশ চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, চিয়ার আপ। হোয়াটেভার উইল বি, উইল বি। আমি তোমার পাশে আছি। ফর বেটার অর ফর ওয়ার্স—তোমার সঙ্গেই আছি।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা উঠলাম। আবার ক্যাডিলাক লিমুজিন। হু-হু করে গাড়ি চলল।

শোফার বলল, হ্যাড আ নাইস টাইম ম্যাম?

ইয়েস! থ্যাঙ্ক ইউ! লারা বলল নৈর্ব্যক্তিকভাবে।

হলিডে ইন-এর কাছাকাছি এসেছি এমন সময় পিঁ-পাঁ, পিঁ-পা, পিঁ-পা করে সাইরেন বাজাতে-বাজাতে দুটো পুলিশের গাড়ি মাথার ওপরের ঘুরন্ত লাল আলো জ্বালিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। লারা চমকে উঠে গাড়ি দুটোর দিকে তাকাল। শোফারও। গাড়ি দুটো হলিডে ইন-এর সামনে গিয়েই থেমে গেল। গাড়ি থেকে দু-কোমরে দুটি পিস্তল ঝোলানো পুলিশ নেমে বিচের দিকে দৌড়ে গেল।

ওসব দেশে, আমাদের দেশের মতো অসংখ্য কৌতূহলী, বেকার ও পরের ব্যাপারে নাক-গলানো লোক নেই। বিচে বিশেষ ভীড় ছিল না। দু-তিনজন লোক এবং একজন মহিলা হোটেলের দিকে ফিরে আসছিলেন বিচের দিক থেকে।

আমাদেরও নামিয়ে দিল শোফার গাড়ি থেকে। পুলিশ দুজন তখন জোরে বিচের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। ফ্লাড লাইটের আলোয় বিচে কী যেন একটা জিনিস পড়ে আছে দেখলাম।

আমি আর লারা হোটেলে ঢুকে গেলাম।

লারা অটোমেটিক লিফটে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আজকে আমার সঙ্গে থেকো। আমার ভয় করছে। আমার খুব কাছে থেকো।

আমি কিছুই না ভেবে বললাম, বেশ।

লারাকে বললাম, তুমি ঘরে যাও। আমি চেঞ্জ করে আসি। আমার ঘর থেকে।

লারা আমার হাত জড়িয়ে বলল, না। তুমি আমাকে এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকবে না। আমার ভয় করে।

আমি হাসলাম, বললাম, পাগলি নাকি? জামাকাপড় ছাড়ব না? স্লিপিং স্যুটটা পরে আসি।

লারা বলল, না। আমাকে এক মুহূর্তও ছেড়ে যেও না।

তারপর বলল, রাতে তো শুয়েই থাকবে বাবা! স্লিপিং স্যুটের দরকার কী? বলে দুষ্টুমি করে হাসল।

আমি বললাম, নটি গার্ল।

লারা ঘরে ঢুকেই রুম সার্ভিসে ফোন করে দুটো বড় কনিয়াকের অর্ডার দিল।

জুতোটা খুলে ফেলে, কার্পেটে পা রেখে আরাম করে বসল। তারপরেই উঠে পড়ে আমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আমার জুতো খুলতে লাগল দু-হাতে।

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। বললাম, করো কী? করো কী?

লারা বাচ্চা মেয়ের মতো বলল, কেন? শুনেছি ইন্ডিয়ায় স্ত্রীরা স্বামীদের জুতো খুলে দেয়।

আমি হাসলাম। বললাম, সে স্বর্ণযুগ চলে গেছে, এখন স্বামীদের জুতো পেটা করে।

লারা জুতোটা টেনে খুলতে-খুলতে বলল, আই ডোন্ট বিলিভ। তোমাদের দেশের বাবা-মা-ছেলেমেয়ে ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আমাদের কাছে একটা বিস্ময়। পরের জন্মে যদি কখনও কেউ আমাকে বিয়ে করে তাহলে আমি ভারতীয়কে বিয়ে করব।

আমি বললাম, পরজন্ম কেন? এ-জন্মে কী দোষ করল? তা ছাড়া তোমরা আবার পরজন্ম মানো নাকি?

লারা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মানতে পারলে খুশি হতাম।

পিসিমার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আমি বললাম, ধরো আমিই যদি বিয়ে করি?

লারা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, না, না। তা হয় না। আমার কী আছে যে তোমাকে দিতে পারি? আমি খারাপ, খুব খারাপ! আমাকে তুমি কয়েক রাতের সঙ্গিনী করতে পারো, বিয়ে করার কথাই ওঠে না। বিয়ে মানে সন্তানের জননী। রক্তের উত্তরাধিকারী। বিয়ে কি যাকে-তাকে করা উচিত?

ওসব কথা মনেও এনো না।

এমন সময় ফোনটা বাজল।

লারা ফোন ধরল। বলল, ইয়েস।

তারপর অন্য প্রান্তে যে ছিল তাকে বলল, শুনেছি নাকি কেনেথ এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। মিস্টার বোস, আমার বন্ধুর কাছে ও নাকি আমার খোঁজে এসেছিল। এ-হোটেলে ও নেই। আমি চেক করেছি। যদি বেনামে উঠে থাকে তো অন্য কথা।

আমি ঘড়ি দেখলাম, প্রায় দশটা বাজে। আমরা হাওয়াইয়ান হাট থেকে ফিরেছি সাড়ে ন'টা নাগাদ।

তারপরই লারা উত্তেজিত হয়ে উঠল দেখলাম। রাগত স্বরে ড্যানারকে বলল, না। আমি তোমার কাছে এখন যেতে পারব না।

ওপাশ থেকে কে কী বলল, শোনা গেল না কিন্তু লারা বলল, তোমার জন্যে যা করার সবই করেছি। তোমার কোনও বিপদ আমি ঘটাইনি, ঘটাব না। বাট ডোন্ট ইন্টারফেয়ার ইন মাই প্রাইভেট লাইফ। মিস্টার বোস আমার বন্ধু—তার সঙ্গে আমি কতখানি ঘনিষ্ঠ হব না-হব তা আমার ব্যাপার।

তারপর রিসিভারে কান লাগিয়ে কিছুক্ষণ শুনল লারা।

তারপর বলল, লুক ড্যানার। আই হ্যাড হ্যাড এনাফ অফ ইউ! লেট মি লিভ মাই ওওন লাইফ। ভয় দেখিও না আমাকে। সবচেয়ে বড় ভয় তো মৃত্যুভয়? তুমি না হয় মেরেই ফেলবে আমাকে। মেরে ফেললে ফেলো, ভয় দেখিও না প্লিজ। গত দশবছর ভয়ের মধ্যেই কেটেছে প্রতিটি মুহূর্ত। ভয়ের ভয় আর করি না। তোমার যা খুশি করতে পারো।

একটু থেমে, আবার কী যেন শুনল। তারপর আবার বলল, বললামই তো। যা খুশি করতে পারো। আমাকে ঘাঁটিও না। আমি নানাকারণে এখন ডেসপারেট হয়ে গেছি। তোমার ভালোর জন্যেই আমার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলিও না। লিভ মি অ্যালোন।

বলেই ঘটাং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল লারা।

আমি বললাম, কী? এবার আমাকে নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে? তার চেয়ে আমি চলে যাই না কেন, কালই ফিরে যাই। নইলে তোমার বিপদ হবে।

লারা হাসল। বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে। যদি ভয় পাও তো চলেই যাও। আমি চাই না আমার জন্যে তোমার কোনও ক্ষতি হোক। তুমি ড্যানারের কোনও ক্ষতি না করলে ড্যানার তোমার ক্ষতি করবে না। তাই তোমার ভয়ের কারণ দেখি না। ভয় যা তা আমার। তবুও ভয় যদি পাও তাহলে তুমি চলে যাও। অন্য হোটেলেও চলে যেতে পারো। সেটাই ভালো।

আমি বললাম, ড্যানার লোকটা কীসের ব্যাবসা করে?

লারা বলল, করে না এমন ব্যাবসা নেই। তারপর বলল, আমাকে তুমি যত পবিত্র ভাবছ তা নই আমি—নইলে ড্যানারের ভয় পাই আমি! ড্যানারও আমাকে ভয় পায়। কারণ তার অনেক গোপন কথা জানি আমি।

তারপর বলল, কেনেথকে ড্যানার চিনত কিন্তু ওদের মধ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল নই।

এমন সময় ওয়েটার কনিয়াক নিয়ে এল।

লারা আরও দুটো কনিয়াকের অর্ডার দিল।

আমি বললাম, করছ কী? একেই তো অতগুলো মাই-টাই খেয়ে নেশা হয়ে গেছে, দুটো কনিয়াক তো পুরো মাতাল হয়ে যাবে।

লারা হাসছিল। বলল, কিছু-কিছু রাত থাকে, মুহূর্ত থাকে, মাতাল হওয়ার। বিশেষ রাতে,

বিশেষ মুহূর্তে 'না' করতে নেই। কোনও কিছুতেই 'না' করতে নেই।

ওয়েটার আর একটা কনিয়াক দিয়ে যাওয়ার পর সেটা টেবলে রেখে আমি বাথরুমে শাওয়ার নিতে গেলাম। শাওয়ার নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখলাম লারা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

লারা কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল। আমার দিকে পিছন ফিরে।

লারাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরের ওয়াইকিকির রাতের বহুবর্ণ আলোকমালার রামধনুর রং ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। লারা একটা হালকা বেগুনি-নাইটি পরে ফেলেছে। আমি যখন চান করতে গেছিলাম তখন। ও আমার কনিয়াকটা হাতে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার হাতে দিল। তারপর শক্ত করে আমার হাত ধরল।

ফ্রেঞ্চ ওডিকোলনের গন্ধে আমার নাক ভরে গেল।

কনিয়াকটা নিতে-নিতে আমি বললাম হাসতে-হাসতে, আচ্ছা পাগলির পাল্লায় পড়লাম যা হোক। স্লিপিং স্যুটটাও পরে আসতে দিলে না?

লারা খাটে এসে আমার কোমরের পাশে বসল। ওর কাঁধ সমান নেমে আসা সুন্দর ঢেউ খেলানো চুল তীক্ষ্ণ নাক, ভরন্ত ঠোঁট, গোল্ডেন প্লোভারের মতো নরম সোনালি-বাদামি বুকের আভাষে মনে হচ্ছিল ঠাকুমার ঝুলির মতো আমি কোনও মন্ত্রপূত রাজপুত্র হয়ে জলের তলার কোনও পরম রূপসি রাজকন্যার শোওয়ার ঘরে চলে এসেছি।

জীবনে যে স্বপ্ন সত্যি হয় রূপকথার নরম পাখিও বাস্তবে এসে ডানা ঝাপটায় তা আমার জানা ছিল না।

আমার কনিয়াকটা শেষ হতেই লারা নিজেরটাও শেষ করে দৌড়ে এসে আমার চাদরের তলায় ঢুকে গেল। তারপর কী করে যে আদরে সোহাগে খেলায় অভিমানে ক্লান্তিতে আধোঘুমে আবারও খেলায় সারা রাত কেটে গেল তা আমি জানি না।

ঘোরের মধ্যে ভালোলাগার আশ্লেষে বারবার আমি লারাকে নেনে বলে ডাকছিলাম। ওর নরম সাদা দুধল ফুলের মতো শরীরের সঙ্গে একমাত্র নেনেরই তুলনা চলে। কী করে কোনও পুরুষকে খুশি করতে হয় তার শরীরের সর্বস্বতায় তা লারা জানে। আমার জীবনে, প্রথম গোঁফ ওঠার মতো, সাইকেল চড়া শেখার মতো, সাঁতার কাটতে শেখার মতো প্রচণ্ড এক আনন্দময় উত্তেজনার মধ্যে আমি এক দারুণ ভরন্ত অথচ নিঃস্ব হওয়ার খেলা জীবনে সেই প্রথম শিখলাম।

সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, গাড়ি চালানো শেখার মতোই সেই আদিম, প্রাকৃত এবং প্রথম মানুষি খেলা একবার শিখে ফেলার পর পরবর্তী জীবনে কেউ কখনওই আর ভোলে না।

সে রাতে আমি প্রথম পুরুষ শরীরে প্রাপ্তবয়স্ক হলাম। শরীরের মধ্যে যে এত সুপ্ত আনন্দ এমন হেলাফেলায় লুকোনো ছিল সেই জানাকে হৃদয়ের সর্বস্বতায় সেই রাতে প্রথম আবিষ্কার করলাম। সে খেলায় লারাই আমার প্রথম পার্টনার হল। আমার শিক্ষয়িত্রী।

আলোহা প্যারেড এবং তারপর

প্যারেড চলেছে তো চলেছেই। শেষ নেই।

ঝকঝক করছে রোদ্দুর। ওয়াইকিকির পথের দু-পাশের হোটেল থেকে মানুষজন সব ভেঙে পড়েছে রাস্তায়। খবরের কাগজ পেতে-পেতে বসে পড়েছে সকলে ফুটপাথে। অল্পবয়সিরা দাঁড়িয়ে আছে। কী চমৎকার যে সাজসজ্জা। মেয়েরা ও ছেলেরা ঝকমকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে চকচকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছে। ট্যাবলোর পর ট্যাবলো। গাড়ির পর গাড়ি। ব্যান্ডের পর ব্যান্ড। মিলিটারির বিভিন্ন শাখার ব্যান্ড। পুলিশের ব্যান্ড। স্কুল কলেজের আলাদা ব্যান্ড।

প্যাসিফিক ফ্লিটের কম্যান্ডার সস্ত্রীক চলে গেলেন ধীর-গতিতে যাওয়া কনভার্টিবল গাড়িতে। হাওয়াইয়ের গভর্নর এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরও গেলেন সস্ত্রীক। বিভিন্ন হোটেল, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দ্বীপের আলাদা-আলাদা ট্যাবলো। চোখ ধেঁধে যায়।

আমরা ঘুম থেকে উঠেছিলাম দেরি করে। ততক্ষণে প্যারেড আধ ঘণ্টাটাক হল চলা শুরু করেছে। তবুও আমরাও প্রায় ঘণ্টা তিনেক ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে হট-ডগ আর কাগজের কাপে কফি খেতে-খেতে আলোহা প্যারেড দেখলাম।

প্যারেড যখন শেষ হল তখন সারা পথে খবরের কাগজ, আইসক্রিমের কাগজের কাপ, ক্যান্ডি-নাটের ঠোঙা, পপ-কর্ন ও পটেটো চিপসের প্লাস্টিকের আবরণী সব পড়েছিল। অত লোক বলে রাস্তার বিন-এ জায়গা হয়নি তাদের। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পথ ঝাঁট দেওয়ার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লাগানো বিরাট-বিরাট সিভিক ভ্যান এসে সমস্ত কাগজপত্র নোংরা ধুলো সাফ করে শুষে নিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল।

রোদটা কড়া হয়েছিল বেশ। লারা বলল, চলো আমরা সানসেট বিচ-এ যাই।

আমি বললাম, আমি ঘুমোব। রাতে ঘুম হয়নি একটুও। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। লারা হাসল। বলল, দোষটা যেন আমারই একার।

আমিও হাসলাম। বললাম, আমি তো তা বলিনি।

হোটেলে ফিরে আমি শুয়ে পড়লাম। লারার ঘরেই। লারাও বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল।

আমি বললাম, চলো আজ আমরা ক্যাটামেরনে ডিনার খাব।

লারা বলল, বেশ।

তারপর দুজনেই ঘুম লাগালাম। ছুটি, কী আনন্দ, কী আশ্চর্য আরাম। জীবনে এমন ছুটিও যে কখনও কাটাব তা কোনওদিনও ভাবিনি। কাজ থেকে ছুটি, কর্তব্য থেকে ছুটি, ভয় থেকে, মজ্জাগত স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারাচ্ছন্ন নৈতিক বোধ থেকে, ভারতীয় 'কাপু' থেকে ছুটি। বড় পিসিমার শাসন থেকে ছুটি।

বিকেলে আমার ঘরে গিয়ে আমি তৈরি হয়ে এলাম। লারাও তৈরি। আমি বললাম, আর দেরি নয়, চলো।

নীচে নেমে দেখলাম, কোনও অনিবার্য কারণে সেই সাড়ে ছ'ফুটের শোফার এবং কালো লিমুজিনটি অনুপস্থিত। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছলাম গিয়ে সমুদ্রের সেই জায়গায় যেখানে ক্যাটামেরন ভাড়া পাওয়া যায়, বিরাট প্রমোদ তরণী, হাউসবোট। গ্লাস-বটম বোট—নীচটা কাঁচের। রঙিন কোরাল রিফ দেখে তাতে চড়ে লোকেরা।

ওখানে গিয়ে লারা বলল, চলো, হাউস বোটেই যাই। পরে চেঞ্জ করে চলে যাব ক্যাটামেরনে।

সূর্য ডোবার দেরি ছিল, তবুও বোট ছেড়ে দিল। পশ্চিমের রামধনু আকাশের দিকে মুখ করে। কী আশ্চর্য যে দেখতে লাগে এখানে সমুদ্রের ওপরের অস্তগামী সূর্যের আলো তা কী বলব।

লারা বলল, বহুদিন চাইনিজ খাই না, চাইনিজ খাব। সাওয়া স্যুপ সোয়াবিন সস দিয়ে, আর প্রণ গোল্ড-কয়েন। সঙ্গে অ্যামেরিকান চপসুই। তার সঙ্গে বুলস-ব্লাড রেড-ওয়াইন।

লারা আমার টেবিলে-রাখা হাতের ওপর ওর হাতটা রেখেছিল। কথা বলছিল না কোনও। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। লাল মুছে গিয়ে আকাশে কালোর ছোপ লেগেছিল ততক্ষণে—শেষ সূর্যের লাল পাড় লুটিয়ে ছিল দিগন্তরেখার বুকে। সাদা সিগালের ঝাঁক কোথায় না-জানি দেরি করে ফেলেছিল। দ্রুত পাখায় উড়তে-উড়তে তাদের অদ্ভুত বিষণ্ণ অস্ফুট ডাকে আসন্ন রাতের রহস্যময়তাকে গভীর করে ওরা চলে যাচ্ছিল তীরের দিকে।

এমন সময় ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা বেজে উঠল। দপ করে জ্বলে উঠল জাহাজের সবক'টা

আলো একসঙ্গে। নানারঙা রঙিন আলো জ্বলবার পরই শুধু বুঝতে পেলাম কী সুন্দর করে সাজিয়েছে জাহাজটাকে। কালো গভীর আদিম মহাসাগরের বুকে আলোকমালায় সাজা সুবেশ-সুবেশি, সুন্দর ও সুন্দরী পুরুষ ও নারীর সুগন্ধি ভীড়ে আনন্দ যেন ট্যাঙ্গো নাচের বাজনার সঙ্গে-সঙ্গে একে অন্যের হৃদয়ে বিকীরিত হচ্ছিল। পৃথিবীর কত জায়গায় নারী ও পুরুষ যে এই স্বর্গীয় সুন্দর সন্ধ্যায় আনন্দের মধ্যে একাত্ম হয়ে গেছে।

ভাবছিলাম, ওরা কত যে আনন্দ করতে জানে, জীবনকে কী দারুণ ভালোবাসে ওরা, জীবনের প্রতিটি মুহূতর্কে। প্রতি মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এ-কথাটা সর্বক্ষণ জানে বলেই আঁজলা গলে এক বিন্দু জীবনকেও বুঝি ওরা গড়িয়ে গিয়ে নষ্ট হতে দেয় না। পান করে জীবনের অনুপরমাণুকেও। ওদের কাজ করা যেমন শেখার আছে আমাদের, ওদের আনন্দ করার ও আনন্দ পাবার ক্ষমতাও শেখার নিশ্চয়ই।

লারা বলল, নাচবে? ট্যাঙ্গো আমার প্রিয় নাচ।

আমি বললাম, কখনও যে নাচিনি এমন নয়—। দার্জিলিং-এ ঠান্ডা জলে চান করলে, অথবা মুখে গরম আলু পড়লে অনেকবার নেচেছি।

লারা হাসল। বলল, দার্জিলিং কোথায়?

আমি বললাম, যখন আমাদের দেশে যাবে তখন দেখাব, হিমালয়ের বুকের শহর। কোথায় লাগে ইয়োরোপের আল্পস তার কাছে।

লারার চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল। বলল, সত্যি নিয়ে যাবে?

বললাম, তুমি তো যাচ্ছই।

লারা হাঁসির মতো হিস-স-স-স করে উঠল।

বলল, বিশ্বাস হয় না।

রাত ন'টা নাগাদ হাউসবোট এসে পাড়ে ভিড়ল। আমরা নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলের দিকে এলাম। তারপর হোটেল থেকে মাইল খানেক আগে নেমে পড়লাম, হাঁটবার জন্যে।

এখন দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে বেশির ভাগ। সমুদ্র থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছে। এদিকে ঢেউ ভাঙার শব্দ পাওয়া যায় না একেবারেই সমুদ্রকে বালিতে ভরে দিয়েছে বলে।

আমরা দুজনে হাতে-হাত ধরে হেঁটে আসছিলাম হোটেলের দিকে। আমি যে কী খুশি ছিলাম কী বলব। মানুষ শারীরিকভাবে সুখি হলে যে মানসিকভাবেও কতখানি সুখি হয় তা আমি আগে জানতাম না। মানুষের শরীর মন বোধহয় অবিচ্ছেদ্য। একটার সুখ অসুখের সঙ্গে অন্যটার সুখ অসুখ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

হোটেলে ঢুকতেই মনে হল একটা ছমছমে ভাব। লাউঞ্জে বিশেষ লোকজন নেই। রিসেপশান ডেস্কের কাছে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন রঙিন হাওয়াইয়ান শার্ট আর ট্রাউজার পরে।

আমাদের ঢুকতে দেখেই ওঁরা উঠে দাঁড়ালেন—রিসেপশানিস্টের কাছ থেকে আমাদের পরিচয় পেয়ে। তারপর আমাদের কাছে এসে আইডিন্টিটি কার্ড বের করে দেখালেন। ইউ-এস-এর এফ-বি-আই-এর লোক ওঁরা।

ওঁরা বললেন যে, আপনাদের একটু যেতে হবে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।

আমি বললাম, আপনারা যে ভুয়া আইডিন্টিটি কার্ড নিয়ে আসেননি তার প্রমাণ?

ভদ্রলোক দুটি বললেন, কী প্রমাণ চান?

আমি বললাম, আমি ফোন করে জানব, তারপর যাব।

ওঁদের মধ্যে যে ভদ্রলোকের বয়স বেশি, তিনি কাঁধ শ্রাগ করে বললেন, ফেয়ার এনাফ। ওঁরা নম্বর বললেন একটা। কিন্তু তবুও আমি রিসেপশানে গিয়ে টেলিফোন ডিরেকটারি

চেয়ে নিয়ে ফোন নাম্বার বের করে টেলিফোন করলাম। যিনি লোকাল এফ-বি-আই-র বস তাঁর বাড়িতে। তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাঁকে মিস্টার ম্যাক্স গিলিগান বলেই উল্লেখ করছি।

মিস্টার গিলিগানকে আমি ওঁদের আইডিন্টিটি কার্ড দুটো দেখে নাম ও নম্বর বললাম। চেহারার বর্ণনা দিলাম।

উনি বললেন, ইয়া! বোথ অফ দেম আর ভেরি মাচ উইথ আস।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ।

ম্যাক্সের বাড়ির নাম্বারটা মনে-মনে মুখস্থ করে নিলাম।

আমাদের দুজনকে গাড়িতে বসিয়ে ওঁরা লোকাল পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেলেন। একটা ছোট ঘরে আমাদের বসতে বলে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন।

আমি লারাকে বললাম, ওঁরা কি তোমার সম্বন্ধে জানতে পেরেছে?

লারা মুখে আঙুল দিয়ে ইসারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বলল।

বুঝতে পারলাম, হয়ত এ-ঘরে টেপ রেকর্ডার আছে অথবা টিভি-র ক্যামেরা আছে।

যে টেবলের সামনে আমরা বসেছিলাম, সেই টেবলের ওপর সেদিনকার খবরের কাগজটা পড়েছিল। লোকাল কাগজ। সময় কাটাবার জন্য আমি কাগজটা তুলে নিলাম। কাগজটা তুলে নিতেই আমার চোখের মণি স্থির হয়ে গেল। প্রথম পাতার মাঝামাঝি জায়গায় বাঁদিকে বড়-বড় হেডলাইনের খবরঃ 'মার্ডার অন দ্য বিচ।' তার নীচেই কেনেথের ছবি। যে-টাইটা পরে ও আমার কাছে এসেছিল সেই টাইটাই তখনও গলায় ছিল। সেই জামা, সেই স্যুট। নিশ্চয়ই কেনেথ।

সন্দেহের অবকাশও ছিল না। খবরে লেখা ছিল যে, কেনেথ হচনার নামের এক ভদ্রলোক, তাঁর বাড়ি ম্যাসচুসেটস-এ কর্মস্থল টোরোন্টো, কাল সকালের ফ্লাইটেই লস এঞ্জেলস থেকে এসেছিলেন হনলুলুতে। বোধহয় আলোহা প্যারেড দেখতে. কোনও দুর্বোধ্য কারণে তিনি ওয়াইকিকির একটা হোটেলে বেনামে উঠেছিলেন। সন্ধেবেলায় তিনি বিচ-এ হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় কে বা কারা তাঁকে সাইলেন্সার বসানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে। একটিই গুলি, হার্টে। করোনার বলেছেন, পয়েন্ট ফোর-ফাইভ কোলট পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়। আততায়ী ধরা পড়েনি।

লারা আমার দিকে তাকিয়েছিল।

ও আমাকে বলল, হঠাৎ এত মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়তে শুরু করলে? তারপরই বলল, আজ তো কাগজ আমার দেখাই হয়নি।

বলল বটে, তবে ও ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কোথায় যেন চলে গেছিল লারা।

আমি কথা না বলে কাগজটা লারার দিকে এগিয়ে দিলাম।

কাগজটা দেখেই লারা, ওঃ মাই গড! বলে মুখ ঢেকে ফেলল দু-হাতে। তারপর মুখ ঢেকেই রইল।

এমন সময় দরজা খুলে একজন সৌম্যদর্শন, হ্যান্ডসাম ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি কোনও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

উনি বললেন, কেনেথ হচনারকে আপনারা কি চিনতেন?

লারা তাড়াতাড়ি বলল, আমাকে দেখিয়ে যে, ও কিছু জানে না, চিনতও না কেনেথকে। আমিই চিনতাম। ভালোভাবেই চিনতাম।

ভদ্রলোক লারাকে তারপর খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার অনেকক্ষণ ধরে জিগ্যেস করলেন।

আমি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম লারাকে। একটুও উত্তেজিত না হয়ে, না ঘাবড়ে গিয়ে ও কীভাবে নিজের বিষয়ে বলছিল ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক আমাকে বাইরে যেতে বলে লারাকে আরও অনেক কিছু জিগ্যেস করলেন। তারপর আমাকে ডেকে কেনেথকে আমি যে এক ঝলক

দেখেছিলাম সেই দেখা সম্বন্ধে যা জানার তা জানলেন। তারপর কেনেথের যে-ছবিটা কাগজে ছাপা হয়েছে তার ওরিজিনাল দেখিয়ে আমাকে বললেন, এই লোকই তাহলে আপনার ঘরে লারার খোঁজে গেছিলেন? কেনেথ হুচনারকে আপনি শনাক্ত করছেন তাহলে!

আমি বললাম, কেনেথকে আমি চিনি না। তবে ছবিটি এ লোকেরই।

একটু পর আমাদের ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউই যদি শহর ছেড়ে যান তাহলে আমাদের জানিয়ে যাবেন। আপাতত কিছুই করার নেই।

লারা বলল, কেনেথের বেরিয়াল কোথায় হবে? আমি কী ওকে দেখতে পাব না একটুও?

ভদ্রলোক বললেন, ওঁর বাবার রিকোয়েস্টে ওঁর বডি ম্যাসচুসেটস-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিকেলের প্লেনে চলে গেছে বডি।

লারা এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

একটু হেঁটে গিয়েই আমরা একটা ক্যাব পেলাম। ট্যাক্সিতে উঠেই লারা নিঃশব্দে কাঁদতে আরম্ভ করল। ওর চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছিল—দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটে কামড়েছিল ও। ট্যাক্সিতে আমার সঙ্গে ও কোনও কথাই বলল না, বোধহয় ড্রাইভারের সামনে বলবে না বলেই।

হোটেলের কাছাকাছি আসার আগেই ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে নিজেকে সংযত করল ও। মুখে পাউডার মাখল। যখন হলিডে ইন-এ নামলাম আমরা ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। লাউঞ্জে ঢুকতেই একজন লোক আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে বাইরে গেল। লারা পিছন ফিরে লোকটাকে দেখল অনেকক্ষণ।

লিফট-এ করে লারার ঘরে এসে পৌঁছতেই লারা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু একবারই। তারপরই সামলে নিল নিজেকে। আমি ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম না। পশ্চিমি দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের অনেক ছেলেদের চেয়েও শক্ত হয় যে, তা নিজের চোখেই দেখলাম। একটু পর ও নিজেই সামলে নিল নিজেকে।

লারা আমার হাত ধরে বলল, জিত্। কোনওক্রমে আমাকে উদ্ধার করো ড্যানারের হাত থেকে। গতকাল কেনেথকে মারল, আগামীকাল আমাকেও যে মারবে না তার কী গ্যারান্টি আছে? এসব লোক বিপদে পড়লে কোনও কিছু করতেই দেরি করে না।

আমি বললাম, তুমি জানলে কী করে যে কেনেথকে মেরেছে ড্যানারই। তোমার সব জানাশোনা লোকেরাই আমার কাছে হেঁয়ালি। ড্যানার কেনেথকে মারবে কেন? কিসের ইন্টারেস্টে?

ও ছাড়া কে মারবে? ও নিজে হাতে মারে না। ওর লোক আছে। লারার চোখ দুটি ভয়ে ও হতাশায় মাখামাখি হয়ে কোনও গৃহপালিত পরনির্ভর ভাষাহীন প্রাণীর মতো হয়ে গেছিল।

লারার জন্যে, লারাকে আমার বুকে নিয়ে, আমার বড়ই কষ্ট হল।

ম্যাক্স গিলিগান

কাল লারার ঘরে আমি শুইনি। লারাই বারণ করেছিল। অথচ ওর ওইরকম মানসিক অবস্থাতে ওর সঙ্গে থাকা আমার উচিত ছিল।

সারা রাত ঘুম হয়নি। ড্যানার। ড্যানার ইনটিগ্রেটেড ইন্টারন্যাশনাল। ডি-আই-আই। এই নামগুলো মাথায় ঘুরছে কেবল। লোকটার চেহারাই খুনি-খুনি। কিন্তু এরকম খুনি চেহারার রহস্যময় চরিত্রের লোকের সঙ্গে ফুলের মতো ফুলওয়ালি মেয়ের আলাপ কী করে হল এবং ওদের সম্পর্কটাই বা কী তা আমার মাথায় এল না। অথচ, লারা প্রায় প্রাঞ্জলভাবেই বলছে ড্যানারই মেরেছে কেনেথকে। যদি তা জানেই লারা তবে ও পুলিশে খবর দিচ্ছে না কেন?

চান-টান করে তৈরি হয়ে নিলাম আমি। ঠিক করলাম আজ একা-একাই বেড়াব। পরশু আমার চলে যাওয়ার দিন। মধ্যে মাত্র একটা দিন কাল। ভালো করে ঘুরে ফিরে নিই। এ-জীবনে আবার কখনও হনলুলুতে ফেরা হবে কি না জানি না।

জামাকাপড় পরে ফেলেছি, বেরোব, এমন সময় লারা এসে উপস্থিত।

দরজা খুলতেই বলল, কোথায় চললে তুমি?

আমি বললাম, পুলিশে খবর দেব অথবা এফ-বি-আইকে।

লারার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল।

ও বলল, কী খবর?

আমি বললাম, ড্যানারের খবর। কেনেথের হত্যাকারী বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-কথা বলব ওদের।

লারা আমাকে ধমকে বলল, ডোন্ট বি সিলি। তুমি এসবের মধ্যে জড়িও না নিজেকে।

আমি বললাম, তোমার সঙ্গে ড্যানারের সম্পর্ক কী?

লারা আমার দিকে অবাক চোখে চেয়েছিল। এমন চোখে আগে কখনও তাকায়নি ও।

ও বলল, তোমার তা জেনে লাভ কী?

আমি বললাম, এত কিছু ঘটার পর আমার জানা দরকার। কারণ আমি তো জড়িয়েই পড়ছি তোমার ব্যাপারে।

লারা তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বলল, সম্পর্কটা কী তা বললে তুমি আমাকে ঘেন্না করবে। আর আমাকে ভালোবাসতে পারবে না।

আমি বললাম, জীবনের কোনও লজ্জা বা গ্লানির কথা লুকিয়ে রেখে যে-ভালোবাসা পাওয়া যায় তা কি থাকে?

লারা বলল, একথা ঠিক। থাকে না। তবু ক্ষণিকের ভালোবাসারও কী কোনও দাম নেই?

আমি বললাম, কথা ঘুরিও না, বলো।

ও একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, আমি ড্যানারের রক্ষিতা ছিলাম। অনেকদিন। ও আমার সৎ বাবার বন্ধু। আমাকে দশবছর বয়স থেকে জানত। জীবনে ওই প্রথম পুরুষ আমার। টাকার বিনিময়ে এখনও সেই সম্পর্কই রাখতে চায়। আমি যে ফুল বিক্রি করে, কষ্ট করে নিজের পড়াশুনা চালাই, ভবিষ্যৎ স্থির করি তা ওর ইচ্ছে নয়। আমাকে ওর রক্ষিতা করেই রাখতে চায় চিরদিন। এখানে আসার আগে ওকে না জানালেই ভালো হত যে আসছি। আমি ভেবেছিলাম, বড়লোক ড্যানার আমার ও কেনেথের অনেক উপকারে আসবে। আমার সৎ বাবার বন্ধু হিসেবে কেনেথের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিতাম ওর। গাড়ি, নৌকো, বেড়ানো-টেড়ানো সবই চলতে পারত ওর ঘাড়ে। আফটার অল, একসময়ের শয্যাসঙ্গিনী—কিছু দুর্বলতা তো থাকতই আমার প্রতি।

আমি বললাম, কেনেথ যদি তোমাদের সম্পর্ক জেনে ফেলত?

লারা হাসল। বলল, কেনেথ জানত। ওকে সবই বলেছিলাম। জানলেই বা কী? ও-ও তো আর ধোওয়া বাইবেল ছিল না। নাথিং লাইক গুড লিভিং এন্ড গুড লাইফ। বুড়ো ড্যানারের ঘাড়ে আমাদের ছুটিটা পরম উপভোগ্য হত। অনেক মেয়েরই মানি ইজ দ্যা ফার্স্ট হাজব্যান্ড। টাকার চেয়ে বড় আধুনিক মানুষের জীবনে আর কী আছে? কিন্তু দ্যাখো, লোকটা কী সাংঘাতিক। আমার বয়-ফ্রেন্ডকেও সহ্য করতে পারল না। কেনেথ আসতে-না-আসতেই কেনেথকে মেরে ফেলল।

আমি বললাম, এখন তোমার বয়-ফ্রেন্ড তো আমি। এবার আমার পালা বলো।

লারা বলল, তোমাকে এ-জন্যেই তো চলে যেতে বলছি।

আমি সেই কথার পিঠে বললাম, তুমি যদি ড্যানারের ব্যাপারে নিশ্চিতই, তবে পুলিশ বা এফ-বি-আইকে বলছ না কেন?

লারা বলল, বলে লাভ? সব জায়গায় ড্যানারের লোক আছে। টাকা ছড়িয়ে রেখেছে সে সব পকেটে। মাঝখান থেকে আমার আরও বিপদ হবে—কারণ ও জানতে পারবেই।

তারপরই লারা বলল, এবার আমি যাই। তুমি এসব ব্যাপারে মাথা গলিও না। তোমারই বিপদ হবে।

আমি বললাম, চললে কোথায়?

ও বলল, কেনেথের এক কাজিন থাকে এখানে। নেভিতে কাজ করে। ওর কাছে যাব। পার্ল হারবারে। কেনেথের সম্বন্ধে সব জানতে।

ওঃ। আমি বললাম।

লারা চলে গেল আমার ঘর ছেড়ে। আমি ব্রেকফাস্ট করার জন্যে বেরোবার আগে সারাটা দিন কীভাবে কাটানো যায়, তাই-ই মনে-মনে ঠিক করে নিচ্ছিলাম। এমন সময় লারা আবার আমার ঘরে ঢুকল। দরজা লক করা ছিল না। এসেই বলল, তোমাকে একটু বিরক্ত করছি। এই প্যাকেটটা তোমার কাছে রাখো। এতে কতগুলো দলিল আছে। মোলোকাইতে আমি একটা জমি কিনছি—তার দলিলপত্র। আমার সলিসিটরকে দেখাতে হবে। ওখানেই থাকব ভাবছি এরপর। কানাডার ঠাণ্ডা আমার সহ্য হয় না। এই জমি কেনার ব্যাপারেও ড্যানারের কাছে আমার হাত পাতার ছিল। কিন্তু সে যে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ তা কী আগে জানতাম? আমি হোটেলে না থাকলে আমার ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দেওয়াও ড্যানারের লোকেদের পক্ষে অসম্ভব নয়। কাল থেকে আমার ভীষণ ভয় করছে। এই প্যাকেটটা তোমার কাছেই থাক। তুমি যখন পরশু চলে যাবে, নিয়ে যেও। আমার সলিসিটরস লোক পাঠিয়ে তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন নিউইয়র্কে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমার সলিসিটরসদের কোনও লোক নেই হাওয়াইতে?

লারা বেশ বিরক্ত গলায় বলল, থাকলে আর তোমাকে কষ্ট দেব কেন?

তারপর বলল, এটা তুমি এখুনি তোমার স্যুটকেশে চাবি বন্ধ করে রাখো। হারিও না।

আমি হাসলাম। বললাম, তথাস্তু।

লারা বলল, তুমি নিউইয়র্কে তোমার ফ্ল্যাটে পৌঁছবার আধঘণ্টার মধ্যেই সলিসিটরের লোক ওটা নিয়ে যাবে। তোমার কোনও চিন্তা নেই।

আমার কোনও চিন্তা নেই। আমি বললাম।

লারা চলে গেলে আমি উঠে প্যাকেটটাকে স্যুটকেশে ভরে রাখলাম। প্যাকেটটা বেশি ভারি নয়। চারকোণা একটা বাক্সর মতো। দলিল দস্তাবেজ লম্বাই হয়। নয়ত মোড়কের মতো মোড়া থাকে। এ-দেশের ব্যাপার আলাদা। হয়ত ফোটোস্টাট করা আছে।

লিফট নিয়ে লাউঞ্জে এলাম। এ ক'দিন প্রায় সর্বক্ষণ লারার সঙ্গে থেকে হঠাৎ একলা পড়ে যাওয়ায় খারাপ লাগতে লাগল। লাউঞ্জেই বসে রইলাম আমি। বসে-বসে বইটা পড়তে লাগলাম। এমন সময় রিসেপশানের একটি মেয়ে, পেজবয়কে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল। রিসেপশানে গিয়ে পৌঁছতেই মেয়েটি বলল, কল ফর ইউ স্যার।

ফোনটা তুলে নিতেই ওপাশ থেকে লারা বলল, হাই! জিত! আই ফিল ব্যাড ফর ইউ। তুমি একা আছ! কী করব বল? না এসে উপায় ছিল না। আজ সন্ধেবেলায় আমরা খুব মজা করব। উই উইল বিট ইট আপ। আমার দুঃখ মাই-টাইতে ডুবিয়ে দেব।

আমি বললাম, তুমি কখন ফিরবে? লাঞ্চ খাবে নাকি একসঙ্গে?

ও বলল, আমার জন্যে বসে থেকো না। তুমি খেয়ে নিও।

আচ্ছা। আমি বললাম।

ফোনটা ছাড়ার আগে ও বলল, দলিলের প্যাকেটটা স্যুটকেশে রেখেছ তো?

আমি অবাক হলাম। বললাম, হ্যাঁ।

ও বলল, বাই।

বলেই ফোনটা ছেড়ে দিল।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পিছন ফিরেছি এমন সময় মেয়েটি আবার ডাকল আমাকে। বলল, ইয়েট অ্যানাদার কল।

আমি আবার গিয়ে রিসিভার নিলাম।

ওপাশ থেকে একটি চেনা-চেনা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল। মর্নিং মিস্টার বোস।

বললাম, গুড মর্নিং টু ইউ। আপনি কে?

ওপাশ থেকে ভদ্রলোক বললেন, ম্যাক্স। ম্যাক্স গিলিগান।

ম্যাক্স! আমি এক মুহূর্ত ভাবতেই মনে পড়ল। সেদিন রাতে এফ-বি-আইয়ের বড় সাহেবকে ফোন করেছিলাম এখান থেকে। তার আসল নাম বলা যাচ্ছে না। ম্যাক্সই বলছি।

আমি বললাম, কী ব্যাপার?

ম্যাক্স বলল, হাউ বাউট হ্যাভিং লাঞ্চ উইথ মি। আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাও আজকে—খুশি হব। তুমিও খুশি হবে।

অন্য সময় হলে আমি রাজি হতাম না। কিন্তু এই রহস্যের পর রহস্য আমাকে ড্যানার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। লারার জন্যে চিন্তান্বিত।

আমি বললাম, আমাকে হঠাৎ লাঞ্চে ডাকছেন কেন? আমাকে তো আপনি প্রায় চেনেনই না।

ওপাশ থেকে বলল ম্যাক্স, চিনি, চিনব না কেন? তবে আমার স্বার্থ আছে বলেই ডাকছি। হয়তো তোমার স্বার্থেও ডাকছি।

তারপরই বলল, চলে এসো। ক্যাব নিয়ে চলে এসো, বলেই ঠিকনা বলল। তারপর বলল, এসো, আমরা পাম গাছের নীচে বসে বিয়ার খাব, গল্প করব। তোমার ভালোই হবে এলে। চলে এসো।

ভালো করছি না মন্দ বুঝতে না পেরে আমি বেরিয়ে পড়লাম। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে গেলাম।

বাড়িটা বাংলো ধরনের, মনে হল, এটা একটা অফিসও। ছোট্ট—কিন্তু ভিতরে ঢুকেই দেখলাম সুন্দর সবুজ লন, বড়-বড় পাম গাছ—সামনেই সমুদ্র। লনে সাদা ফার্নিচার পাতা—লাল নীল ছাতার নীচে। দুটো কালো কুচকুচে অ্যালসাসিয়ান কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে লনে। আমাকে দেখে যে ভদ্রলোক লনের অন্যপ্রান্ত থেকে এগিয়ে এলেন তাঁকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সেই অধ্যাপকের মতো দেখতে ভদ্রলোক—যিনি সেদিন রাতে আমাকে আর লারাকে জেরা করেছিলেন পুলিশ স্টেশানে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। উনি বললেন, হ্যাঁ। আমিই সেই লোক। আমাকেই তুমি ফোন করেছিলে। পুলিশ স্টেশনেও দেখেছিলে।

আমি বসতেই বাটলার ক্যান বিয়ার দিয়ে গেল, সঙ্গে সসেজ ও পটাটো চিপস।

জিগ্যেস করলাম, আপনি খাবেন না?

ম্যাক্স বলল, আমিও খাব।

বসেই আমি বললাম, আমাকে ডেকেছেন কেন?

ম্যাক্স বলল, বলব, বলব। রিল্যাক্স মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান। রিল্যাক্স করো এবং আমাকে তোমার বন্ধু ভাবো।

তারপর বিয়ারে এক চুমুক দিয়ে বলল, লারাকে তুমি কতখানি চেনো? ও কি তোমার ফিঁয়াসে?

বলেই বলল, অত্যন্ত পার্সোন্যাল প্রশ্ন—কিন্তু তুমি সত্যি কথা বললে আমার পক্ষেও তোমাকে সত্যি কথা বলা সহজ হবে।

আমি বললাম, ফিঁয়াসে নয়, তবে আমরা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছি। এখানে এসেই। তার আগেই আলাপ হয়েছিল মনট্রিয়ালের একটি বারে—রাতে ও ফুল বিক্রি করতে এসেছিল সেখানে। তার পরেও দেখা হয়েছে দু-একবার।

ম্যাক্স বলল, তার আগে তুমি চিনেত না লারাকে?

না! আমি বললাম।

তারপর বললাম, আমি নিউইয়র্কে থাকি—পড়ি....।

ম্যাক্স বলল, তোমার সব খবর আমি রাখি। বলেই আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা, ইউনিভার্সিটির হদিস, এমনকি আমার দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নামও বলল ম্যাক্স।

তারপর বলল, আমাদের কাজই হচ্ছে খবর রাখা। উই হ্যাভ ডাবল-চেকড অন ঊ্য। অ্যান্ড ঊ্য আর ক্লিন। উই নো দ্যাট।

আমি উদ্বেগের সঙ্গে বললাম, তবে লারা সম্বন্ধে কি তোমরা অন্যরকম ভাবছ? আসলে ও কিন্তু খুব ভালো মেয়ে। ড্যানার বলে একটা লোকই কিন্তু কেনেথের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ড্যানার ইন্টিগ্রেটেড ইন্টারন্যাশনালের ড্যানার। লারা আগে ওর রক্ষিতা ছিল।

ম্যাক্সকে উৎসাহিত দেখাল। ও সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। বলল, ড্যানারকে তুমি মিট করেছ?

হ্যাঁ। আমি বললাম, লারার ঘরে। লোকটার চেহারাই খুনি-খুনি। তোমরা খোঁজ করে দেখো, কেনেথ হচনারের মৃত্যুর পিছনে ওই ড্যানারই আছে।

ম্যাক্স বলল, তুমি এত জোরের সঙ্গে কী করে বলছ কথাটা?

লারার কাছ থেকে শুনে। আমি বললাম।

ম্যাক্স বলল, তোমার কাছে ড্যানারের ঠিকানা আছে?

এই যে, বলে সঙ্গে-সঙ্গেই আমি ঠিকানা ফোন নম্বর সব দিলাম।

ম্যাক্সের পাশেই লম্বা তার লাগানো ফোন ছিল। একটা সাদা একটা লাল।

লাল ফোনটা তুলে ম্যাক্স কাকে যেন বলল, মারিয়ান, চেক অন দিস জেন্টেলম্যান অ্যান্ড লেট মি নো ইমিডিয়েটলি।

ম্যাক্সকে চিন্তান্বিত দেখাল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ফোনটা বাজল। ড্যানারের ইউ-এস-এ এবং ইয়োরোপে কোথায়-কোথায় ব্যাবসা আছে তা সব জানিয়ে দিল ম্যাক্সকে কে যেন।

ম্যাক্স বলল, ড্যানারের নানারকম ব্যাবসা আছে, ব্রথেল-কিপারও সে। নানা আন্ডার-ডেভালাপড দেশ থেকে মেয়ে আনে ও। ভারত, থাইল্যান্ড, নেপাল, আফ্রিকার নানা দেশ। স্মাগলিং করে নানা জিনিসের।

তারপরই বলল, লারা কি কল গার্ল?

আমি বললাম, ছিঃ-ছিঃ, না-না। তবে ওর প্রথম যৌবনে ও ড্যানারের রক্ষিতা ছিল। ড্যানারই ওর জীবনে প্রথম পুরুষ।

তারপর বললাম, এত সব গর্হিত কাজ করে তাহলেও ড্যানারকে ধরছ না কেন?

ম্যাক্স বলল, লাইসেন্সওয়ালা মেয়েরা ওর ব্রথেলে থাকে। এদেশে এটা বে-আইনি নয়। স্মাগলিং-এর প্রমাণ হাতে-নাতে পেলে ধরব।

তারপর একটু থেমে ম্যাক্স বলল, মিস্টার বোস, আপাতত আমরা কেনেথ হচনারের মৃত্যু নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। হত্যাকারীকে ধরবার জন্যেই প্রথমে চেষ্টা করতে হবে।

আমি বললাম, আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে?

ম্যাক্স বলল, কিছু না, কিছু না। যা-যা বললে এতেই যথেষ্ট সাহায্য হবে। ড্যানারের পিছনে লোক লাগচ্ছি আমরা। তোমার এবং লারার কথাও সত্যি হতে পারে। ড্যানার মারতেও পারে কেনেথকে। কিন্তু আমাদের তো প্রমাণ চাই। সন্দেহের বশে তো আর কোনও কেস টিকবে না। সন্দেহটাকে প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হবে।

বলেই বলল, লারা আর কেনেথের সম্পর্ক সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জানো?

আমি যা জানি, বললাম। তারপর এও বললাম যে, কেনেথ একদিন ফোন করেছিল লারাকে আমার ঘরে—ওর আসবার কথা ছিল এখানে।

ম্যাক্স সোজা হয়ে বসল। বলল, ফোন করেছিল? তুমি কেনেথের গলা শুনেছিলে?

হ্যাঁ। আমি অবাক হয়ে বললাম।

তারপর বললাম, ফোনে কথা বললাম আর গলা শুনব না?

ম্যাক্স বলল, জাস্ট আ সেকেন্ড প্লিজ। বলেই সাদা ফোনটা তুলে নিয়ে কাকে যেন কী বলল।

দু-মিনিটের মধ্যে একজন ছাই-রঙা স্যুট পরা লোক একটা ক্যাসেট টেপরেকর্ডার নিয়ে এল। এনে টেবলের ওপর রাখল। রেখেই চলে গেল।

ম্যাক্স চাবি টিপে টেপ-রেকর্ডারটাকে বাজাল। একজন লোক কথা বলছিল একটি মেয়ের সঙ্গে। কোনও বার বা রেস্টুরেন্টে টেপ করা হয়েছে কণ্ঠস্বর।

ম্যাক্স বলল, ভালো করে শোনো তো! এই ভদ্রলোকের গলার সঙ্গে কেনেথ হচনারের গলার কোনও মিল আছে?

একটুক্ষণই গলা শুনেছিলাম আমি কেনেথের—ভালো বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে হল এ অন্য লোকের গলা।

ম্যাক্স আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে।

চটপট বন্ধ করে বলল, কী? কী মনে হল?

আমি বললাম, ভালো মনে নেই আমার কিন্তু এ যে অন্য লোকের গলা বলে মনে হচ্ছে।

ম্যাক্স তখনও আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। বলল, আবারও শোনো।

বলেই আবার টেপটা চালিয়ে দিল।

মেয়েটা আর ছেলেটা আবার কথা শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে শুনলাম এবারে। কিন্তু মনে হল না যে, এই গলাটার সঙ্গে কেনেথের যে গলা শুনেছিলাম তার খুব মিল আছে বলে।

ম্যাক্সকে সে-কথা বললাম।

ম্যাক্স বলল, এক লোকের গলাও তো অন্যরকম শোনায় বিভিন্ন সময়ে। তা ছাড়া তুমি একটু শুনেছ। তোমার পক্ষে বোঝা মুশকিলও।

আরও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর আমরা পলিনেসিয়ান খাবার খেলাম।

ম্যাক্স বলল, আমার স্ত্রী থাকলে তোমাকে বিরিয়ানি পোলাউ খাওয়াতাম। আমরা দু-বছর যে দিল্লিতে ছিলাম।

তাই বুঝি? অবাক হলাম আমি।

ম্যাক্স বলল, আই হ্যাভ গ্রেট রেসপেকট ফর ইন্ডিয়ানস। তোমরা বড় সাদাসরল অতিথিপরায়ণ লোক—ইন্ডিয়াতে ক্রাইমও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ।

তারপর ম্যাক্স আমাকে অনেকবার ধন্যবাদ দিল। এবং নিজের শোফার ড্রিভন সাদা স্পোর্টস মডেল জাগুয়ার গাড়ির দরজা খুলে আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিল।

গাড়িতে হলিডে ইন-এ ফিরে আসতে-আসতে আমি ভাবছিলাম যে, ম্যাক্স আমাকে একবারও বারণ করল না লারাকে জানাতে যে, আমি এখানে এসেছিলাম। লারার প্রতি কোনও সন্দেহ থাকলে

তা নিশ্চয়ই করত। লারাকে সন্দেহ করবেই বা কেন? ভাবলাম আমি। আহা এমন সুন্দরী নরম নেনে পাখির মতো মেয়ে, সে কী কোনও অন্যায় করতে পারে? কেনেথের মৃত্যুতে বেচারি ভেঙে পড়েছে একেবারে।

রৌদ্রালোকিত পথে গাড়িতে যেতে-যেতে রাতের স্বপ্নালোকিত আলোয় বিছানার ওপর লারার নগ্ন নিভৃত স্বপ্নময় শরীরটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই বলেছিল যে, বিয়ের পরপর কয়েকমাস ও-ও এমনি করে দিনদুপুরে ওর নববিবাহিতা স্ত্রীকে দেখতে পেত। ভাই ডাক্তার ছিল। ও বলত, ওই সময় যে কত ভুল চিকিৎসাই না করেছি কত লোকের তা কী বলব!

বিয়ারটা একটু বেশিই খেয়েছিলাম। জামাকাপড় ছেড়ে লম্বা ঘুম লাগালাম। ঘুম ভাঙল দরজার বেল বাজায়।

দরজা খুলতেই দেখি লারা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই দু-হাত বাড়িয়ে এসে আমাকে চুমু খেল ও।

আমি বললাম, চা আনাই।

ও বলল, চা না কফি! রিয়্যাল স্ট্রং ব্ল্যাক কফি।

রুম সার্ভিসে কফির অর্ডার করে আমি ওকে বললাম ম্যাক্সের কথা। ওখানে যাওয়ার কথা। লারার চোখ দুটি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আমার জন্যে।

বলল, তুমি করেছ কী? তুমি জানো যে যেই-ই কেনেথকে মেরে থাকুক তার লোক আমাদের নজর রাখছে, ড্যানারের লোক তো রাখছেই।

তারা তোমাকে কিছু বোঝার আগেই শেষ করে দেবে। তুমি জানো না তুমি কী ভুল করেছ! এখন আমার চেয়ে তোমার বিপদ বেশি।

আমি বললাম, আমার কিসের বিপদ?

লারা বলল, তুমি এইসব আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর লোকদের জানো না। এরা সাংঘাতিক।

লারাকে খুবই চিন্তান্বিত দেখাল।

আমি ভাবলাম যে আমি ফিরে যাই নিউইয়র্কে। মিছিমিছি কীসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছি। কিন্তু লারা। লারার সুন্দর শরীর। শরীরের মধ্যের কত সব লুকোনো যাদু ছলা কলা। আমার নেশা লেগে গেছে। মৃত্যুর নেশাও বুঝি এরকম। নিশির ডাকের মতো লারার শরীর সবসময় আমাকে হাতছানি দেয়।

নারী-শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমি শরীরী জগতে প্রবেশ করলাম এমনই একজন নমনীয় পেলব রঙ্গিনি নারীর হাত ধরে যে, মনে হচ্ছে সারা জীবনের মতো এই জগতেই বুঝি বন্দি হয়ে থাকব। এই গোলকধাঁধা থেকে আমার বুঝি মুক্তি নেই। পরশু যেতে তো হবেই। কিন্তু আজ ও কাল এই দুটি দিন ও রাতের বিনিময়ে যে-কোনও দামই দিতে রাজি আমি।

লারা আমাকে বলল, তুমি আজই চলে যাও। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়। সানফ্রানসিসকো বা লসএঞ্জেলেস হয়ে অনেক ফ্লাইট আছে নিউইয়র্কের। দেরি কোরো না তুমি। দেরি করলে মরবে।

আমি ওকে দু-হাতে জড়িয়ে বললাম, আমাকে এই দু-দিন দু-রাত তোমার কাছে থাকতে দাও। তাতে যদি মরতে হয় তাহলে মরব। এই আনন্দের জন্যে মরতে হলেও মরব।

লারা হঠাৎ বিড়বিড় করে বলল, ইউ সিলি সেন্টিমেন্টাল ফুল। তুমি জানো না যে, এখন আমার সঙ্গে শোওয়া মানে মৃত্যুর সঙ্গে শোওয়া।

আমি হেসে উঠলাম। কাব্য করে বললাম, তাই-ই! মৃত্যুকেই রমণ করব।

তারপর মনে-মনে বললাম, লারার শরীরের নিবিড় আশ্লেষে প্রতিবারের উষ্ণ নিঃশ্বাসে মৃত্যুর জঘনে ওঠা নামা করব আমি।

লারা অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। ওর মুখটা ভাবলেশহীন।

ও বলল, মৃত্যুর মধ্যে কোনও উষ্ণতা নেই! মৃত্যু ব্যাঙের গায়ের মতো ঠান্ডা। মৃত্যুকে জানোনি তুমি। তাই-ই এমন পাগলের মতো কথা বলছ।

আমি বললাম, কথা বাড়িও না।

লারা বলল, তুমি যদি চলে নাই-ই যাও তবে এখানে আমাদের একসঙ্গে থাকা অসম্ভব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তবে কোথায় যাবে?

পালাব। নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল লারা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি পালাবে কেন? তুমি কী করেছ? ড্যানারের ভার নিয়ে নিয়েছে ম্যাক্স। ড্যানার আর তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চিন্ত থেকো।

লারা বলল, তুমি কিছু চেনো না ড্যানারকে। তুমি চুপ করো। চলো আজ রাতেই চলে যাই আমরা।

আমি বললাম, বাঃ। থানায় না জানিয়ে যাবে কী করে? আমাদের না বলেছে শহর ছেড়ে গেলে জানিয়ে যেতে।

তুমি জানাও। আমি জানাব না। লারা বলল।

আমি লারাকে বললাম, জানো ম্যাক্স আমাকে কেনেথের গলার টেপ বাজিয়ে শোনাল।

টেপ? কিসের টেপ? কেন?

গলাটা কেনেথের কী না জানার জন্যে।

লারা বলল, তুমি কী বললে?

বললাম, কেনেথের মতো মনে হচ্ছে না—মানে আমি যে কেনেথের গলা শুনেছিলাম।

লারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বলল, তার মানেই আমাকে এবং তোমাকে ওরা ড্যানারের সাগরেদ ভাবছে। তুমি জানো না তুমি কী ইডিয়টের মতো কাজ করেছ।

আমি ওর ভাষায় স্তম্ভিত ও দুঃখিত হলাম। মুখে কিছু বললাম না।

লারা বলল, চলো আমরা এই হোটেল থেকে পালাই।

কোথায় যাবে? আমি শুধোলাম। তারপর বললাম, তোমার সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্যই তো দেখায়নি ম্যাক্স। তুমি নিজেকে এত ইমপর্টান্ট ভাবছ কেন?

কাহালা হিলটনে যাব। হাইড এওয়ে কটেজে থাকব চুপচাপ। বেনামে। ওদিকটা একেবারে নির্জন। সমুদ্রের ধারে।

আমি বললাম, আমি বেনামে থাকতে যাব কেন? বেনামে কোথাও থাকাটাও তো বেআইনি।

লারা বলল, তাহলে আমি একাই যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকো—যখন খুশি চলে এসো আমার কাছে। কিন্তু কেউ যেন বুঝতে না পায়। যেন ওই হোটেলেই খেতে গেছ—এমনি ভাবে যাবে—ট্যাক্সি ঘুরিয়ে অন্য পথ দিয়ে—যাতে কেউই বুঝতে না পারে যে তুমি আমার কাছে আসছ।

আমি বললাম, যা ভালো মনে করো। আমি তো পরশু ভোরেই চলে যাচ্ছি। তোমার কী যে এমন অসুবিধা হত জানি না দু-দিন এখানে থাকলে।

লারা বলল, আমি এই হোটেলের ঘরটাও রেখে দেব। যাতে আমি চলে গেছি এখান থেকে এমন সন্দেহ কেউ না করতে পারে। শুধু নাইটিটা নিয়ে যাব কাগজে মুড়ে। তুমি আমার ঘরের বিছানাতে শুয়ে থেকো মাঝে-মাঝে, যাতে হোটেলের হাউসকিপিং স্টাফেরা জানে যে আমি এখানেই আছি।

আমি কোনও জবাব দিলাম না।

লারা বলল, আমি চললাম। আমার কথা কেউ জিগ্যেস করলে বোলো, জানো না। আমাকে ফোনও কোরো না। যদি আসতে চাও, তাহলে সোজা চলে এসো কাহালা হিলটনে রাতে। আমি

অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।

বলেই, হঠাৎ উঠে পড়ে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে চুমু খেল আমাকে। পরক্ষণেই বলল, বাই! দরজা অবধি ফিরে গিয়েই বলল আমার প্যাকেটটা—প্যাকেটটা হারিও না যেন। আমার সলিসিটরের নাম ফিনিগান ব্রাদার্স, ফিফথ অ্যাভিন্যুতে ওদের অফিস। ওদের লোকই আসবে।

লারা আবার বলল, আমার নতুন নাম জিনা ওয়াকার, সানফ্রানসিসকোর।

আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একটা সুন্দর উষ্ণ ছুটি ধীরে-ধীরে কেমন ঠান্ডা, টেন্স, ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠছে।

লারা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসে থেকে পথে বেরোলাম। হলিডে ইন-এর দুটো দরজা। একটা ওয়াইকিকি বিচের দিকে হোটেলের স্টেশনারি দোকানটার পাশ দিয়ে আর অন্যটা পাশের রাস্তায় পড়েছে। সেটাও গিয়ে মিশেছে ওয়াইকিকিতে।

একবার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারে গেলাম। কিছুই ভালো লাগছিল না। রাত বাড়তেই লারার চুলের সুগন্ধ ওর শরীরের সাবানের গন্ধের সঙ্গে মিশে উড়াল হাওয়ায় হাতছানি দিতে লাগল আমাকে। আমি এই প্রথম জানলাম, নারী-পুরুষের পক্ষে কত বড় বিপদের। নারীর নেশায় কীভাবে পুরুষ সর্বস্বান্ত হয়। আমার মন বলছিল লারার কাছে যাওয়ায় আমার বিপদ আছে। এমনিতেও হয়তো আছে। ড্যানার এবং তার লোকজন চারপাশে। তবুও, সব জেনেও আমি নিজেকে বাগ মানাতে পারলাম না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেন্টারের সামনে থেকেই একটা ক্যাব নিয়ে বললাম, কাহালা হিলটন।

ট্যাক্সিটা মুহূর্তের মধ্যে ছুটে চলল রাতের পথ ধরে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথ ঘাট ভিজে। ভেজা পথে পথের রঙিন আলোর প্রতিফলন পড়েছে। কাহালা হিলটনের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ একটা কালো ক্যাডিলাক লিমুজিন খুব জোরে আমার ট্যাক্সিকে ওভারটেক করে চলে গেল। যেন নাম্বার প্লেটটা চেনা মনে হল। কিন্তু ভালো করে দেখার আগেই গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাড়া মিটিয়ে রিশেপসানে গিয়ে জিনা ওয়াকারের খোঁজ করলাম। হাইড-এওয়ে কটেজগুলো কোথায় তা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে কটেজের নাম্বার বলে দিল।

হু-হু করে হাওয়া আসছে সমুদ্র থেকে, পামগাছের পাতাগুলো হাত নাড়ছে পাগলের মতো। আরও নানারকম গাছ। এদিকটা কেমন ছায়া-ছায়া অন্ধকার-অন্ধকার। হনিমুনিং কাপলসরা, প্রেমিক-প্রেমিকারা এবং পরকীয়া প্রেমের অংশীদাররা বড় পছন্দ করে এই লুকিয়ে-থাকা কটেজগুলো। ওরা যেমন পরিবেশ চায়, তেমনই পরিবেশ।

লারার কটেজের কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখি লারা জল থেকে উঠে আসছে বিকিনি পরে। তারপর ওইখানেই দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। আমি কাছে যেতেই বলল, এসো, পাম গাছের অন্ধকারে বসি। কেউই আমাদের দেখতে পাবে না। বলেই লারা টান-টান হয়ে বালির মধ্যে শুয়ে পড়ল।

আজ ত্রয়োদশী কী চতুর্দশী। চাঁদের আলো পাতার ফাঁক-ফোক দিয়ে এসে নীচে পড়েছে। তবুও জায়গাটা অন্ধকার। লারার ভেজা ঠোঁটে আমি জামাকাপড় পরেই নীচু হয়ে চুমু খেলাম।

লারা বলল, সুইটি পাই। তারপর বলল, খেয়ে এসেছ?

আমি বললাম, না। খাব না। আজ শুধু তোমাকে খাব।

লারা চাপা হাসি হাসল। বলল, ক্যানিবাল।

তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, এসো আমরা বালির বাড়ি-ঘর বানাই বালি খুঁড়ে।

আমাকেও খেলায় পেল। লারা যেন ছোট্ট মেয়ে হয়ে গেল। আমরা দুজনে মিলে বালি খুঁড়তে লাগলাম ঘনসন্নিবিষ্ট পাম গাছেদের মাঝের ছায়াচ্ছন্ন জায়গাতে। অনেকক্ষণ খোঁড়ার পর আমি বললাম, অনেক হয়েছে, আর কী হবে?

লারা বলল, প্রাসাদ বানাব। ছোট্ট বাড়িতে কী আমাদের দুজনকে কুলোবে? বলেই দ্বিগুণ জোরে বালি তুলতে লাগল।

আমি বললাম, করছ কী? আঙুল ব্যথা হয়ে গেল আমার।

ও বলল, হোক না কেন? আমি রাতে ব্যথা সারিয়ে দেব।

দেখতে-দেখতে প্রায় দু-ফিট মতো গর্ত হয়ে গেল একটা। অনেক বালি উঠল। আমরা দুজনে ঘর-বাড়ি বানাতে লাগলাম। আমি একটা, ও একটা।

লারা বলল, আমাদের আলাদা-আলাদা বাড়ি—মধ্যে জল থাকবে আর তাতে ব্রিজ। পূর্ণিমা রাতে তুমি আমার বাড়ি আসবে, কেমন?

আমি হাসলাম। বললাম, বাব্বাঃ এ যে শেষের কবিতা হয়ে গেল।

লারা বলল, সেটা কী?

আমি বললাম, আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'। টেগোরের নাম শুনেছ?

না।

আমি বললাম, তোমাকে দেব বইটা। কৃষ্ণ কৃপালনীর ইংরিজি ট্র্যানস্লেশান আছে, 'অ্যাডিউ মাই ফ্রেন্ড।' বলেই, আমি বাংলায় আবৃত্তি করলাম, 'মোর তরে যদি কেউ প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে, আমাকে।' তারপর ইংরিজিতে তর্জমা করে শোনালাম লারাকে।

লারা বলল, গ্রেট।

এমন সময় স্যুট-পরা একজন লোককে দূরের হোটেলের মেইন ব্লকের দিক থেকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

লারা কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখেই সিঁটিয়ে গেল ভয়ে।

ও আমাকে বলল, তুমি এগিয়ে গিয়ে দেখো তো লোকটা কে? কী চায়?

আমিও যেন বিচে হেঁটে বেড়াচ্ছি এমনিভাবে ওইদিকে হেঁটে গেলাম। লোকটা সোজা ওই পামগাছের ছায়া ঘেরা জায়গাটার দিকেই আসছিল। আমার মুখোমুখি হতেই হঠাৎ লোকটাকে চিনতে পারলাম আমি।

আবছা চাঁদের আলোয়, সমুদ্রের গর্জনে, পামের পাতা কাঁপানো হাওয়ায় আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম।

লোকটা বলল, হাই! মিস্টার বোস।

আমি বললাম, হাই!

বলেই বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সেই ছাইরঙা বিজনেস স্যুট—কেনেথ হচনার।

লোকটা বলল, ওখানে হাঁটু গেড়ে বসে কী করছিলে তুমি? লারা কোথায়?

আমি বললাম, আমার এক গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে বালির ঘর বানাচ্ছিলাম। লারার কথা জানি না। ও বোধহয় হলিডে ইন-এই থাকবে।

কেনেথ বলল, দ্যাটস ফাইন। আমি বরং হলিডে ইন-এই যাই।

তুমি এখানে কী করছিলে?

কনডাকটেড ট্যুওরে এসেছিলাম নাচ দেখতে, ডিনার খেতে। বলেই হাত তুলে বলল, সি ইউ এগেইন।

ও পিছন ফিরতে আমি বললাম, আমিই কী বললাম? বললাম, তুমি তো মরে গেছ।

কেনেথ হচনার মুখটা ঘোরাল। বলল, ইয়েস, অলমোস্ট। তারপর বলল, আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভস।

বলেই আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

আমি লারার দিকে দৌড়ে যেতে-যেতে দেখলাম, লারা কী একটা জিনিস বালির গর্তের মধ্যে ফেলে বালি চাপা দিচ্ছে।

আমি পৌঁছতেই বলল, হাত লাগাও। এসো গর্ত বুজিয়ে দিয়ে ঘরে যাই আমরা।

আমি বললাম, তুমি গর্তের মধ্যে কী কিছু ফেললে?

লারা অবাক হয়ে বলল, আমি! কী ফেলব? না তো?

আমি তাকিয়ে দেখলাম লারার হ্যান্ডব্যাগটা পাশেই রাখা।

আমি বললাম, এই ব্যাগটা তো তোমার সঙ্গে ছিল না।

না। আমি ওইখানে ছায়ায় রেখে গেছিলাম লুকিয়ে। তুমি বোধহয় ব্যাগটাকে নিতে দেখেছ আমায়।

আমি বললাম, হবে।

লারা বলল, লোকটা কে?

আমি বললাম, কেনেথ। কেনেথ হচনার।

হোয়াট! বলে লারা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আমাকে ধমকে উঠল।

তারপর বলল, আমাকে সত্যি কথা বল। নইলে তোমাকেও সন্দেহ করব আমি।

আমি বললাম, সত্যিই বলছি। আমাকে আমার নাম ধরে ডাকল। তোমার কথা জিগ্যেস করল। আমি বললাম, তুমি হলিডে ইন-এই আছ। ও বলল এখানে ও খেতে ও নাচ দেখতে এসেছিল। বিচে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে-বেড়াতে এদিকে চলে আসে।

লারা রাগে কাঁপছিল। বলল, ইউ ইন্ডিয়ানস। ইউ বিলিভ ইন রোপট্রিকস, স্নেক-চার্মিং এন্ড ইন ঘোস্টস। ইউ আর ফানি, রিয়্যালি ফানি।

আমি বললাম, হবে। আমি কথা বললাম জ্যান্ত লোকটার সঙ্গে। চলো, আমরা তো ওই পথ দিয়েই কটেজে ফিরব। তোমাকে ওর জুতোর দাগও দেখাব বালিতে।

লারা আমার সাহায্য ছাড়াই গর্তটা বালি দিয়ে বুজিয়ে দিল।

আমি বললাম, বাড়িগুলো গড়তে-না-গড়তেই ভাঙলে কেন? গর্ত ভরাট করার তাড়া কী ছিল?

লারা বলল, তা কেন? কোনও লোক অন্ধকারে এর মধ্যে পড়ে পা মচকাক আর কী!

আমরা ফিরে আসছিলাম। লারা আমার হাত ধরে আসছিল। কিন্তু ওর নিজের পায়ে যেন জোর ছিল না। আমার শরীরে ভর দিয়ে হাঁটছিল।

কেনেথের সঙ্গে যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছিলাম, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি লারাকে জুতোর ছাপ দেখাতে নীচু হতেই দেখলাম কী যেন একটা পড়ে আছে সেখানে।

আমি সেটা তুলে নিতেই লারা আতঙ্কে অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, রুমালটায় কোনও পারফিউম আছে?

আমি শুঁকে বললাম, আছে।

কী পারফিউম? বলতে পারো?

লারা জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল উত্তরের প্রতীক্ষায়।

আমি বললাম, পারি। ব্রুট।

লারা আবারও যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বলল, ব্রুট! ব্রুট পারফিউমের গন্ধ! এ তো কেনেথেরই রুমাল, কেনেথেরই পারফিউম।

পরক্ষণেই বলল, ঘরে চলো, তাড়াতাড়ি ঘরে চলো। ইট জাসট কানট বি। কেনেথ ইজ ডেড। ও মরে গেছে। মরে যাওয়া মানুষ কেমন করে, কেমন করে...?

আমরা কটেজে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এয়ারকন্ডিশানড কটেজ। ফ্রিজ খুলে আমি

ওয়াইনের বোতল বের করলাম একটা। ফ্রেঞ্চ হোয়াইট ওয়াইন।

লারা সোফাতে বসে পড়ল বিকিনি পরেই। তারপর চোখ বন্ধ করে বালিশ টেনে নিল।

আমি ওয়াইন ঢালতে-ঢালতে বললাম, কী ব্যাপার বলো তো? কেনেথ কী তাহলে সেদিন মারা যায়নি বিচে? কেনেথের মতো দেখতে অন্য কোনও লোক কি মারা গেছিল তাহলে?

লারা বলল, ইটস ফুলিশ। হতেই পারে না। আমি জানি যে কেনেথ মারা গেছে। আমি নিশ্চয়ই জানি। এবং জানি বলেই আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এর মাথামুন্ডু।

আমি বললাম, লোকটাকে ডেকে আনব তোমার কাছে? কথা বলবে তুমি? কথা বলো তাহলে? যে লোক জুতো পায়ে হাঁটে, রুমাল ফেলে দিয়ে যায় সে তো ভূত নয়।

ভূত নয়, তাই-ই বা বলি কী করে? লারা স্বগতোক্তির মতো বলল।

তারপর বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে বলল, হতে পারে না জিত্, হতেই পারে না এ। আমি নিশ্চয়ই জানি যে কেনেথ মারা গেছে।

হাত বাড়িয়ে লারা ওয়াইনের গ্লাসটা নিল এবং এক চুমুকে শেষ করে ফেলল তা। আমাকে আবারও ঢেলে দিতে বলল। দেখতে-দেখতে ও একাই বলতে গেলে পুরো বোতল শেষ করে ফেলল। ফ্রিজ থেকে আরও একটা বোতল বের করলাম।

লারার ততক্ষণে পুরো নেশা হয়ে গেছিল। আমাকে লাইটটা নিভিয়ে দিতে বলল।

লাইটটা নিভিয়ে দিতেই চাঁদের আলোয় ঘর ভরে গেল। লারা শোওয়া অবস্থাতেই নিজেকে অনাবৃত করে ফেলল। তারপর জড়ানো গলায় আমাকে চেঁচিয়ে ডাকল। বলল, কাম, মেক লাভ টু মি। উই উইল ড্রাইভ এওয়ে কেনেথেস ঘোস্ট টুনাইট। হোল্ড মি টাইট। প্লিজ হোল্ড মি টাইট।

কেনেথ হচনার

সারা রাত জিনা ওয়াকার ও লারা ডস-এর সঙ্গে কেনেথ হচনারের ভূত তাড়ালাম আমি। রাতভর আনন্দময় ক্লান্তির পর আমি যখন প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে কাহালা হিলটনের হাইড-এওয়ে কটেজ থেকে বেরিয়ে হোটেলের পার্কিং লট-এ এসে একটা ট্যাক্সি নিলাম তখন ঘুম পাচ্ছিল।

গাড়ির পিছনের সিটে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছিল খুব। চোখের পাতা বুঝি বুঁজেই ফেলেছিলাম। এমন সময় ট্যাক্সিটা একটা মোড় ঘুরেই থেমে গেল।

রাস্তার ফুটপাথের এক বেঞ্চে একটা লোক সকালের খবরের কাগজে মুখ আড়াল করে আছে। ট্যাক্সিটা থামতেই, কেন থামল এ-কথা ড্রাইভারকে জিগ্যেস করার আগেই দেখি, কেনেথ হচনার খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সোজা হেঁটে এসে বাঁদিকের দরজা খুলে আমার পাশে বসে পড়ল।

বসেই বলল, গুড মর্নিং টু ইউ মিস্টার বোস।

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে জিগ্যেস না করে হচনারকেই জিগ্যেস করল. হোয়ার টু?

হচনার বলল, বস-এর বাড়ি।

আমার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না যে হচনার ড্যানারের লোক। সেই কালো ক্যাডিলাক লিমুজিনের ড্রাইভারও ঠিক এমনিভাবে লারার কাছে ড্যানারকে বস বলে উল্লেখ করত।

আমি দরজার একদিকে সরে যেতেই হচনার তার কোটের নীচে বাঁ-কাঁধের সঙ্গে ঝোলানো হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আমাকে দেখিয়ে বলল, ঝামেলা করবেন না। আপনাকে গরম-গরম ব্রেকফাস্ট রোলস, চিকেন, ওমলেট উইথ ব্যাকন এবং মধু দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়াব বস-

এর বাড়ি। পিস্তলের গুলির চেয়ে তা খেতে নিশ্চয়ই অনেক ভালো।

কেনেথ পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল। ব্রুট পারফ্যুমের গন্ধ পেলাম আমি।

ট্যাক্সিটা কিন্তু যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সেটা ম্যাক্স-এর বাড়ি।

দরজায় হচনার আমাকে নিয়ে এসে দাঁড়াল। কলিং বেল টিপতেই ড্রেসিং গাউন পরে ম্যাক্স নিজে এসে দরজা খুলল। আমাকে দেখে যেন খুশিই হয়েছে বলে মনে হল।

হচনার স্যালুট করে বলল, গুড মর্নিং স্যার। আমি ভদ্রলোককে গরম রোলস, চিকেন, ওমলেট, ব্যাকন এবং মধু খাওয়াব বলে নিয়ে এসেছি ব্রেকফাস্টে। আমি খাব। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

ম্যাক্স আমাদের বসবার ঘরে বসতে বলে জামাকাপড় ছেড়ে আসতে গেল।

বসবার ঘরে আরেকজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, খুব লম্বা কালো স্যুট পরে। আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক শুধু বললেন, হাই।

হচনার বলল, আপনি বসুন, আমি আসছি।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ম্যাক্স ও হচনার দুজনেই এল একসঙ্গে। ম্যাক্স লম্বা মতো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলল, মরিসন, ওহারা অফ ক্যানাডিয়ান পোলিস। এখন ইন্টারপোলে আছেন।

ডাইনিং রুমের টেবলে বাটলার কাঁটাচামচ সাজিয়ে ব্রেকফাস্ট রেডি করছিল। ফুটন্ত জলে টাটকা কফি ভেজানোর গন্ধ আসছিল হাওয়ায়।

আমি বললাম, সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। আমাকে কেন এখানে আনা হল জানালে ভালো হয়। কখন ছাড়া পাব আমি?

ম্যাক্স আমার হাঁটুতে হাত রেখে বলল, আজ ছাড়া পেতে দেরি আছে। কাল সকালে তোমাকে আমিই এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে আসব। তুমি আজকের মতো আমার অতিথি।

আমি বললাম, আমার জামাকাপড়। সব তো হোটেলে।

ম্যাক্স হাসল। বলল, সব আছে। তারপর হচনারকে বলল, তুমি মিঃ বোসকে ওঁর ঘরে নিয়ে যাও। চেঞ্জ করে আসুন উনি।

ওপরে গিয়ে যে-ঘরের দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে দিল কেনেথ, সে ঘরে ঢুকে দেখি আমার সব সম্পত্তি সেখানে। এমনকি টুথ ব্রাশ, দাড়ি কামানোর জিনিসপত্র সমস্ত বাথরুমে জায়গামত সাজানো আছে।

হঠাৎ আমার স্যুটকেশটার কথা মনে হল। তালাটা বন্ধই ছিল। তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে খুলে দেখি সবই ঠিক আছে, শুধু লারার দেওয়া প্যাকেটটাই নেই।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে নেমে আমি প্যাকেটটার কথা বললাম ম্যাক্সকে। বললাম, প্রথমত আমাকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে তা বলা হোক, দ্বিতীয়ত একটা প্যাকেট ছিল স্যুটকেশে। প্যাকেটটা স্যুটকেশে নেই কেন? কে চুরি করেছে?

ম্যাক্স বলল, ওটা নিশ্চয়ই তোমার প্যাকেট নয়। ওটার মালিকানা দাবি করলে ভীষণ বিপদে পড়বে তুমি। আমরা তোমার বন্ধু, শত্রু নই, আপাতত সে কথাটুকু জানলেই যথেষ্ট। এখন রিল্যাক্স করো। উত্তেজনা এখন আমাদের। তোমার নয়। তুমি পুরোপুরি নিরাপদ।

আর লারা? লারা যে ওখানে একা রইল?

ম্যাক্স কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বলল, ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও। সব কথাই বলা হবে তোমাকে। আমরা তোমার সাহায্য চাই। লারার জন্যে তোমার চিন্তা করার কারণ নেই। নিজের ভার সে নিজেই বইতে পারে।

ব্রেকফাস্ট টেবলে খেতে বসে ম্যাক্স হচনারকে বলল, বিল, কাহালা হিলটনে পামগাছের নীচে লোক পাঠিয়েছ—ওটা বালি থেকে তোলার জন্যে?

বুঝলাম যে, কেনেথ হচনারবেশি মানুষটার আসল নাম বিল।

বিল বলল, আমি তো এই-ই এলাম স্যার।

ম্যাক্স বলল, রাতারাতিই ওটা করা উচিত ছিল। এখন দিনের আলোতে তুলতে পারবে না। সব বন্দোবস্ত করে রেখো যাতে সন্ধে লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই তুলে আনতে পারো।

পুরো ব্যাপারটা, এদের কথাবার্তা, আমার কাছে এমন হেঁয়ালি-হেঁয়ালি মনে হচ্ছিল যে অমন রোলস মধু আর ব্যাকন এবং চিকেন ওমলেটটা ভালো করে খেতে পারলাম না।

বিল টেবল ছেড়ে পাশের ঘরে গিয়ে ফোনে কাকে কী যেন বলে এল।

বিল চলে যেতে ম্যাক্স বলল, এর নাম বিল সেমুর। মেক আপ ও মাইনর প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে ওকে কেনেথ হচনার সাজানো হয়েছিল।

ক্যানাডিয়ান পোলিস-এর মরিস ওহারা বললেন, আমি তাহলে কাল সকালের প্লেনেই প্রিজনারকে নিয়ে মনট্রিয়ালে চলে যেতে পারি।

কফির কাপে দুধ চিনি নাড়তে-নাড়তে ম্যাক্স বলল, আশা করছি। বলেই বাঁ-হাতের দু-তর্জনী আর মধ্যমা জোড়া করে বলল, কিপ ইওর ফিঙ্গারস ক্রসড।

ওহারা বলল, তোমাকে চোখের সামনে কাজ করতে দেখলাম এই সাতদিন। অনেক কিছু শিখলাম ম্যাক্স তোমার কাছ থেকে।

ম্যাক্স মনে-মনে খুশি হলেও হেসে বলল, ওহ্ স্টপ ইট। আমি যখন কানাডা যাব তখন তোমাকে দেখেও আমার অবাক লাগবে।

বিল-এর ও আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে ম্যাক্স বলল, বিল টেক আওয়ার ফ্রেন্ড টু ইওর বেডরুম অ্যান্ড ব্রিফ হিম। আমি পরে আসছি।

বিল আমাকে নিয়ে ওর বেডরুমে এল। একটা নরম গদিওয়ালা বড় চেয়ারে আমাকে বসাল। তারপর ড্রয়ার খুলে ডানহিল-এর আফটার ব্রেকফাস্ট টোব্যাকো বের করে দিল আমাকে।

বলল, আরাম করে পাইপটা ধরাও।

আমি পাইপ ধরাতে-ধরাতে ভাবছিলাম, এইবার ইন্টারোগেশান শুরু হবে। ভালো কথায় কাজ না হলে অত্যাচার করবে এরা। অত্যাচারের রকম এবং প্রক্রিয়া যে কত রকম হয় তা বইয়ে ও সিনেমাতে পড়া ও দেখা ছিল। কিন্তু মৃত কেনেথ হচনার সাজল কেন বিল আর হচনারের হত্যাকারীই বা কে এবং ওই হত্যার উদ্দেশ্যই বা কী এ সব কথা জানার আগ্রহ কম ছিল না। ওই চেয়ারে বসে ভালো ব্রেকফাস্টের পর পাইপ খেতে-খেতে তখন খুব যে একটা ভয় করছিল এমন বলব না।

কেনেথ একটা হাভানা সিগার ধরিয়ে বসল।

আমি দাঁতের ডাক্তারকে যেভাবে দাঁত তোলা শুরু করতে বলে লোকে, সেইভাবে বললাম, প্রশ্ন করতে শুরু করুন।

বিল হেসে ফেলল। বলল, আপনিই আমাকে করুন। বড় সাহেব আপনাব সব প্রশ্নের জবাব দিতে বলেছেন আমাকে।

আমাকে প্রশ্ন করতে বলেছেন? আমি অবাক হয়ে বললাম।

বিল বলল হ্যাঁ। তাই।

আমি বললাম, সেদিন হলিডে ইন-এর সামনে যে লোকটিকে গুলি করে মারা হয়েছিল সে লোকটি কে?

বিল হাসল। বলল, লোকটি আমিই। তবে আমাকে মারা হয়নি। একটা মার্ডার স্টেজ করা হয়েছিল শুধু। আমারই কলিগরা গুলি করেছিল। ব্ল্যাঙ্ক শট। সিনথেটিক রক্তের ব্যাগে। বুক-পকেটে সে ব্যাগ লুকোনো ছিল।

আমি বললাম, তাহলে কাগজের রিপোর্ট, পোস্ট-মর্টেম, করোনারের রিপোর্ট?

ওগুলো সব অ্যারেঞ্জড।

কেনেথের ডেডবডিটা ম্যাসাচুসেটস-এ পাঠানো?

কফিনটা সত্যিই গেছিল। ম্যাসাচুসেটস-এই। কিন্তু কফিনে আনারস ছিল এখানকার। ওখানকার এয়ারপোর্টে আমাদেরই একজন কেনেথের বাবা সেজে কফিনের ডেলিভারি নিয়েছিল।

বিল একটু থেমে বলল, আনারসগুলো অক্ষত অবস্থাতেই পৌঁছেচে। স্বাদও খুবই ভালো ছিল। বড় সাহেব খবর পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যে।

আমি বললাম, তাহলে লারার বন্ধু কেনেথ হচনার মারা যায়নি?

হ্যাঁ। মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, এ কি হেঁয়ালি করছেন।

বিল বলল, কেনেথ হচনার মারা গেছিল আজ থেকে আটদিন আগে। এবং মারা গেছিল টোরোন্টোতে তার অ্যাপার্টমেন্টে। তাকে পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ কোলট পিস্তল দিয়েই মারা হয়েছিল।

আমি বিল-এর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বললাম, তাহলে কেনেথ যে আমার সঙ্গে কথা বলল, হলিডে ইন-এ টেলিফোনে। কেনেথ যে এল একদিন, আমার ঘরে, কথা বলে গেল আমার সঙ্গে।

বিল বলল, প্রথম কেনেথ যে কানাডার টোরোন্টো থেকে তোমার সঙ্গে ও লারার সঙ্গে কথা বলেছিল ফোনে সে আসল কেনেথ নয়। আসল কেনেথ তার অনেক আগেই মারা যায়। আর যে কেনেথ হোটেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলে সে আমি, এই বিল সেমুর।

শুধোলাম, তা হলে টেলিফোনের কেনেথ কে?

বিল বলল, দ্যাটস ইমম্যাটেরিয়্যাল। আমাদের তাকে দরকার নেই, যদিও পরে সে ধরা পড়বে হয়ত। সে খুনির কোলাবরেটর। আমাদের এবং তোমাকে কনফিউজ করবার জন্যে লারা তাকে দিয়ে ফোন করিয়েছিল। আসল কথাটা হচ্ছে কেনেথের প্রকৃত হত্যাকারি টেলিফোন কলের বন্দোবস্ত করে পুরো ব্যাপারটা গোলমেলে করে দিয়ে আমাদের ধোঁকা দিতে চেয়েছিল।

আমি বললাম, ড্যানারকে কী ধরা হয়েছে?

বিল অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, বড়সাহেব বলতে পারবেন. কিন্তু ওকে শ্যাডো করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে ধরা যাবে।

বিল তারপর বলল, লারা সম্বন্ধে তোমার মতামত কী?

চমৎকার মেয়ে। আমি বললাম।

বিল হাসল। অসভ্যের মতো বলল, নো-ডাউট শি মাস্ট বি ভেরি গুড ইন বেড। আমিই আসল কেনেথ হচনার মানে ওর বয় ফ্রেন্ড হলে ভালো হত। যাই-ই হোক, আই হোপ ইউ উইল এগ্রি উইথ হোয়াট আই সে।

আমি বিজ্ঞের মতো বললাম, ও বিষয়ে কোনও দ্বিতীয় মতের প্রশ্নই ওঠে না। এমনভাবে বললাম যেন আমি এ সব ব্যাপারে একজন অথরিটি।

এবার আমি বললাম, লারা সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা, মানে তোমাদের?

বিল একটু চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, চমৎকার মেয়ে। তবে আরও ভালো হতে পারত। ওর সঙ্গী-সাথী ভালো ছিল না।

কেনেথ তো ভালো ছিল।

না। বিল বলল। ওর চাকরিটা একটা ছুতো ছিল। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলারের দলের লোক

ছিল ও। সাংঘাতিক সব মানুষজনের সঙ্গে ওর ওঠা-বসা ছিল।

আমি বললাম, তাই-ই বল, এতক্ষণে ওর মৃত্যু কাদের হাতে হয়েছে বুঝতে পারছি।

তারপর বললাম, ড্যানার তাহলে মারেনি ওকে? কারণ লারা তো তোমাদের সাজানো-খুনের কেনেথকে ড্যানার মেরেছে বলে ভাবছিল। যদি এখানে কোনও সত্যিকারের খুনই না হয়ে থাকে তাহলে ড্যানারকে সন্দেহর প্রশ্নই আসে না।

বিল বলল, ড্যানার সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?

সাংঘাতিক লোক। ওর চোখই বলে সে-কথা।

আমি কিন্তু ড্যানারের ভক্ত। ড্যানার নাম করা মাউন্টেনিয়ার ছিল যৌবনে। বহুবার তোমাদের দেশে গেছে, তারপর নেপাল থেকে হিমালয়ের বিভিন্ন চুড়োয় উঠেছে। চমৎকার স্পোর্টসম্যান ড্যানার।

আমি বললাম, কিন্তু ও তো ব্রথেল-কিপার।

তাতে কী? বিল বলল। ব্যাবসা ব্যাবসাই। মদের ব্যবসায়ীদের যেমন প্রায়ই মদ খেতে দেখা যায় না, মেয়ে-খাটিয়ে যারা খায় তাদের নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়ে সম্বন্ধে অস্বাভাবিকভাবে কম আসক্তি দেখা যায়।

তারপর বিল একটু থেমে বলল, টাকার আসক্তিই মানুষের সব চেয়ে বড় ক্রাইম। এই আসক্তির কোনও শেষ নেই। ওর জন্যে করতে পারে না মানুষে এমন কোনও কাজ নেই।

বিল সিগারটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল।

আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

হঠাৎ আমার মনে হল এতক্ষণে আসল প্রশ্নটাই করা হয়নি বিলকে। এত সব ব্যাপার খুন-খারাপির মধ্যে আমার ভূমিকা কোথায়? আমাকে কেন ধরে আনা হল, জড়ানো হল কেন আমায়?

বিলকে কথাটা বলতেই, বিল বলল, তুমি কেনেথের হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার কেসে যদি আমাদের সাক্ষী হও, মানে উইটনেস ফর দ্যা প্রসিকিউশান, তা হলে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তুমি সাক্ষী না দিলে আমরা জোর করতে পারি না, যদিও সমন করে কোর্ট তোমাকে ডাকতে পারে। কিন্তু তুমি প্রথম থেকে আমাদের সাহায্য করলে খুব উপকার হয় আমাদের। হত্যাকারী যাতে সাজা পায়, তা দেখা সৎ নাগরিকের কর্তব্য।

আমি বললাম, কিছুই বুঝছি না তোমার কথা। হত্যাকারীটি কে?

বিল বলল, তা আমরা জানি না এখনও। তবে জানার চেষ্টা হচ্ছে।

ঠিক এই সময় ম্যাক্স ঘরে এসে ঢুকল।

বিল উঠে দাঁড়াল।

ম্যাক্স বিলকে বলল, বিল লকার খুলে প্যাকেটটা নিয়ে এসো। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভিসনের রিপোর্ট এসেছে। টোরোন্টোর রিপোর্টের সঙ্গে মেলানো হয়ে গেছে। আইডেনটিকাল। সেই মেয়েটিকে নিয়ে একটু পরে ড্যানার আসছে। মেয়েটি বলেছে, হত্যাকারীকে দেখলে সে চিনতে পারবে। ফোটো দেখেও আইডেনটিফাই করেছে। এখন তুমি প্যাকেটটা নিয়ে এসো।

বিল চলে যেতেই, ম্যাক্স বলল, তুমি তো শুনলে সব, এবার তোমার কী মনে হয় বলো তো?

আমি বললাম, আমার কী মনে হবে? মার্ডার যখন এখানেই হয়নি, হয়েছে টোরোন্টোতে তাও আটদিন আগে, এখানকার কাকে সন্দেহ করব? ড্যানারের ওপর সন্দেহ হয়েছিল, লারারও তাই-ই সন্দেহ। এখন তো দেখছি এখানের মার্ডারটাই সাজানো।

ম্যাক্স বলল, হ্যাঁ সাজানো। এটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে সত্যিকারের মার্ডারারকে পাজল করে দেওয়ার জন্যে। অনেক সময় এই রকম ঘটনা ঘটানোর পর খুনির ব্যবহারের তারতম্য দেখে

তাকে শনাক্ত করা সোজা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের বশে তো আর কাউকে গ্রেফতার করা যায় না—হাতে প্রমাণ আজকেই সব এসে যাবে। আজ রাতেই অ্যারেস্ট করব মার্ডারারকে। কিন্তু অ্যারেস্ট করার পর তোমার সাহায্য দরকার হবে আমাদের। তুমি আমাদের অত্যন্ত ইমপর্টান্ট সাক্ষী।

আমি বললাম, আজকে সন্ধেয় অ্যারেস্ট করবেন মানে? মার্ডারার তো টোরোন্টোতে মার্ডার করেছে—তাকে এখানে পাবেন কী করে?

ম্যাক্স বলল, সে এখানে এসেছে। তা নইলে কানাডিয়ান পোলিসের ওহারা কী এখানে এসে বসে থাকে। অ্যারেস্ট করার পর ওহারার হাতে তাকে দিয়ে আমার ছুটি। নিউইয়র্ক থেকে টোরোন্টো আর কতটুকু পথ। তোমাকে যাওয়া-আসার খরচ, ভালো হোটেলে থাকার খরচ, সিকিউরিটি সবই দেওয়া হবে। ভীরু লোকেরা রাজসাক্ষী হতে পারে না—কারণ সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে মনের জোর লাগে। তোমার কোনও বিপদ না হয় তার সব দায়িত্ব আমাদের। সাক্ষ্য দেওয়ার পরও অনেক দিন পর্যন্ত তোমাকে আমরা পাহারা দেব সব সময়। যদি দরকার হয়।

আমি আবারও শুধোলাম, খুনি কে তা জানেন?

ম্যাক্স বলল, জানি।

আমি বললাম, বলুন।

ম্যাক্স বলল, তুমি নিজেই জানতে পাবে। নিজের মাথা খাটাও। খুনিদের কোনও পৃথক জাত নেই—অত্যন্ত স্বল্প ক্ষেত্র ছাড়া—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভালো মন্দ আছে। কখনও আমরা মহৎ, কখনও নীচ। আমাদের মধ্যেই খারাপত্বটা যখন মাথাচাড়া দেয় তখন আমরা অনেকেই এমন-এমন কাজ করে ফেলি যে পরে সুস্থ অবস্থায় তা ভেবে দেখলে আশ্চর্য লাগে। কোনও মানুষ যখন একটা বড় রকমের অন্যায় করে ফেলে, তখন সেটা ঢাকতে তাকে অন্যায়ের পর অন্যায় করে যেতে হয়—মিথ্যাচারের পর মিথ্যাচার। তখন কারো-কারো মাথায় নানা রকম শয়তানী বুদ্ধি খেলে—এমন-এমন বুদ্ধি যা বড়-বড় মনীষীদের মাথা দিয়েও বেরোত না। এই রকম বুদ্ধি ভালো কাজে লাগালে, যারা খারাপ কাজ করে ফেলে সমাজের হাতে শাস্তি পায় তারা কত না বড় হতে পারত।

একটু থেমে ম্যাক্স বলল, সত্যি কথা বলতে কি, আমার যা কাজ তা করতে-করতে কত রকম মানুষই দেখি, মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটা, পাপের দিকটা। তবু মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে এখনও যেন পারি না। যে সব চেয়ে খারাপ মানুষ তার মধ্যেও যে কত কী ভালো দিক থাকে তা আমার মতো করে খারাপ মানুষদের নিয়ে না থাকলে বোধহয় জানতেই পেতাম না।

বিল, লারা আমাকে যে প্যাকেটটা দিয়েছিল রাখতে সেই প্যাকেটটা নিয়ে এল হাতে করে। সঙ্গে ওহারাও এল। ওরা তিনজনে প্যাকেটটা খুলল। প্যাকেটটার মধ্যে থেকে বাচ্চাদের খেলার গুলির মতো বড় দশটা হীরে বেরোল।

বিল ফোন করল নীচে। ভ্যালুয়ার এখনও আসেনি। রাতের আগে নাকি আসতে পারবে না।

হীরেগুলো ম্যাক্স ও ওহারা নেড়েচেড়ে বলল, এদের দাম সব মিলিয়ে প্রায় বারো-তেরো মিলিয়ন পাউন্ড হবে।

তারপর বলল, আমরা তো জহুরী নই। জহুরী এলে হয়ত জানা যাবে যে দাম আরও বেশি।

দেখা হয়ে গেলে, বিল সঙ্গে-সঙ্গে প্যাকেটটা নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড লকারে তুলে রাখল।

আমার গলায় থুথু আটকে গেছিল। ম্যাক্স বলল, ইয়েস, দিস ইজ লাইফ।

তারপর বলল, তুমি কাল যখন এই হীরেগুলো সমেত ধরা পড়তে তখন তোমার কত বছর, জেল হত জানো তো? ধরা পড়লে একেবারে হাতেনাতেই পড়তে। তোমার লাগেজ চেক করার ইনসট্রাকশান দেওয়া আছে এয়ারপোর্টে, এবং সমস্ত কাস্টমস অফিসেও—গত সাতদিন হল—যেদিন

থেকে তুমি লারার সঙ্গে মাখামাখি আরম্ভ করেছিলে।

আমার গলায় থুথু তখন দলা পাকিয়ে গেছিল।

আমি বললাম, লারা তাহলে জেনেশুনেই আমাকে জেলে পাঠাচ্ছিল?

ম্যাক্স বলল, জেনেশুনে নয়। তাহলে ও তোমাকে দিয়ে পাচার করার চেষ্টা করত না।

আমি বললাম, কেন? ও যে ওর সলিসিটরের কথা বলল, বলল, আমি নিউইয়র্কে ফেরার আধঘণ্টার মধ্যে ওর সলিসিটরের লোক এসে প্যাকেটটা নিয়ে যাবে।

ম্যাক্স বলল, সলিসিটর? মাই ফুট।

আমি নাম ও ফিফথ অ্যাভিন্যুর কথা বললাম।

ম্যাক্স ফোন তুলে টেলেক্স অপারেটরকে বলল, এক্ষুনি নিউইয়র্ক থেকে জেনে নিতে ওই নামে কোনও সলিসিটর ফার্ম আছে কি নেই। থাকলে নিউইয়র্ক এফ-বি-আই-কে বলে দিতে বলল তাদের ইমিডিয়েটলি শ্যাডো করতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিল নিজেই টেলেক্স মেসেজের স্ট্রিপটা নিয়ে ম্যাক্সকে দিল।

ম্যাক্স স্ট্রিপটা দেখে নিয়ে আমাকে এগিয়ে দিল। 'নো সাচ ফার্ম একজিসটস।' ওই নামে কোনও ফার্ম নেই নিউইয়র্কে।

ম্যাক্স বলল, কী বুঝলে? খুব সম্ভব যে ওই হীরের প্যাকেট নিতে আসত সে তোমাকে খুন করেও যেত কারণ পরে কখনও তোমার মাধ্যমে ওই প্যাকেটের কথা ফাঁস হলে লারা এবং তার দলের ভারী বিপদ ছিল।

ততক্ষণে যা বোঝার বুঝেছিলাম আমি। সমস্ত পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী মেয়েদের সম্বন্ধে, নারীশরীরের মাদকতা, সুগন্ধ, স্বাদ সম্বন্ধে আমি বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলাম। লারার মুখটা মনেও আনতে পারছিলাম না। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, কেনেথকে মারল কেন লারা? ও তো ওকে ভালোবাসত।

ম্যাক্স হাসল।

আমি ভাবছিলাম, মৃতদেহের ওপরে বসে, ফাঁসিতে লটকানো আসামির জিভ বের করা চেহারা দেখতে-দেখতে এদের হাসতে আটকায় না একটুও।

ম্যাক্স বলল, কেনেথকে ভালো নিশ্চয়ই বাসত। কিন্তু বারো মিলিয়ন ডলারের ভালোবাসার কাছে কেনেথের ভালোবাসার দাম কতটুকু ছিল? টাকা থাকলে সব সুখ থাকে। কেনেথকে ভালোবাসা সত্ত্বেও ওই হীরেগুলোর লোভে ও কেনেথের আদর খেতে-খেতেই ওর হ্যান্ড ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে ওকে গুলি করে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায় কেনেথ। গুলি করার সঙ্গে-সঙ্গে ও জামাকাপড় পরে কেনেথের আলমারি থেকে প্যাকেটটা নিয়ে টোরোন্টোর সিম্পসনস-এর দোকানের একটা পলিথিনের ব্যাগে প্যাকেটটা ভরে নিয়ে লিফট দিয়ে নেমে যায়। ফেরার সময়, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, জ্যুইশ মার্কেটের একটা দোকানে বসে ডিনার খায় লারা, বিয়ার খায় দুটো। কেনেথকে কোল্ড ব্লাডে খুন করার পনেরো মিনিট পর। তখনও নিশ্চয়ই কেনেথের আদরে তার শরীরের কেন্দ্রবিন্দু ভেজা ছিল। বোঝো কী সাংঘাতিক মেয়ে।

একটু থেমে ম্যাক্স বলল, টাকার জন্যে মেয়েরা সব করতে পারে। মেয়েরা কিন্তু ছেলেদের থেকে সাধারণত বেশি লোভী হয়।

আমি বললাম, তুমি এত সব জানলে কী করে?

ম্যাক্স বলল, পিস বাই পিস এভিডেন্স জোগাড় হয়েছে। ওহারা দু-দিনের মধ্যে টোরোন্টো থেকে এখানে চলে আসে সমস্ত প্রাইমারি ড্যাটা নিয়ে। লারা অত্যন্ত সুন্দরী। সকলেরই চোখে পড়ে। ড্যানারের ব্রথেলের একটি মেয়েকে কেনেথ সে রাতে ডেকেছিল তার অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটাবার জন্যে। সে মেয়েটিও সুন্দরী। লারার সেদিন কেনেথের কাছে যাওয়ার কথাই ছিল না। লারা জানত

যে কেনেথ স্মাগলিং করে। সেই দুপুরেই লারা হনলুলুতে ছুটি কাটাতে আসবে বলে লাঞ্চের পর অফিস ছুটি করে কেনেথের অ্যাপার্টমেন্টে যায় এবং দুজনে-দুজনকে আদর করে। সেই সময় কেনেথ দর্বল মুহূর্তে লারাকে ওই হীরের কথা বলে। বলে যে এটা জায়গামত পাচার করতে পারলে পঞ্চাশ হাজার ডলার রোজগার হবে কেনেথের। তখন ওরা দুজনে লম্বা ছুটিতে যাবে—সারা পৃথিবী ঘুরবে রাজা-মহারাজার মতো। লারার সামনেই আলমারি খুলে হীরেগুলো বের করে দেখায়। হীরেগুলো তখন একটা ভেলভেটের বাক্সে ছিল।

সারা বিকেল হীরেগুলো লারার মাথায় ঝড় তোলে। ও ওর নিজের ফ্ল্যাটে যাবে বলে টিউব স্টেশানে গিয়েও ফিরে আসে। কেনেথ তখন ঘুমোচ্ছিল। কেনেথকে ও বলে যে আমি চলে যাব কাল, কতদিন তোমাকে দেখতে পাব না—আরেকবার তোমার আদর খেতে এলাম। কেনেথ আলমারি থেকে কনিয়াকের বোতল বের করে, দুজনে মিলে খায়। কেনেথই বেশি খায়—প্রায় ড্রাঙ্ক হয়ে যায়। তখন লারা বলে, বালিশের তলায় তোমার পিস্তলটা যে সবসময় গুলিভরা অবস্থায় রেখে দাও, আমার শুতে ভয় করে বড়। তখন কেনেথ পিস্তলটা বের করে সাইড টেবলে রাখে।

লারা মিষ্টি করে জিগ্যেস করে চেম্বারে গুলি ভরে রাখো? না, গুলি শুধু ম্যাগাজিনেই আছে?

কেনেথ হাসে। বলে, চেম্বারে না-রাখলে হঠাৎ প্রয়োজনে কাজেই তো লাগবে না।

লারা বলে, আমি তোমার ওপরে শুচ্ছি, তোমাকে ভীষণ আদর করব আমি।

তার কিছুক্ষণ পরই যা করার করে। কেনেথ সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়।

আমার বাকরোধ হয়ে গেছিল। কোন কালনাগিনীর সঙ্গে কোন সর্বনাশের খেলায় মেতেছিলাম আমি!

একটু পর আমি শুধোলাম, তুমি যে মেয়েটির কথা বলছিলে, ড্যানারের ব্রথেলের মেয়ে—সে কী করল?

সে যখন লিফটে এসে কেনেথের পঁয়তাল্লিশ তলার ফ্ল্যাটে যাবে বলে পঁয়তাল্লিশ তলায় পৌঁছে করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তখন দেখে কেনেথের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে লারা হাতে সিম্পসনস-এর শপিং ব্যাগ আর হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

লারাকে মেয়েটি দেখেছিল এক রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে গিয়ে দূর থেকে কেনেথের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে। পরে কেনেথকে জিগ্যেস করে লারার পরিচয় জেনেছিল। তারপর মেয়েটি দরজা খুলেই ড্রইংরুম পেরিয়ে বেডরুমের দরজা খুলেই ওই দৃশ্য দেখে সঙ্গে-সঙ্গে পালিয়ে আসে। খারাপ মেয়েদের ওপরে সন্দেহ সহজে হয় তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই ও এসে সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দরজায় লারার হাতের প্রিন্টের সঙ্গে ওর হাতের প্রিন্টও পায় এবং বোঝে যে ও সত্যি কথা বলছে। ওই মেয়েটি লারার নাম জানত না, কোথায় থাকে লারা তাও জানত না। শুধু চেহারাটা চিনত। লারাও নিশ্চয়ই দেখতে চেয়েছিল মেয়েটি কোথায় যায় কিন্তু তখন সময় নষ্ট করতে পারেনি। লারা কেনেথের পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ও যদি মেয়েটির পিছন-পিছন গিয়ে কেনেথের ড্রইংরুমে ওকে গুলি করে মেরে ফেলত তাহলে একজনও সাক্ষী থাকত না। কিন্তু মাথা অত সঠিকভাবে কাজ করলে কোনও খুনিই কখনও ধরা পড়ত না।

আমি বললাম, ম্যাক্স, আমি একটু ঘুমুতে পারি? আমার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

ম্যাক্স বলল, এমনি ঘুম হবে না তোমার। বলেই ফোন তুলল। দু-মিনিটের মধ্যেই একজন ডাক্তার এসে আমাকে সবরকম পরীক্ষা করে সিডেটিভ ইনজেক্ট করে দিলেন।

ম্যাক্স বলল, ডাক্তার ছ'টার মধ্যেই কিন্তু ওঁকে আমার সঙ্গে বেরোতে হবে। ওভারডোজ যেন না হয়।

ডাক্তার বললেন, ঠিক আছে। তিনটে সাড়ে তিনটে অবধি ঘুমিয়ে উঠে দেরি করে লাঞ্চ খান—একদম ফিট হয়ে যাবে শরীর।

জিনা ওয়াকার

তিনটে নাগাদ আমার ঘুম ভাঙতেই বাইরে বেরিয়ে দেখি অনেক লোক সেখানে। ম্যাক্স গিলিগান খুব উত্তেজিত। বিল একটু আগে ফিরে এসে একটা খারাপ খবর দিয়েছে।

ম্যাক্স আমাকে জিগ্যেস করল, কাল রাতে তুমি আর লারা যখন বিচে পাম গাছতলায় বসেছিলে তখন বালির গর্ত সে খোঁড়ার পর সেই গর্তে লারাকে কিছু লুকিয়ে রাখতে দেখেছিলে?

আমি অবাক হলাম। আমার মনে যে কথাটা এসেছিল মুহূর্তের জন্যে তা ম্যাক্স কী করে জানল ভেবে পেলাম না।

আমি বললাম, বিলের সঙ্গে কথা বলার পর আমি পিছন ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়েছিল আমার, লারা কী যেন একটা গর্তের মধ্যে ফেলল। লারাকে সে-কথা বলেও ছিলাম, ও অস্বীকার করল, বলল আমি দূর থেকে ভুল দেখেছি।

ম্যাক্স বলল, কেনেথের পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ কোল্ট-পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছিল ও-যা দিয়ে কেনেথকে মেরেছিল লারা। বালি খুঁড়ে দেখা গেছে সে পিস্তল নেই। কাল রাতের পর আজ সকালে নতুন করে বালি খুঁড়ে সেটাকে বের করে নিয়ে গেছে কেউ।

কে নিতে পারে? আমি উদ্বেগের সঙ্গে বললাম।

লারাও নিতে পারে। কিন্তু লারা নিলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু কেনেথের দলের লোকেরা যদি লারার খবর পেয়ে থাকে তাহলে বিপদ। কারণ লারা ধরা পড়লে কেনেথের খুনের কিনারা যে শুধু হবে তাই-ই নয়, কেনেথের কাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাও জানা যাবে ওকে জেরা করে। তাই ওদের পক্ষে ওই পিস্তলটি লুকিয়ে ফেলা খুব জরুরি। ওহারা ইতিমধ্যেই কানাডা থেকে খবর পেয়েছে যে, কেনেথের দলের দুজন কন-ম্যান হনলুলুতে এসে পৌঁছেছে। লারা যে হীরেগুলো তোমাকে দিয়ে দিয়েছে একথা তারা জানে না। তারা মোটেই লারার বন্ধু নয়। তারা জানে যে হীরেগুলো লারার কাছেই আছে। লারা হঠাৎ লোভের বশে কেনেথকে হয়তো মেরে বসেছিল কিন্তু ও এই স্মাগলারদের আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তারা করতে পারে না এমন কাজ নেই। ওদের কাছে লারা একেবারেই দুধের শিশু।

ম্যাক্সের কথা শেষ হতে-না-হতে কাহালা হিলটনের পাশে দাঁড়ানো এফ-বি-আই-এর লোক ওয়ারলেসে মেসেজ পাঠাল যে লারার পাশের হাইড-এওয়ে কটেজ থেকে একজন সন্দেহজনক লোক এবং একজন সুন্দরী মেয়েকে চেক-ইন করে ঢুকতে দেখা গেছে। লোকটির চেহারার সঙ্গে কানাডিয়ান পুলিশের কন-ম্যানদের চেহারা সম্বন্ধে যা ইনফরমেশান ছিল, তার সঙ্গে মিলে গেছে।

ম্যাক্স অর্ডার দিল তাদের ওপর কড়া নজর রাখো। ইতিমধ্যে লারা ঘর থেকে বেরোলেই নজর রেখো তার ওপরও।

জবাব এল, লারার হাইড-এওয়ে কটেজের ঘরের দরজা দেখা যাচ্ছে না। ওদের হাইড-আউট থেকে।

ম্যাক্স অর্ডার দিল, ঘরের সামনেই তাহলে প্লেইন-ড্রেসে আর্মড লোক রাখো। লারার ঘরে যেন কেউ ঢুকতে না পারে। লারাও যেন বেরোতে না পারে। আমরা ঠিক সাতটায় যাব।

তারপর ম্যাক্স একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, ড্যানার এখনও আসছে না কেন মেয়েটিকে নিয়ে কে জানে?

আমি বললাম, সন্দেহ বা কল্পনায় ভর করে তো আর তোমরা লারাকে ধরতে পারবে না। ধরতে পারলেও কেস টেঁকাতে পারবে না। তোমাদের হাতে কী প্রমাণ আছে?

তারপর একটু থেমে বললাম, তোমরা ভুল করছ না তো ম্যাক্স?

বিরক্ত গলায় ম্যাক্স বলল, আছে-আছে। অনেক প্রমাণ আছে। পরে কখনও তোমাকে বলব।

তাছাড়া তোমার কাছ থেকে যে হীরেগুলো বেরোলো সেগুলোও কী যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

তখনও সূর্য ডোবেনি, বেলা ছিল। ম্যাক্সকে খুব উত্তেজিত ও বিচলিত দেখাচ্ছিল।

ম্যাক্স বলল, কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক?

আমি হ্যাঁ না কিছুই বললাম না।

ম্যাক্স ড্রইংরুমে এসে সেলারের সামনে দাঁড়িয়ে হুইস্কির বোতল খুলে র' হুইস্কি ঢালল দুটো। তারপর বাটলারকে বলল, আমাকে কিছু খাবার দিতে।

বাটলার বলল, কী দেব?

আমি লাঞ্চ খাইনি আজ। খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। বললাম, যা খুশি। সসেজ বা হ্যাম স্যান্ডউইচ বা হট-ডগ যা হয়।

ম্যাক্স ড্রিঙ্কটা হাতে করে আমাকে পাশের ঘরে ওর স্টাডিতে নিয়ে গেল। গিয়ে একটা বই টেনে নিয়ে আমার হাতে দিল। ম্যাক্স বইটার একটা চ্যাপটার খুলে আমাকে দেখাল। দেখলাম চ্যাপটারটার নাম আইডেনটিফিকেশান অফ ইন্ডিভিজুয়ালস। ড্যাকটিলো-সকোপির প্রথম রুল হচ্ছে কোনও মানুষের আঙুলের ছাপই অন্য মানুষের আঙুলের ছাপের মতো নয়। আমাদের আঙুলের ছাপ নানারকম হয়। প্লেইন আর্চ, টেন্টেড আর্চ, একসেপশানাল আর্চ, প্লেইন লুপ, হোর্ল সেন্ট্রাল পকেট লুপ, টুইন লুপ, ল্যাটারাল পকেট লুপ এবং অ্যাকসিডেন্টাল। তাই আঙুলের ছাপ দেখে সহজেই বোঝা যায়।

তারপর বইটা জায়গায় তুলে রেখে, হুইস্কির গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে বলল, কেনেথের টোরোন্টোর ঘরের দরজায় যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে লারার, সাইড বোর্ডের ওপরে, এখানে হোটেলের কাউন্টারের ওপরে, বাথরুমের দরজায়, বাইরের দরজায়, সব হুবহু মিলে গেছে। আঙুলের ছাপের ডেলটা এবং লুপস দেখে অনেক কিছুই বোঝা যায়। বোঝা যায়, রিজ ট্রেসিং করেও। তাছাড়া ড্যানারের মেয়েটি আইডেনটিফাই করবে লারাকে। এফ-বি-আই-এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভিশানে যে কত লোক কাজ করে তা দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

তারপরই বলল, আচ্ছা, কেনেথ কাল ওখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার পর লারার মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখলে?

আমি বললাম, শুধু কাল কেন? ও যখন হোটেলে এসেছিল, লারা কেবলি বলেছিল, ইট কান্ট বি। ইটস ইমপসিবল। কালকে কেনেথের রুমালটা আমি যখন তুলে নিলাম, যখন জুতোর ছাপ দেখালাম, সত্যি মানুষের, তখনও ও চমকে উঠল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ও আমাকে শুধোলো, রুমালে কোনও পারফিউমের গন্ধ আছে?

আমি বললাম, ব্রুট।

ও চমকে উঠল। বলল, ব্রুট।

তারপরই একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে, ভীষণ ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি তখন ভেবেছিলাম ও ভূতের ভয় পেয়েছে বুঝি।

ম্যাক্স হাসল। বলল, ভূতের ভয়ই বটে। পেত্নিরা ভূতকে ভয় পায় না। তারপর বলল, কেনেথ সবসময় ব্রুটের টয়লেটরিজ ব্যবহার করত, তাই বিলকে বলেছিলাম ব্রুটের পারফ্যুম লাগিয়ে যেতে।

তারপর বলল, এখন বুঝতে পারছ কেনেথকে দেখে এবং কেনেথ দ্বিতীয়বার মার্ডার হওয়ার খবরে ও কেন হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিল। ওর মতো করে আর কেউই জানত না যে ও নিজে হাতে কেনেথকে গুলি করে মেরেছে। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পয়েন্ট ফোর নট ফাইভ দিয়ে গুলি করলে সিংহও মরে যায়, তায় মানুষ। এবং যে-মুহূর্তে ও বুঝতে পারছে এই দ্বিতীয় কেনেথ মিথ্যা সেই মুহূর্তেই ও অনবধানে বলে ফেলেছে তোমার কাছে নিশ্চয়ই যে, এ হতেই পারে না,

ইট কান্ট বি, অসম্ভব। এই কথাই ওর দোষ প্রমাণ করবে। তোমার কাছ থেকে এইটুকু সাহায্য আমার দরকার।

আমি বললাম, আমি সবই বুঝছি, কিন্তু ও যদিও আমার কেউই ছিল না কিন্তু এই ক'দিনে আমাকে যে ও অনেক কিছু দিয়েছে—এত কিছু যা জীবনে আর কারও কাছেই পাইনি। কী করে আমি ওকে জেনে শুনে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাই। আমার যে কী খারাপ লাগছে ম্যাক্স, কী বলব! আমি এখনও ভাবতে পারছি না।

ম্যাক্স বলল, এইটুকু সাহায্য না করলে তো আমার তোমাকেই জেলে পাঠাতে হয়। এত টাকার স্মাগলড হীরে কিন্তু আমরা পেয়েছি তোমারই কাছ থেকে। লারাকে বাঁচাতে হলে তোমাকে মারতে হয়। লারা যে তোমার কত বড় বন্ধু তা তোমার হাত দিয়ে হীরে পাচার করার চেষ্টাতেই বুঝতে পারছ!

আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। তখনও অবাক হয়েই ছিলাম। কেবলই বলছিলাম, অমিনি ফুলের মতো ফুলওয়ালি কি করে এমন কাজ করল। নাঃ ম্যাক্স! কোথাও কোনও ভুল করছ তোমরা। লারার খুব বিপদ। তোমরা লারাকে কোনওক্রমে বাঁচাও।

ম্যাক্স হাসছিল।

বলল, বাঁচাবার মালিক ভগবান। আমি তুমি মারবারই বা কে? বাঁচাবারই বা কে?

বাটলার হ্যামবার্গার এনে দিল সঙ্গে মাস্টার্ড আর সেলারি পাতা দিয়ে। খেয়ে নিলাম। তারপর স্টিফ ড্রিঙ্কটা এক ঢোকে গিলে ফেললাম। ম্যাক্স আগেই গিলে ফেলেছিল।

ম্যাক্স ঘড়ি দেখল। তারপর আমাকে বলল, তুমি তৈরি হয়ে নাও। দ্য হাউস ইজ ইয়োর্স। হেলপ ইওরসেলফ উইথ এ্যানাদার ড্রিঙ্ক—।

বলেই নীচে নেমে গেল।

সাড়ে ছ'টা নাগাদ ম্যাক্স আমাকে নিয়ে ওর সাদা জাগুয়ারে উঠল। আগে পিছনে দেখলাম, দুটি কালো গাড়ি। বুঝলাম প্লেইন ড্রেসে এফ-বি-আই-এর আর্মড লোক আছে।

ম্যাক্স-এর কাঁধে একটা ব্যাগ। তার মধ্যে ওয়াকি-টকি আছে। শর্ট ডিসট্যান্স ওয়ারলেস। সামনের পিছনের গাড়ির সঙ্গে কথা বলল ম্যাক্স।

দেখতে-দেখতে আমরা কাহালা হিলটনের বিরাট পার্কিং লটে এসে পৌঁছলাম। চতুর্দিকে বড়-বড় ট্রপিক্যাল গাছ। ওয়াইকিকি বিচ থেকে হুশ-হুশ করে হাওয়া আসছে। চমৎকার সন্ধেটা। আমার লারার জন্যে, এবং আমার জন্যেও বড় খারাপ লাগতে লাগল। চাঁদ উঠেছে আকাশ ভরে। চাঁদের আলো চকচক করছে প্রশান্ত মহাসাগরের জলের ওপরে। গত দু-তিনটি দিন লারার সঙ্গ যেমন আমার এই জীবনের এক মধুরতম স্বপ্নের মতো মনে হয়েছে আমার কাছে, চারধারের ঘটনাবলী তেমনই দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়েছে, হচ্ছে। এমন এক আনন্দ ও দুঃখের স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র অনুভূতি জীবনে কখনও হয়নি আগে। আমি যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

রিসেপশান লবিতে ঢুকতেই একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে একজন লোক উঠে দাঁড়াল ম্যাক্সকে দেখে। লোকটি দেখতে কদাকার। তার মুখটা শিয়ালে চিবিয়ে খাওয়া কইমাছের মাথার মতো কুদৃশ্য। সে ম্যাক্সকে ফিসফিস করে বলল, ড্যানার আসতে পারেনি, আমি এসেছি তার বদলে।

ম্যাক্স যখন তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তক্ষুনি লোকটি বলল, নিহাউ!

ম্যাক্স আশ্বস্ত গলায় বলল, নিহাউ।

বুঝলাম, কোড ওয়ার্ড একটা।

ম্যাক্স শুধোল, ড্যানার কোথায়?

জানি না। বোধহয় বাড়িতেই আছে। শরীর ভালো না। অপারেশন ওয়াকার ওভার হয়ে গেলে আপনাকে কথা বলতে বলেছে ওর সঙ্গে।

ম্যাক্স বলল, ও-কে।

আমি আর ম্যাক্স রিশেপসান ডেস্কে গিয়ে পৌঁছলাম। ম্যাক্স যেমন গাড়িতে আসতে-আসতে আমাকে শিখিয়ে রেখেছিল, আমি তেমনই রিশেপসানের একটি মেয়েকে বললাম, আমি মিস জিনা ওয়াকার-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

মেয়েটি শুধোল রুম নাম্বার জানেন?

আমি বললাম, হাইড-এওয়ে কটেজ।

মেয়েটি হেসে বলল, হাইড-এওয়ে কটেজ তো লুকিয়ে থাকার জন্যে। ওখানে কী গিয়ে আপনি বিরক্ত করবেন মিস ওয়াকারকে? এই কারণেই অনেক কটেজে টেলিফোনের কানেকশানই রাখিনি আমরা। কিন্তু ওঁর ঘরে আছে। তারপর ডায়াল করে কথা বলতে দিল আমায়।

ফোনটা অনেকক্ষণ বাজবার পর লারা ধরল।

লারা বলল, ইয়েস হু ইজ ইট?

আমি বললাম, আমি জিত্।

লারা ওপাশ থেকে ভয় পাওয়া গলায় বলল, আমি জিনা, জিনা ওয়াকার।

আমি বললাম, বুঝেছি।

লারা বলল, কোথায় ছিলে তুমি সারাদিন? আমি তো ভাবলাম তুমি চলেই গেলে নিউইয়র্কে।

আমি বললাম, পাগল।

তারপর বললাম, আমি আসছি তোমার কাছে।

লারা বলল, তোমার আসতে ফোন করার দরকার কী ছিল। তবে যখন করেইছ তখন এক্ষুনি এসো না। আমি চান করতে যাচ্ছি। জামাকাপড় ছেড়ে ফেলেছি। দরজা বন্ধ, তুমি দশ মিনিট পরে এসো। হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক অর আ কোক এ্যাজ উ্য প্লিজ।

আমি বললাম, আমি গেলেই চান কোরো। তারপর বললাম, তোমার চান দেখব আমি।

লারা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, দেখো, আজ নয়, অন্য কোনওদিন, অন্য কোনওখানে।

ওর এই হঠাৎ পরিবর্তনে অবাক হলাম। ভাবলাম, ও কি জানতে পেরেছে যে আমি, এমনকি আমিও ওর শত্রু হয়েছি?

আমি বললাম, ঠিক আছে, দশ মিনিট পরেই যাচ্ছি।

ম্যাক্সের ইঙ্গিতে আমি রিশেপসানের মেয়েটিকে জিগ্যেস করলাম, লারা বেরিয়েছিল কি না?

মেয়েটি বলল, বিকেলে একবার বেরিয়েছিল শপিং-এর জন্যে। এই তো ঘন্টাখানেক হল ফিরে চাবি নিয়ে গেল ডেস্ক থেকে।

আমার খুব দুর্বল লাগছিল নিজেকে, ভীষণ অপরাধী, পা কাঁপছিল আমার। লারাকে কী করে মুখ দেখাব জানি না। এত কিছু ওর সম্বন্ধে জানা সত্ত্বেও ওকে তবুও খারাপ বলে, খুনি বলে ভাবতে পারছিলাম না।

ম্যাক্স ঠিকই বলেছিল, যখন বলেছিল, কতিপয় ব্যাতিক্রম ছাড়া আমরা সকলেই ভালোত্বে-মন্দত্বে মেশানো মানুষ। কখনও ভালোত্বটা প্রবল হলে আমরা মহৎ হয়ে উঠি, মন্দত্বটা প্রকট হলে নীচ। সংসারে অবিমিশ্র খারাপ মানুষ বা ভালো মানুষ বলে বোধহয় কেউই নেই।

ভালোর মধ্যেও খারাপ থাকে, খারাপের মধ্যেও ভালো।

এমন সময় ম্যাক্সের একজন, অনুচর বাইরে থেকে এসে ম্যাক্সকে ফিসফিস করে বলল যে, সময় নষ্ট করা উচিত নয় আমাদের। ওহারা তাড়া লাগিয়েছেন, ব্যাপারটা মিটে গেলে উনি আজই রাতের প্লেনে চলে যেতে চান কানাডাতে।

ম্যাক্স বলল, ঠিক আছে। ওহারাকে বলে দাও দশ মিনিটে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। ব্যাপারটা যে জরুরি তা আমরাও বুঝি। আমরা এখানে স্ট্রিপটিজ দেখতে আসিনি।

তারপর ফিসফিস করে আমাকে ম্যাক্স বলল, পিস্তলটা যে লারার কাছে নেই এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই। যদি লারাই আবার ওটাকে খুঁড়ে তুলে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে। একমাত্র তোমাকেই ও সন্দেহ করবে না। তুমি ঘরে যাওয়ার পরই ওর হ্যান্ডব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের করে নেবে। এর জন্যে তোমাকে আমি দু-মিনিট সময় দেব। প্রয়োজন হলে তুমি গায়ের জোরে কেড়ে নেবে। তা না হলে ও যে ডেসপ্যারেট কন্ডিশানে আছে এখন ওর পক্ষে আমাদের দেখেই এলোপাথাড়ি গুলি চালানো অসম্ভব নয়। এত বড় নামজাদা হোটেলের মধ্যে আমি সিন ক্রিয়েট করতে চাই না। পুরো অপারেশনটা কোয়েইটলি সারতে চাই। উইদাউট এনি ব্লাড শেড।

আমি বললাম, পিস্তলটা যদি লারার কাছে থাকে এবং ও যদি এতক্ষণে বুঝে থাকে যে ওর বাঁচবার আর পথ নেই, তাহলে ও যদি আত্মহত্যা করে?

ম্যাক্সের চোখ দুটো মুহূর্তের মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠল।

এক সেকেন্ড ও চুপ করে থাকল।

তারপর বলল, এই কথাটা আমার মনে আসেনি, যদিও আসা উচিত ছিল। তবে লোকচরিত্র আমি যতটুকু বুঝি তাতে লারা এমন করবে বলে আমার মনে হয় না। যে-মেয়ে টাকার জন্যে মানুষ খুন করতে পারে, সে অত সহজে নিজেকে মারবে না।

আমি বললাম, কী জানি? আমার তো মনে হয়েছে লারা খুব ইমোশনাল মেয়ে, বেসিকালি ভালো মেয়ে। ওকে কাল সন্ধেতেই যেমন আপসেট দেখেছি তাতে ওর পক্ষে সব কিছুই করা সম্ভব। যদি ও আত্মহত্যা করে মারা যায়?

ম্যাক্স আমার কাঁধে থাপ্পড় মেরে বলল, ডোন্ট ওরি। শি উইল বি এজ গুড ইন হার ডেথ এজ উ্য ফাউন্ড হার অন বেড।

আমি ম্যাক্সের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা ও স্থূলতা দেখে অবাক হলাম।

ঘড়িতে আট মিনিট হয়ে গেছিল। ম্যাক্স ও আমি হাইড-এওয়ে কটেজের দিকে যাচ্ছিলাম। আমাদের পাশ কাটিয়ে জিনস-পরা একটি কদর্য প্রসাধন করা কুৎসিত দর্শন বুড়ি গটগট করে ছ'ইঞ্চি হিলের জুতো পরে চলে গেল। হাতে জিনের হ্যান্ডব্যাগ।

ম্যাক্স হেসে ফেলল। আমাকে বলল, এই ছুঁড়ি-সাজা বুড়ির লুকোবার মতো কোনও অ্যাফেয়ার আছে যে হাইড-এওয়ে কটেজে উঠছে? এর বয়ফ্রেন্ডই বা কে?

আমি বললাম, বয়ফ্রেন্ড যে থাকবেই, তার কী মানে আছে। লেসবিয়ানও হতে পারে।

ম্যাক্স আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল, এই তো বুদ্ধি খুলছে আস্তে-আস্তে।

আমরা যখন লারার কটেজের সামনে পৌঁছেছি, তখন ম্যাক্স অবাক হল সেখানে প্লেইন ড্রেসে আর্মড গার্ড নেই দেখে। সঙ্গে-সঙ্গে ওয়াকি-টকিতে কথা বলল ম্যাক্স। হোটেলের বাইরে গাড়িতে বসা ওর সহচরেরা বলল, নিশ্চয়ই আছে, সে বোধহয় এদিকে-ওদিকে আছে। ঘরের সামনেই হয়তো নেই। ওরা আরও বলল যে, পাঁচ মিনিট আগেও কথা বলেছে ও তাদের সঙ্গে। হয়তো বাথরুমে গেছে।

ম্যাক্স নিজের ওয়াকি-টকিতে লোকটার নাম ধরে ডাকল। তার নাম জন।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

ম্যাক্স বাইরের গাড়িকে বলল, ওকে লোকেট করতে পারলেই যেন ম্যাক্সের সঙ্গে দেখা করতে বলে।

আমরা যখন লারার দরজার সামনে পৌঁছলাম তখন ম্যাক্স আড়ালে চলে গেল। বেল টিপতেই ভিতর থেকে একেবারে দরজার পাশ থেকেই লারা বলল, ডালিং, দশ মিনিট পরে এসো। আমার এক বান্ধবী এসেছিল, এইমাত্র গেল। এখনই চান করতে যাচ্ছি—জামাকাপড় পরে নেই, দরজা খুলতে

পারছি না। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

আমি বললাম, ও-কে। লারা।

ম্যাক্স ও আমি সরে গিয়ে যাতে কটেজ থেকে দেখতে না পাওয়া যায় এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ওয়াকি-টকিতে ম্যাক্স ওই বুড়ির চেহারার বিবরণ দিয়ে বাইরের গাড়ির লোকদের বলল, তারা তাকে দেখেছে কী না?

তারা বলল, দেখেছে, বুড়ি তো একটু আগে নিজের গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। লবিতেও ঢুকেছিল। লেডিজরুমে গেছিল লবির। তারপর বেরিয়ে এসে চলে গেল।

ম্যাক্স শুধোল, সন্দেহজনক দেখলে কিছু চলাফেরায়?

ওরা বলল, নাথিং। একটুও নার্ভাস বা টেন্স নয়—ধীরেসুস্থে লবি থেকে বেরিয়ে গাড়ির লক খুলল তারপর গাড়ি স্টার্ট করে আস্তে-আস্তে চালিয়ে চলে গেল, বুড়িরা যেমন সাবধানীভাবে গাড়ি চালায়। শি ওয়জ জাস্ট এ্যান ওল্ড হ্যাগ।

ম্যাক্স বলল, গাড়ির নাম্বার প্লেট নোট করেছ?

ওরা বলল, করেছি।

ম্যাক্স বলল, খোঁজ নাও কার গাড়ি।

তারপর বলল, কিন্তু জন কোথায়? জনের কী হল? জন তো সাড়া দিচ্ছে না। দ্যাখো তোমরা কোথায় গেল জন?

ম্যাক্স আমাকে বলল, তোমার সঙ্গিনী তো একটি নিম্ফ—দ্যাখো, জনকেও সে ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর খাচ্ছে কি না। তোমাকেও যখন দরজা খুলল না—আরও দশ মিনিট পর আসতে বলল। তখন ব্যাপারটা রহস্যময়।

আমি বললাম, দরজা ভাঙবে না কি?

ম্যাক্স বলল, না। নিজেই যখন সাড়া দিল তখন দশ মিনিট অপেক্ষাই করা যাক। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করলে ওর কাছে পিস্তলটা যদি থাকে তবে তাতে দু-একজন লোক মারা পড়বে। লারাও মারা যেতে পারে।

লারার গুলিতে মারা যাওয়ার কথাতে আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

তারপর ম্যাক্স ইয়ার্কি করে বলল, দশ মিনিট সময় কী জনের আদর খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট?

আমি অনেকক্ষণ পরে হাসলাম। বললাম, আমরা কোনারক খাজুরাহোর দেশের পুরুষ। দশ ঘণ্টাও যথেষ্ট নয় আমাদের কাছে। তোমার জনের কথা জানি না।

ম্যাক্স খিলখিল করে হাসল। বলল, বুলশিট। বাড়িয়ে বলার একটা সীমা আছে। দশ মিনিট কেটে যেতে চলল কিন্তু তবুও জনের পাত্তা নেই।

আমি আবার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বেল টিপলাম। তখনও লারা আবারও ওই একই কথা বলল।

আমি ম্যাক্সকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। ম্যাক্স দৌড়ে এল। আমরা দুজনেই কান পেতে শুনলাম। লারার আগের কথাগুলো বার-বার শোনা গেল—ঘুরে-ঘুরে। বারবার একই কথা বলছে লারা।

ম্যাক্সকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাল। ফ্যাকাশে মুখে আমাকে বলল, এ তো টেপ-রেকর্ডার বাজছে। টেপড মেসেজ।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বল কী?

ম্যাক্স সঙ্গে-সঙ্গে ওয়াকি-টকিতে বাইরের গাড়িগুলোকে কনটাকট করল। ওরা বলল, জনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

লারার কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এবার আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। রক্ত গড়িয়ে

আসছিল ভিতর থেকে বাইরে, দরজার তলা দিয়ে।

ম্যাক্সকে দেখালাম।

ম্যাক্স সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের লোকদের যা-যা ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার দিল।

আমি ও ম্যাক্স দৌড়ে রিশেপসানে ফিরে গেলাম। সেখানে দেখি ড্যানারের সেই লোকটি ছটফট করছে। পায়চারি করছে উদ্বেগে।

ম্যাক্স বলল, মেয়েটি কোথায়?

লোকটি বলল, লেডিজরুমে ঢুকেছে তো ঢুকেছেই।

এতক্ষণ? ম্যাক্স অবাক হয়ে গেল।

তারপর বলল, তুমি গিয়ে দেখোনি কেন এতক্ষণ?

লোকটি অবাক হয়ে বলল, মেয়েদের ল্যাভেটরিতে আমি কী করে ঢুকব?

আমার হাসি পেয়ে গেল, কিন্তু হাসি বেরোল না।

ম্যাক্স রিশেপসানে নিজের পরিচয় দিয়ে একটি মেয়েকে যেতে বলল লেডিজরুমে। গিয়ে দেখতে বলল, কী ব্যাপার?

মেয়েটি লোকটির কথা শুনে, হাসতে-হাসতে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই প্রচণ্ড চিৎকার করে আতঙ্কে দৌড়ে এল বাইরে। প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর বলল, রক্ত, খুন।

ম্যাক্সের অনেক অনুচর তখন এসে গেছে। হোটেল তখন ইনিউফর্ম পরা পুলিশেও ভরতি।

মেয়েটি যখন বলল, লেডিজরুমে আর কেউ নেই—তখন ম্যাক্স ও তার অনুচরেরা লেডিজরুমেই ঢুকল। ঢুকে ফিরে এল।

আমাকে বলল, ড্যানারের সেই মেয়েটিকে গুলি করে মেরেছে কেউ। ঘাড়ে গুলি করেছে পিছন থেকে।

লেডিজরুমে আর কে ঢুকেছিল ওই মেয়েটি ঢোকার আগে ও পরে? ম্যাক্স জিগ্যেস করল ড্যানারের লোক ও রিশেপসানের মেয়েদের।

ওরা সকলেই বলল, একজন জিনস-পরা বুড়ি ছাড়া কেউই ঢোকেনি।

যদিও ম্যাক্স বলল, শি ইজ এজ ডেড অ্যাজ হ্যাম। তবুও পুলিশের লোক মেয়েটিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল।

ম্যাক্স জিগ্যেস করল, রিশেপসানে, এ বুড়ি কি হোটেলের রেসিডেন্ট?

মেয়েরা বলল, বোধহয় না। আমরা তো আগে দেখিনি। কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বোধহয়।

তারপর হোটেলের অনুমতি নিয়ে লারার ঘরের দরজা ভাঙা হল। দরজা ভাঙতেই—আমি ও ম্যাক্স সামনে ছিলাম—আঁতকে উঠলাম।

ম্যাক্স বলে উঠল, জন, ওহ্ জন।

জন নামক ম্যাক্সের অনুচর মেঝের কার্পেটে পড়ে আছে। তার বুকের বাঁদিকে একটা রক্তাক্ত গর্ত।

বাথরুমে ঢুকে দেখা গেল জনের ওয়াকি-টকিটা বাথরুমের জলের মধ্যে ডুবোন। লারার ছাড়া জামাকাপড়—চান করেছে তার সাবানের ফেনা। থিয়েটারের মেক-আপের নানা রকম জিনিসের খাপ ও খোল ঘরময় পড়ে আছে।

দরজার সামনে মাটিতে শুইয়ে রাখা একটা ক্যাসেট টেপ-রেকর্ডার তখনও বেজে চলেছে—'ডার্লিং দশ মিনিট পরে এসো। আমার এক বান্ধবী এসেছিল, এই গেল...প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।'

ম্যাক্স আমার দিকে এবার সন্দেহের চোখে তাকাল।

একটা ভয়, আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে নামতে লাগল।

ম্যাক্স বলল, আজ লারার হাতে তোমারই মৃত্যু ছিল, কিন্তু মরল জন।

তারপর দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে জন-এর মৃতদেহ দেখিয়ে বলল, লুক অ্যাট দিস লাউজি ইডিয়ট। একজন এভারেজ আমেরিকান। এঁদের জন্যেই সারা পৃথিবীতে আমরা বেইজ্জত। এদের জন্যেই পৃথিবীর সর্বত্র ক্ষমতার যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি আমরা। সিলি সোয়াইন।

তারপর বড় দুঃখের গলায় বলল, জানো, দ্যা স্ট্রেনথ অফ আ নেশান ইজ লাইক দ্যাট অফ অ্যান আয়রন চেইন—দ্যা উইকেস্ট হিউম্যান এলিমেন্ট—দ্যা উইকেস্ট লিঙ্ক! দ্যাটস দ্যা স্ট্রেনথ।

বেচারি ম্যাক্স গিলিগান। ও সম্পূর্ণ ফ্রাস্টেটেড হয়ে পড়েছিল। শেষ মুহূর্তে ওই একটি লোক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করায় এতগুলো যোগ্য লোকের পরিশ্রম বৃথা গেল।

নেনে

ম্যাক্স আমাকে কিছুতেই হোটেলে ফিরতে দিল না। বলল, এর পরও আজ রাতে তোমাকে একা থাকতে দেওয়া যায় না। তারপর বলল, কাল সকালে তোমার প্লেন ক'টায়?

আমি বললাম দশটায়।

তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে দিয়ে আসবে আমার লোক। লারার কোনও ক্ষতি তুমি করোনি। নিউইয়র্কে তোমার কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। তবুও আমার নিউইয়র্কের লোককে বলে রাখব আমি।

আমি কথা আর কী বলব। বললাম, যা ভালো মনে করো তুমি।

আমরা ম্যাক্সের বাড়ি-কাম অফিসে ফিরে যাওয়ার পর হনলুলুর সব চেয়ে নামি জুয়েলার ফার্মের ভ্যালুয়ারকে ডাকল ওরা। হীরেগুলোর মূল্যায়ন করতে।

বুড়ো ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা, রঙিন হাওয়াইন শার্ট পরা পৃথিবীবিখ্যাত জহুরি চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একে-একে হীরেগুলোকে দেখলেন।

পরীক্ষা শেষ করার পর ম্যাক্সকে বললেন, ম্যাক্স উড ইয়্যু প্লিজ গিভ মি আ স্টিফ ড্রিঙ্ক।

ম্যাক্স গিয়ে ড্রিঙ্ক ঢালতে-ঢালতে বলল, স্বাভাবিক।

তারপর বুড়োর দিকে ফিরে বলল, তুমিও নিশ্চয়ই তোমার জীবনে এত দামি এবং এতগুলো হীরে একসঙ্গে দেখোনি। কী বল?

বুড়ো আস্তে-আস্তে বলল, এই সবগুলো কাঁচের দাম একটা বেলজিয়ান কাট গ্লাসের অ্যাশট্রের চেয়েও কম হবে।

হো—য়া—ট! বলেই ম্যাক্স ড্রিঙ্ক হাতে থমকে দাঁড়াল।

পরক্ষণেই এক গাল্পে হুইস্কির গ্লাসটা নিজের মুখেই ঢেলে দিল।

তারপর আরও দুটো গ্লাস বের করে নিজে আরেকটা নিয়ে আমাকে ও জহুরি বুড়োকে দিল।

বুড়ো বলল, সব কাঁচ! একটাও হীরে নয়!

ম্যাক্স বলল, মাই গুডনেস। দ্যাট গার্ল মাস্ট বি দ্যা ডেভিল হিমসেল্ফ।

বলেই ম্যাক্স পা ছড়িয়ে সোফায় বসে পড়ল।

আমার মাথাও ভোঁ-ভোঁ করে ঘুরছিল।

কখন যে বুড়ো আরেকটা ড্রিঙ্ক নেওয়ার পর চলে গেল, কখন রাত গভীর হল, কখন আমরা খেতে বসলাম, কতগুলো হুইস্কি খাওয়ার পর, আমার মনে নেই।

আমি একাই ছিলাম তারপর আমার ঘরে। ম্যাক্স বুড়ো চলে যাওয়ার পরই নীচে ওর অফিসে চলে গেল।

টেলেক্স মেসিনের আওয়াজ ইন্টারকমের বুঁ-বুঁ টেলিফোন, ওয়ারলেস মেসেজ—সারা পৃথিবীময় একটি নেনে পাখিকে খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা চলতে লাগল যে কী বলব!

এমন সময় খবর এল, যে গাড়িটা করে বুড়িটা কাহালা হিলটন থেকে বেরিয়ে গেছিল, সেটি একটা ভাড়া করা গাড়ি। হোটেল থেকে আধমাইল দূরে একটা পার্কিংলটে গাড়িটা পাওয়া গেছে। একজন সুন্দরী মেয়ে, লীনা জনসন—গাড়িটা বিকেলে কার-রেন্টাল কোম্পানি থেকে ভাড়া নিয়েছিল।

পরদিন সকালে প্লেনের সময় হলে ম্যাক্স আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে, ওর লোকেদের দিয়ে পাঠিয়ে দিল এয়ারপোর্টে। প্যান-এ্যাম-এর ফ্লাইট আমার। সানফ্রান্সিসকো হয়ে নিউইয়র্ক। লম্বা ফ্লাইট।

এয়ারপোর্টে এসে প্যান-এ্যাম-এর টিকিট দেখিয়ে চেক ইন করতে যেতেই ডেস্কের মেয়েটি আমাকে একটি চিঠি দিল। খামে বন্ধ চিঠি।

আমি বললাম, কে দিয়েছে?

মেয়েটি বলল, কিছুক্ষণ আগে একটি স্কুলের ইউনিফর্ম পরা মেয়ে দিয়ে গেছে আপনাকে দেওয়ার জন্যে। এই তো ছিল মেয়েটি—বলে ডেস্কের মেয়েটি এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল।

ম্যাক্স-এর লোকরা দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। চিঠিটা ওরা দেখতে পায়নি, কথাও শুনতে পায়নি।

আমি এ্যান্টি-হাই-জ্যাকিং-এর ব্যাগেজ চেকিং-এর কাউন্টারে ঢুকে পড়ে ওদের হাত নেড়ে চলে যেতে বললাম।

প্যান-এ্যাম-এর ডি-সি টেন প্লেনটা অতিকায় রাজহাঁসের মতো টারম্যাক ছেড়ে উঠে এল—নীচে দিগন্তবিস্তৃত ওয়াইকিকি বিচটা দেখা যেতে লাগল। প্লেনটা একটা চক্কর মেরে প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলরাশি নীচে ফেলে মেঘ ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে এল।

সিট-বেল্টটা খুলে ফেলে আমি খামটাও খুলে ফেললাম।

চিঠিটা টয়লেট পেপারের ওপর বল-পয়েন্ট পেন দিয়ে তাড়াতাড়ি লেখা।

মাই ডিয়ার জিত্,

আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম।

কিন্তু টাকার মতো ভালো জীবনে আর কিছুকেই বাসিনি।

এই পৃথিবীতে টাকাই হচ্ছে সব প্রেম, সুখ এবং ক্ষমতার মূল। যার টাকা নেই, তার কিছুই নেই।

আমার জন্যে তোমাকে কিছু ঝামেলা পোহাতে হল। আমাকে ক্ষমা কোরো। এয়ারপোর্টে সঙ্গে গিলিগানের লোক নিয়ে এসেছিলে কেন?

তুমি জানো না, জীবনটা কি দারুণ ইন্টারেস্টিং। যে-জীবনে ঝুঁকি নেই, বুদ্ধি এবং টাকার খেলা নেই, নিজের ইচ্ছামতো মুঠিভরে হেলায় পৃথিবীকে ধরার ক্ষমতা নেই; সে জীবন জীবনই নয়।

গিলিগানকে প্রথম রাউন্ডে হারিয়েছি মর্মান্তিকভাবে। আবারও খেলা হবে। এই খেলার মধ্যেই, খেলার আনন্দেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। আমি এখন তোমার

দেশের আগেকার কোনও মহারানীর মতো বড়লোক। কুকুরের মতো অনেক পুরুষকে পুষব আমি। সব পুরুষই বোকা। মেয়েরা তাদের শরীর ও বুদ্ধিকে ঠিকভাবে চালিত করতে পারলে উইমেনস লিব-এর জন্যে শোভাযাত্রা করতে হত না মেয়েদের। পুরষদের ঠুলি পরানো চোখ দিয়ে মেয়েরা চিরদিন জীবনকে দেখে এসেছে। আমি তেমন মেয়ে নই।

তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। ভালোবাসা বলতে তুমি যা বোঝো, অন্য অনেক মেয়ে যা বোঝে, আমি তা বুঝি না। আমার ভালোবাসা শরীরনির্ভর। আমার মন আমি কাউকেই দিতে পারব না। আমার মন আমারই একার।

এদেশে তোমার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না। হলে তোমারই বিপদ।

কোনওদিন তোমাদের দেশে যদি যাই তো তোমার কাছে যাব। কলকাতার ঠিকানা রেখেছি। তোমার সঙ্গে দার্জিলিং-এ যাব ও 'শেষের কবিতা' পড়ব। তখন আবার তোমাদের দেশের গিলিগানদের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো না যেন।

আরও টাকা, অনেক টাকার পর ক্ষমতা, আরও ক্ষমতার জন্যে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সব দেশের টাকাওয়ালা লোকেরা, রাজনীতিকরা মানুষ খুন করেছে, সততা, চরিত্র, সরলতা যা-কিছু পবিত্র সব কিছুই খুন করছে—। সে খুনে রক্ত ঝরে না। সে বড় ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী খুন।

আমি একসময় খুবই গরিব ছিলাম বলে সেই খুনিদের প্রকৃত চেহারা আমি জানি। ধনী এবং ক্ষমতাসীন থাকার জন্যে ওরা পারে না এবং করে না এমন কিছুই নেই। ওরা সার্বিক খুনি, জন্ম খুনি, বংশ পরম্পরায় খুনি।

ওদের তুলনায় আমি কিছুই নই।

আমার মধ্যে যে লারাকে তুমি জেনেছ সেও বাস করে, করবে চিরদিন, অন্য একটা রাগী নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষের সঙ্গে।

তুমি সেই প্রথম লারাকে মনে রেখো।

যে লারা তোমাকে ভালোবেসেছিল।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—তোমার আদরের নেনে।

জানালা দিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালাম।

এখন আর ওয়াইকিকি, ওআহু দেখা যাচ্ছে না। নীচে কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু মেঘ, আর সুনীল শূন্যতা।

নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রবেশ



মিলন মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

হাতের প্লেটে শিক-কাবাব নিয়ে প্রায় দৌড়ে এল জেজে। উলটোদিকে চলে গেছে বস। টলটলে নীলচে সবুজ জলে দুই হাত দুই পা খেলিয়ে পৌঁছে গেছে ওপারে। গরম-গরম কাবাব। বসের ফিরে আসতে-আসতে ঠান্ডা না হয়ে যায়। তাহলেই আবার ছুটতে হবে কিচেনে। নতুন কাবাব বানিয়ে আনতে হবে। দুশ্চিন্তা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকল জেজে। জিতু বা জীতেন্দ্র জোগলেকর। লাইনের সমস্ত পরিচিত লোকেরাই 'জেজে' নামে চেনে। নিজের পুরো নাম মনে করে বলতে হয়।

বস ওপারে হাত ছুঁইয়ে চিত সাঁতারে ফিরে আসছে। জেজেকে দেখতে পেয়েছে কি না কে জানে। এই মানুষ ঠিক কখন যে কী দেখে আবার কী দেখে না—বোঝার কোনও উপায় নেই। তবু, ওকে মাঝপথে পৌঁছতে দেখে একটু নিশ্চিন্ত হল জেজে। আহ্! বাঁচা গেল! ফের বোধহয় দৌড়তে হবে না কিচেনে। প্লেটের নীচে হাতের চেটোয় ওমভাব টের পেল সে। সারাদিন যথেষ্ট ছুটোছুটি গেছে। অথচ, এখানকার ছড়ানো-ছেটানো রঙিন ডেক-চেয়ারের একটায় বসে যে দু-সেকেন্ড জিরিয়ে নেবে তার উপায় নেই। কাজের সময় বস সবাইকে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে পছন্দ করে। সুতরাং ক্লান্ত জেজেকে দাঁড়িয়েই থাকতে হল সটান।

সুইমিং পুলের মাঝ বরাবর জল কাটতে-কাটতে এপারে এসে পৌঁছোল বস। পাড়ে হাতের ভর দিতেই ঝুঁকে পড়ল জেজে। প্লেটটা সামান্য এগিয়ে ধরল। কিন্তু সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে, পাড়ে-রাখা বিয়ারের গ্লাস তুলে নিল বস। এক চুমুকে খালি করে দিল গ্লাস। মুখে আরামের শব্দ করল।—'আহ্।'

তারপর ধীরেসুস্থে আলতো আঙুলে কাবাবের টুকরো তুলে দিল মুখে। ফরসা, রোমশ বুক অবধি জলে ডোবা। শরীরের বাকি অংশ মাথার চুল অবধি সপসপে জলে ভেজা এবং মুখের ভেতরে গরম কাবাব। চিবোতে-চিবোতে বলল, 'হুম! এটা গরম আছে। থ্যাংক ইউ।'

বস যদিও বাঙালি, তবে দারুণ হিন্দি বলে। পরিষ্কার হিন্দির অনেক কথাই আবার মারাঠি। জেজেকে আন্দাজে বুঝে নিতে হয়।

নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নিশা। হাতের ট্রেতে বিয়ারের বোতল। অল্প ঝুঁকে বসের খালি গ্লাস ভরতি করে দিল কানায়-কানায়। দ্রুত পায়ে ফিরে গেল আবার।

বসের এখানে খাতির অনেক। বিগ বস দুবাইতে থাকেন বেশিরভাগ সময়। ন'মাসে ছ'মাসে বম্বে এসে এখানে ওঠেন। ওয়ালকেশ্বরের এই প্রাসাদতুল্য দালানটি মোটামুটি মালাবার হিলের যথেষ্ট উচ্চতায়। চারপাশে তিন-মানুষ উঁচু দেওয়াল। কালো পাথরের। দেওয়ালের চারপাশে স্রেফ আকাশ। এই বাঙালি বস সেন-সাহেব ছাড়া আরও দুজন 'বস' আছে। তাদের ঘাঁটি যে ঠিক কোথায় জানে না জেজে। জানার প্রয়োজনও মনে করে না। কারণ, এই আলো-অন্ধকার জগতে বেশি কৌতূহল আবার অবাঞ্ছিত পরিণতি ডেকে আনে। দু-একটা কেস সম্পর্কে জেজে নিজেই ওয়াকিবহাল। তবে, কাজেকর্মের সূত্রেই এটুকু সে জানে যে, সেন-সাহেবের রবরবা দিল্লি এবং বাংলা মুলুকে।

বাঁ-হাতে শরীরের ভর ঝুলিয়ে ডানহাতে আরও একটা কাবাব তুলে নিল বস। কাবাবটিকে সম্বোধন করেই যেন জিগ্যেস করল, 'কুয়েতের মাল চলে গেছে?'

কাবাব জবাব না দিয়ে বসের মুখগহ্বরে হারিয়ে গেল। জেজে বলল, 'ইয়েস বস'।

'কোনও গোলমাল হয়নি এয়ারপোর্টে?'

'নো, বস।'

'পুলিশের কে-কে ছিল?'

'ইনস্পেক্টর কানাড়ে আর দত্তারাম ছিল, বস।'

এক মুহূর্ত চুপ।

হঠাৎ দমকা বাতাসের মতো হেসে উঠল সেন-সাহেব। জলের মধ্যে তলিয়ে গেল হাসতে-হাসতে। ডুব সাঁতারে অনেকখানি গিয়ে সুইমিং পুলের মাঝখানে ভেসে উঠল ভুশ করে। এখন হাসির চিহ্নমাত্র নেই মুখে। সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে ফিরে আসছে।

জেজের প্রায়ই মনে হয়, এই বাঙালি বসকে দেখতে অনেকটা সিনেমার ভিলেন অনুপম খেরের মতো। ভারী সুপুরুষ। বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে মনে হয়। মুখের হাসিটি দেখবার মতো।

ওর হাসির কারণ বোধহয় ইনস্পেক্টর কানাড়ে। হালে প্রমোশন পেয়ে বেলগাঁও থেকে এসে খুব হম্বিতম্বি। ইনফরমারের মারফত খবর পেয়ে, গেল মাসে থানা চেকপোস্টে দুটো লরি আটক করে ভেবেছিল লাইনের ধান্ধা চৌপাট করে দেবে। ড্রাগ বাজেয়াপ্ত করেছে ঠিকই, কাউকে ধরতে পারেনি। কুয়েতে ছেলে পাচারও সব বানচাল করে দেবে বলে খুব আস্ফালন করেছিল মারাঠি দৈনিকে। ওর মুখে চুনকালি মাখিয়ে গত তিনদিনে সাহার বিমানবন্দর থেকে আঠাশটি দক্ষিণ ভারতীয় ছেলে উটের রাজ্যে চলে গেছে। কানাড়াকে বোকা বানাবার আনন্দেই বস হেসে উঠল।

ফিরে এসে আবার সান-বাঁধানো পাড়ে ডানহাতে ভর রেখে বলল, 'সিগারেট।'

মারবেলের ছোট্ট টিপয়ের ওপর রাখা ডানহিলের লাল প্যাকেট। কাবাবের প্লেট তার পাশে রেখে প্যাকেটটা খুলে এগিয়ে ধরল জিতু। ভেজা হাতের সাবধানী আঙুলে সিগারেট তুলে ঠোঁটের ফাঁকে আলতো করে আটকাল বস। সোনার ডানহিল লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল জিতু, উবু হয়ে।

মোক্ষম একটা টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে শব্দ ছুড়ল বস, 'বম্বেতে তুমি আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক।'

জিতু অপেক্ষা করল। সিগারেটে আর-এক টান। ধোঁয়ার সঙ্গে কথা, ধীর লয়ে, 'কাল সন্ধের মধ্যে একটি মেয়েকে তুলে আনতে হবে।'

চমকে উঠল জিতু। নারীঘটিত ব্যাপারে এই বসের বিন্দুমাত্র বদনাম পুলিশেও দিতে পারবে না। তিন বছরের ওপর বসের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতায় ওকে মোটামুটি চিনে ফেলেছে জিতু। অন্তত তাই ভেবেছিল সে। হঠাৎ কী হল? অন্য কারুর জন্যে কি? রাজ্যের তাবড়-তাবড় শিল্পপতি, পলিটিক্যাল হোতাদের সঙ্গে বসের ওঠা-বসা। লাখিনি, বাজোরিয়া, বানার্জী এদের কারুর অনুরোধ নয়তো! পরের কথাগুলির জন্যে অধীর আগ্রহে এই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল জেজে। কথা কম বলে মানুষটা। ভেবেচিন্তে কেটে-কেটে পরিষ্কার উচ্চারণে ছাঁকা প্রয়োজনীয় শব্দ ছাড়া মুখই খোলে না।

টিপয় থেকে সুডৌল, সুদৃশ্য কাট-গ্লাসের অ্যাশট্রে ওর হাতের নাগালে নামিয়ে রেখেছিল জিতু। জ্বলন্ত সিগারেটটা অর্ধেকের বেশি চেপে-চেপে নিবিয়ে দিল তাতে। জিগ্যেস করলে, 'ক'টা বাজে?'

তটস্থ হয়ে হাতঘড়ি দেখল জিতু, 'আটটা কুড়ি।'

'হুঁ। সাতটা নাগাদ সূর্যাস্ত হয়। কাল এই সময়ের মধ্যে মেয়েটিকে চাই।'

লম্বা চুমুকে গ্লাস শেষ করে দিল বস। খবর পড়ার গলায় বলল, 'থাকে—"লিডো" সিনেমার পেছনদিকে—বড় হাউসিং কমপ্লেক্সের গায়ে। কমপ্লেক্সের নামটা বোধহয়—অজন্তা বা ইলোরা। ডি-ব্লক, এ উইঙ, সেকেন্ড ফ্লোর।'

এতক্ষণে হাতের খালি গেলাসটা নামিয়ে সরাসরি জেজের দিকে তাকাল বস। জিগ্যেস করল, 'ও-কে?'

'ইয়েস বস।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে, খুব স্বাভাবিক কারণেই জিতুর প্রশ্ন, 'বস, নাম?'

'নাম জানবার দরকার নেই—' বলে ব্যাক-স্ট্রোকে আর-এক চক্কর সাঁতার কেটে ফিরে এল বস। সামান্য দম নিয়ে বলল, 'বাঙালি। শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ। ভিলে পার্লের মীনাবাঈ কলেজে যায় এগারোটা নাগাদ। বিকেলে ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে জুহু বিচে বেড়াতে যায়। রোজ। দেখতে

সুশ্রী। ফরসা। একহারা চেহারা।'

নিশা এসে আবার গেলাস ভরে দিয়ে চলে গেল শব্দহীন পায়ে। ফেনা-ভরতি গেলাসটা সাবধানে ব্যালেন্স করে হাতে নিল বস। চুমুক দিতে যাওয়ার মুখে বলল, 'ও—কে।'

'বস, জ্যান্ত? না—?'

গেলাসে চুমুক দেওয়া হল না বসের। ঝট করে ফিরে তাকাল জিতুর দিকে। একেবারে স্থির, পাষাণ চোখ। জিতু এই চোখদুটিকে ক্বচিৎ কখনও দেখতে পেয়েছে। তবে, চিনে গেছে ভালো করে। ফলে, ভীষণ ভয় পায়। কয়েক সেকেন্ড সেই চোখে চেয়ে থাকল বস। তারপর, কেটে-কেটে বরফের টুকরোর মতো শব্দ ছুঁড়ে দিল, 'বাচ্চা মেয়ে। বয়েস—আঠারো-উনিশ। গায়ে এক বিন্দুও—আঁচড় যেন—না লাগে। শাড়ির—এক চিলতে সুতোও যেন—না ছেঁড়ে।—যাও!'

'ইয়েস বস। সমঝ গয়া, বস। থ্যাংক ইউ, বস।' বলে, সাবধানে কাবাবের প্লেটটা নামিয়ে রেখে প্রায় পালিয়ে যাওয়ার পায়ে দ্রুত চলে গেল জিতু। সুইমিং পুল পেরিয়ে দালানে ঢুকে, বসের চোখের আড়াল হয়ে—তবে, দম নিল সে।

করিডোরের শুরুতেই তে-কোণা মোজাইক টেবিলের সামনে নিশা বসে আছে। এখান থেকে বসের লম্বা ডেক-চেয়ার এবং তার ওপরে রাখা ধবধবে সাদা তোয়ালে দেখা যায়। বিয়ারের গেলাস, কাবাবের প্লেট, ডানহিলের প্যাকেটও নজরে আসে। সেদিকেই লক্ষ রাখছে নিশা। গেলাস খালি হলেই পাশের চেম্বার থেকে ফ্রিজ খুলে বিয়ার নিয়ে ছুটে আসবে আবার।

কাচের দরজা পেরিয়ে জিতু আসতেই নিশা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ড্রিংক নেবেন, স্যার?'

জিতু করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতেই জবাব দেয়, 'নো। থ্যাংকস। একটা চা পাঠিয়ে দিতে বলো ব্লু চেম্বারে!—' তারপর থমকে, পিছন ফিরে জুড়ে দিল, 'বস বোধহয় একটু খেপেছে। খেয়াল রেখো। আমি কয়েকটা টেলিফোন করেই বেরিয়ে যাব।'

'ও-কে, স্যার।'

সুবিশাল এবং সুনসান হলঘরে আসবাব বলতে কিছুই নেই। সাদা মারবেলের মেঝের ওপরে চার কোণে রাখা চারটে হাই কুশন। চার রঙের—সাদা, হলুদ, নীল, সবুজ। হলের মধ্যিখানে কালো মারবেলের সুদৃশ্য গোল টেবিল। চেয়ার-সোফা কিছু নেই। টেবিলের ওপরে কালো ওয়ারলেস পুশ বাটন টেলিফোন। নীল কুশনের পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল জেজে। দশ পনেরো ফুট লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে, ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে 'ব্লু চেম্বারে' ঢুকে পড়ল।

সব চেম্বারই এখানে এয়ারকন্ডিশনড। বাইরে সন্ধে উতরে গেলেও বাতাস এখনও ঠান্ডা হয়নি।

হালকা নীল আলোকিত ঘরে ঢুকে আরাম লাগল জিতুর। পুরো মেঝে নীল-রঙের মারবেল পাথরে তৈরি। চারপাশের দেওয়ালও নীল। গাঢ় নীল বিশাল টেবিল ঘিরে ছ'টা নীল রঙের উঁচু সোফা। উলটোদিকে দেওয়ালে পিঠ করে সোফাটা টেবিলের মতো গাঢ় নীল। সবচেয়ে উঁচু ও চওড়া। নীল কাট-গ্লাসের ছাইদান। লেখার প্যাডটিও হালকা নীল। কলমদানে টেবিল ক্যালেন্ডার ও দুটি ঝরনা কলম। নীল রঙের শরীর। হালকা নীলটিতে লাল ও গাঢ় নীলে নীল কালি। জিতু জানে। দুটি পুশ-বাটন টেলিফোনও দু-রকমের নীল। একটি ইন্টারকম। অন্যটি ডাইরেক্ট। রিসিভার না তুলেও স্রেফ ডায়াল ঘুরিয়ে কথা বলা চলে। সাতটা বোতাম টিপে ধপ করে উঁচু চওড়া সোফাটায় বসে পড়ল জীতেন্দ্র জোগলেকর। অনেক কাজ। চব্বিশ ঘণ্টাও হাতে নেই। অচেনা-অজানা একটি যুবতীকে তুলে এনে সেন-সাহেবকে দিতে হবে। জিতু আন্দাজেই ধরে নিয়েছে, এটা দলীয় কোনও কাজ নয় বোধহয়। স্রেফ বসের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মাউথপিসে শব্দ আসছে বিপ-বিপ বিপ-বিপ। ততক্ষণে পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেট খুলে ইলেকট্রনিক লাইটারে ধরিয়ে ফেলল জিতু। একবারে লাইন পেয়ে গেল—ক্রিং-ক্রিং—

মেয়েলি গলা ভেসে এল টেলিফোনের খুদে মাইকে।

'হোটেল সম্ভর। গুড ইভনিং। মে আই হেলপ ইউ?'

জিতুর বাঁ-হাতে সিগারেট। অন্য হাতে পকেট থেকে রুমাল বের করতে-করতে জিতুর জবাব, 'পুট মি অন টু থ্রি জিরো এইট ফাইভ—'

'প্লিজ হোল্ড অন—'

বিলিতি মিউজিক বাজতে আরম্ভ করল। পাঁচ-সাত সেকেন্ড। তারপরেই, 'হ্যালো?'

হেঁড়ে গলা শুনেই চিনতে পারল জিতু। নিশ্চিন্ত হয়ে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে-মুছতে বলল, 'হাই, বব। কেমন আছ?'

সামান্য সময় ও-পক্ষের সাড়া নেই। হঠাৎ একেবারে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল ববি ফিচার্ডো, 'ওস্মাই গড! এ কার কণ্ঠস্বর? জেজে! কির্তে গ'? কিদার হায় তুম, ম্যান? লং টাইম নো সি?—'

ভাঙা ইংরেজি, হিন্দি ও গোয়ান ভাষার খিচুড়ি মাখা উচ্ছ্বাস কমলে, কাজের কথা বলার সুযোগ পেল জেজে, 'শোনো বব! একটা জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট আছে।'

বাধা দিয়ে ববের গলা, 'স্মল অর বিগ?'

'স্মল। তবে, খোদ—'

ঠিক তক্ষুনি দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল রঘুনাথ। নীল ট্রলিতে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। কাপ-ডিশ, এমনকি টি-কোজিটা পর্যন্ত নীল রঙের।

'সেলাম সাব।' বলতে-বলতে ট্রলি ঠেলে এগিয়ে এল রঘু।

দরজায় ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে বোতাম টিপে টেলিফোনের স্পিকার বন্ধ করে দিয়েছে জিতু। রিসিভারটা কানে তুলে নিয়েছে। ববিকে বলল, 'ওয়েট ফর এ মোমেন্ট।'

রঘুকে বলল, 'আও, রঘু—'

পুরো নাম রঘুনাথ ভাট। ভট্টাচার্য বামুন এখানে বম্বের বাতাসে 'ভাট' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙালি বস একে নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে।

ট্রলি ঠেলে জেজে-সায়েবের ডানধারে এনে দাঁড় করাল। পরম বিনয়ে জিগ্যেস করলে, 'চা বানিয়ে দেব, সা'ব?'

'না। ঠিক আছে। তুম যা সকতে হো।'

রঘু সেলাম ঠুকে আড়চোখে দ্রুত একবার টেলিফোন যন্ত্র ও লেখার প্যাডটা দেখে নিল। তারপর আটান্ন বছরের বেঁটে-খাটো শক্ত শরীর নিয়ে টানটান বেরিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে দেখলে ধরা যায়, বাঁ-পায়ে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে রঘু। একাত্তরের যুদ্ধে গোলার কুচি লেগেছিল নাকি হাঁটুতে।

ও বেরিয়ে যেতেই জিতু বলল, 'হ্যা—যা বলছিলুম। কাজটা বড় মাপের না হলেও, খোদ বাঙালি বসের হুকুম।'

রিসিভার আর নামায়নি জেজে। ববের গলা শুনল, 'বাঙালি বস কি টাউনে?'

'হুঁ।'

'কদ্দিন থাকবে?'

'সে, ব্রাদার, শয়তানেও জানে না। এঁদের যাওয়া-আসার কথা নিজে থেকে না জানালে কি এক সেকেন্ড আগেও জানার উপায় আছে?'

'তা ছোট্ট একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দাও না, গুরু।' ববির গলায় আমূল মাখন।

'দেখি। আগে কাজটা হোক। সেই সুবাদে সাক্ষাত আলাপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।'

'ও-কে, জেজে। বলো কী কাজ?'

'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার তো অনেক সাঙাত আছে।'

'বাঙালি বস কি ফিল্ম করবে নাকি?'

হালকা গলায় কথা বলছিল জেজে। এবার স্বর গম্ভীর হল, 'তুমি একটু বেশি প্রশ্ন করছ, বব।'

জেজে দেখতে পেল না, ওপারের কণ্ঠস্বরের মালিক ববি ফিচার্ডো ধমক খেয়ে নড়ে বসল। একটা গোয়ান গালিও দিল মনে-মনে। করুণ গলা করে বলল, 'স-স্যরি জেজে!—আছে। ফিল্ম লাইনে অনেক চেনাজানা আছে। টপ স্টার থেকে নিয়ে চামচে একস্ট্রা—সব্বাইকে তো মাল সাপ্লাই দিই। কাউকে বিলেতি, কাউকে চোলাই—যার যেমন রেস্তোর তাকত। কাকে চাই, বলো?'

জেজের গলা শোনা গেল, আবার স্বাভাবিক নরম, 'ভালো ঘোড়সওয়ার সমেত একটা দারুণ ঘোড়া চাই।'

মনে-মনে বব বলল, খচ্চর কোথাকার। টেলিফোনে জিগ্যেস করল, 'কী ধরনের কাজ? একটু হিন্ট দাও। সেই বুঝে লোক দেব।'

মিনিট পনেরো কথা হল দু-জনে। রিসিভার নামিয়ে রেখে বিশাল বপু নিয়ে সস্তর হোটেলের পালঙ্ক থেকে উঠে দাঁড়াল ববি। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় জামাপ্যান্ট পরে ফেলল, নাম্বার বের করল। প্রাইভেট ডায়েরি হাতড়ে। অপারেটরের কাছে লাইন চাইল, 'চট করে লাগিয়ে দাও, ডার্লিং!'

'এক্ষুনি দিচ্ছি, মিস্টার ফিচার্ডো।'

ওধারে আনোয়ারের গলা, 'হ্যালো!'

'ববি বোলতা। কাল মর্নিংয়ে জুহু বিচে আসবে। ট্রেনার লাখানের সবচেয়ে তেজি ওই সাদা ঘোড়াটা নিয়ে আসবে। বিচে বার তিনেক চক্কর দিয়ে যাবে—আমি দেখে নেব। খুব জমকালো ড্রেস পরে নেবে। যেন, ড্রেস রিহার্সাল দিচ্ছ। শুটিং হবে বিকেল চারটে-পাঁচটার পর।'

'দুপুরে?'

'ছুটি। তবে, ফর গডস সেক—ডোন্ট ড্রিংক্ক!'

'কাজটা কী?'

'সন্ধে নাগাদ একটা মেয়েকে ঘোড়ায় তুলতে হবে।'

'কোথায় নিয়ে যাব?'

'বিচের লাগোয়া গাড়ি তৈরি থাকবে। এক মিনিটের কাজ।'

'কত?'

'সাধারণত ফিল্মের শুটিং করে একমাসে যা পাও, তার ডবল।'

'থ্যাংক ইউ, বস।'

'ও-হ্যাঁ। সঙ্গে, পকেটের রুমালে ক্লোরোফর্ম রেখো। ঝামেলা, চেঁচামেচি নেই মাংতা, ও-কে?'

'ও-কে।'

জুতোর ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে ববি ভেবে নিল, শ্রীনিবাসের ভিডিও ক্যামেরাটা ভালো ছবি দেয় না। তবু, ওতেই চলবে। ছোট্ট একটা জেনারেটর। সঙ্গে পাঁচশো। না-না, হাজার পাওয়ারের তিনটে স্পট। দুটো হলেও চলবে। শ্রীনিবাসকেই বলে দেবে দু-তিনজন চামচে আনতে। সুইচ অন অফ জাতীয় খুচরো কাজে লাগবে।

॥ দুই ॥

গাঢ় কমলা ও হলুদ ছোপ ধরেছে দূরের আকাশে। সূর্যের গায়ের আগুন-রং শীতল হওয়ার জন্যেই যেন জলে নেমে পড়েছে ধীরে-ধীরে। আরব সাগর এখন ঘোলাটে সাদা। আগুন লেগেছে দিগন্তে।

জাহ্নবীর চোখের সামনে। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে খেয়ালই করছে না চারপাশের মানুষজন। কোনও আড়ম্বর আয়োজন নেই। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি নেই আকাশে-বাতাসে। এমনকি বিশাল সমুদ্রের মৃদু, ছল-ছল ঢেউয়ের শব্দও চাপা পড়ে গেছে কোলাহলে। খেলনা ভেঁপু বাজছে প্যাঁ-পোঁ। ঝুমঝুমির শব্দ। বাঁদর-নাচওয়ালার ডুগডুগির আওয়াজ। এই সব ছাপিয়ে হকারদের, স্টলওয়ালাদের চিৎকার। কুলপি, ভেলপুরি, পানিপুরি।

জাহ্নবী প্রায় কানের কাছে শুনতে পেল, 'সিং-চানা, মেমসাব—'

সামান্য চমকে, বিরক্ত মুখে প্রায় ধমক দিল সে বাদামওয়ালাকে।

'ননসেন্স। নেহি চাহিয়ে।'

কাগজের রঙিন ফুলে সাজানো ঘোড়ার গাড়ি ছুটে গেল সামনের বালির ওপর দিয়ে। একটা গোটা ফ্যামিলিই বোধহয় চড়ে বসেছে তাতে। বদখত চলনে দুটো উট দৌড়ে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। সওয়ারি পিঠে নিয়ে ঘোড়াদের ছুটোছুটি। এইসব বাধায় সমুদ্র আড়াল হয়ে যায়। সূর্যও কখন টুপ করে ডুবে গেল। শেষটুকু দেখা হল না জাহ্নবীর।

'দিদি, ঘোড়ায় চড়ব।'

শুকনো বালির ভেতরে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসে আছে জাহ্নবী। বেশ লাগে। ঈষদুষ্ণ আরামে ভারী মিষ্টি ওমভাব। জয়ীর গলা শুনে ফিরে তাকাল সে। পাশেই খেলছে তার ছোটভাই। সবে নয় পেরিয়েছে। বালি জড়ো করে-করে ঢিবি বানিয়েছে একটা। তার মাথায় গুঁজে দিয়েছে সরু কাঠি। আইসক্রিমের কাঠিটাই বোধহয়।

হাত ঝেড়ে উঠে এসে কাছে দাঁড়াল জয়ী। আবার বলল, 'একবার ঘোড়ায় চড়াও না, দিদি, প্লিজ—'

ওকে পাশে বসিয়ে মাথার চুলের বালি, কাঁধের কাছে জামায় লাগা বালি ঝাড়তে-ঝাড়তে জাহ্নবী বলল, 'এই তো, পরশুই তো ঘোড়ায় চড়লে বাপু।'

'তো কী হয়! ওটা তো ঘোড়া নয়, মিউল ছিল—'

কপট চোখ পাকিয়ে জাহ্নবী বলল, 'উঁহু! কী বলতে হয়?'

কলকাতা ছেড়ে এসে অবধি ভাষার ব্যাপারে সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে জয়ীর। ছোট তো! স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে ইংরিজি-হিন্দি বলতে-বলতে, বাংলাটা ধীরে-ধীরে কেমন পলিউটেড হয়ে যাচ্ছে। ভেবেই হাসি পেল জাহ্নবীর। অনেক বাংলা শব্দ তো ও নিজেও ভুলতে বসেছে! পলিউটেড মানে কী হবে—বিষাক্ত না দূষিত? তিন বছর সরাসরি কোনও যোগাযোগ নেই কলকাতার সঙ্গে। চিঠিপত্তরের সংখ্যাও কমে এসেছে দিন-দিন। অথচ, বম্বেতে এসে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না জাহ্নবী। বয়সের জন্যেই বোধহয় জয়ী এখানকার পড়শি, ক্লাসমেটদের দলে মিশে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। তবু দিদির সঙ্গে রোজ বিকেলে, বাড়ির কাছাকাছি এই জুহু বিচে এসে একটু ছোটাছুটি করে। শুকনো এবং ভেজা বালিতে। কখনও একদৌড়ে জল ছুঁয়ে ফিরে আসে। ভেবেচিন্তে বলল জয়ী, 'খচ্চর! কিন্তু ওটা তো খারাপ কথা, দিদি!'

জাহ্নবী হেসে ফেলল। ব্যস, সুযোগ পেয়ে ছোটভাই গলা জড়িয়ে ধরল দিদির। আবদারের গলায় বলল আবার, 'খালি এক রাউন্ড।' বলে, ডানদিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'দ্যাখো, দ্যাখো দিদি, একেবারে আসল ঘোড়া। পক্ষীরাজের মতো ছুটে আসছে—'

জাহ্নবী তাকিয়ে দেখল। উট, ঘোড়া, উটের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, শুদ্ধ বায়ুসেবনের জন্যে মানুষের ধীর গতির মধ্যে প্রায় বায়ুবেগে ছুটে আসছে ঘোড়াটা। জলের ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সমুদ্র থেকে উঠে আসছে যেন। জাহ্নবীর হঠাৎ উচ্চৈঃশ্রবার কথা মনে পড়ল। ঝকঝকে রঙিন যাত্রার পোশাকে সজ্জিত ঘোড়সওয়ার ঝুঁকে রয়েছে সামনে। লাফিয়ে-লাফিয়ে রাজসিক ভঙ্গিতে বাঁ-দিকে চলে যাচ্ছে ছুটে।

ভাঁটার টানে জল এখন নেমে গেছে প্রায় দেড়শো-দুশো ফিট নীচে। বালির চরিত্র এখন তিনরকম। জলের ঢেউ আসছে যদ্দুর, তদ্দুর নরম, ভেজা আর চকচকে। তারপর, ক্রমে এগিয়ে আসছে শক্ত, আধো-ভেজা এবং সবশেষে এদিকে শুকনো ফুরফুরে বালি—যা দিয়ে পাহাড় বানিয়েছে জয়ী।

জাহ্নবীর পিঠের দিকে সিটিজেন হোটেল। তারপর বাঁ-দিকে মাঝারি দু-তিনটে হোটেলের পিছন দিকের দেওয়াল। হোটেল সি প্রিন্সেস। পাম গ্রোভ, জুহু হোটেলের পিছন-দেওয়াল শুরু হয় স্টলের ভিড় ছাড়িয়ে। আরও উত্তরে সেন্টুর সান-এন-স্যান্ড হলিডে ইন। এই সমস্ত হোটেলের পশ্চিমে সমুদ্রের জল বা তটভূমি। পুবে লাগোয়া টানা সদর রাস্তা। জুহু তারা রোড।

বড় রাস্তা ও সি-বিচের মধ্যে যাতায়াতের জন্যে কয়েকটি গলি রয়েছে। নামবিহীন, দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও বেশ চওড়া। দুটি মারুতি বা অ্যামবাসাডার অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারে। পিচ-ঢালা গলিপথগুলি সামান্য ঢালু হতে-হতে হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে সমুদ্রসৈকতের বালিতে।

জয়ী আর জাহ্নবী রোজই উত্তরের শেষ গলিটি দিয়ে নেমে আসে বালিতে। ফিরে যাওয়ারও একই পথ। সাদা ঘোড়াটার দূরে চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে উঠে দাঁড়াল জাহ্নবী। ঘোর হয়ে আসছে। জয়ীকে বলল, 'ও-ঘোড়া ভাড়ায় চড়তে দেওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই নয়।'

'তবে?' বালির দুই হাত প্যান্টে ঝাড়তে-ঝাড়তে জয়ীর প্রশ্ন।

'হয়তো কারুর পার্সোনাল, ইয়ে,—মানে, নিজের ঘোড়া। হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে এসেছে!'

'তা হলে, অন্য যে-কোনও ঘোড়াই চলবে। একবারটি চড়াও না, দি!' সেই প্রথম কথা বলতে পারার সময় থেকেই জয়ী তার দিদিকে স্রেফ একটা 'দি করেই ডাকে। সেই ছোট্ট জয়ীর মুখে একসঙ্গে পরপর দুটো 'দি' জড়িয়ে যেত।

ভাইয়ের দিকে ঘুরে সামান্য ঝুঁকে পড়ল জাহ্নবী। ওর চিবুক নেড়ে-নেড়ে হাসিমুখে বলল, 'আজ আর হবে না, খোকাবাবু। দেখছ না, সন্ধে হয়ে গেছে। কাল দেখা যাবে।'

ভাইবোন হাত ধরাধরি করে প্রথমে সোজা জলের দিকে হাঁটতে লাগল। খানিক দূরে বাঁ-দিকে চোখ যেতেই জাহ্নবী দেখল সিটিজেন হোটেলের দেওয়ালের শেষ প্রান্তে শুকনো বালির ওপর ছোটখাটো একটি জটলা। এ ছাড়া, লোকজনের ভিড় আস্তে-আস্তে হালকা হয়ে আসছে। কাছেই শ্রীমান ভুট্টাওয়ালা বসে-বসে ভুট্টা সেঁকছে। গাঢ় নীল রংয়ের উর্দি পরে সেপাইমশাই ভুট্টা চিবোতে ব্যস্ত। দু-হাতে ধরে নিবিষ্ট মনে। আয়েশে প্রায় বুজে আসছে চোখদুটো। এইসব চানাচুর-ভুট্টা-বাদামভাজা কি আর এরা নগদ পয়সা দিয়ে খায়? ভাবতে-ভাবতে জাহ্নবী জিগ্যেস করল, 'হাবিলদার সাহাব, উধার কেয়া হো রহা হ্যয়?

এখানকার কনস্টেবলদের হাবিলদার ডাকলে খুশি হয়। ভুট্টার দানা চিবোতে-চিবোতে সেপাই বলল, 'ফিল্মমকা শুটিং-বুটিং হোগা, আউর ক্যা।'

'কউনসা ফিল্ম?'

'কেয়া মালুম?—' বলে, আবার ভুট্টা আক্রমণ।

হাঁটতে-হাঁটতে জল অবধি পৌঁছে গেল ওরা। এবার দিগন্ত রেখার সঙ্গে সমান্তরাল হাঁটবে দুজনে। রোজকার মতো। কখনও পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে, কখনও সপসপে ভেজা বালির ওপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে সোজা দক্ষিণ দিকে রওনা হল। ওদিককার শেষ গলি দিয়ে সদর রাস্তায় পড়লেই, বাড়ি পৌঁছতে মিনিট দশেক।

জুহু বিচের এদিকে সরকারি বাতির ব্যবস্থা নেই। থাকলেও সমুদ্রের অন্ধকারে বুদবুদের মতো জ্বলে। হোটেলগুলোর পিছনদিক বলে, স্রেফ জানালার ক্ষীণ আলো দেখা যায়। ফেরিওয়ালাদের স্টলের আলো, ভাজাভুজির গন্ধ, কোলাহল ক্রমে পিছিয়ে পড়ছে।

জয়ী বারবার ঘুরে দেখছে বাঁ-দিকে। দুটি লন্ঠন-টর্চের আলোয় শুটিংয়ের ভিড়টি। জাহ্নবীর

দেখে মনে হল, কমপক্ষে জনা পনেরো-কুড়ি মানুষ। একজনের কাঁধে ক্যামরাই বোধহয়। দু-তিন জন আলোর স্ট্যান্ড ঠিক করছে। খুদে জেনারেটরের পাশে ভূতের মতো বসে একজন। এরা ব্যস্ত। কলাকুশলী হবে। বাকি সব দর্শকের ভূমিকায়। পথ-চলতি, হাওয়া খেতে-আসা মানুষজন, ভিখিরি-টাইপের ছেলেপিলে—সবাই মজা দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

প্রায় কালো সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল জাহ্নবী। আরও একবার ওর মনে হল—বড় শান্ত বম্বের এই আরবসাগর। পুরীর বঙ্গোপসাগরের মতো মোটেই উত্তাল নয়। কোনও গর্জন নেই। ভরা জোয়ারের উচ্ছ্বাসের প্রকাশ বড়জোর একটু ছলাত-ছলাত। উলটোদিক থেকে একটা উটের গাড়ি ফিরে আসছে। লগবগ লগরবগর। এটাই বোধহয় আজকের শেষ ট্রিপ। ওটার পিছনে দেখা গেল রাজকীয় ভঙ্গিতে ছুটে আসছে সাদা ঘোড়া। উটের গাড়ি ও ভাইবোনদের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে পিছনে চলে গেল তীরবেগে। বাতাসের ঝাপটাতেই হোক বা দাপটের ভয়ে চমকে আরও খানিক পশ্চিমে, জলের দিকে সরে হাঁটতে লাগল ওরা।

জয়ী বলল, 'কী দারুণ ঘোড়া, না দি? একেবারে রানা প্রতাপের চৈতকের মতো।'

জাহ্নবী মজা করার জন্যেই বলল, 'তা হলে যে-লোকটা ঝকমকে পোশাক পরে ওর পিঠে বসে আছে, সে তো রানা প্রতাপ! কী বলিস?'

'ধ্যাত! রানা প্রতাপের দাড়ি আছে নাকি? এ তো মোঘলদের সেনাপতি-টতি কেউ হবে—'

রানা প্রতাপ বা মোঘল সেনাপতি নয়। ফিল্ম লাইনের ট্রেইনড তুখোড় ঘোড়া জুবিলির পিঠে বসে রয়েছে আনোয়ার। দামি এবং নামী স্ট্যান্টম্যান। জিপ, ট্রাক, মোটর-বাইক, ঘোড়া চালিয়ে দমবন্ধ স্টান্ট দৃশ্যের জন্যে ওর নাম প্রথম সারিতে। দৈনিক 'রেট' বেশ ভালো। তবে মাসে দু-দিন-চারদিন, বড়জোর ছ'দিন কাজ জোটে বায়োস্কোপের শুটিংয়ে। ববি ফিচার্ডোর মতো আন্ডার-ওয়ার্লড মস্তান বা 'দাদা'দের কাছ থেকে ডাক আসে। সামান্য খুচরো কাজের বদলে তিন-চারগুণ বেশি রোজগার হয়ে যায়। মাঝে-মাঝে অবিশ্যি পুলিশের ঝামেলার ভয় থাকে। ভাড়া করা গোঁফ-দাড়িতে মুখ আড়াল করে নেওয়াই রীতি।

টার্গেটকে পিছনে ফেলে হলিডে ইন-এর দিকে ছুটছে আনোয়ার। ছ-সাত রাউন্ড দেওয়া হয়ে গেছে। লাইট জ্বলেনি তখনও। ববি বলেছিল, 'ঠিক সময় বুঝে, জায়গা মতো ফোকাস জ্বলবে। টার্গেট তখন লাইট-জোনের মধ্যেই থাকবে। দু-চার সেকেন্ডের মধ্যেই কাজ হাসিল করতে হবে তোমাকে।—'

কিন্তু কখন লাইট জ্বলবে? কতক্ষণ? আর কতক্ষণ? ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে বারবার ঘুরে দেখছে সে। অস্থির চোখে উত্তেজনা আর প্রতীক্ষা।

ক্লান্ত ঢেউয়ের শেষ জলে এবং ফেনায় বারবার ডুবে যাচ্ছে ওদের পায়ের পাতা। জয়ী হঠাৎ হঠাৎ পা দিয়ে জল ছেটাচ্ছে। বাতাসের ধাক্কায় জলকণা ফিরে আসছে গায়ে। জাহ্নবী বলল, 'ব্যস! আর নয়। এবার হাত ধরে হাঁটো।'

এখানে ঝিনুক নেই। বাতাসে নোনা গন্ধ। কী একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়তেই, ঝুঁকে সেটাকে তুলে ফেলল জয়ী। একটা আধুলি। কেউ সমুদ্রকে দান করেছে প্রণামসমেত। জাহ্নবী তাড়াতাড়ি বলল, 'ফেলে দে। ফ্যাল শিগগির। অন্যের ছোঁড়া পয়সা কুড়োতে নেই।—'

জয়ী আধুলিটা জোরে জলের দিকে ছুঁড়তেই, হঠাৎ সার্চলাইটের আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের চোখে, মুখে, শরীরে। চমকে, বাঁ-দিকে দেখল ওরা। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। প্রথমে কিছুই ঠাহর হয় না। ভাইয়ের হাত ধরে জাহ্নবী বলল, 'শিগগির চল। শুটিং আরম্ভ হয়েছে বোধহয়। দৌড়ে আলোর বাইরে চলে য।' বলে, দ্রুত পা চালাল সে, যাতে আলোর গণ্ডির থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। দু-পা হাঁটতেই চোখ সয়ে যাচ্ছে। বাঁ-দিকের সেই ফিল্মি-জটলার ওখানেই দুটো আলোর স্ট্যান্ড

আবছা দেখতে পেল জাহ্নবী।

জয়ী ততক্ষণে দিদির হাত ছাড়িয়ে ছুট দিয়েছে সোজা। হাঁটু অবধি ভেজা শাড়ি লেপটে যাচ্ছে পায়ে। সামলে-সুমলে যতটা সম্ভব জোর কদমে হাঁটছে জাহ্নবী। মনে-মনে ভাবছে—ইশ। ছি-ছি কী লজ্জা। ওদিকে দাঁড়ানো সমস্ত লোকগুলো নিশ্চয়ই ড্যাবডেবে চোখে দেখছে আমায়। যেন প্রায় ধমক দিয়ে উড়ু-উড়ু আঁচলকে কাঁধে-পিঠে জড়িয়ে নিল সে। আলোর সীমানা পেরিয়ে গেছে জয়ী।

ঠিক তক্ষুনি পিছন দিকে খপাখপ-খপাখপ শব্দ। জাহ্নবী ফিরে দেখতে গিয়ে পলকের জন্যে টের পেল অতিকায় ঘোড়াটা দুদ্দাড় করে প্রায় তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে। ভয়ে, জলের দিকে সরে যাওয়ার আগেই ঘটে গেল কাণ্ডটা। কিছুই বুঝে উঠতে পারল না জাহ্নবী। দুরন্ত ঘোড়সওয়ার সামান্য ঝুঁকে শক্ত ডানহাতে শূন্যে তুলে নিল ওকে। কী একটা চিৎকার করল সে। বোধহয় জয়ীর নাম ধরে ডাকল। অথবা, 'বাঁচাও—', না কি—, 'ও মাগো—'

ঠিক কী বলল জাহ্নবী নিজেও জানে না। সমুদ্রের বাতাস গিলে ফেলল অক্ষরগুলি। সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে নাকে। নেশার ভাব।

দিদির গলার অর্থহীন চিৎকার ক্ষীণ হয়ে পৌঁছেছে জয়ীর চেতনায়। ছুটতে-ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ফিরে দেখল, ঘোড়ায় বসা লোকটা দিদিকে তুলে নিয়েছে শূন্যে। উজ্জ্বল ফোকাসের আলোয় হাত-পা ছুঁড়ছে দিদি। শাড়ির আঁচল উড়তে-উড়তে শাঁ করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

কিছু না-বুঝেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল জয়ী, 'দি—ই-ই—'

ভিডিও ক্যামেরায় লুক-থ্রু করছিল শ্রীনিবাস। ওরই ক্যামেরা। ক্যামেরায় রোল-টোল কিছু নেই। বোতাম টিপলে ঘর-র-র শব্দ চলতে থাকে। পাশে দাঁড়ানো ববি ফিচার্ডো চাপা গলায় বলল, 'ভিড় খেদিয়ে কেটে পড়ো তোমরা।' তারপরেই যেন, সমবেত জনতাকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কাট ইট। ও-কে। লাইটস অফ।'

অর্ডার দিয়েই, বিশাল বপু নিয়ে ছোঁড়াটার দিকে ছুটে চলল ববি। ওর পিছন-পিছন গুটিকয়েক ছেলে-ছোকরা দৌড়ে গেল। জয়ীও ভয়ে দিশেহারা হয়ে টালমাটাল ছুটছে—অন্ধকারে অদৃশ্য ঘোড়ার পিছনে। নারকোলের খোলা বা পাথর জাতীয় কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল জয়ী। পড়েই, কেঁদে ফেলল, 'দি—ই—ই—'

ববি পৌঁছে গেল কাছে। হাত ধরে ওকে টেনে তুলতে-তুলতে বলল, ভারী বিশ্বাসী নরম গলায়, 'কাম অন—বিগ বয়। ভয় নেই। উ-ই যে দূরে শেষ গলির আলো দেখা যাচ্ছে ওইখানে নিয়ে গেছে তোমার দিদিকে—চলো, দৌড়োও—লেট আস গেট দেয়ার—'

বলে, পেছন ফিরে অনুধাবনকারীদের উদ্দেশে চেঁচাল সে, প্রায় ধমকের সুরেই, 'ভাগো ইধারসে। দেখছ না, বাচ্চা ছেলে ভয় পেয়েছে। যাও, যাও, বাড়ি যাও। শুটিং খতম। ভাগো—'

ওরা থমকে দাঁড়াল। দু-একজনের আওয়াজ শোনা গেল ঃ

'কী ছবির শুটিং, সাব?'

'সিরিয়ালের নাম কী?'

'কবে দেখাবে টিভিতে?'

জয়ীর হাত ধরে শেষ গলিটির দিকে ছুটতে-ছুটতে ববি পিছনে ছুড়ে দিল, 'ভাগম ভাগ।'

ছোট দলটা দু-হাত তুলে নাচতে-নাচতে ফিরে যাচ্ছে স্টলগুলোর দিকে, 'ভাগম ভাগ—ভাগম ভাগ—।'

গাঢ় নীল মার্সিডিস ইঞ্জিন চালু করে অপেক্ষা করছিল। আনোয়ার এবং জেজে ধরাধরি করে অজ্ঞান জাহ্নবীকে পিছনের সিটে শুইয়ে দিল। ড্রাইভারের পাশে বসে জেজে বলল, 'চলো। জলদি।'

দরজা বন্ধ করতে যাবে, ববির গলা শুনল, 'জেজে—ফেউটাকে কী করবে?'

'তোমার গাড়িতে তুলে নিয়ে, আমায় "ফলো" করো।—'

বলেই, ঝপ করে দরজা বন্ধ করে দিল জেজে। হুশ করে গলি বেয়ে উঠে গেল মার্সিডিস! ববির কালো কন্টেসা পাশেই দাঁড়ানো। ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ হচ্ছে। জয়ীকে নিয়ে পিছনে বসতে-বসতে অভয় দিল ববি, 'ওই তো। সামনের গাড়িটায় তোলা হয়েছে তোমার সিস্টারকে। এক্ষুনি ধরে ফেলছি।'

॥ তিন ॥

দেখে অবাক হওয়ার মতোই মস্ত গাড়িখানা। বিশেষ করে এমন বেঁটে রাস্তায়। ছোটখাটো একটা গাঢ় নীল রঙের জাহাজ যেন উঠে এল জুহুর সমুদ্র থেকে এই গলিতে। মাদলের হাঁ চোখের সামনে দিয়ে হুশ করে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কালচে রোদ-চশমার মতো বাঁ-দিকের কাচ নেমে এল অর্ধেকটা। ফরসা চৌকো মুখের তীক্ষ্ণ চোখজোড়া ঘুরে-ঘুরে দেখল ছবিগুলো। পিছনের দেওয়ালে দড়িতে টাঙানো ঘোড়া, মোনালিসা, ফুল, সমুদ্রের নৌকা অল্প বাতাসে দুলছে। নীচে রাস্তায় লাল প্ল্যাসটিকের শিটের ওপরে ছোট-ছোট নুড়ি দিয়ে চাপা নারকেল গাছের সারি, সারকাসের ক্লাউন, গরুর গাড়ির রঙিন ছবিগুলি দেখতে-দেখতে মুখের মালিক চোখের ইশারায় মাদলকে ডাকল। শুধু মাদল নয়। এ-ধারের সবাই গোল চোখে গাড়ি এবং জানালার মুণ্ডুটি দেখছিল।

গ্যাস-বেলুনওয়ালা হরকিশান চাপা উত্তেজিত গলায় তাড়া দিল, 'হেই মাধো। জলদি যা। সাব বুলাতা হ্যয়।'

গত পনেরো দিন থেকে এ-রাজ্যের রাস্তায় নেমে মাদল বসু 'মাধো' হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির মালিক বড়লোক নিঃসন্দেহে। ছবি কিনবে নাকি? না, মাদলের পনেরো দিনের প্রতীক্ষার দেওয়ালে ফাটল ধরল? ভাবতে-ভাবতে তড়িঘড়ি উঠে এগিয়ে এল লোকটির মুখের কাছে।

'ইয়ে সব পিকচার তুম বনায়ে?'

'জী হাঁ।' হিন্দিতে জবাব দিয়ে গাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল মাদল। কী আছে? গাঢ় কাচের ফাঁক দিয়ে, ওপাশে চালককে দেখা যাচ্ছে।

'আমার জন্যে ছবি আঁকতে পারবে?'

'ইয়েস স্যার। কী ছবি বলুন?'

কথা বলতে-বলতে চঞ্চল চোখে গাড়ির পিছনের সিট দেখার চেষ্টা করছে মাদল।

'বড়-বড় ছবি। অয়েল পেইন্টিং?' লোকটি জানাল।

উঁহু, কেউ বসে নেই বোধহয়। খালি?

'ক্যানভাস নেই হ্যয়, সাব। কালার বহুত দাম।'

হাসল মাদল। হেসে, চোখ পিছলে সরিয়ে গাঢ় কাচ ভেদ করতে চাইল। কেউ শুয়ে আছে নাকি? কোনও মহিলা? শাড়ি অথবা গাউন! অসুস্থ কেউ?

'ও সবের চিন্তা করতে হবে না।'

আরও দু-তিনজন এগিয়ে এসেছে পায়ে-পায়ে। বাদাম, বেলুন, ভুট্টাওয়ালা। ঝকঝকে মস্ত গাড়ির মালিক 'কাল-কা-ছোকরা' এই মাধোর সঙ্গে কী কথা বলছে? কৌতূহল হতেই পারে। কখন হকারদের মস্তান জগগুদাদাও এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে ইশারায় ডাকল গাড়ির লোকটি। মাদলের প্রায় গায়ে-গায়ে এসে দাঁড়াল জগগুদাদা। লোকটি খাটো গলায় বলল, 'জগগু। রাত দশটায় এই ছোকরাকে ওয়ালকেশ্বরের গেটে দরোয়ানের কাছে পৌঁছে দিবি।'

সেলাম ঠুকে, কৃতার্থ গলায় জগগু বলল, 'জী, বস!'

ইঞ্জিন চালু ছিল। সড়াত করে জানালার কাচ উঠে লোকটির মুখ আড়াল হয়ে গেল। হুশ

করে বেরিয়ে গেল মার্সিডিস। সদর রাস্তার ডানদিকে ঘুরে উধাও।

ছোট্ট জটলাটি পাতলা করে সবাই ফিরে যাচ্ছে যে যার জায়গায়। মাদলের মাথার পিছনে আলতো চাঁটি মেরে জগ্‌গু বলল, 'হেই স্‌শালা। ঠিক নও বাজে তৈয়ার রহনা। ওহাঁ পহুঁচনেমে টেইম লাগতা।'

মাদল দ্রুত ভাবছিল। লোকটা কে, মস্তানদের হোমরাচোমরা কেউ? গাড়ির পিছনে কে শুয়েছিল? হয়তো খুবই সাধারণ ব্যাপার। বিচে বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে কেউ। তাকে পিছনের সিটে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। হেলাফেলার নিত্যি-দেখা গাড়ি ফিয়াট-অ্যাম্বাসাডার হলে মাদল কিছুই ভাবত না হয়তো। কিন্তু অমন গাড়ি! তার মালিক আবার জগ্‌গুকে চেনে। শুধু চেনে নয়, জগ্‌গুকে হুকুম দিয়ে চলে যায়। ব্যাপারটা কি স্রেফ সাধারণ ঘটনা হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া চলে?

ভাজা-মাছ উলটে-খেতে-জানে-না মুখ বানিয়ে মাদল জিগ্যেস করল, 'জগ্‌গুদাদা, উও সাহাব কউন থে?'

তক্ষুনি সমুদ্রের অন্ধকার দিক থেকে আরও-একখানা গাড়িকে উঠে আসতে দেখল মাদল। আধ মিনিটও হয়নি মার্সিডিসটা বেরিয়ে গেছে। এবারেও হেঁজিপেঁজি মডেল নয়। কন্টেসা। রাস্তার নিয়ন আলো পিছলে যাচ্ছে তকতকে কালো রঙের বডিতে। ওরা দুজনে রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির স্পিড দেখে দ্রুত সরে এল পাশে। কন্টেসা দাঁড়াল। স্বচ্ছ কাচের জানালায় দুটি মুখ দেখা গেল সামনে এবং পিছনে। সামনেরটিকে একটি মিশকালো জলহস্তীর মুখ বলা চলে। পিছনে কচি একটা বাচ্চা। ভিতরে কাচের গায়ে নাক থেবড়ে হাঁ করে বোধহয় কাঁদছে বা চেঁচাচ্ছে। দুটি খুদে হাত কাচের গায়ে চাপড়াচ্ছে।

কাচ বন্ধ, সাউন্ডপ্রুফ গাড়ির ভেতর থেকেও কি আবছা চিৎকার শুনল মাদল? নাকি, মনের ভুল! গাড়িটা সদর রাস্তায় বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হতেই মাদল দেখল, জগ্‌গুর ভুরু সামান্য কুঁচকোনো।

'এ-গাড়িটায় আবার কে গেল, জগ্‌গুদাদা? একেও চেনো নাকি তুমি?

মাদলের গলা শুনে ওর দিকে ফিরতেই কুঞ্চিত ভ্রূ স্বাভাবিক করে জগ্‌গু রুক্ষ গলায় জবাব দিল, 'অত কথার দরকার নেই তোর। তোর ফোটু বেচবি, মাল কামাবি, হপ্তা দিবি—ব্যস, ফুরিয়ে গেল ঝামেলা। যা ভাগ—বোস গে যা জায়গায়। আমি ঘুরে আসছি। ঠিক ন'টায়।'

বলতে-বলতে, মোড় ঘুরে এগিয়ে গেল জগ্‌গু। আড্ডায় চোলাই খেতেই বোধহয়। মাদল লক্ষ করল, ওর মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে আবার।

বাচ্চা ছেলেটার মুখ মনের পরদায় ভেসে উঠল মাদলের। এ কী? মুখটি কোথাও যেন দেখেছে। সঙ্গে-সঙ্গে মাথার ভিতরে লন্ডভন্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। স্মৃতি তোলপাড় করে খুঁজতে লেগে গেল সে। কোথায় দেখেছে? কোনও ছবিতে কি? নাকি, সত্যকাকুর আপিসে কাজের সময় ওই মুখের ছবি সে নিজে হাতে এঁকেছে? চব্বিশ বছরের মাদল বসু গোয়েন্দা নয়, তবে দস্যু মোহন থেকে নিয়ে ব্যোমকেশ-ফেলুদা, হওয়ার নেশায় সেই ছোটবেলা থেকে পাগল। ছবি এঁকে সামান্য রোজগার হয় বটে, তবে, সে তো পাশ-করা শিল্পীও নয়। আর্ট কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের মাথায় বাবার মৃত্যুর পর কলেজ ছাড়তে হল। ছাড়তে হল কলকাতা। সাত বছর আগে পিতৃবন্ধু সত্যকাকুর কাছে এসে উঠেছিল। তাঁর আপিসেই ফুরনে কাজ করে কয়েক ঘণ্টা। ভারী বিচিত্র সে কাজ। মুখ আঁকতে হয়। মৃত মানুষের মুখ। হত্যাকারী বা 'ওয়ান্টেড' মুখ। আগুনে পোড়া ঝলসানো বা জখম মুখ। কখনও প্রোফাইল থেকে 'ফ্রন্ট', কখনও বা ফ্রন্ট-ফেস দেখে প্রোফাইল। তা ছাড়া, পলাতক মুখ অসংখ্য এঁকেছে মাদল। এদেরই ভিড়ে কি কোথাও সে দেখেছে ছেলেটিকে? কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না।

ডবল-হাফ জাতীয় আধা-গেলাস চা-কে এ-রাজ্যে বলে কাটিং। নিত্যিকার মতো মোড়ের ভাইয়াজি কাটিং নিয়ে এল। তার মানে, এখন সন্ধে আটটা হবে। নিজের ছবির পাশ দিয়ে এসে

দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়েছিল মাদল। উবু হয়ে বসে ঘাড়ের গামছায় মুখ মুছল ভাইয়াজি। গেলাসটা মাদলকে ধরিয়ে জিগ্যেস করল, 'কা হুয়া, বাব্বুয়া? উ মোটরওয়ালা সাহাব কা কহতান?'

মুখের ভিড় মাথার থেকে সরিয়ে মাদল হাসল। চায়ে হুস করে চুমুক দিয়ে বলল, 'তেমন কিছু না, ভাইয়াজি! সায়েবের বাড়িতে গিয়ে বোধহয় বড় ছবি আঁকার অর্ডার পাব।'

'ই তো বহুত খুশ খবর, বাব্বুয়া—' বলে, ট্যাঁক থেকে চুন-খৈনির ডিবে বের করল। বয়েস ভাইয়াজির কম করে ষাট। বেশ শক্ত চেহারা। টাক মাথা। তোবড়ানো চোয়ালের অর্ধেক ঢাকা পড়েছে মস্ত একজোড়া গোঁফে। মানুষটা ভালো। খৈনি জিভের তলায় পুরে, গলা খাটো করে বলল, 'তবে একটু হুঁশে থেকো, বাব্বু। সাহাব জগগুর চেনাশোনা। জগগু যে কেমন ট্যারা আদমি তা তো জানোই। উ বদমাশের জুয়ার আড্ডা, চোলাই-কারবার আছে শুনেছি। খুন-টুনও যে করেনি, কে বলবে!'

এখানে এসে বসার প্রথম দিনই ভাইয়াজির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল মাদল। সেই দিনই আকারে-ইঙ্গিতে ফেরিওলাদের কে কেমন, জগগু কী জিনিস—এসব আন্দাজ দিয়েছিল ভাইয়াজি।

'ওর সঙ্গে পুলিশের লোকেরও দোস্তি আছে। একটু সামলে-সুমলে মিশো। রাস্তায় ফিরিওলাদের ভালোমন্দও ও-ই দেখে। "হপ্তা" পেলেই খুশি।'

আজকে নিয়ে ঠিক বারো দিন হল মাদল এখানে এসে বসছে। সারাদিন নয়। দুপুরে রোদের তেজ কমলে আসে। নিজের আঁকা ছবি সাজিয়ে বসে থাকে সেই রাত সাড়ে-আটটা ন'টা অবধি। 'লিডো' সিনেমার পর উত্তরে হোটেলগুলোর দিকে জুহু-তারা রোড ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। কয়েক পা এগোলেই প্রথম বাঁ-হাতি এই গলির মুখে ফিরিওলাদের অস্থায়ী দোকান-পাট। ভাইয়াজির চা-বিস্কুট, গণপতের চাকাওলা মনোহারি পসরা, ডাব, বাদাম, কাচের চুড়ি, ঝুমঝুমি-খেলনা, ফুচকা এই সব।

এখানে এসে বসার কারণ ঘটেছিল প্রায় মাসখানেক আগে। সেদিন একটাই ফোটো ছিল। দুর্ঘটনায় বাঁ-দিকের গাল থেঁতলানো যুবকের ছবি। সত্যকাকুর আপিস সি-আই-ই অর্থাৎ চ্যানেল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে নিদেন ছ-সাতটা এমনি মুখ আঁকতে হয় হপ্তায়। জখম মুখটা টেবিলের ড্রয়িং বোর্ডে ফেলে সত্যকাকু বলেছিলেন, 'একটু তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক মুখটা বানিয়ে দাও। মধুকর পাঠিয়েছে। টেলিফোনও করেছে দুবার।'

বলতে-বলতে সি-আই-ডি ইনস্পেক্টর মধুকর সাঠে এসে ঢুকেছিলেন, 'কই, সাধনকর? হয়েছে ছবিটা?'

কাকুর পুরো নাম সত্যসাধন কর। মারাঠি উপাধি বেশিরভাগই, 'কর' দিয়ে শেষ হয়। উপসিকর, তুলসকর, ভোগলেকর—এমনি সব। তা, এ-রাজ্যে সত্যকাকুও 'সাধনকর' নামে পরিচিত। উনি বললেন, 'এক্ষুনি হয়ে যাবে। বসো, বসো। চা খাবে তো?'

বলে নিজের টেবিলে বসে বোতাম টিপলেন সত্যকাকু। মুখেও হাঁক দিলেন, 'সখারাম।'

দরজা ঠেলে সখা মুখ বাড়াতেই অর্ডার দিলেন, 'তিনটে চা। স্পেশাল আনবি।'

উলটোদিকের চেয়ারে বসতে-বসতে সাঠে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথাও ছিল—'

মাদল, নিজের টেবিল থেকে চোখ না সরিয়েও টের পেল সাঠে ওর দিকে ইশারা করে বললেন কথাগুলি। সঙ্গে-সঙ্গে সত্যকাকু বললেন, 'আহা, তুমি তো ওকে দেখেছ। চেনো। ও-ই তো এখানকার ছবি-টবিগুলো আঁকে, ফোটো ডেভলাপ করে দ্যায়, রি-টাচ করে। আমার দাদা-তুল্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে। নিজের ভাইপোর মতোই বলতে পার। নির্দ্বিধায় বলো, কী ব্যাপার?'

তবু একটু গলা খাটো করেই কথা বলতে শুরু করলেন সাঠে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত শব্দহীন ঘরে ফিসফিসে কথাও স্পষ্ট শোনা যায়। নিজের কাজ করতে-করতে প্রায় সমস্ত ব্যাপারটাই

শুনল মাদল।

বম্বেতে স্মাগলার-মাফিয়াদের গোটা তিনেক বড় গ্যাং আন্ডারওয়ার্লডে দাপিয়ে বেড়ায়। সেই পাতালপুরীর সবচেয়ে শক্তিশালী এখন গাজি কাপ্তানের দল। কাপ্তান নিজে গত তিন-চার বছর ধরে দুবাইতে ঘাঁটি নিয়ে আছে। সেখান থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলির কয়েকটির সঙ্গে ড্রাগস-সোনা ইত্যাদির ফলাও স্মাগলিংয়ের কলকাঠি নাড়ে। ভারতবর্ষের মূল ঘাঁটি বোম্বাই। নানান চোরাপথে ওই সব মাল আসে এবং যায়। হালে, ছোট-ছোট ছেলেদের ধরে বা সস্তায় কিনে নিয়ে গিয়ে উট-দৌড়ের সওয়ার হিসেবে চালানও দিচ্ছে।

'একেবারে জেরবার হয়ে গেলুম, ভাই। ভারসোবা, মাঢ আইল্যান্ড, গোরাই, ডক, এয়ারপোর্টের নানান পকেট থেকে মাল পাচার হচ্ছে।'

সখারাম চা দিয়ে গেল সবাইকে। ও বেরিয়ে যেতেই এতক্ষণে সত্যকাকু কথা বললেন, 'এ সবই তো পুরোনো খবর। গত একমাসে তোমাদের দুজন সৎ এবং সাহসী সাব-ইন্সপেক্টর ও ছ'টি কনস্টেবল মারা গেছে এনকাউন্টারে। তা এসব ব্যাপারে আমরা চুনোপুঁটি, তোমার জন্যে কী করতে পারি, বলো?'

চায়ে চুমুক দিয়ে সাঠে বললেন, 'বিনয়ের অবতার! তুমি চুনোপুঁটি নও বলেই তো তোমাকে শ্রদ্ধা করি।'

'তুমি করলে কী হবে। তোমার ডিপার্টমেন্টের বহু কত্তারই আমি দু-চক্ষের বিষ।'

হাসতে লাগলেন সাঠে। হাসতে-হাসতেই বললেন, 'আসলে তোমরা, মানে, প্রাইভেট গোয়েন্দারা যদি আমাদের কাজ কমিয়ে দাও, তো আমাদের চাকরি যাওয়ার ভয় আছে না!'

সত্যকাকুর বয়েস চল্লিশের ভারী দিকে। সাঠের কম করে পঞ্চান্ন। প্রফেশনাল জেলাসি বয়েসের ফারাক ইত্যাদি থাকলেও দু-জনের দোস্তি যথেষ্ট পুরোনো।

হাসি থামিয়ে আসল কথা বললেন মধুকর, 'আমাদের ইনফরমাররা বেতনভুক নয়। তা ছাড়া, নীচু পোস্টের কর্মচারীরা সবাই তো আর তেমন বিশ্বস্ত হয় না। সাধনকর, তোমাদের চ্যানেলের দু-চারজন যদি লাগিয়ে দিতে পার, তাহলে, কিছু হদিশ মেলা সম্ভব। উপকারটুকু করবে, ব্রাদার?'

পুলিশ, তথা, সাঠের সাহায্য ছাড়া বহু-কেসের সুরাহা সি-আই-এ করতে পারত না। সুযোগ-সুবিধে, ভাব-ভালোবাসার আদান-প্রদান অলিখিতভাবে দু-পক্ষের মধ্যেই রয়েছে।

বাঁ-দিকের চোখের মণিটা ডানদিকের আধবোজা চোখ থেকে আন্দাজ করে আরও একটু গাঢ় করে দিল মাদল। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে মুখটা। শুনল, সত্যকাকু বলছেন, 'দ্যাখো সাঠে। দুজন লোক এখন মোটামুটি ফ্রি আছে। ভারসোবা, গোরাই বিচে লাগাতে পারি।'

সাঠের গলা, 'লিংকিং রোড, জুহু বিচেও পকেটের খবর আছে। তার কী করা যায়?'

'আপাতত দুটো মেইন স্পটে দুজন লাগাচ্ছি কাল থেকেই। বাকি এ-সপ্তাহেই তোমাকে জানাব।'

'থ্যাংক ইউ সো মাচ!'

বলে, উঠে দাঁড়িয়েই গলা তুলে হাঁক ছাড়লেন মধুকর। 'কোথায় হে, ছবি হল? কী নাম যেন—'

এবারে আসল পুলিশি গলা। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এল মাদল। হাতের ফোটো এবং ওর আঁকা মুখ এগিয়ে দিতে গিয়ে, নাম বলতে যাচ্ছিল সে, শুনল, 'মনে পড়েছে! বাদল! কারেক্ট?'

মাদল একটু হেসে বলে ফেললে, 'প্রায় কারেক্ট।'

ছবি মেলাতে-মেলাতে সাঠে বললেন, 'মানে?'

হো-হো করে হেসে ফেলেছেন কাকু। বললেন, 'স্রেফ ওই "ব"য়ের বদলে "ম" হবে।'

'ও।' বলে, তারিফ করলেন মাদলের, 'খাসা হয়েছে। থ্যাংকস।'

সত্যকাকুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে যেতেই মাদল ওঁর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টেবিলের ওপরকার কাচের কোনা খুঁটতে-খুঁটতে বলল, 'কাকু, আপনি গ্রিন সিগন্যাল দিলে, আমি একটা চান্স নিতে পারি।'

ফরসা, চওড়া কপালে ভাঁজ পড়ল। চোখ তুলে সত্যকাকু জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপারে?'

'জুহু বিচে আমার ঘোরা-ফেরা আছে। ও-অঞ্চলে আমি একটু নজর রাখতে পাবি।'

'তুমি?' কাকু সত্যিই অবাক।

'হুঁ।' সঙ্কোচের সঙ্গে ঘাড় নাড়ল মাদল।

'বাছা, তুমি শিল্পী মানুষ। গোয়েন্দাগিরিতে নাক গলিয়ে ঝামেলায় পড়বে।'

'কেন কাকু? গোয়েন্দার যেটা সর্বপ্রথম থাকা দরকার, তা হল অবজারভেশন অর্থাৎ খুঁটিয়ে দেখার চোখ। শিল্পী হিসেবে আমার কি তা নেই?'

ঠোঁটের কোণে কি একটু হাসি ফুটল কাকুর?

মাদল ঠিক বুঝল না। তবে, কোঁচকানো ভুরু সোজা হয়েছে। বললেন, 'শুধু চোখ নয়, কানও সজাগ থাকা দরকার।'

মাদল বলল, 'আপনাদের দুজনের দিকে পিছন ফিরে বসে আমি ছবি আঁকছিলুম। আপনি কম কথা বলছিলেন। তবে, মিস্টার সাঠের কথা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন।'

'বেশ। তাতে কী হল?' সত্যকাকুর গলায় কৌতূহল।

'অন্তত একবার বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আপনি একেবারে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন এবং খুব সম্ভব নানাবতীর কেসটা নিয়ে ভাবছিলেন।'

সত্যকাকু এবার একটু অবাক। এবং খুশিও বোধহয়। কারণ, মাদল ঠিক বলেছে। প্রশ্ন করলেন, 'কী করে জানলে?'

'আপনি পকেট থেকে দুবার ডটপেন বের করেছেন, কিছু লেখার জন্যে। তিনবার খোলা-বন্ধর টুক-টুক আওয়াজ পেয়েছি। তারপর, একটু সময় পরে কাগজের গোল্লা বাস্কেটে পড়ার শব্দ পেয়েছি। এবং চতুর্থবার পেন বন্ধর ক্ষীণ আওয়াজ।'

বেমক্কা সত্যকাকুর প্রশ্ন, 'কত জোরে ছুটতে পারো, মাদল?'

'আপনার চেয়ে জোরে। মনে নেই, গেল বছর মেরিন ড্রাইভে পাল্লা হয়েছিল?'

হেসে ফেললেন কাকু, 'তুমি জুহুতে যাবেই?'

'আপনি অনুমতি দিলেই।'

'কিন্তু, কীভাবে?'

'কাকু, আমি আইডিয়া পেয়েছি। দু-একদিনে কিছু ছবি—সিন সিনারি, গান্ধীজি, ঘোড়া—এই সব এঁকে বেচতে বসব কোথাও।'

'কবে থেকে?'

'কাল পরশু।'

'না। পনেরো দিন বাদে। কাল থেকে দাড়ি কামাবে না। ঠিক আছে?'

মাদল একগাল হেসেছিল।....পনেরো দিন দাড়ি না কামিয়ে, খান পঁচিশেক রঙিন ছবি জলরঙে, প্যাস্টেলে বানিয়ে, প্লাস্টিকের শিট-সমেত এখানে এসে বসেছিল। এই বারো দিন বসে একটা নৌকোওলা জল-রং কুড়ি টাকায় আর প্যাস্টেলের ঘোড়া পনেরো টাকায় বেচেছে। দু-সপ্তাহের পাঁচ-পাঁচ-দশ টাকা দিতে হয়েছে জগ্‌গুকে। ও বলে—সেলামি।

গত ক'দিনের কথা ভাবতে-ভাবতে মাদলের খেয়াল হল, জয়দীপদার আপিসে প্রায় তিন সপ্তাহ ঢুঁ মারা হয়নি। অ্যাডমার্কেট বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে প্রতিমাসেই দু-চারটে ইলাস্ট্রেশনের কাজ

জুটে যায় ফুরনে। ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইট, কালার বা হাফটোনে প্রেস বা ম্যাগাজিন অ্যাডের জন্যে ছবি এঁকে দিতে হয়। কালারে ভালো মজুরি।

দুম করে যেন আলো জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। মনে পড়ে গেল, ওই ছেলেটির মুখ। হিপো-মুখো হুমদোর কন্টেসা গাড়ির পিছনে, বন্ধ জানালার কাচ থাবড়াচ্ছিল, আর, বোধহয় চ্যাঁচাচ্ছিল। ওকে তো মাদল দেখেছে জয়দীপদার অফিস-ক্যাবিনে। টেবিলের ওপর। ছোট্ট একটা ল্যামিনেট করা ছবি আছে টেবিলে। ছবিতে এক বয়স্কা বিধবা চেয়ারে বসে। তাঁর কোলে বসে রয়েছে ছেলেটি। চেয়ারের পিছনে একটি কিশোরী ও জয়দীপদা দাঁড়িয়ে।

ব্যাপারটা ভালো নয়। এবং ভালো। ছেলেটি যদি কোনও বিপদে পড়ে থাকে—মোটেই ভালো কথা নয়। আবার, অপর দিকে—হয়তো, এর থেকেই কিছু হদিশ বেরোবে। এ-ক'দিন প্রতীক্ষার একটা ফল তো পাওয়া উচিত। অত বড় মুখ করে মাদল সত্যকাকুকে রাজি করিয়েছে!

ভাবতে-ভাবতে, হঠাৎ পরিপূর্ণ যুবক মাদলের ভয় ঢুকল শরীরে। সমুদ্রের ঠান্ডা বাতাসেই কি না কে জানে, মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিম-কাঁপুনি লাগল। রাত দশটায় যেতে হবে অচেনা ওয়ালকেশ্বর। তা-ও জগগুর সঙ্গে।

ভাইয়াজির কাছে এসে দাঁড়াল মাদল, 'আমার ছবিগুলি একটু দেখবেন। আমি পাঁচ মিনিট ঘুরে আসছি। টেলিফোন করতে হবে।'

॥ চার ॥

'হ্যালো?'

'সত্যকাকু? মাদল বলছি। আপনি এখনও আপিসে? আমি বাড়ির নাম্বার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হয়রান—।'

'এক্ষুনি বেরুচ্ছিলাম। কী ব্যাপার? অত হাঁপাচ্ছ কেন? কোনও গন্ডগোল?'

'না, কাকু। তবে, মনে হচ্ছে একটা সুতো পেয়েছি।'

'কোত্থেকে কথা বলছ, সেইটে বলো আগে?'

'জুহু বিচের কাছে।'

'একজ্যাক্ট লোকেশনটা বলো?' ধমক দিলেন সত্যসাধন।

'মানে, ক্লোজ টু দ্য—'

'ইংরাজি-হিন্দি নয়। বাংলায় বলো। কাছে-পিঠে লোক নেই নাকি?' আবার ধমক।

'অনেক। উদিপি চায়ের দোকান থেকে ফোন করছি।' এক সেকেন্ড ভেবে বাংলায় বলল, মাদল, 'পাঁচ তারকা সরাইখানা সমুদ্র-সম্রাজ্ঞীর কাছে।'

হেসে ফেলল সত্যসাধন।

'বেশ। কী ব্যাপার হয়েছে সেটা বলো। গুরুত্বপূর্ণ কিছু? সংক্ষেপে বলবে।'

বিকেলের গাড়ি দুটির কথা, জগগু, চেনা-চেনা ছেলেটি—সব মোটামুটি দ্রুত গুছিয়ে বলে দিল মাদল। আপন ঘটনা বিন্যাসের ক্ষমতায় নিজেই অবাক। সত্যসাধন জিগ্যেস করলেন, 'ছেলেটিকে কোথায় দেখেছ, মনে পড়ল?'

মাদলের জবাব, 'হ্যাঁ। আমি যে বিজ্ঞাপন কোম্পানির মাঝে-মধ্যে ইলাস্ট্রেশন করতে যাই, তার চিফ এক্সিকিউটিভ জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনে। জয়দীপদার ফ্যামিলি ফটোতে বোধহয়।'

'ভদ্রলোককে খবরটা দিয়েছ।'

'হ্যাঁ। কিন্তু, উনি বিশেষ গা করলেন না। মনে হয়, প্যাঁচে পড়েছেন। শুধু বললেন, "তোমার

কাকু সত্যসাধন বাবুকে যে করে হোক এক্ষুনি এখানে আসতে বলো। আমি বেশ বাজে ঝামেলায় ফেঁসেছি।'' জিগ্যেস করলুম, ''কী ধরনের ঝামেলা?'' বললেন, ''আপিসে একটা খুন হয়েছে—পুলিশ বোধহয় আমাকেই সন্দেহ করছে!'' কাকু, আপনি প্লিজ এক্ষুনি যান।'

সত্যসাধন লেখার প্যাড টেনে, ডটপেন টিপে তৈরি হলেন। বললেন, 'ঠিকানা বলো।'

'আপনার আপিসের কাছেই—'

ঠিকানা টোকা শেষ হতে-হতে প্রশ্ন করলেন, 'ওয়ালকেশ্বরে ঠিক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তোমায়?'

হঠাৎ মাদল দেখল, প্রায় ভুঁই ফুঁড়ে কোত্থেকে উদয় হয়েছে জগ্‌গু। ওর দিকে খর চোখে তাকিয়ে হেঁটে আসছে দশ ফুট দূর থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে মাদল গলা তুলে বলল, 'নেহি, কাকা? বড়া কাম মিলা হ্যয়—'

ওপার থেকে সত্য বললেন, 'হঠাৎ কী হল? হিন্দিতে চ্যাঁচাচ্ছ—?

'হাঁ-হাঁ। আনেমে থোড়ি দের হোগি। আপ খানা খা লিজিয়েগা। ইন্তজার মত করিয়ে—আচ্ছা, ফোন রাখতা হুঁ!' বলে, ঝট করে রিসিভার নামিয়ে রাখল মাদল।

হাত খানেক দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জগ্‌গু। কোঁচকানো ভুরু কোমরে হাত। চোখেমুখে জঙ্গি ভাব। চিবিয়ে-চিবিয়ে জিগ্যেস করল হিন্দিতে, 'কাকে ফোন করলি স্-শালা?'

অকপটে সত্যি কথা বলল মাদল, 'যে-লোকটার সঙ্গে থাকি তাকে।'

'কে হয় তোর? তুই না বলেছিলি, তোর কেউ নেই—বান্দ্রার ঝুপড়িতে থাকিস?'

'হ্যাঁ। থাকিই তো। মারাঠি ফ্যামিলির সঙ্গে।'

যদিও গলা শুকিয়ে আসছিল, ঠোঁট চেটে, হাসবার চেষ্টা করল মাদল।

'ঝুপড়ি-বস্তিতে টেলিফোনও আছে নাকি?' অ্যাঁ?'

'খোঁচা মেরে কথা কটি বলে, জগ্‌গু একদলা থুতু ফেলল রাস্তায়।

'না, না। বস্তিতে কী করে ফোন থাকবে? তুমি মজাক করছ, জগ্‌গু দাদা!' মাদল আবার একখানা হেঁ-হেঁ হাসি টানল মুখে, 'উলটো ফুটের মুদিখানায় ফোন। ওরা কাকাকে ডেকে দেয়,।'

ভালো করে ওর সারা মুখ, চোখ দিয়ে চেটে দেখল জগ্‌গু। তারপর বলল, 'ভাগ জলদি। সাড়ে আটটা বাজতে চলল। ঠিক ন'টায় রওনা হব—ও-ক্কে?'

আহ্! হাঁফ ছাড়ল মাদল। আসল হেসে, বলল, 'ওক্কে।'

জগ্‌গু যেমন উদয় হয়েছিল। তেমনি মিলিয়ে গেল ডানধারের এঁদো গলির অন্ধকারে।

সত্যসাধনের একখানা গাড়ি আছে। তার গুণ দুই প্রকার। হয় লোকে গ্রাহ্যই করে না, বা হাঁ করে চেয়ে থাকে। উনিশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দের মডেল। ইটালিয়ান ফিয়াট। কোনওকালে এটার রঙ ছিল ট্যাক্সির ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ ওপরের অংশ কালো, নীচের ভাগ হলুদ। এখন অবিশ্যি সারা গায়ের চলটা উঠে-উঠে যত্রতত্র মরচে পড়া রঙ। বছর দুয়েক আগে মাদলের চেঁচামেচির ঠেলায় ছোট্ট এক কৌটা সাদা পেইন্ট এনে, দুজনে মিলে ক্ষতচিহ্নগুলিতে মলম লাগিয়েছিল। তাতে অঙ্গ শোভা আরও বিচিত্র হয়েছে। ডোরাকাটা বাঘ, চিতল হরিণ বা জেব্রা বহু ঝড়ঝঞ্ঝা, মরুভূমি পেরিয়ে এলে যেমন দেখাবে, অনেকটা তেমনি। সত্যকাকু মেকানিকের কাজ জানেন। মন খারাপ হলে, অথবা কোনও কঠিন মামলার চিন্তার জট ছাড়াতে হলে, হঠাৎ ওঁকে দেখা যাবে গাড়ির হুড তুলে কিছু-না-কিছু করছেন। নয়তো, মাদুর বিছিয়ে গাড়ির তলায় চিত হয়ে ঢুকে খুট-খাট লাগিয়ে দিয়েছেন। ফলে, ভেতরকার আসল ইতালীয় ন্যাড়িভুঁড়ি তথা মোদ্দা ইঞ্জিনের প্রতিটি ইঞ্চি সর্বদাই চকচকে। ফার্স্ট গিয়ারের পিক-আপে যে কোনও মারুতিকে কাত করে দেবে। কিন্তু 'বডি' অর্থাৎ গতরে নানান

আওয়াজ। ধীরে-ধীরে চললে সর্বাঙ্গ এমন ঝমঝমিয়ে বাজে যে, ছোটখাটো গলিতে পাড়ার কুত্তারা আঁতকে উঠে ডেকে ওঠে এবং তাড়া করে আসে।

সত্যকাকু বলেন, 'ওরে, এইরকম ঝমঝম গাড়ি গোটা বম্বের কোনও রাস্তায় দেখতে পাবি না। হন্ডা, মার্সিডিস, কন্টেসা, মারুতিতে গিসগিস করছে এ-শহর। ঝমরঝম এক্কেবারে, একমেবাদ্বিতীয়ম। জুড়ি নেই। যেই রং-চং করিয়ে দুরস্ত করতে যাব একে—এ সিওর ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে—বেচারা সাধারণ ছাপোষা হয়ে যাবে যে!

এ হেন ঝমর থেকে প্রায় ছ'ফুট লম্বা সত্যসাধন যখন বেরুলেন, গেটের দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হল।

'কিধার যানা হ্যয়, সাব?

দুটি কনস্টেবলও এগিয়ে এল দু-পাশ থেকে।

'অ্যাডমার্কেট।'

পুলিশ দুটি মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করল। একজন বলল। 'আপিস বন্ধ হয়ে গেছে। কার কাছে যাবেন?'

'জয়দীপ রায়।'

সেপাই একজন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

গোটা সাত-তলা জুড়ে অ্যাডমার্কেটের অফিস। লিফট থেকে বাইরে পা রাখলেই অলিভ গ্রিন-কার্পেট, তার ওপরে কোম্পানির সাদা সিম্বল ও 'ওয়েলকাম' লেখা। উলটো দিকে রিসেপশান কাউন্টারে কেউ নেই। রাত সাড়ে আটটায় থাকার কথাও নয়। ডানদিকের উইঙ-এ দু-কদম এগোতেই মানুষের গলা শুনতে পেলেন সত্যসাধন। গলা তো নয়—বাজখাঁই ধমক, 'লেকিন তুম কিঁউ অন্দর গয়া থা?'

জবাবে, মনুষ্যকণ্ঠে বেড়ালের মিঁউ-মিঁউ শোনা গেল। বাজখাঁই গলা শুনেই মালিককে চিনেছে সত্য।

ইনস্পেক্টর মধুকর সাঠে।

বেশ বড় সাইজের ঘরে ছোট-মাঝারি কিউবিকলে বিভিন্ন কর্মচারীদের বসবার ব্যবস্থা। সবই প্রায় খালি এখন। হলের ভেতরে খানিকটা গেলেই বাঁ-দিকে একটি মাঝারি ঘর। সেখানে জনকয়েক নরনারী বসে, দাঁড়িয়ে। রিভলভিং সোফা এদিক পানে ঘুরিয়ে মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছেন সাঠে। সত্যসাধনকে দেখেই উঠতে গিয়েও বসে পড়লেন মধুকর। গম্ভীর মুখে বললেন, 'এই যে সাধনকর। এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'তুমি জানলে কী করে, যে, আমি আসছি?'

ততক্ষণে একটু দূরে দেওয়াল ঘেঁষে, আলাদা হয়ে যে-লোকটি বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়েছে। হালকা নীল শার্টের উপরে গাঢ় রংয়ের টাই। গলার কাছে ফাঁস আলগা করে দেওয়া হয়েছে। ফরসা মুখে সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা। মাঝারি হাইট। শরীরে মেদের চিহ্ন নেই। বয়েস ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ।

স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে, কথা ফুটল তার মুখে, 'আপনি খবর পেয়েছেন, তা হলে?'

'হ্যাঁ, মিস্টার রয়।' বলে, সত্যসাধন সাঠেকে বললেন, 'সাঠে, আমি একটু এঁর সঙ্গে—।'

বাধা দিলেন মধুকর। হেসে বললেন, 'আগে ফিসফিস করবে—এই তো? ঠিক আছে।'

সাঠের কথা বলার ধরনে বোধহয় একটু হালকা রসিকতার চেষ্টা ছিল। কিন্তু হাসল না কেউ। সবক'টি শুকনো মুখ যেমন-কে-তেমন রইল।

মাঝারি ঘরটি পেরিয়ে ডিজাইন স্টুডিওতে এসে ঢুকল দুজনে। টেবিলে শিল্পীদের ড্রইং বোর্ড ও অন্যান্য সরঞ্জাম রয়েছে। লোকজন নেই। একটা টেবিলে মুখোমুখি বসলেন ওঁরা। সত্য সরাসরি

জিগ্যেস করলেন, 'বাড়িতে আপনার কে-কে আছেন, জয়দীপবাবু?'

'প্যারালিটিক মা। এক বোন, ভাই।'

'বাড়িতে টেলিফোন করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুনের খবর দিয়েছেন।'

প্রশ্নটা করেই জয়দীপের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সত্যসাধন। মুহূর্তের জন্যে চোখ নামিয়ে সে বলল, 'কাকে দেব? কেউ ছিল না। মা তো টেলিফোনের হলঘরে আসতে পারেন না। মারাঠি বাই, মানে, ঝি তুলেছিল রিসিভার।'

'হুঁ।' বলে, একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সত্যসাধন।

'তা ওকে বললুম—ফিরতে দেরি হতে পারে। মাকে যেন খাইয়ে দেয়।'

'আপনার ভাইবোনের নাম কী?'

'জয়ী এবং জাহ্নবী।'

'ওরা কোথায়?'

'ইয়ে মানে, বিকেলে বেড়াতে বেরোয়। ফিরতে দেরি করছে হয়তো।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সত্য, 'ঠিক আছে। চলি তা হলে।'

'সে কী? আপনি আমাদের সাহায্য করবেন না?'

'কীসে?' হাঁটতে আরম্ভ করেছেন সত্য।

'অফিসের মার্ডার কেসে পুলিশ আমাকেই মেন সাসপেক্ট করছে।' পিছন-পিছন হেঁটে আসছে জয়দীপ।

দাঁড়িয়ে পড়লেন সত্য। ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি আমায় ইনভেস্টিগেট করতে বলছেন?'

'প্লিজ, স্যার। আপনার ফি আমি দেব।' জয়দীপের গলায় আকুতি।

'কিন্তু, আমার এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজন কতখানি! পুলিশ তো ইনভেস্টিগেট করবে। যথাযত সত্যের সন্ধান করবে। সেটাই ওদের কাজ।'

সামান্য শ্লেষের সঙ্গে জয়দীপের জবাব, 'চাকরি।'

সত্যসাধন দু-সেকেন্ড চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। করুণ মুখে চেয়ে আছে জয়দীপ।

সত্য শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হুম। তবে, স্রেফ ফি দিলেই আমি কাজে হাত দেব না।'

'বলুন, বলুন, স্যার। আর কী চাই?'

তারপরেই, হঠাৎ সত্যের হাত ধরে ফেলল জয়দীপ। বলল, 'পুলিশ ইন্সপেক্টার যেভাবে কর্নার করছিলেন—আমাকে হয়তো জামিনও দিতে চাইবেন না। অথচ বাড়িতে আমার অথর্ব মা। ভাই বোনও নেই আজ—'

'ঠিক এই প্রসঙ্গেই বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিস্টার জয়দীপ রায়, পুরো ফি ছাড়াও আপনি যদি কথা দেন, যে সত্য গোপন করবেন না—তবেই আমি আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারি।'

'কিন্তু, কিন্তু—আমি তো কোনও মিথ্যে কথা বলিনি আপনাকে। মানে, আপনি তো আমার সঙ্গে কথাই বললেন না।'

ফের হাঁটতে আরম্ভ করেছেন সত্য, 'এরই মধ্যে আপনি আপনার ছোট্ট ভাইটি প্রসঙ্গে কিছু কথা এড়িয়ে গেছেন।'

সাঠের জেরা-ধ্বনি কানে আসছিল। সত্য আবার হেঁটে প্রায় ও-ঘরের কাছে পৌঁছলেন। ক্ষীণ গলায় পিছন থেকে জয়দীপ বলল, 'ওটা বড়ই ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানে, আজকের এই দুর্ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে না ফিরেই সত্য বললেন, 'বেশ তো! আপনি যখন এত দ্রুত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছেন—তা হলে আর আমাকে দরকার কী? বেস্ট অফ লাক।'

বলতে-বলতে সাঠের কাছে এসে দাঁড়ালেন সত্য। হেসে বললেন, 'মধুকর। জেরা শেষ হল?'

রোগা, কৃষ্ণকায়া মহিলাটি বোধহয় দক্ষিণ দেশের। স্কার্ট-ব্লাউজ সমেত কাঁপছিল সাঠের জেরার ঠেলায়।

সাঠে ঘুরে সত্যকে দেখে বললেন, 'লাশ দেখবে নাকি?'

প্রায় 'না' বলতে যাচ্ছিলেন, বাঁ-দিকের কাঁধের কাছে ফিসফিস গলা শুনতে পেলেন সত্য। 'স্যার, যা-যা জানতে চাইবেন সব বলব—প্লিজ!'

বলতে-বলতে জয়দীপ আবার দু-হাতে সত্যর বাঁ-হাত আঁকড়ে ধরেছে।

ওর কথার উত্তর না দিয়ে সত্যসাধন মধুকরকে জিগ্যেস করলেন, 'সে কী? লাশ এখনও নিয়ে যায়নি?'

সাঠে বললেন, 'আর বোলো না। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে, ফোন করেছি। এখনও ফিঙ্গার-প্রিন্ট-ওয়ালা এসে পৌঁছোল না। রাস্তায় জ্যামে আটকেছে বোধহয়।'

'কোন ঘরে?'

হকচকিয়ে গেলেন সাঠে সত্যর প্রশ্নে, 'কে?'

'লাশ।'

'ও।' বলেই নিজেকে সামলালেন মধুকর। তারপর, চালাক ভঙ্গিতে ভুরু নাচিয়ে জয়দীপের দিকে ইশারা করলেন, 'কোথায় আবার! তোমার মক্কেলের ক্যাবিনে।'

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন পুলিশসায়েব। হলঘর পেরিয়ে, রিসেপশন ছাড়িয়ে অন্য দিকের উইঙ্গে চলে এলেন দু-জনে। হাঁটতে-হাঁটতে সাঠে বললেন, 'সব জেরা প্রায় হয়ে গেছে, সাধনকর। তিন-চারজন সন্দেহভাজন।'

'কে কে?'

সত্যর জিজ্ঞাসায় দাঁড়িয়ে পড়লেন সাঠে। দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বললেন, 'উঁহু! আমি বলব না। তুমি নিজে খেটে জেনে নাও। তবে, অই রয় হ্যাজ টু বি দ্য কালপ্রিট। খুনের মোটিভ দেখলে—ওর ছাড়া আর কারও কোনও লাভ নেই।'

বলতে-বলতে 'কনফারেন্স-রুম' লেখা দরজার সামনের ফাঁকা চওড়া করিডোরে এসে পৌঁছলেন দু-জনে। দু-দিকে তিনটে দরজা। সামনে দাঁড়ানো কনস্টেবল সেলাম ঠুকল সাঠেকে দেখে। সাঠে ওকেই বললেন, 'ইয়ে সাহাবকো লাশ দিখা দো। হেলপ করো। আর কেউ যেন না ঢোকে, খেয়াল রেখো।' সাঠেকে 'থ্যাংক ইউ' বলে ঘরে ঢুকলেন সত্যসাধন। আপিস ক্যাবিন হিসেবে শ-বাই-বারো বেশ ভালো সাইজ বলা চলে। মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ও-পাশে গদিমোড়া সোফা। তাতে কোট ঝুলছে। কোটটি অবশ্যই জয়দীপের। টেবিলের এ-পাশে পিছন ফিরে আছে তিনটে একই রকম সোফা। মধ্যিখানের সোফায় বসে আছে একজন দোহারা মানুষ। যেন বাঁ-দিকে ঘাড় হেলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাঁ-হাতটা সোফার হাতলের বাইরে ঝুলছে। পিছন থেকে লোকটির টাকের হালকা চুল দেখা যাচ্ছে। ওর সামনে টেবিলে একটি খালি ডিশ। কাগজপত্র, ফাইল, টেলিফোন, কলম—সব পরিষ্কারভাবে সাজানো টেবিলে। ল্যামিনেট করা ফ্যামিলি ফোটোগ্রাফ। এটার কথাই মাদল বলছিল।

একটু এগিয়ে, সামনে থেকে মৃতদেহটি দেখলেন সত্যসাধন। মুখে কালচে ছোপ। গোলগাল মুখটিতে মোটা কাঁচা-পাকা গোঁফ। গোঁফ এবং ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে চিবুকে শুকিয়ে গেছে।

কোলের ওপরে-রাখা ডানহাতের কাপটি কাত হয়ে বোধহয় কফি গড়িয়ে পড়ে গেছে

বেশিরভাগ। সামান্য গাঢ় কফি এখনও রয়েছে কাপে। বুক-খোলা কোট, সাদা জামা ও হালকা রংয়ের ট্রাউজারে কফির দাগ শুকিয়ে এসেছে প্রায়।

ঘরের চারদিকে দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলেন সত্য। টেবিলের পিছনে দেওয়ালে নানান কোম্পানির প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন, চার্ট টাঙানো। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে তিনজন বসবার মতো সোফা, একটি গদিমোড়া চেয়ার। মাঝখানে টি-টেবিল। অন্য পাশে দেওয়াল আলমারির গায়ে চা-কফি তৈরির জন্যে গরম জল বানাবার যন্ত্র। আলমারির একটি খোলা পাট দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার ভেতরকার কাপ-ডিশ, চামচ, চিনির কৌটো, গুঁড়ো দুধ, টি-ব্যাগ এবং নেসকাফের কৌটো।

সত্যসাধন বাইরের সেপাইকে একবার দেখে নিয়ে জয়দীপের কোটের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। এক পকেট থেকে বেরোল সিগারেট-লাইটার। অন্য পকেটে মাথা ধরার ট্যাবলেট, তিন টুকরো কাগজ ভাঁজ করা। শ্রীমতী মনোরমা রায়ের ওষুধের প্রেসক্রিপশন, বিল। আর একটা সাদা চিরকুটে ছোট্ট নোট লেখা ইংরাজিতে। 'গোদরেজের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা রাজি। বাবার সঙ্গে আমি কাল মর্নিংফ্লাইটে পুনা যাচ্ছি। ডাইরেক্টরদের মিটিং আছে। তুমি শনিবার আসছ তো? দেখা হবে। লক্ষ্মীটি, এসো কিন্তু। রাগ কোরো না। এস-কে।'

চিরকুটটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে, বাকি সব যথাস্থানে রেখে দিল সত্য। না! মৃত্যুর কোনও চিহ্ন নেই। একমাত্র মৃতদেহটি ছাড়া সাদা চোখে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বেরিয়ে আসছিলেন ঘর থেকে, হঠাৎ লম্বা সোফার পায়ার কাছে দেখলেন, কী একটা চকচক করছে। ঝুঁকে আলগোছে তুলে নিয়ে ভালো করে দেখলেন। সিগারেটের প্যাকেটের ভেতরে যেমন রুপোলি রাংতা থাকে—ঠিক সেই জিনিস। কে যেন দুমড়ে গোল্লা পাকিয়ে ফেলেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে তাতে জড়িয়ে নিয়ে বস্তুটা ফের পকেটে চালান করে দিলেন সত্য।

অন্য উইঙ্গ থেকে সাঠের হাঁক-ডাক এগিয়ে আসছে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন সত্য।

'এই যে, সাধনকর! এতক্ষণে এসেছে শর্মা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওস্তাদ বলে কি আর বম্বের আপিসটাইমের জ্যাম ওকে ছেড়ে কথা বলবে? যা বলেছিলুম।'

বলতে-বলতে শর্মা ও তার ফোটোগ্রাফারকে জয়দীপের ক্যাবিনে নিয়ে এলেন মধুকর। বললেন, 'লেগে যান—লেগে যান। তাড়াতাড়ি করুন। বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে।'

সত্যর দিকে ঘুরে বললেন, 'কী? লাশ দেখা হল।'

সত্য কী একটা ভাবছিলেন, গাল টেনে হেসে জবাব দিলেন, 'হুঁ।'

'ডেথের কারণ কী' মুচকি হেসে ভ্রু নাচালেন সাঠে।

'বিষক্রিয়া মনে হয়!'

'মনে হয় কী হে! আলবাত পয়জনিং। এত বড় কোম্পানির দু-নম্বর ব্যক্তি জে রয়, এক নম্বর মিস্টার জোশীকে নিজের খোপে ডেকে আদর করে কফি খাইয়েছে। দু-ফোঁটা বিষ কফির সঙ্গে। ব্যস। ডেথ এন্টারড পুত্তর যোশী'জ বডি উইথআউট নয়েজ—অ্যান্ড, সাইলেন্টলি সাইলেন্সড হিম ফর এভার। নো মারামারি, নো রক্তক্ষয়।'

'দু-ফোঁটা বিষই যে ছিল, তা তো নয়, মধুকর। এ-ঘরে এখনও এত বিষ আছে, যাতে এই আপিস কেন, গোটা দালানের সব আপিসের লোকদের মেরে ফেলা যায়।'

ভুরু কুঁচকে সাঠের প্রশ্ন, প্রায় হোঁচট খেতে খেতে, 'এখন, বিষ—এ-ঘরে—মানে—ইয়ে, কোথায়?'

'আলমারিতে রাখা চিনি, দুধের গুঁড়ো বা নেসকাফের কৌটোয় ভরতি। মনে হয়, কফিতেই কারণ, কফির গুঁড়ো সামান্য দলা পাকিয়ে গেছে। স্রেফ হাওয়া লেগে দলা পাকিয়ে গেলে, এত বড় কোম্পানির দু-নম্বরের ক্যাবিনে নিশ্চয়ই তাজা নেসকাফের নতুন কৌটো এসে যেত। তাই না!'

॥ পাঁচ ॥

সত্যসাধনের বাঁ-দিকের বুক পকেটে 'সোনি-পকেট-টেপ-রেকর্ডার'। চেয়ারে বসতে-বসতে ডটপেনটা ছুঁয়ে দেখার কায়দায় টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে দিলেন। একই সঙ্গে প্রথম প্রশ্ন করার ফলে, 'খুট' শব্দটা চাপা পড়ে গেল।

'মিস্টার জোশী, যাঁকে খুন করা হয়েছে, তিনি কি বোম্বাই ব্রাঞ্চের ডাইরেক্টর, জয়দীপবাবু?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'অ্যাডমার্কেটের হেডঅফিস কোথায়?'

'পুনাতে।'

'আর কোথায়-কোথায় ব্রাঞ্চ আছে?'

'কলকাতা-দিল্লি-ব্যাঙ্গালোর।'

অ্যাডমার্কেটের মতো বিশাল কোম্পানির এসব খবর সত্যর জানা। তবু সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলে, কথা বলতে-বলতে বিপর্যস্ত মানুষ কিছুটা স্বাভাবিক হয়। সত্যসাধন লক্ষ করলেন, কাজ হচ্ছে। জয়দীপের অসাব্যস্ত মুখচোখ সমূহ দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিল। পালটাচ্ছে। গলার স্বরও স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

জয়দীপের ঘরে বসেছেন দুজনে। লম্বা সোফায় সত্যসাধন। টি-টেবলের উলটোদিকে জয়দীপ।

সত্য বললেন, 'মিস্টার জোশি আপনার ক্যাবিনে কখন এসেছেন?'

'আমি জানি না। ছিলাম না।'

'কখন বেরিয়েছেন?'

'তা, এই সাড়ে তিনটে-চারটে হবে।'

'কোথায় গিয়েছিলেন? আপিসের বাইরে?'

'না। কনফারেন্স রুমে। অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভদের সঙ্গে মিটিং ছিল।'

মিটিং শেষ হল ক'টায়?'

একটু ভাবল জয়দীপ। ঘড়ি দেখে বলল, 'পাঁচটা নাগাদ।'

'তারপর ক্যাবিনে ফিরে দেখলেন, যে—'

জয়দীপ বাধা দিল। 'না। তারপর, আমি সোজা ডিজাইন স্টুডিওতে গেছি। সাবানের একটা ক্যাম্পেন চেক করতে।'

'মৃতদেহ প্রথম কে আবিষ্কার করে?'

'আমার সেক্রেটারি। মিস সালডানা।'

'আপনি কখন দেখেছেন ডেডবডি?'

'চিৎকার চেঁচামেচি শুনে, আমি ছুটে আসি এদিকে।'

'তখন ক'টা বাজে?'

'তা তো খেয়াল করিনি, স্যার। অফিস ছুটি হয়ে গেছে। মানে, ছ'টার একটু পরেই হবে।'

'ঘরে ঢুকে কী দেখলেন?'

মিস্টার জোশী ডেড। জুলি, মানে মিস সালডানা দু-হাতে মুখ ঢেকে আপনার ওই সোফায় বসে পড়েছে।'

'আর কী দেখলেন?'

ভাবতে হল জয়দীপকে সামান্য সময়। তারপর যেন ভেবে-ভেবে বলতে লাগল, 'দরজার ভেতরে ঢুকে পড়েছে দত্তারাম।'

'কে?'

'আমার খাস বেয়ারা।'

'হুঁ। আর কী দেখলেন।'

'দরজা খুলে অনেকগুলো মুখ উঁকি মারছে ভেতরে। সকলের চোখেই আতঙ্ক।'

এক মুহূর্তে চুপ থেকে সত্য বললেন, 'তা হলে এখন তো আপনিই ব্রাঞ্চ-ডাইরেক্টর, কী বলেন?'

প্রথমে যেন কথাটা ধরতেই পারল না জয়দীপ। সঙ্গে-সঙ্গে, প্রায় শক খাওয়ার মতো আঁতকে উঠল। ভয়ার্ত চোখে চেয়ে বললেন, 'না, না, বিশ্বাস করুন। আমি কিচ্ছু জানি না।'

তারপরেই অনুনয়ের গলায়, করুণ মুখে বলল, 'পুলিশ-ইন্সপেক্টরও ওই জাতীয় নোংরা ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলছিল। আপনি অন্তত—'

বলতে-বলতে ঝুঁকে পড়ে সত্যর হাত ধরে ফেলল জয়দীপ।

আস্তে-আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সত্য বললেন, 'ঠিক আছে। সময়ে সত্য বেরোবেই। তবে প্রথম সন্দেহ তো লোকে আপনাকেই করবে! কী? ঠিক বলছি কি না?'

'কিন্তু আমি, মানে আমার—কী আশ্চর্য! আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, স্যার। আপনি আমাকে এই বিচ্ছিরি ঝামেলা থেকে উদ্ধার করুন! আপনিই পারবেন।—'

সহসা গম্ভীর গলায় সত্যসাধন জিগ্যেস করলেন, 'আপনার ভাই কার কাছে গেছে?'

চমকে উঠেই, সামলে নিল জয়দীপ আস্তে-আস্তে বলল, 'এ প্রসঙ্গে, কাল বা পরে কথা বললে হয় না সত্যবাবু? আমি ভীষণ ক্লান্ত। আর, আপনি বিশ্বাস করুন, মিস্টার জোশীর মার্ডারের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।'

পাথরের মতো চোখে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছেন সত্যসাধন। জয়দীপ শীততাপনিয়ন্ত্রিত ক্যাবিনেও ঘামতে শুরু করেছে। আমতা-আমতা করে যেন, শেষ খড়কুটো আঁকড়াবার চেষ্টায় বলল, 'তা ছাড়া, ওরা সবাই বাইরে আপনার অনুমতির অপেক্ষায়—'

হ্যাঁ। এটা ন্যায্য কথা।

বডি পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দেওয়ার পর সাঠে সত্যকে আলাদা ডেকে বলেছিলেন, 'ভাউসায়েব, সাধনকর! তুমি কি অই রায়ের হয়ে কেস তদন্ত করতে চাও?'

'এখনও ঠিক করিনি। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করব।'

'তা হলে, ওকে লকআপে নিয়ে যাব নাকি? এক রাত্তির একটু ঠান্ডাগরম দিলেই স্বীকারোক্তি বেরিয়ে যাবে।—'

সত্য তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিলেন ওকে, 'না-না, তা তুমি পারো না। হাতেনাতে খুনি ধরতে পারলে আলাদা কথা। তা ছাড়া, তুমি নিজেই বলছ, চার-পাঁচজন সন্দেহভাজন।'

'বেশ। তুমি কি আলাদা কথা বলবে ওদের সঙ্গে? না, আমার এফ-আই-আর-এ জবানবন্দি দেখে নেবে?'

সত্য হেসে বলেছিলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ভাই। তুমি এগোও। আমি বরং একবার ঝালিয়ে দেখি এদের।'

প্রথমে একখানা বিদ্রূপের হাসি দিয়েছিলেন সাঠে। তারপর, মুখ বেঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে তিন-চার দিকে শূন্যে দু-হাতের খোঁচা মেরে বলেছিলেন, 'ওহ হো-হো! তুমি তো আবার নানান দিকে খোঁচা মেরে, ফুঁ দিয়ে সূত্র বের করবার ব্যাপারে এ-রাজ্যে বিখ্যাত!'—দম নিয়ে কথা শেষ করেছিলেন সাঠে, 'ওপরে দুজন, নীচে একজন সেপাই রইল। ওদের বলে যাচ্ছি। দরকার হলে কাজে লাগিও ওদের—'

অজস্র প্রশ্ন একসঙ্গে এসে উপস্থিত হয় এইসব সময়ে। হুড়মুড়িয়ে একইসঙ্গে সবগুলি বেরিয়ে আসতে চায়। কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন সত্যসাধন। মনে-মনে গুছিয়ে ফেলেছেন সব। প্রত্যহ উষাকালে

প্রাণায়াম, কার্টার রোডে জগিং এবং নিত্য যোগব্যায়ামের ফলে অতি দ্রুত এই ব্যাপারটি করে ফেলতে পারেন সত্য।

জয়দীপকে বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি বাইরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন। যাওয়ার আগে স্রেফ তিনটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। পুলিশে খবর দিয়েছে কে?'

'অ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর হরবিলাস চওধরি।'

'আপনার ক্যাবিনে আজ শেষ কখন আপনি চা বা কফি খেয়েছেন।'

'লাঞ্চের পর আড়াইটে নাগাদ কফি খেয়েছি।'

'নিজেই বানিয়ে নিয়েছেন, না, অন্য কেউ?'

'আমার খাস বেয়ারা দত্তারাম বানিয়ে দিয়েছে।'

'যান হরবিলাসবাবুকে পাঠিয়ে দিন। আপনি আবার চলে যাবেন না যেন।'

ধীরে-ধীরে, ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে গেল জয়দীপ।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দ্রুত বেগে দরজা ঠেলে যে লোকটি ঢুকল, তার বয়েস সত্যসাধনের কাছেপিঠে। শক্ত চেহারায় চৌকো কঠিন মুখ। মুখে মোটা গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। টকটক করছে রং। কোঁচকানো ভুরু এবং ঘাড়ের ভঙ্গিতে সদাউদ্ধত ভাব।

ক্যাবিনে ঢুকেই, প্রায় আক্রমণের ধরণে সত্যকে প্রশ্ন ছুড়লেন, 'ইয়েস, নাউ হোয়াট?'

সত্য শান্ত গলায় ভদ্রভাবে বললেন, 'বসুন, মিস্টার চওধরি!'

'বাট, হু আর ইউ? আপ কউন হ্যায়? আপনি আমাদের আটকে রাখার কে?'

লোকটার গলাবাজিতে বিরক্ত হলেও সত্য ঠান্ডা গলায় বললেন, মুখে হাসি মাখিয়ে, 'আমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

'পুলিশের লোক চলে গেছে সব মিটিয়ে। আপনি আবার কোত্থেকে টিকটিকিগিরি ফলিয়ে ঝামেলা বাড়াতে এসেছেন! অ্যাঁ? আমি আপনার কোনও কোয়েশ্চেনের জবাব দিতে রাজি নই। আমি চললাম—'

বসেই ছিলেন সত্য। বসে-বসে বললেন, 'সবাইকে ইনস্পেক্টর সাঠে বলে গেছেন, আমার সঙ্গে কোঅপারেট করতে। আপনি শোনেননি নাকি?' যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল চওধরি। সেই অবস্থাতেই, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দিল, 'না। শুনিনি। দারোগা যখন লাশ নিয়ে গেছে, আমি টয়লেটে ছিলাম। গুড নাইট—'

দরজা টেনে খুলে এক পা বাড়িয়েছিল লোকটা। সত্যর রাশভারি গলা গর্জে উঠল, 'মিস্টার জোশী ইজ ডেড। মার্ডার-সাসপেক্ট জয়দীপ রায়ের জেল হতে পারে। তা হলে তো কোনও বাধা নেই আপনার—আপনিই তো অ্যাডমার্কেটের বম্বে-ডাইরেক্টর! কী বলেন?'

'হো-হোয়াট? তা-তার মানে?'

স্প্রিংয়ের মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছে চওধরি।

সত্য গলা আবার যথারীতি শান্ত করে বললেন, 'মানে ঠিক তাই। যেটা আপনার মাস্টারপ্ল্যান হলেও অবাক হবে না পুলিশ। তা ছাড়া, যে কোনও একটা কনস্টেবলকে বললে, আপনার ঘাড় ধরে এক্ষুনি আপনাকে থানা লকআপে নিয়ে গিয়ে রাতটুকু অন্তত লাবড়া তরকারি খেতে সাধাসাধি করবে। কী? বসবেন, না গুড নাইট করে চলে যাবেন?'

ততক্ষণে মূর্তি একেবারে পালটে গেছে লোকটার। সোজা ঘাড়ের মুন্ডু হেলে পড়েছে। ভুরু টানটান। চৌকো মুখ ঝুলন্ত। গুটি-গুটি ফিরে এসে, থপ করে বসে পড়ল সত্যসাধনের মুখোমুখি।

মিটিমিটি হাসছিলেন সত্য। বললেন, 'সময় নষ্ট না করে, তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলে, তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে পারবেন।'

বিড়বিড় করে চওধরি বলল, 'সরি, স্যার। এতটা ভেবে দেখিনি। বলুন, কী জানতে চান?'

এতক্ষণে সত্য পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেট বের করেছেন। খুলে, চওধরির দিকে এগিয়ে ধরলেন। মাথা নেড়ে হরবিলাস বলল, 'থ্যাংক ইউ। আমার অন্য ব্র্যান্ড। এটা খেলে কাশি হয়।'

'কোন ব্র্যান্ড আপনার?'

'বেনসন হেজেস।'

সত্য সিগারেট ধরাতে-ধরাতে জানতে চাইলেন, 'মদ কি আপনি রোজ খান?'

'অ্যাঁ?' মাথা নীচু করে কী ভাবছিল চওধরি। প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল, 'ইয়েস—না, মানে, আপনাকে কে বলল?'

'আপনার চোখের কোল। বেশ ফোলাফোলা। তা ছাড়া, প্রচুর অ্যালকোহল খেলে ফরসা ভারতীয় অনেককেই গোলাপি রঙের দেখায়। সে কথা যাক। মিস্টার রায়ের সঙ্গে আপনার বনিবনা কী রকম? হাউ ইজ হি?'

'হি ইজ এ বাস্ট—'

গালাগালিটা মাঝপথে থামিয়ে দিল হরবিলাস। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কথা শুরু করার ফলেই বোধহয় ওর শ্বাসের সঙ্গে অ্যালকোহলের গন্ধ পেলেন সত্যসাধন।

সামলে নিয়ে চওধরি কথা শেষ করল, 'খোদ বড়কত্তা, মানে, মালিকের চামচাগিরি করে যথেষ্ট। আমার নামে লাগায়। তবে, হ্যাঁ, নিজের কাজটা বোঝে। তার চেয়ে বেশি বোঝে—কী করে মালিকের মেয়েকে পটাতে হয়।'

গড়গড়িয়ে বলতে-বলতে ব্রেক কষে থেমে গেল হরবিলাস। সত্য অপেক্ষা করলেন, যদি আরও কিছু বলে। না। থেমেছে। তখন সত্য জিগ্যেস করলেন, 'মালিক অর্থাৎ কোম্পানির চেয়ারম্যানের নাম কী?'

'কোরগাঁওকর।'

'পুনাতেই থাকেন?'

'হুঁ।'

'জোশীর সঙ্গে আপনার রিলেশান কী রকম ছিল?'

'মোটামুটি।'

'আজ শেষ কখন দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে?'

'লাঞ্চের আগে। এই বারোটা-সাড়ে বারোটায়।'

'বিকেল চারটে থেকে কোথায় ছিলেন?'

'আমার ক্যাবিনে।'

'আপনি চা বেশি পছন্দ করেন, না, কফি?'

একটু ভেবে নিয়ে চওধরির জবাব, 'যে কোনও একটা হলেই হল।'

'ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন।'

হরবিলাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। বাড়ি যেতে পারি তো?'

'হ্যাঁ, তা পারেন। তবে, পুলিশকে না জানিয়ে শহর ছেড়ে যাবেন না।'

দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে সত্য ওকে বললেন, 'জয়দীপ রায়ের খাস বেয়ারা দত্তারামকে একটু পাঠিয়ে দিন।'

মহিলা দুজনের কথা ভেবে সঙ্গে-সঙ্গে মত পরিবর্তন করলেন—রাত হয়ে যাচ্ছে। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া দরকার।

'না। আপনি বরং মিস সালডানাকে আসতে বলুন।'

জয়দীপের পার্সোনাল সেক্রেটারি জুলি সালডানা ঘরে ঢুকতেই সত্য উঠে দাঁড়ালেন, 'প্লিজ

কাম ইন। সিট ডাউন।'

দু-জনে মুখোমুখি বসলেন। জুলিকে দেখতে বেশ সুশ্রী। ঠোঁট, চিবুক, চোখ ভুরুসমেত পানপাতা মুখটি বেশ যত্ন নিয়ে বানানো। রং একটু চাপা হলেও, জেল্লা আছে। আঁটোসাঁটো তন্বী, প্রায় পঁচিশের মেয়েটির শরীরে এখন অবিশ্যি একটা আলগা ক্লান্তির ছাপ।

একটুক্ষণ মাথা নীচু করে যেন, নিজেকে সংযত করল জুলি। তারপর ডাগর চোখ তুলে সত্যর দিকে চেয়ে রইল। সত্য বললেন, 'মিস্টার জোশী ক'টা নাগাদ আপনার বসের ক্যাবিনে ঢুকেছিলেন?'

'তখন চারটে হবে।'

'ভেতরে কেউ ছিল?'

'আমি ছিলাম।'

'জয়দীপ তো তখন ছিল না। আপনি কী করছিলেন ভেতরে?'

'একটা ফাইল খুঁজছিলাম।'

'জোশীর সঙ্গে আপনার কোনও কথা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, উনি জিগ্যেস করেছিলেন স্যার কোথায়? বললুম কনফারেন্স রুমে। উনি চেয়ারে বসতে-বসতে বললেন, ঠিক আছে, আমি বসছি। স্যারকে খবর দেব কি না জানতে চাইলে বলেছিলেন, না, দরকার নেই। তারপর আমি বেরিয়ে এসে নিজের টেবিলে বসি।'

'জয়দীপ রায়কে চা-কফি কি আপনি বানিয়ে দ্যান? না, ও নিজেই করে নেয়?'

'কখনও স্যার নিজেই করেন, কখনও আমি বানিয়ে দিই। দত্তারাম বা শিবালকরও বানিয়ে দেয় কখনও-সখনও।'

'শিবালকর কে?'

'মিস্টার জোশীর খাস বেয়ারা।'

'জোশীর সঙ্গে রায়ের সম্পর্ক কীরকম ছিল।'

'হট অ্যান্ড কোল্ড!'

'ঝগড়াঝাঁটি?'

'মাঝে-মধ্যে চেঁচামেচি হত।'

'কী নিয়ে?'

'বেশির ভাগই ক্লায়েন্ট নিয়ে। জোশী বোধহয় ভাবতেন যে স্যার চেয়ারম্যানের কাছে ওঁর এগেনস্টে কথা বলেন—সেই নিয়েও।'

'জোশী মানুষ কেমন ছিলেন?'

'আমার সঙ্গে তো সরাসরি বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তবে, এমনিতে সকলের সঙ্গে বেশ ভালো। তবে, বড় রগচটা। যখন-তখন যাকে-তাকে বলতে শুনেছি—আই উইল স্যাক ইউ—'

'বিশেষ করে কারুর প্রতি রাগ ছিল কি?'

'না। কোনও বাছবিচার থাকত না রেগে গেলে। এই তো আজ সকালেই তো—'

বলে, হঠাৎ থেমে গেল জুলি।

'আজ সকালে—কী?'

'মানে স্যারকে বলছিলেন—ড্যাম ইট, আই'লকিল ইউ—'

'কোথায়? এই ঘরে?'

'উঁহু। মিস্টার জোশীর ক্যাবিনে।'

'হুঁ।' একটু ভেবে নিয়ে সত্য অন্য প্রশ্নে গেলেন, 'মৃতদেহ আপনিই প্রথম দেখেন, মিস সালডানা?'

'ইয়েস স্যার।'

অর্থাৎ, জীবিত মিস্টার জোশীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে আপনার।'

'আজ্ঞে।'

'মৃতদেহও প্রথম আপনিই আবিষ্কার করেন?'

'হ্যাঁ, স্যার!'

জুলির চোখমুখে আবার আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠল। বিহ্বল চোখে চেয়ে আছে।

সত্য মৃদু হেসে বললেন, 'না-না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হয়তো, স্রেফ কোইন্সিডেন্স—মানে, কাকতালীয়। আচ্ছা। লাঞ্চের পরে জোশী ক্যাবিনে ঢোকার আগে, কে-কে ক্যাবিনে ঢুকেছিল?'

'দত্তারাম, শিবালকর ছাড়া মিস লাখানি। ও হ্যাঁ, তা ছাড়াও দেশলাই খুঁজতে মিস্টার চওধরি।'

'জোশীকে কফি কে বানিয়ে দিয়েছে? আপনি?'

'নো, স্যার।'

আরও দু-একটা সাধারণ কথাবার্তার পরে জুলিকে ছেড়ে দিলেন সত্যসাধন। উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল জুলি, সত্য হেসে বললেন, 'আপনাকে কনগ্র্যাচুলেশন ও আগাম বেস্ট-অফ-লাক।'

'জুলি অবাক, 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। কিন্তু, কী জন্যে?'

'শিগগিরই বিয়ে করছেন তো?'

লজ্জায় এক মুহূর্ত অধোবদন জুলি সালডানা। তারপরেই মুখ তুলে জিগ্যেস করলে, 'স্যার মানে, ইয়ে—আপনাকে কে বলল? অফিসের কেউ তো জানে না এখনও।'

'ভেরি সিম্পল, মিস সালডানা। আপনার হাতের আংটি। 'এন' অক্ষরটি খোদাই করা। অথচ, ওটি আপনার নামের আদ্যাক্ষর নয়। মানে, এনগেজমেন্ট বা আশীর্বাদ হয়ে গেছে আপনার।'

দ্বিতীয় মহিলাটির বয়স পঞ্চাশের কাছে। ঢুকতেই সত্য বুঝলেন চুলে কলপ করেন। মুখে পুরু মেকআপ। দোহারা শিথিল গঠনকে চাপা সালোয়ারকামিজে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।

ওঁকে বসতে বলে, নাম জানতে চাইলেন সত্য।

'মিস মীরা লাখানি।'

'এখানে কদ্দিন চাকরি করছেন?'

লাখানি মনে-মনে হিসেব করে বললেন, 'সাত বছর চার মাস।'

'এই ক্যাবিনে আজ ক'বার এসেছেন আপনি?'

'অ্যাঁ? একবার।'

'কখন?'

'ঠিক খেয়াল নেই। দেড়টা-দুটো।'

'কেন?'

'ইয়ে, ওই টি-ব্যাগ! স্যার, মানে, মিস্টার জোশীর টি-ব্যাগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই নিতে এসেছিলুম।'

'জয়দীপ তখন ছিল কামরায়?'

'না-না! না তো!'

'মিস্টার জোশী কি খুব চা খেতেন?'

'চা-কফি দুটোই।'

'দিনে ক'বার?'

'অন্তত দশ-বারো কাপ।'

হঠাৎ সত্য জিগ্যেস করলেন, 'আপনি সিগারেট খান?'

'অ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে।'

'কোন ব্র্যান্ড?'

'উইলস!'

'একটা খাওয়াবেন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!'

কোলে রাখা চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে লাল উইলসের প্যাকেট বের করলেন লাখানি। খুলে এগিয়ে ধরলেন। হাত সামান্য কাঁপছে মহিলার। সত্য বললেন, 'একটাই আছে!'

'তাতে কী! খান না, স্যার! খান!'

সিগারেট বের করে খালি প্যাকেটটা টেবিলে রাখলেন সত্য। ধরিয়ে বললেন, 'থ্যাংক ইউ। আপনি যেতে পারেন। বেয়ারাকে একটু পাঠিয়ে দিন।'

মীরা লাখানি বেরিয়ে যেতেই দ্রুত সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে পুরে ফেললেন সত্যসাধন।

ঠিক তক্ষুনি, বাইরে একটা কান্নাকাটির আওয়াজ শোনা গেল। পুরুষকণ্ঠে হাঁউ-মাঁউ গোছের অস্ফুট চিৎকার ভেসে এল শীততাপনিয়ন্ত্রিত ক্যাবিনে।

॥ ছয় ॥

পকেটের টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন সত্য। দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল এক বিচিত্র এবং করুণ দৃশ্য। বেয়ারা দুজন একেবারে ভেঙে পড়েছে। কে যে কোনজন, কার কী নাম তখনও জনেন না সত্য।

দুজনেরই জলপাই সবুজ উর্দি পরনে। কালো মতন কমবয়েসিটি জয়দীপের হাঁটু ধরে হাঁউমাঁউ চেঁচাচ্ছে মারাঠি ভাষায়, 'মালা কায় মাইতি নাহি, সাহেব! বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিতে বলুন—'

বাকি কথা ধরা যাচ্ছে না।

অন্যটি বয়স্ক, রোগা। লেবড়ে বসে পড়েছে কার্পেটে। সেপাইয়ের পা জাপটে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কনস্টেবল তার পা ঝটকা দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

সত্যসাধনকে দেখেই দুজনের বাকরোধ হয়ে গেল। জয়দীপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সত্য জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে? কান্নাকাটি কীসের?'

জয়দীপ সামান্য হাসার বৃথা চেষ্টা করল। বলল, 'কিছুই না। ওরা দুজনে অন্যদের মতোই ভয় পেয়েছে। তার ওপরে, ইন্সপেক্টর জবানবন্দি নেওয়ার সময় হাজতে পুরে দেবেন বলে দাবড়ানি দিয়েছেন। লাঠি দিয়ে আলতো খোঁচাও মেরেছেন দত্তাকে। তাই একটু টেরিফায়েড—'

সেপাইকে ইশারায় ভেতরে আসতে বলে, সত্য বয়স্কটিকে উদ্দেশ করে বললেন—'ভয় নেই। আমি মারব না। হাজতেও পুরব না। স্রেফ কয়েকটা কথা জিগ্যেস করে ছেড়ে দেব। এসো।'

বলে, আবার ক্যাবিনে ঢুকলেন সত্যসাধন। ঢুকে, রেকর্ডার 'অন' করে দিলেন। গুটি-গুটি দরজা ঠেলে এসে ঢুকল বয়স্ক। সে তখনও ফোঁপাচ্ছে। ঝ্যাঁটা গোঁফ। কুতকুতে গোল-গোল চোখদুটির চারপাশে কালো বৃত্ত। মাথার টাক দেখে মৃত জোশীকে মনে পড়ল সত্যর। জোশীর মাথায়ও ঠিক এমনি টাক। জিগ্যেস করলেন—'তুমি কি জোশীসায়েবের পিওন? শিবালকর?'

'হো, সাহেব।' নাক টেনে জবাব দিল লোকটা।

'কদ্দিন কাজ করছ এখানে?'

হাত জোড় করে শিবালকর জানাল, 'আজ্ঞে মুম্বাইতে ন'মাস।'

'তার আগে কোথায় ছিলে?'

'পুনা হেড অফিসে।'

'কী করতে?'

'মালিক-সাহেবের খাস-পিওন ছিলাম।'

'ক'বছর?'

'এগারো বছর।'

'সায়েবের ছেলেমেয়ে ক'টি?'

'একই মেয়ে—শকুন্তলা মেমসাব।'

'রয়-সায়েবের ঘরে ক'বার গিয়েছিলে আজ?'

'একবার। সকালে।'

'কী কাজে?'

'জোশী সাবের চিঠি সই করিয়ে আনতে।'

ধমকে উঠলেন সত্যসাধন, 'বিকেলে যাওনি?'

থতমত খেয়ে, আবার কাঁদো-কাঁদো মুখ হল শিবালকরের, 'আজ্ঞে না—মানে, হ্যাঁ। তবে, রয়-সায়েব তো ছিলেন না।'

আবার ধমক, 'তাই ভেতরে ঢুকেছিলে?'

'আজ্ঞে—না—'

বলেই ফুঁপিয়ে উঠল লোকটা। ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সত্যর হাঁটুর কাছে, 'কিছু জানি না, সায়েব। আমি নির্দোষ।'

পা সরিয়ে নিয়ে কড়া গলায় সত্য বললেন, 'একেবারে উঠে দাঁড়াও। সোজা হয়ে।'

কাঁপতে-কাঁপতে আদেশ পালন করল শিবালকর।

সত্য ফের নরম গলায় প্রশ্ন করলেন, 'ভেতরে ঢুকেছিলে কেন? সত্যি কথা বলো।'

'ঠোঁট চেটে ঢোক গিলছে শিবালকর। হাত কচলাতে-কচলাতে শব্দ খুঁজছে যেন। সত্য বললেন, 'শিগগির বলো। পুলিশ ডাকব নইলে—'

বেয়ারার মুখ থেকে বুলেটের মতো ছিটকে বেরুল, 'শাকর—'

সত্য অবাক হলেন একটু, 'চিনি? মানে?'

নাকিসুরে কান্নার গলায় জবাব, 'চিনি খেতে ঢুকেছিলুম—সাব—' বলতে বলতে আবার হুমড়ি খেতে যাচ্ছিল লোকটা, 'রয়-সায়েবকে বলবেন না, বাবুজি। আমার চাকরি—'

বাধা দিলেন সত্য। 'ঠিক আছে—ঠিক আছে—। তার মানে তুমি চিনি চুরি করো?

'এক চামচ। রোজ নয়, সাহাব। মাঝে-মধ্যে।' —হঠাৎ কান মলে কথা শেষ করল শিবালকর, 'আর কোনও দিন যাব না, সায়েব—'

মধ্যবয়স্ক একটা মানুষকে হাজতের ভয়ে প্রায় বাঁদরের মতো অঙ্গভঙ্গি করতে দেখে সত্যর প্রথমে সামান্য হাসি পেল। সঙ্গে-সঙ্গে হল রাগ। সে রিপুকেও দমন করতে কয়েক মুহূর্ত ভাবনায় ডুবে গেলেন। প্রত্যেকেই কমবেশি অ্যাক্টিং করে গেল জবানবন্দি দেওয়ার সময়। এরটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না তো? হতেই পারে। হরবিলাস, মিস লাখানি, জয়দীপ—এরা কেউই বেয়ারাজাতীয় পোস্টের নয়। ওদের ব্যবহার এতটা 'লাউড' হওয়ার কথাও নয়। সুতরাং, অশিক্ষিত-অধস্তন বেয়ারার পক্ষে—এ-ধরনের 'অ্যাক্ট-করা', বা, আতঙ্কের এমন প্রকাশ অস্বাভাবিক নয় বোধহয়।

'জোশীকে এ-ঘরে কফি কে বানিয়ে দিয়েছে? তুমি?'

'না, সায়েব।'

আচমকা চাপা গলায় শিবালকরকে জিগ্যেস করলেন সত্য, 'একটা গোপন খবর দিতে পারো হে?'

মুহূর্তে স্থির হয়ে, অল্প ঝুঁকে দাঁড়াল শিবালকর। জুলজুল চোখে ঔৎসুক্য এবং উদ্বেগ। গলা খাটো করে সে বলল, 'হো সায়েব, বোলা—'

'তোমাদের রয়-সায়েব কেমন লোক?'

জিভ কেটে এক-পা পিছিয়ে গেল শিবালকর, 'ছোট মুখে বড় কথা—না সাব, আমি কিছু বলতে পারব না—সাব।'

ওর মুখ দেখে কিন্তু সত্যর একটি কথাই মনে হল—'আর একবার সাধিলেই খাইব।' ফলে, আরও গলা নামিয়ে বললেন, 'আমি কাউকে বলব না, তুমি বলো।'

যথেষ্ট ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে, দরজা টেনে শিবালকর বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। সত্যও ওকে দেখলেন। খসখসে আওয়াজে কথা বলল লোকটা, 'প্রায়ই জোশীসায়েবের সঙ্গে লেগে যায়। সেদিন তো প্রায় হাতাহাতি হওয়ার জোগাড়—'

'কোথায়?' বাধা দিলেন সত্য।

'আমার সায়েবের ক্যাবিনে।'

'কী নিয়ে?

'তা, আমি, মুখ্যু মানুষ—আংরেজি তো বুঝি না—'

'হুঁ।' সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন সত্য।

'তা ছাড়া, রয়-সায়েবের সঙ্গে শকুন্তলা বাইয়ের—'

বলতে-বলতে থেমে গেল শিবালকর।

'হুঁ!' বলে ধরতাই দিলেন সত্য আবার।

'মানে, তাই নিয়ে জোশীজির সঙ্গে খটাখটি—'

'তোমার কী মনে হল, জয়দীপ রায় ওঁকে খুন করতে পারে?'

'আলবাত পারে, স্যার?'

'আর ওর বেয়ারা—?'

'ও-ও পারে! সায়েব!'

'কেন?'

'রয়-সাবের জন্যে ও জান দিতে পারে।'

প্রশ্নোত্তরের মধ্যে অজস্র সুতো এসে জুটছে, আর জট পাকিয়ে যাচ্ছে সত্যসাধনের ভাবনায়। বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি যাও। রয়ের বেয়ারা—কী নাম যেন—পাঠিয়ে দাও।'

'দত্তারাম।' বলতে-বলতে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলে, খুশি-খুশি মুখে বেরিয়ে গেল শিবালকর।

কাঁচুমাচু মুখ করে দত্তারাম ঘরে ঢুকতেই সত্যসাধন দুম করে প্রথমেই জিগ্যেস করলেন, 'কোন সিগারেট খাও তুমি?'

'জি?—ইয়ে,—গোল্ড, সায়েব!'

'কই, দেখি?'

বলে হাত বাড়ালেন সত্য।

দত্তার বয়েস পঁয়ত্রিশের কাছে-পিঠে। মাথাভরতি চুল। চোয়াড়ে মুখ। ইউনিফর্মের পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে দত্তা বলল, 'নেই, স্যার। খতম হো গিয়া।'

তড়াক করে উঠে এগিয়ে এলেন সত্য। ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখে চোখ রেখে শক্ত গলায় বললেন, 'মিথ্যে কথা। তোমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, তা তুমি নিশ্চয়ই জানতে। হঠাৎ পকেট হাতড়ালে কেন? দেখি—'

বলে, বুশশার্টের সাইড-পকেট জোড়ায় হাত ঢোকালেন। ও কাঁদো-কাঁদো মিনমিনে সুরে বলে চলেছে, 'নেই সায়েব। খতম। সম্পলা—'

'ততক্ষণে বুক-পকেট থেকে রুপোলি রাংতার মোড়ক বের করে ফেলেছেন সত্য। ওকে কোনও কথা না বলে, ফিরে এলেন সোফায়। দত্তারাম ডুকরে কেঁদে ফেলেছে এবার।

মোড়ক খুলতে একটা সিগারেট বেরোল। সাধারণ সিগারেট। গোল্ড। সত্য ওটার দিকে দেখতে-দেখতে জিগ্যেস করলেন, 'প্যাকেটটা কোথায়?'

কান্না চাপতেই বোধহয় দমকে-দমকে হেঁচকি তোলার কায়দায় জবাব দিল দত্তারাম 'ফেহ্-হে-হেলে দি-ই-য়েছি—'

'কেন?'

'এ-হে-হ্-হেমনি—'

'প্যাকেট ফেলে দিয়ে রাংতায় মুড়ে রেখেছ? ততক্ষণে ঘটনাটা পরিষ্কার হয়েছে। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকতেই টের পেলেন সত্য। ভেতরকার তামাকের সঙ্গে হয় গাঁজা বা চরস মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে!

'কোথায় পেলে এটা?'

'প্যাকেটেই ছি-হি-হিল—'

এবার ধমক, 'সত্যি কথা বলো।' সঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হল দত্তার, 'ওরলির অনেক পানওয়ালার কাছে চরস পাওয়া যায়। আমরা সিগারেটের তামাক বের করে, মিলিয়ে, ফের ভরে দিই।'

'আমরা মানে?'

'আমি, শিবা, গেটম্যান—'

'হুঁ। তা এ-ক্যাবিনে তুমি মোটামুটি দিনে ক'বার ঢোকো।'

'ঠিক নেই, সায়েব।' দম নিয়ে আবার বলল, 'আমার সায়েব যতবার ডাকেন।'

'আজ ক'বার ঢুকেছ মনে আছে?'

একটু ভেবে নিয়ে দত্তার জবাব, মাথা নেড়ে-নেড়ে, 'ঠিক মনে নেই, স্যার। ছ' সাতবার হবে।'

'তোমার সায়েব না থাকলে ঢোকো না?'

'না, সায়েব।'

ধমকে উঠলেন সত্য, 'আজ বিকেলে কেন ঢুকেছিলে?'

একটু থতমত খেয়েই, সামলে নিল দত্তা, বলল, জোশীসায়েব ডেকে ছিলেন। জল চাইতে। আমি জল দিয়ে, খালি গেলাস নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

'যাওয়ার আগে কফি বানিয়ে দিয়েছিলে তো?'

'হাঁ, সাব—নেহি, সাব—কিন্তু, আমি কিছু জানি না—আমাকে ছেড়ে দিন, সাব—' বলতে-বলতে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল দত্তা। দু-হাতে মুখ ঢেকে হাঁউমাঁউ শব্দে কান্না মিশিয়ে কী বলতে লাগল বোঝা গেল না।

উঠে, কাছে গেলেন সত্য। হাত ধরে তুলে ওকে দাঁড় করালেন, 'ওই চরস-সিগারেট ক'টা খেয়েছ আজ, দত্তা?'

চোখ মুছে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, 'জানি না, স্যার—মনে নেই—আমায় ছেড়ে দিন, বাবুজি—'

'চোপ।'

ধমক খেয়ে দত্তা একেবারে বোবা।

'কফি ওকে তুমি বানিয়ে দিয়েছ?'

ভয়ার্ত চোখে মুণ্ডু নেড়ে দত্তা জানাল—হ্যাঁ।

'তুমি কি জানতে কফির কৌটোয় বিষ মেশানো ছিল?'

মুখ বিকৃত করে, কান্না চাপতে-চাপতে, মাথা দুপাশে নাড়িয়ে জানাল—না।

গলার স্বর নামিয়ে সত্য জিগ্যেস করলেন, 'কে মেশাতে পারে, বলো দিকি?'

ভয়ে-ভয়ে মাথা নেড়ে বোঝালো দত্তা—জানে না!

সত্য ফিসফিস করে, প্রায় ওর কানে-কানে বললেন, 'শিবালকর?'

মুহূর্তে দত্তার মুখের চেহারা পালটে গেল, 'হ্যাঁ, সায়েব! ও-ই তো! আপনি কী করে জানলেন? অথচ, দারোগা সায়েব ওকে ধরলই না।—'

'তুমি কী করে জানলে, বলো তো?'

'আহা! ও তো গুরু ঘন্টাল। পুনায় নানান লটর-ঘটর করেছে! ওই কারণেই তো ওকে এখানে বদলি দেওয়া হয়েছে!'

দত্তাকে ছেড়ে দিয়ে টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করলেন সত্য। আরএকবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলেন ঘরটায়। খুচরো যা জিনিসপত্তর ছিল পুলিশ সব নিয়ে গেছে। জয়দীপের কোট থেকে আরম্ভ করে ভাঙা কাপ-ডিশ, কফি-দুধ-চিনির কৌটো। জল গরমের কেটলি, চামচ ইত্যাদি। সোফায় ফেরত এসে বসে, একটা গোল্ড ফ্লেক ধরাতেই মনে হল, জয়দীপের টেবিলের ওপাশের অভিশপ্ত চেয়ারে জোশী টানটান বসে আছেন। হাতে ভাঙা কাপের হ্যান্ডেল ধরা। ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্তের ফোঁটা গড়াচ্ছে। বাঁ-হাত তুলে কোটের হাতায় সেটা মুছলেন। গোলগাল, বিষণ্ণ মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে কী যেন বিড়বিড় করলেন।

এ-সি হলেও বন্ধ ঘর। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। সত্যসাধন তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরোতেই, জয়দীপের প্রায় মুখোমুখি। সত্য বললেন, 'চলুন।' বলেই হাঁটতে আরম্ভ করলেন হলঘরের দিকে।

'কোথায়?' জয়দীপ কি একটু ইতস্তত করছে? সত্যর তাই মনে হল। বললেন, 'কেন? আপনি তো জুহুর দিকে থাকেন। চলুন, বান্দ্রা অবধি একসঙ্গে যাই। যেতে-যেতে কথা হবে।—'

'না, মানে আমাকে যে একটু অন্যদিকে—'

জয়দীপকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে সত্য দাঁড়িয়ে পড়লেন। সরাসরি জিগ্যেস করলেন, 'ভাইয়ের খোঁজে?'

'হুঁ।'

'মনে হচ্ছে, পুলিশকে এসব কিছুই বলেননি?'

'না।'

'কেন?'

হলঘরে আর কোনও লোক নেই এখন। সেপাই দুজন ঢুলে বসেছিল। ওদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। সত্য ওদের বললেন, 'ক্যাবিনটা সিল করে দাও। হয়তো, কাল আবার আমি আসব।'

'জি, সাহাব।'

সেলাম ঠুকল দুজনে।

লিফটের কাছে এসে দাঁড়ালেন সত্যসাধন। পেছনে জয়দীপ। জয়দীপ বলল, 'ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ওরা দুজন এখন যার কাছে আছে, তাকে আমি চিনি।'

লিফট এসে গেল। ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে সত্য বললেন, 'দুজন মানে?'

'আমার ভাই-বোন।'

লিফট নিঃশব্দে নামছে। সত্য জিগ্যেস করলেন, 'দুজনকেই কিডন্যাপ করেছে?'

'হুঁ।'

সত্য ভেবে দেখলেন, মাদল এ-ব্যাপারে কিছু বলেনি। তবে, প্রথম গাড়িতে যে-মহিলা বা

মেয়েটিকে ও শুয়ে থাকতে দেখেছে, সেই কি জয়দীপের বোন?

ঝমর-গাড়ির কাছে পৌঁছে সত্য প্রশ্ন করলেন, 'পুলিশকে জানালে তো ব্যাপারটার সুরাহা তাড়াতাড়ি হতে পারত। তাই নয় কি?'

'না। সে-লোক বড় ভয়ঙ্কর, ওদের হয়তো প্রাণেই মেরে ফেলবে। সেইরকম হুমকিও দিয়ে রেখেছে।'

গাড়িতে বসতে-বসতে সত্য বললেন, প্রায় আদেশের ভঙ্গি, 'আসুন ভেতরে।'

জয়দীপ সত্যর পাশে খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসতে বাধ্য হল। ঝমর একবারেই স্টার্ট নেয়। এখনও নিল। সত্য জিগ্যেস করল, 'ওরা যে কিডন্যাপড হয়েছে আজ এবং আপনার পরিচিত ব্যক্তিই এ-কাণ্ড করেছে—এসব আপনি জানলেন কখন এবং কীভাবে? তখন তো পুলিশের লোক, মানে, ইন্সপেক্টর সাঠে আপনাদের অফিসে?'

'টেলিফোন এসেছিল আমার নামে। সাঠেই তুলেছিল। ওপার থেকে বলেছিল, কোনও বন্ধু ফোন করছে, ব্যক্তিগত ব্যাপার।—'

'কী বলল লোকটি আপনাকে?'

'বলল, তুমি কোনও কথা বলো না, খালি শুনে যাও। আমি রুদ্রাক্ষ সেন কথা বলছি। তোমার ভাইবোন আমার কাছে আছে। ভালো আছে। চিন্তার কারণ নেই। ভালোও থাকবে, অবশ্যই যদি তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার কথা শোনো।—'

জয়দীপ চুপ করে গেল হঠাৎ।

সত্য জানতে চাইলেন, 'কোন দিকে যাব?'

জয়দীপ বিহ্বল চোখে চেয়ে বলল, 'আপনি কি সত্যি-সত্যিই আমার সঙ্গে যেতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'জয়-জাহ্নবী, মানে, আমার ভাইবোনের ক্ষতি হতে পারে।'

'যেতে-যেতে আপনার গোটা ঘটনাটা আমি শুনতে চাই। শোনার পর যদি তেমন মনে করি, তো আমি অবশ্যই শেষ অবধি যাব না। আর, এতেও যদি আপনি রাজি না থাকেন, তা হলে, অনায়াসে নেমে যেতে পারেন। তবে, আমার কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্যের আশা আর আপনি করতে পারবেন না।'

জয়দীপ করুণ গলায় বলল, 'এমন করে বলবেন না, স্যার। পুরো ব্যাপারটা শুনলে আপনি বুঝবেন, কী বিচ্ছিরি বিপদে আমি পড়েছি। এবং আমার আর কেউ নেই—আপনি ছাড়া।'

'কোন দিকে যাব?'

'ব্রিচ ক্যান্ডি। ওয়ার্ডেন রোড।'

॥ সাত ॥

নারিমান পয়েন্ট থেকে চৌপাটি, ওয়ালকেশ্বর অবধি মেরিন ড্রাইভের প্রশস্ত দীর্ঘ পথটি অর্ধবৃত্তাকার। ঝমর তার বিচিত্র রং-বেরঙের চেহারা নিয়ে ঝমঝমিয়ে চলেছে। বাঁ-দিকে খোলা আরব সমুদ্রের অন্ধকার থেকে হা-হা বাতাস ছুটে আসছে দমকে-দমকে। দু-ধারে রাস্তার আলো। ডানদিকের সারিবদ্ধ বাড়ির গায়ে ঝুলছে অজস্র নিয়ন সাইন। টিভি, টায়ার, জীবনবীমার আলোকিত বিজ্ঞাপন জ্বলছে-নিভছে, আবার জ্বলছে। এই আলোকমালা এ-ধারে নারিমান পয়েন্ট থেকেই একেবারে শেষ প্রান্তে চৌপাটি পর্যন্ত দেখা যায়। মনে হয়, আলো অন্ধকার সমুদ্র তটভূমির মিলনক্ষেত্রে একটি মণিমানিক্যের কণ্ঠহার কেউ পরিয়ে দিয়েছে। সায়েবরা এ-অঞ্চলের নাম ভালোবেসে রেখেছে—'কুইনস নেকলেস'।

টপ গিয়ারে ইঞ্জিন রেখেও খুব ধীরে-ধীরে গাড়ি চালাচ্ছেন সতসাধন। একেবারে ফুটপাথ ঘেঁষে চকচকে-ঝকঝকে গাড়ির স্রোত ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে যাচ্ছে ঝমরকে ছাড়িয়ে। খুব মন দিয়ে জয়দীপের প্রত্যেকটি কথা শুনছেন সত্য। ওর কথার গতিতে বাধা না দিয়ে আলগোছে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করছেন টুপটাপ। যেমন—

'নিজামুদ্দিনে আপনাদের বাড়ি থেকে, আপনার অই দিল্লি পাবলিক স্কুল কতটা পথ?'

জয়দীপ ভাবতে-ভাবতে বলল, 'কত আর হবে? এই দেড়-দুই কিমি!'

'হেঁটে যেতেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। তারপর?'

আবার খেই ধরে কথা বলতে শুরু করে জয়দীপ। তার ছোটবেলার কথা।

'কাছাকাছি বাড়ি। একই স্কুল। প্রায়ই একসঙ্গে যাতায়াত। উঁচু ক্লাসের দিকে ওর দাদা, এই রুদ্রাক্ষ, কখনও-সখনও গাড়িতে লিফট দিত আমাদের। নিজের গাড়ি। কলেজের থার্ড ইয়ারেই সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনে ফেলেছিল একখানা। অত ছোট বয়সে কিছুই বুঝতাম না। পরে বুঝেছি, রুদ্রদা নানান ধান্দায়, দলবলে মিশে বেশ মোটা হাত-খরচা নিজেই রোজগার করত—ঠিক কীভাবে, কে জানে!'

সত্যসাধন বাধা দিলেন এখানে, 'ওর বাবা কী করতেন?'

'মালটি-ন্যাশানাল কোম্পানিতে বড় অফিসার ছিলেন। রাশভারি লোক। কোম্পানির গাড়িই ছিল। নিজামুদ্দিনের মতো উচ্চমধ্যবিত্ত পাড়ায় বাংলো করেছিলেন নিজে। তবে, ছেলে কম বয়েসেই লায়েক হয়ে উঠেছিল। বাবার সঙ্গে বনত না বিশেষ। প্রায়ই দুজনে লেগে যেত। মা-ই নাকি ছেলেকে সামাল দিয়ে আগলে রাখতেন—'

'এসব ঘরের-খবর আপনি জানলেন কী করে?'

'নিম্বু এসে বলত।'

সত্য ভুরু কুঁচকে আড় নয়নে জয়দীপকে দেখলেন, 'নিবেদিতা সেনের ডাক নাম নিম্বু? মানে, লেবু?'

'হুঁ। পাড়ায় সবাই ওই নামেই ডাকত।'

প্রচ্ছন্ন রসিকতার গলায় সত্য জিগ্যেস করলেন, 'নামটি কি আপনিই রেখেছিলেন?'

প্রশ্নটি এড়িয়ে গেল জয়দীপ, 'বোধহয়! ঠিক মনে নেই। সেই ক্লাস ফোর-ফাইভের কথা। স্কুলের বন্ধুরাও শর্টকার্টে "নিম্বু" বলে ডাকত ওকে।'

বলে, থেমে গেল সে। ভাবছে কী যেন।

'হু। তারপর?'

খেই ধরালেন সত্যসাধন। ধরিয়ে, শ্রুতি এবং বোধ টানটান করে থাকলেন।

সোজা সামনে তাকিয়ে কথা বলতে লাগল জয়দীপ। বলতে-বলতে বর্তমান অবস্থা, সময় থেকে পিছিয়ে গেল সে অনেকগুলো বছর। দিল্লির নিজামুদ্দিনে। মথুরা রোডের কাছে, ছোট রাস্তায়, গলিতে নেমে পড়ল হাফ প্যান্ট পরে। লুকোচুরি, ডাং-গুলি, ছি-বুড়ি। নিম্বু বলল, হাঁফাতে-হাঁফাতে, 'এই জয়, প্লিজ! আমাকে ছুঁস না। আমি "আউট" হই সবসময়। আজকে ছেড়ে দে। দম ফুরিয়ে গেছে। অন্য কাউকে ধর। উফ—'

বলে, জয়ের কাঁধে ভর রেখে হাঁফাতে লাগল। কেউ দেখল কি না দেখে নিয়ে বালক আবার ছুটল অন্য কাউকে ছুঁয়ে দিতে।

নিম্বুর দাদা, মানে, রুদ্রকে দেখতে সেই তখন থেকেই বেশ হিরো-হিরো। জয়দীপ উঠেছে ক্লাস টেনে। নিম্বু নাইন। রুদ্রদা কলেজ ছেড়েছে বেশ ক'বছর আগে। গাড়ি কিনেছে। কীসের ব্যাবসা

করে কে জানে। বলে, আমদানি-রপ্তানি। ব্যাবসার প্রয়োজনে হঠাৎ-হঠাৎ উধাও হয়ে যায় দিল্লি থেকে। নিজে একখানা বিশাল ফ্ল্যাটও কিনে ফেলেছে বড়লোক পাড়ায়। গ্রিন পার্কে।

একদিন গাড়িতে ওদের দুজনকে লিফট দিচ্ছিল স্কুল অবধি। যেতে-যেতে রুদ্রদা জিগ্যেস করল জয়দীপকে, 'নেক্সট ইয়ার তো কলেজে! বিগ বয়, অ্যাঁ কলেজে পাশ-টাশ দিয়ে কী করবে ভেবেছ কিছু?'

যেমন নিম্মু তেমনি জয়। দুজনেই ভয় পেত ওকে। কোনওরকমে আমতা-আমতা করে জয়দীপের জবাব, 'মানে—এখনও ভাবিনি কিছু?'

'ভাবোনি মানে! স্কুলের রাস্তার মোড়ে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল রুদ্রদা। কথা শেষ করল হাসতে-হাসতে, 'বিগ বয়! বিগম্যান হওয়ার কথা ভাবো। আর কিচ্ছু ভেবে, হায়ার এডুকেশন করে হবে স্রেফ লবডংকা। বেসিক এডুকেশানটা নিয়ে বুদ্ধিতে একটু ধার দিয়ে নাও। দেন—ড্রিম অ্যান্ড প্ল্যান—হাউ টু বিকাম এ বিগ ম্যান—অর্থাৎ বড়লোক।'

ততক্ষণে ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। হাত তুলে 'বাই' জানিয়ে সদর রাস্তায় বেরিয়ে গেল রুদ্রদা। পিঠে বই-ভরতি ব্যাগের বোঝা বয়ে স্কুলের গেট পেরোতে-পেরোতে জয় জিগ্যেস করেছিল, 'হ্যাঁ রে নিম্মু, গ্রেট মানে কি খালি বড়লোক?'

তেমন কিছু না বুঝেই, বেণী দুলিয়ে নিম্মু হেসে-হেসে দুলাইনের ইংরাজি গানটা শুনিয়েছিল,

'মানি মানি মানি
মাস্ট বি হানি
ইন এ রিচ ম্যানস ওয়ার্লডি—'

আর এক দিনের কথা ঝুপ করে কুয়াশা নামার মতো জয়দীপের স্মৃতি আচ্ছন্ন করে দিল। খুব কেঁদেছিল নিম্মু সেদিন। ওদের বাংলো বাড়ির গেটের কাছে পাড়ার লোকদের ভিড়। পুলিশের ভ্যান। সামনের বাগানে সাদাপোশাকে অচেনা কিছু লোক। পুলিশ বলেই মনে হয়েছিল জয়দীপের। জটলার ফাঁক দিয়ে পাশ কাটিয়ে জয়দীপ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে গেল। নিম্মু ক্লাস নাইনে তখন। জয় টেন। দুজনের যাওয়া বা ফিরে আসা একসঙ্গে হলেও, আলাদা ক্লাস বলেই সারাদিন আর দেখা হয় না। সেদিন ফেরার সময় নিম্মুকে না পেয়ে খোঁজ নিতেই সে ঢুকেছিল বাড়ির ভেতর অবধি। গোটা দালানে এত মানুষ।—অথচ, কেমন শ্মশানের মতো চুপচাপ।

হলঘরের দুটি দরজার মুখেই দুজন করে পুলিশ দাঁড়িয়ে। জয়ের দিকে আড় নয়নে দেখে নিয়েও কিছু বলল না। নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথায় ব্যস্ত হয়ে থাকল।

নীচের তলায় এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে রান্নাঘরে পাওয়া গেল নিম্মুকে।

আধা-ভেজানো দরজার পেছনে দু-হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাঁধুনি-বউ চওরাসিয়া ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে কাঁধে-পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

'কী হয়েছে, মওসি?' দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে জয়দীপ জিগ্যেস করল। চোখে কৌতূহল। গলায় উৎকণ্ঠা। মওসি বিহারের বউ। আধো-হিন্দি আধো-বাংলায় জবাব দিল চাপা গলায়, 'উই তো জয়বাবু আ গয়া! আসলে পুলিশ ছাপা মারল বাড়িতে। ছোট দাদাবাবুকে ধরিয়ে লিয়ে গেল।'

তারপর, ঠোঁটে আঙুল চেপে চুপ থাকতে বলল, 'কিসিকো বলো নেহি, জয়বাবা। তুমহি ইকটু দিদিটাকে দ্যাখো। চাইকি, তুমহাদের বাসায় লিয়ে যাও। পোরে, পুলিশ আদমিরা চোলে গেলে হামি লিয়ে আসব। হামি উপোরে গিয়ে দেখছি কী হাল সাহাব-মেমসাহাবের—'

বলতে-বলতে বেরিয়ে গেল মওসি।

সেই যোলো-সতেরোর জয়দীপ এমন অবস্থায় এর আগে পড়েনি কখনও। নিবেদিতার কান্না থেমে গিয়েছিল ততক্ষণে। তবু, ওর পিঠে আলতো হাত ছুঁইয়ে জয়দীপ বেশ বড়দের মতোই, কিছু সান্ত্বনার কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বিশাল আশ্রয়ের মতো জয়কে আঁকড়ে ধরল নিবেদিতা। বুকে মুখ লুকিয়ে আবার ফুঁপিয়ে উঠল। নাক-টানার শব্দের মধ্যে জড়ানো কথা শুনতে পেল জয়, 'দাদা আর ফিরে আসবে না। দাদাটা খুব খারাপ—তাই পুলিশ ওকে জেলে নিয়ে গেল—

তখন প্রায়-যুবক জয়ের মুখে আর কথা ফুটছিল না। সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। এতকালের খেলার সখীকে সে হঠাৎ নতুন অনুভূতিতে আবিষ্কার করেছিল। প্রাপ্তবয়স্কদের স্বরে সান্ত্বনার কথা আওড়াতে গিয়ে ছেলেমানুষি গলায়, ভয়ে-ভয়ে, বলতে পেরেছিল, 'ভয় কী! আমি তো আছি!'

ঘটনার শেষের অংশ প্রায় নিজের মনেই বিড়বিড় করল জয়দীপ। ডান ধারে, অত কাছে বসেও স্পষ্ট শুনতে পেলেন না সত্যসাধন। তার ওপরে ঝমরের ঝমঝমানি, সমুদ্রের বাতাসি শব্দ—সব মিলিয়ে মিশিয়ে সত্য শুনতে না পেলেও দিল্লির কোনও এক অপরিচিত রান্নাঘরে, থমথমে আবহাওয়ায় আনকোরা দুটি তরুণ-তরুণীকে সঘন এবং আবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন। ব্রেক কষে লাল ট্র্যাফিক সিগন্যালে দাঁড় করালেন ঝমরকে। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে দিল্লি থেকে, প্রথম যৌবন থেকে যেন ফিরে এল জয়দীপ। বলল, 'ওমা। এসেই তো গেছি। বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে, প্রথম ডানদিকের গলিতে ঢুকতে হবে।'

শুনে নিয়ে, আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন সত্যসাধন, 'হুম। তার মানে, আপনার সঙ্গে ওই নিম্বু বা নিবেদিতার একটা মধুর সম্পর্ক হয়েছিল?'

'উঁ? হ্যাঁ। মানে, তা বলতে পারেন।'

জয়ের গলায় অন্যমনস্কতা ও সঙ্গে-সঙ্গে সচেতন হয়ে, সোজা উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা লক্ষ করলেন সত্য। হলুদ ছুঁয়ে সবুজ আলোও জ্বলে উঠল একইসঙ্গে। রাত হয়ে আসছে। মেরিন ড্রাইভের আলোকমালা ছাড়িয়ে ঝমর এসেছে অনেকটা পথ। পথে বাড়ি ফেরার ব্যস্ততা একেবারে হালকা হয়নি এখনও। ডানপাশের মারুতি জিপসির গা থেকে ঝমরকে সাবধানে বাঁচিয়ে, বাঁ-দিকে ঘুরলেন সত্যসাধন। ঝমর কিঞ্চিৎ আপত্তি জানিয়ে বলল, 'ঘ্যাং-ঘটর-ঘ্যাংটক-ঝম—'

মনে-মনে সত্য জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, বাছা! ঠিক আছে। কাল সকালেই তোমার বাঁ-দিকের মার্ডগাড কষে দেব। রবার লাইনিং কিনেও এনেছি।'

মুখে জিগ্যেস করলেন জয়দীপকে, 'তা এখন কি সেই সম্পর্ক নেই?'

জয়দীপ কেমন তেতোভাবে বলল, 'দেখুন স্যার। কিছু মনে করবেন না। এগুলো আমার একেবারেই ব্যক্তিগত জীবনের কথা। এই খুনের ঝামেলায় আমার জড়িয়ে পড়বার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এ-কথা আমি বারবার বলা সত্ত্বেও কেন জানি না, আপনার সন্দেহ মিটছে না।'

বাম গালে দ্যাখন-হাসি ফুটিয়ে জয়ের দিকে ফিরে তাকালেন সত্য। বললেন, 'সন্দেহ ব্যাপারটি আমার বাতিক বলতে পারেন। কাজের সর্বপ্রথম হাতিয়ার বললেও খুব ভুল বলা হবে না।'

ডানদিকের গলিতে ঝমরকে ঢুকিয়ে সামান্য এগোতেই জয়দীপ বলল, 'এসে গেছি।'

ঝমর দাঁড়াল।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল জয়দীপ, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আপনি একটু বসুন আসছি।'

সত্য হাসলেন। বললেন, 'কতক্ষণে?'

'দেখে আসছি। ওপরের অবস্থা দেখে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।'

'নিবেদিতা দেবী এই বাড়িতে থাকেন?'

পুরোনো আমলের পাঁচ-তলা বাড়ি। ইট নয়, শক্ত পাথরের দেওয়াল। কারুকাজ করা ফটক

থেকে সামান্য এগিয়ে ঝমরকে দাঁড় করাতে হয়েছে। কারণ, ফটক জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মস্ত লিম্যুসিন। সাদা রঙের বিলেতি হন্ডা।

সত্য চারপাশ দেখে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার বান্ধবীরই বাড়ি?'

'না। ও এখানে সেন্ট অ্যান স্কুলের প্রিন্সিপাল। পুরো তিন তলায়, স্কুলের কোয়ার্টারে নিবেদিতা থাকে।'

'আর কে-কে?'

'কেউ নয়। ও-একা।'

'ওঁর মা-বাবা?'

'বাবা দিল্লিতেই মারা গেছেন বছরখানেক হল। মা কলকাতায় ফিরে গেছেন। শ্বশুরের পৈতৃক ভিটেতে। ডায়মন্ড হারবার। আমি ঘুরে আসছি...'

বলে, এক কদম পিছোতেই, সামান্য গলা তুলে সত্য জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি নিয়মিতই এখানে আসেন?'

'না। কখনও-সখনও।'

চট করে পকেট থেকে ডায়েরি আর কলম বের করলেন সত্যসাধন, 'এখানকার ও আপনার বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটা লিখে দিয়ে যান।'

'এক্ষুনি?'

জবাব দিলেন না সত্য। ডায়েরির পাতা খুলে ডটপেন এগিয়ে ধরলেন।

হাতে নিয়ে নাম্বার লিখছে জয়দীপ, সত্য পকেট থেকে নিজের বাড়ির নম্বর লেখা 'সি-আই-এ'র কার্ড বের করে দু-আঙুলে ধরে থাকলেন। ডায়েরি পেন ফেরত দিয়ে কার্ড নিয়ে পকেটে রাখতে-রাখতে মেইন গেটের দিকে হাঁটতে লাগল জয়দীপ। শেষ মুহূর্তে ওর মুখে-চোখে চাপা উত্তেজনার ছাপ সত্যর নজর এড়াল না। ফিরে না তাকিয়ে, ঝমরের 'রিয়ার ভিউ মিরারে' চোখ পেতে ওর চলে যাওয়া দেখতে লাগলেন।

সাদা হন্ডার পাশ দিয়ে ঘুরে দ্রুত পায়ে ফটকের তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়দীপ। সঙ্গে-সঙ্গে দূর থেকে ওর গলা শুনতে পেলেন সত্য 'এ কী? রুদ্রদা!'

ওপরের ধাপে মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটিকে দেখতে পাওয়া গেল সঙ্গে-সঙ্গে। সাদা পোশাক। ট্রাউজার, জামা, জ্যাকেট সব সাদা। দারুণ স্মার্ট দেখতে। টকটকে ফরসা রং। ললাট এত প্রশস্ত—মাথার সামনের দিকটাকে টাকও বলা যায়। পিছনে পাতলা, কুচকুচে কালো চুল। উন্নত নাসা। অসম্ভব দৃঢ় চিবুক। সত্যসাধন মনে-মনে ভাবলেন, এই-ই তা হলে রুদ্রাক্ষ সেন। এ-রাজ্যের পাতালপুরীর অজস্র নাটের হোতা। এর বিপক্ষে কোনও প্রমাণ বা সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যায় না বলেই পুলিশ আজ অবধি মানুষটির ধারে-কাছে পৌঁছোতে পারেনি। যারা পৌঁছেছে, তারা এর মোসাহেব হয়ে গেছে। গোপনে হয়তো মাসোহারাও পায়। এ ছাড়া, যে দু-একজন রুদ্রাক্ষ বা গাজি কাপ্তানের ছায়া অবধি ছুঁতে পেরেছে—হাত পুড়েছে সেই মুষ্টিমেয় অফিসারদের। লাশ পাওয়া গেছে লোকালয়ের বাইরে। আরব সাগরের তীরে। চিহ্নবিহীন। সত্যসাধন আয়নায় চোখ রেখে মনে-মনে বললেন, 'সাবাস বাঙালির বাচ্চা! অ্যাই ঝমর! পোন্নাম কর বাচ্চা! হিল্লি-দিল্লি-বম্বের নমস্য বঙ্গসন্তান। এনার দরশন পাওয়া-সৌভাগ্যের বিষয়!'

রুদ্রাক্ষ একখানা সুন্দর হাসি উপহার দিয়েছে এখন জয়দীপকে। সত্য আন্দাজ করলেন—কত বয়েস আর হবে? পঁয়তাল্লিশ? ছে-চল্লিশ! বাহ্! একেবারে তাজা জোয়ান। রুদ্রাক্ষ মিষ্টি গলায় বলল, সত্য শুনলেন, 'ইটস নাইস টু সি ইউ হিয়ার, জয়। যাও, ওপরে যাও!—'

বলে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

জয় উদ্বিগ্ন গলায় জিগ্যেস করল, 'ওরা কোথায়?'

'ওরা? কারা? মুখে হাসি নিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে রুদ্রর পালটা প্রশ্ন।

'আমার ভাইবোন? জয়ী-জাহ্নবী?'

লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ গাড়ি। চালকের কাছের দরজা খুলতে-খুলতে রুদ্রাক্ষ বলল, 'সব ঠিক আছে। ওরা বহাল তবিয়তে আছে। ব্যাপারটি আর ঝুলিয়ে রেখো না। ওপরে গিয়ে কথা বলো—'

ইঞ্জিন স্টার্ট হওয়ার মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। জয়ের করুণ গলা শুনতে পেলেন সত্য, 'প্লিজ ওদের ছেড়ে দিন। ওরা কী দোষ করেছে? আমি কথা দিচ্ছি—দু-একদিনের মধ্যেই ভেবে দেখব—'

রুদ্রকে আর দেখা যাচ্ছে না। কথাও স্পষ্ট নয় এত দূর থেকে। জয় আবার বলল, 'আমি সঙ্গে যাব আপনার।—' বলতে-বলতে পিছনের দরজার হ্যান্ডেল ধরে টান দিয়েই বোধহয় রুদ্রর দিকে চোখ পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে হাত-জোড়া কেমন অসহায়ের মতো শূন্যে ঝুলতে লাগল।

সত্য আন্দাজ করলেন হয়তো ভয়ানক কিছু দেখাল রুদ্রাক্ষ গাড়ির মধ্যে বসেই। খুব সম্ভব—আগ্নেয়াস্ত্র।

'কাম অন, বিগ বয়। গো আপ! মিট হার। টক-টু হার।—'

বলতে-বলতে, রিভার্স গিয়ারে সাদা গাড়ি বড়রাস্তায় পড়ল। হাঁ করে, ভয়ার্ত বিহ্বল মুখে দাঁড়িয়ে আছে জয়দীপ।

॥ আট ॥

রুদ্রাক্ষকে দেখে জয়দীপ বোধহয় সত্যসাধনের কথা কয়েক মুহূর্তের জন্যে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। পিছনের মোড়ে পৌঁছে সাদা হন্ডা অদৃশ্য হতেই ঝমর ঝাঁকুনি দিয়ে স্টার্ট নিয়েছে। রিভার্স গিয়ারে পিছিয়ে এসে জয়ের সামনে দাঁড়াতেই সত্য বললেন, 'জয়দীপবাবু। আপনি ওপরে যান আমি ঘুরে আসছি। আটকে গেলে টেলিফোনে খবর নেব।—'

জয়দীপ যেন ভাসমান অবস্থায় নৌকো পেল। বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ওকে ফলো করবেন? আমিও আসছি!—'

দৃঢ় স্বরে সত্য বললেন, 'না। আপনি ওপরেই যাবেন। হয়তো, আপনার ভাইবোনকে এখানেই রেখে গেলেন রুদ্রাক্ষবাবু। না থাকলেও ক্ষতি নেই। আপনার এখন ওপরে গিয়ে মহিলার সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না সত্য। পিছিয়ে বড় রাস্তায় নেমে এল ঝমর। গিয়ার টপকে-টপকে জখমি চিতার মতো লাফাতে-লাফাতে এগোল—ঝম-ঝম ঝমর-ঝম—। সত্যসাধন ও মাদলের এই প্রিয় পোষা ঝমরের গতি এবং ধ্বনি ভারী বিচিত্র। অনেকটা ঘোড়ার চরিত্র। প্রথম-দ্বিতীয় গিয়ারে যখন ট্রটিং করে দুলকি চালে চলে, সারা অঙ্গের বাদ্যি-বাজনা, হেলন-দোলন থাকে চরমে। তৃতীয় গিয়ারে উঠে দ্রুত হাঁটা এবং দৌড়ের মাঝামাঝি অবস্থায়—দোলা এবং শব্দ কমে যায়। টপ গিয়ারে উর্ধ্বশ্বাস গ্যালপ করে যখন, তখন সারা শরীরে তীব্র গতি—শব্দহীন প্রায়। বড় জোর ঘুঙুরের ফিসফিসানি শোনা যেতে পারে কখনও-সখনও।

এখন ফোর্থ গিয়ারে ঝমর গলায় ঘুন্টি-বাঁধা স্পটেড চিতাবাঘের মতো গ্যালপ করে ছুটছে পেডার রোড ধরে। দূরে, সাদা লিম্যুজিনকে দেখতে পাওয়া গেল দশ-বারো সেকেন্ড পরেই। কেম্পস কর্নারের উড়ালপুল দিয়ে ওপরে উঠছে। সত্য ঘড়ি দেখলেন—রাত দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। মাদল

এখন কোথায়? কী করছে? ছেলেটা বিপদে না পড়লেই হল। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে বোঝালেন। না-না, ও যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সাহসী এবং সাবধানী। চট করে নিজের বিপদ ডেকে আনবে না।...

ঠিক সেই সময়, মাদল এক অতিকায় সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মালাবার হিলের এদিককার অংশকে বোধহয় ওয়ালকেশ্বর বলে। এর আগে এদিকে আসেনি মাদল। দরকারই পড়েনি। চারিদিকে বেশ নির্জন পরিবেশ। সমুদ্র সমতল থেকে যথেষ্ট উচ্চতায় বলেই জায়গাটায় বেশ আরামের ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব। সিংহদরজার দুই পাশ আঁকড়ে রয়েছে দেড়-দু-মানুষ উঁচু পাথরের দেওয়াল। ফটকের গায়ে দুটি গুমটি-ঘর। তার সামনে সটান দাঁড়িয়ে দারোয়ান দুজন। হাতে বন্দুক-টন্দুক নেই। তবে, লাঠি দেখতে পেল মাদল। সাদামাটা লাঠি কি না সে-বিষয়ে মাদলের সন্দেহ আছে। গুপ্তিও হতে পারে।

জগ্গু তখন ট্যাক্সিওয়ালাকে নির্দেশ দিচ্ছে হিন্দি এবং মারাঠি মেশানো খিচুড়ি ভাষায়, 'হো মাস্টার। সাইডমে লাগাও। বাজুলা আম্বা।'

ড্রাইভার গাঁইগুঁই করছে, 'হামকো ছোড় দো! গাড়ি দেওয়ার টাইম হয়ে গেছে।'

জগ্গু হুঙ্কার ছাড়ল, 'চো-ও-ও-প।'

ছেড়ে, এগিয়ে এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। মাদলের পাশে। দারোয়ানদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে, স্বর পালটে বলল, 'গুর্খাজি। জেজে সাবকো বোলো জগগু আয়া। জুহুকা জগগু। জগমোহন।'

ধীর এবং দৃঢ় পদক্ষেপে ডানদিকের দারোয়ান গুমটির ভেতরে ঢুকল। অন্যজন সটান দাঁড়িয়ে মরা মানুষের মঙ্গোলিয়ান চোখে ওদের দিকে চেয়ে থাকল।

গুমটির ভেতরে হয় ইন্টারকম বা ওয়াকি-টকি রয়েছে। কারণ, ভেতরে অদৃশ্য দারোয়ানের গলা শুনতে পেল মাদল, 'সাহাব! এক জগ্গু আয়া। বলছে, জুহু কা জগ্গু—'

চুপচাপ।

একটু পরে আবার, দু-বার, 'জি সাহাব।'

সঙ্গে-সঙ্গে গুমটির দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লোকটি জগ্গুকে জিগ্যেস করলে, 'সঙ্গে কে?'

স্থির দাঁড়িয়ে চোখ-কান সজাগ রেখেছে মাদল।

জগ্গু বলল, 'আর্টিস। যাকে সঙ্গে নিয়ে আসার কথা।'

মুখটি অদৃশ্য হয়ে গেল ফের। গলা শোনা গেল, 'আর্টিস—'

দু-চার সেকেন্ড চুপ। তারপর আবার, 'জি সাহাব।'

বলে, বেরিয়ে এল দারোয়ানজি। সোজা মাদলের সামনে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। বলল, 'চলো।'

সঙ্গীকে কী ইশারা করতেই, সে চাবি দিয়ে সিংহফটকের গায়ের ছোট দরজা খুলে দিল। মাদলকে বলল, 'চলো।'

জগ্গুও মাদলের পিছন-পিছন ঢুকতে যেতেই বাধা পেল, 'নেহি। আপকো যানে কা অর্ডার নেহি হ্যায়।'

জগ্গু বোধহয় প্রথমে বুঝতেই পারেনি, যে ওকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। জুহু এলাকার এত বড় মাস্তান, 'দাদা' বলতে ছোটখাটো স্মাগলাররা অজ্ঞান হয়ে যায়, তার পক্ষে এমন অপমান—বুকে লাগারই কথা। মাদলের হাসি পেল। পাড়ার মাস্তান বা গুণ্ডা প্রায় কুকুরের সামিল। বে-পাড়ায় গেলেই দাপট শুকিয়ে কেঁচো হয়ে যায়। লেজ গুটিয়ে কুঁই-কুঁই। প্রায় তেমনি গলায় জগ্গু মিনমিন করল, 'আমি ভেতরে যাব না? অ্যাঁ? তুমি ঠিক শুনেছ, দারোয়ানজি?' বলতে-বলতে শেষ খড়কুটোর মতো মাদলকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে এখানে পৌঁছে দেওয়ার জিম্মেদারি জেজে-সাহাব নিজে আমাকে দিয়েছে। হ্যাঁ। আজই—সন্ধেবেলা—'

বাইরের দারোয়ান ছোট্ট ঘুলঘুলি-দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। মাদল আর শুনতে পেল না

কিছু। দ্বিতীয় ওয়াচম্যানের পিছন-পিছন হাঁটতে লাগল। লাল মোরামের পথ। দু-ধারে সুন্দর ঘাসের গালিচা, বাগান। বাগানে নানান ঝোপঝাড়। ছোট-বড়-মাঝারি গাছ আধো-অন্ধকারে অপরিচিতের মতো দাঁড়িয়ে। সামনে, অল্প দূরে মস্ত দালান। পোর্টিকোর নীচে এবং দু-পাশে খান চারেক ছোট-বড় গাড়ি।

হলঘরের কাছে পৌঁছে দারোয়ান বলল, 'অন্দর যাও, সাহাব। উও মেমসাহাবকো পাস।'

দারোয়ান গেটের দিকে ফিরে চলল।

সাদা মারবেলের মেঝেয় পা রাখল মাদল। ঝকঝকে পাথরে ছায়াও পিছলে যেতে চায়। বিশাল হলটি প্রায় আসবাববিহীন। স্রেফ চার কোণে চারটে হাই-কুশন। সাদা, হলুদ, নীল, সবুজ। ঠিক মধ্যিখানে কালো পাথরের গোল টেবিলে টেলিফোন। টেবিলে বাঁ-হাতের ভর রেখে যে দাঁড়িয়েছিল সে-ই দারোয়ান-কথিত মেমসাহেব। খাঁটি দিশি তরুণী। বব-ছাঁট চুল। ছিমছাম শরীরের আকর্ষণ বাড়াবার জন্যেই হয়তো, বেশ চাপা লাল রঙের স্কার্ট পরনে। কলার-ওয়ালা টপ। রং খুব ফরসা না হলেও, কালো লকেট ও গাঢ় ক্রিমসান রঙের পটে, মোটামুটি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

মাদলের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল। দু-পা এগিয়ে অপাঙ্গে একবার মাদলের পোশাক-আশাকের ছিরি দেখে নিল। ক্ষয়া নীল জিনস, হাতা-গোটানো গেরুয়া পাঞ্জাবি পরনে মাদলকে দেখে তরুণী হয়তো অনায়াসে ভেবে ফেলেছে—এই চিজটির গা থেকে বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে। ইচ্ছে করেই গালের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি খচ-খচ শব্দে দু-বার চুলকে নিল মাদল। তরুণীটি হিন্দিতে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।—'

বলে, হলুদ হাই-কুশনের গা বেয়ে, সরু করিডোর ধরে এগোল। মনে-মনে গুনতে লাগল মাদল। ঠিক আঠারো পা হেঁটে আলোকিত করিডোরের শেষে সিঁড়ির সামনে পৌঁছল। মেয়েটির পিছন-পিছন দশ ধাপ উঠে দরজা। ঠকঠক করে তিনবার নক করে দরজা ঠেলে ধরে মাদলকে বলল মেয়েটি, 'অন্দর যাও।'

উরিব্বাস! ঘরে ঢুকতেই মাদলের চোখ প্রায় চড়কগাছ। এমন ঘর সে জীবনে দেখেনি। কল্পনাতেও নয়। একেবারে হলুদ ঘর। কার্পেটে মোড়া মেঝে ইয়োলো অকার। দেওয়ালে গাঢ় ক্যাডমিয়াম। প্রত্যেকটি দেওয়ালে একটা দুটো চেনা-অচেনা হলুদ ছবি। জলরঙের, তেল রঙের। সরাসরি উলটোদিকে প্রকাণ্ড সূর্যমুখীর ছবিটি বেশ চেনা ঠেকল। তক্ষুনি মনে পড়ল না, কার ছবি? কোথায় দেখেছে? তার নীচে হাঁটু-সাইজের হলদে গোল টেবিল। ডজনখানেক সোফা সাজানো সারা ঘরে। সব হলুদ। উজ্জ্বল লেমন হলুদ আলো ঘরটিকে মায়াবী করে রেখেছে। হঠাৎ ঠেক লাগল মাদলের। জন্ডিস হল না তো? ন্যাবা?

ঠিক তক্ষুনি, শূন্য ঘরে মানুষের গলা শোনা গেল, 'অন্দর আও! ব্যয়ঠো! সিট ডাউন।'

অল্প দূরে, ডানদিকের কোণ ঘেঁষে সোফায় বসে রয়েছে মানুষটা। গায়ের সাদা জামাটা হলুদ আলো পড়ে পারিপার্শ্বের সঙ্গে মিশে গেছে। চট করে নজরে পড়ে না। দু-কদম এগিয়ে চিনতে পারল মাদল। জুহুতে দেখা প্রথম গাড়ি—সেই মার্সিডিসের মুখ।

এমন একখানা ঘর! তাতে একা লোকটি বসে, যে আবার কিনা জগগুর মতো বেপরোয়া খুনি মাস্তানকে হুকুম দেয়। মাদলের গা ছমছম করতেই পারে। তবে, ভয় সে পায়নি। মস্তিষ্ক দ্বিগুণ বেগে কাজ করছে। মনে হচ্ছে, মস্ত কোনও রুই-কাতলাদের দলে, জলে এবং জালের মধ্যে ঢুকে পড়েছে সে। তবে, জাল এখনও জানেই না, মাদল কে অথবা কেন এসেছে? অন্তত, ওর ধারণা তাই।

তবু, মুখ ঘুরিয়ে ঝট করে একবার পিছনে দেখে নিল। পিছনের দরজা বন্ধ। টাইট-বসনা সুন্দরী উধাও। হালকা প্রসাধনের গন্ধ পেল মাদল।

কাঁচুমাচু পায়ে হেঁটে গোল টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মার্সিডিসের মুখ অর্থাৎ জয়ন্ত

জোগলেকর ওরফে জেজে আবার বলল, 'ঘাবড়াও নেহি! ব্যয়ঠো।'

সোফায় বসতে-বসতে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল মাদল। মস্ত সূর্যমুখীওয়ালা হলুদ ছবিটা দেখিয়ে জিগ্যেস করল, 'কার ছবি?'

ছবি-টবির ব্যাপারে জেজের তেমন আগ্রহ নেই। যেটুকু কাজকর্মের আওতায় সেইটুকু জানা থাকলেই যথেষ্ট। ইমিডিয়েট বস সেন-সায়েবের রাজত্ব এসব। ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে ছবিটি দেখার ভঙ্গি করে হাসল জেজে। বলল, 'ফ্রান্সের এক আর্টিস্ট। নীচে দেখো নাম সই আছে—ভিনসেন্ট!'

ভিনসেন্ট ভ্যানগখ!

সাইজের কথা ভেবে মাদল বলল, 'এটা তো প্রিন্ট—না?'

'উঁহু। কপি। মূল ছবির থেকে সাইজে একটু বড় করে করা।'

আপনা থেকেই মাদলের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'বাঃ! দারুণ। কে কপি করেছেন!'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল জেজে। পালটা জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'মাদল।'

'মাধো? তা, বম্বেতে কদ্দিন? থাক কোথায়?'

'এই তো কিছুদিন। ভারসোবার কাছে থাকি।'

'তোমার হাত ভালো। ছবি-টবি নিয়ে এসেছ সঙ্গে?'

মাদল বলল, 'না তো! জগণ্ডদাদা ছবি নিয়ে আসবার কথা তো বলেনি!'

টেবিলে রাখা প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে-করতে জেজে বলল, 'হুম! তা হলে তো মুশকিল। তোমাকে তো আমাদের এখানে চাকরি দেওয়ার কথা ভাবছিলুম। আমার ওপরঅলাকে তোমার কাজের নমুনা না দেখালে তো কাজ হবে না!'

'কী ধরনের কাজ আমাকে করতে হবে?'

'ঠিক যে-কাজটা তুমি জানো। ছবি আঁকতে হবে।'

'কীরকম ছবি?' মাদলের কৌতূহল বাড়তে থাকে। এরা কি সাদামাটা ছবির ব্যাবসা করে? সাধারণ এক অনামী-অখ্যাত শিল্পীর ছবি দিয়ে তো ব্যাবসা হয় না? হাজার-হাজার আর্টিস্ট যে-দেশে আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছে—সেখানে এদের ধান্ধাটা কী জাতের আঁচ করতে পারছে না মাদল। বিখ্যাত শিল্পীদের কাজ কপি করলেও তো সমঝদার ক্রেতা সহজেই ধরে ফেলবে। তা হলে?

টেবিলের গাঢ় হলুদ টেলিফোন হালকা এবং মধুর শব্দে বেজে উঠল। রিসিভার তুলে জেজে বলল, 'ইয়েস?'

পিনপিন করে একটা যান্ত্রিক মেয়েলি গলা শুনতে পেল মাদল? কথা বোঝা যাচ্ছে না।

'হুম। কোন ঘরে গেল?' জেজের প্রশ্ন।

আবার পিনপিন।

'ঠিক আছে। এক্ষুনি আসছি। নিশা, মেজাজ কেমন বুঝলে।'

পিনপিন।

'কী যনত্তোন্না। আবার কী হল?'

রিসিভার রাখতে-রাখতে উঠে দাঁড়াল জেজে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে মাদলকে বলে গেল, 'একটু বোসো। এক্ষুনি আসছি।—'

বসতে বলে গেলেও বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না মাদল। সোফায় দু-এক মিনিট ছটফট করে, উঠে দাঁড়াল। ঘরের চারপাশে আর কিছু নেই। কতগুলি ঘর আছে এই প্রকাণ্ড বাড়িতে, কে জানে! এই লোকটিই জয়দীপের ভাইবোনকে নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই এ-বাড়িতেই কোথাও! কোথায়! কোন ঘরে ওদের রেখেছে? কোনও চিৎকার-টিৎকারও তো শোনা যাচ্ছে না। ভাবতে-ভাবতে মাদল সূর্যমুখীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফুলের টবে একগুচ্ছ হলুদ ফুল। ছবিটা কি তেল রঙে? ক্যানভাসের

ওপর করা! না কি, জল রঙে? তর্জনী বুলিয়ে কিছুই বোঝা গেল না। ক্যানভাস হলে, ছবি পিছন দিকের জমি দেখলে বোঝা যাবে। দরজায় চোখ রেখে, আলতো হাতে ফ্রেমের নীচের অংশ খানিকটা তুলে, ঝুঁকে পেছন দিক দেখতে গেল মাদল। বেশি ওজন নয়। আসল ক্যানভাসের টেক্সচারই মনে হচ্ছে। নিরীক্ষার পদ্ধতির কারণেই একটু কাত হয়ে গেল গোটা পেইন্টিং। তক্ষুনি, হালকা ঘড়-ঘড় শব্দ হল ঘরে। চমকে, ছবি ছেড়ে সরে এল মাদল।

এ কী! টেবিলের ওপাশের দেওয়াল অনেকখানি ফাঁক হয়ে, একটা দরজার মতো হাঁ-মুখ খুলে গেছে! এবারে ভয় পেল মাদল। হঠাৎ শীত লাগার কাঁপুনি দিল গায়ে।

এক্ষুনি কেউ ঢুকে পড়লে কেলেঙ্কারি! কী হবে, কী করবে ভেবে না পেয়ে যন্ত্রচালিতের মতো দ্রুত পায়ে পৌঁছে গেল সে হাঁ-মুখের সামনে। ভেতরে অন্ধকার। এ-ঘরের যেটুকু আলো পড়েছে, তাতে সিঁড়ির ধাপ দেখতে পেল মাদল। নেমে গেছে ঘুরে, গভীরতর অন্ধকারে।

ভয় ছাপিয়ে কৌতূহল, অদম্য জিজ্ঞাসা ওকে ভেতরে টেনে নিল। পিছন ফিরে একবার ঘরের বন্ধ দরজা দেখে মনে হল, এই মুহূর্তে ওই লোকটা বা যে কেউ একজন ঢুকে পড়লেই মাদল আর কোনওদিনই হয়তো এখান থেকে বেরোতে পারবে না। সত্যকাকু এখন কোথায়? জয়দীপের ভাইবোনকে কি এই পথের শেষে আটকে রেখেছে? এ-পথ কতদূর অবধি? মাদল সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে, অন্ধকার হাতড়ে নীচে নামতে লাগল।

ঘুরে-ঘুরে সাত-আট নয় ধাপ। দশ-এ-গা-রো—পিছনের হাঁ মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। সামনে, নীচের দিক থেকে খুব হালকা আলোর আলগা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পা রাখতে না-রাখতেই শব্দ শুনতে পেল মাদল। সামনে নীচে থেকে অতিদূর কণ্ঠস্বর—বাচ্চা ছেলের, 'দিদি! এরা কি আমাদের মার্ডার করবে?'

মেয়েলি গলায় পালটা প্রশ্ন, 'কী বলতে হয়?

'আই মিন—ওই—কী বলে—খুন!'

'দূর বোকা ছেলে! খুন করলে তো জুহুতে করে ফেলত?' সান্ত্বনার গলা মেয়েটির।

নিশ্চয়ই জয়দীপের ভাইবোন, মাদল ভাবল। সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণ ভয়ে হঠাৎ চমকে ওঠার মতো শব্দ হল পিছনে—ওপরে। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ।

এক মুহূর্ত সময় গেল ভাবতে। নীচে যাবে দৌড়ে, না, ওপরে উঠে দেখবে। খতিয়ে বোঝবার আগেই উঠতে আরম্ভ করেছে মাদল। নীচের হালকা আলো, কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল। সাত-ছয়-পাঁচ-চার ধাপে পা তুলে—রক্ত হিম। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বড় জোর চার-পাঁচ ফুট দূরে সিঁড়ির শেষে হাঁ-মুখের দরজা। ঘরের আলোয় সিলিউট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষটা। বেঁটে-খাটো শক্ত চেহারা বলিষ্ঠ দু-হাত ছড়িয়ে দরজা আগলে দাঁড়ানো। মুখ দেখা যাচ্ছে না। হলুদ পটভূমিতে অন্ধকার পাথরের মূর্তিটি শব্দহীন মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর। মাদল হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পেল।

॥ নয় ॥

লোকটি ভারী গলায় ডাকল, 'উপর আও।' সুড়ঙ্গের ভিতর দৈববাণীর মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে গমগম করল শব্দ।

ভয়ে বিহ্বল মাদল বসু হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে ওপরে, হলুদ ঘরে উঠে এল। গোল-গলা ছাই রঙের হাতা-ওলা গেঞ্জি ও কালো প্যান্ট পরনে লোকটাকে পুরো দেখা গেল এবার। অসম্ভব কঠিন মুখ। বয়েস চল্লিশ-পঞ্চাশ—যা খুশি হতে পারে। শক্ত হাতের মাংসপেশি হলদে আলোয় চকচক করছে। ক্ষুধার্ত, ধারালো চোখ দিয়ে জরিপ করছে মাদলকে।

আচমকা মাদলের জঙ্গুলে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান! অসহ্য যন্ত্রণায় মাদল চেঁচিয়ে উঠতেই অন্য হাতে তার মুখ চেপে ধরল, 'চোপ—চো-ও-ওপ—'

বলে, দুটো হাতই সরিয়ে নিল বদমাশটা। 'উহ্-আহ্,' করে তখনও গালে হাত বোলাচ্ছে মাদল। পাষণ্ড ব্যাটা অবাক গলায় বলল, পরিষ্কার বাংলায়, 'এ শালা দাড়ি তো আসল দেখছি—তু কউন রে?'

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে মাদল। এমন জায়গায় মাতৃভাষা শুনে রাগ ব্যথা কমে এল। তবু বেশ আক্রমণের ভঙ্গিতেই কথা বলল সে, 'এটা কী ধরনের অসভ্যতা? তুই, মানে তুমি—ইয়ে, আপনি কে? আমি মাদল।'

জুলজুল চোখে চেয়ে আছে লোকটা। বললেন, 'বাঃ! তুমিও বাঙালি! আমি রঘুনাথ—'

পিছনের বন্ধ দরজার দিকে দেখে নিয়ে, গলা নামিয়ে ফিসফিস করল, 'পুলিশের চামচে নাকি?'

মাদল বলল, 'না। আমি আর্টিস্ট। আপনি?'

'আমি এখানে চাকরবাকর। তা, তুমি কি এখানে ছবি আঁকবে বলে এয়েছ?'

'হুম।'

সাপের গলায় রঘুনাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'ঈশ!—হায় রে, পোড়া কপাল। পালাও! শিগগির পালাও এখান থেকে—'

'কেন? পালাবার কী হল?' মাদল যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

রঘুনাথের কথাবার্তায় মুখচোখের ভঙ্গিতে অশিক্ষার ছাপ। গোল-গোল চোখে ঘৃণা ক্রোধ এবং ভয় মিশিয়ে দাঁত কিড়মিড় করল। হিসহিস করে বলল, 'রাক্ষস! রাক্ষসের দল। আমার ভাইটারে খেয়েছে। কত মানুষ যে খেয়েছে—তার গোনাগুনতি নেই। তোমারেও খাবে। পালাও—'

মাদলের মনে হল লোকটা পাগল নয় তো? তা যে নয়, পরের মুহূর্তেই বোঝা গেল। স্বর পালটে সামান্য খুশি মিশল এবার। দেওয়ালের হাঁ-মুখ দেখিয়ে জিগ্যেস করল, 'ওটা এল কোত্থেকে? তুমি খুললে নাকি? কী করে?—' সুড়ঙ্গর মুখের কাছে যেতে-যেতে রঘুনাথ বলল।

'জানি না। ওই ছবিটার সঙ্গে দেওয়ালের চোরা দরজার কোনও যোগাযোগ আছে।'

'আমি জানতাম। জানতাম এ-ঘরে কোনও চোরা-দরজা আছে।—'

বলতে-বলতে দ্রুত পায়ে পিছনের দরজার দিকে চলে গেল। অল্প ফাঁক করে বোধহয় দেখে নিল কেউ আসছে কি না। ওখান থেকেই নির্দেশ দিল রঘু। 'শিগগির বন্ধ করো ওটা। জেজে-সাব আসছে।—'

ছবিটা কাত হয়ে ছিল।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওটাকে টেনেটুনে সোজা করে দিল মাদল। সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিকের খেল। বেড়ালের গলায় আদরের মৃদু গরর-গরর আওয়াজে দেওয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দেওয়াল। গোটা ব্যাপারটাই দু-তিন সেকেন্ডে নিরেট হয়ে গেল আবার। আগের মতোই যেমন-কে-তেমন।

ঠিক তক্ষুনি জেজে এসে ঢুকল। দুজনকে এক পলক দেখে নিল। মাদলকে দেওয়ালের সূর্যমুখীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সামান্য কুঁচকে গেল ভুরু। জিগ্যেস করলে, 'ওখানে কী করছ?'

মাদল এক মুহূর্তও না ভেবে শপাং করে বলে দিল, 'ছবিটা দেখছিলাম। ক্যানভাসে আঁকা। তাই না?'

কোনও জবাব না দিয়ে, গোল টেবিলের দিকে হেঁটে গেল জেজে। সোফায় বসতে-বসতে রঘুকে একটু ধমকের সুরে বলল, 'ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেছিলুম না! এতক্ষণ কী করছ এখানে?'

রঘু এখন একেবারে ভিন্ন মানুষ। অতি বশংবদ মোসায়েব বা পোষা জানোয়ারের মতো

হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, 'কী করব, সাহাব? ও বাবু ছবি দেখছিল!—'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মাদল। রঘু তা হলে মোটেই পাগল নয়। বরং পরে কাজে লাগবে—ভাবতে-ভাবতে মাদল জেজেকে বলল, 'আমাকে পৌঁছোতে হবে না। একাই যেতে পারব, স্যার।'

কেটে-কেটে কথা বলল জেজে, 'না। তুমি/একা/যেতে/পারবে/না। রঘুই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। যাও।'

'ঠিক আছে, স্যার—' বলতে-বলতে দরজার দিকে হাঁটতে লাগল মাদল। পরিষ্কার বুঝে গেল সে, যে, রঘুকে ওর আস্তানা ইত্যাদি জেনেশুনে আসবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দরজা টেনে খুলে ধরল রঘু। মাদল বোরোতে যাবে, পিছন থেকে জেজে বলল। 'শোনো হে!'

মাদল মুখ ঘুরিয়ে দেখল জেজের ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। বলছে, 'ঠিক চারদিন বাদে, রোববার, সকাল এগারোটায় গাড়ি যাবে। সব ছবি সঙ্গে নিয়ে আসবে। তোমার ছবি দেখতে বস রাজি হয়েছে।'

মাদল হাসল, 'থ্যাংক্যু স্যার।'

'আর একটা কথা। এ-বাড়িতে কোনও ব্যাপারেই বিশেষ কৌতূহল রেখো না মাথায়, কেমন?'

সুবোধ বালক হয়ে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এল মাদল। পিছনে রঘুনাথ।...

সত্যসাধন সেই সময় মস্ত দালানটির পশ্চিমের দুই-মানুষ উঁচু দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। রুদ্রাক্ষর গাড়ি মেইন গেট দিয়ে এ-বাড়িতেই ঢুকে গেছে একটু আগে। ঝমরের গতি কমিয়ে তো রাস্তার মোড় থেকে লক্ষ করেছেন সত্য। ওখানেই ঝমরকে পার্ক করে হেঁটে উঠে এসেছেন মালাবার হিলের ওপরে। ওয়ালকেশ্বর নামে পরিচিত এ-পাড়ায় বিশেষ যাতায়াত না থাকলেও অন্তত মাসে-দু-মাসে এক-আধবার আসতেই হয়। গণতন্ত্র দিবসে রাজ্যপালের বাড়িতে নামী দামি শহরবাসীদের নেমন্তন্ন করা হয়। সেদিন সত্যসাধনও আসেন। তা ছাড়া, ডাক্তার-বন্ধু রাজীব রাজনও থাকে এখানে। খানিক দূরে হাসপাতালের কোয়ার্টারে। বেশ পুরোনো প্রাসাদোপম অট্টালিকা এইটি। হয়তো কোনও ইংরেজ বা পার্সির নামে রয়েছে। আলোকিত সদর গেটে পাথরে খোদাই-করা নামও দেখেছেন তিনি ওঠবার সময়। সানসেট ভিলা। সজাগ প্রহরী দুটির সতর্ক চোখ এড়াতে সত্য সানসেট ভিলা ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে, বুনো ঝোপঝাড়, বাগান এবং আরও একটি মাঝারি বাংলো ছাড়িয়ে, তবে পশ্চিমে হাঁটা ধরেছেন। উদ্দেশ্য, পিছন দিকে পৌঁছে ভিলাটির ব্যাপার-স্যাপার কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা। শুকনো কাঁটাঝোপ, আবর্জনা পেরিয়ে, হোঁচট খেতে-খেতে সানসেটের এই পিছনের দেওয়ালে পৌঁছেছেন সত্য। অপূর্ব দৃশ্য এখানে। কয়েকশো ফুট নীচে, পাহাড়ের ঢাল শেষ হলে মূল আরব সাগর খানিকটা ডানদিকে ঢুকে খাঁড়ির মতো চেহারা নিয়েছে। চোখের সামনে সরাসরি দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের নীল। কোথাও গাঢ়, কোথাও আধখানা চাঁদের আলোয় হালকা এবং চকচকে। হু-হু বাতাসে নোনা গন্ধ। বহু দূরে দিগন্তের সীমারেখা যেখানে অন্ধকারে মিলিয়েছে, সেখানে, কয়েকটি ছোট-ছোট নক্ষত্র নেমে এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট হলেও সমান-সমান। যারা জানে না, তারা কয়েক মুহূর্ত ভেবে অবাক হবে—বোম্বাই শহর ও সমুদ্রের অংশ পাহারা দিতে সন্ধের পর ডিউটিতে নেমে আসে, আকাশের কয়েকটি তারা। সত্য জানেন, ওগুলি দূরের জাহাজ। বন্দরে ঢোকার অনুমতির অপেক্ষায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করে। একটা সরে গেলে, তার জায়গা নেয় নতুন জাহাজ।

ভিলাটির চারিদিকে নিরেট প্রাচীর এত উঁচু যে, এখান থেকে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামার চেষ্টা করা মানে সরাসরি গড়িয়ে জলে গিয়ে পড়া। ছোট-ছোট শুকনো ঝোপ বা বুনো ঘাস, গাছ-গাছড়া ধরে-ধরে নামতে যাওয়াও বিপজ্জনক। সত্যর মতো

লম্বা চওড়া মানুষের শরীরের ভার রাখতে পারবে না। তবু ঝুঁকি নিতে হল সত্যসাধনকে। অস্ফুট চাঁদের আলোতে একটা খটকা লাগার মতো ব্যাপার চোখে পড়েছে তাঁর। পাহাড়ের এই খাড়া উতরাইয়ের প্রায় সর্বত্রই রুক্ষ-শুকনো ঘাস-ঝোপ। কিন্তু, একেবারে নীচের দিকে, ডানধারে খাঁড়ির জল ছুঁয়ে বেশ খানিকটা জায়গা বেশ তরতাজা সবুজ।

হাঁটু মুড়ে ঢালের শুরুতে বসে পড়লেন সত্য। দু-হাতের ভর রেখে স্লিপ খাওয়ার ধরনে ঘষটে-ঘষটে নামতে লাগলেন তিনি। ট্রাউজার নোংরা তো হবেই। ছিঁড়েও যেতে পারে। কিন্তু উপায়ও তো নেই। এই ভিলাতেই খুব সম্ভবত মাদলের আসার কথা। টেলিফোনে বলেছিল—ওয়ালকেশ্বর—মালাবার হিল এলাকা। তা ছাড়া, জয়দীপের ভাইবোনও কি এখানে? না, শহরের বাইরে কোথাও পাচার করে দিয়েছে? সবচেয়ে বড় কথা, বোম্বাই পাতালপুরীর 'ডন' রুদ্রাক্ষকে এই ভিলাতেই ঢুকতে দেখেছেন সত্য। 'জয়েন্ট সিম্ফনি' নামে কুখ্যাত দলটির মূল ঘাঁটি কি এখানেই?

দু-হাতে ও পায়ে ব্রেক কষতে-কষতে নামছেন সত্য। হাতের চেটো কাঁটাঝোপে ছড়ে গিয়ে বিচ্ছিরি জ্বালা করছে। তা করুক, ভাবলেন সত্যসাধন। কিন্তু হঠাৎ সবুজের ব্যাপারটা, একটা যাচাই করা দরকার। 'জয়েন্ট' শব্দটির দু-রকম মানে, সত্য জানেন। যৌথ এবং শুকনো মাদক দ্রব্য। গাঁজা, চরস, হাশহিশ। জয়দীপের আপিসে জোশীর মার্ডার এবং রুদ্রাক্ষর মধ্যে তো একমাত্র কমন ফ্যাক্টর জয়দীপ। ওর ভূমিকাটা এখনও ঠাহর পাচ্ছেন না সত্য। বাড়ি পৌঁছে, খতিয়ে না ভাবলে অন্ধকার কাটবে না।

ভাবতে-ভাবতে একেবারে সবুজের কাছে নেমে এলেন। কাছাকাছি বলেই খুব একটা তফাত চোখে পড়ছে না। সামান্য ঝুঁকতেই দেখা গেল অনেকটা জায়গা স্যাঁতসেতে, ভেজা। শুধু ভেজাই নয়। খাঁড়ির জল থেকে অন্তত দশ-বারো ফুট ওপরে, সত্যর প্রায় পাশ দিয়ে ক্ষীণ জলধারা অদৃশ্য গতিতে নীচে নেমে সমুদ্রের সঙ্গে মিশছে। অসম্ভব পিছল জায়গাটা।

জলের জন্যেই শ্যাওলা এবং সবুজ ঘাস-পাতা। কিন্তু জলটা আসছে কোত্থেকে বুঝতে পারছেন না সত্য। ভিলার ভেতরে কোনও সুইমিং পুল? যার থেকে জল চুঁইয়ে? নাকি, নর্দমার জল? কোনও চোরা পথ নয় তো?

এই সব ভাবনা-চিন্তার মধ্যে হঠাৎ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এক গুরু গম্ভীর ডাক, 'হোউ!'

মুখ তুলে ওপরে দেখবার আগেই সত্য বুঝে গেছেন—এ-ডাক কোনও নেড়ি-কুত্তার নয়। ঠিক তাই। খুদে যমদূতের মতো পাহাড়ের মাথায়, দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুকুরটা। বুলমাস্টিফ। পথে-ঘাটে সচরাচর এ-জিনিস দেখা যায় না। খাস বিলেতি পাহারাদার কুকুর। চট করে কামড়ায় না। কামড়ে ধরলে ছাড়ে না এবং মাংস ছাড়া কিছুই রোচে না এদের মুখে!

আর একখানা ডাক।

'হোউ!' যেন কী হচ্ছে ওখানে!

সত্য টের পেলেন, গতিক সুবিধের নয়। যদিও খাড়া ঢাল বেয়ে শ্রীমান নেমে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। কিন্তু ওঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ওপরে ওঠা মুশকিল। সমুদ্রের জলে নেমে, সাঁতরে খানিকটা দূরে গিয়ে, ওঠবার চেষ্টা করা যায়। সে-রাস্তায় দু-রকম সম্ভাবনা। এক, ওদিক দিয়ে ওপরে ওঠার পথ আছে কি? থাকলেও সে যে আরও দুর্গম হবে না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। দুই, শ্রীমানের ডাকাডাকিতে সশস্ত্র মানুষ-প্রহরীরা এসে উপস্থিত হলেও চিত্তির।

'হোউ-হোউ!' অর্থাৎ ওপরে উঠে এসোই বোধহয়!

ডাকের আওয়াজ চড়েছে। ক্রমে আরও চড়বে। হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ভয়েই শ্রীমান নামছে না। নইলে, এতক্ষণে নেমে আসত।

'যা থাকে বরাতে—ভেবে চার-হাতে পায়ে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো সন্তর্পণে উঠতে লাগলেন সত্য। ওর কাছাকাছি পৌঁছতেই অভ্যর্থনা উত্তেজনায় অধীর শ্রীমান সামনের দু'পা নেমে একটু এগিয়ে

এল।

কুকুরের গলার ভেতরে একটানা রাগের গর্জন শুনতে পেলেন সত্য—গর-র-গর-র। এই সব ইংরেজ কুত্তার সঙ্গে মাঝামাঝি রফা হয় না। মনঃস্থির করে ফেললেন সত্য। হয় এসপার, নয় ওসপার। ডানহাতে শরীরের সব শক্তি জড়ো করে ও-ব্যাটার আগ-বাড়ানো ডান পাটি আচমকা ধরে ফেললেন তিনি। ক্ষিপ্র গতিতে টান মেরে ছুঁড়ে দিলেন নীচে। যমদূত কিছু বুঝে ওঠবার আগেই খানিকটা শূন্যে উড়ে পাহাড়ের গায়ে পড়ে গড়িয়ে চলল জলের দিকে। ভয়-পাওয়া কুকুরের চিরন্তন ডাক ফুটল সায়েবের মুখে, 'ইঁইক—কিউ—ইঁউ—!

আর এক মুহূর্তে দেরি না করে দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন সত্য। কিন্তু দেরি হয়েই গেছে। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দৌড়ে আসছিল মানুষটা। মঙ্গোলিয়ান মুখ। গেটের লোক দুটির কেউ নয়। এ অন্য। হাতে টু-ব্যারেল রাইফেল। এখন, সত্যর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ানো। লোকটার কথা বলার ধরন অই 'হোউ-হোউ' গোছের। হিন্দিতে জিগ্যেস করলে, 'কী ব্যাপার? কী হচ্ছে এখানে?'

ততক্ষণে শ্রীমান হোউ সামলে নিয়েছেন। ঘন-ঘন ডাকতে-ডাকতে উঠে আসছে ওপরে।

মুখে হাসি টেনে সত্য বললেন, 'তোমার কুকুর হোঁচট খেয়েছে?' এক পলক নীচে তাকিয়ে লোকটা ডাকল, 'আও—রবসন আও।'

তারপর সত্যর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল আবার, 'তা তো দেখছিই।—তা তুমি কী করছ এখানে?'

সত্য একটু লজ্জা-লজ্জা মুখ বানিয়ে বললেন, 'না—মানে—কিছু না! একটু ইয়ে—'

প্যান্টের বোতাম লাগাবার ভঙ্গি করলেন কথা বলতে-বলতে 'মানে—বাথরুম সারছিলুম—'

যথেষ্ট অবিশ্বাসের চোখে ওঁর আপাদমস্তক জরিপ করছে লোকটা। বলল, 'জামা-প্যান্টের এই ছিরি কেন?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত সময় নিলেন। কারণ, হঠাৎ-ই মনে হল, এর সন্দেহ একটু বাড়িয়ে দিলে, পাঁচিলের গণ্ডির ভিতরে কি আছে-না-আছে—দেখে নেওয়ার সুযোগ হয়। ভয় একটাই—রুদ্রাক্ষ ওকে চিনে রাখবে। সেটা বোধহয় এক্ষুনি বাঞ্ছনীয় নয়।

কুকুরটা ততক্ষণে কাছে উঠে এসেছে। ডাক থামেনি। সত্যর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। হয়, ওঁকে ভয় পেয়েছে। নয়, প্রহরীটি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বলে। সত্য ভাবলেন, ভাগ্যিস। ব্যাটা নালিশ করবার মানুষি ভাষা জানে না। সত্য বললেন, 'ওর ডাকে ভয় পেয়ে, আমারও পা পিছলে গিয়েছিল।'

বলে বোকা-গোছের হাসি ছেড়ে, জামার হাতা প্যান্ট, ঝাড়তে-ঝাড়তে রাস্তামুখো হলেন।

'দাঁড়াও।'

লোকটার সঙ্গে-সঙ্গে বুলমাস্টিফও বলল, 'হোউ-হোউ।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন সত্য।

শ্রীমান রাগে গজর-গজর গর-র গর-র করছে—শুনতে পেলেন এবার।

লোকটি পাশাপাশি এসে, এক কদম এগিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

॥ দশ ॥

'একী? কী চেহারা হয়েছে আপনার, সত্যকাকু? কোথায় গিয়েছিলেন?'

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে মাদলকে জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন, হালকা গলায়,'ছোটবেলায় কলকাতায় থাকতে স্লিপ খেয়েছ কখনও?'

মাদল অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'টালিগঞ্জে। লেকের লাগোয়া চিলড্রেন্স পার্ক-এ। বেশ বড় সিমেন্টে বাঁধানো স্লিপ!'

'আমিও অনেক নীচু স্লিপ খেয়ে আসছি। খেতে ভালোই! তবে মসৃণ সিমেন্টের নয় বলেই,—সামান্য খোঁচাখাঁচি খেয়েছি উপরি।' বলতে-বলতে, ধপাস করে ওঁর ফেবারিট বেতের ইজি-চেয়ারে আধ-শোয়া হলেন। মাদল দৌড়োল তুলো-ডেটল আনতে।

'ইশ? হাতের চেটো, কনুই প্রচণ্ড ছড়ে গেছে—' ওষুধ লাগাচ্ছে মাদল আর উঃ-আঃ করছে নিজেই।

সত্য বললেন, 'তোমার অ্যাডভেঞ্চার বিস্তারিত বলো শুনি।' বলে চোখ বুজলেন তিনি।

মাঝে-মধ্যে এক-আধটা প্রশ্ন, দু-একটা হুঁ-হা করে মাদলের ঘটনা সবটা শোনা হয়ে গেলে বললেন, 'তার মানে, তুমি যখন ভিতরে ছিলে, আমি তখন পাঁচিলের বাইরে। রুদ্রাক্ষকে দেখেছ?'

'উঁ-হুঁ? কিন্তু ওই পাহারাওলা আপনাকে ধরেনি?'

উঠে দাঁড়ালেন সত্য। বললেন, 'ধরেছিল। গেট অবধি যেতে হয়েছিল সঙ্গে। তবে, ভেতরে আর নিয়ে যায়নি। বলতে গেলে, খেদিয়ে দিয়েছে।—'

হেসে, বাথরুমের দিকে পা বাড়ালেন সত্যসাধন। যেতে-যেতে বললেন, 'খাবার কী করেছে সখা?

আপিসের সখারাম এখানেই থাকে। ঘরের কাজকর্ম, রান্না ইত্যাদি করে দেয়। মাদল বলল, 'ডিমের লাবড়া। আস্ত মুসুরির ডাল। খেতে বসলে, বেগুন ভেজে দেবে, বলল।—'

'ওকে ছেড়ে দাও হে। বেশ রাত হয়েছে। বেচারা শুয়ে পড়ুক। আমরাই ভেজে নেব'খন বেগুন-বেদোষ—যা হোক কিছু।'

মাদল তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি স্নানে যান। আমিই ভেজে নিচ্ছি।

বাথরুমে ঢুকে পড়েছেন সত্যকাকু। দরজা বন্ধ করবার আগে বললেন, 'ঝমরের পিছনের সিটে পকেট-রেকর্ডারটা আছে। তোমার জয়দীপদা ও অন্যান্যদের কথাবার্তা বেগুনভাজার সঙ্গে শুনে নাও।—'

মাদল রেকর্ডার নিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল।

রাত বাজল বারোটা। শহরের শব্দগুলি ক্লান্তিতে অবশ বলেই দূরের গির্জার ঘড়ি থেকে ঢং-ঢং শুনতে পাওয়া গেল। দিনের বেলাতেও নিশ্চয়ই বাজে ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। শুনতে পাওয়া যায় না। মাদলের মনে হল, গত কয়েক বছরে এ-শহরের কোলাহল কত বেড়ে গেছে।

খাওয়ার টেব্‌লে বসে খেতে-খেতে মাদল জিগ্যেস করল, 'সত্যকাকু, জয়দীপদা কি খুন করতে পারেন? আমার তো মনে হয় না!'

সত্যসাধন অতি মনোযোগ দিয়ে আহার করছেন। এই মুহূর্তে যেন বেগুনভাজার চেয়ে বেশি কিছু নিয়ে আর ভাবার নেই। অথচ, মাদলের কেমন মনে হল, উনি আপন চিন্তার জগতে ডুবে গেছেন—যেখানে বেগুন, ডিম বা মুসুরির ডাল—কিসসু নেই।

সঙ্গে-সঙ্গে মাদল ভাবল, ইশ। অন্যের মনের কথা যদি টের পাওয়া যেত! তা হলে এক্ষুনি সে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ত। সত্যকাকুর ভাবনায় ভর দিয়ে ও-ও সব কিছু দেখতে পেত!

ফোন বেজে উঠল এই সময়। মাদল টেবিল ছেড়ে উঠে, এঁটো হাতেই পাশের ঘরে দৌড়োল ফোন ধরতে। এ-ঘরটা সত্যকাকুর 'স্টাডি'। তিন পাশের দেওয়ালে সিলিং অবধি রাজ্যের বই। টিভি-ভি.সি. আর। ছবি,এনলার্জার। বাঁ-দিকের দেওয়ালের পুরোটাই দুটি মানচিত্রে ঢাকা। একটি পৃথিবীর। অন্যটি ভারতবর্ষের। সেখানেই ছোট্ট লেখার টেবিল, একটি মাত্র রিভলভিং চেয়ার। টেবিলে লাল-নীল ডটপেন। লেখার প্যাড এবং সাদা টেলিফোন-যন্ত্র। বাঁ-হাতে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলার

সঙ্গে-সঙ্গে জয়দীপদার ক্লান্ত স্বর ভেসে এল, 'কুড আই স্পিক টু মিস্টার কর?'

এক মুহূর্ত ভাবল মাদল। ওর গলার স্বর জয়দীপদা চিনতে পারেননি। আপন পরিচয় দেবে কি দেবে না ঠিক করতে পারল না। ও-ঘর থেকে সত্যকাকুর গলা, 'কার ফোন? জয়দীপ রায়?'

মাদল ফোনের মাউথপিসে বলল—'জাস্ট এ মিনিট!'

পরক্ষণেই ডানহাতের পিঠে মাউথপিস ঢেকে সত্যকাকুকে জবাব দিল, গলা তুলে, 'হ্যাঁ। আপনি আছেন, কি, নেই?'

সত্যকাকু হেসে ফেললেন শব্দ করে। হাসতে-হাসতে বললেন, 'সাব্বাশ, মিস্টার মাদল বসু। পাকা সহকারীর মতো কাজ করলে—'

টেবিল ছেড়ে উঠতে-উঠতে আরও বললেন, 'আছি ভাই, আছি। বহাল তবিয়তে আছি। হাত ধুয়ে আসছি, ধরতে বলো।'

ওয়াশ-বেসিনের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, নিজের মনেই এবং জোরে-জোরে, 'বেগুন ভাজাটা যা জমেছে না! আহা! দারুণ—'

মাদল নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল, সত্যকাকু হয় কোনও ক্লু পেয়েছেন ভেবে অথবা উনি জয়দীপদার ফোন—এত রাতেও আশা করেছিলেন। হয়তো বা দুটোই!

সত্যকাকুকে রিসিভার ধরিয়ে দিয়ে মাদল ফিরে এল টেবিলে। খিদেটা তো পেয়েই ছিল। চেটেপুটে থালা সাফ করে উঠতে-উঠতে মিনিট-দশ-পনেরো লেগে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসেও দেখল সত্যসাধন 'স্টাডি'-তে রয়েছেন। মাদল অবাক হল না। তবু সামান্য এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারল ও-ঘরে। রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন সত্যকাকু, কখন কে জানে! পিছন ফিরে চেয়ারে বসে আছেন চুপচাপ। হাতের চুরোট হয়তো নিভেও গেছে—খেয়াল নেই। ঘরে ধোঁয়ার গন্ধ। এখন ওঁকে বিরক্ত করা চলবে না। মাদল জেনে গেছে অ্যাদ্দিনে। শার্লক হোমস, ব্যোমকেশ থেকে নিয়ে ফেলুদা বা আজকের তরতাজা গল্প-উপন্যাসের ডিটেকটিভরা এইরকমই। ওঁদের কখনও-সখনও, ধোঁয়ার আশ্রয় নিতে হয় ধোঁয়াটে ব্যাপারের জট ছাড়াতে।

ফলে-পা টিপে-টিপে ফিরে আসছিল সে। পিছন থেকে সত্যকাকুর গলা শুনতে পেল, 'শুয়ে পড়ো গে যাও। তোমার ঘুম দরকার। কাল ভোর পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে শুয়ো। বেরোতে হবে। গুড নাইট।'

'গুড নাইট'—বলে, কোণের ঘরে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিতে না-দিতেই মাদল কাদা।....

ঝমর তার দুজন প্রেমিক ও বিশ্বস্ত আরোহী নিয়ে জুহু-পার্লে স্কিমের দশ নম্বর রোড ধরে চলেছে। ঢিমে তেতালায়। ভোরবেলার কুকুরেরা পেটের ধান্দা ভুলে দু-চারবার ডাকাডাকি করে কণ্ঠস্বর ঝালিয়ে নিচ্ছে।

বাসা থেকে বেরোবার পর দুজনের কেউ একটাও কথা বলেনি। মাদল লক্ষ করেছে, সত্যকাকু অত্যন্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে ঝমরের গতি নিয়ন্ত্রণ করছেন, যা সাধারণত অনায়াসেই উনি করে থাকেন। অর্থাৎ সকাল থেকে অন্য ভাবনায় ডুবে আছেন। সারারাত ঘুমিয়েছেন কিনা, বলা মুশকিল। চোখে-মুখে চিন্তার ভাব থাকলেও—একবিন্দু ক্লান্তি দেখা যাচ্ছে না।

সিনেমা তারকা অমিতাভ বচ্চনের বাংলো ছাড়িয়ে বিহারি ভাইয়ার সাময়িক চায়ের স্টল ফুটপাতে দু-তিনজন শ্রমিক-গোছের মানুষ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। ঝমরকে হঠাৎ দাঁড় করিয়ে সত্যকাকু রাস্তায় পা রাখতে-রাখতে বললেন, 'একটু চা খেলে হয়।'

যেন, সকালের বাতাস বা সূর্যোদয়কে বলছেন।

মাদলও নামল।

সেই ভোর-রাত্তিরে ঘুম ভাঙার পর পেটে কিছু পড়েনি। নিয়মিত সকালের চা-ও নয়। কারণ সাড়ে-পাঁচটায় ঘুম ভাঙিয়েছেন সত্যকাকু। একেবারে তৈরি। বলেছেন, 'উঠে পড়ো—যদি, যেতে চাও।'

ঘুম-চোখে মাদলের মুখে প্রশ্ন ফুটতেই পারে, 'কোথায়?'

জবাব সে পায়নি। ততক্ষণে। সত্যকাকু দরজা খুলে বেরিয়ে গেছেন। শেষ শব্দের রেশ রেখে গেছেন, 'আমি ঝমরকে গরম করছি। আসতে পারো।...'

এতক্ষণে সকালের প্রথম গরম চা জিভ পোড়াতেই আর থাকতে পারল না মাদল। বলেই ফেলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, সত্যকাকু?'

'অ্যাড-ম্যাগনেট কে-কে এবং তাঁর একমাত্র লাডলি কন্যা এস-কে'র বাড়ি।'

'আপনি কি জয়দীপদার বড় কর্তা আর শকুন্তলা ম্যাডামের কথা বলছেন?'

কথা বলতে-বলতে চা শেষ করে দুজনে ঝমরে বসল।

সত্যসাধন নাকে শব্দ করলেন, 'হু।'

অবাক গলা মাদলের, 'ওঁদের বাড়ি তো পুনায়!'

'বম্বেতেও আছে।'

'আপনি বাড়ি চিনতেন নাকি—আগেই?'

'না। কাল রাতে জয়দীপ রায় টেলিফোন করেছিল, ভুলে গেছ? অনেক কথা হয়েছে। ওর কাছেই জানলুম।'

মাদল একটু চুপ থেকে আবার বলল, 'কিন্তু, ওঁরা দুজন তো পরশুই ফিরে গেলেন পুনায়। আজ কখন এলেন?'

'খুনের খবর পেয়ে কালই সন্ধের পর এসেছেন। জয়দীপের সঙ্গে শকুন্তলার কথা হয়েছে টেলিফোনে।'

চেম্বুরের ঘিঞ্জি বাজার এলাকা ছাড়িয়ে লায়ন্স পার্ক থেকে বাঁ-দিকে ঢুকল ঝমর। এখানটায় যথেষ্ট গাছপালা, শান্ত পরিবেশ। বাংলো টাইপের খানকয়েক বাড়ির পর সবুজের মধ্যে ধবধবে সাদা দোতলা বাড়ি। সামনে মস্ত বাগান।

সূর্য উঠে গেছে। তবে, বাগানে এখনও রোদ আসেনি। বাড়িটার বারান্দার সামনে ঘাসের গালিচায় বেতের সাদা চেয়ার-টেবিলে বসে আছে শকুন্তলা। মাদল দূর থেকেই চিনতে পারল।

সত্য জিগ্যেস করলেন, 'উনিই কি তোমাদের ম্যাডাম?'

মাদল ঘাড় নাড়তে, দুজনে ঝমর থেকে নামল। হেঁটে এসে, বুক অবধি উঁচু গেটের সামনে দাঁড়াল। সামান্য গলা তুলে সত্যসাধন জিগ্যেস করলেন, 'মে উই কাম ইন?'

সত্য স্পষ্ট দেখলেন, মেয়েটির ভুরু অল্প কুঁচকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর মনে হল, এমন সুন্দরী রমণীর ভুরু কোঁচকালেই আধা-সৌন্দর্য মার খেয়ে যায়। সে-যুগের সুচিত্রা সেন, বা আজকের শ্রীদেবীকে কোঁচকানো ভ্রূ-সমেত দেখেছেন বলে মনে পড়ল না।

ততক্ষণে মাদলকে দেখে বোধহয় চিনতে পেরেছে মেয়েটি। মুখ স্বাভাবিক হয়েছে। ঠোঁটের কোলে হাসি এক্ষুনি ফুটলেও ফুটতে পারে—এমন ভাব! হাসি না হলেও কথা ফুটল মুখে, অবশ্যই ইংরিজিতে, 'গেট খোলা আছে—আসুন!'

ওরা দুজনে কাছে পৌঁছতেই উঠে দাঁড়াল শকুন্তলা। শূন্য চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।' তারপর মাদলকে উদ্দেশ করে জুড়ে দিল, 'কী ব্যাপার? এত সকাল-সকাল? এখানে এসে উপস্থিত?' বলতে-বলতে ফের বসে পড়ল।

ফরসা সুডৌল মুখটি সুন্দর বলা চলে। তবে কমনীয়তার অভাব। বরং একটু আহ্লাদী বা গরবিনী-গোছের চাউনি। ফোলা ঠোঁট, সামান্য উদ্ধত চিবুক ছাড়াও—উঠে দাঁড়ানো এবং বসার

মধ্যে বেশ উগ্র উদ্ধত ভঙ্গি। ওর পাশাপাশি জয়দীপের চশমা-চোখে গোবেচারা মুখটি ভাবতে বেশ অসুবিধে হল সত্যর।

মাদল বলল, 'ইনি মিস্টার সত্যসাধন কর। চ্যানেল ইনটেলিজেন্সের ডাইরেক্টর—'

ততক্ষণে সত্য তাঁর কার্ড বের করে এগিয়ে দিয়েছেন শকুন্তলার দিকে। মুখে হাসি টেনে বললেন, 'আপনার তুলনায় চুনোপুঁটি কোম্পানি। মোটমাট, অথরাইজড প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

যেটুকু হাসি ফুটব-কি-ফুটব না করছিল সেটি একেবারে গায়েব এখন। শকুন্তলার মুখে সেই বেমানান ভুরু-সমেত কঠিন ভাব দেখা গেল স্পষ্ট। বলল, 'চ্যানেলের নাম আমি জানি। অ্যাড মার্কেটের সিকিউরিটির ভার আপনাদের দেওয়ার কথাও উঠেছিল গেল বছর। যাক! বলুন—কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'আপনাদের বম্বে আপিসের মিস্টার জোশীর মার্ডারের ব্যাপারে ক'টা প্রশ্ন করতে চাই?'

'বেশ। তবে তার আগে আমার দুটি প্রশ্নের জবাব দিন। এক—আপনি কি খুনি, মানে, জয়দীপের হয়ে ওকালতি করছেন? দুই—ঠিক ক'টি প্রশ্ন করবেন?'

ওর কথা শুনতে-শুনতে, টেবিলের টুকিটাকি জিনিস দেখে নিচ্ছিলেন সত্য। চায়ের সরঞ্জাম। দুটি কাপে চা খাওয়া হয়ে গেছে। এখন পরিত্যক্ত। ব্রেকফাস্টের প্লেটেরও একই দশা। জলের গেলাস একটি ভরা ও অন্যটি প্রায় খালি। তিন-চার রকম ট্যাবলেটের কৌটো এবং স্ট্রিপ। ভরা গেলাসটি শকুন্তলার সামনে। মেয়েটির কথা শুনতে-শুনতে মনে-মনে তারিফ করলেন সত্য—সাব্বাস! এই তো চাই। বাবার ব্যাবসার যোগ্য ডাইরেক্টর। হুঁশিয়ার ওয়ারিশ। মুখ ফুটে জবাব দিলেন, 'প্রথম প্রশ্নের উত্তর—হ্যাঁ। কারণ, জয়দীপ খুনি না-ও হতে পারেন। দ্বিতীয়র জবাব—সাতটি।'

শকুন্তলা চুপ করে থাকল। ওর চোখ এড়িয়ে সত্যসাধন বুক পকেটে হাত ছোঁয়ালেন। তর্জনীর মৃদু চাপে টেপ রেকর্ডার অন হয়ে গেল। খুট শব্দটুকুও শোনা গেল না। কারণ, ততক্ষণে কথা বলতে শুরু করেছেন সত্য, 'খুনের খবর পুনায় কে দিয়েছে আপনাদের এবং কখন?'

'আমাদের সিনিয়ার একজিকিউটিভ মিস্টার চওধরি ও ইন্সপেক্টর সাঠে। টেলিফোন পেয়েছিলুম সাড়ে ছ'টা নাগাদ।'

'রাত্রে বোম্বাই পৌঁছে এখানে এলেন, না, সোজা আপিসে গিয়েছিলেন? নাকি, অন্য কোথাও?'

'থানায় সাঠের সঙ্গে দেখা করে সোজা অফিসে।'

'জয়দীপকে ফোন করেছেন ক'টায়?'

'রাত প্রায় এগারোটা।'

'জয়দীপ ও আপনার ঘনিষ্ঠতা কি বিয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং মিস্টার কোরগাঁওকর কি তা জানেন?'

'এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। জবাব দেব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, ওর সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই—'

বলতে-বলতে শকুন্তলার গলা প্রায় বুজে এল। শেষের শব্দগুলি স্পষ্ট শুনতে পেলেন না সত্যসাধন।

'কেন?'

ঘৃণা-জড়িয়ে জবাব দিল শকুন্তলা, 'হি ইজ এ কেরিয়ারিস্ট। এ মার্ডারার —এ ফ্রড—'বলে, মুখ নামিয়ে বোধহয় কান্না চাপার চেষ্টা করল শকুন্তলা। সেই ফাঁকে সত্য পকেট থেকে জয়দীপের পকেটে পাওয়া চিরকুটটি বের করে দেখালেন, 'এটা কি আপনার হাতের লেখা?'

সামলে নিয়ে, আবার ভুরু কুঁচকে গেল মেয়েটার। চিরকুটটি দেখে বলল 'কে দিল আপনাকে? জয়দীপ?'

'হুঁ।'

উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে শকুন্তলা, 'মাফ করবেন, আমার শরীর ভালো লাগছে না।'

সত্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। দেখাদেখি মাদলও। সত্য বললেন, 'সাতটার মধ্যে দুটি প্রশ্ন রয়ে গেছে। আপনার বাবা এখন কোথায়?

'পুনা ফিরে যাওয়ার জন্যে রওনা হয়ে গেছেন একটু আগে।'

টেবিলে ওষুধগুলোর মধ্যে দুটি বিলেতি কোম্পানির। এখানে, সোজা পথে এ-দেশে পাওয়া যায় না। সেগুলো দেখিয়ে সত্য বললেন, 'সপ্তম এবং শেষ প্রশ্ন। আপনার বাবার হাই ব্লাড-প্রেসার এবং ডায়াবিটিস আছে মনে হয়। এ-সব ওষুধ কোত্থেকে কেনেন?'

শকুন্তলা একটুও না ভেবে জবাব দিল, 'খাপোলিতে আমার দূর সম্পর্কের কাকা আছেন। কেমিস্ট ও কেমিক্যালস সাপ্লায়ার। উনিই পাঠিয়ে দেন বা বাবা লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেন।'

'শেষ প্রশ্নের লেজ হিসেবেই—কাকার নামটা একটু বলে দিন।'

শকুন্তলার মুখে হাসি না ফুটলেও গুমোট ভাবটা কিছু কমল। গটগটিয়ে দালানের দিকে হেঁটে যেতে-যেতে নামটা ছুঁড়ে দিল, 'জগদীশ কোরগাঁওকর।'

টি-পটে হাত ছুঁইয়ে পরখ করলেন সত্য। তারপর গেটের দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, 'শিগগির এসো, মাদল। চা এখনও কুসুম-কুসুম গরম আছে।'

নড়বড়িয়ে উঠল ঝমর। ঝম-ঝমর থেকে গিয়ার পালটে-পালটে প্রায় নিঃশব্দ এবং ঝড়ের গতিতে ছুটতে আরম্ভ করল।

ঝমরকে ছুটিয়ে দিয়ে মাদলকে জিগ্যেস করলেন সত্য, 'কে-কের গাড়ির নম্বর জানো?'

'না তো।'

'কী গাড়ি?'

'দু-তিন রকমের গাড়ি নিয়ে আসেন বোম্বেতে।'

'কোন-কোন গাড়ি তুমি দেখেছ অ্যাদ্দিনে? কী-কী রঙের?'

মাদল মনে করে-করে বলল, 'গাঢ় নীল অ্যাম্বাসাডার, লাল মারুতি-ভ্যান। আর—আর—ইয়ে, শেষ দেখেছি গত পরশু—নতুন গাড়ি—অই প্রিমিয়ার ওয়ান-ওয়ান এইট। সাদা রং।'

থানা ক্রিকের ব্রিজ পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে ছুটেছে ঝমর। দু-ধারে সবুজ খেত-খামার। দূরে ধূসর পাহাড়। তাজা রোদ পড়ে চারদিকে চনমনে ভাব। বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে মাদলের চোখে-মুখে। খালি পেটে চড়ুইপাখি, পায়রা ডেকে বেড়াচ্ছে। বলেই ফেলল, 'এখন কোথায় যাচ্ছি, সত্যকাকু? পুনা?'

'দরকার হলে পুনা। না হলে, খাপোলি।'

'খাপোলিতে গরম-গরম বটাটা, মানে, আলুর বড়া ভাজে সকালে—'

সত্য হেসে, বাধা দিলেন, 'খিদে পেয়েছে, তাই না?'

ব্যস, আর বলার দরকার নেই মাদলের। সেই থেকে খটকা লেগে আছে। জিগ্যেস করল অন্য কথা, 'চা গরম আছে, বললেন কেন হঠাৎ?'

'নিজেই ভেবে বের করো দেখি।'

খালি পেটে গভীর ভাবনা ভাবা মুশকিল। তবু, মাদল খতিয়ে বোঝার চেষ্টা করল। চা গরম আছে, মানে, এখনও খাওয়া যায়। অথবা এইমাত্র দুজনে চা শেষ করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধি খুলল তার। হেসে বলল, 'এ মা! এ তো খুব সোজা। তার মানে, ভদ্রলোক একটু আগেই বেরিয়েছেন। অর্থাৎ বেশি দূর যেতে পারেননি। হয়তো খাপোলিতেই ধরা যাবে—কি, তাই না, কাকু?'

সত্য মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, 'মস্তিষ্ককে অলস ফেলে রাখতে নেই। কার্যকারণ, আগে-পিছে ভাবতে থাকবে—নইলে গোয়েন্দা হওয়া যায় না—'

সকালের ফাঁকা রাস্তা ধরে খাপোলি পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না।

ভিন্ন-ভিন্ন জাতের তিন-চারটে রেস্টুরেন্ট পথের দু-পাশে। মাদল দূর থেকেই গুনে দেখল, মাল-বোঝাই দুটি লরি ছাড়া, পাঁচখানা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে।

তকতকে নতুন সাদা প্রিমিয়ার ওয়ান-ওয়ান-এইট বাঁ-দিকের দোকান ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। দোকানের ওপরে সাইনবোর্ড—জে. কে. কেমিস্ট, ড্রাগিস্ট অ্যান্ড কেমিক্যালস সাপ্লায়ার। সামনে গাছের ছায়ায়, চেয়ারে বসে যে-লোকটি প্লেটে চা ঢেলে খাচ্ছে, তাকে দেখে সত্যসাধন মাদলকে জিগ্যেস করলেন, 'চেনো নাকি ওকে?'

মাদল অবাক গলায় বলল, 'অ্যাড-মার্কেটের শিবালকর!'

॥ এগারো ॥

ইন্সপেক্টর সাঠে ভ্যান থেকে নেমে দাঁড়ালেন মিস্টার জোশীর ফ্ল্যাটবাড়ির কম্পাউন্ডে। পিছনে চওধরির গাড়ি থেকে নামল জুলি সালডানা, দত্তারাম এবং চওধরি স্বয়ং। শকুন্তলা ম্যাডামের লাল মারুতি ভ্যান আগেই পৌঁছে গিয়েছিল।

সাধারণত কাটা-ছেঁড়া বডি লাশকাটা ঘর থেকে সোজা শ্মশানেই নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, তিরাশি বছরের বৃদ্ধা, জোশীর পিসিমা সারা রাত উথাল-পাথাল কান্নাকাটি করেছেন শেষবারের মতো দেখবেন বলে। পুলিশ ভ্যানের পিছন দিক থেকে মাধব জোশীকে নামানো হল। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে মোড়া।

চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ির পড়শিরা বেশিরভাগই জানালা বা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গেল। কিছু পুরুষ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরা এসে জুটল কাছেপিঠে। চাপা গুঞ্জন। আপিসের ওরা দোতলায় উঠে গিয়ে খবর দিয়েছে। জোশীর বউ ছেলের হাত ধরে নেমে আসছে। পাশে জুলি। শকুন্তলা, দত্তারাম ও আরও দুজন প্রতিবেশী বৃদ্ধাকে ধরে-ধরে নামাচ্ছে।

ঠিক তখনই পুলিশ ভ্যানের দু-দিকে এসে দাঁড়াল একটি ট্যাক্সি ও ঝমর। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে জয়দীপ নেমে এল। সত্যসাধন এগিয়ে গেলেন সাঠের দিকে। পিছনে মাদল। জয়দীপ যেন একটু ভয়ে-ভয়েই সাঠের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল। সাঠের কাছে পৌঁছে সত্য নীচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'পোস্টমর্টেম কী বলে।'

'রিপোর্ট বিকেলে পাব। পেলেই জানাব।' শোকের ছায়ায় চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই। এমন কি সাঠের মতো উদাত্ত-কণ্ঠ পুলিশসায়েবও সে-রেওয়াজ না ভেঙে কথা বলছেন। এত ফিসফিসিয়ে যে, পিছনে দাঁড়ানো মাদলও আর শুনতে পেল না। ওঁরা কথা বলছেন, মাদল শোক-সন্তপ্ত মানুষদের লক্ষ করছে।

শবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্বজনেরা, জোশীর স্ত্রী স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হলেন। ফরসা সুন্দর মুখটি ফোলা-ফোলা। জোশীর সঙ্গে বয়েসের ফারাক যথেষ্ট। এঁর বোধহয় তিরিশও হবে না। বেশ আঁটোসাটো শরীরে অসাব্যস্ত ছাপা শাড়ি কোনওমতে জড়ানো। মাথা নীচু করে নিঃশব্দে কাঁদছেন। জোশীর পিসিমাকে বসতে সাহায্য করছে শকুন্তলা ম্যাডাম। বিড়বিড় করে সমানে কী যে বকে যাচ্ছেন বুড়ি, শুনতে পাচ্ছে না মাদল। জোশীর মুখের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে চাদর সরাতে চেষ্টা করলেন। হাত কাঁপছে বলে, পেরে উঠছেন না। একজন সেপাই দাঁড়িয়েছিল। সামান্য ঝুঁকে জোশীর মুখের ঢাকনা সরিয়ে দিল সে। গোটা ভিড়টা একটু-আধটু নড়ে-চড়ে মুখটি দেখার-জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাদল ভেবে পেল না মরা একটা মানুষের মুখ দেখতে জ্যান্ত লোকগুলির এত উৎসাহ কেন? খুন হয়েছে বলে? নাকি, জীবিত চেনা, সেই মুখটির সঙ্গে এ-মুখের তফাত কীরকম—

দেখার জন্যে! আর দেখা যাবে না এই মুখ বলেও হতে পারে! ভাবতে-ভাবতে, মাদল নিজেও দু-কদম সরে, একটি অচেনা কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে উঁকি দিয়ে দেখল। বেলা এগারোটার খটখটে আলোয় নীলচে, ফোলা-ফোলা জোশী সাহেবের শেষ চেহারা। দু'টি মাছি উড়ছিল।

একটি ঠোঁটে, অন্যটি টাকের ওপর বসছে, উড়ছে আবার। চওধরি বোধহয় লক্ষ করল। এগিয়ে এসে হাত নাড়ল একবার। মাছিরা সরে গেল কিনা বোঝবার আগেই দারুণ চমকে উঠল সবাই। জোশীর বৃদ্ধা পিসিমা কাঁপা এবং ভাঙা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছেন হঠাৎ। না, শুধু কান্না নয়।

মারাঠি ভাষায় অকথ্য গালাগাল দিচ্ছেন চওধরিকে, যার বাংলা করলে দাঁড়াবে অনেকটা, 'মুখপোড়া, মাতাল, লুচ্চা কোথাকার। ছুঁবি না। ছুঁবি না ছেলেকে।' সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ব্যাপার কী? প্রতিবেশীদের কয়েকজন নিজেদের মধ্যে ফিসফিস জুড়ে দিয়েছে। মাদলের মনে হল, বুড়ি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে—এত রাগ! শোকে মাথা খারাপ হল না তো? ছোটবেলা থেকে বাপ-মা-মরা জোশীকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছে। মাথায় ধাক্কা লাগতেই পারে।

তারপরেই, বাপরে! এ কী কাণ্ড!

অশীতিপর বৃদ্ধা এমনিতেই ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছেন না। তার ওপর অমন শীর্ণকায় লোলচর্ম শরীর যেন পাহাড়-প্রমাণ ঘৃণা এবং ক্রোধে নুয়ে পড়ে টাল-মাটাল। সমানে শাপ-শাপান্ত করে যাচ্ছেন চওধরিকে। বাছা-বাছা মারাঠি গালাগাল ও বক্তব্যের বিষয় শুনে মাদল তো থ! বলে কি বুড়ি।

'ওরে মুখপোড়া, শকুনের বাচ্চা মাতাল! তুই কি আর বেলেল্লাপনার জায়গা পেলি না? মাধবের সংসার ভাঙতে এলি!—'

হাত ঘুরিয়ে জোশীর স্ত্রীকে দেখিয়ে জুড়ে দিলেন, 'ভাঙলি তো—ছেনাল মাগিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলি না কেন? হারামজাদা, মলখেকোর পো—আমার ছেলেটাকে না মেরে তোর কেলো কলজে ঠান্ডা হল না—'

শকুন্তলা ওঁকে ঠান্ডা করবার বৃথা চেষ্টা করছে। অমন টকটকে রং চওধরির—যেন, কালি মাখিয়ে দিয়েছে কেউ। তবু, কাঁচুমাচু মুখে লোকটা বোঝাবার চেষ্টা করছে দু-হাত তুলে, বুড়ির কাছে গিয়ে, 'আহা মাসিমা! শান্ত হোন! এইভাবে উলটোপালটা মুখ খারাপ করলে কি মাধবের আত্মা শান্তি পাবে?--'

কীসের কী? টার্গেটকে হাতের কাছে পেয়েই বোধহয় দ্বিগুণ উৎসাহে হামলে পড়লেন পিসিমা। খামচে ধরলেন ওর কলার। একটি মৃতদেহের সামনে সে ভারী বেমানান দৃশ্য। জোশীর ছ'সাত বছরের ছেলেটি মৃত্যুর তেমন কিছু বোঝে না বোধহয়। এতক্ষণ, চুপচাপ জুলজুল চোখে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে লোকজন, পুলিশের ইউনিফর্ম, পিস্তল ইত্যাদি দেখছিল। এবার, হয়তো ভয় পেয়েই ডুকরে কেঁদে ফেলল।

দু-তিনজন প্রতিবেশীর সাহায্যে শকুন্তলা ও দত্তারাম পিসিমাকে ধরে, বুঝিয়ে-সুজিয়ে বসিয়ে দিল। বুড়ি হাঁফাচ্ছেন তখন।

এদিকে, সত্যসাধন ও সাঠে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন। এবার পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন দুজনেই। চওধরির কাছে এসে সাঠে প্রায় কানে-কানে বললেন, 'মিস্টার চওধরি! একটু আসুন তো!'

মাদল একবার ভাবল ওদের পিছন-পিছন যায়। না গিয়ে, জয়দীপের কাছে চলে এল।

'জয়দীপদা, কী ব্যাপার বলুন তো?'

জয়দীপ বৃদ্ধা এবং শকুন্তলাকে দেখছিল। অন্য কিছু ভাবছিল বোধহয়। মাদলের কথা শুনে একটু যেন চমকে উঠল। বলল, 'কীসের কী ব্যাপার?'

মাদল বলল, 'ইয়ে, মানে—বৃদ্ধা অমন খেপে গেলেন কেন?' জয়দীপের জবাবে বিস্ময়,

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! তবে, চওধরির সঙ্গে বোধহয় এ-পরিবারের সম্পর্ক বেশ কাছের!'

মাদলের মনে হল, জয়দীপদা বেশি ভাঙতে চাইছে না এখন। অবশ্য, এটাও ঠিক—বিষয়টা মুখরোচক হলেও স্থান-কালের বিচারে রুচি-সঙ্গত নয়। তা ছাড়া, মাদল আরও ভেবে দেখল, সব ব্যাপারে অপরিসীম কৌতূহল থাকা গোয়েন্দার কাছে প্রায়োজন তবে, তার পক্ষে সেটা সব সময়, সব ক্ষেত্রে প্রকাশ করে ফেলা ভালো নয়। কারণ, সে না সরকারি পুলিশ, না, বেসরকারি গোয়েন্দা। সুতরাং, মাদল বসু চুপচাপ দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে যেতে লাগল।

পিসিমাকে ধরাধরি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধা। তবু সিঁড়ি ভাঙার সময় মাঝে-মধ্যে হেঁচকি তোলার মতো কান্নার আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। মিসেস জোশী যেমন স্থাণু হয়ে বসেছিলেন, তেমনি রয়েছেন। একমাত্র ছেলে তাঁর কোলে মাথা গুঁজে হাঁটু মুড়ে বসে। মহিলার পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে জুলি সালডানা।

মাছ-ভাজার তেলতেলে গন্ধ ভেসে এল মাদলের ঘ্রাণে। সকালের রোদ দুপুরের দিকে দ্রুত হাঁটছে। শবদেহের কাছাকাছি পৌঁছে গেল প্রায়। মাদলের বাঁ-পাশে দাঁড়ানো লোকটি বোধহয় দক্ষিণের। লুঙ্গি ও ফতুয়া পরনে। সিঁড়ি দিয়েই নেমে এসেছে কম্পাউন্ডে। মাদল ধরে নিল, এ-বাড়িরই বাসিন্দা। গলা খাটো করে হিন্দিতে জিগ্যেস করলে, 'শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার কী ব্যবস্থা?'

লোকটিও চাপা গলায় জবাব দিল, 'ফোন করা হয়েছে। শিবসেনার শববাহিকা ভ্যান এক্ষুনি এসে পড়ল বলে।'

'জোশীর আত্মীয়-স্বজন?

'খুব বেশি আত্মীয়-স্বজন তো কখনোই ওঁর ফ্ল্যাটে আসতে দেখিনি। ওই নীল ডোরাকাটা জামা-পরা মামাতো ভাই। ওরই কাছাকাছি যে তিন-চারজনকে দেখছেন, ওরা কীরকম সম্পর্কের জানি না। তবে, কখনও-সখনও, মানে, ন'মাসে-ছ'মাসে মুখ দেখেছি—এই পর্যন্ত। আপনি?'

'আমি আপিসের।' জবাব সেরেই মাদলের আবার জিভ চুলকোল। লোকটি ওর চেয়ে বয়েসে খুব বেশি নয়। মিশুকেও মনে হচ্ছে। জিগ্যেস করে দেখা যাক, ভেবে যতটা সম্ভব কৌতূহলবিহীন প্রশ্ন করলে মাদল, 'আচ্ছা ওই বৃদ্ধা, মানে, জোশীসায়েবের পিসিমা হঠাৎ অমন চেঁচামেচি করলেন কেন? মিস্টার চওধরির ওপরে খুব খাপপা দেখলুম?'

'আপনি যা দেখলেন-শুনলেন, আমিও তাই। এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।'

বলে, মুখে কুলুপ লাগিয়েই যেন অন্য দিকে মনোযোগ দিল লোকটি।

কী আর হবে? মারবে তো না! এই পরিবেশে চেঁচিয়েও উঠবে না—ভেবে মাদল খুবই আন্তরিক গলায় আর-এক খোঁচা দিল, 'না। মানে, আমি তো আপিসের লোক। কদ্দুর আর জানব বলুন? আর, আপনি তো এ-বাড়িতেই থাকেন। সজাগ প্রতিবেশী হিসেবে হয়তো আমার চেয়ে একটু বেশিই জেনেশুনে থাকবেন।'

গ্যাসে কাজ হল। মুখ ফেরাল দক্ষিণীবাবু। হিসহিস গলায় বলল, 'আছে ব্রাদার। কেলেঙ্কারি আছে। দ্বিতীয় পক্ষের বউ। চনমনে জওয়ানিও রয়েছে গতরে। আধা-বুড়ো, ঠান্ডা সোয়ামিতে শানাবে কেন?'

বলে, চারপাশে জরিপ করে নিল লোকটা। ফের বলল, 'আপনাদের চওধরিও বাপু ধুরন্ধর মাল। গোড়ায়-গোড়ায় জোশীর সঙ্গেই আসত। গত বছরখানেক ধরে দেখছি একাই দিন-দুপুরে এসে হাজির হচ্ছে। ছেলেটা যায় ইস্কুলে। বুড়ি তো সারাক্ষণ তার ঘরের খাটেই শুয়ে থাকে। কস্টিনস্টির অসুবিধে নেই—তাছাড়া, এ-পাড়ার লোকেও দুজনকে দিন দুপুরে হোটেলে-মোটেলে ঢুকতে দেখেছে—' বলতে-বলতে শিবসেনার সাদা ভ্যান প্যাঁ-পোঁ করে এসে গেল।

ফুল-টুল নিয়ে আসা হয়েছে। অতি সাধারণ ভাবে, নিয়ম-মানার জন্যেই যেন, ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হল। দত্তারাম একটি বড় তোড়া এনেছে কখন কে জানে? সেটি দিল শকুন্তলা মেমসাব।

আপিসের তরফ থেকেই বোধহয়।

'রামনাম' সামান্য কান্নার আওয়াজ এবং শবদেহ তোলার মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে মাধব জোশীকে শেষবারের যাত্রার জন্যে মোটরে তুলে দেওয়া হল।

মাদলও যন্ত্রচালিতের মতো হাত লাগিয়েছিল। ও-সবের মধ্যেও মনে একটা খচখচানি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে সেই থেকে। চওধরিই কি তবে কালপ্রিট? জোশী সরে যাওয়ায় ওর সুবিধে তো এখন বাধা-বন্ধ-হারা। মাতাল মানুষ। খুনিও কি?

পুলিশ ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে সাঠে ও সত্যসাধন চওধরির সঙ্গে কথা বলছিলেন। সাঠেই জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। সত্য শুনছিলেন। চওধরি বলল, 'এবার আমায় ছেড়ে দিন। শ্মশানে যেতে হবে।'

ইনস্পেক্টর সাঠের গলায় কি সামান্য ব্যঙ্গের সুর, 'শ্মশানে গিয়ে আর হবে কী? এখন তো বরং আপনার এখানে থাকাই ভালো। সান্ত্বনা-টান্তনা!'

'ছি-ছি,! কী বলছেন আপনি? স্যারের শেষযাত্রায়—! তা ছাড়া, ওখানে কী লাগে-টাগে—' বলতে-বলতে, নিজের গাড়ির দিকে এক পা বাড়াল চওধরি।

ইনস্পেক্টর সাঠে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ঠিক আছে। যান। আমি থানায় থাকব। আপনি ওখান থেকে সোজা থানায় চলে আসবেন। একঘণ্টার মধ্যে। মড়া ছাই হল কিনা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করবেন না আবার!' শিবসেনার হার্স বেরিয়ে যেতেই, সাঠে বললেন, 'আমি চলি হে, সাধনকর! সায়ন হাসপাতালে একবার টুঁ মারতে হবে। তুমি কি যাবে, না এখানেই সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে?'

সত্য কী একটা ভাবছিলেন। অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'নাহ! যাব এবার। এখানে থেকে আর করবটা কী?'

কালো ভ্যানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে মুখ ঘুরিয়ে ঠাট্টা করলেন সাঠে 'সে কী। বাতাসে ফুঁ দিয়ে গন্ধ শুঁকে-শুঁকে সূত্র খুঁজবে না।' জোরে শ্বাস টেনে সাঠে জুড়ে দিলেন। 'আহ! দারুণ মাছ ভাজা হচ্ছে। হয় পমফ্রেট, নয় রাউস! শোঁকো হে! আমি চলি—'

ওঁর ভ্যান বেরিয়ে গেল। মাদল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আসল গাড়ি দুটি বেরিয়ে যেতেই কম্পাউন্ড প্রায় সাফ।

হঠাৎ সিঁড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন সত্য। মাদলকে ডাকলেন, 'এসো দেখি।'

দোতলায় উঠে জোশীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন সত্যসাধন। পেছনে মাদল। দরজা খোলা। ল্যান্ডিংয়ের দু-ধারে আরও দুটি ফ্ল্যাটের দরজা। জনা পাঁচ-ছয়েক নারী-পুরুষের ছোট জটলা। জোশীর হলঘরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। সেখানে, জুলি সালডানা সোফায় বসে কারুর সঙ্গে কথা বলছে নীচু গলায়; দ্বিতীয় ব্যক্তি দরজার আড়ালে বলে, বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না।

সত্যকে দেখে জুলি উঠে দাঁড়াল। শুকনো এবং দ্বিধা-ভরা হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে জিগ্যেস করলে, 'ইয়েস স্যার?'

'মে আই কাম ইন?' বলতে-বলতে সত্য এককদম ঢুকে পড়লেন ঘরের চৌহদ্দিতে। হলের একদিকে সোফাসেট, অন্য প্রান্তে ডাইনিং টেবিল ঘিরে ছ'টা চেয়ার। তার একটাতে মিসেস জোশী। অন্যটায় শকুন্তলা। দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে, টেবিলে মাথা রেখেছেন মিসেস জোশী। পিছন থেকে দেখে মনে হয় মাঝে-মাঝে শরীর কেঁপে উঠছে। কাঁদছেন। জুলি কথা বলছিল শকুন্তলার সঙ্গে।

ঘরে ঢুকে পড়তেই শকুন্তলা খানিকটা বাঁকা সুরে বলল, 'ইউ হ্যাভ অলরেডি কাম ইন! জিগ্যেস করা তো বাহুল্য।—' জুলি তাড়াতাড়ি পরিচয় দেওয়ার ধরনে বলে উঠল, 'ম্যাডাম, ইনি মিস্টার রয়ের হয়ে ইনভেস্টি—'

শকুন্তলা হাত তুলে বাধা দিল জুলিকে। এবং সত্যকে বলল, 'এখানে কী? এখানেও জেরা করবেন নাকি?'

সত্যর মুখে বিনয়ের হাসি, 'আপনাকে নয়। এবং জেরাও নয়। মিসেস জোশীর সঙ্গে দুটো কথা বলার দরকার ছিল—'

মাথা না তুলেই, কান্নাভাঙা অথচ কড়া গলায় জবাব দিলেন মহিলা, 'আমার কারুর সঙ্গে কোনও কথা নেই। বলবারও নেই। শোনবারও নয়।—' বলতে-বলতে সামান্য মুখ তুলে সত্যকে দেখে বললেন, 'ইউ মে প্লিজ গেট আউট! ডোন্ট ডিস্টার্ব মি!—' মাদল যেটুকু ঘরে ঢুকেছিল, অভ্যর্থনার নমুনা দেখে সেটুকুও পিছিয়ে গেল। সত্য দমলেন না। বললেন, 'তা হলে আপনার স্বামীকে চওধরিই খুন করেছে, বলছেন?'

এবার চমকে সোজা হয়ে বসলেন মহিলা। 'কিছুতেই না। কী বলতে চান, আপনি?'

'আমার তো কোনও কথাই শুনতে চাইছেন না। তবে, চওধরিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল বলেই ভাবলুম, হয়তো আপনার সাহায্যে আসতেও পারি।

শকুন্তলা বলল, 'চওধরিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল? মিথ্যে কথা।'

সত্য বললেন, 'একটু বাদে থানায় ফোন করলেই সত্যি-মিথ্যে টের পাবেন।'

মহিলা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। চোখ মুছলেন আঁচলে। বললেন, 'আপনি কে?'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার।'

'ভেতরে আসুন।'

সত্য মাদলকে ডেকে নিলেন—'এসো মাদল।'

ছোট প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মাদল দেখল ডানদিকে রান্নাঘর। তেমন গোছানো নয়। বাঁ-দিকে টয়লেট। রান্নাঘরের পরে ছোট বেডরুম। আধা-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল বৃদ্ধা পিসিমা চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন। কেমন একটা ওষুধ-ওষুধ গন্ধ আসছে। তারপরে, মাস্টার বেডরুমের খোলা দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। ডবল-বেডের বিছানায় চাদর বালিশ অগোছালো। ওয়াল ক্যাবিনেট। ড্রেসিং টেবিল ও দুটি ছোট গদিমোড়া টুল। বাঁ-ধারের কোণে জানালা-ঘেঁষে একটা টেবিল-চেয়ার। টেবিলে খানকয়েক বই, টেবল-ল্যাম্প।

মিসেস জোশী চেয়ারটির মুখ বিছানার দিকে ঘুরিয়ে সত্যকাকুকে বললেন, 'প্লিজ সিট ডাউন।' মাদলের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

সত্যকাকু না বসে মিসেস জোশীকে বললেন, ইংরিজিতে, 'এ আমার সহকারী—মাদল বসু।'

'অ।' বিরক্তি চাপা-দেওয়ার ধরনে জবাব দিলেন মহিলা। তারপর, অপাঙ্গে এক পলক দেখে নিয়ে মাদলকে বললেন, 'ওখানে বসতে পারেন।'

মানে, ড্রেসিং টেবিলের টুলে।

'থ্যাংক ইউ'—বলে, আম্লানবদনে বসে পড়ল মাদল। বসেই, খেয়াল হল, আয়নার পাশে, দেওয়াল গেঁথে লাগানো রয়েছে এ-সি-মেশিন। বন্ধ এখন।

একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে খাটের ধার ঘেঁষে বসলেন মিসেস জোশী। কাছ থেকে এবার মাদল টের পেল ওঁর মুখে, গলায়, ঘাড়ে অল্প-অল্প ঘাম। চোখের কোলে রাত-জাগার ছাপ। শাড়ির আঁচল বুলিয়ে মুখ মুছে যেন তৈরি হয়ে নিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন কী জানতে চান?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে সত্যকাকু দুম করে প্রশ্ন ছুড়লেন, 'মিস্টার চওধরির সঙ্গে আপনার কীরকম সম্পর্ক?'

নীচের কম্পাউন্ডে অমন নাটকীয় ঘটনা, বৃদ্ধা পিসিমার চিৎকার ইত্যাদির পর এ-প্রশ্ন যে আসবে তা নিশ্চয়ই মহিলা আশঙ্কা করেছিলেন। তবে, মুখে সামান্য চমকানোর ভাব দেখে বোঝা গেল, একেবারে গোড়াতেই সরাসরি বুলেট ছুটে আসবে—ভাবতে পারেননি।

সামলে নিয়ে, সপ্রতিভ গলায় জবাব দেওয়ার চেষ্টাও মাদলের চোখে পড়ল, 'স্বামীর কলিগ এবং বন্ধু। এ-বাড়ির প্রায় পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন।—'

ভারী শান্ত এবং নির্লিপ্ত কণ্ঠে সত্যকাকু আবার বললেন, 'আই রিপিট—মিস্টার চওধরির সঙ্গে আপনার কীরকম সম্পর্ক?'

॥ বারো ॥

মাদল লক্ষ করল সত্যকাকু 'আপনার' শব্দটিতে পাথরের ওজন চাপিয়ে উচ্চারণ করলেন।

'বন্ধুর মতো।'

'পুরুষ-বন্ধুর মতো বলছেন?'

'হ্যাঁ—' বলেই ভুরু কুঁচকে পালটা প্রশ্ন করলেন মিসেস জোশী, 'মানে? কী বলতে চান আপনি?'

'বলতে চাই না কিছুই। স্রেফ জ.নতে চাই—মিস্টার জোশীর পিসিমা যে-কথাগুলো বললেন তার কতখানি সত্য?'

দ্যাখন হাসির চেষ্টা দিয়ে ঠাট্টার গলায় মহিলা বললেন, 'সেনিলিটি বলে একটা কথা আছে—ভীমরতি? নিশ্চয়ই শুনেছেন?'—

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন সত্যকাকু। হ্যাঁ, শুনেছেন।

'ওঁর বয়েস বিরাশি। সাতান্নরকম রোগে ধুঁকছেন। আবোল-তাবোল বকা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয় কি?'

সত্যকাকু এক সেকেন্ড চুপ থেকে বোধহয় পরের প্রশ্ন সাজাচ্ছিলেন মনে-মনে। মাদল হুট করে জিগ্যেস করল, 'কাকু, আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে সত্যসাধন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাবার মধ্যেই মহিলা প্রায় টিটকারির গলায় বললেন ওঁকে, 'আপনার চ্যালা টিকটিকির কথাও শুনতে হবে নাকি?'

সত্যকাকুর মাথা নাড়া দেখে নিয়েছে মাদল। মহিলার কথা গায়ে না মেখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকে জিগ্যেস করলে, 'বম্বে শহরের কয়েকটি আধাখ্যাত আবাসিক হোটেলে ভর-দুপুরে আপনাকে ঢুকতে দেখা গেছে। চওধরি সায়েবের সঙ্গে অবশ্যই।—'

কথা শেষ হওয়ার আগেই তেরিয়া ভঙ্গিতে মহিলা বলে উঠলেন, 'শাট আপ!—কোথায়? কোন হোটেলে?'

মাদলকে এক মুহূর্ত চুপ দেখে সত্যসাধন বললেন, মিসেস জোশী, মাফ করবেন। আমি ঠিক ঠাহর পাচ্ছি না—আপনার প্রশ্নের জবাব আমরা দেব, না, আপনি আমাদের প্রশ্নের?'

গলা নরম করে মহিল বললেন, 'এই সব ভিত্তিহীন ফালতু প্রশ্নের জবাব দিতে আমি রাজি নই।'

সত্য মৃদু হাসলেন, 'ভিত্তিহীন হলে, খুব সম্ভবত আপনি "কোন হোটেলে" কথাটি বলে ফেলতেন না! এনিওয়ে থ্যাঙ্ক ইউ, মাদল—' শেষেরটুকু মাদলকে উপহার দিয়ে আবার ঘুরলেন মহিলার দিকে।

'একটি বাস্তব প্রশ্নের সোজা উত্তর দিলে আপনাকে তথা, চওধরি সায়েবকে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব এবং সহজ হবে।'

সাপের উদ্যত ফণা নেতিয়েছে, এমনই ধরনে বললেন মিসেস জোশী, 'বলুন।'

'চওধরির সঙ্গে আপনার যতখানি বা যেটুকু সম্পর্কই থাক—তা কি মিস্টার জোশী, মানে আপনার স্বামী জানতেন?'

মাথা নীচু করে ধরা গলায় জবাব। 'কিছুটা।'

'মানে, পুরোটা নয়?'

সত্যকাকুর প্রশ্নে চমৎকৃত হল মাদল। এ-ক্ষেত্রে, সোজা আঙুলে ঘি উঠছে না দেখে উনি আঙুল বেঁকিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কাজও হল। কারণ, মহিলা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তেমনি মুখ নীচু করেই তাঁর গলায় ভাঙনের সুর ফুটল, 'আপনি বিশ্বাস করুন, হরবিলাসকে আমার মতো কেউই বোধহয় জানে না। ওর পক্ষে, এমন নৃশংস কাণ্ড—না, না—এ অসম্ভব! ওরা পরশুও দুজনে এই এ-ঘরে বসে ড্রিংক করেছে একসঙ্গে।—'

'ওদের দুজনে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে ইদানীং?'

মুখ তুললেন মিসেস জোশী। চোখে জল জমছে। সামলে নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'না। কোনওদিনও তেমন কিছু আমি দেখিনি, শুনিনি।'

'হরবিলাস চওধরির সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছে—যখন মিস্টার জোশী উপস্থিত ছিলেন না?'

'গতকাল।'

'কোথায়? বাড়িতেই?'

'না। "কপার চিমনি" রেস্তোরাঁয়।'

'কখন?'

'বেলা এগারোটা নাগাদ।'

'কতক্ষণ ছিলেন একসঙ্গে।'

'ঘণ্টাখানেক।'

'তারপর?'

'ও আপিসে চলে যায়। আমি বাসায় ফিরে আসি।'

মিস্টার জোশী প্রসঙ্গে কোনও কথা? আলোচনা?'

কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে মিসেস জোশীর জবাব, 'না।'

উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে সত্যসাধন বললেন, 'শেষ দুটি প্রশ্ন। মিস্টার চওধরি অবিবাহিত। আপনারা দুজনে কি বিয়ের কথা ভাবছিলেন?'

'আমার স্বামী সরল ও উদারচেতা ছিলেন। ওঁকে ত্যাগ করার কথা আমি ভাবিনি কখনও।'

'কিন্তু মিস্টার চওধরি?'

একটু চুপ থেকে জবাব দিলেন মহিলা, 'ওঁকেই জিগ্যেস করবেন।' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন খাট থেকে। মাদলও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মিসেস জোশী দরজার দিকে এগোতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। সত্যকাকুকে জিগ্যেস করলেন, 'হরবিলাসকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে? আপনি ঠিক বলছেন?'

'এখনও অ্যারেস্টেড হননি। তবে থানায় ওঁকে যেতে হচ্ছে। তারপর কী হবে বলা মুশকিল।'

'আপনি কি ওকে সাহায্য করতে পারেন না? আমি আপনার ফিস দেব, কারণ, আমি জানতে চাই হরবিলাস এরকম অমানুষিক ব্যাপারে থাকতে পারে কি না।—না, না অসম্ভব।'

বলে মুখ নামিয়ে যেন নিজেকে সংযত করতে সময় নিলেন মিসেস জোশী।

সত্যকাকু হঠাৎ জিগ্যেস করলেন ঘর থেকে বেরোবার মুখে, 'আপনার ছেলেকে দেখছি না?'

মুখ তুলে ম্লান হাসবার চেষ্টা করলেন মহিলা। বললেন, 'ওকে পাশের ফ্ল্যাটে প্রতিবেশীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই শোক, এই নোংরা কথাবার্তার মধ্যে ওর না-থাকাই ভালো। কী বলেন?'

মাথা নেড়ে সত্যকাকু বললেন, 'ঠিক করেছেন। বড়ই নোংরা—'

হঠাৎ মাদলের সামনেই, মহিলা সত্যকাকুর হাত ধরে ফেললেন। কান্না চাপার চেষ্টা করে,

অনুরোধের গলায় বললেন, 'হরবিলাসের কিছু হবে না তো? ওকে আপনি সাহায্য করুন। ও ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই এখন!'

শুনে মাদলের মন তেতো হয়ে গেল। সবে স্বামী খুন হয়েছে। তার কিনারা এখনও হয়নি। তার শেষকৃত্যও বাকি এখনও। এই অবস্থায়, এমন করে কথা বলতে পারল মহিলা! পরক্ষণেই ভাবার চেষ্টা করল মাদল অন্যদিক। সত্যিই তো! বুড়ি পিসিমার দু-চক্ষের বিষ। একমাত্র ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে মিসেস জোশীর একমাত্র সহায় হয়তো তার অবৈধ প্রেমিক।

সত্যকাকুর মাপা জবাব শুনতে পেল মাদল, 'উনি যদি নির্দোষ হন, আমি কথা দিচ্ছি—ওঁর কিছু হবে না।'

বেডরুম থেকে বেরিয়ে তিনজন প্যাসেজ ধরে হাঁটতে লাগল।

আহা-হা! দেখেও আনন্দ! মাদলের ঠিক এই কথাই মনে হল। যদিও বিশাল ঘরটি একটু স্যাঁতসেঁতে। মাটির নীচে বলেই হয়তো। যদিও ঘরটির কোনও দেওয়ালে কোনও জানালা নেই, এবং যদিও, স্রেফ একটাই দরজা—যেটা দিয়ে মাদল ঘরে ঢুকেছে! তবু, চারিদিকে এতগুলি সাদা-সাদা ক্যানভাস—অবশ্যই স্ট্রেচ করে ফ্রেমে লাগানো—! তার ওপরে, নীচু টেবিলে এবং প্যাকিং বাক্সে গাদাগুচ্ছের রং-ভরতি টিউব। সবকিছু যেন মাদলের স্পর্শের অপেক্ষায় হাঁ করে চেয়ে আছে।।

মাদল খুশি-খুশি, অবাক গলায় বললে, 'এ-এ স-অ-ব আমার??' খোঁচাখোঁচা দাড়িওলা পরিপূর্ণ যুবকের কণ্ঠস্বর প্রায় শিশুর মতো শোনাল।

যুবক দেখতে পেল না, জেজে রুদ্রাক্ষর দিকে তাকিয়ে এক চিলতে হাসি দিল। রুদ্রাক্ষ গম্ভীর। এয়ার কন্ডিশন মেশিনের মৃদু আওয়াজ না থাকলে ওর উত্তর এ-ঘরে নিশ্চয়ই প্রতিধ্বনিত হত, 'হ্যাঁ, তোমার। আপাতত। ছবি আঁকার জন্যে।'

একশো পাওয়ারের একটা নাঙ্গা বালব ঝুলছে সিলিং থেকে। মস্ত ঘরটির বেশিরভাগই মরা আলোয় আবছা।

পিছনে, রুদ্রাক্ষ এবং জেজের দিকে ঘুরে মাদল জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু আলো? এ-আলোয় তো রং বোঝাই যাবে না?' বসের ইশারায় জেজে হাত ছোঁয়াল দরজার পিছনে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের চার কোণে নকল সিলিং-এর তলা দিয়ে চারটে আলো জ্বলে উঠল। পরপর। দুটো স্পট। ইজেল, ক্যানভাস, রং, প্যালেট—তকতকে আলোয় অলঙ্কারের মতো ঝকঝক করতে লাগল শিল্পী মাদলের চোখের সামনে।

পেতে আরম্ভ করলে, মানুষ স্বভাবতই—আরও কি পাওয়া যায়—কতখানি—জেনে নেওয়ার তৃষ্ণায় আকুল হয়। মাদলেরও প্রায় তেমনি অবস্থা। না কি, ওর মনের লুকোনো কোণে অন্য জিজ্ঞাসা? 'কিন্তু ন্যাচারাল লাইট? দিনের আলো কই? এরকম নকল আলো, মানে, আর্টিফিশিয়াল লাইটে, তো অনেক হলুদ সাদা দেখাবে। অনেক নীল সবুজ। যা আঁকব, বাইরের আলোয় তো সেরকম দেখা না-ও যেতে পারে?'

ঠিক সময়েই জুহুতে গাড়ি এসে পৌঁছেছিল। মাদলও তার ছবি-টবি নিয়ে যথা সময়ে ওয়ালকেশ্বরের এই অট্টালিকায় হাজির হয়েছে। প্রধান ঘরের একদিকে করিডোর যেমন শেষ হয় হলুদ চেম্বারে, অন্য দিকে তেমনি লাল চেম্বার। সমস্ত কিছুই লাল বা লালচে। সেখানে জেজে নিয়ে গেল তার বসের সঙ্গে আলাপ করাতে। ঘরে ঢুকতেই গা ছমছম করে। দু-পাঁচটা খুন করে লাশ সরিয়ে ফেললে রক্তের দাগ চেনা যাবে না এখানে। অন্তত, খালি চোখে। ক্রিমসান রংয়ের মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে বস। মুখটি ক্ষণিকের জন্যে চমকে দিয়েছে মাদলকে। উরিত্তারা!

এ তো অনুপম খের। সিনেমার নামকরা ভিলেন।

মাদলের ছবিগুলি টেবিলে সাজিয়ে রাখল জেজে। দ্রুত চোখ বুলোচ্ছে বস। মাদল ভাবছে, এই-ই তাহলে রুদ্রাক্ষ সেন। নাটের গুরু! উঁহু! গুরুর গুরু মহাগুরুও আছেন। তিনি 'কফেপোসা' ও 'ফেরা'র আসামী। কী কাপ্তান যেন বলেছিলেন সত্যকাকু! দুবাই না আবুধাবিতে থাকে এখন। কলকাঠি নাড়ে ওখান থেকেই।

ছবি দেখে রুদ্রাক্ষ বলল, 'হুম! ঠিক হ্যায়!'

আইব্বাস! গলা তো একেবারে আর-এক হিন্দি ভিলেনের। অম্বরীশ পুরি। দানা-ওয়ালা জলদ-গম্ভীর স্বর ঘরে গমগম করে উঠল।

জেজেকে হুকুম দিল হিন্দিতে, 'ওকে নিয়ে যাও। ঘর-টর দেখিয়ে দাও। খেয়াল রেখো— ওর যেন এখানে কোনও অসুবিধে না হয়।'

তারপর, মাদলকে জিগ্যেস করল বাংলায়, 'তোমার নাম কী?'

ও যে বাঙালি—সেটা নিশ্চয়ই জগগু জেজেকে এবং জেজে বসকে বলেছে।

বিনীত জবাব মাদলের, 'মাদল।'

'বাহ্! তুমি বাজাতে জানো?'

মাদল অবাক, 'কী স্যার?'

মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে রুদ্রাক্ষ বলল, 'অই, তোমার নাম! তা, তুমি ছবি আঁকতে শিখলে কোথায়?'

'কলকাতায়। দু-বছর। আর্ট স্কুলে।'

'যাও। আজ থেকে কাজে লেগে যাবে।'

'কী কাজ, স্যার?'

'ছবি আঁকবে। যত ইচ্ছে। যেমন খুশি। যত বেশি এবং দ্রুত আঁকবে, তত টাকা।'

'কত টাকা, স্যার?'

'ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে আছে রুদ্রাক্ষর, 'কত চাই?'

লজ্জা পেয়ে গেল মাদল, 'সে—স্যার—আমি কেমন করে জানব—!'

'রাস্তায় বসে কত করে পেতে?'

'এই দশ-কুড়ি। সবচেয়ে বড় ছবির দাম পঞ্চাশ টাকা।'

'প্রত্যেক ছবির জন্যে তুমি পাঁচশো টাকা করে পাবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে মাদলের আফশোস হল। ইশ। এরা যদি গুণ্ডা-বদমাশ বা স্মাগলার না হত? তা হলে, সারা জীবন এখানে কাজ করত সে। টাকা-বাড়ি-গাড়ি আরও টাকা। ইশ, মনে-মনে সে বলল— 'ওরে! তোরা মানুষ হলি না কেন রে?'

মাদল চুপ করে ছিল বলে, রুদ্রাক্ষ বলল, 'কী? ঠিক আছে তো?'

একগাল হেসে মাথা নাড়াল মাদল। রুদ্রাক্ষ আরও বলল, 'তুমি কিন্তু এক বছর ছুটি পাবে না। এ-বাড়ির যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে। তবে, বাড়ির বাইরে নয়। বছর শেষে একমাসের ছুটিতে তুমি বাড়ি, মানে, কলকাতায় যেতে পারবে। প্লেনে যাবে-আসবে।'

মাদল ভাবল—তার মানে, ও কি এখন থেকেই বন্দি হয়ে গেল? রঘুনাথ কী যেন বলছিল সেদিন? ওর ভাই এখানে ছবি আঁকত। ওকেও এরা সাবাড় করে দিয়েছে। তাহলে, সে কি এখানে ওই রঘুনাথের ভাইয়ের শূন্যস্থান পূরণ করতে এসেছে? লাল ঠান্ডা ঘরে এমনিতেই শীত-শীত ভাব। এই মুহূর্তে মাদলের ভেতরে একটা কাঁপুনি দিয়ে গেল।

বসকে একটু তোয়াজ করে 'মস্কা' মারলে হয়! খুশি হবে লোকটা। ভেবে নিয়ে মাদল বলল, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'আপনাকে না, স্যার, অনেকটা সিনেমার—' গম্ভীর স্বরে বাধা পেল মাদল 'হুম জানি।'

বলেই, প্রসঙ্গ পালটাতে রুদ্রাক্ষ চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল, 'চলো। তোমার স্টুডিও দেখিয়ে দিই। আও জেজে।' লোকটা খুশি হল কিনা বোঝা গেল না। তাই, আরেকটা চেষ্টা দিল মাদল, হাঁটতে-হাঁটতে, 'স্যার, আপনার পোর্ট্রেট এঁকে দেব?

দুম করে দাঁড়িয়ে পড়ল রুদ্রাক্ষ। ঘুরে, ওর মুখোমুখি হল, চোখে-চোখে চেয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। ভয়ঙ্কর চোখের চাউনি! মাদলের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা কী একটা নামছে। ভয়ে, চোখ সরিয়ে নিল সে। রুদ্রাক্ষ খুব ধীরে-ধীরে বরফের গলায় কেটে-কেটে উচ্চারণ করল—'না। কোনও মানুষের। জীবিত বা। মৃত। মুখ আঁকবে না।'

সায় দিতে গিয়ে, গলা মৃদু কেঁপে গেল মাদলের! ঘাড় কাত করে বলল, 'ঠিক আছে, স্যার। কিন্তু স্যার, তাহলে—ইয়ে, কী ধরনের ছবি আঁকতে হবে, স্যার?'

আবার রওনা হল রুদ্রাক্ষ। দরজার কাছে পৌঁছে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'পোর্ট্রেট ছাড়া যা খুশি। হাতি-ঘোড়া-বাঘ-সিংহ। ঠাকুর-দেবতা। সিনসিনারি—যা মন চায়।'

বলতে-বলতে ওরা তিনজনে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছিল ভূগর্ভে। মাদল গুনেছিল মনে-মনে—সাতাশটা সিঁড়ি। মনুমেন্ট থেকে নামার মতো ঘুরে-ঘুরে এসে এ-ঘরে ঢুকেছিল।

ন্যাচারাল ও আর্টিফিসিয়াল লাইটে রঙের তফাত বলতে-বলতে মাদল দেখল, রুদ্রাক্ষর মুখে অতি ক্ষীণ হাসির রেখা। লোকটা খুশির গলায় জেজেকে বলল, 'বাহ! ছোকরা তো সমঝদার হ্যায়! বহুৎ খুব!' মাদলকে বলল, 'প্রত্যেক ছবিতে তোমাকে পাঁচশো নয়। হাজার করে দেব, মাদল।'

ওর মুখে হাসি দেখে, ধড়ে প্রাণ পেল মাদল। মনে-মনে বলল, কিছুই তো দেবে না, বাপু। ছবি আঁকা শেষ হলে তোমাদের উদ্দেশ্য ফুরোবে। তারপরেই, ওই রঘুনাথের ভাইয়ের মতো আমার লাশ গায়েব হবে যাবে। কিন্তু ছবি আঁকানোর পিছনে এদের উদ্দেশ্যটা কী? প্রাচীন ঐতিহ্যময় শিল্পকর্ম বা অত্যন্ত নামী-দামি শিল্পীর ছবি-টবি স্মাগলড হয়। কিন্তু মাদল বসুর মতো হরিদাস পালের ছবি তো স্মাগল করার দরকারই হবে না। কিনবেটা কে?

ভাবতে-ভাবতে মুখে বলল, 'কিন্তু স্যার, আলো? মানে, ন্যাচারাল লাইট না পেলে যে—

বাধা দিয়ে জবাবে রুদ্রাক্ষ যা বলতে আরম্ভ করল, তাতে মাদল বুঝল লোকটার জ্ঞান যথেষ্ট। শুধু দু-নম্বরি ব্যাপারে নয়—শিল্পজগৎ সম্পর্কে এর চিন্তাধারা দারুণ আধুনিক। যতই সে চোরাপথের বোতাম-চাবি ছবির পিছনে লুকিয়ে রাখুক—ভ্যানগখ বা যামিনী রায় সম্পর্কে অবশ্যই বেশ ওয়াকিবহাল। রুদ্রাক্ষ তখন বলছিল, 'তা ছাড়া, আজকের দিনে প্রাকৃতিক আলোয় ছবি আঁকা বোকামি। কারণ, পৃথিবীর কোনও আধুনিক শহরের কারও বাড়িতেই পর্যাপ্ত আলো আর ঢোকার পথ পায় না। আর্ট গ্যালারিগুলোতে তো সবই আর্টিফিশিয়াল লাইট। ছবি দেখাই হয়ে থাকে আজকাল কৃত্রিম আলোয়। সুতরাং, এই আলোতেই লেগে যাও, মাদল। আধুনিক, বুদ্ধিমান এবং প্র্যাকটিক্যাল শিল্পী হও।—'

লেকচার শুনে, ওরা চলে যাওয়ার পরও, বেশ কিছুক্ষণ মাদল ধুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যা বাব্বা! প্রমাণাভাবে পুলিশ ধরতে পারছে না বলেই পুলিশের হট-ফেভারিট এক টপ স্মাগলার-খুনির মুখে ছবি নিয়ে এত জ্ঞান খেতে হবে কোনওদিন—স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

আসবাব বলতে এ-ঘরটার স্রেফ দু-তিনটে প্যাকিং বাক্স—তাতে রং-তেল-টেলই হবে। তা ছাড়া, দুটো কাঠের চেয়ার। কাঠের একটা বড় টেবিলে একগাদা সাদা কাগজ, স্কেচ পেন ছড়ানো। দেখে মনে হবে, কিছুক্ষণ আগে ওখানে কেউ বসেছিল। রঘুনাথের ভাই?

মনে হতেই, বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠল মাদলের। যথেষ্ট আলো থাকা সত্ত্বেও, প্রায় নিস্তব্ধ

পাতালঘরে অস্বস্তির ছোঁয়াচ লাগল। ভূত-প্রেত যদি থাকে, তো, খুন হয়ে যাওয়া একটা মানুষের অতৃপ্ত প্রেতাত্মা এ-ঘরে রয়েছে। রঙে তুলিতে, ক্যানভাসে। হয়তো, ওই চেয়ারটায় বসে-বসেই ও খুন হয়েছে! ভাবতে গিয়ে, স্যাঁতসেতে ঠান্ডা ঘরে কাঁটা দিল মাদলের গায়ে। ঠিক তক্ষুনি, হঠাৎ ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দ, 'হ্যাই!'

চমকে লাফিয়ে উঠল মাদল। ধক্ করে নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ নিজেই শুনতে পেল সে! ফিরে তাকিয়ে দেখল—রঘুনাথ। আগের থেকেও পাগল-পাগল চেহারা। হাতে ট্রে। তাতে দুধ, চিনি, কাপ এবং টি-পট। সঙ্গের প্লেটে দু-রকমের বিস্কুট। আপ্যায়ন ভালোই। তবে, রঘুনাথের সহসা এমন রোমাঞ্চকর প্রবেশের ধাক্কা সামলাতে একটু সময় নিল মাদল। হাঁফ ছেড়ে বলল, 'এমন করে চুপচাপ ঢুকে, ভয়—'

কথা শেষ করতে দিল না রঘু। টেবিলে ট্রে নামাতে-নামাতে বলল, 'চা খাও।'

মাদল বলল, 'খাচ্ছি। তা তোমার ভাইয়ের—'

এবারও বাধা দিল রঘুনাথ। ঠোঁটে তর্জনী ছুঁইয়ে চুপ করতে ইশারা করল। মাদলের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'চা খেয়ে, সিঁড়িতে এসো। এ-ঘরে মাইক আছে—'

সঙ্গে-সঙ্গে হাঁ-মুখ বন্ধ হয়ে গেল মাদলের। মাথাও কাজ করতে লাগল তীব্রবেগে। রঘুনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, পিছু ডাকল সে, 'শোনো।'

তড়িৎবেগে ঘুরে রঘু ফের আঙুল ছোঁয়াল ঠোঁটে। গোল-গোল চোখ ঘুরিয়ে 'চুপ' থাকতে বলল। জবাবে, সামান্য গলা তুলে মাদল জিগ্যেস করল, 'আমার শোওয়ার ঘর, বাথরুম, জামাকাপড়—এসব কোথায় পাব?'

হলদে দাঁত দেখিয়ে পুরো দু-গালে হেসে দিল রঘু। অবশ্য নিঃশব্দে। শব্দ তুলে বলল, 'চা খেয়ে এসো। সব দেখিয়ে দিচ্ছি।'

চা খেতে-খেতে মাদল ভাবল—অ্যাদ্দুর আসা কি ঠিক হল? 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে'—গোছের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল প্রায়। আসল দাড়ির মেকআপ নিয়ে রাস্তায় বসে ছবি বিক্রির অছিলায় দু-নম্বরি বদমাশের গতিবিধির হদিশ খোঁজা এক কথা। কিন্তু, এ যে বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজতে গিয়ে সোজা বাঘের গুহায় ঢুকে পড়া। এখানে বাইরের একফোঁটা আলো ঢোকে না। বেরোবার পথ কই? আদৌ আছে কি? না কি, রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারময় গোয়েন্দাগিরির হাতেখড়ি হাতে নিয়েই বেঘোরে—

তাড়াতাড়ি চা শেষ করে রঘুনাথের পিছন-পিছন সাত ধাপ সিঁড়ি ভেঙে, ছোট্ট ল্যান্ডিংয়ে ডানদিক ঘুরে, একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। মাথা সমান উঁচু টিমটিমে আলো-অন্ধকার এ-পথ কতদূর গেছে? রঘুকে জিগ্যেস করতে বলল, 'এখানে, এই মালাবার হিলের পাতালপুরিতে কত যে সিঁড়ি আর সুড়ঙ্গ—তার ঠিক নেই। তবে, এটা শেষ হয়েছে গুদামঘরে।'

'সেখানে কী আছে?'

'মাথার ছাদের ওপরে সুইমিং পুল। পশ্চিমের দেওয়ালের গায়ে সমুদ্র—আবার কী?'

'তা নয় হল। কিন্তু গোডাউনে কী রাখা হয়?'

'ছবি, মূর্তি, প্যাকিং বাক্স। তা ছাড়া, অই ছবি আঁকার ফ্রেমও ওখানেই তৈরি হয়।'

কথা বলতে-বলতে একটা আবছা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ছিটকিনি খুলে, ঠেলে দিতেই খুলে গেল দরজা। রঘু বলল, 'এই নাও। তোমার ঘর। লাগোয়া বাথরুম আছে।'

ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'এখানে আমার ভাই থাকত। শালারা—'

দাঁত কিড়মিড় করে গাল দিল রঘুনাথ।

ছিমছাম গোছানো খাট-বিছানা, আয়নাওয়ালা টেবিল, স্টিলআলমারি-সমেত ঘরটির চারপাশে দেখতে-দেখতে মাদল জিগ্যেস করল, 'রঘুদা, তুমি এখানে ক'দ্দিন এসেছ?'

'তা—বছরখানেক। আগে ডায়মন্ড হারবারে সেন-স দের পৈতৃক ভূতবাংলোয় ছিলুম প্রায় তিন বছর।'

'আর তোমার ভাই?'

'ও আগেই এসেছিল। সাইনবোর্ড আঁকত বেহালায়। ব্যাটা সেনের পো তুলে এনেছিল।'

'তুমি জানলে কী করে যে, তাকে এরা খুন করেছে?'

পাগল-পাগল চোখ হয়ে গেল রঘুর। সাপের গলায় হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানি, আমি জানি। শয়তানদের দলের ভেতরকার ঘাঁতঘোঁত ও অনেক টের পেয়ে গিয়েছিল। গত দু-বছর ওকে ছুটিই দেয়নি। পরে ও লুকিয়ে পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল—।'

'কতদিন আগের ঘটনা?'

'তা, দিন পনেরো হবে। আমাকে সাতদিনের জন্যে গোয়া পাঠিয়ে দিল, মাল ডেলিভারি দিতে। ফিরে এসে আর দেখতেই পাই না ওকে। জিগ্যেস করলে বলল, ও নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, কেউ জানে না! হুঁহ! চাইলেই যেন এখান থেকে সবাই অমনি-অমনি ছাড়া পেয়ে যায়?—'হুঁ!' বলে, বেরিয়ে যেতে-যেতে ঘুরে দাঁড়াল রঘু। মাদলের প্রায় কানের কাছে এসে ফিসফিস করলে, 'আজ রাতেই আমি লাশের হদিশ পেয়ে যাব। দেখাব তোমায়। তারপর, সেনের বাচ্চাকে নিকেশ করে তবে শান্তি—'

মৃদু ঠুকঠুক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মাদলের। স্থান-কাল-অবস্থা বুঝতে সময় লাগল একটু। দুপুর থেকে নিয়ে তিনখানা তেল রঙের পেইন্টিং শেষ করে ফেলেছে সে। যামিনী রায়ের ঢংয়ে মা-কালী, হুসেনের টাইপের ঘোড়া এবং একটা নৌকোয়ালা ছবি।

নানান চিন্তা ও আবোল-তাবোল দুশ্চিন্তায় মাথার ভিতরে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল রঘু চলে যাওয়ার পর। ভালো করে সাবান মেখে চান করে ঠান্ডা হয়েছে। আলমারিতে পাট করা পাজামা-পাঞ্জাবি ছিল দু-জোড়া। প্রায় ওরই সাইজের। হয়, জেজেই আনিয়ে রেখেছে আন্দাজমতো। নয়তো, রঘুদার ভাইয়ের। সামান্য ইতস্তত করে পরে ফেলে বেশ ফ্রেশ লাগছিল। তারপর, সারাটা দিন রং-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে মশগুল হয়ে ছিল শিল্পী মাদল। দুপুরের খাবার, বিকেলের চা দিয়ে গেছে স্টুডিওতে। রঘু আসেনি। অন্য একজন সাদা পোশাকের গোঁফয়ালা বুড়ো বেয়ারা। নাম বলেছিল, কাপ্যপ। রাতের খাবারও ও-ই নিয়ে এসেছে। শোওয়ার ঘরে। ডাল-রুটি-কষা মাংস আর একটা লাবড়া তরকারি। ভরপেট খেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মাদল, খেয়াল নেই।

এখন, আবার দরজায় ঠুকঠুক।

অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে খাট থেকে উঠে, দেওয়াল ছুঁয়ে, ঘরের বাতি জ্বালল সে। দরজা খুলতেই রঘুনাথের মুখ। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে আরও। গোল-গোল চোখ দুটিতে এখন রক্তের ছোপ ধরেছে। নেশা করেছে কি না বোঝা গেল না! 'শিগগির এসো।'

চাপা গলায় হাতছানি দিয়েই সরে গেল রঘু। কী করবে, বুঝতে পারল না মাদল। কত রাত কে জানে? একেবারে অজানা অচেনা ভূগর্ভের অন্ধকার। কে কোথায় কীসের জন্য ওত পেতে আছে বলা যায় না। এর মধ্যে আধ-পাগল এক আধ-চেনা লোকের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? দ্রুত ভাবছে মাদল। রঘুনাথের হাতে টর্চ। সেই বৃত্তাকার আলোতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পথ শুঁকতে-শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে সে। জেজের কথা মনে পড়ল, 'এখানে বেশি কৌতূহল থাকা ভালো নয়।'

দোনোমনো করতে-করতে 'যা থাকে বরাতে' ভেবে বেরিয়ে পড়ল মাদল। রঘুর পিছন-পিছন পা টিপে-টিপে টানেল ধরে হাঁটতে লাগল।

দূরে কোথায়, অনেক দূরে যেন জল পড়ার ক্ষীণ শব্দ। সেই সঙ্গে, কান পাতলে বোঝা যায় ভারী জিনিস পতনের শব্দও ভেসে আসছে। একের পর এক-একটানা। স্যাঁতসেতে ঠান্ডা আর ভেজা গন্ধ।

দেওয়ালের কোণ ধরে কী যেন দেখতে-দেখতে হাঁটছে রঘুনাথ। ওইভাবেই ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল, 'শুনতে পাচ্ছ হে! মাল নামছে। ধাউ এসেছে। তাতে এবার সব মাল উঠবে। আমার ভাইয়ের শেষ ছবিগুলোও প্যাকিং বাক্সে বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে!'

হঠাৎ মাদলের খেয়াল হল, রঘুর ডানহাতে টর্চ এবং বাঁ-হাতে লোহার শাবল। সামান্য ঝুঁকে নিজেও দেখার চেষ্টা করে সে বলল, 'কী দেখছ?'

'পিঁপড়ে।'

'মানে?'

আরও ঝুঁকে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে লাগল মাদল এবং সত্যিই দেখল—লাল পিঁপড়ের সারি। একদল যাচ্ছে। আরেক দল—যারা আসছে—তাদের মুখে সাদা-সাদা কণা।

দুবার বাঁক নিয়ে চার ধাপ সিঁড়ি নেমে এবড়ো-খেবড়ো ল্যান্ডিংয়ে এসে দাঁড়াল ওরা। এখান থেকে ছলছলাত জলের এবং ধুপধাপ পতনের শব্দ একটু জোরালো শোনা যাচ্ছে। মাদল জিগ্যেস করল, 'ভাইয়ের লাশ খুঁজছ?'

'খুঁজছি না, পেয়ে গেছি—' বলে আঙুল দিয়ে একটা খুদে গর্ত দেখাল। চলন্ত পিঁপড়ের সারি ওখানেই নেমে গেছে। তার মানে, রঘু বলতে চায়, লাশ পচে গিয়ে পিঁপড়ে ধরেছে? অন্য কিছুও তো হতে পারে? মাদল দ্বিধার গলায় বলল, 'ওকে খুন করে থাকলে তো সমুদ্রের জলেই ফেলে দেবে?'

'না। মড়া ফুলে ভেসে উঠত থা'লে। পুলিশি তদন্ত হত—'

বলতে-বলতে ছমাত করে শাবলের কোপ বসাল রঘু ল্যান্ডিংয়ের পাথুরে মাটিতে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাদল। যে কোনও মুহূর্তে কী যে ঘটবে, সেই আতঙ্কে অস্থির। টর্চটা শুয়ে-শুয়ে আলো দিচ্ছে। রঘু কোপাতে-কোপাতে বলল, 'মাটি সরাও।'

উবু হয়ে বসে আদেশ পালন করতে লাগল মাদল। প্রথমে হালকা, পরে ভয়ঙ্কর পচা গন্ধ উঠে আসতে লাগল খোঁড়া জায়গা থেকে। গা ঘুলিয়ে দুবার ওয়াক পেল মাদলের। বেশ কিছুক্ষণ বাদে লাশের খানিকটা পচা-গলা অংশ দেখা গেল প্রায় তিন হাত মাটির নীচে। মুখ এবং বুকই সম্ভবত। বীভৎস দৃশ্য। শুকনো রক্ত, কাদামাটি মাখা ডানহাত বুকের ওপরে রাখা। মাদল তার পাঞ্জাবির ঝুল নাকে চেপে দম বন্ধ করেই প্রায় টর্চের আলো ফেলল। ঝুঁকে পড়ে দেখছে রঘু। ঘামছে দরদর করে। হঠাৎ কান্না ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখো, দ্যাখো। ভাইয়ের আঙুলে তামার আংটিটা দ্যাখো—'

ঠিক তক্ষুনি, ডানদিকে সুড়ঙ্গের বাঁকে, সিঁড়ির কাছ থেকে ভারী আওয়াজ, 'কউন হ্যায় রে?'

মাদল চমকে উঠতেই জ্বলন্ত টর্চটা গর্তে পড়ে গেল। দ্রুত অন্ধকারে সরে এল সে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে।

শাবল হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে রঘু। দৌড়তে আরম্ভ করেছে সুড়ঙ্গের ওই মুখে। ওখানে, আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে রুদ্রাক্ষ সেন।

'হা-রাম-জা-দা, শুয়োরের বাচ্চা—আমি তোর যম—' বলতে-বলতে অনেকটা গুহা-মানবের মতো ছুটছে রঘুনাথ। দেয়ালের খাঁজের আড়াল থেকে, লুকিয়ে মাদল স্পষ্ট দেখতে পেল বাকিটুকু।

'হ্যাই—' চিৎকার তুলে রঘুনাথ পাহাড়ের মতো পড়ে গেল হঠাৎ। শাবল ছিটকে লাগল দেয়ালে।

রুদ্রাক্ষর হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সাইলেন্সার লাগানো, নিশ্চয়ই।

রুদ্রাক্ষর গলা দূরে সরে যেতে লাগল, শান্ত এবং নির্লিপ্ত, 'জেজে! রঘুকো উসকে ভাইকে পাস সুলা দো—'

॥ তেরো ॥

অসম্ভব ভয় পেয়েছে মাদল। সাধারণ বুদ্ধিসুদ্ধি সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। ঠকঠক করে কাঁপছে গোটা শরীর। পারলে পাথুরে দেওয়ালের মধ্যে মিশে পাথর হয়ে যেত সে।

নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যে, রুদ্রাক্ষ সেনের মতো মানুষ একটা জলজ্যান্ত লোককে খুন করে ফেলতে পারে। অমন ঠান্ডা মাথায়, নিঃশব্দে! দু-মিনিট আগেও রঘুনাথের সঙ্গে কথা বলেছে মাদল। এখন লোকটা স্রেফ লাশ হয়ে পড়ে আছে। উফ্! ভাবা যায় না!

লাশ ডিঙিয়ে যদি সুড়ঙ্গের এদিকে চলে আসত রুদ্রাক্ষ? তাহলে, এখানে তিনটে লাশ শুয়ে থাকত পাশাপাশি। মাদল কেঁপে উঠল। কাঁটা দিল গায়ে। সঙ্গে-সঙ্গে রঘুনাথ অথবা ভয় কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'পালাও হে, ছোকরা! পালাও!'

বাস! ওইটুকু বুদ্ধি যেই মাথায় ফিরে এল, সঙ্গে-সঙ্গে ভূতগ্রস্তের মতো পা বাড়াল মাদল। উলটোদিকে, অন্ধকারে হোঁচট খেতে-খেতে। একবার মনে হল টর্চটা তুলে আনলে হত। পরক্ষণেই ভাবল, যে কোনও মুহূর্তে জেজে ঢুকে পড়বে লাশের গতি করতে। সুতরাং কখনও উবু হয়ে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, দেওয়াল ধরে-ধরে এগোতে লাগল সে। অন্ধকার থেকে, গভীরতর অন্ধকারে।

কীসে একটা হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাদল। ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের নোখটা বোধহয় উঠেই গেল। তা যাক! প্রাণ বাঁচাও। পালাও হে, ছোকরা পালাও!

কপাল ঠুকে গেল পাথরে। ঝিম লাগল মাথায়। আস্তে-আস্তে দেওয়াল ধরে-ধরে বসে পড়ল মাদল। কোন পায়ের চটি যে কোথায় খুলে গেছে, খেয়াল নেই। খালি পায়ে জল-জল ঠেকল অন্ধকারে। কপালে হাত রেখে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে একটু। ঘুরঘুট্টি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আওয়াজের কথা খেয়াল হল। ধুপধাপ ও জলের শব্দ বেশ কাছেই কোথাও।

দু-পাশে হাত বাড়িয়ে আন্দাজে বোঝা গেল বাঁ-দিকে বাঁক নিয়েছে সুড়ঙ্গ। বসে-বসেই পা ঘষটে-ঘষটে এগোতে থাকল সে। অসহ্য যন্ত্রণা ডানপায়ে। কপালে। ব্যথায় টনটন করছে পা। মাথাটা বুঝি ছিঁড়ে গেল। মনে হল, এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে সে।

হঠাৎ, কিছু বুঝে ওঠবার আগেই হুড়মুড়িয়ে দলা পাকিয়ে ছ-সাতটা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মাদল। ব্যাথায় চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও দাঁতে-দাঁত চেপে সহ্য করতে বাধ্য হল। কারণ, মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। যেখানে এসে পড়েছে মাদল, তার ডানদিকে, বেশ খানিকটা নীচে আবছা আলোর আভাস। দম বন্ধ হতে-হতে অক্সিজেন পাওয়ার মতো অবস্থা। চোখ ভরে সেই আলোটুকুই দেখে নিল মাদল। দৃষ্টি শান্ত হতে-হতে টের পেল, সিঁড়ি ঘুরে নেমে গেছে ওই দিকে। এই প্ল্যাটফর্মটি না পেলে মাদল সোজা ওই অবধি নেমে যেত। টাল সামলাতে পারত না। মাথা ফাটত এবং ওখানে মানুষজন আছে—ফলে, ধরাই পড়ে যেত সে। দ্রুত এই সব মাথায় খেলা করে গেল তার। গুছিয়ে, সোজা হয়ে বসল। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। মানুষের গলায় কী কথা হচ্ছে।

প্রথমটি সেই অমরীশ পুরীর ভরাট আওয়াজ। অবশ্যই রুদ্রাক্ষর। হিন্দিতে বলছে, 'কেন হয়নি? সব বাক্স প্যাক করা হয়নি কেন?'

দ্বিতীয়টি জেজে। ভীত গলায় জবাব, 'অতগুলি মাল নিয়ে ষোলটা বাক্স প্যাক করতে এরা চারজনে হিমসিম খেয়ে গেছে বস—'

'তা আরও দু-তিনজনকে লাগালেই পারতে?—'

'বিশ্বস্ত লোক তো এখানে নেই, বস?'

'একটু আগে বললেই পারতে? কিংবা, ভারসোবা, ওয়াসাই থেকে আনিয়ে নিতে পারতে সাময়িকভাবে?'

'এর পরে, আর ভুল হবে না, বস!'

এবারে তৃতীয় কণ্ঠ। অচেনা। ভাঙা হিন্দি। অশুদ্ধ ইংরিজি ও বোধহয় আরবিতে বলল, 'ইয়াল রফিক! হোয়াট আই ডু বস? বাকি বক্সেস হোয়েন?'

অচেনা কণ্ঠস্বরের মালিককে দেখার জন্য উশখুশ করে উঠল মাদল। অতি সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে নামতে লাগল সে। বুকের টিপটিপানি বাড়ছে। প্রায় কুড়ি ফুট নীচে খানিকটা সমতল দেখা গেল। ফ্লাড লাইটে দিনের আলো। উলটো দিকে পাহাড়-কাটা দেওয়াল অমসৃণ। তিনটে সিঁড়ি নামতেই জলরেখা ছলছলাত করে সমতলে জিভ বোলাচ্ছে। মাদল অবাক। পাহাড়ের মধ্যে এমন জল কোত্থেকে এল? ভয় সরে গিয়ে কৌতূহলের খোঁচায়, আরও চার ধাপ, সাবধানে, দেওয়াল ধরে-ধরে। নীচের অনেকখানি অংশ মোটামুটিভাবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। ব্যাপার-স্যাপারও অনেকখানি আন্দাজ করা গেল।

রঘু বলেছিল—আজ 'মাল' যাবে।

পাহাড়ের বাঁ-দিকে সমুদ্রের খাঁড়ি। পাথর কেটে পথ। সেই পথে জোয়ারের জল ঢোকে রাত্রে। পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে মিশে যায়, এমন দরজাও নিশ্চয়ই আছে। যাতে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। ওই পথেই একটি মস্ত 'ধাউ' নৌকো এসে ঢুকেছে। মোটর-লাগানো 'ধাউ' হওয়াই স্বাভাবিক। ওতে 'মাল' ভরা হয়ে গেছে—চোরা পথে চলে যাবে এবার আসল সমুদ্রের মধ্যে। স্মাগলারদের বে-আইনি বা চোরা কারবারের জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝসমুদ্রের কোথাও। শোনা-কথা ও পড়ে-জানা ঘটনা মিলিয়ে মাদল এই পর্যন্ত টের পেয়ে গেল।

শেষ প্যাকিং বাক্সটি মোটা দড়িতে বেঁধে তোলা হচ্ছে নৌকোয়। জনা পাঁচেক লোক টেনে-টুনে, ঠ্যালা মেরে সাহায্য করছে। এদিকে দেওয়াল ঘেঁষে, জলের কাছে দাঁড়িয়ে তিনজন কথা বলছে। পিছন ফিরে রয়েছে জেজে। তার মুখোমুখি অচেনা লোকটা। কালো টাইট প্যান্ট এবং গাঢ় নীল জামা। মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। লালচে দাঁড়ি এবং চুল। মাদল আর-এক ধাপ নেমে বাঁ-দিকে ঝুঁকলে রুদ্রাক্ষকেও দেখতে পাবে নির্ঘাত।

নাঃ। আর ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। নিজের শোওয়ার ঘর এখন খুঁজতে হবে। সুড়ঙ্গ ও সিঁড়ির গোলকধাঁধায় কতক্ষণ ঘুরতে হবে কে জানে। ভাবতে-ভাবতে, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল মাদল। শেষ কথা শোনা গেল অচেনা লোকটির, 'দেন পরশু সেম টাইম?'

বস এবং জেজের গলা একই সঙ্গে, 'ইয়েস, ইলেভেন-ও-ক্লক।'

'গোল্ড? হাউ মেনি বারস?'

'ওয়ান থাউজেন্ড।' বসের জবাব।

'ইনসাল্লাহ! খোদা হাফিজ।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আবার অন্ধকারে পথ খুঁজে-খুঁজে চলল মাদল অন্ধের মতো হাতড়ে কখনও সিঁড়ি, কখনও সুড়ঙ্গ। কোথাও ডাইনে, কোথাও বাঁয়ে। ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। মনে হল, একই জায়গায় ঘুরে মরছে না তো? ওলায় ধরল নাকি?

দমে গেলে চলবে না। সত্যকাকুকে খবর দিতেই হবে। উনি বলেছিলেন, 'মন থেকে আমি ঠিক সায় পাচ্ছি না, ভায়া। তুমি সাহসী, বুদ্ধিমান। কিন্তু যেখানে যাচ্ছ—সে বড় ভয়ানক দলের ঘাঁটি। এর আগে দু-দুবার ফুল ফোর্স নিয়ে গিয়েও পুলিশ প্রমাণাভাবে নাকাল হয়ে ফিরেছে। উলটে, মামলা করেছে রুদ্রাক্ষর উকিল। ফলে, সৎ পুলিশি কর্তারা হাত কামড়াচ্ছে। অসতেরা জেনেশুনেও

মুখ বুজে আছে।'

'কিন্তু, আমি তো পুলিশ-টুলিশ নই। কোনও অ্যাকশানের প্রশ্নই ওঠে না একা-একা। সুযোগ যখন পাচ্ছি ভেতরে ঢোকার—সুলুক-সন্ধান করতে দোষ কি? সবাই তো এমন সুযোগ পায় না।—'

'হক কথা! তবে, ঢোকার সৌভাগ্যই তো সব নয়—এ সব জায়গা থেকে বেরুনোটাও ততোধিক সৌভাগ্য। শেষে, অভিমন্যুর মতো বে-ঘোরে কিছু ভালো-মন্দ হলে—আজীবন আফশোস থেকে যাবে আমার।—'

বলতে-বলতে গলা ধরে এসেছিল সত্যকাকুর। চুপ করে ছিল মাদল। হয়তো শেষ দেখা!

পরে, গলা সাফ করে হাসবার চেষ্টা করেছিল সত্যকাকু, 'জেদ ধরেছ, যাও! অল দ্য বেস্ট! তবে ঠিক দু-দিনের মধ্যে তোমার কাছ থেকে খবর না পেলে, কমিশনারের সঙ্গে কথা বলব—ডাইরেক্ট অপারেশানের পথ ধরতে হবে...'

হঠাৎ অত্যন্ত ফিকে নীল আলোর ভাব দেখা গেল। যেন, কোনও অদৃশ্য ঘুলঘুলি থেকে মরা চাঁদের আলোর ছিটেফোঁটা আসছে। ঝিমিয়ে-পড়া মাদল পায়ের ব্যথা ভুলে দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে গেল। সামনের বাঁকে পৌঁছে, সত্যি-সত্যিই ছোট্ট ভেন্টিলেটার বা বড় ঘুলঘুলি চোখে পড়ল। নীচে, পায়ের কাছে। হামা দিয়ে বসল মাদল। না। চাঁদের আলো মোটেই নয়। ঘুমের আলো। নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে। পাথুরে জমিতে চিবুক ছুঁইয়ে, বেশ কসরত করে, মাথা ঢোকাতে হল ঘুলঘুলির ভেতরে। কংক্রিটের জাল দিয়ে ও-মুখ ঢাকা। জালের ফাঁকে চোখ রেখে মাদল তাজ্জব বনে গেল। প্রায় তিনমানুষ নীচু ঘরের মেঝেয় কার্পেট বিছানো। সোফাসেটের অংশ দেখা যাচ্ছে। তাতে একগাদা কমিকস ছড়ানো। গোল টেবিলে দুটি থালা, বাটি। একটি থালায় আধ-খাওয়া ভাত-তরকারি। অন্যটা যেন কেউ ছুঁয়েই দেখেনি। টিভিসেট, ভিডিও এবং আয়নাওয়ালা আলমারির খানিকটা দৃশ্যমান। জোড়া খাটে শুয়ে আছে দুজন। তাদের জড়াজড়ি করা পা দেখা যাচ্ছে। শাড়ির আঁচলের শেষে মেয়েটি এবং হাফ-প্যান্ট-পরা বালকের খোলা পা। জয়দীপদার ভাইবোন? প্রথমে মনে হল—বেচারি! তারপরে ভাবল, কপাল তো খুব খারাপ নয় ওদের। রুদ্রাক্ষ বেশ ঘটা করেই রেখেছে। আপ্যায়নের ত্রুটি নেই বিশেষ।

মাদল শুনেছে—বড়-বড় রাজনৈতিক কয়েদিদের ফার্স্ট ক্লাশ জেলে রাখা হয়। সেখানে নাকি, পাঁচ-তারকা ব্যাপার-স্যাপার! এরা এখানে বন্দি হলেও, কম করে তিন-তারকা ঘরে আছে। তাহলে, আদৌ এদের এনে আটকে রেখেছে কেন রুদ্রাক্ষ? উদ্দেশ্যটা কী? কিছুই ভেবে পেল না মাদল। ওরা ঘুমুচ্ছে। তা ছাড়া, এখান থেকে কথা বলতে যাওয়াও বিপজ্জনক। মাদল উঠে পড়ল। কিন্তু তার ঘরটা কোন দিকে?

আবার গোলকধাঁধায় তিন পাক ঘুরে ছ-খানা সিঁড়ি ভেঙে নামতে-নামতে, অন্ধকার দেওয়ালে হাতলের মতো কী ঠেকল। দু-হাত বুলিয়ে বুঝল—দরজার হাতল। ঘরের দরজা? নাকি, অন্য কোনও পথ? কী আছে ওপারে? মাদল হাতল ঘুরিয়ে মৃদু চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বিকট রকমের ঝাঁঝালো, উগ্র গন্ধ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাদলের ঘ্রাণে। ও ঠিক চিনতে পারল না, কীসের গন্ধ। তবে, আন্দাজ করল—নিশ্চয়ই গাঁজা বা চরস! বা, ওই জাতীয় মাদক দ্রব্য।

বন্ধ ঘর বলেই মনে হচ্ছে। গন্ধটা কোনও দিক দিয়েই আর বেরোবার পথ পাচ্ছে না বলেই বোধহয় এত উৎকট কড়া! এবং যেহেতু, মাদল হিসাব করল, আলো জ্বলছে না ঘরে, তার মানে, কেউ নেই।

নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে পড়ল সে। খুব সাবধানে, আলতো হাতে ভেজিয়ে দিল পিছনের

দরজা। কয়েক পা এগোতেই কাঠ মতন কী ঠেকল বাঁ-পায়ে এবং প্রায় একই সঙ্গে ডানপায়ে লাগল মানুষের শরীর। চমকে, স্ট্যাচু হয়ে গেল মাদল। বুক ঢিপঢিপ! না। কোনও সাড়া নেই। কী সর্বনাশ! আর-একটা লাশ নয় তো? কে? কার মৃতদেহ এখানে?

ধীরে-ধীরে ঝুঁকে, হাতের স্পর্শে নিশ্চিত হল মাদল। মানুষের পা, হাঁটু, কোমর। গোটা একটা মানুষ পড়ে আছে কাত হয়ে।

ঠিক তখনই দ্বিতীয়বার আঁতকে উঠতে হল। ছিটকে পিছিয়ে এল সে। কারণ, জড়ানো ঘড়ঘড়ে শব্দে হিন্দি কথা ফুটল লোকটার মুখে 'অ্যাই সসালা। কেয়া হো রহা? খোঁচাচ্ছিস কেন? বাতি জ্বালিয়ে নে—'

কী জানি কেন, মাদল মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, 'সুইচ কিধর?'

লোকটাও জবাব দিল, গোল্লা পাকানো-জড়ানো উচ্চারণে, 'দরওয়াজা-কে-পাস—নেই মালুম? স-সালা—কাবাবমে হাড্ডি—' শেষের শব্দগুলি অধিকতর জড়িয়ে-মিইয়ে ঘড়ঘড়ের মধ্যে ঢুকে গেল।

তার মানে, লোকটার দোসর কেউ ছিল। হয়তো, কোনও কারণে বেরিয়েছে। ফিরে আসতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। তবু, এমন সুযোগ ছাড়া যায় না! এ-ঘরটায় কি আছে-না-আছে দেখে রাখা দরকার। পরে হয়তো কাজে লাগবে।

দ্রুত দরজার পাশের দেওয়াল হাতড়াতে লাগল মাদল। পেল সুইচ। আলো জ্বলে উঠতেই প্রথমে চোখ গেল জ্যান্ত লোকটার দিকে। প্রায় লাশের মতোই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। মাথা এবং পিঠের নীচে একগাদা কাঠের পট্টি। এইরকম সাদা পট্টি চারটে দিয়ে ক্যানভাস লাগাবার জন্যে নাঙ্গা ফ্রেম তৈরি হয়।

তা, সেই পট্টি-ফটিতে লোকটার শুয়ে থাকার কোনও ব্যাঘাত ঘটছে না। নেশা করেছে কি? ঘর আলোকিত হতেই , চোখ পিট-পিট করে তাকাবার চেষ্টা করল। দু-একবার বুজে-খুলে, মাদলকে দেখতে-দেখতে হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ জোড়া। গেঁজেলের ঢুলু-ঢুলু চাউনি পালটে গিয়ে ভূত দেখার চোখ। গলায় ঘড়-ঘড় আওয়াজ, 'ক-কউন—?'

কনুইয়ের ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা দিল একবার। খানিকটা উঠলও। হাই-তোলার ভঙ্গিতে হাঁ করে নির্ঘাত চ্যাঁচাতে যাচ্ছিল। মাদল আর দেরি করল না। মানুষটার হাঁ-করা-মুখ ও নাক লক্ষ করে জবরদস্ত একখানা ঘুষি চালিয়ে দিল। কাজ হল। যে-ভঙ্গিতে শুয়েছিল, হুবহু সেই ভঙ্গিতে ফের ঢলে পড়ল সে। জীবনে মারামারি করেনি মাদল, এমন নয়। কিন্তু, নেশায় নির্জীব একটা মানুষকে অত জোরে ঘুষিটা মেরে একটু খারাপই লাগল। অথচ, উপায় ছিল না। এই ওষুধ না পড়লে, ব্যাটা ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠত। বিপদ বাড়ত মাদলের। সে মনে-মনে আধা-লাশটিকে বলল, 'সরি স্যার! মাফ করনা!'

এবার পর্যবেক্ষণের চোখে ঘরটি দেখল সে। বেশ বড় ঘর। কুড়ি ফিট বাই কুড়ি ফিট হবে। চার রকমের জিনিস চার ভাগে রাখা আছে। এক দিকে অজস্র প্লাস্টিকের সরু নল জড়ো করা। তার কাছাকাছি, আধ-কেজি, এক-কেজি সাইজের প্লাস্টিক ব্যাগ। সীলড। একটা হাতে তুলে, দাঁতে কেটে ছিঁড়ল মাদল। কালচে, শুকনো এবং স্যাঁতসেতে তামাক-পাতা।

নির্ঘাত গাঁজা বা চরস। অন্য দিকে, কাঠের পট্টিও দু-ভাগে ভাগ করে রাখা। একটি তুলে পরখ করল সে। অত্যন্ত হালকা। তবে, ফ্রেম বানানোর সাধারণ পট্টির চেয়ে একটু মোটা-সোটা। এবং—অদ্ভুত কাণ্ড—ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। অর্থাৎ, তিন ফুট লম্বা একটা ফালির ভিতরে প্রায় ইঞ্চিখানেক ব্যাসের বৃত্তাকার গর্ত এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। প্লাস্টিকের নলে মাদকদ্রব্য ঠেসে ভরে গর্তে ঢোকানো হয়েছে। ভরা পট্টিগুলি আলাদা ভাগায় সাজানো।

চমৎকৃত হয়ে গেল মাদল। অভিনব আইডিয়া দেখে শিল্পীর মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল, 'বাহ! দারুণ তো!'

এবার, চার-চারটে পট্টি দিয়ে ফ্রেম হবে। তাতে ক্যানভাস স্ট্রেচ করে লাগিয়ে তৈরি হবে ছবি। অসাধারণ! মনে-মনে রুদ্রাক্ষ সেনকে মাদল বললে, 'সেলাম, সেন-সাহেব।'

তক্ষুনি মনে পড়ল, দ্বিতীয় লোকটি যে কোনও সময় ঢুকে পড়বে। বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে পা রাখল সে। সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে দেওয়ালে বাধা পেল বারকয়েক। বাঁক নিয়ে, মাথায় আবার টাক খেল এইমাত্র। শারীরিক ব্যথা-বেদনা কেমন কমে গেছে এখন। যেন, হুমড়ি না খেলে, গড়িয়ে না পড়লেই সে অবাক হবে প্রতি পদে। গিলতে-গিলতে অন্ধকারই সত্য বলে বোধ হচ্ছে। আলো দেখলে চমকে যাবে।

অথচ, সেই আলোর বিন্দু খুঁজতে-খুঁজতে পেল অন্য পথ। কিছুক্ষণ আগেই, যে-গন্ধে গা ঘুলিয়ে বমি পাচ্ছিল, সেই গন্ধই হালকা হয়ে নাকে লাগল মাদলের। চেনা পথ খুঁজে পাওয়ার আনন্দে, অত্যন্ত খুশি হয়ে সেই পচা-গন্ধের উৎস-সন্ধানে হাঁটতে লাগল সে। ধীরে-ধীরে রঘুনাথের ভাইয়ের পচাগলা লাশের গন্ধ বাড়তে লাগল। ওই অসহ্য গন্ধই মাদলকে নিকষ অন্ধকারে আলোর মতো পথ দেখাল।

ঠিক তাই।

দুই ভাইয়ের শবদেহ পেরিয়ে, ডিঙিয়ে মাদল পৌঁছে গেল আবছা আলোকিত সিঁড়ির কাছে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল খুনি রুদ্রাক্ষ সেন।

সিঁড়িতে পা রেখে যেন নতুন জীবন ফিরে পেল সে। অন্ধকার থেকে আলোয়। আনন্দ উপভোগের সময় নেই তার। ঊর্ধ্বশ্বাসে ওপরে উঠতে লাগল ঘুরে-ঘুরে।

একেবারে ওপরে, প্রধান হলঘরে পৌঁছে গেল মাদল। চার কোণে, চার রঙের কুশন। সাদা মার্বেলের মেঝের মধ্যিখানে টেলিফোন।

চোখ ঘুরিয়ে নিল সে। কেউ নেই আশেপাশে, হলঘরে ঢোকার পথও বন্ধ। লোহার শিক-লাগানো গেট নামিয়ে তালা লাগানো হয়েছে। কয়েদখানার গরাদের মতো দেখতে। পিছনের সুইমিং পুল থেকেই সম্ভবত, ঠান্ডা হাওয়ার ঢেউ আসছে থেকে-থেকে। ভিতরের করিডোরগুলির দিকে চোখ রেখে, রিসিভার তুলে নম্বর লাগাল মাদল।

ক্রিং-ক্রিং! ক্রিং-ক্রিং। ক্রিং-ক্রিং!

অনেক রাত হয়েছে নিশ্চয়ই! ইশ! সত্যকাকুকে বোধহয় ঘুম থেকে তুলতে হল।

ঘুম-জড়ানো গলায় সত্যকাকু বললেন, 'হ্যালো!'

মুহূর্ত দেরি না করে হুড়মুড়িয়ে বলে গেল মাদল, প্রায় টেলিগ্রামের ভাষায়, 'মাদল বলছি। চিন্তার কিছু নেই। যে-রঘুর কথা বলেছিলাম সে খুন হয়েছে। লক্ষ-লক্ষ টাকার হ্যাশহিশ। অ্যান্টিকস। পরশু এগারোটায় অপারেশান করুন। রাত এগারোটা। জয়দীপদার ভাইবোন ভালো আছে।—'

সত্যকাকু প্রত্যেক কথায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মাদল সুযোগ দেয়নি। ও যেই দম নিচ্ছে, উনি প্রথম কথা জিগ্যেস করলেন, 'তুমি আহত হওনি তো?'

'না।'

'সারাদিনে কিছু খেয়েছ?'

বিদেশে, এই শত্রুপুরীতে, সকল ভয়ের মধ্যেও মাদলের চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। সত্যকাকু তাকে এত ভালোবাসে? আহ! একটা কথায় যেখানে কাজ হয়, সেখানে ধরা গলায়, থেমে-থেমে বলল, 'আমি পেট ভরে খেয়েছি, সত্যকাকু। চিন্তা একদম করবেন না।'

'সাবধানে থেকো।'

জরুরি কথা মনে পড়ল মাদলের, 'খাঁড়ির দিকে শক্ত পাহারার দরকার। রাখছি।'

বাড়ির বাগানে এরা কুকুর ছেড়ে দেয় হয়তো। নাইট-ডিউটি। গোটা তিনেক দানব গোছের

কুকুর লোহার শিকেয় ওপরে হামলে পড়ে ডাকছে।

রিসিভার নামিয়ে, সামান্য খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ওই দিকে হেঁটে গেল মাদল।

পিছনে জেজের কণ্ঠস্বর, 'কী করছ এখানে? এত রাতে?'

সেই চেনা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে ব্যাটা। 'ধাউ' চলে গেছে নিশ্চয়ই। মাদল ঘুরে দেখে, মৃদু হেসে বলল, 'বদ্ধ ঘরে ঘুম আসছে না। হাওয়া খেতে এসেছি। কুকুর দেখছি।'

॥ চোদ্দো ॥

জয়দীপ জিগ্যেস করল, 'মিস্টার চওধরির ব্যাপারটা কীরকম বুঝলেন, সত্যসাধনবাবু?'

'এই মুহূর্তে, আপনার মুখে এ-ধরনের প্রশ্ন শোভা পায় না। যথা সময়ে জানা যাবে। বরং, আপনার সম্পর্কেই আমার কিছু জানার আছে। আপনিই যে জোশীকে খুন করেননি, সেটা অন্তত আমার বোঝা দরকার।'

'বেশ তো! বলুন?'

'আপনাদের ম্যাডাম শকুন্তলার সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা ক'দ্দিনের?'

ঝমরে চেপে এঁরা দুজনে চলেছেন নিবেদিতা বা নিম্বুর বাসায়। কাকভোরে টেলিফোন করে সত্য জয়দীপকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দুলকি চালে নয়, বেশ দ্রুতগতিতে শব্দহীন ছুটছে ঝমর—নিবেদিতা স্কুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরতে হবে।

একটু ভেবে জয়দীপ বলল, 'তা—প্রায় দেড় বছরের পরিচয়।'

ঝমরের গতি কমিয়ে, ঝপ করে ব্রেক কষলেন সত্য। সরাসরি জয়দীপের চোখে চেয়ে জিগ্যেস করলেন।

'বিয়ে-শাদির কথাবার্তা পর্যন্ত গড়িয়েছে?'

'প্রায়। গড়িয়ে—ছিল—'

ভুরু কোঁচকালেন সত্য, 'মানে?'

'এখন আমাকে ও খুনি বলেই মনে করে।'

ঝমর চলতে আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জয়দীপ যেন আপনমনে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'গত পাঁচ দিনে বহু চেষ্টা করেও ওর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। টেলিফোনেও বোঝাতে পারিনি যে, খুনটা আমি করিনি।—'

সহানুভূতির স্বরে সত্য বললেন, 'আপনি যে খুনি নন, ব্যাপারটা প্রমাণিত হলেই, আবার দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ধরা গলা জয়দীপের, 'না, ঠিক হবে না।'

'আর কী কারণ থাকতে পারে?'

'দুটি কারণে। প্রথমত, ওর বাবা, মিস্টার কোরগাঁওকর আমাদের দুজনের সম্পর্ক কখনোই ভালো চোখে দেখেননি। সম্ভবত উনিই মেয়ের কানে বিষ ঢেলেছেন।'

একটু চুপ করে রইল জয়দীপ। সত্য ধরিয়ে দিলেন, 'দ্বিতীয় কারণ?'

প্রেমিকের হতাশ গলা বদলে পুরুষের দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল জয়দীপ, 'যে-মেয়ে আমাকে বিশ্বাসই করে না, সে যত ধনি-কন্যাই হোক না কেন, তাকে কোনও মতেই বিয়ে করতে পারব না। তা ছাড়া, হয় ওরাই আর রাখবে না, বা, আমিই ছেড়ে দেব চাকরি।'

'এই ক'দিন তো আপিস বন্ধ রাখা হয়েছে। কবে খুলবে?'

'সোমবারে। তবে, আমি আর যাবই না, ঠিক করেছি।'

ওয়ারডেন রোডের বাঁ-দিকে ছোট রাস্তায় ঝমরকে ঘোরাতে-ঘোরাতে সত্য বললেন, 'এসে গেছি। আর-সোমবার আপনি আপিসে যাবেন। লাঞ্চের পর। অবস্থা বুঝে, ফাইনাল ডিসিসন নেবেন। ও-কে?'

জয়দীপ চশমার কাচের ভেতর দিয়ে চোখ পিটপিট করে সত্যকে দেখল। কিছুই না বুঝতে পেরে, বলল, 'ও-কে।'

বলে, দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল, সত্য বললেন, 'দাঁড়ান। আরও একটা ভাইটাল কোয়েশ্চন আছে।'

জয়দীপ ফের দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সত্যর দিকে। সত্য প্রশ্ন করলেন, 'আপনার সঙ্গে নিবেদিতার কীরকম সম্পর্ক? এখন?'

'ভালোই।'

'কোন পর্যায়ের ভালো?'

'ভালো বন্ধু।'

'তা হলে, রুদ্রাক্ষ সেনের ইচ্ছে পূরণ করছেন না কেন? নিবেদিতাকে যদি আপনি বিয়েটা করেই ফেলেন—তা হলেই একদিকের ঝঞ্ঝাট থেকে আপনি রেহাই পেয়ে যান। ভাইবোনকেও ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারেন।'

ম্লান হাসি ফুটল জয়দীপের মুখে। বলল, 'আপনি কি ঘটকালি করছেন?'

'কেন নয়? সমস্যার সরল সমাধান ভেবে, ঘটকালি করতেই বা দোষের কী?'

'বড় দেরি হয়ে গেছে, সত্যবাবু! নিম্নুর আত্মসম্মানবোধ যথেষ্ট প্রবল। দিল্লিতে যখন আমরা ছিলুম—সেই কৈশোর ও প্রথম যৌবনে কাছাকাছি থাকার জন্য যে-সম্পর্ক, হয়তো, অজান্তেই কোনও সম্ভবনার দিকে নিয়ে যেতে পারত—তা তো আর নেই এখন!'

'তা ভাঙন ধরল কেন এবং কোথায়? সেই 'আউট-অফ-সাইট-আউট-অফ-মাইন্ড' ব্যাপারটিই কি মূল কারণ?'

'অনেকটা তাই। তা ছাড়া, সেই সাত-আট বছর আগে বাবার বদলির কারণে কলকাতায় যেতে হয়েছিল। আমাকে তখন নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে বৃহত্তর জগতে মন দিতে হয়েছে।'

'তাই বলে, ভালোবাসার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে?'

'একদিনে তো নয়! প্রথম কিছুদিন, চিঠিপত্রের যোগাযোগ রাখা গেছে। ক্রমে, নতুন কাজ শেখার আগ্রহে ও কাজের চাপে—ধীরে-ধীরে তাও থেমে গিয়েছিল।'

মৃদু হাসলেন সত্য। বললেন, 'নারী, তথা প্রণয়-জাতীয় ব্যাপারে যদিও আমার অভিজ্ঞতা শূন্যের পর্যায়ে পড়ে, তবু, শুনেছি, মেয়েরা তাদের জীবনের প্রথম প্রেম কখনও ভুলতে পারে না। তদুপরি, সমবয়সী ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মেয়েই নাকি অধিকতর গভীর এবং বুঝদার। প্রথম প্রেমে পড়লে প্রেমিককেই শিবের মতো স্বামী হিসেবে ভাবতে শুরু করে। আপনার কী মনে হয়?'

কিছু যেন মনে পড়ল এইমাত্র, ঠিক তেমনি ভাবে তৃপ্তিদায়ক কিঞ্চিৎ রসিকতার সুরে জয়দীপ বললে, 'জানেন সত্যবাবু! ছোটবেলায় ও শিবরাত্রির উপোস করত ওর মার সঙ্গে। পরে, আমাকে প্রসাদি ফল খাইয়ে হেসে-হেসে বলত, তোর ভালোর জন্য উপোস দিলাম। তোর দুষ্টুমি নষ্টামি যাতে কমে—'

বলে, হাসতে গিয়ে জয়দীপের মুখটুক কেমন কোমল করুণ হয়ে গেল। সত্য গাড়ি থেকে বেরোতে-বেরোতে বললেন, 'ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলেন নাকি?'

'পাড়ার লোক এবং স্কুলের মাস্টাররা বলতেন বটে।'

'এখন মোটেই বোঝা যায় না!'

বাড়িটা পুরোনো আমলের হলেও মেঝে, সিঁড়ি সব ঝকঝকে তকতকে। একটা টালিও ভাঙা বা নোংরা নয়।

তিনতলায় উঠতে-উঠতে সত্য জিগ্যেস করলেন, 'উনি কি আপনার ও শকুন্তলার বিষয়ে জানেন কিছু?'

'হুঁ। আমিই বলেছি।' অপরাধীর গলায় জয়দীপ বলল।

সত্যসাধন অস্ফুট উচ্চারণে বললেন, 'ইশ! বেচারি!'

দরজা খুলে দিল নিবেদিতা নিজেই! ওকে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে মন ভালো হয়ে গেল সত্যর। ভারী মিষ্টি মুখশ্রী। প্রায় গোল মুখে সরু চিবুক। পাতলা ঠোঁট, টানা ভুরু এবং আয়ত চোখজোড়া মিলিয়ে মিশিয়ে বেশ প্রতিমা-প্রতিমা দেখতে। প্রশান্ত ও গম্ভীর। রংটা একটু চাপা। সত্যর মনে হল, ফরসা রং হলে যেন মানাত না। পরনে হালকা খয়েরি জমির ধনেখালি। গাঢ় ছাই রঙের মোটা পাড়-আঁচল।

জয়দীপকে এক পলক দেখে নিয়ে সত্যর দিকে তাকাল। হেসে, অভ্যর্থনা করল, নমস্কার-সমেত, 'কই, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভেতরে আসুন!' বলে, দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সত্য বললেন, 'চিনে ফেলেছেন?'

ঘাড় কাত করে নিবেদিতা বলল, 'জয়ের মুখে শুনেছি! আপনার তো দু-এক দিন আগেই আসার কথা ছিল—'

'হয়ে উঠল না। আরও কয়েকটা মামুলি কেস হাতে আছে। আপিসেও কামাই দিতে পারি না। নেহাত, আজকে না এলেই নয়—তাই, বিরক্ত করতে বাধ্য হলুম।'

'না-না, বিরক্ত কীসের? কিন্তু, এই কি সময় হল আসার? আমাকে তো একটু বাদেই বেরুতে হবে! বসুন। একটু চা করে আনি—'

সোফায় বসতে-বসতে সত্য আপত্তি করলেন, 'এখন আর চায়ের ঝামেলা করবেন না। আরও দেরি হয়ে যাবে আপনার। বরং বসুন, আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা সেরে নিই। বেশি সময় নেব না।'

মাঝারি ঘরটি পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। জানালার লাগোয়া ছোট্ট ডাইনিং টেবিল, চারটি চেয়ার। দরজার পাশে তিনটি সোফা ও নীচু কাচের টেবিল, ইংরিজি, হিন্দি পত্রপত্রিকা এবং আনন্দবাজার।

সত্যর মুখোমুখি সোফার হাতল ছুঁয়ে নিবেদিতা বলল, 'ঠিক আছে। আমি বসছি। জয়, প্লিজ, তুমি বরং আজ চা করে খাওয়াও আমাদের। আমিই তো রোজ করি—প্লিজ!—'

জয়দীপ লাজুক ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল। সুবোধ বালক হয়ে, ভেতরের দিকে যেতে-যেতে বলল, 'ঠিক আছে। আমি চা করে খাওয়াচ্ছি—তোমরা কথা বলো।'

গলা তুলে নিবেদিতা জিগ্যেস করল, 'চা-চিনি কোথায় আছে, জানো তো?'

ভিতর থেকে জয়দীপ সাড়া দিল, 'হ্যাঁ। ওপরের ক্যাবিনেটে। ডানদিকে।'

তার মানে, সত্য আন্দাজ পেলেন, জয়দীপ রায় এখানে রোজ না হলেও, প্রায়ই আসে-টাসে।

সোফায় বসে, শান্ত কণ্ঠে নিবেদিতা বলল, 'বলুন, ওরা কেমন আছে?'

'ওরা কারা?'

'জয়ের ভাইবোন। জয়ী-জাহ্নবী?'

ওর চোখে চোখ রেখে সত্য বললেন, 'আপনার দাদাকে টেলিফোন করে, আপনি নিজেই তো খবর পেতে পারেন!'

নিবেদিতা দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, 'না। পারি না। ও বম্বেতে এলে কোথায় ওঠে, কী তার টেলিফোন নম্বর আমি জানি না, জানতেও চাই না। ওর সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলেই ধরে নিন।'

বাঁকা সুরেই একটু খোঁচালেন সত্যসাধন, 'যোগাযোগ তো আছে। খোঁজ-খবর নেয়—'

বাধা দিল নিবেদিতা, 'স্রেফ নিজের প্রায়োজনে দাদাগিরি ফলাতে আসে। ''দাদাগিরি''—শব্দটি দুই অর্থেই এখানে খাটে। ওর সম্পর্কে আলোচনা করতেই ঘৃণা করে আমার।'

'ওদের দুজনকে কেন আটকে রেখেছে, আপনি জানেন?'

'ব্ল্যাকমেইলিং! যাতে আমি ও জয়দীপ বিয়েটা করে ফেলি—ছোটবেলার সেই পুতুল-বিয়ের মতো! হুঁহ!'

'আপনাদের অসুবিধেটা কোথায়?'

'প্রশ্নটা বড় ব্যক্তিগত হয়ে গেল না!'

'ইচ্ছে না হলে, অসুবিধে থাকলে জবাব দেওয়ার দরকার নেই।'

'শুধু এইটুকু জেনে রাখুন—আমি বিয়েই করব না।' এক বিন্দুও হাসি নেই নিবেদিতার মুখে। স্থির গম্ভীর গলায় কথা বলছে ও।

পরিবেশটা একটু হালকা করতে সত্য হেসে বললেন, 'চিরকুমারী বলছেন?'

কথাটার মধ্যে ঠাট্টার রেশ কতটা বোঝবার জন্যেই বোধহয়, নিবেদিতা চোখের পলক না ফেলে সত্যর মুখ লক্ষ করল। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির চেষ্টা করে জবাব দিল, 'বলতে পারেন।'

'আপনাদের বিয়ে হলে রুদ্রাক্ষর কী স্বার্থসিদ্ধি হয়, জানেন কিছু?'

'আন্দাজ করতে পারি।'

'কী?'

'আমার বাবার পৈতৃক ভিটে কলকাতার ডায়মন্ড হারবারে। বে-অফ-বেঙ্গলের সমুদ্র ও গঙ্গার মোহনার খুব কাছে। অনেকখানি জমি। সেখানে বেশ বড়সড় পুরোনো আমলের বাড়ি আছে। নোনা জলে, দেখাশোনার অভাবে সে-বাড়ি এখন ভূত-বাংলা বা হানাবাড়ি নামে পরিচিত। আমার দূর-সম্পর্কের এক মেসোমশাই তাঁর পরিবার নিয়ে কোনমতে দুখানা ঘরে থাকেন এবং যতটা সম্ভব দেখাশোনা করেন। একজন মালি-কাম-দারোয়ানও আছে। আরেকটি বাংলো-টাইপ বাড়ি আছে দিল্লির নিজামুদ্দিনে। বাবা উইল করে, দিল্লির বাড়ি আমাকে দিয়ে গেছেন। ডায়মন্ড হারবারের জমি-বাড়ির অংশীদার মা-আমি ও দাদা। তবে, মার মৃত্যু এবং আমার বিয়ে হলে—ও-বাড়ি সম্পূর্ণই দাদা পাবে।—'

সত্যসাধন সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, 'চমৎকার! আপনার দাদার বুদ্ধি ও হিসেব তুলনাহীন।'

নিজের দাদা বলেই হয়তো সামান্য সংকোচে মাথা নীচু করে চুপ থাকল নিবেদিতা।

সত্য জিগ্যেস করলেন, 'আপনার মা নিশ্চয়ই জীবিত নেই।'

'উঁহু। প্রায় দেড়মাস হল।'

আর 'দাদা' ব্যবহার না করে সত্য বললেন, 'আপনার বিয়েটা ঘটাতে পারলে, ভাবুন—রুদ্রাক্ষ সেনের উচ্চাঙ্গের আমদানি-রপ্তানি ব্যাবসা আরও ফলাও হবে। পুর্বের সমুদ্রও ঘাঁটির গায়ে লেগে সার্ভিস দেবে। বাহ্! সত্যিই চমৎকার—'

জয়দীপ চা নিয়ে এল।

চা খেতে-খেতে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, জয়দীপ ও সত্যসাধন উঠে পড়লেন।

জেজে বলল, 'লালুয়া, ফির তুম কাল নেশা কিয়া?'

লালুয়া নিজের কান ধরে। জিভ কেটে বলল, 'জি নেহি সাব। কসমসে। আমি দেখলাম লোকটা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। একগাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।'

রাগ সামলে জেজে বলল, 'হুম। তারপর?'

'ভূতই হবে, সাব! অ্যায়সা জোরে একটা ঘুষি মারলে—চোয়ালের ব্যথায় কিচ্ছু খেতে পারছি না!—'

'হুম। তারপর?—'

'আমার আর মনে নেই, হুজুর—'

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতে-তুলতে জেজে ধমক দিল, 'চোপ মিথ্যুক—গেঁজেল! গেট আউট। আর-একদিনও যদি শুনিও ঘরে বসে তুই গাঁজা খেয়েছিস—তাহলে, ভূত আর আসবে না,—তোকেই ভূতের কাছে পাঠিয়ে দেব—ভাগ—'

চোয়ালে হাত বোলাতে-বোলাতে হলুদ চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে লালুয়া, জেজে ফোনে বলল, 'ইয়েস, নিশা?'

'বসকে ফোনটা দিন। একটা কল আছে।'

'বস তো এ-ঘরে নেই। বোধহয় ব্লু চেম্বারে—'

নীল ঘরে বিপ-বিপ হতেই রুদ্রাক্ষ রিসিভার তুলে ভারী গলায় বলল, 'ইয়াপ!'

'বস। জয়দীপ রায়'জ অন দ্য লাইন।'

খুট আওয়াজটা হতেই রুদ্রাক্ষ বলল, 'জাস্ট এ রিমাইন্ডার, জয়দীপ।'

'বলুন?' জয়দীপের গলায় ত্রাস টের পেল রুদ্রাক্ষ।

'আটচল্লিশ ঘন্টাও নেই আর। কাল রাত বারোটার আগে যদি ব্যবস্থাটা না হয়, দেন ইউল নেভার সি দেম এগেন। গাল্ফ-এ যুদ্ধ লাগছে সম্ভবত। দ্য হাংরি ড্রাই সোলজারস নিড গার্লস অ্যান্ড চিলড্রেন ফর এন্টারটেইনমেন্ট—'

ওপার থেকে বাধা এল, 'রুদ্রদা, প্লিজ, অমন কথা বলবেন না—গা ঘুলিয়ে ওঠে। উফ্! আপনি কি অসম্ভব—'

কণ্ঠরোধ হল বোধহয় জয়দীপের। রুদ্রাক্ষ বলল, 'তুমি কিছু বলবে, না ফোন রাখব?'

দু-সেকেন্ড চুপ। তারপর ধরা গলায় জবাব এল, 'আমি রাজি, রুদ্রদা—নিম্মুকেও মোটামুটি রাজি করিয়েছি।'

খুশি হল রুদ্রাক্ষ। বলল, 'আহ্-হা! দ্যাটস লাইক আ গুড বয়। তা আজ রাতেই আমি রেজিস্ট্রারকে ধরে এনে ব্যবস্থা করি?'

'না-না, রুদ্রদা। আজ নয়। আমরা একটু রীতি-রেওয়াজ মেনে করতে চাই। সাত পাক ঘুরে, মানে, সপ্তপদী—'

'ও-নো! ও-সব ঝামেলা আবার কেন?'

'বিয়ে তো জীবনে দুবার করার ইচ্ছে নেই। একবারই। তাই বাপ-দাদার নিয়ম মেনে—তাছাড়া, আপনারও একমাত্র বোন—কন্যাদান করবেন—'

'উরিব্বাবা! সে তো বিস্তর ঝামেলা। পুরুত কোথায় পাব? বিয়ের ছাপ্পান্ন রকমের সরঞ্জাম?'

'দাদার নারায়ণ স্টোর্স-এ সব পাবেন। ওখানে, অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে, শ্রাদ্ধ—সবকিছুর উপকরণ পাবেন। আর পুরুত আমি আনতে পারব। বাবার এক বন্ধু, বৃদ্ধ এক রিটায়ার্ড কেরানি। উনি যজমানগিরি করেন—ভটচাজ বামুন।'

'বেশ। তোমাদের ইচ্ছেই পূরণ হোক। তবে, রেজিস্ট্রি ইজ এ মাস্ট। কাল করতে চাও?'

'কাল বিয়ের দিনও আছে। লগ্ন—দশটা চল্লিশ গতে—'

'রাত! একটু আগে—সন্ধে নাগাদ মানে, ইয়ে, তোমাদের ওই গোধূলি লগ্নে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না?'

মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর, জয়দীপের গলা, 'আমাদের তাড়া আছে বলে, বিয়ের লগ্ন তো এগিয়ে আনা যাবে না।'

রুদ্র চুপ করে একটু ভেবে নিয়ে, আওয়াজ খাদে নামিয়ে জিগ্যেস করলে, 'আই হোপ—নো মাঙ্কি বিজনেস? নো চালাকি?'

'রুদ্রদা, কী যে বলেন আপনি? আপনার সঙ্গে—'

'ঠিক আছে। খেয়াল থাকে যেন—আরব রাজ্যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত সৈনিকরা বেশ উত্তেজিত এখন—'

'কিন্তু, আপনার ওখানকার ঠিকানা তো আমরা জানি না?'

'রাত ঠিক ন'টায় ফুলে-সাজানো মার্সিডিস ওয়ারডেন রোডে নিজের বাড়ির দরজায় তৈরি থাকবে।'...

পরদিন রাত দশটা নাগাদ বাগানে পায়চারি করছিল মাদল। দুপুর থেকে সানসেট ভিলায় কেমন যেন সাজ-সাজ রব। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, ভেতরের প্রথম হলঘরটি বেশ কয়েক ডজন ফুলের ছড়া দিয়ে সাজানো হয়েছে। বসের নির্দেশ পালন করে মাদল আলপনা করে দিয়েছে মেঝেয়। বিয়ের পিঁড়ি ঘট ইত্যাকার সব জড়ো করে সবাই তৈরি বসের একমাত্র বোনের নাকি বিয়ে। জেজে, নিশা, আরও দুটি মেয়ে, যাদের আগে দেখেনি মাদল, এবং বেয়ারা, কর্মচারী—সব মিলিয়ে চোদ্দ জন লোককে খাটতে দেখা গেছে। যদিও, ভূগর্ভে দেখা সেই গেঁজেল বা 'ধাউতে' পরশু যারা 'মাল' তুলছিল তারা ওপরে ওঠেনি।

সিংহ-দরজা খুলে ফুলে-সাজানো কালো মার্সিডিস ঢুকল। মোরামের পথে খুকুর-পুকুর শব্দ তুলে গাড়ি বারান্দার আলোয় গিয়ে থামল। মাদল এগিয়ে যাচ্ছিল, পিছনে বসা জয়দীপকে দেখে ক্যানাঝোপের পাশে আড়াল নিয়ে দাঁড়াল। জয়দীপদা দেখে ফেললে গণ্ডগোল হতে পারে। ধরা পড়ে যাবে সে।

রুদ্রাক্ষ, নিশা হলের দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ওদের অভ্যর্থনা করছে। কী বলছে রুদ্রাক্ষ, অ্যাদ্দুর থেকে শোনা যাচ্ছে না। জয়দীপদার পিছন-পিছন লাল বেনারসি-পরা কনে নামল। রুদ্রাক্ষর বোনই হবে। কেমন দেখতে, পিছন থেকে বোঝবার উপায় নেই।

মাদল ভাবল, এ আবার কেমনতরো বিয়ে রে, বাবা! উলু নেই, শাঁখ নেই, সানাই বাজছে না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শকুন্তলা ম্যাডামকে ছেড়ে জয়দীপদা হঠাৎ এই ধুরন্ধর স্মাগলারের বোনের পাল্লায় কবে পড়ল?

ড্রাইভারের পাশ থেকে বুড়ো সৌম্যদর্শন পুরুতঠাকুর ধীরে-সুস্থে নামছেন। গায়ে নামাবলি, চোখে নিকেলের গোল চশমা। ধবধবে সাদা চুলের মধ্যিখানে সিঁথি। পাকা গোঁফ। কুঁজো হয়ে ঠুকঠুক লাঠি ঠুকে হাঁটছেন। কীরকম খটকা লাগল মাদলের। ক্যাকটাস, ক্যানাঝোপের আড়াল নিয়ে এগিয়ে গেল সে। পুরুতঠাকুরের হাতে গামছার পুঁটুলি। রুদ্রাক্ষর গলা শুনতে পেল মাদল, 'আসুন, ঠাকুরমশাই। আসুন। আপনার ওই পুঁটুলিতে আবার কী?'

খনখনে কাঁপা গলায় পুরোহিত জবাব দিলেন, 'বাছা! এটা ছাড়া যে আমার চলে না।' হেসে, গলার শ্লেষ্মা ফেলতে মোরামপথের পাশে এগিয়ে এলেন। মাদল যে ক্যাকটাসের পিছনে ছিল তারই কাছে এসে নানান বিচিত্র আওয়াজ তুলে কেশে, কী একটা বলতে-বলতে 'খ্যাক-থুঃ।'

গামছার পুঁটুলি তুলে রুদ্রাক্ষকে দেখিয়ে দোলালেন। হেসে বললেন, 'শালগ্রাম শিলা বাবা।' বলে, মাথায় ঠেকালেন।

মাদল ভাবার চেষ্টা করল, কফ ফেলতে গিয়ে পুরুত যেন কী একটা বললেন? 'এলাম' নাকি!

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনা-আনন্দে চনমন করে উঠল সে। কী কাণ্ড! এ তো সত্যকাকু!!

॥ পনেরো ॥

পুরুতমশাই যে আসলে সত্যকাকু, ব্যাপারটি আন্দাজ করে, মাদল মনে-মনে প্রায় নেচে উঠল। ইশ! একেবারে চেনাই যায় না। ও নিজেই তো প্রথমে চিনতে পারেনি। চুলে রং করে একদম সাদা। গোঁফ-জোড়াও লাগিয়েছেন একেবারে ম্যাচিং। সারা বছরে ক্বচিৎ-কখনও ধুতি পরেন সত্যকাকু। লাস্ট পরেছিলেন সেই ছাব্বিশে জানুয়ারি। রাজ্যপালের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্নে যাওয়ার সময়। কিন্তু, সে তো অন্য ব্যাপার! চুনোট ধাক্কা-ওয়ালা ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে। গিলে-করা ফুরফুরে শৌখিন আদ্দির পাঞ্জাবি। একেবারে বাংলা ছবির নায়ক। আর, আজ কী ছিরি! কোরা, মিলের সরুপাড় ধুতি। তা-ও প্রায় হাঁটু অবধি তোলা। পাঞ্জাবি দূরস্থান, গেঞ্জি পর্যন্ত নেই। স্রেফ নামাবলি। হিন্দিতে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' লেখা। মাদল ভেবে পেল না, এ-জিনিস সত্যকাকু জোগাড় করলেন কোত্থেকে, কখন? শুধু নামাবলিই নয়। ধবধবে পৈতে। বাম-বাহুতে কালো-সুতোয় বাঁধা একটি তাবিজ। শুধু টিকিটাই বাকি।

বাগানের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে সোজা হলঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে এই সব লক্ষ করছে মাদল। জয়দীপ রায়কে দেখে প্রথমে আবডাল নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু যেই দেখল সত্যসাধন ওঁর সঙ্গে রয়েছেন—অমনি সব ভয় সরে গিয়ে ডবল সাহসী হয়ে উঠল, মাদল বসু। মনে-মনে সে ধরেই নিয়েছে, সত্যকাকু আছেন মানেই জয়দীপদাও নিশ্চয়ই জানেন যে, মাদল এখানে এসেছে আত্মপরিচয় গোপন করে।

ডানহাতে লাল গামছার পুঁটুলিতে শালগ্রাম শিলা ও লাঠি, বাঁ-হাতে কমণ্ডলু, কাঁধে ঝোলাসমেত, কুঁজো হয়ে হলঘরে পা রাখলেন সত্যকাকু। ওমা! পায়ে তো সেই মাদলের অতি-পরিচিত খয়েরি তালতলার চটি!

রুদ্রাক্ষ হাসিমুখে হাত তুলে বলল, 'একটু দাঁড়ান, ঠাকুরমশাই।' বলে, কাছে-দাঁড়ানো জেজেকে ইশারা করল, 'জেজে, পুরোহিতজিকো জরা পরখ কর লো।'

মাদলের বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। ধুরন্ধর রুদ্রাক্ষর সন্দেহ হল নাকি? ধরা পড়ে যাবেন না তো সত্যকাকু?

জয়দীপের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে রুদ্রাক্ষ। মুখের মিষ্টি হাসিটি বজায় রেখে বলছে, 'ওয়েলকাম, মিস্টার জামাই। তা, পকেটে কোনও আপত্তিকর বস্তু নেই তো?' বলতে-বলতে অসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে ওর সারা গায়ে দু-হাত বুলিয়ে দেখে নিল সে।

কাণ্ডটা এত দ্রুত হল যে, জয়দীপ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই তার বডি সার্চ হয়ে গেল। রুদ্রাক্ষ হেসে-হেসেই বলল, 'বাহ্! গুড বয়!'

বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে নিশার টেবিলে কাঁধের ঝোলা এবং কমণ্ডলু রেখেছেন সত্যসাধন। কমণ্ডলুর ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে, ঝোলা হাতড়াতে লাগল জেজে। এক-এক করে বের করে দেখল সব—বিড়ির প্যাকেট, দেশলাই, চন্দনপিঁড়ি, টর্চ, পঞ্জিকা। সত্য 'হাঁ-হাঁ' করে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন—রুদ্রাক্ষ জিগ্যেস করলে হাত বাড়িয়ে—'ঠাকুরমশাই, আপনার লাঠিখানা তো দারুণ—দেখি, দেখি—'

সত্য বিরক্ত মুখে একবার জেজে ও একবার রুদ্রাক্ষকে দেখতে-দেখতে লাঠিটা এগিয়ে দিলেন। হাতে নিয়ে গাঁটে-গাঁটে প্যাঁচ ঘুরিয়ে দেখে নিল রুদ্রাক্ষ, 'বেশ পোক্ত, কী বলেন?'

মাদল বুঝল, ধুরন্ধর খুনি লোকটা দেখে নিল—ওতে চোরা-গুপ্তি-টুপ্তি আছে কি না। ততক্ষণে, ঝোলা পরখ করে, ছোঁওয়ার ভঙ্গিতে দু-হাত বাড়িয়ে জেজে সত্যকাকুর কাছে আসতেই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি। গামছার পুঁটিলি সমেত হাত জোড়া মাথার ওপরে তুলে শ্রীচৈতন্যের কায়দায় প্রায় নেচে উঠলেন। খনখনে কাঁপা গলায় হিন্দি বেরোল, 'আহা-হা—আহা-হা! ছুঁয়ো মাত—ছুঁয়ো

মাত—কেয়া করতা হ্যয়—তুম ব্রাহ্মণ হ্যায়—অ্যাঁ—?'

জেজে যত এগোচ্ছে সত্যকাকু এক-পা দু-পা করে পেছোচ্ছেন—ভারতনাট্যমের কায়দায়। জেজে হিন্দিতে বলল, 'দাঁড়ান স্থির হয়ে। আপনার বডি সার্চ করব—'

'কেন হে বাপু। আমি কী করেছি। আমি কি চোর না, ছ্যাঁচোড়? ওহে, জয়বাবা। এ কোথায় এনে ফেললে আমায়—' সে প্রায় হাঁউমাঁউ চিৎকার!

হলঘরে যে ক'জন ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। সত্যকাকুর অভিনয় দেখে মাদল চমৎকৃত। হাসিও পাচ্ছিল—একটু-একটু ভয়ও। গোঁফটা না ছিটকে পড়ে যায়! অথবা, জেজে যদি আসল-নকল পরখ করতে হঠাৎ টান মেরে বসে? তাহলেই সর্বনাশ! খুনে-স্মাগলারদের এই আড্ডা থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা মুশকিল। ভাবতেই শরীর অবশ হয়ে আসে।

ততক্ষণে, সুর পালটেছেন সত্য। সামান্য থিতিয়ে ভারী দুঃখ-মাখা গলায় বলছেন, 'কী আর সার্চ করবে, বাছা! সে-বডি কি আর আছে! ভেজাল খেয়ে-খেয়ে দেহের চোদ্দোটা বেজে গিয়েছে—এখন দেহরক্ষাই বাকি!'

রুদ্রাক্ষ অধৈর্যভাবে হাত নেড়ে ইশারা করল জেজেকে। ঠোঁটের কোলে হাসি ঠেকিয়ে সত্যকে বলল, 'আপনি উতলা হবেন না, ঠাকুর। এখানে আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।'

'বসের বোনের বিয়ে, বসের হাসি-হাসি মুখ—এই সব দেখে জেজে হয়তো একটু ইতস্তত করছিল। এবার ঘাপ বুঝে হামলে পড়ল। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছিলেন সত্য। তাঁর গলা, কাঁধ, নামাবলি চেপে, বগল, পিঠ ছুঁয়ে বোলানোর কায়দায় হাত ঘুরিয়ে নেমে এল কোমরের কষিতে। ধুতি চেপে-চেপে হাত বোলাতে-বোলাতে নগ্ন হাঁটু অবধি নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জেজে।

মাদল জানে না, কী প্ল্যান করে এসেছেন সত্যকাকু! এমন বিপজ্জনক একটি ঘাঁটির ভেতরে আসবার জন্যে উনি কতখানি প্রস্তুত? তাই, কাঁটা হয়ে ছিল। টানটান স্নায়ু শিথিল হতেই প্রায় ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল সে।

'পাপ ধুয়ে যাক'—বা, 'ঈশ্বর ক্ষমা করুন' গোছের আধবোজা চোখে বিড়বিড় মন্ত্র আওড়াচ্ছিলেন সত্যসাধন। জেজে সরে দাঁড়াতেই ড্যাবড্যাব চোখে চারপাশে দেখে নিলেন। 'হরি ওঁম—হরি ওঁম' বলতে-বলতে দ্রুত হাতে কমণ্ডলু তুলে নিলেন টেবিল থেকে। জয়দীপ ও রুদ্রাক্ষর দিকে চেয়ে নিজের মনেই বললেন যেন, 'চান করতে পারলে ভালো হত! ইশ! নাহ-থাক! অ্যাতো রাতে আবার ঠান্ডা লেগে শ্লেষ্মা জমবে। গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেহশুদ্ধি করে নিই—হরি ওঁম—' হাতে জল নিয়ে নিজের গায়ে মাথায় ছেটাতে-ছেটাতে বললেন, 'অপবিত্র পবিত্রবা—ওঁম—হুঁম—' বলতে-বলতে খকখক কেশে বোধহয় শ্লোক ভেবে নিলেন এবং শুরু করলেন আবার, 'মন্দাকিনী সলিল চন্দন চর্চিতায়—নান্দীশ্বর প্রমথনাথ বিশ্বেশ্বরায়—ওঁ মা গঙ্গে—'

মাদল ভেবে পাচ্ছে না, কীসের মন্ত্র পড়ছেন সত্যকাকু? আদৌ কোনও মন্ত্র কি? না, স্রেফ ভুজুং ভাজুং? রুদ্রাক্ষ, জেজে এবং চারপাশের অন্য সব মুখগুলির দিকে একে-একে চেয়ে দেখল মাদল। এরা কেউ পুজো-পাঠ, সংস্কৃত মন্ত্র-ফন্ত্রের ধার বোধহয় ধারে না। আগেকার দিনের ডাকাত, যারা কালীপুজো-টুজো করত, তাদের সামনে সত্যকাকু অবশ্যই এতক্ষণে ধরা পড়ে যেতেন। এই বদমাশগুলোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সত্যকাকুর কাণ্ড-কারখানা এরা খানিকটা মজা-দেখার চোখেই দেখছে। বাঁদর-নাচ, বা সার্কাসের জোকার দেখার মতো।

কমণ্ডলু, পুঁটলি হাতে ছিলই। এবার, টেবিলের ওপর থেকে ঝোলা তুলে নিলেন সত্য। রুদ্রাক্ষ বলল, 'সে কি ঠাকুরমশাই! চললেন, কোথায়? আপনি গেলে এদের বিয়ে হবে কী করে?—'

বলতে-বলতে, ভাবী বর-কনের দিকে দেখাল। জয়দীপের চেহারা এখন বোকা-বোকা। কী করবে ঠাহর পাচ্ছে না যেন। মাদলও দ্রুত ভাবার চেষ্টা করল, সত্যি-সত্যিই যদি সত্যকাকু এখন চলে যান, তো এসেছিলেনই বা কেন?

জিনিসপত্তরসুদ্ধই হাতজোড়া কপালে ঠেকিয়ে রুদ্রাক্ষকে নমস্কার করার ভঙ্গি করলেন সত্যকাকু। বললেন, 'না, বাবাজীবন। বিবাহ হচ্ছে শুদ্ধাচারের ব্যাপার। এখানে, সে-কার্য সমাধা করতে গেলে আরও কী কী অপমান এই অভাগা ব্রাহ্মণকে সইতে হবে, কে জানে! তার চেয়ে বরং আমাকে কাছের লোকাল ইস্টিশানে পৌঁছে দিন—আমি বিদেয় হই।'

রুদ্রাক্ষ জয়দীপকে ইশারা করল এবং হাতজোড় করে যথেষ্ট করুণ গলায় বলল, 'এ-যাত্রা মাফ করে দিন, ঠাকুর। আসলে, আমি একটু সাবধানী মানুষ কিনা! তবে, কথা দিচ্ছি, আপনাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না। প্রমিস! —' চশমার ফাঁক দিয়ে পিটপিট করে কয়েক পলক রুদ্রাক্ষকে দেখলেন সত্যকাকু! বললেন, 'কথা দিচ্ছেন?'

'আমার একমাত্র বোনের দিব্যি।'

'বেশ! চলো হে জয়বাবু। বিবাহের আয়োজন হোক—রাত বেড়ে যাচ্ছে—'

রুদ্রাক্ষ হাতের ঘড়ি দেখে নিয়ে জেজে এবং অন্যদের হিন্দিতে হুকুম করল, এই—সব মালপত্তর এনে পুজারিজিকে দাও তোমরা—উনি যেমন-যেমন বলবেন—সাহায্য করো সবাই—হাত লাগাও—'

বাংলায় কথা হচ্ছিল বলে, অন্যেরা এতক্ষণ ঠিক ধরতে পারছিল না—কী হচ্ছে না হচ্ছে, এবার নাড়াচাড়া পড়ে গেল বসের হুকুম পেয়ে। দুপুরের আগেই চটের থলি বোঝাই বিয়ের যে সব সরঞ্জাম এসেছে—সেই সব নিয়ে আসতে ছুটল জনা তিনেক। সত্যসাধন পিঁড়ি ও আলপনার কাছে ধীরে-সুস্থে উবু হয়ে বসলেন।

রুদ্রাক্ষ ততক্ষণে নিবেদিতার দিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে একটা সোনার নেকলেস বের করে ধরিয়ে দিল ওর হাতে। মুখে অল্প হাসি টেনে বলল, 'নিবে! ইটস মাই গিফট। এটা পরে একটু সাজগোজ করে নাও।—'

নেকলেসটি হাতে ধরে দাদার দিকে চেয়ে আছে নিবেদিতা। পলক পড়ছে না চোখের। চেয়েই আছে। তার কি ছোটবেলার কথা মনে পড়ল? নাকি, কোনও বিশেষ ঘটনা?

অথবা, হয়তো মনে পড়ল হঠাৎ, ভাই-বোনের ফেলে-আসা সেই খেলাধুলো খুনসুটির দিনরাত্তির? এই সব ভাবনা এল মাদলের মনে। কারণ, সে স্পষ্ট দেখতে পেল, নিবেদিতার আয়ত চোখজোড়া ঘরের উজ্জ্বল আলোয় চিকচিক করছে। জল উপছে পড়বে বুঝি এক্ষুনি। রুদ্রাক্ষও সহসা চোখ সরিয়ে পিছনে নিশার দিকে তাকাল। ব্যস্ত গলায় বলল, 'নিশা। বি এ গুড গার্ল। আমার বোনকে তোমাদের প্রসাধন কক্ষে নিয়ে যাও—' জয়দীপের কাছে চলে গেল দ্রুত পায়ে। গাল ভরে হেসে বলল, 'মাই ডিয়ার হবু-জামাই! এসো আমার সঙ্গে। ও-ঘরে তোমার নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি রাখা আছে—পরে নেবে চলো—'

জয়দীপ সত্যসাধনের দিকে তাকাল। সত্য সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাও শিগগির। তবে কাছা-কোঁচার ঝামেলায় যেও না। অভ্যেস নেই তো! খুলে যেতে পারে। একেবার আদি ও অকৃত্রিম মালকোঁচা মেরে, কষে বেঁধে নিও।' রুদ্রাক্ষর সঙ্গে জয়দীপ হলুদ চেম্বারের দিকে হাঁটা দিল।

খানিকটা ঠাট্টার সুর থাকলেও সত্যকাকুর কথার মধ্যে অন্য ইঙ্গিত নেই তো! মাদলের কেমন সন্দেহ হল। অ্যাকশানের গন্ধ? কে জানে! মাথা খাটিয়েও কোনও আন্দাজ পাচ্ছে না মাদল। সত্যকাকুর প্ল্যানটা কী অথবা দু-একজনের কাজ তো নয়? পুলিশ ফোর্সের সাহায্য না থাকলে তো সামলানো যাবে না। এত জটিল ঘাঁটি, এতগুলো ষণ্ডা? আগ্নেয়াস্ত্রও প্রচুর আছে নিশ্চয়ই। কীভাবে যে কী হবে তার কণামাত্রও টের পাওয়ার আশায় হাঁ করে গিলে খাচ্ছে সত্যকাকুর প্রতিটি ভঙ্গি বা কথা।

জেজেকে বললেন, উনি, অবশ্যই হোঁচট হিন্দিতে, 'চারঠো আস্তো, মানে থান ইট মাংতা, বাবা!'

'থান ইট?' জেজের বুঝি আক্কেল-গড়ুম, 'থান ইট দিয়ে কী হবে?'

'বিয়ে হবে, বাপ, বিবাহ! অগ্নিসাক্ষী চাই না?'

'ঠোঁট কামড়ে, ভুরু কুঁচকে, চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভাবছে জেজে। মাদলের বেদম হাসি পাচ্ছে। মহা ফাঁপরে পড়েছে ব্যাটা। রাত এগারোটার সময় মালাবার হিলে থান ইট? অসম্ভব! কাছেপিঠে নতুন দালান তৈরির কাজ চললে, তবেই জোগাড় হতে পারে।

ভেবেচিন্তে জেজের প্রশ্ন, 'চার খণ্ড পাথরে কাজ চলবে না?'

হাতের অসহায় ভঙ্গি করে সত্য বললেন, 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাং। কী আর করা যাবে। তাই এনে দাও, ভায়া!'

হলঘর থেকে সুইমিং পুলে যাওয়ার প্যাসেজের মাথায় একটা সাদা-কালো কোয়াতর্জ ওয়াল ক্লক। ওদিকে দেখে, নিজের হাতঘড়িতে সময় দেখল জেজে। ব্যস্ত গলায় বলল, 'আর কী কী চাই, একেবারে তাড়াতাড়ি বলে দিন। অন্য কাজও তো আছে আমাদের!'

কী কাজ, তা মাদলের বেশ ভালো করেই জানা। এগারোটা বাজতে আর মিনিট দশেক বাকি! আমদানি-রপ্তানির সেই 'মালবাহী ধাউ' এসে পড়ল বলে।

উত্তেজনায়, কৌতূহলে ছটফট করছে মাদল। সত্যকাকুর দিক থেকে চোখ সরছে না একদম—পাছে, ওঁর কোনও ইশারা-ইঙ্গিত 'মিস' করে ফেলে! অথচ, পুরুতমশাই একেবারে নির্বিকার। 'নারায়ণ স্টের্সে-র ছাপ-মারা বস্তা থেকে যে সব টুকিটাকি সরঞ্জাম বেরোচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখতেই ব্যস্ত। যেন, মানুষটা চোদ্দপুরুষের যজমান। স্রেফ প্রজাপতয়ে নমঃ করতেই এসেছেন এখানে।

কোশার ভিতরে কুশি রাখতে-রাখতে বললেন, 'ব্যস। আর তো মনে হয় না কিছু লাগবে। শুধু এই কলসি ভরে জল চাই। সমুদ্রের নোনাজল নয় কিন্তু! মিষ্টি জল—' বলে জেজেকে একগাল হাসি উপহার দিলেন সত্য।

মনে-মনে চটলেও, 'বসের হুকুম মানতেই একজন চ্যালাকে হাত নেড়ে ডাকল জেজে। তার হাতে কলসি ধরিয়ে সুইমিং পুলের দিকে পাঠিয়ে দিল। অন্য দুজনকে সঙ্গে নিয়ে নিজে চলল বাগানের পথে।

ঘরে অন্য যে ক'জন মাসলম্যান ছিল, তারা হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সত্যর কাছাকাছি বসে পড়েছে দু-জন উবু হয়ে পুরুতের কাণ্ড দেখছে। সুইমিং পুলের প্যাসেজে একজন পাহারায়। মাদল গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এসে সত্যকে জিগ্যেস করল, 'আমায় কিছু করতে হবে?'

বাংলা বোঝে এমন কেউ নেই এখন। উবু হয়ে বসা যণ্ডা দু'জন ভুরু কুঁচকে মাদলকে দেখল। সত্য বোধহয় লক্ষ করলেন আড়নয়নে। বললেন, 'হিন্দিমে বোলো, বেটা। রাষ্ট্রভাষা হায় হামারা। আভি সেরেফ দাঁড়াকে থাকো। বোহুৎ কিছু করনা হায়—' নিজের মনে কাজ করতে-করতে অশুদ্ধ বিকট উচ্চারণে হিন্দি বললেন সত্য। হাসি চাপতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল মাদলকে। কারণ, সে জানে, সত্যকাকু চোস্ত পণ্ডিতি-হিন্দি যেমন বলতে পারেন, লখনউয়ের উর্দু-ঘেঁষা হিন্দুস্তানিও তেমনি।

গামছার পুঁটুলি মাদলের হাতে ধরিয়ে আবার বললেন, 'আপাতত ইসকো ধরো। শালগ্রাম শিলাকো প্রণাম করো—কাম আয়গা।—'

জয়দীপকে নিজের হাতে ধুতি-পাঞ্জাবি দেওয়ার জন্যেই হয়তো হলুদ চেম্বারের দিকে নিয়ে গিয়েছিল রুদ্রাক্ষ। কখন যে একা বেরিয়ে এসেছে খেয়াল করেনি মাদল। হঠাৎ পিছনে চোখ পড়তেই দেখল, সিঁড়ি দিয়ে দু-পা নেমে থমকে দাঁড়িয়েছে লোকটা। মুখের ভাব কি একটু থমথমে? মুহূর্তেই সে-ভাব পালটে সত্যকে ডাকল, 'ঠাকুরমশাই। একটু আসবেন?'

'কে বাবা?' বলতে-বলতে বসা অবস্থাতেই ঘুরে দেখলেন সত্য। জুড়ে দিলেন উঠতে-উঠতে,

'ও হরি! আপনি! না এসে উপায় আছে—' আরও কী সব বিড়বিড় করতে-করতে উঠে দাঁড়ালেন। কোমরে বাঁ-হাতের ভর রেখে হাঁটতে লাগলেন সামান্য কুঁজো হয়ে।

শালগ্রাম শিলার পুঁটুলি বেশ ভারী। সত্যকাকু এ-জিনিস জোগাড় করলেন কোত্থেকে? সত্যি-সত্যিই জয়দীপদার বিয়ে দেবেন নাকি? ধুর! তা কী করে হয়! আনসান ভাবতে-ভাবতে নেহাত কৌতূহলেই গামছার গিঁট খুলে ফেলল মাদল। একটাই বেশ শক্ত মোটা গিঁট। ফাঁক হতেই, ভেতরে উঁকি দিয়ে আঁতকে উঠল সে। কী সব্বোনাশ! কোথায় শিলা? ছ-ঘড়ার একটা রিভলভার চকচক করছে। ভয়ে, হাত থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। কিছুই না, কিছুই না, মুখ বানাবার চেষ্টা করল সে। চারপাশে নজর ঘুরিয়ে, অতি কষ্টে থরথর হাতের কাঁপুনি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গামছা দলা পাকিয়ে হাতের মুঠোয়। বুকের মধ্যে টিপ-টিপ ভাবনা শুরু হল—সত্য-কাকুকে হলুদ ঘরে নিয়ে গেল কেন খুনি লোকটা? ওঁর অস্ত্রটাও তো দিয়ে গেলেন তাকে।

রুদ্রাক্ষর পিছন-পিছন সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন সত্যসাধন। ঘরে ঢুকে দ্রুত চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন। ঠান্ডা এবং বড়সড় হলুদ ঘরটি সাউন্ডপ্রুফ। কোনও কারণে মাদলের সাহায্যের দরকার হলে, গলা ফাটালেও আওয়াজ পৌঁছোবে না বাইরে। ভ্যানগখের 'সান-ফ্লাওয়ার' টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। এই ছবিটার কথাই মাদল বলেছিল। তার নীচে টেবিল। টেবিলের বাঁ-ধারের শেষ কোণে, ছোটো একটি ঘর। দরজা আধখোলা। বড় আয়নায় জয়দীপকে দেখা যাচ্ছে। ধুতি পরছে সে।

টেবিলের কাছে পৌঁছে, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রুদ্রাক্ষ। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ঙ্কর বরফ গলায় বলল, 'মিস্টার—সত্যসাধন—কর!'

হৃৎপিণ্ডের একটা শব্দ হয়তো একটু জোরে পড়ল। ব্যস! ওই পর্যন্তই! মুখের ভাব এতটুকুও বদলাল না সত্যর। বরং সামান্য হাসলেন। হেসে, কোমর সোজা করে টানটান দাঁড়ালেন। চোখ দিয়ে মোটামুটি দেখে নিলেন দুজনের মধ্যে ব্যবধান কতটা। বড় জোর পাঁচ-ছয় ফুট। নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছাড়লেন যেন। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'আহ! এই তো! ধরা পড়ে গেছি!—'

ওঁর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে পিছনের টেবিল স্পর্শ করল রুদ্রাক্ষ। একটা ফাইল হাতে তুলে নিয়ে দোলাতে-দোলাতে বলল, 'ধরা অনেক আগেই পড়েছ, মিস্টার লিজার্ড! অ্যাক্টিং-ফ্যাক্টিং মন্দ নয়। তবে, তোমার স্বাস্থ্যটি বড় বেশি রকমের ভালো। হাত-পায়ের মাসলগুলির সঙ্গে তোমার হাঁটাটা ঠিক ম্যাচ করছিল না। গোঁফটাও কেমন অচেনা লাগছিল।'

আড্ডা মারার ধরনে হালকা গলায় বলে উঠলেন সত্যসাধন, 'তা কী করে হবে! আঁ? ছড়াটা পড়োনি বাংলায়—গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে—' বলতে, একটানে গোঁফ খুলে ফেললেন।

'শাট আপ, বাস্টার্ড!—ঠান্ডা ভারী গলায় ধমক দিল রুদ্রাক্ষ, 'এখানে কী জন্যে এসেছ? জয়দীপের ভাই-বোনকে সেভ করতে? না মারিয়্যানা, হ্যাশ চেখে, সোনা ওজন করতে?'

গোঁফটা উলটেপালটে দেখে সত্যর জবাব, 'দুটো হলেই বা ক্ষতি কী!'

অন্য কথায় গেল রুদ্রাক্ষ। হাতের ফাইলটা দেখিয়ে বলল, —'এটা দেখছ, সাধনকর! এতে গত পাঁচ-সাত বছরের পেপার-কাটিং আছে। রাজ্যের খবরের কাগজ থেকে জড়ো করা। স্মাগলিং বা অন্য নানান জাতের ক্রাইমের রোমহর্ষক রিপোর্ট। ড্যামনা তথা সাধু দারোগা সাঠের সঙ্গে তোমার ছবিও ছাপা আছে নাম-সমেত। দাউদের কেস, প্লাস, সত্যবতী-মার্ডার কেস! মনের খচখচানি শান করতেই ঘরে এসে ফাইলটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম।'

'বাহ! দেখি, দেখি। অনেকদিন নিজের ছাপা ছবি দেখি না—' বলে, সত্যসাধন এক পা এগোতে যেতেই, চোখের পলকে রুদ্রাক্ষর পকেট থেকে লিলিপুট পিস্তল বেরিয়ে এল। সোজা সত্যর বুকে তাক করে, দাঁতে দাঁত চেপে কেটে-কেটে উচ্চারণ করল সে, 'না। আর—কোনওরকম—চালাকি নয়।'

॥ ষোলো ॥

ইন্টার-কলেজ বক্সিং চ্যাম্পিয়ান সত্যসাধন বুঝে গিয়েছিলেন. প্রায় ছ-হাত দূর থেকে কোনও সুবিধে করতে পারবেন না। সেই জন্যেই একটু এগোতে চেয়েছিলেন। সে-পথও রুদ্ধ হল!

চকিতে রুদ্রাক্ষর পিছনে চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন, জয়দীপের ধুতি পরা তখনও শেষ হয়নি। সেই অবস্থাতেই ছোট ঘরটির বাইরে মুখ বের করে দেখছে এদিকে। অত দূর থেকে পুরো ঘটনাটা ধরতে না পারলেও বিপদ-সংকেতের আঁচ সে পেয়েছে।

ওইদিকে চোখ রেখেই আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন সত্য, 'ধরো জয়দীপ।'

অতি চতুর এবং টপ-ক্লাস ধুরন্ধর রুদ্রাক্ষ। সে যে মুখ ঘুরিয়ে পিছনে দেখবে, এতটা আশা মোটেই করেননি সত্য। তবে, সামান্য অসতর্ক সে হয়ে পড়ল মনুষ্যজনিত ন্যাচারাল রিফ্লেক্সের কারণেই। পরে চোখের মণি চকিতের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত। জাপানি কুংফু, বা ক্যারাটে-ফ্যারাটে হাতে-কলমে কোনওদিন শেখেননি সত্যসাধন। তবু, ওই এক দণ্ডের অসতর্কতাই কাজে লাগালেন তিনি। তা ছাড়া, আর উপায়ও তো নেই। সামনে থেকে পিছনে শরীরের ভার দুলিয়ে, ডান পায়ে সাদা বাংলায় একখানা লাথি ঝাড়লেন সজোরে। মোক্ষম লাথিখানা যথাস্থানে, অর্থাৎ, পিস্তল-ধরা রুদ্রাক্ষর ডানহাতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে আগুনের হলকা বেরোল পিস্তল থেকে। ওই অবস্থাতেও সত্য খেয়াল করলেন—কোনও শব্দই হল না। গুলিটা যে কোন দিকে গেল, কে জানে! তবু লিলিপুট পিস্তল অমন 'গালিভার' লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল দূরে। অবশ্যই, ভায়া সিলিং।

ততক্ষণে, বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে রুদ্রাক্ষ। সত্যকে হলুদ পাথরের মেঝেয় ফেলে বাঁ-হাতে টুঁটি চেপে ধরেছে। ডানহাতে ঘুষি চালাচ্ছে পর-পর। এলোপাথাড়ি হিংস্র ঘুষির ঘায়ে নাক মুখ ফেটে যাচ্ছে সত্যর। দম বন্ধ হয়ে আসছে নলি চেপে ধরার জন্যে। তবু, দু-হাতে রুদ্রাক্ষর কোমরে, পাঁজরায় ঘুষি মারছেন। নীচে পড়ে আছেন বলে, বক্সিংয়ের কায়দায় বাগে পাচ্ছেন না ওকে। এরই মধ্যে কসরত করে হাঁটুজোড়া সামান্য ভাঁজ হল। ডান হাঁটু দিয়ে একখানা গুঁতো ম্যানেজ করলেন সত্য। কাজ দিল। তলপেটে লাগার ফলে, আঁক শব্দের সঙ্গে রুদ্রাক্ষর বাঁ-হাত একটু আলগা হয়ে গেল। ব্যস! ওইটুকুই যথেষ্ট। ওজনদার চ্যাম্পিয়ান ঘুষি পড়ল রুদ্রাক্ষর চোয়ালে। উলটে ওকে চিত করে ফেললেন সত্য।

জয়দীপ এই সময়টুকু হতভম্ব হয়ে হুটোপুটি ঘুষোঘুষি দেখছিল দুজনের। এমন হয়। কথায় -কথায় হঠাৎ মারামারি লেগে গেল, তৃতীয় ব্যক্তির বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগতেই পারে। এবার জয়দীপ রায় তার চশমা ঠিক করে নিল দ্রুত হাতে। তারপর, আধা-পরা ধুতির বাকি অংশ পোঁটলা করে দু-হাতে ধরে দৌড়ে গেল ও-পাশে, দেওয়ালের দিকে। কোণে পড়ে-থাকা পিস্তলটা তুলে মল্লভূমের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। যদি সত্য কোনও ইনস্ট্রাকশন দেন? না। তেমন অবস্থা নয়। ওঁর নিকেলের নকল চশমা ছিটকে পড়ে আছে দূরে। পরনের খাটো ধুঁতি এবং নামাবলি পুরোপুরি অসাব্যস্ত। অতি মনোযোগের সঙ্গেই দুজনে ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত। দেখতে-দেখতে পট পালটাল। রুদ্রাক্ষকে কাবু করা অত সোজা নয়। লোকটার যেমন ক্ষুরধার বুদ্ধি তেমনি মোষের মতো জোরও আছে গায়ে। উলটে দিয়েছে সত্যকে ফের চিত করে। জয়দীপ ভাবল, এমন অবস্থায় এত কাছ থেকে গুলি ছোঁড়াটা কি ঠিক হবে? রুদ্রাক্ষর মৃত্যু নিশ্চিত। প্লাস, ও নিজে আরেকটা খুনের দায়ে পড়তে পারে।

ভেবেচিন্তে, ধীরে-সুস্থে অথচ যথেষ্ট শক্তিসমেত পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঘা মারল রুদ্রাক্ষর মাথায়। তার শিথিল শরীর ঠেলে পাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সত্যসাধন। হাঁফাতে-হাঁফাতে জয়দীপকে বললেন 'থ্যাঙ্ক ইউ!' তারপরে আরও একটু দম নিয়ে আবার বললেন, 'ধুতিটা খুলে ফেলুন চট করে। পরে, ট্রাউজার পরে নেবেন। আগে এই শক্তিমান ধুরন্ধরকে বেঁধে ফেলতে হবে আষ্টেপৃষ্টে। ওরই কেনা

কোরা ধুতির পাকানো রশি কাজে লাগানো যাক—আসুন—'

নির্দ্বিধায় অন্তর্বাস পরেই জয়দীপ হাত লাগাল সত্যর সঙ্গে। অচেতন রুদ্রাক্ষকে বাঁধতে-বাঁধতে সত্য বললেন, 'সাক্ষাৎ বোয়াল! সমস্ত শক্তি দিয়ে কষে বাঁধুন। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। এ-ব্যক্তির ক্ষমতা অসীম। পুলিশের প্রায় সব রকম কায়দা-কানুনই বানচাল করে এসেছে বছরের পর বছর। বলা যায় না, এত কাণ্ড করেও প্রমাণাভাবে পুলিশ হয়তো ওকে ছেড়ে দিয়ে সেলাম করতে বাধ্য হবে। ভেলকিও তো জানে প্রচুর। হয়তো দেখবেন, জাদুসম্রাট পি.সি.সরকারের মতো সকল বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ—'

শেষেরটুকু হালকা গলায় বলে, সত্যসাধন ভালো করে রুদ্রাক্ষর বাঁধন পরীক্ষা করে দেখলেন আপাদমস্তক। না। এখন, এই বোয়ালের পক্ষে ঘাই মারা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র নড়তে পারা উচিত নয়। সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়ালেন সত্য। দ্রুত পায়ে ছুটে গেলেন 'সূর্যমুখীর দেওয়ালে। মাদলের কথা মনে রেখে, ছবিটা কয়েক ইঞ্চি কাত করতেই দেওয়ালে লুকোনো দরজা খুলে গেল, মৃদু ঘড়ঘড় শব্দে। গুপ্তপথের মুখ হাঁ।

'জয়দীপবাবু। আমাকে এক্ষুনি হলঘরে ফিরে যেতে হবে—আমাদের দেরি দেখে হলের লোক কেউ এখানে এসে উপস্থিত হলে মুশকিল। তা ছাড়া, মাদল-নিবেদিতাদেবী ওখানে দুশ্চিন্তায় রয়েছে। স্মাগলার-মাফিয়া দলের এই নাম্বার-টু লোকটির বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করতে হলে এক্ষুনি যাওয়া দরকার। বামাল-সমেত গ্রেপ্তার করতে হবে।

'আমাকে কী করতে হবে বলুন! জয়ী-জাহ্নবী ওরা কোথায় কে জানে?'

বলতে-বলতে লিলিপুট পিস্তলটি সত্যর হাতে দিল। সি-আই-এর প্রোপ্রাইটর, গোয়েন্দা সত্যসাধনের জায়গায় অন্য কেউ হলে, এখানে জয়দীপকে দেখে হেসে ফেলত। সুবিশাল বিজ্ঞাপন কোম্পানি অ্যাড মার্কেটের ঊর্ধ্বতন অফিসার সুট-টাইয়ের বদলে স্রেফ একটি জাঙ্গিয়া পরে দাঁড়িয়ে। চোখে চশমা। মুখে টেনশানের ছাপ।

সত্য ওকে একবার দেখে নিলেন। সহানুভূতির গলায় বললেন, 'রিল্যাক্স মিস্টার রয়। জামা-প্যান্টটা পরে ফেলুন। এই চোরা দরজা দিয়ে, ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান। আলো-অন্ধকার পেরিয়ে আলোয় পৌঁছে আপনার ভাইবোনকে দেখতে পাবেন। ওদের এখানে, ওপরে নিয়ে আসুন। আমি হলঘরে যাচ্ছি—'

বলে, নকল গোঁফ ও নিকেলের চশমা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলেন। দ্রুত পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলেন কোণের ছোট ঘরে। আয়নার সামনে।

জয়দীপ ওঁর পিছন পিছন কাছে এসে জিগ্যেস করল, 'ওদের দুজনকে নীচে গেলেই পাব?'

নাক সত্যর আগে থেকেই ভাঙা। বক্সিং প্র্যাকটিসের শুরু থেকেই। হাড়ে ব্যথা-বেদনা-বোধও কম। আয়নায় চোখ রেখে নামাবলি দিয়ে চোয়ালের ও নাকের রক্ত মুছতে-মুছতে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

জয়দীপ জামা-প্যান্ট পরছে। বলল, 'আপনি কি গেছেন এই চোরা পথে?'

গোঁফ ও চশমা যথাস্থানে বসিয়ে নিলেন সত্য। বললেন, 'না।'

'তাহলে, এই দরজা, সিঁড়ি বা জয়ি-জাহ্নবীর কথা—আপনি জানলেন কী করে?'

ধুতির কাছা-কোঁচা দুরস্ত করে ফেলেছেন সত্য। নামাবলি গায়ে জড়িয়ে বললেন, 'আমার সহকারী মাদলের কাছে। চিরুনি আছে?'

জয়দীপ প্রথমে বুঝতে পারেনি। পেরে, প্যান্টের পকেট থেকে চিরুনি বের করে সত্যকে দিল, 'মাদল তো আর্টিস্ট। ও আপনার সহকারী হল কবে থেকে?'

চুল ঠিকঠাক করে চিরুনি ফেরত দিলেন সত্য। নামাবলির আড়ালে পিস্তলটা একবার ছুঁয়ে দেখে নিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আজ থেকে।' তারপরে অজ্ঞান রুদ্রাক্ষকে পেরিয়ে দরজার কাছে

এসে বললেন, 'যান। আপনি আর দেরি করবেন না? তাড়াতাড়ি ওদের নিয়ে ফিরে আসুন। একে বেশিক্ষণ একলা রাখা ঠিক হবে না। বোয়াল মাছের জ্ঞান ফিরতে সময় লাগবে না। এদের আমি চিনি। আর হ্যাঁ—'বলে, ঘরের চারপাশে নজর ঘোরালেন সত্য। টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিসিভারটিকে দেখিয়ে বললেন, আবার, 'বস্তুটি ভারী। তার ছিঁড়ে হাতের কাছে রাখবেন। সেন-মশাই একটুও নড়ে উঠলেই, ফের মাথায় মুগুর জোরে মেরে বেহুঁশ করে দেবেন।'

অকারণে আবার রুদ্রদাকে মারতে হবে শুনে জয়দীপ মিনমিন করল, 'আবার মারব! অমন শক্ত করে বাঁধা—'

কথা শেষ করতে দিলেন না সত্য। বেরিয়ে যেতে-যেতে প্রায় হুকুম দিলেন, 'উঁহু! একটুও নরম হয়ে, কোনও দ্বিধা নয়। যা বলছি করবেন। জ্ঞানে ফিরে এ-মানুষ যে কোন চালাকি করবে—সে বোঝার সাধ্য এ-রাজ্যের তাবড়-তাবড় বুদ্ধিমানেরও নেই—অল দ্য বেস্ট—'

সত্য বেরিয়ে যেতেই, গুপ্ত পথের সিঁড়ি বেয়ে ঘুরে-ঘুরে নামতে লাগল জয়দীপ। হাতড়ে-হাতড়ে অন্ধকার পেরিয়ে ক্ষীণ আলোর আভাস দেখা গেল নীচে। স্যাঁতসেতে গন্ধ। শব্দ নেই কোথাও। সিঁড়ির শেষে একটা লোহার গেট। ওপরের দিকটা গরাদের মতন মোটা শিক লাগানো। ওপারে ঘর। ঘরটি স্বল্প আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। টিভি-ভিসিআর, সোফাসেট। সেন্টার টেবল, জোড়া পালঙ্কে ছিমছাম। সেন্টার টেবলে দুটি খাবারের থালা। ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে আছে। খাটে শুয়ে জয়ী। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। সোফায় ঘাড় কাত করে আধ শোয়া হয়ে রয়েছে জাহ্নবী। কোলে ইংরাজি ম্যাগাজিন। ভঙ্গিটি দেখে বুকের মধ্যে ধক করে উঠল জয়দীপের। অফিস-ক্যাবিনে মিস্টার জোশীর মৃতদেহ মনে পড়ল।

লোহার দরজায় তালা ঝুলছে। দু-হাতে গরাদ চেপে ধরে উদ্বেগের গলায় জয়দীপ ডাক দিল, 'জাহ্নবী! জানু!'

কাঁপা গলায় তার সাবধানী ডাক পাতালের ঠান্ডা দেওয়ালে লেগে, ভেঙেচুরে ফিরে এল জয়দীপের কাছে আবার। গা ছমছম করে উঠল। কণ্ঠস্বর আর একটু বাড়িয়ে ফের ডাক দিল সে, 'জয়ী! জানু!'

ওদের কোনও সাড়া নেই।

এবার বেশ ভয় পেল জয়দীপ। ওরা কি বেঁচে নেই? সত্যসাধনের প্ল্যান আগে থেকেই টের পেয়ে গিয়ে শয়তান রুদ্রাক্ষ প্রতিশোধ নিল? এই ভাবনায় ভর দিয়ে তার মন-মস্তিস্কে ঢুকে পড়ল দারুণ আতঙ্ক এবং স্বজন-হারানোর শোক। কান্না ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'জয়ী—জাহ্নবী—।'

প্রায় পাগলের মতো লোহার দরজায় তালা ঝাঁকিয়ে শব্দ করতে লাগল জয়দীপ। কখন যে জাহ্নবী চোখ মেলেছে খেয়াল হয়নি। খুব ধীরে-ধীরে সে যখন সোফা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছে, তখন টের পেল জয়দীপ, যে তার বোন জীবিত। কিন্তু অমন টালমাটাল হেঁটে আসছে কেন? নেশা করেনি তো? দুবার পড়তে-পড়তে সামলে নিয়ে কোনও রকমে জড়ানো পায়ে হেঁটে এল জাহ্নবী। কাছে এসে ওপার থেকে গরাদে ভর দিয়ে ঝুঁকে দেখল দাদাকে। চোখ যেন খুলে রাখতে পারছে না। দু-একবার টানটান চোখ করে দেখেও চিনতে পারল না তাকে। গরাদের ফাঁক দিয়ে দু'হাত গলিয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল জয়দীপ, 'জানু! জানু এই দ্যাখ—আমি এসে গেছি—। কী হয়েছে তোর? ভালো করে দ্যাখ—আমি। তোর দাদা। জয়দীপ—'

ধীরে-ধীরে চিনতে পারল জাহ্নবী বহু পরিশ্রম করে ঠোঁটের কোলে হাসি ফোটাল সে। জড়ানো ক্ষীণ স্বরে বলল, 'দাদা! এসেছ! আমি তাহলে ঘুমোই!'

জয়দীপের মাথা খুব দ্রুত কাজ করছে। বোনের মুখে মদের গন্ধ নেই। তবু, রুদ্রাক্ষর লোকেরা নিশ্চয়ই কর্তার হুকুমে ওদের দুজনকে অন্য কোনও মাদক দ্রব্য বা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে

দেয়। এ কদিন কি ওরা ঘুমিয়েই কাটিয়েছে? খুব সম্ভবত, খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। বা, জোর করে! তবু, ওরা দুজন জীবিত এবং অক্ষত আছে দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দিল জয়দীপ। বোনের কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে সজাগ করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দরজাটা খুলে ওদের বাইরে আনবে কি করে? ওপরে রুদ্রাক্ষর জ্ঞান ফিরে এল না তো?

দুশ্চিন্তা, ভয়ে, খানিকটা আক্রোশেই হয়তো নিজের অজান্তে ঠাস করে এক চড় কষাল জাহ্নবীর গালে। 'এই—এই জানু। চাবি কই? এই তালাটার চাবি? চাবি কোথায় থাকে জানিস?'

আঘাতে জাহ্নবী ভুরু অল্প কোঁচকাল। চোখও একটু স্বাভাবিক মনে হল। তারপর দাদাকে আবার নতুন করে চিনে সারামুখে ফুটে উঠল অসহায় করুণ ভাব। খানিকটা অভিমানও বুঝিবা। তারপরে, হয়তো বর্তমান অবস্থার খানিকটা আন্দাজ পেয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, থেমে থেমে, 'সিঁড়ির ডান দিকে দেয়ালে, ওপরে হাতড়ে—একটা বোতাম—টিপলে কুলুঙ্গি—ওখান থেকেই তো চাবি নামিয়ে আনে—ওরা—'

ওদিকে, ঠিক তখন, মাদল দেখল এগারোটা বাজতে আর তিন-চার মিনিট বাকি। সত্যকাকু, জয়দীপদা কি করছে এতক্ষণ? রুদ্রাক্ষকে বিশ্বাস নেই। ভাবতে না ভাবতেই দেখল, সত্যকাকু সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। যদিও তাঁর চেহারা স্বাভাবিকই আছে, তবু হাঁটার ভঙ্গি বা অন্য কিছু ব্যাপারে কেমন খটকা লাগল মাদলের। ঠিক ধরতে না পারলেও ওর পাকা চোখে মনে হল কোথায় যেন একটু অন্য রকম।

হলঘর পেরিয়ে সোজা বাগানের দিকে হেঁটে চললেন সত্যসাধন। যেতে-যেতে মাদলকে বললেন, হিন্দিতে, 'হেই ছোকরা! হামারা পেছন পেছনমে আও। থোড়া দূর্বাঘাস মাংতা—'

পাঁচ-ছ'জন যারা হলঘরে বসে বা দাঁড়িয়েছিল হুকুমের অপেক্ষায়, তারা বিশেষ গ্রাহ্য করল না বুড়ো পুরুত বা ছোকরাকে। ওরা দুজনে যেই হল পেরিয়ে বাগানে পা রাখতে যাবে ঠিক তক্ষুনি হঠাৎ আরম্ভ হল আওয়াজটা। বিপ-বিপ-বিপ। চমকে ফিরে তাকাল ওরা। মাদলের চোখ পড়ল দেওয়াল ঘড়িতে। এগারোটা। এবং মাদল অবাক হয়ে লক্ষ করল, ঘড়ির ডায়াল আগে সাদা ছিল, এখন ফ্রেমের ভেতর লাল আলো পড়ে পুরো ডায়ালটিকে একচক্ষু শয়তানের মতো দেখাচ্ছে। এ নিশ্চয় পাহাড়ের গায়ের পাথুরে দেওয়াল সরে যাওয়ার সংকেত। খাঁড়িপথের গেট খুলে যাওয়ার ইঙ্গিত মাদল হিসেব মিলিয়ে স্থির করল, এগারোটা বাজে, মানেই ওই মালবাহী ধাউ এসে গেছে। অপেক্ষমাণ পাঁচ-ছ'টি লোক ততক্ষণে ছুটতে আরম্ভ করেছে। লাল কুশনের পাশ দিয়ে প্যাসেজে ঢুকে পড়ছে ওরা, অবশ্যই ওরা নীচে নেমে যাচ্ছে যন্ত্রচালিতের মতো। কোনও উত্তেজনা নয়। বিশৃঙ্খল চেঁচামেচিও নয়। মাদলের মনে হল, এরা সবাই এই নিয়মে অভ্যস্ত। ধাউ এসেছে। মাল তুলতে হবে।

সত্যও বোধহয় আন্দাজ করেছেন ব্যাপারটা! কারণ, সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লেন বাগানে। দ্রুত গলায় মাদলকে বললেন, 'রিভলবার হাতে নিয়ে রেডি থাকো—'

উত্তেজনায় হাত কাঁপছে মাদলের। কারণ, সে বুঝতে পারছে অ্যাকশান শুরু হয়ে গেছে। খলবলিয়ে গামছার পুঁটুলি থেকে রিভলবার হাতে নিল সে। গামছাটা পড়েই গেল কাঁপা হাত থেকে। তা যাক।

জেজে তার সঙ্গী দুজনকে নিয়ে ছুটে আসছিল। ছোট এবং মাঝারি ক্যানা গাছগুলো ডিঙিয়ে, লাল মোরামের রাস্তায় একেবারে মুখোমুখি। ওরা তিনজন। এরা দুজন। ওদের হাত খালি। এদের হাতে উদ্যত পিস্তল, রিভলবার।

পরিষ্কার হিন্দি উচ্চারণে গম্ভীর গলায় সত্য বললেন, 'মুখে টুঁ শব্দটি নয়। গলা খাঁকারির

শব্দ করলেও কিন্তু নলি এ-ফোঁড়-ও-ফোঁড় হয়ে যাবে।। হাত তুলে দাঁড়াও।'

তিনজনেরই ভূত দেখার চোখ তখন। গলা টিপে ধরলে যেমন ফ্যাঁসফেঁসে অস্ফুট আওয়াজ বেরোয় তেমনি গলায় জেজে বলতে যাচ্ছিল 'প-পূজারিজি—'

'একদম চুপ!' চাপা গলায় ধমক দিলেন সত্য। তারপর বললেন, 'গেটের দিকে চলো চুপচাপ।'

তিনজনেই গুটি-গুটি মেইন গেটের দিকে পা বাড়িয়েছিল, সত্য চ্যালা দুটিকে বললেন, 'উঁহু। তোমরা এখানেই থাকো। পিছন ফিরে দাঁড়াও। মাথার ওপর থেকে হাত নামাবে না। মাদল, এ দুটোর কেউ একটুও আওয়াজ করলে বা নড়লে সঙ্গে-সঙ্গে ঠান্ডা করে, শুইয়ে দিও।'

মাদল ঘাড় নেড়ে, দুহাতে রিভলবার বাগিয়ে ধরে থাকল। ওরা দুজন শান্ত মোষের মতো সত্যর আদেশ পালন করতে ঘুরে দাঁড়াল।

জেজেকে আগে-আগে রেখে সত্য চললেন সিংহ দরজার দিকে। মাদলের উত্তেজনা একটু কমে গিয়ে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। ও এখন একা। হাতে রিভলবার থাকলেও জীবনে সে কখনও গুলি ছোঁড়েনি। ছবি-আঁকার পেনসিল-তুলি-ধরা হাতে পিস্তল খুব একটা স্থির নয়। তার ওপরে, পিছন ফিরে হাত-ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলেও এক জোড়া পাষণ্ড যমের মতো মোষের পাহারা দেওয়াতে যতটা কলজের জোর লাগে, ততটা মাদলের নেই। অন্তত এই মুহূর্তে। তবু, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই—এরা এখন কিছুই করতে পারবে না।'—ভাবনা মনে আনার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ আকাশের কথা ভাবল মাদল। ওপরে তাকালে এখন ক'টা তারা দেখা যাবে, শুনতে ইচ্ছা করল তার। আজ কি চাঁদ আছে আকাশে? নাঃ। ওপরে চোখ তুলে দেখতে যাওয়া 'রিস্কি' হতে পারে। মোষ দুটো হঠাৎ ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওর ওপর। তাই সে আশেপাশে খুটখাট নজর ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। মোরামের পথে এবং বাগানের নানান অংশে নীচু ল্যাম্প-পোস্ট বসানো। তাতে মাথা-ঢাকা বাতি। অল্প দূরে, বাঁদিকের ক্যানা ঝোপে বসেই বোধহয় একলা একটা ঝিঁঝি নাগাড়ে ডেকে চলেছে। হঠাৎ, মাদল টের পেল তার ডানদিকের কপালে মশা কামড়াচ্ছে। চটি-পরা পায়ের গোড়ালিতেও। উফ, চুলকোচ্ছে। জ্বালা করছে। ওদের মারবার বা হাত দিয়ে তাড়াবার উপায় নেই। তাই মাদল বসু খুব মন দিয়ে মহাভারতের কথা চিন্তা করতে লাগল। কোন বীরপুরুষ যেন তাঁর গুরুদেবের ঘুম ভাঙাবে না বলে, ভয়ঙ্কর বিছের কামড় চুপচাপ সহ্য করেছিলেন! দম বন্ধ করে নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিছু! অর্জুন? না কর্ণ? মোষের মতো লোক দুটোর দিকে রিভলবারের নল স্থির রেখে, দম বন্ধ করে মশার কামড় ভুলতে চেষ্টা করল মাদল।...

জেজে বন্ধ মেইন-গেটের কাছে পৌঁছোতে, পেছন থেকে সত্য বললেন, চাপা গলায়, 'তোমার ওই বাইরের থুম্বোমুখো দুটোকে গেট খুলে দিতে বলো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে জেজে বলল, 'কিন্তু ওরা তো এভাবে খুলবে না। ইন্টারকমে অর্ডার পেলে, তবেই খুলবে।'

'উহুঁ! এদিকে নয়। সামনে তাকাও। এবং যা বলছি, তাই করো। ফালতু কথা বললেই গুলি ছুঁড়ব। তোমার গলা শুনে, ওরা যাতে খুলে দেয়, তেমনি আদেশ দেওয়ার গলায় বলো। জোরে—' বলে, জেজের পিঠে লিলিপুটের নলটা চেপে ধরে, মৃদু চাপ দিলেন সত্য।

সঙ্গে-সঙ্গে কাজ হল।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল জেজে, 'রেশম বাহাদুর! গ-গেট খোল দো।—'

বন্ধ গেটের ওপার থেকে আওয়াজ এল, 'কউন? জেজে সাহাব?'

জেজে চুপ করে আছে। সত্য লিলি-নলের খোঁচা দিতেই ফের আর্তস্বর বেরুল, 'হাঁ-হাঁ-

'বড়া, কি, ছোটা?'

সত্য প্রম্পট করলেন ফিসফিস করে, জেজের কানের কাছে, 'বড়া গেট।'

আরেক খোঁচার সঙ্গে-সঙ্গে তার ভাঙা গলা থেকে শব্দ ছিটকে বেরুল, 'ব-বড়া গেট।'

ঘড়ঘড় যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে সিংহ-দরজা খুলতে লাগল। সত্যর নির্দেশে তোতাপাখির মতো জেজে প্রহরী দুজনকে বলল, 'তোমরা গুমটি থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়াও।'

ওরা দুজনে অবাক চোখে জেজে-সাব ও পূজারিজিকে দেখল। গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে। যেন, কত ভাব দুজনের। আসলে, জেজের পিঠে গাঁথা সত্যর লিলিপুট, প্রহরীরা দেখতে পাচ্ছে না। পরস্পরকে বোকা-চোখের চাউনি দিয়ে গুমটি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সত্যর আরেক খোঁচায় জেজে চেঁচাল, 'যাও।'

পেছন ফিরে তাকাতে-তাকাতে ওরা রাস্তার ওপারে পৌঁছে গেল। এক লাফে ডানদিকের গুমটিতে ঢুকে স্টেনগানটা তুলে নিলেন সত্য। এর পরের তিনটে ঘটনা প্রায় একই সঙ্গে ঘটল। মালাবার হিলের নীচের দিক থেকে সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল। সত্য বুঝলেন, পুলিশের গাড়ি আসছে। ভয় পেয়ে চড়াইয়ের দিকে ছুট দিল একজন প্রহরী। সুযোগ পেয়ে জেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল সত্যর ওপরে। সব্যসাচীর মতো দু-হাতে কাজ করতে লাগলেন সত্য। ছুটন্ত প্রহরীর পা লক্ষ করে নিঃশব্দে গুলি ছুঁড়লেন ডান হাতে। বাঁ-হাতে স্টেনগানের শক্ত বাঁট দিয়ে ঘা মারলেন জেজের মাথায়।

গুলি খেয়ে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রহরীটি। অন্যজনকে আদেশ দিলেন সত্য, 'শিগগির ভিতরে চলে এসো। জলদি!'

লোকটা ধরা-পড়া চোরের মতো ভয়ে-ভয়ে গেটের কাছে আসতেই, গলা তুলে বাংলায় চেঁচিয়ে উঠল সত্যসাধন, মাদল। পিছিয়ে এসে পড়ো এখানে—শিগগির—'

কাত হয়ে নেতিয়ে-পড়া জেজে মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পারছে না। চোখের অন্ধকার, মগজের মধ্যে ভোঁ-শব্দের ঘোর কাটাতে সময় লাগছে।

মাদল কাছে আসতে বাঁ-দিকের গুমটি থেকে দ্বিতীয় স্টেনগানটা ওকে তুলে নিতে বললেন সত্য। আরও নির্দেশ দিলেন, 'পুলিশের ভ্যান এসে পড়ল বলে। তুমি ততক্ষণ এই প্রহরীদের আর ওই ষন্ডা দুটোকে সামলাও। আমি নীচে সুড়ঙ্গে চললুম—'

বলে, স্টেনগানের এক খোঁচা দিলেন জেজেকে,—'কি হে। তুমি মানে-মানে পথ দেখাবে, না, আমি ট্রিগারটা টিপব?'

শুনে, টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল জেজে।

ওর পিঠে স্টেনগান ঠেকিয়ে হলঘরে এলেন সত্য। ভারী বিচিত্র দেখতে লাগছে তাঁকে। খাটো করে পরা ধুতি। গয়ে নামাবলি। হাতে স্টেনগান। চোয়ালটা সামান্য ফোলা-ফোলা।

হলঘরে কোনও লোক নেই। একা নিবেদিতা দাঁড়িয়ে রয়েছে টেবিলের কাছে। দেওয়াল-ঘড়ির লাল আলোটা জ্বলছে-নিভছে। সত্যকে দেখে নিবেদিতা উদ্বেগের গলায় জিগ্যেস করলে, 'দাদা কোথায়? জয়দীপ! ভালো আছে তো?'

'হুঁ। কিন্তু আপনার সঙ্গিনী তিনজন কোথায় গেল?'

'গোলমাল দেখে ওরা আমাকে ফেলে, ওই লাল-কুশনের পাশ দিয়ে কোথায় সরে গেল।'

সত্য বললেন, 'গোটা দালান চারপাশ থেকে পুলিশে ঘিরে ফেলছে এক্ষুনি। কেউ পালাতে পারবে না। আপনি বরং এই পিস্তলটা রাখুন। কাউকে দেখলেই আটকে রাখবেন—' বলে, বাঁ-হাতে ওটা এগিয়ে ধরলেন সত্য।

দু-পা পিছিয়ে গেল, নিবেদিতা, 'না-না। এসব আমাকে দেবেন না। প্লিজ। আমাকে বরং আপনি বলে দিন দাদা বা জয়দীপ কোথায়? ওখানেই যাই বরং।'

একটুক্ষণ নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন সত্যসাধন। একেবারে কনে বউয়ের মতো সাজানো হয়েছে ওকে। শুধু মুকুটটাই যা বাকি। শুকনো মুখে একটা আলগা ক্লান্তির ছাপ। ওকে দেখতে-দেখতে শ্বাস ফেলার সময়টুকু মন বিষণ্ণ হয়ে গেল সত্যর। এক কালের ভালোবাসার জনের

সঙ্গে নকল বিয়ের সাজগোজ। বেচারি!

পারিপার্শ্ব ভুলে, সহানুভূতির গলায় সত্য বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। সবই ঠিক আছে। আমাদের অপারেশান অলমোস্ট সাকসেসফুল মনে হচ্ছে। আপনার সাহায্য ছাড়া হত না। সরি, অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য ট্রাবল।'

তারপর, বুঝিয়ে দিলেন, 'হলুদ কুশনের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হলুদ ঘরে চলে যান। দেখবেন, দাদার প্রতি করুণা উথলে গিয়ে তার বাঁধন-টাঁধন আলগা করে দেবেন না যেন। তাহলে, কিন্তু আমাদের এত রিস্কি অপারেশানটা মাঠে মারা যাবে। তা ছাড়া, আইনের চোখে আপনাকে অপরাধী করা হবে।—'

বলে, জেজেকে খোঁচা দিলেন নল দিয়ে। 'চালাও পানসি বেলঘরিয়া! গুষ্ঠিসুদ্ধ বামাল-সমেত ধরব আজ।'

জেজে হাঁটতে আরম্ভ করে, ক্ষীণ গলায় জানাল, 'তা পারবেন না, স্যার। ওরা সবাই এতক্ষণে ধাউতে চেপে পগার পার।'

সত্য বাঁহাতে টর্চটা নিয়ে নিয়েছে। লিলিপুট গুঁজেছেন কোমরে। মাদল বলেছিল। সুড়ঙ্গ বেশ অন্ধকার। সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতে উনি হাসলেন, 'মেশিনগান, স্টেনগান, রাইফেল, কাঁদুনে গ্যাসসমেত, নিদেন চল্লিশজন সেপাই-দারোগা নিয়ে জল-পুলিশের চারটে স্পিডবোট তোমাদের ওই নীচের গুপ্ত-খাঁড়ি-পথ ঘিরে ফেলেছে এতক্ষণে।'

'ও মাই গড! এত খবর পেলেন কোথায়!' বলতে-বলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে জেজে। আবার বলল, 'তবে বসকে ধরতেই পারবেন না, স্যার। উনি গোলমালের গন্ধ পেয়ে আগেই সরে পড়েছেন হয়তো—'

জবাবে সত্য বললেন, 'তোমার বস অজ্ঞান এবং বন্দি অবস্থায় হলুদ ঘরে রয়েছে। তুমি চলো দেখি।'

'ও—নোহ!' মাথায় হাত দিয়ে সিঁড়িতেই বসে পড়ল জেজে। সত্য ওর ঘাড়ে নল ঠেকিয়ে বললেন, 'উঁহুঁ! কোনওরকম বেচাল, বেয়াদপি নয়, বাছা। আবার বাঁটের বাড়ি মারব। ওঠ—'

অতি কষ্টে দোমড়ানো শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল জেজে। সত্য রেগে যাচ্ছেন। সময় খাচ্ছে লোকটা। দাঁতে-দাঁত চেপে সত্য বললেন, 'সুড়ঙ্গের অন্ধকারে সুযোগ নিতে যদি একটুও এদিক-ওদিক করো তো, পিঠটা ঝাঁঝরা করে দেব। চলো—জলদি' বলে টর্চের আলো ফেললেন সিঁড়িতে।

দেওয়াল ধরে-ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল জেজে। পিছনে সত্যসাধন।

হলুদ ঘরে ঢুকে দাদার অবস্থা চোখে পড়তেই কষ্ট হল নিবেদিতার। যতই যাই হোক, মানুষটা তার একমাত্র দাদা। চোখ খোলা। গোঁ-গোঁ শব্দ করছিল। নিবেদিতাকে দেখে শব্দটা বেড়ে গেল—কিছু বলতে চায় যেন।

জয়দীপের দিকে একবার তাকিয়ে নিবেদিতা এগিয়ে যাচ্ছিল দাদার কাছে। জয়দীপ ইশারায় বারণ করল ওকে। নিবেদিতার থমকে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'যথেষ্টই শক্ত-অকরুণ হাতে বাঁধা হয়েছে। শুধু মুখের কাপড়টুকু সরিয়ে দিচ্ছি। পালাতে তো পারবে না! কিছু বলতে চায় মনে হচ্ছে—'

বলতে-বলতে এগিয়ে গেল সে। দাদার মাথার কাছে উবু হয়ে বসল। জয়দীপও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'সত্যসাধনবাবু মানা করে গেছেন কিন্তু—'

অনেক জোর লাগিয়ে প্রায় খামচে মুখের কাপড়টুকু নীচে নামিয়ে দিল নিবেদিতা। সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণায় কাতরে উঠল রুদ্রাক্ষ। 'নিবে। মরে গেলাম ব্যথায়।—'

বোন ঝুঁকে পড়ল মুখের কাছে, অসহায় গলায় বলল, 'কোথায় ব্যথা রে, দাদা? কীসের ব্যথা?'

বাঁধা অবস্থাতেই ছটফট করছে রুদ্রাক্ষ।

'বুকে। হার্টের ব্যাথাটা। গেল বছর মাইল্ড একটা অ্যাটাকও হয়ে গেছে—'

একটু দম নিয়ে অনুনয় করল তারপর, 'একটু জল খাব, নিবে। হাতটা —হাতটা খুলে দে, প্লিজ—'

জয়দীপ সঙ্গে-সঙ্গে বাধা দিল, কড়া গলায়, 'না। একদম নয়। জল চান তো হাঁ করুন। খাইয়ে দেওয়া হবে।'

নিবেদিতা হাত গুটিয়ে দাদার দিক থেকে চোখ সরাল। তখনই চোখে পড়ল তার। দূরে দুটি সোফায় বালক জয়ী হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। পাশের সোফায় জাহ্নবীরও একই অবস্থা প্রায়। আধশোয়া, ঘাড় হেলানো, চোখ বোজা।

জয়দীপকে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল নিবেদিতা, 'তোমার ভাইবোন, না? কি হয়েছে, ওদের?'

জবাব দিল রুদ্রাক্ষ, ব্যাথার গলায়, 'আমারই অপরাধ নিবে। ওদের প্রায় সারাক্ষণ খাবার, চা বা দুধের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছে। নইলে, গোলমাল। তবে—'

যন্ত্রণায় মুখ কুঁকড়ে গেল রুদ্রাক্ষর, জয়দীপকে বলল, 'তবে বিশ্বাস করো, ওদের কোনও ক্ষতি করা হয়নি। স্পর্শও করেনি কেউ—। একটু—জল—'

নিবেদিতার রাগ হচ্ছিল। দুঃখও। দাদার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। জিগ্যেস করল জয়দীপকে, 'জল কোথায়?'

জবাব দিল রুদ্রাক্ষ, 'ওই আয়নার ঘরে ফ্লাস্কে। গেলাসও আছে।'

নিবেদিতা জল আনতে গেল। যন্ত্রণাকাতর গলায় রুদ্রাক্ষ বলল, 'ভাই জয়। টেবিলের বাঁদিকে ড্রয়ারে হার্টের ওষুধ আছে। একটা দেবে? প্লিজ—আহ—'

জয়দীপ সেই ছোটবেলার দিল্লির কয়েকটি দৃশ্য মনে-মনে দেখতে পেল হঠাৎ। রুদ্রদা ওদের দুজনকে গাড়ি করে পৌঁছে দিচ্ছে—টেনিস র‍্যাকেট উপহার দিচ্ছে—লম্বা-লম্বা পা ফেলে নিজামুদ্দিনের রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে রুদ্রদা—।

টেবিলের ড্রয়ার টেনে ছোট সাদা কৌটো বের করে আনল জয়দীপ। ততক্ষণে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে এসেছে নিবেদিতা। এক ঢোঁক জলের সঙ্গে একটা সাদা ট্যাবলেট ওঁকে খাইয়ে দিল দুজনে মিলে। আরামের শ্বাস ছাড়ল রুদ্রাক্ষ। ম্লান হাসল সে। বলল, সত্যসাধনের আগের রেকর্ড যা পড়েছি, তাতে জানি, ও কাঁচা কাজ করে না। নিশ্চয়ই খুব পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেই তবে এসেছে।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল জয়দীপ, 'পুলিশ আর জল-পুলিশ এগারোটার মধ্যেই বাড়ি ঘিরে ফেলেছে—আপনাদের খাঁড়িপথও—'

'বাহ! চমৎকার'। বলে, আবার হাসল রুদ্রাক্ষ। বলল, 'আর আমার অপরাধের সীমা তো নেই। ফলে, তোমরা আমার বাঁধন কোনও মতেই এখন খুলবে না। আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারলে বা যাবজ্জীবন পাঠাতে পারলে তোমাদের সত্যবাবু হয়তো পদ্মশ্রীও পেয়ে যেত। কিন্তু, পুলিশ তথা, আমাদের এ-দেশের করাপ্ট আইনের হাতে আমি কোনও শাস্তিই নিতে রাজি নই।—'

ওর মুখে-চোখে যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন নেই আর। তবে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে জড়িয়ে আসছে।

নিবেদিতা ও জয়দীপ দু-পাশে বসে আছে। জয়দীপ বলল, 'কিন্তু, কোনও উপায় নেই রুদ্রদা। এবার পালানো আপনার পক্ষে মুশকিল। ইন্সপেক্টার সাঠে এসে পড়লেন বলে—'

চোখ উজ্জ্বল হল রুদ্রাক্ষর। মুখে হাসি টেনে বলল, 'জানো ভায়া। ওই পুলিশের হাতকড়া আমাকে মানায় না। সেই জন্যেই বড়িটার দরকার ছিল। হার্ট আমার পোক্তই আছে। চেয়ে দ্যাখো

মুখে কোনও ঘাম নেই। ওটা আসলে সবচেয়ে কড়া ঘুমের ওষুধ ছিল—যে ঘুম ভাঙে না—'

আরও অস্পষ্ট, অস্ফুট জড়িয়ে-জড়িয়ে কথা বলছে, 'চলি রে, নিবে! আমার কোনও খেদ নেই। আই ওয়ান্টেড টু লিভ ডেঞ্জারাসলি—অ্যান্ড—আই লিভ্‌ড ইট —। যার জন্যে এত কাণ্ড করলুম তোদের সঙ্গে—সেই— ডায়মন্ডহারবারের বাড়িটা আমার আর কাজে লাগল না।— তুই ভোগ করিস। আর হ্যাঁ, যদি আদৌ সত্যি সত্যিই বিয়ে করিস কখনও—ওই নেকলেসটাই পরবি কিন্তু—আমার গিফট—'

চোখ ছোট হয়ে বুজে এল প্রায়। বিড়বিড় করে আরও কি সব বলার চেষ্টা করল মানুষটা—শোনা গেল না। ধীরে-ধীরে মাথাটা কাত হয়ে ঝুলে পড়ল রুদ্রাক্ষর।

জয়দীপ বোকার মতো চেয়ে থাকল। নিবেদিতাকে দেখল একবার। হয়তো চোখের ভুল, মনে হল, নিবুর চোখ্ জলে ভরে গেছে।

॥ সতেরো ॥

'স্যার, জয়দীপ রয় হ্যাজ বিন মার্ডারড!'

'রিপিট?'

'ইয়েস, স্যার—জয়দীপ রায়—খুন হয়েছেন!'

দু-হাতে রিসিভার ধরেও কাঁপছে। ভয়ে, কান্না দলা পাকিয়ে যাচ্ছে গলার কাছে। ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না জুলি সালডানা। রিসেপশানের টেলিফোন-বোর্ড থেকে ডায়াল করেছে জুলি। ওপার থেকে ইন্সপেক্টর সাঠের গলা, 'কোথায় মার্ডারটা হল? ঠিক কখন?'

রুমাল দিয়ে নাক মুছতে গিয়ে, রিসিভার ফস্কে গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে জবাব দিল জুলি, 'ওঁর ক্যাবিনে। টাইম ঠিক—' ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল জয়দীপের সেক্রেটারি।

'আহ্-হা! মোটামুটি কখন?'

ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোম্পানির অ্যাসিটেন্ট ডাইরেক্টর মিস্টার হরবিলাস চওধরি, জোশীর সেক্রেটারি মীরা লাখানি এবং ফ্রি-লান্স আর্টিস্ট মাদল বসু। জুলি একটু সামলে নিয়ে জবাব দিল, 'মিস্টার রয় আজ এসেছেন দুটো নাগাদ। আমি লাঞ্চ সেরে আসার একটু পরে। তারপর আর ক্যাবিন থেকে বোরোননি। আধঘণ্টা আগে চা চাইলেন—দিলাম। এইমাত্র আমি একটা কোটেশানের চিঠি সই করাতে ঢুকে দেখি—স্যার—স্যার টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন।'

'ওকে। আমি এক্ষুনি আসছি। দশ মিনিটে। কাউকে ডেডবডি টাচ করতে দেবে না। রায়ের ক্যাবিনে যেন কেউ না ঢোকে! বুঝেছ, মিস সালডানা? কেউ নয়।—আর, অফিসের বাইরে যেন কেউ না যায়!'

'ইয়েস স্যার!'

রিসিভার নামিয়ে রেখে জুলি সকলের দিকে দেখল। চোখ মুছে, রুমালে নাক ঝাড়ল। মিস্টার চওধরিই এখন, এই মুহূর্তে অন্তত, সবচেয়ে সিনিয়ার। তাকে উদ্দেশ করে এবং সবাইকে শুনিয়ে জুলি বলল, 'ইন্সপেক্টর সাঠে দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বেন। কেউ যেন অফিসের বাইরে না যায়! কাউকে স্যারের ক্যাবিনে ঢুকতে মানা করেছেন।—'

চওধরি সঙ্গে-সঙ্গে ডাক দিল, 'দত্তরাম!'

এখন বেলা সাড়ে-তিনটে। পুরোদমে আপিস টাইম। প্রায় পঞ্চাশজন অফিস-কর্মীর সকলেই কাছেপিঠে উপস্থিত। জয়দীপের ঘরের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোটো-খাটো জটলা। সকলেই কৌতূহলবশে একবার উঁকি মেরে ডেডবডি দেখে নিয়েছে। দু-দুটো খুন নিয়ে তুমুল তর্ক, আলোচনা।

দত্তারাম একটি জটলার মধ্যে থেকে সাড়া দিল, 'জি সাব? আয়া।' বলে, রিসেপশান কাউন্টারে দ্রুত পায়ে পৌঁছে গেল।

চওধরি বলল, 'তোমার সায়েবের ক্যাবিনের সামনে টুল নিয়ে বোসো। দরজা টেনে বন্ধ করে দাও। কাউকে ঢুকতে দেবে না।'

'জি সাব—' বলে, নির্দেশ পালন করতে ছুটল দত্তা।

মাদল বলল, 'মিস সালডানা! আমাকে একটা ফোন করতে হবে।'

জুলি সরে জায়গা করে দিল ওকে। চওধরি জিগ্যেস করলেন, 'কাকে?'

'স্যার, "সি আই-এ"তে সত্যসাধন করকে!'

'খুবই প্রয়োজন কি? পুলিশ তো আসছেই!'

'স্যার! জয়দীপ রায় ওঁর ক্লায়েন্ট। খবরটা ওঁর জানা দরকার—'

সত্যসাধনের চেহারা ও কথা বলার ভঙ্গি মনে করে চওধরি আর ঘাঁটাল না।

নম্বর লাগিয়ে মাদল বলল, সত্যকাকু, অ্যাডমার্কেটে একবার আসুন। জয়দীপদা খুন হয়েছেন।'

'এক্ষুনি আসছি।' লাইন কেটে দিলেন সত্যসাধন।

জুলি যখন আর্তনাদ করে ওঠে তখন সবচেয়ে কাছে মানে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল দত্তারাম। ভেতরে ঢুকে দেখল, সায়েবের বাঁ-হাত টেবিলে ছড়ানো, ডানহাতে ধরা চায়ের কাপ, মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন প্লেটের ওপরে। চা ছড়িয়ে রয়েছে টেবিলময়। জুলির হাতে টাইপ করা কাগজ থরথর করে কাঁপছে। কোনওরকমে টলতে-টলতে বেরিয়ে এসেছে জুলি। পিছনে দত্তারাম। ততক্ষণে ভিড় জমে গিয়েছিল দরজায়। নানান কথার মৃদু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে সারা অফিসে।

সত্যকাকুকে টেলিফোন করে, ধীরে-সুস্থে রিসেপশান থেকে সরে এল মাদল। বাথরুমের দিকে হাঁটতে লাগল সবার অলক্ষ্যে। দ্বিতীয় হলের কিউবিকলগুলো পেরিয়ে পরলোকগত মিস্টার জোশীর ক্যাবিনের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়াল। এদিকটায় জটলা নেই। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। কিছু না। কোনও আওয়াজ আসছে না। চারপাশে তাকিয়ে দরজা ঠেলে সুড়ুত করে ঢুকে পড়ল সে। একটু বাদে বেরিয়ে সোজা লিফটের কাছে, রিসেপশানের সামনে সোফায় গিয়ে বসল। সত্যকাকু কখন আসবেন?

মাদল আজ চলে এসেছে সকাল-সকাল। অনেকদিন আসা হয়নি। ঘুম থেকে উঠেই সত্যকাকুর ঘরে চলে গেছে সোজা, 'কেমন আছেন?'

চা খেতে-খেতে খবরের কাগজ দেখছিলেন। হেসে বললেন, 'এসো। ভালোই আছি।'

'কাল রাতে আপনার জ্বর এসেছিল। চোয়ালের ব্যথা এখন কমেছে?'

সত্যকাকু এড়িয়ে গেছেন, 'হ্যাঁরে বাবা, জ্যাঠামশাই। সব ঠিক আছে। ও-হ্যাঁ, সাঠে কাল বলছিল, পুলিশের তরফ থেকে তোমাকে একটা সার্টিফিকেট পাইয়ে দেবে। সঙ্গে কিছু টোকেন নগদ পুরস্কার।—কী খাওয়াবে, বলো?'

'কেন, আপনার ফেবারিট মধু-মিষ্টান্নর গরমাগরম জিলিপি!'

'ভেরি গুড।' বলে, শব্দ করে হেসে উঠেছিল সত্যকাকু। ওঁর চোয়ালের ফোলা-ভাব কিছুটা কমেছে। তবে, ডানচোখের নীচে ফাটা দাগটা পুরোপুরি শুকোয়নি এখনও। যদিও, রাতে শোওয়ার আগে যত্ন করে মলম লাগিয়ে দিয়েছিল মাদল। ওই দিকে চেয়ে মাদল বলল, 'মুখে খুব ব্যথা আছে, তাই না?'

নিজের ব্যথা-বেদনা প্রসঙ্গে মানুষটা বড় উদাসীন। আবার এড়িয়ে গেলেন। 'রুদ্রাক্ষকে ধরতে পারলুম না। এইভাবে পালিয়ে গেল হে। অমন ব্রিলিয়ান্ট মানুষ। ইশ!' বলে, মাদলকে দেখে আবার বললেন, 'তোমাকেও পাঠানো উচিত ছিল হলুদ ঘরে। ওর "হার্ট-অ্যাটাকে"র অভিনয়টা তুমি হয়তো বুঝতে পারতে। আমারই ভুল—' অসহায় হাত নেড়ে খবরের কাগজে মন দিলেন।

মাদল বলল, 'সখাকে ব্রেকফাস্ট দিতে বলছি।'

'তুমি স্নান করে নিয়েছ?'

'না। এই যাব—'

মাদলের দিকে তাকিয়ে সত্যকাকু বললেন, 'আর কী! এবার দাড়িটাও কামিয়ে ফেলো।'

গালে হাত বুলিয়ে মাদল মুচকি হাসল, 'কেমন মায়া পড়ে গেছে, কাকু!'

হাসতে-হাসতে সত্যকাকু বললেন, 'দ্যাখো বাপু! তোমার দাড়ি—রাখবে কি কামাবে—তোমার মর্জি। তবে, এটা ঠিক—আর্টিস্ট হিসেবে দাড়ি মানিয়ে যায়। কিন্তু যদ্দুর মনে পড়ছে, প্রফেশনাল অভিনেতা বা নাম-করা গোয়েন্দাদের দাড়ি ছিল না। নেই।'

মাদল ভেবে দেখল, সত্যিই তো! রবার্ট ব্লেক, শার্লক হোমস থেকে ফেলুদা বা সত্যকাকু কারুরই দাড়ি নেই। ওদিকে দেবানন্দ, দিলীপকুমার, অমিতাভ বচ্চনের কিংবা উত্তমকুমার—সৌমিত্র উঁহু। নো দাড়ি! নাসিরুদ্দিন শাহকেও দাড়ি কামিয়ে ফেলতে হয়েছে।

'কারণ কী, সত্যকাকু?'

'প্রয়োজন-মাফিক নকল দাড়ি বা গোঁফ লাগিয়ে যখন তখন চেহারা পালটে ফেলা যায়—তাই!'

বাথরুমে ঢুকে, আয়নার সামনে দু-তিনমিনিট সময় নিল মাদল। আঙুল দিয়ে 'বিলি' কাটল দাড়িতে। মুচড়ে-মুচড়ে আদর করল। তারপর নির্দয়, নির্মম হাতে কামিয়ে ফেলল। সান্ত্বনা দিল নিজেকে, শুধু অভিনেতা-গোয়েন্দা কেন, অনেক বড়-বড় শিল্পীদেরও দাড়ি নেই। গোগ্যাঁ, পিকাসো, নন্দলাল বোস।

'অ্যাড-মার্কেটে' এসে পড়েছে মাদল সকাল এগারোটার আগেই। জয়দীপদা তখনও আসেননি। সোজা আর্ট ডিপার্টমেন্টে চলে গিয়েছিল মাদল। এর-ওর-তার টেবিলে ঘুরে-ঘুরে, আড্ডা মেরে চা খেয়ে সময় কাটিয়েছে।

স্টুডিয়ো ম্যানেজার রমনিকভাই ফলাও করে জোশী-হত্যার বিবরণ দিয়েছেন। ফিসফিসিয়ে এও জানিয়েছেন, তাঁর সন্দেহ দুজনকে নয়, তিনজনকে।

'কে কে বলুন তো?' চায়ে চুমুক দিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছে মাদল।

'রায়, চওধরি আরও অই ঢলানি মাদি মীরা লাখানি!'

আপিসের অনেকেই জানে, এই প্রৌঢ় গুজরাতি ভদ্রলোক নিরীহ প্রকৃতির। তবে, বছরখানেক আগে জোশীর সেক্রেটারি মিস লাখানির সঙ্গে একটু ঢলাঢলির চেষ্টা দিতে গিয়ে যথেষ্টই ল্যাজেগোবরে হয়েছিলেন। সেই থেকে মহিলার ওপর ভয়ঙ্কর খার। যে কোনও রকমে গোলমালের দায়িত্ব রমনিকভাই মীরার ঘাড়ে চাপাতে পারলেই খুশি।

খুব সিরিয়াস গলায় মাদল খুঁচিয়েছে, 'ওঁর মোটিভ এ-ক্ষেত্রে কী হতে পারে বলুন তো?'

রমনিকভাই অবাক, 'সে কী, মাধো! চওধরি তো ওর নাগর। জোশী সরে গেলে ছেনালি করে প্রমোশনের রাস্তা তো অল ক্লিয়ার—'

'পুলিশ কিন্তু এ-ব্যাপারটা জানে না। আপনি বলেছেন তো?'

সঙ্গে-সঙ্গে চুপসে গেছেন রমনিকভাই, 'না-না! পুলিশকে আবার বলতে যাব কেন! আমি তো সেদিন ছিলুমই না। তা ছাড়া, জানোই তো, বাঘে ছুঁলে আঠারো, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।'

মাদল হাসি চেপে উঠে অন্য টেবিলের দিকে রওনা দিতেই, রমনিকভাই পিছু ডেকেছিলেন। গলা নামিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি আবার কাউকে যেন বলতে যেয়ো না, হে—'

সেই সকাল থেকে ঘুরে-ঘুরে সময় কাটিয়েছে মাদল। সত্যকাকুকে টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে আবার উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা।

শকুন্তলা ম্যাডামও বম্বেতে আছে। বেশ দামি ফুরফুরে গোলাপি শাড়ি পরে তাকে দু-একবার উড়ে আসতে-যেতে দেখেছে মাদল। রিসেপশানের যে-সোফাটায় মাদল বসে দাঁতে নখ কাটছে

টেনশানে, তার থেকে অল্প দুরে লিফটের দরজা। সেখানে টুলে টানটনে বসে শংকর বাহাদুর। ওয়াচম্যান। অন্য সোফা তিনটি খালি। টেলিফোন বোর্ডের কাছে ও অফিসের ভেতরে চাপা কথাবার্তা চলছে। ছোট-ছোট দলে প্রায় সকলেই দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর বাহাদুরের দিকে সামান্য হেলে পড়ে মাদল জিগ্যেস করল, অবশ্যই নীচু গলায়, 'ম্যাডাম কোথায় গেলেন?'

বাহাদুরও কথা বলার সুযোগ পেয়ে এদিকে ঝুঁকে বলল, 'কী জানি, সাব। এক-দেড় বাজে নিকলে গেল—কিলায়েন্টকে সাথ—'

তার মানে, লাঞ্চে গেছে ক্লায়েন্টকে নিয়ে। কখন ফিরবে, কে জানে। হয়তো আজ ফিরলই না! তবে, চওধরি-সায়েব নিশ্চয়ই খোঁজ-খবর করছেন। আজ টেলিফোন অপারেটার আসেনি। জুলিকে দিয়ে একের পর এক নাম্বার ডায়াল করিয়ে যাচ্ছেন হরবিলাস।

বাহাদুর সাধারণত কোনও ব্যাপারেই বিশেষ কৌতূহল দেখায় না। কিন্তু এখন একটু উসখুস করে আবার মাদলের দিকে ঝুঁকল, 'মাধো সাব! রয়-সাবকে যে খুন করতে পারে সে মানুষ নয়। অত ভালো, দেবতুল্য—'

বলতে-বলতে, স্প্রিং-এর মতো লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বাহাদুর। লিফট উঠে এসেছে। বাহাদুর সেলাম করল। শকুন্তলাকে লিফট থেকে বেরোতে দেখে, মাদলও উঠে দাঁড়াল। ওকে যেন লক্ষই করল না মহিলা। সোজা রিসেপশান পেরিয়ে চওধরির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে শুধাল, 'বাহ! মেলা বসে গেছে দেখছি। অ্যাডমার্কেটের লাঞ্চ-আওয়ার কি সাড়ে-তিনটেতেও শেষ হয়নি? ব্যাপার কি?—'

পরিবেশের গুরুত্বের জন্যেই সকলে-প্রায় নিঃশ্বাসের শব্দে কথা বলছিল। হঠাৎ শকুন্তলার খাপছাড়া উচ্চকিত বক্রোক্তি চমকে দিল সবাইকে। বিরক্ত হলেও মালকিন বলে কথা! গুটি-গুটি হেঁটে যে যার টেবিল, ক্যাবিনের দিকে রওনা দিল।

চওধরি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ওর দিকে। গম্ভীর মুখে বলল, 'সরি ম্যাডাম। মিস্টার রয় খুন হয়েছেন।'

প্রথমে চেঁচিয়ে উঠলেও পরে গলা নামিয়ে শকুন্তলা বলল, 'হোয়াট! অ্যানাদার মার্ডার! কোথায়?'

'ওঁর ক্যাবিনেই।'

রিসেপশানের টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়াল শকুন্তলা। নিজের মনেই মন্তব্য করলে যেন, 'ইশ, কি কেলেঙ্কারি! ছি-ছি! কোম্পানির বদনাম—অ্যাড-মার্কেট ইজ ডুমড—।'

তারপরে, সোজা হয়ে দাঁড়াল। জিগ্যেস করল, 'বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে?'

চওধরি বলল, 'পুনার লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, ম্যাডাম!'

বিরক্ত গলায় শকুন্তলা প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল। 'ওহ নো! হি ইজ ইন টাউন, বাই নাউ! লাঞ্চের আগেই তো বম্বে পৌঁছোনোর কথা।—শিগগির বাড়িতে লাইন লাগান—অ্যান্ড গিভ মি দ্য লাইন—'

বলে, কনফারেন্স রুমের দিকে দু-কদম এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ব্যাপারটা হয়েছে কখন?'

চওধরি বলল, 'সঠিক টাইম তো পোস্টমর্টেমে বেরোবে। আমরা টের পেয়েছি এই দশ-পনেরো মিনিট আগে।'

'কে দেখেছে প্রথম?'

'জুলি। জুলি সালডানা।'

টেলিফোন বোর্ডে বসা জুলি অপরাধীর মতো ভীত মুখে উঠে দাঁড়াল। শকুন্তলা তাকে এক পলক দেখে নিয়ে চওধরিকে জিগ্যেস করল, অ্যাট লিস্ট—পুলিশকে খবর দিতে পেরেছেন আশা

করি—নাকি, থানার লাইনও পাওয়া যাচ্ছে না—'

'না-না! পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে ইন্সপেক্টর সাঠে এসে পড়বেন—'

চারপাশে দেখে নিল শকুন্তলা। জটলা ভেঙে অনেকেই ডিপার্টমেন্টের দিকে রওনা দিয়েছে। রিসেপশানের পেছনে মার্কেটিং-এর টেবিলে যারা বসে পড়েছে, তারা জোর করে কাজে মন দেওয়ার ভান করছে। কান খাড়া করে ফাইলপত্তর ঘাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে।

খুব নীচু গলায় নির্দেশ দিল, শকুন্তলা, 'কাগজ-অলারা আসতে পারে। আফটার অল, পর পর দুটো মার্ডার! ছিছি! কি চলছে আপিসে কিছুই বুঝতে পারছি না। অ্যাডভার্টাইজিং ওয়ার্লডে টি-টি পড়ে যাবে। আপনি একটু খেয়াল রাখবেন, যাতে, ক্রাইম-রিপোর্টাররা ব্যাপারটা চেপে যায়। অ্যাট লিস্ট ফলাও করে না লেখে। দরকার হয়, ভালো করে খাইয়ে দেবেন—ইউ নো হোয়াট আই মিন—নইলে, ক্লায়েন্টদের ধরে রাখা যাবে না—'

বলে, নিজের ক্যাবিনের দিকে হাঁটা দিল শকুন্তলা। যেতে-যেতে, গলা তুলে জুলিকে বলে গেল, 'বাবাকে পেলে, ইমিডিয়েটলি লাইনটা আমার ঘরে দিয়ে দেবে—'

কথা বলতে-বলতে শকুন্তলাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল হরবিলাস চওধরি, ঠিক তক্ষুনি ওপরে উঠে এল লিফট। দরজা খুলে প্রথমে বেরুলেন মধুকর সাঠে তারপর বেরুলেন সত্যসাধন। পেছনে চারজন কনস্টেবল।

শংকর বাহাদুর গোড়ালি ঠুকে এক জবর সেলাম দিল। সাঠে গটগটিয়ে হেঁটে চললেন আগে-আগে। মাদল উঠে দাঁড়িয়েছিল। সত্যসাধন ওর কাঁধে হাত রেখে জিগ্যেস করলেন, 'কোনও গন্ডগোল হয়নি তো?'

মাদল ঘাড় নেড়ে জানাল—'না।'

'সব ঠিক-ঠিক?'

'সব।'

দুজন সেপাই লিফট তথা, গেটের কাছে মোতায়েন হল। বাকি দুজনকে নিয়ে সাঠে এগোচ্ছিলেন সোজা জয়দীপের ক্যাবিন লক্ষ্য করে। পেছন থেকে ডাক দিলেন সত্যসাধন, 'মধুকর!'

ডাক শুনে, সাঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সত্য ওর কাছে পৌঁছে জিগ্যেস করলেন, 'চললে কোথায়?'

সাঠে অবাক, 'বাহ! লাশ দেখবে না! এসো—'

বলে, আবার পা বাড়াচ্ছিলেন, সত্য হাত ধরে ফেললেন সাঠের, 'দাঁড়াও। বলি, লাশ তো আর পালাচ্ছে না!'

মাদল ওদের পেছন-পেছন এসে পড়েছে। চওধরি এবং জুলিও। জয়দীপের ক্যাবিনের সামনে টুলে বসা দত্তারাম তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সাঠেকে দেখে।

সাঠে বললেন, বোকা-বোকা হাসি মেখে, 'না। লাশ পালাবে না। তবে, হ্যাঁ। তোমার মক্কেল কিন্তু ফুড়ুত! মজুরি লস—'

মাদল টানটান চোখে সত্যকে লক্ষ করছে। সত্য খোঁচা গায়ে না মেখে বললেন, 'আমি একটা রিকোয়েস্ট করব তোমাকে। রাখবে?'

খোঁচা-দেওয়ার বোকা-বোকা হাসি উঠে গিয়ে সাঠের মুখে গদগদভাব 'বলো কি হে, সাধনকর? এভাবে লজ্জা দিয়ো না, ব্রাদার। তোমার আবার রিকোয়েস্ট কি? স্রেফ হুকুম করো। একটা কেন? আজকের দিনটায় অন্তত তোমার তিনটে হুকুম তামিল করতে রাজি—'

বলে, বেশ ঘনিষ্ঠ বেড়ালের আদুরে গলায় যা বললেন, মাদল শুনতে পেল স্পষ্ট, 'সকালের কাগজ দেখেছ? আমাদের ছবি বেরিয়েছে!'

সত্যকাকু চঞ্চল, লাজুক ভঙ্গিতে পাশ কাটালেন, 'ও-হ্যাঁ-হ্যাঁ। দেখেছি।—'

'আমার প্রমোশন এবার কেউ আটকাতে পারবে না, হে সাধনকর! ওই খাঁড়ি-পথে আমি না থাকলে—'

নিজের কথা বলতে গিয়ে যেন, মনে পড়ল হঠাৎ—তাই সুর পালটালেন। সত্যকাকুর কাঁধে হাত রাখতে গিয়েও কাছেপিঠের লোকজনকে দেখে সামলে নিলেন। শেষ করলেন কথা খুব চাপা স্বরে, 'সবই তোমার জন্যে, হে—'

সত্যকাকু অসোয়াস্তি ঝেড়ে ফেলার মতো বললেন, 'ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ!—হ্যাঁ, যা বলছিলুম—'

'বলো-বলো। কী করতে হবে?'

দুজনে একটু দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে অস্ফুট আলোচনা শুরু করতেই, শকুন্তলা ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এল। পুলিশ আসার খবর পেয়েই বোধহয়।

সঙ্গে-সঙ্গে সাঠে ওর দিকে এগোলেন। বললেন, 'এই যে মিস, ইয়ে, মানে, কোরগাঁওকার। আসুন। আপনার সাহায্যের ভীষণ দরকার।'

শকুন্তলা অপাঙ্গে সত্যকে দেখে নিয়ে যেন, চিনতেই চাইল না। সাঠেকে বলল, 'কি কান্ড বলুন দেখি। একটার পর একটা মার্ডার হতে থাকলে তো, কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে। জোশী-হত্যার কোনও কিনারা করতে পারলেন না—আর একটা খুন হয়ে গেল—ইশ—'

কিঞ্চিৎ ঠাট্টা এবং বিরক্তি মিশিয়ে সাঠে বললেন, 'তা আর কী করব বলুন ম্যাডাম! আমাদের পুলিশ-বিভাগে এখনও পর্যন্তও তো তেমন কম্পিউটার বসানো যায়নি, যে তিনটে বোতাম টিপলেই খুনির নাম-ঠিকুজি স্যাটাস্যাট বেরিয়ে আসবে! তাই, একটু সময় লাগছে—'

খোঁচা খেয়ে শকুন্তলা সুর বদলাল, 'হ্যাঁ, বলুন। আমাকে কী করতে হবে?'

হঠাৎ যেন খেয়াল হল, এমনিভাবে চারপাশে চোখ বুলিয়ে সাঠে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার বাবা, মানে, মিস্টার কোরগাঁওকার কি পুনায় নাকি?'

'না। আজই এসেছেন বম্বেতে। বাড়িতে নেই। মনে হয় অফিসেই আছেন।'

'বাঃ বেশ! আচ্ছা, ম্যাডাম, আপনাদের কনফারেন্স রুমটা কত বড়? আপিসের সমস্ত কর্মচারীদের কি ও ঘরে এক সঙ্গে জড়ো করা যাবে?'

'মোটামুটি। তবে, সবাই হয়তো বসতে পারবে না। কিন্তু, কি ব্যাপার বলুন তো, মিস্টার সাঠে? আপনি ডেডবডি দেখে নিয়েছেন?'

মাদল এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি লোকের ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে। প্রায় সব মুখগুলিতেই কেমন তটস্থ, বিচলিত ভাব। মৃত্যুর ছায়ায় শোক না থাকলেও, থমথমে ভয়ের ছাপ। জয়দীপ রায়ের মৃত্যুতে কেঁদে ভাসাবার লোক আপিসে থাকার কথাও নয়। তবু, সারাক্ষণ কাছাকাছি থাকার ফলে এবং আতঙ্কেই হয়তো জুলি সালডানা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু, সেই তখন থেকেই মাদল অবাক হয়ে দেখছে, শকুন্তলা ম্যাডামের ভাবসাব! যত দেখছে তত বেশি অবাক হচ্ছে। এ কি করে সম্ভব? জয়দীপদার মৃত্যু-সংবাদ শুনে মহিলার মুখের চেহারা দেখে মনে হল, অ্যাডমার্কেটের যে কোনও একজন রাম-শ্যাম বা যদু কর্মচারী নিহত হয়েছে। চমকে উঠে, যথেষ্ট বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছে তার কথাবার্তায়। কোম্পানির বদনাম, ঝামেলা ইত্যাদির চিন্তাতেই মহিলা মহা ব্যস্ত। অথচ, শুধু মাদল কেন, তার মতো অনেকেই ভেবেছিল—'জয়দীপ রায় নিহত' শুনে কান্নায় ভেঙে পড়বে শকুন্তলা। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কানাঘুসোয় শুনেছে মাদল। এমনকি, বিয়ে হওয়ার কথাও নাকি হয়েছিল। সেক্ষেত্রে মহিলাটি একবার নিহত মানুষটিকে দেখতে চাইল না! নাম পর্যন্ত আনল না মুখে! শোকতাপ তো দূর অস্ত। এ কেমন করে হয়, ভেবে পেল না মাদল। মেয়েরা এত নিষ্ঠুর, এত প্র্যাকটিকাল হতে পারে-ভাবা যায় না। চব্বিশ বছরের

যুবক মাদলের মনে নারীজাতি সম্পর্কে ধারণাই আজ পালটে যেতে লাগল। লোক-মুখে-শোনা, পড়া বা নিজস্ব মন-গড়া প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদির ছবি রং পালটাতে শুরু করল শকুন্তলাকে দেখে। আবার এও ভেবে দেখল সে—হয়তো, আদপেই দুজনের মধ্যে কোনও গভীর সম্পর্ক ছিল না। স্রেফ খেলাধুলো। খেলা শেষ হলে, ধুলো ঝেড়ে ফেলে দাও।

শকুন্তলার কথার জবাব দিলেন সাঠে, দু-হাত তুলে, আশ্বাসের ভঙ্গিতে, 'সব হবে, ম্যাডাম! ফরেনসিকের লোক, ফিঙ্গার প্রিন্টের শর্মা আর ফোটোগ্রাফার এসে গেলে, একসঙ্গে ঢুকব ক্যাবিনে। তার আগে—' সত্যসাধনকে দেখিয়ে ঘোষণার ঢঙে কথা শেষ করলেন, মধুকর, 'দিস গ্রেট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্লড অফ ইন্ডিয়ান ইনভেস্টিগেশান, মিস্টার সত্যসাধন কর আপনাদের কিছু বলবেন। আমার সঙ্গে আজ কাগজে এঁর ছবি ছাপা হয়েছে—দেখেছেন নিশ্চয়ই!'

দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে ওর কথা বলার ধরনধারণ দেখে মাদলের হাসি পেল। বহু কষ্টে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। শকুন্তলা, চওধরি, জুলি—এমনকি, জয়দীপের ক্যাবিনের দরজার পাহারাদার দত্তারামের মুখেও বিরক্তির চিহ্ন। সবাই মনে-মনে চটে যাচ্ছে—পাশের ঘরে একটা লাশ পড়ে আছে—আর উনি কি না—

সাঠেকে প্রায় বাধা দিয়ে শকুন্তলা জিগ্যেস করল, 'তা কী করতে হবে বলুন?'

সাঠে সত্যকে ইশারা করল, 'সাধনকর! বলে ফ্যালো—'

যথেষ্ট বিনীতভাবে সত্য শকুন্তলাকে বললেন, 'আই অ্যাম সরি টু ট্রাবল ইউ ম্যাডাম! অথচ উপায় নেই। জোশী-হত্যার ব্যাপারে আমার ক্লায়েন্ট জয়দীপ রায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। আজ উনি নিজেও নিহত। ফলে, কর্তব্যের খাতিরেই আমি আপনাদের সামান্য বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি।'

অসহিষ্ণু শকুন্তলা ওঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। ভূমিকা না-করে তাড়াতাড়ি বলুন কী করতে হবে?'

এক মুহূর্তের জন্যে সত্যর চোয়াল শক্ত হল। সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিয়ে বললেন, 'আজ এবং এখন অ্যাড-মার্কেটে যে ক'জন লোক রয়েছেন প্রত্যেককে আপনাদের কনফারেন্স রুমে ডেকে পাঠান। খেয়াল রাখবেন, জোশী-হত্যার দিনে যাঁরা আপিসে ছিলেন এবং পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছেন—তাদের প্রত্যেকে যেন বসবার জায়গা পান। আমরা এগোচ্ছি। এসো সাঠে—' বলে, কনফারেন্স রুমের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে মাদলকেও সঙ্গে ডেকে নিলেন সত্যসাধন।

জয়দীপের বন্ধ ক্যাবিনের সামনে একজন সেপাইকে মোতায়েন করে, সর্বশেষটিকে সঙ্গে আসতে ইঙ্গিত করলেন সাঠে।

ওরা এগিয়ে গেল। চওধরি জিগ্যেস করল শকুন্তলাকে, 'স্যার এখনও এসে পৌঁছোলেন না! মহা ঝামেলা হল ম্যাডাম! গোয়েন্দা লোকটার মতিগতি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ইনস্পেক্টার সাঠেও তো লোকটার কথায় ঘাড় কাত করে আছে। আপনিই বলুন ম্যাডাম, এখন কি লেকচার শোনবার মুড আছে, না শোকসভা করার?'

শকুন্তলা দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, 'রাবিশ অ্যান্ড বোগাস!'

দত্তারামের পাহারা দেওয়ার কাজ সেপাইটি নিয়েছে। ফলে, গুটিগুটি সে এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। ম্যাডামের মুড দেখে, ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলে চওধরিকে, 'সবাইকে ডেকে আনব, সাব?'

॥ আঠারো ॥

মস্ত একখানা ডিম্বাকৃতি টেবিল ঘিরে দশ-বারোটি চেয়ার। তা ছাড়া, দেওয়াল ঘেঁষেও অনেকগুলি চেয়ার পাতা। এ-ঘরে এক-আধবার ঢুকেছে মাদল। জয়দীপদার ক্যাবিনে অন্য লোক থাকলে, আর্ট-

ডিরেক্টর এবং মাদলকে নিয়ে উনি এখানে চলে আসতেন। ক্যাম্পেনের কাজ বোঝাতে। দরজা দিয়ে ঢুকে, ডানহাতি দেওয়ালে আলো এবং পাখার সুইচ-বোর্ড।

আগে-আগে ঢুকে সুইচ টিপে সব ক'টা আলো এবং পাখা চালিয়ে দিল মাদল। সাঠেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন সত্যসাধন। ভালো করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন চারপাশে। উলটোদিকের দেওয়ালের গায়ে সাময়িক সাদা পরদা লাগানো। ছবির প্রোজেকশানের জন্যেই বোধহয়।

টেবিলটাকে চক্কর মেরে ওই পর্দার কাছে পৌঁছে গেলেন সত্য। সঙ্গে মধুকর সাঠে। সত্য মাদলকে বললেন, 'তুমি দরজার কাছেই থেকো।'

পাশাপাশি চেয়ারে বসে পড়লেন দুজনে। ভুরু নাচিয়ে সাঠে জিগ্যেস করলেন, 'সাধনকর, তোমার মতলবটা কী বলো দেখি?'

মুচকি হাসলেন সত্য। বললেন, 'দেখা যাক! হয়তো, হত্যা-রহস্যের একটা কিনারা হলেও হতে পারে—'

'দুটোরই? মানে, জোশী এবং জয়দীপ?'

সত্য জবাব দেওয়ার আগেই দরজার কাছে, দুজন-চারজন করে অফিস-কর্মী এসে জড়ো হল। তারা ভেতরে 'ঢুকবে কি, ঢুকবে না' ভাবছে। মাদল বলল, 'চলে যান। ভেতরে গিয়ে বসে পড়ুন সবাই।'

সত্যও উঠে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালেন হাসিমুখে, 'আসুন, মিস সালডানা, মিস লাখানি—ভেতরে আসুন।'

এক-এক করে, আড়ষ্ট পায়ে ভেতরে আসতে আরম্ভ করল ওরা। চাপা গুঞ্জন। সত্য এবং সাঠের থেকে দূরের চেয়ারগুলি ভরতি হয়ে গেল প্রথমে। তারপরে, ধীরে-ধীরে সব আসনই দখল হয়ে গেল। সাঠের বাঁ-দিকের তিনটি এবং সত্যর ডানদিকের দুটি চেয়ার খালি রয়ে গেল। পুলিশের অত কাছে বোধহয় কেউই বসতে ভরসা পাচ্ছে না। কয়েকজন দেওয়াল ঘেঁষে, দরজার কাছাকাছি সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবশেষে মাদলের পাশ কাটিয়ে শকুন্তলার পিছন-পিছন এসে ঢুকল চওধরি। দু-রকম গন্ধ পেল মাদল। প্রথমে হালকা সেন্ট ও পরে আলতো অ্যালকোহল। হঠাৎ মাদলের সন্দেহ হল হরবিলাস চওধরি কি তার ক্যাবিনে বিয়ার বা হুইস্কির বোতল লুকিয়ে রেখে দেয়! এক্ষুনি এক ঢোঁক মেরে এল হয়তো!

সাঠের কাছের চেয়ারে শকুন্তলা ও সত্যর পাশে চওধরি এসে বসতে-না-বসতে দরজার সামনে এসে উপস্থিত মিস্টার কোরগাঁওকর। কোম্পানির খোদ মালিক। জাঁদরেল ভারিক্কি চেহারাটি প্রায় দরজা জুড়ে দাঁড়ানো। ছাই রঙের সুট পরনে। মাথায় টাক। ভারী ফ্রেমের চশমার পিছনে ছোট চোখজোড়া চঞ্চল। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম নিয়ে সামান্য হাঁফাচ্ছেন। ষাটের কাছেপিঠে বয়েস।

বড় কর্তার আবির্ভাবে তটস্থ হয়ে প্রায় সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছে। সাঠে পুরোপুরি একগাল হেসে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন আসুন, স্যার! আপনার ঘাটতি মালুম হচ্ছিল। আপনাকে ছাড়া—'

হাত তুলে বাধা দিলেন কোরগাঁওকর। হেঁটে আসতে-আসতে উত্তেজিত এবং বিরক্ত গলায় বললেন, 'কী হচ্ছে এখানে? কীসের মজলিস বসেছে, অ্যাঁ? লিফটম্যান বলল, আবার একটা খুন—জয়দীপ রায়?'

সত্যসাধন হেসে বললেন, 'আগে আপনি বসুন, স্যার। সব বলছি। হার্টের রুগির পক্ষে অত উত্তেজনা ভালো নয়!'

ভিড়ের মধ্যে ডিম-টেবিলের চূড়ামণি হয়ে বসা সত্যসাধনকে আগে বোধহয় লক্ষ করেননি ভদ্রলোক। এবার, দেখতে পেয়ে অবাক গলায় বললেন, 'আপনি? আপনাকে না দু-একদিন আগে পুনার হেড অফিসে দেখেছি?—'

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন সত্যসাধন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার দীপন গুহ আমার পুরোনো বন্ধু—ওর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলুম—'

শকুন্তলার পাশে চেয়ার টেনে বসতে-বসতে কোরগাঁওকর বললেন, 'বেশ তো! তা—এখানে? হোয়াট দ্য হেল আর ইউ ডুয়িং হিয়ার?'

মাদল মনে-মনে হিসাব কষছিল। ওয়ালকেশ্বরের 'সানসেট ভিলা'য় তিনদিন ছিল সে। ওরই মধ্যে সত্যকাকু পুনা ঘুরে এসেছেন। নিশ্চয়ই কোনও 'ক্লু' আবিষ্কার করেছেন। মাদলকে কিচ্ছু বলেননি ভেবে একটু অভিমান হল তার। সঙ্গে-সঙ্গে, ভেবে দেখল, অবিশ্যি, সেসব কথা বলার সময়ই বা পেলেন কোথায়? তিনদিন দেখা হয়নি। গতকাল মধ্য রাত অবধি তো 'অপারেশান সানসেট' নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত। আরও একটা কথা এক্ষুনি মনে পড়ে গেল। সেই যে ভোর-ভোর থাকতে বেরিয়ে ঝমরে চেপে খাপোলি যাওয়া হয়েছিল, কোরগাঁওকরের গাড়ি ও তাঁর খাসবেয়ারা শিবালকরকে দেখে ঝমরকে একটু আড়ালে দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সত্যকাকু। একটু বাদে সাদা প্রিমিয়ার নিয়ে ওরা বেরিয়ে যেতেই সত্যকাকু ঝমর থেকে নেমেছিলেন। মাদলকে বলেছিলেন, 'এসো, নেমে পড়ো। তুমি চা-আলুবড়ার অর্ডারটা দিয়ে ফেলো। আমি ছোট্ট একটা পাক দিয়ে আসি।'

বলে, দ্রুত পায়ে 'জে. কে. কেমিস্ট-ড্রাগিস্ট অ্যান্ড কেমিক্যাল সাপ্লায়ারে'র দিকে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করেছিলেন। মাদলের পেটে তখন ছুঁচোয় ডন মারছে। হোটেলে ঢুকে দু-প্লেট 'বটাটা বড়া' আর দুটো চা বলে ফিরে এসেছিল ঝমরে। সকালের শীতল বাতাস আর নেই। রোদের তাত বাড়ছে। ছোট্ট একটি ছেলে অর্ডার সার্ভ করে যেতে-না-যেতেই ফিরে এলেন সত্যকাকু। সঙ্গে ঠোঁটে নিয়ে এলেন রবি ঠাকুর, 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়—'

ঝমরের দরজা খুলে সিটে বসেও গান থামে না। আপনমনে একটা বড়া তুলে কামড় দিয়েই বললেন, 'আহা! সত্যি মাদল। খাপোলির বড়া অতুলনীয়।'

হা-ভাতের মতো বড়া খেতে-খেতে মাদল জিগ্যেস করল, 'ও-দোকানটায় কিছু পেলেন?'

'হুম্‌ম বাবা। পেলাম তো বটেই। নানান ওষুধের গন্ধ। স্পিরিট।— আরও দুটো করে বড়া সঙ্গে নিয়ে নাও হে, শ্রীমান। দেড় ঘণ্টার ফিরতি পথে লেগে যাবে—'

অনর্গল ফালতু কথা বলে যাচ্ছিলেন। তারই ফাঁকে চায়ে যেই চুমুক দিতে যাবেন, মাদল ফাঁক বুঝে আবার চেষ্টা দিল, 'মানে কোনও হদিশ-টদিশ?'

ও মা! তার জবাবে সত্যকাকু বলে উঠলেন, 'নাড়িতে মোর রক্তধারায়—লেগেছে তার টান—'

'আকাশভরা সূর্যতারা'র মধ্যে ঝমর স্টার্ট নিয়েছে। ছোকরাটি এসে কাপ-ডিশ-পয়সা নিয়ে গেছে। সত্যকাকুর মুখ থেকে কাজের কোনও কথাই বেরোয়নি। মাদল টের পেয়ে গেছে, এখন ওঁকে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না।

কয়েক মুহূর্তে খাপোলির ঘটনা থেকে ঘুরে-ফিরে আসতে দেখল, সাঠে সত্যকাকুর পরিচয় করাচ্ছে মিস্টার কোরগাঁওকরের সঙ্গে। 'সি-আই-এ' প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর শুনে-টুনে ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে একখানা শব্দ উপহার দিলেন বাতাসে, 'অ।'

তারপর, সাঠেকে জিগ্যেস করলেন, 'বাট হোয়াট, অ্যাবাউট দ্য ডেডবডি? পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

শকুন্তলা প্রায় ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ময়নাতদন্ত দূরস্থান, এঁরা এখনও পর্যন্ত লাশই দেখেননি।'

সাঠে এক পলক সত্যকে দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'উই নো আওয়ার ডিউটি, মিস্টার অ্যান্ড মিস কোরগাঁওকর। সাধনকর আপনাদের সবাইকে কিছু বলবেন বলেই এখানে সমবেত হয়েছি আমরা। পুলিশের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি বা, ধরে নিন, নির্দেশ দিচ্ছি—একটু ধৈর্য ধরুন সবাই। বলো হে, সাধনকর—'

বলে, সত্যর দিকে তাকালেন সাঠে।

মৃদু-মৃদু হাসছিলেন সত্য। ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন, কে কোথায় রয়েছে। প্রায় সকলের মুখে-চোখে অসহিষ্ণুতার ভাব। কৌতূহল। মাদলের মনে হল এই মুহূর্তে প্রকাণ্ড ঘরের কোথাও হঠাৎ টিকটিকি ডেকে উঠলেও ধক করে উঠবে বুকের মধ্যে।

সত্যসাধন বলতে শুরু করলেন, 'পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট অনুযায়ী, মিস্টার জোশীর মৃত্যু হয়েছে বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। মৃত্যুর কারণ—সায়নায়েড বিষ। জয়দীপ রায়ের ঘরে, চিনির কৌটোয় মেশানো হয়েছিল এই মারাত্মক বিষ। সেই চিনি দিয়ে তৈরি চা মুখে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মিস্টার জোশী মারা যান—চিৎকার তো দূরের কথা, সামান্যতম শব্দ করবারও অবকাশ উনি পাননি। তা ছাড়া—'

মিস্টার কোরগাঁওকর অধৈর্য স্বরে বাধা দিলেন, 'কিন্তু এসবের সঙ্গে আজকের খুনের সম্পর্ক কী?'

হাত তুলে, বেশ কড়া গলায় জবাব দিলেন সত্যসাধন, 'হবে। একে-একে সব আসবে। — আর-একটা কথা, অতি সাধারণ যে-বোধটি, যে-কোনও দায়িত্বশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের থাকা উচিত, তা হল—ভদ্রতা। কথার মধ্যিখানে বাধা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে কথা বলাটা অশালীনতা।—'

ভদ্রলোকের ফরসা রঙে যেন কেউ ছাই মিশিয়ে দিল এতগুলো বেতনভুকের সামনে। এক সেকেন্ডের জন্যে চশমার পিছনে চোখ দুটো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। একেবারে চুপ করে গেলেন কোরগাঁওকর।

ওঁর দিক থেকে চোখ সরিয়ে আবার বলতে লাগলেন সত্য, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সন্দেহভাজন মোট পাঁচজন। প্রথমেই ধরা যাক, জয়দীপ রায়। প্রত্যেক বিজ্ঞাপন কোম্পানিতেই ক্লায়েন্ট এবং অ্যাকাউন্ট নিয়ে কম-বেশি মন-কষাকষিই হয়েই থাকে। এমনকি ঝগড়াঝাঁটি হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। তার জন্যে, জয়দীপ জোশীকে একেবারে খুন করে ফেলবে—প্ল্যান করে—এটা হজম করা শক্ত। দ্বিতীয়ত জোশীর মৃত্যুর ফলে, রায় ব্রাঞ্চ ডিরেক্টর হবে—এই "মোটিভ"-ও খুব পোক্ত নয়। কারণ, অ্যাডমার্কেটের অ্যাতো বিশাল রাজত্বের একমাত্র রাজকন্যাই যেখানে হাতের নাগালে, সেখানে খুদে একটা ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর হওয়া তো মামুলি—'

'আই ওবজেক্ট!—' সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে শকুন্তলা, 'উটকো লোকের মনগড়া সব রাবিশ মন্তব্য বসে-বসে শুনতে রাজি নই—'

বলে, গটগট করে হাঁটা ধরেছিল গেটের দিকে, সত্য একটু গলা বাড়িয়ে বললেন, 'আহা। এখন আপনার আপত্তি থাকতেই পারে। সাময়িক মোহও কেটে যেতে পারে বৈকি! তবে, আমার কথার অকাট্য প্রমাণ-স্বরূপ খানকয়েক চিঠি-চাপাটি আমার পকেটে আছে, যেগুলি দেখলে সবাই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবে—'

মোলায়েম গলায় সাঠে ডাক দিলেন, 'আসুন, আসুন, মিস কোরগাঁওকর। এসে, বসে পড়ুন দেখি।—এই সাধনকর বড় সাংঘাতিক চিজ, ওকে ঘাঁটিয়ে জল ঘোলা করবেন না।—'

দরজা অবধি পৌঁছে গিয়েছিল শকুন্তলা। মাদল স্পষ্ট শুনতে পেল, দাঁতে-দাঁত চেপে ম্যাডাম বিড়বিড় করল শূন্যে 'স্কাউন্ড্রেল।'

বিশেষণটির টার্গেট হয় অনুপস্থিত জয়দীপদা, নয়তো, সত্যকাকু—এটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না মাদলের। তবু, সে চুপ করে থাকল। এই অবস্থায়, ঘরভরতি লোকের সামনে মাথা-গরম করার কোনও মানে হয় না।

আর কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের চেয়ারে ফিরে গেছে শকুন্তলা। ওর বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সত্য বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' এবং জুড়ে দিলেন সঙ্গে-সঙ্গে, 'খুনি হিসেবে জয়দীপকে বাদ দেওয়ার ভাইটাল পয়েন্ট হল—মোটিভের কথা ভুলে গিয়ে, যে কোনও কারণেই হোক, জয়দীপ রায়ের মতো বুদ্ধিমান লোক যদি জোশীকে খুন করতে চাইত, তা হলে কখনোই নিজের ঘরে চিনির

কৌটোয় বিষ মিশিয়ে তাকে খুন করত না।'

সামান্য দম নিয়ে, সমবেত মানুষগুলির মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন সত্য। শুরু করলেন আবার, 'দ্বিতীয় নম্বরে, জুলি সালডানাকে দেখা যাক—'

সত্যর ডানদিকে চারটি চেয়ারের পরে পঞ্চম চেয়ারে বসে জুলি। ওর নাম উচ্চারিত হতেই, চমকে তাকাল সত্যর দিকে। শরীর টানটান, শক্ত হয়ে গেল। চোখের চাউনি ভীত, সন্ত্রস্ত।

সত্য বললেন, 'জোশী মারা গেলে, জুলির কোনও সুবিধে হয় না। অর্থাৎ "মোটিভ" একেবারে নিল। ভিতু নার্ভাস টাইপের এক যুবতী, বিনা কারণে একটা লোককে খুন করতে পারে না। বিশেষত, যে-তরুণীর দু-চার দিন বাদেই বিয়ের ঠিকঠাক—তার মাথায় হত্যার প্ল্যান ঘুরছে—এটা সাইকোলজির ধোপে টেকা মুশকিল।—অ্যাম আই রাইট মিস সালডানা?'

জুলির ভীতমুখে ম্লান হাসির রেখা। সত্যর দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে। কৃতজ্ঞতায় জল বুঝি উপছে পড়বে এক্ষুনি। ও মুখে জবাবই দিতে পারল না। ছোট্ট করে দু-তিনবার মাথা কাঁপিয়ে সত্যর কথায় সম্মতি জানাল। নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে, গলা শুকিয়ে আসছিল সত্যর। একটু চা পেলে ভালো হত। কিন্তু কাকেই বা বলবেন? বেশিরভাগ লোককেই চেনেন না। যাদের চেনেন তাদের মধ্যে জয়দীপ নেই। অন্য যে ক'জন আছে, তারা ঘোর বিতৃষ্ণা, বিরক্তির চোখে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তবু, নিদেন এক চুমুক জল না পেলে চলছে না। সত্য, হঠাৎ যেন কিছু না-ভেবেই এই কোম্পানির খোদ মালিককে জিগ্যেস করলেন, 'একটু জল পেতে পারি, মিস্টার কোরগাঁওকর?'

ভদ্রলোক সোজা ওঁর দিকে চেয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। খাবেন, না, কুলকুচি করবেন?'

সত্যও হাজির-জবাব দিলেন, 'দুটোই।'

বড় কর্তা হাঁক দিলেন, 'শিবালকর?'

দরজার কাছে ভিড়ের মধ্যে বেয়ারা দত্তারাম ও শিবালকর দাঁড়িয়েছিল। মালিকের ডাক শুনেই শিবালকর ছুটল জল আনতে।

ঢোঁক গিলে সত্য শুরু করেছেন আবার, 'একটা ব্যাপার সারাক্ষণ মনে রাখা দরকার, খুনটা হয়েছে জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনে। ঠিক ওই দিন ওই সময়ে মিস্টার জোশী যদি ওর ক্যাবিনে না যেতেন, তা হলে হয়তো উনি আজ আমাদের মধ্যে থাকতেন। কারণ, জোশী ছাড়াও সিনিয়র অফিসারদের যে কেউ ওই ক্যাবিনে গিয়ে বসতে এবং চা খেতে পারতেন। এমনকি, জোশীর বদলে কোনও ক্লায়েন্টেরও মৃত্যু হতে পারত স্রেফ চা খেয়ে। সুতরাং, আমাদের দু-ভাবে ভাবতে হবে। এক, জোশীকে হত্যা করাই যদি উদ্দেশ্য থাকত, তা হলে, হত্যাকারী আগে থেকে জেনে গিয়েছিল ওই সময় জোশী জয়দীপের ক্যাবিনে যাবে। দুই, জোশী আদপেই হত্যাকারীর টার্গেট ছিল না। যার ক্যাবিন, তাকে সরিয়ে দেওয়াই ছিল খুনির উদ্দেশ্য—অর্থাৎ জয়দীপ স্বয়ং।'

এতক্ষণে, আবার একটা চাপা গুঞ্জন আরম্ভ হল ঘরের মধ্যে। মাদলের এখন আর দাড়ি নেই। তবু সত্যকাকুর কথা শুনে এই ক'দিনের অভ্যেসের ফলে, গাল চুলকে ফেলল সে। শিবালকর কাচের গেলাসে জল নিয়ে ফিরে এল। সত্যসাধনের সামনে, টেবিলে গেলাস রেখে ফেরত চলে গেল নিজের জায়গায়। দত্তরাম ও অন্যান্য বেয়ারাদের কাছে।

বড়সড় এক চুমুক জল খেয়ে সত্য বললেন, 'এবারে ধরা যাক, তিন নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি দত্তারামকে, জয়দীপ ও চওধরি-সায়েবের বেয়ারা। এরও কোনও জোরদার "মোটিভ" দেখা যাচ্ছে না। কারণ, জোশীর সঙ্গে ওর সরাসরি যোগাযোগই ছিল না। তবে হ্যাঁ, যদি ওর আপন বস জয়দীপকে খুন করবার "মোটিভ" কিছু আবিষ্কার করা যায়, তা হলেও, খুনটা ও করেছে—এমন কথা মগজবিহীন ব্যক্তিও ভাবতে পারবে না।'

এতক্ষণে, সাঠে কথা বললেন, 'এটা তুমি কী করে বলতে পারলে, সাধনকর?'

জবাবে, প্রথমে সাঠেকে একখান ছোট্ট হাসি উপহার দিলেন সত্য। তারপর সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'তাই যদি হয়, তা হলে, ধরে নিতে হবে যে, দত্তা চিনিতে বিষ মিশিয়ে রেখেছে। পরে, জোশী যখন ওর কাছে কফি চাইল, তখন, সেই বিষাক্ত চিনি দিয়ে ও নিজেই কফি বানিয়ে খাইয়ে দিল জোশীকে। জেনেশুনে, এটা ও করবে না। কারণ, আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিয়েছি যে, ওর টার্গেট জয়দীপ রায়—'

বাধা দিলেন সাঠে এঁড়ে-তর্কের ধরনে, 'কিন্তু, ও তো গাঁজা-টাজা খায়—'

সত্য হাসলেন, 'তা অ্যাডমার্কেটের বেশ কিছু লোকই হয় শুকনো, নয়, ভেজা নেশা করে থাকেন। তা হলেও, ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে খুন যে করবে, সে এমন বোকামি করতে পারে না—তা সে, দু-চার ছিলিম গাঁজা বা দু-চার পেগ মদের ঘোরেও নয়।'

'তা হলে, খুনটা করেছে কে?'

দরজার কাছে দাঁড়ানো এবং দেওয়াল-ঘেঁষে-বসা প্রায় ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে থেকে আবছা, অস্পষ্ট প্রশ্নটা উড়ে এল বাতাসে। ঘরের নৈঃশব্দের মধ্যে, উপস্থিত সকলের মনের কথা হয়ে কয়েক সেকেন্ড ঘুরে-ঘুরে মিলিয়ে গেল শব্দ ক'টি। মাদল চিনতে পারল কণ্ঠস্বর। সামান্য উত্তেজিত, অধৈর্য রমনিকভাই। স্টুডিয়ো ম্যানেজার। জোশী হত্যার দিন মিস লাখানিকেও পুলিশের জেরায় যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে—এই খবরে ভারী আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে রমনিকভাই। স্টুডিয়োর দু একজন শিল্পী হাসাহাসি করেই জানিয়েছে মাদলকে, আজ সকালে। হঠাৎ মাদলের মনে হল মিস লাখানির সঙ্গে ঢলাঢলি করতে গিয়ে মানুষটি হয়তো মনে-মনে বড়ই অপমানিত বোধ করেছে। আজ যদি প্রমাণিত হয় যে, ওই মহিলাই খুনি—তা হলে, হয়তো, রমনিকভাই সেই জ্বালা মেটাবার পরস্মৈপদী আনন্দ পাবে। সেই আশাতেই কি এই আকুল জিজ্ঞাসা?

সত্যসাধন বললেন, যেন, রমনিকভাইয়ের প্রশ্নের জবাবেই, 'সম্ভাব্য ডাইরেক্ট খুনির তালিকায় এখন তিনজন। জোশীর সেক্রেটারি মিস লাখানি, বেয়ারা শিবালকর ও মিস্টার হরবিলাস চওধরি। পরোক্ষ অথচ আসল খুনি হয়তো কোনও চতুর্থ নামের মালিক।'

বলে, এক চুমুকে জলের গেলাস পুরো খালি করে দিয়ে আবার শুরু করলেন 'মিস লাখানির নামটি এই তালিকা থেকে এক কথায় নাকচ করা যায়। কারণ উনি জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনে একবার গিয়েছিলেন ঠিকই—টি-ব্যাগ আনতে। দেড়টা-দুটো নাগাদ। এই সময়ের পরে, অর্থাৎ আড়াইটের পর জয়দীপ রায় কফি খেয়েছে। তার মানে, তখনও চিনির কৌটোয় সায়নায়েড মেশানো হয়নি। তা হলে, বাকি রইল দুজন। হরবিলাস চওধরি ও জোশীর বেয়ারা শিবালকর।—'

শিবালকর দরজার পাশে, কোণে দাঁড়িয়ে। জুলজুল চোখে চেয়ে আছে সত্যসাধনের দিকে। চওধরি সত্যর ডানদিকে পঞ্চম চেয়ারে বসে। সিগারেট ধরাল একটা।

'হত্যার দিন আমাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন হরবিলাস। জোশীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নাকি, স্রেফ—মোটামুটি। পরে, নানান সূত্রে জানা গেছে ওদের দুজনের সম্পর্ক অফিসের বাইরেও বেশ ঘন ছিল। মিসেস জোশীর সঙ্গে চওধরির ভাবের সম্পর্ক আছে। এটা বেশ বড় রকমের ব্যক্তিগত কারণ বা খুনের "মোটিভ" বলে সহজেই ধরা যেতে পারে। তাই বলে, অফিসেই মার্ডারটা করতে হবে, এটা কেমন খটোমটো। কারণ, মৃত জোশীর সঙ্গে মিস্টার চওধরির যত্রতত্র ওঠা-বসা, পানাহার চলত।'

বাধা দিলেন সাঠে, 'আপিসের ভিড়ে তৃতীয় ব্যক্তি জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনে খুন করলে তো "মোটিভ"-ওয়ালা সন্দেহের পাত্র অনেক জুটে যায়—'

সাঠের কথা শেষ হওয়ার আগেই 'হো-হো' করে হেসে উঠল হরবিলাস। ঘর সুদ্ধু সবাই চমকে অবাক চোখে ওকে দেখল। ততক্ষণে, সে কাশতে আরম্ভ করেছে। গলায় ধোঁয়া লেগে বিষম লাগার জন্যেই বোধহয়। হাসি এবং কাশি থামতে বেশ কষ্ট হল চওধরির। চোখ-মুখ লালচে-ভয়ঙ্কর তখন। কেউ কিছু বলার আগেই দত্তারাম দৌড়ে গিয়ে জল নিয়ে এসেছে গেলাসে। এক চুমুক খেয়ে,

শান্ত হল লোকটা।

সত্য জবাব দিলেন সাঠের কথার, 'বলেছ হয়তো ঠিকই। তবে ছোট্ট একটা মুশকিল থেকে যাচ্ছে।'

'কী?' সাঠের প্রশ্ন।

'জয়দীপ রায়ের ক্যাবিনের সামনে সারাক্ষণ হয় মিস সালডানা বা দত্তারাম মজুত থাকে। আমি মিস্টার চওধরির কথার সত্যতা যাচাই করতে ওদের দুজনকেই জিগ্যেস করে জেনেছি যে, বারোটা-সাড়ে বারোটায় উনি ঢুকেছিলেন রায়ের ক্যাবিনে। লাঞ্চের আগে, দেশলাই খুঁজতে। তার পরে আর যাননি। সুতরাং—বাকি থাকে—' বলে, ঘরের কোণের দিকে তাকালেন সত্যসাধন। পা ঘষে-ঘষে শিবালকর দরজার বাইরে পৌঁছে গেছে প্রায়। মাদল লাফ দিয়ে, ওর হাত চেপে ধরল। কড়া গলায় হুকুম দিল, 'ভেতরে এসো।'

ভারী মোলায়েম গলায় সত্যও ডাক দিলেন, 'এসো হে শিবালকর। কাছে এসো দেখি—'

নাকি সুরে গাঁওটি মারাঠিতে কী সব হাঁউমাউ চেঁচিয়ে, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতেই, মাদলের এক ধাক্কা। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে সামলে নিল শিবালকর। কুঁজো হয়ে হাতজোড়া করে, কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে এল লোকটা।

সত্য জিগ্যেস করলেন, 'এ মাসের শেষে তুমি রিটায়ার করবে?'

মাথা নেড়ে শিবালকর জানাল—হ্যাঁ।

'পুনা জেলায় শিরুরে তোমার কত একর জমি আছে?'

'তিন।'

'নিজেই কিনলে, না কেউ দিল?'

শিবালকর চোরের চাউনিতে, অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে মিস্টার কোরগাঁওকরের দিকে দেখল। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছেন ভদ্রলোক।

শিবালকর জবাব দিচ্ছে না দেখে, সত্যই ধরিয়ে দিলেন। 'তোমার মালিক, মিস্টার, কোরগাঁওকর দিলেন?'

'হুঁ।' মুখ নামিয়ে মাথা কাঁপাতে লাগল শিবালকর।

'দিন দশেক আগে। তাই না? কিন্তু, হঠাৎ? কেন বলো তো?'

মালিক তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। সাঠেকে বলছেন, 'এসব কী হচ্ছে— জমিজমা নিয়ে! আপনারা খুনের কিনারা করতে এসেছেন, না, জমিজিরেত নিয়ে গপ্পো? এত বছর চাকরি করে লোকটা রিটায়ার করছে—একটা গিফট দিতে পারব না! কী আশ্চর্য!'

'প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি ছাড়াও তিন-চার লক্ষ টাকার উপহার? বাঃ! ভারী উদার প্রাণ তো!—বসুন, বসুন।'

বসলেন বটে, তবে, যথেষ্ট ছটফট করতে লাগলেন কোরগাঁওকর। সাঠে জিগ্যেস করলেন, 'এসব খবর জোগাড় করলে কোত্থেকে, সাধনকর?'

'অ্যাড-মার্কেটের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার দীপন আমার পুরোনো বন্ধু—ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম পুনায়— বললুম না!'

সত্য শিবালকরের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'তোমার মালিকের ভাইয়ের কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এবং ডিলিং কোম্পানি খাপোলিতে। তুমিই সব ওষুধপত্তর এনে দাও ওঁকে?'

'জি।' ভাঙা গলায় ফুঁপিয়ে উঠল শিবালকর।

'এবার। একটা ছোট্ট গল্প শোনাব—মন দিয়ে শুনুন সবাই।—'

কোরগাঁওকর আবার উঠেছেন। দরজার দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, 'অসম্ভব! রিডিকিউলাস! এখন বসে-বসে টিকটিকির গপ্পো শোনো—আই অ্যাম সরি—আমার অনেক কাজ—'

সত্যসাধন সাঠেকে ইশারা করতেই বাজখাঁই গলায় সাঠে ডাকলেন, 'মিস্টার কোরগাঁওকর! আপনি যদি না বসেন, তো আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হবো।—'

পুলিশের মুখে 'গ্রেপ্তার' শব্দটি সবসময় কাজে দেয়।

মালিক বসে পড়তেই সত্য শুরু করলেন, 'সুবিশাল মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির মালিকের একমাত্র কন্যার সঙ্গে এক অত্যন্ত সাধারণ কর্মচারীর অনুরাগ চলছে। খবর পেয়ে, মালিকের দুশ্চিন্তা। দু-একবার আকারে-ইঙ্গিতে মেয়েকে বোঝালেন। আদুরে কন্যা বিশেষ গায়ে মাখল না। বেশি বললে আবার একগুঁয়ে মেয়ে যদি আরও বেঁকে যায় ওদিকে?—সেই ভেবে, অন্য পন্থা ধরলেন মালিক। কর্মচারীটিকে সরিয়ে দাও। নইলে, সে তো রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বের অধিপতি হয়ে বসবে! কিন্তু, নিজে এ-কাজ করা যায় না। ভাড়াটে গুন্ডা-ফুন্ডাও নিরাপদ নয়। কেমিক্যাল ডিলার কাম অ্যাডমার্কেটের অংশীদার ভ্রাতার সঙ্গে পরমার্শ করে ঠিক করলেন—পুরাতন ভৃত্যই সবচেয়ে সেফ। ভাইয়ের কাছ থেকে সামান্য কেমিক্যাল বিষ ধরিয়ে দিলেন ভৃত্যকে। আর দিলেন তোওফা হিসেবে—সুবিশাল জমি। কাজ হলে, তাকে বাড়ি করে দেওয়ার লোভও দেখালেন। জয়দীপের ঘরে অনেকেরই আসা-যাওয়া। মোটামুটি, ফাঁক বুঝে চিনির কৌটোয় সায়নায়েড ফেলে নেড়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না বিশ্বস্ত ভৃত্যের। মারা পড়লেন বেচারা জোশী।—'

উশখুশ করছিলেন কোরগাঁওকর। মরিয়া গলায় প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'প্রমাণ? প্রমাণ কী? এসবের মানেটাই বা কী?'

সত্যসাধন শান্ত গলায় ডাকলেন, 'মাদল।'

মাদল কাছে যেতে বললেন, 'যন্ত্রটা দাও এবার।'

পকেট থেকে কালো-কুচকুচে টেপ-রেকর্ডারটি বের করে দিল মাদল। একটা সরু তারও ঝুলছে ওটার সঙ্গে!

সত্য বললেন, 'আমি জানি, ভুল লোকের মৃত্যুতে খুবই আফশোস হয়েছে কর্তার। ভুল না শোধরালে তো চলবে না! এদিকে, শকুন্তলা ম্যাডাম হঠাৎ বাবার মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। আফটার অল সি ইজ প্র্যাকটিকাল অ্যান্ড কেরিয়ারিস্ট। খুনের দায়ে জয়দীপ যখন নাকাল, তখনই, মনে-মনে ম্যাডাম উক্ত কর্মচারীকে নাকচ করেছেন। কারণ, প্রেম করতে হলে অন্য কোনও বিশাল কোম্পানির মালিক বা তার ছেলেই সবচেয়ে উপযোগী। খাপোলি থেকে আবার যে সায়নাইড বা অন্য কোনও বিষাক্ত কেমিক্যাল ভৃত্যটির হাতে পৌঁছেছে গেল হপ্তায়—সেটুকু আমার আন্দাজ। তাতে ভর দিয়েই সামান্য নাটকের আশ্রয় নিলাম। আজ সকালে মাদল এসে জোশীর ঘরের টেলিফোনের সঙ্গে এই 'সোনি' টেপ-রেকর্ডারটি লাগিয়ে দিল। একটা মজা হল, এই সরু তারটির অন্য প্রান্ত দু-ভাগে ভাগ করে, একটা দিক টেলিফোনের যন্ত্র ও প্লাগ-পয়েন্টের মধ্যেকার তারে জুড়ে দিল, যখনই কোনও কথা হবে—দু-তরফের বাক্যালাপ পরিষ্কার শোনা যাবে।'

শিবালকর ততক্ষণে মেঝেয় উপুড় হয়ে বসে পড়েছে। ঝুলে পড়েছে মাথা। কালকে রুদ্রাক্ষকে জ্যান্ত ধরতে পারেননি—সেই আফশোস সাঠের মনে কাজ করেছে বোধহয়। চেয়ার থেকে উঠে, তিনি এখন কোরগাঁওকরের পিছন দিকটায় পায়চারি করছেন ধীর পায়ে।

সত্য বললেন, 'আপিস থেকে আজ জয়দীপ রায়ের মৃত্যুর খবরের পর কে-কে টেলিফোন করেছেন—হাত তুলুন।'

জুলি, মাদল ও চওধরি হাত তুলল। সত্য দেখে বললেন, 'আরও-একজন করেছে। এবং সে যে জোশীর ঘর থেকেই করবে—এটাও আশা করেছিলাম কারণ, রিসেপশান বোর্ডে ভিড় থাকবে। অন্য ডাইরেক্ট ফোন জয়দীপের ঘরে। সম্ভব নয়। শিবালকরের বস, মৃত জোশীর ক্যাবিন থেকেই তার পক্ষে সেই সময় গোপনে ফোনটা করা স্বাভাবিক।'

যন্ত্রটা চালু হল। মারাঠি ভাষায়, দুটি পুরুষ কণ্ঠ চমকে দিল নিস্তব্ধ ঘরের সবাইকে। কোরগাঁওকর ও শিবালকরের গলা শোনা গেল পরিষ্কার। প্রথমে মিস্টার কোরগাঁওকর।

'হ্যালো?'

'সাব। আমি শিবালকর।'

'হ্যাঁ বলো?'

'সাব, জয়দীপরায়-সাব খুন হয়েছে।'

'কী বলছিস তুই!' চাপা গলা মালিকের, 'বারণ করেছিলাম না—এ-সপ্তাহটা কিছু করবি না। ওফ,—'.

'কিন্তু, সাব অমি কিছু করিনি—আমি শপথ—মায়ের দিব্যি—ওষুধ আমি মেশাইনি সাব—'

'উল্লুক—হারামজাদা। কাউকে কিছু বলতে হবে না। আমি আসছি।—'

ঝপাং করে লাইনটা কাটার আওয়াজ।

চওধরি ও সাঠে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'সে কি? তাহলে, রায়কে খুন করল কে?'

সত্যসাধন হাসলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'জয়দীপ মোটেই খুন হয়নি বললাম না, নাটক করতে হল একটু! যথেষ্ট রিস্কি, একটা চান্স নিয়েই ফেললাম। জয়দীপকে বহু কষ্টে রাজি করিয়েছি।—সাঠে ভায়া, আমার কাজ শেষ। তুমি যা করবার করো। এই সব রাখো তোমার কাছে—' বলে, টেপ-রেকর্ডারটা সাঠেকে দিলেন। পকেট থেকে শকুন্তলার চিঠিচাপাটি। জয়দীপকে লেখা প্রেমপত্র।

মাদলকে বললেন, 'চলো হে! তোমার জয়দীপদাকে নিয়ে নিবেদিতার বাড়ি যেতে হবে।' বলতে-বলতে সেপাইরা জয়দীপকে ধরে আনল। সাঠেকে বলল, 'এ-আদমি ঘরের মধ্যেই ছিল। লাশ ভাগ গিয়া সাব।—'

কনফারেন্স রুমে উপস্থিত সবাই ভূত-দেখার মতো চমকে উঠেছে, মাদল এবং সত্যসাধন ছাড়া। সমবেত, চাপা, ভিন্ন-ভিন্ন আওয়াজ অনেকটা গোঙানির মতো। তারপর মৃদু গুঞ্জন।

সাঠে ঝপ করে সত্যর হাত ধরলেন। অপ্রস্তুত গলায় প্রায় ধমক দিলেন আস্তে করে, 'পুলিশকে চিট করে —ভাঁওতা দেওয়ার জন্য তোমাকেও গ্রেপ্তার করতাম সাধনকর—ইয়ে—মানে—আজকের কাগজে ওই ছবিটার জন্যে—যাও—মাফ—! আই মিন, আই ফরগিভ ইউ, অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ—' বলে, ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটালেন। চাপ দিলেন সত্যর হাতে।

দুলকি চালে ঝমর চলছে ঝমঝমিয়ে। সত্যসাধন ও মাদল সামনে। পিছনে জয়দীপ। অফিস থেকে বেরিয়ে, ঝমরে ঢুকে পিছনের সিটে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে সে। হাঁফ ছাড়ার ভঙ্গিতে বলেছে, 'উফ! হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে, সত্যবাবু! ঘাড়ে এমন ব্যথা—স্পন্ডিলাইটিস না হয়!'

মাদল জিগ্যেস করেছে, 'আড়াইটে নাগাদ ক্যাবিনে ঢুকেছেন আপনি। আমি খেয়াল রেখেছি। সেই থেকেই কি লাশ সেজে বসে ছিলেন?'

'না। জুলিকে ডেকে, একটা ফালতু লম্বা চিঠি ডিকটেট করেছি—যাতে ওর টাইপ করতে সময় লাগে। তারপর, দু-কাপ চা বানিয়ে, একই কাপে প্রথমে তৃপ্তি করে খেয়েছি। তারপর, দ্বিতীয় কাপ ভরে নিয়ে পোজিশান নিয়ে এবং পোজ দিয়ে হুমড়ি খেয়েছি টেবিলে—'

মাদল একেবারে পরান খুলে হো-হো করে হাসতে লাগল। সত্যর মুখেও হাসি। বললেন, 'সারক্ষণই কি স্ট্যাচু হয়ে ছিলেন?'

'অলমোস্ট। শুধু, সেপাই মোতায়েন হওয়ার পর একবার উঠে জল খেয়ে এসেছি—'

মাদল চমকে উঠল, যেন, এখনও অবস্থা একই রয়েছে, 'কী সর্বনাশ! যদি ধরা পড়ে যেতেন? যদি কোনও শব্দ হত?'

সত্য বললেন, 'আহ-হা! এখন আর অত ঘাবড়াচ্ছ কেন হে! ধরা তো উনি পড়েননি!'

জুড়ে দিল জয়দীপ, 'পড়েছে দুই "কর"। মনিব ও পুরাতন ভৃত্য।'

অফিস-ছুটির ভিড় আরম্ভ হব-হব রাস্তায়। পেডার রোডে যানজটের উপক্রমণিকা শুরু হয়ে গেছে। সিগন্যালে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে ঝমর। সত্য জিগ্যেস করলেন, 'ওরা ঠিক আছে? আপনার ভাই-বোন? ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

জয়দীপ বলল, 'গ্লুকোজ ইঞ্জেকশানেও পুরো ফ্লাশ হয়নি ঘুমের ওষুধ। পরপর ক'দিন—দু-বেলা—। ডাক্তার বলল, কালকেই পুরো সজাগ হয়ে উঠবে ওরা।'

'ইশ। এমন গুণী বদমায়েশকে ধরতে পারলুম না।'

সত্যকাকু আপনমনে বললেও মাদল বুঝল, রুদ্রাক্ষের জন্যে আফশোস হচ্ছে। ও জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা কাকু! আপনার পকেট রেকর্ডার শুনে মনে হল, আপনি সবার কাছ থেকেই সিগারেট চেয়েছেন? কেন?'

সবুজ সিগন্যাল পেয়ে ঝমর চলল। সত্য বললেন, 'যেখানে পাইবে ছাই—উড়াইয়া দ্যাখো তাই। পাইলে পাইতে পারো—।'

মাদল-জয়দীপও যোগ দিয়ে বলল ওঁর সঙ্গে, 'অমূল্য রতন!' এবং মাদল খেই ধরাল, 'পেলেন?'

'না। সিগারেটের রাংতার টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলুম জয়দীপের ক্যাবিনে। সেটা ওরই। কারণ, স্রেফ ওরই আঙুলের ছাপ রয়েছে তাতে।'

ডানদিকের গলিতে ঢুকে, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝমর। মাদল জিগ্যেস করল, 'আর চিনির কৌটোয়? আঙুলের ছাপ?'

'একমাত্র দত্তারামের পাওয়া গেছে।'

'সে কী? তাহলে?'

ঝমর থেকে নামতে-নামতে সত্য বললেন, 'হয় নির্দেশ ছিল মনিবের, নয়, শিবালকর মহা-চালাক। খুব সম্ভবত, রুমালে হাত জড়িয়ে ঢাকনায় চাপ দিয়ে, এক হাতেই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে খুলে ফেলেছে কৌটো!'

'কিন্তু কখন? জুলি বা দত্তারাম তো সারাক্ষণই ওখানে বসে থাকে?'

'দত্তা গাঁজা খেতে পালিয়েছিল। জুলিও গিয়েছিল টয়লেটে। সুযোগ সন্ধানী শিবালকর ফাঁক পেয়ে গেছে। অথচ, ভুলেই হয়তো, আমাকে বলে ফেলেছিল—"চিনি" খেতে ঢুকেছিল একবার—ক্যাবিনে!'

কলিং বেল টিপতেই হাসিমুখে দরজা খুলে দিল নিবেদিতা। জিগ্যেস করল, 'ঝামেলা সব মিটল?'

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সত্য বললেন, 'উঁহু এখনও একটা বাকি।'

নিবেদিতার ভুরু সামান্য কোঁচকাল। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ উদ্বেগ, 'সে কী? খুনি ধরা পড়েনি?'

চোখ নাচিয়ে সত্যর জবাব, 'তা পড়েছে। দু-দুটো। কিন্তু, একটা কনে এখনও ধরা পড়েনি। বলি, বিয়েটা হবে তো?'

নিবেদিতার মুখটি স্বাভাবিক হল। জয়দীপের দিকে পলক ফেলে লজ্জার ছোঁয়ায় সুন্দর হল আরও। মাথা নীচু করে বলল, 'আসল পুরুত চাই কিন্তু।'

শেষে দিল রা



মনোজ সেন

॥ ১ ॥

রোববারের বিকেল। দময়ন্তী ঘটর-ঘটর করে কল চালিয়ে সেলাই করছে দেখে সমরেশ একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে পড়ার তালে ছিল। সবে আলমারি থেকে কিছু টাকা বের করে পকেটে ঢুকিয়েছে, দময়ন্তী পিছন থেকে খপ্ করে ধরে ফেলল।

'কোথায় চলেছ শুনি?' দময়ন্তী ভ্রূকুটি করে জিগ্যেস করল।

'এই না, মানে, একটু বেরোচ্ছিলুম আর কি।' সমরেশ আমতা-আমতা করে বলল।

'বেরোচ্ছিলে তো বুঝেছি। যাচ্ছটা কোথায়?'

'এই এদিক-ওদিক। মানে ভাবছিলুম একটু রথীনের বাড়ি থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়।'

'খুব ভালো হয়। রথীনের বাড়ি জমাট আড্ডা বসে, সেখানে একবার গেলে উঠবে তো সেই রাত ন'টায়। ততক্ষণ আমি ঘরে বসে-বসে পচি আর যাই করি, তোমার তাতে কী যায় আসে? যেন আমার কোনও আনন্দ নেই, ফূর্তি নেই। কলেজ আর রান্নাঘর, রান্নাঘর আর কলেজ।'

'আহা, এই তো সেদিন নৈহাটি থেকে ঘুরে এলুম।' সমরেশ বোঝাতে গিয়ে গিন্নির মুখ চিমনির কালি হেন দেখে তাড়াতাড়ি স্ট্র্যাটেজিটা পালটে ফেলল। 'অবিশ্যি তাতে কী হয়েছে? চলো না, দুজনেই যাই। কোথাও বেড়িয়ে আসি। আমি ভেবেছিলুম তুমি কাজ করছ। তাই...।'

দময়ন্তী হেসে ফেলল। বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। চিত্রঘরে "মনে পড়ে হায়" দেখাচ্ছে। শুনেছি খুব ভালো হয়েছে। চলো, দেখে আসি।'

সমরেশের চক্ষু চড়কগাছ। বলল, ' "মনে পড়ে হায়"? ওই স্যাঁতসেঁতে প্যানপেনে বাংলা বই তুমি আবার দেখবে? সেদিন একটা দেখে সাধ মেটেনি? ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কেঁদে যে কী সুখ পাও!'

দময়ন্তীর মুখে আবার ক্রীড়মান পরিণত গজের মতো মেঘ ঘনীভূত হয়ে এল। বলল, 'আমাদের যে কীসে সুখ তা কি তোমরা কোনওদিন বোঝবার চেষ্টা করেছ?'

খুব বিপদে পড়লে সমরেশের দিব্যচক্ষু মাঝে-মাঝে খুলে যায়। হঠাৎ তার প্রভাবে উল্লসিত হয়ে বলল, 'তার চেয়ে চলো শ্রীরূপাদের বাড়ি যাই। অনেকদিন যাইনি।'

দময়ন্তীর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই ভালো।'

॥ ২ ॥

শ্রীরূপা দময়ন্তীর অনেকদিনের বন্ধু। স্কুল থেকে একসঙ্গে পড়েছে। কলেজেও একসঙ্গে ঢুকেছিল, কিন্তু বি-এ পরীক্ষার আগেই শ্রীরূপার বিয়ে হয়ে গিয়ে রোজকার দেখাশুনোয় ছেদ পড়ে। তবে তাতে অন্তরঙ্গতার কোনও অভাব ঘটেনি। শ্রীরূপার স্বামী বিশ্বরূপ মৈত্র ইকনমিক্সের মতো নীরস বিষয়ের অধ্যাপক হয়েও অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, আড্ডাবাজ, জমাটি চরিত্র। তিনি অন্যরকম হলে হয়তো সম্পর্কেও ছেদ পড়ত, কিন্তু তার বদলে অন্তরঙ্গতা আরও ঘনীভূতই হয়েছে। সমরেশ তো মিস্টার মৈত্র বলতে অজ্ঞান, যদিও বয়েসে দুজনের তফাত অনেক। বিশ্বরূপ সমরেশের চেয়ে প্রায় আট বছরের বড়। অবশ্য তাতে দুজনের প্রচণ্ড আড্ডা মারার কোনও অসুবিধে হয় না। ভদ্রলোকের পাণ্ডিত্য অগাধ, ওঁর সঙ্গে একসন্ধে কাটিয়ে এলে সমরেশ নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করে। ওঁর বসবার ঘরে সমরেশের অবারিত দ্বার, চারজন একত্র হলে গানে, গল্পে, খাওয়া-দাওয়ায় সময়টা নিমেষে কেটে যায়।

শ্রীরূপারা যদি কাছাকাছি থাকত তাহলে বোধহয় রোজই আড্ডা বসত, কিন্তু দুঃখের বিষয়,

জগতে ভালো-ভালো জিনিসগুলো সাধারণত খুব সহজলভ্য হয় না। রাধাকান্ত মৈত্র লেনে ওদের বাড়িটা উত্তর কলকাতার একপ্রান্তে। এই দূরত্বটাই অসুবিধেজনক। যদিও একটা বাসেই অর্কিড রোড থেকে ওখানে যাওয়া চলে, আর যদি দোতলায় বসবার জায়গা পাওয়া যায় তাহলে তো যাত্রাটা প্রায় আনন্দজনকই হয়। তাহলেও অতদূর যেতে হবে ভাবতেই সমরেশের গায়ে জ্বর আসে! নিতান্ত বেকার না হলে ওদিকে যাওয়ার কথা আর মনে আসে না।

আপার সার্কুলার রোডে রাধাকান্ত লাইব্রেরির স্টপে বাস থেকে নামতে হয়। লাইব্রেরির পাশ দিয়ে কংগ্রেস রোড দিয়ে একটু এগিয়ে রাধাকান্ত মৈত্র লেন। গলিটা ব্লাইন্ড। একদিকে পুরোটা জুড়ে রাধাকান্ত লাইব্রেরির প্রকাণ্ড চারতলা লাল রঙের বাড়ি আর অন্যদিকে প্রায় দশ বিঘে জমির ওপর শ্রীরূপাদের মান্ধাতার আমলের বাড়ি। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও বাড়ি নেই রাস্তাটায়।

রাস্তার মাঝামাঝি লোহার কারুকার্য করা ফটক, দু-পাশে প্রায় দেড় হাত ব্যাসের লতাপাতা, কাটা স্তম্ভ, তার ওপরে সিংহের গম্ভীর মূর্তি দম্ভভরে বসে আছে। তারপর প্রায় পঁচিশ গজ লনের পর বাড়ি।

বাড়িটা একটু অদ্ভুত। বহুদিনের পুরোনো বাড়ি, যদিও বেশ সযত্নেই রক্ষিত। বাড়িটা যিনি তৈরি করেছিলেন, তিনি পয়সাওলা লোক ছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারীরাও কম অর্থশালী ছিলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়িটা অসম্ভব রকমের চাঁছাছোলা, সাদামাটা, কোনওরকম অলঙ্কারবর্জিত। চারদিকে স্রেফ চুনকাম করা নিরেট খাড়া দেওয়াল, একমাত্র জানলাগুলো ছাড়া আর কোথাও কোনও ফাঁক-ফোকর বা উঁচু-নীচু টক্কর বলে কিচ্ছু নেই। একতলার জানলাগুলো বড়-বড়, প্রায় মেঝে পর্যন্ত, দোতলার জানলাগুলো আবার ছোট-ছোট। সেগুলোতে যদি রঙিন পরদা না ঝুলত, তাহলে বোধহয় সেগুলোকে অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের কোটরের মতো দেখাত। প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ি, সে-যুগে যেমন হত। যদিও দোতলা, দেখায় তিনতলার মতো।

একতলায় একটা ফুট পাঁচেক চওড়া দরজা আছে—সেটাই প্রধান প্রবেশ পথ।

সমরেশ আর দময়ন্তী গেটের কাছে পৌঁছে দেখতে পেল, শ্রীরূপা লনে একটা বেতের চেয়ার পেতে বসে আছে আর ওর কাছে তিন বছরের ছেলে শান্তরূপ ওরফে শান্ত খেলা করছে। শান্তই ওদের প্রথম দেখতে পায়। রবারের বলটা মার কোলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, 'মা, দেখো কে এসেছে।'

অন্যান্য বারের মতোই এবারও শ্রীরূপার সহর্ষ অভ্যর্থনা আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু ঘটনাটা ঘটল অন্যরকম। সমরেশদের দেখেই শ্রীরূপা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে শান্তকে কোলে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। মুখে আনন্দের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

॥ ৩ ॥

গেটটা খুলে সমরেশ আর দময়ন্তী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা ওদের এই প্রথম এবং অকল্পনীয়পূর্ব। শ্রীরূপা দময়ন্তীকে দেখে খুশি হয়ে উঠবে না, এটা স্বপ্নে ভাবা যায় না। ওকে যতদূর জানা আছে, তাতে এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, শ্রীরূপার মনটা স্বচ্ছ এবং নির্মল। কেউ অপমান করলেও ও মুখ কালো করে না, হেসে উড়িয়ে দেয়। কারোর ওপর রাগ করলে, গজগজ করতে-করতে তাকে একটা ভয়ানক কড়া চিঠি লিখতে বসে, পাঁচ মিনিটে দশটা কাগজ ছেঁড়া হয়ে যায়, তারপরে রাগটা পড়ে যায়।

সমরেশ কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপারটা কী হল?'

দময়ন্তী বলল, 'কী জানি। হয়তো কেউ ভেতরে ডেকেছে, এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে।'

কিন্তু পঁচিশ গজ লন পেরোতে-পেরোতেও কেউ বেরিয়ে এল না। অবাক বিস্ময়ে দুজনে নিঃশব্দে গিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

বাড়িটার ওপর-নীচে চারটে করে মোট আটখানা ঘর, মাঝখানে সিঁড়ি। একতলায় একজন ভাড়াটে আছেন, বঙ্কিমচন্দ্র পাল। দোতলায় তিনটে ঘর নিয়ে ডক্টর মৈত্র থাকেন, একটা ঘর তালাবন্ধ থাকে।

সিঁড়িটা খুব চওড়া, শ্বেতপাথরে বাঁধানো, দোতলায় উঠে শেষ হয়ে গেছে। সেখানে চওড়া শ্বেতপাথরে বাঁধানো চত্বর। বাঁ-দিকে বসবার ঘর, ডানদিকে অন্দর।

দুজনে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এসে চত্বরে দাঁড়াল। চারিদিক নিস্তব্ধ, শান্তর গলা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। খানিকক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত সমরেশ বাজখাঁই গলায় হাঁক মারল, 'মিস্টার মৈত্র বাড়ি আছেন নাকি?'

কোনও সাড়া নেই। বেশ কিছুক্ষণ পরে ডানদিকের দরজার পরদা সরিয়ে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ষোলো-সতেরো বছরের, বোধহয় বাড়ির ঝি হবে। সে বাঁ-দিকের দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'বাবু বাড়ি নেই। আপনারা বসুন, উনি এক্ষুনি আসবেন।'

সমরেশের হঠাৎ মনে হল, নীচে যাকে দেখে শ্রীরূপা বলে মনে হয়েছিল সে হয়তো শ্রীরূপা নয়, অন্য কেউ। হয়তো শ্রীরূপার কোনও বোন হবে। তাইতে ওর মনটা খুশি হয়ে উঠল। বসবার ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে জিগ্যেস করল, 'মা বাড়ি নেই?'

'আছেন।'

'তাহলে ওঁকে একটু ডেকে দাও, বলো সমরেশবাবু এসেছেন।'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে অদৃশ্য হলে সমরেশ দময়ন্তীকে বলল, 'তুমি এখানে বসছ কেন? ভেতরে যাও। নীচে যাকে দেখলুম, সে বোধহয় শ্রীরূপা নয়, শ্রীরূপার বোন-টোন হবে।'

মাথা নেড়ে দময়ন্তী বলল, 'নাঃ, এখানেই বসি। আর নীচে যাকে দেখেছি, সে শ্রীরূপাই, অন্য কেউ নয়। তা ছাড়া, শুনলে না, শান্ত ওকে মা বলে ডাকল?'

সমরেশ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'হুঁ, তা বটে। কিন্তু ব্যাপারটা কী, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি জানো কিছু?'

চিন্তিত মুখে দময়ন্তী বলল, 'নাঃ, কিচ্ছু না।'

॥ ৪ ॥

প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল, অন্দর থেকে কেউ এল না। সমরেশের বিস্ময় ততক্ষণে ক্ষোভে পরিণত হয়েছে। বলল, 'দুত্তেরি ছাই! কী হয়েছে, আমি জানতে চাই না। চলো, চলে যাই।'

দময়ন্তী স্থির হয়ে বসে কি চিন্তা করছিল। চটকা ভেঙে বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। চলো।'

দুজনে উঠতে যাবে, এমন সময় সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু বাদেই পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন গৃহকর্তা। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, অত্যন্ত ফরসা আর মাথাজোড়া প্রকাণ্ড টাক। চওড়া ফ্রেমের চশমার পিছনে একজোড়া উজ্জ্বল চোখ আর মোটা-গোঁফের নীচে দৃঢ় সংবদ্ধ অথচ সংবেদনশীল ঠোঁট। ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গে শিক্ষা আর আভিজাত্যের ছাপ।

ঘরে ঢুকে অতিথিদের দেখে বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, 'আরে! তোমরা কতক্ষণ।'

সমরেশ নীরস গলায় বলল, 'এই মিনিট পনেরো হবে।'

'শ্রী কোথায়?'

দুজনে চুপ করে আছে দেখে বিশ্বরূপ আবার জিগ্যেস করলেন, 'আসেনি?'

দুজনে তখনও চুপ।

বিশ্বরূপ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মায়া! মায়া!'

পূর্বদৃষ্ট মেয়েটি নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকল। বিশ্বরূপ তাকে বললেন, 'মাকে একবার ডেকে দাও। বলো, আমি ডাকছি।'

মায়া অদৃশ্য হলে, বিশ্বরূপ বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে একটা সোফায় বসলেন। বললেন, 'একটা ব্যাপার হয়েছে।'

শান্ত গলায় দময়ন্তী বলল, 'বুঝেছি। কী ব্যাপার?'

'বলছি। শ্রী আসুক।'

একটু বাদেই শ্রীরূপা ঘরে এসে ঢুকল। আঁচলে মুখের আধখানা ঢাকা, চোখ দুটো লাল, স্পষ্টতই জোর করে চোখে:. জল মোছার ফল।

বিশ্বরূপ ক্ষুব্ধ অভিযোগের স্বরে বললেন, 'এরা আমাদের বাড়ি এসেছে, আর তুমি এদের একলা বসিয়ে রেখেছ? একবার এলে না পর্যন্ত?'

চাপা গলায় শ্রীরূপা বলল, 'আমি কেন আসব? আমার কাছে তো ওরা আসেনি! তুমি ডেকে পাঠিয়েছ, তুমি কথা বলো।' বলে দাঁড়িয়েই রইল, বসল না।

সমরেশ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে বিশ্বরূপ বললেন, 'তুমি বিশ্বাস করো, শ্রী, আমি ওদের ডেকে পাঠাইনি। তুমি তো জানো, আমি প্রতিশ্রুতি ভাঙি না।'

আঁচলের তলা থেকে বন্দুকের গুলি ছুটে এল, 'জানি। আর এ-ও জানি, লোভ মানুষকে সম্পূর্ণ পালটে দেয়, অমানুষ করে তোলে পর্যন্ত। লোভী মানুষ নিজের সন্তানকে পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।' বলতে-বলতে শ্রীরূপার গলা কান্নায় ভারী হয়ে এল। কোনওক্রমে উদগত অশ্রু চেপে বলল, 'আমি যাই, শান্তকে খাওয়াতে হবে।'

॥ ৫ ॥

শ্রীরূপা চলে যেতে স্তম্ভিত সমরেশ আত্মসম্বরণ করতে পারল না। বলল, 'এ যে অবিশ্বাস্য, মিস্টার মৈত্র! কী ব্যাপার?'

মৈত্র বিষন্ন দৃষ্টিতে দরজার দিকে চেয়ে ছিলেন। আত্মগত ভাবে বললেন, 'শ্রী হয়তো ঠিকই বলেছে। লোভ মানুষকে পালটে দেয়, হয়তো আমাকেও দিয়েছে। কতখানি আমি জানি না। কিন্তু অন্ধ কুসংস্কার যে একজনকে কতদূর পালটে দিতে পারে, আজ সেইটে দেখলে, সমরেশ। শ্রীকে প্রায় চেনা গেল না, তাই নয়?

সমরেশ বলল, 'তাই বটে। কিন্তু কুসংস্কারটা কী? আর তার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়লুম কী করে?'

বিশ্বরূপ বললেন, 'বলছি। আসলে আমি একটা সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছি। সেটা বললেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

. দময়ন্তী বলল, 'কিন্তু শ্রীর কথায় বোঝা গেল, এ-সমস্যার সমাধান হয়, সেটা ওর ইচ্ছে নয়। এ-অবস্থায় আমাদের সেটা শোনা কি উচিত হবে?

'সেটা তুমি বিবেচনা করে দেখো। এ-কথা সত্যি যে, আমি আমার সমস্যাটার সমাধান করার উদ্দেশ্যে তোমার সাহায্য নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলুম এবং আজকের এই অশান্তির কারণটা তাই। শ্রীর বিশ্বাস, তোমাকে সমস্যাটা বললেই তুমি তার সমাধান বের করে ফেলবে। এতে করে, তোমার বন্ধুর তোমার পরিজ্ঞানের ওপর অগাধ বিশ্বাস প্রমাণিত হয় ঠিকই, কিন্তু অশান্তিটা আটকায় না। যা হোক, সমস্যাটা আমার, সংস্কারটা তোমার বন্ধুর। এখন, আমিও নিজেকে তোমার বন্ধু বলেই

মনে করি। এ-অবস্থায়, তোমার বেশিদিনের বন্ধুর কুসংস্কারের মর্যাদা রাখতে অল্পদিনের বন্ধুকে সাহায্য করবে কিনা, সেটা বিচার করে দেখো।'

দময়ন্তী কোনও জবাব দেওয়ার আগেই সমরেশ জিগ্যেস করল, 'কিন্তু সমস্যাটার আগে কুসংস্কারটা কী, সেটা শুনলে হত না? আপনাদের এই মান্ধাতার আমলের বাড়িটার আনাচে-কানাচে কত যে অদ্ভুত সব সংস্কার লুকিয়ে আছে, তার তো হিসেব নেই। তাঁদের কোনটি এসে শ্রীমতী শ্রীরূপার ঘাড়ে চেপেছেন, সেটা আগে জানতে পারলে সুবিধে হত।'

'কেন, কী সুবিধে হত?' দময়ন্তী জিগ্যেস করল।

'হয়তো জুতোর সুকতলা পুড়িয়ে তার ধোঁয়া নাকে দিতে পারলে আপনিই ওসব ছেড়ে যেত। তখন নিশ্চিন্তে সমস্যার সমাধান হত।'

বিশ্বরূপ ম্লান হাসলেন। বললেন, 'না হে, জুতোর শুকনো সুকতলার কম্ম নয়। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, তবে যদি কোনও কাজ হয়। এখন, দময়ন্তী, তোমার রায় কী?'

দময়ন্তী চিন্তিত ভাবে বলল, 'আপনি যদি সমস্যাটা আমাকে বলেন, তাহলেও কি কোনও সাংসারিক অশান্তির সম্ভাবনা আছে?'

ইতিমধ্যে কখন যেন শ্রীরূপা আবার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর কণ্ঠস্বরে সবাই চমকে উঠল, 'না, বরং ওকে বলতে না দিলেই অশান্তির শেষ নেই। তোকে না শোনানো পর্যন্ত ওর মনে শান্তি নেই। যাই হোক, আমি তো আর এ-বাড়িতে থাকছিই না। শান্তকে নিয়ে দাদার কাছে চলে যাব। লাথি-ঝাঁটা খেয়েও শান্তকে বড় করে তুলতে পারব, আশা করি। কাজেই সাংসারিক অশান্তি আর কী হবে? তুই ওকে বলতে দে।'

দময়ন্তী উদ্বিগ্ন চোখে বিশ্বরূপের দিকে তাকাল। বলল, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো? শ্রীকে দুঃখ দিয়েও আপনার সমস্যার সমাধান দরকার—এ তো চিন্তা করা যায় না, মিস্টার মৈত্র!'

নিষ্পলক অসহায় চোখে শ্রীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন বিশ্বরূপ, স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া মানুষ যেমন আর্ত চোখে চেয়ে থাকে তীরের দিকে। দময়ন্তীর কথায় কিছুটা আত্মস্থ হলেন। বললেন, 'শ্রীকে দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, দময়ন্তী। আমি যে-কথাটা ওকে বোঝাতে পারছি না, তা হল, ওর দুঃখ লাঘব করাই আমার উদ্দেশ্য।'

শ্রীরূপা বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনও কথা বলবার আগেই কেঁদে ফেলল। ওর মুখের দিকে একপলক চেয়ে দময়ন্তী দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'কাঁদিসনি, শ্রী। মিস্টার মৈত্রের সমস্যাটা কী শোনাই যাক, ওঁর মনের ভারও হালকা হোক। হয়তো তার সমাধান আমি করতেই পারব না। যদি পারিও তাহলেও তা প্রকাশ করব না, যদি বুঝতে পারি যে তাতে তোদের একজনেরও অমঙ্গল হবে। আমার ওপর এ-আস্থা রাখতে পারিস।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিশ্বরূপ বললেন, 'সাবাস দময়ন্তী, বাঁচালে। এবারে আমার প্রবলেমটা শোনো।'

'গোড়াতেই বলে রাখি, বিষয়টা একটু বিশদভাবে বলা দরকার, তা না হলে তোমার বন্ধুর এত অশ্রুর কারণটা তোমার ভালো করে বোধগম্য হবে না। এর জন্য আমাদের পরিবারের ইতিহাসটা তোমাকে একটু শুনতে হবে।'

॥ ৬ ॥

'তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী এবং অধ্যাপিকা। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে যে, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বরেন্দ্রী থেকে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ এসে কৃষ্ণনগরে বসতি স্থাপন করেন। আমার

অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বগলাচরণের বাবা ছিলেন এইরকম একটি পরিবারের কর্তা। সোজা বাংলায় উনি হচ্ছেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা।'

বিস্ফারিত চোখে সমরেশ বলল, 'ওরে বাবা! এ যে পলাশীর যুদ্ধের আমলের কথা।'

'ঠিক তাই। পলাশী যুদ্ধের আমলেরই কথা। যা হোক, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বগলাচরণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্দান্ত এবং ডানপিটে। ১৭৯০ সালে তাঁর জন্ম আর ১৮০০ সালের গোড়ার কয়েকটা বছর কাটতে-না-কাটতেই ভদ্রলোক ত্যাজ্যপুত্র।

'কলকাতা তখন সদ্যোজাত। বগলাচরণের মতো বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলেদের তীর্থস্থান। কাজেই গত শতকের গোড়ার দিকে একদিন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার বাবা ঠুকঠুক করতে-করতে এই শহরে এসে উপস্থিত হলেন।

'এসে যে তিনি কী করেছিলেন, আল্লায় মালুম। কিন্তু ১৮২৫-এর মধ্যেই দেখছি তিনি কলকাতার একজন মহাপ্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, সকলের শ্রদ্ধা এবং ঈর্ষার পাত্র। ১৮৩০ সালে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভোলানাথের জন্ম হয় এবং সে-বছরেই এই জমিটা কিনে বগলাচরণ তাঁর ভদ্রাসন পত্তন করেন। না-না, এ-বাড়িটা নয়। ওই যে রাধাকান্ত লাইব্রেরির বিশাল বাড়িটা দেখছ, ওটাই ছিল তাঁর বসতবাড়ি। ১৮৫০ সালে আটষট্টি বছর বয়েসে বগলাচরণ তাঁর দুই ছোট ছেলে কাশীনাথ আর রমানাথকে নিয়ে প্রয়াগে তীর্থ করতে যান, আর ফিরে আসেননি। শোনা যায়, সিপাহী বিদ্রোহের দলছুট একদল সিপাহী তাঁদের সকলকে খুন করে টাকাপয়সা সব হস্তগত করে। বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁদের সঙ্গে টাকাপয়সা কিছু কম ছিল না।

'ভোলানাথের তিরিশ বছর বয়েসে আমার ঠাকুরদার বাবা ত্রৈলোক্যের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে ভোলানাথ তাঁর টাকাপয়সা আরও বাড়িয়েছেন। তাঁর প্রখর ব্যাবসাবুদ্ধি ছিল, তার ওপর বিবেক বা বদনেশা কোনওটাই ছিল না। কাজেই একসময়ে তিনি যে কলকাতার একজন ধনীশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবেন তাতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এবং এই সুখ্যাতির জন্যেই তাঁকে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয় ডাকাতের হাতে। একদিন রাত্রে বাড়িতে ঢুকে তারা নৃশংস ভাবে সবাইকে হত্যা করে। অথচ পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করছে যে, তারা টাকাপয়সা সম্ভবত কিছুই নিয়ে যেতে পারেনি। ত্রৈলোক্য মামাবাড়ি ছিলেন সে-রাত্রে, কাজেই প্রাণে বেঁচে যান।

'ত্রৈলোক্য মাত্র তিন বছর বয়সে পিতৃহারা হন। কিন্তু তিনি দারুণ ঐশ্বর্যের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠেন। বড় হয়ে ওঠার পর দেখা গেল যে, তিনি প্রতিভার ক্ষেত্রে তাঁর বাপের ওপরেও এককাঠি। যেখানে পয়সা, সেখানেই ত্রৈলোক্য। মাত্র চল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন ত্রৈলোক্যনারায়ণ, কিন্তু তার মধ্যেই অবিশ্বাস্য পরিমাণে পয়সা রোজগার করে গেছেন।

'ইতিমধ্যে আমাদের বংশে একটা কুসংস্কার চালু হয়ে গেছে যে, বগলাচরণের বাড়িটা অভিশপ্ত। সে-বাড়িতে যে-ই থাকে সে-ই অপঘাতে মারা যায়। এটা অবশ্য কেবল পুরুষদের প্রতিই প্রযোজ্য। মজা এই যে, এ-কথা কেউই বিচার করে দেখেনি যে, যখন ব্যাঙ্ক ছিল না তখন বড়লোকদের টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি বাড়িতেই মজুত রাখতে হত এবং সেই সঞ্চিত সম্পদের জন্য চোর-ডাকাতদের হাতে প্রাণ খোয়ানো ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বিচার আর কুসংস্কার তো একসঙ্গে চলতে পারে না।

'তবে এই কুসংস্কার ত্রৈলোক্যকেও অধিকার করে এবং তিনি তারই বশবর্তী হয়ে নিজে থাকার জন্যে এই বাড়িটা তৈরি করেন ১৮৮৫ সালে এবং তাঁর ঠাকুরদার বসতবাড়িটাকে পরিণত করেন কাছারিবাড়িতে। সে-সময় এ-দুটো বাড়িই ছিল একই জমির ভেতরে, রাধাকান্ত লেন তখন ছিলই না। একটা ঢাকা বারান্দা, যেমন মেডিক্যাল কলেজে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার জন্যে করা আছে, যোগ করে রেখেছিল কাছারিবাড়ি আর অন্দরমহলকে।

'বগলাচরণের বাড়ি ছেড়ে দিয়েও কিন্তু ত্রৈলোক্যনারায়ণ অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা

পেলেন না। ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বরানগরের বাগানবাড়িতে ফুর্তি করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে ডাকাতের হাতে সবান্ধব নিহত হন।'

দময়ন্তী এখানে বাধা না দিয়ে আর পারল না। বলে উঠল, 'কী ভয়ানক!'

'হ্যাঁ। ভয়ানকই বটে। এবং এটাই শেষ নয়।'

'ত্রৈলোক্যনারায়ণের মৃতদেহ যখন বাড়িতে এল, তখন স্বভাবতই বিরাট হুলুস্থুল পড়ে গেল। ত্রৈলোক্যের দুই স্ত্রী—জ্ঞানদাসুন্দরী আর শকুন্তলার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, যদিও জানা যায় দুজনে অন্তরঙ্গ ছিলেন সতীন হওয়া সত্ত্বেও। জ্ঞানদাসুন্দরী ঘোষণা করলেন, অপঘাত মৃত্যুর যে সংস্কারটা বলে বগলাচরণের বাড়ির দোষ সেটা ঠিক নয়, দোষটা বগলাচরণের সম্পত্তির। অতএব, সকলের উচিত পত্রপাঠ সমস্ত সম্পত্তি দান করে দেওয়া। শকুন্তলা কিন্তু এই সংস্কারের নতুন সংস্করণটাকে মোটেই পাত্তা দিলেন না। টাকার মূল্য তিনি বুঝতেন, কাজেই সম্পত্তি দান করা ব্যাপারটা তাঁর কাছে মোটেই ভালো লাগল না। অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল মহিলা ছিলেন, সে-যুগে অমন ঋজু বলিষ্ঠ মনের মহিলা বড় দেখা যেত না। দুঃখের কথা, আমার ঠাকুরদার মা শকুন্তলা ছিলেন না, ছিলেন জ্ঞানদাসুন্দরী।'

শ্রীরূপা কান্নাভেজা গলায় বলল, 'সত্যিই দুঃখের কথা। শকুন্তলা তোমার পূর্বপুরুষ হলে তোমাকে আর জন্মাতে হত না আর আজকে এই সমস্যাও উঠত না।'

মৃদু হেসে বিশ্বরূপ বললেন, 'সে যাই হোক, ত্রৈলোক্যের শেষকৃত্যের পরেই জ্ঞানদাসুন্দরী একবস্ত্রে তাঁর দুই ছেলে রাধাকান্ত আর শঙ্করনাথকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। রাধাকান্তর বয়েস তখন পনেরো, শঙ্করনাথের দশ। আর শকুন্তলা তাঁর তিন ছেলে গঙ্গাধর, চন্দ্রধর আর জয়রামকে নিয়ে ত্রৈলোক্যের ব্যাবসা আর জমিদারি দেখাশুনো আরম্ভ করেন। সেসময় গঙ্গাধরের বয়েস ষোলো, চন্দ্রধরের চোদ্দো আর জয়রামের বারো। পঞ্চপাণ্ডবের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

'ছোটরানি দুই ছেলেকে নিয়ে ডেরা বাঁধলেন শ্যামবাজারে।'

'ত্রৈলোক্যের মৃত্যুর পর শকুন্তলা হাল ধরলেন বটে, কিন্তু ভালো ম্যানেজ করতে পারলেন না। পূর্ববঙ্গের বিশাল সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেল শয়তান কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রে। কলকাতার ব্যাবসাপাতিও লাটে ওঠবার অবস্থা হল। গঙ্গাধরের বয়েস যখন কুড়ি তখন শকুন্তলা ভগ্নহৃদয়ে, অর্থাভাবের মধ্যেই মারা গেলেন।'

'গঙ্গাধর, বগলাচরণের বংশে যা কেউ কখনও করেনি, চাকরি নিলেন।'

সমরেশ প্রশ্ন করল, 'মাত্র চার বছরে অত বিশাল সম্পত্তি শেষ হয়ে গেল? সব টাকাই বুঝি ব্যাবসায় লগ্নি করা ছিল?'

'না, তা ছিল না? এবং ছিল না যে সেটা পরে বুঝতে পারবে।'

'যাই হোক। গঙ্গাধর মোটামুটি ভালোই চাকরি করতেন, বুদ্ধিমান লোক ছিলেন বলে বিলাসিতাও অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ে-থা করেননি। ভাইদের অন্ধের মতো ভালোবাসতেন, তাদের মানুষ করে তোলার জন্যে সর্বদা চেষ্টা করে গেছেন। শান্ত, নির্বিরোধ ভালোমানুষ লোক ছিলেন, সেজন্যে অনেকে তাঁকে নানাভাবে ঠকিয়েছে, দুঃখ দিয়েছে।

তাঁকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছিল তাঁর ছোট দুই ভাই। প্রথম-প্রথম তারা ভালোই ছিল, ভালো লেখাপড়া শিখেছিল, ভালো চাকরিতেও ঢুকেছিল। কিন্তু হঠাৎ তাদের ডানা গজাল, তারা উড়তে আরম্ভ করল।

'আর সে কী ওড়া! চৌরঙ্গী পাড়ায় বাড়ি কেনা হল, সেখানে দু-বেলা দীয়তাং, ভুজ্যতাং চলতে লাগল। নাচনা, গাওনা কত কী।'

'ওঁদের তখন কত বয়েস?' দময়ন্তী জিগ্যেস করল।

'চন্দ্রধর তখন চৌত্রিশ হবে, তাহলে জয়রাম বত্রিশ।'

'অর্থাৎ, ত্রৈলোক্যনারায়ণ মারা যাওয়ার প্রায় বিশ বছর বাদে?'

'হ্যাঁ। স্পষ্টতই, তারা ত্রৈলোক্যনারায়ণের, শুধু ত্রৈলোক্যনারায়ণের কেন, তাদের বংশের সঞ্চিত ধনসম্পদের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। সে-কথা সবাই বুঝতে পেরেছিল, বিশেষ করে গঙ্গাধর। কিন্তু তাঁর কিছু করবার ছিল না। কারণ, প্রথমত, সেই সম্পদ কোথায় আছে সেটা তাঁর জানা ছিল না, দ্বিতীয়ত, তাঁর ছোট দুই ভাই তাঁর কথা শোনবার পাত্র ছিল না। তারা প্রায়ই চৌরঙ্গীর বাড়িতে থাকত, মাঝে-মাঝে এসে দাদার সঙ্গে দেখা করে যেত। দাদা তখন তাদের অনেক লেকচার দিতেন, কিন্তু তাতে কোনও ফল হত না। আমাদের বাড়ির পুরোনো রেকর্ডে দেখতে পাচ্ছি, দাদা অনবরত ছোট দুই ভাইকে তাদের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা থেকে নিবৃত্ত করার আশায় চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছেন, তাঁর ছোট-মা অর্থাৎ জ্ঞানদাসুন্দরীর রিজরেন্ডারটার কথা অর্থাৎ বগলাচরণের সম্পত্তি যে অভিশপ্ত সে-কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন হচ্ছে।

'বৈমাত্রেয় ভাই শঙ্করনাথকে লেখা একটা চিঠিতে দেখছি গঙ্গাধর লিখছেন,

> *"আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পিতৃদেব আমার বাল্যাবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। তিনি তাঁহার তোষাখানার সন্ধান আমাকে দিয়া যাইতে পারেন নাই। বালককে তাহা দিবার কথাও হয়তো তাঁহার কর্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। কিন্তু হায়, তাহা যদি দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাকে এই অসহ্য মানসিক দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে হইত না। আমার পরমারাধ্যা ছোট মাতাঠাকুরণী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই, তাঁহার সেই সাবধান-বাণী আজিও আমার স্মৃতিপটে জ্যোতির্ময় শিখায় জ্বলজ্বল করিতেছে। কাজেই, পিতৃদেবের তোষাখানার সন্ধান যদি আমি পাইতাম, তাহা হইলে তাহাতে কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিতাম না। হয়তো সদাশয় গভর্নমেন্ট বাহাদুরের মধ্যস্থতায় তাহা গরিব দুঃখীর কল্যাণকর্মে বিতরিত করিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নহে। তোমার অপর দুই ভ্রাতা আমার কোনও উপদেশেই কর্ণপাত করে না। তাহাদের জন্য আমার যে কী ভয়ানক দুশ্চিন্তা তাহা তোমাকে কী লিখিব। যতবার তাহাদের কথা ভাবি, আমার কল্পনায় নিহত পিতৃদেবের রক্তাপ্লুত বদনমণ্ডল জাগরুক হইয়া উঠে। আমি শিহরিয়া উঠি। কতবার যে গভীর নিশীথে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি, তাহা তোমাকে আর কী লিখিব।"*

'গঙ্গাধরের আশঙ্কা কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই খানিকটা সত্য বলে প্রমাণিত হল। রামবাগানের একটি কুখ্যাত বাড়িতে চন্দ্রধর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। সেই বাড়ি থেকে তার মৃতদেহ যখন পুলিশ এ-বাড়িতে নিয়ে আসে, তখন তার স্ত্রী ক্ষোভে লজ্জায় সেই দিনই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর একটি বছর দশেকের ছেলে ছিল, একমাত্র ছেলে। সে এই ঘটনার ভীষণতায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং কিছুদিনের মধ্যেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। সে যুগে যক্ষ্মা রোগ হলে তার থেকে নিস্তার ছিল না।

'জয়রাম কিন্তু চন্দ্রধরের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখেও নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। তার অবশ্য অন্যতম কারণ ছিল যে, জয়রাম কিঞ্চিৎ জড়বুদ্ধি ছিল। সেজন্য গঙ্গাধর তার বিয়ে দেবেন না স্থির করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রধরের পাল্লায় পড়ে সে যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ল, তখন তাকে ঘরে বাঁধবার জন্যে তার বিয়ে দেন। তার ফল ভালো হয়নি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনরাত ঝগড়া লেগে থাকত। শেষ পর্যন্ত জয়রাম আর বাড়িতে আসতই না, প্রায় পাকাপাকি ভাবেই চৌরঙ্গীতে থাকত। অবশেষে ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে জয়রাম একদিন বাড়ি এলে একপ্রস্থ চূড়ান্ত ঝগড়া হয়, জয়রামের চিৎকার আর গালিগালাজ নাকি সার্কুলার রোড থেকেও শোনা যায়। তারপরেই

জয়রাম বেপাত্তা। মনে হয়, ততদিনে সংসারে সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তার ওপর, সেদিন কলকাতায় একটা ভীষণ ভূমিকম্প হয়, হয়তো তাতে জয়রামের মানসলোকেও একটা তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল।

'গঙ্গাধর ছোট ভাইয়ের অনেক খোঁজ-খবর করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিলেন। ভগ্নহৃদয়ে তাঁর বৈমাত্র ভাইদের অনেক কাকুতি মিনতি করে এ-বাড়িতে নিয়ে এলেন।'

'সেই দুই ভাই এতদিন কী করছিলেন?' সমরেশ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। জ্ঞানদাসুন্দরীর কথা এবার একটু বলা দরকার। আগেই বলেছি, জ্ঞানদাসুন্দরী শ্যামবাজারে গিয়ে বাসা নিয়েছিলেন। আসলে সেটা ছিল তাঁর দাদার বাড়ি। সে-ভদ্রলোক ছিলেন কাব্যসাংখ্যবেদান্তচঞ্চু, মারাত্মক পণ্ডিত! তাঁর দুই ছেলে ছিল। তাঁরাও বাপের মতোই দিগগজ ছিলেন। তিনজনে মিলে চালাতেন টোল। আর কাব্যসাংখ্যবেদান্তচঞ্চু আন্তরিক ভাবে বোনের শ্বশুরবাড়িকে ঘেন্না করতেন। এখন সেই বোন যখন ঐশ্বর্যের লোভ ত্যাগ করের দু-ছেলের হাত ধরে আশ্রয়ের আশায় এসে দাঁড়ালেন, দাদা পরম পুলকিত হয়ে তাঁদের পক্ষপুটে গ্রহণ করলেন। অসুবিধে কিছুই হল না, তাঁর টোলে দুজন ছাত্র বাড়ল, এই পর্যন্ত।

'এই দুজন ছাত্রের মধ্যে বড় ভাই রাধাকান্ত ছিলেন শ্রেষ্ঠ আর শঙ্করনাথ—আমার ঠাকুরদা—ছিলেন মোটামুটি। রাধাকান্ত জ্ঞানে, বিদ্যায় তাঁর মামাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই জ্ঞানের জ্যোতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বই লিখে অজস্র পয়সা রোজগার করেছিলেন, তার সমস্তই দান করে গিয়েছিলেন। গঙ্গাধর স্বভাবতই এই ভাইয়ের সহচর্যে অনেক বেশি আরাম বোধ করতেন এবং রাধাকান্ত ষাট বছর বয়েসে দেহরক্ষা করলে তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী অর্ধেক জমি আর ওই কাছারিবাড়ি লাইব্রেরি করার উদ্দেশ্যে সরকারকে দান করে নিজে কাশীবাসী হন।'

দময়ন্তী বলল, 'তারপরে আর এই পরিবারে অপঘাত মৃত্যু হয়নি?'

'না। ত্রৈলোক্যনারায়ণের বংশের জেল্লাও কমে গেল, অপঘাত মৃত্যুও কমে গেল।'

শ্রীরূপা বলল, 'তবে? এর থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, বগলাচরণের সম্পত্তি সত্যিই অভিশপ্ত? কত লোকের অশ্রু আর হাহাকারের ওপর যে তিনি এই সম্পত্তি গড়ে তুলেছিলেন, সে তো তুমি জানো।'

'জানি। কিন্তু, যেহেতু তাঁরা কখনওই আদালতে অভিযুক্ত হননি বা তাঁদের সম্পত্তি কখনওই বেআইনি বলে ঘোষিত হয়নি, সেহেতু কীভাবে সেই সম্পত্তি গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটা দেখবার আমার তো কোনও দরকার নেই। সে-সম্পত্তি আমার পিতৃপিতামহের এবং তা ভোগ-দখলের সম্পূর্ণ অধিকার আমার। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া সমাজে অপরকে শোষণ না করেল, একজন কখনওই সম্পদ আহরণ করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে কি সেই সম্পদের সুযোগ-সুবিধে থেকে তার উত্তরপুরুষ বঞ্চিত হয়?' বলতে-বলতে বিশ্বরূপ কিঞ্চিত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

শ্রীরূপার গলা আবার কাঁপতে শুরু করল। বলল, 'কিন্তু এই সামান্য জিনিসটা কেন তোমার চোখে পড়ছে না যে, বগলাচরণ, তাঁর তিন ছেলে, ত্রৈলোক্য, তাঁর ছেলে সকলেই কী নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন এই সম্পত্তি ভোগ করতে গিয়ে। অথচ দেখো, যাঁরা ভোগ করেননি, তাঁরা সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে গেছেন।'

'না, শ্রী। তাঁরা হয়তো বেশি দিন বেঁচেছিলেন, কিন্তু সুখ-স্বচ্ছন্দে কখনওই ছিলেন না। এই সহজ কথাটা তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না যে, যাঁরা নিহত হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের সম্পত্তি হয় বেশি লোক-দেখানো শো করেছেন, নয়তো অপব্যবহার করেছেন, সেইজন্য। যদি সেই সম্পত্তি ঠান্ডা মাথায় সদ্ব্যবহার করতেন, তাহলে কখনওই তাঁদের মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করতে হত না।

'কিন্তু যাঁরা আদৌ ভোগ করেননি, তাঁদের যে বেঁচে থাকাটাই মর্মান্তিক ছিল। রাধাকান্তর

কথা বাদ দাও, তিনি সর্বত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাই শঙ্করনাথ সারাজীবন অর্থকষ্টে ভুগেছেন। আমার এখনও মনে আছে, ঠাকুমার সঙ্গে বাজারের হিসেব নিয়ে তাঁর দু-বেলা খিটিমিটি লেগে থাকত। আমার বাবা গ্রাসাচ্ছাদনের ধান্দায় সারা জীবন দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দৌড়ে বেড়ালেন। আর আমি? অর্থাভাবে বিলেত যেতে পারিনি, এম-এ পাশ করেই চাকরিতে ঢুকেছি, ডক্টরেট করবার আহ্বান এবং প্রবল ইচ্ছেকে পাশ কাটাতে হয়েছে। আর সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের শেষে এসে যখন দেখি আধো-অন্ধকার ঘর তুমি শুধু তোমার মঙ্গল চিন্তা আর শুভ আকাঙক্ষায় উজ্জ্বল করে রেখেছে, তখন ত্রৈলোক্যনারায়ণকে মনে-মনে অভিশম্পাত দিই। আমার সব থেকেও নেই, এটা যে কত বড় দুঃখ, তোমাকে কী করে বোঝাব!'

শ্রীরূপা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল।

সমরেশ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কী? আপনি কি সেই গুপ্তধনের হদিশ পেয়েছেন?'

মাথা নেড়ে বিশ্বরূপ বললেন, 'না, পাইনি। আর সেইজন্যেই দময়ন্তীর সাহায্য চাই।'

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি আপনাকে কী সাহায্য করব? আপনি কি নিশ্চিত যে, সেই গুপ্তধন এ-বাড়িতেই কোথাও আছে? ত্রৈলোক্যনারায়ণ এ-বাড়ি বানানোর বছর পঁচিশেকের মধ্যেই নিহত হন। তারপর গঙ্গাধর তাঁর সম্পত্তি চোখে দেখেননি এ-বাড়িতে থেকেও, অথচ দেখেছিলেন তাঁর ছোট দুই ভাই। কাজেই এটা সম্ভব হতে পারে যে, সে-সম্পত্তি হয় আপনাদের ওই পুরোনো বাড়িতে অথবা বাইরে অন্যত্র কোথাও লুকোনো ছিল। আমার তো ধারণা, ওই আদি বসতবাড়িতেই লুকোনো আছে। বলা যেতে পারে, গভর্নমেন্টের ঘরে জমা পড়ে গেছে।'

পুনরায় মাথা নাড়লেন বিশ্বরূপ। বললেন, 'না। এ-বড়িতেই কোথাও আছে। এ-ব্যাপারে আমি কেন নিশ্চিত, সে-কথাই বলছি।

'আমার ঠাকুরদা শঙ্করনাথ তাঁর দাদা গঙ্গাধর কাশীবাসী হওয়ার বছর দুয়েক বাদে একবার বাড়ির চারদিকের জমি লাঙল দিয়ে তছনছ করে ফেলেছিলেন। একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো মেঝের প্রত্যেকটি পাথর তুলে তার তলায় খুঁচিয়েছিলেন। সে-কথাটা কী করে যেন গঙ্গাধরের কান পর্যন্ত পৌঁছয়। তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে শঙ্করনাথকে আবার একটি মর্মস্পর্শী সাবধানবাণী পাঠান।'

'আপনার বাবা তখন কোথায় ছিলেন?' দময়ন্তী জিগ্যেস করল।

'সেটা ধরুন ১৯৪৭ সাল, স্বাধীনতার বছর। তখন আমার বাবার বয়েস বত্রিশ, আমার সাত। আমরা তখন ছিলুম আদ্রায়। বাবা রেলে চাকরি করতেন।'

'আপনার ঠাকুরদা কিছু পেয়েছিলেন?'

'না। কিছুই পাননি। তারপর আবার আমার বাবাও একবার লাঙল দিয়েছিলেন, আবার মেঝের সব পাথর তুলিয়েছিলেন, জায়গায়-জায়গায় দেওয়ালে গর্ত করিয়েছিলেন।'

'সেটা কবে? আপনি তখন ছিলেন এ-বাড়িতে?'

'সেটা ১৯৫০ সালে, আমার ঠাকুরদা ষাট বছর বয়েসে মারা যাওয়ার কয়েক মাস পরে। আমার বয়েস তখন দশ। কী হয়েছিল আমার মনে নেই, তবে মা যে ভয়ানক আপসেট হয়েছিলেন এবং আমাকে নিয়ে বেশ কিছুদিন বাপের বাড়িতে গিয়ে থেকেছিলেন, সেটা মনে আছে।'

সমরেশ মৃদু হেসে বলল, 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাবাও কিছু পাননি?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

'না। উনিও কিছু পাননি। কিন্তু এতে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁরা দুজনেই এমন কোনও প্রমাণ পেয়েছিলেন, যাতে তাঁরা এ-বাড়ির সর্বত্র সেই সম্পদ আঁতিপাতি করে খুঁজেছিলেন। এবং সেই প্রমাণ সম্প্রতি আমিও পেয়েছি।'

বিশ্বরূপের কথা শুনে সমরেশ স্তম্ভিত। দময়ন্তীর দিকে চেয়ে দেখল, ওর চোখ দুটো একটা

অস্বাভাবিক জ্যোতিতে জলজ্বল করছে, অর্থাৎ, ও মনে-মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

দময়ন্তী মৃদু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী প্রমাণ?'

'দেখাচ্ছি।' বলে বিশ্বরূপ উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীরূপাকে ডেকে নিয়ে পরদা সরিয়ে চলে গেলেন ঘরের বাইরে।

॥ ৭ ॥

বিশ্বরূপ একাই ফিরে এলেন।

দময়ন্তী জিগ্যেস করল, 'শ্রীরূপা?'

হতাশ মুখ করে বিশ্বরূপ বললেন, 'ও এল না। ও বলছে, এত উত্তেজনায় ওর নাকি বুকের মধ্যে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। শান্তর ঘরে খাটে শুয়ে পড়েছে।'

'কোনও বিপদ-আপদ হবে না তো?'

'না-না। অত্যন্ত নার্ভাস টাইপের মেয়ে। তবে এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। যাক, এই দেখো প্রমাণ।'

প্রমাণ দেখে সমরেশ আর দময়ন্তী দুজনেরই চক্ষুস্থির। একটা প্রায় দেশি সুপুরির সাইজের গোলাপি রঙের অস্বচ্ছ পাথর, ভেতর থেকে একটা নীলাভ দ্যুতি বেরিয়ে আসছে। অপূর্ব তার গড়ন, অবিশ্বাস্য আর সৌন্দর্য।

স্তম্ভিত দময়ন্তী জিগ্যেস করল কোনওক্রমে, 'এটা কী?'

'এটা পদ্মরাগমণি। বাজারে এর দাম পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা। কিন্তু এমন কোনও লোক আছেন, যাঁরা এহেন একটি পদ্মরাগমণির জন্য লাখ টাকা দিতেও প্রস্তুত। এ-মণি যার ঘরে থাকে, সে নাকি মহা সৌভাগ্যবান হয়। টাকায় এর ঠিক মূল্য হয় না।'

'কোথায় পেলেন এটা?'

'শান্তর মার্বেলের কৌটোয়।'

'সে কি! শান্ত কোথায় পেয়েছিল?'

'সঠিক কিছু বলতে পারে না। সারা বাড়িময় মার্বেল গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কোনটা কোত্থেকে কুড়িয়ে তুলছে, ও কি তার হিসেব রাখতে পারে? তবে আমার ধারণা, ইঁদুরে মুখে করে এনে ফেলেছে। আমাদের বাড়িতে ভয়ানক ইঁদুর।'

'একতলার ভাড়াটেদের জিগ্যেস করেছিলেন? এটা ওঁদের জিনিস নয় তো?'

'জিগ্যেস করেছিলুম। ওদের জিনিস নয়। আমারও গোড়াতে এরকম সন্দেহই হয়েছিল। বিশেষত, বঙ্কিমকাকার যখন সোনা-রুপোর দোকান। এটা যে পদ্মরাগমণি এবং এর যে অসাধারণ মূল্য, সেটা তো উনিই আমাকে বললেন। এরকম জিনিস উনি নাকি জীবনে কখনও দেখেননি।'

দময়ন্তী চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, 'বঙ্কিমকাকা, মানে আপনার ভাড়াটে বঙ্কিমচন্দ্র পাল? ওঁরা কতদিন আছেন এ-বাড়িতে?'

'বহুদিন। ওঁরা বংশানুক্রমে আমাদের স্যাকরা। আমার ঠাকুরদার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়লে, বঙ্কিমকাকার বাবা হারাণচন্দ্র একতলাটা ভাড়া নেন।'

বিশ্বরূপের কথা শুনে দময়ন্তীর ভ্রূকুটি আরও গভীর হল। বলল, 'ওঁদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?'

বিশ্বরূপ হেসে বললেন, 'খুব ভালো। এত ভালো যে, সেটা প্রায় অবিশ্বাস্য। আমাদের অবস্থা বহুদিনই খারাপ হয়ে গেছে, অথচ এখন বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে তাঁর জমিদারবাবু বলে মনে করেন। মাথা তুলে কথা বলেন না। আর সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি, মেয়ের বিয়ে, ছেলের লেখাপড়া ইত্যাদি

সমস্ত বিষয়েই আমার পরামর্শ বা উপদেশ যাই বল, না নিয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। আসলে, সমস্ত পরিবারটাই অত্যন্ত নির্বিরোধ, শান্ত, ভীরু প্রকৃতির আর আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে পরনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী।

'তুমি কী ভাবছ, আমি জানি। ভাবছ, এটা একটা কোনওরকমের অসৎ ঠাট্টা, যে-ধরনের রসিকতা কোনও-কোনও বদরসিক ভাড়াটে বাড়িওলার কাছা খোলার জন্যে করে থাকে। যেমন অনেকে ভূতের ভয় দেখায়। আমারও গোড়ায় এ-ধরনের একটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এটা সত্যিই ঠাট্টা নয়, তার কারণ, এ-মণিটা খাঁটি, জাল নয়। আমার মনে সন্দেহটা আসতেই আমি ঠাকুরদাস মোতিলালের দোকানে গিয়ে এ-বিষয়ে পরামর্শ নিই।'

'ওঁরা কী বললেন?' সমরেশ জিগ্যেস করল।

বললেন, 'মণিটা আসল। বঙ্কিমকাকা যা-যা কথা বলেছিলেন, ওঁরাও ঠিক সেই সব কথাই বললেন। কাজেই, এ-ব্যাপারটা ঠাট্টা বলা যায় না, তাই না?'

দময়ন্তী বলল, 'এটা যে ঠাট্টা, সেরকম সন্দেহ আমার একবারও হয়নি। আমি শুধু জানতে চাইছিলুম যে, বঙ্কিমবাবুদের সঙ্গে আপনাদের বংশানুক্রমিক সম্পর্কটা ঠিক কীরকম। অবাধ মেলামেশা আছে কি না, দেখাশুনো, কথাবার্তা হয় কিনা।'

বিশ্বরূপ একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'তোমার প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। চাও তো আরও বিস্তারিত ভাবে বলতে পারি।'

দময়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'না-না, আমার জবাব আমি পেয়ে গেছি।'

'তুমি এ-প্রশ্নটা করলে কেন? তোমার ধারণা, আমাদেব বংশের স্যাকরা হিসেবে বঙ্কিমকাকার ত্রৈলোক্যনারায়ণের তোষাখানা কোথায়, সে-বিষয়ে জ্ঞান আছে? তোমার সে-ধারণা ভুল।'

'আমার এরকম কোনও ধারণাই নেই। আপনাদের দুই পরিবারের সম্পর্কটা কেমন, সে সম্পর্কে প্রশ্নটা হঠাৎ মাথায় এল, তাই করে ফেললুম।'

'তাই বলো। তা তোমার কী ধারণা, তোষাখানাটা এ-বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই আছে?'

'তোষাখানা কি না জানি না, তবে কিছু লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন আছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

'তোমার কি মনে হয়, সেটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব?'

'অসম্ভব নয়। ত্রৈলোক্যনারায়ণ একটা ধাঁধা রেখে গেছেন, সেটার সমাধান করতে হবে। তার জন্যে চিন্তা করতে হবে। তবে ধাঁধা যখন আছে, তখন তার উত্তরও নিশ্চয়ই আছে।'

'চিন্তা আমি অনেক করেছি। উত্তর পাইনি। তুমি কি চেষ্টা করে দেখবে, দময়ন্তী?' বলতে-বলতে বিশ্বরূপের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। গলা কেঁপে গেল।

সমরেশ অবাক হয়ে দেখছিল, একজন বিদগ্ধ, পণ্ডিত লোক অর্থের লালসায় চোখের সামনে কেমন লোভী, নির্লজ্জ ছোট ছেলের মতো দেখতে হয়ে গেলেন। মুখ থেকে জিভটা বের করলেই হয়তো টসটস করে লালা ঝরে পড়বে।

দময়ন্তী বলল, 'চেষ্টা করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আমি শ্রীরূপার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।' বলে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

॥ ৮ ॥

সমরেশ আর বিশ্বরূপ দুজনেই নির্বাক হয়ে বসেছিল। বিশ্বরূপ নার্ভাস কম্পিত হাতে অনবরত চেয়ারের হাতলে টরেটক্কা বাজিয়ে যাচ্ছিলেন; সমরেশ চিন্তা করছিল, ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে কিনা। এমনসময় পরদা সরিয়ে দময়ন্তী ঘরে এসে ঢুকল।

বিশ্বরূপের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে দময়ন্তী বলল, 'শ্রীরূপা রাজি হয়েছে, কিন্তু কয়েকটা শর্তে।'

বিশ্বরূপ রক্তাভ মুখ তুলে চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কী শর্ত?'

'প্রথমত, তোষাখানার সন্ধান যদি পাওয়া যায়, তাহলে সেটা শ্রীর কাছে গোপন রাখা চলবে না। দ্বিতীয়ত, তোষাখানার একটি পয়সাও শ্রীর অনুমতি ছাড়া খরচ করা চলবে না। তৃতীয়ত, তার প্রতিটি পয়সা খরচা করতে হবে এমন বিষয়ে, যাতে শুধু শ্রী-ই উপকৃত হয়, আপনার বা শান্তর জন্যে তা করা চলবে না।'

বিশ্বরূপের চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্যে ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর হেসে বললেন, 'লিখিত মুচলেকা দিতে হবে?'

'না, আপনার অঙ্গীকারই যথেষ্ট।'

'বেশ।' বলে বিশ্বরূপ উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি শ্রীবিশ্বরূপ মৈত্র, ঈশ্বর চিত্তরঞ্জন মৈত্রের পুত্র, ঈশ্বর শঙ্করনাথ মৈত্রের পৌত্র, সাকিন কলিকাতা, অদ্য ১৪ই আশ্বিন এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার স্ত্রী শ্রীরূপা যে-সকল শর্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহা সারা জীবন অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিব।'

দময়ন্তী হেসে বলল, 'প্রতিজ্ঞাপালনে অপারগ হলে কিন্তু শ্রীরূপা সমস্ত তোষাখানাটাকেই টান মেরে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে বলেছে। তার এই অধিকারে কোনওরকমেই হস্তক্ষেপ করা চলবে না।'

বিশ্বরূপ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'রাজা ভোলানাথ মৈত্রবাহাদুরের বংশধর কথার খেলাপ করে না, দময়ন্তী। এ-বিষয়ে কোনওরকম সন্দেহ কোরো না।'

॥ ৯ ॥

বিশ্বরূপ বললেন, 'আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি, দময়ন্তী?'

'প্রথমে, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই, তারপরে বাড়িটা আর লনটা একবার ঘুরে দেখব। যদি দেখি, যেটুকু সন্দেহ হয়েছে তা ভুল, তাহলে আর অগ্রসরই হব না। অন্তত, এবারের মতো ত্রৈলোক্যনারায়ণের ধাঁধা ধাঁধাই থেকে যাবে।'

'কী সন্দেহ করেছ তুমি?'

'সে তেমন কিছু নয়। এখন বলুন, আপনার বাড়িতে যেসব কাগজপত্র আছে, পুরোনো চিঠিপত্র আছে, তাতে কি কোথাও এমন কোনও ছবি বা লেখা বা অন্য কোনও কিছু পেয়েছেন, যা আপনার বোধগম্য হয়নি বা হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে?'

'না। কিচ্ছু নয়। অজস্র চিঠি আছে, ডায়েরি আছে। তাদের প্রত্যেকটি পড়েছি আর প্রত্যেকটি অতিশয় সরল, প্রাঞ্জল। দ্ব্যর্থক কোনও কিছুই নেই।'

সমরেশ হাত নেড়ে বলল, 'পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা গোছের কোনও কবিতাও নেই?'

বিশ্বরূপ সহাস্যে মাথা নেড়ে বললেন, 'না।'

দময়ন্তী জিগ্যেস করল, 'বাড়ি তো দেখছি সম্প্রতি চুনকাম করিয়েছেন। মিস্তিরিরা কি কখনও কোথাও পলেস্তারা ঢপঢপে বলেছে?'

'ঢপঢপে? কী যে বলো, তার ঠিক নেই। এ তোমাদের আজকালকার ঠুনকো ফ্যাশনদার বাড়ি নয়। রীতিমতো শামুক পোড়ানো চুন আর বালির পলেস্তারা করা হয়েছিল, যাতে গঙ্গামাটি মেশানো সিমেন্টের নামগন্ধ নেই। ঢপঢপে তো নয়ই বরং লোহার মতো শক্ত। একটা ছ'ইঞ্চি বাই

ছ'ইঞ্চি ঢপঢপে জায়গা কাটতে একটা লোকের সারাদিন লাগে, তার মধ্যে দুটো ছেনি ভেঙে যায়। আসল কথা, তুমি জানতে চাইছ কোথাও কোনও গুপ্তপথ আছে কি না। থাকতে যে পারে না তা নয়, কারণ, দেখছ তো, দেওয়ালগুলো এই তলায় কুড়ি ইঞ্চি চওড়া, একতলার পঁচিশ ইঞ্চি। কিন্তু আগাপাস্তলা ঠুকে দেখেছি দেওয়াল কোথাও ফাঁপা বলে মনে হয়নি।'

'আমি অবশ্য ঠিক গুপ্তপথের কথা চিন্তা করিনি, কারণ, বাড়ির প্ল্যানটা সাদামাটা। দেওয়ালে অজস্র জানলা, এ-অবস্থায় গুপ্তপথ থাকা খুব একটা সম্ভব নয়। আমি ভাবছিলুম কোনও লুকোনোর জায়গা, কোনও গোপন কুলুঙ্গি কোথাও আছে কিনা। থাকলে হয়তো তার মধ্যে কোনও সূত্র পাওয়া যেত। থাক সে-কথা। জানলার কথায় মনে পড়ল, একতলায় বড় জানলা, দোতলায় ছোট জানলা কেন? নাকি আপনি পরে পালটেছেন?'

'আমি পালটাইনি কিছুই। তবে জানলার রকমফের কেন তা বলতে পারব না, ত্রৈলোক্যনারায়ণের পছন্দ হয়তো এইরকমই ছিল।'

'এ-বাড়ির কোনও প্ল্যান আছে? কর্পোরেশনে যেমন জমা দেওয়া হয়ে থাকে আর কী।'

'আছে।'

'বাড়িটা কি ঠিক সেইভাবেই তৈরি? কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই?'

'না, কোনও পরিবর্তন নেই।'

'বাড়ির সামনে আপনি ফুলের বাগান করেছেন, খানিকটা লন আছে, পেছনেও তরিতরকারির চাষ করেন। কোথাও কি জমির কোনও তারতম্য বোঝেন? মানে, জমি কি সর্বত্রই একরকম উর্বর?'

'হ্যাঁ। জমি সর্বত্রই একইরকম।'

'বাড়ির পিছনে ওই গোল স্তম্ভ মতন, ওটা কী? দেখতে অনেকটা দুর্গের টারেটের মতো, অথচ জানলা, দরজা নেই।'

'ওটা ওপরে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। জানলা নেই ঠিকই, তবে দরজা আছে। আমার বাবা গাঁথনি করে বন্ধ করে দেন। মণিটা পাওয়ার পর আমি সেটা ভেঙে আবার দরজাটা বের করি।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। ছাদে ওঠার জন্যে বাইরে আলাদা সিঁড়ি কেন? ওটা কী প্ল্যান বহির্ভূত?'

'না, ওটাও প্ল্যানে আছে। আসলে ত্রৈলোক্যনারায়ণ মেয়েদের ছাদে ওঠা দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, ছাদে উঠলেই মেয়েদের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। সেজন্যে বাইরে আলাদা সিঁড়ি করেছিলেন, অন্দরের সিঁড়িটা দোতলাতেই শেষ।'

'আপনার বাবা দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেন?'

'প্রথমত, ছাদে কেউ উঠত না। দ্বিতীয়ত, একবার একদল চোর অন্য কোনও বাড়িতে চুরি করে চোরাই মাল এনে এই অব্যবহৃত সিঁড়ির ঘরে রেখে গিয়েছিল। পরে খুঁজতে-খুঁজতে পুলিশ এসে হাজির হয় আর বিষম হাঙ্গামা বেধে যায়। এইসব কারণে বাবা ওটা একদম বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে আমি এই সিঁড়ির ঘরের দেওয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি ভেতর থেকে ঠুকে-ঠুকে দেখেছি, কিচ্ছু নেই। সিম্পল দশ ইঞ্চি দেওয়াল, ভেতরে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি।'

'আচ্ছা, এই সিঁড়ির ওপাশে দুটো ঘর, এপাশে দুটো। ওপাশের ঘর দুটো আমি দেখেছি, কিন্তু চতুর্থ ঘরটা কখনও দেখিনি। সে-ঘরটা তো এই ঘরের লাগোয়া। কী আছে সেখানে?'

'কিছু না। তালাবন্ধ থাকে। ভেতরে একগাদা পুরোনো অয়েল পেন্টিং, পারিবারিক কাগজপত্র, পুরোনো শাল, সামিয়ানা ইত্যাদি, একটা ভাঙা অর্গান এই সমস্ত আছে। ও-ঘরটাও আমি ভালো করে দেখেছি। কিছু নেই।'

'এ-বাড়িতে মোট ঘর তো আটটা। সে-যুগের জমিদারবাড়ির অন্দরমহলের তুলনায় সংখ্যাটা একটু ছোট নয়? ষাট-সত্তরটা ঘর থাকলেই যেন মানানসই হত, তাই না?'

'মানানসই হত কিনা জানি না, তবে আমার ধারণা কোনও জমিদারবাড়িই প্রথমেই ষাট-

সত্তরখানা ঘর নিয়ে তৈরি হত না। প্রথমে ছোটই থাকত, পরে প্রয়োজন অনুসারে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আয়তনে বাড়ত।'

সমরেশ বলল, 'সে-কথা ঠিক। অনেক পুরোনো প্রাসাদই এককোশী প্রাণীর মতো বেড়েছে, যেখানে-সেখানে যেমন-তেমনভাবে।'

বিশ্বরূপ বললেন, 'তা ছাড়া, আরও একটা কথা আছে। ত্রৈলোক্যনারায়ণ তাঁর ঠাকুরদা বগলাচরণের মতো অমিতব্যয়ী ছিলেন না। সে-যুগের লক্কা জমিদারদের অনেকেই তাঁকে কিপটে বলত, যদিও তিনি মোটেই কিপটে ছিলেন না। অতিরিক্ত বিলাসিতা তিনি পছন্দ করতেন না। দেখছ না, বাড়িটা কেমন নিরাভরণ সাদামাটা?

'ত্রৈলোক্যনারায়ণ বাড়িটা বানিয়েছিলেন তাঁর নিজের থাকবার জন্যে। শিশুকালে তিনি পিতৃহারা হন। কাজেই থাকবার মধ্যে ছিলেন তাঁর দুই স্ত্রী আর পাঁচ ছেলে। তাই বাড়িটা মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা ছিল। ছেলেরা বড় হওয়ার আগেই তিনি মারা গেলেন, এক স্ত্রী বেরিয়ে গেলেন, কাজেই বাড়িটা বাড়াবার আর দরকার হল না। তিন ছেলের বড়জন তো সারাটা জীবন কাটালেন একতলার কোণের ঘরটায়। বাকি দুজনের কী হল তা তো আগেই বলেছি। জয়রাম নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী উন্মাদ হয়ে যান। তিনি মারা না-যাওয়া পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় গঙ্গাধর কাছারিবাড়িতেই থাকতেন, এ-তল্লাট মাড়াতেনই না। কাজেই বাড়িটা আর বাড়াবে কে?

'জয়রামের স্ত্রীর শেষ পর্যন্ত কী হল?' সমরেশ প্রশ্ন করল।

'কী আবার হবে? বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকতেন, যত্রতত্র নোংরা করতেন, বিরাট-বিরাট নখ আর জটার মতো চুল নিয়ে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াতেন, অমানুষিক চিৎকার করে গালাগালি করতেন অদৃশ্য শত্রুদের। ভয়ে লোক প্রাণান্তেও ওদিক মাড়াত না। কেবল মহিলার বাপের বাড়ির এক বুড়ি ঝি তাকে রান্না করে দিত আর সিঁড়ির নীচে পড়ে থাকত। উনি যখন মারা গেলেন, তখন দেখা গেল সারা বাড়ি নরককুণ্ড হয়ে আছে, দুর্গন্ধে টেঁকা দায়। প্রায় সাতদিন ধরে সারা বাড়ি পরিষ্কার করা হল, গঙ্গাজল আর আতর ছড়ানো হল, তবে এ-বাড়ি আবার বাসোপযোগী হয়।'

দময়ন্তী স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টিতে বিশ্বরূপের কথা শুনেছিল। চাপা নীচু গলায় জিগ্যেস করল, 'তারপর কী হল?'

'তারপর আমার আপন ঠাকুরদারা এলেন। গঙ্গাধর রাধাকান্তর সঙ্গে একতলায় থাকতেন, শঙ্করনাথ থাকতেন দোতলায়। আমার ঠাকুমা প্রথমটা এ-বাড়িতে থাকতে ভীষণ ভয় পেতেন, পরে সয়ে যায়। মানে, কুসংস্কার আর কী।'

মগ্ন কণ্ঠে যান্ত্রিক ভাবে দময়ন্তী জিগ্যেস করল, 'তারপর?'

বিশ্বরূপ হাত নেড়ে বললেন, 'তারপরে আর নেই। বগলাচরণের বংশধররা পেটের অন্ন যোগাতে বাড়ির বাইরে বেরোল, বাড়ি বাড়ানো তখন তাদের সাধ্যাতীত।' বলে বিশ্বরূপ চুপ করলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনও কথা বলল না। অবশেষে বিশ্বরূপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করলেন, 'আর তোমার কিছু জানবার আছে, দময়ন্তী?'

দময়ন্তী বলল, 'আর কয়েকটা সামান্য প্রশ্ন। আপনি তো সম্প্রতি বাড়ি চুনকাম করলেন, ওপর নীচে সবক'টা ঘরই কি এক মাপের?'

'না। ওপরে চারটে ঘরই আঠারো ফুট দশ ইঞ্চি বাই বিশ ফুট দশ ইঞ্চি বাই বারো ফুট আর নীচের চারটে ঘর আঠারো ফুট বাই বিশ ফুট বাই বারো ফুট।'

সমরেশ বলল, 'সেটা স্বাভাবিক। এটা হয় দেওয়ালের চওড়ার পাঁচ ইঞ্চি করে তফাতের জন্যে।'

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'আপনি কতদিন বাদে-বাদে বাড়ি রং করান?'

বিশ্বরূপ পালটা প্রশ্ন করলেন, 'কেন? এই সংবাদেও কি তোমার গুপ্তধন খুঁজে বের করায় সুবিধে হবে নাকি?'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'তা হতেও পারে।'

বিশ্বরূপ অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'চার কি পাঁচ বছর অন্তর। যে-বছর ভেতরটা রং করাই, তার বছর দুয়েক বাদে বাইরেটা করাই। তবে এখন মাল-মশলার এমন দাম বেড়েছে যে ভাবছি, বাইরেটা রং করা বন্ধই করে দেব।'

'এ-বাড়ির প্রধান ফটকের কারুকার্য করা স্তম্ভ আর গেট কে করেছিলেন? ত্রৈলোক্যনারায়ণ?'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকা দেওয়া বারান্দাটা ভেঙে দিলেন কে? ত্রৈলোক্যনারায়ণ?'

'না। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে শঙ্করনাথ ভাঙিয়েছিলেন। তখন আর তার প্রয়োজন ছিল না, কাছারিবাড়ি দান করা হয়ে গিয়েছে।'

আবার সকলে চুপ করে গেল। দময়ন্তী মাথা নীচু করে স্থির হয়ে বসে রইল বেশ অনেকক্ষণ, তারপর চোখ তুলে উদ্বিগ্ন বিশ্বরূপের দিকে চেয়ে ফিকে হাসল।

বিশ্বরূপ বললেন, 'এবার? জমিটা একবার ঘুরে দেখবে?'

দময়ন্তী হেসে মাথা নাড়ল। বলল, 'জমিটা দেখে তো কোনও লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ঠিক মতো দেখতে হলে তো আবার লাঙল চালাতে হয়। তারচেয়ে বরং চলুন, বাড়িটাই একবার ঘুরে দেখি।'

'কোত্থেকে শুরু করবে? এ-তলাটা তো প্রায় সবটাই তোমার দেখা। একতলা থেকে শুরু করবে?'

'আপনি যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে, একতলাটা প্রায় দোতলার মতোই। কাজেই ওটা পরে দেখব। তারচেয়ে বরং চলুন, যে-দুটো জিনিস দেখিনি, সে-দুটো দেখে আসি। একটা ছাদে ওঠার সিঁড়ি আর অন্যটা আপনাদের ছাদ। ছাদে চিলেকোঠা আছে?'

'আছে। তবে তুমি যা ভাবছ তা নেই। চিলেকোঠার মেঝে আর ছাদ একদম এক লেভেলে। তাছাড়া চিলেকোঠাটাও একটি অতি ছোট্ট ঘর মাত্র।'

শুনে দময়ন্তী হতাশ মুখ করে হাসল।

বিশ্বরূপ ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে দময়ন্তীকে জিগ্যেস করলেন, 'কিছু কি বুঝতে পারলে?'

মৃদু হেসে দময়ন্তী বলল, 'কিছু-কিছু।'

॥ ১০ ॥

সিঁড়ির ঘরটা গোলাকৃতি, ভেতরের ব্যাস প্রায় ছ'ফুট। বৃত্তের বাইরেটা বাড়ির পিছনের দেওয়ালটাকে স্পর্শ করে আছে। ওই দেওয়ালটার সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণ করে একটা দরজা, তার সামনে একরাশ ভাঙা ইট।

বিশ্বরূপ সেদিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওইটে হল গে দরজা। গাঁথনি করে বন্ধ করা ছিল, তাই চোখে পড়েনি। তা ছাড়া, এধারে তো আসাই হয় না। চলো, ভেতরে চলো।'

সিঁড়ির ঘরটা বাইরে থেকে দেখলে যেমন অন্ধকূপ বলে মনে হয়, ভেতরটা কিন্তু তত অন্ধকার নয়। তার দেওয়ালে কোনও জানলা নেই বটে, কিন্তু একদম ওপরে ছাদে অনুভূমিক কতগুলো রঙিন কাচ লাগানো রয়েছে। সিঁড়িটা ঢালাই লোহার, ধাপগুলো ফুটো-ফুটো, কাজেই ওই ওপরের কাচের মধ্যে দিয়ে আসা আলো অনেকটাই নীচ পর্যন্ত চলে আসছে।

মাঝখানে খাড়া একটা দণ্ডকে ঘিরে সিঁড়ির ধাপগুলো যেন কেবল ঘুরেই যাচ্ছে আর ঘুরেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন কোথাও আর শেষ নেই। আধখানা উঠেই সমরেশ হাঁপিয়ে পড়ল। ওর আগে-আগে দময়ন্তী উঠেছিল। সম্বোধন করে বলল, 'এই স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে জানলে আজ আর এখানে আসতুম? এর চেয়ে তোমার "মনে পড়ে হায়" ছিল শতগুণে ভালো।'

দময়ন্তী হাঁপিয়ে পড়েছিল। কোনওক্রমে বলল, 'যা বলেছ! তাও যদি দু-চারটে জানলা থাকত, তাহলে আর এমন দমবন্ধ করা হত না ভেতরটা।'

সমরেশ পূর্ববৎ হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'সত্যি! দুটো জানলা যে কেন করেননি ত্রৈলোক্যনারায়ণ, কে জানে।'

কেবল বিশ্বরূপ ক্লান্তিহীন। গটগট-গটগট করে উঠে যাচ্ছেন আর মাঝে-মাঝে পিছন ফিরে হাঁক লাগাচ্ছেন, 'কী হল, পিছিয়ে পড়লেন যে? সবে তো আধখানা উঠেছি।' কিংবা, 'আর বেশি বাকি নেই। এই তো হয়ে এল।'

ছাদের ওপরে উঠে দময়ন্তী লম্বা শ্বাস নিল। বলল, 'আমার মাথা ঘুরছে। একটু বসি।' বলে মাটির ওপর বসে পড়ে চারদিকে তাকাল।

তার পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত খাড়া হয়ে দাঁড়াল দময়ন্তী। সমরেশ তাড়াতাড়ি পাশে এসে দাঁড়াল। জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

চাপা গলায় দময়ন্তী বলল, 'ছাদটা ন্যাড়া, লক্ষ করেছ?'

সমরেশ বলল, 'হ্যাঁ। এত উঁচু বাড়িতে ন্যাড়া ছাদ থাকা খুব অন্যায়।'

'আর ওই সামনের চিলেকোঠাটা অসম্ভব নীচু, একটা মানুষ কোনওরকমে ভেতরে খাড়া হয়ে হাঁটতে পারে, দেখেছ?'

এবার বিশ্বরূপ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। ঘরটা নীচু করেই তৈরি করা হয়েছিল। ওখানে তো কোনও লোক থাকে না, কেবল কতগুলো ভাঙা সুটকেস, তোরঙ্গ, হোল্ডঅল, ট্রাঙ্ক এই সমস্ত আছে। ওসব আমি ঘেঁটে দেখেছি।'

'ঘরটা কে তৈরি করেছিলেন?'

'ত্রৈলোক্যনারায়ণই।'

'কেন?' বলে দময়ন্তী সমরেশের দিকে তাকাল।

সমরেশ হতাশ মুখে করে বলল, 'তা আমি কী করে বলব? আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে এক ভদ্রলোক চিলেকোঠার ঘর কেন তৈরি করেছিলেন, সে কি আজ বলা সম্ভব? বিশেষ করে এই এক হাজারটা সিঁড়ি ভাঙার পর?'

বিশ্বরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দময়ন্তীর দিকে চেয়েছিলেন। সমরেশের কথা শুনে হেসে বললেন, 'বাড়াবাড়ি কোরো না, সমরেশ। হাজারটা সিঁড়ি সত্যিই যদি কোনওদিন ভাঙতে হয় তোমাকে তাহলে তোমার যে কী দুর্দশা হবে, আমি তাই ভাবি। তার মোটে ছয় শতাংশ ভেঙেই নেতিয়ে পড়লে?'

দময়ন্তীর শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সমরেশ একলাফে এগিয়ে এল। দময়ন্তীর একটা কাঁধ খামচে ধরে জিগ্যেস করল, 'পেয়ে গেছ?'

যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নাড়ল দময়ন্তী। বলল, 'হ্যাঁ।'

দময়ন্তীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সমরেশ দেখতে পেল একটা নারকোল গাছের মাথা। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করল, 'ওই নারকোল গাছের মাথায়?'

দময়ন্তী তৎক্ষণাৎ সংবিত ফিরে পেল। বলল, 'দ্যুৎ! কী যে বল তার ঠিক নেই।'

বিশ্বরূপ এতক্ষণ স্থির হয়ে দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, যদিও স্পষ্টতই তিনি দময়ন্তীকে

দেখছিলেন না। তাঁর সামান্য যন্ত্রণাক্ত মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তাঁর মাথার মধ্যে একটা পিচ্ছিল বুদ্বুদ ভেসে বেড়াচ্ছে আর তিনি সহস্রবাহু দিয়ে সেটাকে ধরবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না।

হঠাৎ বুদ্বুদটা ফেটে গেল।

বিস্ফারিত চোখে পাগলের মতো লাফ দিয়ে উঠলেন বিশ্বরূপ। বিকৃত অসংলগ্ন কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'ষাটখানা সিঁড়ি। বুঝেছি, বুঝেছি। পেয়ে গেছি, হে ভগবান, পেয়ে গেছি।' বলে ছাদের ওপর নাচ জুড়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে খ্যাপা ষাঁড় যেমন ম্যাটাডোরের দিকে ছুটে যায়, তেমনিভাবে অন্ধবেগে ছুট লাগালেন চিলেকোঠার দরজার দিকে।

দময়ন্তী আর সমরেশ এতক্ষণ হাঁ করে ভদ্রলোকের নাচ দেখছিল। দৌড় শুরু হতেই দময়ন্তী ব্যাকুল গলায় চিৎকার করে উঠল, 'যাবেন না, বিশ্বরূপবাবু, ওদিকে যাবেন না। আপনার পায়ে পড়ি, ফিরে আসুন।'

দময়ন্তীর চিৎকার কানে ঢুকল বিশ্বরূপের। দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ভাঙা, কর্কশ গলায় বললেন, 'কেন, যাব না কেন?' তাঁর চোখের দৃষ্টি উন্মাদের মতো।

দময়ন্তী সজল গলায় বলল, 'ফিরে আসুন, বিশ্বরূপবাবু। ওখানে যা অপেক্ষা করে আছে আপনার জন্যে, আপনি তা সহ্য করতে পারবেন না।'

হিংস্রভাবে দাঁত বের করলেন বিশ্বরূপ। বললেন, 'কেন, কী অপেক্ষা করছে আমার জন্যে? কে অপেক্ষা করছে?'

'আপনার নিয়তি, বিশ্বরূপবাবু, আপনার নিয়তি!'

'ওঃ, আমার নিয়তি? হোক গে, করুক গে। আমি যাবই, তোমরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না যেন। হুঁঃ, আমার নিয়তি!' বলে গজগজ করতে-করতে বিশ্বরূপ পিছন ফিরলেন।

দময়ন্তী ব্যাকুল চোখে সমরেশের দিকে তাকাল। বলল, 'হাঁ করে দেখছ কী? যাও ওঁর সঙ্গে।'

সমরেশ নিয়তি ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'জোর করে ধরে নিয়ে আসব?'

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল দময়ন্তী। বলল, 'নাঃ। শুধু সঙ্গে থাকো। ওঁকে ওঁর ভবিতব্যের সঙ্গে একবার মুখোমুখি হতে দাও।'

॥ ১১ ॥

অন্ধকার ঘরের মধ্যে হারিয়ে গেছেন বিশ্বরূপ, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন সমরেশ তাঁর ওপর নজর রাখছে। দুমদাম করে আওয়াজ আসছে ভেতর থেকে, বাক্স-প্যাঁটরা এদিক-ওদিক ছুড়ে ফেলবার আওয়াজ। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, তারপর ঠকঠক করে শব্দ শুরু হল। সেটা চলল প্রায় মিনিট দশেক। অবশেষে হঠাৎ একটা চাপা উল্লাসের চিৎকার ধ্বনি ভেসে এল। তার একটু পরেই অন্ধকার দরজার মাঝখানে বিশ্বরূপের মুখটা দেখা গেল। সে-মুখ উল্লাসে, উত্তেজনায়, লোভে একটা দানবীয় রূপ নিয়েছে।

কম্পিত কণ্ঠে বিশ্বরূপ বললেন, 'তুমি তো সিগারেট খাও, সমরেশ। একটা দেশলাই দিতে পারো?'

সমরেশ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা দেশলাই বের করে দিল। মুখটা আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গড়গড় করে একটা শব্দ হল ঘরের মধ্যে, যেন একটা পাটাতন সরানো হল। একটা পাণ্ডুর হলদে আলো জ্বলে উঠল। বোঝা গেল, বিশ্বরূপ দেশলাই জ্বালালেন। একটু পরেই হলদে আলোটা হারিয়ে গেল। সমরেশ এতক্ষণ অকম্পিত প্রস্তরবৎ বাইরে দাঁড়িয়েছিল, এবার এক-পা ভেতরে ঢোকাল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বীভৎস, রক্ত জল-করা, বুকফাটা আর্তনাদে দময়ন্তী থরথর করে কেঁপে উঠল। সেই ভয়ঙ্কর বিকট আর্তনাদে কেবল অবিমিশ্র বিভীষিকা। বেশ কিছু সময় ধরে সেই আর্তনাদ যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে-হতে দূরে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল। সমরেশ ততক্ষণে একলাফে ঘরের মধ্যে চলে গেছে।

॥ ১২ ॥

আবার ঘরের মধ্যে একটা গড়গড় শব্দ হল। তবে এবারের শব্দটা অনেক ব্যস্তসমস্ত, অল্পক্ষণ স্থায়ী। বোঝা গেল, পাটাতনটা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তার পূর্বতন অবস্থায় সরিয়ে দেওয়া হল।

একটু পরেই বিশ্বরূপের জ্ঞানহীন শরীরটাকে কাঁধে করে বিরাটাকার সমরেশ অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল।

কিন্তু এ কোন সমরেশ? ভয়াবহ আতঙ্কে ওর সমস্ত মুখ রক্তহীন, ফ্যাকাশে। বিশ্বরূপের শরীরটা ছাদের ওপরে নামিয়ে দিয়ে বিহুল দৃষ্টি তুলে দময়ন্তীর দিকে তাকাল সমরেশ। স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'ভেতরে একটা কঙ্কাল। সিঁড়ির ঠিক নীচে, একটা থামে হেলান দিয়ে বসে হাঁ করে ওপরে তাকিয়ে আছে।' বলতে-বলতে শিউরে উঠল।

শান্ত গলায় দময়ন্তী বলল, 'আমি জানতুম।'

'ওটা কে?'

'জয়রাম।'

'জয়রাম? কী ভয়ানক! কিন্তু ওই অন্ধকূপের মধ্যে আরও একটা কিছু জীবন্ত আছে! আমি তার নড়াচড়া করবার খড়খড় শব্দ শুনেছি।'

'ও কিছু নয়। ইঁদুর। বহু বছরের নিশ্চিন্ত বসবাস ওদের। তাদেরই সম্মিলিত পদধ্বনি শুনেছ।'

দময়ন্তীর কথায় সমরেশ নিশ্চিন্ত হল বলে মনে হল না। বিশ্বরূপের মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে ছাদের ওপর বসে নীরবে হাঁপাতে লাগল।

দময়ন্তী আলসের দিকে এগিয়ে গেল, সাবধানে নীচের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'এই শ্রীরূপা! শিগগির এক বালতি জল নিয়ে ওপরে আয়।'

শ্রীরূপা তখন লনের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, তার স্বামীটি অতিথিদের নিয়ে কোন দিকে গেল তারই খোঁজ করছিল বোধহয়। দময়ন্তীর ডাক শুনে জলের সন্ধানে একদৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

॥ ১৩ ॥

ভিজে আঁচল দিয়ে বারংবার মুখ মুছিয়ে দেওয়ার পর বিশ্বরূপ ধীরে-ধীরে চোখ খুললেন। শরতের সূর্য তখন পাটে বসেছেন। কনে-দেখা আলো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে শ্রীরূপার মুখে। বিশ্বরূপ চোখ খুলে সেই প্রেমে, করুণায় কোমল মধুর মুখখানি প্রাণভরে দেখলেন, তাঁর দু-চোখ জলে ভরে এল।

আস্তে-আস্তে উঠে বসে বিশ্বরূপ পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে স্ত্রীর হাতে দিলেন। বললেন, 'এটা সেই পদ্মরাগমণি। তুমি নিজের হাতে এটাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো।'

শ্রীরূপার উদ্বিগ্ন মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। সে-হাসিতে কী গর্ব, কী অহঙ্কার, কী মাধুর্য। কম্পিত গলায় বলল, 'ফেলে দেব কেন? আমার গলায় লকেট বানিয়ে পরব। এমন মণি কি সহজে পাওয়া যায়?'

শ্রীরূপার শেষ কথাগুলো বোধহয় বিশ্বরূপের কানে ঢোকেনি। তিনি তার আগেই হঠাৎ, স্থান কাল ভুলে, শ্রীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রবল আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরেছেন। শীতার্ত লোক যেমন জ্বলন্ত কাঠকয়লার আংঠা জড়িয়ে ধরে তার থেকে উত্তাপ টেনে নেয়, বিশ্বরূপও যেন সেই ভাবেই শ্রীর শরীর থেকে তাঁর প্রাণশক্তি টেনে নিচ্ছিলেন।

সমরেশের কাঁধে ভর দিয়ে নীচে নামতে-নামতে বিশ্বরূপ জনান্তিকে জিগ্যেস করলেন, 'আমরা আজ যা দেখলুম, সেটা শ্রীকে বলনি তো?'

সমরেশ বলল, 'না। সেটা শুধু আমদের দুজনের অভিজ্ঞতাতেই থাক।'

॥ ১৪ ॥

শ্রীরূপা বলল, 'আমি জানতুম, তুই ঠিক বের করতে পারবি। এখন একটু বস। আমি রান্নাঘরটা ঘুরে আসি। আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যাবি।'

বিশ্বরূপ বললেন, 'দ্যাখো না, একটু চিংড়িমাছ লাগাতে পারো কি না।' ভদ্রলোক আড় হয়ে খাটে শুয়েছিলেন, মুখে সুস্পষ্ট ক্লান্তি, কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিদগ্ধ, সুশীল হাসিটি ফিরে এসেছে।

শ্রীরূপা মাথা নেড়ে বলল, 'সেই ভালো। চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর...।'

'ভাজা মুগের ডাল।' নির্লজ্জ সমরেশ যোগ করল।

শ্রীরূপা বলল, 'হুঁ। তাও হবে। তবে আপনার কপালে আরও কিছু হবে।'

শ্রীরূপার বলার ভঙ্গিতে ওই 'আরও কিছুটা' বিশেষ আনন্দজনক হবে বলে মনে হল না সমরেশের। ব্যাকুল হয়ে জিগ্যেস করল, 'আমার কপালে আবার কী হবে?'

'হবে, হবে। আমি বাজার থেকে ঘুরে আসি।' বলে শ্রীরূপা তার স্বামীর দিকে ফিরল। বলল, 'আমি মায়াকে নিয়ে বাজারে চললুম, চিংড়িমাছ না দেখে কেনা ঠিক নয়। তুমি ততক্ষণ সাবধানে থেকো, দময়ন্তী দেখবে'খন তোমাকে। ফিরে এসে পুরো গল্পটা শুনব আর সমরেশদাকে দেখে নেব।'

সমরেশ হাঁ-হাঁ করে উঠতে-না-উঠতেই শ্রীরূপা পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

॥ ১৫ ॥

দময়ন্তী জিগ্যেস করল, 'আপনি ওপরে কী দেখেছেন, শ্রীরূপাকে জানিয়েছেন কি?'

বিশ্বরূপ বললেন, 'না। বলেছি, ওপরে বিশেষ কিছুই নেই। থাকার মধ্যে আছে কিছু ইঁদুর আর বিষাক্ত গ্যাস। সেই গ্যাসের প্রভাবেই আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম।'

সমরেশ বলল, 'শ্রীরূপা কি এই গ্যাসটা বিশ্বাস করেছে?'

'করেছে। আমি যে অভিশপ্ত গুপ্তধনের মরীচিকার পিছনে ছোটা একেবারে বন্ধ করেছি, তাতে ও এতই আনন্দিত যে, কেন বন্ধ করেছি তা নিয়ে প্রশ্নই করছে না। যে-কোনও গল্পই ও এখন বিশ্বাস করতে রাজি আছে।'

'সে-কথা থাক। এখন বোঝা যাচ্ছে, ওপরের ছাদটা পুরোটাই পরছাদ, মানে ইংরিজিতে যাকে বলে ফলস সিলিং বা আন্ডার সিলিং। ওই ছাদ আর আসল ছাদের মধ্যে একটা ফুট ছয়েক উঁচু আস্ত ফ্লোর। বাড়িটা আদতে তিনতলা, তার একটা তলা রাখা হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।'

সমরেশ বলল, 'লোকচক্ষুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে কত কিছু না করা হয়েছে। ওই জন্যেই বাড়ির ফ্যাশানটা এমন সাদামাটা, চাঁছাছোলা। ওপরের আর নীচের জানলাগুলো ইচ্ছে করেই দু-রকম করা হয়েছে, আর বাইরেটা করা হয়েছে নিরেট, যাতে করে বিভিন্ন তলার আপেক্ষিক অবস্থানটা চট করে কারোর চোখে না পড়ে। ছাদটা ন্যাড়া, সেটা নীচ থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। চিলেকোঠার ঘরটা অসম্ভব নীচু করে তৈরি, যাতে নীচ থেকে দেখলে মনে হয় সেটা ওইটুকু রেলিংয়ের ওপর মাথা উঁচিয়ে আছে। আর সিঁড়ির ঘরে একটাও জানলা নেই, যাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কেউ বাড়িটা দেখতে না পায়, আধো অন্ধকারে ঘুরতে-ঘুরতে ওপরে উঠে একেবারে ভুল করে ছাদে উত্তরণ, এমন কিছু নেই যার সঙ্গে তুলনা করে বাড়ির উচ্চতা আর ছাদের ন্যাড়াত্বটা কারোর চোখে পড়ে। উঃ, কী ঘুঘুই না ছিলেন, যিনি বানিয়েছিলেন এই বাড়ি। আই বেগ ইওর পার্ডন, মিস্টার মৈত্র, মানে আপনার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ত্রিলোকেশ্বরের আসলে হওয়া উচিত ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ভদ্রলোক তাহলে কলকাতায় এরকম খান পনেরো বাড়ি করে রেখে যেতে পারতেন।'

বিশ্বরূপ সহাস্যে বললেন, 'ত্রিলোকেশ্বর নয়, ত্রৈলোক্যনারায়ণ, আর উনি ছিলেন আমার ঠাকুরদার বাবা। তবে তুমি লজ্জিত হয়ো না। তিনি যে অত্যন্ত ঘুঘু লোক ছিলেন, তাতে কি আর সন্দেহ আছে? আমিই বরং তাঁকে একটু আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলুম। ভেবেছিলুম, কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই তিনি এ-বাড়িটা তৈরি করেন। আসলে, এখন বুঝি, তা মোটেই নয়। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, তাঁর বিশাল ধনভাণ্ডার ও-বাড়িতে আর নিরাপদ নয়। কাজেই এমন ভাবে সরাতে হবে সেই মূল্যবান ঐশ্বর্য যাতে তা কারোর চোখে না পড়তে পারে। তা নাহলে, ওই সম্পত্তির জন্যেই বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে হবে।

'তখন ব্যাঙ্ক ছিল না, জগতে হেন সিন্দুক নেই যা চোর-ডাকাতে ভাঙতে পারে না, দেওয়ালে গোপন সুড়ঙ্গ, মাটির তলায় গুপ্ত কুঠুরি নেহাত পুরোনো হয়ে গেছে, লোকে আগে ওসব জায়গাতেই খোঁজ করে। তাহলে কোথায় রাখা যায়? তখন এই ব্রিলিয়ান্ট প্ল্যান তাঁর মাথায় এল, আসলে সংস্কার-টংস্কার সব বাজে। এ-বাড়িতে যদি কেউ খোঁজেও, খুঁজবে দেওয়ালে, একতলার মেঝেয়। কারোর মাথায় মরে গেলেও এ-ধারণা আসবে না, ছাদের চিলেকোঠার মেঝের মধ্যে গোপন দরজার খোঁজ করা দরকার। তাও সে কী দরজা! লোহাকাঠের ওপর মার্বেল টালি মেরে এমন ভাবে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, কার সাধ্যি বোঝে!'

'আপনি বুঝলেন কী করে?'

'আমি প্রত্যেকটি টালি ঠুকে-ঠুকে দেখছিলুম যে। একটা টালিতে জোরে চাপ দিতে পুরো দরজাটা ইঞ্চি তিনেক নেমে যায়, তারপর সেটা ঠেলতে গড়গড় করে সরে গেল। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তুমি কী করে বুঝলে বলো তো দময়ন্তী, যে গুপ্ত কুঠুরি যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা ছাদে?'

দময়ন্তী বলল, 'অনেকগুলো কারণে। প্রথমত, ওই পদ্মরাগমণিটা পাওয়া গেল শান্তর মার্বেলের কৌটোয়, কারণ, ইঁদুর ওটা মুখে করে এনে ফেলেছিল আর শান্ত সেটা কুড়িয়ে তুলে রেখেছিল, তাই। এখন, ইঁদুর তো ওটাকে মুখে করে একতলায়ও যেতে পারত, আর গেলে যেহেতু পালেদের সঙ্গে আপনার দারুণ সদ্ভাব অতএব আপনি নিশ্চয়ই সেটা জানতে পারতেন। পাল সৎ লোক, আপনাকে মণিটার আসল দামই বলেছিলেন, বাজে কাচ বলে গাপ করবার চেষ্টা করেননি। তবে,

ইঁদুর পালেদের বাড়ি না ফেলে কষ্ট করে সিঁড়ি বেয়ে বারো ফুট উঠে আপনার বাড়িতে ফেলেছে। তা ফেলতে পারে, ইঁদুর তো আর মানুষ নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ-ঘটনা বারংবারই ঘটছে। আপনার বাবা আর ঠাকুরদা, দুজনেই দোতলাতেই এ-ধরনের কিছু জিনিস পেয়েছিলেন এবং নিশ্চয়ই কোনও ছুতোয় পালেদের বের করে দিয়ে তাঁদের মেঝে খুঁড়িয়েছিলেন। কাজেই, ধরে নেওয়া যেতে পারে পালেরা এ-ব্যাপারে অংশীদার ছিল না এবং সম্ভবত কোনও সন্দেহও করেনি। করলে, বঙ্কিমবাবু আপনার কাছে এ-বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতেন। তাহলে, একটা সন্দেহ হতেই পারে যে, মণিটা বাইরে থেকেই আসেনি। সেক্ষেত্রে অন্যতম সম্ভাবনা, ওপর থেকে পড়েছে।

'দ্বিতীয়ত, যে বাড়ির গেট এত কারুকার্য করা, সে-বাড়িটা এত সাদামাটা কেন? এর নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে—স্রেফ মিতব্যয়িতা এর কারণ হতে পারে না।

'তৃতীয়ত, ছাদে ওঠবার সিঁড়িটা নিতান্তই অনাবশ্যক। ছাদে উঠলে মেয়েদের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, এ-ধরনের হাস্যকর কথা ত্রৈলোক্যনারায়ণের মতো বিচক্ষণ লোকের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তাহলে সিঁড়িটা ওখানে রাখার সার্থকতা কোথায়?

'চতুর্থত, জানলাগুলোর তারতম্য কেন?

'এ সমস্তই, একটা সন্দেহেরই উদ্রেক করে যে, এ-বাড়িটাতেই কোনও গন্ডগোল আছে, এবং সেটা আছে ওপরের দিকে, নীচের দিকে নয়। সমরেশ ঠিকই বলেছে, এ-সমস্তই লোককে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে।

'আমি অবশ্য সন্দেহ করেছিলুম, চিলেকোঠার ঘরের মেঝে নিশ্চয়ই ছাদের লেভেলের চেয়ে উঁচুতে এবং তার মধ্যেই গুপ্ত কুঠুরি, কিন্তু যখন শুনলুম ছাদ আর ওই ঘরের মেঝে সমান-সমান, তখন হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। তবু আমার মন বলছিল রহস্যের সমাধান ছাদেই আছে। তারপর আপনি যখন বললেন, সিঁড়ির সংখ্যা ষাটটা, তখুনি সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনার ঘরগুলো বারো ফুট করে উঁচু, তাহলে দুটো তলায় হয় চব্বিশ ফুট, অথচ ষাটটা সিঁড়ি কভার করে ত্রিশ ফুট। তাহলে, এই ছাদের তলায়ই লুকোনো আছে হারানো ছ'ফুট।

'সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলুম, জয়রামের দেহও ওখানেই রয়েছে। ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ওখান গিয়ে ঢুকেছিলেন, কিন্তু ভূমিকম্পে হঠাৎ দরজাটা সরে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। জড়বুদ্ধি জয়রাম ভয়ে দিশেহারা হয়ে যান, আর বেরোতে পারেননি। বোধহয়, দরজাটা এমন যে তলা থেকে খোলাও যায় না।'

বিশ্বরূপ জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু পদ্মরাগমণিটা এই ফ্লোরে এল কী করে? ছাদে কি কোনও ফুটো আছে?'

দময়ন্তী বলল, 'ঠিক ফুটো বলতে যা বোঝায় তা হয়তো নেই। ওই তো, ছাদের কনস্ট্রাকশানটা দেখুন না। বিমের ওপর প্রিকাস্ট টালি বসিয়ে-বসিয়ে ছাদ বানানো হয়েছে। বেশি পুরোনো হয়ে গেলে টালিগুলোর মধ্যে ফাঁক হয়ে যায়। হাতিবাগানে আমার মার মামাবাড়িতে অমন দেখেছি। এখন, আমার বিশ্বাস, আপনার যে-ঘরটি বন্ধ থাকে, তার ছাদে অমন ফাঁক রয়েছে। যেহেতু ঘরটা ব্যবহার হয় না আর সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে আলোও আসে না, সেই জন্যে সেটা কোনওদিনও আপনার নজরে পড়েনি। ইঁদুরের দৌড়োদৌড়িতে ধাক্কা লেগে পদ্মরাগমণিটা এবং তারও আগে গোটা দুই মূল্যবান রত্ন ওই পথেই নীচে পড়েছে। এবং যেহেতু আপনার ঠাকুরদা, বাবা আর আপনি কোথায় এ-রত্নগুলি পাওয়া গেছে, তা নিয়ে আলোচনা করেননি, সেইজন্যে খেয়াল করেননি যে, তাদের উৎপত্তি একই ঘরে। করলে হয়তো বহুদিন আগেই রহস্যের সমাধান হয়ে যেত।'

দময়ন্তী চুপ করল। অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। তারপর সমরেশ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ওপরে ওই ওটা থাকলে আপনার নীচে থাকতে কোনও অসুবিধে হবে না?'

মাথা নাড়লেন বিশ্বরূপ। বললেন, 'কীসের অসুবিধে? এতদিন থাকলুম, ভবিষ্যতেও থাকব।

তা ছাড়া, এখন তো আর এ-বাড়িটা বাইরের লোককে ভাড়া দিতে পারব না। ভাড়া না দিলে আমার পক্ষে অন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকাও সম্ভব নয়। আর, আমি তো শ্রীরূপা নই। আমার কোনও কুসংস্কার-টুসংস্কার নেই।'

॥ ১৬ ॥

শ্রীরূপা ঘরে ঢুকল।

সমরেশ বলল, 'আমায় যেন কী তুমি দেবে বলেছিলে?'

শ্রীরূপা বলল, 'দেব বইকী। আমার নাকে জুতোর সুকতলা পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতে বলেছিলেন না? দেওয়াচ্ছি, দাঁড়ান। আমার কাছে ত্রৈলোক্যনারায়ণের রুপো বাঁধানো খড়ম আছে, সেটা ভাঙছি এখন আপনার মাথায়।'

হাতজোড় করে সমরেশ বলল, 'আমার মাথাই যদি ভাঙতে চাও, তাহলে রুপো বাঁধানো খড়মটা নষ্ট করে কী লাভ? তারচেয়ে বরং তোমার ভাঙা গলায় একটি মেশিনগান চালাও, আমি মরে পড়ে থাকি।'

একটু পরে শ্রীরূপার ভরাট মিষ্টি গলার গানে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল ঃ

'ওই আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গণ,
কোথায় ছিল কোন যুগে মোর নিমন্ত্রণ,
মন লাগল না, তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।'

অন্বেষন



অমলেন্দু সামুই

প্রস্তাবনা

মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধে ভরা ঘরখানার সব আলোগুলো একসঙ্গে নিভে গেল। অন্ধকার ঘরে একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করল অলক ঘোষ। এতক্ষণ যেন শরীরের পেশিগুলো উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিল নতুন এক চমকের।

মেজর অলক ঘোষ।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসার। হালকা ঋজু চেহারা, ছ'ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা। সারা মুখে বুদ্ধির ছাপ জ্বলজ্বল করছে। চোখদুটো উদাস।

অন্ধকার ঘরে আওয়াজ ভেসে এল পুরুষ-কণ্ঠের। প্রতিরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার মালহোত্রাসাহেব বলতে লাগলেন, মেজর ঘোষ, আপনার চাকরি জীবনের অতীত ইতিহাস আমরা খুঁটিয়ে তন্নতন্ন করে দেখেছি। বলতে দ্বিধা নেই, যে-কয়জন অফিসারকে আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরব বলে মনে করি, তাদের মধ্যে আপনি অন্যতম। সেইজন্যে এই বিরাট কাজের দায়িত্ব আপনার হাতে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, এ-কাজে আপনি সফল হবেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঘরের মধ্যে মিস্টার মালহোত্রা ও মেজর অলক ঘোষ ছাড়া আর কেউ নেই। ঘরের সমস্ত জানলা ও দরজা বন্ধ। তার ওপর ভারি পরদা ঝুলছে।

হঠাৎ সামনের দেওয়ালের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠল। বোঝা গেল, মিস্টার মালহোত্রা প্রোজেক্টর চালিয়েছেন।

অলক তাকিয়ে দেখল, ধীরে-ধীরে ছবি ফুটে উঠছে। ওপরে নীল আকাশ। নীচে পাহাড় আর সবুজ বনানী।

মিস্টার মালহোত্রা বলতে লাগলেন, এই জায়গাটার নাম নেফা। এখন যার নাম অরুণাচল প্রদেশ। জায়গাটার অবস্থান নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। ওই জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে আছে আমাদের ছোট্ট একটা আর্মি ইউনিট। কম্যান্ড করছেন কর্নেল চ্যাটার্জি। সম্প্রতি আমাদের এক বন্ধু-দেশ থেকে প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত একটা দলিল ওই ইউনিটে এসে পৌঁছেছে। আপনার কাজ হবে দলিলটি নিরাপদে দিল্লিতে নিয়ে আসা। কাজটা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা অনুমান করছি, শত্রুপক্ষের গুপ্তচর অলরেডি দলিলটার একটা মাইক্রো ফিল্ম ফটো তুলে নিয়েছে। কিন্তু ফিল্মটি ইউনিটের মধ্যেই রয়ে গেছে। ওরা এখনও সরিয়ে ফেলতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, মাত্র কয়েকদিন আগে ওই ইউনিটের সিকিউরিটি অফিসার মেজর নায়ার নিহত হয়েছেন।

দেওয়ালের গায়ে তখন পাহাড় আর জঙ্গলের পাশ দিয়ে একটা নদী দেখা যাচ্ছে। ছবির মতো এঁকেবেঁকে কখনও পাহাড়গুলোর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে, আবার কখনও উচ্ছলা তরুণীর মতো খিলখিল করে হেসে উঠছে। তারপর ক্যামেরা আরও নীচে নেমে এল। সারি-সারি কুঁড়েঘর। অর্ধ উলঙ্গ কিছু মানুষ চলে বেড়াচ্ছে।

মিস্টার মালহোত্রা বললেন, ওরা হল ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। শিক্ষা-দীক্ষার আলো এখনও পৌঁছায়নি। ফলে, ওরা এখনও সো-কলড় 'অসভাই' রয়ে গেছে। সাধারণভাবে ওরা বিপজ্জনক নয়। কিন্তু ওদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগলে ওরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। ওখানে ছোট একটা 'হেলথ সেন্টার' আছে। একজন ডাক্তার আর কিছু নার্স আছে। আপনাকে জানিয়ে রাখা ভালো যে, ওইসব আদিবাসী মেয়েরা খুব সুন্দরী এবং ওদের স্বাস্থ্যও খুব লোভনীয়।

প্রোজেক্টরের আলো নিভে গেল। মিস্টার মালহোত্রা ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দিলেন। তারপর হাসিমুখে এগিয়ে এলেন অলক ঘোষের কাছে।

মেজর ঘোষ, ওই দলিলটির ওপর আমাদের দেশের নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। আশা করি, আপনার কাজের গুরুত্ব আপনি বুঝতে পেরেছেন।

অলক ঘোষ উঠে দাঁড়ল। খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল শরীরখানা। মিস্টার মালহোত্রা তাকিয়ে দেখলেন। দেখবার মতোই চেহারা অলক ঘোষের। শরীরের কোথাও একটু মেদ নেই। চওড়া বুক আর সরু কোমরে বীরের কাঠিন্য।

মালহোত্রা বললেন, কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?

দলিলটা বর্তমানে কোথায় আছে?

কর্নেল চ্যাটার্জির কাছে।

মেজর নায়ার কীভাবে নিহত হয়েছেন?

অফ ডিউটিতে তিনি যখন বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়।

অলক ঘোষ দু-এক মিনিট কী যেন চিন্তা করে নিল। তারপর বলল, আমাকে ওখানে কীভাবে পাঠানো হচ্ছে?

আপনাকে পাঠানো হচ্ছে মেজর নায়ারের জায়গায়—সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে। কিন্তু যে-মুহূর্তে আপনার কাজ শেষ হবে—আপনি সোজা চলে আসবেন দিল্লিতে। এর জন্য নতুনভাবে কোনও অর্ডার ইস্যু করা হবে না। আপনার চলে আসার সুবিধার জন্য দু-খানা প্লেন ও একখানা হেলিকপ্টার সবসময় 'স্ট্যান্ড বাই' থাকবে। তবে প্রয়োজন মনে করলে 'বাই রেল' অথবা 'বাই রোড'ও আপনি আসতে পারেন। আর কিছু?

মৃদু হেসে অলক বলল, ধন্যবাদ স্যার। আর কিছু নয়।

উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।

এক ঃ ভৌতিক কণ্ঠস্বর

প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে মেজর অলক ঘোষ যখন বেরিয়ে এল তখন দিল্লির ঘড়িতে রাত ন'টা। একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে এল চাঁদনি চকে। কাল সকালেই রওনা হতে হবে নেফার উদ্দেশে। সেইজন্যই কিছু কেনাকাটার দরকার।

চাঁদনি চকে তখন আলোর পসরা।

আনমনে হাঁটতে লাগল অলক। দু-একটা দোকানে ঢুকে কিছু কেনাকাটা করল। তারপর বাড়ি ফেরার জন্য যখন ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়াল, তখন হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডেকে উঠল, হাই অলক? তুই এখানে?

অলক চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখল, রজত সেন। এককালে দুজনে কলেজে পড়েছিল একসঙ্গে। রজতের পরনে টেরিকটনের প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট।

একগাল হেসে রজত বলল, তোকে যে একবারে চেনাই যাচ্ছে না রে। একেবারে পাক্কা মিলিটারি ম্যান।

হাসির জবাবে হাসি দিয়ে অলক বলল, মিলিটারি ম্যানদের চেনা সবসময়ই একটু কঠিন। কিন্তু তোরও তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট একখানা গোঁফ রেখেছিস। তুই না ডাকলে আমি তো চিনতেই পারতাম না।

রজত বলল, তোরই ভাষায় জবাব দিই। মিলিটারি ম্যানদের চেনা সবসময়ই একটু কঠিন।

অর্থাৎ?

আমি বর্তমানে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের একজন পাইলট। ফ্লাইট লেফটেনান্ট রজত সেন।

মাই গুডনেস! আমরা তাহলে একই গোয়ালের গরু।

তুই তো আমার কোনও খোঁজই রাখিস না। চল, কোথাও গিয়ে বসা যাক।

অলক বলল, না রে, আজ আর সময় হবে না। কাল সকালের ফ্লাইটেই আমাকে আসাম চলে যেতে হচ্ছে।

পোস্টিং?

হ্যাঁ।

তবুও চল না। একজনের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল অলক। চাঁদনি চক থেকে লালকেল্লার দিক হাঁটতে লাগল দুজনে। রজত একটা সিগারেট ধরাল। বড়রাস্তা পার হয়ে যখন সামনের খোলা ময়দানে দুজনে পা রাখল, অকস্মাৎ মনে হল, বর্তমান সভ্যতা থেকে তারা যেন বহুদূর পিছিয়ে এসেছে।

সামনে ইতিহাসের স্মৃতি-ভরা লালকেল্লা। অতিকায় এক জীবের মতো আবছা অন্ধকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। থমথম করছে চারদিক। অথচ কিছুটা দূরেই দিল্লির চাঁদনি চক অনেক মানুষের কলকাকলিতে মুখর হয়ে আছে। চলছে বেচাকেনা।

অলক হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, এইদিকে কোথায় যাচ্ছিস রে?

রজত বলল, আমার লেটেস্ট প্রেমিকা সারদার সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেব। মেয়েটিকে দেখলে তুই চমকে উঠবি। তমিলনাড়ুর মেয়ে। পেশায় নার্স। নেফার কাছে কোনও এক হাসপাতালে চাকরি করছে। তোর কাজে লাগবে।

আমার কাজে লাগবে?

চকিতে অলকের সমস্ত স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠল। কী বলতে চায় রজত? নেফার কাছে কোনও এক হাসপাতালে রজতের প্রেমিকা সারদা চাকরি করে। সে নাকি অলকের কাজে লাগবে! তার মানে, সে যে নেফা যাচ্ছে, সেটা রজত জানে।

অর্থাৎ?

তার যাওয়াটা গোপন নেই? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? মাত্র একঘণ্টা আগে সে প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে নির্দেশ পেয়েছে। এর মধ্যেই রজত সেন নামক এয়ার ফোর্সের একজন পাইলট সে খবর জানতে পারল? অর্থাৎ, গোপন খবরটা আর গোপন নেই। কেন সে যাচ্ছে—তাও নিশ্চয়ই রজত জানে। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল অলক।

মুখে বলল, তোর প্রেমিকা আর আমার কী কাজে লাগবে! তুই তো জানিস, মেয়েদের সংশ্রব সবসময় আমি এড়িয়ে চলি।

কেন! মিলাইকে এখনও ভুলতে পারিসনি?

মিলাই!

অনেকদিনের পুরোনো একটা ব্যথার জায়গায় কেউ যেন খোঁচা মারল। সারা শরীরটা একবার কেঁপে উঠল অলকের। মিলাই! এটা তো একটা নাম নয়। একটা সঙ্গীত। সবসময় যার রেশ অলকের বুকের মাঝে রিনরিনিয়ে বাজে। একটা ব্যথা, একটা যন্ত্রণা, তার সঙ্গে অফুরন্ত আনন্দের ধারা। সব মিলিয়ে একটা মিষ্টি মেয়ের নাম—মিলাই।

হৃদয়ের গভীর গোপনে সানাই-এর যে-সুরটা বেজে উঠতে চাইছিল, সেটাকে কঠিন চোখে শাসন করল অলক। উদাস চোখ দুটো থিরথির করে কেঁপে উঠল। এখন ভাবাবেগের সময় নয়। রজতের পরের কথায় সমগ্র মন-প্রাণ আবার সজাগ হয়ে উঠল।

রজত ফিসফিসানি সুরে বলল, অলক, তুই যে-কাজের ভার নিয়ে কাল রওনা হচ্ছিস সেটা আমি জানি। আমি ডিটেল হয়েছি তোর 'স্ট্যান্ড বাই' এয়ারক্র্যাফ্‌টের পাইলট হিসাবে। তোকে নেফা থেকে নিরাপদে দিল্লি ফিরিয়ে আনাই আমার কাজ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তোর আর আমার পিছনে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর লেগেছে। খুব সাবধানে থাকিস।

পরক্ষণেই পাকা অভিনেতার মতো গলার স্বর উচ্চগ্রামে চড়িয়ে দিয়ে বলল, তাহলে তোর মিলাই-এর আর কোনও খবরই পাসনি?

অলক ঘোষের মনের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। এ কোন রজত? কী বলল সে? একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগেই সামনের অন্ধকার থেকে কে যেন এগিয়ে এল। অলক দেখল, স্কার্ট পরিহিতা একজন রমণী। আবছা আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অলক।

রজত পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বান্ধবী সারদা কৃষ্ণমূর্তি। আর এ হল আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেজর অলক ঘোষ।

নিজেকে সামলে নিল অলক। মেয়েটি অবিকল যেন মিলাই-এর প্রতিচ্ছবি। শুধু তফাত গায়ের রং-এ। মিলাই ছিল কাঁচা হলুদে সূর্যের আলো ঠিকরে-পড়া রঙের স্বপ্নময়ী সান্ত্বনা। আর এ হল তামিলনাড়ুর স্বাভাবিক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মূর্তিময়ী যৌবনের আবেদন। তফাত আছে বইকী। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে চমকে ওঠার মতোই মিল।

অলক ঘোষ মুহূর্তে 'মেজর'-এ রূপান্তরিত হল। রজতের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বাইরে রজত জানে তার পরবর্তী ডিউটি কী। আর রজতের কথা অনুযায়ী তার পিছনে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ঘুরছে। সারদা হল রজতের বান্ধবী। তাকে বিশ্বাস করা যায় কি?

ইংরেজিতে আলাপ শুরু হল তিনজনের। পায়ে-পায়ে হাঁটতে লাগল চাঁদনি চকের দিকে। সারদা বলল, সেন তো আপনার কথা বলতে অজ্ঞান। ওর কাছে আপনার প্রশংসা এত শুনেছি যে, বহুদিন থেকেই আপনাকে আমার দেখার ইচ্ছা। আজ সে-আশা পূর্ণ হল।

উদাস চোখে সারদার মুখের দিকে তাকিয়ে অলক বলল, ধন্যবাদ।

সারদার চোখের যেন পলক পড়ে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে মোহাচ্ছন্নের মতো বলল, ইউ আর রিয়েলি হ্যান্ডসাম মিস্টার ঘোষ।

আবার বলছি ধন্যবাদ, মিস কৃষ্ণমূর্তি।

আপনি আমাকে সারদা বলেই ডাকবেন।

অলকের কপালে চিন্তার রেখা পড়ল। মেয়েটি কি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে?

ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে অলক বলল, তার কি কোনও প্রয়োজন আছে, মিস? আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কি না সন্দেহ। হয়তো আজকের আলাপই শেষ আলাপ।

অপমানে সারদার মুখে একটা কালো ছায়া নেমে এল।

অলক বলল, আপনাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য ও-কথা বলিনি, মিস কৃষ্ণমূর্তি। আমরা মিলিটারি মানুষ। লোকালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই কম। তবে আপনাকে আমার মনে থাকবে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল অলক। সাড়ে দশটা। বুঝতে পেরে রজত বলল, তোকে আর দেরি করাব না, অলক। তুই যা। গুডনাইট।

চাঁদনি চকের হালকা ভিড়ের মাঝে ওদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলমান একটা ট্যাক্সি থামিয়ে অলক উঠে পড়ল।

অলক ভেবেছিল, প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে যে-কাজের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে, সেটা শুরু হবে নেফার সেই আর্মি ইউনিট থেকে। কিন্তু এখন বোঝা গেল, তার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এখন থেকে প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। সময়ের হিসাবে মাত্র দেড়ঘণ্টা সে অপচয় করেছে। অপচয়! না, ভুল বলা হল। রজতের সঙ্গে তার আকস্মিক সাক্ষাৎ তাকে সচেতন করে দিয়েছে। মনে করিয়ে দিয়েছে, সে হল মেজর অলক ঘোষ। ভারত সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারী। মালহোত্রার ভাষায়, মিলিটারির গৌরব।

বাড়ির কাছে ট্যাক্সি থামাতে ভাড়া মিটিয়ে অলক নেমে পড়ল।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলল তার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। ব্যাচেলার মানুষ। সংসারের দিকে কোনও আকর্ষণ নেই। অথচ তার মতো দায়িত্ববান অফিসার খুব কমই দেখা যায়। এটা সকলেই জানে।

চাবি খুলে নিজের ঘরের মধ্যে পা দিল অলক। অন্ধকার ঘর। দূরের লাইটপোস্টের আলো আবছা ভাবে মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে। আলোর সুইচটা 'অন' করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল সে। ঘড়িতে তখন এগারোটা।

দু-মিনিট বা তিন মিনিট সময় কেটেছে। সহসা এক ভরাট গলার আওয়াজে চমকে উঠল অলক।

কে যেন বলছে, নমস্কার, মেজর ঘোষ। এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু প্রয়োজনটা খুবই জরুরি—তাই আর অপেক্ষা না করে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি।

বিদ্যুচ্চমকের মতো বিছানার ওপর উঠে বসল অলক। চকিতে দেখে নিল, ঘরের একমাত্র দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এবং মুহূর্তের মধ্যে কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা হাতের মুঠোয় চলে এল। কেউ কি ঘরের মধ্যে আগে থেকে লুকিয়েছিল?

কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, অলকবাবু, ভারত সরকার আপনাকে যতখানি গুরুত্ব দেয়, আমরাও ঠিক ততখানি দিই। আপনার কাজের ওপর আমাদের ভরসা আছে। তাই অনুরোধ, নেফায় গিয়ে আপনি দলিলের একখানা ফটোস্ট্যাট কপি অথবা মাইক্রোফিল্মটা আমাদের হাতে তুলে দেবেন। এর জন্যে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপনাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

অলক ইতিমধ্যে বিছানা থেকে নেমে পড়েছে। তারপর রিভলভারটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল সুইচবোর্ডের দিকে। পরপর কয়েকটা সুইচ টিপে দিল। রান্নাঘর, বাথরুম, ডাইনিং স্পেস নিমেষের মধ্যে আলোকিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকাল অলক। কেউ নেই। খাটের নীচে, পরদার আড়াল, রান্নাঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেলল। আশ্চর্য, কোনওখানে মানুষের ছায়ামাত্র নেই। তাহলে এই কণ্ঠস্বরের অধিকারী কোথা থেকে কথা বলছে? কোথায় লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে?

সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর তখন বলে চলেছে, আপনাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আপনি যদি আমাদের কথামতো কাজ করেন, সরকারকে আমরা এ-বিষয়ে কিছুই জানাব না। আপনি নিরাপদে আসল দলিলখানা নিয়ে দিল্লি ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, স্বয়ং ভগবানও আপনার মৃত্যু রোধ করতে পারবে না।

অলক এক দৌড়ে জানলার কাছে এগিয়ে গেল। পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল। সামনেই লাইটপোস্টের আলোয় সবকিছু দিনের মতো পরিষ্কার। মানুষ কেন, একটা ইঁদুর থাকলেও তাকে স্পষ্ট দেখা যেত।

জানলা বন্ধ করে দিল অলক। হাতের পেশিগুলো শক্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। একটা দারুণ উত্তেজনায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে অলকের। কে কথা বলছে? কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সে নিজেকে?

কণ্ঠস্বর বলেই চলেছে, যদি আপনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহলে দয়া করে আপনার শোওয়ার ঘরের আলোটা তিনবার নেভাবেন, তিনবার জ্বালাবেন। তাহলেই আমরা সব জানতে পারব। এবং কথা দিচ্ছি, কাল সকালেই আপনি পঁচিশ হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। বাকিটা কাজ মিটলে। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।

ভৌতিক কণ্ঠস্বর থেমে গেল। ঘরের মধ্যে নিদারুণ স্তব্ধতা। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে সারা মন ভরে গেল অলকের। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। আবার সবক'টা ঘর খুঁজে ফেলল অলক। সে ছাড়া আর কোনও জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই পুরো অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে। তবে কে কথা বলল?

ভূত?

নিজের মনেই হেসে ফেলল অলক। চোখ রাঙিয়ে শাসন করল শৈশবের মনটাকে, শাট আপ! ঠাকুমার কোলে শুয়ে ভূতের গল্প শোনার দিন অনেকদিন আগেই চলে গেছে। এখন তুমি মেজর ঘোষ। আর্মি অফিসার। দেশের সৈনিক। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তোমার জীবন উৎসর্গীকৃত। ভুলে যেও না, ধোঁয়ার দেখা পেলে তার পিছনে আগুনের অস্তিত্ব থাকতেই হবে।

অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি ইঞ্চি তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল অলক।

অবশেষে পাওয়া গেল। ভৌতিক কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে খুঁজে পাওয়া গেল। রিভলভারটা পকেটে পুরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল অলক।

একটা টেপরেকর্ডার।

বই-এর র‍্যাকের মধ্যে সযত্নে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ছোট্ট টেপরেকর্ডারটা। সেখান থেকে একজোড়া তার চলে গেছে ঘরের সুইচবোর্ডে। ফলে যখন অলক ঘরের আলো জ্বালাবার জন্য সুইচটা 'অন' করেছিল, তখন নিজের অজান্তে টেপরেকর্ডারটাও চালু করে দিয়েছিল।

টেপরেকর্ডারটা হাতে তুলে নিল অলক। বিদেশি জিনিস। ছোট অথচ শক্তিশালী। এ-সি মেনস-এর সঙ্গে রেকটিফায়ার লাগানো। স্পুলটা রি-ওয়াইন্ড করে টেপটি আবার চালু করে দিল অলক।

আবার শোনা গেল সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর, নমস্কার, মেজর ঘোষ। এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত।

দুই ঃ স্মৃতি, তুমি বেদনার

পালাম এয়ারপোর্ট থেকে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেন যখন আকাশের নীলে মিলিয়ে গেল, তখন অলকের ঘড়িতে সকাল ছ'টা।

কাল থেকে একটার-পর-একটা বিস্ময় যেন অলকের জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রথমত, এমন একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে তার নির্বাচন। তারপর, চাঁদনি চকে এককালের কলেজী বন্ধু রজতের সঙ্গে সাক্ষাৎ। রজতের বান্ধবী সারদা—যার সাথে অলকের স্বপ্নের রানি মিলাই-এর মিল আছে।

কিন্তু এতগুলো চমকপ্রদ ঘটনাকে ছাড়িয়ে গেছে, আজকের সকালের বিস্ময়। বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অবাক হয়ে অলক আবিষ্কার করল, তার পাশের সিটে সারদা বসে আছে।

চোখাচখি হাতেই সারদা বলল, গুডমর্নিং, মিস্টার ঘোষ।

সবিস্ময়ে অলক বলল, আপনি!

মিষ্টি হেসে সারদা বলল, ছুটি শেষ। ডিউটিতে জয়েন করতে চলেছি।

এয়ার হোস্টেস তখন বলতে শুরু করেছে, গুডমর্নিং লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের আজকের ফ্লাইট পাটনা, গৌহাটি হয়ে বেলা এগারোটার সময় ডিব্রুগড় বিমানবন্দরে পৌঁছাবে। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

এয়ার হোস্টেসের বক্তব্য শেষ হতেই হালকা সেতারের সুরে জায়গাটা ভরে উঠল।

অলক জিগ্যেস করল, আপনি কোথায় যাবেন?

নেফা।

নেফা—কোথায়?

চেংগেল।

চেংগেল!

চমকের ওপর চমক। অলকেরও গন্তব্যস্থল চেংগেল। ভারত-চীন সীমান্তে নেফার অন্তর্গত ছোট্ট একটি জনপদ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সারদার দিকে তাকাল অলক। চোখের পাতা নাচিয়ে দু-গালে টোল ফেলে সারদা বলল, কাল রজতের কাছে আপনার মিলাই-এর গল্প শুনলাম। আরও শুনলাম, আমাকে নাকি অবিকল মিলাই-এর মতো দেখতে। সত্যি নাকি, অলকবাবু?

মিলাই—মিলাই—মিলাই! মুখটা ব্যথাতুর হয়ে উঠল অলকের।

চকিতে বাঁ-হাতের তিনটে আঙুলে একটা বিশেষ মুদ্রা করল সারদা। আবার একটা চমক। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মালহোত্রা সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী এই বিশেষ মুদ্রার প্রদর্শনকারী তার বন্ধু। অর্থাৎ, সারদা তার বন্ধু। একই কাজের ভার নিয়ে দুজনে চলেছে। অর্থাৎ, সারদাকে বিশ্বাস করা যায়।

অলক বলল, আপনাকে ভুল বোঝার জন্যে ক্ষমা চাইছি, মিস কৃষ্ণমূর্তি।

ও-প্রসঙ্গ এখন থাক, অলকবাবু।—বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল সারদা।

ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হল না অলকের। এয়ারক্র্যাফটটা বর্তমানে একটা পাবলিক প্লেস ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সাবধানতার প্রয়োজন আছে বইকী।

সারদা বলল, সত্যি বলছি, আমাকে আর-একটা মেয়ের মতো দেখতে জেনে আমি কিছুতেই কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না। বলবেন মিস্টার ঘোষ, আপনার মিলাই-এর গল্প?

আবার বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল অলকের।

মিলাই! এ তো শুধু একটা নাম নয়। একটা বেদনা। অনেক যন্ত্রণা দিয়ে অলকের বুকের মধ্যে যে-ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, সেখান থেকে নতুন করে রক্তের ধারা নেমে এল।

সে কে?

'মিলাই' নামে সেই ছোট্ট মেয়েটি, যার সঙ্গে অলকের বয়সের তফাত অনেক, সেই মেয়েটিকে অনেকবার, অনেকদিন দেখেছে সে।

দুধে-আলতা রঙে, পটল-চেরা চোখে সে এক স্বপ্নের দেশের মেয়ে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল সে তার মামার বাড়িতে। সেখানেই প্রথম দেখল মিলাইকে।

বাচ্চাদের নাটক হবে। তাই মেকাপ দেওয়ার জন্য ডাক পড়ল অলকের। সন্ধে থেকে একজনের পর একজনকে মেকাপ দিয়ে চলেছে অলক। মেকাপ টিউব, ফেস পাউডার, রুজ আর আইব্রো পেনসিলে তারা একে-একে রূপান্তরিত হচ্ছে নাটকের চরিত্রে। অবশেষে মেকাপ নেওয়ার জন্য এগিয়ে এল বছর বারোর একটা মেয়ে।

দ্রুত হাত চলতে লাগল অলকের। মেকাপের গুণে রং যেন ফেটে পড়তে লাগল মেয়েটার। ফেস পাউডারের প্রলেপ দিয়ে, আইব্রো পেনসিলের ছোঁয়ায় চোখ দুটোকে স্বপ্নময় করে দিল অলক। তখনও তার মনে ঝড় ওঠেনি।

কিন্তু যে-মুহূর্তে সিঁদুরের টিপ পরিয়েছে মেয়েটির কপালে, সেই মুহূর্তে তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে হাজার সুরের ঐকতান বেজে উঠল। নিমেষের মধ্যে স্বপ্নের রাজকন্যায় পরিণত হল মেয়েটি। এত রূপ সম্ভব একটি মেয়ের দেহে?

একমাথা কোঁকড়ানো চুল, ছোট্ট কপাল, টানা-টানা ডাগর দুটি চোখ, ছবির মতো ভুরু, পাতলা

নাক আর চাপা চিবুকে এ কাকে দেখছে অলক? স্বর্গের মেনকা, উর্বশী কি এর চেয়েও সুন্দরী ছিল? মেনকার চোখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বামিত্রেরও কি তারই মতো অবস্থা হয়েছিল?

নিজেকে হারিয়ে ফেলল অলক। কতক্ষণ তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল—মনে নেই। শুধু মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তে জগতের সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে। সময় বইছে না। নদীর জলে স্রোত নেই। সাগরের জলে উথালি-পাথালি নেই। অলক তখন কোথায়?

চমক ভাঙল মেয়েটার কথায়, যাঃ, অমন করে তাকিয়ে থাকলে আমার বুঝি লজ্জা করে না!

বাস্তবে ফিরে এল অলক। লজ্জার হাসি মেয়েটির ঠোঁটের কোণে। এই হাসি, মুখের এই স্বর্গীয় অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা। অলকের মনে হল, সে ধন্য হয়ে গেছে।

মেয়েটি আবার বলল, আর কতক্ষণ লাগবে তোমার সাজাতে?

এতক্ষণে জবাব দিতে পারল অলক, এই তো হয়ে এল।

শেষবারের মতো পাউডারের পাফ বোলাতে-বোলাতে অলক বলল, কী নাম তোমার?

মিলাই।

সেই সুর বেজে উঠল অলকের মনে।

তারপর কতবার, কতদিন মিলাইকে দেখল সে। রূপনারায়ণ নদীর চরে, খোলা মাঠে, সবুজ গাছের ছায়ায় সে আর মিলাই খেলে বেড়াল, গল্প করল।

মিলাই হাসলে তার বুকে ঝড় ওঠে। মিলাই-এর চোখে জল দেখলে পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে করে। চারিদিকে শুধু মিলাই, মিলাই আর মিলাই।

কলকাতায় ফিরে এসে আর পড়ায় মন বসে না। বই খুললে বই-এর পাতায় মিলাই-এর ছবি ভেসে ওঠে। চোখ বন্ধ করলে মিলাই হাসতে থাকে। অলক যেন পাগল হয়ে যাবে।

দু-একমাস ছাড়া-ছাড়াই সে দৌড়ে যায় তার মামাবাড়ির গ্রামে। কলকাতা থেকে মাত্র দু-ঘণ্টার পথ। দিনগুলো আবার রঙিন প্রজাপতির মতো উড়তে থাকে। তারপর একদিন অবাকবিস্ময়ে অলক আবিষ্কার করল, মিলাই ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছে।

শাড়িপরা অবস্থায় প্রথম মিলাইকে দেখে অলক বলেছিল, ইচ্ছে করছে এখুনি তোমাকে আমার বউ করে নিয়ে চলে যাই।

যাঃ! লজ্জায় লাল হয়ে ছুটে পালিয়েছিল মিলাই। পলকের মধ্যে তার শাড়ির আঁচল ধরে ফেলেছিল অলক।

সিনেমার যেমন ফ্রিজ শট থাকে, সেই মুহূর্তে অলক ও মিলাইও বুঝি পটে আঁকা ছবির মতো হয়ে গেছিল। দুজনেই দুজনের চোখের গভীরে কয়েক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গেছিল। ঈথার তরঙ্গের মতো, হাজার-হাজার কথা পরস্পরের বুকের মধ্যে ঝড় তুলেছিল।

কিন্তু সেটা শুধু কিছুক্ষণই।

মিলাই এগিয়ে এসেছিল অলকের কাছে। একেবারে বুকের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ফিসফিস করে বলেছিল, আমারও ইচ্ছে করছে—।

কী? আরও ফিসফিসিয়ে অলক প্রশ্ন করেছিল।

তোমার বউ হয়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতে।

তারপরেই অলকের হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়ে বাড়ির দিকে পালিয়েছিল।

এই পর্যন্ত সবটাই সুখের স্মৃতি।

কিন্তু...।

তারপর! তারপর?

অলক ভাবতে পারে না, বুকটা যেন ফেটে যেতে চায়। কপালের শিরা দুটো ছিঁড়ে

যেতে চায়।

অথচ অলক কত অসহায়। বিশ বছরের তরুণ হয়েও তার কিছু করার ছিল না। মিলাই যেন হারিয়ে গেল।

সেই দুঃস্বপ্নের দিনে বেলা দুটোর সময় স্কুলের ছুটির পর মিলাই বাড়ি ফিরছিল। সঙ্গে আর কোনও সাথী ছিল না। স্কুল থেকে বাড়ি আসার পথে প্রতিদিন মিলাইকে একটা 'জাতীয় সড়ক' অর্থাৎ বম্বে রোড পার হয়ে আসতে হয়।

'জাতীয় সড়ক' অর্থাৎ যে-পথ দিয়ে প্রতিদিন শত-শত লরি মালপত্র নিয়ে দৈত্যের মতো উর্ধ্বশ্বাসে যাতায়াত করে—যে-পথে প্রতি তিনদিনে একটা করে দুর্ঘটনা ঘটে, সেই পথ অতিক্রম করে মিলাইকে যাতায়াত করতে হয়।

সেইদিন দুপুরবেলা, নির্জন পথ ধরে মিলাই আসছিল। যে-মুহূর্তে বম্বে রোডে সে পা রেখেছে, একটা ট্রাক হঠাৎ এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে শয়তানের মতো কয়েকটা লোক তার মুখ বেঁধে তাকে ট্রাকে তুলে নিল। তারপর ছুটে চলল বম্বের দিকে।

মিলাই হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক থানা-পুলিশ করা হল, কিন্তু মিলাই নামক অলকের স্বপ্নের রানিকে আজ বারো বছরের মধ্যে একবারও দেখা যায়নি।

তিন ঃ কর্নেল চ্যাটার্জি

ডিব্রুগড় থেকে হেলিকপ্টারে অলক যখন চেংগেল পৌঁছাল, তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। সারদাকে ডিব্রুগড়েই 'গুডবাই' জানিয়ে এসেছে অলক। কারণ, সারদা চেংগেলে আসবে বাসে চড়ে। আগামীকাল সকালে সে চেংগেল পৌঁছাবে। অলকের জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা ছিল।

চেংগেলের ছোট 'হেলিপ্যাডে' যখন সে অবতরণ করল, তখন সন্ধ্যা বেশ ভালোভাবেই আসর জমিয়ে বসেছে। তারই মাঝখান থেকে মিলিটারি পোশাক পরা একজন এগিয়ে এল।

ওয়েলকাম টু চেংগেল, মেজর ঘোষ।

অলক তাকিয়ে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল চ্যাটার্জি। এখানকার আর্মি ইউনিটের অফিসার কম্যান্ড। সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট দিল অলক।

গুড ইভিনিং, স্যার। মেজর ঘোষ ইজ রিপোর্টিং টু ইউ।

কর্নেল চ্যাটার্জি বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। পথে তেমন কোনও কষ্ট হয়নি তো?

মৃদু হেসে অলক বলল, না, তেমন কিছু নয়।

তারপর কর্নেল চ্যাটার্জির সঙ্গে তাঁর অফিসে এসে হাজির হল অলক।

সুন্দর সাজানো-গোছানো অফিস। অফিসার-কম্যান্ডিং-এর অফিস যেমন হওয়া উচিত। ঠিক তেমন। শুধু দৃষ্টিকটু লাগল একটা জিনিস। অফিস ঘরের এক কোণে পুজোর সরঞ্জাম। ছোট একটা জলচৌকির ওপর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। তার সামনে ধূপদানি, কোশাকুশি প্রভৃতি নানাবিধ পুজোর সরঞ্জাম।

অলকের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হতে দেখে চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, আপনাদের ভাষায় আমি একটু বেশি পরিমাণ আস্তিক। আমার দিন শুরু হয় রাধাকৃষ্ণের পুজো দিয়ে।

আরও নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন কর্নেল চ্যাটার্জি। ইউনিটের কাজ এবং সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে অলকের দায়িত্ব কী হবে—সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তারপর বললেন, আমাদের ইউনিটে কিছু সিভিলিয়ান লোকও কাজ করে। আপনি কখন থেকে কাজ শুরু করতে চান, মেজর ঘোষ?

স্থির দৃষ্টিতে কর্নেল চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে অলক বলল, সত্যি কথা বলতে কী, দিল্লিতেই আমার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কাজের কথা শুরু করার আগে আমার অন্য ধরনের কিছু খবর চাই।

যথা?

চেংগেল শহরটা এখান থেকে কতদূর?

প্রায় দশমাইল হবে। আমাদের ইউনিট থেকে চেংগেল পর্যন্ত শুধু একটা রোড লিঙ্ক আছে।

পোস্ট অফিস?

হেড পোস্ট অফিস আছে। চেংগেল এক্সটেনশান কাউন্টার।

শুনেছি এখানে একটা হাসপাতাল আছে। সেটা কোথায়?

চেংগেলে। কথাটা হাসিমুখেই বললেন কর্নেল চ্যাটার্জি। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অলক ঘোষের বুকের ভেতরটা যেন তিনি তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখতে চাইছেন।

তারপর হিসহিসানি স্বরে বললেন, এক্সকিউজ মিস্টার মেজর ঘোষ। চেংগেল হসপিটাল সম্বন্ধে আপনার ইন্টারেস্ট কি মিস সারদা কৃষ্ণমূর্তির জন্যে?

ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল অলক। এবং দেখা গেল, কর্নেল চ্যাটার্জি সেই চমকটা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করলেন। বললেন, দেন আই অ্যাম রাইট! তাহলে আপনার ফারদার ইনফরমেশনের জন্যে জানাচ্ছি, মেজর ঘোষ, আমাদের নিহত সিকিউরিটি অফিসার মেজর নায়ারের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল মেয়েটি। প্রায়ই দুজনকে একসঙ্গে দেখা যেত। সেইজন্যে আপনাকে বলছি, মিস সারদা কৃষ্ণমূর্তিকে সবসময় দূরে-দূরে রাখবেন।

আপনার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ, স্যার। এইবার আসল কথায় আসা যাক।

তার আগে চলুন, ডিনার শেষ করে ফেলা যাক। সেখানে অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।

কর্নেল চ্যাটার্জির সঙ্গে অফিসঘরের বারান্দায় এল অলক। এই ইউনিটের প্রতিটি বাড়িই একতলা। বাড়ির মেঝে এবং মেঝে থেকে দেওয়ালের তিনফুট পর্যন্ত পাকা। অর্থাৎ, ইট ও সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা। বাকি দেওয়াল কাঠের তৈরি। ছাদ টিনের। অবশ্য পাকাবাড়ি মাত্র চারখানা। অফিস-কাজের জন্য দু-খানা। আর বাকি দু-খানা। আর বাকি দু-খানা মেস। একটা অফিসারদের, অন্যটা সাধারণ সৈনিকদের জন্য। থাকবার ব্যবস্থা তাঁবুতে। এ বিষয়ে অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে কোনও তফাত নেই।

ইউনিটের নিজস্ব জেনারেটর আছে। জেনারেটর চলে সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশ্য কমিউনিকেশনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। সেটা চব্বিশ ঘণ্টাই চালু থাকে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল অলক। অল্প চাঁদের আলোয় তার চোখে পড়ল, সামনে, দূরে—ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়। অতিকায় জীবের মতো বিরাট বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে জেনারেটরের একটানা গুমগুমানি আওয়াজ।

অলক যেন নিজেকে ভুলে গেল। রাতের নেফা সত্যিই রহস্যময়ী।

কর্নেল চ্যাটার্জি বললেন, লেট আস গো নাউ।

অলক লজ্জিত হয়ে বলল, আই অ্যাম সরি, স্যার। পাহাড়গুলো এত ভালো লাগছিল।

আপনি কি কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি?

না-না।

হা-হা করে হেসে উঠলেন কর্নেল চ্যাটার্জি। বললেন, না, না—এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এককালে আমারও ওসব বাতিক ছিল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই দুজনে মেসে পৌঁছে গেল। অন্যান্য অফিসাররাও ততক্ষণে এসে গেছে।

কর্নেল চ্যাটার্জিকে দেখে সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সবাইকে বসতে বলে চ্যাটার্জি বললেন, আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন আমাদের নতুন সিকিউরিটি অফিসার মেজর ঘোষ।

তারপর একে-একে পরিচয় করাতে লাগলেন, ক্যাপটেন স্যানিয়েল, মেডিকেল অফিসার। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সকলের সঙ্গে হাসিমুখে করমর্দন করল অলক।

মেজর দেশপাণ্ডে বললেন, আপনি কি দিল্লি থেকে আসছেন, ঘোষ?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

না এমনিই। জাস্ট এ কিউরিওসিটি। কারণ, আমিও দিল্লি থেকে এই জঙ্গলে এসেছি। সেইজন্যে যারা দিল্লি থেকে এখানে আসে, তাদেরকে আমার খুব আপনজন বলে মনে হয়।

আই সি। মেজর দেশপাণ্ডের মুখখানা মনের মধ্যে একে নিল অলক।

ডিনার শেষ হওয়ার পর কর্নেল চ্যাটার্জির সঙ্গে তাঁর অফিসে এসে হাজির হল অলক। বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চ্যাটার্জি সাহেবের কথায় জানা গেল, এখানে প্রায় সারা বছর ধরেই বৃষ্টিপাত হয়। কখনও-কখনও এমন হয়, দিন পনেরো ধরে সূর্যের মুখ দেখাই গেল না।

অফিসঘরের দরজা বন্ধ করে কোমরের বেল্ট খুলতে-খুলতে চ্যাটার্জি বললেন, এইবার বলুন—আপনার আর কী জানার আছে?

দলিলটা কোথায় আছে? অলক একেবারে আসল কথা দিয়েই তার বক্তব্য শুরু করল।

চ্যাটার্জি বললেন, মেজর ঘোষ, আমার ওপর অর্ডার আছে, আমি যেন সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করি। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ওসি এবং জুনিয়ার অফিসারের নয়। এই কাজের ব্যাপারে আপনার ইচ্ছাই শেষ কথা। সেক্ষেত্রে আমাকেও আপনার আদেশমতো কাজ করতে হবে। এইরকমই নির্দেশ। এখন কথা হল, দলিলটা বর্তমানে নিরাপদেই আছে। আপনি কি এখনই ওটা চান?

অলক বলল, না, এই মুহূর্তে নয়।

দলিলটা সম্বন্ধে আরও কিছু কথা আপনাকে জানাই। ওটা আমার হাতে আসার পর আমার প্রধান চিন্তা হয় কোথায় ওটাকে রাখা যায়। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, মাটির মধ্যে পুঁতে রাখব। একদিন গভীর রাতে আমার অফিসের সামনে নিজের হাতে এক ফুট গভীর একটা গর্ত খুঁড়লাম। তারপর কী মনে হতে গর্তের মধ্যে ওটা না রেখে গর্তটা আবার বুজিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, ঘোষ, পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম গর্তটা আবার কে যেন খুঁড়ে রেখেছে!

অর্থাৎ আপনি বলতে চান, দলিলটা ওখানে থাকলে সেই রাত্রেই চুরি হয়ে যেত?

নিশ্চয়ই!

অর্থাৎ শত্রুপক্ষ সবসময়ই আপনার ওপর নজর রেখেছে?

একজ্যাক্টলি।

তারপর?

সেই থেকে দলিলটা আমি স্টিল আলমারির মধ্যে বন্ধ করে রাখতাম। কিন্তু একদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমের ঘোরটা কাটতে অনুভব করলাম, আমার কপালে একটা ঠান্ডা

জিনিসের স্পর্শ। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, স্টিল আলমারির কাছে একটা পেনসিল টর্চের আলো নড়াচড়া করছে আর কানের কাছে কে যেন ইংরেজিতে বলল, একদম নড়াচড়া করবে না। তাহলে এক গুলিতে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। ফলে আমারই চোখের সামনে ওরা দলিলটার ফটো তুলে নিয়ে চলে গেল। পরের দিনই ম্যাটারটা আমি হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট করি।

এই পর্যন্ত বলে চ্যাটার্জি একটু থামলেন। এমনসময়ে দপ্ করে ঘরের আলোটা নিভে গেল। চকিতে পকেটের মধ্যে হাত ঢোকাল অলক।

চ্যাটার্জি বললেন, দশটা বেজে গেল। জেনারেটর 'অফ' করে দিল।

অলক আশ্বস্ত হল। ভালো করে কান পেতে শুনল, জেনারেটরের একটানা গুমগুমানি আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না।

চ্যাটার্জি বলতে লাগলেন, এরপর থেকে আমি আরও সাবধান হয়ে গেলাম। দলিলটা আলমারি থেকে সরিয়ে অন্য একটা জায়গায় রাখলাম। এবং আজ পর্যন্ত সেটা নিরাপদেই আছে।

ঘরের অন্ধকারটা যেন অসহ্য লাগছে অলকের। জানলা দিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে আরও উজ্জ্বল, আরও মোহময়ী লাগছে।

এই ইউনিটের সিকিউরিটি কতখানি নিরাপদ?

সেন্ট পারসেন্ট।

অর্থাৎ বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকা বা ভেতর থেকে বাইরে যাওয়া সকলের অজান্তে—সম্ভব নয়, কেমন?

একজ্যাক্টলি।

অর্থাৎ, সেদিন রাত্রে যারা আপনার ঘরে ঢুকেছিল দলিলের ফটো তুলতে, তারা আমাদেব ক্যাম্পের লোক হলেও হতে পারে, তাই না?

চিন্তিত স্বরে চ্যাটার্জি জবাব দিলেন, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা, ঘোষ। আমাদের এই ক্যাম্প—কিছু অফিসার, দুজন জে সি ও আর শ'দেড়েক জওয়ান। ওয়ার্কিং আওয়ার্সে আরও দশজন সিভিলিয়ান—এর মধ্যে কে বা কারা শত্রুপক্ষীয় দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবেই।

চ্যাটার্জির কথা শেষ হওয়ার আগেই বিদ্যুৎবেগে অলক ছুটে গেল জানলার কাছে। তারপর পকেট থেকে রিভলভার বের করে দুবার 'ফায়ার' করল। নৈশ স্তব্ধতা খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ল রিভলভারের আওয়াজে। সচকিত হয়ে উঠল ছোট ইউনিট।

বিস্মিত চ্যাটার্জি প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার, ঘোষ?

আমার সঙ্গে আসুন।

দরজা খুলে দ্রুত বাইরে এল অলক। পিছনে কর্নেল চ্যাটার্জি। এগিয়ে গেল সামনের ছোট ময়দানের দিকে। ময়দানের একাংশে সারি-সারি তাঁবু—যার মধ্যে জওয়ানরা এতক্ষণ বিশ্রাম করছিল। রিভলভারের আওয়াজে প্রায় সকলেই তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

অলক আর চ্যাটার্জি এগিয়ে যাচ্ছে। উলটোদিক থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো তাদের দিকে আসছে।

হোয়াট হ্যাপেনড, স্যার? এনিথিং রং?

গলা শুনে বোঝা গেল মেজর দেশপাণ্ডে।

এবং তার কয়েক মিনিট পরেই আবিষ্কার হল, ছোট একটা ঝোপের ধারে একটা দেহ পড়ে আছে।

একটা মানুষের মৃতদেহ। পিঠের ওপর ছ'ইঞ্চি ব্যবধানে দুটো ক্ষত। প্রায় উলঙ্গ একটা মানুষ। মাথায় পালক-গোঁজা বাঁশের মুকুট। দু-কানে বড়-বড় দুটো বালা। উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ। নিম্নাঙ্গে ছোট্ট

একফালি কাপড় কোনওরকমে লজ্জা নিবারণ করেছে।

চ্যাটার্জি বললেন, মাই গুডনেস, এ কোথা থেকে এল?

অলক প্রশ্ন করল, এ কে?

এখানকার জংলি আদিবাসী। অফিসারদের জুতো পালিশ করত। কিন্তু সন্ধের পর ক্যাম্পের মধ্যে থাকার অনুমতি ছিল না। হাওএভার,—চ্যাটার্জি মুহূর্তে অফিসার কম্যান্ডিং-এ রূপান্তরিত হলেন, মেজর ঘোষ, আপনি এই ইউনিটের সিকিউরিটি অফিসার। ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করে পরশু আমায় রিপোর্ট দেবেন।

চার ঃ লালা বাবা

পরের দিন বিকেল চারটের সময় কর্নেল চ্যাটার্জির ঘরে ডাক পড়ল অলকের। ঘরে ঢুকে অলক দেখল চ্যাটার্জি বাইরে বেরোবার জন্য তৈরি। অলককে দেখেই তিনি বললেন, আজ সারাদিন ইচ্ছে করেই আপনার সঙ্গে দেখা করিনি। প্রথমেই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার কান, চোখ আর হাতের অব্যর্থ নিশানার জন্যে। কাল রাত্রে আমিও তো আপনার সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু কই—আমার চোখে তো কিছুই পড়েনি বা কানেও কিছু শুনিনি। সত্যি, আমি গর্বিত যে, আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একজন যোগ্য অফিসারকেই নির্বাচন করেছেন এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে।

ধন্যবাদ, স্যার।

চলুন—আজ আপনাকে আশেপাশের কিছুটা জায়গা ঘুরিয়ে আনি। তারপর সন্ধে হলে যাব আদিবাসীদের উৎসবে। সেখানে লালা বাবাকে দেখাব।

লালা বাবা?

হ্যাঁ, লালা বাবা। এখানে যে-উপজাতি বাস করে, তাদের সর্দার, পুরোহিত হল ওই লালা বাবা। আটানব্বই বছর বয়েস, কিন্তু এখনও যুবতী মেয়েগুলোর সঙ্গে সমানতালে নাচতে পারে।

বলতে-বলতে দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা জিপের কাছে এল। জিপের ড্রাইভার অ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট দিল।

চ্যাটার্জি বললেন, আজ আর তোমাকে লাগবে না। তুমি বিশ্রাম করো।

আর-একখানা স্যালুট দিয়ে ড্রাইভার প্রস্থান করল। অলককে আহ্বান জানিয়ে চ্যাটার্জি স্বয়ং ড্রাইভারের আসনে বসলেন। জিপ এগিয়ে চলল মেন গেটের দিকে।

গেটের সামনে আসতেই প্রহরী হাত দেখিয়ে জিপ থামাল। জিপের ভেতরটা পরীক্ষা করে লম্বা এক স্যালুট মারল। জিপ আবার এগিয়ে চলল সামনের চড়াই-এর দিকে।

অলক দেখতে লাগল চোখ মেলে। চারিদিকে শুধু সবুজের সমারোহ। চোখ জুড়িয়ে যায়। সামনের সূর্যটা পাহাড়ের কোলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার ইচ্ছে নিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আর পাহাড়টাও সেই আনন্দে ক্ষণে-ক্ষণে নিজের রং বদলাচ্ছে।

ওপরের আকাশে রামধনু রঙের খেলা। আকাশে এত রঙের সমারোহ সমতল ভূমির দেশে দেখা যায় না। একই আকাশে জলভরা মেঘ, সোনাঝরা সূর্যের আলো, তার সঙ্গে হোলির রঙে রাঙানো আকাশ—এ বুঝি শুধু নেফাতেই দেখা যায়।

অলক মুগ্ধ হয়ে গেল।

জিপ চলেছে মন্থরগতিতে। এখন অলকের বাঁ-দিকে পাহাড়। আর ডানদিকে খাদ। খাদের

অনেক নীচে সরু একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। নদীর কলকল আওয়াজ পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে।

চ্যাটার্জি বললেন, ওই নদীটার নাম হল ঘাই নদী। দারুণ স্রোত। আরও মাইল পঞ্চাশেক দূরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে।

অলক প্রশ্ন করল, আমরা এখন কোথায় চলেছি?

চেংগেল শহরের দিকে।

জিপ এগিয়ে চলল।

কিছু-কিছু সমতল জমিতে ধানের চাষ করা হয়েছে। আশেপাশে কিছু কুঁড়েঘরও নজরে পড়ল। নীচু মাটির দেওয়াল। চালে লম্বা-লম্বা ঘাস চাপানো। অলক অবাক বিস্ময়ে দেখল, এখানকার আদিবাসীরা সত্যিই এখনও 'অসভ্য' রয়ে গেছে।

পরুষদের পরনে 'কৌপীন' ছাড়া আর কিছু নেই। আর মেয়েরা একটা লুঙ্গিজাতীয় কাপড় বুকে বেঁধে রাখে। সেটাই হাঁটু পর্যন্ত ঝুলতে থাকে। মায়েরা তাদের পিঠের ওপর একটা কাপড়ে বাচ্চাকে বসিয়ে রাখে। দোলার মতো নিশ্চিন্তে বসে থাকে বাচ্চারা। পড়ে না।

চ্যাটার্জি বললেন, এবার ফেরা যাক। ওদের উৎসব শুরু হওয়ার সময় হয়ে গেছে।

জিপ ঘুরিয়ে নিলেন চ্যাটার্জি। কিছুটা আসার পর এক জায়গায় জিপ থামিয়ে বললেন, এবার আমাদের হেঁটে যেতে হবে।

পাকা রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল দুজনে। সবে সন্ধ্যা নামছে সেখানে। অলকেব ভারি ভালো লাগল। আবছা আলো-আঁধারির মাঝখানে এইভাবে হেঁটে যেতে খুবই ভালো লাগছে অলকের।

কিছুটা যাওয়ার পরই গুমগুম করে একটা আওয়াজ শোনা গেল।

চ্যাটার্জি বললেন, এই হল ওদের বাজনা। এই বাজনার তালে-তালে ওরা নাচবে। একটা খুব সুন্দরী মেয়ে আছে। লালা বাবার মেয়ে। দারুণ ভালো নাচে।

আরও মিনিটপাঁচেক হাঁটার পর দেখা গেল।

জঙ্গলের মাঝখানে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। চার-পাঁচ ফুট ছাড়া-ছাড়া একটা করে মশাল মাটিতে পোঁতা আছে। তারই আলোয় জায়গাটা আলোকিত। দেখা যাচ্ছে, জনাপঞ্চাশেক স্ত্রী-পুরুষ ইতস্তত চলাফেরা করছে।

অকস্মাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে একজনের আবির্ভাব হল তাদের সামনে। ন্যাড়া মাথা, দু-কানে বড় বড় দুটো বালা। সারা মুখ বলিরেখায় ভরা। হঠাৎ দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

অবোধ্য ভাষায় একবার চিৎকার করে উঠল লোকটা। অলক ভয় পেয়ে গেল। এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল, কর্নেল চ্যাটার্জিও সেইরকম ভাষায় কী যেন বললেন। এইরকম কথোপকথন মিনিট-দুয়েক চলল। তারপর লোকটা হাসতে লাগল।

কী বীভৎস সেই হাসি।

অলকের শিরদাড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।

তারপর লোকটা হাতছানি দিয়ে ওদের দুজনকে ডেকে এগিয়ে চলল।

চ্যাটার্জি বললেন, এই হল লালা বাবা। এদের সর্দার।

লালা বাবার নির্দেশে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর দুজনে বসল।

চ্যাটার্জি বললেন, প্রতি পূর্ণিমাতেই এদের এই উৎসব হয়।

ওদিকে বাজনার আওয়াজ তীব্র হয়ে উঠল। লালা বাবা চিৎকার করে উঠল একবার। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ে-পুরুষের দল নাচ শুরু করল। কিছুক্ষণ নাচ চলার পর জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা গানের কলি ভেসে এল। সেই গানের সুর যেন অলককে চমকে দিল।

দেখা গেল, নাচের ভঙ্গিমায় একটা মেয়ে এগিয়ে আসছে। মশালের আলোয় দেখা গেল, মেয়েটির দেহসৌষ্ঠব অপূর্ব। মেয়েটির গানের তালে-তালে বাজনা শুরু হল।

চ্যাটার্জি বললেন, এ হল হীরা। লালা বাবার মেয়ে।

মেয়েটি যখন নাচতে-নাচতে আরও কিছুটা কাছে এল, অলকের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হীরার দিকে। মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা। বুকের ভেতরটা যেন ফেটে পড়তে চাইছে। অলক পাথরের মতো বসে রইল। চোখের পলক আর পড়ে না।

নাচতে-নাচতে হীরার দৃষ্টিও পড়ল একবার তার ওপর। চোখ ঘুরিয়ে নিল। পরমুহূর্তে আবার তাকাল। আবার। আবার। নাচের তাল কেটে গেল তার। গানের সুরে ভুল হয়ে গেল।

কতক্ষণ?

সময়ের হিসাবে দু-চার সেকেন্ডের বেশি নয়। কিন্তু তার মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেল।

নাচ-গান থামিয়ে রুদ্ধশ্বাসে হীরা দৌড়ে গেল ঘন জঙ্গলের দিকে। আর অলকের মুখ থেকে শোনা গেল এক বুকফাটা আর্তনাদ, মিলাই—!

তারপর তার জ্ঞানহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল চ্যাটার্জির কোলে।

পাঁচ ঃ মাইক্রোফিল্ম

চ্যাটার্জি বললেন, আমি এই ইউনিটের প্রতিটি ইঞ্চি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু মাইক্রোফিল্মের সন্ধান কোথাও পাইনি।

অলক প্রশ্ন করল, কিন্তু এটা কি ঠিক যে, তারা দলিলটার ফটো তুলতে সমর্থ হয়েছে?

তা না পারলে, সেদিন ওরা আমাকে জীবিত ছেড়ে দিত না।

অলক কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, মেজর নায়ারের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

চ্যাটার্জি বললেন, আমার ধারণা, মেজর নায়ার শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তারপর কোনও কারণে বনিবনা না হওয়ার জন্য তাকে হত্যা করা হয়।

মাইক্রোফিল্মটা যে এখনও ক্যাম্পের মধ্যেই রয়ে গেছে, সে-সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হলেন কী করে?

মাইক্রোফিল্মটা যদি ওরা পেয়ে যেত, তাহলে আমার ধারণা, ওরা এখান থেকে চলে যেত, বা আমাদের ইউনিটের ব্যাপারে আর নাক গলাত না। কিন্তু দিল্লিতে আপনাকে ভয় দেখানো এবং পরশু রাত্রে একজন আদিবাসীর আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনার চেষ্টা—এইসব দেখেই মনে হচ্ছে, ওরা এখনও হাতে কিছু পায়নি।

আরও কিছুক্ষণ নিজেকে চিন্তার গভীরে ডুবিয়ে রাখল অলক। মাইক্রোফিল্ম আর সামরিক দলিল—যার সঙ্গে তার মাতৃভূমি ভারতবর্ষের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। দলিলটা অবশ্য নিরাপদেই আছে। কিন্তু দলিলটা সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে সোজা দিল্লি চলে যাওয়া এবং মিস্টার মালহোত্রার হাতে তুলে দেওয়া—ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অত সহজ নয়। তাহলে অলক ঘোষকে বিশেষ করে এখানে পাঠানোর কোনও প্রয়োজনই হত না।

কিন্তু কাজটা কতখানি কঠিন?

এখান থেকে দলিল ও মাইক্রোফিল্ম নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে শত্রুপক্ষ ঠিক কতখানি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে? ভাবতে লাগল অলক। কিছুটা হয়তো অনুমানও করতে পারল। কিন্তু বেশিরভাগ ব্যাপারটা রয়ে গেল অন্ধকারে। দলিল নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে পরে তীব্র

বাধার সম্মুখীন হয়ে সেটাকে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। আর তা যদি ঘটে, তাহলে অলক নিজেকে কোনওদিনই ক্ষমা করতে পারবে না।

কাজে নামার আগে ওদের শক্তি কতখানি জানতে হবে।

অলক ঈষৎ মাথা নীচু করে চ্যাটার্জিকে বলল, স্যার, কিছু মনে করবেন না। কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।

আপনি যে-কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছেন, তার জন্যে একটা কেন, প্রয়োজন হলে হাজারটা প্রশ্ন করবেন। আপনার সঙ্গে আমাকে সম্পর্ক শুধুমাত্র ওসি আর সাবোর্ডিনেট অফিসারের নয়, তার চেয়েও বেশি। বলুন, আপনি কী জানতে চান?

আপনি—মানে আপনাকে আমি ঠিক কতখানি বিশ্বাস করতে পারি?

সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ-হাতের তিন আঙুলের এক বিশেষ মুদ্রা করলেন চ্যাটার্জি। অলকের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। এই মুদ্রার প্রদর্শনকারী তার বন্ধু।

অলক বলল, স্যার, আপনাকে একটা-কাজ করতে হবে। এটা কেন করছি—সেটা পরে বলব।

বলুন, কী কাজ?

এই দলিলের ব্যাপারটা আর কে-কে জানেন?

সাধারণ জওয়ানদের বাদ দিলে প্রায় সবাই। কারণ, আমাদের ইউনিটের কাজটাই তাই।

আপনি সমস্ত অফিসার ও জেসিওদের জানান যে, আমি মাইক্রো ফিল্মটা খুঁজে পেয়েছি। এবং সেটা এখানে রাখা নিরাপদ নয়। তাই আজই বিকেলে আমি বাই রোড চেংগেল যাব। সেখানে মাইক্রো ফিল্মটা নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করব। আর আপনি আমার জন্যে একখানা জিপ ও দু-জন সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করবেন, যারা আমার সঙ্গে চেংগেল পর্যন্ত যাবে।

আপনি কি সত্যিই মাইক্রোফিল্মটা খুঁজে পেয়েছেন?

এখনও পাইনি। তবে আসল কাজে নামবার আগে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে নিতে চাই।

বেশ, তাই হবে। আজ লাঞ্চের সময় আমি সমস্ত অফিসারদের জানিয়ে দেব।

আর-একটা কথা, যদি আমি সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে ফিরে না আসি, তাহলে আমার খোঁজ করবেন।

চ্যাটার্জিকে আর কোনও প্রশ্ন করবার অবকাশ না দিয়ে অলক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল আরও অনেক ভাবনা নিয়ে।

বিকেল ঠিক চারটের সময় অলকের তাঁবুর সামনে জিপ এসে দাঁড়াল। একজন ড্রাইভার আর দুজন সশস্ত্র জওয়ান। দুজনের কাঁধে দু-খানা স্টেন এম সি ঝুলছে। অলক তৈরি হয়েই ছিল। ব্রিফকেসটা সঙ্গে নিয়ে জিপে উঠে বসল ড্রাইভারের পাশের আসনে।

জিপ ছুটে চলল মেন গেটের দিকে। ডিউটি গার্ড নিয়মমাফিক গাড়ি পরীক্ষা করল। তারপর গাড়ি আবার এগিয়ে চলল।

কিছুটা যাওয়ার পর রাস্তাটা ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। দেখা গেল, কালকের রাত্রির সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হীরা। পরনে কালকের পোশাক। চোখ-মুখের ভাব আনমনা। একটা ঘাস নিয়ে দাঁতে করে ছিঁড়ছে।

অলকের শরীর অবশ হয়ে এল। বুকের মধ্যে দামামা বাজতে শুরু করল। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, ওই মেয়েটির কাছে গিয়ে জিপটা থামাতে।

জিপ এগিয়ে চলেছে। অলকের সময় আর কাটছে না। অবশেষে একসময় ব্রেক কষে গাড়িটা থেকে গেল। চমকে ফিরে তাকাল হীরা।

চার চোখের মিলন হল। জিপের ওপর অলক। আর নীচে, রাস্তার ধারে ঘাসের জঙ্গলে হীরা।

জীবনে এইরকম ক্ষণ খুব কমই আসে, যেখানে সময় স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ায়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত নিমেষের মধ্যে মুছে যায় স্মৃতি থেকে। এমনকী নিজেকেই ভুলে যায় মানুষ।

এই কি সেই ক্ষণ অলকের জীবনে? অলক কি ভুলে যাচ্ছে যে, সে একজন মিলিটারি মানুষ। মেজর অলক ঘোষ। গোলাগুলি বারুদ নিয়েই তার জীবন। এই ধরনের ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া তার উচিত নয়।

অথবা ওই মেয়েটি! হীরা যার নাম। যে মিলিটারি দেখলে সামাজিক মানুষ দশ হাত দূর দিয়ে পথ হাঁটে, সেই ধরনের এক মানুষকে এমন তন্ময় হয়ে দেখবার কী আছে?

অলক আর হীরার জীবনে এই কি সেই স্থাবর মুহূর্ত?

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে, কে জানে!

অলক মোহাচ্ছন্নের মতো ডাকল, মিলাই—।

কোন সাড়া নেই। পাথর-প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে হীরা। অলকের আহ্বান তার কানে গেল কি না বোঝা গেল না।

অলক আবার ডাকল, মিলাই। আমাকে চিনতে পারছ না। আমি অলক। বলে মাথার পি-ক্যাপটা খুলে ফেলল সে।

তবুও হীরা কিছু বলল না। জিপের ড্রাইভার আর প্রহরী দুজন অবাক-বিস্ময়ে দেখল, হীরা নামের 'অসভ্য' মেয়েটার দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে।

অলক আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। জিপ থেকে নেমে পড়ল। অলককে নামতে দেখে হীরার ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল কয়েকবার। সারা শরীরটা দুলে উঠল একবার। তারপর চিৎকার করে উঠল, নেহী—ঈ—ঈ!

তারপর কোনও কিছু বোঝবার আগেই হীরা দৌড়াতে শুরু করল, ভয়াবহ খাদের দিকে। যে-খাদের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ঘাই নদী। শুধু পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল হীরার সুরেলা কণ্ঠের আর্তনাদ, নেহী—!

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল অলক।

ড্রাইভার বলল, সাব—ও লালা বাবা কি লেড়কি আছে।

অলক ফিরে এল। জিপে উঠে বসল।

গাড়ি আবার এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ আগেই সূর্য ডুবে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

তবে কি অলকের ভুল হল?

লালকেল্লার আবছা অন্ধকারে সারদাকে দেখে যে-ভুল সে করেছিল, কাল রাত্রে মশালের আলোয় হীরাকে দেখে কি সে একই ভুল করেছে? হীরা কি মিলাই?

কিন্তু পশ্চিমবাংলার একটা মেয়ে, যাকে ট্রাক-ড্রাইভার জোর করে নিয়ে চলে গিয়েছিল, তাকে নেফার চেংগেল নামক জনপদে আদিবাসীদের মাঝখানে দেখা যাবে—অলক কি একটু বেশি কল্পনা করে ফেলছে? এ যে রূপকথার গল্পকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু এমন কি ঘটে না?

তাহলে মিলাই এখন কোথায়?

তাকে দেখে, তার মুখে 'মিলাই' ডাক শুনে, হীরার চোখে জল আসে কেন?

অলকের মনে ঝড় বয়ে গেল। স্মৃতির হীরা, মিলাই সব একাকার হয়ে যায়।

হঠাৎ এক তীব্র আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে জিপটা একদিকে হেলে গিয়ে খাড়া পাহাড়ের গায়ে

ধাক্কা মারল।

কোনওকিছু বোঝবার আগেই অলক ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। তাকিয়ে দেখল, তার চারদিকে জনাদশেক লোক বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। নেফার জঙ্গলে তখন অন্ধকার।

মুহূর্তে অলক ফিরে এল বাস্তব জগতে। পরনে তার সৈনিকের পোশাক। নিমেষের মধ্যে ডানহাতখানা পকেট থেকে পিস্তলখানা বের করে আনল। কিন্তু গুলি চালাবার আগেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে লুটিয়ে পড়ল অলক।

ছয় ঃ শয়তানের সঙ্গে এক রাত

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন চারিদিকে অন্ধকার। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল অলক।

তারপর একটু নড়বার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারল, তার হাত-পা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। চোখ মেলে তাকাল অলক। ঘরটা একেবারে অন্ধকার নয়। নীল আলোর আবছা আলোয় সবই পরিদৃশ্যমান।

শুয়ে-শুয়েই চারিদিকে তাকাল অলক। একটা ঘর। ঘর না বলে গুহা বলাই উচিত। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল সে। মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা কীসের বুঝতে পারল না। অলক বুঝতে পারল, শত্রুর হাতে সে বন্দি।

হঠাৎ পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল হিন্দিতে, এই যে, মেহমানের জ্ঞান ফিরে এসেছে। চলো—বড় কর্তার সঙ্গে মোলাকাতটা সেরে আসবে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল অলক, একজন কুৎসিতদর্শন মানুষ ঘরের কোণে বসে আছে। অলকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে বিশ্রীভাবে হেসে উঠল সে।

তারপর এগিয়ে এসে তার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

বলল, এবার চলো। সোজা সামনের দিকে। কোনওরকম কায়দা করার চেষ্টা কোরো না। আমার পকেটে রিভলভার আছে।

অলক উঠে দাঁড়াল। মাথাটা অসহ্য ভারী। দেওয়াল ধরে কোনওরকমে টাল সামলে নিল অলক। তারপর এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

গলির মতো একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

লোকটার নির্দেশমতো চলতে লাগল অলক।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা বড় ঘরে এসে উপস্থিত হল অলক। দেখল, তার সামনে জনাচারেক লোক চেয়ারে বসে আছে। এক পলক তাদের দিকে তাকিয়ে অলক দুটি জিনিস লক্ষ করল।

ওই চারজনের মধ্যে একজন লালা বাবা।

আর-একজনের মুখে মুখোশ। বাকি দুজনকে দেখলেই বোঝা যায়, তারা ভারতীয় নয়। শয়তানের দৃষ্টিতে তারা অলকের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুখোশধারী বলল, আসুন, মেজর ঘোষ। আপনাকে আঘাত করার ইচ্ছে আমাদের ছিল না। কিন্তু উপায়ও ছিল না। এখন স্পষ্ট করে আপনার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জানতে চাই।

অলক কোনও জবাব দিল না। মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। প্রথমত, আদিবাসীদের সম্মানীয় পুরোহিত হয়ে লালা বাবা কেন শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাল? আর ওই লোকটা মুখোশ পরে আছে কেন? মুখোশ পরে আছে কেন—তার শুধু একটাই কারণ হতে পারে। লোকটা নিজের মুখ অলককে দেখাতে চায় না। কারণ, অলক তাকে চিনে ফেলতে পারে।

তবে কি ওই মুখোশধারী তার পরিচিত?

মুখোশধারী বলল, মাইক্রোফিল্মটা কোথায়?

অলক এবারও জবাব দিল না।

আপনার সারা শরীর তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু মাইক্রোফিল্মটা পাওয়া যায়নি। কোথায় রেখেছেন বলুন?

কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়। অলকের চোখ তখন সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক কোণে টেবিলের ওপর পোর্টেবল ট্রান্সমিটার-রিসিভার রাখা আছে। অর্থাৎ কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা আছে।

মেজর ঘোষ, আপনি হয়তো ব্যাপারটার গুরুত্ব সঠিক বুঝতে পারছেন না। দিল্লিতে আপনাকে আমরা যে-প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তা আপনি পালন করেননি। এর শাস্তি একটাই হয়। সেটা হল মৃত্যু। কিন্তু আপনাকে আমরা আর-একটা সুযোগ দিতে চাই। আসল দলিলটা অথবা মাইক্রো ফিল্ম—যেটা নিয়ে আপনি চেংগেল যাচ্ছিলেন, সেটা আমাদের চাই-ই।

অলক বলল, আপনারা যত চেষ্টাই করুন না কেন—আমাকে দিয়ে আপনাদের কোনও কাজই হবে না।

মুখোশধারী বলল, অন্য কোনও পার্টি আরও বেশি টাকা দিচ্ছে নাকি?

এবার অলকের বিস্ময়ের পালা, অন্য কোনও পার্টি?

আপনাদের মেজর নায়ারকে যেমন আর-একটা কানট্রি প্রস্তাব দিয়েছিল। বেশি লাভ করার জন্যেই তাকে মরতে হল।

মেজর নায়ারকে তাহলে আপনারা হত্যা করেছিলেন?

সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে নাকি? আপনিও যদি আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে আপনার অবস্থাও মেজর নায়ারের মতো হবে। আপাতত আপনি আমাদের বন্দি হয়েই থাকবেন, যতদিন না আমাদের প্রস্তাবে রাজি হচ্ছেন।

অলক মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলল। কেউ কিছু বোঝবার আগেই হঠাৎ পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করল। ব্যাপারটা এত আকস্মিক ঘটল যে, ঘরের মানুষগুলো প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর চিৎকার করে উঠল মুখোশধারী, পাকড়ো, পাকড়ো উসকো।

অলক ছুটছে। লম্বা গলিপথ থেকেই মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক কিছু রাস্তা চলে গেছে। অলক সোজা পথে না গিয়ে এ-গলি ও-গলি দিয়ে ছুটতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ একটানা ছোটার পর পরিশ্রান্ত হয়ে থামল অলক। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছে। হাঁপাতে লাগল অলক।

এখানে আলো প্রায় নেই বললেই হয়। ইন্ডিয়ান আর্মির পোশাকপরা অলক ঘোষকে এখন সহজে কেউ দেখতে পাবে না। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল অলক। না, কেউ তাকে অনুসরণ করে এদিকে আসতে পারেনি। ওপরের দিকে তাকাল। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ অলক এখনও গুহার মধ্যেই রয়েছে। গুহার মধ্যে থাকার অর্থ, সে শত্রুপুরীর মধ্যে বিচরণ করছে।

কী করা যায়? কীভাবে পালানো যায় এখান থেকে?

অচেনা, অজানা জায়গা। কেউ তাকে সাহায্য করার নেই। অলক নিজেকে খুব অসহায় বোধ করল।

মেজর অলক ঘোষ!

কে যেন পাশ থেকে তার নাম ধরে ডেকে উঠল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল অলকের। আর বাঁচবার কোনও উপায় নেই।

মেজর অলক ঘোষ, পালাবার চেষ্টা করবেন না। এই গুহাটা একটা গোলকধাঁধার মতো।

প্রতিটি গেটে কড়া পাহারা আছে। আপনি শত চেষ্টা করলেও পালাতে পারবেন না। আপনাকে কথা দিচ্ছি, নিজে থেকে ধরা দিলে আপনাকে হত্যা করা হবে না। যেখানেই থাকুন না কেন, দেওয়ালের গায়ে কালো রঙের বোতাম দেখতে পাবেন। সেটা টিপুন, তাহলেই আমরা জানতে পারব আপনি কোথায়!

এতক্ষণে অলক বুঝতে পারল, তার আশেপাশে কেউ নেই। এই গুহার দেওয়ালে অসংখ্য লাউডস্পিকার ফিট করা আছে। সেইখান থেকেই এই কথাগুলো শুনতে পেল সে। অলকের নিশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

অলক আবার পা টিপে-টিপে হাঁটতে লাগল। কিছুটা যাওয়ার পর এক জায়গায় একটা ছোট ফাঁক দেখতে পেল। সেখান থেকে নীল রঙের একটা আলোর রেখা রাস্তার ওপর এসে পড়েছে।

অলক এগিয়ে গেল সেইদিকে। ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে তাকাল। একটা ঘর। গোলা-বারুদ, নানাধরনের বন্দুক-পিস্তলে ঘরটা ঠাসা। একদিকে একটা লোক চেয়ার-টেবিলে বসে কী যেন লিখছে।

এত গোলা-বারুদ-বন্দুকের আয়োজন কীসের জন্য? তবে কি কিছুদিন আগে আসামে যেসব নাশকতামূলক কাজ ঘটত বা কিছু-কিছু দেশদ্রোহীর কাছে বিদেশি অস্ত্রসস্ত্র পাওয়া যেত, তা কি এখান থেকে চালান দেওয়া হত?

যাক গে, এসব পরে ভাবলেও চলবে। এখন যেভাবে হোক এখান থেকে পালাতে হবে।

অলক এগিয়ে চলল। কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। একইরকমের সুড়ঙ্গ-পথেই সে তখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোনওখান দিয়েও একটুখানি আকাশ দেখা গেল না। আকাশ—একটুখানি আকাশ। অলকের প্রাণটা হাহাকার করে উঠল।

লাউডস্পিকারে আবার আওয়াজ ভেসে এল, মেজর ঘোষ, আপনাকে আবার বলছি, আত্মসমর্পণ করুন। নইলে এর জন্যে সারাজীবন ধরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।

অলক এগিয়ে চলল। কতক্ষণ সময় কেটেছে কে জানে! সারা শরীর অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে।

হঠাৎ একটা টর্চের আলো তার গায়ে এসে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার, পেয়েছি, পেয়েছি।

অলক দেখল, তিনজনের একটা দল। সঙ্গে সেই মুখোশধারী আছে।

মুখোশধারী এগিয়ে এল। বলল, তাহলে মেজর ঘোষ, ধরা পড়তেই হল!

উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখোশধারীর নাক লক্ষ করে এক ঘুষি মারল অলক। সঙ্গে-সঙ্গে বাকি দুজন লোক তাকে জাপটে ধরল।

নাক চেপে ধরে মুখোশধারী বলল, ওকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে চল।

লোক দুটো অলককে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। কিছুটা যাওয়ার পর একটা দরজা খুলে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল অলক। দাঁতের আঘাতে নীচের ঠোঁটটা কেটে গেল। রক্ত পড়ছে। আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। ঘরটা সত্যিই একটা অপারেশন থিয়েটার।

দু-হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে ভালো করে তাকাল অলক।

দেখল, টেবিলের ওপর একজন লোক শুয়ে আছে। আর সাদা অ্যাপ্রন-পরা একজন বিদেশি মানুষ ছুরি দিয়ে তার একখানা পা কেটে বাদ দিয়ে দিল। তারপর আর একখানা। মিনিট দশেকের মধ্যেই অলক দেখল, টেবিলে শায়িত লোকটার দু-খানা হাত আর দু-খানা পা নেই।

শিউরে উঠল অলক।

পাশ থেকে মুখোশধারী বলে উঠল, ওই লোকটা আমাদের সঙ্গে একটু চালাকি করবার চেষ্টা

করছিল। তাই ওকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে ভেবো না, ওকে আমরা মেরে ফেলব না। তাকিয়ে দেখো, আমাদের ডাক্তার কত যত্ন করে ওর হাত আর পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। মাস-দেড়েকের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে উঠবে। তখন আমরা ওকে তোমাদের ক্যালকাটা বা দিল্লিতে ছেড়ে দেব। ভিক্ষে করে দিব্যি ওর দিন চলে যাবে।

অলকের ইচ্ছে করল, পা থেকে জুতো খুলে মুখোশধারীর মুখে মারে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। শয়তানের সঙ্গে শয়তানি করবার সময় এখনও আসেনি। তাকে আরও কিছুটা ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

মুখোশধারী বলল, তুমি যদি আমাদের কথামতো কাজ না করঁ বা কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা কর—তাহলে তোমার অবস্থাও ওইরকম হবে, মনে থাকে যেন!

বলে সদর্পে মুখোশধারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল অলক।

ইতিমধ্যে লোকটার হাতে-পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছল। বিদেশি ডাক্তার অলকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। চোখে চোখ পড়তেই বিশ্রীভাবে হাসল সে। তারপর বলল, ডোন্ট ওরি, হি উইল বি অলরাইট উইদিন এ মানথ অর টু।

অলকের ইচ্ছে করল, ডাক্তারটার মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়।

কিন্তু তার আগেই একটা লোক এসে তার হাত ধরল, চলো, এখন ঘরে বন্দি হয়ে থাকবে। হেডকোয়ার্টারে তোমার ব্যাপারে খবর পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে খবর না আসা পর্যন্ত বিশ্রাম করবে চলো।

অলক দেখল, এ সেই আগের লোকটা, যে তাকে সঙ্গে নিয়ে মুখোশধারীর ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। কোনও কথা না বলে লোকটাকে অনুসরণ করল অলক।

লোকটা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যেতে-যেতে অলক বলল, তুমি তো একজন ভারতীয়। তোমার লজ্জা করে না নিজের দেশের সঙ্গে এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা করতে?

লোকটা বলল, ওসব কথা এখানে উচ্চারণ কোরো না। তাহলে তোমাকে-আমাকে দুজনকেই ডাক্তারের রুগি হতে হবে।

একটা ঘরের মধ্যে অলককে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল সে। অলক আবার বন্দি হল।

সাত ঃ সারি-সারি মৃতদেহ

অলক কি স্বপ্ন দেখছে?

শত্রুপুরীতে বন্দি হয়েও কি এমন স্বপ্ন দেখা যায়?

অলকের মনের মধ্যে যেন সপ্তসুরের রাগিণী বেজে চলল। ভালো করে চোখ মেলে তাকাতেও তার ভয় হচ্ছে। যদি স্বপ্নটা মুছে যায়! সামনের ওই অনিন্দ্য সুন্দরীর পরিচিত মুখখানা যদি মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়?

আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে ছবিটাকে চোখের সামনে ধরে রাখল অলক। মিলাই, মিলাই—আমার মিলাই।

কিন্তু কতক্ষণ?

আবার একটা ধাক্কা খেল অলক। কে যেন হাত দিয়ে তাকে ঠেলছে।

মুহূর্তের মধ্যে বাস্তবে ফিরে এল অলক। গুহার মধ্যে বন্দি অলক।

কিন্তু আশ্চর্য, স্বপ্নটা তো চোখের সামনে থেকে মুছে গেল না?

ঘরের নীল আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অলকের সামনে বসে আছে হীরা। হীরা, না কি মিলাই?

অলক কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হীরার একটা হাত তার মুখের ওপর এসে পড়ল। অর্থাৎ, হীরা তাকে কথা বলতে মানা করছে। অলকের সারা শরীরে একটা স্বার্গীয় শিহরন বয়ে গেল। কতদিন, কতদিন পরে সে তার মিলাই-এর স্পর্শ অনুভব করল।

হীরার হাতের ওপর অলক তার নিজের হাত রাখল। চোখে-চোখে, হাতে-হাতে কত কথার যেন আদানপ্রদান হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। অলকের মনে হল, এখন যদি তাকে ওই বিদেশি ডাক্তারের রুগিও হতে হয়, তাহলেও কোনও আক্ষেপ থাকবে না তার।

হীরা একটানে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। তারপর ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলল।

অলক উঠে দাঁড়াল। হীরার পিছন-পিছন এগিয়ে চলল সে। হরিণীর মতো ছুটে চলেছে হীরা, আর তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো তাকে অনুসরণ করছে অলক।

কত গুহা-পথ পার হয়ে গেল। চলার আর শেষ নেই। কিন্তু নিজেকে এতটুকু ক্লান্ত মনে হচ্ছে না অলকের। এইভাবে সারা জীবন ধরে সে যেন হীরার সঙ্গে পথ চলতে প্রস্তুত।

অবশেষে গুহা শেষ হল। পাহাড়ের একটা ফাটল, যার পরিসর একফুটেরও কম হবে, সেখান দিয়ে অনায়াসে হীরা বেরিয়ে গেল। অলকও একটু চেষ্টা করতে বেরিয়ে যেতে পারল।

আঃ—এতক্ষণে একটু আকাশ দেখা গেল।

অলকের মনে হল সে যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেল। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিল অলক। প্রকৃতির একটু হাওয়া আর একফালি নীল আকাশ দেখবার জন্য তার প্রাণটা যেন আনচান করছিল এতক্ষণ।

নেফার প্রকৃতিতে তখন ঊষা। রাত্রি শেষ হতে চলেছে। কিন্তু দিন এখনও শুরু হয়নি। অথচ তার আভাস মিলছে স্নিগ্ধ হাওয়ায়, শিশিরসিক্ত ঘাসে, আর আকাশের নীলিমায়।

হীরা পিছন ফিরে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকল অলককে।

অলক আবার চলতে শুরু করল। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু ঘাস, তার মধ্যে ছোট বড় নানারকমের পাথর। রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তার মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হীরা ছুটে চলেছে। অলকের বেশ অসুবিধা হলেও, গতিতে ছেদ পড়েনি তার।

দুজনে প্রায় ছুটেই চলেছে। পদে-পদে শত্রুপক্ষের ভয়। ধরা পড়লে হয়তো দুজনের লাশ লুটিয়ে পড়বে এই পাহাড়ি জঙ্গলে। এইবার অলক একটু বাস্তব চিন্তা শুরু করল। হীরা কীভাবে শত্রুপক্ষের গুহায় এল? তবে কি হীরাও ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?

কপালের শিরা ফুলে উঠল অলকের।

তার মিলাই একজন দেশদ্রোহী?

দিনের আলো একটু-একটু করে ফুটে উঠছে। চারিদিক ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অলক দেখল, হীরা উৎরাই-এর মুখে এগিয়ে চলেছে ঘাই নদীর দিকে।

অলক পিছন ফিরে তাকাল। কেউ তাদের অনুসরণ করছে না।

ঘাই নদীর কূলে এসে হীরা থামল। পরিশ্রান্ত হীরার বুক কামারের হাপরের মতো ওঠানামা করছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সায়ার নীচের দিকটা শিশিরসিক্ত। হীরার কাছে এলে অলকও থামল।

হীরা হিন্দিতে বলল, এই নদীটা পার হয়ে আরও মাইলখানেক হাঁটলেই তোমার ইউনিট দেখতে পাবে। আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না। আমি এখান থেকেই বাড়ি চলে যাব। তুমি আর দেরি কোরো না, চলে যাও। ওরা জানতে পারলে আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।

অলক হীরার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের পলক আর পড়ে না।

হীরা লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেল।

মেদুর গলায় অলক ডাকল, মিলাই!

হীরা যেন একবার কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ম্যায় মিলাই নেহি—ম্যায় হীরা হুঁ।

মিলাই! আবার স্বপ্নভরা কণ্ঠের আহ্বান।

হীরা যেন আর সহ্য করতে পারছে না। পালিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুড়ে দাঁড়াল।

অলক আবার বলল, মিলাই, এতদিন পরে তোমাকে পেলাম আমি, তবুও তুমি ধরা দেবে না?

হীরার সারা শরীর একবার থরথর করে কেঁপে উঠল। কাছে এগিয়ে এল অলক। হীরার পিঠে একটা হাত রাখল। দেখল, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

মিলাই, এত কষ্ট পাচ্ছ তুমি! তবু সত্যি কথা বলবে না?

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল হীরা। তারপর বুকফাটা কান্নায়, আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বলে উঠল সে, মিলাই বলে আমার মধ্যে যে আর কিছু অবশিষ্ট নেই গো, অলকদা!

বাঁধভাঙা জলের মতো অলকের বুকে আছড়ে পড়ল অলকের স্বপ্নসুন্দরী মিলাই। তার কান্না, তার কথা—নেফার প্রকৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল, আমার যে আর কিছু নেই, অলকদা! তোমার মিলাই বারো বছর আগে মরে গেছে। তুমি কেন ডাকো বারবার ও-নামে? আমি যে সব ভুলে যেতে চাই গো—সব ভুলে যেতে চাই!

অলকের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। এত যন্ত্রণা, এত আনন্দ—সে ওইটুকু বুকে ধরে রাখবে কেমন করে? বুক ফেটে যেতে চাইছে তার। নিজের চোখ দিয়েও দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে, মিলাই-এর কান্না সে কেমন করে থামাবে?

এই যে এতবড় আকাশ, ধ্যানগম্ভীর পাহাড়, শ্যামল বনানী—তোমরা পার না মিলাই-এর চোখের জল মোছাতে? সামান্য একজন প্রেমিক হয়ে অলক তা কেমন করে পারবে?

ভারতের পূর্ব সীমান্তে, নেফার এক অখ্যাত নদীর কূলে এই যে মিলন, এই যে দুটো প্রাণের মিলন—কেউ তার সাক্ষী রইল না। শুধু চোখের জলে দুজনের বুক ভেসে গেল।

বারোটা বছর!

যে-মেয়েটা একদিন পশ্চিমবাংলার মাটি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজে পাওয়া গেল নেফার গভীর অরণ্যে।

মিলাই—মিলাই—আর কেঁদো না—আর কেঁদো না তুমি—।

ওগো—আমি যে আর পারছি না। আমায় তুমি ধরে রাখো—আর আমাকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিয়ো না গো।

কতক্ষণ—কতক্ষণ—সময় কেটে গেছে, কেউ জানে না। অলক যখন একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে, তখন ঘাই নদীর জলে সপ্তরঙের খেলা।

ঘাই নদীর জলে পা ডুবিয়ে মিলাই বলে চলেছে তার বারো বছরের কাহিনি। বোম্বে রোডে তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল একদল শয়তানের দল। তারপর কুকুর-শেয়ালের মতো তাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেল তারা। যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, তখন গুপ্তচরগিরি করার জন্য বিদেশি শক্তির হাতে তাকে বিক্রি করে দিল।

লালা বাবা এখানকার পুরোহিত হলেও সে হল শত্রুপক্ষের একজন এজেন্ট। এখানকার মিলিটারিদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখাটাই হল তার প্রধান কাজ। এইরকম এজেন্ট এই সীমান্তপ্রদেশে অনেক আছে। মিলাইকে লালা বাবার মেয়ে সাজিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে তাঁকে সাহায্য করতে।

আমি জানি অলকদা, তুমি আমাকে ঘেন্না করবে। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করছি নিজের

মাতৃভূমির সঙ্গে। কিন্তু যেভাবে এরা আমার ওপর নজর রেখেছে, এখান থেকে পালাতেও সাহস পাইনি। আত্মহত্যা করতে আমার বড় ভয় অলকদা, নইলে যেদিন আমার দেহটা নিয়ে শয়তানগুলো ছিনিমিনি খেলেছিল, সেদিনই শেষ করে দিতাম নিজেকে। তাহলে আমাকে আজ দেশদ্রোহী সাজতে হত না।

অলকদা, আজ এতদিন বাদে তোমাকে পেয়েছি। আর আমার কোনও দুঃখ নেই। তুমি তো দেশের একজন বীর সৈনিক, তুমি নিজে হাতে দেশদ্রোহিতার শাস্তি আমাকে দাও। আমাকে মেরে ফেলো তুমি।

অলক যেন এতক্ষণ নিজেকে ভুলে গেছল। মিলাই-এর কথায় আবার ফিরে পেল নিজেকে। সে একজন সৈনিক। তার হাতে বিরাট একটা দায়িত্ব আছে।

কিন্তু কী করবে সে?

একদিকে দায়িত্ব, আর-একদিকে তার বুকের পাঁজর, মিলাই!

অলক ডাকল, মিলাই।

জলভরা চোখে মিলাই তাকাল অলকের দিকে।

মিলাই, আজ আমারও কোনও দুঃখ নেই। যেদিন থেকে তোমাকে হারিয়েছি সেদিন থেকে আমার মধ্যে আর আমি ছিলাম না। সেই দুঃখে ঘর ছেড়ে মিলিটারিতে ঢুকেছি। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে ভুলতে পারিনি। আজ বারো বছর পরে তোমাকে পেয়েছি। মরতে যদি হয় দুজনে একসঙ্গে মরব। কিন্তু তার আগে আমরা আমাদের স্বপ্ন সার্থক করব।

কী স্বপ্ন, অলকদা?

এত শিগগির ভুলে গেলে? রূপনারায়ণের ধারে যে-স্বপ্নের জাল রোজ আমরা বুনতাম? আমরা বিয়ে করব।

বিয়ে? সাপ দেখার মতো চমকে উঠল মিলাই। বলল, আজ আর তা হয় না, অলকদা। তোমাকে তো সব বললাম—আমি নষ্ট হয়ে গেছি অলকদা।

আমার কাছে তুমি আগের মতোই পবিত্র আছ, মিলাই। আমিও তোমার সেই অলকদাই আছি। কিন্তু তার আগে আমাদের অন্য কাজ আছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিলাই তাকাল অলকের দিকে।

অলক বলল, এতদিন ধরে তুমি নিজের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। এবারে তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বলো, রাজি?

মিলাই বলল, প্রায়শ্চিত্ত! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

অলক তার প্ল্যানটা খুলে বলল মিলাই-এর কাছে। মিলাই এখন থেকে সবসময় অলককে সাহায্য করবে। কিন্তু শত্রুপক্ষকে কিছু বুঝতে দেওয়া চলবে না। তারপর অলকের কাজ শেষ হয়ে গেলে দুজনে দেশে ফিরবে। বিয়ে করবে। ঘর বাঁধবে। তাদের স্বপ্ন সফল করে তুলবে।

ওদিকে সূর্য আরও কিছুটা ওপরে উঠেছে। তার আলোয় ঘাই নদীর জল মাঝে-মাঝে হেসে উঠছে।

মিলাই বলল, চলো—এবার ওঠা যাক। ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সব জানতে পেরেছে। হয়তো তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।

দুজনে হাত ধরাধরি করে উঠে দাঁড়াল। ঘাই নদীর জলে যেসব পাথরগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ওপর পা দিয়ে-দিয়ে নদী পার হল। তারপর গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল দুজনে।

অলক বলল, ওরা একটা মাইক্রোফিল্ম খুঁজছে। তুমি কিছু জান ও-সম্বন্ধে?

মিলাই বলল, ওটা এখন আমার কাছে আছে।

এবার অলকের বিস্ময়ের পালা, তোমার কাছে?

মিলাই বলল, তোমাদের মেজর নায়ার টাকার লোভে দলিলটার ফটো তুলেছিল। সেই সময় আরও একটা বিদেশি দেশ মেজর নায়ারের কাছে বিরাট অঙ্কের টোপ ফেলেছিল। ফলে নায়ার দোটানায় পড়ে গেছল। কার কাছে ফিল্মটা বিক্রি করবে—ঠিক করতে পারছিল না। ওদিকে দু-দেশই ওকে শাসাচ্ছে। সেইসময় আমার সঙ্গে ওর একটু ঘনিষ্ঠতা হয়। বুঝতেই পারছ। তোমাদের অফিসারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে খবর বের করাটাই আমার কাজ। তখন মেজর নায়ার মাইক্রোফিল্ম আমার কাছে লুকিয়ে রাখে। আর ওদিকে দাম বাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তার আগেই এ-পক্ষের গুলিতে তাকে মরতে হল। ফলে মাইক্রোফিল্মটা আমার কাছে রয়েই গেল।

অলক জিগ্যেস করল, তুমি কেন তাহলে এখনও ওটা ওদের হাতে তুলে দাওনি?

মৃদু স্বরে মিলাই বলল, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না—কিন্তু সত্যি বলছি, নিজের দেশের সঙ্গে অতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রবৃত্তি হয়নি। মিলিটারি ইউনিটের একটু-আধটু খবর আমি ওদেরকে দিয়েছি বটে, কিন্তু মাইক্রোফিল্ম শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া মানে দেশের সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দেওয়া—তাই এখনও মনস্থির করতে পারছিলাম না। তোমার চাই? তাহলে তোমাকে ওটা দিয়ে দেব।

হ্যাঁ, ওটা আমাকেই দিয়ে দিয়ো। নইলে ওরা জানতে পারলে তুমি আবার বিপদে পড়ে যাবে।

আবার কিছুটা সময় চুপচাপ কাটল। শুধু দুজনের পায়ের তলায় শুকনো পাতার মচমচানি।

একসময় মিলাই বলল, এবার আমি যাই, তুমি এই পথ দিয়ে সোজা চলে গেলেই তোমার ইউনিটে পৌঁছাতে পারবে।

মিলাইকে যেতে দিতে হবে, আবার তাকে চোখের আড়াল করতে হবে—ভাবতেই অলকের বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু হায়, তবু যেতে দিতে হবে।

মিলাই-এর হাতদুটো নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে অলক বলল, কথা দাও—আবার তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না? রোজ বিকেলে রাস্তার ধারে আমার সঙ্গে দেখা করবে?

কথা দিচ্ছি, অলকদা। তোমাকে না দেখে আমিই কি থাকতে পারব?

অলক বলল, আমার মনে হচ্ছে, আর কয়েকদিনের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। আর কয়েকটা দিন, মিলাই।

আধোস্বরে আবেগজড়ানো কণ্ঠে মিলাই বলল, আমি অপেক্ষা করব, অলকদা।

দুজনে দুজনের দিকে আবেশবিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল। একের হৃদয়ের স্পন্দন আর-একজনের হৃদয়ে মিলিয়ে যেতে চাইছে।

মিলাই বলল, লক্ষ্মীটি, এবার ছেড়ে দাও—আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

ধীরে-ধীরে হাতের বাঁধন শিথিল করে দিল অলক।

মিলাই অন্য রাস্তা ধরে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যেতে লাগল। যতদূর চোখ যায়, অলক দেখতে লাগল। তারপর একসময় আর দেখা গেল না মিলাইকে।

অলক হাঁটতে লাগল মিলাই-এর নির্দেশিত পথে। মিনিট পনেরোর মধ্যে সে ক্যাম্পের গেটে এসে পৌঁছাল।

তাকে দেখেই যেন গার্ডদের মধ্যে উত্তেজনা বয়ে গেল। একজন গার্ড টেলিফোন তুলে কাকে যেন ফোন করল।

অলক সবিস্ময়ে লক্ষ করল, মিনিট তিনেকের মধ্যে একটা জিপ ভেতর থেকে তীব্র গতিতে এগিয়ে এল গেটের দিকে। ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামল আর জিপ থেকে নেমে এলেন কর্নেল চ্যাটার্জি।

আসুন, মেজর ঘোষ, এ কী অবস্থা হয়েছে আপনার?

অলক মৃদু হাসল।

আসুন, জিপে উঠে আসুন।

অলক উঠে বসল। স্টিয়ারিং ধরলেন স্বয়ং চ্যাটার্জি।

মুখ ঘুরিয়ে জিপ আবার ছুটে চলল ক্যাম্পের দিকে।

চ্যাটার্জি বললেন, জানি আপনার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন—কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।

মিনিটদু-তিনের মধ্যে জিপ এসে একটা তাঁবুর কাছে থামল। অলক দেখল একজন প্রহরী সেখানে ডিউটি দিচ্ছে রাইফেল হাতে।

চ্যাটার্জির সঙ্গে জিপ থেকে নেমে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল অলক।

এবং দেখল, সারি-সারি তিনটি মৃতদেহ মেঝের ওপর শোয়ানো আছে। প্রত্যেকের দেহে অসংখ্য গুলির আঘাতের চিহ্ন।

চ্যাটার্জি বললেন, এরা হল আপনার কালকের দুজন সশস্ত্র প্রহরী আর ড্রাইভার। এদের খুন করে আমার কাছে মৃতদেহগুলো ওরাই পাঠিয়েছে। সঙ্গে একটা চিঠিও ছিল। তাতে লেখা ছিল, আপনার মৃতদেহও দু-চারদিনের মধ্যে আমার কাছে ফেরত পাঠাবে।

অলকের মাথাটা নীচু হয়ে গেল। কাল এরা তার সঙ্গেই গিয়েছিল। কিন্তু 'মেজর অলক ঘোষ' সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এরা কেউ জীবিত ফিরে আসতে পারেনি। এ-লজ্জা রাখবে কোথায় অলক!

মৃতদেহগুলোর দিকে আবার তাকাল সে। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে তিনজন সৈনিক।

চ্যাটার্জি বললেন, আপনি এখন গিয়ে বিশ্রাম করুন। পরে আপনার কাছ থেকে সব শুনব।

আট ঃ দলিল চুরি

নেফার বুকে আরও একটা রাত্রি নেমে এল। ঘন কালো আকাশ, তার মাঝে রুপোলি বিদ্যুতের রেখা মাঝে-মাঝে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। সূর্য ডোবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই যে বৃষ্টি নেমেছে, এখনও তার বিরাম নেই। মনে হয়, আকাশ ভেঙে পড়ছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়ায় গা-শিরশির করে ওঠে।

কর্নেল চ্যাটার্জির অফিসঘরে অলক বসে আছে।

দুজনেই গম্ভীর। অলকের চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে উঠছে সকালবেলার দেখা সারি-সারি মৃতদেহ।

অলক বলল, একটা বিরাট গ্যাং এই কাজ করে চলেছে, স্যার। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমাদের দেশের বিশ্বাসঘাতকের দল। কাল রাত্রে যেটুকু বুঝেছি—তাতে মনে হয়, ওই পাহাড়টা একটু দুর্গবিশেষ। আধুনিক ট্রান্সমিটার রিসিভার সহযোগে ওরা হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ রাখে। তা ছাড়া, ওদের কাছে প্রচুর আর্মস আর অ্যামিউনিশন আছে। ওদের ক্ষমতা অনেক। আমাদের আরও সাবধানে কাজ করতে হবে।

চ্যাটার্জি বললেন, তাহলে কীভাবে কাজ শুরু করা যায়?

অলক বলল, এখানে আসার পর ভেবেছিলাম 'যে-দলিলটা নিয়ে যাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। এখন দেখছি, আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রক ব্যাপারটার গুরুত্ব সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন।

একটু থামল অলক। বাইরে থেকে একটানা বৃষ্টির শব্দ ভেসে আসছে।

অলক বলল, কাল যে আমি মাইক্রোফিল্ম নিয়ে চেংগেল যাচ্ছিলাম, এ-কথা কে-কে জানতে পারে, স্যার?

চ্যাটার্জি বললেন, কথাটা প্রথমে আপনি আমাকে বলেছিলেন, তারপর আপনার কথামতো আমি লাঞ্চ আওয়ারে সমস্ত অফিসারদের জানাই।

অলক বলল, তাহলে শত্রুপক্ষ কেন আমাদের গাড়ি আক্রমণ করল? কী করে ওরা আমাদের প্রোগ্রামের কথা জানতে পারল?

চমকে উঠলেন চ্যাটার্জি। বললেন, তার মানে আপনি বলতে চান আমাদের মধ্যে কেউ একজন ওদের এজেন্ট?

একজ্যাক্টলি, স্যার। আমি, আপনি এবং এই ইউনিটের অন্যান্য অফিসার, এদের মধ্যে কোনও একজন হল শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। তাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

একটা কথা মেজর ঘোষ, মাইক্রো ফিল্মটা কি সত্যি-সত্যিই আপনি খুঁজে পেয়েছেন?

অলক হাসল। বলল, না, স্যার। তবে আমি জানি, সেটা কোথায় আছে।

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়ালেন চ্যাটার্জি, কোথায় আছে?

সেটা বর্তমানে নিরাপদেই আছে। কাল আমি ওই কথা বলে জিপ নিয়ে কেন বেরিয়েছিলাম জানেন? ওরা কতখানি ক্ষমতাসম্পন্ন, সেটা জানতে। যেদিন সত্যিই আমি দলিল আর মাইক্রোফিল্ম নিয়ে দিল্লি ফিরব, সেদিন কতখানি বাধা আসতে পারে ওদের তরফ থেকে—তাই জানবার জন্যেই কালকের প্ল্যানটা ঠিক করেছিলাম। দেখলাম, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। দলিল নিয়ে ওরা আমাকে এত সহজে ফিরে যেতে দেবে না। প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে আমাকে।

কিন্তু মাইক্রোফিল্মের খোঁজ আপনি পেলেন কেমন করে?

অলকের মুখ এক অনির্বচনীয় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, সে-কথা আপনাকে পরে বলব, স্যার। তবে আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

বলুন।

ওই যে লালা বাবার মেয়ে হীরা, ওকে ওর ইচ্ছেমতো আমাদের ক্যাম্পের মধ্যে আসবার অনুমতি দিতে হবে। এর সঙ্গে আমাদের অপারেশনের সম্পর্ক আছে। তাই এই অনুরোধ।

একটু চিন্তা করে নিয়ে চ্যাটার্জি বললেন, কাজটা যদিও নিয়মবিরুদ্ধ, তবুও আপনার কথামতো ব্যবস্থা হবে। আর কিছু?

লালা বাবাকে অ্যারেস্ট করার আদেশ চাই।

চ্যাটার্জি আবার চমকে উঠলেন। বললেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া কী হবে ভেবে দেখেছেন কি? এখানকার সমস্ত আদিবাসীরা খেপে উঠবে। হয়তো ওরা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করে বসবে।

অলক বলল, জানি, স্যার। কিন্তু লালা বাবাকে গ্রেপ্তার করলে ওদের একটা হাত পঙ্গু করে দেওয়া যাবে। চাই কী, লালা বাবার কাছ থেকে আরও অনেক খবর জানা যাবে।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু দলিলটা কীভাবে দিল্লি নিয়ে যাবেন?

ওটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মোটামুটি একটা প্ল্যানও ছকে ফেলেছি। কিন্তু আমার কাজ শুধু দলিল আর মাইক্রোফিল্ম নিয়েই নয়। এখানে আসার পর একটা নৈতিক দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সেটা হচ্ছে—ওদেরকে সমূলে ধ্বংস করা। যাই হোক, সে-সম্বন্ধে কাল ব্যবস্থা করা যাবে।

এমনসময় ঘরের আলো নিভে গেল। অর্থাৎ, রাত দশটা বাজল। ইউনিটের জেনারেটর অফ করে দেওয়া হল।

অলক উঠে দাঁড়াল।

ও কে, স্যার। আজ চলি। গুডনাইট।

গুডনাইট।

অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে অলক চলে গেল। কর্নেল চ্যাটার্জি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানার ওপরে বসলেন।

মনের মধ্যে অনেকগুলো ভাবনা ঘুরপাক খেয়ে মরছে। মেজর অলক ঘোষ সত্যিই করিৎকর্মা পুরুষ। তার চলা-বলা—সবকিছুর মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। কিন্তু তবুও কতকগুলো প্রশ্ন কর্নেল চ্যাটার্জির মনে ভেসে ওঠে।

যে-লোকটা দলিলের জন্য এখানে এসেছে, সে এখনও দলিলটা একবার দেখতেও চাইল না! কর্নেল চ্যাটার্জির কথাতেই কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইল। এবং দলিল-প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন যেন এড়িয়ে যেতে চায়।

তারপর সেই আদিবাসীদের উৎসবের রাত্রি। লালা বাবার মেয়ে হীরাকে দেখে মেজর অলক ঘোষের মূর্ছিত হয়ে পড়া—কেমন যেন দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল চ্যাটার্জির কাছে। পরে অলককে তিনি প্রশ্নও করেছিলেন। কিন্তু অলক এড়িয়ে গেছে।

অবশ্য হীরা মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। দেখলে লোভ হয়। কর্নেল চ্যাটার্জির সঙ্গেও হীরার আলাপ আছে। মেয়েটা কেমন যেন গায়ে-পড়া। সেই রাত্রে হীরার চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল চ্যাটার্জির। তা ছাড়া, অলককে দেখে হীরা ছুটে পালিয়েছিল কেন?

তা বলে মেজর ঘোষ যে একজন দক্ষ অফিসার, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কর্নেল চ্যাটার্জির। মাত্র তিন-চারদিনের মধ্যেই সে শত্রু-ঘাঁটির সন্ধান করে ফেলল। আর অলকের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে মাইক্রোফিল্মও সে খুঁজে পেয়েছে।

হাই উঠল চ্যাটার্জির। পোড়া সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

বাইরের বৃষ্টি সমান বেগে চলেছে। একটানা একঘেয়ে আওয়াজ। সেই আওয়াজ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন চ্যাটার্জি।

ক্রমে রাত গভীর হল। বৃষ্টি কমে এল। আকাশে একটা-দুটো তারা ফুটে উঠল। নিশুতি রাতে সবাই তখন ঘুমে অচেতন।

এমনসময় দেখা গেল, একটা মূর্তি পা টিপে-টিপে এগিয়ে আসছে কর্নেল চ্যাটার্জির ঘরের দিকে—বারান্দায় উঠে মূর্তিটা এদিক-ওদিক তাকাল। যখন নিশ্চিন্ত হল যে, তাকে কেউ দেখছে না—তখন আস্তে-আস্তে এগিয়ে এল জানলার কাছে।

দূরে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল।

মূর্তিটা বিশেষ কায়দায় জানলাটা খুলে ফেলল। তারপর একলাফে কর্নেল চ্যাটার্জির ঘরের মধ্যে পা দিল। চ্যাটার্জি তখন নাক ডাকিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। নৈশ অতিথির কথা জানতেও পারলেন না।

মূর্তিটা একটা পেনসিল টর্চ বের করে, তার আলো চ্যাটার্জির মুখে ফেলল। একটু ঝুঁকে তাঁর ঘুমের গভীরতা পরীক্ষা করল। তারপর এগিয়ে গেল চ্যাটার্জির পুজোর বেদির দিকে। যেখানে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রাখা আছে।

চটপট মূর্তি দুটো পকেটের মধ্যে পুরে আবার জানলা টপকে বাইরে চলে গেল। চ্যাটার্জি কিছু জানতেও পারলেন না।

নয় ঃ একটা মৃতদেহ ও হেলিকপ্টার

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কর্নেল চ্যাটার্জি সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, তাঁর পুজোর বেদি শূন্য। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি সেখানে নেই।

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ল চ্যাটার্জির। যেমন ছিলেন সেই অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, মেজর ঘোষ, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চ্যাটার্জির চিৎকারে প্রায় সমস্ত অফিসাররা ঘুম ভেঙে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেজর দেশপাণ্ডে জিগ্যেস করল, হোয়াট হ্যাপেনড্, স্যার! এনিথিং রং!

চ্যাটার্জি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, হোয়ার ইজ মেজর ঘোষ? আই ওয়ান্ট হিম ইমিডিয়েটলি।

ততক্ষণে অলকও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। দু-চোখে তখনও তার ঘুমের রেশ।

কী ব্যাপার, স্যার।

সর্বনাশ হয়ে গেছে, ঘোষ। আমার রাধাকৃষ্ণের মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। তার মধ্যে দলিলটা ছিল।

হোয়াট! বিস্ময়ে ও বেদনায় হতভম্ব হয়ে গেল অলক।

ক্রমে-ক্রমে সব জানা গেল। দলিলটা লুকিয়ে রাখার জন্য চ্যাটার্জি নিজে ছুরি দিয়ে কাঠের রাধাকৃষ্ণের মূর্তির ভেতরটা ফাঁপা করেছিলেন। তারপর তার মধ্যে দলিলটা লুকিয়ে রেখে নীচে থেকে গালা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সকলে জানত, কর্নেল চ্যাটার্জি একটু বেশি পরিমাণ ঠাকুর দেবতার ভক্ত। কিন্তু তা নয়। দলিলের নিরাপত্তার জন্যই তাঁকে ওই ভান করতে হয়েছিল।

চ্যাটার্জির কাছ থেকে সব শোনার পর সমস্ত অফিসারদের মুখ শুকিয়ে গেল। ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছে। আর দলিলটার দায়িত্ব শুধুমাত্র চ্যাটার্জির নয়, তাদের সকলের। ফলে সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

অলক এগিয়ে এল চ্যাটার্জির কাছে।

স্যার, দলিলটা আপনি অন্য কোথাও রাখেননি তো?

কী বলছেন আপনি, মেজর ঘোষ! আমি রেখেছি আর আমি জানি না?

না—মানে, আমতা-আমতা করে অলক বলল, যদি ভুল করে অন্য কোথাও রেখে থাকেন!

শাট আপ। কর্নেল চ্যাটার্জির ওইরকম ভুল হয় না। কিন্তু এখন আমি কী করি? ডিফেন্স মিনিস্টার যখন প্রশ্ন করবেন, আমি কী জবাব দেব!

মেজর দেশপাণ্ডে বললেন, চলুন স্যার, আপনার অফিসটা ভালো করে খুঁজে দেখা যাক।

অলক তাকাল দেশপাণ্ডের দিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠল।

এমনসময় দেখা গেল, মেন গেটের দিক থেকে দুজন গার্ড দৌড়াতে-দৌড়াতে এদিকে আসছে।

স্যার, আদিবাসীদের একদঙ্গল লোক গেটের সামনে এসে চেঁচামেচি শুরু করেছে। ওরা ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কেন, ওদের আবার কী হল?

কী জানি, স্যার। ওরা কিছুই বলছে না। বলছে, ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলব।

ঠিক আছে, ওদের অপেক্ষা করতে বলো। আমি আসছি।

গার্ড দুজন চলে গেল।

মিনিটপনেরোর মধ্যে মিলিটারি পোশাক পরে কর্নেল চ্যাটার্জি মেজর ঘোষ ও দেশপাণ্ডেকে নিয়ে মেন গেটের দিকে চলে গেলেন।

অলক দেখল, প্রায় শ'খানেক নারী-পুরুষ সেখানে জমায়েত হয়েছে। কর্নেল চ্যাটার্জিকে দেখে

সবাই চিৎকার করে উঠল।

চ্যাটার্জি বললেন, কী ব্যাপার? এই সকালবেলায় কী চাই তোমাদের?

তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় ওদের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা চলতে লাগল। তার মধ্যে একখানা পাথর এসে পড়ল জিপের ওপর।

চ্যাটার্জি অলক ও দেশপাণ্ডেকে ইংরেজিতে বললেন, কাল রাত থেকে ওরা নাকি লালা বাবাকে খুঁজে পাচ্ছে না। ওরা খবর পেয়েছে, আমরা নাকি লালা বাবাকে বন্দি করে রেখেছি। ওদের দাবি, লালা বাবাকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দিতে হবে। নইলে ওরা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করবে। আমি বোঝাচ্ছি, লালা বাবার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, তাকে আমরা বন্দি করে রাখিনি, কিন্তু ওরা সে-কথা বিশ্বাস করছে না।

চ্যাটার্জিকে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেখে ওরা আবার চিৎকার করে উঠল।

চ্যাটার্জি বললেন, তোমরা যদি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে না যাও, তাহলে আমি গুলি চালাবার আদেশ দেব।

সঙ্গে-সঙ্গে আদিবাসীরা চুপ হয়ে গেল। কিছুটা পিছিয়ে গেল তারা। নিজেদের মধ্যে কী যেন আলাপ করল।

পরমুহূর্তে দশ-বারোখানা তির ছুটে এল চ্যাটার্জিকে লক্ষ্য করে। তড়িৎ গতিতে জিপের মধ্যে ঢুকে পড়ে চ্যাটার্জি অর্ডার দিলেন, ফায়ার।

গার্ডের রাইফেল গর্জে উঠল দুবার। পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত সেই আওয়াজ হাজার গুণ হয়ে ফিরে এল। ওদিকে আদিবাসীদের মধ্যে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হল। নিমেষের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা ছোট-ছোট টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

গার্ড আরও দুবার ফায়ার করল। সেই আওয়াজ মিলিয়ে যেতে-না-যেতে দেখা গেল জঙ্গলের ভেতর থেকে বনহরিণীর মতো দৌড়ে আসছে একটি নারী।

কাছে আসতে সবাই দেখল, হীরা।

আর অলক দেখল, মিলাই।

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল অলকের। একটা অজানা সুখের অনুভূতি সারা দেহটাকে একবার কাঁপিয়ে দিল। তার মিলাই আসছে। মুখখানা আনন্দে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। সে এখন মেজর অলক ঘোষ। হীরা-অলকের সম্পর্ক এখন গোপন থাকাই উচিত।

হীরা এগিয়ে এসে বলতে লাগল, ওগো, তোমরা সবাই দেখবে চলো না, ওই জঙ্গলের মধ্যে লালা বাবা মরে পড়ে আছে। কে যেন তাকে ছোরা মেরে খুন করে গেছে।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়!

লালা বাবা নিহত!

কর্নেল চ্যাটার্জি এগিয়ে গেলেন হীরার দিকে।

কী বলছ তুমি? লালা বাবাকে খুন করেছে?

ওদিকে টিলার আড়াল থেকে একজন, দুজন করে আদিবাসীর দল বেরিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে সবাই এসে হীরাকে ঘিরে দাঁড়াল।

চ্যাটার্জি, দেশপাণ্ডে আর অলকও এগিয়ে গেল।

হীরা বলল, আমি সকালে উঠে আমার ছাগলগুলো চরাতে গেছলুম। হঠাৎ দেখি ঘাসের জঙ্গলে লালা বাবার দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

বলতে-বলতে কেঁদে ফেলল হীরা।

ওগো, তোমরা চলো না, আমার বাবাকে কে খুন করেছে—দেখবে চলো না।

মিলাই-এর কান্নার অভিনয় দেখে অলক মুগ্ধ হয়ে গেল। কে বলবে, লালা বাবা মিলাই-এর, তথা হীরার, আসল বাবা নয়!

হীরাকে অনুসরণ করে সবাই এগিয়ে গেল। কিছুটা যাওয়ার পর দেখা গেল, লালা বাবার মৃতদেহ পড়ে আছে। সারা দেহে দশ-বারোটা ছোরার আঘাতের চিহ্ন। পরনের একমাত্র কাপড় জলে ভিজে সপসপ করছে। জলে, রক্তে, কাদায়—আশেপাশের জমি মাখামাখি হয়ে গেছে।

লালা বাবার দেহের ওপর আছড়ে পড়ে পাগলিনীর মতো কাঁদতে লাগল হীরা। একজন আদিবাসী বুড়ি এগিয়ে গেল তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।

চ্যাটার্জি অলক আর দেশপাণ্ডেকে নিয়ে ইউনিটে ফিরে এলেন।

চ্যাটার্জি বললেন, কী মনে হয় মেজর ঘোষ?

অলক বলল, আপনি দলিলটার সম্বন্ধে জিগ্যেস করছেন? নাকি লালা বাবার মৃত্যু সম্পর্কে?

দুটোই।

দলিলটা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব। আর, একজন আদিবাসীর মৃত্যু সম্পর্কে আমার কোনও কৌতূহল নেই।

হোয়াট! চ্যাটার্জি যেন চিৎকার করে উঠলেন, লালা বাবার হত্যা সম্পর্কে আপনার কোনও কৌতূহল নেই?

না, স্যার। ওরা অসভ্য বন্যজাতি। হয়তো নিজেদের মধ্যে দলাদলি করে একে অপরকে খুন করেছে।

অলকের এই নিরাসক্ত ভাব চ্যাটার্জি যেন আর সইতে পারলেন না। বললেন, কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে লালা বাবা একজন শত্রুপক্ষের চর?

এ-বিষয়ে আমি পরে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। এখন আমার একটা নিবেদন আছে।

বলুন।

আপনার গাড়িটা একবার চাই। একবার চারপাশটা ঘুরে দেখব। আর চেংগেল যাব।

চেংগেল? হঠাৎ?

সারদা কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করতে।

চ্যাটার্জি সাহেবের আরও একবার মনে হল, তিনি মেজর অলক ঘোষকে ঠিক চিনতে পারেননি।

চেংগেল শহরটা ঠিক শহর নয়। একটা ছোট বাজারকে কেন্দ্র করে কয়েকটা কাঠের বাড়ির অস্তিত্ব জায়গাটাকে সজীব করে রেখেছে মাত্র। তারচেয়ে বড় কথা, এখানে 'ইলেকট্রিক' আছে। ব্যাঙ্ক আছে। গভর্নমেন্টের 'রুরাল হেল্‌থ সেন্টার' আছে। আর আছে ডিব্রুগড় পর্যন্ত একটা পিচঢালা পাহাড়ি রাস্তা। দুটো কাজ এখানে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। প্রথমত, আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা। আর দ্বিতীয়টা হল, পরিবার পরিকল্পনা।

কাউকে কোনও কিছু জিগ্যেস না করেই অলক জিপ নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গেল। তারপর একটু খোঁজ করতেই নার্সের পোশাক-পরা সারদার আবির্ভাব হল।

অলককে দেখেই মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সারদার।

গুডমর্নিং, মেজর ঘোষ। আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি আমাকে ভুলেই গেছেন।

মৃদু হেসে অলক বলল, ভুলিনি। কিন্তু এই ক'টা দিন ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। তার মধ্যে একদিন আবার শত্রুপুরীতে বন্দি হয়েছিলাম। কিন্তু সে-কথা থাক। আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কিছু

আলোচনা আছে।

সারদা বলল, চলুন, তাহলে আমার কোয়ার্টারে গিয়ে বসা যাক।

না—ওখানে নয়। ওখানে লোকে আড়ি পাততে পারে। তার চেয়ে আমার জিপে আসুন।

ডিউটি মেডিকেল অফিসারদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সারদা এসে বসল অলকের জিপে।

জিপ নিয়ে এলোমেলো ভাবে চেংগেল শহরটা ঘুরতে লাগল অলক।

জিপ ছুটে চলল ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে ডিব্রুগড়ের দিকে। তারপর আবার ফিরে এল চেংগেলের পথে।

একসময় সারদা প্রশ্ন করল, আপনার কাজ কতদূর এগোল, মেজর ঘোষ?

মাইক্রোফিল্ম খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু দলিলটা চুরি হয়ে গেছে।

সেকী! চমকে উঠল সারদা।

অলক বলল, আশা করছি, আর দু-দিনের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপরেই হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে এল অলক, আপনি নাচ জানেন সারদা দেবী?

নাচ? কেন বলুন তো?

জানেন কি না আগে বলুন!

জানি।

তাহলে আমি শত্রুপক্ষকে সমূলে ধ্বংস করে এখান থেকে চলে যাব। আপনি আমায় সাহায্য করবেন, কথা দিন।

সারদা বলল, আপনাকে সাহায্য করবার জন্যেই আমাকে এখনও চেংগেলে রাখা হয়েছে। নইলে আমার বদলি হয়ে চলে যাওয়ার কথা।

অলক বলল, কাল রাত্রে আপনাকে একজনের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। সে অবিকল আপনার মতো দেখতে।

আপনি কার কথা বলছেন?

লালা বাবার মেয়ে হীরা।

হীরা! নাম শুনেছি। এখনও দেখিনি।

সে শুধু হীরাই নয়, সারদা দেবী। সে হল আমার হারিয়ে যাওয়া মিলাই।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। সারদা যেন বোবা হয়ে গেল।

অলক এবার তার সমস্ত প্ল্যান খুলে বলল। শুনতে-শুনতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সারদার। তারপর বলল, আমি রাজি মেজর ঘোষ। কামনা করি, আপনার আর মিলাই-এর মিলন শুভ হোক।

হাসপাতালের কাছে সারদাকে নামিয়ে দিয়ে অলক তার জিপ ছুটিয়ে নিয়ে চলল ক্যাম্পের দিকে। সূর্য তখন মাথার ওপর। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই।

এমনসময় একটা আওয়াজে অলক তাকাল উপরের দিকে। একটা হেলিকপ্টার। ভারতীয় বিমানবাহিনীর ছাপ মারা হেলিকপ্টার। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে নিশানার দিকে।

অলকের জিপ ছুটে চলল।

ছোট ব্রিজটা পার হয়ে অলক তার গাড়ি থামাল। তারপর তাকিয়ে রইল সামনের বড় পাহাড়টার দিকে। ওই পাহাড়টার মধ্যেই আছে শত্রুপক্ষের বিরাট অফিস। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল অলকের। ওই পাহাড়টা ধ্বংস না করা পর্যন্ত ওর যেন শান্তি নেই।

অলক ফিরে এল জিপে। জিপ আবার ছুটে চলল তার গন্তব্যস্থলের দিকে। মনে-মনে সব প্ল্যানগুলো আর-একবার জরিপ করে নিল। যদি সবকিছু ঠিকমতো হয়, তাহলে কাল রাত্রিশেষে

সে এখান থেকে চলে যেতে পারবে।

এখন শুধু একবার মিলাই-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সারদা বুদ্ধিমতী। তার ওপর অলকের ভরসা আছে।

মিনিটদশেক পরে অলকের জিপ যখন ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকল, সে দেখল, তার একটু আগে-দেখা হেলিকপ্টারখানা ক্যাম্পের হেলিপ্যাডে দাঁড় করানো আছে।

অলক গিয়ে জিপখানা থামাতেই পাইলটের পোশাক পরা একজন মানুষ এগিয়ে এসে লম্বা স্যালুট দিয়ে বলল, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সেন ইজ রিপোর্টিং টু ইউ, স্যার।

অলক দেখল, মানুষটা আর কেউ নয়, তার বন্ধু রজত সেন।

দশ ঃ রাধাকৃষ্ণের মূর্তি

অফিসারস মেসের অ্যান্টিরুমে জরুরি মিটিং-এর আহ্বান জানিয়েছেন কর্নেল চ্যাটার্জি। বলা বাহুল্য, মেজর অলক ঘোষের পরামর্শেই।

সময় ওই দিনই বিকেল চারটে। অলকের মনে হয়, উত্তর আসাম ও নেফা অঞ্চলে 'বিকেল' বলে বিশেষ কোনও সময় নেই। এখানে দুপুরের পর সোজাসুজি সন্ধ্যা নেমে আসে। আর ওদিকে রাত তিনটের সময় আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

চারটে বাজতে মিনিট দুই-তিন বাকি আছে, একে-একে সমস্ত অফিসার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সবশেষে এলেন কর্নেল চ্যাটার্জি স্বয়ং। সঙ্গে মেজর ঘোষ, ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সেন। এয়ার ফোর্সের মাস্টার গ্রিন পাইলট।

অ্যান্টিরুমের ঘড়িতে ঢংঢং করে চারটে বাজতেই কর্নেল চ্যাটার্জি বললেন, ডিয়ার অফিসারস্, আজ এক বিশেষ প্রয়োজনের সন্ধিক্ষণে আমি আপনাদের আহ্বান জানিয়েছি। আশা করি, আপনাদের সহযোগিতা আমি পাব। আমার যা বক্তব্য, আমার পক্ষ থেকে মেজর ঘোষ আপনাদের তা জানাবেন।

অলক উঠে দাঁড়াল। তারপর ওসিকে ধন্যবাদ-জানিয়ে বলতে শুরু করল, আপনারা জানেন, আমাকে এক বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমি হয়তো সে-কাজ পেরে উঠব না।

মেজর দেশপাণ্ডে বলে উঠলেন, এক্সকিউজ মি, আপনার এই সন্দেহের কি কোনও কারণ আছে? কারণ, আমি যতদূর জানি, আপনার পক্ষে 'অসম্ভব' বলে কিছু নেই। অন্তত আমাদের সরকার তাই বিশ্বাস করেন।

অলক ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল দেশপাণ্ডের দিকে। তারপর বলল, জানি না আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন কি না; তবুও বলছি, আমাদের শত্রুপক্ষ প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাই কোনও কাজে অগ্রসর হওয়ার আগে, আমাদের চিন্তা করতে হবে। এ-ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য চাই, মেজর দেশপাণ্ডে।

বলুন, আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি। দেশের জন্যে প্রয়োজন হলে আমি জীবন উৎসর্গ করব।

ধন্যবাদ। কাজটা হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, যে-দলিল নিয়ে আমাদের অভিযান, সেই দলিলটা, তথা কর্নেল চ্যাটার্জির রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা চুরি হয়ে গেছে। আমার ধারণা, সেটা এখনও ক্যাম্পের মধ্যেই আছে। আজকের রাতের মধ্যেই ওটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। মেজর দেশপাণ্ডে, এই দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা পেলেই

ওটা আপনি আমার কাছে দিয়ে দেবেন।

মেজর দেশপাণ্ডে বললেন, আমি সম্মত, মেজর ঘোষ।

অলক বলল, আপনার দ্বিতীয় কাজটা আরও গুরুত্বপূর্ণ মেজর। আমি খবর পেয়েছি, সিভিল পুলিশ লালা বাবার মৃতদেহ, পোস্টমর্টেমের পর, আগামীকাল দুপুরে আদিবাসীদের কাছে ফেরত দেবে। তারপর কাল রাত্রে ওই মৃতদেহ নিয়ে আদিবাসীদের কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে। সেই অনুষ্ঠানে লালা বাবার মেয়ে হীরার নাচ-গানের ব্যবস্থা আছে। আপনার কাজ হবে, হীরার ওপর নজর রাখা, এবং এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে চোখের আড়ালে যেতে না দেওয়া।

মেজর দেশপাণ্ডে সব শুনে বললেন, এ-কাজের ভারও আমি নিলাম। কথা দিচ্ছি, আমার তরফ থেকে কর্তব্যের কোনও ত্রুটি থাকবে না।

মেজর ঘোষ বসে পড়ল। আর তার কোনও বক্তব্য নেই।

কর্নেল চ্যাটার্জি বললেন, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা এই মুহূর্তে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি খোঁজা শুরু করে দিন। প্রয়োজন হলে ইউনিটের প্রতিটি মানুষকে এই কাজে লাগিয়ে দিন।

নিয়মমাফিক অভিবাদন জানিয়ে একে-একে সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেল। রইল শুধু তিনজন। চ্যাটার্জি, অলক আর রজত সেন।

সবাই চলে যেতে চ্যাটার্জি অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার, ঘোষ, আপনি যে সব কাজের ভার দেশপাণ্ডের ওপর চাপিয়ে দিলেন!

রহস্যময় হাসি হেসে অলক বলল, আমি ওকে সবসময় এনগেজ করে রাখতে চাই। আর আপনাকেও একটা কাজ দিতে চাই, স্যার!

বলুন।

আপনার কাজ হবে দেশপাণ্ডের ওপর নজর রাখা।

আপনি কি মেজর দেশপাণ্ডেকে সন্দেহ করেন নাকি?

আমার ধারণা সত্যি হলে দেশপাণ্ডেই হল সেই বিভীষণ—যাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

প্রমাণ আছে?

আছে বইকী! আপনি দেশপাণ্ডের নাকে একটা কালশিটের দাগ লক্ষ করেছেন কি?

ঠিক খেয়াল করিনি।

ওইটাই হল আমার প্রমাণ। তবে ওই দাগ দু-চারদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, আরও গভীর কোনও দাগ—যা কোনওদিন মুছে যাবে না।

কর্নেল চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন অলকের দিকে। তার কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আমার রাধাকৃষ্ণের মূর্তি!

অলক বলল, ওটা আজকেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এবং কাল রাত্রে আবার ওটা চুরি হয়ে যাবে।

তার মানে?

তার মানে, রাধাকৃষ্ণের মূর্তিসহ দলিলটা যে চুরি করেছে, তাকে আমি জানি।

চ্যাটার্জি মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সেকী? আমি এখুনি তাকে গুলি করে মারব। কোথায় আছে সে?

অলক ধীরস্বরে বলল, সে আপনার সামনেই বসে আছে।

আপনি! ধপ্ করে বসে পড়লেন চ্যাটার্জি। অতবড় একটা মিলিটারি অফিসারের মুখখানা একটা বাচ্চা ছেলের মতো অসহায় দেখাল।

অলক বলল, আপনি রাগ করবেন না, স্যার। এর প্রয়োজন ছিল। রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা

আমি নিজেই চুরি করেছি এই কারণে যে, শত্রুপক্ষ জানুক যে ওটা চুরি হয়ে গেছে। তাহলে আমি কিছুটা সময় পাব। আপনাকে আমি আগেই বলেছি, এই দলিলটার পিছনে দুটি দেশ কাজ করছে। ফলে এই চুরির খবর রটে যেতেই এখন তারা একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। এটা আরও ভালোভাবে প্রমাণিত হল আজ সকালে। আমাকে চেংগেল যাওয়ার পথে কেউ অনুসরণ করেনি।

কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন যে, ওটা রাধাকৃষ্ণের মূর্তির মধ্যে লুকোনো আছে?

একজন মিলিটারি অফিসারের অফিসঘরে ঠাকুরের মূর্তি দেখে প্রথম দিনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। অবশ্য আপনি নিজেকে 'গোঁড়া ব্রাহ্মণ' বলে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর আরও একটা জিনিস লক্ষ করলাম, আপনি রাত্রে নিজের অফিসঘরেই শুয়ে থাকেন। অতএব দুয়ে-দুয়ে চার।

রজত সেন এতক্ষণ দুজনের কথোপকথন শুনছিল। অলক এবার তার দিকে তাকাল। বলল, তোর এখানে আসতে এত সময় লাগল কেন?

হেলিকপ্টারটা ডিব্রুগড়ে 'আনসারভিসেবল্' হয়ে গেছল।

এখন ওটার অবস্থা কী?

ফুল্লি সারভিসেবল্।

আগামীকাল রাত বারোটা থেকে তুই হেলিকপ্টারের মধ্যেই থাকবি। আমি যে-কোনও মুহূর্তে চলে আসব, এবং তৎক্ষণাৎ তোকে হেলিকপ্টার চালিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে। পারবি?

নিশ্চয়ই।

চ্যাটার্জি বললেন, আপনি কি কাল রাত্রেই এখান থেকে চলে যাবেন?

আমার প্ল্যানমতো সবকিছু যদি চলে, আশা করছি, কাল গভীর রাতেই আমি এখান থেকে চলে যেতে পারব।

দলিল? মাইক্রোফিল্ম?

ওগুলোও আমার সঙ্গে থাকবে।

আরও কিছুক্ষণ নানা ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার পর রজত চলে গেল অফিসারস্ মেসে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। অ্যান্টিরুম থেকে অলক আর চ্যাটার্জি যখন বাইরে এলেন, আকাশে তখন ঘন কালো মেঘ। সন্ধ্যা নামতে হয়তো কিছুক্ষণ দেরি ছিল, কিন্তু কালো মেঘের জন্য এখনই চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। মেঘের নীচে নেফার প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে কীসের যেন প্রতীক্ষা করছে। এতটুকু হাওয়া বইছে না। কালো মেঘের বুকে পাহাড়গুলো আরও কালো হয়ে যেন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল চ্যাটার্জির।

পাশেই দাঁড়িয়ে আছে অলক। পি-ক্যাপের আড়ালে তার মুখটা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না। তবুও বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতির মতোই অলকের মুখখানা কোনও এক অজানা রহস্যে থমথম করছে।

অলক দেখতে পেল, সারা ক্যাম্প জুড়ে অনেকগুলো মানুষ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। ফেন্সিং-এর যতখানি অংশ দেখা যাচ্ছে, এক-একজন জওয়ান দশফুট ছাড়া-ছাড়া রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ক্যাম্পের মধ্যে যেন নিঃশব্দে এক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে।

বারান্দা থেকে নীচে নেমে এল অলক।

ঘাসের জঙ্গল কেটে ছোট-ছোট পাথর ফেলে সুন্দর রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। তার ওপর চ্যাটার্জিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল অলক। পাশ দিয়ে একজন জওয়ান যাচ্ছিল। ওদেরকে দেখে স্যালুট দিল।

চ্যাটার্জি বললেন, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি খোঁজার কাজ বেশ ভালোভাবেই হচ্ছে দেখছি।

অলক বলল, হবে না। এর মধ্যে দেশপাণ্ডের নিজের ইন্টারেস্টও আছে যে।

একটু পরেই জেনারেটর চালানোর আওয়াজ ভেসে এল। সারা ক্যাম্প আলোকিত হয়ে উঠল। মাথার ওপর আকাশ গর্জে উঠল। তার সঙ্গে ঘন-ঘন বিদ্যুচ্চমক। বোঝা যাচ্ছে একটু পরেই প্রকৃতি তার তাণ্ডবলীলা শুরু করবে।

অকস্মাৎ একটা গুলির আওয়াজে চমকে উঠল অলক।

কে গুলি চালাল?

কান পেতে গুলির আওয়াজের উৎপত্তিস্থল অনুমান করার চেষ্টা করল অলক। চ্যাটার্জির কানেও শব্দটা গেছে। কিন্তু বুঝতে পারেননি, কোনদিক থেকে শব্দটা এল।

এর মধ্যেই একটা হইহল্লার আওয়াজ শোনা গেল।

মুহূর্তের মধ্যে চ্যাটার্জিকে অনুসরণ করতে বলে ঝড়ের বেগে অলক দৌড়ে গেল জওয়ানদের তাঁবুর পিছন দিকে।

ওপর থেকে তখন বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

জওয়ানদের তাঁবুর পিছনে, যেখানে ছোট একটা জঙ্গল আছে, এবং যার মধ্যে অনায়াসে দশ-বারোজন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে, সেখানে গিয়ে অলক দেখল এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

সবচেয়ে বড় যে-বিস্ময়, সেটা হল ঘাসের জঙ্গলে রঙিন পোশাক পরে মিলাই দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর একসঙ্গে দুটো জিনিস চোখে পড়ল। মেজর দেশপাণ্ডের বাঁ-হাতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, আর ডানহাতে উদ্যত পিস্তল। আর কিছুটা দূরে রক্তাক্ত দেহে একজন জওয়ানের মৃতদেহ পড়ে আছে। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আরও কিছু অফিসার ও জওয়ানের দল।

চ্যাটার্জি চেঁচিয়ে বললেন, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? মেজর দেশপাণ্ডে, হোয়াটস দ্যা ম্যাটার?

মেজর দেশপাণ্ডের কথায় জানা গেল যে, তিনি এই ইউনিটের সবাইকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি খোঁজার কাছে 'ডিটেল' করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যে খুঁজে পাবে তাকে একশো টাকা পুরস্কারও দেবেন বলেছিলেন।

যাই হোক, প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুজির পর মেজর দেশপাণ্ডে যখন হঠাৎই এখানে এসে পড়েছিলেন, তখন দেখলেন ওই জওয়ানটা—ওর নাম সিপাই রাম সিং—ও একটা গর্ত খুঁড়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটা বের করল। মেজর দেশপাণ্ডের কোনওরকম সন্দেহই নেই যে, রাম সিং-ই মূর্তিটা চুরি করেছিল।

মেজর দেশপাণ্ডে তখন রাম সিংয়ের কাছ থেকে মূর্তিটা চাইলেন। কিন্তু রাম সিং ওটা দিতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, মূর্তিটা নিয়ে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। পাছে দলিলটা আবার হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করতে হয়।

অতএব, ওই হল রাম সিংয়ের মৃতদেহ। আর এই হল কর্নেল চ্যাটার্জির রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। বলে মূর্তিটা চ্যাটার্জির হাতে তুলে দিলেন দেশপাণ্ডে।

চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি মূর্তিটাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে তলার ঢাকনাটা খুলে ফেললেন। তারপর একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে, আবার সেটা ভেতরে রেখে দিলেন।

ভালো, সবকিছু ঠিকই আছে। প্রায় স্বগতোক্তি করলেন চ্যাটার্জি। অলকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। ঘষা কাচের মতো দৃষ্টি নিয়ে অলক তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

চ্যাটার্জি এবার হীরার দিকে তাকালেন। ওদের ভাষায় জিগ্যেস করলেন, তুমি এখানে কেমন করে এলে?

হীরা আমতা-আমতা করে কী যেন বলল।

চ্যাটার্জি তখন দেশপাণ্ডেকে জিগ্যেস করলেন, ইজ ইট দ্যা ফ্যাক্ট?

দেশপাণ্ডে বললেন, হ্যাঁ স্যার। মেসের কাজে মাঝে-মাঝে দু-তিন ঘণ্টার জন্যে লোক্যাল মানুষদের এমপ্লয় করতে হয়। আজকে হীরাকে লাগানো হয়েছিল। বোধহয় চেঁচামেচি শুনে এখানে এসে থাকবে।

আই সি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন চ্যাটার্জি।

ওদিকে বৃষ্টি তখন আরও জোরে পড়তে শুরু করেছে।

চ্যাটার্জি দেশপাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মৃত্যুর ব্যাপারে একটা ফর্মাল ইনভেস্টিগেশান না হওয়া পর্যন্ত আপনি অফিসারস্ মেসে কনফাইন্ড হয়ে থাকবেন। আশা করি, এর জন্যে কিছু মনে করবেন না।

তারপর দুজন জওয়ানকে মৃতদেহটা পাহারা দেওয়ার আদেশ জানিয়ে কর্নেল চ্যাটার্জি মেসের দিকে পা বাড়ালেন। বুকের সঙ্গে সযত্নে জড়িয়ে ধরেছেন রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটি। বৃষ্টির জলে সকলেই ততক্ষণে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

অলক বলে উঠল, এক্সকিউজ মি, স্যার। আমি সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে জানাচ্ছি যে, আমি চাই না সন্ধ্যার পর কোনও 'সিভিলিয়ান' ক্যাম্পের মধ্যে থাকুক। কাজেই ওই মেয়েটাকে এসকর্ট দিয়ে ক্যাম্পের বাইরে দিয়ে আসবার আদেশ দিন। এর মধ্যে আপনি ইচ্ছে করলে মেজর দেশপাণ্ডের স্টেটমেন্টটা লিখিয়ে নিতে পারেন।

শুধু বক্তব্যটুকুই নয়, চ্যাটার্জি দেখলেন, অলকের চোখ দুটোও যেন কী বলতে চায়। ইঙ্গিত বুঝতে চ্যাটার্জির দেরি হল না।

সঙ্গে-সঙ্গে চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, ও-কে, ইউ গো এহেড উইথ ইয়োর ডিউটিজ। আমি ইতিমধ্যে ফর্ম্যাল ইনভেস্টিগেশানটা সেরে ফেলছি।

বলে দেশপাণ্ডেকে আহ্বান জানালেন, আসুন, মেজর দেশপাণ্ডে।

মাথা নীচু করে চ্যাটার্জিকে অনুসরণ করতে লাগলেন দেশপাণ্ডে।

অলক এবার পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল মিলাই-এর দিকে।

অনেক দূর থেকে ল্যাম্পপোস্টের একচিলতে আলো এসে পড়েছে মিলাই-এর মুখে। সেই আলোয় মিলাইকে দেখতে লাগল অলক। মিলাই-এর পিছনে ঘাসের জঙ্গল। তারও অনেক পিছনে সারি-সারি পাহাড়। বিদ্যুতের আলোয় মাঝে-মাঝে মিলাই পাহাড়ি পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আবার মুহূর্তের মধ্যে 'স্বপ্নময়ী' হয়ে উঠছে ঘন আঁধারের মাঝে ল্যাম্পপোস্টের রশ্মিতে।

মাথার ওপরে আকাশ ভেঙে পড়ছে। সেই অঝোরধারা বৃষ্টিতে স্পন্দনহীন চোখে, স্থিরচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছে মিলাই।

অলক হিন্দিতে বলল, চলো হে মেয়েটা, তোমাকে ক্যাম্পের বাইরে দিয়ে আসি।

এগারো ঃ বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি

ক্যাম্প ছাড়িয়ে কিছুটা আসার পর একটা বাঁক পার হতেই যখন ক্যাম্পটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না অলক। প্রচণ্ড আবেগে জড়িয়ে ধরল মিলাইকে। মিলাইও বুঝি এই শুভক্ষণের প্রত্যাশায় ছিল। বিরামহীন বৃষ্টির মাঝে, অন্ধকার প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে, অব্যক্ত

ভাষায় ওরা যেন কত কথা বলে নিল।

একসময় একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মিলাই বলল, এই, এখানে নয়। কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। চলো—ওদিকে যাই।

অলকের হাত ধরে টানতে-টানতে মিলাই এগিয়ে চলল গভীর জঙ্গলের দিকে। রাতের জঙ্গল এমনিতেই ভয়াবহ, তার ওপর এমন মুষলধারা বৃষ্টিতে সেটা আরও বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে।

পথ দেখা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র মিলাই-এর হাত ভরসা করে এগিয়ে চলছে অলক। মাঝে-মাঝে গাছের ডাল এসে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু ওরা দুটো মানুষ যেন আজ কোনও কিছুরই পরোয়া করে না। এই নগ্ন প্রকৃতির বুকে ওরা যেন দুজন আদিম মানব-মানবী।

একসময় থামল মিলাই। হাঁপাচ্ছে সে। মিলাই-এর হাত-ধরা অবস্থায় অলকও থামল। সে-ও হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে দুজনেই হেসে ফেলল একসঙ্গে। মাথার ওপর গাছের পাতার ফাঁকে বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি।

মিলাই বলল, আমি আর পারছি না গো। এখন ওদের সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি কিছু একটা করো।

অলক বলল, কিছু করার কথা বলবার জন্যেই আজ সকাল থেকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর বোধহয় বেশিদিন আমাদের এখানে থাকতে হবে না। তারপর তোমাকে নিয়ে সোজা চলে যাব বাড়িতে। ভাবো দেখি, কী মজাই না হবে! তোমার মা-বাবা হঠাৎ তোমাকে দেখে কীরকম অবাক হয়ে যাবেন! তারপর দেখবেন, মাথায় ঘোমটা দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরে মিলাই দাঁড়িয়ে আছে অলক ঘোষের পাশে।

মিলাই-এর চোখদুটো জলে ভরে এল।

হ্যাঁগো, এত সুখ কি আমার সইবে! হ্যাঁগো, আমার সব কথা জানার পরও কি তুমি আমাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারবে!

অলক সমবেদনার কণ্ঠে বলল, আবার তুমি ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করছ? আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না?

অলকের মুখে হাত-চাপা দিয়ে মিলাই বলল, ও-কথা বোলো না গো। তোমাকে বিশ্বাস করব না তো আর কাকে করব? তোমাকে আমি এত বিশ্বাস করি যে, সেই বিশ্বাসের ভারে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার শুধু মনে হয়—আমি বোধহয় আর নিজেকে সামলে রাখতে পারব না।

একটু থামল মিলাই। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, এবার বলো তোমার কথা। কবে এখান থেকে আমরা যাব?

অলক বলল, তার আগে তুমি বলো আজ হঠাৎ তুমি ক্যাম্পের মধ্যে গিয়েছিলে কেন?

আমাকে মেজর দেশপাণ্ডে ডেকে পাঠিয়েছিল। তুমি হয়তো জান না, তোমাদের ওই মেজর হল শত্রুপক্ষের লোক। আমাকে ও ডেকে পাঠিয়েছিল কী একটা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেবে বলে। সেই মূর্তিটা নিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে হবে ওই পাহাড়ে ওদের হেডকোয়ার্টারে—যেখানে তোমাকে ওরা বন্দি করে রেখেছিল।

অলক বলল, এবার তুমি আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো।

বলো।

কাল রাত আটটার সময় তুমি আমার সঙ্গে যাবে একটা জায়গায়—যেখানে দুজনে একটা

গুরুত্বপূর্ণ কাজ করব।

কাল রাত আটটায়? অসম্ভব।

কেন?

কাল সন্ধে থেকে লালা বাবার মৃতদেহ নিয়ে আমাদের উৎসব হবে। সেই উৎসবে আমাদের নাচতে হবে, গাইতে হবে। ওরা যদি আমাকে ওখানে না দেখতে পায়, তাহলে সন্দেহ করবে।

এই পর্যন্ত বলে মাথা নীচু করল মিলাই। তারপর আবার বলতে লাগল, তোমাকে একটা কথা এখনও বলিনি। লালা বাবাকে আমিই খুন করেছি।

চমকে উঠল অলক। কথাটা যেন সে বুঝতে পারল না।

কী বলছ তুমি? লালা বাবাকে তুমি খুন করেছ? কেন?

সেদিন রাত্রে যে আমিই তোমাকে শত্রুপুরী থেকে মুক্ত করেছি, তারপর পথ দেখিয়ে এখানে পৌঁছে দিয়েছি—সেটা লালা বাবা বুঝতে পেরেছিল। তাই বাধ্য হয়েই তাকে পথ থেকে সরাতে হয়েছে। নইলে এতদিনে তুমি, আমি দুজনেই শেষ হয়ে যেতাম ওদের গুলিতে। আমার জন্যে আমি ভাবি না। শুধু তোমার কথা ভেবেই—।

আর বলতে পারল না মিলাই। কেঁদে ফেলল।

সস্নেহে মিলাই-এর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে অলক বলল, ছিঃ, কেঁদো না। এখন শোনো আমার কথা। কাল রাত্রে যে তোমাদের উৎসব আছে, আর সেই উৎসবে তোমাকে যে নাচতে-গাইতে হবে, তা আমি জানি। তার ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমার বদলে তোমারই মতো দেখতে অন্য একটা মেয়ে কাল ওই উৎসবে নাচবে। তুমি আর আমি যাব ওই পাহাড়ে।

ওই পাহাড়ে? মানে হেডকোয়ার্টারে?

হ্যাঁ। তুমি শুধু আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। বাকি যা করার আমি করব।

বেশ, তাই হবে।

আমার কাজ যদি সফল হয়, তাহলে কাল রাত্রেই আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারব। ভালো কথা, কাল আসবার সময় মাইক্রো ফিল্মটা সঙ্গে নিয়ে আসবে, কেমন?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল মিলাই। তারপর অলকের হাতের ওপর হাত রেখে বসে রইল।

কতক্ষণ সময় কেটেছে কে জানে! একসময় উঠে দাঁড়াল মিলাই।

চলো, এবার ওঠা যাক। বেশি দেরি হলে ওরা আবার আমাকে খোঁজাখুঁজি করবে।

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল অলকের। সত্যিই তো, সারারাত মিলাইকে সঙ্গে নিয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকা যায় না। এখানকার পরিবেশ আলাদা। এখানে তাদের পরিচয় আলাদা। একজন হল জংলি আদিবাসী, আর-একজন হল সুশিক্ষিত সৈনিক। কাছাকাছি থেকেও এক হওয়া যাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়াল অলক। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে দুজনে বৃষ্টিতে ভিজেছে। এখনও তার বিরাম নেই। আকাশের অবস্থা আর বৃষ্টির বেগ দেখে মনে হচ্ছে, সারারাতেও বুঝি এ আর থামবে না। বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি।

দুজনে ধীর পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে চলল বড়রাস্তার দিকে। তারপর একজন চলে যাবে আদিবাসীদের কুঁড়েঘরে, আর-একজন যাবে মিলিটারি ছাউনির তাঁবুতে।

জঙ্গলের পাতায়-পাতায় শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি। দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পথ চলতে লাগল।

বারো ঃ নতুন ফন্দি

অলক যখন ক্যাম্পের মধ্যে পা দিল, ঠিক তখনই সব আলোগুলো নিভে গেল। রাত দশটা বেজেছে। এই মুহূর্তে অলকের এককাপ গরম চা খেতে ইচ্ছে করল।

নিজের তাঁবুতে এসে ভিজে জামাকাপড়গুলো খুলে শুকনো পাজামা পরে নিল। শীত-শীত করছে দেখে গায়ে একটা চাদর জড়াল। তারপর রেনকোটটা সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল কর্নেল চ্যাটার্জির অফিসের দিকে।

চ্যাটার্জি বোধহয় এতক্ষণ অলকের প্রতীক্ষা করছিলেন। অফিসঘরে ছোট একটা কেরোসিনের আলো জ্বলছে।

দরজা খুলতে-খুলতে চ্যাটার্জি বললেন, এত দেরি হল, কোথায় ছিলেন আপনি?

সব কাজ শেষ করে এলাম, স্যার।

অলককে বসতে বলে চ্যাটার্জি বললেন, আমি তো ভাবলাম আজও বুঝি আপনাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল।

মৃদু শব্দ করে হেসে উঠল অলক। তারপর বলল, মেজর দেশপাণ্ডের স্টেটমেন্ট নিয়েছেন?

হ্যাঁ।

নতুন কিছু বলেছে নাকি?

না। ওই একই কথা।

আমি চলে যাওয়ার পর দেশপাণ্ডে ক্যাম্পের বাইরে গিয়েছিল নাকি?

না। যতদূর জানি, ও নিজের তাঁবুতেই আছে।

রাধাকৃষ্ণের মূর্তি?

আমার কাছেই আছে; শুধু ওর মধ্যে থেকে দলিলটা বের করে নিয়েছি। ওটা চাই আপনার এখন?

না, এখনই চাই না। ওটা কাল সকালে কোনও অফিসারকে দিয়ে চেংগেলে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি যেন দলিলটা নিয়ে ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট লকারে জমা দিয়ে আসেন।

আপনি কি কাল রাত্রে সত্যিই চলে যাবেন?

ইচ্ছে করলে আমি এখনই চলে যেতে পারি। কিন্তু দুটো কারণে আমাকে আরও একটা দিন থেকে যেতে হচ্ছে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চ্যাটার্জি তাকালেন অলকের দিকে।

অলক বলে চলল, প্রথম কারণটা হল, আমি চাই না ওগুলো কেউ আবার ছিনতাই করে নিক আমার কাছ থেকে। আর দ্বিতীয় কারণ হল, ওই পাহাড়টাকে আমি ধ্বংস করে যেতে চাই। এর জন্যে আমার কিছু এক্সপ্লোসিভের প্রয়োজন হবে, স্যার। ডিনামাইট জাতীয় কিছু। এবং ওগুলো কাল সন্ধের মধ্যে চাই। ছোট এবং শক্তিশালী জিনিস চাই।

চ্যাটার্জি সম্মতি জানিয়ে বললেন, বেশ, পেয়ে যাবেন। আমি আর্মানেন্ট অফিসারকে প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখব।

আর আজ রাত্রে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। প্রয়োজন হলে গুলি চালাতেও দ্বিধা করবেন না।

আপনি কি কোনও বিপদ আশংকা করছেন?

মনে হচ্ছে, দলিলের জন্যে আজ আবার হামলা হতে পারে।

*

পরের দিন সকালে ইউনিট অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপটেন কুলকার্নির হাতে দলিলটা দিয়ে তাকে চেংগেল যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অলকের পরামর্শমতো কুলকার্নি একাই রওনা হল জিপ চালিয়ে।

আর এদিকে অলক ও রজত ব্যস্ত রইল হেলিকপ্টার নিয়ে। রজত আর-একবার পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছিল, যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক কাজ করছে কি না।

মেজর দেশপাণ্ডে একবার ঘুরে গেলেন।

রজতকে কাজ করতে দেখে জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার—কিছু খারাপ হয়েছে নাকি?

রজত কোনও কিছু বলার আগেই অলক জবাব দিল, হ্যাঁ। ফুয়েল প্রেশার ড্রপ করেছে। সেটাকেই মেরামত করবার চেষ্টা করছি দুজনে।

আরও কিছুক্ষণ পরে রজত বলল, মনে হচ্ছে, বেসে খবর পাঠাতে হবে। ওখান থেকে টেকনিশিয়ান আনাতে হবে।

দেশপাণ্ডে চলে গেলেন।

সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অলক মৃদু স্বরে বলল, কেউ জিগ্যেস করলে বলবি, হেলিকপ্টারটা আনসারভিসেবল্।

আরও আধঘণ্টা পরে দেখা গেল ঝড়ের বেগে একটা জিপ ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে। গেটে যারা প্রহরায় আছে, তাদেরকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে জিপটা দ্রুতবেগে এসে কঁ্যাচ করে ব্রেক কষে থেমে পড়ল একেবারে অলকের কাছে। বিস্মিত অলক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো জিপ থেকে নেমে দাঁড়াল ক্যাপটেন কুলকার্নি। দারুণ উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপছে।

কী ব্যাপার, কুলকার্নি? আপনাকে এত উত্তেজিত লাগছে কেন?

দারুণ ব্যাপার হয়ে গেছে, মেজর ঘোষ। এখান থেকে চেংগেল যাওয়ার পথে ছোট যে-ব্রিজটা আছে, সেটা কেউ ডিনামাইট চার্জ করে উড়িয়ে দিয়েছে। বাই রোড চেংগেল যাওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি কর্নেল চ্যাটার্জির একটা কাজে চেংগেল যাচ্ছিলাম। কিন্তু ব্রিজের মুখ থেকে আমাকে ফিরে আসতে হল।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল অলক। শত্রুপক্ষের তৎপরতায় মুগ্ধ হল। ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়ে চেংগেলের সঙ্গে এই ইউনিটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল তারা। উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। এখন একমাত্র সম্বল হেলিকপ্টার। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা আছে।

আজই সারদা আসবে চেংগেল থেকে এখানে হীরার ভূমিকায় অভিনয় করতে। কিন্তু...কেমন করে আসবে সে? গভীর চিন্তায় ডুবে গেল অলক। তবে কী তার সমস্ত প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে যাবে?

ক্যাপ্টেন কুলকার্নি বলল, যাই, ওসিকে খবরটা দিয়ে আসি।

বলে সশব্দে জিপ চালিয়ে চলে গেল।

অলক ধপ করে বসে পড়ল হেলিপ্যাডের উপরে।

কী উপায়? কী করা যায়?

মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলল সে। ব্যাপারটার মধ্যে প্রচুর রিস্ক আছে সত্য, কিন্তু এই মুহূর্তে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

রজতের দিতে তাকিয়ে অলক বলল, তোকে একটা কাজ করতে হবে রজত। কিন্তু কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়।

বল।

আজ সন্ধ্যার সময় তোকে চেংগেল যেতে হবে হেলিকপ্টার নিয়ে। ওখানে হসপিটাল থেকে সারদাকে তুলে নিয়ে আসবি। কেউ যেন জানতে না পারে। হেলিকপ্টার দেখে কেউ যদি কিছু জিগ্যেস করে বলবি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে তোকে ক্র্যাশল্যান্ড করতে হয়েছে। পারবি?

কেন পারব না! খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

তারপর শোন, সারদাকে এখানে এনে হেলিকপ্টারের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে বলবি। তারপর সুযোগ বুঝে যেন সে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। আমি আশেপাশেই থাকব।

তেরো ঃ দুরন্ত অভিযান

নেফার বুকে আরও একটা সন্ধ্যা নেমে এল।

আজকের সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার। ঘন নীল আকাশে এ এক নতুন নেফা। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র, তার নীচে ধ্যানগম্ভীর পাহাড়ের সারি। এমনকী কান পাতলে ঘাই নদীর কলকল ধ্বনিও শোনা যায়।

আজকের এই সুন্দরী নেফাকে দেখে অলক মুগ্ধ হয়ে গেল।

মনের মধ্যে হাজার চিন্তার ঝড় না থাকলে সে হয়তো আরও বেশি উপভোগ করতে পারত এই সৌন্দর্যকে। একদিকে আজকের বিপজ্জনক অভিযানের দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে মিলাই-এর সঙ্গে তার মধুর মিলনের সুখস্মৃতি—সব মিলিয়ে এক জোয়ার-ভাটা খেলে যাচ্ছে তার অন্তরে।

এইরকম নানা ভাবনায় তার মন যখন বিক্ষিপ্ত, তখন দেখল, রজতের হেলিকপ্টারখানা ক্রমশ নীচে নেমে আসছে।

যাক, রজত নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছে।

হেলিকপ্টারটা আস্তে-আস্তে মাটি স্পর্শ করল। ইঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হতে, প্রপেলারের ব্লেডগুলো থেমে যেতে, দ্রুতপদে অলক এগিয়ে গেল। ততক্ষণে ককপিট থেকে রজত নীচে নেমে পড়েছে।

অলক বলল, সারদা এসেছে?

রজত জবাব দিল, হ্যাঁ।

এদিকেও অল ক্লিয়ার। একটু আগেই কর্নেল চ্যাটার্জি আর মেজর দেশপাণ্ডে আদিবাসীদের আড্ডায় চলে গেছে। তুই চটপট খেয়ে নিয়ে এয়ারক্র্যাফটের মধ্যেই বসে থাক। আমি ঘণ্টাতিন-চারেকের মধ্যেই ফিরে আসব।

বলে অলক এগিয়ে গিয়ে প্যাসেঞ্জার কেবিনের দরজাটা খুলে ফেলল।

খুলেই চমকে উঠল।

কেবিনের মধ্যে মিলাই বসে আছে!

পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারল অলক। এ মিলাই নয়। হীরার ছদ্মবেশে সারদা।

অলক আহ্বান জানাল, নেমে এসো, সারদা।

সারদা নেমে এল। কে বলবে এই মেয়েটি চেংগেল হসপিটালের নার্স। এ যেন একটা জংলি মেয়ে। যারা হীরাকে চেনে, তারা বলবে, এ হল লালা বাবার মেয়ে হীরা।

অলক গাঢ়স্বরে বলল, তোমার এই সহযোগিতার জন্য অনেক ধন্যবাদ সারদা। আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। তাই এখনই তোমাকে 'গুডবাই' জানিয়ে রাখছি। আমার আজকের অভিযান

যদি সফল হয়, তাহলে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে তোমার নাম আমি রেকমেন্ড করব। আর ব্যক্তিগতভাবে সারাজীবন আমি তোমাকে ভুলতে পারব না। চলো, লেট আস গো।

সারদার হাত ধরে গেটের দিকে এগিয়ে চলল অলক।

যেতে-যেতে বলল, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে, তুমি সোজা এই ইউনিটে চাল আসবে। কর্নেল চ্যাটার্জি তোমার জন্যে গেটেই অপেক্ষা করবেন। পরে তিনিই তোমাকে চেংগেলে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।

গেট পার হয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে চলল দুজনে।

কানে এল আদিবাসীদের উৎসবের প্রাথমিক বাজনা।

অলক বলল, যাও—তাড়াতাড়ি গিয়ে উৎসবে যোগ দাও। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে। ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে পালিয়ে যেয়ো। কর্নেল চ্যাটার্জি তোমায় সাহায্য করবেন।

পাকা রাস্তা থেকে খাদের দিকে নেমে গেল অলক। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে ডাকল, মিলাই।

সন্ধ্যার কিছু পরে অলকের নির্দেশমতো মিলাই এখানে লুকিয়েছিল। অলক একটা ব্যাগও রেখে গিয়েছিল মিলাই-এর জিম্মায়।

অলকের ডাক শুনে মিলাই বের হয়ে এল গোপন আস্তানা থেকে। তারপর সামনে আর একটা হীরাকে দেখে নির্বাক-বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল।

দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

অলক বলল, এইবার তুমি যাও, সারদা। আমার নির্দেশ মনে রেখো।

সারদা তাকাল অলকের দিকে। অলকের মনে হল, সারদার দু-চোখে দু-ফোঁটা জল টলটল করছে। যে-কোনও মুহূর্তে তা অঝোরধারায় ঝরে পড়তে পারে।

অলক হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সারদা দৌড়ে চলে গেল উৎসবস্থলের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘাসের জঙ্গলে।

মনটা দুর্বল হয়ে পড়ছে অলকের। কঠিন কণ্ঠে নিজেকে শাসন করে অলক বলল, মাইক্রো ফিল্মটা আমাকে দাও, মিলাই।

ব্লাউজের মধ্যে থেকে একটা কৌটো বের করল মিলাই। তারপর সেটা তুলে দিল অলকের প্রসারিত হাতে।

ব্যাগটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে অলক বলল, চলো, এবার আমরা যাই।

পরমুহূর্তে সচল হয়ে উঠল দুজনের পা। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল একটা পাহাড়ের উদ্দেশে।

চড়াই-উৎরাই-এর পথ। কিন্তু পথ বলে বিশেষ কিছু নেই। ছোট-বড় পাথরের মাঝে পা ফেলতে-ফেলতে এগিয়ে চলল ওরা।

মাইলখানেক যাওয়ার পর ঘাই নদী এসে পথ আগলে দাঁড়াল। এখন আর আদিবাসীদের বাজনা শোনা যাচ্ছে না। ঘাই নদী পার হলেই তারা গন্তব্যস্থলে এসে পড়বে। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করতে লাগল অলকের।

কিন্তু থামলে চলবে না। এগিয়ে চলল অলক। মিলাই-এর হাত ধরে পাথরের ওপর পা দিয়ে-দিয়ে নদী পার হয়ে এল। এবার শুধু চড়াই।

সামনে মিলাই। পিছনে অলক। চঞ্চলা হরিণীর মতো মিলাই বেশ দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু একটানা চড়াই-এর পথে হাঁটতে-হাঁটতে বুকের ভেতরে বিরাট একটা চাপ অনুভব করছে অলক। তার ওপর কাঁধে তার বোঝা। আসন্ন সংঘাতের নেশায় তার মন আচ্ছন্ন। ওদিকে সারদার জন্যও সর্বক্ষণ চিন্তা হচ্ছে।

অবশেষে পথ একসময় শেষ হল। হাঁপাতে-হাঁপাতে যেখানে থামল অলক, সেখানেই বিরাট

পাহাড়ের দুর্ভেদ্য দেওয়াল।

ফিসফিস করে মিলাই বলল, আমরা এসে গেছি। খুব সাবধান কিন্তু।

পা টিপে-টিপে দেওয়ালের আরও কাছে এগিয়ে গেল তারা। রাত কত হবে এখন? দশটা? মিলিটারি ক্যাম্পটা কোথায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কোথাও এতটুকু আলো নেই। শুধু আকাশের অগুনতি তারার আলোয় চারিদিকে একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

দেওয়ালের খুব কাছে আসতে একটা ফাটল নজরে পড়ল। মিলাই-এর পিছন-পিছন সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল অলক। ঢুকেই আবার পিছিয়ে এল দুজনে। তারা সুড়ঙ্গ-পথে এসে পড়েছে। আর একজন প্রহরী বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে।

চকিতে অলকের সমস্ত স্নায়ু সজাগ হয়ে উঠল। তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মিলিটারি মানুষটা। ইঙ্গিতে মিলাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল অলক।

তারপর সহসা রিভলভারের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল প্রহরীর মাথায়। নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল সে। মিলাই এগিয়ে গেল। অলকের মুখে মৃদু হাসি। কাজের শুরুটা ভালোই হল।

আবার গলিপথ ধরে এগিয়ে চলল দুজনে। এখন লক্ষ্য আর্মস-অ্যামিউনেশনের ডিপো। মিলাই-এর নির্দেশমতো কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পড়ল সেই ঘরে। অলক উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরের মধ্যে কোনও মানুষ নেই। সারা ঘরটা নানারকম বন্দুক, রাইফেল, পিস্তলে ঠাসা। এছাড়াও গ্রেনেড, লাইট মেশিনগান আর স্টেন এম সি আছে। বারুদের বাক্স যে কত, তা বুঝি গুনে শেষ করা যাবে না।

মিলাইকে বাইরে দাঁড়াতে বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অলক। চটপট ব্যাগ থেকে একখানা টাইম-বম্ব বের করে বারুদের বাক্সের পিছনে রেখে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোতে যাবে, এমনসময় একটা পুরুষকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন বলছে, একী হীরা! তুমি এখানে?

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল অলকের। নিমেষে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল দরজার পিছনে। এইভাবে যে ধরা পড়তে হবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

ওদিকে হীরার কণ্ঠ শোনা গেল, একটু বসের কাছে এসেছিলাম। জরুরি দরকার আছে।

যাও। বস এখন তার বেডরুমে আছে।

অলক শুনতে পেল, পায়ের আওয়াজ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অলক।

তাকিয়ে দেখল, গলিপথে কেউ নেই।

আশ্চর্য! মিলাই কোথায় গেল?

গলিপথে এসে চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল অলক। একটু পরে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে মিলাইকে আসতে দেখা গেল।

কাছে আসতে অলক জিগ্যেস করল, কোথায় গেছলে?

ওই লোকটা আমাকে দেখে ফেলেছিল। তাই একটু ওদিকে চলে গিয়ে ওকে বোঝাচ্ছিলাম, সত্যিই আমি বসের কাছে যাচ্ছি। চল, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে।

নিঃশব্দে, যতটা সম্ভব দ্রুত ওরা পা চালাল। এবারে লক্ষ্য শত্রুপক্ষের কমিউনিকেশন সেন্টার।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওরা এসে পড়ল সঠিক জায়গায়।

দেখা গেল, একজন অপারেটর উত্তেজিতভাবে মুখে মাইক্রোফোন লাগিয়ে কার সাথে যেন কথা বলছে।

হ্যালো, হ্যালো, দিস ইজ আলফা কনট্রোল কলিং—হ্যালো—।

তারপর বোধহয় ভালোভাবে শোনবার জন্য রিসিভারের ভলিউম বাড়িয়ে দিল। ফলে বাইরে থেকে সবকিছু শুনতে পেল অলক আর মিলাই।

দূরের স্টেশন থেকে তখন কে যেন বলছে, হ্যালো, আলফা কনট্রোল, দিস ইজ এজেন্ট নাম্বার ফিফটি সেভেন। মেসেজ ফর ইউ। কনফারম রেডিনেস!

অপারেটর জবাব দিল, আলফা কনট্রোল ইজ রেডি টু অ্যাকসেপ্ট ইয়োর মেসেজ। প্লিজ, গো এহেড।

রিসিভারে শোনা গেল, আমি ফিফটি সেভেন বলছি। এখানে হীরার মতো দেখতে একটি মেয়ে নাচ-গান করছে। আমি শিওর যে-মেয়েটি হীরা নয়। হীরাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তার সঙ্গে-সঙ্গে মেজর অলক ঘোষও মিসিং। কোথায় গেছে বুঝতে পারছি না।

অপারেটর জিগ্যেস করল, ওদের হেলিকপ্টারের খবর কী?

উত্তর এল, হেলিকপ্টার আনসারভিসেবল্। সন্ধ্যার সময় একবার টেস্ট-ফ্লাইটে গিয়েছিল। কিন্তু পারফরমেন্স স্যাটিসফ্যাক্টরি নয়। ওদের পাইলট এখনও কাজ করে চলেছে।

তাহলে মেজর ঘোষ কোথায়? বাই রোড কোথাও যেতে পারবে না। কারণ ব্রিজ আমরা উড়িয়ে দিয়েছি। যাই হোক, আপনি মেজর ঘোষ আর হীরার সন্ধানে থাকুন। আমি বসকে খবর দিচ্ছি। কোনও কিছু খবর থাকলেই সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন।

রিসিভার স্তব্ধ হয়ে গেল। অলক আর মিলাই-এর চোখাচোখি হল। তাদের পলায়ন আর শত্রুপক্ষের কাছে গোপন নেই। অতএব আরও তাড়াতাড়ি তাদের কাজ শেষ করতে হবে।

একলাফে অলক ঘরে ঢুকে গেল। ঢোকার মুহূর্তে হয়তো একটু শব্দ হয়েছিল। অপারেটর ঘুরে তাকাল। কিন্তু কোনও কিছু বোঝার আগেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল অলক। তারপর দু-হাতে গলা টিপে ধরল।

অমানুষিক তেজে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল লোকটা। কিন্তু অলকের দেহে যেন আজ অসুরিক শক্তি ভর করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল লোকটার।

মিলাই চটপট ব্যাগ থেকে একটা টাইম-বম্ব বের করে ট্রান্সমিটারের পিছনে রেখে দিল।

মোটামুটি কাজ শেষ। অলকের লক্ষ্য ছিল এই দুটো জায়গাই। বারুদঘর আর কমিউনিকেশন সেন্টার। তারপরের কাজ বারুদঘর নিজেই করবে।

অলক বলল, চলো, এবার পালাই। হাতে আর মাত্র মিনিটদশেক সময় আছে। আর দশ মিনিট পরেই বম্বগুলো বার্স্ট করবে। তার মধ্যেই আমাদের এই গুহার বাইরে চলে যেতে হবে।

আবার চারখানা পা একযোগে চলতে শুরু করল। শর্টকাট করার উদ্দেশ্যে একটা গলি দিয়ে ঢুকতে যেতেই কতকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পিছন ফিরে চলার গতি বাড়িয়ে দিল মিলাই।

সময় কেটে চলেছে।

এক মিনিট—দু-মিনিট।

একী! এদিকেও যে পায়ের শব্দ। শুধু পায়ের শব্দ নয়, তার সঙ্গে গলার আওয়াজও শোনা গেল, কই—হীরা তো আমার কাছে আসেনি।

দু-পায়ে পাষাণভার নেমে এল অলকের। কোনদিকে যাবে সে? এদিকে দুজন মানুষরূপী শয়তান, ওদিকে নিজেরই হাতে রেখে আসা তীব্র মারণাস্ত্র। অথচ হাতে আর সময় নেই বললেও

চলে। অলক আর কোনওকিছু চিন্তা করারও সাহস পেল না।

এমনি মুহূর্তে, হঠাৎ মিলাই ওর রিভলভারখানা ছিনিয়ে নিল। তারপর তড়িৎগতিতে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে, অলকের দিকে রিভলভারখানা বাগিয়ে ধরে গর্জে উঠল, হ্যান্ডস আপ, মেজর ঘোষ। আজ আর তোমার নিস্তার নেই।

কী নিষ্ঠুর দৃষ্টি মিলাই-এর চোখে! দু-চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। আস্ত একটা শয়তানের মতো দেখাচ্ছে মিলাইকে। অলকের মাথাটা বনবন করে ঘুরে উঠল।

সময় বয়ে যায়।

তিন মিনিট, চার মিনিট!

চোদ্দো ঃ পলায়ন

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দুজন মানুষের আবির্ভাব হল তাদের সামনে।

একজন অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার, হীরা?

মিলাই জবাব দিল, দেখুন না বস। এই শয়তানটা লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের হেডকোয়ার্টারে এসেছিল।

বস ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু তুমি এই সময় এখানে কেন? তোমার তো এখন লালা বাবার সমাধিতে যাওয়ার কথা।

চটপট জবাব দিল মিলাই, মেজর দেশপাণ্ডে আমাকে এই পিস্তলটা দিয়ে আপনার কাছে পাঠালেন একটা জরুরি খবর দিয়ে।

কী খবর শুনি?

মেজর ঘোষ নাকি অনেক লোকজন নিয়ে আমাদের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করতে আসছে।

তাই নাকি?

বলে আরও কিছু এগিয়ে এল বস। সঙ্গে-সঙ্গে মিলাই-এর হাতের রিভলভার গর্জন করে উঠল দুবার। অলক দেখল, বস আর তার সঙ্গীর রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল পাথরের রাস্তার ওপর।

অলকের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল মিলাই, পালাও—।

সময় কেটে গেছে। পাঁচ মিনিট, ছ'মিনিট।

দুজনে দৌড়চ্ছে। কিন্তু এ-পথের যেন শেষ নেই। অথচ সময় বয়ে চলেছে তার নিজের গতিতে। সাত মিনিট, আট মিনিট।

ওই তো পাহাড়ের গায়ের সেই ফাটল।

দুজনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে।

আঃ! মুক্তি—ওই তো আকাশ দেখা যাচ্ছে। অনেক পরিচিত নেফার নির্মল আকাশ।

কিন্তু থামলে চলবে না। পিছনে যেন একটা পায়ের শব্দ!

আরও জোরে ছুটতে লাগল দুজনে। পাথরের ধাক্কায় বিষফোঁড়ার মতো ব্যথা পায়ে। গাছের ডালে যন্ত্রণাদায়ক খোঁচা লাগছে শরীরে।

ন'মিনিট, দশ মিনিট।

প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে যেন তালা লেগে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দিনের আলোর মতো আলোকিত হয়ে গেল জায়গাটা। মিলাইকে এক টান দিয়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল দুজনে।

শরীরের ওপর দু-চারখানা পাথরের টুকরো এসে পড়ল। শুয়ে-শুয়েই শুনতে লাগল অলক, একের-পর-এক বিস্ফোরণ হয়েই চলেছে পাহাড়ের অভ্যন্তরে।

সেই আওয়াজে বুকের নীচে মাটি কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

অভিযান সফল হয়েছে তার।

কতক্ষণ ওইভাবে শুয়েছিল কে জানে, এক সময় উঠে দাঁড়াল অলক। সস্নেহে ডাকল, ওঠো মিলাই, আর কোনও ভয় নেই। এবার ফেরা যাক।

মিলাই উঠে দাঁড়াল। ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে।

অলকের কাঁধে ভর দিয়ে উৎরাই-এর পথে নামতে লাগল সে। অলক একবার পিছন ফিরে তাকাল। গোটা পাহাড়টা যেন জ্বলছে। মাঝে-মাঝে তার মধ্য থেকে বড়-বড় আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছে আর হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঘাই নদীর পাড়ে এসে হাতে-মুখে জলের ঝাপটা দিল দুজনে। অনেকটা আরাম বোধ হচ্ছে।

হঠাৎ কীসের শব্দে উৎকর্ণ হয়ে উঠল মিলাই।

আবছা অন্ধকারে নদীর ওপারে যেন কিছু মানুষের আনাগোনা।

ফিসফিস করে মিলাই বলল, বোধহয় কর্নেল দেশপাণ্ডের নির্দেশে আদিবাসীরা আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। সাবধান অলক। ওদের বিষ মাখানো একটা তিরের আঘাতে জংলি হাতিগুলো পর্যন্ত লুটিয়ে পড়ে। চলো, আমরা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে এগোতে থাকি।

নদী আর পার হওয়া গেল না। তার পরিবর্তে কখনও শুয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল দুজনে।

একসময় মিলাই বলল, চলো, আমরা চট করে নদীটা পার হয়ে নিই। ওপারে জঙ্গলটা বেশি। পালাতে সুবিধা হবে।

পাথরের ওপর পা রেখে-রেখে যতখানি তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী পার হয়ে নিল দুজনে। কিন্তু ওই সময়েই বোধহয় আদিবাসীদের একটা দল তাদের দেখতে পেয়েছিল।

ওই যে পালাচ্ছে। কে যেন চিৎকার করে উঠল।

পালাও, অলক! আরও জোরে।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে কি জোরে দৌড়ানো যায়। এখানে পদে-পদে বাধা। কখনও পায়ের তলায় পাথরের ধাক্কা, কখনও বা কাদার মধ্যে পা বসে যায়। সামনের গাছগুলো তো প্রতি মুহূর্তে বিরাট এক প্রাচীর হয়ে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে।

দূর থেকে একটা তির ছুটে এল।

নাম-না-জানা কিছু পাখি নৈশ স্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করে চিৎকার করে উড়ে পালাল।

কিন্তু কতক্ষণ আর পারা যায়।

হোঁচট লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মিলাই। পরনের কাপড় তার ছিন্নভিন্ন। হাত ধরে তাকে টেনে তুলল অলক।

ওপরের আকাশ ক্রমে কালো হয়ে আসছে। তারাগুলো একটা-একটা করে নিভে যাচ্ছে। ঘন জঙ্গলে স্লেট পাথরের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

আর বেশি পথ বাকি নেই।

কিন্তু মিলাই-এর শরীর ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছে। তীক্ষ্ণ পাথরের আঘাতে দু-পায়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। অলক একপ্রকার তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ঝাঁকে-ঝাঁকে আরও কিছু তির এসে পড়ল। অর্থাৎ, আদিবাসীরা বেশি দূরে নেই। নইলে

জঙ্গলের মধ্যে তিরের গতি তাদের ছুঁতে পারত না।

অলক বলল, মিলাই, লক্ষ্মীটি, মনে জোর আনো। আমরা প্রায় এসে গেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ক্যাম্পে পৌঁছে যাব।

নতুন উৎসাহে মিলাই আবার চলতে লাগল।

কিছুটা দূরে অনেক আলোর মালা। আজ বোধহয় ক্যাম্পের জেনারেটর বন্ধ করা হয়নি। হয়তো ওদেরকে ফিরে আসতে না দেখে কর্নেল চ্যাটার্জিই এই ব্যবস্থা করেছেন।

আলোর রেখা দেখতে পেয়ে ওদের গতি যেন আপনাতেই বেড়ে গেল।

অবশেষে একসময় সমস্ত দুর্ভাবনার অবসান হল। ক্যাম্পের গেট আর মাত্র বিশ গজ দূরে। ওখান থেকেই দেখা যাচ্ছে আলোকিত ময়দানে তাদের হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে। আরও কাছে আসতে দেখা গেল কর্নেল চ্যাটার্জি, সারদা আর রজত দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের কাছে পৌঁছেই অলক চেঁচিয়ে উঠল রজতের উদ্দেশ্যে, রজত, ইঞ্জিন চালু করে দে।

রজত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করল। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের গর্জন শোনা গেল। মাথার ওপর প্রপেলার সবেগে ঘুরতে লাগল।

অলক ও মিলাইকে দেখে এগিয়ে এলেন কর্নেল চ্যাটার্জি। সঙ্গে সারদা।

অলক বলল, আমরা এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে চাই, স্যার। মনে হচ্ছে, আদিবাসীরা আমাদের ক্যাম্প আক্রমণ করতে পারে। আপনি মেজর দেশপাণ্ডেকে অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করুন।

বলে অলক দ্রুত এগিয়ে গেল হেলিকপ্টারের দিকে।

চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, দলিলখানা নেবেন না?

বাঁ-হাত দিয়ে মিলাইকে কাছে টেনে এনে অলক বলল, আপনার কাছে যেটা আছে, ওটা নকল। আসল দলিলটা আর মাইক্রো ফিল্ম আমার সঙ্গে আছে। ও-কে স্যার, গুডবাই। মেজর দেশপাণ্ডেকে কিন্তু বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে দেবেন না।

অলকের কথা শেষ হতে-না-হতে কতকগুলো ঘটনা চকিতে ঘটে গেল নিমেষের মধ্যে।

কর্নেল চ্যাটার্জি চিৎকার করে উঠলেন, সাবধান অলক—।

মিলাই একটা আর্ত চিৎকার করে অলককে সজোরে জড়িয়ে ধরল।

অলক কোনও কিছু বোঝবার আগেই, ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে দু-খানা গুলির শব্দ পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

অলক তাকিয়ে দেখল, একটু দূরে কর্নেল চ্যাটার্জির হাতে উদ্যত পিস্তল। বাঁ-দিকে প্রায় হেলিকপ্টারের গা-ঘেঁষে মেজর দেশপাণ্ডের দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পাশে একটা পিস্তল।

আরও দেখল, মিলাই-এর হাতের বাঁধন ক্রমশ আলগা হয়ে তার দেহ থেকে খসে পড়তে চাইছে।

গুলির আওয়াজে রজত ততক্ষণে ইঞ্জিন 'কাট অফ' করে দিয়েছে।

অলক তাড়াতাড়ি মিলাইকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় কারাবার চেষ্টা করল। দু-হাত তার লাল হয়ে উঠল মিলাই-এর তাজা রক্তে।

এক হাতে মিলাইকে ধরে রেখে, অন্য হাতটা চোখের সামনে এনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল অলক। দু-চোখের তারা যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। কপালের শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাবে। ঠোঁট দুটো এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর সকলকে চমকে দিয়ে, এক বুকফাটা চিৎকারে কেঁদে উঠল অলক, মিলাই—!

দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই আর্ত আহ্বান।

আর পটে-আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল মিলিটারি মানুষগুলো। সবাই যেন এক অজানা মন্ত্রবলে বোবা হয়ে গেছে।

উপসংহার

আর-এক সকালে নেফার আকাশে একটা হেলিকপ্টার ভেসে উঠল—যার পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রজত সেন। আর-একমাত্র যাত্রী মেজর অলক ঘোষ।

অনেক নীচে নেফাকে আজও এক মোহময়ী নারীর মতো দেখাচ্ছে। পাহাড়গুলো যেন একরাশ বোবা বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্যের আলোয় লম্বা সুতোর মতো রুপোলি ঘাই নদী পাহাড়গুলোকে বেষ্টন করে বয়ে চলেছে।

ওই ঘাই নদীর জলেই মিলাই-এর চিতাভস্ম বিসর্জন দিয়ে এসেছে অলক। মিলাই আজ সত্যিই হারিয়ে গেল।

চোখ দুটো জলে ভরে উঠল অলকের।

মিলাই, মিলাই, মিলাই।

আর তাকে খুঁজে বেড়াতে হবে না মিলাইকে। বারো বছরের অন্বেষণ আজ শেষ হয়ে গেল।

হেলিকপ্টারটা তখন আরও উঁচুতে উঠছে।

নেফার প্রকৃতি ক্রমে ছোট হয়ে আসছে অলকের চোখে। ছোট আর স্থির। স্থির আর আরও ছোট।

বিদায়, শরীর



অনিরুদ্ধ চৌধুরী

শ. সে. র. উ. ৩—৫৭

অসিত

অস্বীকার করি না। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মাথায় ছ'টা গুলি করে ওর মাথাটাকে আমি ঝাঁঝরা করে দিয়েছি। তবু বিশ্বাস করুন, আমি খুনি নই। কী, আমায় পাগল ভাবছেন? না, আমি পাগল নই, সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কেই আমি কাজটা করেছি, এবং এখনও আমার কোনও মানসিক বিকৃতি হয়নি। কী ভাবছেন? ভাবছেন, পাগল কি কখনও বুঝতে পারে যে, তার মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, দয়া করে আমার এ-বিবৃতিটা পড়ুন, তারপর বলুন, এ ছাড়া আমার কী-ই বা করবার ছিল।

সেই ভয়ঙ্কর আবির্ভাবের আগে আমি নিজেও এ-ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি। এখনও মাঝে-মাঝে ভাবি আমাকে কি ভ্রান্ত পথে চালিত করা হয়েছিল? নাকি সবাই যা বলে, তা-ই ঠিক, আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছি। কিন্তু অসিত আর বিনতা সম্পর্কে অনেকেই তো অনেকরকম অদ্ভুত কথা বলে। পুলিশও এখন পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর আবির্ভাবের একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। অবশ্য পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, কোনও ছাঁটাই চাকর সম্ভবত এই ভয়ঙ্কর রসিকতা করেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুলিশ কর্তৃপক্ষ বেশ ভালো করেই জানেন যে, তাঁদের দেওয়া ব্যাখ্যা নিতান্তই দুর্বল। আসলে যা ঘটেছে, তা আরও ভয়াবহ, আরও অবিশ্বাস্য।

যাক যা বলছিলাম। আমি খুনি নই। আমি অসিত মল্লিককে হত্যা করিনি, বরং বলা যেতে পারে, আমি বন্ধুকৃত্য করেছি। হতভাগ্য অসিতের যে শোচনীয় পরিণাম হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নিয়েছি, এবং এই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পৃথিবীকে আতঙ্কমুক্ত করেছি। এ-মহা-আতঙ্ককে যদি আমি ধ্বংস না করতাম, তবে সমস্ত মানবজাতির ওপর নেমে আসত এক অবর্ণনীয় পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা। আমাদের দৈনন্দিন চলার পথের কাছাকাছিই রয়েছে এক রহস্যে ঘেরা ছায়াময় জগৎ। সে-জগৎ থেকে মাঝে-মাঝে কোনও দুষ্টু আত্মা জানা আর অজানা জগতের মাঝখানের ক্ষীণ সীমারেখা ভেদ করে চলে আসে আমাদের জগতে। সেই দুষ্ট আত্মার অস্তিত্ব যদি কেউ উপলব্ধি করতে পারে, তবে তার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে এই নারকীয় শক্তিকে আঘাত করা। কোনওরকম করুণা না করে এই শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলা, ফলাফল তা সে যাই হোক না কেন।

অসিত মল্লিককে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি। বয়েসে আমি ওর বড়। অদ্ভুত ধী-শক্তি ছিল ওর। সাত-আট বছর বয়েস থেকেই ও কবিতা লিখতে শুরু করেছিল। আমাদের স্কুলের শিক্ষকদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না ওর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে। সম্ভবত ওর ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং নিঃসঙ্গতার ফলেই এমন এক মানসিকতা ওর মধ্যে দেখা দিয়েছিল, যা ওর বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল অসিত মল্লিক। স্বাস্থ্য ওর ভালো ছিল না। আর সেজন্যেই বোধ করি ও পেয়েছিল বাপ-মায়ের অন্ধ স্নেহ। তাঁরা ওকে মোটে কাছছাড়াই করতে চাইতেন না। ছেলেবেলায় দেখেছি, ও কোনওদিন একা-একা পার্কে বেড়াতে যেতে পারত না, সঙ্গে একজন ঝি অথবা চাকর থাকতই। সমবয়েসি অন্য ছেলেদের সঙ্গে ও খেলাধুলো করবার সুযোগও পেত না। নিঃসন্দেহে এর ফলে ওর অদ্ভুত স্বভাব-গোপন এক অন্তর্জীবনের যেন সৃষ্টি হয়েছিল, যে-জীবনে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে কল্পনা, উদ্দাম কল্পনা।

ছেলেবেলা থেকেই ও প্রচুর পড়াশুনা করত। ওর সাবলীল লেখা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল গভীরভাবে। কলেজ-জীবনে একসময় আমার ঝোঁক পড়েছিল অদ্ভুত শিল্পকলার দিকে। এ-ব্যাপারে আমি লক্ষ্য করেছিলাম অসিতের অপরিসীম আগ্রহ। চিত্রকলার আলো-ছায়ার মধ্যে বহু সময় কল্পজগতের আভাস পেয়ে আমরা দুজনেই মানসিক তৃপ্তি বোধ করতাম। এক পুরোনো মফঃস্বল শহরে আমরা থাকতাম, এই শহরের উপকণ্ঠের পুরোনো সব ভাঙা বাড়ি আর জঙ্গল আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করত। ধূসর, বিবর্ণ, পাণ্ডুর আর ভগ্নবস্তুর ওপর অসিতের ছিল যেন এক সহজাত

আকর্ষণ।

মফঃস্বল শহরের পড়া শেষ করে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকলাম। অসিত ঢুকল ইউনিভার্সিটিতে, এম.এ. পড়তে। বলা বাহুল্য, ওকে একলা ছাড়া হল না। কলকাতার বাসায় ওর মা ওর সঙ্গেই রইলেন, কাজেই দেশছাড়া হয়েও দুজনের মধ্যে যোগাযোগটা রয়েই গেল। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময়ই প্রকাশিত হল অসিতের প্রথম কবিতা সঙ্কলন 'দুঃস্বপ্ন এবং অন্যান্য কবিতা'। প্রচণ্ড আলোড়ন তুলল এই কবিতাগুচ্ছ। অনেকেই স্বাগত জানাল কবিমনের এই বল্গাহীন উদ্দাম কল্পনাকে, আবার কেউ-কেউ সমালোচনার ঝড় তুললেন এই বলে যে, এটা কোনও মহৎ সাহিত্যকর্ম নয়, এটা হচ্ছে এক ধূসর কবিমনের অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

ছেলেবেলা থেকে মা-বাপের অন্ধস্নেহের ছত্রছায়ায় মানুষ হওয়ার ফলে অসিতের চরিত্রে আত্মবিশ্বাস এবং বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। ছেলেবেলায় ও ছিল ভগ্নস্বাস্থ্য, কিন্তু বয়েসের সঙ্গে -সঙ্গে স্বাস্থ্য ভালো হলেও ওর সেই শিশুসুলভ নির্ভরশীলতা কিন্তু থেকেই গিয়েছিল। একা-একা কোনওদিন ও বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়নি। কোনও বিষয়ে স্বাধীনভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া অথবা দায়িত্ব নেওয়া ওর ধাতে ছিল না। জীবন-সংগ্রামের কঠিন বন্ধুর পথে ও যে সাফল্য লাভ করবে না তা বেশ বোঝা গিয়েছিল। কেন না, ওর যেরকম মানসিকতা তাতে ব্যাবসা বা চাকুরি কোনটা করাই ওর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য সেজন্যে চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল না, কেন না, ওর বাবার যা সম্পদ ছিল, তাতে তিন পুরুষ স্বচ্ছন্দে হেসে-খেলে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত। বয়েস বাড়লেও ওর চেহারায় বয়সোচিত ছাপ বিশেষ পড়ল না। ও সুকুমার এক কিশোরেই যেন রয়ে গেল। গোঁফ রেখে কিশোর মুখে বয়েসের ভাব ফুটিয়ে তুলবার একটা চেষ্টা অসিত করেছিল, কিন্তু ওর গোঁফ কোনওদিনই পুষ্ট হয়নি, রেখামাত্রই থেকে গিয়েছিল।

প্রত্যেকবার পুজোর ছুটিতে ও মা-বাবার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেত। এই সূত্রেই ভারতের নানা অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ওর একটা পরিচিতি ঘটে গিয়েছিল। পুরোনো ধ্বংসস্তূপ, পুরোনো সব অলৌকিক বিশ্বাস, এ-সবের দিকে কেমন এক অন্ধ আকর্ষণ ও অনুভব করত। ফিরে এসে ও এসব পুরোনো স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং বিশ্বাস নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করত। ইতিমধ্যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমাদের শহরে এক সদ্য প্রতিষ্ঠিত পলিটেকনিকের দায়িত্ব নিয়ে বসেছি। অসিতও এম.এ. পাশ করে কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে ফিরে এসেছে নিজের শহরে।

প্রতি সন্ধ্যায় অসিত আমাদের বাড়িতে আসত। আমি ও আমার স্ত্রী ওকে পরিবারের একজনের মতোই দেখতাম। প্রতি সন্ধ্যায় কলেজ থেকে ফিরে আমি ওর আগমনের প্রতীক্ষা করতাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হত না। কলিংবেল বেজে উঠত। আমার স্ত্রী দরজা খুলে দিতেন। অসিত আসত। তারপর শুরু হত আর-একদফা চা-পান। অসিতের কলিংবেল টিপবার এক বিশেষ পদ্ধতি ছিল। ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং করে তিনবার বেল বেজে উঠত, তারপর একটু থেমে আবার দু-বার ক্রিং-ক্রিং- করে বাজত। এটা যেন অসিতের একটা বিশেষ কোডসিগনালে পরিণত হয়েছিল। যেদিন বেল বাজত না, সেদিন আমরা দুজনে অসিতদের বাড়িতে যেতাম। অসিত তার পড়বার ঘরে আমাদের নিয়ে বসাত। দেখতাম ওর বই-ঠাসা আলমারির সারি। একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতেই বোধ করি বই-ভরা আলমারিগুলোর দিকে তাকাতাম। কেন না, বই পড়বার শখ আমারও খুব, কিন্তু কিনবার সামর্থ্য সীমিত।

কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছিলাম যে, অসিত ভারতের প্রাচীন তন্ত্র-মন্ত্রের দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছে। প্রায় বিলুপ্ত এবং আদিবাসীদের অলৌকিক বিশ্বাস নিয়ে ও প্রায়ই আমার সঙ্গে আলোচনার অবতারণা করত, আলোচনায় দেখতাম, এসব ব্যাপারে ওর জ্ঞান মোটেই ভাসা-ভাসা নয়, বরং বেশ গভীর।

অদ্ভুত! আশ্চর্য! অসিত উত্তেজিত ভাবেই মন্তব্য করত, তন্ত্রের পুরোনো পুঁথি আর আদিবাসীদের অলৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে কত যেসব রত্ন লুকানো রয়েছে তা আর তোমাকে কী বলব তপন। এসব লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করতে পারলে মানুষ জরা-মৃত্যু জয় করে অনন্ত শক্তির অধিকারী হবে। সেই অমিত শক্তিধর মানুষ বিশ্বজগৎকে চালাতে পারবে নিজের অঙ্গুলি হেলনে। অতীত তার মন্ত্র-তন্ত্রের মধ্যে যেসব সূত্র রেখে গেছে তার রহস্য ভেদ আমি করবই। কিন্তু মুশকিল কী জানো, আমাকে সব কাজই একা-একা করতে হচ্ছে। যেসব জিনিস নিজে বুঝতে পারছি না, তা বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কাউকে যদি পেতাম তবে অনেক তাড়াতাড়ি আমি এগোতে পারতাম। তুমি বোধহয় আন্দাজও করতে পারবে না যে, কত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আমি পড়েছি।

কিন্তু তুমি যে এত তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করছ, তা কি তোমার মা-বাবা জানেন?

না ওঁদের বলিনি। বললে মা হয়তো ভয় পেয়ে আমার পুরোনো পুঁথিপত্র কেনা বন্ধ করে দেবেন।

অসিতের বয়েস তখন পঁচিশ। ইতিমধ্যেই তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন ভারতের লুপ্ত তন্ত্র সম্পর্কে তার গবেষণামূলক কয়েকটি দামি প্রবন্ধ তখন দেশি এবং বিলেতি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ওর মা-বাবাও জানতে পেরেছেন, অসিতের গবেষণার বিষয়বস্তু কী। কিন্তু ওর পড়াশুনা সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমিক, ও তো আর সত্যিই তন্ত্রসাধনা করতে যাচ্ছে না, এ-কথা ভেবেই হয়তো ওঁরা অসিতের তান্ত্রিক গবেষণায় বাধা দেননি।

আমিই অসিতের একমাত্র বন্ধু ছিলাম। ওর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বুঝতে পারতাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরাতত্ত্ব এবং প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ওর কী সুগভীর জ্ঞান।

যেসব ব্যাপার নিয়ে ও মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইত না, সেসব ব্যাপারে ও আমার সঙ্গে পরামর্শ করত। অবশ্য ওর সব কথাই যে আমার কাছে খুলে বলত তা নয়, মূলত ও ছিল এক নিঃসঙ্গ চরিত্র। ওর বাবা ওর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ও বিয়ে করতে রাজি হয়নি। সমাজে মেলামেশা করার ব্যাপারেও ওর ছিল দারুণ অনিচ্ছা।

এমনি করেই অসিতের নির্জন, নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিক জীবন কেটে যেতে লাগল। পঁচিশের কোঠা ছাড়িয়ে ওর বয়েস তিরিশের কোঠায় এগিয়ে চলল।

বিনতা

অসিতের বয়েস যখন তিরিশ, তখন ওর পরিচয় হল বিনতা সোমের সঙ্গে। বিনতার বয়েস তখন তেইশ কি চব্বিশ। বিনতাও গবেষণা করছিল। ওর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, তন্ত্র এবং অধিবিদ্যা। আমার এক বন্ধুর ছোট বোন কলেজ জীবনে বিনতার সহপাঠিনী ছিল। কিন্তু বিনতাকে সে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলত। বিনতার ছিল নাতিদীর্ঘ দেহ, শ্যামলা রং আর ভাসা-ভাসা বড়-বড় চোখ। মোটের ওপর বিনতাকে বেশ সুন্দরীই বলা যেতে পারে। কিন্তু ওর ভাবে-ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে অনেক মেয়েই ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইত না। সম্ভবত ওকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা কারণ ছিল ওর পিতৃপরিচয়। বন্ধুর ছোট বোনের কাছ থেকে বিনতার যে বংশপরিচয় পেয়েছিলাম তা হচ্ছে মোটামুটি এরকম ঃ

বিনতার বাবা করালীকিঙ্কর সোম ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। সারাজীবন তিনি তন্ত্রসাহিত্য সম্পর্কে পড়াশুনা এবং গবেষণা করেছিলেন। বিভিন্ন তন্ত্রের তিনি টীকা রচনাও করেছিলেন এবং তাঁর টীকাগুলি সত্যিই মূল্যবান। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি ঝুঁকে পড়লেন তন্ত্রসাধনার দিকে। কতকগুলো নীচু দরের তন্ত্র সম্পর্কে তিনি এতদূর কৌতূহলী হলেন যে, বাস্তবে তিনি এগুলোর

কার্যকারিতা হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। এ-সময়ে তাঁর একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হল। এ-পুস্তিকায় তিনি বলতে চাইলেন ঃ

আমাদের জানা জগতের কাছাকাছিই রয়েছে এক রহস্য-ঘেরা ছায়াময় অতীন্দ্রিয় লোক। জ্ঞাত আর অজ্ঞাত লোকের মাঝখানের সীমারেখা খুব ক্ষীণ, স্থানে-স্থানে খুবই অস্পষ্ট, এই অতীন্দ্রিয় লোক অসীম শক্তির উৎস। বিশেষ তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়ব্যতীত লোকের মাঝখানের অস্পষ্ট কুহেলীময় আবরণকে ছিন্ন করে অলৌকিক শক্তিকে আমাদের জগতে নিয়ে আসা যায়। সঠিকভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হলে মন্ত্র-তরঙ্গের আঘাত এই কুয়াশাময় আবরণকে ছিন্ন করে। কিন্তু সাধককে সাবধান হতে হবে। দেখতে হবে তার অবাহনের ফলে কোনও দুষ্ট শক্তির আবির্ভাব যাতে না হয়।

শেষ জীবনে করালীকিঙ্কর তন্ত্রসাধনা নিয়ে মেতে উঠলেন। তাঁর সম্পর্কে নানারকম কাহিনি শোনা যেতে লাগল। তিনি নাকি অমাবস্যায় শ্মশানে গিয়ে তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গে প্রেত-চক্রে বসছেন, তিনি নাকি শবসাধনা করছেন, পিশাচ আবাহন করছেন ইত্যাদি। জানি না এসব গুজবের কতটা সত্যি। তবে শেষ জীবনে করালীকিঙ্কর যে মানুষের সংসর্গ এড়িয়ে চলতেন এটা সত্যি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রায় ষাট বছর বয়েস পর্যন্ত অকৃতদার থেকে করালীকিঙ্কর শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলেন। কাকে বিয়ে করলেন, কোথায় বিয়ে করলেন, তা কিন্তু কেউ জানে না। করালীকিঙ্করের স্ত্রীর মুখও কেউ কোনওদিন দেখেনি। পারতপক্ষে তিনি বাড়ির বাইরে আসতেন না। যদি বা কোনও কারণে আসতে হত, তবে একগলা ঘোমটায় তাঁর মুখ ঢাকা থাকত।

এই বিয়ের দু-বছর পরে বিনতার জন্ম। ওর বাবার বয়েস তখন বাষট্টি, মায়ের বয়েস? কেউ জানে না।

বন্ধুর বোনের কাছ থেকে বিনতা সম্পর্কেও অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম। উত্তরাধিকার সূত্রে বিনতাও নাকি কিছু অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েছিল। কলেজ জীবনে এসব ক্ষমতার কিছু-কিছু পরিচয়ও নাকি ও দিয়েছিল। বিনতা দাবি করত, ও নাকি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে ঝড় তুলতে পারে। এ-শক্তির প্রমাণও সে নাকি কয়েকবার দিয়েছিল। কিন্তু সহপাঠিনী মেয়েদের বিশ্বাস যে, আসলে ওর ঝড় সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু আসন্ন ঝড়ের সংকেত ও অনেক আগেই বুঝতে পারত এবং এ-সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করে সতীর্থদের কাছে বাহাদুরি নেওয়ার চেষ্টা করত। কুকুর-বিড়াল জাতীয় প্রাণীরা বিনতাকে ভীষণ অপচ্ছন্দ করত। বিশেষ ভঙ্গিমায় ডানহাতের আঙুল নাড়িয়ে ও কুকুর বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের ভয় পাইয়ে দিতে পারত। চোখ ঘুরিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে এমন অনেক ভঙ্গি ও করত, যাতে করে ওর কাছাকাছি যারা থাকত, তারা ভয় পেয়ে যেত। অন্যরা ভয় পেলে ও কেমন এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করত। অনেক সময় তন্ত্র, যাদুবিদ্যা, তুক্‌তাক্‌ ইত্যাদি নিয়ে ও এমন সব কথা বলত যা ওর মতো বয়েসের একটি মেয়ের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়।

সবচেয়ে অস্বাভাবিক ছিল ওর অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা। যারা ওকে এড়িয়ে যেতে চাইত, তারাও ওর কাছাকাছি এলে ওর ব্যক্তিত্বের দ্বারা কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। সম্মোহন বিদ্যা ও বেশ ভালো করেই জানত। অদ্ভুত ভঙ্গিতে কোনও সহপাঠিনীর দিকে তাকিয়ে ও কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সম্মোহিত করে ফেলতে পারত। সম্মোহিতার মনে তখন এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হত। বন্ধুর বোন সুতপার ভাষাতেই বলি ব্যাপারটা।

জানেন তপনদা, বিনতা একবার আমাকে সম্মোহিত করেছিল। আমি যে খুব ইচ্ছুক ছিলাম তা নয়, তবে ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার যে একটা কৌতুহল হয়েছিল, তা অস্বীকার করব না। ওই সময় একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল আমার, মনে হয়েছিল আমার ব্যক্তিত্বের বুঝি বদল হয়ে গেছে। আমার আত্মা যেন বিনতার দেহ আশ্রয় করে তাকিয়ে আছে আমার সত্যিকারের

দেহের দিকে। আমার আবিষ্ট দেহের দু-চোখে অদ্ভুত দীপ্তি, আমার দেহের চোখ দুটি যেন আমার সম্পূর্ণ অজানা, সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও যেন আমার চোখ নয়, ও-চোখের মধ্য দিয়ে আমি যেন পেলাম বিনতার দৃষ্টির ইশারা।

দেহ, চৈতন্য, আত্মা এসব নিয়ে বিনতা অনেক বড়-বড় কথা বলত। এসব কথার অর্থ আমরা ঠিক বুঝতে পারতাম না, তপনদা। চৈতন্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে ও বলত যে, চৈতন্য দেহের অধীন নয়, দেহ-বন্ধনের বাইরেও বিদেহী চৈতন্যের অস্তিত্ব সম্ভব। দেহের সীমাবদ্ধতার মধ্যে চৈতন্যের শক্তি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। কিন্তু দেহ-মুক্ত চৈতন্য অমিত শক্তিধর, অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

বিনতা মাঝে-মাঝে রেগে যেত ও মেয়ে বলে, কেন না ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুরুষের মস্তিষ্কে এমন কিছু উপাদান আছে যার ফলে পুরুষ-মস্তিষ্ক অনেক বেশি পরিমাণে অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয় শক্তি ধারণ করতে সক্ষম, এ-কথা ও অনেকবারই বলেছে যে, ও যদি ছেলে হত, তবে অজ্ঞাত অলৌকিক শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তারে ও কেবল বাবার সমানই হত না, বাবাকেও ছাড়িয়ে যেত। ও যে ছেলে হয়ে জন্মায়নি, এটা ওর মহা দুর্ভাগ্য।

অসিত-বিনতা সংবাদ

অসিতের সঙ্গে বিনতার প্রথম দেখা হয়েছিল এক সেমিনারে। এখান অসিত তন্ত্রের ওপর তার সদ্য-লিখিত এক প্রবন্ধ পাঠ করেছিল। এসব ক্ষেত্রে প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে শ্রোতারা সাধারণত প্রবন্ধকারকে তার বক্তব্যের ওপর নানারকম প্রশ্ন করে, অসিতের পাঠ শেষ হতে শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল। কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্নই ছিল নিতান্ত মামুলি, নিছক কৌতূহল সঞ্জাত। সবার শেষে প্রশ্ন করতে উঠল একটি মেয়ে। মেয়েটির প্রশ্নের ধরন থেকেই অসিত বুঝতে পারল, তন্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে এরকম প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। অসিত তার জ্ঞান-বুদ্ধি মতো জবাব দিল ঠিকই, কিন্তু অনেক জবাব ওর নিজেরই মনঃপূত হল না। নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই বুঝি ও প্রথম সচেতন হল।

সভার শেষে মেয়েটি নিজেই এসে অসিতের সঙ্গে পরিচিত হল। তন্ত্র সম্পর্কে মেয়েটির জ্ঞানের গভীরতায় অসিত তখন মুগ্ধ। ও ঠিক করল মেয়েটির সঙ্গে আলোচনা করে নিজের সদ্য লিখিত প্রবন্ধে ও কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত করবে।

পরদিন সন্ধ্যায় অসিত আমার বাড়িতে এল। সে-সন্ধ্যায় অসিতের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল বিনতা প্রসঙ্গ।

জানো তপন, অদ্ভুত এই বিনতা সোম। কতই বা ওর বয়েস, কিন্তু এ-বয়েসেই কী অসাধারণ পাণ্ডিত্য তন্ত্র সম্বন্ধে! ওর সহায়তা যদি পাই, তবে তন্ত্র সম্পর্কে এক যুগান্তকারী গবেষণা করতে পারব। শুধু গবেষণাই বা কেন, তন্ত্রসাধন পদ্ধতি অনুসরণ করে অলৌকিক অতীন্দ্রিয় শক্তির ওপর প্রভাব পর্যন্ত বিস্তার করতে পারব। আর তা ছাড়া শুধু কি তন্ত্র? বিনতার বাবা করালীকিঙ্কর সোম অ্যালকেমি নিয়েও অনেক পড়াশুনা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে অ্যালকেমির অনেক পুরোনো পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। আজ সকালেই বিনতার সঙ্গে দেখা করেছি। তন্ত্র এবং অ্যালকেমির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা দুজনে মিলে একটা পেপার তৈরি করব বলে ঠিক হয়েছে।

বিনতাকে তখন পর্যন্ত আমি চোখে দেখিনি। ওর সম্পর্কে দু-একটা ভাসা-ভাসা মন্তব্য আমার কানে এসেছিল। আমি জানতাম ওর পিতৃপরিচয়। বিনতা সম্পর্কে অসিতের উচ্ছ্বাসে একটু দুঃখই পেলাম। কিন্তু অসিতের উৎসাহে বাধা দিলাম না, কারণ জানতাম, ওর উচ্ছ্বাসে বাধা দিলে সেটা

না কমে আরও বেড়েই যাবে।

এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে অসিতের কাছ থেকে বিনতার প্রশংসা ছাড়া কিছুই শুনলাম না। বুঝলাম, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। বিনতা নামক মেয়ের প্রবল ব্যক্তিত্বওকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিনতা সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেব বলে ঠিক করলাম। আর এই সূত্রেই বন্ধুর বোনের কাছ থেকে বিনতা এবং করালীকিঙ্কর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম।

মাসখানেক কেটে গেল। এক সন্ধ্যায় অসিত বিনতাকে নিয়ে এল আমাদের বাড়িতে। বুঝলাম, অসিত কেবল নিজেই বিনতার দিকে আকৃষ্ট হয়নি, বিনতাও ওর প্রতি আকৃষ্ট। যতক্ষণ ওরা আমার বাড়িতে ছিল, ততক্ষণ বিনতা প্রায়ই চোরাদৃষ্টিতে অসিতের দিকে তাকাচ্ছিল, অসিতের দিক থেকেও চোরা কটাক্ষের বিরাম ছিল না। ওরা এত ঘনিষ্ঠ হয়েছে যে, এই ঘনিষ্ঠতার জট এখন খোলার বাইরে চলে গেছে।

কয়েকদিন পরে অসিতের বাবা অক্ষয় মল্লিক মশাই আমার বাড়িতে এলেন। মল্লিক মশাইকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল, পারস্পরিক কুশল সংবাদ এবং এ-কথা ও-কথায় কিছু সময় কেটে গেল। চা-পান শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। বুঝলাম, মল্লিক মশাই আমাকে কিছু বলতে চান এবং যা বলতে চান তা তিনি মনের মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছেন। কী নিয়ে বলতে চান তা-ও আমি আন্দাজ করতে পারছিলাম, উনি নিশ্চয়ই অসিত-বিনতা প্রসঙ্গেই আমাকে কিছু বলবেন।

আমার আন্দাজ ঠিক হল। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে মল্লিক মশাই বললেন, অসিতের কোনও খবর রাখ?

কেন রাখব না, সে তো মাঝে-মাঝেই আমার এখানে আসে।

মাঝে-মাঝে, তার মানে আগের মতো আর রোজ ও তোমার বাড়িতে আসে না।

রোজ, মানে না, মানে আজকাল ওর এখানে আসাটা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

কমে গেছে, কিন্তু ও তো রোজই বিকেলে বেরিয়ে পড়ে, মানে ও অন্য কোথাও যায়। কোথায় যায় বলতে পার, তপন?

কোথায় যে অসিত যায় তা ঠিকই বুঝেছিলাম। কিন্তু মল্লিক মশাইয়ের মতো প্রবীণ লোকের সঙ্গে এ-ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না।

আমার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে মল্লিক মশাই এবার সোজাসুজি জিগ্যেস করলেন, বিনতা সোমের নাম শুনেছ?

শুনেছি।

দেখেছ মেয়েটিকে?

দেখেছি।

কোথায়?

এখানেই।

এখানে?

হ্যাঁ, অসিত একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

অসিত সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, একটু আত্মগতভাবেই মল্লিক মশাই বললেন।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মল্লিক মশাই। তারপর নিজেই নীরবতা ভেঙে বললেন, অসিতের সঙ্গে করালী সোমের মেয়ের নাম জড়িয়ে শহরে অনেক কথা রটতে শুরু করেছে। আমি চাই না অসিত ওর সঙ্গে মেলামেশা করে। অসিতকে আমি মেলামেশা বন্ধ করতে বলেছিলাম। কিন্তু ও চায় বিনতাকে বিয়ে করতে। আমি ছেলেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি যে, এ-বিয়েতে আমার মোটেই সম্মতি নেই। খবর পেলাম, অসিত আর বিনতা নাকি একটা বাসা খুঁজছে। তার মানে, বিয়ে ওরা করবেই। অসিত আমার একমাত্র সন্তান। তপন, বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো, তুমি

কি বুঝিয়ে-সুজিয়ে আমার অসিতকে ওই ডাইনির খপ্পর থেকে বের করে আনতে পারো না?

শেষ দিকে মল্লিক মশাইয়ের গলার স্বরটা করুণ হয়ে এল।

এখন বোধহয় আর তা সম্ভব নয়।

তবু যদি একটু বুঝিয়ে দেখতে...।

শুধু তো দুর্বলমনা অসিতকে বোঝালে হবে না। এখন এক শক্ত মেয়ের পালায় পড়েছে অসিত। সেই মেয়েকেও বোঝাতে হবে। তবে আমার ধারণা সে-মেয়েকেও বোঝানো যাবে না। সে-মেয়ে অসিতকে আর ছাড়বে না।

কিন্তু আমার অসিত যে মনের দিক থেকে একেবারে ছেলেমানুষ।

হ্যাঁ, চিরশিশু অসিত এতদিন শুধু বাবার ওপর নির্ভর করেছে, এখন সে নির্ভর করতে শিখেছে বিনতার ওপর। আগেই আপনাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল, এখন আর এ-ব্যাপারে কিছু করা যাবে বলে আমার মনে হয় না।

আমার ধারণা সত্যি হল। একমাসের মধ্যেই অসিত আর বিনতার বিয়ে হয়ে গেল। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। বিয়ের পর ওরা দার্জিলিং-সিকিম সীমান্তে চলে গেল হনিমুনে। ওই অঞ্চলে যাওয়ার অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। ওদের ইচ্ছে ছিল ওদিককার বৌদ্ধ গোম্ফাগুলিতে যে সমস্ত বৌদ্ধ-তান্ত্রিক পুঁথিপত্র আছে, সুযোগ মিললে তা-ও দেখে আসা।

আমার পরামর্শে মল্লিক মশাই বিয়েতে বাধা দেননি। হনিমুনে যাওয়ার আগে বিনতা নিজেই আমাদের শহরের শেষ প্রান্তে নদীর ধারে একখানা পুরোনো বাগানবাড়ি ভাড়া করল। পরলোকগত করালীকিঙ্করের পৈত্রিক বাড়ি ছিল আমাদের শহর থেকে দশ-বারো মাইল দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, যে-পাহাড় থেকে আমাদের শহরের নদীটা বেড়িয়ে এসেছে।

হনিমুন থেকে ফিরে এসে অসিত আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। মনে হল, ওর চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। ওর ঠোঁটের ওপরকার সেই ক্ষীণ গোঁফের রেখার অস্তিত্ব আর নেই। বোধ করি, বিনতার পরামর্শেই অসিত তার গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পরিবর্তনটা এখানেই নয়, ওকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল আর এই গাম্ভীর্যের পিছনে যেন ছিল এক বিষণ্ণ ব্যাথাতুর ভাব। সদ্য হনিমুন প্রত্যাগত নববিবাহিতের পক্ষে এ যেন একটু অস্বাভাবিক। অসিত যেন তার দীর্ঘস্থায়ী কৈশোর পার হয়ে হঠাৎ পরিণত দেহ-মনের এক মানুষে পরিণত হয়েছে। বুঝতে পারলাম না ওর এই পরিবর্তনটা আমার ভালো লেগেছে কিনা। অসিত একলাই এসেছিল আমার বাড়িতে, কেননা বিনতা নিজেই নাকি খুব ব্যস্ত। করালীকিঙ্করের পুরো লাইব্রেরিটাই সে নিয়ে এসেছে ওদের নতুন বাসায়। সেই লাইব্রেরি সাজানো আর নতুন ঘরকন্না সাজাতেই এখন ব্যস্ত বিনতা।

হনিমুন থেকে ফিরে প্রথমে শ্বশুরবাড়িতেই উঠেছিলাম। সপ্তাহখানেক ছিলাম ওখানে। মনে হল, অসিতের গলার স্বরটা যেন একটু কেঁপে উঠল—এ সাতদিনে অনেক নতুন জিনিস শিখেছি। বিনতার গাইডেন্সে আমার প্রগ্রেস বেশ ভালোই হচ্ছে। তন্ত্র আর অ্যালকেমি থেকে পাওয়া কতগুলো নতুন সূত্রের ওপর নির্ভর করে বিনতা একটু দুঃসাহসী এবং যুগান্তকারী পরীক্ষা করতে চাইছে। ওর স্থির বিশ্বাস এ-পরীক্ষায় ও সফলতা লাভ করবেই।

কী পরীক্ষা? আমি জিগ্যেস করলাম।

মানে, পরীক্ষার ব্যাপারটা আপাতত বিনতা গোপন রাখতে চাইছে। তপন, ভাই—কিছু মনে কোরো না, পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে এ নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে বিনতা বারণ করেছে। একটু অপ্রস্তুত ভাবেই অসিত কথাগুলো বলল।

না-না, ঠিক আছে, এ নিয়ে তুমি এত কিন্তু করছ কেন, মনে-মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেও আমি বললাম, থাক ও-কথা, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তো গবেষণা করবে, নতুন সংসারে কাজকর্ম করবার লোকজন পেয়েছ তো?

হ্যাঁ, বিনতাই ওর বাপের বাড়ির পুরোনো ঝি-চাকরদের এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এরা তিনজনেই রহস্যময়, একজন এক বুড়ো, সে বাজার-টাজার করে আর দ্বিতীয় জন হচ্ছে তার স্ত্রী এক বুড়ি, সে করে রান্না-বান্না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব কম কথা বলে, এদের গতিবিধিও নিঃশব্দ। তৃতীয়টি হচ্ছে আরও অদ্ভুত। এটি হচ্ছে একটি আদিবাসী কালো মেয়ে। মেয়েটি নাকি বিনতার গবেষণায় সাহায্য করে। কী সাহায্য করে বলতে পারি না, তবে মেয়েটির আকৃতিটাই অদ্ভুত। মাথাটা বিরাট লম্বা, হাত-পাগুলো কাঠি-কাঠি। দুটো বড়-বড় ছুঁচলো শ্ব-দন্ত। হঠাৎ দেখলে কেমন আঁতকে উঠতে হয়। আমি তো প্রথমে ওকে দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আর সব চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার কী জানো, মেয়েটার গা থেকে সবসময়ই পচা মাছের মতো বিকট দুর্গন্ধ বেরোয়।

পরিবর্তন

দেখতে-দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। আমার বাড়িতে অসিতের আগমন তখন আর প্রাত্যহিক নয়। ওর আসা অনেক কমে গেছে, মাঝে-মাঝে সপ্তাহ দুয়ের ব্যবধানে সেই পরিচিত কলিংবেল-এর আওয়াজ পেতাম। সেই প্রথমে তিনবার ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং, তারপর একটু থেমে আবার দু-বার ক্রিং-ক্রিং। আমিও মাঝে-মাঝে ওদের বাগানবাড়িতে যেতাম। এ-আসা-যাওয়াটা নেহাত সৌজন্যমূলক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। ও যখন আসত, বা আমি যখন যেতাম, তখন আমার আর অসিতের মধ্যে ওদের অতীন্দ্রিয় গবেষণা নিয়ে কোনও কথা হত না। অসিত ওই প্রসঙ্গ এড়িয়েই যেতে চাইত। এতে আমি যে একটু মনঃক্ষুণ্ণ না হতাম তা নয়, কেননা অসিত একদা একমাত্র আমার সঙ্গেই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করত। এর মানে কী? এই যে আগে আমি ওর যে বিশ্বাসের পাত্র ছিলাম, এখন আর তা নই? বিনতা সম্পর্কেও ও কোনও কথা বলতে চাইত না। ওর বাড়িতে গিয়ে বিনতাকে কয়েকবার দেখেছি, বিয়ের পর ওর বয়েস যেন অনেক বেড়ে গিয়েছে। অসিত আর বিনতাকে একসঙ্গে দেখলে দুজনের মধ্যে বিনতারই বয়েস বেশি বলে এখন মনে হয়। ওর দৃঢ় ভাবভঙ্গি, মুখের কঠিন ভাব এবং বাইরের লোকের সঙ্গে নিরুত্তাপ কথাবার্তা কাউকেই ওর সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক করে না। আমার স্ত্রী ওর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অসিতের বাড়িতে আমাদের যাওয়া ক্রমে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আর এজন্য, অসিত এক অসতর্ক মুহূর্তে বলেই ফেলল, বিনতা নাকি মনে-মনে খুশিই হয়েছিল। কেন না বাইরের লোক ও-বাড়িতে যাক, এটা বিনতা আদপেই চাইত না।

মাঝে-মাঝে ওরা দুজনে দূরপাল্লায় পাড়ি দিত। অসিত বলত, এসব যাত্রার উদ্দেশ্য ওদের গবেষণার উপাদান সংগ্রহ।

ওদের বিয়ের বছরখানেক পর থেকেই অসিতের পরিবর্তন নিয়ে লোকে নানা কথা বলতে শুরু করেছিল। অসিত যেন আর আগেকার মতো নেই, ও যেন অনেক পালটে গেছে। এসব ছিল নিছক কথার কথা, কেন না পরিবর্তন যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে, তা হচ্ছে একান্তভাবেই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন। কিন্তু এর মধ্যেও কতকগুলো নজরে পড়বার মতো ব্যাপার ছিল। অনেক সময় অসিত এমন ভাবভঙ্গি বা কাজ করত, যা ঠিক ওর পরিচিত প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেত না। যেমন প্রায়ই দেখা যেত, অসিত বিনতার টু-সিটার গাড়িখানা হাইওয়ে দিয়ে বেগে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন নিপুণ ড্রাইভারের মতোই ওর ভাবভঙ্গি। কিন্তু অতীতের অসিত মোটেই গাড়ি চালাতে পারত না। অসিত যে কোনওদিন গাড়ি চালাতে পারবে এটা ছিল আমাদের কল্পনারও বাইরে। পরিবর্তন তাহলে সত্যিই হয়েছে, আর এটা কেবল নিছক মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনই নয়, এ-পরিবর্তনটা দেখা যেত অসিত আর বিনতা যখন দূরপাল্লায় পাড়ি দিয়ে ফিরত, অথবা পাড়ি দেওয়ার জন্য তৈরি হত।

অসিতের এই পরিবর্তনটা আমার ভালো লাগেনি। লোকে বলাবলি করত, মাঝে-মাঝে ওর মুখভঙ্গি হাবভাব নাকি বিনতার মতো হয়ে যেত। কেউ-কেউ আবার আরও অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলত। তারা বলত যে, উদ্দীপ্ত অবস্থায় ওর চেহারায় এবং আচরণে পরলোকগত করালীকিঙ্কর সোমের ভাবভঙ্গিই যেন ফুটে উঠত।

একদিন একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। ন'টার সময় যখন পলিটেকনিকে বেরুচ্ছি, তখন দেখলাম, অসিতের গাড়িখানা বেগে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভারের আসনে দেখলাম তেজোদৃপ্ত অসিতকে। নিপুণ হাতে ও স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে। এ অসিত যেন আমার অপরিচিত। সন্ধ্যায় পলিটেকনিক থেকে ফিরবার সময় দেখলাম, অসিতের গাড়ি ফিরছে। পিছনের সিটে নিস্তেজ অবসন্ন দেহে বসে আছে অসিত আর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসছে কোনও ভাড়া করা ড্রাইভার অথবা মেকানিক। এ আমার পরিচিত অসিত।

বিবাহিত জীবনের তৃতীয় বৎসরে অসিত আমার কাছে তার আশঙ্কার আর অসন্তোষের কথা বলতে শুরু করল। প্রথম-প্রথম ও অবশ্য খোলাখুলিভাবে কোনও কথা বলত না। বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আমাকে আমার ব্যক্তি-সত্ত্বা ফিরে পেতে হবে—এ-ধরনের সব হেঁয়ালিভরা মন্তব্য ও করত। আভাসে ইঙ্গিতে ও যেন আমাকে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করত। প্রথম-প্রথম এ-ধরনের মন্তব্যকে আমি কোনও আমল দিতাম না। কিন্তু প্রায়ই এ-ধরনের কথা ওর কাছ থেকে শুনে আমিও সতর্কভাবে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। আমার প্রশ্নে অসিত একই সঙ্গে যেন ভীত আর কৃতজ্ঞ হত। বুঝতে পারতাম, আমার কাছে সব কথা বলে ও ওর মনটাকে হালকা করতে চায়, কিন্তু সব কথা খুলে বলবার মতো সাহস অথবা মনোবল ওর নেই। বিড়বিড় করে ও বলত, বলব, বলব, একদিন তোমায় সব কথা খুলে বলব, তপন।

অসিতের যখন এই অবস্থা তখন একদিন ওর বাবা বুড়ো মল্লিক মশাই মারা গেলেন। ওর মা মারা গিয়েছিলেন ওর বিয়ের আগেই। বিয়ের পর থেকে অসিতের সঙ্গে মল্লিক মশাইয়ের যোগাযোগ একরকম ছিলই না। বিনতার সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছিল ও। বাবার সঙ্গে যোগাযোগ হলে পাছে ও আবার বাবার প্রভাবে পড়ে যায়, এই ভয়েই বোধ করি বিনতা অসিতের সঙ্গে তার বাবার যোগাযোগটা একেবারেই পছন্দ করত না।

বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাওয়ার পর অসিত পৈতৃক বাড়িতে ফিরে যেতে চাইল, কিন্তু বিনতা রাজি হল না, ফলে অসিতেরও ফিরে যাওয়া হল না। কয়েকদিন পরে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার শুনলাম। অসিতের পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় আমার স্ত্রী এখানে ছিলেন না, বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন, ফিরে এসে ওদের সঙ্গে একবার দেখা করে সমবেদনা জানিয়ে আসা একটা সামাজিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করে উনি এক বিকেলে অসিত-বিনতার বাড়িতে গেলেন।

আমার স্ত্রী যখন ওদের বাগানবাড়ির গেটের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছেন, তখন বেগে ওদের টু-সিটারখানা গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। আমার স্ত্রী দেখলেন চালকের আসনে তেজোদৃপ্ত অসিতকে। গাড়ির ভিতর আর কোনও আরোহী ছিল না। উনি অসিতকে ডাকলেন, কিন্তু অসিত শুনতে পেল বলে ওঁর মনে হল না। ও দারুণ স্পিডে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার স্ত্রী একবার ভাবলেন ফিরে আসবার কথা, তারপর আবার কী ভেবে বাগানবাড়িতে ঢুকেই পড়লেন, কলিংবেল টিপতে দরজা খুলে দিল সেই ভীষণদর্শন কুৎসিত ঢ্যাঙা মেয়েটা।

বিনতাদি বাড়ি আছেন তো? আমার স্ত্রীর এ-প্রশ্নের জবাবে মেয়েটা বলল, না, দিদিমণি বাড়িতে নেই, তিনি দাদাবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন। মেয়েটার জবাব শুনে আমার স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, কেন না তিনি পরিষ্কার দেখেছেন অসিতের গাড়িতে দ্বিতীয় কোনও আরোহী নেই, মেয়েটা পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলছে।

ফিরেই আসছিলেন আমার স্ত্রী ঊর্মিলা। গেটের কাছাকাছি এসে একবার ফিরে তাকালেন

বাড়িটার দিকে, একটা আশ্চর্য ব্যাপার উর্মিলার চোখে পড়ল।

জানো, আমি ফিরে তাকাতে দোতলায় লাইব্রেরি ঘরের জানলা থেকে সাঁৎ করে একখানা মুখ সরে গেল।

কার মুখ?

আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে উর্মিলা বললেন, খুব অল্প সময়ের জন্য আমি মুখখানা দেখেছি। ব্যর্থতা, বেদনা আর চূড়ান্ত আশাহীনতায় ভরা সেই মুখ। মুখখানা নিঃসন্দেহে বিনতার। কিন্তু হেসো না, বিশ্বাস করো, ও-মুখের দু-চোখে আমি দেখেছি অসিতবাবুর অসহায় দৃষ্টি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মনে পড়ল বিনতা সম্পর্কে আমার বন্ধুর বোন যেসব কথা বলেছিল।

এ-ঘটনার পর অসিত আবার মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ি আসতে শুরু করল। কিছুদিন ধরে আভাসে ইঙ্গিতে ও যেসব কথা বলছিল, এবার অনেকটা খোলাখুলি ভাবেই তা বলতে আরম্ভ করল। কিন্তু ওর যা বক্তব্য তা একেবারেই অবিশ্বাস্য। এসব কথা শুনলে ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই মনে সন্দেহ জাগবে।

জানো তপন, অসিত একদিন বলল, প্রেত-চক্রের অনুষ্ঠান এখনও হয়, তোমরা জানো না, কিন্তু আমি জানি, পিশাচ উপাসক সম্প্রদায় এখনও আছে। লোকালয় থেকে অনেক দূরে নির্জন বনভূমিতে অমঙ্গল আর অশুভ শক্তির আবাহনকারীরা আজও মিলিত হয় বিশেষ-বিশেষ তিথিতে। সুন্দরবনে গিয়েছ কখনও? সুন্দরবনের গভীরে এক গোপন অঞ্চলে রয়েছে এক বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। এই প্রাসাদের এক ঘরে রয়েছে এক গোপন সিঁড়ি-পথ। এ-সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালের অন্ধকার গহ্বরে। এ-গহ্বরের জটিল কোণ আর পথ যেন এক অদৃশ্য দেওয়াল ভেদ করে নিয়ে যায় অন্য মাত্রা আর সময়ের এক রহস্যময় অজ্ঞাত জগতে। বড় ভয়ংকর এই নিষিদ্ধ জগৎ। এ-জগতে বিচরণ যেন এক দারুণ দুঃস্বপ্ন, এ নিষিদ্ধ জগতে আমি গিয়েছি, যেতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু সত্যিই কি আমি গিয়েছি? না, আমার দেহ আশ্রয় করে আর কেউ—হঠাৎ থেমে গেল অসিত। নিতান্ত অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

নিজের অবিশ্বাস্য বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করতে অসিত একদিন আমাকে কতগুলো জিনিস দেখাল। হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম জিনিসগুলো দেখে। এগুলো কোথাকার জিনিস? অদ্ভুত রং আর গড়ন জিনিসগুলোর। এ-রং আমাদের অজানা। গড়নের রেখা আর তল আমাদের অপরিচিত। আমাদের জানা জ্যামিতিকে মোটেই অনুসরণ করেনি। কী এগুলো? এগুলো তৈরির উদ্দেশ্যই বা কী?

এগুলো সেই অজ্ঞাত জগতের জিনিস, তবে এর প্রয়োজনীয়তা কোথায় তা বলতে পারব না। আমার প্রশ্নের জবাবে অসিত বলল।

কী পাগলের মতো কথা বলছ, এগুলো তুমি পেলে কোথায়?

আমি পাইনি, বিনতা পেয়েছে। ও জানে কী করে এগুলো পেতে হয়।

আর-একদিন সন্ধ্যায় কিছু এলোমেলো কথা বলে অসিত হঠাৎ ফিসফিস করে আমায় জিগ্যেস করল, করালীকিঙ্কর সোমকে তুমি কখনও দেখেছ?

দেখেছি?

কীরকম লোক মনে হত তাঁকে?

অদ্ভুত মানুষ, কারু সঙ্গে মেলামেশা করতেন না।

আচ্ছা, তিনি কি সত্যিই মারা গেছেন, না কি তাঁর দেহটাই শুধু নষ্ট হয়েছে?

কী আবোল-তাবোল বকছ, অসিত? তোমার এসব কথার কোনও অর্থই হয় না।

অর্থ হয় না! তপন, তুমি যদি ভাই সব কথা জানতে তাহলে আমায় আর পাগল

ভাবতে না।

বেশ তো, তোমার কথা আমায় খুলে বলো। এভাবে কথা চেপে রেখে তুমি তোমার নিজেরই ক্ষতি করছ।

বলব, তোমায় আমি সব খুলে বলব। আজই বলব। আমি আর পারছি না, তপন, আমার দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন। তপন, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে, কোন পরিবেশের মধ্যে আমায় দিন কাটাতে হচ্ছে। আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি এক অভিশপ্ত মানুষ। এক অশুভ শক্তি এক মহা অমঙ্গল আমায় পাকে-পাকে বেঁধে ফেলেছে। এ থেকে কী করে যে আমি মুক্তি পাব— অসিত হঠাৎ থেমে গেল।

আজকাল ওর এই এক দোষ হয়েছে। কথা বলতে-বলতে ও হঠাৎ থেমে যায়। যেন চলা রেডিওকে কেউ হঠাৎ নব ঘুরিয়ে বন্ধ করে দেয়। এখন ভাবি, বিনতাই কি তাহলে দূর থেকে তার দুরন্ত সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করে অসিতের বক্তব্যকে মাঝপথে থামিয়ে দিত? বিনতা নিশ্চয়ই সন্দেহ করত যে, অসিত মাঝে-মাঝে আমার কাছে আসে এবং অনেক গোপন কথা বলে। এ-আসাটা বন্ধ করতে বিনতার দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। অনেক কষ্ট করেই অসিতকে আমার কাছে আসতে হত। অনেক সময় আমার কাছে আসবার জন্য পথে বেরিয়ে ও সম্পূর্ণভাবে ভুলেই যেত ওর গন্তব্যস্থলের কথা। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। সেই অদৃশ্য শক্তির টানে আবিষ্ট অসিত আবার টলতে-টলতে ফিরে যেত নিজের বাগানবাড়িতে।

যখন বিনতা বাইরে যেত, নিজের দেহে বাইরে যেত, অসিত একবার এরকম একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিল, তখনই কেবল অসিত আমার কাছে স্বাধীনভাবে আসতে পারত। ফিরে এসে অবশ্য বিনতা সবই জানতে পারত, কেননা সেই বিকটদর্শন ঢ্যাঙা মেয়েটা সব সময়ই অসিতের যাওয়া আসার ওপর নজর রাখত।

জানতে পেরে ও গম্ভীর হয়ে যেত, কিন্তু এই ব্যাপারে কঠোর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া ও সমীচীন মনে করত না।

ইঙ্গিত

অসিত আর বিনতার বিবাহিত জীবনের চার বছর পূর্ণ হল। আগস্ট মাস শেষ হতে চলল। গত জুন থেকে অসিতের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। বাইরে কোথাও গিয়েছে। বিনতাও সম্ভবত ওর সঙ্গে গিয়েছে। কেননা তাকেও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আশেপাশের লোকের ধারণা ও-বাড়ির দোতলার লাইব্রেরি ঘরে কেউ একজন রয়েছে, এই কেউ একজন সেই বুড়ো-বুড়ি বা ঢ্যাঙা মেয়েটা নয়। লাইব্রেরি ঘরের জানলায় ডবল করে কালো রঙের পরদা খাটানো হয়েছে। কোনও-কোনও পথচারীর কানে এসেছে পরদার পিছন থেকে ভেসে আসা নারীকণ্ঠের অসহায় আর্তনাদ। দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কেউ যেন জোর করে আর্তনাদটা থামিয়ে দিয়েছে।

এমনি একদিনে আমি টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামটা এসেছে নামখানা থেকে। করেছেন সুরেন মাইতি নামে এক ভদ্রলোক। এক অর্ধ-উন্মাদ ব্যক্তিকে তিনি নাকি সপ্তমুখী নদী থেকে উদ্ধার করেছেন। তার কাছ থেকে আমার নাম-ঠিকানা পেয়েই মাইতি আমায় টেলিগ্রাম করছেন। আমার অবিলম্বে নামখানায় যাওয়া দরকার।

এক বন্ধুর কাছ থেকে গাড়িখানা ধার করে বেরিয়ে পড়লাম নামখানার দিকে।

যথাসময়ে নামখানায় পৌঁছলাম। দেখা হল মাইতি মশাইয়ের সঙ্গে। সবিস্তারে শুনলাম সব কথা।

মাইতি মশাইয়ের কিছু জমি-জমা আছে সুন্দরবন অঞ্চলে। বৈষয়িক প্রয়োজনে তাঁকে সেখানে যেতে হয়েছিল। কাজ মিটে গেলে তিনি নৌকোয় করে সপ্তমুখী নদী ধরে ফিরছিলেন নামখানার দিকে। সন্ধ্যা হয়-হয়। পানসীর ছাদে বসে মাইতি মশাই অস্তসূর্যের শোভা দেখছিলেন। পশ্চিমের আকাশটা লাল। সূর্যকে দেখাচ্ছে টকটকে লাল একটা বিরাট সিঁদুরের ফোটার মতো। নদীর নীল জলে লাল আকাশের ছায়া পড়ে লালে-নীলে মিলে এক অপূর্ব বর্ণসুষমার সৃষ্টি হয়েছে। দূরে নদীর পাড়ের ঘন জঙ্গলের গাছগুলোর মাথায় লেগেছে লালের ছোপ। নীড়মুখী পাখির পাখায় বিদায়ী সূর্যের রক্তিম পরশ। সবটা মিনিয়ে যেন কোনও এক মহাশিল্পীর আঁকা অপূর্ব একখানি ছবি মাইতি মশাই তন্ময় হয়ে দেখছিলেন।

হঠাৎ মাইতি দেখলেন, দূরের জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা লোক ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে এসে নদীতে ঝাঁপ দিল। ভাবে মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই সাঁতার জানে না। আর সাঁতার জানলেই বা কী হবে? এই দুরন্ত সপ্তমুখী কি সাঁতরে পার হওয়া সোজা? সাঁতরে যাবেই বা কোথায়? ডুবন্ত লোকটার কাছে সুরেনবাবু নৌকো নিয়ে যেতে বললেন। তারপর মাঝিদের সাহায্যে জল থেকে উদ্ধার করলেন অচৈতন্য দেহটাকে।

নামখানায় নিজের বাড়িতে লোকটাকে নিয়ে এলেন সুরেনবাবু। প্রাথমিক চিকিৎসার পর লোকটি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল। সুরেনবাবুর মনে হল কোনও ব্যাপারে লোকটা দারুণ ভয় পেয়েছে। মাঝে-মাঝে ও আঁতকে ওঠে, পাগলের মতো আবোল-তাবোল এমন সব কথা বলে যার কোনও অর্থই হয় না। লোকটার কাছ থেকে জিগ্যেস করে আমার নাম আর ঠিকানা পেয়েছেন সুরেনবাবু, ওর নিজের নামও জেনেছেন। ওর নাম নাকি অসিত মল্লিক। অসিতই সুরেনবাবুকে বারবার অনুরোধ করেছে আমাকে খবর দেওয়ার জন্য।

অসিতের সঙ্গে দেখা হল, এ কী অদ্ভুত চেহারা হয়েছে ওর। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল, চোখ কোটরগত, চোখের কোণে কালি। হঠাৎ দেখলে চেনাই যায় না ওকে।

আমায় দেখে অসিত কেঁদে ফেলল। তপন এসেছ, এসেছ ভাই, কান্না ভরা গলায় ও বলল, ঈশ্বরের দোহাই আমায় বাঁচাও। অভিশাপের জগৎ থেকে আমায় উদ্ধার করো। জানো, নরকের অন্ধকার অতল গহ্বরে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। আমি পারলাম না, থাকতে পারলাম না সেখানে, সহ্য করতে পারলাম না সেই মূর্তিমান মহা-অমঙ্গলকে। আমি পালিয়ে এসেছি। কিন্তু পালিয়েই বা যাব কোথায়, আমাকে আবার সেই মহা-নরকে নিয়ে যাবে। আমাকে গ্রাস করবে, আমার দেহটাকে গ্রাস করবে, আমার অভিশপ্ত আত্মা নিক্ষিপ্ত হবে পূতিগন্ধময় অনন্ত নরকে। তপন, তপন, আমার আর নিস্তার নেই, আমার আর মুক্তি নেই, আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল অসিত।

বড় কষ্ট হল ওর অবস্থা দেখে।

কোনও ভয় নেই, তুমি শুয়ে পড়ো অসিত। আমি তোমার পাশে বসছি।

তুমি আমায় ছেড়ে যেও না ভাই, আমার হাত দু-খানা চেপে ধরে আকুলভাবে অসিত বলল।

না, কোথাও যাব না, যখন যাব তখন তোমায় সঙ্গে করেই নিয়ে যাব। কোনও চিন্তা নেই, তুমি ঘুমোও।

ঘুমিয়ে পড়ল অসিত। জাগল ঘণ্টাখানেক পরে। মনে হল ও যেন কিছুটা সুস্থ হয়েছে।

তপন জানো, আমি কোথায় গিয়েছিলাম? কোথায় নিয়ে গিয়েছিল আমাকে? ফিসফিস করে অসিত বলল।

ওসব কথা এখন থাক, তুমি সুস্থ হলে তখন সব কথা শুনব।

সুস্থ! ম্লান হাসি হাসল অসিত, সুস্থ আর আমি কোনওদিনই হব না, ভাই।

কেন হবে না? তোমার কী এমন হয়েছে যে...।

বৃথাই আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ, আমি জানি আমার এই হতভাগ্য জীবনের শেষ পরিণতি কোথায়। তাই তো সময় থাকতে তোমায় কিছু বলে যেতে চাই, জানি না পরে আর সুযোগ পাব কি না।

অসিত, তুমি অসুস্থ।

বাধা দিয়ো না, আমায় বলতে দাও। জানো কোথায় নিয়ে গিয়েছিল আমাকে? আমায় নিয়ে গিয়েছিল নরকের অন্ধকার অতল গহ্বর পেরিয়ে অন্য কাল আর মাত্রার এক ভয়ঙ্কর জগতে। লাইব্রেরি ঘরে আমি বন্ধ ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম এক পৈশাচিক প্রেত-জগতের মধ্যে এসে পড়েছি। বিনতা কথা দিয়েছিল যে এ-জগতে আমায় কখনই নিয়ে আসবে না। কিন্তু ও কথা রাখল না।

লাইব্রেরি ঘরে তুমি বন্ধ ছিলে!

হ্যাঁ, লাইব্রেরি ঘরে আমার আত্মাকে ওর নিজের দেহে বন্দি করল বিনতা। তারপর আমার দেহটাকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই দেহকে আশ্রয় করে বিনতার আত্মা চলে এল অন্য কাল আর মাত্রার সেই পৈশাচিক জগতে। অশুভ প্রেত-চক্রে যোগ দিতে। লোকে জানল আমি বাইরে গিয়েছি, কিন্তু আসলে আমার দেহ আশ্রয় করে বাইরে গেল বিনতা।

কী বলছ তুমি অসিত! দারুণ বিস্ময়ে আমি বলে উঠলাম, এ-ও কি সম্ভব।

হ্যাঁ, সম্ভব। 'গুহ্য সাধনমালা' তন্ত্রে অনেক গূঢ় সাধন পদ্ধতির কথা আছে। এ-তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনও সাধক তার নিজের আত্মাকে অন্য দেহের মধ্যে চালিত করতে পারে।

অসিত, তুমি ওসব তান্ত্রিক পুঁথিপত্র পড়া ছাড়ো দেখি। ক্রমাগত এসব পুঁথি পড়ে-পড়ে তুমি সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা ভুলে গেছ। তুমি হয়ে পড়েছ এক কল্পজগতের বাসিন্দা।

বিশ্বাস করলে না তো, ম্লান হাসি হাসল অসিত, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না, বরং যা বলছিলাম তাই বলি।

বলছিলাম আমি লাইব্রেরি ঘরে বিনতার দেহে বন্দি ছিলাম। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে আমি বোধহয় কাঁদছিলাম। সেই কুৎসিত ঢ্যাঙ্গা মেয়েটা আমায় ধমকাচ্ছিল, চুপ করতে বলছিল। ঘর থেকে যাতে আমি কোনওরকমে বেরিয়ে যেতে না পারি সেজন্য আমায় বেঁধে রাখত ওরা। হঠাৎ কি হল বুঝলাম না। আমার চোখের সামনে দিনের আলো নিভে গেল। নিরন্ধ্র অন্ধকার যেন গ্রাস করল আমাকে, চারপাশের জগৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেল। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল আমার চৈতন্য। জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন দেখলাম আমি আর লাইব্রেরি ঘরে বন্দি অবস্থায় নেই। এসে পড়েছি সেই ভয়াবহ প্রেত-চক্রের মাঝখানে।

দেখলাম, একটা ম্লান নীলাভ আলোয় আলোকিত একটা জায়গা। একদল লোক গোল হয়ে একটা বেদিকে ঘিরে বসে সাপ-খেলানো সুরে মন্ত্রপাঠ করছে। আমি তো কিছু তান্ত্রিক পুঁথি-পত্র পড়েছি, কিন্তু এ-মন্ত্র আমার কাছে দুর্বোধ্য, লোকগুলোর ভাবভঙ্গি আর চেহারা অত্যন্ত রহস্যময়। ওদের দেখলেই প্রাণে যেন দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

মন্ত্রপাঠ ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। মনে হয় মন্ত্রের ধ্বনি-তরঙ্গে সমস্ত জায়গাটা যেন থরথর করে কাঁপছে, একটা অশুভ আশঙ্কায় আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল ভয়ানক কিছু একটা যেন ঘটতে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছিল ছুটে পালিয়ে যাই এখান থেকে, কিন্তু পালাব কোথায়? পালাবার পথ নেই। কোনও এক অদৃশ্য শক্তি যেন অদেখা বাঁধনে আমাকে এখানে বেঁধে রেখেছে।

একখণ্ড পাতলা কুয়াশা বেদির ওপর জমতে লাগল। তাই দেখে সাপ-খেলানো সুরের মন্ত্রপাঠ আরও তীব্র, আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। থির-থির করে কাঁপতে লাগল কুয়াশা খণ্ড। হালকা কুয়াশা পরতের-পর-পরত জমতে-জমতে ঘন হল। তারপর এক সময় দেখলাম বেদির ওপর জমে উঠেছে বিরাট একখণ্ড নিকষ কালো মেঘ। মেঘখণ্ড স্থির নয়। প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে সেই পুঞ্জীভূত কালো মেঘের মধ্যে। মুহূর্তে-মুহূর্তে মেঘের আকৃতি পালটে যাচ্ছে। আমার ভয়-বিহ্বলদৃষ্টির সামনে

মেঘটা যেন একটা আকার নেওয়ার চেষ্টা করছে। এক সময়ে সেই মূর্তিমান মহা-আতঙ্ক রূপ নিল।

একটা হিমেল হাওয়ার স্রোত বইতে লাগল। সেই হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় আমার শরীরের রক্ত যেন জমে গেল। সে কী ঠান্ডা! মনে হল, এক তুষার সমুদ্রের মধ্যে কে যেন আমায় ফেলে দিয়েছে। লোকগুলো এক পৈশাচিক উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল। সে যে কী ভয়াল ভয়ঙ্কর দৃশ্য, তা আর আমি তোমায় কেমন করে বোঝাব, তপন!

বেদির ওপরকার মহা-আতঙ্ক ততক্ষণে রূপ নিয়েছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিপুল দেহ। পৃথিবীর কোনও জীবদেহের সঙ্গে এর মিল নেই। এ এক অপার্থিব দেহ। মূর্তির মেঘময় দেহ কোনও কঠিন উপাদনে গড়া নয়। একটা সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট আকারও নেই মূর্তিটার। ক্ষণে-ক্ষণে ওটা রূপ আর রং পালটাচ্ছে। শুঁড়ের মতো অদ্ভুত সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেরিয়ে আসছে ওটার মেঘময় দেহ থেকে। নিষ্ঠুর জিঘাংসায় ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে দুটো অগ্নিময় প্রেতচক্ষু।

বেদি ঘিরে গোল হয়ে বসা লোকগুলো নতজানু হল। একটা হিসহিস শব্দ বেরিয়ে এল সেই মেঘ-মূর্তির দেহ থেকে।

নতজানু মূর্তিগুলো প্রার্থনার সুরে বলতে লাগল ঃ হে মহাপ্রেত! হে মহাপিশাচ, হে অলৌকিক শক্তিধর! তুমি প্রসন্ন হও। তুমি তৃপ্ত হও। তোমার অনুগামীদের তুমি অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান করো। পৃথিবীতে তারা তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। তারা চূর্ণ করবে মঙ্গলের রাজত্ব, নিয়ে আসবে অমঙ্গলের প্লাবনকে। হে সহস্রমুণ্ড! তুমি আমাদের আনুগত্য গ্রহণ করো। তোমার সন্তানদের তুমি শক্তিমান করো, যাতে তারা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারে। হে মহা-আতঙ্ক! তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক।

নতজানু মূর্তিগুলো এবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সেই মেঘবর্ণ মূর্তি থেকে শুঁড়ের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এগিয়ে এসে স্পর্শ করল মাটিতে লুটিয়ে থাকা মানুষগুলোকে। মেঘের আবরণে ঢাকা পড়ে গেল মূর্তিগুলো। একটা বীভৎস শুঁড় এসে স্পর্শ করল আমার দেহ। পিচ্ছিল ক্লেদাক্ত সেই স্পর্শ। সেই শীতল স্পর্শে আমার শরীরটা যেন বরফের মতো জমে গেল। লক্ষ-লক্ষ সাপ যেন হিসহিস করে উঠল নিষ্ঠুর জিঘাংসায়। সেই অপার্থিব মেঘদেহ আমার অস্তিত্ব টের পেয়েছে। আমি এখানে অনাহূত অবাঞ্ছিত। সেই বীভৎস শুঁড় আমায় পাকে-পাকে বেঁধে ফেলল, তারপর আমার দেহটাকে শূন্যে তুলে ছুড়ে দিল সেই বিবর্ণ নীল আলোর সীমার বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে। আমার চৈতন্য লুপ্ত হল।

জ্ঞান হতে দেখি আমি সুন্দরবনের সেই বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে পড়ে আছি। আমার সমস্ত শরীর জলে ভেজা—কাদায় মাখা। দারুণ আতঙ্কে আমি ছুটতে শুরু করলাম। এ-অভিশপ্ত পুরীর কাছে আর এক মুহূর্তও থাকা আমি নিরাপদ মনে করলাম না। তারপর কী করে যেন বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে-ছুটতে নদীর কিনারায় এসে জলে ঝাঁপ দিলাম তা আমি নিজেই গুছিয়ে ঠিক করে বলতে পারব না।

এ-ভগ্ন প্রসাদের ভিতরে আমি আগেও গিয়েছি। এ-প্রাসাদের তলায় গহ্বরের ভেতরেই রয়েছে অজানা জগতের মাঝখানকার অতি ক্ষীণ সীমারেখা। এ-সীমার বাঁধন আমি আগেও ভেদ করেছি, কিন্তু মূর্তিমান সেই মহা-অমঙ্গলকে আগে কখনও দেখিনি। বিনতা আমায় কথা দিয়েছিল, ওখানে আর কখনও আমাকে নিয়ে যাবে না। কিন্তু ও কথা রাখেনি। ও আমায় সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ওর হাত থেকে আমার আর নিস্তার নেই...ওকে আমি খুন করব...ওকে আমি নিজের হাতে খুন করব...। উত্তেজনায় অসিতের গলা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

অনেক কষ্টে ওকে শান্ত করলাম।

পরদিন সকালে নামখানার একটা দোকান থেকে ওর জন্য একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি কিনলাম। ওর পোশাক পরিচ্ছদের এমন হাল হয়েছে যে, এটা না কিনলেই চলছিল না। একজন ক্ষৌরকার ডেকে ওর চুল কাটানো এবং দাড়ি কামাবার ব্যবস্থা করলাম। তারপর মাইতি মশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অসিতকে সঙ্গে করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের ভরপেট জলযোগ না করিয়ে মাইতি মশাই ছাড়লেন না।

অসিতের হিস্ট্রিরিয়ার ভাবটা কেটে গেছে। ও কোনও কথা বলছিল না। চুপচাপ থাকতে চাইছিল। গাড়িতে ও পিছনের সিটে না বসে আমার পাশেই বসল। গাড়ি স্টার্ট দিলাম। কাকদ্বীপ পর্যন্ত অসিত চুপচাপ রইল, কেবল মাঝে একবার ও আপন মনেই কী যেন বিড়বিড় করে উঠেছিল। মনে হয়, কোনও অপ্রীতিকর স্মৃতি ভেসে উঠেছিল ওর মানসপটে। এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে, অসিত আর ওদের বাগানবাড়িতে ফিরে যেতে চাইছে না। আমিও ভাবছিলাম আপাতত অসিতের ওখানে না ফেরাই ভালো। বিনতা সম্পর্কে ওর মনে অদ্ভুত ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, আর এ-ভ্রান্তি হয়তো কোনও মারাত্মক সম্মোহনমূলক পরীক্ষার ফল।

ঠিক করলাম, অসিতকে কিছুদিন আমার বাড়িতে নিয়ে রাখব। এর ফলে বিনতার সঙ্গে যদি অপ্রীতিকর সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তো হোক। অসিতের মানসিক অবস্থা সুস্থ হলে আমি চেষ্টা করব যাতে ওর সঙ্গে বিনতার ডিভোর্স হয়ে যায়। এ-বিয়ে মোটেই শুভ হয়নি। অসিতের কাছে বিবাহিত জীবন হয়ে উঠেছে মারাত্মক। অসিতের দিকে তাকালাম। ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘুমন্ত অসহায় দেহের দিকে তাকিয়ে মায়া হল।

ডায়মন্ডহারবারে পৌঁছলাম। ট্যুরিস্ট লজে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিলাম। তিনটের সময় আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবার আমাদের যেতে হবে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে কলকাতার দিকে। কলকাতা পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে না, শহরতলির মধ্য দিয়ে আমরা গিয়ে পড়ব ন্যাশনাল হাইওয়েতে। তারপর হাইওয়ে ধরে ঘণ্টা পাঁচেক ড্রাইভ করলেই আমাদের শহরে পৌঁছে যাব।

সূর্য অস্ত গেল। অসিতের ঘুম ভাঙল। ও আবার বিড়বিড় করা শুরু করল। ওর কথায় কান দিলাম। বিনতার সম্পর্কেই ও অসংলগ্ন কথা বলছে। বিবাহিত জীবনে বিনতা ওর স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করেছে। আর তারই ফলে বিনতাকে কেন্দ্র করে ওর মনে সৃষ্টি হয়েছে একটা ভ্রান্ত আমূল প্রত্যক্ষের (হ্যালুসিনেশন) জগৎ। ওর সমগ্র ব্যক্তিত্বের মন্থর অবনতি ঘটেছে। বাস্তব জগৎ সম্পর্কে একান্ত উদাসীন হয়ে ও এক মনগড়া কল্পজগতের বাসিন্দা হয়ে গেছে।

আমার এই অবস্থা...এ কি এই প্রথম হল? না, আগেও অনেকবার হয়েছে...অবশ্য এতটা সাংঘাতিক কোনওদিন হয়নি। জানো, ও আমাকে কেড়ে নিচ্ছে...আমার দেহ ছিনিয়ে নিচ্ছে...এখনও ও আমাকে সবসময় ধরে রাখতে পারে না...কিন্তু ওর শক্তি বাড়ছে। এমন একদিন আসছে যখন আমি আর আমাকে ফিরে পাব না। ও আমার দেহ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় অজানা সব ভয়ঙ্কর জায়গায় প্রেত-চক্রের অধিবেশনে যোগ দিতে। এমনি সব অশুভ চক্রে যোগ দিয়ে ও ওর পৈশাচিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। বিনতা আমায় জোর করে আটকে রাখে ওর নারীদেহের মধ্যে। লাইব্রেরি ঘরে বন্ধ করে রাখে আমাকে। ওই কুৎসিত ঢ্যাঙা মেয়েটা, ওটা কি মানুষ! আমায় বেঁধে রাখে, আমায় শাসন করে। কিন্তু সময়-সময় ছিনিয়ে নেওয়া দেহকে বিনতা ধরে রাখতে পারে না। ওর বাঁধন আলগা হয়ে যায়। আমি ফিরে যাই নিজের দেহে। দেখি, আমি এক অচেনা অজানা ভয়ঙ্কর জায়গায় এসে পড়েছি।...আমি আর পারছি না। এ-জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

আগে কিছুক্ষণের জন্য ও আমার দেহ কেড়ে নিতে পারত। বারবার দখল করে ওর শক্তি

এখন অনেক বেড়ে গেছে। এখন দিনের-পর-দিন ওর আত্মা আমার দেহকে আশ্রয় করে থাকতে পারে। ও পুরুষ হতে চায়, আর সেজন্যই আমাকে বিয়ে করেছে। ও চেয়েছিল এমন একটি পুরুষ, যার ধীশক্তি প্রবল, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি দুর্বল। আমার মধ্যে ও সেরকম একজন পুরুষই পেয়েছে। একদিন হয়তো ও আমার দেহ নিয়ে চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর আমি তখন বাঁধা পড়ে থাকব ওর নারীদেহের মধ্যে।

বুড়ো করালীকিঙ্কর সোম, তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন চিরকাল। আর এ-জন্য তিনি এক পৈশাচিক কাণ্ড করেছিলেন...। বিনতা? বিনতার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে। একবার যখন সফলতা এসেছে, তখন আর-একবারই বা আসবে না কেন।

তপন, তপন, তুমি করালীকিঙ্কর সোমকে দেখেছ। কেমন অদ্ভুতভাবে তাকাতেন বুড়ো। আজকাল বিনতাও সেরকম অদ্ভুতভাবে তাকায় আমার দিকে। আমি জানি কেন ওভাবে তাকায়।

বুড়ো করালীকিঙ্কর 'গুহ্য সাধনমালা' তন্ত্রে এই রহস্যময় মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। তুমি যদি সে-পুঁথি পড়, বুঝতে পারবে আমার এরকম হাল হল কেন, কীরকম এক ভয়ঙ্কর পৈশাচিক আবর্তের মধ্যে আমি পড়েছি।

বাঁচতে হবে, চিরকাল বাঁচতে হবে...এক দেহ বার্ধক্যে জীর্ণ হলে নবীন এক দেহ আশ্রয় করে বাঁচতে হবে। এমনি করেই ঘটবে দেহ থেকে দেহান্তরে দুষ্ট আত্মার চিরন্তন অশুভ সঞ্চার। বুড়ো করালীকিঙ্কর বোধহয় এরকম সব কথাই ভেবেছিলেন।

দেহ মরে গেলেও দেহমুক্ত জীবনদীপ কিছুকাল জ্বলতে পারে। আমি তোমায় ইঙ্গিত দিচ্ছি, তুমি হয়তো গোটা ব্যাপারটা ধারণা করে নিতে পারবে। বিনতার হাতের লেখা দেখেছ?

দেখেছি। গাড়ি চালাতে-চালাতে এই প্রথম আমি কথা বললাম।

ওর হাতের অক্ষরগুলো কী কায়দায় লেখা?

অক্ষরগুলো বাঁ-দিকে হেলানো।

ঠিক বলেছ। বুড়ো করালীকিঙ্করের কোনও পাণ্ডুলিপি দেখেছ? অসিত প্রশ্ন করল।

না।

একদিন বিনতা লাইব্রেরি ঘরে বসে একখানা পুরোনো পুঁথি থেকে কী যেন নোট করছিল। সে-দিন ওর হাতের লেখা দেখে আমি ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম। কেন ভয় পেয়েছিলাম জানতে চাও?

বিনতা—সত্যিই কি বিনতা বলে কেউ আছে? নিজেকেই যেন অসিত এক অদ্ভুত প্রশ্ন করল। আর এমন গুজবই বা উঠেছিল কেন যে, বুড়ো করালীকিঙ্করকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে? এরকম কথাই বা লোকে বলে কেন যে, পাগল করালীকিঙ্করকে বিনতা যখন চিলে কোঠায় আটকে রাখছিল তখন সে এক ভীত-আতঙ্কিত শিশুর মতো আর্ত চিৎকার করছিল? বুড়ো করালীকিঙ্করের দেহে কি তার নিজের আত্মা ছিল? না কি...? কার দেহে কার আত্মা ছিল? কেনই বা করালীকিঙ্কর শেষ জীবনে পোষ্যপুত্র নেওয়ার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন? কেন নিজের মেয়েকে মোটেই দেখতে পারতেন না? কেন? কেন? ভাবো, তপন, ভাবো। কল্পনা করো কী নারকীয় পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল করালীকিঙ্করের সেই আতঙ্ক-ভরা পাষাণপুরীতে, যেখানে দুরন্ত পৈশাচিক শক্তির অধিকারী এক দানব একটা অল্পবুদ্ধি কিশোরীকে পেয়েছিল একেবারে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে। পরিবর্তনটা কি সাময়িক, না চিরন্তন? বলো তপন, বলো, কেন অসতর্ক মুহূর্তে বিনতার হাতের লেখা অন্যরকম হয়? কেন সেই হাতের লেখার সঙ্গে...ওঃ আঃ মা গো।' তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে অসিত হঠাৎ থেমে গেল।

মনে পড়ল, আমার বাড়িতে বসেও কথা বলতে-বলতে অসিত হঠাৎ থেমে গেছে। কিন্তু

এবারের থামাটা একেবারে অন্যরকম। আমার পাশে বসা অসিতের মুখটা দারুণ যন্ত্রণায় যেন বিকৃত হয়ে গেল। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল কোটর থেকে। ওর সারা দেহ কেঁপে উঠল থরথর করে। ওর শরীরের অস্থি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংসপেশি, স্নায়ু, গ্ল্যান্ড সবই যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভঙ্গিমা এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা সুরু করল। ভয় পেয়ে গেলাম।

কেন ভয় পেলাম, ভয়ের কারণটাই বা কোথায় ঠিক করে বলতে পারব না। স্টিয়ারিং হুইলে রাখা আমার হাত শিথিল হয়ে গেল, নেহাত হাইওয়ে বেশ চওড়া এবং একেবারে ফাঁকা, তা না হলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত। মনে হল, আমার পাশে বসে দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে যে-দেহটা, তা যেন অসিতের নয়, এ-দেহ যেন অন্য ভুবনের কোনও অজানা আগন্তুকের। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অভিশাপ যেন বর্ষিত হচ্ছে এ-দেহের ওপর, আর সে-অভিশাপের যন্ত্রণায় হতভাগ্য দেহটায় শুরু হয়েছে প্রচণ্ড আক্ষেপ।

স্টিয়ারিং হুইলে আমার হাত আলগা হয়ে গেল। হঠাৎ এক ধাক্কায় আমায় সরিয়ে অসিত শক্ত হাতে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরল। মুখের ভাব, এ যেন মুহূর্তকাল আগের অসিত নয়। ওর মুখের ভাবভঙ্গি, দৃঢ়, চোখ দুটো যেন জ্বলছে। এ এক তেজীয়ান বলদৃপ্ত চেহারা।

এ-পাশে সরে এস তপন, অ্যাকসিডেন্ট করবে নাকি! আমি গাড়ি চালাচ্ছি।—অসিতের গলার স্বরে স্পষ্ট আদেশের সুর।

এ কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

কিন্তু এ-অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি সত্যিই ঘটেছিল সেদিন সন্ধ্যায়।

ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে ছুটছিল গাড়ি। কোনও কথা বলছিল না অসিত। একটা হিংস্র শ্বাপদের চোখের মতোই যেন জ্বলজ্বল করছিল ওর চোখ দুটো। লোকে ঠিকই বলে তেজীয়ান অসিতের মুখের ভাবভঙ্গি যেন অনেকটা বিনতারই মতো। ওর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো যেন মনে করিয়ে দেয় করালী-কিঙ্কর সোমের কথা।

খড়্গপুর পেরিয়ে অসিত প্রথম কথা বলল, ওর গলায় স্বর আমার কাছে একেবারে অপরিচিত মনে হল। এ-স্বর গভীর, দৃঢ়, এক অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়ে ভরা। গলার স্বর নয়, ওর বলার ভঙ্গিটা যেন সম্পূর্ণ পালটে গেছে। ওর কথার মধ্যে যেন রয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন শ্লেষ।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তুমি ভয় পাওনি তো? যাকগে, ওসব কথা ভুলে যাও, জানই তো আমার নার্ভের অবস্থা কীরকম। সত্যি তপন, তোমার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ, তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছ।

কোনও জবাব দিলাম না।

আমি বোধহয় পাগলের মতো আবোল-তাবোল অনেক বকেছি। বিনতা সম্পর্কেও বোধহয় আজে-বাজে অনেক কথা বলেছি। ওসব কথা ভুলে যাও। সবসময় তান্ত্রিক পুঁথিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবার ফলেই আমার এই হাল হয়েছে। যখন আমার মনটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন নানারকম সব অসম্ভব আজগুবি ধারণার সৃষ্টি হয় আমার দুর্বল মনে, আমি তখন ভাবি, বুঝি এসব আজগুবি ধারণা সত্যি। নাঃ, বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। বাইরেই কোথাও যাব ঠিক করেছি। কিছুদিন তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। বিনতা বেচারির কোনও দোষ নেই, অসুস্থ অবস্থায় ওর সম্পর্কে যদি কোনও কথা বলে থাকি, তা নিতান্তই অমূলক।

এ-যাত্রায় কিছু তান্ত্রিক পুঁথিপত্রের খোঁজে বেরিয়েছিলাম, নানা জায়গা ঘুরতে-ঘুরতে, এসে পড়েছিলাম সুন্দরবন অঞ্চলে। এখানে এক সময় কাপালিকদের আস্তানা ছিল। তাঁদের সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্যই এ-অঞ্চলে আসা। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আর আমার দুর্বল নার্ভের কথা তো জানই। অসুস্থ শরীর, দুর্বল নার্ভ, তারই ফলে

হয়তো অনেক ভুল বকেছি। মাসখানেক বিশ্রাম করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মনে পড়ছে না এসব কথার পিঠে আমি কোনও কথা বলেছিলাম কি না। যদিও বলেও থাকি তবে তা খুব অল্প। কেমন এক অদ্ভুত অস্বস্তি, অদ্ভুত আতঙ্ক যেন আমায় পেয়ে বসেছিল। আমি ভাবছিলাম কতক্ষণে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতে পারব। এ-যাত্রার সমাপ্তি যত তাড়াতাড়ি ঘটে ততই মঙ্গল। অসিত স্টিয়ারিং হুইল ছাড়ল না। অসম্ভব দ্রুতগতিতে ও যেন গাড়িখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমাদের শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলাম। দূরে দেখা গেল অসিতদের বাগানবাড়িখানা। বাগানের গেটে একটা আলো টিমটিম করে জ্বলছে। এ ছাড়া সারা বাগানবাড়িটা অন্ধকার।

আমি এখানেই নেমে যাই, তপন। তোমায় ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট করেছ আমার জন্য।

গেট পেরিয়ে বাগানের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল অসিত।

বাকি পথটুকুন আমি একা ফিরে এলাম।

বাড়ি ফিরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এ-যাত্রায় এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। কেন অদ্ভুত? নিজের মনকে প্রশ্ন করেও যেন সঠিক জবাব পেলাম না। অসিতের সঙ্গে যে বেশ কিছুদিন দেখা হবে না, এ-কথা ভেবে মনে-মনে দুঃখিত না হয়ে যেন খুশিই হলাম।

কিন্তু দেখা হল, বাইরে যাওয়ার আগে অসিত একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সন্ধ্যাবেলায় ড্রইংরুমে বসে চা খাচ্ছিলাম। ক্রিং...করে কলিংবেল বেজে উঠল। উঠে দরজা খুলে দিলাম, দেখলাম অসিত দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। তেজোদৃপ্ত বলীয়ান অসিত। ওকে দেখব বলে আশা করিনি। না, সত্যিই ওর পরিবর্তন হয়েছে। ওর পুরোনো কলিংবেল বাজাবার ধরনটা পর্যন্ত পালটে গেছে।

এসো, ভিতরে এসো।

আসছি, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না, তপন। কাল সকালে বাইরে যাচ্ছি গোছগাছ করা এখনও বাকি ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

কোথায় যাচ্ছ?—কিছুটা নিস্পৃহ স্বরেই জিগ্যেস করলাম, অসিতের এই তেজীয়ান চেহারাটা কেন জানি না আমার ভালো লাগছিল না।

শিমুলতলা। খুব কম ভাড়ায় ওখানে একখানা বাড়ি পেয়ে গেছি। জায়গাটাও খুব স্বাস্থ্যকর। সোফায় বসতে-বসতে অসিত বলল।

একাই যাচ্ছ, নাকি বিনতাও সঙ্গে যাবে?

না, একাই যাচ্ছি। বিনতা একটা আর্টিকল লেখার কাজে ব্যস্ত আছে। ওখানে গিয়ে একটা ছোকরা চাকর ঠিক করে নেব, সে-ই আমার রান্নাবান্না, হাটবাজার আর অন্য সব কাজ করে দেবে।

কতদিন থাকবে ওখানে?

মাসখানেক তো বটেই, বেশিও হতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ বসল অসিত। এমনি ধরনের মামুলি কথাবার্তাই হল ওর সঙ্গে। তারপর এক সময় ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমিও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সেই সন্ধ্যার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, গাড়ির ভিতর আমার চোখের সামনে অসিতের যে-পরিবর্তনটা হয়েছিল তার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা আমি বারবার চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। আর ওর পরিবর্তনের ফলে আমার মনে যে কেন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল তা বুঝতে পারছিলাম না।

একলা

মাসখানেক পরে এক সন্ধ্যায় আমার বাড়ির কলিংবেল বেজে উঠল, ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। একটু থেমে আবার ক্রিং-ক্রিং। এ তো অসিতের সেই পুরোনো ডাকবার ভঙ্গি। দরজা খুলে দেখলাম, দোরগোড়ায় অসিত দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন সেই আগেকার অসিত। এক বিচিত্র মিশ্র আবেগে ওর মুখের রেখাগুলো কাঁপছে, একইসঙ্গে যেন ভয় আর জয়ের ছাপ পড়েছে ওর রেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলে, বারবার ও পিছন ফিরে কী যেন দেখছিল।

এসো-এসো, ভিতরে এসো।

অসিত এল আমার পিছু-পিছু। দুজনে বসলাম এসে ড্রয়িংরুমে।

তারপর, কবে এলে?

কাল রাতে, তপন। আজ আমি তোমায় সব কথাই খুলে বলব, কিন্তু আগে আমায় এক কাপ কফি খাওয়াতে পারবে? বেশ কড়া করে এক কাপ কফি।

কফি খেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ও। আমি কোনও প্রশ্ন করলাম না, ও নিজে থেকেই বলা শুরু করুক।

বিনতা চলে গেছে তপন, চাপা গলায় অসিত বলতে শুরু করল, কাল রাতে ওর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে, ঝি-চাকরেরা বাড়িতে ছিল না। বিনতা আর আমার দেহ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, বেকায়দায় ফেলে ওর কাছ থেকে আমি এ-প্রতিশ্রুতি আদায় করেছি। আমিও কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিলাম। এ-সম্পর্কে তোমায় আগে কিছু বলিনি আমি। আমার সে-শক্তির কাছে বিনতার শক্তি পরাজিত হয়েছে। সাংঘাতিক রেগে গেছে ও। আজ সকালে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ও এখান থেকে চলে গেছে। জানি, এ নিয়ে নানা গুজব উঠবে, লোকে নানারকম কথা বলবে। কিন্তু বিশ্বাস করো তপন, আমার সামনে এ ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। বিনতার সঙ্গে যে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, এ-কথা আপাতত কাউকে বোলো না তুমি, কেউ জিগ্যেস করলে বোলো, গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করবার জন্য ও দূর পাল্লায় পাড়ি দিয়েছে, ফিরতে বেশ কিছুদিন দেরি হবে।

আমার ধারণা, বিনতা তার প্রেতচক্রের সঙ্গীদের কাছেই গিয়েছে, এখন আমাদের মধ্যে একটা আইনসঙ্গত বিবাহ-বিচ্ছেদ দরকার। তা সে-বিবাহ-বিচ্ছেদ হোক আর নাই হোক, আমি যে ওর অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে একলা থাকতে পারব তাতেই আমি খুশি। কী সাংঘাতিক জীবনের মধ্যে আমি পড়েছিলাম তপন, বিনতা আমার দেহ ছিনিয়ে নিত, আমার অসহায় আত্মাকে বন্দি করে রাখত নিজের নারীদেহের মধ্যে। আমি বাধ্য হতাম নিজের দেহ ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমি সব সময়ই সুযোগ খুঁজতাম। আমার মনের কথা পুরোপুরি বুঝবার মতো শক্তি বিনতার ছিল না। তবে আমি যে মনে-মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠছি, এটা ও বুঝতে পারত। ও সবসময়ই ভাবত আমি বুঝি একান্ত অসহায়। বিনতা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে, আমিই শেষ পর্যন্ত ওকে কোণঠাসা করব। আমিও যে কিছু অলৌকিক শক্তি লাভ করেছি এটা বিনতা বুঝতেই পারেনি। কাজেই ও সতর্ক ছিল না, আর ওর অসতর্কতার সুযোগ নিয়েই আমি আমার শক্তি প্রয়োগ করেছি।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অসিত।

আর একটু কফি খাবে? আমি জিগ্যেস করলাম।

তা খেতে পারি, উদাসভাবে অসিত বলল।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ও আবার বলতে শুরু করল, বিনতার ঝি-চাকরদের বিদায় করে দিয়েছি। সহজে কি যেতে চায় ওরা, নানারকম অজুহাত তুলেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে শুরু করেছিল। যাক, শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে ওরা। মনে হয়, ওরা আমাকে বিরক্ত করতে

আসবে না। সেই কুৎসিত ঢ্যাঙা মেয়েটা, যে আমার ওপর তর্জন-গর্জন করত, এমনভাবে লম্বা দুটো শ্ব-দন্ত বের করে আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল যে, মনে হয়েছিল এই বুঝি দিলে কামড়ে। যাওয়ার আগে হিঃহিঃ করে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠেছিল ও। মেয়েটা যেন এক মূর্তিমতী প্রেতিনী! ও-অভিশপ্ত বাড়িটাই আমি ছেড়ে দেব, তপন, ফিরে আসব আমাদের নিজের বাড়িতে। বাবার পুরোনো চাকর-বাকরদের আবার কাজে বহাল করব।

সেই ভালো, ও-বাড়িটা তুমি ছেড়েই দাও। নিজেদের বাড়িতে ফিরে এলে পরিবর্তিত পরিবেশে তোমার দেহ-মন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

তপন, তুমি বোধহয় ভাবছ আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, কিন্তু ভাই, তুমি নিজের চোখেই তো আমার একটা পরিবর্তন দেখেছ, বিষণ্ণ গলায় অসিত বলল, নামখানা থেকে ফিরে আসবার পথে তোমার চোখের সামনেই তো পরিবর্তনটা ঘটেছিল। বিনতার দুষ্ট আত্মা তখন আমার দেহে ভর করেছিল। আমার আত্মা চলে গিয়েছিল লাইব্রেরি-ঘরে ওর নারীদেহের পিঞ্জরের মধ্যে। আমি বোধহয় তখন তোমায় বলছিলাম বিনতা আসলে কে বা কী।

পরিবর্তনটা তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলে। সুরেন মাইতি মহাশয়-এর বাড়িতে তুমি আমাকেই দেখেছিলে, ফিরবার পথে প্রথমদিকটায় আমিই তোমার পাশে ছিলাম। কিন্তু শেষদিকে আমি আর তোমার পাশে ছিলাম না। ছিল কেবল আমার দেহটা, আর সেই দেহকে আশ্রয় করে ছিল এক অশুভ দুষ্ট আত্মা, সে আত্মা কার? বিনতার? না কি...?

অসিত থামল। আমি কেঁপে উঠলাম। সেদিনের সেই পরিবর্তনের কোনও ব্যাখ্যা আমি আজও খুঁজে পাইনি। কিন্তু এখন অসিত যে-ব্যাখ্যা দিচ্ছে তা একেবারে অসম্ভব। একান্ত অবিশ্বাস্য। এ তো উন্মাদের প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে, এ-ব্যাখ্যা কী করে বিশ্বাস করি?

কিন্তু আমায় তো নিজেকে বাঁচাতে হবে, নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করাটা কি অপরাধ, তপন? বিনতা চিরকালের মতো আমার দেহকে ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল। সেই অন্য মাত্রা আর সময়ের ভয়ঙ্কর জগতের পৈশাচিক প্রেত-চক্রে আর কয়েকবার যোগ দিতে পারলেই বিনতার উদ্দেশ্য সফল হত। ও চিরকালের মতো পেয়ে যেত আমার দেহটাকে। বিনতা হয়ে যেত অসিত, আর হতভাগ্য অসিত মল্লিককে আশ্রয় নিতে হত বিনতার দেহ-পিঞ্জরে। ওর পুরুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হত। নিজের পুরোনো দেহটাকে খুন করে ও পথের কাঁটা অসিত মল্লিককে অবলুপ্ত করে দিত চিরকালের মত। এরকম কাণ্ড ও আগেও করেছে।

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল অসিত। ওর মুখের রেখায়-রেখায় যেন ভয়ের ছাপ।

গাড়িতে আমি আভাসে ইঙ্গিতে তোমায় যা বলতে চাইছিলাম তা হচ্ছে, ও আসলে মোটেই বিনতা নয়। ও হচ্ছে সেই বুড়ো করালীকিঙ্কর সোম। আতঙ্কভরা গলায় অসিত ফিসফিস করে বলল, দেড় বছর আগেই আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল, এবং এখন আমি জানি যে, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। অসতর্ক মুহূর্তে বিনতার হাতের লেখা হয়ে যায় অবিকল করালীকিঙ্করের হাতের অক্ষরের মতো। কথাপ্রসঙ্গে এমন ভাবে অনেক অতীত ঘটনার কথা ও বলত, যাতে মনে হত ঘটনাগুলো যেন ও নিজের চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছে। কিন্তু ঘটনাগুলো হয়তো ওর জন্মেরও অনেক আগেকার।

বুড়ো করালীকিঙ্কর বাঁচতে চেয়েছিলেন অনন্তকাল। তিনি যখন দেখলেন দেহের মৃত্যু আসন্ন, তখন দুরন্ত পৈশাচিক শক্তির প্রভাবে নিজের জরাজীর্ণ দেহটাকে পালটে নিলেন, আশ্রয় নিলেন নিজেরই কিশোরী মেয়ের দেহের মধ্যে। করালীকিঙ্করের জীর্ণ দেহের মধ্যে বন্দি সেই অসহায় মেয়েটিকে তারপর ধীরে-ধীরে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হল। এমনি করেই করালীকিঙ্কর পেয়ে গেলেন এক নবীন দেহ। কিন্তু এ-দেহ পেয়ে করালীকিঙ্কর সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি চাইছিলেন একটি পুরুষ দেহ। আমার সঙ্গে তথাকথিত বিনতার আলাপ হতে সে-সুযোগও এসে গেল। বিনতার দেহ-আশ্রয়ী পিশাচ করালীকিঙ্কর এবার চাইল আমার দেহটাকে ছিনিয়ে নিতে। এক পৈশাচিক পরিকল্পনার

অসহায় শিকার হলাম আমি। কিন্তু আমায় যতটা অসহায় ভেবেছিল ততটা অসহায় আমি সত্যিই নই। আমি সুযোগ খুঁজছিলাম, সুযোগ আসতেই দানবীয় ষড়যন্ত্রের জাল কেটে আমি বেরিয়ে এসেছি।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে অসিত হাঁপাতে লাগল। দম নেওয়ার জন্য থামল কিছুক্ষণ। আমি চুপ করে রইলাম। এর পর অসিত যখন আবার কথা বলতে শুরু করল, তখন ওর গলার স্বর অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ভাবছিলাম অসিতের মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, ও অদ্ভুত সব কথা বলছে! অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছে। ওর ব্যক্তিত্বটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। পরিষ্কার পাগলাগারদের কেস। কিন্তু ওকে আমি পাগলাগারদে পাঠাতে পারব না, মনে হয় কিছুকাল বিনতার প্রভাব-মুক্ত জীবন কাটাতে পারলে ও নিজেই ঠিক হয়ে যাবে, আমাকে দেখতে হবে যাতে ও পুরোনো তান্ত্রিক পুঁথিপত্র নিয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাটি করতে না পারে।

পরে তোমায় আমি আরও বলব, আমার দেহ-মনের ওপর দিয়ে যে-ঝড় বয়ে গেছে, তাতে এখন আমার দরকার দীর্ঘ বিশ্রাম। আমি তোমায় সেই নিষিদ্ধ আতঙ্কময় জগতের কথাও বলব। এ-আতঙ্কময় জগতের বিদেহী বাসিন্দাদের পৈশাচিক মন্ত্রশক্তিতে জাগরিত করে আমাদের জানা জগতে নিয়ে আসতে পারে এমন সাধনভ্রষ্ট বিপথগামী উপাসক সম্প্রদায় এখনও রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে যা কোনও মানুষেরই জানা উচিত নয়। অবশ্য বিশুদ্ধ জ্ঞান হিসেবে যদি কেউ এর চর্চা করে তবে সেটা খারাপ নয়। কিন্তু এই জ্ঞানের ফলে যে-শক্তি অর্জিত হয় তার অপব্যবহার করলেই নেমে আসে অমঙ্গল। শক্তি লাভ করবার পর তা ব্যবহার করবার প্রলোভন সংবরণ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার! তাই তো দেখি অনেক তান্ত্রিক সাধক কিছু ক্ষমতা লাভ করেই তার অপপ্রয়োগ করে সাধন-ভ্রষ্ট হয়। করালীকিঙ্কর সোমের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার ঘটেছিল। তন্ত্র-শক্তি লাভ করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি এমন কাজ করেছিলেন যা কোনও সাধকেরই করা উচিত নয়।

তান্ত্রিক পুঁথিপত্র নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা তোমার পক্ষে ঠিক হবে না, একটু দৃঢ়ভাবেই আমি বললাম।

'গুহ্য সাধনমালা' তন্ত্রের পুঁথিখানা আমি আজই পুড়িয়ে ফেলব। বিনতা ছিল আমার জীবনে একরকম অভিশাপ। আমি শাপমুক্ত হয়েছি, তপন। বিনতা আর আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। তপন, ভাই, একটা কথা বলি। যদি কোনওদিন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তুমি আমাকে সাহায্য কোরো, অবশ্য জানি, এ-কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আমার বিপদে তুমি না বললেও আমায় সাহায্য করবে।

সে-রাতে অসিতকে আর বাড়ি ফিরতে দিলাম না। আমার বাড়িতেই ওর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলাম। সকালে ওকে অনেক শান্ত, অনেক স্বাভাবিক মনে হল। ওর পৈতৃক বাড়িতে ফিরবার ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হল। আমার ধারণা, যত তাড়াতাড়ি ও পৈতৃক বাড়িতে ফিরতে পারে ততই মঙ্গল, বিনতার অপ্রীতিকর স্মৃতি-মাখানো ওই বাগানবাড়ি অসিতের দুর্বল মনের ওপর হয়তো আবার কোনও অশুভ প্রভাব বিস্তার করবে। আমার ধারণার কথা অসিতকে বললাম।

পরদিন সন্ধ্যায় অসিত এল না। আমিই গেলাম ওর বাগানবাড়িতে। সে-সন্ধ্যায় আমরা দুজনেই আমাদের আলোচনায় অদ্ভুত এবং অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গেলাম! বিনতা সম্পর্কে আমাদের, বলতে গেলে মোটেই আলোচনা হল না। স্ত্রীর প্রসঙ্গে আলোচনা অসিতের কাছে শুধু অপ্রীতিকর নয়, বেদনাদায়কও।

অসিত-বিনতাকে নিয়ে আমাদের ছোট্ট মফঃস্বল শহরে অনেক রসাল গালগল্প, অনেক গুজব শোনা যেতে লাগল। কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীকে ঘরে রাখতে পারে না বা যে স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়, তাদের নিয়ে যে কোনও গুজব উঠবে না, এটাই বা আশা করা যায় কী করে।

অসিত যত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে ভেবেছিলাম, তা কিন্তু হল না। কেমন একটা ভয়, একটা মানসিক অবসাদে ও ভুগতে শুরু করল। মাঝে-মাঝে ওর মধ্যে আসত উচ্ছ্বাসের প্রবল জোয়ার। কিন্তু এ-উচ্ছ্বাস স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন হিস্টিরিয়ার ছোঁয়াচ মাখানো।

ইতিমধ্যে অসিতের পৈতৃক বাড়িখানাকে নতুন করে রং করা হয়েছিল। কিছু-কিছু সংস্কারও করা হয়েছিল বাড়িখানায়। কিন্তু ও পৈতৃক বাড়িতে ফিরে এল না। সেই ঘৃণ্য বাগানবাড়িখানা যেন কোনও এক অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রাখল ওকে। বাড়ি পরিবর্তনের কথা বললেই ও নানা অজুহাত তুলে কথাটা আর বেশিদূর এগোতে দিত না।

বিনতার আমলের ঝি-চাকরদের বিদায় করে দেওয়ার পর অসিতের বাবার আমলের এক বুড়ো চাকর ওরসঙ্গে বাগানবাড়িতে থাকত। তার মুখ থেকেই একদিন শুনলাম কথাটা। বাজার থেকে ফিরছিল বুড়ো, রাস্তায় দেখা হল।

কী ব্যাপার নিবারণ, তোমরা বাগানবাড়িটা ছাড়ছ কবে? মল্লিকমশাই-এর বাড়ি তো রং-টং করে রেডি করা হয়ে গেছে, এখন তো উঠে এলেই হয়।

কী জানি বাবু, খোকাবাবুর কী মর্জি। প্রথমে তো ও বাড়িতে ফিরে যাওয়ার খুব উৎসাহ দেখেছিলাম, এখন যেন সে-উৎসাহ কেমন ঝিমিয়ে গেছে। একটু থামল নিবারণ। কিছু ভাবল। তারপর আবার বলল, আর খোকাবাবুও যেন কেমন হয়ে গেছেন। এ যেন সেই আগের খোকাবাবু নন। ডাইনি মেয়েটা খোকাবাবুকে কি কম দাগা দিয়ে গেছে। জানেন বাবু, প্রায় রাতেই খোকাবাবু ঘুমোন না। কেমন যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো একা-একা বাগানে ঘুরে বেড়ান।

তাই নাকি! এসব কথা তো জানতাম না।

আমার মনে হয় কী জানেন বাবু, আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে নিবারণ বলল, সেই ডাইনি মেয়েটা বোধহয় বিদেশ থেকে খোকাবাবুকে ভয়-দেখানো চিঠি লিখতে শুরু করছে আর সেজন্যই চিন্তায়-চিন্তায় খোকাবাবুর রাতে ঘুম হচ্ছে না।

নিবারণ, তোমার খোকাবাবুর ওপর নজর রেখো। আর দেখো, যত তাড়াতাড়ি পারো ওকে তোমাদের পুরোনো বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।

চেষ্টা তো করছি বাবু, কিন্তু খোকাবাবু কথা শুনছেন কোথায়? ও-বাড়িটা আমারও ভালো লাগে না, কেমন যেন ছমছমে-থমথমে ভাব বাড়িটায়। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, রাতেরবেলা—আমি এখন চলি, বাবু।

নিবারণ চলে গেল। চিন্তিত হলাম অসিতের নৈশ বিচরণের সংবাদে। ও কি সমনামব্যুলিস্ট হয়ে যাচ্ছে!

পুজোর ছুটি এসে গেল। ঠিক করলাম, যে করেই হোক অসিতকে বাগানবাড়ি থেকে বের করে আনতেই হবে। ও-বাড়ি থেকে বের করে না আনলে ও কোনওদিনই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না। ভাবলাম, ওকে সঙ্গে করে বাইরে কোথাও কিছুদিন ঘুরে আসব।

আমার প্রস্তাবে রাজি হল অসিত। সেদিন সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসন্ন বিদেশযাত্রা নিয়ে আলোচনা করছিলাম দুজনে। আচম্বিতে অসিতের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। দারুণ উত্তেজনায় ও চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। দারুণ আতঙ্কে ওর মুখ বিকৃত হয়ে গেল। সারা শরীর কাঁপতে লাগল ঝড়ের মুখে বাঁশপাতার মতো।

আমার মাথা! আমার মগজ! টানছে—জোর টান মারছে...ধাক্কা দিচ্ছে...খুবলে নিচ্ছে...তপন, তপন, শয়তানী আমায় ছাড়েনি...দুষ্ট পিশাচ করালীকিঙ্কর এখনও শক্তিহীন হয়নি...আমায় টানছে...অনেক দূর থেকে...নরকের অতল অন্ধকার গহ্বর থেকে আমায় টানছে...আমি পারছি না নিজেকে ধরে রাখতে, পারছি না।...জীবনদীপ! দেহসীমার বাইরে জীবনদীপ কাঁপছে...থিরথির করে কাঁপছে। আমি অভিশপ্ত...আমার মুক্তি নেই...হায় ভগবান!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অসিতকে ধরলাম। ওকে শুইয়ে দিলাম বড় সোফাটার ওপরে। ওর তখন অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থা।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে অসিত যেন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল। ওর ঠোঁট নড়তে লাগল। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে শুরু করল ও। ওর মুখের কাছে আমার কান নিয়ে এলাম।

আবার, আবার ও চেষ্টা করছে, আমার শরীরটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, আমার জানা উচিত ছিল, ও-দুরন্ত দুষ্ট শক্তিকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না, দূরত্ব, জাদু, এমনকী মৃত্যু, কোনও কিছুই এ-অশুভ পৈশাচিক শক্তির চলার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। অদৃশ্য এই শক্তি আসে, রোজ আমায় টানে—কী ভয়ঙ্কর!—তপন, তুমি যদি জানতে এ কী ভয়ানক!...

অসিত থামল, চোখ বন্ধ করল। আমি একটা বালিশ নিয়ে এসে ওর মাথার নীচে রাখলাম। ঘুমোক, ও কিছুক্ষণ ঘুমোক। ডাক্তার ডাকলাম না। ডেকে কী হবে? ডাক্তার তো ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করবেন। ডাক্তার তো বলবেন, ওকে এখুনি কোনও মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠাতে। স্বাভাবিক ভাবেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে, এ-আশা আমি তখনও ছাড়িনি। মাঝরাতে আবার অসিত চিৎকার করে জেগে উঠল, আমি ওকে দোতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। আমরা স্বামী-স্ত্রী রইলাম পাশের ছোট ঘরখানায়। সকালে উঠে দেখলাম ও চলে গেছে। আমাদের কাউকে কিছু না বলে কোথায় গেল অসিত? নিবারণকে ফোন করলাম। জানলাম, অসিত বাড়ি ফিরে এসেছে। গম্ভীর ভাবে লাইব্রেরি ঘরে পায়চারি করছে ও।

এরপর অতি দ্রুত অসিতের ব্যক্তিত্বটা যেন খণ্ড-খণ্ড হয়ে ভেঙে যেতে লাগল। ও আর বাড়ির বাইরে বেরোত না। আমি রোজ ওকে দেখতে যেতাম। শূন্য দৃষ্টি নিয়ে লাইব্রেরি-ঘরে বসে থাকত অসিত। মাঝে-মাঝে মনে হত ও যেন কিছু শুনছে। মাঝে-মাঝে ও যে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলত না তা নয়, কিন্তু সেসব কথা নিতান্তই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। ওর অসুস্থতার কথা বললে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বললে, অথবা বিনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে, অসিত পাগলের মতো হয়ে যেত। নিবারণের কাছে শুনলাম রাতেরবেলা আজকাল ও মোটেই ঘুমোয় না। অদ্ভুত সব আচরণ করে, কখনও নিজের চুল ধরে টানে, কখনও বুক চাপড়ায়, কখনও যেন অদৃশ্য কিছু দেখে দারুণ আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। এরকম অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ও হয়তো কোনদিন নিজেরই দারুণ ক্ষতি করে ফেলবে, হয়তো বা আত্মহত্যাই করে বসবে।

অসিত সত্যিই উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার গুপ্তর সঙ্গে কথা বললাম। উনি কলকাতায় ওঁর দুজন স্পেশালিস্ট বন্ধুর কাছে তার করে দিলেন। তারপর একদিন সন্ধ্যায় তিনজন ডাক্তার আর আমি অসিতের বাগানবাড়িতে এলাম।

স্পেশালিস্ট ডাক্তার সিনহার প্রথম প্রশ্নেই অসিতের সারা দেহ প্রচণ্ড আক্ষেপে থরথর করে কেঁপে উঠল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল ও, তপন, কাদের নিয়ে এসেছ? চলে যাও, এখান থেকে চলে যাও। জানো না আমি অভিশপ্ত? আমার কাছে এসো না, আমায় ছুঁয়ো না, তোমরাও অভিশপ্ত হয়ে যাবে। পালাও, পালাও, শিগগির চলে যাও এখান থেকে।

সেই সন্ধ্যায়ই একখানা ঢাকা গাড়িতে অসিতকে নিয়ে আসা হল আমাদের মফঃস্বল শহরের হাসপাতালে। ঠিক হল, পরে প্রয়োজন হলে ওকে কলকাতায় ডাক্তার সিনহার নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হবে।

হাসপাতালে আমাকেই উন্মাদ অসিতের গার্জিয়ান করা হল। পলিটেকনিক থেকে ফিরবার পথে রোজই ওকে দেখতে যেতাম। আমাকে কাছে পেলেই ও নানারকম অসংলগ্ন কথা বলতে আরম্ভ করত।

আমাকে এ-কাজ করতে হয়েছে, বাধ্য হয়েই এ-কাজ করেছি আমি, ও আমাকে ছিনিয়ে নেবে,

জোর করে ছিনিয়ে নেবে, কেউ আটকাতে পারবে না। আমাকে চলে যেতে হবে সেখানে, সেই অন্ধকার গহ্বরে, মা। মাগো। তপন! বাঁচাও, আমায় বাঁচাও...।

ওর এসব কথা শুনে কান্না পেত আমার। ও কোনওদিন সুস্থ হয়ে উঠবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি আশাবাদী হওয়ার চেষ্টা করতাম।

হাসপাতালে

মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল থেকে একটা ফোন পেলাম। ফোনে খবর পেলাম অসিতের বিচারবুদ্ধি নাকি হঠাৎ ফিরে এসেছে। ওর অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি দুর্বল হয়ে গেলেও, মানসিক সুস্থতা যে ফিরে এসেছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। অবশ্য পর্যবেক্ষণের জন্য ওকে আরও কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। মনে হয়, পর্যবেক্ষণের ফল আশাপ্রদই হবে। সব ঠিক থাকলে, আশা করা যায়, ওকে এক সপ্তাহের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

আনন্দে ভরে গেল মনটা, ছুটলাম হাসপাতালের দিকে। একজন নার্স যখন আমাকে অসিতের কেবিনে নিয়ে গেলেন তখন ওকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

হ্যালো তপন, কেমন আছ? আমায় দেখে সোল্লাসে এক লাফে খাট থেকে নেমে এল অসিত। এ তো সেই দুর্বলমনা অসুস্থ অসিত নয়! এ তো তেজোদৃপ্ত বলীয়ান অসিত!

কী হে কথা বলছ না কেন? অবাক হয়ে গেলে নাকি? অসিতের গলার স্বরে কেমন ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ মাখানো। এ সেই অসিত, যে পাঁচ মাস আগে নামখানা থেকে ফিরবার পথে গাড়ি চালিয়েছিল। এ-অসিতকে আমি শেষ দেখেছিলাম, ওর বাইরে যাওয়ার আগে, যখন ও অভ্যেস মতো কলিংবেল টিপতে ভুলে গিয়েছিল। এ সেই অসিত, যে আমার মনে কেমন যেন এক অজানা অস্পষ্ট ভয়ের শিহরন জাগিয়ে তোলে।

আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি হে! দরাজ গলায় অসিত বলল, তারপর? কবে আমায় এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছ? অমায়িকভাবেই অসিত প্রশ্ন করল।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকদিন তোমায় অবজারভেশনে রাখতে চান।

আরও কয়েকদিন এখানে রাখতে চান! কেন, আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি! স্মৃতিশক্তিটা অবশ্য এখনও দুর্বল। এখানে আসবার কিছুদিন আগের কথা আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না, তবে ওটাও ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে রিলিজ করবার ব্যবস্থা করো।

আরও কয়েকদিন থাকো না কেন এখানে!

এখানে আর মোটেই ভালো লাগছে না। তা ছাড়া অনেক কাজ রয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে এখন আমার কেবল কাজ আর কাজ। একদণ্ড ফুরসৎ ফেলবার সময় হবে না।

এখান থেকে তোমায় সোজা তোমাদের পুরোনো বাড়িতেই নিয়ে যাব।

ও-বাড়িতে আমি যাব না। বাগানবাড়িটাই আমার গবেষণার পক্ষে সুবিধাজনক।

মনের ভিতর আবার ধাক্কা খেলাম। ও আবার বাগানবাড়িতে ফিরতে চাইছে, ও আবার তান্ত্রিক গবেষণা করতে চাইছে। ও না বাগানবাড়ি ছাড়বে বলেছিল? ও না বলেছিল 'গুহ্য সাধনমালা' তন্ত্রের পুঁথিখানি পুড়িয়ে ফেলবে? কেমন যেন গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে না? একটা সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলছি, এর মধ্যে পাগলামির লেশমাত্র নেই, কিন্তু এ কি আমার জানা অসিত? যদি না হয়, তবে এ কে? অসিতই বা কোথায়? সে কি মুক্ত, না বন্দি? নাকি তাকে দুনিয়া থেকে একেবারে মুছে ফেলা হয়েছে?

এরকম সব অদ্ভুত অবিশ্বাস্য চিন্তা আমার মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল। আমি কি আমার জানা অসিতের অসংলগ্ন প্রলাপ বিশ্বাস করতে শুরু করেছি? আমার মনটাও কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে?

কী ভাবছ, তপন? আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে রিলিজ করবার ব্যবস্থা করো।

যাই ডাক্তার গুপ্তর কাছে, দেখি উনি কী বলেন। হতবুদ্ধি হয়ে কেবিন থেকে বেড়িয়ে এলাম। টানা করিডর ধরে এগিয়ে চললাম ডাক্তার গুপ্তর চেম্বারের দিকে। একটা দারুণ অস্বস্তিতে ভরে আছে সারা মন। কিন্তু কেন এই অস্বস্তি তা পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারছি না।

দু-দিন ধরে সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামালাম। কী ঘটেছে? অসিতের আচরণে আবার কেন এই পরিবর্তন? এ কী প্রহেলিকা! ভেবে-ভেবে সমস্যার কোনও কূলকিনারা করতে পারলাম না। দু-দিন ধরে নিজের কোনও কাজকর্মও আমি ঠিকমতো করতে পারলাম না। তৃতীয় দিন সকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ফোনে জানালেন, রোগীর অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে। দু-তিন দিনের মধ্যেই রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

খবরটা পেয়ে কোথায় আনন্দিত হব তা নয়, কেমন এক দুশ্চিন্তার কালো মেঘে আমার মনের আকাশ ছেয়ে গেল। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল আমার মনটা। লোকে বলে, আচ্ছন্ন মনেই আমি সে-রাতে সেই কাল্পনিক অবাস্তব দৃশ্য দেখেছিলাম। এ-ব্যাপারে আমার কিছু বলবার নেই—এ নিয়ে আমি কারুর সঙ্গে তর্কও করতে চাই না। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা আছে তা-ই যথেষ্ট।

আবির্ভাব

সে-রাতেই ঘটল সেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কময় আবির্ভাব। সে-রাতে যে-দারুণ ভয় পেয়েছিলাম, তা থেকে আজও আমি মুক্ত হতে পারিনি। সে-নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা মনে হলে, এখনও আমার সারা দেহ শিউরে ওঠে। সে-রাতে এক 'টেলিফোন কল' হল ঘটনার সূচনা।

রাত প্রায় বারোটা। আমার স্ত্রী শুয়ে পড়েছেন। আমি একা 'স্টাডি'-তে বসে একখানা বই পড়ছিলাম। ব্র্যাম স্টোকারের লেখা 'ড্রাকুলা'। নিঝুম নিস্তব্ধ রাতেই এ-ধরনের বই পড়তে হয়। ট্রানসিলভানিয়ার এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গ। জোনাথান হারকার সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে। জনহীন সেই প্রাসাদে রাতের বেলা পুঞ্জ-পুঞ্জ ধুলো দিয়ে গড়া তিন পিশাচী ঘুরে বেড়ায় পৈশাচিক রক্ত-তৃষ্ণায়...।

ক্রিং-ক্রিং করে ফোন বেজে উঠল, বিরক্ত হলাম। কাহিনির এমন একটা জমাট জায়গায় এসে পড়েছি, এ-সময়ে কে আবার বাধা দিয়ে রসভঙ্গ করল?

ক্রিং-ক্রিং করে ফোন বেজেই চলল। নিতান্ত অনিচ্ছায় রিসিভারটা তুললাম।

হ্যালো, কে? আমি তপন চৌধুরী বলছি।

ওপাশ থেকে কোনও সাড়া এল না।

হ্যালো, কে? কথা বলুন।

কোনও সাড়া নেই।

বিরক্ত হয়ে রিসিভারটা রেখে দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, ওপাশ থেকে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে।

কেউ যেন দারুণ অসুবিধার মধ্যে কিছু বলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বক্তার কোনও কথা আমি বুঝতে পারলাম না। গ্লাব...গ্লাব...ব্লাব...ধরনের কতগুলো অদ্ভুত ধ্বনি ওপাশ থেকে আমার

কানে ভেসে এল।

কে? কে কথা বলছেন? পরিষ্কার করে বলুন।

আবার ভেসে এল সেই সেই অদ্ভুত গ্লাব...গ্লাব...ব্লাব...ব্লাব ধ্বনি।

মনে হল, এটা বোধহয় কোনও যান্ত্রিক শব্দ। হয়তো ও পাশের ফোন খারাপ হয়ে গেছে, তাই বক্তার কোনও কথা আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে না, আমার কথা হয়তো সে শুনলেও শুনতে পারে। এই ভেবে বললাম ঃ

দেখুন, আপনার কোনও কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না। আপনার ফোনে বোধহয় কোনও গন্ডগোল হয়েছে। আপনি বরং রেখে দিন। যদি আমাকে কিছু জানাবার থাকে তবে অন্যপথে জানাতে চেষ্টা করুন।

বলতে গেলে সঙ্গে-সঙ্গেই ওপাশ থেকে রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ ভেসে এল।

রাত বারোটা দশ। কোথা থেকে এল ফোনটা? পরে খোঁজ করে জানা গিয়েছিল যে, ফোনটা এসেছিল অসিতের বাগানবাড়ি থেকে। কিন্তু ও-বাড়ি থেকে কে ফোন করবে? ও-বাড়ি তো তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। কেবল নিবারণ সপ্তাহে একদিন গিয়ে অসিতের বইগুলো ঝেড়ে-মুছে দিয়ে আসে।

পরে বাগানবাড়িতে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ কী দেখেছিল? দেখেছিল, বাগানের এক জায়গায় মাটি খোঁড়া, সেখান থেকে কেউ যেন বাড়ির দিকে এগিয়ে এসেছিল। তার চলার পথে অদ্ভুত পায়ের দাগ, ছড়ানো মাটি—ঝুরঝুর করে মাটি যেন ঝরে পড়েছে। একটা ভাঙা তালা আর একখানা পাথর—এ-পাথর দিয়েই তালা ভাঙা হয়েছে। একটা খোলা পোশাকের আলমারি। পোশাকগুলো এলোমেলো—মনে হয় কে যেন ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। টেলিফোনের রিসিভারটার ওপর আঠা-আঠা কী যেন লেগে আছে। পড়ার টেবিলে ছড়ানো বই আর খাতাপত্র। একখানা খাতা খোলা, তার একটা পাতা কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। আর সব জায়গায় বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে গেছে এক অসহ্য দুর্গন্ধে।

পুলিশ ভুল করছে—এখনও বুঝতে পারছে না আসল ব্যাপারটা—এখনও পুলিশ ভাবছে কোনও ছাড়িয়ে দেওয়া ঝি অথবা চাকরই সে-রাতের কাণ্ডের জন্য দায়ী। কর্মচ্যুতির প্রতিশোধ নিয়েছে সে। আর আমাকেও ভয় দেখিয়েছিল এজন্য যে, ঝি-চাকরদের মনে হয়তো এই ধারণা হয়েছিল যে, ওদের কর্মচ্যুতির জন্য আমিও দায়ী। আমিই হয়তো অসিতকে ওদের ছাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম।

যতসব বোকার দল! ওরা কী মনে করে যে মূর্খ ঝি-চাকরেরা হাতের লেখা জাল করেছিল? ওদের কি ধারণা সে-রাতে যে-ভয়ঙ্করের আবির্ভাব হয়েছিল কর্মচ্যুত কোনও ঝি অথবা চাকরই তার জন্য দায়ী? অসিতের মধ্যে কোনও পরিবর্তনই কি পুলিশ লক্ষ করেনি?

আমি? আমি এখন বিশ্বাস করি অসিত আমাকে যা বলেছিল তা মোটেই বিকারগ্রস্ত মনের অসংলগ্ন প্রলাপ নয়। অসিতের প্রতিটি কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

জীবনের কিনারায় রয়েছে কুয়াশাঘেরা এক অস্পষ্ট ছায়াময় আতঙ্কঘন অবাস্তব জগৎ। তার অস্তিত্ব আমরা জানি না।

কোনও কৌতূহলী মনের আহ্বান সে-জগতের কোনও আতঙ্ককে নিয়ে আসতে পারে আমাদের জগতে। ক্রমে সেই বিদেহী আতঙ্ক আচ্ছন্ন করে ফেলে আবাহনকারীকেই।

তন্ত্রসাধক করালীকিঙ্কর আহ্বান করেছিলেন এমনি এক মহা ভয়ঙ্করকে। সে-ভয়ঙ্কর আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাঁকে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর নিজস্ব সত্তা। বিদেহী ভয়ঙ্কর অন্য দেহ আশ্রয় করে অনন্তকাল ধরে বিচরণ করতে চেয়েছিল পৃথিবীর বুকে। তার প্রথম শিকার সাধক করালীকিঙ্কর স্বয়ং। করালীর দেহ জীর্ণ হলে সেই দুষ্ট আত্মা বিনতার দেহ কেড়ে নিল। তারপর এল অসিতের

পালা। এমনি করে হয়তো যুগ-যুগান্তর ধরে সেই বিদেহী দুষ্ট আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে আশ্রয় নেবে। পৃথিবীতে থাকবার ফলে বিদেহী আত্মার অনেক শক্তি ক্ষয় হয়। তাই নষ্ট শক্তিকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য যেতে হয় সেই নাম-না-জানা অবাস্তব জগতের প্রেতচক্রে। প্রেতপুরীর অধীশ্বরের কাছ থেকে নতুন করে অশুভ শক্তি সঞ্চয় করতে হয়।

কী মহা দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করেছিলেন তন্ত্রসাধক হতভাগ্য করালীকিঙ্কর!

আমি নিজে কি নিরাপদ? অসিতের বন্ধু হিসেবে বিদেহী দুষ্ট আত্মার কোপে আমি কি পড়িনি?

পরদিন বিকেলে যখন রাতের আতঙ্ক থেকে আমি কিছুটা মুক্ত হলাম, তখন সোজা চলে গেলাম হাসপাতালে। অসিতের কেবিনে গিয়ে পরপর ছ'টা গুলি করে ওর দেহটাকে মেরে ফেললাম, হতভাগ্য অসিতের মুক্তির জন্য—পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য এ-কাজ আমাকে করতে হল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অসিতের দেহটা পুড়িয়ে না ফেলা হচ্ছে ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। মূর্খের দল ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহটাকে আটকে রাখছে। দেহটাকে এক্ষুনি পুড়িয়ে ফেলা দরকার। কেন না এখনও দুষ্ট আত্মা মৃতদেহটার মায়া কাটাতে পারেনি। দেহটাকে পুড়িয়ে ফেলতে পারলে সে আত্মা বাধ্য হবে নিজের প্রেতলোকে ফিরে যেতে। দেরি হলেই সর্বনাশ! হয়তো আর কোনও হতভাগ্য সেই বিদেহী পিশাচের শিকার হবে। হয়তো আমিই হব সেই হতভাগ্য শিকার!

না, আমি হব না, আমি অসিতের মতো দুর্বলমনা নই। যতবড় দুরন্ত দুষ্ট আত্মাই হোক না কেন, আমার দেহ সে কিছুতেই ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

না, পরের কথা আগে বলে ফেলেছি. ধারাবাহিকভাবেই কাহিনিটা বলা যাক।

সে-রাতের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা আমি যতদূর সম্ভব গুছিয়ে বলবারই চেষ্টা করব। সে-রাতে তিনজন চৌকিদার যে একটা অদ্ভুত মূর্তিকে দেখেছিল, তার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি নিজের চোখে যা দেখেছিলাম তার কথা। কিন্তু চৌকিদারদের দেখা আর আমার দেখার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। পুলিশ কেন যোগসূত্রটা দেখতে পাচ্ছে না? নাকি দেখতে পেয়েও অবিশ্বাস্য বলে অস্বীকার করে যাচ্ছে?

যাক ও কথা, আমার নিজের কাহিনিতেই ফিরে আসি।

ঘুমিয়ে ছিলাম। ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং...ক্রিং-ক্রিং কলিংবেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। এ তো অসিতের পুরোনো 'সিগনাল'। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত দুটো। এত রাতে অসিত আমার দরজায়! আমার জানা পুরোনো অসিত, যে তার পুরোনো ডাকবার ভঙ্গিটা মনে রেখেছে! ওর নতুন ব্যক্তিত্ব তো ভুলে গিয়েছিল এ-ডাক। অসিত কি আবার তার স্বাভাবিক প্রকৃতিতে ফিরে এসেছে? এত রাতে ও এখানে কেন? ওকে কি হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে? নাকি ও পালিয়ে এসেছে? আমার মনে এ-প্রশ্নগুলো জাগল।

যাই হোক না কেন, এ যে অসিতের ডাক সে-বিষয়ে কোনও ভুল নেই। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। সদর দরজা খুলতে হবে। স্ত্রীর ঘুম ভাঙেনি, ওকে আর জাগালাম না।

দরজা খুললাম। আচম্বিতে একটা দারুণ দুর্গন্ধের ঝাপটা যেন আমার ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়কে আঘাত করল। একটা দারুণ বিবমিষা যেন পেয়ে বসল আমাকে। অতি কষ্টে বমনের বেগ সংবরণ করলাম। আমার দৃষ্টি পড়ল দরজার সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো মূর্তিটার ওপর। ডাকটা নিঃসন্দেহে অসিতের। কিন্তু, এ কে? এ তো অসিত নয়। এই তো এক্ষুনি অসিত বেল টিপছিল, মুহূর্তের মধ্যে সে উধাও হল কোথায়?

দরজায় দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক ঢাকা এক খর্বকায় মূর্তি। মূর্তির গায়ে অসিতেরই একটা ওভারকোট। ওভারকোটের তলাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। হাতগুলো যদিও গুটোনো, তবুও ঢলঢল

করছে। তাই হাত দেখা যাচ্ছে না। মূর্তির মাথায় অসিতের শখ করে কেনা বিলিতি টুপি। টুপির কিনারা মুখের ওপর টেনে নামানো। একটা কালো রঙের সিল্কের মাফলারে মূর্তির মুখটা ঢাকা। এ কে? কোথা থেকে এল এই গভীর রাতের আগন্তুক?

স্খলিতপদে এগোলাম। কে আপনি? কী চাই? কোনও স্পষ্ট জবাব এল না মূর্তিটার কাছ থেকে। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা অর্ধ-তরল ধ্বনি, গ্লাব...গ্লাব...ব্লাব...ব্লাব...।

এরকমের ধ্বনিই আমি ফোনে শুনেছিলাম।

টলতে-টলতে আমার দিকে এগিয়ে এল আপাদমস্তক ঢাকা দেহটা। আমার দিকে এগিয়ে ধরল একটা বড় পেনসিলের মাথায় আটকানো একখানা লম্বা কাগজ। প্রচণ্ড অস্বস্তিকর দুর্গন্ধে তখনও আমার বমি পাচ্ছে। কাগজখানা পেনসিলের মাথা থেকে খুলে নিলাম। ড্রয়িংরুমের খোলা দরজা দিয়ে আসা আলোয় চেষ্টা করলাম কাগজখানা পড়তে।

নিঃসন্দেহে এ অসিতের হাতের লেখা। কিন্তু অসিতের লিখবার কী দরকার ছিল? ওর বক্তব্য তো ও ফোন করেই আমাকে জানাতে পারত। ওর হাতের অক্ষরও তো দেখছি এলোমেলো, কাঁপা-কাঁপা, যেন কোনও অশীতিপর বৃদ্ধ লিখেছেন কাগজখানা। ম্লান আলোয় পড়তে পারলাম না। এগোলাম ড্রয়িংরুমের দিকে। টলমল করতে-করতে মূর্তিটাও এগোতে লাগল। কিন্তু ড্রয়িংরুমে ঢুকল না, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর রাতের এই আপাদমস্তক ঢাকা রহস্যময় আগন্তুকের গায়ের গন্ধ সত্যিই অসহ্য। শুধু অসহ্যই বা কেন, দারুণ আতঙ্ককর। এ-বিশ্রী পচা গন্ধটা যেন ভেসে আসছে জীবনের ওপার থেকে।

কাগজখানা পড়তে শুরু করলাম, একখানা চিঠি। আমাকেই লেখা। পড়তে-পড়তে এক প্রচণ্ড আতঙ্কের হিমশীতল স্রোত যেন আমার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল। হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে গেল, দু-চোখে নেমে এল অমানিশার নিকষ কালো অন্ধকার। অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান হতে দেখলাম ড্রয়িংরুমের মেঝেতে পড়ে আছি। সেই অভিশপ্ত চিঠিখানা তখনও আমার মুঠোয় শক্ত করে ধরা। দরজার বাইরে সেই আপাদমস্তক ঢাকা হতভাগ্য মূর্তিটা আর দাঁড়িয়ে নেই। তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে দরজার বাইরে বারান্দার মেঝেতে। পূতিগন্ধময় গলিত স্রোত বেরিয়ে আসছে পোশাকের স্তূপের মধ্যে থেকে। এবার আমি জানি এ কে। এ কী!

বাইরের খোলা হাওয়ায় ভাঙনের কাজ শুরু হয়েছে। এ-দেহ আর কোনওদিন হাঁটবে না। এ-দেহে আর কোনওদিন চেতনা আসবে না। দারুণ আতঙ্কে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

চিঠি

সে-রাতে যে-চিঠিখানা পেয়েছিলাম তা হুবহু তুলে দিচ্ছি।

তপন,

চিঠিখানা পাওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে গিয়ে আমার দেহটাকে হত্যা করে আসবে। ও-দেহে আর আমি নেই। বিনতা চিরকালের মতো আমার দেহ ছিনিয়ে নিয়েছে। না, বিনতাই বা বলি কেন, মন্দভাগ্য করালীকিঙ্কর যে দুষ্ট বিদেহী আত্মাকে এক অশুভ মুহূর্তে আহ্বান করেছিলেন, সেই আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে আশ্রয় নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমার দেহটাকে কেড়ে নিয়েছে।

তোমার কাছে একটা কথা গোপন করেছিলাম। বিনতা আমায় ছেড়ে চলে

যায়নি। আজ প্রায় চারমাস হল সে মারা গেছে। আজ তোমার কাছে স্বীকার করছি, আমিই বিনতাকে খুন করেছি, খুন করতে বাধ্য হয়েছি। হঠাৎ-ই সুযোগ এল, আর মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। ঝি-চাকররা বাড়িতে ছিল না। ওরা যাত্রা শুনতে গিয়েছিল, বাড়িতে ছিলাম আমরা দুজন। আমি তখন আমার নিজের দেহেই ছিলাম।

লাইব্রেরি, ঘরে পড়ছিল বিনতা। আমি পাশের ঘরে বসেছিলাম চুপচাপ। হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল টেবিলের উপরে রাখা পাথরের ফুলদানিটার ওপর। মুহূর্তের মধ্যে মাথার ভিতরে পরিকল্পনাটা তৈরি হয়ে গেল। ভারী ফুলদানিটা নিয়ে পা টিপে-টিপে এগোলাম পাশের ঘরের দিকে। ফুলদানিটা দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম বিনতার ব্রহ্মতালুতে। টুঁ শব্দটি করবার অবসর পেল না ও। মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল। বিশ্বাস করো তপন, এ ছাড়া আমার সামনে মুক্তির আর কোনও দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। বিনতা পরিকল্পনা করছিল, আর সাময়িকভাবে নয়, চিরকালের মতো আমার দেহটাকে কেড়ে নিতে।

বিনতার দেহটাকে কবর দিলাম বাগানে। ঝি-চাকর কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। কিন্তু ওদের অতীত জীবনও কলঙ্কমুক্ত নয়, পিশাচ-আশ্রিত করালীকিঙ্করের অনেক অপকর্মের সঙ্গী ছিল ওরা। কাজেই পুলিশের কাছে যাওয়ার সাহস ওদের ছিল না। বেশ কিছু টাকাপয়সা দিয়ে ওদের বিদায় করলাম।

ভাবলাম এবার আমি নিশ্চিন্ত, কিন্তু হায় ভগবান! তখনও আমি বুঝিনি কী সাংঘাতিক অশুভ শক্তির পাল্লায় আমি পড়েছি। মৃত্যু পর্যন্ত এ-শক্তির গতি রোধ করতে পারে না।

ক'দিন বেশ কাটল। তারপর একদিন সন্ধ্যায় যখন তোমার বাড়িতে আসবার জন্য তৈরি হচ্ছি, তখন আবার এল সেই অদ্ভুত অনুভূতি। অদৃশ্য কোনও শক্তি যেন আমার মস্তিষ্কে জোর টান মারছে। মগজটা যেন আমার দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি এ কীসের আকর্ষণ—আমার মনে রাখা উচিত ছিল। অশুভ আত্মা বিনতার মৃতদেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়নি। যতদিন পর্যন্ত ওর দেহটা পচে গলে মাটির সঙ্গে না মিশে যাবে ততদিন পর্যন্ত প্রেতলোকের দুষ্ট আত্মার প্রভাব থাকবে ও-দেহের ওপরে।

দুষ্ট আত্মা আমার দেহকে আবার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, আমার হতভাগ্য আত্মাকে পাঠিয়ে দিতে চাইছে কবরের নীচে শায়িত এক বিকৃত গলিত শবদেহের মধ্যে।

বুঝলাম কী মহা দুর্ভাগ্য আমার জীবনে আসছে। আসন্ন দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। আর সেইজন্যই আমাকে যেতে হল হাসপাতালে।

তারপর একদিন এল সেই মহা দুর্ভাগ্য! দেখলাম বিনতার গলিত শবদেহে আমি বন্দি। দুষ্ট আত্মা নিশ্চয়ই হাসপাতালে আমার দেহে আশ্রয় নিয়েছে—চিরকালের মতোই ছিনিয়ে নিয়েছে আমার হতভাগ্য দেহটাকে। এবার হাসপাতালের আমি-বিহীন আমার দেহটা সুস্থ হয়ে উঠবে। তারপর একদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দেবেন অসিত মল্লিককে। পৃথিবীর বুকে শুরু হবে অসিত মল্লিকের দেহ-আশ্রয়ী এক মহা-অমঙ্গলের অবাধ বিচরণ।

গলিত শবদেহের ভিতরে আমার বন্দি আত্মা এ-কথা ভাবতে-ভাবতে

উত্তেজিত হয়ে উঠল। একটা কিছু করা দরকার—একটা কিছু করতে হবে—পৃথিবীকে মুক্ত করতে হবে দুষ্ট আত্মার প্রভাব থেকে। দারুণ উত্তেজনায় আমি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। অনেক কষ্টে দু-হাতে কবরের মাটি সরিয়ে আমি পৃথিবীর বুকে উঠে এলাম।

শবদেহের মুখের কাছটা একেবারে পচে গেছে। ও-মুখ দিয়ে আর কথা বলা যায় না। তোমাকে ফোন করলাম কিন্তু কোনও কথা বলতে পারলাম না। লিখবার শক্তি বোধহয় এখনও আছে। অনেক কষ্টে চিঠিখানা লিখলাম। কিন্তু তোমাকে পাঠাই কী করে? আর-একটা বেপরোয়া কাজ করলাম। নিজেই নিয়ে এলাম, আমার শেষ চিঠিখানা। এ-চিঠি কেবল কোনও হতভাগ্য মানুষের শোচনীয় পরিণতির দলিল নয়—এ হচ্ছে এক সাবধানবাণী। এ-চিঠির মধ্যে দিয়ে অভিশপ্ত অসিত মল্লিক তোমাকে সাবধান করছে—সমস্ত পৃথিবীকে সাবধান করছে।

তপন, পৃথিবীতে যদি শান্তি চাও, মানুষকে যদি ভালোবাসো, তবে হাসপাতালে গিয়ে আমার দেহটাকে হত্যা করো, কোনও দয়া কোরো না—কোনও মায়া কোরো না! মনে রাখবে, ও-দেহে আমি নেই। আছে এক অশুভ দুষ্ট আত্মা। দেখো, আমার দেহটাকে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। দেহটা নষ্ট হলেই বিদেহী আত্মাকে ফিরে যেতে হবে প্রেতলোকে।

নীচু স্তরের তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে কোনওদিন ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, তপন। শেষ পর্যন্ত তা অমঙ্গলই ডেকে আনে।

বিদায় বন্ধু, পুলিশকে সব কথা খুলে বলো। জানি না পুলিশ কতটা বিশ্বাস করবে, তোমাকে এই পৈশাচিক ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনতে হল বলে আমি খুব দুঃখিত।

আমার অভিশপ্ত জীবনও শেষ হয়ে এল, পচা গলা এ দেহটা আর বেশি দিন টিকবে না। দেহটা নষ্ট হয়ে গেলেই আমার মুক্তি আসবে।

আশা করি, আমার হাতের লেখা তুমি পড়তে পারছ। যাওয়ার আগে আবার বলি পিশাচ-আশ্রিত ওই দেহটাকে তুমি হাসপাতালে গিয়ে খুন করো।

আমার জন্য দুঃখ করবার মতো কেউ নেই। আমার কথা মনে করে তুমি দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলো।

অসিত

উপসংহার

পরদিন সকালে আমাদের ছোকরা চাকরটাই আমার অজ্ঞান অচৈতন্য দেহটাকে আবিষ্কার করল। দরজার ওপাশে আপাদমস্তক মোড়া তালগোল পাকানো বস্তুটা দেখে ও ভয় পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমার মতো অজ্ঞান হয়ে যায়নি। ও পুলিশে ফোন করল, পুলিশ যখন এল তখন আমার অচেতন দেহটাকে দোতলায় শোওয়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্গন্ধময় পোশাকের স্তূপটা তখনও পড়ে আছে ড্রয়িংরুমের বারান্দায়। পুলিশের লোকেরা নাকে রুমাল চাপা দিল।

অসিতের পোশাকের ভেতর থেকে পুলিশ যা খুঁজে পেল তা হচ্ছে এক পচা গলা শবদেহ, শবদেহের কোনও-কোনও অংশে মাংস ঝরে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। মাথার ব্রহ্মতালু ফাটা।

মুখটা একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে। বোঝাই যায় না কার দেহ এটা।

শেষ পর্যন্ত দাঁতের গড়ন দেখে বোঝাই গেল দেহটা বিনতারই।

আমার কাহিনি শেষ হল, সব কথাই খুলে লিখলাম আমি। এখনও কি আপনারা আমায় পাগল ভাবছেন? ভাবুন। আমার আর কিছু বলবার নেই। আমার যা বক্তব্য তা আমি বলেছি। আমার যা করণীয় তা আমি করেছি।

শুনছি, কর্তৃপক্ষ নাকি আমাকে রাঁচি পাঠাবার কথা ভাবছেন। ঠিক আছে—ডাক্তারি পরীক্ষাতেই প্রমাণিত হবে আমার সত্যিই মনোবিকার ঘটেছে কি না।

কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, ওরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অসিতের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলেন। না হলে..

তপনের বিবৃতি এখানেই শেষ হয়েছে। শেষ বাক্যটা আর ও সমাপ্ত করেনি।

নাটকের নাম শিবাজী



অশোক বিশ্বাস

শ. সে. র. উ. ৩—৬১

গ্রীষ্মের খরতাপে ধরণী যখন দগ্ধ, তখন আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখিলে কাহার না হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে!

কয়েক দিন ধরিয়া প্রচণ্ড গরম যাইবার পর মাঝরাত হইতে রিমঝিম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। আমরা চা ও তেলেভাজা সহযোগে আদিরসাত্মক গল্প জমাইয়াছিলাম। হিমাদ্রি আগাগোড়াই এত তর্ক করিতেছে, তাহার সহিত গলা চড়াইয়া তর্ক করা আমার কর্ম নয়। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে এবং শেষ পর্যন্ত লখিন্দরকে আমার পিছনে লেলাইয়া দিবে। লখিন্দর একটি বানর শিশু। একদিন যেন কী একটা অপরাধের জন্য আমাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া আর একটু হইলে প্রায় নাগা সন্ন্যাসী করিয়া ফেলিয়াছিল আর কী! তির্যক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিলাম, হিমাদ্রির ইজিচেয়ারের হাতলে বসিয়া সে কচি লেজটি খেলাইতে-খেলাইতে বেগুনি চিবাইতেছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই একবার দাঁত খিঁচাইয়া দিল।

অতঃপর আমি একেবারে নীরব শ্রোতা হইয়া গেলাম। হয়তো আরও কিছুক্ষণ হিমাদ্রির জ্ঞান বিতরণ চলিত, কিন্তু গদাই হন্তদন্তভাবে আসিয়া হাজির। গদাই আমাদের বাসার নিকটেই থাকে। মাঝে-মাঝে আমাদের এখানে বেড়াইতে আসে। তাহার বাবা প্রণবশঙ্কর রায় স্টোন চিপসের বড় ব্যবসায়ী। দিন পনেরো পূর্বে তাহার দিদি যূথিকার বিবাহ হইয়াছে। আমরা নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছি। জামাই চিত্তরঞ্জনের চাকুরে। দেখিতে-শুনিতে খারাপ নয়।

গদাইয়ের কাছে কয়েকদিন পূর্বে শুনিয়ছিলাম, তাহার দিদি ও জামাইবাবুকে দ্বিরাগমনে আনিবার জন্য তাহার বাবা চিত্তরঞ্জনে গিয়াছেন।

কিশোর গদাইকে এভাবে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কী খবর, গদাই, দিদি এসেছে বুঝি?

গদাই বলিল, দিদি তো পরশু এসেছে। জানেন, আমাদের কুকুরটা জামাইবাবুর গলা কামড়ে দিয়েছে। জামাইবাবু মরে গেছে। মা, বাবা, দিদি, ফড়িং, ভেঁপু সবাই কাঁদছে। আপনারা দেখবেন তো চলুন। পুলিশ এসেছে। ডাক্তার এসেছে। বিনুকাকু; মাসি, রমেনদা আরও কত লোক। জামাইবাবুর বাড়ি টেলিগ্রাম করেছে।

গদাই এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া গেল।

খবর শুনিয়া আমরা হতবাক হইয়া গেলাম।

গদাইদের বাড়িতে বাঘের মতো একটি কুকুর আছে। দরজায় 'কুকুর হইতে সাবধান' কথাটি বড়-বড় হরফে লেখা আছে। তাহাদের বাড়ির সামনে দিয়া যাইবার সময় মাঝে-মাঝে দরজায় কুকুরটিকে বড়-বড় ধারালো দাঁতের উপর দিয়া জিভটি ঝুলাইয়া দিয়া হিংস্রভাবে রাস্তার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লক্ষ করিয়াছি।

হিমাদ্রি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমরা যাচ্ছি। তুমি যাও।

গদাইদের বাড়িতে প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমাদের পরিচিত ইন্সপেক্টর চট্টরাজকে দেখিতে পাইলাম।

হিমাদ্রি বলিল, কাছেই থাকি। খবরটা শুনে না এসে পারলাম না।

চট্টরাজ আমাদের বসিতে বলিলেন।

ঘরে গদাইয়ের মা, বাবা প্রণবশঙ্করবাবু ছাড়াও তিনজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলাকে উপস্থিত থাকিতে দেখিলাম। অপরিচিতদের সহিত ইন্সপেক্টর পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভদ্রমহিলার নাম নির্ঝরিণী দেবরায়। প্রণবশঙ্করবাবুর জ্যাঠতুতো শ্যালিকা। তিনজন ভদ্রলোক। বিনয়বাবু—

গদাইয়ের দূরসম্পর্কের কাকা। সমিতবাবু—প্রণবশঙ্করবাবুর পিসতুতো বোনের ছেলে। এবং রমেনবাবু, গদাইয়ের দিদি যূথিকার পুরোনো গৃহশিক্ষক। রমেনবাবু ছাড়া সকলেই এ-বাড়িতে থাকেন।

ঘরে শোকপর্ব চলিতেছিল। চারিদিকে ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস ও ছলছল চোখ দেখিয়া মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল বসিবার ঘরের দরজা পার হইয়া বারান্দায়— যেখানে গদাইয়ের সদ্য-বিধবা দিদি যূথিকা পা ছড়াইয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া উদাসভাবে বসিয়াছিল। যূথিকার বয়েস বছর বাইশ হইবে। চোখ, মুখ, রং, চুল, স্বাস্থ্য—সব মিলিয়া তাহাকে সুন্দরী দেখিতে। মুখে তাহার গতরাত্রের প্রসাধন চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। কোলের ওপর নিটোল হাত দুটি অলসভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। গায়ে অন্তর্বাস কিছু নাই। পরিধানে কেবল একটি মাত্র শাড়ি। তাহাও অগোছালো। উগ্র যৌবনের প্রতিটি রেখা প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

হঠাৎ হিমাদ্রির কনুইয়ের মৃদু খোঁচা খাইলাম। লজ্জা পাইয়া দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া সকলের প্রতি একবার চাহিয়া লইলাম—কেহ দেখিয়া ফেলে নাই তো!

হিমাদ্রির প্রশ্নে চট্টরাজ জানাইলেন যে, কুকুরটির ক্ষিপ্ততার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

হিমাদ্রির আগ্রহে চট্টরাজ এবার আমাদের মৃতদেহ দেখাইতে চলিলেন।

একটি ঘরে পুলিশ পাহারায় মৃতদেহটি একটি সাদা কাপড়ে আবৃত ছিল। হিমাদ্রি স্বহস্তে কাপড় উঠাইয়া লইল। মৃত ব্যক্তির বয়েস ত্রিশের মধ্যে; সুদর্শন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পরনে কেবল একটি ধুতি। মৃতদেহের কণ্ঠনালি কাটা। গলার সমস্ত মাংস, শিরা-উপশিরা একেবারে উপড়াইয়া গিয়াছে। চোখ দুটি খোলা। কষ বাহিয়া খানিকটা রক্ত মিশ্রিত লালা বাহির হইয়া শুকাইয়া রহিয়াছে। মুখে একটি বিভীষিকার চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে। শরীরে কোনও আঁচড়ানোর চিহ্ন নাই।

হিমাদ্রি মৃতদেহ উপুড় করিয়া দিল। তারপর অনেকক্ষণ কী যেন দেখিয়া লইয়া ঘাড়ের কাছে একটি কালশিটা পড়া জায়গার দিকে চট্টরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইল।

চট্টরাজ বলিলেন, আমি দেখেছি। মনে হয়, কুকুরটাকে আক্রমণ করতে দেখে পিছু হটতে গিয়ে দেওয়ালে বা রেলিঙের গরাদে ধাক্কা খাওয়ার ফলে হয়ে থাকবে।

হিমাদ্রি মৃতদেহের উপর আবরণটি টানিয়া দিয়া বলিল, যেখানে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, সে-জায়গাটা একটু দেখব।

আমরা সিঁড়ি ভাঙিয়া দ্বিতলে উপস্থিত হইলাম। দ্বিতলে সিঁড়ির দুপাশে দু-খানি করিয়া চারখানি ঘর। সামনে বারান্দা। ঘরগুলির পিছনদিক দিয়াও এই একই রূপ বারান্দা। প্রতিটি ঘরে পূর্ব-পশ্চিম-মুখো দুইটি করিয়া দরজা। বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে বাথরুম। উত্তর প্রান্তে খোলা ছাদে যাইবার দরজা। একপাশে একখানি ঘরে থাকেন বিনয়বাবু। তাহার পাশের ঘরে সমিতবাবু। অন্যপাশে পাশাপাশি দু-খানি ঘরে যূথিকা এবং নির্ঝরিণী।

ইন্সপেক্টর চট্টরাজ বাথরুম হইতে কয়েকহাত দূরে বারান্দায় একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এইখানে বিবেকবাবুর মৃতদেহ পড়েছিল।

দেখা গেল, সেখানে খানিকটা রক্ত জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে এবং রক্তের ছোট-ছোট ফোঁটা ক্রমশ বাথরুমের দিকে গিয়াছে। হিমাদ্রি রক্তের দাগ লক্ষ করিয়া বাথরমের দ্বার ঠেলিয়া খুলিয়া দিল। ভিতরে রক্তের দাগ নাই।

হিমাদ্রি খানিক্ষণ আনমনা ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর চট্টরাজের দিকে তাকাইয়া বলিল, ইন্সপেক্টর, বাড়ির লোকেদের স্টেটমেন্ট নেবেন না?

ও, শিওর। অন্তত মৃত্যুটা যখন স্বাভাবিক নয়।

তাহলে আমি যদি ঘরগুলো একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে চাই, আপনার কোনও আপত্তি হবে কি?

বুঝেছি, কেসটার ব্যাপারে আপনি খুব ইন্টারেস্টেড। কিন্তু এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন, মিস্টার সেন? অমায়িকভাবে হাসলেন চট্টরাজ।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়। আমার খেয়ালি মনের খানিকটা খোরাক আর এ-ফ্যামিলির সঙ্গে আমার খানিকটা সূক্ষ্ম কৃতজ্ঞতা জড়িয়ে আছে, তাই আর কী।

বেশ, আপনি দেখুন। আমি ততক্ষণে তলায় গিয়ে স্টেটমেন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করি। শীঘ্র আসছেন আশা করতে পারি।

ইন্সপেক্টর নীচে নামিয়া গেলেন।

আমরা প্রথমে যূথিকার ঘরে প্রবেশ করিলাম। এই ঘরে কাল বিবেকবাবু শয়ন করিয়াছিলেন। আজ তিনি নাই।

ঘরের আসবাব অল্প। একটি খাট। ড্রেসিং টেবিল। টিপয়ে পানীয় জল-ভরতি একটি জার। আলনায় যূথিকার পোশাকের সঙ্গে বিবেকরঞ্জনের ধুতি-পাঞ্জাবি রহিয়াছে। এক নজরে চারিদিক দেখিয়া লইয়া হিমাদ্রি ঘরের কোণে টেবিলের দিকে আগাইয়া গেল। টেবিলে যূথিকার পড়াশুনা করিবার ব্যবস্থা। হিমাদ্রি আনমনে ড্রয়ার টানিল। কালো রেক্সিনের বাঁধানো একটি অ্যালবাম দেখা গেল। অ্যালবামটি তুলিয়া লইয়া হিমাদ্রি পাতা উলটাইল। প্রথম পাতায় লেখা ঃ

'এমনি করে তোমার মনে এঁকে দিলাম আলপনা,
আমার কথা মনে কোরো যখন আমি থাকব না।'

যূথিকে।—'র'।

কবিতাটি পড়া শেষ করিয়া হিমাদ্রি একের-পর-এক পাতা উলটাইয়া চলিল। সমস্ত অ্যালবাম ভরিয়া শুধু যূথিকার ছবি। নানা পোশাকের। নানা ঢঙের। নানা অভিব্যক্তির। কখনও সে অভিমানী, কখনও সে কপট রাগী, কখনও অনুরাগী, কখনও বা লাস্যময়ী। প্রতিটি ছবিতেই যূথিকার যৌবনের বিশেষ রেখাগুলি সযত্ন প্রচেষ্টায় ধরিয়া রাখা হইয়াছে। যূথিকা তাহার দেহকে যে ক্যামেরার সামনে এমনিভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সে ক্যামেরা এবং ক্যামেরাম্যান উভয়েরই সৌভাগ্য।

আমরা আসিলাম নির্ঝরিণীর ঘরে। নির্ঝরিণী যে যূথিকার সম্পর্কে মাসি—সে-পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। নির্ঝরিণী শিক্ষকতা করেন। বোধহয় ইতিহাস পড়ান। ঘরের শেলফে ইতিহাসের বই-ই বেশি। হিমাদ্রি বইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিল। পরিপাটিভাবে শেলফে সাজানো। কিছু বাঁধানো খাতা। তাহাতে পড়াশুনা সংক্রান্ত নোট। দুই-তিনটা খাতার অন্তরালে একটি বড় খাতা কাগজের মোড়কে রহিয়াছে দেখা গেল। মোড়ক খুলিতে দেখা গেল দামি ফ্রেমে একটি ফটো। সদ্য ব্যাডমিন্টন খেলা শেষ করিয়া বোধ করি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া হাতে র‍্যাকেট লইয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিতেছে একটি যুবক ও একটি যুবতী। যুবতী নির্ঝরিণী এবং যুবক মৃত বিবেকরঞ্জন—যূথিকার স্বামী। ছবিটি নতুন তোলা নয়।

নির্ঝরিণীর ঘরে একটি খাট। আলনা। চেয়ার-টেবিল। টেবিলের উপর একটি মোটা বই অলসভাবে পড়িয়াছিল। হিমাদ্রি বইখানি হাতে তুলিয়া লইল। একটি ইতিহাস বই। মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস। মুখবন্ধের ওপর লেখা ঃ

নির্ঝরিণী দেবরায়। শিক্ষয়িত্রী। '—' বালিকা বিদ্যালয়।

এক নজরে পাতা উলটাইতে গিয়া হিমাদ্রি 'ছত্রপতি শিবাজী' পরিচ্ছেদে থামিল। একস্থানে লাল পেনসিল দিয়া কয়েকটি ছত্র আন্ডারলাইন করা। অংশটি হিমাদ্রি বারবার পড়িল। তারপর বইটি যথাস্থানে রাখিয়া জানলার সামনে আসিয়া সিগারেট ধরাইয়া দূর আকাশের দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, সে-দৃষ্টির সহিত আমি গভীরভাবে পরিচিত।

এবার আমরা বিনয়বাবুর ঘরে আসিলাম। বিনয়বাবু যে একজন কবি তাহা ঘরে প্রবেশ করিতেই অচিরাৎ প্রমাণ হইয়া গেল। অন্য দুইটি ঘরের মতো একইভাবে ঘরটি সাজানো। নতুন

কিছু নাই। টেবিলে একটি মোটা খাতা শোভা পাইতেছিল। বিনয়বাবুর কবিতাগুলি। আদিরসাত্মক কত কবিতা যে বিনয়বাবু লিখিয়াছেন, বাংলাদেশের পাঠক তাহার খোঁজ রাখেন না। কয়েকটি কবিতা এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা গেল।

প্রথম কবিতা ঃ

সে গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি।
আলনাতে তার ঝুলছে শাড়ি।।
এসব নিয়েই নাড়ি-চাড়ি,
চিঠিতে সে লিখেছে 'আড়ি'
মা হবে সে তাড়াতাড়ি।।

দ্বিতীয় কবিতা ঃ

আসুক ঝড়, বন্যা কিংবা ঝঞ্ঝা,
পরোয়া করিনে, লড়ে যাব পাঞ্জা।।
শুধু আমরা ডিম ভাত খাব আর
একদম হব নাকো ঘরের বার।।
তুমি ইচ্ছে করে থাকবে চোখ বুজে।
আমি তখন তোমার বুকে মুখ গুঁজে...।

কী সর্বনাশ! এর পরের অংশ বুঝিতে পারিলে হিমাদ্রির লখিন্দরও লজ্জায় মরিয়া যাইত।

তৃতীয় কবিতা ঃ

সত্যি বলছি মাইরি!
তুমি যেন খাবারের ঝুড়ি,
তোমার মুখটি খাজা কাঁঠালের কোয়া।
বুকটি তোমার...।

বর্ণনা ক্রমশ নিম্নাভিমুখী। পড়িতে গিয়া মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। 'শ্রীহরি' বলিয়া হিমাদ্রি খাতা রাখিয়া দিল।

হিমাদ্রি হাতের ঘড়ি দেখিল। বেলা বাড়িতেছে। ইন্সপেক্টরও অনেকক্ষণ নীচে গিয়াছেন। আমাদের আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। হিমাদ্রি তাই দেরি না করিয়া সমিতের ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু সমিতের ঘরে প্রবেশ করিয়া সিগারেট টানিতে ভুলিয়া গেলাম। সমিত যে কত বড় শিল্পী তাহা তাহার ঘরে না আসিলে বোঝা যাইত না। সারা ঘরে সুরুচির পরিচয় মেলে। ঘরের দেওয়ালে হাতে-আঁকা অনেক ছবি। ঘরে নানা আকারের নানা ধরনের মডেল রহিয়াছে। একটি নটরাজের। একটি বুদ্ধের। একটি মহাত্মাজির। একটি মৎস্যকন্যার ব্রোঞ্জ মডেল। সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল টেবিলে রক্ষিত ব্রোঞ্জ বা সীসা জাতীয় কোনও ধাতুর তৈরি একটি হাফ-বডি শিবাজীর মূর্তি।

হিমাদ্রির মুখ দিয়া শুধু একটি মাত্র কথা বাহির হইল, এখানেও শিবাজী!! দেখিবার মতো আর বিশেষ কিছু ছিল না। টেবিলে একটি পোর্টফালিও রহিয়াছে। তাহার এককোণে সাদা কার্ডে টাইপ করা ঃ

মিস্টার সমিত মিত্র। ফোরম্যান। '—' ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড।

সেদিন বাড়ি ফিরিতে বেলা দুটা বাজিয়া গেল। আহারাদি সমাপন করিয়া আমি দিবানিদ্রায় আত্মনিয়োগ করিলাম। বৈকালে যখন ঘুম ভাঙিল দেখিলাম হিমাদ্রী বুকের উপর হাত আড় করিয়া ঘরময় পারচারি করিতেছে।

আত্মারাম চা দিয়া গেল। মুখ ধুইয়া চায়ের কাপ লইয়া বসিলাম। চা খাইতে-খাইতে হিমাদ্রি বলিল, চট্টরাজ সকালে যখন স্টেটমেন্ট নিচ্ছিল, তখন আমি মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করেছি। এর থেকে ও-বাড়ির লোকদের মোটামুটি একটা খসড়া তৈরি করেছি। কেমন হয়েছে শোনো।

সে উঠিয়া গিয়া একটি খাতা লইয়া আসিল। তারপর পড়িতে আরম্ভ করিল ঃ

(১) প্রণবশঙ্কর রায়—প্রৌঢ়। ব্যবসায়ী। অতিথিবৎসল। অনেক দূরসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের পেয়িংগেস্ট-এর মতো বাড়িতে আশ্রয় দিয়াছেন। জামাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হইয়াছেন। কুকুর সম্বন্ধে সাবধান করিয়া তিনি জামাইকে বলিয়াছিলেন, রাত্রে বাহিরে আসিলে যেন সে যূথিকাকে ডাকে। তিনি কুকুরের ডাক শোনেন নাই।

(২) সুরমা রায়—প্রণববাবুর স্ত্রী। জামাইয়ের মৃত্যুতে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। ঘটনার রাত্রে কুকুরের ডাক শোনেন নাই।

(৩) বিনয় ঘোষ—প্রবণবাবুর সম্পর্কে ভাই। বয়স পঁয়ত্রিশ বা কিছু কম। অত্যন্ত শৌখিন। কবিতা লেখেন। অবিবাহিত। প্রণববাবুকে ব্যবসায়ে সাহায্য করেন। কুকুরের দেখাশুনা তিনিই করিতেন। সে-রাত্রে নিজের খাওয়ার পর কুকুরটিকে খাওয়ান। কুকুরটিকে তিনিই নাড়াচাড়া করেন বলিয়া তাহার সম্বন্ধে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল। রাত্রে কোনও অপরিচিত বা সন্দেহজনক কিছু দেখিলে সে নিশ্চয়ই ডাকিত। এবং তিনি তাহা শুনিতে পাইতেন। কিন্তু কুকুরের সেরকম কোনও চিৎকার তিনি রাত্রে শোনেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কুকুরটি হিংস্র হইলেও কাহাকেও আক্রমণের পূর্বে সে চিৎকার করে। যূথিকার চিৎকারে তিনিই প্রথম দরজা খুলিয়াছিলেন। তিনি তখন বাথরুমের দরজার পাশে রক্তের ধারা ও কুকুরটিকে শুইয়া থাকিতে দেখেন। কুকুরটিকে তখন রণক্লান্ত সৈনিকের মতো ঝিমাইতে দেখা যায়। সে বিনয়বাবুকে দেখিয়া কেমন অসহায়ভাবে মৃদু স্বরে ডাকিয়া ওঠে। তাহার সে-স্বরে গভীর অপরাধবোধ ছিল। এমন স্বর তিনি কোনওদিন কুকুরটির গলায় শোনেন নাই।

(৪) সমিত মিত্র—ব্যায়ামপুষ্ট ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক। ভালো চাকুরে। সম্পর্কে প্রণবাবুর ভাগনে। প্রাণচঞ্চল এই যুবকটি অত্যন্ত প্রগতিশীল মনের। কারুশিল্পে তাহার প্রবল অনুরাগ। নিজের আঁকা ছবি এবং মডেল দ্বারা নিজের ঘর সুরুচিসম্মতভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কুকুরটিকে সে-ও কিছু-কিছু দেখাশুনা করিত, এবং কুকুরটির চরিত্রও কিছু-কিছু জানিত। তবুও কুকুরটির এরূপ ব্যবহারে সে মর্মাহত হইয়াছে। এই আকস্মিক ঘটনা তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

(৫) নির্ঝরিণী দেবরায়—পঁচিশ বছরের এই যুবতী প্রণববাবুর সম্পর্কে শ্যালিকা। শিক্ষকতা করেন। সুন্দরী না হইলেও নিজেকে সুন্দরী করিয়া তুলিবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন—প্রসাধনে, চালচলনে, কথাবার্তায়। মৃত বিবেকরঞ্জনের সহিত তাঁহার পূর্ব হইতেই আলাপ ছিল। কিন্তু তাহা তিনি গোপন বা অস্বীকার করিয়াছেন। ঘটনার রাত্রে তিনি কয়েকবার কুকুরের ডাক শুনিতে পান। তবে সে-ডাক কেমন যেন মিয়ানো ছিল।

(৬) যূথিকা বসু (রায়)—বয়স আঠারো। অপূর্ব সুন্দরী। সারা শরীরে যৌবন অকৃপণ মেলা বসাইয়াছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা নির্জন ছাদে তাহার স্বামীর সহিত নির্ঝরিণীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করিতে দেখিয়া শেষ পর্যন্ত সে বিরক্ত হয়। রাত্রে বিছানায় আশ্রয় লইবার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক কথা হয়। তাহাদের জীবনের কথা। ভবিষ্যতের কথা। কত রঙিন স্বপ্নের কথা। তারপর এক সময় রাগ-অনুরাগ একাকার হইয়া শরীরে অবসাদ আসে। যূথিকা ঘুমাইয়া পড়ে। হঠাৎ এক সময় বিছানায় পাশ ফিরিতে গিয়া নিতান্ত আকস্মিকভাবেই ঘুম ভাঙিয়া যায়। দেখে বিবেকরঞ্জন বিছানায় নাই। ভেজানো দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই ওই মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়ে। বাথরুমের পাশে বিবেকরঞ্জনের রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া আছে। কুকুরটিকে ওপাশে শুইয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহাকে দেখিয়া কুকুরটি বারকয়েক ক্ষীণ আওয়াজ করে। তারপর লম্বা জিভ দিয়া মুখ চাটিতে-চাটিতে মাথাটি সামনের দুই ছড়ানো পায়ের উপর কাত করিয়া রাখে। আর্ত চিৎকার করিয়া যূথিকা সংবিৎ হারাইয়া

ফেলে। তাহার চিৎকারে বাড়ির সকলে উঠিয়া পড়েন।

(৭) রমেন পতিতুণ্ডী—যূথিকার গৃহশিক্ষক। রবীন্দ্রপ্রভাবযুক্ত ব্যক্তি। গিলে-করা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি আর সোনার ফ্রেমের চশমা পরেন। সুন্দর চেহারায় একটি নারীসুলভ সলজ্জ ভাব আছে। তিনি ভালো ছবি তুলিতে পারেন। বেড়ানো, গান লেখা এবং ছবি তোলা তাঁহার 'হবি'। যূথিকার বিবাহের পরও এ-বাড়িতে তাঁহার যাতায়াত কমে নাই।

হিমাদ্রি খাতা বন্ধ করিল।

আমি বলিলাম, তা নয় হল, কিন্তু এসব করে কী লাভ তোমার?

খেয়াল লাভ-লোকসান বিচার করে না, মুকুল। আর—।

বাহিরে আবার বর্ষণ শুরু হইল।

সকালে ঘুম ভাঙিতে দেখিলাম আকাশ মেঘমুক্ত হইয়াছে। প্রখর সূর্যকিরণ চারিদিকে ঝলমল করিতেছে।

চায়ের পাট চুকাইয়া সবে দৈনিক পত্রিকাটি তুলিয়া লইয়াছি, কলিংবেল বাজিয়া উঠিল। দ্বারে অতিথি। মক্কেল হইতে পারে। আমিই গিয়া দরজা খুলিলাম। ইন্সপেক্টর চট্টরাজ একটি ফাইল হাতে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আত্মারামকে ডাকিয়া হিমাদ্রি আর-একদফা চায়ের ফরমাশ করিল। ইন্সপেক্টর হিমাদ্রির হাতে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তুলিয়া দিলেন।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে—গলার ক্যারোটিড আর্টারি, সারভাইক্‌ল ভ্যাটিব্রা প্রভৃতি কাটিয়া যাওয়ায় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছে। মাংসাশী পশু হিংস্র দাঁত দ্বারা যেন সমস্ত শিরা-উপশিরা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। না, মস্তিষ্কে কুকুরের কোনও বিষ পাওয়া যায় নাই।

হিমাদ্রি মন্তব্য করিল, আমি জানতাম।

সিগারেট ধরাইয়া চট্টরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কী বুঝছেন বলুন, মিস্টার সেন।

আত্মারাম চা দিয়া গেল। নীরবে চা পান সমাপ্ত হইল।

ইজিচেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া হিমাদ্রি অলসভাবে প্রশ্ন করিল, ইন্সপেক্টর চট্টরাজ, আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

প্রশ্ন করবেন না, উত্তর দিন।—একরাশ ধোঁয়া বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া মুদিত চোখে হিমাদ্রি বলিল, মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে কোন রাজনৈতিক বীরের চরিত্র আপনাকে মুগ্ধ করে?

মিস্টার চট্টরাজ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, শের শা বা আকবর।

যদিও আমি ইতিহাসের ছাত্র নই তবুও বলছি, শিবাজীর চরিত্র আমায় মুগ্ধ করে।—বলিয়া হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ চোখে মিঃ চট্টরাজের দিকে তাকাইয়া রহিল।

তারপর অনেক সিগারেট পুড়িয়া ছাই হইল। এবং হিমাদ্রি ইজিচেয়ারে দেহ ছড়াইয়া চোখ মুদিল। কেবল ইন্সপেক্টর চট্টরাজের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল একটি কথা—স্ট্রেঞ্জ!

যাইবার পূর্বে ইন্সপেক্টর বলিলেন, আমার সাহায্য আপনি সবসময় পাবেন।

অতঃপর অনিবার্যভাবে প্রণবশঙ্করবাবুর বাড়িতে আমাদের যাতায়াত বাড়িয়া গেল। আমরা তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। সম্প্রতি যে-প্রচণ্ড শোকের ঝড় এই পরিবারের ওপর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে মাঝে-মাঝে এখানে আসিয়া ইহাদের শোকের বোঝা হালকা করা প্রয়োজন। ইহা আমরাও যেমন

বুঝিতাম, প্রণববাবুও বুঝিতেন। সুতরাং, বাড়িতে সকলেই আমাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ির যত্রতত্র আমাদের গতিবিধি অবাধ হইয়া গেল। ড্রইংরুম হইতে কোনও নোটিশ না দিয়াই আমরা উপরে উঠিয়া আসিতাম।

এমনিভাবে প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যায় আমরা প্রণবশঙ্করবাবুর বাড়িতে হাজিরা দিতাম। চা হইত। গল্প হইত। নানা সুখ-দুঃখের কথা হইত। এবং আলোচনার অংশীদার বাড়ির সকলেই ছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রণবশঙ্করবাবুর ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, গদাই ছবি আঁকিতেছে। পড়িবার বইগুলি একপাশে পড়িয়া রহিয়াছে।

হিমাদ্রি বলিল, স্কুলের ছেলে। সন্ধ্যাবেলা পড়া না করে ছবি আঁকছ কেন?

গদাই বিস্ময় বোধ করিল : বারে, ছবি আঁকা বুঝি খারাপ! সমুদা বলে, যারা ছবি আঁকে তারা শিল্পী। সমুদা কত ভালো-ভালো ছবি আঁকে। রবীন্দ্রনাথও ছবি আঁকতেন। হিমাদ্রিদা, আমি না বড় হয়ে শিল্পী হব।

কিন্তু লেখাপড়াটাও তো শিখতে হবে। যাক, দেখি কী-কী ছবি এঁকেছ?

গদাইয়ের হাত হইতে খাতাটি লইয়া হিমাদ্রি পাতা উলটাইল।

শিল্পীমন গদাইয়ের আছে। কাঁচা হাতে সে বাড়ির সকলের ছবি আঁকিয়াছে। বাড়ির চাকর হইতে শুরু করিয়া কুকুরটিও বাদ যায় নাই। প্রতিটি ছবির তলায় পরিচয়লিপি রহিয়াছে।

নির্ঝরিণীর হাতে বই ও বেত। সুরমা দেবীর হাতে পূজার থালা। প্রণববাবুর চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, হাতে ছড়ি। বিনয়বাবু ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। যূথিকার কপালে টিপ ও হাতে চুড়ি। যূথিকা ও সমিত মুখোমুখি। যূথিকার মুখ নত। সমিতের হাত দুটি যূথিকার কাঁধে। পরিশেষে একটি অর্ধসমাপ্ত ছবি। দুটি যুবক। তাহাদের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া গদাইয়ের দিকে তাকাইতেই সে হাসিয়া উঠিল।

এটা কাদের ছবি বলুন তো?

আমাদের নিরুত্তর দেখিয়া গদাই আরও হাসিতে লাগিল।

বুঝতে পারলেন না? ওটা তো আপনাদের ছবি।

দেখিলাম গদাইয়ের শিল্পদৃষ্টি হইতে আমরাও বাদ পড়ি নাই। সে বড় হইলে সত্যিই শিল্পী হইবে।

কিন্তু হিমাদ্রি বিমনা হইয়া রহিল।

ইহাতে বোধ করি গদাই একটু ভড়কাইয়া গেল। সে যে গোপনে শিল্পচর্চা করিয়া বাড়ির লোকদের এইভাবে বিকৃত করিয়াছে, হিমাদ্রির ভাবভঙ্গি দেখিয়া এ-কথা তাহার মনে উদয় হইতেই সে ভয় পাইল।

হিমাদ্রি জিগ্যেস করিল, তোমার বাবা কোথায়?

শুষ্ক কণ্ঠে গদাই জবাব দিল, বাবা-মা ভাইবোনদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেছেন।

এসো মুকুল, ভেতরে যাওয়া যাক।

যাওয়ার পথে গদাই আসিয়া হিমাদ্রির হাত চাপিয়া ধরিল। হিমাদ্রি হয়তো এমন কিছু আশা করিয়াছিল, বলিল, ভয় নেই, কাউকে বলব না। পড়ার সময়ে ছবি আঁকবে না।

দ্বিতলে পদার্পণ করিয়া দেখা গেল বারান্দায় কম পাওয়ারের আলো জ্বলিতেছে। কোনও ঘর হইতেই আলোর ছটা বারান্দায় আসে নাই। সামনের বারান্দার দিকের দরজা-জানলা বন্ধ দেখিয়া মনে হইল, যে যার নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। ফিরিয়া যাইব কি না চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ অত্যন্ত মৃদু কথার আওয়াজ কানে আসিল। বিনয়বাবু কাহারও সহিত খুব চাপা কণ্ঠে কথা বলিতেছিলেন। হিমাদ্রিকে চোরের স্বভাব পাইয়া বসিল। সে সন্তর্পণে পা টিপিয়া-টিপিয়া বিনয়বাবুর ঘরের দিকে চলিল। আমিও তাহার পশ্চাতে-পশ্চাতে গিয়া বিনয়বাবুর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে

দাঁড়াইলাম। এবার বিনয়বাবুর কণ্ঠ পরিষ্কার বোঝা গেল। আমরা শুনিতে লাগিলাম।

বিনয়বাবু বলিলেন, তোমাকে যে আমি মনে-প্রাণে চাই, কেন বোঝো না গো?

অপরপক্ষের কোনও কথা শুনিলাম না।

তুমি তো আস না। আমি কত ডাকি। তুমি কি আমার মনের কথা বোঝো না? কথা বলছ না কেন? বারে, আমার কথার জবাব দাও।

আবার চুপচাপ।

ও, রাগ হয়েছে সোনা? এসো, আমার বুকের মধ্যে এসো।

এবার সশব্দে চুম্বনের আওয়াজ শুনিলাম।

সর্বনাশ! আর দাঁড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে এখানে অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। যদি কেহ দেখিয়া ফেলে। কিন্তু হিমাদ্রির মধ্যে কোনও ব্যস্ততা লক্ষ করিলাম না। সে সরাসরি বিনয়বাবুর দরজায় মৃদু টোকা দিল।

ভেতর হইতে বিনয়বাবুর গলা পাওয়া গেল : কে?

আমরা। দরজা খুলুন। এই সন্ধেবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে কীসের ধ্যান করছেন, মশায়!—শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে চাপা হাসি হাসিয়া উঠিল হিমাদ্রি।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিনয়বাবু ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। আমরা ভেতরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু একটু আগে যাহার সহিত বিনয়বাবু প্রেমালাপ করিতেছিলেন, তাহার কোনও অস্তিত্বই ঘরে দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঝুলানো বারান্দার দিকের দরজাও বন্ধ ছিল।

হিমাদ্রি কোনও প্রকার সঙ্কোচ না করিয়াই বিনয়বাবুর খাটের ওপর পা ঝুলাইয়া বসিল।

বিনয়বাবু একটু আগেই যে এই ঘরে বৃন্দাবনলীলা চালাইতেছিলেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না। ভয় বা বিরক্তির কোনও চিহ্নই তাঁহার মুখে নাই। এমনকী আমাদের এখন এখানে এভাবে দেখিয়াও তিনি বিস্মিত হন নাই বোঝা গেল।

হিমাদ্রি বলিল, তলায় গদাইয়ের কাছে শুনলাম, কর্তা-গিন্নি দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। তাই সোজা উপরেই চলে এলাম। এসে দেখি, শুধু আপনার ঘরেই আলো জ্বলছে। তাই...।

বিলক্ষণ। আমি মশাই বাড়ি ছেড়ে বের হই না। হওয়ার দরকারও হয় না। একলা মানুষ বেশ আছি।

বড্ড গরম হচ্ছে। জানলাগুলো সব বন্ধ করে রেখেছেন দেখছি।

তাই তো!—ব্যস্তসমস্ত হইয়া বিনয়বাবু জানলা খুলিয়া দিতে গেলেন।

বিনয়বাবুর বিছানাটা একটু এলোমেলো। মাথার বালিশের পাশে কোনও মেয়ের একটি বক্ষবন্ধনী পড়িয়া আছে। আর পড়িয়া আছে দুইটি রুপোর মাথার-কাঁটা।

সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত।

হিমাদ্রি ওই সময়টুকু নিপুণভাবে কাজে লাগাইল। কাঁটা দুইটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া সুদীর্ঘ আঘ্রাণ লইল। তারপর আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

জানলা খুলিয়া দিয়া বিনয়বাবু আমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন। আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরের যত্রতত্র তাকাইতেছিলাম। দেখিলাম, আলনায় বিনয়বাবুর জামা-কাপড়ের সঙ্গে একটি সিল্কের শাড়ি শোভা পাইতেছে। শাড়ি যাহারই হউক, বিনয়বাবুর নিশ্চয়ই নয়। মনে-মনে একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিলাম। বিনয়বাবু সত্যিই ভাগ্যবান।

একটু পরেই নীচে আমাদের চায়ের আসর বসিল। যূথিকা আসিয়া আসরে যোগ দিল। হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাড়ি ছিলেন নাকি?

যূথিকা অল্প ঘাড় নাড়িল—ছাদে বেড়াচ্ছিলাম। অন্ধকার ছাদে বেড়াতে আমার ভালো লাগে।

আমার বলিতে ইচ্ছা হইল, অন্ধকার ছাদে নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় বেড়াইতে আমারও

ভালো লাগে। কিন্তু সব জায়গায় সবকিছু বলা যায় না। নিজের ইচ্ছাটাকে দমন করিলাম।

চাকর চা আনিল। যূথিকা উঠিয়া টি-পট হইতে চা ঢালিতে লাগিল। যূথিকাকে আজ খুব ভালো দেখাইতেছিল। গায়ে গাঢ় লাল রঙের একটি স্লিভলেস ব্লাউজ। পরনে হালকা ঘাসীরঙের সিল্কের শাড়ি। মাথার চুলগুলি একটি লম্বা বেণীতে আবদ্ধ। চোখে সূক্ষ্ম কাজল। কপালে টিপ নাই। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকের ছোঁয়া। ওর ছোট-ছোট দু-একটি কথা, মানানসই হাসি—এসব দেখিয়া মনে হইতেছিল যূথিকার বিবাহ হয় নাই—অথবা সে বিধবা হয় নাই।

চা পান সমাপ্ত হইল। আমরা উঠি-উঠি করিতেছি, অন্দরের দিক হইতে একটা স্ত্রীলোক আসিয়া যূথিকাকে বলিল, সব হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি, দিদিমণি। বলিয়া ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া গেল।

হিমাদ্রি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিনয়বাবুর দিকে তাকাইতেই তিনি বলিলেন, ও বাসন্তী। বড় ভালো মেয়ে। এ-বাড়িতে রান্নার কাজ করে।

কিন্তু আমাদের ঠিক তখনই উঠা হইল না। যূথিকার পূর্বকথিত গৃহশিক্ষক রমেনবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া যূথিকার মুখটি খুশিতে ভরিয়া গেল।

যূথিকা বলিল, দু-দিন আসেননি কেন?

রমেনবাবুর কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিতেছিল। সেটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, রোজ-রোজ আসতে হবে, তার কী মানে আছে! আর তা ছাড়া, এখন আর আমাকে এ-বাড়িতে পড়াতে আসতে হয় না।

অতঃপর যূথিকা আর কিছু বলিল না। ভিতরে রমেনবাবুর চা আনিতে গেল। হিমাদ্রি বলিল, ব্যাপার কি মশাই। একেবারে ক্যামেরা-ট্যামেরা সহ?

দিন দুয়েকের জন্য দীঘায় বেড়িয়ে এলাম। তারপর কেমন আছেন বলুন? বিনয়বাবুর খবর কি?

এইরকম মামুলি কথাবার্তার মধ্যে যূথিকা চা লইয়া প্রবেশ করিল। রমেনবাবু চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলেন। যূথিকা তাঁহার পাশের চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িল। তারপর রমেনবাবুর সহিত নিম্নকণ্ঠে কথা বলিতে লাগিল। আমিই এদের সবচেয়ে কাছে নিলাম। হিমাদ্রি ও বিনয়বাবু নিজেদের মধ্যে কথায় ব্যস্ত। ওদের কথায় সায় দিলেও আমার কান সজাগ ছিল রমেনবাবু ও যূথিকার কথায়। দু-একটি ছাড়া তাহাদের সব কথা আমার কানে আসিতেছিল না।

রমেনবাবু বলিলেন, ব্যাপারটা সকলের দিক দিয়েই ভালো হবে।...তোমার...আর তোমার মতো মেয়ের অন্তত চিরকাল বাবার উপর নির্ভর করে থাকাটা শোভা পায় না...না, কোনও কিন্তু না,...তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা আমিই করব।...

ঢং-ঢং করিয়া দেওয়াল ঘড়িতে রাত ন'টা বাজিল।

আমরা উঠিয়া পড়িলাম।

যূথিকাকে আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হইতেছিল। সে আমাদের সঙ্গে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত আসিল। লক্ষ করিতেছি, যূথিকার উপর আমার একটা তীব্র লোভ ভিতরে-ভিতরে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে।

বিদায় লইবার সময় তাহার অত্যন্ত কাছেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যূথিকার মাথা হইতে কী সুন্দর একটা গন্ধ বাহির হইতেছে।

আজ রাতে নির্ঘাত ওকে স্বপ্ন দেখিব।

রাতে খাওয়ার পর বিছানায় বসিয়া আমরা কিছুক্ষণ ধূমপান করিয়া থাকি—সেইসঙ্গে হয়তো কিছু পরচর্চা হয়। তারপর ঘুমাইয়া পড়ি। এ আমাদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

আজ সিগারেট ধরাইয়া হিমাদ্রি বলিল, বিনয়বাবুর ঘরে যে-মাথার কাঁটা দুটো দেখেছিলাম সেগুলো যূথিকার। যূথিকার মাথা থেকে যে-তেলের গন্ধ বেরোচ্ছিল, সেই একই গন্ধ ওই কাঁটাতেও ছিল।

আমি একটু হাঁ করিয়া রহিলাম।—যূথিকার...বিনয়বাবুর ঘরে...।

যাক, রমেন-যূথিকার কথায় তেমন কিছু শুনতে পেয়েছ কি না বলো।

আমি যাহা-যাহা শুনিতে পাইয়াছিলাম বলিলাম।

হিমাদ্রি আবার পায়চারি শুরু করিল। আমি নীরবে তাহার পদচারণা লক্ষ করিতে-করিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করিবার পূর্বে শুধু অস্পষ্টভাবে শুনিলাম সে কাহাকে ফোন করিতেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় হিমাদ্রি আমাকে লইয়া সমিতবাবুর ঘরে প্রবেশ করিল। সমিতবাবু তখন ঘরে বসিয়া ল্যান্ডস্কোপের ওপর একটি ছবিতে তুলির আঁচড় দিতেছিলেন। ছবিটি সমাপ্তির পথে। আমাদের দেখিয়া সমিতবাবু বসিতে বলিলেন। হিমাদ্রি বসিল না। সে দাঁড়াইয়া ছবিটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কোনও গ্রিক ভাস্কর্যের অনুকরণ। একটি নারীকে বিবস্ত্র করিতেছে একটি পুরুষ। পুরুষের একটি পেশিবহুল হাত নির্মমভাবে নারীর কাঁধে চাপিয়া বসিয়াছে। অন্য হাতে নারীর অঞ্চলের শেষপ্রান্ত ধরা। পুরুষটির বুকের সুগঠিত পেশিগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে। চোখ দুটিতে আদিম ক্ষুধা। নারীটির শরীরে ধরা-নাহি-দিব এমনি একটি কপট প্রচেষ্টা। একটি পেলব হাত উন্মুক্ত বক্ষসম্পদ আড়াল করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। কাপড়ের একপ্রান্ত অন্য হাতে ধরিয়া পুরুষের চোখ হইতে দেহ ঢাকিবার ছলনা করিতেছে। চোখে কটাক্ষ। ঠোঁটের বাঁকা হাসিতে সূক্ষ্ম প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত। সব মিলিয়া ছবিটিতে সজীবতা এত স্পষ্ট যে, দেখিলেই উগ্র কামনা জাগিয়া উঠে।

সমিতবাবু সত্যিকারের শিল্পী। নিখুঁত কল্পনাশক্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি। কিন্তু ছবিটিতে যে-নারীটি রহিয়াছে, তাহার সহিত কাহার যেন মুখের সাদৃশ্য আছে।

আমি বলিলাম, অপূর্ব! অদ্ভুত!

হিমাদ্রি বলিল, মশায় দেখছি মাইকেল এঞ্জেলো!

সমিতবাবু বলিলেন, সমালোচনা করুন। তাতে সত্যিকারের উপকার হয়। প্রশংসাটা একঘেয়ে।

হিমাদ্রি সমিতবাবুর ঘরে সাজানো ছবি ও মডেলগুলি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দেখিতেছিল। সমিতবাবুর সৃষ্ট প্রতিটি শিল্পই প্রশংসার দাবি রাখে। মনোযোগ দিয়া হিমাদ্রি সেগুলিই দেখিতেছিল। সমিতবাবুর ঘরে তাঁহার নিজের ব্যবহার্য প্রতিটি জিনিস পরিপাটিভাবে সাজানো রহিয়াছে। সিঙ্গল খাটে নিভাঁজ শয্যা। টিপয়ে টাইমপিস। একটা ফুলদানি। তাহাতে একগুচ্ছ তাজা রজনীগন্ধা। ফুলের গুচ্ছটিকে বেষ্টন করিয়া সুগন্ধী ধূপের ধূম্রজাল নাচিয়া-নাচিয়া উঠিয়া বাতাসে হারাইয়া যাইতেছে। দেওয়ালের একধার ঘেঁসিয়া একটি আলনা। তাহাতে কাপড়-জামা। তলার কাঠের পাটাতনের ওপর পাশাপাশি তিনজোড়া জুতো সাজানো রহিয়াছে। ঘরের এপাশে টেবিল-চেয়ার। টেবিলের উপর শিবাজীর স্ট্যাচু শোভা পাইতেছে। হিমাদ্রি ধীরে-ধীরে তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর বুকের উপর হাত দুইটি ভাঁজ করিয়া সেটিকে দেখিতে লাগিল।

সেদিন সকালবেলা দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি যুবক প্রবেশ করিল। সাদামাটা একহারা চেহারা। চোখ দুটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সজাগ। নাম পঞ্চানন কুণ্ডু। পুলিশের ইনফরমার।

হিমাদ্রি বলিল, কী খবর বলো, পঞ্চানন।

পঞ্চানন শুরু করিল ঃ আপনার কথামতো স্যার, আমি বিনয়বাবুর ওপর নজর রেখেছিলাম। কাল সকালে ভদ্রলোকের পিছু নিলাম। উনি বাসে উঠলেন। আমিও উঠলাম। কাদাপাড়া স্টপেজে ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও নামলাম। উনি একটা বস্তিবাড়িতে ঢুকে গেলেন। আমি বাইরে ঘুরতে লাগলাম। বাড়িটার সামনে রাস্তার পাশ ঘেঁষে একটা প্রাইভেট গাড়ি পার্ক করা ছিল। বেশ ঝকঝকে নতুন গাড়ি। বাড়ির দরজার ওপর নজর রেখে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম। চা খেতে-খেতে দোকানদারের সঙ্গে আলাপ জমালাম। তার কাছেই জানতে পারলাম, সামনের বস্তিবাড়িটাতে রাখাল নামে একটা লোক থাকে। সে ড্রাইভারি করে। মাঝে-মাঝে গাড়িটা নিয়ে আসে।

পঞ্চানন চায়ের কাপ সরাইয়া রুমালে মুখ মুছিল।

হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করিল, কতক্ষণ পরে বিনয়বাবু বেরোলেন?

তা প্রায় মিনিট পনেরো পরে। সঙ্গে একটি মধ্যবয়স্ক লোক। মধ্যবয়স্ক হলেও চালচলনে এবং পরনের আঁটোসাঁটো পোশাকে কুড়ি বছরের খোকা-খোকা ভাব। বুঝলাম এই রাখাল। সে গাড়ির দরজা খুলে ড্রয়ারের মধ্যে থেকে কাগজের একটা বই-সাইজের মোড়ক বিনয়বাবুর হাতে দিল। বিনয়বাবু অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেটা গ্রহণ করলেন। বিনয়বাবুর চোখে-মুখে কেমন যেন একটা লোভী-লোভী খুশি-খুশি ভাব। রাস্তা তখন প্রায় ফাঁকা ছিল। তবু বিনয়বাবু চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে পাঞ্জাবি তুলে পেট-কোঁচড়ে সেটা গুঁজে নিয়ে পাঞ্জাবি চাপা দিয়ে দিলেন। তারপর পার্স খুলে কিছু টাকা রাখালের হাতে দিলেন। টাকাগুলো গুনে দেখে রাখাল কায়দা করে একটা হাত ওঠাল। সেটা নমস্কার না বিদায় সম্ভাষণ বুঝলাম না। বিনয়বাবু হনহন করে বড়রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন। রাখাল খানিকক্ষণ তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে আপনমনে শিস দিয়ে উঠল। তারপর কানে গোঁজা সিগারেটটা হাতঘড়ির কাচের ওপর ঠুকতে-ঠুকতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

আমি দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে-করতে ভাবলাম, এবার কী করব।

একটা সিগারেট শেষ হল। আর-একটা ধরালাম। সেটাও শেষ হয়ে গেল। গাড়ির নম্বরটা টুকে নিয়ে আমিও বড়রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম। বড়রাস্তায় পড়বার মুখেই দেখি নির্ঝরিণী দেবী ব্যগ্রদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে আসছেন। চোখে সানগ্লাস। হাতে চামড়ার একটা শৌখিন ব্যাগ। এমনটি আশা করিনি। যাই হোক, লক্ষ করতে লাগলাম। নির্ঝরিণী দেবী—যে-চায়ের দোকানে আমি চা খেয়েছিলাম—সেই দোকানে কী যেন জিগ্যেস করলেন। তারপর বিনয়বাবু যে-বাড়িতে ঢুকেছিলেন, সেই বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলেন।

একটা দশ-বারো বছরের ছেলে বাড়ির মধ্যে যাচ্ছিল। তাকে কিছু বললেন। একটু পরেই রাখাল হাসিতে দন্তবিকশিত করে বেরিয়ে এল। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়াল। নির্ঝরিণী দেবী দাঁড়ালেন তার সামনে। দুজনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তারপর রাখাল বাড়ির মধ্যে চলে গেল। নির্ঝরিণী দেবী ঘড়ি দেখলেন। রাখাল ফিরে এসে গাড়িতে উঠল। নির্ঝরিণী দেবীও উঠে বসলেন। তারপর হাতের ব্যাগ খুলে ছোট আয়না বার করে মুখ দেখতে লাগলেন। রাখাল গাড়িতে স্টার্ট দিল।

সৌভাগ্যবশত মোড়েই আমি একটি খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। রাখালের গাড়িটা অবিশ্যি এগিয়ে গিয়েছিল। তবুও আয়ত্তে এসে গেল। ড্রাইভার আমার কথামতো ওর গাড়িকে ফলো করে এগোতে লাগল।

হিমাদ্রির ফরমাশে আর-একদফা চা আসিল। চা পানের পর পঞ্চানন পুনরায় তাহার অভিযানের কাহিনি শুরু করিল।

রাখালের গাড়ি বালিগঞ্জের একটা বড় বাড়ির মধ্যে ঢুকল। ভাড়া মিটিয়ে আমি গাড়ি ছেড়ে দিলাম। আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও ওদের কাউকে বেরোতে দেখলাম না। আমি রাস্তা থেকে একটা বাস ধরে মোটর ভেহিকেলসের অফিসে এসে নাম্বারটা ট্রেস করলাম। গাড়ির মালিক এস. পি. দত্তগুপ্ত। বালিগঞ্জের ওই বাড়ির মালিক।

সিগারেটে মৃদু টান দিয়া হিমাদ্রি প্রশ্ন করিল, আর কিছু দেখেছ?

কাল সন্ধেবেলা, স্যার, একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। সন্ধে নয়। রাত প্রায় আটটা হবে। প্রণবশঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে একজন মেয়েছেলে বেরিয়ে এল। রাস্তায় রাখাল অনেকক্ষণ থেকেই ঘোরাফেরা করছিল। মেয়েছেলেটি বেরিয়ে আসতেই রাখাল তার সঙ্গে গল্প করতে-করতে এগিয়ে গেল বাস-স্টপেজের দিকে। ওরা দুজন বাসে উঠল। বাস তখন খালি। জেন্টস্ সিটে পাশাপাশি বসল। মেয়েছেলেটি টিকিট কাটল। দুজনা খুব স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছিল। হাসাহাসিও হচ্ছিল মাঝে-মাঝে। ওরা রাখালের বাড়ির স্টপেজে নামল। সেই বাড়িতেই ঢুকল। আমি ফিরে এলাম। মেয়েছেলেটি রাখালের বউ বোধহয়।

কোনও সন্দেহ নেই।—হিমাদ্রি সিগারেটের শেষাংশ অ্যাশট্রেতে গুঁজিয়া দিল।

আজ বিকাল হইতে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। শনশন করিয়া বাতাস বহিতেছে। আমি চেয়ারটি জানলার পাশে আনিয়া প্রকৃতির এই প্রলয়রূপ অবলোকন করিতেছিলান। হিমাদ্রি বাসায় নাই। সকাল এগারোটায় খাইয়া কোথায় যেন বাহির হইয়াছে।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া হিমাদ্রি ফিরিল। আত্মারামকে চা করিতে বলিয়া সে বাথরুমে গেল।

যখন আমরা বাহির হইলাম তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তবে আকাশ পরিষ্কার হয় নাই।

নির্ঝরিণীর ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া আমাদের একটু থামিতে হইল। দরজার বাহিরে একটি ছেঁড়া খাম রহিয়াছে। হিমাদ্রি তুলিয়া লইল। আজকের তারিখে চিঠিটা বিলি হইয়াছে। নির্ঝরিণীর নাম এবং এ-বাড়ির ঠিকানা প্রণববাবুর কেয়ার-অফে লেখা। খামের ভিতর কিছু চিঠি নাই। ঘরের দরজা কিন্তু খোলাই ছিল। আমরা দেখিলাম জানলার ধারে দাঁড়াইয়া নির্ঝরিণী অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। হয়তো বা কিছু ভাবিতেছেন।

আসতে পারি?

নির্ঝরিণী জানলার ধার হইতে সরিয়া আসিলেন—বসুন।

ঘরে বসিবার অন্য ব্যবস্থা না থাকায় আমরা নির্ঝরিণীর নির্দেশে তাহার খাটের কিনারায় বসিলাম। উনি বসিলেন না। দাঁড়াইয়া রহিলেন। নির্ঝরিণীকে চিন্তাচ্ছন্ন মনে হইল।

আজ ট্যুশানি যাননি?

না।

ড্রয়ার হইতে দুটি ধূপ বাহির করিয়া নির্ঝরিণী জ্বালাইয়া দিলেন। তারপর চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িলেন। ধূপ ঘরের বাতাসে সৌরভ ছড়াইতেছে। ধীরে-ধীরে পুড়িয়া নিঃশেষ হইতেছে। সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া নির্ঝরিণী বোধহয় একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেলেন।

জানেন হিমাদ্রিবাবু, এ-বাড়িতে আমার একদম ভালো লাগে না।

কেন?

তা জানি না। শুধু মনে হয় এ-বাড়িতে থাকব না।

তাহলে কোনও লেডিস মেসে বা অন্য কোথাও চলে যান।

কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠছে কই?

কেন?

বর্তমানে একটা স্কুলে টেম্পোরারিলি কাজ করছি। সেখানে বেতনও কম। সে-টাকায় ভদ্রভাবে অন্যত্র থাকা সম্ভব হবে না।

অন্য জায়গায় চেষ্টা করছেন না?

করছি—করেছি। বহু জায়গায় আবেদন করেছি। কোনও ফল হয়নি।

হিমাদ্রি কোনও কথা বলিল না। নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল, এক্সকিউজ মি, আপনার কোয়ালিফিকেশন?

পাস কোর্সে বি-এ পাশ করেছি। পার্সেন্টেজও খুব একটা ভালো নয়। আঁচলের কোণ দিয়া একটি আঙুলে নির্ঝরিণী পাক দিতেছিলেন।

হিমাদ্রি চোখ বুজাইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল।

আপনার তো অনেক বড়-বড় লোকের সঙ্গে জানাশুনা, দিন না হিমাদ্রিবাবু, আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে।

নির্ঝরিণীর গলার স্বরে বোধহয় করুণ আবেদন।

আজ মধ্যাহ্নে গুরুভোজন হইয়াছে। সিগারেট শেষ করিয়া সবে দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছি, হিমাদ্রি মালকোঁচা মারিতে-মারিতে আসিয়া বলিল, 'পূরবী'-তে একটা ভালো বই হচ্ছে। এভারগ্রিন হিরোর ছবি। চলো, দেখে আসি।

তাহাকে নিবৃত্ত করা অপচেষ্টা মাত্র। এখনি হয়তো 'বাঙালি অলস' এই পর্যায়ে লম্বা বক্তৃতা শুরু করিবে। অগত্যা উঠিলাম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া দুজনে বাহির হইয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য 'হাউস-ফুল'। কালোবাজারী মহোদয়ের নিকটও টিকিট পাওয়া গেল না। মধ্য হইতে আমার দিবানিদ্রাটিও মাটি হইল। মনের উষ্মা রোধ করিতে পারিলাম না। হিমাদ্রিকে বলিলাম, কী দরকার ছিল সিনেমায় আসার? ঘুমটাও বিগড়ে দিলে, টিকিটও পেলে না...যত্ত সব ইয়ে...।

কোণের দোকানটায় পান কিনিতেছি, হিমাদ্রি কনুইয়ের খোঁচা দিল, ওহে, ওদিকে দেখো।

তাহার কথায় মুখ ঘুরাইয়া রাস্তার অন্যপাশের ফুটপাতের দিকে তাকাইলাম। রমেন পতিতুণ্ডী আর যূথিকা। রমেনবাবু একটি খালি ট্যাক্সি থামাইলেন। দুজনে পিছনের সিটে উঠিলে ড্রাইভার গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

হিমাদ্রিও একটি খালি ট্যাক্সি ধরিল। গাড়িতে উঠিতে-উঠিতে বলিল, বাড়িতে গিয়ে ঘুমোও গে। যত্ত...।

হিমাদ্রিকে লইয়া গাড়ি তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

সে যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রণববাবু তখনও ফেরেন নাই। ড্রয়িংরুম ফাঁকা। বোধহয় যে-যার নিজের ঘরে বিশ্রাম লইতেছেন। আমরা উপরে উঠিয়া আসিলাম।

বিনয়বাবুর উপর হিমাদ্রির বোধ করি একটি আন্তরিক টান জন্মিয়া গিয়াছিল। কারণ লক্ষ করিতাম যে, এ-বাড়িতে আসিলে বিনয়বাবুর ঘরেই আগে যাইত।

বিনয়বাবুর ঘরের দরজা ঈষৎ ভেজানো, অনুচ্চ কণ্ঠে ভিতরে বিনয়বাবু আবৃত্তি করিতেছিলেন—

তুমি ফুল গো আমি ভোমরা,
তোমরা অরুচি মুখে আমি আমড়া।
তুমি চুষ-প্যান্ট আমি পা...

তারপর। তারপর...উঁহু।

মিলিতেছে না। বিনয়বাবু কবিতার ছন্দ মিলাইতে পারিতেছেন না।

তুমি চুষ-প্যান্ট আমি পা।
আমি স্যাকারিন তুমি চা।।

কেমন মিলল।

হাসিতে-হাসিতে হিমাদ্রি ঘরে প্রবেশ করিল। আমরা খাটে বসিলাম। চেয়ার-টেবিলে বসিয়া বিনয়বাবু কবিতা রচনা করিতেছিলেন।

হিমাদ্রি বলিল, আপনি কবিতা লেখেন? বলেননি তো?

বিনয়বাবু লজ্জায় লাল হইয়া গেলেন : না-না, তেমন কিছু না। একা মানুষ। যখন যা খেয়াল আসে লিখি...। খাতা মুড়িয়া ফেলিলেন।

হিমাদ্রি চোখ পাকাইল।

একা...খেয়াল...। তুমি-আমি! আমি-তুমি দিয়ে কবিতা লেখা। কন্ডিশন খারাপ। মুকুল, বিনয়বাবুকে বাঁচাও।

তার মানে বিয়ে?—আমি বলিলাম।

বিয়ে—মানে আমার?—বিনয়বাবু ঘাবড়াইয়া গেলেন।

কেন দাদা,—হিমাদ্রি উঠিয়া দাঁড়াইল, বেশ তো শাঁসে-জলে আছেন! অবস্থা তো আর আমাদের মতো সজনে কাঠ নয়।

বিনয়বাবু বলিলেন, কী জানি মশাই, আমার আবার মেয়েদের কেমন যেন ভয় করে।

হিমাদ্রি আবার বসিয়া পড়িল। খুকখুক করিয়া কাশিল।—মুকুল, বিনয়বাবুকে বাঁচাও—।

মেয়েদের দূর থেকে দেখতে ভালো। ওদের কথা, গল্প, কাহিনি পড়তে ভালো, শুনতে ভালো, কল্পনা করতেও ভালো। কিন্তু ওদের আমি ভয় করি।

থাক ওসব কথা। অনেকক্ষণ থেকে বকবক করছি, চায়ের ব্যবস্থা করুন দেখি। আজ আপনার ঘরে বসেই আমি আর মুকুল চা খাব।

বিনয়বাবু একটু ইতস্তত করিয়া নীচে গেলেন। হিমাদ্রির নির্দেশে আমি দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। হিমাদ্রির কাজ শুরু হইল।

আমরা তখন তলার ড্রয়িংরুমে বসিয়া আছি। সঙ্গে বিনয়বাবু ছাড়া কেহ নাই। প্রণববাবু তখনও ফেরেন নাই।

সেদিনের পর গদাইয়ের খুব শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তাই সন্ধ্যায় আমরা আসিলেই নীচের কোনও ঘরে বসিয়া গলা ছাড়িয়া পড়িতে থাকে। আজও হিমাদ্রিকে শুনাইয়া-শুনাইয়া গায়ের সমস্ত শক্তি গলা দিয়া বাহির করিয়া পড়িতেছে। ইংরেজি পড়িতেছে। যেখানে ঠিক উচ্চারণ করিতে না পারিতেছে, সেখানটায় গলা চাপিয়া দিতেছে।

বিনয়বাবু উঠিলেন।

গদাইটা কেমন পড়ছে দেখে আসি। বসুন আপনারা।

বিনয়বাবু চলিয়া গেলেন।

মিনিট দুই অতিবাহিত হইয়া গেল। হিমাদ্রি আস্তে-আস্তে উপরে উঠিতে লাগিল। আমি তাহাকে অনুসরণ করিলাম।

দোতলার বারান্দা অন্ধকার। সবগুলো ঘরের দরজা বন্ধ কিংবা ভেজানো। পিছনদিকের ঝুলবারান্দামুখো দরজাগুলো খোলা আছে কি না ঘরের মালিক বলিতে পারেন শুধু।

আমার বিশ্রী লাগে। এই সন্ধ্যাবেলা উপরতলাটা বড় নিঝুম লাগে।

বারান্দার উত্তরদিকে দরজাটা পার হইলেই একফালি ছাদ। হিমাদ্রির কখন কী খেয়াল হয় বুঝিতে পারি না। কেন যে সে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বারেবারে এই দোতলায় আসে তাহা জানি না। এই দোতলাই হয়তো সব রহস্যের চাবিকাঠি! সে একে-একে ঘরগুলি অতিক্রম করিয়া ছাদের দিকে চলিল। ছাদে যাইবার দরজাটা ভেজানো। হিমাদ্রি মুহূর্তের জন্য থমকিয়া রহিল। তারপর আস্তে-আস্তে দরজার পাল্লাটা একটু খুলিয়া দিল। হিমাদ্রির পাশে আমি। ছাদের একটি কোনায় একটি নিভৃত দৃশ্য চোখে পড়িল। চিরনূতন দৃশ্য। একটি পুরুষ, একটি নারী! প্রায়ান্ধকারে কাহাকেও চেনা যাইতেছে না। কিন্তু নারীটি অত্যন্ত চাপা স্বরে কাঁদিতেছে।

ড্রয়িরুমে ফিরিয়া আসিয়া যখন যথাস্থানে বসিলাম, তখন সেখানে কেহ নাই। হিমাদ্রি বিমনাভাবে সিগারেট ধরাইল।

প্রণববাবু প্রবেশ করিলেন।

ক্লান্ত-বিশ্রস্ত চেহারা। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরিতেছেন।

আপনারা...কতক্ষণ?

এই তো খানিক আগেই এসেছি। আপনার আজ দেরি মনে হচ্ছে।

তা একটু হয়েছে, ভাই। কাজের ঝামেলা বাড়ছে। দিনকাল যা পড়ছে বাঙালির আর করে খেতে হবে না। আপনারা বসুন। আমি আসছি।

হিমাদ্রী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আপনার বাড়িতে বারান্দা ছাড়া ছাদে যাওয়ার আর কোনও পথ আছে কি?

আছে। বাগান থেকে দুটো লোহার ঘোরানো সিঁড়ি আছে। তবে তা কেউ ইউজ করে না।

হিমাদ্রি আবার সিগারেট ধরাইল।

প্রণববাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। শুনিয়াছি মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, মানসিক চিন্তা মানুষের শরীরের চেয়ে মুখ-চোখের উপর বেশি রেখাপাত করে। আজ তাঁহাকে দেখিয়া এই কথাটিই মনে হইল। সামনের চুলগুলিতে পাক ধরিলেও এতদিন যেন চোখে পড়িত না। আজ মনে হইল তাঁহার চোখে-মুখে বার্ধক্যের ছায়া যেন গভীরভাবে পড়িয়াছে।

বাড়ির ভিতরের দিক হইতে রমেনবাবু আসিলেন।

হিমাদ্রি বলিল, আরে রমেনবাবু যে, কতক্ষণ এসেছেন?

বেশ কিছুক্ষণ হল।—বারকয়েক কাশিয়া রমেনবাবু গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন।—এখানে দেখলাম কেউ নেই। তাই ভেতরে গিয়েছিলাম মাসিমার সঙ্গে গল্প করতে।

হিমাদ্রি রমেনবাবুর দিকে সিগারেট কেসটি বাড়াইয়া দিল, নিন, সিগারেট খান।

রমেনবাবু সযত্নে একটি সিগারেট তুলিয়া লইলেন। তাঁহার হাতের আঙুলগুলি সরু-সরু, নরম। একটু কম্পমান। ভারি সুন্দর দেখিতে। জ্যোতিষীরা বোধহয় এই আঙুলকেই শিল্পীর আঙুল বলেন।

সমিতবাবু আসিলেন। পাজামা-স্যান্ডোগেঞ্জি পরিয়া আছেন। গায়ে একখানি দামি তারকিস। হিমাদ্রির পাশে বসিয়া পড়িয়া পটপট করিয়া আঙুল মটকাইতে লাগিলেন। তারপর কোনওরকম ভণিতা না করিয়া হিমাদ্রিকে বলিলেন, মিস্টার সেন, সিগারেট দিন।

ও শিয়োর। হিমাদ্রি সিগারেট কেসটি দিয়া বলিল, কী করছিলেন এতক্ষণ?

কেসটি খুলিয়া সমিতবাবু সিগারেট লইলেন।

বারকয়েক জোরে টান দিয়া সবেগে ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, একটা বই পড়ছিলাম। রাসেলের 'কনকোয়েস্ট অব দ্য হ্যাপিনেস'।

হিমাদ্রি বলিল, একটা অনুরোধ করব? আমাকে একটা নেতাজীর স্ট্যাচু তৈরি করে দেবেন? G. O. C. ইউনিফর্মে।

এক্সট্রিমলি সরি। আপনার অনুরোধটা বড় অসময়ে করলেন, মিস্টার সেন। আমি হয়তো শীঘ্রই চলে যাচ্ছি বোম্বেতে।

বোম্বেতে? ব্যাপার কী, রঞ্জু?—প্রণববাবু প্রবেশ করিলেন।

সমিতবাবু সিগারেট পায়ের তলায় চাপিয়া দিলেন।

কোম্পানি বোম্বেতে একটা নতুন ফ্যাক্টরি খুলেছে। হায়ার প্রোমোশন দিয়ে সেখানেই আমাকে পাঠাবার কথা হচ্ছে।

কথা শেষ করিয়া সমিতবাবু তাকাইলেন রমেনবাবুর দিকে। রমেনবাবু চোখের চশমা খুলিয়া আস্তে-আস্তে চশমার কাচ মুছিতে লাগিলেন।

প্রণববাবু চিৎকার করিয়া চাকরকে চা দিতে বলিলেন।

বিনয়বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম, পরিপাটি করিয়া চুল আঁচড়াইতেছেন। মুখটি বৃষ্টিধোয়া ফুলের মতো স্বচ্ছ। স্নো মাখিতে পারেন।

চাকর চা ও টোস্ট লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে-পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন নির্ঝরিণী। অলসভাবে একটি সোফায় বসিলেন। চোখ দুটি একটু ফোলা-ফোলা। চুলগুলি একটু অবিন্যস্ত।

চাকর চা পরিবেশন করিতে লাগিল।

যূথিকা ধীর পদক্ষেপে আসিল। আনমনাভাবে ঘরের কোণে রক্ষিত গোল শ্বেতপাথরের টেবিলটার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর আনমনাভাবেই ফুলদানির ফুলগুলি নতুন করিয়া গোছাইতে লাগিল।

হিমাদ্রি চায়ের কাপে চুমুক দিয়া নির্ঝরিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাড়িতে ছিলেন নাকি?

ভাঙা-ভাঙা গলায় নির্ঝরিণী বলিলেন, ঘুমোচ্ছিলাম। শরীরটা ভালো নেই।

যূথিকা নির্ঝরিণীর দিকে চকিতে ফিরিয়া চাহিল।

নির্ঝরিণী হাতের চুড়িগুলি দেখিতে লাগিলেন।

যূথিকা যেমন আসিয়াছিল, তেমনভাবে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নির্ঝরিণী দেবী শাড়ির আঁচলটি মুখের ওপর একবার বুলাইয়া লইয়া চায়ের কাপ মুখে তুলিলেন। লক্ষ করিলাম, নির্ঝরিণী যে-শাড়িটা পরিয়া আছেন, সেটা একদিন বিনয়বাবুর আলনায় দেখিয়াছি।

প্রণববাবুর দিকে চোখ পড়িতে দেখিলাম তিনি যেন কী ভাবিতেছেন।

কী ভাবছেন?

আমার ব্যাবসার অবস্থা এখন বড় খারাপ। কিছু টাকা নতুন করে ইনভেস্ট করতে পারলে কয়েকটা ভালো টেন্ডারের কাজ ধরা যেত। কিন্তু...।

হিমাদ্রি দেখিলাম একমনে ধূম্রজাল রচনা করিয়া চলিয়াছে।

বাসায় ফিরিতেই দেখা গেল পঞ্চানন অপেক্ষা করিতেছে। সে কয়েকটি খবর দিয়া গেল।

প্রথম খবর ঃ আগের দিন বৈকালে মেট্রোর কাছে ফুটপাথে একটা পত্রিকার স্টলে রাখালকে দেখে। পরে তাহাকে বালিগঞ্জের সেই বাড়িতে যাইতে দেখে।

দ্বিতীয় খবর ঃ কিছুক্ষণ পর ওই বাড়ি হইতে এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এবং নির্ঝরিণীকে মোটরে করিয়া বাহির হইতে দেখে। মোটর তাঁহাদের লইয়া সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডে আসে। ওই ভদ্রলোক এবং নির্ঝরিণী একটি বাড়িতে প্রবেশ করেন। আধঘণ্টা পরে ওই ভদ্রলোক একা ফিরিয়া আসেন। রাখাল তাঁহাকে লইয়া গাড়ি চালায় বালিগঞ্জ অভিমুখে।

তৃতীয় খবর ঃ রমেনবাবু ও যূথিকাকে সুরাবর্দি অ্যাভিনিউতে একটি বাড়িতে প্রবেশ করিতে

দেখা যায়। একঘণ্টা বাহিরে অপেক্ষা করিয়াও তাঁহাদের ফিরিতে না দেখিয়া পঞ্চানন চলিয়া আসে।

পঞ্চানন বিলক্ষণ কাজের ছেলে। সে বাড়িগুলির নম্বর লইতে ভোলে নাই।

অন্যান্য দিনের মতো আজও প্রণববাবুর চায়ের মজলিশ জমিয়া উঠিয়াছিল। কেবল হিমাদ্রি নিবিষ্ট মনে একের-পর-এক সিগারেট শেষ করিতেছিল।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে ইন্সপেক্টর চট্টরাজকে দেখা গেল। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল এবং একজন সাব-ইন্সপেক্টর। সকলেই খানিকক্ষণ অবাক হইয়া চট্টরাজের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

হিমাদ্রিই তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল।

ইন্সপেক্টর হিমাদ্রির পাশে আসিয়া বসিলেন।

হিমাদ্রি বলিল, এই আসরে এঁকে হঠাৎ দেখে আপনাদের সকলের সেই নিদারুণ ঘটনার কথা আজ আবার মনে পড়ছে। সেটা নির্মম সত্য। অ্যান্ড ট্রুথ উইল কাম আউট সুনার অর লেটার।

প্রণববাবু, সেদিন আপনার জামাই বিবেকবাবু কুকুরের কামড়ে মারা যাননি। তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রণববাবু কিছু বলিতে পারিলেন না। যূথিকা একবার চমকাইয়া উঠিয়া একেবারে স্থির হইয়া গেল। সারা ঘরে মৃদু গুঞ্জন ছড়াইয়া পড়িল।

এ-গল্পকথা নয়। প্রমাণিত সত্য। সেই ঘটনার পর এ-বাড়িতে আমি সময়ে-অসময়ে এসেছি, গল্প করেছি, চা খেয়েছি। কিন্তু একটি মুহূর্তও নষ্ট করিনি। সত্যকে খুঁজে বেড়িয়েছি।

কুকুর আপনার জামাইকে একটা আঁচড়ও দেয়নি। স্পর্শ করার ক্ষমতা পর্যন্ত তার ছিল না। সে তীব্র এক নেশার ঘোরে পঙ্গু হয়ে ছিল। তাকে সামনে শিখণ্ডির মতো খাড়া রেখে হত্যাকারী তার পরিকল্পিত পথে কাজ হাসিল করেছিল।

বিবেকরঞ্জনকে হত্যা করার মতলব হত্যাকারীর আগে থেকেই ছিল। আমার হিসাবে যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম রাতে—অর্থাৎ, দ্বিরাগমনে আসার রাত্রেই—হত্যাকারী তৈরি ছিল। কিন্তু সেদিন সে সুযোগ পেল না। কুকুরটির ওপর তার যা করণীয় তা সে করেছিল। বিনয়বাবু বলেছেন, ঘটনার দিন সকালে কুকুরটিকে কেমন একটু ঝিম-ধরা লাগছিল।

দ্বিতীয় রাত্রে সেই সুযোগ এল, তার সদ্ব্যবহার করল হত্যাকারী। বিবেকবাবু আসছিলেন বাথরুমের দিকে...একা। কেন তিনি যূথিকাকে ডাকেননি, সে-কথা চিন্তা করা নিস্ফল। যাই হোক, বিবেকবাবু বাইরে আসতেই হত্যাকারী তার মাথায় আঘাত করল। তিনি চিৎকার করতেও পারলেন না। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হত্যাকারী সেই মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে গলার তাঁর ওপর মরণ আঘাত হানল। বিবেকবাবুর মৃত্যু হয়েছে দেখে হত্যাকারী বাথরুমের মধ্যে ঢুকল। তারপর মেথর আসবার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বাগানে। তারপর সকলের সঙ্গেই বিবেকবাবুর মৃতদেহ স্বাভাবিকভাবেই দেখতে এল।

এতখানি বলার পর হিমাদ্রি থামিল। সিগারেট ধরাইয়া আবার শুরু করিল ঃ হত্যাকারীর বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু সে তিনটি ভুল করেছিল, যেগুলো তাকে চিনিয়ে দিল আমায়। প্রথম, হত্যা করার সময় অস্ত্রটা ডানহাতে ধরা ছিল বটে, কিন্তু বাঁ-হাতে গ্লাভস বা দস্তানা পরার প্রয়োজন বোধ করেনি। যার ফলে তার রক্তমাখা বাঁ-হাতের কয়েকটি আঙুলের ছাপ বাথরুমের কপাটে পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয়, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ যে-জুতো পরে সে হত্যা করেছিল সেটা সে সরিয়ে ফেলেনি। বাথরুম থেকে জুতোর দাগ মৃতদেহ পর্যন্ত এসেছে। মৃতদেহের কাছে বিক্ষিপ্ত। আবার রক্তের ফোঁটা-ফোঁটা দাগের সঙ্গে বাথরুমের দিকে ফিরে গেছে। এই জুতোজোড়া হত্যাকারীর ঘরে এখনও আছে। বাথরুমের ঘোরানো সিঁড়ির নীচে বাগানের মাটিতে সেই একই

জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে। এখানে বলা বাহুল্য, বাগান ছাড়া যাওয়ার আর কোনও নিরাপদ পথও ছিল না তার। তৃতীয়, এই খুনের ঘটনায় সবচেয়ে বিস্ময়কর হল 'খুনের অস্ত্র'। হত্যার অনেক পথ ছিল। হত্যাকারী ছুরি মারতে পারত, গলায় রেশমের ফাঁস দিতে পারত, বিষ প্রয়োগের সুযোগ তার ছিল, এমনকী সাইলেন্সার লাগানো আগ্নেয়াস্ত্রও সে ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু সেদিক দিয়ে সে গেল না। কুকুরের ওপর দোষ চাপাতে গিয়ে সে যে-অস্ত্রটি দিয়ে খুন করল—তার এই প্রচেষ্টার মনোবৃত্তিই তাকে ধরিয়ে দিল। হ্যাঁ, আমি বলতে পারি, হত্যাকারী নিজেই নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছে। অস্ত্রটি কী, আমি প্রথমে ধারণা করতে পারিনি। তারপর বুঝতে পেরেছি। জানি, সেটা এখন কোথায় কীভাবে আছে। সে-কথায় পরে আসছি। এখন আমি ভাবছি, হত্যাকারী এত বুদ্ধিমান হয়েও এ-পথের কথা ভাবল কেমন করে! তার বুদ্ধি অনায়াসে অন্যভাবেও তার স্বার্থসিদ্ধি ঘটাতে পারত।

হিমাদ্রি মুখটি রুমালে মুছিয়া লইল।

এ-রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে বারবার আমি পথ হারিয়েছি। রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কত রহস্য লুকিয়ে আছে। সকলেই বুকের মধ্যে রহস্য বয়ে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, পারিপার্শ্বিক সবকিছু মিলে আমার কাছে এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছিল। হত্যার মোটিভ জানতে পারলে হত্যাকারীকে ধরাটা সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি মোটিভ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে মোটিভ খুঁজে পেলাম। রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। হত্যাকারীকে চিনতে পারলাম। এই হত্যার মোটিভ লোভ আর কামনা।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়া হিমাদ্রি বলিল, দুঃখের সঙ্গে আজ জানাতে হচ্ছে, আমার কাছে অনেকে অনেক কথা গোপন করে গেছেন।

নির্ঝরিণীর দিকে তাকাইয়া হিমাদ্রি বলিল, আপনার সঙ্গে বিবেকরঞ্জনবাবুর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি কেন?

নির্ঝরিণী কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার ঠোঁট দুটি শুধু কাঁপিয়া উঠিল। হিমাদ্রি তীক্ষ্ণ চোখে প্রণববাবুর দিকে তাকাইল। মুহ্যমানের মতো তিনি বসিয়াছিলেন।

প্রণববাবু, আপনি বলেছিলেন, আমার মনে আছে, আপনার ব্যবসায়ে বেশ কিছু টাকা লগ্নি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মেয়ে-জামাইকে দ্বিরাগমনে আনতে গিয়ে যখন জানতে পারলেন যে, বিবেকবাবু তার পঁচিশ হাজার টাকার পলিসিটাতে আপনার মেয়েকে 'নমিনি' করেছে, সে-কথাটা আমাকে জানাতে ভুললেন কেন?

আমি...আমি...মানে...।—কিছু বলিতে পারিলেন না প্রণববাবু। তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া গেল।

হিমাদ্রি অঙ্গুলিসঙ্কেতে হত্যাকারীকে দেখাইয়া দিল। হত্যাকারী হইচই করিয়া উঠিল। ভব্যতার মুখোশ তাহার খসিয়া পড়িল। হিমাদ্রিকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করিল। কিন্তু একটি কনস্টেবল তাহার হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিল।

হিমাদ্রি বলিল, এখনও প্রমাণ চান? যে কয়টি বলেছি তাই যথেষ্ট। বাদবাকি কোর্টেই দাখিল করা যাবে।

ঘরের মধ্যে যেন একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল।

ঘর এবং স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া হিমাদ্রি বলিল, মিস্টার চট্টরাজ, একজন কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিন। নায়কের বুকের মধ্যে পাবেন অস্ত্রটিকে। এখনও তাতে বিবেকবাবুর রক্তকণিকা শুকিয়ে আছে।

বাসায় ফিরিয়া হাত-মুখ ধুইয়া সুস্থ হইয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিলাম। হিমাদ্রিকে বলিলাম, তুমি গোড়া থেকে সবকিছু খুলে বলো।

হিমাদ্রি বলিল, হ্যাঁ, তোমায় সবকিছু বলব। তুমি আমার কাছে মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করেছ, কিছু-কিছু ব্যাপার জানতে চেয়েছ, তখন কিছু বলিনি। আজ তোমায় সবকিছু খুলে বলছি। শোনো—।

আমি নড়িয়া-চড়িয়া বসিলাম। হিমাদ্রি শুরু করিল ঃ

মৃতদেহ দেখেই আমার মনে হল, এটা নিখুঁত খুন। কুকুরের ব্যাপার সাজানো। মৃতের ঘাড়ে আঘাতের দাগ দেখে বুঝলাম, আগে মাথার পিছনদিক থেকে আঘাত করা হয়েছে। আঘাতের তীব্রতা হয়তো এতখানি নিঁখুত ছিল যে, কোনও আওয়াজ বিবেকরঞ্জন করতে পারেনি। তারপর সংজ্ঞাহীন বিবেকরঞ্জনকে হত্যা করল খুনি। আঘাত দেখে মনে হয়, কোনও হিংস্র পশু ধারালো দাঁত দিয়ে গলা থেকে গভীরভাবে মাংস উপড়ে নিয়েছে। কিন্তু কী দিয়ে হত্যা করল? অস্ত্রটা মারাত্মক বুঝতে পারলেও তার রূপটা বুঝতে পারলাম না। অস্ত্রটির চিন্তা মাথায় ঘুরতে লাগল।

বাথরুমের দরজায় পেলাম রক্তমাখা বাঁ-হাতের কয়েকটি আঙুলের ছাপ। বাথরুমের মেথর-যাওয়া সিঁড়ির তলায় বাগানে পাওয়া গেল জুতোর ছাপ—যা উপরেও ছিল। তুমি তো জানো সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ঘরগুলো সার্চ করতে এসে নির্ঝরিণীর ঘরে পেলাম একটি ইতিহাসের বই। বইটা খুলতে গিয়ে 'ছত্রপতি শিবাজী' পরিচ্ছেদে আটকে গেলাম। বইটার অনেক জায়গায় দাগ দেওয়া আছে; কিন্তু ওই পরিচ্ছেদে একটি অংশ বিশেষভাবে মোটা-মোটা করে দাগ দেওয়া ঃ

'শিবাজী আফজল খাঁকে বাঘনখ দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন।'

অস্ত্রটির ইঙ্গিত পেলাম। শিবাজীর একটা মডেল দেখা গেল সমিতের ঘরে। সে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ফোরম্যান। ধাতু উপাদানে নিজের হাতে সে তৈরি করেছে এই মডেল। তাহলে...শিবাজীর বাখনখও তো সে তৈরি করতে পারে!

ভালো কথা, আমি সমিতের কাছে খবর পেয়েছিলাম, মডেলটা সে খুব বেশিদিন তৈরি করেনি। কেন সে হঠাৎ শিবাজীর মডেল তৈরি করতে গেল, জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিয়েছিল, শিবাজীকে তার ভালো লাগে। তার ভাষায় অত বড় ধুরন্ধর রাজনৈতিক বীর আর নেই।

বেশ বোঝা যায়, শিবাজীর চরিত্র তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। নিজের ঈপ্সিতকে পাওয়ার জন্যে সে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল।

ভুল হল। পরের ঘটনা আগে বলে ফেললাম।

সমিতের পক্ষে বাঘনখের মতো অস্ত্র তৈরি করা যত স্বাভাবিক ছিল, আর কারও পক্ষে ততখানি ছিল না। আর সমিতের তৈরি বাঘনখ নিয়ে আর অন্য কেউ তো এ-কাজে নামতে পারে না। সমিতকে সন্দেহ করলাম। তাকে অনুসরণ করলাম সন্তর্পণে। সিগারেট দেওয়ার সময় কেসটা তার হাতে দিলাম। বাঁ-হাতে কেসটা ধরে সে সিগারেট নিল। কেসের ওপর আঙুলের ছাপ রয়ে গেল। পরে মিলিয়ে দেখলাম, বাথরুমের ধারে পাওয়া দাগের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। একদিন তুমি আর সমিত যখন কথায় ব্যস্ত ছিলে, তখন তার ঘর দেখতে-দেখতে আলনার তলায় রাখা জুতোর মাপ বাগানে পাওয়া ছাপের সঙ্গে মেলাতে মোটামুটি মিলে গেল।

সমিতের বড় দোষ, সে নিজেকে খুব চালাক ভাবত। তার সঙ্গে ছিল দম্ভ। এই দুয়ে সে বেশি বোকা হয়ে গেছল।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না সমিতের মোটিভ কী।

গদাইয়ের অপটু হাতে আঁকা ছবি আমার চোখ ফুটিয়ে দিল। তার কাঁচা-মন সমিতের সঙ্গে যূথিকার প্রণয় গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল।

মোটিভ পরিষ্কার—প্রণয়। প্রয়োজন—পথের কাঁটা সরানো।

এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো—যূথিকা এবং সমিতের মধ্যে যদি প্রেম হয়ে থাকে, তবে যূথিকা বিবেকরঞ্জনের সঙ্গে বিয়েতে মত দিল কী করে? এ-বিষয়ে চিন্তা করে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। তোমার সঙ্গে তো যূথিকার বেশ আলাপ জমে উঠেছে—তুমিই তাকে জিগ্যেস করে মিলিয়ে নাও আমার অনুমান কতটুকু সত্য।

নীরবে হিমাদ্রির খোঁচাটি হজম করিয়া বলিলাম, যাক, সে না হয় হবে। তুমি তোমার কথা বলো—।

যূথিকাকে দেখে বুঝেছি, তার মধ্যে একটা বিরাট দুর্বলতা আছে। তার সংস্কারের দুর্বলতা। সত্য প্রকাশ করার মতো মনের দৃঢ়তাও তার কম। হয়তো প্রণববাবুর প্রবল ব্যক্তিত্বের কঠোরতা তাকে আত্মসচেতনশীল হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল।

তবুও জীবনধর্মকে অস্বীকার করা যায় না। 'ইন্সেস্টুয়াস্ লভ' বলে একটা কথা আছে। যূথিকা তখন কৈশোর থেকে সবে যৌবনে পা দিয়েছে। তার দেহের বাইরে এবং ভিতরে চলছে বিপ্লব। তার রক্তে এক চরম কৌতূহল চঞ্চল হয়ে উঠছে। সমিত বাড়িতে একটি যুবক। সে অগ্রসর হল। যূথিকা তাকে প্রশ্রয় দিল। তুমি রমেনবাবুর কথা তুলতে পারো। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাবে, এই যুগসন্ধিক্ষণে মেয়েরা জ্যাঠামশাই-মার্কা ছেলেদের চেয়ে বেশি আকর্ষিত হয়, যেসব ছেলেরা ভাঁড়ামি করতে পারে—তাদের প্রতি। এরপর যখন যূথিকার ভেতরের বিপ্লব স্তিমিত হয়ে এল—তরল মনটা যখন একটা আকার নিল, তখন এল তার উপলব্ধি। কিন্তু সে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। সে না পারল স্বীকার করতে, না পারল অস্বীকার করতে। সমিত হয়তো চেষ্টা করেও তার মনের কাঠামোকে দৃঢ় করতে পারেনি। কিন্তু সে প্রণববাবুকে ভালো করেই চিনত। সে জানত কুমারী যূথিকার বিয়ে হতে পারে, বিধবা যূথিকার বিয়ে হবে না।

তাই সমিত বিবেকরঞ্জনকে হত্যা করার পথই বেছে নিল। অবশ্য সমিতের মনের এই অভিসন্ধি যূথিকা জানতে পারেনি। জানলেও সে কী করত, এ-কথা উত্থাপন করা নিস্প্রয়োজন।

একটি কথা মনে আসিতে গা শিহরিয়া উঠিল। সমিতের ঘরে শিবাজীর স্ট্যাচুর মধ্যে অদ্ভুত অস্ত্রটি পাওয়া গিয়াছে। অস্ত্রটি লৌহশলাকা নির্মিত। হাত-মোজার মতো। ডানহাতেই পরা যায়। নখের জায়গাগুলি ছুরির ফলার চাইতেও তীক্ষ্ণ। আঙুলের গাঁট বরাবর ছোট-ছোট কবজা বসানো আছে। সমিত ইহা স্বহস্তে নির্মাণ করিয়াছে। কী জানি, শিবাজীর বাঘনখ অস্ত্র হয়তো এমনিই ছিল।

আমি প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা, তুমি কী করে জানলে ওটা ওখানে আছে?

হিমাদ্রি বলিল, ইতিহাস বইয়ের ওই আন্ডারলাইন করা অংশ এবং সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নায়কের স্ট্যাচু দেখে প্রথম থেকেই আমার মনে হয় 'শিবাজী' ঘটনার মধ্যে মিশে আছেন। সমিতের ঘরে শিবাজীর স্ট্যাচুটা আমার বরাবর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একদিন সন্ধ্যায় একা গেলাম ওখানে। সে ছাদে ব্যায়াম করছিল। ছাদের দরজায় শিকল তুলে দিলাম। বারান্দায় কেউ ছিল না। তার ঘরের তালা আমার চাবির গোছার একটি চাবি দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকলাম। মূর্তিটার পিছনদিকে একটা ঢাকনা দেখতে পেলাম। সেটা টান দিতে ভিতরে একটা গহ্বর দেখা গেল। আর সেই গহ্বরের কোঠরে রয়েছে মারণাস্ত্রটি।

তাহলে বলো, নির্ঝরিণীর ইতিহাস বই পড়েই ধারণাটা সমিতের মাথায় আসে।

নির্ঝরিণীর কাছ থেকে বইটা হয়তো নিয়ে থাকবে সমিত। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে বইতে দাগ দিতে গেল কেন? এটাও তার একটা মস্ত ভুল। যদি অন্যরকম সন্দেহ হয়, তা নির্ঝরিণীর ওপর দিয়েই যাবে। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম, যে ইতিহাস পড়ে বা পড়ায়, সে ইম্পর্ট্যান্ট জায়গায় আন্ডারলাইন করতে পারে, কিন্তু সকলের জানা ওই ঘটনার ওপরে দাগ দেওয়াটা যে একান্তই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, তা বুঝতে আমার দেরি হল না।

আচ্ছা হিমাদ্রি, যূথিকার ঘরে অ্যালবামের 'র' কে?

রমেন নয়। রমেনকে যূথিকা ভালোবাসেনি। ভক্তি করেছে। অবশ্য রমেন তাকে ভালোবাসতে পারে।

কিন্তু রমেনকে দেখতে ভালো। সে তাকে অনেকদিন ধরে পড়িয়েছে...।

আগেই তো তোমায় বলেছি, কাঁচা মনে রঙ ধরাতে গেলে, জ্ঞান দিলে হটে যাবে। ফাজলামি করো, হিরো হবে। রমেন ফাজলামি করতে পারত না। 'র' রমেন নয়। 'র' মানে রঞ্জু, অর্থাৎ সমিত। ওটা যে তার ডাকনাম, তা একদিন প্রণববাবুকে ডাকতে শুনে বুঝতে পারি।

কিন্তু রমেনের সঙ্গে যে যূথিকার কীসব পরামর্শ হয়েছিল। তাদের একসঙ্গে...।

রমেন যূথিকাকে বাঁচবার একটা অবলম্বন করে দিতে চাইছিল। শিক্ষকতা লাইনে সে আছে, অনেক স্কুলে তার সুপারিশের সুযোগ ছিল।

কিন্তু রাখালের গাড়িতে নির্ঝরিণীকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যাতায়াত...।

উপযুক্ত প্রশ্ন করেছ। রাখালের মনিব একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। নির্ঝরিণী রাখালের মাধ্যমে তার দ্বারস্থ হয়েছিল। নির্ঝরিণী হচ্ছে সেই নারী যে জীবনে ভদ্রভাবে বাঁচতে চায়।

আচ্ছা, বিনয়বাবু...।

একটি যৌনবিকৃত কল্পনাবিলাসী অদ্ভুত জীব। প্রকৃত নারীকে পাওয়ার প্রচেষ্টার চেয়ে যার বিলাস বা আত্মতৃপ্তি হচ্ছে মেয়েদের ব্যবহার্য জিনিস লুকিয়ে এনে নিজের ঘরে রাখা—মেয়েটি তার ঘরে এসেছে, তাকে সে পেয়েছে, কাছে এসেছে, সে উপভোগ করছে...এইসব কল্পনার মধ্যেই যৌবনের আনন্দকে সে লুটে নিতে চায়। এমনি কত হাজার-হাজার বিনয়বাবু রয়েছে আমাদের মধ্যে কে তার হিসেব রাখে!

রাখাল বাড়ির রাঁধুনি-বউয়ের স্বামী। কী সূত্রে বিনয়বাবুর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল জানি না। সে ড্রাইভার। অসৎ সংসর্গ তার আছে। বিনয়বাবু টাকা দিয়ে তাকে দিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতেন।

আমাকে হাঁ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হিমাদ্রি বলিল, বুঝলে না তো। রাখাল বিনয়বাবুকে নিষিদ্ধ বই এবং ছবি জোগাড় করে দিত। উঁহু, অবাক হয়ো না। ওই ধরনের বই আজকাল অনেক বড়-বড় বাবুর পোর্টফোলিওর মধ্যেও পেতে পারো—যদি খোঁজ করো। মনে হচ্ছে, তোমারও লোভ হচ্ছে?

হিমাদ্রি হাসিতে-হাসিতে ইজিচেয়ারে গা ঢালিয়া দিল।

ভিতরে আত্মারাম মাংস চাপাইয়াছে। তারই মনোরম গন্ধ আসিতেছে। আহা, আত্মারাম ভারী চমৎকার রান্না করে। তবে গঞ্জিকার মাত্রা চড়িয়া গেলে একটু-আধটু গোলমাল করিয়া ফেলে বইকি। তা করুক। আজ মন ভরিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা হইল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম—আত্মারাম যেন শত পুত্রের পিতা হইতে পারে!

অপারেশন ব্ল্যাঙ্ক



হিমাংশু সরকার

॥ ১ ॥

এক চোখে তাকিয়ে আছে ০'৩৮ ম্যাগনাম সাইলেন্সড অটোমেটিক পিস্তলটা আমার বুকের দিকে। ট্রিগারে সামান্য একটু চাপের দরকার।

তাহলেই তপ্ত একটা সিসের বুলেট ছিটকে এসে আমার কলজেটাকে আদর করে পিঠ ফুঁড়ে দেওয়ালে গিয়ে লাগবে।

একটা হিমশীতল অনুভূতি পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে।

মনে হল আমার পা-দুটো পাথরের থামের মতো শক্ত হয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে। আমার যেন আর নড়বার শক্তি নেই।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে এভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হব, তা ভাবতে পারিনি। ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

মাত্র ছ'ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখে তার খুনের নেশা।

আমি তাকে ভালো করে আপাদমস্তক মেপে নিলাম। শক্ত শরীর। শক্তিশালী। কিন্তু সুগঠিত বলতে যা বোঝায়, তা নয়। শরীরের প্রত্যেকটি অংশের বৃদ্ধি সমান নয়। বুঝলাম এ-শরীরে শক্তি আছে, কিন্তু এ-শরীর শিক্ষিত নয়। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও নাটকীয়। অতিরিক্ত হিন্দি সিনেমা দেখেছে।

কিন্তু আমি কী করি? সাক্ষাৎ মৃত্যু আমার সামনে দাঁড়িয়ে। নিশানা তার বিন্দুমাত্র ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এভাবে আমি বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আহতও হয়েছিলাম।

প্রাণরক্ষার একটা উপায় আমায় খুঁজে বার করতেই হবে। এমন অসহায় হয়ে আমার মরা চলে না। আমাকে লড়তেই হবে।

আমার ভাগ্য ভালো, অস্ত্রধারী নিজেই হিন্দি সিনেমার ভিলেনের মতো আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, আমাদের তালিকায় তোমার নামটা সকলের ওপরে।

আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, আমার নাম সর্বত্র ওপরেই থাকে।

এবং সেইজন্যে, তোমাকেই প্রথমে মরতে হবে।

বিশ-পঁচিশ বছর ধরে সকলেই অপেক্ষা করছে আমার মৃত্যুর জন্যে।

তোমাকে হত্যা করার জন্যে একটা মোটা পুরস্কার পাওয়া যাবে।

আমি যথাসাধ্য হাসতে চেষ্টা করে বললাম, তাহলে আর দেরি করছ কেন? বৈঠকবাজিতে তুমি ওস্তাদ মনে হচ্ছে।

কিন্তু তুমি যে এত অসহায়ভাবে মরবে, তা ভাবতে পারছি না। তবু তোমাকে আজ মরতেই হবে, বিমান।

বিমান! আমার নাম বিমান নয়। হত্যাকারী আমাকে চেনে না। কেউ নামটা বলে দিয়েছিল, ভুলে গেছে। অতএব হত্যাকারী ভিতরের লোক নয়। ভাড়াটে খুনি।

হাসতে-হাসতে বললাম, সকলকেই তো একদিন মরতে হয় বন্ধু, কিন্তু...।

কিন্তু?

কিন্তু যারা আমায় মারতে চেয়েছে, তাদের কেউ আর বেঁচে নেই। কেউ-কেউ পুড়ে ছাই হয়ে পঞ্চভূতে মিলেছে। কেউ-কেউ বিভিন্ন গোরস্থানে মাটির ছ'ফিট নীচে ঘুমুচ্ছে। এবং তুমিও একটা মূর্খ, মরবার জন্যেই এসেছ।

এবার সেও হাসল : তাই নাকি? দূরবিনের উলটোদিক দিয়ে দেখছ মনে হচ্ছে। তুমি বোধহয় জানো না যে, তুমি আমার সপ্তম বলি। আমি ঠিক আর-পাঁচজন খুনির মতো নই।

জানি, তুমি ভাড়াটে খুনি। তোমার হাতের অস্ত্রটা বিদেশি। রাশিয়ার তৈরি। রাশিয়া অনেক

যুগ আগে চিনকে দিয়েছিল। এক নতুন ধরনের সাইলেন্সার লাগানো আছে ওতে। প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন বুলেট। যাকে বলে, high velocity slug। প্রায় রাইফেলের মতো কাজ করে।

সে একটু অবাক হয়ে বলল, অনেক কিছু জানো দেখছি।

ওটা আমার ব্যাবসা, গর্দভ।

বাঃ! মরবার আগে নার্ভগুলোকে শক্ত করে নিচ্ছ মনে হচ্ছে!

আবার হাসলাম, তুমি এ-লাইনে নতুন এসেছ মনে হচ্ছে। আগে কী করতে? চোলাই মদ বিক্রি করতে, না পাড়ার নতুন রংবাজ তুমি? কোনটা?

সে আরও অবাক হয়ে বলল, কি করে জানলে তুমি এসব?

বললাম, ওটা জানাও আমার ব্যাবসা। তুমি নিখুঁতভাবে পিস্তলটা ধরতে পারোনি। তোমার বুড়ো আঙুলটা পিস্তলের বাঁট ছোঁয়নি। তুমি জানো না যে, এ-পিস্তলে গুলি ছোড়ার সময় প্রচণ্ড জার্ক খায়। পিস্তলটা হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। তুমি এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নও। আর তোমার ডান হাতের কনুইয়ের নীচে একটা কাটা দাগ। তোমার নাকের পাশে একটা কাটা দাগ। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ওগুলো ছুরির আঘাত থেকে হয়েছে। পাড়ার গুন্ডাদের অমন দু-একটা দাগ থাকে। তাই না?

কাজ হয়েছে। ওর চোখে এক গভীর বিস্ময় ও অস্বস্তি ফুটে উঠেছে।

ও খুন করতে এসেছিল। কথা না বলে খুন করাই উচিত ছিল। কোনও বুদ্ধিমান লোক এতক্ষণ কথা বলত না।

'কম্ব্যাট' ট্রেনিংয়ে শিখেছিলাম বেয়নেট চার্জ করলে মাটিতে শুয়ে পড়তে হয়। তারপর ক্রমাগত গড়াতে হয়। তারপর বেয়নেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে গেঁথে গেলেই, শুয়ে-শুয়েই মারতে হয় প্রতিপক্ষের চোয়ালে এক লাথি। এ ব্যবহারিক শিক্ষা আমি নিয়েছি।

কিন্তু এটা বেয়নেট নয়। পরিস্থিতিও আলাদা।

আর আমি গড়িয়ে পালাব কোথায়?

পিছনে দেওয়াল। দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলবে আমাকে মারাত্মক বুলেটগুলো। সেভাবে বাঁচা যাবে না।

অতএব?

রিভার্স! ঠিক উলটোটা করতে হবে।

আমার কথাগুলো শুনে খুনি একটু অবাক হয়েছে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছে।

আমি বিদ্যুৎগতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। ততক্ষণে একটা বুলেট আমার মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেওয়ালে গিয়ে বিঁধেছে।

আমার ভাববার সময় নেই। মরতেই যদি হয় তো না লড়ে মরব কেন?

মাটিতে পড়ে আমি গড়াচ্ছি। কিন্তু দেওয়ালের দিকে নয়, খুনির দিকেই।

একটা তীব্র অনুভূতি আমার বাঁ-দিকের পাঁজরে, বোধহয় একটা গুলি লেগেছে। কিন্তু ভাববার সময় নেই। আমাকে তবুও শেষ চেষ্টা করতে হবে। বাঁচতেই হবে।

গড়াতে-গড়াতে হাত বাড়ালাম। হত্যাকারীর বাঁ-পা-টা ধরে প্রচণ্ড জোরে টান দিলাম। ভারসাম্য না রাখতে পেরে আমার ওপরেই পড়ল সে। পিস্তলটা ছিটকে গেছে দূরে। আমি যা চাইছিলাম।

আমার ভেতরে যে ক্রোধ এতক্ষণ জমা ছিল, এবার সেটা বেরোবার পথ পেল।

আমার তলপেটের—দু-পায়ের মাঝখান লক্ষ্য করে সে হাঁটু চালাল।

কিন্তু ব্যর্থ হল। এ-শিক্ষা আমার বহুদিনের। আমি সহজেই ওর আক্রমণ ব্যর্থ করলাম। আমি বাঁ-হাতের কনুই দিয়ে আঘাত করলাম ওর চোয়ালে। সে উঠে পালাতে গেল।

আমি দরজার কাছেই ওকে ধরে ফেললাম। আমার শরীরে তখন অসম্ভব এক জ্বালা। ক্রোধ যার নাম।

আমি ওর পাঁজরার নীচে যকৃতের ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে এক 'পাঞ্চ' করলাম। ও ভাঁজ খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

আমি ভাঁজ-করা হাঁটু বিদ্যুৎবেগে ওপরে তুলে আঘাত করলাম ওর নাকে। ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আবার পাঞ্চ। এবার পেটের ওপর। ওর দম বেরিয়ে এল।

সঙ্গে-সঙ্গে রক্তাক্ত নাকের ওপর আর একটা স্ট্রেট পাঞ্চ।

ওর চোখ দুটো বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। বুঝলাম, ওর তখনও দম আছে।

হাঁটুর মালাইচাকিতে জুতোর ডগা দিয়ে প্রচণ্ড কয়েকটা আঘাত। সঙ্গে-সঙ্গে থুতনির নীচে একটা হুক।

কিন্তু তখনও ওর দম আছে। সে হাত ঘুরিয়ে দুর্বল একটা ঘুসি ছুড়ল আমার দিকে। আমি মাথা নীচু করে একটা ঘুঁসি ছুড়লাম ওর চোখ লক্ষ করে। শেষ ঘুষি।

লোকটা ছিটকে পড়ল দূরে।

কিন্তু সর্বনাশ। ওর হাতের কাছেই মাটিতে পড়ে আছে ওরই হাত থেকে ছিটকে পড়া পিস্তলটা। ওটা যে-কোনও মুহূর্তে আমার মৃত্যুবাণ হয়ে যেতে পারে।

ও হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা নিয়েছে। আর সময় নেই।

ও নিশানা করার আগেই আমার হাতের Lugar 9 mm-টা গর্জন করে উঠল।

একটা ঝাঁকানি খেয়ে ওর মাথাটা কাত হয়ে পড়ল। এ-দৃশ্য আমি জীবনে অনেকবার দেখেছি।

গুলি লেগেছে কপালের ঠিক মাঝখানে। আমি তাড়াতাড়ি অটোমেটিকটা যথাস্থানে রেখে ওকে তল্লাশি করতে লাগলাম।

পেলাম কয়েকটি একশো টাকার নোট। কিছু খুচরো পয়সা। সিগারেট। দেশলাই।

আর একটা কাগজের টুকরো (প্রফেশনাল খুনিরা পকেটে এসব রাখে না)। তাতে একটা নাম। একটা ঠিকানা।

আমার বাঁ-দিকের পাঁজরটা এবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

চোট মারাত্মক নয়। শার্টের কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। ছিঁড়ে গেছে খানিকটা মাংস ও চামড়া। তাড়াতাড়ি 'ফার্স্ট-এইড' সেরে নিলাম। এ ধরনের আঘাতের চিহ্ন আমার শরীরে অনেক আছে। আমার এখন প্রধান চিন্তা, এই মৃতদেহের কাছ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব পালাতে হবে। কেন না, আমার অনেক কাজ বাকি আছে।

রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করতে হবে।

রঞ্জন। আমার বাল্যবন্ধু। আমার ডান হাত। আমার মন্ত্রী। সেই রঞ্জন হঠাৎ একদিন আমায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল।

বারো বছর পর আমাকে আবার ফিরতে হল কলকাতায়।

কিন্তু রঞ্জন এখানে নেই। আমি কলকাতা পৌঁছনোর ঠিক আগের দিন রঞ্জন নিহত হল।

যাই হোক, আমি এখন বাধ্য এই হোটেল ছেড়ে যেতে। পুলিশ আসবে।

আর পুলিশ মানেই হাজারখানেক প্রশ্ন, যার কোনওটারই উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার সঙ্গে সামান্য কয়েকটি জামাকাপড় ছিল। সেগুলো সুটকেসে পুরে, সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে পথে নেমে এলাম।

আমি যে দীর্ঘ বারো বছর পর মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে কলকাতায় ফিরেছি, সেটা কারোর

জানার কথা নয়।

কিন্তু ওরা জেনেছে। পাঠিয়েছে খুনিকে। কিন্তু কেন? ওরা কারা? ওরা আমায় মারতে চায় কেন? কী ওদের উদ্দেশ্য?

সৌভাগ্যবশত একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সিতে উঠে বসে বললাম, চলো মৌলালির কাছে—ক্রিক রো!

॥ ২ ॥

ক্রিক রো। সেন্ট্রালের সেন্টার।

আমার জন্মস্থান। আমার পাড়া। আমাদের পাঁচ পুরুষের বাস। আমি সেন্ট্রালের ছেলে।

আমি দীর্ঘদিন কলকাতায় নেই, অথচ কোনওদিন ভাবতে পারিনি যে, ওটা আমার পাড়া নয়। কোনওদিনই বোধহয় ও-পাড়াটা আমার কাছে পর হবে না।

কাঁধের ওপর সেই কাটা দাগটা এখনও আছে। ওই পাড়াতেই আমাকে গভীর রাতে আক্রমণ করেছিল বদ্রি। বদ্রিপ্রসাদ সিং।

বদ্রিপ্রসাদ সত্যিই সিংহ ছিল। মধ্য-কলকাতার এলাকা ছাড়িয়েও অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার ক্রাইমের সাম্রাজ্য। বদ্রি সম্রাট ছিল।

আর সাম্রাজ্যের বাইরেও বিস্তৃত ছিল তার খ্যাতি (আপনারা সেটাকে কুখ্যাতি বলবেন)। অসাধারণ ছিল তার সাহস এবং শক্তি। পুলিশ কোনওদিন তার নাগাল পেত না। কেন না, এমন ইনফরমার ছিল না যে, বদ্রিকে উপেক্ষা করে পুলিশকে সাহায্য করার কথা ভাবতে পারত। অন্তত গোটা পাঁচেক ইনফরমারের জীবন গেছিল বদ্রির ইশারায়। সেন্ট্রাল তখন সিংহের জন্ম দিত। 'ইনফরমার' একটাও ছিল না।

সেই বদ্রি আমার উত্থানকে বিপদের সঙ্কেত বলে ভাবত। কেননা, বদ্রি পরিষ্কার বুঝেছিল, আমার বৃদ্ধি মানেই ওর পতন।

সে ছিল এক নম্বর পয়দাবাজ। ভাবত আমার বৃদ্ধি হলে ওর পয়দা কমে যাবে। সেই জন্যে বদ্রি প্রথমে আমাকে ওর দলে টানতে চেষ্টা করল।

বদ্রির নির্দেশে আমি কয়েকটি ছোটখাটো 'তোড়' করেছিলাম। কিন্তু এক পয়সাও ওকে ঠেকাইনি।

কাজেই বদ্রি বুঝল আমাকে দলে টানা যাবে না। তখন সে চেষ্টা করল আমাকে শেষ করে দিতে। শুরু হল আমার মরণ-বাঁচন লড়াই।

বদ্রির চেলারা কয়েকবার আমাকে আক্রমণ করেছিল। পারেনি।

আমার বাহিনী ছিল ছোট, তাই আমাকে লড়তে হত গেরিলা প্রথায়।

'হিট অ্যান্ড রান' মেথডে।

দেখতে-দেখতে আমি অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। ঠেক জমালাম 'হিন্দমোটর' এলাকায়। দু-চারটে কারখানার ইউনিয়নের হয়ে কাজ করার কনট্রাক্ট পেলাম। টালার কয়েকটি দুর্ধর্ষ ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল। নর্থের একটা হিরোকে ধরে একদিন মেরামত করে দিয়ে চমক সৃষ্টি করলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটি 'হাইজ্যাকিং করলাম। অর্থাৎ, চোরের ওপর বাটপাড়ি।

বদ্রির রাজ্য সেন্ট্রাল ক্যালকাটা থেকেও দু-চার পয়সা পয়দা করছি। চারদিকে আমার নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি তখন সারা কলকাতার উঠতিদের মধ্যমণি। সব উঠতিরাই তখন আমার নেতৃত্ব পেতে চাইছে।

বদ্রি শঙ্কিত। বদ্রি আমার সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনি শুনে চমকে উঠেছে। আমার ওপর আক্রমণের পর আক্রমণ হচ্ছে।

আমি তখনও কলেজে পড়ছি। বদ্রির আক্রমণ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। আমি বাধ্য হলাম ঘর ছেড়ে পালাতে।

পরীক্ষা দেওয়া হল না। দিলেও পাশ করতাম না। প্রাণ নিয়ে পালাতে হল।

ছেলে বাড়ি ছাড়লে যে আরও দ্রুত অবনতি ঘটে তার চরিত্রের, তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমি। আমি আমার পরিচিত জগৎ থেকে অনেক দূরে এক অন্ধকার জগতে চলে গেলাম। সেখানেও টিকে থাকার জন্যে যুদ্ধ করতে হত। পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ না করে কোনও মানুষ বাঁচতে পারে না। যুদ্ধের রকমফের থাকতে পারে, কিন্তু বাঁচার রীতি-নীতি সেই একই। লড়াই।

সেই দূর-সাম্রাজ্য থেকে আমার দ্রুত উন্নতির কাহিনি বিস্তারিতরূপে সেন্ট্রালের সম্রাট বদ্রির কানে পৌঁছত।

বদ্রি দূর থেকে লোক পাঠাত আমাকে শেষ করতে। আমি সে-আঘাত প্রতিহত করতাম। নেপাল থেকে চোরাপথে বদ্রির মাদকদ্রব্য, বিশেষ করে গাঁজা আসত। আমি আমার উঠতি বাহিনি নিয়ে পরপর তিনবার তার মাল 'হাইজ্যাকিং' করলাম। পূর্বপাকিস্থান থেকে বদ্রির জন্যে লবঙ্গ আসত, সেটাও ঘুরিয়ে দিলাম বারদুয়েক।

বদ্রি মহা বিপদে পড়ল। শেষে সে কলকাতা এবং তার আশপাশের সম্রাটদের ডেকে কনফারেন্স করল।

কিন্তু সফল হল না। অন্য রাজারা বদ্রিকে ভয় করত, ভালোবাসত না। তাদের মধ্যে দু-একজন বদ্রির পতন দেখতে চাইছিল।

আমি তখন যে-এলাকায় ছিলাম, তার সম্রাট বদ্রির এই ক্ষতিতে খুশি হল। কেন না আমার কাছ থেকে সেই অনামী সম্রাট মোটা টাকা পেত।

এইভাবে দীর্ঘ ছ-সাত মাস ধরে বদ্রির সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলল।

সেই ছ-সাত মাস পরে। যেদিন আমার মা মারা যায়, সেই রাত্রে লুকিয়ে মায়ের মরামুখ দেখতে এসেছিলাম।

বদ্রি প্রস্তুত ছিল। সে জানত আমার মাকে আমি দেখতে আসব।

রাত দেড়টা নাগাদ প্রায়ান্ধকার গলিতে ঢুকতেই পেছন থেকে কাঁধের ওপর কোপ পড়ল ভোজালির।

কিন্তু ভোজালিটা ভালোভাবে লাগেনি। কেন না ভোজালিটা আমার কাঁধ স্পর্শ করার আগেই আমি ওর ছায়া দেখে বিদ্যুৎবেগে বসে পড়েছিলাম। কাঁধে লেগেছিল, কিন্তু তাতে প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল না।

কিন্তু বদ্রি ভুল করেছিল। তার জীবনের প্রথম ও শেষ ভুল।

সে জানত না এই দীর্ঘদিন আমি বাড়ির বাইরে থেকে কী শিক্ষা পেয়েছি। দ্বিতীয় ভুল, সে নিজে এসেছিল আমাকে মারতে। তার উচিত ছিল অন্য কাউকে পাঠানো।

আঘাতটা লাগার সঙ্গে-সঙ্গে আমি খানিকটা ঘাবড়ে গেছলাম। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই আমি ছিটকে পাঁচ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এবার আমি আর বদ্রি সামনা-সামনি। দুজনের চোখেই আগুন।

বদ্রি ভোজালি তুলে তেড়ে এল আমাকে আক্রমণ করতে। কিন্তু মাত্র তিন হাত।

আমার হাতের ০.৪৫ অটোমেটিকটা তখন গর্জন করে উঠেছে। আমার লক্ষ্য নিখুঁত।

কলকাতার অপরাজেয় সম্রাট বদ্রির পতন ঘটল আমার হাতে।

আমার মাকে প্রণাম করে পুলিশের গাড়িতে উঠলাম।

দীর্ঘ চার-মাস পর ছাড়া পেলাম। 'সেলফ ডিফেন্স'। দিদি-জামাইবাবুর সে-উপকার কোনওদিন ভুলব না। জে-সি থেকে বেরিয়ে দেখি বিকাশ দাঁড়িয়ে আছে দিদির সঙ্গে। বিকাশ এখন পুলিশ অফিসার। বিকাশ আমার বাল্যবন্ধু।

বিকাশ বলল, বদ্রির পতন ঘটিয়ে তুই কলকাতাকে ত্রাসমুক্ত করেছিস।

তবু তো আমাকে নাস্তানাবুদ করতে ছাড়িসনি।

তার কারণ সম্রাটের বদলে সম্রাট চাই না আমরা। তুই যেন বদ্রির বদলে নিজে...।

আমি ওর কথা শেষ পর্যন্ত শোনার জন্যে অপেক্ষা না করে দিদির সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলাম।

তার পরের ইতিহাস আমার পূর্ণবিকাশের ইতিহাস। আমি মানে হিমাদ্রি সরকার হয়ে গেলাম সেন্ট্রালের মস্তান। কিং। রংবাজ শব্দটা তখনও প্রচলিত হয়নি।

রেসের বুকিরা বাড়ি এসে টাকা দিয়ে যায়। আশপাশের উঠতিরা পয়দা করলে আমার কাছে একটা মোটা অংশ পৌঁছয়।

আর, আশ্চর্য। রাতারাতি আমি বিভিন্ন রকমের প্রোটেকশান পেতে লাগলাম। রাজনৈতিক নেতারা গাড়ি করে এসে তোষামোদ শুরু করল। আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে লাগল।

আমারও গাড়ি হল। চতুর্দিক থেকে পয়দার রাস্তা খুলে গেল।

আর, স্বাভাবিকভাবেই আমার চারদিকে জুটে গেল 'চামচা'রা। সাম্রাজ্য রাখতে গেলে তো বাহিনী দরকার। এ তো শিশুরাও জানে।

এক কথায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমার সাথী হল অতি দ্রুত। আমি হলাম কলকাতার রাজধানী সেন্ট্রালের সম্রাট।

কিন্তু সেই সাম্রাজ্য আমি একদিন ছেড়ে গেলাম। কোথায় গেলাম, কেন গেলাম, একমাত্র রঞ্জন ছাড়া আর কেউ তা জানত না।

আজ দীর্ঘ বারোবছর পর আবার দেশে ফিরলাম।

কিন্তু আজ রঞ্জন নেই। সে নিহত।

॥ ৩ ॥

মৌলালি ছেড়ে ক্রিক রো-তে ঢুকলাম। ট্যাক্সি থেকে নামলাম কমলের বাড়ির সামনে। কমল এখন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

কমল বাড়িতেই ছিল।

আমাকে প্রথমে চিনতে পারেনি ও। তারপর জড়িয়ে ধরে বলল, এতদিন কোথায় ছিলি?

চাঁদে। হাসতে-হাসতে বললাম আমি।

ঠাট্টা রাখ। সত্যিই তোকে আর কোনওদিন দেখব বলে ভাবতে পারিনি। কমলের অনুযোগ।

পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে গেছে, কমল। ঘুরে-ফিরে সেই একই লোকের সঙ্গে দেখা হয়।

কমল হাসল ঃ হ্যাঁ। আমাদের মনের মতোই পৃথিবীটাও ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু তুই তো বিরাট চেহারা করেছিস। ব্যায়াম করিস নাকি? আর তোর চেহারা এত রুক্ষ হল কী করে?

হেসে বললাম, রোদে—জলে—ঝড়ে।

হিপিদের মতো কাঁধ পর্যন্ত চুল রেখেছিস।

যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলছি মাত্র।

তা বেশ। তোর খবর কী বল?

আমারই খবরের দরকার, এখন এখানকার সম্রাট কে?

কী হবে জেনে? কমলের কণ্ঠস্বর কঠিন।

না, মানে আমি চলে যাওয়ার পর...।

তুই চলে গেলি কেন?

যেতে হল কমল।—আমি যেন উদাস হয়ে গেলাম।

কিন্তু কেন? তোর তো কোনও অভাব ছিল না। একটি নির্দিষ্ট সাম্রাজ্য...যথেষ্ট অর্থ...সুজাতা...।

সুজাতা?—আমার অবাক হওয়ার পালা।

হ্যাঁ। জীবনে তুই কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরলি না, হিমাদ্রি। মা-বাবা তোকে ঘরে রাখতে পারল না। কলেজের শেষ দরজায় গিয়েও পরীক্ষা দিলি না। ক্রাইমের জগৎ বেছে নিলি। কিন্তু সেখানেও থাকলি না। যে তোকে ভালোবাসল, তার ভালোবাসার মূল্য দিলি না। তার চোখের সামনেই ক্রাইমের জগতে তলিয়ে গেলি। তবু...।

আমি জানি কমল। কিন্তু...।

বলতে দে, হিমাদ্রি। তবু সেই মেয়েটা সমাজ, সংসার সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তার কথাও তুই ভাবলি না। অনায়াসে সব ছেড়ে চলে গেলি।

আমার বলার কিছুই ছিল না। আমি অভিশপ্ত। আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে সেদিনকার সেই ষোলো বছরের মেয়েটার জীবন জড়াতে চাইনি।

তাই, যেদিন গভীর রাতে আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাই, সেদিন সুজাতাকে ওরই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলাম ঃ তুই আমায় ভুলে যা, সুজাতা। আমাদের মিলন বিধাতার অভিপ্রেত নয়।

সুজাতা কাঁদেনি। রাগেনি। শুধু প্রশ্ন করেছিল, তুমি হঠাৎ ভগবানে এত বিশ্বাসী হয়ে পড়লে কী করে?

ভগবানে আমি চিরকালই বিশ্বাসী। মুখে স্বীকার করতাম না।—একটু থেমে আবার বলেছিলাম, তোর বয়স এখন কম। কিছুদিন পর ভালো ঘরে তোর বিয়ে হয়ে যাবে। তখন ভুলে যাবি।

আমি সুজাতাকে বলেছিলাম আমাকে ভুলে যেতে। কিন্তু আজ এতকাল পর আমার মনে হচ্ছে, সত্যিই কি আমি চেয়েছিলাম যে, সুজাতা আমাকে ভুলে যাক? তাহলে ওভাবে কথাটা বলেছিলাম কেন?

সুজাতা অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিল, তুমি যাচ্ছ যাও, কিন্তু এখানে তোমাকে ফিরতেই হবে। এই তোমার দেশ, তোমার ঘর। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

অপেক্ষা করবি! পাগল নাকি। আমি যদি না ফিরি আর?

এবার সুজাতা হাসল। মলিন হাসি। মুখ ফিরিয়ে অনেক দূরের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এসব বুঝবে না।

আমি উত্তর দিলাম না।

সুজাতা বলল, যেদিন তুমি বাড়ি ছেড়েছিলে, সেদিন তুমি নিশ্চিতরূপে নিজের জীবনের গতিপথ বদল করেছিলে। তারপর তিলেতিলে নিজের সর্বনাশ করছিলে। যেদিন বদ্রিকে তুমি মারলে, সেদিন তোমার উত্থান এবং পতন দুই-ই হল। একটা হিংস্র জীব হয়ে তুমি জন্মালে, আর মানুষ হিমাদ্রি সরকার হারিয়ে গেল।

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, সুজাতা, আমি তোর সর্বনাশ করতে চাই না। তুই আর-পাঁচটা মেয়ের মতো হলে আলাদা কথা ছিল। আমার অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা কর।

সুজাতা দেবদাসীর মতো মলিন হেসে বলল, ক্ষমা! ক্ষমা করারও অধিকার থাকা চাই। আমার তাও নেই। তোমরা ছেলেরা কত সহজে সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলতে পারো, 'আমায় ক্ষমা

করো', আমরা পারি না। আমি অন্তত বলতে পারব না। আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করব।

আমি যেন হঠাৎ একটু ব্যঙ্গ করার জন্যেই বললাম, সব মেয়েরাই অমন বলে, সুজাতা। কিন্তু আবার যখন বিয়ে হয়, তখন সব ভুলে যায়। তোরও বিয়ে হবে, তুইও ভুলে যাবি। এই নে, এটা তোর বিয়েতে আমার উপহার।

সুজাতা চমকে মুখ তুলল, একী! এটা যে তোমার মায়ের গলার হার!

বললাম, মাকে ওটা দিয়েছিলেন আমার ঠাকুরমা। মা ওটা তোকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ওটা ছাড়া তো তোকে দেওয়ার মতো আর কিছু নেই। মায়ের আর সব গয়না আমি দিদিকে দিয়ে দিয়েছি।

তারপর আর কথা না বাড়িয়ে উলটোদিকের ফুটপাতের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়েই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলাম। আমি কলকাতা ছাড়লাম।

॥ ৪ ॥

আজ এতকাল পর আবার সুজাতার কথা উঠল।

বললাম, কোথায় বিয়ে হয়েছে সুজাতার? বাপের একমাত্র মেয়ে ছিল। নিশ্চয় খুব ভালোভাবেই বিয়ে হয়েছে?

কমল একটু চুপ করে থেকে বলল, সুজাতা বাড়িতেই থাকে। চল, দেখে আসবি।

আমি কিছু বলার আগেই কমল উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে নামতে লাগল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। সেই পরিচিত সিঁড়ি। সেই দেওয়াল। অনেক কথা। অনেক গুঞ্জন। সুর। অভিমান।

সেই সব স্মৃতি আজ জড়িয়ে যাচ্ছে।

কমলই বেল টিপল। দরজা খুলে উঁকি মারল ঝি। আমি কিছু বলার আগেই কমল বলল, তোর দিদিমণিকে বলগে যা, আমাদের পাড়ার সেই পুরোনো হিমুদা এসেছে।

আমরা বসার ঘরে বসলাম। আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা ধক-ধক শব্দ হচ্ছিল। মনে হল, কমল বুঝি শুনতে পাবে সেই শব্দ। একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার শরীরের কোনও এক স্থানে জন্ম নিয়ে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরটা অবশ করে দিচ্ছে।

আমি, দুর্দান্ত হিমাদ্রি সরকার সুজাতার মতো এক সাধারণ মেয়ের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছি। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত।

হঠাৎ কমল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চট করে একটা পান নিয়ে আসছি।

আমার একা বসে থাকতে আরও অস্বস্তি লাগছিল। এই ঘরে কতদিন সুজাতার সঙ্গে বসে-বসে গল্প করেছি। হারিয়ে যাওয়া সেই স্মৃতিগুলো ভিড় করে এল।

আমার পুনরাবির্ভাবের খবর শুনে সুজাতা নিশ্চয় চমকে উঠেছে।

সুজাতার মুখের চেহারাটা কেমন হয়েছে? চোখ দুটো কি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, না ঘৃণায় ওর নাক কুঞ্চিত হল?

ছায়া পড়ল চৌকাঠের বাইরে। আমি অনেকক্ষণ সেই ছায়ার দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

চোখ তুললেই...বারো বছর, দীর্ঘ বারো বছর পর সুজাতার সঙ্গে চোখাচোখি হবে।

আর হঠাৎ সেই মুহূর্তে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল।

আমি জোর করে চোখ তুলে তাকালাম।

সেই বিশাল নীল চোখ। সমুদ্রের মতো গভীর অথচ স্থির। পলক পড়ছে না। আমার দিকে

তাকিয়ে আছে সুজাতা। যেন একটা মূর্তি।

আর শরীর। অদ্ভুত। একটু লম্বা হয়েছে। শরীরের ঠিক-ঠিক জায়গায় মাংস লেগেছে। মেদহীন পেলব মসৃণ দেহ।

সেদিনকার সেই সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরা ষোলো বছরের মেয়ে যে আজ এত সুন্দরী হয়েছে, তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না।

জীবনে কত মেয়ে তো দেখলাম। কত শরীর। কত মুখ। কিন্তু এই মুহূর্তে আটাশ বছরের এই শরীরটার দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেলাম।

আমার মনে হল, আমি কোথাও, কোনওদিন কোনও মেয়ে দেখিনি। আমি কোনওদিন কোনও শরীর ছুঁইনি। সুজাতা সত্যি সুন্দরী।

মধ্যের এই বারোটা বছর এই দুনিয়া আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই সুজাতার সঙ্গে সেই পুরোনো যোগসূত্রটা খুঁজে পাচ্ছি না।

আমি আচমকা বলে উঠলাম, কীবে, কেমন আছিস—মানে কেমন আছ সুজাতা? তোমাদের দেখতে এলাম...মানে আসতে হল। এই কলকাতা...।

তোমার ঘর।—সুজাতার সংযোজন।

ঘর!...ও, হ্যাঁ। আমার কলকাতা। মাই সিটি। আমার শহর—।

আমি বলেছিলাম তোমাকে ফিরতে হবে। সুজাতা একটুও নড়েনি, নড়ছে শুধু ওর ঠোঁটজোড়া।

হ্যাঁ, তুই....তুমি বলেছিলে বটে যে আমাকে আবার একদিন ফিরতে হবে। আর বলেছিলে. .।

আমি অপেক্ষা করব। আমি অপেক্ষা করেছি।

আমি আবার চোখ তুলে তাকালাম। আমার সব যেন উপন্যাসের মতো মনে হচ্ছে।

এবার সুজাতা খুব ধীর পদক্ষেপে ঘরের ভিতরে এল। গুছিয়ে বসল সামনের সোফাতে। নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করেই আমার সামনে এসেছে। একটা বেনারসী পরেছে। পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে শ্রাবণের মেঘের মতো তার ঘন একরাশ চুল।

আর, একী।

সুজাতার গলায় সেই নেকলেসটা। আমার মাকে আমার ঠাকুমা যে নেকলেসটা দিয়েছিলেন—যে নেকলেসটা আমি বারো বছর আগে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ওকে দিয়ে গেছলাম।

সুজাতা বলল, ওটা আমি এখনও যত্ন করে রেখেছি। তুমি ছিলে না, তোমার দেওয়া উপহার ছিল।

আশ্চর্য! তুমি এই সামান্য একটা জিনিসকে এত যত্ন করে রেখেছ। আর, সত্যি-সত্যি বিয়ে করলে না।

বিয়ে যে করব তাই বা ভাবলে কী করে?

আমার ওপর রাগ করেও তো বিয়ে করতে পারতে—যেমন আর পাঁচটা মেয়ে করে?

পারতাম—সব কিছুই পারতাম। কিন্তু করিনি।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। জীবনটাকে আমি যেভাবে বিচার করতে চেয়েছি, সেটা বোধহয় ভুল পন্থা। জীবনটা যদি অঙ্ক হয়, সব উত্তরই এক হয় না। মাঝপথে কোথায় যে যোগ গুণ ভাগ করতে গিয়ে ভুল করি, তা আমরা নিজেরাই জানি না।

বললাম, জানি আজ এসব প্রশ্ন করা বৃথা। তবু জানতে ইচ্ছা করে সুজাতা, এই দীর্ঘ বারো বছর তোমার কাটল কেমন করে?

সুজাতা জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, দ্যাখো, দলে-দলে, মেঘেরা, কেমন উড়ে যাচ্ছে। আজকের দিনটা বড় সুন্দর!

আমি সামনের দিকে ঝুঁকে বসে বললাম, প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?

ওসব আলোচনায় কোনও লাভ নেই বলেই এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম। পুরুষরা সর্বদাই জানতে চায় যে কেউ তার সম্পত্তি ভোগ-দখল করছে কি না। বাবা অনেক পাত্র দেখেছিলেন। কলেজের বন্ধুরাও মন ছুঁতে চেয়েছিল। কিন্তু কিছুই হয়নি। বাবার দেখা পাত্রদের আমি দেখিনি পর্যন্ত।

কেন?

আমার মনের দরজায় তুমি চাবি দিয়ে গেছিলে। সে মন আর কাকে দেব? মন না দিয়ে বিয়ে করাটা দেহের বেসাতি। তা আমি পারব না।

সুজাতা একটুও বদলায়নি। খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, তুমি বলতে চাইছ যে আমার জন্যেই তুমি বিয়ে করোনি?

বলতে চাইছি নয়, বলছি। সুজাতা হাসছে।

কিন্তু আমি যদি না ফিরতাম আর?

তা হয় না। আমি জানতাম তুমি ফিরবেই। আমি অপেক্ষা করেছি। কথা রেখেছি। এরপর সব কিছুই তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে।

আর একটা কথা—

আর কথা নয়। স্নান করে নাও। আমি ঝিকে রাঁধতে বলেছি।

সেকী! না, না সুজাতা। আমার এখানে থাকা চলে না।

খেতে আপত্তি কি? আমি তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ব না কিছুতেই।

But I am on the run, সুজাতা।

মানে?

মানে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যে-কোনও মুহূর্তে পুলিশ বা শত্রুপক্ষ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

স্তব্ধ হয়ে সুজাতা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখে সেই পুরোনো দিনের জ্যোতি ফুটিয়ে বলল, তাহলে তুমি পথ বদল করোনি—সবকিছুই সেই আগের মতো চলছে?

আমি উত্তর দিলাম না।

সুজাতা বলে চলল, তোমার ওই বিরাট চেহারার ভেতর যেটুকু কমনীয়তা ছিল, আজ দেখছি সেটুকুও নেই। তুমি রৌদ্রদগ্ধ পাহাড়ের মতো রুক্ষ হয়ে গেছ। এভাবে বাঁচার মানে কী?

মানে নেই। এই বেঁচে থাকাটা খুব কঠিন ব্যাপার সুজাতা। এই বেঁচে থাকার জন্যে সবকিছু করতে হয়।

তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?

কোথায় ছিলাম না, তাই জিগ্যেস করো। পাঞ্জাব, দিল্লি, বোম্বাই, কর্নাটক—পাগলা কুকুরের মতো ঘুরছি।

সেই একই ব্যাবসা করছ?

বলতে পারো।

তাহলে বাড়ি ছাড়লে কেন? এখানেও তো সাম্রাজ্য ছিল।

তোমরাই তো বলো আমি অস্থির। বোধহয় তাই জীবনে কোনও কিছুই আঁকড়ে ধরতে পারলাম না।

তুমি চলে যাওয়ার আগে তোমার ভেতর একটা অস্থিরতা দেখেছিলাম। সেটার সঙ্গে বৈরাগ্যের তুলনা করা চলে। ভেবেছিলাম তোমার ভেতর পরিবর্তন আসছে। কিন্তু এখন দেখছি তুমি পথ বদল করোনি, পন্থা বদলেছ।

পথ বদল করা সহজ নয়, সুজাতা।

কেন? তুমি তো সত্যি করে এই অন্ধকার জগতে থাকতে চাও না।

আমি না চাইলেই বা। এই সমাজ আমায় ফিরিয়ে নেবে? না। আর, তাছাড়া ক্রাইমের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়, সুজাতা। অপরাধ নিয়েই আমার কারবার।

তাহলে তুমি ফিরে এলে কেন?

ফিরতে হল সুজাতা। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু—আমার নিজের ভাইয়ের মতো একজন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

কে, রঞ্জন? সুজাতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল।

হ্যাঁ, আমার এই বারো বছরের সমস্ত ইতিহাসই রঞ্জন জানত। কিন্তু আমি এখানে এসে পৌঁছনোর আগেই রঞ্জন নিহত হল।

হ্যাঁ, কাগজে পড়লাম তাই।

আমি এখন জানতে চাই কেন ওকে হত্যা করা হল। কে ওকে হত্যা করল? রঞ্জন কেন আমায় ডেকে আনল? কী এমন কথা ছিল তার যে, সে-কথা আর কাউকে বলতে পারল না? কী এমন কথা যে, চিঠিতে পর্যন্ত লিখতে পারেনি সে? রঞ্জনের চিঠিটা আমি যত্ন করে রেখেছি।

সত্যিই অবাক লাগছে। রঞ্জন কেন যে তোমাকে ডেকে আনল, সেটা সম্ভবত রহস্যই থেকে যাবে।

আমার কাছে রহস্য থাকবে না। আমি রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করবই, এ তুমি দেখে নিয়ো।

তাহলে বলতে চাও যে, রঞ্জনকে হত্যা করার পিছনে একটা বিরাট রহস্য আছে?

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা সুজাতা, আমার এখানে এসে পৌঁছনোর কথা কোনও এক পক্ষ—এখন যেটা শত্রুপক্ষ বলেই মনে হচ্ছে—জানল কী করে?

এখানে তো তোমার কোনও শত্রু নেই।

সুজাতা, মাত্র এক ঘণ্টা আগে একজন খুনি মাত্র দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে গুলি করে মারতে চেয়েছে। বিশ্বাস করো আমায়—।

সুজাতা কিন্তু কথাটা শুনে একটুও অবাক হল না। বরং ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল, সে নিশ্চয় এখন আর বেঁচে নেই?

আমি মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে উত্তর দিলাম, উপায় ছিল না, সুজাতা। এ এক ভয়ংকর জগৎ।

কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা খুন! বাঃ চমৎকার! কী বলে তোমায় অভিনন্দন জানাব? Killer of the century?

বিশ্বাস করো সুজাতা, Purely self-defence। আমি ওকে খুন না করলে, ও আমায় খুন করত। এ জগৎ সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা নেই। বড়মাছ ছোট মাছকে খায়। প্রাণ-রক্ষার জন্যে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। সামান্য মাত্র ভুলের জন্যে প্রাণ যেতে পারে। I had to kill him.

এখন তাহলে কী করবে?

আমাকে যে-লোকটা খুন করতে এসেছিল, তার কাছে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেছে। সেই কাগজে আছে একটা ঠিকানা আর একটা নাম।

কোথাকার ঠিকানা? কার নাম?

পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলের ঠিকানা। নামটা তোমার শোনার দরকার নেই। তুমি তাকে চিনবে না।

সুজাতা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, রঞ্জন বাঁচতে চেয়েছিল। বাঁচার জন্যে কঠিন সংগ্রাম করেছিল। তুমি চলে যাওয়ার পরই তোমার মন্ত্রীর ওপর সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নতুন রাজা হল

এখানে। রঞ্জনকে তারা পাত্তা দিল না। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মতো সাহস রঞ্জনের ছিল না। ছোটখাটো যুদ্ধ হল। ওরা রঞ্জনকে পুলিশে ধরিয়ে দিল মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে। দু-বছর জেল হল রঞ্জনের। জেল থেকে বেরিয়ে রঞ্জন বদলে গেল।

এই বারো বছর রঞ্জনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। কিন্তু রঞ্জন এসব কোনও কথাই তো আমাকে বলেনি!

তুমি তো জানো, রঞ্জন নিজের বিপদের মধ্যে কোনওদিন কাউকে টেনে আনত না।

অথচ সেই রঞ্জন আমাকে ডেকে আনল নিজের বিপদের কথা জানিয়ে। তাহলে বুঝতে হবে রঞ্জনের জেল-খাটা ইত্যাদি ব্যাপারের চেয়েও এবারের ব্যাপারটা আরও গুরুতর। তারপর কী হল?

জেল-খাটা লোক কোথাও চাকরি পেল না। শেষে কেষ্টপদ ওকে ট্রেনে হকারি করার জন্যে নিয়ে গেল।

রঞ্জন হকারি করতে গেল!

রঞ্জন প্রায়ই আসত আমার এখানে। মাঝে-মাঝে আমার জন্যে নানান ধরনের উপহার নিয়ে আসত। মরবার আগের দিনও এসেছিল।

অদ্ভুত লাগছে শুনতে।

রঞ্জনের দেওয়া অনেক জিনিস দেখতে পাবে এ-বাড়িতে। তোমার মাথার ওপর দেওয়ালে ঝোলানো ওই অয়েল পেন্টিংটা রঞ্জনের দেওয়া। ওই ফুলদানি—ওই মাছ পোষার জন্যে কাচের অ্যাকুরিয়াম, একটা গয়নার বাক্স, একটা সেতার—।

সেতার? সেতার কী হবে?

তুমি চলে যাওয়ার পরই রঞ্জন ওটা এনে দিয়ে বলেছিল, বউদি তোমাকে সেতার বাজানো শিখতে হবে। আমি গত দশ বছর ধরে বাজাতে শিখেছি।

Strange ! সবকিছুই অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে, এটা আমার জগৎ নয়। কিন্তু রঞ্জন কি এ সমস্তই হকারির পয়সায় কিনত?

হ্যাঁ। বলত, এতকাল তোমাদের কিছুই দিতে পারিনি, বউদি। কিন্তু এসব আমার নিজের হকের পয়সা।

রঞ্জন আমার নিজের রক্তের ভায়ের মতো ছিল। আমি ওর খুনিকে খুঁজে বার করবই। আমি এই কলকাতার বুকের ওপর আরেকবার তাণ্ডব নৃত্য দেখাব।

কিন্তু—কিন্তু তুমি বোধহয় আর পারবে না।

কেন পারব না?

সবকিছুই পালটে গেছে এখানে। তোমার যুগ আর নেই। Socio-economic কাঠামোটা পালটানোর দরুন সমস্ত ব্যাপারটা একটা নতুন রূপ নিয়েছে। আর, তা ছাড়া তোমার বাহিনী নেই। এখন কলকাতার তথা পশ্চিমবঙ্গের সব রাজারাই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক নেতারাই তাদের প্রধান সহায়। পুলিশ শুধু অভিনয় করে এখন। তারা নেতাদের কথাতেই ওঠে-বসে।

আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম খোলা জানলা দিয়ে। তারপর বললাম, কিন্তু আমি তো হারতে শিখিনি সুজাতা। দিস সিটি ওয়াজ মাই সিটি। আমার নাম হিমাদ্রি সরকার। আমার হাতে বদ্রির মতো সম্রাটের পতন ঘটেছিল। দমদমের নিমু রায়ের অতবড় বাহিনী আমি তছনছ করে দিয়েছিলাম। মনে আছে তোমার সুজাতা, সাউথের শেখর সেনকে, আমি একদিনে তাকে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম? একটু থেমে আবার বললাম, আমি একটুও নরম হইনি। দরকার হলে কলকাতার নতুন রংবাজদের এবং কলকাতার পুলিশকে আর-একবার চরকি খাওয়াব।

সুজাতা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে। মনে হল, ওর চোখের পাতা-দুটো থিরথির করে কাঁপছে। ঘৃণা নয়, সে-চোখে প্রশংসাই দেখতে পেলাম।

সেই চোদ্দো-পনেরো বছর আগে আমি এক-একটা অভিযান থেকে ফিরে যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফলাফল পর্যালোচনা করতাম, তখনও সুজাতার চোখে ওই দৃষ্টি দেখতাম।

আমি আবার বললাম, আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, জীবনটা একটা জুয়ো খেলা। চোখ-কান খুলে সতর্ক হয়ে খেলতে হয়। আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ আমি পরাজয় স্বীকার করতে রাজি নই। জিততে আমাকে হবেই।

সুজাতা হাসি-হাসি ভাব দেখিয়ে আমাকে যেন খোঁচা দেওয়ার জন্যেই বলল, কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের তুমি ঠেকাবে কী করে? যে-মুহূর্তে তুমি এক সম্রাটকে ছোঁবে, সেই মুহূর্তে সমস্ত রাজনৈতিক হিরোরা চিৎকার করে উঠবে। পুলিশ লেলিয়ে দেবে তোমার পিছনে—যেমন দিয়েছিল রঞ্জনের পিছনে।

আমিও হাসলাম। বললাম, পুলিশের সঙ্গে সারা জীবনই আমার দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে। ওতে আমি ভয় পাই না। তোমার ওইসব রাজনৈতিক নেতাদের আমি তোয়াক্কা করি না। যারা গুণ্ডাদের দিয়ে দেশ শাসন করবার চেষ্টা করছে, তারা নিজেরাই অসহায়।

সুজাতা আমার চোখের ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করল, তুমি নিজেকে কী মনে করো? তোমার দৌড় কতদূর পর্যন্ত?

সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না, সুজাতা। আমার দৌড় বা ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণাই থাকতে পারে না—।

তুমি কী করতে পারো?

তুমি দেখতেই পাবে। আমি রঞ্জনের খুনিকে চাই। যে আমায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে ভেঙে চুরমার করে দেব। আমার ভেতর সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ দৈত্যটা এখনও মরেনি। আমার এই বারো বছরের ইতিহাস তুমি জানো না—জানলে শিউরে উঠতে। কিষেণলাল দুবের নাম শুনেছ?

শুনেছি। নামকরা লোক। আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী বলে পুলিশ তাকে ধরেছিল। শুনেছি একজন এম-পি নাকি তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দেয়। পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু আমি ছাড়িনি। সেই কিষেণলাল চলন্ত ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে।

সুজাতা শিউরে উঠল : মানে?

আমি কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট।

কথাটা শেষ করে হাসলাম। এক-একটা খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করে যেমন করে হাসতাম। কদর্য হাসি। সেই হাসি দেখে সুজাতা শিউরে উঠত। বলত, সবকিছুর একটা সীমা থাকা দরকার।

আজও সুজাতা মুখ ফিরিয়ে নিল। ওর চোখের দৃষ্টিতে একটা বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে বলল, আসলে তুমি এই সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেলে। কারণ, তোমার আরও বড় সাম্রাজ্যের দরকার ছিল। কলকাতার একটা নির্দিষ্ট এলাকার সম্রাট হয়ে তোমার মন ভরছিল না, তাই তুমি রাজধানী বদল করলে। এখন দেখছি তোমার কাজের টেকনিক পালটেছে।

তাতে সুবিধা আছে। পুলিশ আমার নাগাল পায় না।

পুলিশের হাত থেকে চিরকাল কি বাঁচা যায়? Sooner or later they will get you।

বললাম, এখনও তো ধরা পড়িনি।

সুজাতা রেগে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঘরে এসে ঢুকল ঝি।

আমাদের উঠতে হল।

বারো বছর পর আজ আবার সুজাতার বাড়ি খেতে বসলাম।

পুরোনো স্মৃতিগুলো ভিড় করে এল। অনেকদিন পর বাড়ির রান্না খেতে সত্যিই ভালো লাগছিল।

খাওয়ার টেবিলটা খাওয়ার ঘরের জানলার ধারে। সামনে বসে সুজাতা এটা-ওটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। নানান ধরনের গল্প হচ্ছিল।

আর তখনই গুলিটা আমার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পিছনের কাবার্ডে লাগল। আমি মাথা নীচু করে টেবিলটা ঠেলে দিয়ে কাত হয়ে মাটিতে পড়লাম। সুজাতাও টেবিলের ধাক্কায় ওপাশে পড়েছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে সুজাতার কাছে পৌঁছনোর আগেই আরও গোটা তিনেক গুলি কাবার্ডটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছে। আমি আমার পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে পাশের জানালায় গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন গাড়িটা তিরবেগে ক্রিক রো ছাড়িয়ে সার্কুলার রোডে গিয়ে পড়েছে।

আমি ফিরে দাঁড়িয়ে সুজাতার দিকে তাকালাম। সুজাতা মাটিতে বসে হাঁপাচ্ছে। আমি ওকে তুলে ধরে বললাম, দেখলে তো, কেন আমি মানুষ খুন করি? আমি খুন না করলে আমাকে খুন হতে হবে। I live dangerously.

ভয়ে সুজাতার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

আমি টেবিলে বসে আবার নিশ্চিন্তে খেতে শুরু করলাম।

আমাকে শেষ করার একটা সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলছে। আমায় এবার একটা কিছু করতেই হবে।

॥ ৫ ॥

পরের দিন।

মানিকতলার সেই বহু পরিচিত প্রকাণ্ড চারতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। হাতে সুটকেস।

একটা রাত কাটিয়েছি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে। আমার পুরোনো এক বন্ধুর বাড়ি। আজ নতুন আস্তানা খুঁজতে হবে।

দরজার কড়া নাড়তেই একজন যুবক এসে দরজা খুলে দাঁড়াল : কাকে চাই?

ফরসা টকটকে রং। লম্বা। শক্ত বাঁধানো শরীর। বোঝা যায় নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস আছে। বয়স কুড়ির কাছেই।

বললাম, কল্যাণবাবু আছেন?

বাড়ি নেই।

কল্যাণবাবুর স্ত্রী...মানে...।

আপনি কোথা থেকে আসছেন? আপনার নাম?

তুমিই কি ইন্দ্র?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না।

কী করে চিনবে। তোমাকে শেষ যখন দেখেছি, তোমার বয়স তখন সাত। তোমার মা-কে গিয়ে বলো, তোমার হিমু মামা এসেছে।

হিমু মামা!—মনে হল বিস্ময়ে ইন্দ্রের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

বলল, আপনিই হিমু মামা? কত সব অদ্ভুত গল্প শুনেছি আপনার বিষয়ে। আপনিই বদ্রিকে খুন করেছিলেন? আপনি একাই নিমুর দলের সঙ্গে লড়েছিলেন? শেখর সেন আপনার ভয়েই কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে ছিল? এই কলকাতার গুণ্ডাদের আপনিই শাসন করতেন? আপনি...।

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, তুমি কি পুলিশে চাকরি নিয়েছ নাকি? আমায় ভেতরে যেতে বলবে না?

এবার লজ্জিত হয়ে ইন্দ্র বলল, আসুন, আসুন। আজ দারুণ আনন্দের দিন।

আমি ভেতরে পা দিলাম।

আমার দিদি বাংলাদেশের অধিকাংশ দিদির মতোই দারুণ সেন্টিমেন্টাল, পুরোপুরি গৃহিণী, এবং তার স্নেহাস্পদ সকলের চারদিকে সর্বদাই বিপদ দেখতে পায়।

দিদি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্যে আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম।

দিদি অনুযোগ করল, এতদিনে আমাদের মনে পড়ল? তুই যে বেঁচে আছিস, সে-খবরটাও তো দিবি?

মরলে জানতে পারতে। তুমি তো জানো, পুলিশের গুলি খেয়েও আমি মরিনি। আমি আরও অনেকদিন তোমাদের জ্বালাব। তোমরা কেমন আছ?

দিদি গুছিয়ে বসে তার কাহিনি শুরু করল। কবে জামাইবাবুর নিউমোনিয়া হয়েছিল, কবে ইন্দ্রের ভয়ানক অসুখ করেছিল (সর্দি), দিদি নিজেও কোন-কোন অসুখের জন্যে কোন-কোন ডাক্তার ঠিক করে রেখেছে। দিদির দেওর এখন লন্ডনের কোন ইউনিভার্সিটিতে কী নিয়ে রিসার্চ করছে, কিছুই বাদ গেল না। সব শেষে বলল, এই বারো বছর তুই কোথায় ছিলি?

কোথায় ছিলাম না তাই জিগ্যেস করো।

তা একটাও চিঠি দিতে নেই?

চিঠি দেওয়ার উপায় থাকলে নিশ্চয় দিতাম। তুমি তো জানো, আমাকে লুকিয়ে বেড়াতে হয়।

মানে? এবার দিদি চমকে উঠল, তাহলে...তাহলে...কি তুই এখনও সেই পথেই আছিস?

উত্তরে আমি শুধু একটু হাসবার চেষ্টা করলাম।

দিদি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, সেই জন্যে তুই কথার ফাঁকে-ফাঁকে বারবার রাস্তার ওপাশে চোখে কালো চশমা পরা ওই লোকটাকে দেখছিস?

আমি আবার হাসলাম।

লোকটা কে?

লোকটা নিশ্চয় আমায় অনুসরণ করছে। অপেক্ষা করছে, আমি কখন এখান থেকে বেরোব। হয় দেখতে চায় আমার গন্তব্য স্থানগুলো, নচেৎ...।

নচেৎ?

নচেৎ ফুটপাথের ওপরই আমার মৃতদেহটা ফেলে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা ওর আছে।

দিদি শঙ্কিত হয়ে বলল, তাহলে তো পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।

আমি হেসে বললাম, তোমার মাথা খারাপ নাকি, দিদি! পুলিশের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো জানো।

কিন্তু সত্যিই যদি লোকটা তোকে...।

ওর ইচ্ছাটা যাই হোক না কেন, পুলিশে আমি খবর দিতে পারব না, কেন না, ও নিজেই তো পুলিশের লোক হতে পারে।

কিন্তু এ তুই কী খেলায় মেতেছিস, হিমু?

আমি নিজের ইচ্ছায় কাউকে খুন করি না। কেউ আমায় খুন করতে চাইলে...যাকগে সে-কথা। আমি রঞ্জন সম্পর্কে তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই। রঞ্জনকে নিশ্চয় তুমি চেনো?

চিনব না কেন। প্রায়ই তো আসত আমাদের বাড়ি।

রঞ্জনের চালচলন তোমার কেমন লাগত?

আপত্তির কিছু ছিল না। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত। ইন্দ্রকে দারুণ ভালোবাসত। ট্রেনে হকারির কাজ করত। আমাকে অনেক উপহার এনে দিয়েছে।

উপহার! আমি বিস্মিত হলাম।

হ্যাঁ। বলত, এবার ব্যাবসা করছি, দিদি। এবার তোমাদের যা কিছু উপহার দিচ্ছি, তার কোনওটাতেই পাপের স্পর্শ নেই।

বড় আশ্চর্য লাগছে। সুজাতাকে মনে আছে তোমার?

খুব ভালো করে মনে আছে। তোর বিচারের সময় কোর্টে যেত। ওখানেই আলাপ। আমার এখানে প্রায়ই আসে। খুব ভালো মেয়ে। সেবার পুজোর সময় আমাকে ছানার পোলাও রাঁধতে...।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই সুজাতা। রঞ্জন সুজাতার ওখানেও যেত। সুজাতাকেও সে অনেক উপহার দিয়েছে।

আমাকে একটা হাড়ের চিরুণি, একটা শাড়ি এনে দিয়েছিল। ইন্দ্রকে একটা ব্যায়ামের যন্ত্র এনে দিয়েছিল...ওই যে বুলওয়ার্কার না কী যেন বলে।

তাহলে বলতে চাও, রঞ্জন সম্পূর্ণ সৎ জীবন-যাপন করছিল?

দিদি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। আমি উঠে পড়লাম।

দিদি আমাকে থেকে যাওয়ার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করল। আমি বললাম, আমি এখন অনেকদিন কলকাতাতেই থাকব। কাজেই আবার নিশ্চয় আসব।

আমি পথে নেমে এলাম। কালো চশমা পরা লোকটা নেই। আমি সার্কুলার রোডে এসে বাসস্টপে দাঁড়ালাম। দেখতে পেলাম লোকটা একটা রিকশাতে বসে আছে, দূরে।

পরনে একটা ধূসর রঙের স্যুট। গলায় টাই। দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় লোকটার শরীর খুব মজবুত। প্রায় আমার মতোই লম্বা। ওজন অন্তত দুশো পাউন্ড।

আমি বাসে না উঠে সার্কুলার রোড ধরে শিয়ালদার দিকে হাঁটতে লাগলাম। খানিকক্ষণ চলার পর পিছন ফিরে দেখি, লোকটা রিকশা ছেড়ে পায়ে হেঁটে (প্রায় দুশো গজ দূরে) পিছন-পিছন আসছে।

হাঁটতে-হাঁটতে শিয়ালদা এলাম। এখানে বড় রাস্তার ওপর আমার পরিচিত খুব ভালো একটা হোটেল ছিল। হোটেলটা সত্যিই খুব সুন্দর। এখানে একটা স্যুট ভাড়া নিলাম।

চাবিটা নিয়ে ওপরে উঠছি সিঁড়ি দিয়ে, দেখি কালো চশমা পরা সেই বন্ধুটি হোটেলের 'লবি'তে ঢুকছে।

ওপরে এসে প্রথমেই স্নান করতে ঢুকলাম।

অটোমেটিকটা রাখলাম ফোয়ারার পাশে বেসিনের ওপর আয়নার তাকে।

স্নান সেরে বেরিয়ে এলাম। বন্ধু এল না। নীচে এলাম। খাবারের অর্ডার দিলাম। খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম।

রঞ্জনের চিঠি। আমার কলকাতায় আসা। মধ্যে রঞ্জনের মৃত্যু। আমাকে হত্যার চেষ্টা। কালো চশমা-পরা আগন্তুক। ঘটনাগুলো সাজালাম।

সমস্ত ঘটনা একে-একে আমার মনের পরদায় ভেসে উঠল। রঞ্জনের হত্যার সঙ্গে কি আমাকে হত্যা করতে চাওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে? ওই কালো চশমা পরা লোকটা কে? পুলিশ? তাহলে কি গতকাল বউবাজারের হোটেলে সেই আততায়ীর নিহত হওয়ার সঙ্গে পুলিশ আমার সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে? কী করে পেল? আমি তো কোনও প্রমাণ ফেলে আসিনি।

কিন্তু ওই লোকটা যদি পুলিশের লোক না হয়, তাহলে ও কে? শত্রুপক্ষের লোক? শত্রু কে? আমাকে জানতেই হবে যে, কারা আমায় খুন করতে চাইছে।

এতদিন আমি ক্রাইমের জগতে ঘুরে-ঘুরে একটা জিনিস বুঝেছি। সেটা হল এই যে, যে-কোনও অপরাধের একটা প্যাটার্ন থাকবে। সেই প্যাটার্ন দিয়ে সেই অপরাধের প্রকৃতি চেনা যায়।

কিন্তু এখনও আমি কোনও প্যাটার্ন খুঁজে পাইনি। প্যাটার্ন খুঁজে পাইনি, কারণ শত্রু এখনও কোনও ভুল করেনি। করলেও সেটা আমার কাছে ধরা পড়েনি।

কিন্তু কেন?

আমি হিমাদ্রি সরকার, এককালে মাস্টার ক্রিমিনাল বলে পরিচিত ছিলাম। আমি এখনও একটা ভালো হাইপথেসিস খাড়া করতে পারলাম না কেন?

তাহলে কি শত্রুপক্ষ খুবই মেথডিকাল? বিরাট মাথা আছে এর পেছনে? কার মাথা?

আমার প্রথম হাইপথেসিস হল যে, এর পিছনে একটা মাথা নয়, অনেক ক'টা মাথা আছে। আছে একটা অর্গানাইজেশান।

আমি বিল চুকিয়ে উঠে পড়লাম। রঞ্জন সম্পর্কে আর একটু খোঁজখবর নিতে হবে।

কমলের কাছে আমি আমার বিগত সাম্রাজ্যের অনেক সৈনিকের খবর পেয়েছিলাম।

তপন ছিল আমার সবচেয়ে বড় গুপ্তচর। সে বিভিন্ন বিষয়ে খবরাখবর এনে আমাকে দিত। তপন এখন ইন্টালি বাজারে একটা ভালো স্টেশনারি দোকান করেছে। থাকে সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে। বেশ পয়সাও হয়েছে 'বেবি ফুড' ব্ল্যাক করে।

তপনকে দোকানেই পেলাম।

প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, আমি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমিই বললাম, চিনতে পারছিস?

গুরু, তুমি?

গুরু শব্দটা প্রথম শুনলাম।

এখনও বেঁচে আছি।—ভনিতা করলাম।

তেমনি আছ? মানে সেই হিমুদা? সেই tough?

More than that. আমায় দেখে কী মনে হচ্ছে?—আমার ঠোঁটের কোণে হাসি।

শরীর তেমনই আছে। মুখটা rough হয়ে গেছে অনেক বেশি।

আমি হেসে দোকানের ভিতর ঢুকে একটা চেয়ারে বসলাম। দোকানটা দেখলাম ভালো করে। অন্তত হাজার দশেক টাকার মাল আছে দোকানে।

তপন বলল, তুমি কি থাকবে এখানে, হিমুদা?

কেন?—সাবধানে প্রশ্নটা ছুঁড়লাম।

না—তাহলে বলো ব্যাবসা তুলে দিই। আবার পুরোনো দিনের মতো—।

না, তপন। আমি একটা অন্য দরকারে এসেছি। আমার কিছু খবরের দরকার।

আমি একটু থেমে সিগারেটা জোরে-জোরে টানতে লাগলাম। তপন তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি আচমকা বললাম, রঞ্জন কী করে মরল, তপন?

তপন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি রঞ্জনের খুনের কিনারা করতে চাইছ?

হ্যাঁ। আমি রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করবই। আমি শুধু জানতে চাই যে, রঞ্জন মরল কেন? কীভাবে মরল।

রঞ্জনের মৃত্যুর কারণটা সত্যিই একটা বিরাট রহস্য।—তপন গম্ভীর হয়ে বলল।

রহস্য। না কেউ পুরোনো 'খার' মেটালো?

রঞ্জন লাইন ছেড়ে দিয়েছিল।

বললাম, কীরকম?

অনেক অবিচার হয়েছে রঞ্জনের ওপর। শেষে ওরা চক্রান্ত করে ওকে জেল খাটাল। জেল থেকে বেরিয়ে কোথাও চাকরি পেল না। জীবিকার জন্যে অনেক যুদ্ধ করেছিল রঞ্জন।

আমি একটু ভেবে বললাম, বিকাশকে তোর মনে আছে?

কোন বিকাশ? পুলিশে চাকরি করত যে বিকাশ?

বললাম, হ্যাঁ, সে কি আমাদের সাহায্য করতে পারে?

সাহায্য! সাহায্য করবে বিকাশ চৌধুরি? তোমার মনে নেই, এককালে সে আমাদের কীরকম নাস্তানাবুদ করেছে? He had ambition এবং সেই অ্যামবিশন পূরণ করার জন্যে সে কোনও কিছু করতেই দ্বিধা করেনি। সে এখন হেড কোয়ার্টার্সের বিরাট অফিসার। সে আমাদের চিরকালকার শত্রু।

কিন্তু পুলিশ হিসাবে বিকাশ perfect । সে যতবারই আমাদের কাউকে ধরে নিয়ে গেছে, তার প্রত্যেকবারই একটা কারণ ছিল। পুলিশ হিসাবে সে তার কর্তব্য করেছে মাত্র।

বিকাশ তোমাকে সাহায্য করবে না, হিমুদা। রঞ্জনের খুনিকে ধরতে হলে তোমাকে অন্য কোনও উপায় বার করতে হবে।

বেশ। রঞ্জনের একটা বন্ধু ছিল। সেই বারো-তেরো বছর আগে একটা খুনের আসামি হয়ে সে আমাদের এখানে ঠেক নিয়েছিল। তারপর সে থেকেই গেছিল আমাদের এখানে। বাড়তি কাজগুলো সেই করত।

আমার মনে আছে তাকে। সে 'কর' আদায় করত। তুমি কেষ্টপদ গড়াইয়ের কথা বলছ।

কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?

নিতাই বলতে পারবে।

নিতাইকে কোথায় পাওয়া যাবে?

ইনফর্মার নিতাই থাকে তালতলায়।

আমি উঠে পড়লাম।

তপন বলল, কিন্তু একটা কথা, হিমুদা।

বল।

কিছু মনে কোরো না। তুমি আমাদের গুরু। তুমি সমস্ত কলকাতাটা শাসন করতে একদিন। তোমাকে কিছু শেখাতে চাইছি না। কিন্তু...।

সঙ্কোচ কীসের, তপন?—আমার স্বরে ব্যঙ্গ।

পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। এখন সব পাড়াতেই একটা করে হিরো আছে। তুমি সেই পুরোনো দিনের মতো করে অপারেশন চালাতে গেলে বিপদে পড়বে।

অবস্থা যত বদলেছে, তার থেকে অনেক বেশি বদলেছি আমি।

কিন্তু হিমুদা, এখন যারা সম্রাট তাদের সকলেই রাজনীতি করে। তার মানে, পুলিশও তাদের ছুঁতে পারে না।

পুলিশ আমাকেও কোনওদিন ছুঁতে পারেনি!—আমার গলায় ব্যঙ্গ। চোখে আগুন।

কিন্তু এখন 'মিসা' নামে এক আইন আছে, যার বলে বিনা বিচারে তোমাকে বছর কয়েকের জন্যে গরাদের ওপারে বন্ধ করে রাখা চলে।

গোটা কলকাতার মানুষ নানান সমাজবিরোধী এবং নানান আইনের ভয়ে কাঁপছে। গণতন্ত্র!

আমি হেসে বললাম, একটা কাজ কর তপন। এই নে, একশোটা টাকা। আমাদের পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের কয়েকজনকে জোগাড় কর। তাদের বল, কলকাতার অন্ধকার জগতে একটা খবর প্রচার করতে। আজ রাত দশটার মধ্যেই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়া চাই।

কী খবর? তপন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল।

আমি খানিকক্ষণ তপনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, খবরটা হল, হিমাদ্রি সরকার ফিরে এসেছে।

॥ ৬ ॥

সন্ধ্যায় চা খেতে গেলাম সুজাতার ওখানে। সেন্টার টেবিলের ওপাশে বসল সুজাতা।

সুজাতা আজ আরও বেশি সেজেছে। আজ অনেক বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছে ওকে। ওকে যতই দেখছি, ততই ভালো লাগছে।

সুজাতার রূপ খুব উগ্র নয়।

শূন্য চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে গিয়ে চোখ তুলে সুজাতা তাকাল আমার দিকে। আর স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর মুখটা লাল হয়ে গেল। মাথা নীচু করে বলল, কী দেখছ অমন অসভ্যের মতো?

তোমাকে দেখছি, সুজাতা। দেখছি আর অবাক হচ্ছি। আমি হঠাৎ একদিন চলে গেলাম, আর তুমি আমার জন্যে পথ চেয়ে বসে রইলে?

আমরা মেয়ে। তোমরা কেবলই ভাঙতে চাও। আমরা গড়তে চাই। আমার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বারকয়েক টান দিয়ে বললাম, একটা কথার স্পষ্ট জবাব দেবে?

সুজাতাও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সব প্রশ্নেরই জবাব দেব। বলো কী জানতে চাও।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, তুমি—তুমি সত্যিই আমায় ভালোবাসো?

এ-প্রশ্ন করছ কেন?

It is too good to be true.

সেই চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স থেকে তোমার কথায় উঠছি-বসছি। এ-পাড়ায় এই কলকাতার লোকেরা তোমাকে ভয় করত। আমি কিন্তু কোনওদিন তোমাকে ভয় করিনি। আমি তোমার কাছে এসেছিলাম ভয়ে নয়, ভালোবেসে।

তোমাকে তো সকলেই বাধা দিয়েছিল।

সকলের কথা অমান্য করেছিলাম শুধু তোমাকে ভালোবাসি বলেই। আজও তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।

সত্যিই কি তাই?

মানে? সুজাতা ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল। ক্রুদ্ধ ভঙ্গি। চোখের কোণে ভাঁজ।

ধরো, যদিও এটা purely guess work, এমন তো হতে পারে যে, এককালে তুমি আমার সঙ্গে ঘুরেছিলে। আমার সঙ্গে তোমার ভালোবাসা ছিল বলে কেউ তোমাকে বিয়ে করতে চায়নি।

সুজাতা জানলা দিয়ে বাইরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, তাও হতে পারে। তুমি দীর্ঘ বারো বছর ছিলে না। আর আমি একটা সাধারণ মেয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম, সেটা বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। এসব তো নাটক-নভেলে ঘটে।

ধরো, আমার জন্যেই তোমার ভালো ঘরে বিয়ে হল না। তাই তুমি হয়তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে আছ।

সুজাতার মুখের চেহারার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটল না। এক ঠান্ডা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে যতখানি চিনি, এক তোমার মা ছাড়া, আর কেউ তোমাকে ততখানি চেনে না।

ওটা তো আমার প্রশ্নের উত্তর নয়!

ওটাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। কেন না, আমি তোমাকে চিনতাম বলেই জানতাম যে, একদিন তুমি ফিরবে। যদি অপেক্ষা না করি, ধৈর্য না থাকে, বিশ্বাস না করতে পারি, তবে কীসের ভালোবাসা? অবশ্য তোমাকে দোষ দেব না। তোমার ও ধরনের ধারণা হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়।

বললাম, আমার ধারণাটা কি ঠিক?

সুজাতা সামান্য একটু হাসল ঃ যেদিন সকলে তোমাকে সমাজবিরোধী বলত, গুণ্ডা বলত, সেদিনও আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। জানি, রঞ্জনের মৃত্যুর জন্যে আজ তুমি সকলকেই সন্দেহ করছ—।

ঠিক তাই, সুজাতা। আজ কাউকেই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

কিন্তু রঞ্জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

তুমি কি গুলি করে হত্যা করতে পারো না?

সুজাতা এবার জোরে হেসে উঠল ঃ প্রশ্নটা আমিই তোমাকে করতে চাই। তুমি তো জীবনে অনেক দেখেছ, অনেক শুনেছ। ক্রাইমের জগৎ তো তুমিই ভালো চেনো আমার থেকে! তুমিই বল না, যে-রঞ্জনকে আমি ভালোবাসতাম—একমাত্র যার 'বউদি' ডাকের জন্যেই আমার মনে পড়ত আমি তোমার, সেই রঞ্জনকে আমার পক্ষে খুন করা সম্ভব কি না?

মার্ডার করা যে-কোনও লোকের পক্ষে সম্ভব। তা সে নারীই হোক বা পুরুষই হোক, সে ক্রিমিনাল হোক বা না-ই হোক। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমি সুজাতাকে সেসব কথা বলতে পারলাম না।

আমি আর-একটা সিগারেট ধরালাম। অনেক স্মৃতি ভিড় করে এল। অনেক ঘটনা, অনেক কথা মনে পড়ল আমার।

আমার জন্যে সুজাতা অনেক টিটকারি সহ্য করেছে, সহ্য করেছে অনেক অত্যাচার। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে একচুল নড়েনি। সুজাতা হারেনি। যদি কেউ হেরে থাকে, সে আমি।

আমি জীবনটাকে ঠিক গুছিয়ে চলতে পারলাম না। কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলাম না। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালাম ছন্নছাড়া হয়ে। আমার যে-ব্যাবসা, তাতে একদিন হয়তো বিদেশে কোথাও গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকব। কেউ জানতেও পারবে না যে, হিমাদ্রি সরকার নেই।

আমি দেওয়াল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সুজাতার দিকে তাকালাম। বললাম, তুমি আমার মতো এক ছন্নছাড়া মানুষকে বিয়ে করে কি সুখী হবে, সুজাতা?

তোমাকে বিয়ে না করেই বা কি সুখী হলাম? আমি জানি, তুমি কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পর অনেক মেয়ে দেখেছ—দেখেছ অনেক নারীর শরীর। তবু বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে একদিনের জন্যেও ঘৃণা করতে পারিনি।

কিন্তু কেন? এত কিছু জেনেও আমায় তুমি ঘৃণা করতে পারো না কেন?

কথাটা আমি বেশ উত্তেজিত হয়েই বলে ফেললাম। সেই উত্তেজনা প্রতিফলিত হল এবার সুজাতার মধ্যেও। সে সোজা হয়ে বসল।

ওর সারা মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করা। সে-হাত দুটো একটু-একটু কাঁপতে লাগল। ওর সেই ভয়ংকর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওর বাহ্যজ্ঞান ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

সুজাতা ধীরে-ধীরে বলল, তুমি সত্যি শুনতে চাও তো শোনো। তুমি হিমাদ্রি সরকার যখন

সারা কলকাতার ওপব রাজত্ব করছিলে, যখন তোমার অঙ্গুলিহেলনে অনেক প্রাণ যেতে পারত, যখন কেয়া এবং অনিতার মতো মেয়েরা সেধে এসে তোমার সঙ্গে রাত কাটিয়ে যেত—।

আমি বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালাম ঃ কী বলছ, সুজাতা?

ভুল বলেছি? সুজাতাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

তুমি—তুমি এসব জানতে?

জানতাম। ওরা তখন সিনেমার নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তোমার সাহায্য নেওয়ার জন্যেই তোমার কাছে ছিল। তুমিই ওদের নিয়ে গেছিলে কমল রায়চৌধুরীর কাছে। তোমার সুপারিশেই ওরা নায়িকা হয়েছিল।

সুজাতা এবার থরথর করে কাঁপতে লাগল ঃ জানতাম গো—আমি সবই জানতাম।

আমি এক-পা বাড়িয়ে সুজাতাকে ধরলাম। ও আমার বুকে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ঃ সব জেনেও তোমাকে ভালোবেসেছি—জেনেও তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি, কারণ তুমি আমাকে কোনওদিন ছোঁওনি। তুমি আমাকে—আমার এই দেহটাকে অন্তত মর্যাদা দিয়েছ।

আমাকে সকলে বলে যে, আমি সেন্টিমেন্টাল নই। কথাটা বোধহয় সত্যি নয়।

সেই মুহূর্তে সুজাতাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মনে হল, আমি যদি জীবনে আর কোনও অপরাধ নাও করতাম, শুধু সুজাতাকে এইভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্যেই আমাকে গুলি করে মারা উচিত।

মা বলেছিলেন, আমি যেন সুজাতাকে কোনওদিন অসাম্মান না করি, কষ্ট না দিই। মা ওকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

মায়ের প্রথম আদেশটা রেখেছি। দ্বিতীয়টা অজান্তে লঙঘন করেছি।

আমি ওকে দু-হাতে ধরে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, আমায় ক্ষমা করো, সুজাতা। আমি অমানুষ—আমি পশু। কিন্তু এর জন্যে সম্পূর্ণ আমি দায়ী নই। আমি এক ভয়ানক যুদ্ধে নেমেছি। একদল লোক আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইছে। তুমি জানো না, এই দীর্ঘ বারো বছর আমার কীভাবে কেটেছে। আমি কী সব ভয়ংকর কাণ্ড করেছি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। আমি যদি শেষ পর্যন্ত বাঁচি, কথা দিলাম, তোমার মাথায় আমি সিঁদুর পরিয়ে দেবই।

কথাগুলো শেষ করে আমি দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু আমায় থামতে হল। আমার কানে সেই শব্দটা এল। অত্যন্ত মৃদু। শব্দটা আমি এর আগে বহুবার শুনেছি।

আমি পিছন ফিরে সুজাতার দিকে তাকালাম। ও তখনও সেন্টার টেবিলের পাশে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি সিলিং-এর দিকে তাকালাম। শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। আমি সুজাতাকে বললাম, তুমি বাথরুমে গিয়ে (শব্দটা পেলাম) মুখে-হাতে জল দাও।

শব্দটার শেষ রেশ শুনতে পেলাম। শব্দটা থেমে গেল। আমরা কথা বললেই সেই ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ণ সাঁই-সাঁই শব্দটা হচ্ছে? আমি পাখাটা বন্ধ করে দিলাম। পাখার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ঘরটা স্তব্ধ।

আমি একটা গান ধরলাম। শব্দটা শুরু হল। গান করতে-করতে শব্দটার উৎস সন্ধানে চারদিকে তাকালাম।

অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে শব্দটার উৎসে এসে পৌঁছলাম। দেওয়ালে জানলার ধারে একটা বইয়ের আলমারি। শব্দটা ওই আলমারির ভেতর থেকেই আসছে।

আলমারি খুলে পরীক্ষা করতে-করতে পেয়ে গেলাম সেটা।

একটা মোটা বাংলা অভিধান। সেটার ভেতরের পাতা কৌশলে কেটে নেওয়া। আর সেই ফাঁকা অংশে সযত্নে বসানো আছে সেটা। একটা 8"x6" কৌটো।

মিনি টেপ রেকর্ডার। অত্যাধুনিক শক্তিশালী যন্ত্র। বিদেশি। দামি।

এই টেপ রেকর্ডারটা রাখা হয়েছে এখানে আমাদের সমস্ত কথাবার্তা টেপ করার জন্যে। এটা অটোমেটিক। কথা বললে আপনি-আপনি চলে, কথা শেষ হলে এটা আপনি থেমে যায়।

কিন্তু এটা এখানে এল কী করে? কে এই বসার ঘরে বই কেটে এর ভেতর এই বস্তুটি সযত্নে রেখে গেল?

সুজাতা, না বাইরের কেউ?

আমি অনায়াসে সেটা খুঁজে বার করতে পারি। কিন্তু তাতে সময় লাগবে।

আমি কি এটা নষ্ট করে দেব? না। তাহলে শত্রু সর্তক হয়ে যাবে। শত্রুকে বোকা বানাতে হবে।

আমি এবার একটা প্যাটার্ন পাচ্ছি। দরকার নেই অনুসন্ধানের। শত্রু এটা নিয়ে যা ইচ্ছা করুক।

ঘরে সুজাতা নেই। কিন্তু আমি তাকে সম্বোধন করে বললাম, আমি জানি সুজাতা, রঞ্জনকে কারা খুন করেছে, এবং কেন খুন করেছে। তাদের ধরতে আর মাত্র দিন দুই সময় লাগবে।

আমার কথাগুলো রেকর্ড হয়ে গেল টেপে। আমি জানি না, রঞ্জন কেন খুন হয়েছে বা তাকে কে খুন করেছে।

আমি শুধু কথাগুলো বললাম এই জন্যে যে, শত্রু জানুক আমি তাদের চিনি। শত্রুকে ঘাবড়ে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

আমি অভিধানটা আবার যথাস্থানে রেখে আলমারি বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ধরে নেমে এলাম রাস্তায়। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম।

কে রেখেছে ওটা? সুজাতা? সুজাতা কি তাহলে...।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি কী যেন একটা ভুল করলাম।

ভুল? না, ঠিক ভুল নয়। তবে?

আমার বুদ্ধির দরজায় একটা ধাক্কা লাগল। আমি কী যেন একটা দেখেও দেখিনি। আমি নীচু হয়ে জুতোর ফিতেটা ভালো করে বাঁধবার ভান করে চারদিকে তাকালাম।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে। ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসে আছে সেই কালো চশমা পরা লোকটি।

কিন্তু আমি বেশ মনে করতে পারছি যে, লোকটা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল সামনের একটা ওযুধের দোকান থেকে। সেই ছুটে বেরিয়ে আসাটাই আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

আমি দ্রুত ওযুধের দোকানে ঢুকে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, একটা অ্যানাসিন দিন তো।

ভদ্রলোক অ্যানাসিনটা দিতেই একটা এক টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বললাম, অ্যানাসিন আর ফোনচার্জ দুটোই কেটে নেবেন।

ফোন চার্জ। আপনি ফোন করেছেন নাকি?

না, আমি নই। আমার বন্ধু ফোনটা ব্যবহার করেছিলেন। ওই যে কালো চশমা পরা ভদ্রলোকটি, এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন।

উনি? উনি তো প্রায় তিন-চারটে ফোন করেছেন। সব চার্জ উনি মিটিয়ে দিয়েছেন।

ও—I am sorry।

রাস্তায় নেমে এলাম আবার। আমার ধারণাই ঠিক। ওরা আমায় নিখুঁতভাবে অনুসরণ করছে। প্রত্যেকটি রিপোর্ট ফোন মারফত যথাস্থানে পৌঁছে দিচ্ছে।

কিন্তু কালো চশমা পরা ওই লোকটা কে? কাকে খবর পাঠাচ্ছে?

ওরা কি পুলিশ? ওরা কি সন্দেহ করছে যে, সেই আততায়ীর মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী? পুলিশ কী করে জানল? কেউ কি পুলিশকে খবর দিয়েছে?

কিন্তু সুজাতার ঘরে ওই টেপ-রেকর্ডার এল কী করে? আমি কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারি না।

আমি একটা ট্যাক্সি ধরলাম। সোজা চলে এলাম পার্ক স্ট্রিটের সেই হোটেলে।

॥ ৭ ॥

পার্কস্ট্রিটের এই হোটেলের বর্ণনা দিয়ে সময় নষ্ট করতে পারি না।

সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলে যে, এ-হোটেলে সকলে আসতে পারে না। খুব উঁচুদরের হোটেল। আদবকায়দা সবই সাহেবি।

বলাই বাহুল্য, আমার পরনে ছিল একটা দামি স্যুট। আমার মাথায় লম্বা, ঘাড় পর্যন্ত চুল। হাতে দামি ঘড়ি। একটা হীরের আংটি। আমাকে এখানে বেমানান লাগছিল শুধু একটি কারণে। দৈর্ঘে-প্রস্থে আমি আর সমস্ত খদ্দেরের চেয়েই বেশি।

ভেতরে পা দিতেই 'অ্যাটেন্ডান্ট' স্যালুট করে দাঁড়াল। আমি কোণের দিকে একটা টেবিল দেখিয়ে বললাম, ওই টেবিলটা চাই।

সে আমাকে টেবিলে বসিয়ে একটা মেনু ধরিয়ে দিল।

সামনে বার। প্রকাণ্ড কক্ষের চারদিকে টেবিল। বেয়ারারা ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে।

আমার হাতঘড়িতে সবে রাত আটটা। অর্থাৎ তখনও ভালো করে প্রাণ আসেনি এখানে।

একটা বিয়ারের অর্ডার দিলাম। বিয়ার এল। সেটা পান করার পর হুইস্কি। আবার বিয়ার। এখান থেকে দরজাটা বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। বিয়ারে চুমুক দিয়ে দরজার দিকে তাকালাম।

এক-এক করে নিশাচরেরা ঢুকছে। প্রত্যেকেই বেশ ধনী।

কোথায় যেন মিষ্টি একটা বাজনা বাজছে! আমার টেবিলের ওপাশে বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একজন সুন্দরী যুবতী। প্রথম থেকেই সে আমার আপাদমস্তক লেহন করছিল তার সুন্দর চোখজোড়া দিয়ে।

হঠাৎ সে এগিয়ে এসে হাসতে-হাসতে বলল, হ্যালো, বিগ ম্যান।

হ্যালো, ডল।

বসতে পারি?

নিশ্চয়ই।—চেয়ারটা এগিয়ে দিলাম।

মেয়েটি বসল। আমি তার জন্যেও একটা বিয়ার অর্ডার দিলাম। মেয়েটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল। বিয়ার এল।

মেয়েটি বলল, আমার নাম লিলি। কিন্তু আপনাকে তো কোনওদিন দেখিনি এ-হোটেলে। শহরে নতুন নাকি?

বললাম, হ্যাঁ। আর্মিতে ছিলাম। চাকরি ছেড়ে এসেছি এখানে থাকতে। তুমি এ-হোটেলে কতদিন ধরে আছ?

আমি সব হোটেলেই থাকি। তবে এ-হোটেলটাই আমার বেশি পছন্দ। আমার অধিকাংশ খদ্দের এই হোটেলেই আসে।

এই হোটেলের ওপরের ঘরগুলো খুব ভালো শুনেছি।

হ্যাঁ। এয়ারকন্ডিশনড ঘর।

আমার একজন বন্ধু এখানে থাকে। বলতে পারো, কোন ঘরে সে থাকে?

সেটা তো রিসেপশানে গেলেই জানা যাবে।

না, আমি রিসেপশানে যেতে চাই না। কারণ আছে।

আমি পকেট থেকে নিহত আততায়ীর কাছ থেকে পাওয়া কাগজটা তার সামনে মেলে ধরলাম।

মেয়েটি নামটা পড়ল, তারপর বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল, উনি তো প্রায় সকলেরই পরিচিত। গত দু-তিন দিন ধরে উনি হোটেলে ফিরছেন না। অন্য কোথাও গেছেন বোধহয়।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, দরজার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলাম। দরজা দিয়ে একটি সুন্দরী মহিলার সঙ্গে যিনি ঢুকলেন তিনি আর কেউ নন, আমাদের সেই পুরাতন অবিনাশদা।

অবিনাশ ভট্টাচার্য। এখন একজন বেশ বড় মিনিস্টার। প্রচণ্ড ধনী। বসিরহাটের দিকে বিরাট সম্পত্তি।

আমার রাজত্বকালে আমার কাছে আসতেন তিনি। আমাকে খুব ভালোবাসতেন, কেন না, তার অধিকাংশ ভোট আসত আমার দৌলতে।

আমাকে দেখতে পেয়ে উনি এগিয়ে এলেন : কে? হিমাদ্রি না?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চিনেছেন দেখছি। ভাবলাম কী জানি, মিনিস্টার হওয়ার পর হয়তো চিনতে পারবেন না।

অবিনাশদা হাসলেন, তোমাকে কি ভুলতে পারি, হিমাদ্রি? তা এতকাল কোথায় ছিলে?

কলকাতায় ছিলাম না।—আমার দৃষ্টি কিন্তু বরাবর অবিনাশদার সঙ্গে আসা সেই মেয়েটির দিকে। মহিলাটি অত্যন্ত সুন্দরী।

অবিনাশদা সেটা লক্ষ করে পরিচয় করিয়ে দিলেন, হিমু, ইনি মিস মলয়া দে। দু-চারটে ছবি করেছেন। বেশ নাম হয়েছে। আর মলয়া, একে দেখে রাখো। এর নাম হিমাদ্রি...হিমাদ্রি সরকার। এককালে কলকাতায় এর রাজত্ব ছিল। কলকাতায় এমন কোনও বদমায়েশ, এমন কোনও গুণ্ডা ছিল না যে ওকে ভয় করত না।

মলয়া দে হাত তুলে নমস্কার করলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বাঙালিদের এ ধরনের চেহারা বড় একটা চোখে পড়ে না।—আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনার চেহারা অনেকটা western ছবির নায়কের মতো। আপনি অনায়াসে হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে পারেন।

আমি হেসে বললাম, ধন্যবাদ। আমাকে যে হিন্দি ছবির ভিলেন বলেননি, সেজন্যে ধন্যবাদ।

মলয়াও হাসলেন : আমি ঠাট্টা করছি মনে করেছেন? মোটেই না। আমি সিরিয়াস।

অবিনাশদা যোগ দিলেন, বুঝলে হিমু, মলয়া আবার সব কিছুতেই সিনেমা জগতের তুলনা দিতে ভালোবাসে।

আমি মলয়াকে উদ্দেশ করে বললাম, আপনার ছবি দেখার বাসনা রইল। অবিনাশদার সামনেই বলছি, আপনার যা রূপ, আর কথা বলার মধ্যে যে স্মার্টনেস, তাতে মনে হয় আপনি অনায়াসে ভারতের এক নম্বর নায়িকা হতে পারবেন।

এক মুহূর্তের জন্যে মলয়ার গাল দুটো লাল হয়ে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। ওর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। ও-দৃষ্টি আমি অনেকবার অনেক মেয়ের চোখে দেখেছি। ওর অপর নাম আত্মতৃপ্তি।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে তো?

টু টেল য়ু ফ্র্যাঙ্কলি,—মলয়া বললেন, ওই কথাটা আমিও আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম।

অবিনাশদা কয়েক পা দূরে গিয়ে বললেন, আবার পরে কথা হবে, হিমু। একদিন বাড়িতে এসো। চলো মলয়া, ওঁরা এসে পড়েছেন।

অবিনাশদা নিজে এগিয়ে গেলেন। মলয়া বলল, আপনি চলুন, অবিনাশদা, আমি আসছি। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনি আছেন তো? পালাবেন না। ওদিকের একটা 'বিজনেস' মিটিং সেরে আসছি। অবিনাশদার এক বন্ধু একটা ছবি করছেন। কনট্রাক্টটা আমায় পাইয়ে দিচ্ছেন। প্রোডিউসার এখানেই আসবেন।

মলয়া কথা শেষ করে দ্রুতপায়ে এগিয়ে অবিনাশদার সঙ্গে যোগ দিলেন। লিলি এতক্ষণ এসব দেখছিল। এবার বলল, আপনাদের এই মিনিস্টারটি সর্বদাই মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। এতে বদনাম হয় না?

বললাম, ও-বদনাম অবিনাশদার চিরকালের। তবে লোক বড় ভালো। লোকের উপকার করে খুব।

কিন্তু আপনি নিজের পরিচয় গোপন করলেন কেন আমার কাছে? আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখন আপনার নাম শুনেছিলাম। আজ আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনার বিষয়ে যা কিছু শুনেছি তার কোনওটাই মিথ্যা নয়।

আমি তো এখন আর এখানে থাকি না। কলকাতার খবর রাখি না। আমার জীবন...।

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। দরজা দিয়ে যে ভেতরে ঢুকল, তার দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম। আমি মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেকে যথাসাধ্য তার দৃষ্টির আড়াল করতে চাইলাম।

আমার ভাগ্য মন্দ। ঠিক সেই সময়েই লিলি চলে গেল লেডিস রুমে।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছে কেয়া। সঙ্গে একজন লম্বা-চওড়া লোক।

কেয়া অবিনাশদাকে দেখতে পেয়ে সেইদিকেই এগিয়ে গেল। অবিনাশদা কেয়াকে অভ্যর্থনা করলেন। ওদের মধ্যে কী সব কথা হতে লাগল।

একসময় হঠাৎ অবিনাশদা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসতে-হাসতে কী যেন বললেন।

কেয়া চকিতে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে রইল। তারপর দ্রুতপায়ে আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল।

আমি আর কেয়া মুখোমুখি। কেয়ার দৃষ্টি বরফের মতো ঠান্ডা। মুখটা অসম্ভব গম্ভীর হলেও আমি বুঝতে পারছিলাম, ও ভেতরে-ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

কেয়া। সেই কেয়া। কমল রায়চৌধুরীর কাছে বাঁধা ছিল। কিন্তু তার আগে বাঁধা ছিল আমার কাছে।

কেয়া তখন সবে কলেজের একটা দরজা পার হয়েছে। তখন তার বয়স কম ছিল। সে ছিল কুমারী।

বললাম, বসো।

কেয়া বসল। কোনও ভণিতা না করেই বলল, তুমি আবার ফিরে এলে কেন?

তোমার অসুবিধে হচ্ছে?—আমি এর মধ্যে বারকয়েক হুইস্কি ঢেলেছি গলায়। সামনে আমার সপ্তম পেগটা ছিল। সেটা তুলে নিলাম।

কেয়া বলল, আমার কথার জবাব দাও।

বললাম, মানে?

You heard me.—কেয়ার কণ্ঠস্বর কঠিন।

আমি নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিলাম, এটা আমার শহর, আমার ঘর...।

ঘর?—কেয়া গর্জন করে উঠল, তোমার ঘর? তোমার আবার কোনওকালে ঘর ছিল নাকি? তুমি তো ঘর ভাঙতেই ওস্তাদ।

তোমার ঘর ভেঙেছি নাকি?

মনে নেই?

বাজে কথা বোলো না, কেয়া। একটা মেয়ের সঙ্গে দিনকয়েক একত্রে বাস করলেই ঘর করা হয় না।

তাহলে আমায় তালতলার সেই ফ্ল্যাটে রেখেছিলে কেন?

তুমি যেতে চেয়েছিলে বলে।

আমায় বিয়ে করলে না কেন?—কেয়া গরম হচ্ছে।

বিয়ে? তোমায় বিয়ে? You got to be kidding. আর তা ছাড়া তুমি কি আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলে নাকি? তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে নায়িকা হওয়ার জন্যে। আমি তোমায় সাহায্য করেছি। বিয়ে করার কথা তুমি ভাবওনি।

তুমি কী করে জানলে?

কেয়া, আমার নাম হিমাদ্রি। আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরো না। তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক ছিল ঠিকই, কিন্তু সেজন্যে তোমাকে একটা ফ্ল্যাটে রাখিনি।

তবে কী জন্যে রেখেছিলে?

To give you a good start. তুমি নায়িকা হতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে ফিল্ম জগতের পাঁচটা লোক আসা-যাওয়া করবে সেজন্যে তোমার ভালো একটা বাসস্থানের দরকার ছিল। আর বিয়ের কথা বলছ? যদি আমাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলে, তাহলে আমার অনুপস্থিতিতে কমলবাবু তোমার ওখানে রাত কাটাত কেন?

কথাটা শেষ করে গ্লাসটা আবার তুলে নিলাম। বললাম, আমি সব জানতাম, কেয়া, কিন্তু কিছু বলিনি। কারণ, it did not matter to me.

কেয়া আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।

আমি বললাম, একটা কথার জবাব দাও, রঞ্জনকে কে খুন করেছে?

কেয়া টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ন গলায় বলল, তাই বলো, তুমি তাহলে সেইজন্যেই এসেছ?

মনে করো, রঞ্জন এমন একজনকে চিনত—যার বর্তমান সামাজিক অবস্থা খুবই ভালো। টাকা-পয়সা-প্রতিপত্তি সবই আছে, অথচ অতীতে সে ছিল সামান্য একটি মেয়ে। নোংরা। গুণ্ডার রক্ষিতা—।

Stop.

হয়তো রঞ্জন তাকে ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে প্রাণ হারাল।

Stop ! Stop ! তোমার একটুও পরিবর্তন হয়নি।

তোমার হয়েছে। থাকতে ক্রিক লেনের একটা বস্তিতে। কলেজে পড়তে। দু-বেলা পেট পুরে খেতে পেতে না। এখন তোমার কত দর, কেয়া?

কেয়া উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল ঃ তোমাকে—তোমাকে গুলি করে মারা উচিত।

ইতিমধ্যে সে চেষ্টা একবার হয়ে গেছে। তার ফল ভালো হয়নি। আচ্ছা কেয়া, বলো তো, আমার এই কলকাতা ফেরাটাকে কেউ পছন্দ করছে না কেন?

তার কারণ, তুমি একটা হিংস্র পশু—একটা অভিশাপ। তুমি তোমার চারদিকের আবহাওয়াটাকে দূষিত করে তোলো। আমরা যারা তোমাকে চিনতাম, কেউই তোমাকে কোনওদিন ভালোবাসিনি। আমরা তোমাকে ভয় পেতাম মাত্র। তুমি মানুষের শান্তি কেড়ে নাও। তুমি ঝড়। তুমি কিছুই গড়ো না। তুমি শুধু ভাঙতে শিখেছ। তুমি কোথায় ছিলে জানি না। তুমি সেই নরকে ফিরে যাও, হিমাদ্রি। এখানে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এখানে আর তোমার হুকুম চলবে না।

কেয়া ভয়ানক উত্তেজিত হওয়ার দরুন ওর কণ্ঠস্বর খুব উঁচু পরদায় ঘোরাফেরা করছিল। ওর তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর শুনে ওর সঙ্গে আসা সেই লম্বা-চওড়া লোকটি এবার দ্রুতপায়ে এসে দাঁড়াল।

আমি আমার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে এক নজরেই দেখে নিলাম তাকে। আমার সমান লম্বা। চওড়া কাঁধ ও বুক। হাতের কবজি বেশ চওড়া। শক্তি ধরে সন্দেহ নেই।

কেয়া লোকটাকে দেখিয়ে বলল, একে দ্যাখো, হিমাদ্রি। এর নাম পঞ্চা। সেন্ট্রালে এখন এরই হুকুম চলে। তোমার দিন চলে গেছে।

পঞ্চা কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল, কী হয়েছে, কেয়া? এই লোকটা কি তোমায় ইনসাল্ট করেছে?

আমি অতি ধীর গতিতে উঠে দাঁড়ালাম। চেয়ারটা পিছনে সরিয়ে দিলাম এক হাত। আমার ডানদিকে কেয়া। বাঁ-দিকে পঞ্চা। আমি কেয়ার দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে বললাম, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, ক্ষমা চাইছি।

কেয়ার চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পঞ্চা বিজয়ীর ভঙ্গিতে বড় টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বলল, অবিনাশদা, ওহে বীরেশ, মলয়া, তোমরা শোনো। এই বাচ্চা ছেলেটা কেয়াকে অপমান করেছে বলে ক্ষমা চাইছে।

অবিনাশদা এগিয়ে এসে বলল, পঞ্চা থাক। কেয়া হিমাদ্রির অনেক দিনের পরিচিত।

তা হোক। ওকে ক্ষমা চাইতে হবে সকলের সামনে।—আমাকে বলল, চাও, ক্ষমা চাও। শুনি তোমার ক্ষমা চাওয়ার ভাষাটা।

আমার চারদিকে বেশ ভিড় জমে গেছে। লিলি কখন একসময় লেডিস রুম থেকে এসে উৎকণ্ঠিত হয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে নিরস্ত হওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করছে।

আমি কেয়ার দিকে ফিরে বললাম, কেয়া, এককালে তুমি ভালো মেয়ে ছিলে। কিন্তু যেহেতু এখন তুমি এই পঞ্চার মতো একটা নেড়ি কুত্তার সঙ্গে মিশছ, তখন বলতেই হবে যে, তুমি এখন রাস্তার একটা কুত্তির চেয়ে বেশি কিছু নও।

পঞ্চার দিকে ফিরে বললাম, শুনলে আমার ক্ষমা চাওয়ার ভাষাটা? Now, what are you going to do about it?

চোখের কোণে দেখতে পেলাম, ম্যানেজার গুটিগুটি এগিয়ে যাচ্ছেন ফোনের দিকে।

এক ঘর লোক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। পঞ্চার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, তাকে এবং কেয়াকে কেউ এভাবে অপমান করতে পারে। পঞ্চার মুখ রাগে টসটস করছে।

আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে সবটুকু হুইস্কি শেষ করে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা মলয়ার দিকে তাকালাম।

মলয়ার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। আমাকে তারিফ জানাচ্ছে চোখের ইশারায়।

হঠাৎ পঞ্চা একটা প্রচণ্ড ঘুসি চালাল আমার মুখ লক্ষ করে।

আমি তো প্রস্তুতই ছিলাম। নিমেষে মাথা নীচু করে ছুড়লাম একটা তীব্র ঘুসি। লাগল ওর চোয়ালে।

ওর বিরাট শরীরটা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল 'বার'-এর ওপর। কয়েক মুহূর্ত পরে উঠে দাঁড়াল। ডানহাতটা পকেটে দিয়ে আবার বার করে আনল। দেখতে পেলাম সে হাতে 'ব্রাস নাকল্‌'।

আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুললাম। আর এটা ছেলেখেলা নয়। এবার পঞ্চার মুখে এক বীভৎস হাসি দেখা দিল। ওর সামনের সবক'টা দাঁত ঝকঝক করছে।

পঞ্চা এগিয়ে আসছে ধীর গতিতে। ঠিক যেন একটা শিকারি বাঘ। আমার আর পঞ্চার মধ্যে ব্যবধান মাত্র ছ'হাত। মধ্যে একটা চেয়ার কাত হয়ে পড়ে আছে।

আমি অতি দ্রুত আমার আক্রমণের ধারা ঠিক করে নিলাম।

আমি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গিয়ে উলটে-পড়া চেয়ারের ওপর বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে হাই-জাম্প

দিয়ে শূন্যে ভেসে গিয়ে পড়লাম পঞ্চার মাথার ওপর।

পঞ্চা ঘুসি চালাল। লাগল আমার ডান পায়ের উরুতে। পঞ্চা জানে না, নিজের কাঁধের সমান্তরাল কোনও লক্ষ্যবস্তুর ওপর ঘুসি মারলেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা যায়। কেন না সেটাই আমাদের অভ্যাস। কিন্তু আমার শরীরটা ছিল শূন্যে—পঞ্চার মাথার ওপর।

ওর ঘুসিটা আমার লাগল বটে, কিন্তু তাতে কোনও জোর ছিল না। আমি ওর মাথার ওপর পড়লাম। পঞ্চা ঠিক এ ধরনের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। আমরা দুজনেই মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম। সেই অবস্থাতেই আমি জুতোর ডগা দিয়ে ওর পাঁজরে মারলাম গোটাকয়েক লাথি।

পঞ্চা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বেঁকে গেল। সেই সময়টুকুই আমার উঠে দাঁড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর ডানহাতের কবজির ওপর একটা পা রেখে প্রচণ্ড চাপ দিলাম। ওর মুঠো খুলে গেল। আমি ওর হাত থেকে 'নাকল ডাস্টার' খুলে নিলাম।

সুযোগ দিলাম ওকে উঠে দাঁড়াতে। কেন না এখানে অনেক দর্শক। এদের কিছু দেখানো দরকার।

পঞ্চা উঠে দাঁড়াতেই আমি আমার অভ্যস্ত 'রুটে' আক্রমণ করলাম। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওর পাঁজরার নীচে যকৃতের ওপর একটা বাঁ-হাতের স্ট্রেট পাঞ্চ আর সঙ্গে-সঙ্গে ওর থুতনির নীচে ডানহাতের একটা 'হুক'।

পঞ্চা ছিটকে পড়ল। আবার উঠতে চেষ্টা করতেই ওর ঘাড়ের ওপর বসালাম একটা 'কাবাটি চপ'। পঞ্চা মুখ থুবড়ে পড়ল। এবার ওর ঘাড়ের কাছে কলার ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে আবার একটা পাঞ্চ করলাম ওর পেটে। পঞ্চা ছিটকে পড়ল, আর উঠল না।

আমি রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগলাম। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলল, অদ্ভুত!

অবিনাশদা এগিয়ে এসে বললেন, একি ভোজবাজি নাকি! পঞ্চার মতো একটা বিরাট দৈত্যকে তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিলে?

আমিও এবার এক কুৎসিত হাসি হেসে বললাম, Training, অবিনাশদা। One should have training to do this kind of dirty job.

কেয়ার দিকে ফিরে বললাম, I can take over this city whenever I want to, These are all small time punks ! মনে রেখো, কেয়া, আমার নাম হিমাদ্রি সরকার। I am class one ! যাও, এবার ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা করো। আমি জানি, you always fell for the big guys.

আমি জানি, এতগুলো ইংরাজি একসঙ্গে না বললেও চলত। তবু এসব ক্ষেত্রে ইংরাজি বললে ওরা বেশি প্রভাবিত হয়।

আমি চিবিয়ে-চিবিয়ে বললাম, আমি হিমাদ্রি সরকার ফিরে এসেছি। This city is mine. আমার বন্ধু রঞ্জনের খুনিকে না পাওয়া পর্যন্ত আমি এ-শহর তোলপাড় করে ছাড়ব।

আমি ফিরে দাঁড়িয়ে আর-একটা হুইস্কির অর্ডার দিলাম। হুইস্কিটা এক চুমুকে শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখতেই দরজার দিকে চোখ পড়ল। জনকয়েক S. I. এবং কনস্টেবলের সঙ্গে ভেতরে এল বিকাশ চৌধুরি। মনে পড়ল, ম্যানেজারের ফোন করার কথাটা। এবার সত্যিই আমার বিপদ।

বহু বছর পর আজ আবার আমি আর বিকাশ মুখোমুখি।

বিকাশ সোজা ম্যানেজারের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার?

ম্যানেজার আমাকে এবং পঞ্চার অচৈতন্য দেহটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, সেন্ট্রালের এই প্রাক্তন রংবাজ বনাম বর্তমান রংবাজের ডুয়েল। ফল বর্তমান রংবাজের চৈতন্য লোপ। আমার দশটা গ্লাস ভেঙে চুরমার। একটা চেয়ারের পা নেই।

বিকাশ আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। ধীরে-ধীরে ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল। চিবিয়ে

চিবিয়ে বলল, So you are back ?

বললাম, You are not blind.

পঞ্চাকে দেখিয়ে বিকাশ বলল, একে তুই মেরেছিস?

আমি বিশ্রীভাবে হেসে বললাম, self-defence.

প্রমাণ?

এই একদল সম্ভ্রান্ত নাগরিক।

ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে এলেন মিস মলয়া দে। বললেন, আমি প্রথম থেকেই সব দেখেছি। পঞ্চা আগে মিস্টার হিমাদ্রি সরকারকে আক্রমণ করেছিলেন। উনি আত্মরক্ষার জন্যে...।

বিকাশ বাধা দিয়ে বলল, যথেষ্ট। কিন্তু আমি ওকে হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাব।

এবার আমার প্রশ্ন করার পালা। বললাম, আমার অপরাধ?

দাঙ্গা। হত্যার চেষ্টা।

সাক্ষী?

এই জ্ঞানহীন দেহ।—পঞ্চাকে নির্দেশ করল বিকাশ।

কিন্তু অফিসার, ওটা তো অন্যভাবেও হতে পারে। It is only his words against mine.

বিকাশ চোখে আগুন ছিটিয়ে বলল, বেশি চালাক সাজবার চেষ্টা ভালো নয়।

আমি চালাক সাজবার চেষ্টা করছি না। শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছি, তুমি একজন পুলিশ অফিসার। আইন রক্ষা করা তোমার কাজ। আইনের বাইরে পদক্ষেপ ঘটলে আমি তোমাকে...।

বিকাশ বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, কী করবি?

তুমি আমাকে এই মুহূর্তে যা করছ বা করতে চাইছ, ঠিক তাই করব।

Boy! হিমাদ্রি! তোর একটা শিক্ষা হওয়ার দরকার। You have gone too far!

That's right, Officer, and you can not do anything about it. হয় আমাকে arrest করো সকলের সামনে, নতুবা আমায় যেতে দাও। ওসব হেডকোয়ার্টাসে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করার ভান করে জনতাকে ধোঁকা দেওয়ার পদ্ধতি পুরোনো হয়ে গেছে।

তুমি একজন পুলিশ অফিসারকে চ্যালেঞ্জ করছ!

সকলের সামনেই করছি। আমি আগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। অথচ তুমি আক্রমণকারীকে ছেড়ে আমাকেই ধরতে চাইছ। এটা আইনের বিকৃতি।

পুলিশ হিসাবে বিকাশের খ্যাতি আছে। বিকাশ জানে, কোথায় কখন কোন কৌশল খাটাতে হয়। বিকাশ কেয়ার দিকে ফিরে বলল, কেয়া দেবী, আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। আপনার কী বলবার আছে?

কেয়া আমার দিকে তাকাল। কেয়ার চোখে খানিকক্ষণ আগের সেই সাহস, সেই বিদ্রূপ আর দেখতে পেলাম না।

কেয়া চোখ নামিয়ে বলল, আমি কোনও অভিযোগ আনছি না। আমি পঞ্চার হয়েও বলতে পারি...।

বাধা পড়ল। পঞ্চা ওপাশ থেকে কাতরোক্তি করে নড়ে উঠল।

খানিক পরে দুজন কনস্টেবল ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। প্রায় আধ গ্লাস হুইস্কি এনে দেওয়া হল ওকে। এক নিশ্বাসে সেটা শেষ করে পঞ্চা তাকাল আমার দিকে। কেউটের মতো দৃষ্টি। দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, কী হয়েছে?

বিকাশ প্রশ্ন করল, পঞ্চা, হিমাদ্রি তোমাকে আক্রমণ করেছিল?

পঞ্চা মাথা নেড়ে বলল, না। আমি পড়ে গিয়ে টেবিলে আঘাত পেয়ে...।

স্টুপিড! সত্যি কথা বল।—বিকাশ গর্জে উঠল।

আমিও এগিয়ে গেলাম ঃ অফিসার, তুমি আবার জোর করে আমার নামে অভিযোগ আনছ।

পঞ্চা উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নাম হিমাদ্রি সরকার?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, অনেক দেরিতে চিনলে আমায়, পঞ্চা।

হিসাব মিটল না। একদিন না একদিন এ হিসাব আমি চুকিয়ে দেব। আমার নাম পঞ্চা। আমি পুলিশে নালিশ করি না।

আমি হেসে বললাম, আমি এখানে—মানে, এই শহরে পা দিয়েই তোমার নাম শুনেছি। এও শুনেছি যে, তোমার কাছে অন্তত নব্বই হাজার টাকার বেবিফুড আছে। রংবাজরা শিশুর খাদ্য নিয়ে কালোবাজারি করে না, পঞ্চা। তুমি শের নও—কুত্তা।

পঞ্চা কোনও উত্তর না দিয়ে কেয়ার হাত ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি পেছন থেকে ডাকলাম ঃ পঞ্চা, হিসাব চুকিয়ে এই নাক্‌ল ডাস্টারটা নিয়ে যেয়ো। কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি কেয়ার আঁচলের নীচে লুকিয়ে থাকলেই ভালো হবে। এরপর আর কোনওদিন যদি আমার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার পরিণতি হবে ভয়াবহ! যাও।

পঞ্চা বেরিয়ে গেল।

বিকাশ এতক্ষণ এসব শুনছিল। এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা তোকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই। তোকে হেডকোয়ার্টার্সে যেতে হবে।

বললাম, আমাকে নিয়ে যেতে হলে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমার মনে হয়, সেটা তুই করতে সাহস পাবি না। বিনা অপরাধে নাগরিকদের গ্রেপ্তার করার অপরাধে অনেক পুলিশ অফিসারের চাকরি গেছে।

কথা শেষ করে আমি দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। পেছনে একদল লোক হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি দরজার হাতলে হাত রেখে অরসন ওয়েলস-এর ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালাম ঃ অবিনাশদা, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রঞ্জনকে তুমি চিনতে, এককালে তোমার ভোটের জন্যে সে রক্ত দিয়েছে। সেই রঞ্জন খুন হয়েছে—খুন, মানে মার্ডার। বিকাশ আমাকে উত্যক্ত করছে। ওকে জিগ্যেস করুন, রঞ্জনের খুনিকে কেন এখনও খুঁজে বার করতে পারল না।

দরজা খুলে আমি পথে নেমে এলাম।

॥ ৮ ॥

পথ প্রায় জনশূন্য।

হোটেলের সামনে খানকয়েক ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। আমি সামনেই যে-ট্যাক্সিটা পেলাম, তার পেছনের দরজা খুলে উঠে বসলাম।

কিন্তু আমার আগেই পেছনের আসনে বসে আছে মিস মলয়া দে।

আমি সিটে বসে চমকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই উনি বললেন, সত্যি বাঘের বাচ্চা বটে আপনি।

আপনি?

হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় করার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

বললাম, আপনার সাহস আছে।

মলয়া, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে উদ্দেশ করে বললেন, রাসবিহারী অ্যাভিনু্য।

গাড়ি গতি নেওয়ার পর উনি আবার বললেন, আপনি এসব শিখলেন কোথায়?

কীসব?

ওই সব...ওই মারপিট?

জীবনের পাঠশালায়। তা ছাড়া আমি আর্মিতে যোগ দিয়ে যুদ্ধেও গেছিলাম।

তাই আপনার এত সাহস।

আমরা যারা সত্যিকারের সৈনিকের ট্রেনিং নিয়েছি, যাই করি না কেন, আমাদের মরাল অনেক হাই। কিন্তু আজকে সাহসের কী দেখলেন?

ওরে বাবা, পঞ্চাকে কে না ভয় পায়! ওর মতো নিষ্ঠুর লোক খুব কমই আছে। মধ্য কলকাতাটা ও নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে। অবশ্য...।

অবশ্য?

অবশ্য বিদ্যুৎ রায় ওকে বাধা দিচ্ছে। বিদ্যুৎ রায়কে চেনেন? প্রচণ্ড এক ধনীর একমাত্র ছেলে। কিন্তু underworld-এর বড়-বড় হিরোরা ওকে ভয় করে। প্রচণ্ড সাহস আছে।

মনে পড়ে গেল আমার প্রথম যৌবনের কথা। অনেক দুঃসাহসী ঘটনা। অনেক কাহিনি আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। শুধু মাঝে-মাঝে সেগুলো বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উঁকি মারে।

আমি উদাস হয়ে বললাম, এ-লাইনে সাহস না থাকলে হয় না।

তাই বলছি, সেটা আপনার আছে। আপনার শিক্ষা নিখুঁত।

শিক্ষা এবং চর্চা— অর্থাৎ practice—দুটোই চাই। কিন্তু এ-লাইনে যেটা সব চেয়ে বেশি দরকার, সেটা সকলের থাকে না।

সেটা কী?

প্রতিভা। যার প্রতিভা আছে, তার সাহস, শিক্ষা এবং বুদ্ধি, এ তিনটেই আছে। প্রতিভা না থাকলে বেশিদিন এই ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় না। পঞ্চার মতো ক্রিমিনালদের শুধু সাহস আছে। প্রতিভা নেই। সাহস আর প্রতিভা এক জিনিস নয়।

আশ্চর্য! আপনি এত সুন্দর ব্যাখ্যা কোথায় পেলেন?

বললাম তো, জীবনের পাঠশালায়। আমার বন্ধু রঞ্জনের সাহস ছিল, শিক্ষা ছিল। কিন্তু প্রতিভা ছিল না। আমি দীর্ঘ বারো বছর পর ফিরে এসে দেখছি, প্রতি পাড়ায় একটা করে রাজা। কলকাতাকে এরা ভাগ করে নিয়েছে। প্রকৃত প্রতিভার অভাবেই আজ এত রাজা মাথা তুলে উঠেছে।

সত্যি আপনি গ্রেট। এ-জগৎ সম্বন্ধে আপনার গভীর জ্ঞান আছে।

এই জগতের জন্যেই আমি ঘর ছেড়েছি। এই জগৎ আমাকে আমার সমস্ত প্রিয়জনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, মলয়া দেবী।

হঠাৎ মিস মলয়া আমার হাতের ওপর হাত রেখে বললেন, দেবী নয়, শুধু মলয়া। আপনি নয়, তুমি। ওতে বন্ধুত্বের সুবিধা হয়।

আমিও ওর হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, বেশ, তাই হবে।

কেয়াকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন?

অনেকদিন ধরে। আগে আমাদের পাড়াতেই থাকত। আমিই ওকে প্রথম কমলবাবুর কাছে নিয়ে যাই। আমার অনুরোধ ফেলতে না পেরে শেষে কমলবাবু ওকে নায়িকা করেন।

আর বিনিময়ে কেয়া কী দিয়েছিল আপনাকে?

আমি মলয়ার চোখের দিকে তাকালাম। ওর চোখ দুটো চকচক করছে। ঠোঁটের কোণায় হাসি। মলয়ার উরুর ওপর আমার ডান হাতটা রেখে বললাম, কেয়ার মতো একটা তাজা জিনিস কী দিতে পারে বলে তোমার মনে হয়? তুমি কী চাও, তাই বলো।

আমি আর কী চাইব? আমি...।

একটা ঝাঁকানি দিয়ে ট্যাক্সিটা থেমে গেল। রাসবিহারীর মোড় এসে গেছে। মলয়া আবার নির্দেশ দিল। গাড়িটা ওর তিনতলা বাড়ির সামনে থামল।

তিনতলায় এলাম। ওর বসার ঘরে একটা সোফায় বসলাম। মলয়া হাসতে-হাসতে ভেতরে গেল কাপড় বদলাতে।

আমি চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম। ফিল্ম-দুনিয়ার অনেক লোককেই আমি চিনতাম এককালে। এরা বড় অদ্ভুত। এদের সব কাজের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এরা বিত্তবান। প্রচুর ব্ল্যাকমানি।

মলয়া ভেতরে এল। পরনে একটা সিল্কের হাউস-কোট। সামনেটা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত চেরা। কোনও বোতাম নেই। মাঝখানে কোমরের কাছে একটা ফিতের বাঁধন। ফলে ওর শরীরের বিশেষ-বিশেষ অংশগুলো আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

আমি ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মলয়া গাউনের ভেতর কিছুই পরেনি। কথাটা ভাবতেই আমার শরীরের ভেতর শিরশির করতে লাগল।

মলয়া অসামান্য সুন্দরী। সত্যিকারের একটা বন্য শরীর আছে। সরু কোমর, ভারী নিতম্ব আর সাঙ্ঘাতিক বুক। যেন রাক্যুয়েল ওয়েল্চ।

আমি ভেতর-ভেতর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মলয়া সেটা টের পেল। বলল, কী দেখছ?

তোমায়। তোমার শরীর। অপূর্ব!

কেয়ার চেয়েও?

কেয়ার মতো করে তোমাকে দেখার সুযোগ হয়নি।

মলয়া শব্দ করে হাসল। হাসলে মলয়াকে আরও সুন্দর লাগে। হাসি থামিয়ে বলল, কী দেব? জিন, হুইস্কি, না ইমপোর্টেড ব্র্যান্ডি?

বললাম, হুইস্কি।

মলয়া নিজেও নিল, আমাকেও দিল। হুইস্কি খেতে-খেতে গল্প হচ্ছিল। মলয়া ঘরে চলাফেরা করছে। আমি ভেতর-ভেতর উত্তেজিত হয়ে উঠছি। সম্ভবত সেটাই ছিল মলয়ার উদ্দেশ্য।

আমরা দুজনেই পরপর কয়েক পেগ শেষ করলাম। মলয়ার স্বর সামান্য একটু জড়িয়ে আসছে। আমারও বেশ নেশা ধরছে মনে হল। এর আগে হোটেলে তো কয়েক পেগ পান করেছি।

মলয়া আর-এক পেগ নিয়ে আমার পাশে বসল। বলল, ফিল্ম লাইনে এসেছি বছর পাঁচেক। কিন্তু fed up. এ-জগতের বাইরের লোকেদেরই বেশি ভালো লাগে। তোমার toughness আমাকে মুগ্ধ করেছে।

তুমি সত্যিই আমাকে লোভ দেখাচ্ছে। আমাকে তো দেখলে। আমাকে ভয় করছে না তোমার?

ভয়? ভয় কেন?

I can be dangerous.

মলয়া শব্দ করে হেসে উঠল। হাসি না থামিয়েই বলল, যে হরিণ নিজে ধরা দেয়, তাকে তির মেরে শিকার করতে হয় না।

গ্রিন সিগন্যাল। এগিয়ে চলো।

আমি হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানলাম। বিনা দ্বিধায় মলয়া চলে এল আমার দু-বাহুর মধ্যে।

বাইরে থেকে ওর শরীর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম, তার থেকে অনেক বেশি সম্পদ আছে ওর শরীরে। র‍্যাক্যুয়েল ওয়েল্চ-এর মতো বন্য শরীরটা অনাবৃত হয়ে লেপটে গেছে আমার শরীরের সঙ্গে। ওর অনাবৃত দেহে আমার লোভী হাত আবিষ্কারের নেশায় ঘোরাফেরা করছে। মলয়া উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। আমি ওকে ধরে উঠে দাঁড়ালাম।

মলয়া হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েই পায়ে-পায়ে নিয়ে

চলল শোওয়ার ঘরের দিকে।

শোওয়ার ঘরে এসে আমরা গড়িয়ে পড়লাম নরম বিছানায়। নরম বিছানা। একটা নরম পিচ্ছিল শরীর। পেটে প্রচুর সুরা।

কী এক অপূর্ব কৌশলে মুহূর্তের মধ্যে মলয়া আমার কোটের বোতামগুলো খুলে ফেলল। আমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত বুলাতে লাগল। হঠাৎ ওর চঞ্চল ডান হাতটা থেমে গেল আমার বাঁ-দিকের বগলের নীচে। মলয়া এক মুহূর্তে পাথর হয়ে গেল।

আমার বাঁ-দিকের বগলের নিচে sling-এ ঝোলানো ছিল ৯ মিঃমিঃ লুগার স্করপিয়ন। ওটা যে আমার কাছে থাকতে পারে, এ ধারণা মলয়ার ছিল না।

আর আমি তখনই সেই গন্ধটা পেলাম। আমি এই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমার বুদ্ধির দরজায় ধাক্কা লাগল। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে সর্তক করে দিল। আমার চারদিকের বাতাসে বিপদের অদৃশ্য সঙ্কেত পেলাম।

আমি ডান হাত দিয়ে অটোমেটিকটা বাগিয়ে ধরে, বাঁ-হাত দিয়ে মলয়ার মুখটা চেপে ধরে খাটের উলটো দিকে কার্পেটের ওপর গড়িয়ে পড়লাম।

ফিসফিস করে বললাম, এতটুকু শব্দ কোরো না, মলয়া। করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

দ্রুত খাটের ওপর দুটো পাশ-বালিশ সাজিয়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে দিলাম।

দরজা দিয়ে ঢুকলেই সামনে খাটটা। আর খাটের পেছনে আমরা দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে আছি। আমাদের পেছনে দেওয়াল।

রুদ্ধশ্বাসে একহাতে অটোমেটিকটা বাগিয়ে ধরে, অন্য হাতে মলয়ার মুখ চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রথমে অন্ধকারে চলায় অভ্যস্ত কারোর মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট, পায়ের শব্দ পেলাম। তারপর প্রায় নিঃশব্দে সে ঘরের ভেতর এল। সেই গন্ধটা তীব্রতর হল। ট্রেনিংয়ের অভাব।

খাটের ওপর বালিশ দুটোকে লক্ষ করে গুলি চালাতে লাগল। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলে শুধু 'প্লপ' 'প্লপ' করে কয়েকটি শব্দ হল মাত্র।

এসব কাজে নিখুঁত ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ওর ট্রেনিং নিখুঁত ছিল না। থাকলে ওর জানা থাকত যে, যে-কোনও প্রাণীর দেহে ওই তীব্র গতিবেগসম্পন্ন বুলেট লাগলেই সেই দেহ ঝাঁকানি খেত। ঘুমন্ত শরীরও কেঁপে উঠতে বাধ্য।

ওর ট্রেনিং নিখুঁত ছিল না। ঘর ছিল অন্ধকার। কাজেই ও লক্ষ করল না যে, যেখানে গুলি করা হল, সেখানে কোনও ঝাঁকানি বা কম্পন দেখা গেল না।

কাজ শেষ করে সে নিশ্চিন্তে ঘুরে দাঁড়াল যাওয়ার জন্যে। আমি ওর পেছনদিকে। মাত্র কয়েক পা ও এগিয়েছে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে, আমি ওকে পেছন থেকে ডাকলাম, এই যে, এদিকে—।

সে বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আবার পিস্তলটা তুলতে গেল। তার আগেই আমি প্রসারিত বাঁ-হাতের কবজির ওপর ডান হাতের কবজিটা রেখে ট্রিগারে চাপ দিলাম। পরপর তিনটে বুলেট ছিটকে গেল প্রচণ্ড গর্জন করে।

আমি লাফিয়ে উঠে বাতিটা জ্বালালাম। সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ পেলাম, নীচে একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল ওর সহযোগী রূপে।

নিহত লোকটির দিকে তাকালাম। ওর বুকেব বাঁ-দিকটা রক্তে ভিজে গেছে।

মলয়া উঠে এল। ভয়ে ওর মুখ রক্তহীন। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কম্পিত কণ্ঠে সে বলল, আমি—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব—এসব...।

আমি বাঁ-হাতের উলটো দিক দিয়ে প্রচণ্ড একটা চড় কষালাম ওর গালে। মলয়ার জ্ঞানহীন

দেহটা লুটিয়ে পড়ল খাটের ওপর।

আমি দ্রুত হাঁটু মুড়ে বসে নিহত লোকটার তল্লাশি নিতে লাগলাম। কিন্তু তার কাছে সেই কালো চশমাটা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। তার ব্যবহৃত পিস্তলটা স্পর্শ না করেই পরীক্ষা করলাম। এই একই ধরনের পিস্তলের আর-একজন অধিকারীকে আমি এর আগে খুন করেছি। একই পিস্তল। একই মেকার।

প্যাটার্নটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে। বলেছি সব অপরাধেরই একটা প্যাটার্ন থাকে।

আমার পিস্তলের শব্দে নিশ্চয় আশপাশের প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে গেছে। কেউ না কেউ নিশ্চয় পুলিশকে ফোন করে দিয়েছে। এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে।

আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম পথে। প্রায় তিনশো গজ ছুটে আসার পর দেখতে পেলাম পুলিশের গাড়ি।

আমি ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে একটা বন্ধ দোকানের অন্ধকার দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভ্যানটা প্রচণ্ড বেগে আমার সামনে দিয়ে মলয়ার বাড়ির দিকে চলে গেল।

আমি দুটো হাত পকেটে রেখে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগলাম। খানিকক্ষণ পরে পেয়ে গেলাম একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে বসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মিনিট দশেক পরে ট্যাক্সিটা এসে থামল হোটেলের ফুটপাথে। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। ট্যাক্সিটা চলে গেল। হোটেলে ঢুকব বলে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে মনে হল আমি একটা গর্দভ। ভয়ানক ভুল করেছি।

আর কালক্ষেপ না করে আমি সেই শক্ত সিমেন্টের ফুটপাথের ওপরই 'ডাইভ' দিলাম। কেন না ততক্ষণে আমি দেখে ফেলেছি উলটোদিকের ফুটপাথে একটা কালো রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে—যার ইঞ্জিনটা চালু। গাড়ির পেছনের জানলা দিয়ে ধীরে-ধীরে একটা হাত বেরিয়ে আসছে। সে-হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

আমি মাটিতে পড়ে গড়াতে-গড়াতেই আমার পিস্তলটা চেপে ধরেছি। গাড়ি থেকে বিরামহীন গুলি আমাকে লক্ষ করে ছুটে আসছে। আমার মাথার কাছে সিমেন্টের চলকা উড়ে গেল কয়েকটি বুলেট লেগে।

আমিও গাড়িটা লক্ষ করে গুলি চালালাম। এবার গাড়িটা বিদ্যুৎবেগে ছুটে হারিয়ে গেল সামনের অন্ধকারে।

আমি সেই একইভাবে পড়ে রইলাম মাটিতে মিনিটখানেক। বুঝতে পারলাম, শত্রুপক্ষ অনেক বেশি তৎপর হয়েছে আমাকে শেষ করার জন্যে। আমি ওদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছি।

তাহলে কি টেপরেকর্ডারটা ওরা এর মধ্যেই নিয়ে গেছে? আমার 'ব্লাফ' কাজ করেছে। ওরা যত সক্রিয় হবে আমাকে মারার জন্যে আমার পক্ষে তত সুবিধা হবে ওদের কাছে পৌঁছতে।

এই পথই ঠিক পথ। এই পথেই রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে পাব।

আমি কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে হোটেলে ঢুকলাম। ওপরে এসে কাপড় ছেড়ে আগে স্নান করলাম।

আর স্নান করতে-করতে আমার দু-চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। কোনওরকমে স্নান সেরে শোওয়ার ঘরে এসে সুটকেস থেকে হুইস্কির বোতলটা বার করতে গিয়েই থমকে গেলাম।

সুটকেসটা খাটের ওপরই ছিল। লকারের সঙ্গে একটা অতি সূক্ষ্ম তার দেখতে পেলাম। তারটা লকার থেকে সুটকেসের মধ্যে চলে গেছে।

আমি মুখ টিপে হাসলাম। আমার চারদিকে সাংঘাতিক মৃত্যুর জাল বিছানো।

আমি পকেট থেকে ছোট্ট ছুরিটা বার করে তারটা কেটে দিলাম আগে। তারে বিন্দুমাত্র টান

পড়ল না।

সুটকেসটা খুললাম। ভিতরে আমার জিনিসপত্র লন্ডভন্ড হয়ে আছে। আর, ঠিক মাঝখানে, আছে সেই বিস্ফোরক পদার্থটা। বিশেষ ধরনের একটা বোমা। তাতে বিদেশি ছাপ। চমৎকার পরিকল্পনা।

আমি পিনটা খুলে বোমাটা রেখে এলাম বাথরুমে।

মাত্র সামান্য অসাবধানতার জন্যে আজ হিমাদ্রি সরকার ইহলোক ত্যাগ করত।

হাতঘড়িতে ভোর তিনটে। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ ৯ ॥

ঘুম ভাঙল দরজার কড়া-নাড়ার শব্দে। দরজা খুলেই প্রত্যাশামতো বিকাশকে দেখতে পেলাম। ওকে ভিতরে আসতে বলে আমি বাথরুমে ঢুকলাম। বাথরুমের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, নীচে একটা ভ্যান। অন্তত জনা বিশেক পুলিশ রাইফেল উঁচিয়ে আছে। পালানোর কোনও পথ নেই।

বিকাশ 'মেথড' মেনে চলে। বিকাশ সাবধানতা অবলম্বন করেছে। বিকাশ আমাকে খুব ভালো করেই চেনে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বোতলটা আবার বার করলাম।

বিকাশ আমায় গ্রেপ্তার করতে এসেছে। নার্ভগুলোকে আবার শক্ত করে নেওয়া দরকার। কেন না, এর পর বিকাশ ও তার কর্তারা আমাকে যে ধরনের প্রশ্ন করবে, তার উত্তর দিতে হলে নার্ভ চাই।

দু-তিন ঢোক পান করার পর বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমাকে খুঁজে পেতে এত দেরি হল কেন, বিকাশ?

মলয়ার জ্ঞান ফিরতে দেরি হল, তাই। আর this is murder ! আগে নিশ্চিত না হয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করা চলে না।

মেথড, অ্যাঁ? সত্যিই তোর প্রশংসা না করে উপায় নেই।—আমি হাসলাম।

But that does not help you.

I know, I know.

আমি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম। তারপর ওর সঙ্গে নেমে এলাম নীচে। লবিতে বেশ ছোটখাটো ভিড়।

যেতে-যেতে শুনতে পেলাম কে যেন কাকে বলছে, এরই নাম হিমাদ্রি সরকার। ভয়ংকর লোক।

আমি মুচকি হেসে এগিয়ে গেলাম। লবিতে একটা বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ছিল। আমি এক মুহূর্ত থেমে হেডলাইনটা পড়লাম। বড়-বড় অক্ষরে লেখা আছে ঃ

নায়িকার শয়নকক্ষে খুন ঃ কলিকাতার পুরোনো গুণ্ডা হিমাদ্রি সরকারের পুনরায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব।

আমি বিকাশকে অনুরোধ করলাম এক মিনিট অপেক্ষা করতে। তারপর ডায়াল করলাম সেই পত্রিকার অফিসে।

অনুরোধ করলাম 'নিউজ এডিটার'কে দিতে। নিউজ এডিটারের কাছে জানতে পারলাম, ওদের এই বিশেষ সংবাদের উৎস 'পুলিশ কমিশনার'।

পুলিশের গাড়িতে উঠে বসে বললাম, পুলিশ আমার আবির্ভাবের খবর কাগজওয়ালাদের দিতে গেল কেন?

বিকাশ গম্ভীর হয়ে বলল, হেডকোয়ার্টার্সের নীতি নিয়ে আমি আলোচনা করি না কোনওদিন, হিমাদ্রি।

কেন? ভয়ে?—আমি খোঁচা দিলাম।

না। Principle !

কিন্তু এখনও আমার বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ প্রমাণ হয়নি! এ ধরনের পাবলিসিটিতে আমার ক্ষতি হতে পারে।

এ Spade is a spade.

কিন্তু বিকাশ, আমি যে কোনওকালে ক্রিমিনাল ছিলাম, এটা আদালতে প্রমাণ হয়নি। নট অ্যান অ্যারেস্ট নো কনভিকশান। আমি একজন নাগরিক। আমার অধিকার যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, সেটা তোমাদের দেখার কথা।

আমি বক্তৃতা শুনতে চাই না, হিমু। আমি দার্শনিক নই, সাহিত্যিক নই, রাজনীতিবিদ নই। আমি পুলিশ। আমি মনেপ্রাণে পুলিশ। আমি আমার ওপরওয়ালার আদেশ পালন করি মাত্র।

যন্ত্রের মতো।

রাইট। আর একটা কথা তোকে মনে করিয়ে দিতে চাই। তোকে যিনি পাঁচ-পাঁচবার গ্রেপ্তার করেছিলেন, সেই অবনীবাবু এখন ডি-সি, ডি-ডি। তুই তাকে খুব ভালো করে জানিস। So you better behave youself ! Don't play it wrong.

Damn !—আমার অজান্তেই আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

আবার সেই লালবাড়ি! পুরোনো সিঁড়ি। এখানে আমি বহুবার এসেছি। এখানকার সব কিছুই আমার চেনা। বিশেষ করে সেই ভয়াবহ ইন্টারোগেশান রুম।

শুনেছি, আমেরিকা থেকে নাকি Lie Detecting Machine আনা হয়েছে। সর্বনাশ!

বিকাশ আমাকে ওর ঘরে এনে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। নিজে বসল টেবিলের ওপাশে নিজের আসনে। টেবিলটা থেকে খানকয়েক ফাইল সযত্নে তুলে ড্রয়ারে রাখল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর বিরুদ্ধে মার্ডারের চার্জ আছে। Now you tell me your story.

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে গোটাকয়েক টান দিয়ে বললাম, কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে ইন্টারোগেশানের টেকনিক পালটেছে তোদের?

বিকাশ কঠিন কণ্ঠে বলল, tell me your story.

আমি একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, গতকাল পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে পঞ্চার সঙ্গে বিবাদ হওয়ার পর আমি মলয়ার সঙ্গে মলয়ার বাড়ি গেছিলাম।

মলয়াকে কোথায় পেলি? আমি তো তোকে একা বেরিয়ে যেতে দেখলাম।

মলয়া আমার আগেই ট্যাক্সিতে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকেই ওর বাড়ি গেছিলাম।

কেন?

সেটা নিতান্ত ব্যাক্তিগত ব্যাপার। মলয়া এবং আমি ওর শয়নকক্ষে বসে গল্প করছিলাম।

গল্প? এবং সেটা শয়ন কক্ষে বসে!

হ্যাঁ। গল্প।

বাতি জ্বলছিল?

বিকাশ অত্যন্ত ধূর্ত। যদি বলি বাতি জ্বলছিল, তাহলে ও প্রশ্ন করবে, আততায়ী তাহলে

নিশানা ভুল করল কেন?

আমি বললাম, বাতি জ্বলছিল।

তাহলে আততায়ী তোর কপালে গুলি না করে বালিশে গুলি করল কেন?

কারণ ও একটা বুদ্ধু। ওর training নিখুঁত ছিল না।

Explain. বিকাশ কঠিন কণ্ঠে বলল।

Murder is a dangerous game, বিকাশ। You must have the best training for this. He did not have this.

তারপর?

এ লাইনে আমি বহুদিন আছি। আমি জীবনের পাঠশালায় ট্রেনিং নিয়েছি। যে খুন করতে এসেছিল, তার একটা বাতিক ছিল।

সেটা কী?

Scent, সুগন্ধী দ্রব্য, deoderizer যাকে বলে।

লোকটার গায়ে scent ছিল?

হ্যাঁ। মলয়ার ঘরে সুন্দর গন্ধ ছিল। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। আমি সেই গন্ধ পেয়েই অনুমান করলাম আততায়ী খুব কাছেই—সম্ভবত সিঁড়িতে—দরজার বাইরে এসে গেছে।

Strange !

Training বিকাশ। আমি কোনওদিন challenge প্রত্যাখ্যান করি না। আমি বাতি নিভিয়ে দিয়ে দেখছিলাম যে, আমার ধারণা সত্যি কি না। আততায়ী ঘরে ঢুকে গুলি চালাচ্ছিল। কিন্তু আমি সেই মুহূর্তে মরতে রাজি ছিলাম না।...এই হল আমার গল্প।

বিকাশকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সেও একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘনঘন টানতে লাগল। তারপর একসময় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই কী এক অজ্ঞাত কারণে একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেছিলি। তারপর আবার এক অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘ বারো বছর পর ফিরে এলি। আর সঙ্গে-সঙ্গে somebody wants to kill you. তারও কারণ অজ্ঞাত।

আমি হাসলাম।

বিকাশ বলল, কেউ তোকে খুন করতে চাইছে। কিন্তু কেন?

আমি মুখের ভাব পরিবর্তন না করে বললাম, আমি এর পরে আক্রান্ত হলে সুবোধ বালকের মতো এসে পুলিশের খাতায় ডায়েরি করব। কেমন?

বিকাশ টেবিলের ওপর একটা থাপ্পড় কষিয়ে বলল, এসব চালাকিগুলো এখানে না করলেও চলবে। We know how to deal with you..

মলয়া দেবী কী বলেন?

তার মতে তুই আগে আক্রান্ত হয়েছিলি। কিন্তু আমরা তোকে চিনি, হিমু।

তার মানে? আমি আগে আক্রমণ করেছি?

না, কিন্তু কাউকে খুন করবার ইচ্ছা হলে তুই আগে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাস, যাতে করে সে আগে তোকে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। এবং তারপর তুই তাকে খুন করিস।

এর কোনও প্রমাণ নেই।

সেটাই সবচেয়ে অসুবিধায় ফেলেছে আমাদের। তোকে যদি এখন গ্রেপ্তার করি—ঘণ্টা-দুয়েক পরে বা কালকেই তুই জামিনে বেরিয়ে যাবি।

যাক, তাহলে তুই নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন।

কিন্তু হিমাদ্রি, তুই যে গল্প বললি, এইটুকুই সব নয়। তুই অনেক কিছু গোপন করছিস।

যেমন?

এমন তো হতে পারে যে, মলয়া তোকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছিল খুন করবার জন্যে।

মলয়া আমাকে খুন করতে চাইবে কেন?

সেইটাই তো আমি জানতে চাই।

আমি একটু হেসে বললাম, তোর নিজের কী ধারণা?

Something fishy. এটা একটা খুব সাধারণ গুণ্ডা-বদমায়েশের ব্যাপরে বলে মনে হচ্ছে না।

বিকাশ। এই জন্যেই ও আজ এত ওপরে উঠে এসেছে। ও জানে, সমস্যার কেন্দ্রে আঘাত করতে।

আমি বললাম, গতকাল পঞ্চার সঙ্গে আমার বিবাদের ঘটনা তো তোর জ.না আছে। এমনও তো হতে পারে যে, পঞ্চারই দলের কেউ এসেছিল আমায় খুন করতে।

Don't bluff us, হিমু। আমি স্বীকার করছি যে, তোর উপস্থিতবুদ্ধির কাছে আমরা বহুবার হেরে গেছি। কিন্তু আজ তোকে যে spot-এ পেয়েছি, সেখান থেকে তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

সর্বনাশ! আবার বিকাশের কথার মোড় ঘুরছে।

আমাকে হাজতে পুরলে আমি অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারব। কিন্তু ততক্ষণে রঞ্জনের খুনি অনেক দূরে চলে যাবে। সেটা আমি কোনওমতেই হতে দিতে পারি না।

বললাম, এটা যদি সাধারণ গুণ্ডা-বদমায়েশের ব্যাপার না হয়, তাহলে এটা কী?

বিকাশের চোখে ফিরে এল হিমশীতল দৃষ্টি। চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, I will give you a chance.

কারণ?

কারণ আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কী সন্দেহ?

হয়তো এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এর পেছনে অনেক কিছু আছে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি তো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।

বিকাশ হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, বাংলাদেশে খুব গোলমাল শুরু হয়ে গেছে, তাই না, হিমু?

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, বাংলাদেশ? বাংলাদেশের সঙ্গে আমাকে খুন করতে চাওয়ার কী সম্পর্ক?

কিছুই না। Just a guess. লক্ষ-লক্ষ শরণার্থী আসছে ভারতে। ভারতের অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। পাকিস্তানও ভারতকে শত্রুরাষ্ট্র বলে ভাবে। এ-অবস্থায় ভারত আর নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না। আমাদের ধারণা ভারত আক্রান্ত হবেই। এবং আধুনিক যুদ্ধে...।

হঠাৎ বিকাশ থেমে গেল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। তারপর বলল, So, I am right ?

Right? Right about what ?

বিকাশ মুখ টিপে হাসতে লাগল। আমিও না হেসে পারলাম না। বললাম, তুই বলতে চাইছিস আধুনিক যুদ্ধে গুপ্তচরদের অবদান কোনওমতেই অস্বীকার করা যায় না?

Am I wrong ?

না। কিন্তু তবু আমি আমার সঙ্গে বাংলাদেশের যুদ্ধের কোনও যোগাযোগ খুঁজে পাচ্ছি না।

হিমু, I am just giving you some facts. আমরা আমাদের তিনটে মূল্যবান রত্নকে

হারিয়েছি।

আমি এবার সোজা হয়ে বসলাম, What was that ?

আমরা আমাদের তিনটি অমূল্য রত্ন হারিয়েছি। একজনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে কলকাতার একটি হোটেলে। দ্বিতীয় জনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে ঢাকায়। তৃতীয় মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে ব্যারাকপুরে।

এই তিনজন কী ধরনের কাজে নিযুক্ত ছিল?

They were trying to break a spy ring. এই তিনটি ভারতীয় এজেন্ট এসেছিলেন সেন্ট্রাল থেকে। তিনজনেই কাউন্টার spying এর জন্যে প্রসিদ্ধ।

॥ ১০ ॥

বিকাশ একটু থেমে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল। দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এইসব ব্যাপারের সঙ্গে তোর যোগ কোথায়?

আমার যোগ? আমার যোগ থাকবে কেন? আমি শুধু রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করতে চাই। আমার একটাই উদ্দেশ্য।

তুই আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বেশ এক্সপার্ট, তাই না?

সামান্য বুঝি।

মলয়ার ঘরে যে-লোকটার লাশ পাওয়া গেছে, তার হাতে যে-পিস্তলটা আছে, সেটা নিশ্চয়ই তুই পরীক্ষা করেছিস?

করেছি।

আরেকটা লাশ আবিষ্কৃত হয়েছে দু-দিন আগে, কলকাতার আর-একটি হোটেল থেকে। তার হাতেও ঠিক ওই একই ধরনের একটা পিস্তল পাওয়া গেছে। দুটো পিস্তলই একটি বিদেশি রাষ্ট্রের ছাপ বহন করছে।

রাশিয়া?

হ্যাঁ। যতদূর জানি ওগুলো চিনকে দেওয়া হয়েছিল।

তাহলে কি এই গুপ্তচরবৃত্তির ভেতর চিনও আছে?

আমি কিছুই বলতে চাই না। আমি শুধু factsগুলো সাজাচ্ছি। তোকে বোঝাতে চাইছি, উই নো দি গেম।

তাহলে আর আমাকে নিয়ে টানাটানি করছিস কেন?

বিদেশি পিস্তল যাদের কাছে পাওয়া গেছে, তারা তোকে খুন করতে চাইছে কেন?

কী করে বলব?

I am giving you a chance, হিমাদ্রি। আমার এই বন্ধুত্বটাকে বা এই সুযোগ দেওয়াটাকে আমার দুর্বলতা বলে ভাবলে ভুল হবে। আমরা শুধু জানতে চাই তোর সঙ্গে এদের যোগাযোগটা কোথায়?

আমি আমার বন্ধুর মার্ডারারকে খুঁজছি, বিকাশ। আমার বন্ধু এককালে অতি সাধারণ গুণ্ডা ছিল, যেমন প্রত্যেক পাড়ায় থাকে। আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, সে কোনওদিন গুপ্তচর, বৃত্তি গ্রহণ করেনি।

বিকাশ চুপ করে বসে কী যেন ভাবতে লাগল। চিন্তা করলে বিকাশকে পুলিশ অফিসার মনে হয় না। মনে হয় দার্শনিক। অনেকক্ষণ পরে বলল, আমি একটা রিস্ক নিচ্ছি। তোকে একটা

কথা বলতে চাই। গোপন কথা। তৃতীয় ব্যক্তি যেন না জানতে পারে।

A secret shared is never a secret halved, আমি বললাম।

জানি, কিন্তু তোকে এগুলো বলার কারণ তোর কাছ থেকেও আমি কিছু জানতে চাই। মাসখানেক আগে ডি. ডি.-র স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও মিলিটারি ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের কর্তাদের নিয়ে একটা ক্লোজ্‌ডডোর মিটিং হয়ে গেছে। সেখানে কী আলোচনা হয়েছিল জানি না, কিন্তু...।

বিকাশ ইতস্তত করতে লাগল। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, কিন্তু এটা আমি শুনেছি যে, দিল্লি থেকে মিস্টার মালহোত্রা আসছেন।

মিস্টার মালহোত্রা। মন্ত্রী নাকি?

ওঁর নাম শুনিসনি?

আমি মন্ত্রীদের চিনি না।

উনি মন্ত্রী নন। শুনেছি তিনি একজন এক্সপার্ট। তাঁকে ছোটখাটো ব্যাপারে পাঠানো হয় না। তিনি নাকি একটা ব্যাপারে প্রায় একক। গুপ্তচর চক্রকে ভেঙে দিতে তাঁর মতো মাথা সারা দেশে নেই।

আমার এবার সত্যিই হাসি পেল। মনে হল মশা মারতে কামান দাগা হচ্ছে।

বিকাশ বলল, দুটো লাশের সঙ্গে দুটো বিদেশি পিস্তল আর মিস্টার মালহোত্রার কলকাতায় আসা—এই দুটো যোগ করলে কী দাঁড়ায়?

আমি বিরক্ত হয়ে আর-একটা সিগারেট ধরালাম। কয়েকটা টান দিয়ে বললাম, আমার কাছ থেকে কী জানতে চাস?

Where do you come in?

I don't. একটু থেমে বললাম, একটা জিনিস আমার মাথায় ঘুরছে। হয়তো....mind that, হয়তো রঞ্জন কোনওক্রমে এদের বিছানো পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রঞ্জন! একজন 'হকার' এদের বিছানো পথের কাঁটা? তাহলে তোকে কারা খুন করতে চাইছে?

আমার ধারণা, রঞ্জন এদের গুপ্ততত্ত্ব জানতে পারায় এরা তাকে খুন করেছে। এবং এখন আমাকে খুন করতে চাইছে।

কিন্তু তোকে খুন করতে চাইবে কেন?

কারণ আমি রঞ্জনের বন্ধু। আমি—একমাত্র আমি হিমাদ্রি সরকার পারি রঞ্জনের খুনিকে খুঁজে বার করতে।

একমাত্র তুই?

হ্যাঁ, একমাত্র আমি। পুলিশ পারবে না। কেন না, আমাদের সরকার তোষামোদের পররাষ্ট্র-নীতি নিয়েছে। কোন রাষ্ট্র কবে আমাদের কোন আচরণে চটে যাবে, সেই চিন্তাতেই ভারত সরকার গলদঘর্ম। আর তোরা—এই পুলিশ বিভাগ? তোদের কথা শুনলেই দেশের লোক ঘৃণায় নাক সিঁটকোয়। এখানে এক নোংরা রাজনীতি চলছে।

একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

মোটেই না। সরকারি নির্দেশ ছাড়া তোরা কিছুই তদন্ত করতে পারিস না। কেন না কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যায়। কারণ প্রায়-সময়েই তোমাদের মহান দেশনেতারা সেই সব তদন্তের ফলে বিপদে পড়ে যান। আর তখনই তোমাদের চাকরি যায়, নতুবা অকালে অবসর নিতে হয়। একে বলে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট?

সদ্য-আনা চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। বিকাশ গম্ভীর হয়ে বলল, তোর কথায় কিছু সত্য আছে।

কিছু সত্য? তুই বিবেকে হাত দিয়ে বল তো, গতকাল রাত্রে আমি যা করেছি, তা না করলে

আমি প্রাণে বাঁচতাম? সংবিধান আমাকে অধিকার দেয়নি আমার প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষার?

দিয়েছে। কিন্তু প্রমাণ হওয়া চাই তুমি তোমার প্রাণ রক্ষা করছিলে, অপরের প্রাণ নিচ্ছিলে না। এবং তার জন্যে কোর্ট আছে।

পুলিশ—আগাগোড়া তুই একটা পুলিশ। তোর ভেতর কি আর কোনও অনুভূতি নেই?

যতক্ষণ আমার দেহে পোশাক আছে, ততক্ষণ আমি আর কিছু নই। আমি এখন 'অন ডিউটি'। কিন্তু তোর ওই সব বক্তৃতা আমি অনেক শুনেছি, হিমু। ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়।

আমার ধারণা, রঞ্জনকে হয়তো এই গুপ্তচর চক্রের কেউ খুন করেছে। তাই যদি হয়, তাহলে রঞ্জন নিশ্চয় ওদের বিপদের কারণ হয়েছিল। রঞ্জন আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল। বলেছিল ওর খুব জরুরি দরকার। ভীষণ বিপদ। সে জানত, খুব প্রয়োজন না থাকলে আমাকে চিঠি দেওয়া বা ডেকে আনা উচিত নয়।

কিন্তু সত্যিই রঞ্জন যদি এদের কোনও গুপ্ত কথা জেনেছিল, তাহলে পুলিশের কাছে এল না কেন?

কোন পুলিশের কাছে? যে-পুলিশ রাজনৈতিক নেতাদের আদেশে তাকে দু-বৎসর জেল খাটাল, সেই পুলিশের কাছে? কে তাকে বিশ্বাস করত? একটা জেলখাটা দাগি আসামির কথা পুলিশ বিশ্বাস করত? তারপর তাকে মরতেই হত ওদের হাতে।

আমরা ওকে প্রোটেকশান দিতাম।

প্রোটেকশান! আর হাসাস না বিকাশ! সেদিন ডালাসে চৌষট্টি জন সিক্রেট সার্ভিস মেন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে ঘিরেছিল—কই, পারল তাকে প্রোটেকশান দিতে? পুলিশ কাউকে প্রোটেকশান দিতে পারে না।

তোর ধারণা...।

আমার ধারণা, একজন সাধারণ গুণ্ডা হঠাৎ স্বদেশপ্রেম দেখাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। রঞ্জন সেই গুপ্ত কথাটা জেনেও চুপচাপ চেপে যেতে পারত। তাতে তার ক্ষতি হত না, কিন্তু দেশের ক্ষতি হত।

তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলাম যে, দেশের একদল শত্রু রঞ্জনকে মেরেছে। তারা গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে।

আমার ধারণা ওটা হাইপথেসিস। কোনও প্রমাণ নেই।

হাইপথেসিস খাড়া করতেও প্রমাণ দরকার, হিমু।

Facts—আমার কাছে কতকগুলো facts আছে। তার ওপর নির্ভর করেই ওই ধারণা হয়েছে।

আমরা এক বন্ধুরাষ্ট্র মারফত জানতে পেরেছি যে, এখানে একদল গুপ্তচর কাজ করে চলেছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে-দেখতে প্রশ্ন করলাম, এই গুপ্তচরেরা কোন লাইনে কাজ করছে?

আমি ঠিক জানি না। তবে আমার মনে হয়, আসন্ন যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করাই এদের উদ্দেশ্য।

মিলিটারি সিক্রেট?

আমার মনে হয়। হিমু, আমি তোকে জামিনে ছেড়ে দিচ্ছি। এটা আমি ব্যক্তিগত রিস্কে করছি। কিন্তু এক শর্তে—।

কী শর্তে?

তুই পুলিশকে সাহায্য করবি।

তোর মাথার ঠিক আছে তো?

কেন?

আমি আর যা-ই কিছু করি না কেন, পুলিশ হতে পারব না। পুলিশ আমার চিরকালের শত্রু।

কিন্তু পুলিশ হওয়ার সব যোগ্যতাই তো তোর আছে। আমরা দুজনে ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা অনায়াসে কাঁধে-কাঁধ দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে পারতাম। অথচ নিয়তির কী পরিহাস। ভাগ্যচক্রে তুই আজ লাইনের ওপারে। আমি এপারে।

তা হয় না, বিকাশ।

কেন হয় না?

হয় না, কারণ আমি পুলিশকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

মুহূর্তে বিকাশের মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি দেখতে পেলাম, ওর ডান হাতটা কাঁপছে। অনেকক্ষণ পর বিকাশ বলল, O. K. We will deal this in a different way. আমি তোকে জামিনে ছাড়ছি। You go out and hunt that killer of your friend. কিন্তু যে-মুহূর্তে এই গুপ্তচরচক্রের বিষয়ে কোনও ক্লু, কোনও সংবাদ তোর কাছে আসবে, you bring it to us.

রেগে গেলে বিকাশ খুব ইংরাজি বলে।

আমি বললাম, কেন?

কারণ, রঞ্জনের খুনিকে ধরা আর আন্তর্জাতিক গুপ্তচরদের সঙ্গে লড়াই করা এক কথা নয়, হিমু। It is just too big for you.

তার মানে, আমি পুলিশকে সাহায্য করার বদলে পুলিশ আমাকে সাহায্য করবে, যদি এই গুপ্তচররাই রঞ্জনের খুনি হয়ে থাকে?

ঠিক তাই। পণ্ডার মতো দু-একটা গুণ্ডা-বদমায়েশকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা হয়তো তোর আছে। কিন্তু একটা well organised spy ring-এর সঙ্গে লড়াই করা তোর পক্ষে সম্ভব নয়।

বললাম, এটা করা যেতে পারে। কিন্তু আমি বিচার করে দেখব কোনটা পুলিশকে বলা দরকার। I am not interested in any spy business.

আমি দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে বললাম, রঞ্জন যদি সত্যিই এই গুপ্তচরদের হাতে প্রাণ দিয়ে থাকে, তবে this is your game.

হ্যাঁ, কিন্তু আর-একবার বলছি, হিমু, তোর কি ফিরে আসার কোনও উপায় নেই?

আমি তো দেশে ফিরে এসেছি।

দেশে নয়, হিমু। সমাজে।

সমাজে?

হ্যাঁ। Can't you leave that underworld? সুস্থ নাগরিকের মতো জীবনযাপন করা কি সম্ভব নয়?

অনেক দেরি হয়ে গেছে বিকাশ। আমি গলা পর্যন্ত জলে নেমে গেছি। আমার শত্রু অনেক। আমি এ-জগৎ ত্যাগ করলেই ওরা আমায় খুন করবে।

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতে গেলাম। বিকাশ বলল, আর-একটা কথা হিমু—।

কী?

সেই অস্ত্রটা। The gun—যেটা কাল ব্যবহার করেছিলি—।

বলেছি বিকাশ মেথড মেনে চলে। কোনও সময়েই কর্তব্যচ্যুত হয় না।

কী হবে?

তুই জানিস কী হবে। ব্যালিস্টিক টেস্ট। ফোরেনসিক রিপোর্ট তৈরি করতে হবে।

আমি কোটের ভেতরে হাত দিয়ে পিস্তলটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলাম। আমি জানি

আমাকে আর-একটা পিস্তল জোগাড় করতে হবে। আমি জানি কোথায় সেটা পাব। আমাকে বরাবর সেই একই উৎসে ফিরে যেতে হয়।

পিস্তলটা টেবিলের ওপর রেখে জিগ্যেস করলাম, মিস্টার মালহোত্রা কবে আসছেন?

দিন সাতেকের মধ্যে। আমরা তার জন্যেই অপেক্ষা করছি। তিনি এলে তার নির্দেশ মতোই চলতে হবে আমাদের। কিন্তু...।

কিন্তু?

উনি আসার আগেই কলকাতা পুলিশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এই অপারেশন শেষ করতে চাই।

আমি আবার দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। পেছন থেকে বিকাশ বলল, Stay away from that snake.

বিদ্যুৎবেগে আমি ফিরে দাঁড়ালাম ঃ কে? মলয়া দে?

She is trouble. ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে জানিস?

কে? অবিনাশদা?

না, পুলক সেন।

পুলক সেন!—নামটা শুনে আমি চমকে উঠলাম।

হ্যাঁ, পুলক সেন।

লোকটা কে?

You will find out.

আমি নামটা মনে-মনে বারতিনেক উচ্চারণ করলাম। তারপর যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বললাম, আমার ওপর তোর এত বিশ্বাস দেখে কৃতজ্ঞ হলাম।

তার কারণ আমরা বন্ধু, হিমাদ্রি। আমি আজও বিশ্বাস করি, তুই কলকাতায় ফিরে আসতে পারিস, আবার সাধারণ নাগরিকের মতো জীবনযাপন করতে পারিস। It is never too late.

এই সমাজের সব লোকগুলোই তোর মতো উদার নয় বিকাশ। সমাজের সর্বস্তরে পাপ ঢুকেছে। এ-সমাজ পায়ে-পায়ে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তাই দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে।

সমাজের সব লোকই খারাপ নয়।

ভালো মানুষ আছে—তবে সংখ্যায় খুব কম। তারা ভয়ে লুকিয়ে গেছে।

দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফুটপাথে পা দিলাম। একটা পেপার কিনলাম ফুটপাথ থেকে। মলয়ার বাড়িতে নিহত লোকটার ছবি ছাপা হয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠায়।

বিকাশের সঙ্গে কথা বলে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি। রঞ্জন নিহত হয়েছে একটা গুপ্তচর-বাহিনীর হাতে। গুপ্তচররা সাধারণ মানুষকে খুন করে না। রঞ্জনকে যখন তারা খুন করেছে, তখন নিশ্চয়ই তার একটা গুরুতর কারণ আছে।

সেই গুরুতর কারণেই রঞ্জন আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল।

আমি কলকাতায় পা দিয়েই শুনলাম রঞ্জন নিহত হয়েছে। ওর বাড়ি এসে শুনি চোর এসেছিল।

রঞ্জনের ঘরে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। অর্থাৎ, নিপুণভাবে তার ঘরের তল্লাশি নেওয়া হয়েছে। রঞ্জনের প্রতিবেশীরা যেটাকে চোরের কাজ বলে মনে করছে। তল্লাশি যারা নিয়েছিল, তারা এ-কাজের ট্রেনিং নিয়েছে।

কিন্তু তল্লাশি কেন? কী খুঁজছিল তারা? তবে কি রঞ্জনের কাছে এমন কিছু ছিল, যার জন্যে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে?

কিন্তু তারা যে-জিনিসটা খুঁজছিল, সেটা তারা পায়নি। বিকাশের অফিস থেকে বেরিয়ে আমার মনে হল, সেই জিনিসটা খুঁজে বার করতে হবে।

যেভাবে রঞ্জন মৃত্যুবরণ করেছে, ঠিক সেইভাবে আমাকে হত্যাকারীর কাছে পৌঁছতে হবে।

কিন্তু তার আগে আমাকে দু-চারজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। কলকাতার হিরোরা জানুক যে আমি ফিরে এসেছি।

॥ ১১ ॥

তালতলা এলাকার সারেং লেনে যখন ঢুকলাম, তখন আমার মনে পড়ে গেল অতীতের অনেক কথা।

এখানে প্রথমেই দেখা করলাম প্রণব রোজারিওর সঙ্গে। বাঙালি খ্রিশ্চান। বিদেশি সাহেবরা নিজেদের দেশের পদবি দিয়ে দিয়েছেন এদের অনেককে। ব্রিটিশ আমলে এরা এটা পছন্দ করত। তখন বিদেশি পদবিওয়ালা খ্রিশ্চানদের চাকরি জুটত সহজে।

প্রণব রোজারিওকে আমি সত্যিই শ্রদ্ধা করতাম। তার কারণ ছিল অনেক।

প্রণব একাই রংবাজি করত। কোনও দল ছিল না। ও কোনওদিন কোনও সম্রাটকে ভয় করত না। আমাকেও না।

ওকে একবার তুলে এনে প্রচণ্ড বিট (ধোলাই) দিয়েছিলাম। তবু প্রণব আমার দলে যোগ দেয়নি।

রক্তাক্ত মুখের ওপর হাত বুলিয়ে বলেছিল, আমি ভাওয়ালের লোক, হিমু। আমায় ধোলাই দিয়ে কিছু হবে না।

প্রণব ওর ঘরেই ছিল। দোতলা বাড়ি। সুন্দর সাজানো। রোজারিও পয়সা করেছে। আমাকে দেখে হাসল। বলল, এসো, এসো। শুনেছি তুমি আবার ফিরে এসেছ, এবং ফিরে এসেই কলকাতা তোলপাড় করছ।

তোমার খবর কী?

আমার সেই একই খবর। একই ব্যাবসা—ডকের কাজ। তা হঠাৎ পঞ্চার সঙ্গে ঝগড়া হল কেন?

পঞ্চাকে বুঝিয়ে দিলাম আমি ফিরে এসেছি।

তোমার চারদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে, হিমাদ্রি।

তাই নাকি?

তুমি জানো গতকাল রাত্রে প্রীতম সিংয়ের ওখানে তিন ঘণ্টা ধরে মিটিং হয়ে গেছে?

শুনিনি তো।

উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত এলাকা থেকে সম্রাটরা আর তাদের মন্ত্রীরা একত্রিত হয়েছিল।

কী জন্যে?

তোমাকে শেষ করার জন্যে। ওরা বেশ পয়দা করছিল, সুখে রাজ্য শাসন করছিল। তুমি এসে ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছ। ওরা বলছে, হিমাদ্রি থাকতে আমাদের কোনও চান্স নেই।

বেশ, ভালো কথা। আমি চাইছিলাম, আমার প্রত্যাবর্তন সংবাদ যেন ওদের কাছে পৌঁছয়। আমি চাই ওরা আগে 'মুভ' করুক।

কিন্তু কেন, হিমাদ্রি? তুমি ফিরে এসেছ—ভালো কথা। তুমি সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ফিরে পেতে চাও, তাও মেনে নেব। কিন্তু সমস্ত কলকাতা তোলপাড় করার কী কারণ?

আমার বন্ধু রঞ্জনের খুনিকে চাই। আমার বন্ধু রঞ্জন খুন হল আর কেউ তা দেখেনি, কেউ কিছু জানে না—এটা আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু কেউ কিছু জানলেও কি সাহস করে বলবে?

যার ভয়ে বলছে না, তার চেয়েও যদি আমাকে বেশি ভয় করে, তবে নিশ্চয়ই বলবে।

হিমাদ্রি, যুগ পালটে গেছে।

যুগটা একটা বা একদল লোক পালটেছে। সেই লোকগুলোকে শায়েস্তা করলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

রোজারিও চুপ করে রইল। চা নিয়ে এল ওর ভৃত্য। চায়ে চুমুক দিয়ে ও বলল, কী করতে চাও তুমি?

প্রত্যেক এলাকায় এখন সম্রাট আছে, তাই না?

হ্যাঁ।

তাদের পরের ধাপে আছে তাদের চামচারা।

ঠিক।

কিন্তু কিছু-কিছু লোক আছে যাদের সাহস অনেক বেশি, কিন্তু কোনও দলে নেই। যেমন তুমি।

তাদের পাবে কী করে?

টাকা খরচ করে তাদের একত্রিত করতে হবে। যদি এই underworld থেকে রাজনীতিকদের সরানো না যায়, তাহলে—।

এটা খুবই কঠিন কাজ, হিমাদ্রি।

আই উইল ডু দিস। আমি একদিন এ-কাজ করেছিলাম। এই কলকাতার সম্রাট আমরা। যারা রাজনীতি করে তারা নয়। তাদের উস্কানিতে, তাদের স্বার্থ রাখার জন্যে আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরব না। এটা বোকামি।

প্রোটেকশান দেবে কে?

Organized হলে প্রোটেকশান পাওয়া যাবে। পুলিশ চিরকাল সমাজবিরোধীদের পক্ষে, কারণ এই underworld এর লোকেরাই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবল রোজারিও। ওর সাহস সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। সারা কলকাতার self-operator-রা ওকে চেনে। কেউ ওকে বিরক্ত করতে সাহস পায় না। অনেকক্ষণ পরে সে বলল, ঠিক আছে, আমি আরও দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু লাখখানেক টাকার দরকার এর জন্যে।

পাওয়া যাবে। Organized way-তে একমাস অপারেশন করলেই পাওয়া যাবে।

ঠিক আছে, তাই হবে।

আর-একটা কথা, ইনফরমার নিতাইকে কোথায় পাব?

তাকে কী দরকার?

দরকার আছে।

রোজারিও ওর পার্শ্বচরকে আদেশ দিল নিতাইকে ধরে আনার জন্যে।

নিতাই এল মিনিট দশেক পরে। আমাকে দেখে বেশ ভয় পেল।

নিতাইকে উদ্দেশ করে বলল রোজারিও, একে চিনিস, নিতাই?

না তো!

হিমাদ্রি সরকার—হিমু। কাল পঞ্চাকে যে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

এবার চিনেছি।

আমি বললাম, তুমি সারা কলকাতার খবর রাখো। সকলে কী বলছে?

সেন্ট্রালের প্রত্যেক থানার বড়বাবুরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। প্রত্যেক পাড়ার রাজারা

বারবার মিটিং করছে। আর পুরোনো রংবাজরা এবং উঠতিরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। শিগগির ওরা আপনার সঙ্গে দলে-দলে এসে দেখা করবে। চারদিকে একটা হইচই পড়ে গেছে।

তোমার কী মনে হয়, আমি জিতব?

আপনি কোন পার্টি করেন? মানে, কোন মন্ত্রী আপনাকে ব্যাকিং করছে?

প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী? ভারতের প্রধানমন্ত্রী?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি।

নিতাই বোকার মতো তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি বললাম, আমি কোনও ব্যাকিং নিয়ে কাজ করি না, নিতাই। কিন্তু পুলিশ আমায় বিরক্ত করবে না।

ব্যস। ওইটাই দরকার। তাহলেই আপনি জিতবেন।

কেষ্টপদ কোথায়?

কে?

কেষ্টপদ গড়াই।

রোজারিও বলল, ঠিক জবাব দিবি, নিতাই, নতুবা মাথা ভেঙে দেব।

কেষ্টপদ...কেষ্টপদ তিনদিন আগে...।

নিতাই!—ধমকে উঠল রোজারিও।

কেষ্টপদ রাজাবাজারে আছে। ইজরাইলের ঠেকে।

আমি রোজারিওকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। আগে একটা পিস্তল জোগাড় করলাম। তারপর ট্যাক্সি করে সোজা চলে এলাম রাজাবাজার।

॥ ১২ ॥

রাজাবাজারে এসে একটা অতি নোংরা স্যাঁতসেতে গলিতে ঢুকলাম।

ইজরাইল নিজের দরজার ওপরেই বসেছিল। আমাকে দেখে চমকে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আরে হিমুবাবু, আপনি? এক জমানাসে আপকো দেখা নেহি।

বেঁচে আছি, ইজরাইল।

শুনলাম, আপনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন।

কার কাছে শুনলে?

কাল বেলঘরিয়া গিয়াছিলুম। আপনার পুরোনো দোস্ত অপূর্ব ঘোষ বলল, আপনি আসিয়েছেন। সব এলাকামে হইচই। পুরোনো দোস্তরা আবার আপনাকে বাদশা বানাবে বলছে।

আমি সে-কথার জবাব না দিয়ে বললাম, তোমার চুলে পাক ধরে গেল, ইজরাইল। অনেক বদলে গেছ।

আপভি বদলে গেছেন। হিপিদের মতো বড়-বড় চুল রাখিয়েছেন। সাহেবদের মতো দামি স্যুট পরেছেন। অনেক বড় নোকরি পাকড়েছেন নাকি?

আমি লাইন বদলাইনি, ইজরাইল। চাকরিও করি না। এসব এমনি-এমনি এসে যায়।

পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, আমার খবর দরকার।

কিন্তু টাকা দিচ্ছেন কেন? এক জমানামে আপনি আমার বহুত মদত করেছেন। বলুন, কী জানতে চান?

রঞ্জনকে তোমার মনে আছে?

মুখ কালো হয়ে গেল ইজরাইলের। মনে হল ভয় পেয়েছে।

বললাম, রঞ্জনকে কেউ খুন করেছে। আমি জানতে চাই, রঞ্জন কেন খুন হল।

চলুন, ভেতরে চলুন।

ইজরাইল আমাকে নিয়ে গেল গলির আরও ভেতরে। একটা ছোট্ট দরজায় টোকা দিল। অনেকক্ষণ পর কে যেন দরজা খুলল। আমি অন্ধকারে তার মুখ ভালো করে দেখতে পেলাম না।

ইজরাইল বলল, ভয় নেই কেষ্টা, পুলিশ নয়। আমাদের পুরোনো দোস্ত।

ভিতরে এলাম। এবার চিনতে পারলাম লোকটাকে। সেই চোদ্দো-পনেরো বছর আগে খুনের আসামি কেষ্টপদ আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। রঞ্জনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

বললাম, কী খবর, কেষ্টা? কেমন আছ?

কেষ্টা কোনওরকমে ঢোক গিলে বলল, হিমুদা, তুমি আবার কলকাতায় কবে এলে?

আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম, আমি জিগ্যেস করেছি, তুমি কেমন আছ?

ভালো...ভালোই আছি।

কিন্তু তুমি খুব ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে, কী ব্যাপার?

ইজরাইল জবাব দিল, কয়েকদিন ধরে কেষ্টা বেরোচ্ছে না, এখানেই ঠেক নিয়েছে।

কেন কেষ্টা, কী হয়েছে?

হঠাৎ কেঁদে ফেলল কেষ্টা। আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, হিমুদা, আমার বড় বিপদ। ওরা আমাকেও খুন করবে।

কারা খুন করবে?

ওরা...ওরা...।

আমি প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় কষালাম ওর গালে। কেষ্টা ছিটকে পড়ল। ঠোঁট থেকে দু-এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম, আমার কাছে নক্সাবাজি নয়, কেষ্টা। রঞ্জন কীভাবে মরল? কে বৈঠকবাজি করেছে?

কেষ্টা উঠে গিয়ে সামনের সেল্‌ফ থেকে একটা বোতল বার করে পান করতে লাগল।

ইজরাইল বলল, এ ক'দিন ধরে শুধু শরাব খাচ্ছে।

খানিকবাদে আবার আমার সামনে বসল কেষ্টা।

বলল, রঞ্জনের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না, হিমুদা। রঞ্জন মরল, কারণ সে সৎ হতে চেয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে রঞ্জন কোনও কাজই পেল না। ও যখন মাস তিনেক অর্ধাহারে এবং অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, আমিই ওকে ট্রেনে হকারির লাইনে নিয়ে যাই।

বলে যাও।

হকারিতে বেশ দু-পয়সা হচ্ছিল। হঠাৎ এই হপ্তা দেড়েক থেকে ও কাজে যাওয়া বন্ধ করল।

একটু থেমে আবার বলল, ইদানীং রঞ্জন চুপচাপ বসে থাকত ঘরে। বলত, আমি একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। সে এলে তার কথা মতো কাজ করব। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, রঞ্জন ভয় পেয়েছিল। সবসময় ওকে খুব চিন্তিত দেখাত।

রঞ্জন কার জন্যে অপেক্ষা করছিল?

জানি না। অনেক জিগ্যেস করেও জানতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, তোমার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। রঞ্জন কি জানত যে, তুমি আসছ?

তুমি গল্পটা শেষ করো, কেষ্টপদ। আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই।

একদিন ওকে বোঝাবার জন্যে ওর ওখানে গেলাম। সঙ্গে একটা বাংলা বোতল ছিল। সময়টা বেশ ভালোই কাটছিল। একসময় আমি বাথরুমে গেলাম। ফিরে আসার সময় দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালাম। দেখি, ঘরের মধ্যে দুটো ষণ্ডামার্কা লোক রঞ্জনের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি চুপকি দিয়ে ছপ্পড়ে সেঁটে গেলাম। একজন ষণ্ডামার্কা লোক প্রশ্ন করল, তোমার নাম রঞ্জন?—রঞ্জন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে আর একজন বলল, তোমাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আমরা হেডকোয়ার্টার্স থেকে আসছি।—তার হাতে একটা পিস্তল ছিল। আর একটা কার্ড ছিল। রঞ্জন কার্ডটা পরীক্ষা করে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এল। আমি ধাঁ করে বাথরুমে সেঁটে গেলাম। দেখি, ওরা রঞ্জনকে নিয়ে যাচ্ছে। একজন বলছে, আমাদের সামনে-সামনে চলো। চালাকি করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। আমি লোক দুটোকে দেখলাম। যেন আর্মির কোনও অফিসার। যেমন লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য, অনেকটা তোমার মতো।

ওদের দেখলে চিনতে পারবি?

একশো বার। আমি ভালো করে ওদের খুমা মেপে রেখেছি। একজনের বাঁ-চোখের ওপর একটা কাটা দাগ ছিল। কিন্তু ওরা কারা জানি না, কিন্তু পরের দিনই রঞ্জনের লাশ পাওয়া গেল। ওরাই বোধহয় রঞ্জনকে মেরেছে।

আমি সেদিনকার দৈনিক পত্রিকাটা ওর সামনে মেলে ধরে বললাম এই লোকটাকে চেনো?

এই তো! ওদেরই একজন। ওই তো বাঁ-চোখের ওপর কাটা দাগ।—কেষ্টা কাগজটা পড়তে লাগল।

আমি বললাম, তাহলে এ-লোকটা আর তোমাকে বিরক্ত করবে না।

কী করে মরল লোকটা?

কাগজে একটা গল্প দিয়েছে। আসলে আমি হাতের টিপ প্র্যাকটিস করছিলাম। একটা নয়, তিনটে বুলেট ওর হৃৎপিণ্ডে গিয়ে লেগেছে।

তুমি...তুমি মারলে? পুলিশ ধরল না তোমায়?

আমি সেই বিশ্রী হাসিটা হাসতে-হাসতে বললাম, পুলিশ আমায় ধরে না। ধরলেও বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারে না।

কেষ্টার চোখে বিস্ময়ের ঘোর। বলল, তুমি কোথা থেকে আসছ, হিমুদা?

আমি হাসলাম। উত্তর দিলাম না।

তুমি....তুমি কী করতে এতদিন?

এই একই ব্যাবসা।

কোথায়?

বোম্বাই...দিল্লি...মাদ্রাজ সর্বত্র।

কী বলছ, হিমুদা!

হ্যাঁ, কেষ্টা। তোমরা এখানে কার জোরে রংবাজি করো?

মিনিস্টারদের জোরে।

শুধু মিনিস্টার নয়, কিছু-কিছু এম-পি, কিছু-কিছু মেরুদণ্ডহীন পুলিশ অফিসারদের সাহায্যও দরকার হয়। তাই না?

ঠিক বলেছ।

রঞ্জন কি কোনও নতুন দলে ভিড়ে ছিল? ওরাই কি বৈঠকবাজি করে রঞ্জনকে মারল?

রঞ্জনকে ওরা কোনও গোপন আস্তানায় ধরে নিয়ে গেছিল। ওরা রঞ্জনের কাছে কিছু চাইছিল। অত্যাচার করেও যখন সেটা পেল না, তখন ওকে খুন করল।

কিন্তু কী জিনিস তারা চাইছিল?

এমন একটা জিনিস, যার জন্যে বিনা দ্বিধায় মানুষকে খুন করা যায়। আমিও জানতে চাই, সেটা কী জিনিস।

কেষ্টা ভ্রূকুটি করে বলল, কী এমন জিনিস হতে পারে? একজন ট্রেনের হকার কী এমন জিনিস পেতে পারে, যেটা ওই সব ভয়ংকর লোকেদের কাজে লাগবে! টাকাপয়সাও তো রঞ্জন নিত না। একবার একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিল ট্রেনে হকারি করার সময়। ব্যাগ ভরতি টাকা ছিল। অথচ রঞ্জন সেটা জমা দিয়েছিল।

কী বললে?

বলছি, অপরের টাকাতেও রঞ্জনের লোভ ছিল না। এক ব্যাগ ভরতি টাকা পেয়েও রেলওয়ের 'হারানো-প্রাপ্তি' বিভাগে জমা দিয়েছিল।

আমার মাথার ভিতর দপদপ করে আওয়াজ হতে লাগল। একটা কীসের সংকেত পেলাম মাথার মধ্যে।

আমি একটা একশো টাকার নোট কেষ্টার হাতে দিয়ে উঠে পড়লাম।

॥ ১৩ ॥

হারানো-প্রাপ্তি ডিপার্টমেন্টে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে-বসে বিড়ি টানছিলেন। আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা একশো টাকার নোট বার করলাম। ভদ্রলোকের চোখজোড়া বড়-বড় হয়ে উঠল। বললাম, এটা কি আপনার দরকার?

মানে?—ভদ্রলোক জোরে-জোরে বিড়ি টানতে লাগলেন।

মানে এটা আপনাকে দিতে পারি।

কাকে খুন করতে হবে?—ভদ্রলোক রসিকতা করলেন।

খুন নয়। এমন একজনের বিষয় খবর দেবেন যে নিজেই খুন হয়ে গেছে।

মানে মৃত?

মৃত।

তাহলে মর্গে যান, নতুবা প্ল্যানচেট করুন।

আমি রঞ্জনের খবর চাইছি।

কোন রঞ্জন? যে হকারি করত?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোক আরাম করে বসলেন : দিন দুয়েক আগের কাগজেই পাবেন। একটা অদ্ভুত চরিত্র। স্ট্রেঞ্জ!

কেন?

আরে মশাই, সামান্য একটা হকার, একসঙ্গে অত টাকা পেয়েও নিলে না। অথচ শুনেছি, এই রঞ্জন নাকি এককালে কলকাতার এক বিরাট গুণ্ডার ডানহাত ছিল।

কত টাকা ছিল?

অনেক। পাঁচ হাজার।

পাঁচ হাজার।

সঠিক হিসাব হল পাঁচ হাজার দুশো ত্রিশ টাকা।

সব একশো টাকার নোট?

সব একশো টাকার নোট। নতুন সিরিয়াল নাম্বার ছিল।

এটাও তো অদ্ভুত। এত টাকা লোকে সঙ্গে করে ঘোরে? তাও আলাদা কোনও ব্যাগ নয়, মানিব্যাগে?

আরে মশাই, গোটা ব্যাপারটাই রহস্যময়। অবশ্য যার টাকা তিনি নিয়ে গেছেন।

কার টাকা?

খাতা দেখে বলতে হবে। তিনি অবশ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। পুলিশ কেসটা ডিল করেছিল। টাকা পেয়ে ভদ্রলোক রঞ্জনের সততায় খুশি হয়ে শ-পাঁচেক টাকা উপহার দিতে চেয়েছিলেন।

রঞ্জন নিশ্চয় নেয়নি?

এলই না! বলে পাঠাল টাকার দরকার নেই।

আবার আমার মাথার মধ্যে দপদপ করতে লাগল। আমি যেন কী বুঝেও বুঝতে পারছি না।

পঞ্চাশটা একশো টাকার নতুন করকরে নোট। সামান্য একটা মানিব্যাগে ছিল। তার মানে ভদ্রলোক এত টাকা নিয়ে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু রঞ্জন টাকাটা ফেরত দিল কেন? সে কি এত সৎ?

বললাম, যার টাকা তিনি কী করে প্রমাণ করলেন যে টাকাটা তাঁর?

মানিব্যাগে ভদ্রলোকের অনেক কাগজপত্র ছিল। আর তা ছাড়া ব্যাগের প্রথম ফোল্ডে সেলোফোন আটকানো ছিল তাঁর নিজের ছবি।

বললাম, ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানাটা দিতে পারেন?

নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই টাকাটা আগে নিরাপদ স্থানে রাখা দরকার—মানে আমার বুকপকেটে।

আমি হাসতে-হাসতে টাকাটা বাড়িয়ে ধরলাম। উনি সেটা দ্রুত যথাস্থানে চালান করে দিয়ে খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নাম-ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে আমার হাতে দিতে-দিতে বললেন, একে চেনেন বোধহয়? বিখ্যাত লোক।

আচ্ছা, রঞ্জন বকশিসের টাকাটা নিতে এল না কেন?

কী করে জানব? বলে পাঠাল টাকার দরকার নেই। তারপর সপ্তা-দেড়েক হল আর কাজেই এল না। তারপর কাগজে ওর মৃত্যু-সংবাদ বেরোল।

সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেল। রঞ্জনের হত্যার রহস্য নিহিত আছে এই ব্যাগটার মধ্যে। এবার আমি পেয়েছি। 'ইউরেকা! ইউরেকা!' বলে চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

রঞ্জন ব্যাগটা ফেরত দিয়েছিল, কিন্তু ব্যাগের ভেতর এমন কিছু ছিল—যেটা কোনওক্রমে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেটা রঞ্জন ফেরত দেয়নি। সম্ভবত প্রথমে জিনিসটার গুরত্ব বুঝতে পারেনি সে। পরে যখন সেটার গুরত্ব বুঝতে পারল, তখন ব্যাগটা জমা দেওয়া হয়ে গেছে। এবং রঞ্জন তখনই আমাকে ডেকে পাঠাল।

এদিকে ব্যাগের মালিক ব্যাগটা ফেরত পেয়ে তার ভেতর সেই বিশেষ জিনিসটি দেখতে না পেয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিছু টাকা দেওয়ার ছলে রঞ্জনকে নিজের আয়ত্তে আনতে চাইলেন।

আমার নিজের ওপর রাগ হল। আমি যদি আর একদিন আগে কলকাতায় আসতে পারতাম, তাহলে রঞ্জনকে জীবিত অবস্থায় পেতাম। পেতাম সেই অমূল্য বস্তুটি।

রঞ্জন পুলিশের কাছে যায়নি। পৃথিবীর কারোর কাছে যায়নি। অতএব আমি বুঝতে পারছি, সে কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সে-বস্তুটির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার ধারণা হল।

আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম যে, সেটা যাই হোক, সমস্তরকম চেষ্টা করেও শত্রু সেটা হাতাতে পারেনি।

আর আমার ওপর কেন আক্রমণ হচ্ছে, তাও বুঝতে পারলাম। শত্রু এমন একজন লোক, যে জানে আমি রঞ্জনের বন্ধু এবং তার খুনিকে ধরতেই কলকাতা এসেছি।

রঞ্জন নিশ্চয় জানত যে, ওই বস্তুটির জন্যে তার জীবন বিপদাপন্ন। কাজেই সে নিশ্চয় সেটা কোথাও রেখে গেছে। এমন জায়গায় রেখে গেছে, সে মরে গেলেও যাতে জিনিসটা সহজেই আমার হাতে আসে।

রঞ্জনের বিশ্বাস ছিল আমার ওপর—আমার বুদ্ধির ওপর। ও জানত, আমি সেটা খুঁজে পাবই।

ভদ্রলোকের দেওয়া চিরকুটটা হাতে নিয়ে থমকে গেলাম। আমার সমস্ত শরীর রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

প্রথম আততায়ীর পকেটে এই ঠিকানাটা পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে এক নাম ছিল; এখানে অন্য নাম।

এই লোকটা ব্যাগের মালিক। এরই নির্দেশে রঞ্জন নিহত হয়েছে। এরই নির্দেশে আমাকে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে।

রঞ্জন কেন ব্যাগটা জমা দিয়েছিল, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ভদ্রলোকের ব্যাগ বলেই সে ব্যাগটা জমা দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাগ থেকে সেই বস্তুটি বেরিয়ে এসেছিল কোনওরকমে। সেটা জমা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি। পরে নিশ্চয় কৌতূহলের বশে সেটা পরীক্ষা করে তার গুরত্ব বুঝতে পারে, এবং আমায় ডেকে পাঠায়।

কিন্তু সেই বিশেষ জিনিসটা এখনও শত্রুর হাতে পড়েনি।

॥ ১৪ ॥

আমি কিন্তু সত্যিই বোকা। সেই জিনিসটা আমার চোখের সামনেই ছিল, আমি দেখতে পাইনি। রঞ্জন সেটা আমার জন্যে ঠিক জায়গায় রেখে গেছিল।

সুজাতার বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি বেশ ভিড়। ঝি-চাকররা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে আর সুজাতা তাদের বকাঝকা করছে।

জানতে পারলাম, বাড়িতে চোর এসেছিল। জিনিসপত্র সব তছনছ করে গেছে। কিন্তু কিছুই চুরি যায়নি।

আমি দ্রুত বসার ঘরে এসে বইয়ের আলমারিটা খুললাম। মোটা বইটা বার করে দেখলাম। আমার ধারণা মতো ছোট্ট টেপরেকর্ডারটা সেখানে নেই। শোওয়ার ঘরে গেলাম। সেখানে দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে।

Pattern ! সেই একই অদৃশ্য হাতের ছাপ ঘরময় ছড়ানো। সুজাতার ঘরেও সেই তল্লাশি। আমি থমকে গেলাম। তল্লাশি মাঝপথে থেমে গেছে।

ওরা ওটা পেয়েছে। ওরা জানত জিনিসটা এখানে আছে। আমি আন্দাজ করতে পারিনি। ওরা আমার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছে।

ওরা ওই টেপরেকর্ডার দিয়ে আমাদের কথাবার্তা টেপ করেছে। সেই কথাবার্তার ভেতর ওরা যা খুঁজে পেয়েছিল, তা আমরা উচ্চারণ করেছি অথচ বুঝতে পারিনি জিনিসটার সন্ধান আমরাই ওদের দিয়ে দিচ্ছি। ওরা সম্ভবত অনেকদিন ধরেই ওখানে টেপ-যন্ত্রটা বসিয়ে রেখেছিল।

আমি দ্রুত পকেট থেকে রঞ্জনের চিঠিটা বার করে আবার পড়তে লাগলাম ঃ

হিমু,

তোর নিষেধ সত্ত্বেও আজ এই চিঠি দিতে হচ্ছে। তুই অতি অবিশ্যি একবার অন্তত কলকাতায় আসিস। খুব জরুরি দরকার। নতুবা আমি বিপদে পড়ব।

ইতি—তোর রঞ্জন

পুনঃ আমি সুজাতার বাড়ি তোর জন্যে অপেক্ষা করব। ওখানেই আমাকে পাবি।

রঞ্জন সুজাতার বাড়ি থাকত না। অতএব 'ওখানেই আমাকে পাবি' কথাটার ভেতর সব কিছু বলা হয়ে গেছে।

তখন কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি।

ঘরের চারদিকে তাকালাম। কোথায় ছিল সেটা? সত্যিই কি সেটা ওরা পেয়েছে?

আমি রঞ্জনের দেওয়া উপহারগুলোর কথা ভাবলাম। মাছের অ্যাকুইরিয়ামটা উবুড় করে সব জল আর মাছ ফেলে দিলাম বাথরুমে। মাটিতে উবুড় করে ঢাললাম সব বালি। তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কিছুই পেলাম না।

এবার দেওয়াল থেকে নামালাম অয়েলপেইনটিংটা। ফ্রেম খুলে ক্যানভাসটা বার করলাম। উলটোপিঠে খুব ছোট-ছোট করে লেখা আছে ঃ 'মাইক্রোফিল্ম ক্যাপসুল—গয়নার বাক্স'।

আমি গয়নার বাক্সটা রুমাল দিয়ে ধরলাম। সমস্ত গয়না আলমারির ভেতরেই পড়ে আছে। বাক্সটা শূন্য।

আমি রাগে দুঃখে বাক্সটা ছুড়ে ফেলে দিলাম।

কিন্তু এ কী! একটা অদ্ভুত শব্দ হল। খালি বাক্সের এরকম শব্দ হবে কেন? বাক্সটা আবার তুলে নিলাম আমি। বেশ ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলাম।

সামান্য চেষ্টার পর দেখতে পেলাম, নীচে একটা সিক্রেট চেম্বার আছে। সেটা খুলতে দেখি, ভেতরে পাতলা একটুখানি জায়গা। সিক্রেট চেম্বার।

কিন্তু সেটাও শূন্য!

ওরা সেটা পেয়েছে। সেই ক্যাপসুল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে চেম্বারটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। কাঠের গায়ে পেরেক বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে কুঁদে-কুঁদে লেখা আছে 'কর্নেল এ. বি.।'

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল কাবুলের সেই ভয়ঙ্কর শীতের রাত।

সেই নির্জন অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম ঘরটার ভিতরে। টেবিলের চারদিকে দাঁড়িয়েছিল অনেকগুলো লোক। আর টেবিলের মাথায় যে লম্বা-চওড়া লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, সকলে তাকে কর্নেল বলে সম্বোধন করছিল।

খান আবদুল গফুর কাবুল সফরে গেছিলেন। তাঁকে উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছিল ওরা। সেদিন আমার জন্যেই ওরা তা পারেনি।

তাহলে সেই মহাপুরুষ এখন ভারতবর্ষে। তারই নেতৃত্বে এই গুপ্তচরচক্র কাজ করছে।

এই গয়নার বাক্সে যা ছিল, সেটা ওরা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু ওরা জানত না যে,

রঞ্জন বহুদিন অপরাধের জগতে ঘুরে ছিল। রঞ্জনের একটা trained mind ছিল। একমাত্র ক্যাপসুলটা ছাড়া আর সবকিছুই আমার জানা হয়ে গেছে।

সেই ক্যাপসুলে কী ছিল, সেটা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না।

রুমাল দিয়ে ধরে বাক্সটা আমি বিকাশের কাছে নিয়ে এলাম। বিকাশ হাজার-হাজার প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে।

আমি তার কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, এই বাক্সতে সুজাতার হাতের ছাপ ছাড়া আর একজনের হাতের ছাপ পাওয়া যাবে।

কার হাতের ছাপ?

সেটা পরে বলব। পুলিশ ল্যাব থেকে ছাপটা তৈরি কর। এবং এর জন্যেই তোর প্রমোশন হয়ে যাবে।

ব্যাপার কী, হিমু? কীসব ঘটে যাচ্ছে?

অনেক কিছু। সব বলব সময় হলে। আমি খুনির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছি।

তার মানে গুপ্তচরদের সন্ধান পেয়েছিস?

না। রঞ্জনকে খুন করেছে একজন সাধারণ গুণ্ডা।

সাধারণ গুণ্ডা! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাকে খুলে বল, হিমু।

বলব, সময় হলে।

আর কথা না বাড়িয়ে আমি দ্রুত বেরিয়ে এলাম। আজ রাতেই কাজ শেষ করে কলকাতা ছেড়ে চলে যাব। সঙ্গে নিয়ে যাব সুজাতাকে।

সুজাতার ঝি আমাকে দেখে চমকে উঠল ঃ এ কী জামাইবাবু, আপনি এখানে?

কেন, আশ্চর্য হচ্ছ কেন?

এইমাত্র এক ভদ্রলোক এসে বললেন যে, আপনি গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। দিদিমণি তাঁর সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

ওরা কৌশল পালটেছে। ওরা আসলে আমাকে চায়। প্রশ্ন করলাম, ভদ্রলোক দেখতে কেমন?

বেশ লম্বা-চওড়া। চোখে কালো চশমা।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। সন্ধে হয়ে গেছে। আমাকে প্রস্তুত হতে হবে।

আমি চলে এলাম হোটেলে। সুটকেসটা গুছিয়ে নিলাম।

বাথরুমে ঢুকলাম স্নান করবার জন্যে। ঝরনার নীচে দাঁড়িয়ে কল খুলে দিলাম। আমার সমস্ত স্নায়ু উত্তেজিত। অনেকক্ষণ জলের নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম।

স্নান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গা মুছতে-মুছতে লেখাটা দেখতে পেলাম। দেওয়ালে আটকানো 'বাথরুম মিরর'-এর পাশে সাদা দেওয়ালে পেনসিল দিয়ে লেখা ২২ নং নুর আলি লেন। প্রথম ঘরটা।

এ ভাষা আমি বুঝি। এর একটাই অর্থ হয়।

আমি নীচের লবিতে এসে ফোন করলাম কমলকে। তারপর সুটকেসটা নিয়ে, হোটেলের বিল চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম। পায়ে হেঁটে চলে এলাম কমলের বাড়ি।

কমল বলল, গাড়ি প্রস্তুত। কিন্তু গাড়ি কী হবে?

যথেষ্ট তেল আছে তো?

আছে। ব্যাপার কী?

ওরা সুজাতাকে ধরে নিয়ে গেছে।

ওরা কারা?

একদল গুপ্তচর। যারা রঞ্জনকে মেরেছে।

তাহলে তো পুলিশকে খবর দেওয়া দরকার।

আমি হাসলাম, In this kind of game you don't go to the police. ওরা শুধু সুজাতাকে নিয়ে গেছে আমাকে ধরার জন্যে।

কিন্তু তবু...।

They will kill her, কমল।

॥ ১৫ ॥

আমি মৌলালি থেকে একটা হুইস্কির বোতল নিলাম। গাড়িতে বসেই খানিকটা পান করলাম।

তারপর এলাম এন্টালি পেরিয়ে বেনেপুকুর থানা এলাকায় নূর আলি লেনে। এসব পথঘাট আমার খুব পরিচিত।

ছোট সুন্দর দোতলা বাড়ি। কিন্তু সব ঘরই অন্ধকার। মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই। কিন্তু আমি জানি, এই অন্ধকারে আমার জন্যে মৃত্যু অপেক্ষা করছে। জীবনে বহুবার আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু আজ আমি অসহায়। কোনওরকম চালাকি করলে ওরা সুজাতাকে খুন করবে। আমি কিছুতেই তা হতে দিতে পারি না।

যে মেয়েটা আমার জন্যে বারো বছর অপেক্ষা করে আছে, আমি আজ ফিরে এসে কিছুতেই তার মৃত্যুর কারণ হতে পারি না।

আমি অন্ধকারে পা টিপে-টিপে ওপরে এলাম। লম্বা বারান্দা। বাঁ-দিকে সারি-সারি তিনটে ঘর।

আমি পকেট থেকে পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা বার করলাম। বার করলাম ছোট্ট এক গোলা কালো সুতো। সিঁড়ির রেলিংটা যেখানে বাঁক নিয়ে ছাদে চলে গেছে, সেই বাঁকে টর্চটা রাখলাম। কালো সুতোর একটা প্রান্ত বাঁধলাম টর্চটার সঙ্গে। গোলাটা খুললাম। আন্দাজ মতো খানিকটা সুতো খুলে সুতোটা ছিন্ন করে সেই প্রান্তটা বাঁধলাম আমার বাঁ-পায়ের গোড়ালির ওপরে, পায়ে। প্যান্ট দিয়ে ঢাকা।

সুতোটা চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। কেন না, আততায়ী আমার চোখের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। প্রফেশনাল খুনি হলে তাই করা উচিত।

আমাকে এমনিতেই মরতে হবে। একটা সুযোগ নেব না কেন? সুতোর একটা প্রান্ত টর্চে বাঁধা আছে, আর একটা প্রান্ত আমার পায়ে।

আমি পা টিপে-টিপে প্রথম ঘরটাতে ঢুকলাম, আর সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলাম বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি, হিমু। হাত দুটো ওপরে তোলো।

আমি হাত দুটো ওপরে তুলতেই বাতি জ্বলে উঠল।

রাস্তার দিকে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চা। মুখে তার সেই কদর্য হাসি। হাতে একটা পিস্তল।

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। ঘরটা বেশ দামি-দামি আসবাবপত্রে সাজানো। সুদৃশ্য আলমারি, ড্রেসিং টেবিল। মেঝেতে পুরু লাল কার্পেট।

আমি বললাম, আমি আত্মসমর্পণ করতে এসেছি। সুজাতা কোথায়?

পঞ্চা হাসতে-হাসতে বলল, জানতাম, তুমি আমাদের ভাষা বুঝবে, তাই সুজাতাকে আমিই নিয়ে এসেছি।

কিন্তু কেন? তুমি না সেন্ট্রালের সম্রাট? তোমার পেশা চুরি—ডাকাতি—বেবি ফুড ব্ল্যাক করা। এ-খেলা তো তোমার নয়!

তোমাকে চাই, হিমাদ্রি। কলকাতার কেউ তোমাকে জীবিত দেখতে চায় না। আমরা কলকাতার সম্রাটরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—।

প্রীতম সিং-এর ওখানে বসে?

হ্যাঁ। ভোট হয়েছিল। প্রত্যেকে তোমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে একজন ছাড়া—।

সেই একজন কে? রোজারিও?

হ্যাঁ। তুমি সবই জানো দেখছি।

হ্যাঁ, আমি সবই জানি। তুমি কিন্তু একটা জিনিস জানো না পঞ্চা, কলকাতার উঠতি 'মাফিয়া'রা তোমায় চায় না।

তাতে কিছু আসে যায় না। আমি জানি কী করে বিদ্রোহ দমন করতে হয়।

তোমরা নতুন রাজা কলকাতার। তোমরা ভাব, তোমরা সব জানো। কিন্তু তোমরা বোকা। কলকাতার মাফিয়ারা নতুন করে দল তৈরি করতে চাইছে।

চাইলেই তো হবে না, বন্ধু। এতগুলো রাজাকে সরাবে কী করে?

কিন্তু তুমি জানো না, তুমি কী সাঙঘাতিক খেলায় মেতেছ। তুমি ধরা পড়লে, স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তুমি যেসব মিনিস্টারদের ছায়ায় আছ, তাদের সাধ্যি নেই—।

চুপ করো! তোমায় বক্তৃতা করতে ডাকা হয়নি। আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে হিসাব চুকিয়ে দেব। সুজাতাকে ধরে আমার জন্যে পাঁচ হাজার, আর তোমাকে খুন করার জন্যে দশ হাজার। এক ঢিলে তিন পাখি।

আমি জানি, পঞ্চার পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে। ও খুন করতে দ্বিধা করবে না।

বললাম, তোমার 'বস'রা সব গেল কোথায়?

তুমি তো মরবে এখুনি, এসব জেনে কী হবে?

আমি যখন মরবই, তখন আর বলতে আপত্তি কী?

ওরা সব হাসনাবাদের দিকে রওনা হয়ে গেছে। কালীকে চেনো?

চিনি।

কালী তোমাকে—তোমার মতো তিনটে হিমাদ্রিকে গিলে খেতে পারে।

ওরা হাসনাবাদে গেছে কেন? ওরা কি বর্ডার ক্রস করে ওপারে যাবে?

ঠিক ধরেছ। তোমার বুদ্ধি আছে। কাল সকালে ওরা বাংলাদেশের মুক্তিফৌজকে রসদ পৌঁছে দেওয়ার অজুহাতে ওপারে চলে যাবে। এবং সেখান থেকে—।

পশ্চিম পাকিস্তান।

সবই জানো দেখছি।

আমি কথা বলতে-বলতে এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে দূরে সরে যাচ্ছিলাম, যাতে টর্চে বাঁধা সুতোটা টান-টান হয়ে থাকে।

বললাম, আর ওদের সঙ্গে চলে যাবে সেই মাইক্রোফিল্ম-এর ক্যাপসুলটা। তাই না? কী আছে ওতে?

সে কী, এই সামান্য খবরটা রাখো না? পঞ্চার কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

জানি, শুধু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইছি।

মিলিটারির টপ সিক্রেট। অর্থাৎ—।

অর্থাৎ তোমাদের 'কোড' বলছে অপারেশন টপ সিক্রেট, তাই না?

ওটা কোড নয়, কোডের তর্জমা। কোড বলছে, অপারেশন ব্ল্যাঙ্ক।

ব্ল্যাঙ্ক?

হ্যাঁ। ওটাই কোড—অর্থাৎ, তোমাদের ভারত সরকারকে বোকা বানানো। আমাদের ভিতরেও তোমাদের গুপ্তচর আছে। তারা যদি খবরটা পাচার করে, তবুও তোমরা আসল অর্থ ধরতে পারবে না। অপারেশন ব্ল্যাঙ্ক কথার কোনও অর্থ হয় না।

আমি মনে-মনে ওদের এ-পরিকল্পনার প্রশংসা না করে পারলাম না। বললাম, যদি বাংলাদেশ নিয়ে পাকিস্তানেব সঙ্গে যুদ্ধ হয়, তাহলে পাকিস্তানের বেশি সুবিধা হবে, এই টপ সিক্রেটগুলো জানা থাকলে। তাই না?

স্বাভাবিক।

তাতে তোমার লাভ?

আমি টাকা পেলাম। মোটা টাকা।

কিন্তু তুমি কি মনে করেছ, ওরা যখন বোমা ফেলবে, তখন তোমার বাড়িটা বাঁচিয়ে বোমা ফেলবে? না, এ-দেশ ওদের পদানত হলে, ওরা তোমাকে 'উজির-এ-আজম' করবে? 'গদ্দার'-কে ওরা ছাড়বে না, পঞ্চা। তুমি বিশ্বাসঘাতক...তুমি দেশদ্রোহী...তুমি...।

পঞ্চা সশব্দে হাসতে লাগল। প্রচণ্ড সে-হাসির বেগ। প্রচণ্ড শব্দ।

আমি লক্ষ করলাম, ওর সমস্ত শরীর হাসির চোটে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। ফলে ওর পিস্তলের নলটা সামান্য একটু দিক পরিবর্তন করেছে। আমি এরই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

আমি সুযোগ বুঝে শরীরের ওপরের অংশ একটুও না নড়িয়ে, শুধু বাঁ-পাটা ঝাঁকানি দিলাম। টর্চের সঙ্গে বাঁধা সুতোটা টান-টান হয়েছিল। সুতোতে টান পড়ল, আর তীব্র আওয়াজ পেলাম দরজার ওপারে বারান্দায়—টর্চটা পড়ার।

সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চা হাসি থামিয়ে দরজার দিকে তাকাল।

ব্যস। আমি এইটুকুই চাইছিলাম। শব্দটা শুনে যে-মুহূর্তে পঞ্চা দরজার দিকে তাকাল সেই মুহূর্তে আমি দ্রুত মাটিতে পড়ে কার্পেটটা ধরে প্রচণ্ড এক টান দিলাম।

পঞ্চা প্রস্তুত ছিল না। সে চিত হয়ে পড়ল মাটিতে।

আমি লাফিয়ে পড়লাম ওর ওপর। পিস্তলটা কেড়ে ছুড়ে দিলাম। সেটা গড়িয়ে চলে গেল ড্রেসিং টেবিলটার নীচে।

থুতনির নীচে জুতোর ডগা দিয়ে একটা আঘাত। ধনুকের মতো বেঁকে গেল পিছনদিকে পঞ্চা। সঙ্গে-সঙ্গে ওর পাঁজরে গোটাকয়েক লাথি জুতোর ডগা দিয়ে। পঞ্চা ছটফট করতে লাগল।

আমি প্রচণ্ড রাগে তখন কাঁপছি। আমার ভেতর তখন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। ওকে সুযোগ দিলাম উঠে দাঁড়াতে।

পঞ্চা আত্মরক্ষার জন্যে উঠে পালাতে গেল। ওর ছুটন্ত শরীর লক্ষ করে একটা সাঙঘাতিক ঘুষি চালালাম। ঘুষিটা লাগল ওর বাঁ-দিকের কানের নীচে।

পঞ্চা পাক খেয়ে পড়ল। আবার উঠল। এবার পেটে, বুকে, নাকে কয়েকটা পাঞ্চ পরপর।

পঞ্চা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। বুঝতে পারলাম, পঞ্চা চোখে অন্ধকার দেখছে। আমি ওকে আর কষ্ট না দিয়ে ওর কণ্ঠার ওপর একটা 'কারাটে' চপ দিলাম। পঞ্চা হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ল। আর নড়ল না।

আমি বাথরুমে একখণ্ড দড়ি পেলাম। সেটা দিয়ে ওর হাত-পা বাঁধলাম।

Writing pad টেনে নিয়ে লিখলাম ঃ

বিকাশ,

পঞ্চাকে রেখে গেলাম। ওর ‘কলার বোন’ ভেঙে গেছে। পঞ্চা জড়িয়ে পড়েছে এই গুপ্তচরদের সঙ্গে।

আমি যাচ্ছি হাসনাবাদ। গোটা দলটা ওখানে আছে। এতবড় একটা দলের সঙ্গে একা লড়াই করা সম্ভব নয়। তোর সাহায্য দরকার। কিন্তু আমি আগে রওনা হব।

—হিমু

টেলিফোনটা তুলে নিলাম।

বিকাশ অফিসেই ছিল। চিৎকার করে উঠল, হিমু, তুই কোথায়?

একটা পাবলিক ফোন থেকে ফোন করছি। কেন?

তোর সেই finger print তৈরি।

তার আর দরকার নেই। আমি জানি, ওটা কার হাতের ছাপ। তার বদলে একটা কাজ কর— পুলক সেন আগে মন্ত্রী ছিলেন, নিশ্চয় তার নামে একটা file আছে S. B.-তে। অমি ওর ‘ব্যাকগ্রাউন্ড’ চাই। যা কিছু পাওয়া যায় সব।

কিন্তু পুলক সেন তো...।

Please, বিকাশ, এখন সময় নেই।

O. K. বিকাশ মনে হয় ফোনটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। মিনিট তিনেক পর আবার আমার লাইনে এল, হিমু...।

Yes.

S. B. কিছুই জানাতে চায় না। নিয়মবিরুদ্ধ ওটা। তবে আমাদের ফাইলে যা আছে, তা হল এই ঃ পুলক সেন ছিলেন পুলিশ মন্ত্রী। A very controversial character. তুই যেদিন কলকাতায় পা দিয়েছিস, সেইদিন থেকেই সে অদৃশ্য।

আমার ঠোঁটের কোণায় হাসি দেখা দিল। আমার ধারণাটাই ঠিক তাহলে। বললাম, এই কাহিনির অন্যতম নায়ক পঞ্চাকে পাবি ২২ নং নূর আলি লেনের ওপরের ঘরে।

লাইন কেটে দিলাম। এক সেকেন্ড পরে আবার ডায়াল করলাম। সেই গোপন স্থান থেকে উত্তর আসতে আমি পুলক সেনের নামটা বললাম। উত্তরে যা শুনলাম, তাতে আমি বেশ সন্তুষ্ট হলাম।

গোটা ব্যাপারটা এবার আমার কাছে জলের মতো পরিস্কার হয়ে গেল। প্রত্যেককে এবার চিনতে পারলাম আমি।

গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। আমি জানি ওরা আজ রাতে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে। সে-বাড়িতে আমি অনেকব্যার গেছি। থেকেছি।

একটার পর একটা সিগারেট টানছি আর মাঝে-মাঝে বোতলটা বার করে চুমুক দিচ্ছি। স্টিয়ারিং ধরেছি এক হাতে, আর বোতল আর-এক হাতে।

আমার জীবনের অলিন্দে-অলিন্দে অনেক পাপ জমা হয়ে আছে। হয়তো এই রাত শেষ রাত আমার জীবনে।

মায়ের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল দিদি-জামাইবাবুর কথা। সুজাতার কথা। এই সমাজের কথা। হয়তো সকলের প্রতি আমি অবিচার করেছি। এদের সকলের কাছে আমি অপরাধী হয়তো।

আমি শুধু কলকাতায় ফিরে এসেছি। কিন্তু শুধু কলকাতায় ফিরলে হবে না। আমি এই সমাজে ফিরব।

আমার প্রাণ থাকতে আমি কর্নেলকে জীবিত অবস্থায় ভারত থেকে বেরিয়ে যেতে দেব না। যারা রঞ্জনকে মেরেছে, সুজাতাকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের আমি ক্ষমা করব না। তাতে যদি আমায় মরতে হয় মরব।

॥ ১৬ ॥

অবশেষে এসে পৌঁছলাম। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে, একাই ঠেলে-ঠেলে এনে রাখলাম দোতলা বাড়িটার কাছে।

ওপরের একটা ঘর ছাড়া আর কোথাও বাতি জ্বলছে না। বাড়ির পিছনদিকে আছে বিঘে তিনেক জমির ওপর একটা প্রকাণ্ড বাগান। প্রধানত আম ও লিচুর গাছ।

আমি আগে আমবাগানে এসে চারদিকে ঘুরে পরীক্ষা করলাম। সেখানে কেউ নেই।

সকলেই বোধহয় ওপরের ঘরে বসে মিটিং করছে।

ওপরের প্রত্যেকটি কক্ষ আমি চিনি। বদ্রির হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে আমি এখানেই পালিয়ে এসেছিলাম। আমার অজ্ঞাতবাসের অনেকটাই এখানে কেটেছিল।

বাড়ির পিছনদিকে ছাদের জল নিকাশের পাইপ ছিল। সেই পাইপ বেয়ে ওপরে উঠলাম।

খোলা জানলা দিয়ে প্রথমে যেখানে ঢুকলাম, সেটা রান্নাঘর। সেখান থেকে পা টিপে-টিপে এলাম পাশের খাওয়ার ঘরে। খাওয়ার ঘর থেকে যেখানে এসে পৌঁছলাম, সেটা শোওয়ার ঘর। এই শোওয়ার ঘরটা পার হলেই প্রকাণ্ড একটা 'হল' কামরা। সেখানে বাতি জ্বলছে। ওরা সেখানেই বসে আছে।

শোওয়ার ঘর আর হল-কামরার মধ্যের দরজায় একটা ভারী পরদা। পরদা সরালেই ওদের দেখা যাবে। সেই আলো এসে পড়েছে এই ঘরের পরদার উলটোদিকে।

সামান্য একটু সরালাম পরদাটা। লম্বা একটা টেবিল। সেই টেবিলের মাথায় বসেছে কর্নেল। আমি তার ডানদিকটা দেখতে পাচ্ছি। কর্নেলের সামনে টেবিলের ওপর একটা পিস্তল।

কর্নেলের বাঁ-দিকে আমার দিকে মুখ করে বসে আছে সুজাতা এবং মলয়া। আর কর্নেলের ডানদিকে, আমার দিকে পেছন ফিরে বসেছেন এই বাড়ির মালিক অবিনাশদা।

কর্নেল গম্ভীর কণ্ঠে বলছে ঃ The job is done. কিন্তু হঠাৎ হিমাদ্রি কলকাতায় এসে পড়ায় আমাদের 'সারভে সেকশানের' ভয়ানক ক্ষতি হয়ে গেল। এর জন্যে আমাকে ওপরওয়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

মলয়া বলল, কী ধরনের ক্ষতির কথা বলছেন?

কর্নেল জানলা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, সেদিন আপনার ঘরে আমাদের যে লোকটা মারা গেছে, তার পরিচয় জানেন? সে ছিল সারভে সেকশানের যশোর শাখার বড়কর্তা মেজর এ. এম. হাবিবউল্লা।

আমি চমকে উঠলাম। হাবিবউল্লার নাম শুনেছিলাম। হাবিবউল্লা ছিল ঢাকার 'টু হানড্রেড সারভে সেকশানে'র একজন প্রথম শ্রেণির 'ইনটেলিজেন্ট অফিসার'। পরে তাকে যশোর শাখার বড়কর্তা করে পাঠানো হয়।

অবিনাশদা বললেন, হিমাদ্রির জন্যেই এই ক্ষতি হল।

কর্নেল বলল, ওই ধরনের একজন অফিসার রাতারাতি তৈরি করা যায় না। অনেক পরিশ্রম, অনেক অর্থ ব্যয় করলে তবে একজন অফিসার তৈরি হয়। He was one of the best.

সকলে চুপ করে কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কর্নেল আবার বলল, আমি কালই টু হানড্রেড সারভে সেকশানের হেড অফিস ঢাকায় যাব। সেখানে নতুন কর্তা হয়েছেন ব্রিগেডিয়ার সামসের। তাঁকে কিছু-কিছু তথ্য সরবরাহ করে পরের দিন ক্যাপসুলটা নিয়ে যাব পশ্চিমে। মিস দে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। ওঁর আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। কিন্তু কতকগুলো কাজ বাকি আছে, সেগুলো আপনাকে করতে হবে, অবিনাশবাবু।

অবিনাশদা প্রশ্ন করলেন, কী কাজ?

শিলিগুড়ি এবং বারাকপুরে 'ফিল্ড ইনটেলিজেন্স' বিভাগের দুজন লোক আছে। একজনের নাম কিরণ চৌধুরী ওরফে শেখ নিজামউদ্দিন—তাকে পাবেন শিলিগুড়িতে, আর-একজন—যার নাম কে. এ. নাইমুজুমান, তাকে পাবেন বারাকপুরে। এরা দুজনেই আপনাদের সাহায্য করবে।

কিন্তু তাদের তো চিনি না।

এই নিন তাদের ছবি। এবার থেকে এদের মারফত সব কাজ হবে। একটা কথা বলে রাখি, হিমাদ্রিকে পঞ্চা শেষ করলেও বিপদ কেটে যাবে না। বিদ্যুৎ রায়কে কিছুতেই আন্ডারএস্টিমেট করবেন না।

অবিনাশদা বললেন, অতএব আমাদের সামনে এখন দুটো কাজ। একটা হল বিদুৎ রায়কে উড়িয়ে দেওয়া, আরেকটা হল পঞ্চাকে শেষ করা।

রাইট। পঞ্চাকে আগে শেষ করবেন, কেন না পঞ্চা পরে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে। কোনও সাক্ষী না রাখাই ভালো। আর-একজন আছে—তাকেও শেষ না করলে আপনি নিরাপদ হবেন না।

কে সেটা?

পুলক সেন।

হ্যাঁ, আমি জানি। পুলক আমার বিষয়ে অনেক কিছুই জেনেছে এবং সে-ই আমার প্রধান শত্রু।

মলয়া সুজাতাকে দেখিয়ে বলল, আর এই অহল্যাকে নিয়ে কী করবেন?

কর্নেল প্রশ্ন করল, এর নাম অহল্যা নাকি?

খিলখিল করে হেসে উঠল মলয়া ঃ না, এর নাম সুজাতা। আঠাশ বছরের খাঁটি কুমারী, বারো বছর অপেক্ষা করে আছে হিমাদ্রির জন্যে।

সুজাতা লজ্জায় অপমানে রাঙা হয়ে বলল, ভদ্রভাবে কথা বলুন।

এবার অবিনাশদা বললেন, আমাদের উচিত মেয়েটাকে এখানে রাখা। একে আমি একটু ভদ্রতা শেখাব।

কর্নেল বলল, না, তার দরকার নেই। আমি একে নীচের বাগানে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, অবিনাশবাবু, আপনার শোওয়ার ঘরের আয়রন সেফে আমার সরকারের দেওয়া তিন লাখ টাকা আছে। ওটা আপনার।

মলয়া বলল, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আজ রাতেই বর্ডার টপকালে হয় না? কেন না, হিমাদ্রি বড় সাংঘাতিক! আমি জীবনে ওর মতো পুরুষ দেখিনি, কর্নেল। ওকে যদি পঞ্চা না মারতে পারে, তাহলে ও এখানেও এসে পৌঁছবে।

কর্নেল হাসল শব্দ করে। বলল, ও জানবে কী করে যে আমরা এখানে আছি?

হিমাদ্রিকে আপনারা চেনেন না। He is not an ordinary hoodlum, He is...

সুজাতা উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। চোখের ইশারায় ওকে মাথা নীচু করতে বললাম।

কিন্তু কর্নেল অতি ধূর্ত। সুজাতার এই সামান্য মুভমেন্টও ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। আমি 'বডি থ্রো' করার আগেই কর্নেল বিদ্যুৎবেগে মাটিতে পড়ে ফায়ার করতে-করতে

লাথি মেরে টেবিলটা উলটে দিল।

আমি লাফিয়ে হলের মধ্যে পড়লাম। কর্নেলের দিকে নজর দেওয়ার আগেই দেখি অবিনাশদা কোমর থেকে পিস্তল বার করছে।

আমি কালক্ষেপ না করে দুটো বুলেট গেঁথে দিলাম ওর বুকে।

মুখ ফিরিয়ে দেখি, কর্নেল ততক্ষণে গড়িয়ে-গড়িয়ে বাগানের দিকে খোলা জানলার কাছে পৌঁছে গেছে।

আমার ফায়ার আর কর্নেলের জানলা টপকে নীচের বাগানে লাফ দেওয়াটা একইসঙ্গে ঘটল। আমি সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললাম, দৈহিক শক্তিতে এই মেয়েটা তোমার চেয়ে বেশি নয়। এই মেয়েটাকে যেতে দিয়ো না। বলে মলয়াকে দেখিয়ে দিলাম।

আমিও জানলা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ে মুহূর্ত কয়েক উবুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। অন্ধকার চোখে সয়ে গেল। কিন্তু কর্নেল সেখানে নেই।

এটা বাড়ির পিছনের দিক। হঠাৎ সামনের দিকে চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। সঙ্গে হেডলাইটের আলো।

বুঝলাম পুলিশ এসে গেছে। আমি দৌড়ে আমবাগানে ঢুকলাম। যতদূর সম্ভব জোরে ছুটতে লাগলাম।

সামনে কারও ছুটে যাওয়ার শব্দ পেলাম। এর আগে প্রতিবারই কর্নেল পালাতে সক্ষম হয়েছে। এবার আর আমি তাকে ছাড়ব না।

কর্নেলের ছোটার ধরনে মনে হল সে আহত।

ছুটতে-ছুটতে বাগান শেষ হয়ে গেল। এবার আমি সাবধান হলাম। সামনে খোলা মাঠ। কোনও আড়াল নেই। আমি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। আমাকে গুলি করলে আমি আত্মরক্ষা করতে পারব না।

খোলা মাঠে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। এবার দেখতে পেলাম কর্নেলের ছায়ামূর্তি আকাশের গায়ে। আবছা রেখাচিত্র।

নিশানা ঠিক করে একটা গুলি ছুড়লাম। কর্নেল পড়ে গেল।

আমি বুক টেনে-টেনে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। নীচু হয়ে আলো ফেললাম ওর ওপর। গুলি লেগেছে পিঠে ও কোমরে।

কর্নেলের হাতে পিস্তল নেই। আমি দাঁতে-দাঁত চেপে বললাম, I got you.

কর্নেল কাতরাচ্ছে। সেই একইভাবে দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, You son of a...

টর্চের আলোটা নিজের মুখে ফেললাম, পিস্তলের নলটা ওর কপালে ঠেকিয়ে বললাম, দেখতে পাচ্ছ আমার হাসি? আজ আমার হাসবার পালা। মনে পড়ে হংকং-এর সেই হোটেল? যেখানে তোমার লোকেরা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল? আমার ডান উরুতে সেই কাটা দাগটা এখনও আছে।

কর্নেল যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে বলল, প্লিজ, হিমু, আমায় খুন করো।

বেশ, তাহলে সেই ক্যাপসুলটা দাও।

নেই, সেটা নেই...।

আমি পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলাম ওর মাথায়। ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

আমি ওকে তল্লাশি করে ওর একটা জুতোর ফাঁপা হিলের মধ্যে সেটা পেলাম। সেটা পকেটে রেখে বললাম, এবার বলো, রঞ্জনকে কে খুন করেছে?

হাঁপাতে-হাঁপাতে কর্নেল বলল, আমি...আমি মেরেছি...।

হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

পুলিশের সার্চ লাইট।

বিকাশ তার বাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশে সুজাতা এবং মলয়া।

আমি পিস্তলটা আবার কর্নেলের কপালের ডানদিকে ধরতেই বিকাশ চিৎকার করে উঠল, Stop! Don't kill him.

আমি ট্রিগারে চাপ দিলাম। কর্নেলের দেহটা একবার মাত্র কেঁপে উঠল।

বিকাশ চিৎকার করে এগিয়ে এল, এবং আমি সাবধান হওয়ার আগেই আমার পিঠে প্রচণ্ড এক লাথি মারল ঃ আমি নিষেধ করলাম না ওকে খুন করতে?

সুজাতা আর্তচিৎকার করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার ওপর।

আমি ফিসফিস করে বললাম, গাড়িটা স্টার্ট দাও।

সুজাতা উঠে দাঁড়াল। আমিও উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, আবার একটা ঘুসি এসে পড়ল আমার চোয়ালে। আমি কোনওরকমে টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

গাড়ি স্টার্ট হওয়ার শব্দ হল। বিকাশ চমকে সেদিকে তাকাতেই আমি এক লাফে ওর ওপর পড়লাম। ওর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলাম।

সিপাইরা কিছু বোঝার আগেই আমি ছুটলাম।

গাড়ির দরজাটা খোলাই ছিল। সুজাতা সরে বসল হুইলের পেছন থেকে। আমি স্টিয়ারিংয়ের পেছনে বসে গাড়ি ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু দেখতে পেলাম ওরাও আমার পেছনে তাড়া করছে।

আমি জানি, ওরা এতক্ষণে ওয়ারলেসে খবর পাঠাচ্ছে আমাকে সামনে থেকে ঘিরে ধরার জন্যে।

আমিও ক্রমাগত রাস্তা বদল করতে লাগলাম।

এইভাবে রাত্রির অন্ধকারে চোর-পুলিশ খেলতে-খেলতে কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থামালাম কলকাতার সবচেয়ে বড় এবং অভিজাত এক হোটেলের সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের লিফটে পা দিতে-দিতে আড়চোখে দেখলাম, পুলিশের গাড়িটা আমার গাড়ির পেছনে থামল।

লিফটে করে আমি আর সুজাতা এলাম এগারো তলায়। এখানে একটা কক্ষের সামনে দাঁড়িয়েছিল দুজন ষণ্ডামার্কা লোক।

আমাকে দেখে স্যালুট করে দাঁড়াল। আমি বললাম, পেছনে পুলিশ আসছে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। বিকাশ গুলি চালাবে। আমি রক্তারক্তি চাই না।

সুজাতাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। এটাই এ-হোটেলের সবচেয়ে বড় কক্ষ। সুন্দর করে সাজানো। মেঝেতে পুরু কার্পেট। দেওয়ালে ছবি। দামি-দামি আসবাবপত্র।

দরজা দিয়ে ঢুকলে ঠিক উলটোদিকে দেখা যাবে একটা সুন্দর বড় টেবিল। এই ঘরের চার কোণে চারজন বিশালদেহী যুবক সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল।

সামনের বড় টেবিলে দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

আমাদের ঢুকতে দেখে ভদ্রলোক ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বললেন, Come in, son.

আমি এগিয়ে গিয়ে স্যালুট করে দাঁড়ালাম। উনি আমায় বসতে বললেন।

আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

উনি বললেন, কাজ শেষ?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

উনি আবার বললেন, কর্নেল?

আমি তার চোখে-চোখ রেখে বললাম, Dead.

Good. আমাদের পরিশ্রম সফল হয়েছে।

এমন সময় দরজার কাছে একটা হট্টগোল শোনা গেল। এবং মুহূর্ত পরেই সদলবলে ভেতরে ঢুকল বিকাশ।

আমি তখন পকেট থেকে ক্যাপসুলটা বার করেছি। ক্যাপসুলটা রাখলাম প্রৌঢ় ভদ্রলোকের প্রসারিত হাতের ওপর। বললাম, অপারেশন ব্ল্যাঙ্ক—।

মানে?

ওটা 'কোড'। অপারেশন মিলিটারি টপ সিক্রেট। ওটা নেওয়ার জন্যেই কর্নেল ভারতবর্ষে এসেছিল।

হঠাৎ বিকাশ চিৎকার করে উঠল, ওটা আমায় দিন, নতুবা গুলি করব।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন, আপনাকে তো এখানে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি, আপনি কে?

আমি একজন পুলিশ অফিসার। এই আসামিকে তাড়া করে এখানে এসেছি।

আসামি?

হ্যাঁ। গুপ্তচরবৃত্তি এবং হত্যার অপরাধে একে গ্রেপ্তার করতে চাই, আপনাদের গ্রেপ্তার করতে চাই খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে।

বলেন কী? হিমাদ্রি, আমি তো এসব কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব নাটক হচ্ছে নাকি?

বিকাশ হাতকড়ি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতেই ঘরের চার কোণে দাঁড়িয়ে থাকা চার যুবক একসঙ্গে পিস্তল তুলে বিকাশকে তাক করল।

সেটা দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ক্রুদ্ধস্বরে ওদের বললেন, Stop !

তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কাকে হাতকড়ি পরাচ্ছেন? ওর অপরাধ?

Murder.

কাকে?

ভারতীয় নাগরিক অবিনাশ ভট্টাচার্য।

Damn it, ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালেন।—ভারতীয় নাগরিক! এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টটার কী হয়েছে? এরা কি কোনও খবরই রাখে না?

না, স্যার। আমি বললাম, কলকাতার পুলিশ শুধু ঠেলাওয়ালা আর রিকশাওয়ালাদের ধরে। ফুটপাথে বসে যারা দু-পয়সা রোজগার করে, তাদের ধরে-ধরে হ্যারাস করে। কলকাতার পুলিশ রাজনীতি করতে গিয়ে সব কুশলতা, সব সুনাম নষ্ট করেছে। এঁরা এখন রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুল।

তাই তো দেখছি। আপনি যাকে ভারতীয় নাগরিক বলছেন, অফিসার, he was a notorious spy. পাকিস্তানের এজেন্ট। And Himadri is our man.

কী বলছেন আপনি?

হিমাদ্রি, tell him boy.

আমি উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে আমার wallet বার করলাম। প্রথম ফোল্ডটা খুলে ধরলাম—সেখানে আমার আইডেন্টিটি কার্ডটা আটকানো ছিল।

বিকাশ মিনিট খানেক সেদিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখের পলক পড়ছে না। ধীরে-ধীরে ওর চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, C. B. I ! Interpol !

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, প্রত্যাবর্তন, বিকাশ। That was the only way to

come back.

Strange !...Very strange !

তারপর বিকাশ ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বলল, এরা কারা?

এরা সকলেই C. B. I.-র অফিসার। Specialists.

আর উনি?

এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের নাম বলদেব মালহোত্রা, দি টপ ম্যান।

বিস্মিত বিকাশ কোনওরকমে বলল, কিন্তু...কিন্তু উনি তো...।

হ্যাঁ। দিন কয়েক পরে উনি কলকাতায় আসবেন বলে এখানকার পুলিশ মহল জানত। প্রকৃতপক্ষে উনি কলকাতায় এসেছেন আমারও আসার আগে। আর এই হোটেলের এই কক্ষটা সি-বি-আই'র অস্থায়ী কার্যালয়।

বিকাশ অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল, আমাকে তুই বলতে পারতিস, হিমু। It is rather humiliating.

আমি বিকাশের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললাম, old boy, you know how it is, আমরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কিছুই করতে পারি না। লোকাল পুলিশ যদি আমাদের আসার সংবাদ জানত, তাহলে পাখি উড়ে যেত। কেন না, পুলিশ বিভাগ সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীদের হাতের মুঠোর মধ্যে। আমি ক্ষমা চাইছি, বিকাশ।

বিকাশ করুণভাবে হেসে বলল, It does not matter.

মিঃ মালহোত্রা সকলকে বসতে অনুরোধ করে খাবারের অর্ডার দিলেন।

আমরা বসলে মিঃ মালহোত্রা বললেন, হিমাদ্রি, তোমার দ্বিতীয় পিস্তলটা জমা দাও। বিকাশবাবু, এই ডিপার্টমেন্টের একটা পিস্তল আপনি হিমাদ্রির কাছ থেকে নিয়েছেন। দয়া করে ওটা ফেরত দেবেন।

নিশ্চয়।

হিমাদ্রি, my clever boy, তুমি ওদের হাসনাবাদের ডেরা চিনলে্ কী করে?

আমি বিকাশের দিকে ফিরে বললাম, for your benifit, আমি প্রথম থেকে শুরু করছি। এটা একটা ভালো গল্প হতে পারে। তবে এটাকে তোরা গোয়েন্দা কাহিনি বলবি, না গুপ্তচর কাহিনি বলবি, তা বলতে পারি না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলা দিয়ে পুব-আকাশের দিকে তাকালাম। ভোর হয়ে আসছে। আমি ফিরে এসেছি।

ধীরে-ধীরে বললাম, আমি ছিলাম বেইরুটে। কথা ছিল, সেখান থেকে এক ভারতীয় স্মাগলারকে অনুসরণ করে তার সঙ্গে দিল্লি আসব। সেখানেই তাকে জেলে পুরব।

কিন্তু বেইরুটেই নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পেলাম। হেড-অফিসের আদেশ, সেই বেইরুটের কাজটা দিল্লিতে শেষ করে কলকাতায় আসব। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট—কর্নেল। এই সময় রঞ্জনের চিঠি পেলাম। হেড অফিস থেকে রঞ্জনের চিঠিটা আর-একটা খামে পুরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিকাশ বলল, তাহলে তুই রঞ্জনের চিঠি পেয়ে কলকাতায় আসিসনি?

না, বিকাশ। ভাগ্যচক্রে আমার ওপর আদেশ হল কলকাতায় আসার, তাই। কিন্তু আমার ওপর যদি আদেশ হত বোম্বাইয়ে যেতে, আমায় যেতে হত। রঞ্জনের চিঠি পেলেও আমি আসতে পারতাম না। আমাদের কাজটাই ওই ধরনের। আগে কাজ।

সিগারেটটা ফেলে আবার শুরু করলাম, কলকাতায় এসে ভাবলাম, রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করা যাবে। অবশ্য তোমার সঙ্গেও দেখা করার অদম্য বাসনা ছিল, সুজাতা। কিন্তু এখানে পৌঁছে শুনলাম, রঞ্জন খুন হয়েছে। তারপরই আমাকে খুন করার চেষ্টা হল। আমি বুঝতে পারলাম রঞ্জনের খুনিই

আমাকে খুন করতে চাইছে; কেন না রঞ্জনের খুনি জানত আমি কলকাতায় এসেছি রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে নয়, গুপ্তচরদের ধরতে। অতএব ধরে নিতে হবে গুপ্তচররাই রঞ্জনকে মেরেছিল, এবং তারাই জানত যে, রঞ্জন তাদের মারণাস্ত্র আমাকে দেবে বলে ডেকেছে। সুতরাং সেটা আমার হাতে আসার আগে আমাকে সরাতে চেষ্টা করছে।

আমার পথ সহজ হয়ে গেল। আমি জানতাম, রঞ্জনের খুনিকে বার করতে পারলেই গুপ্তচরদের কাছে পৌঁছে যাব। হলও তাই।

কিন্তু আমি একটু ধোঁকায় পড়েছিলাম—প্রথম দিন হোটেলের কক্ষে নিহত আততায়ীর পকেটে সেই কাগজের টুকরোটা পেয়ে। তাতে ছিল একটা হোটেলের ঠিকানা আর পুলক সেনের নাম। প্রথমে মনে হয়েছিল আততায়ী পুলক সেনের লোক। তার নির্দেশেই আমাকে হত্যার চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু রেলওয়ের হারানো-প্রাপ্তি বিভাগ থেকে যে-নামটা পেলাম, সেটা অবিনাশদার—অবিনাশ ভট্টাচার্যের টাকার ব্যাগ ওটা। আমি বুঝতে পারলাম, পুলক সেন অপরাধী নন, তিনি নিজেই এদের টার্গেট। আমার নাম এবং পুলক সেনের নাম ও ঠিকানা আততায়ীকে দেওয়া হয়েছিল। আততায়ী ছিল ভাড়াটে—কাউকেই সে চিনত না।

পঞ্চা আমাকে যখন হাসনাবাদের ঠিকানা দিল, তখন বুঝতে পারলাম, পুলক সেন এর কেন্দ্রে নেই, কেন না পুলক সেনের সম্পত্তি সবই হুগলিতে। হাসনাবাদের বাগানবাড়ির মালিক যে অবিনাশদা, তা আমি জানতাম। বদ্রির হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমি ওখানে মাস কয়েক ছিলাম।

পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে লিলির কাছে শুনেছিলাম, আমি কলকাতায় আসার সঙ্গে-সঙ্গে পুলক সেন অদৃশ্য হয়েছে। মনে হয়েছিল পলায়ন। পরে পঞ্চাকে বন্দি করে এই হোটেলে মিস্টার মালহোত্রাকে ফোন করে জানলাম, মিস্টার সেনের নিরাপত্তার জন্যেই তাঁকে সরিয়ে নিয়েছে C. B. I.

আমি তোমাকে ওটা আগে বলিনি, হিমাদ্রি, কারণ নিয়মবিরুদ্ধ। এজেন্টদের সব কথা বলা যায় না।—বললেন মিঃ মালহোত্রা।

বিকাশ বলল, পুলক সেনকে ওরা মারতে চাইবে কেন?

মিঃ মালহোত্রা বললেন, পুলক সেন ছিলেন পুলিশ-মন্ত্রী। তিনি এই সময়ে অবিনাশের বিষয় জানতে পারেন। তখন কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে হোম ডিপার্টমেন্টে যান। হোম ডিপার্টমেন্ট তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

আমি বললাম, এই সময় ভোটের ফলাফল বের হল। পরাজিত হলেন পুলক সেন। প্রধানত অবিনাশ ভট্টাচার্যের চক্রান্তেই তিনি হেরেছিলেন।

মিঃ মালহোত্রা বললেন, আমরা বুঝতে পারলাম এবার মিস্টার সেন বিপদে পড়বেন। তাই তাঁকে সরিয়ে নিতে হল।

মিঃ মালহোত্রার ডাকে পাশের ঘর থেকে পুলক সেন বেরিয়ে এলেন। বিকাশ বিস্মিত হয়ে নমস্কার করল। পুলক সেন হেসে বললেন, ভালো আছ, বিকাশ? তোমরা চিরকাল ভেবেছ যে, আমি একটা shady character, অথচ তোমার প্রমোশান হয়েছিল আমারই জন্যে।

বিকাশ বলল, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন ধোঁয়াটে। স্ট্রেঞ্জ।

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, Operation blank—শূন্য। কিন্তু আমি দুঃখিত বিকাশ, তোকে প্রথম থেকে সঙ্গে না নেওয়ার জন্যে।

Luck হিমু, with all these degrees আমি নীচেই পড়ে রইলাম।

মিঃ মালহোত্রা বললেন, দুঃখ করার কিছু নেই, বিকাশবাবু। আপনি সৎ এবং পরিশ্রমী। You are in our sights all along. আপনার মতো বুদ্ধিমান এবং সাহসী লোক আমাদের দরকার। হিমাদ্রি আমাদের বহুবার আপনার কথা বলেছে। আপনি প্রস্তুত থাকুন, আপনাকে আমরা

খুব শিগগিরই এখান থেকে নিয়ে যাব।

খাবার এল। নীরবে সকলে খেতে লাগলাম।

হঠাৎ মিঃ মালহোত্রা বললেন, তোমার পরবর্তী কাজ হবে...।

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, আমার একটা অনুরোধ আছে, স্যার। আমি দীর্ঘদিন কোনও ছুটি পাইনি, কিন্তু এবার আমার তিন মাসের ছুটি চাই। এই যে এই ভদ্রমহিলাকে দেখছেন—ইনি দীর্ঘ বারো বছর আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। ইনি...।

জানি, হিমাদ্রি। তুমি চলে যাওয়ার পর এই সেন্ট্রালে তিন-চারটে রাজা রাজত্ব করেছে। এখন পঞ্চা আর বিদ্যুৎ রায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

শুনেছি স্যার।

এই বিদ্যুৎ রায়ই শেষ পর্যন্ত সম্রাট হবে। He has every quality you had. প্রচণ্ড ধনী। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল নয়। শিক্ষিত অথচ underworld-এ থাকে।

আপনি এত খবর রাখেন?

তোমার বিষয়েও তো সব খবর রাখতাম, হিমাদ্রি। তুমি সেদিন রাত্রে যখন এই মেয়েটিকে তোমার মায়ের গলার হার উপহার দিয়ে বিদায় নিচ্ছিলে, তখন কি কল্পনাও করতে পেরেছিলে যে, সেই সময় উলটোদিকের ফুটপাথে উন্মুক্ত পিস্তল হাতে আমার ছ'জন অফিসার অপেক্ষা করছে?

সুজাতার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল সেদিন।

অথচ তুমি ঠিক আট মিনিট বিশ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলে।

চমকে উঠলাম। আমি এই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি, অথচ আমার বিষয়ে এত detailed রিপোর্ট রাখেন মিঃ মালহোত্রা, তা আমি জানি না!

উনি বললেন, এই বিদ্যুৎ রায়কে খুন করার জন্যে এক বিরাট চক্রান্ত হচ্ছে। আর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছেন পরমাণু বিজ্ঞানী ডাক্তার অসীম সোম। কেন সকলে বিদ্যুৎ রায়কে মারতে চাইছে? কেন ডাক্তার সোম অদৃশ্য হলেন? So you have another job to do.

কথা শেষ করে উনি উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

বুঝলাম। মিটিং শেষ। একটা মেয়ের পক্ষে বারো বছর অপেক্ষা করাটা বোধহয় যথেষ্ট নয়। আমি সুজাতার দিকে ফিরে বললাম, আমার পরবর্তী মিশন হওয়া উচিত 'অপারেশন ম্যারেজ'। কিন্তু ভাগ্যে এসে জুটল অপারেশন কিডন্যাপ।

বহে বিষম বাতাস



তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ. সে. র. উ. ৩—৭২

॥ ১ ॥

হঠাৎই আজ একটু ভোর-ভোর ঘুম ভেঙে গেল গার্গীর। জানালার দিকে চোখ মেলতেই দেখল, বাইরের পৃথিবীতে তখন ধোঁয়ারং আলোর উদ্ভাস খুব ধীরে, খুবই নরমভাবে জন্ম দিচ্ছে কলকাতার বুকে আরও একটি মোলায়েম সকাল। জুবিলি পার্কের যে-দোতলা বাড়িটিতে তারা বহুকাল ধরে ভাড়াটে হিসেবে আছে, তার সামনের নাতিপ্রশস্ত মরচেধরা পিচরাস্তাটি ক্রমশ মুখর হয়ে উঠতে থাকে এই ব্রহ্মসময় থেকেই। রোদের সোনালি তুলি দিয়ে যতই একটু-একটু করে মুছতে থাকবে ভোরের কুয়াশারং, জুবিলি পার্ক হয়ে উঠবে আরও কোলাহলময়।

সবদিন এমন ভোরেই ঘুম ভাঙে না গার্গীর। তবে সে লেট রাইজার তাও নয়। ভোর ও সকালের সন্ধিসময়েই বিছানা ছাড়ে সে। ভোরে ঘুম ভাঙলেও সেই সন্ধিক্ষণ না আসা তক জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকাটা তার বহুদিনের অভ্যাস। আজও সে-দৃশ্য অবলোকনের মুহূর্তগুলো তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করতে গিয়েই কী যেন মনে পড়ল তার। পরক্ষণেই তার শরীর জুড়ে যা প্রবলভাবে ঘনিয়ে এল, তার নাম টেনশন।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল, আজ বেলা দুটোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে যে-ডিবেট কমপিটিশনের আয়োজন হয়েছে, তাতে সে একজন পার্টিসিপ্যান্ট। কয়েকদিন আগে মুহূর্তের এক দুর্বলতায় এই বিতর্ক-প্রতিযোগিতার নাম লিখিয়েছিল। বিতর্কের বিষয়বস্তুটি তার খুব রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল বলেই তার এই আকস্মিক অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু তারপর যত দিন গড়িয়েছে, ততই কিছুটা উত্তেজনায়, শিহরনে কিছুটা শঙ্কায়ও চুরমুর হচ্ছে নিজের ভেতর। আজ সেই দিনের দিন টেনশন যে তুঙ্গে উঠবে তা তো অনিবার্যই।

বিতর্কের বিষয়বস্তু অবশ্য গার্গীর কাছে গ্রিক কিংবা রোমানের মতো দুর্বোধ্য ঠেকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের ছাত্রী সে। 'ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র'—এই বিষয়বস্তু তার অধীত বিষয়ের ধারেকাছেও ঘেঁষে না। কিন্তু গণিতের ছাত্রী হয়েও গার্গীর কৌতূহলের বৃত্তটি পরিসরে বড্ডই বড়। সে তার নিজস্ব বিষয়ের বাইরে হুটহাট বেরিয়ে পড়ে আরও বহুবিধ তথ্য, তত্ত্ব ও তর্কের তালাশে। কখনও সাহিত্য, কখনও রাজনীতি, কখনও অর্থনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কখনও দর্শনের তত্ত্বতালাশও তার অন্যতম হবি। কখনও-কখনও কলকাতার পথে-পথে সন্ধানী চোখ নিয়ে টুকটাক ঘোরাফেরা করাও তার আর এক প্রিয় বিলাস। ঠিক বোহেমিয়ান তাকে বলা যাবে না। কেন না আসলে এতসব অ্যাডভেঞ্চারের ভেতর টুঁ দিতে-দিতে তার কালি, কলম ও মন জন্ম দেয় এক-একটি ফিচারের। ইতিমধ্যে তার কিছু-কিছু ফিচার প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার দু-তিনটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। বিংশতিবর্ষীয়া এই তরুণীটির নাম অতএব সংবাদপত্রের কল্যাণে কোনও-কোনও মহলে সামান্য পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী মহলে তো অবশ্যই। তাই বিতর্কের আসরে গার্গী মুখার্জির অংশগ্রহণ রীতিমতো কৌতূহলের তো বটেই, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে সমীহেরও।

এতসব ভাবনার মধ্যে গার্গী বিছানা ছেড়ে শুরু করে দিয়েছে তার দৈনন্দিন রোজনামচা। বিছানা তোলা, ঘরকন্নার কাজে তার মাকে একটু সাহায্য করার পর বইখাতা খুলে গণিতের গভীর তত্ত্বে কিছুক্ষণ হাবিডুবি খাওয়া। আজ সেইসঙ্গে বিতর্কের বিষয়েও এক ঝলক নজর রাখল সে। তার মধ্যে রান্নাঘর থেকে মায়ের রান্নার আওয়াজ, তার দাদা সুশোভনের অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি, একটু পরেই খেয়েদেয়ে তার অ্যাটাচি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ, এতসব শোনার পর সে হামলে পড়ল সেদিনকার খবরের কাগজ নিয়ে।

সকাল সাড়ে আটটা-ন'টার পর মিনিট পঁয়তাল্লিশেক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তন্নতন্ন চোখ বোলাবুলিও তার রোজনামচার একটি বিশেষ আইটেম। যারা রোজ সারারাত জেগে সাদা পৃষ্ঠা কালো করেন, তাদের পরিশ্রম ও ক্লান্তিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে গার্গীর কোনওদিনই ক্লান্তি নেই। সারা

বিশ্বে কোথায় কী ঘটে চলেছে তা না জানা তক একটা মূর্খ-মূর্খ অনুভূতি ঘুলিয়ে ওঠে তার শরীরে। তার বান্ধবীরা যাকে বোকা-বোকা লাগা বলে। পি. টি. এস.-এর অক্ষরগুলি গোগ্রাসে গেলার পর তবেই যেন বিশেষ অজ্ঞ থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে গার্গী। অন্তত সেদিনকার মতো।

আজও পঞ্চম পৃষ্ঠায় পৌঁছনোর পর একটা চমকপ্রদ খবরে তার চোখ আটক হয়ে রইল। শুধু চমকপ্রদই তা নয়, বেশ রহস্যময়ও। সংবাদে প্রকাশ, কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে বেশ রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন সে-বাড়ির রানিমা। রানিমার বয়স হয়েছিল প্রায় সাতাত্তর। গত চারপাঁচ বছর ধরে চলচ্ছক্তিহীনও হয়ে পড়েছিলেন বাতজনিত ব্যথায়। তবু তাঁর স্মৃতিশক্তি, বিবেচনাবোধ, রাজকীয় মেজাজ খুবই অটুট ছিল এখনও। বছর দশেক আগে রাজা ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মারা যাওয়ার পর রানি লাবণ্যপ্রভা বাস করতেন রাজপ্রাসাদে। তিনি ছাড়াও রাজপ্রাসাদে বাস করতেন তাঁর বহু আশ্রিত-আশ্রিতারা। কেউ একা, কেউ সপরিবারে। দিন চারেক আগে রঙিন সাইডব্যাগ কাঁধে দাড়ি-গোঁফওয়ালা এক যুবক রাজপ্রাসাদে হঠাৎ হাজির হয় সাংবাদিক পরিচয়ে। রাজপ্রাসাদেরই একটি ঘরে থাকত সে, চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা, হাতে সর্বক্ষণই লেখার প্যাড ও কলম। গত চারদিন ধরেই সে কখনও রানিমার কাছে, কখনও আশ্রিতদের কাছে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করত, আর সেগুলি নোট করত মনোযোগ সহকারে। যুবকটির বিশেষত্ব হল, সে লেখালেখি করে বাঁ-হাতে, কিন্তু খাওয়াদাওয়া বা অন্য কাজের সময়ে ব্যবহার করে ডানহাত। খুব বেশি কথা বলে তা নয়। কিন্তু যখন বলে, একটু উত্তেজিত দেখায় তাকে। গতকাল দুপুরে আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার ছুতোয় সে রানিমার ঘরে ঢুকেছিল। ঘণ্টাখানেক পর সে চলে যাওয়ার পরেই আবিষ্কৃত হয়, রানিমার নিস্পন্দ শরীর পড়ে আছে বিছানায়। তাঁর গলার নলিটি কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সেই যুবককে দেখা যায়নি সে-তল্লাটে। যুবকটি রাজবাড়িতে ঢোকার সময় জানিয়েছিল, সে কলকাতায় থাকে, পেশায় ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক, তবে ছবিও আঁকে মাঝেমধ্যে, এখন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে-ঘুরে পুরোনো রাজবাড়িগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে একটি পূর্ণাঙ্গ লেখা তৈরি করবে বলে। প্রাসাদের আশ্রিতরা তাকে সাংবাদিকবাবু বলেই জানত। রানিমার কাছে নাম বলেছিল অশেষ রায়। কী কারণে খুনটি হল তা সবার কাছেই ভারী রহস্যজনক। পুলিশ তদন্ত করছে।

সংবাদটিতে বার-দুই চোখ বুলিয়ে ভারী আশ্চর্য হল গার্গী। খুনের খবরটি যেমন তার কাছে বিস্ময়কর, তেমনই সেই 'সাংবাদিক'টির লেখার বিষয়বস্তুটিও। পুরোনো রাজবাড়িগুলো নিয়ে লেখার কথা সে নিজেও তো কতবার ভেবেছে!

কিন্তু এহেন রোমাঞ্চকর একটি লেখা তৈরি করতে এসে হঠাৎ এক বৃদ্ধা, পঙ্গু রানিমাকে খুন করতে গেল কেন সেই অদ্ভুত দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোকটি।

কতক্ষণ এই রহস্যের ভেতর নিজেকে ওতপ্রোত রেখেছিল গার্গী তা স্মরণে নেই তার। হঠাৎ টেবিল-ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে চমকে ওঠে। সময় দশটার ঘর ছুঁই-ছুঁই। বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা বলেছেন, অন্তত বারোটার মধ্যে হাজিরা দিয়ে প্রতিযোগিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা চাই।

দ্রুত স্নান-খাওয়া সেরে একরাশ উত্তেজনার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হল গার্গী। সময়ানুবর্তিতা যেমন তার পছন্দের, তেমনি কতর্ব্যবোধ। আসলে যে-কোনও ব্যাপারেই সে ভীষণ সিরিয়াস। বিতর্কে নামার ঘণ্টাখানেক আগে সে তার ব্যাগ খুলে চোখ রাখল নির্দিষ্ট কাগজটিতে যাতে তার আলোচ্য বিষয়বস্তুটি লেখা আছে বিশদ করে।

সেই দিনটা গার্গীর জীবনের এক লাল অক্ষরের দিন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই বিতর্কে সে-ই একমাত্র প্রতিনিধি যে কিনা সায়েন্স স্ট্রিমের ছাত্রী। স্বভাবতই বিচারক, অধ্যাপক, শ্রোতা, সবারই কৌতূহলের দৃষ্টি ছিল তারই দিকে। তবে সে নিরাশও করেনি তাদের। তার বাচনভঙ্গি বরাবরই ভারি সাবলীল,

তার বিশ্লেষণবোধও তীক্ষ্ণ, বিষয়বস্তুটি উপস্থাপনাও করল খুবই বিশদ, প্রাঞ্জল ও নিপুণভাবে। বিতর্কের পক্ষে সে এমন বিপুল তথ্যাবলি হাজির করল শ্রোতাদের সামনে যে, তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অডিয়েন্স ফেটে পড়ল তুমুল হাততালিতে।

বিচারকরাও একবাক্যে ঘোষণা করলেন, গার্গী মুখার্জিই প্রথম।

গার্গী তখনও এক ঘোরের মধ্যে আছে। মঞ্চ থেকে নামার পর এতজনে এতভাবে প্রশংসা করল যে, সে বহুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইল নিজের ভেতর। কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ তাকে এক অলিখিত উপাধিতে ভূষিত করল, মিস ইউনিভার্সিটি, মিস ইউনিভার্সিটি। ইয়ার্কি করেই বলেছে, তবু এই ঘোরের মুহূর্তে উপাধিটি মন্দ লাগল না তার। সে তেমন রূপসি নয় যে সে কখনও মিস ইউনিভার্স হতে পারবে। সে-যোগ্যতা তার নেই, বাসনাও নেই। কিন্তু মিস ইউনিভার্সিটি! বাহ বেশ বলেছে, তো ছেলেটা। নিশ্চয়ই কোনও ছাত্র।

দু-একজন পরিচিত অধ্যাপকও তাকে কনগ্রাটস জানিয়ে গেলেন।

শেষে তার হাতে তুলে দেওয়া হল উইনার্স কাপ, সুদৃশ্য সার্টিফিকেটটি। সেই সঙ্গে একগুচ্ছ ভারী-ভারী বই। বইয়ের প্যাকেটটিই সবচেয়ে পছন্দ হল তার। বই-ই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, যে কখনও বিট্রে করে না।

বাড়ি ফিরতেই তার মা বললেন, সে কি রে, তুই ডিবেটে ফার্স্ট হয়েছিস! এ তো ভাবাই যায় না। ছোটবেলায় যা মুখচোরা ছিলি তুই!

গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল। মা জানে না এই ক'বছর কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পর সে এখন রীতিমতো মুখরা। তার তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে কখনও ঘাবড়ে যান অধ্যাপকবৃন্দও। তার শাণিত আক্রমণকে সমীহ করে ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা। আসলে গার্গী ভীষণ স্পষ্টবক্তা। কাউকেও রেয়াত করে না আজকাল। অন্তত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে।

বিতর্কে প্রথম হয়ে পুরস্কার জিতেই যে সে রেহাই পেল তা নয়। তার বিশুদ্ধ গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পরদিন তাকে চেপে ধরল, অ্যাই গার্গী, আমরা অনেকেই তো ডিবেট কমপিটিশন দেখতে যাইনি। কী বির্তক করে ফার্স্ট হলি তা আমাদের শোনা। আজ ক্লাসে ডেইসে দাঁড়িয়ে তোর বক্তিমে দিয়ে তাক লাগিয়ে দে সবাইকে।

গার্গী এড়াতে চাইছিল। কিন্তু সুপ্রতিম, শঙ্খলেখা, রীতেশ, বুম্বা, স্বাগতা, এরা কয়েকজন এমন নাছোড়বান্দা হল যে, গার্গীকে উঠতেই হল ডেইসে। তারপর সেই বক্তব্য রেকর্ডের মতো পুনর্বার—।

আবারও তুমুল হাততালি। সবাই উদ্ভাসিত হয়ে বলল, আমাদের ডিপার্টমেন্টের মান বাড়ালি তুই।

হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট এস. কে. জি. পর্যন্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর অথচ মৃদুভাষে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, গুড।

এভাবে বেশ কয়েকদিন প্রশংসা আর উচ্ছ্বাসে ডুবে থাকার পর হঠাৎ দিন পনেরো বাদে আর এক সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চোখ আটক হল তার। এবার সংবাদ নয়। বিজ্ঞাপন। সেই বীরভঙ্গপুরের ঘটনারই জের টেনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তৃতীয় পৃষ্ঠার ওপরের ডানদিকের কলামে। বীরভঙ্গপুরের নামটি দেখেই গার্গী কৌতূহলী হল। বিজ্ঞপ্তিটি খুবই অদ্ভুত আর বিস্ময়কর। তার বয়ানটি এইরকম ঃ

বীরভঙ্গপুর রাজপ্রাসাদে রানিমা লাবণ্যপ্রভা মিত্রর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এইমুহূর্তে উত্তরাধিকারবিহীন। যদি এ-দেশের কোথাও তাঁর কোনও উত্তরাধিকারী জীবিত থাকেন, তাহলে তিনি বা তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদি

সহ রাজবাড়ির ট্রাস্টিবোর্ডের নিযুক্ত অ্যাডভোকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যিনি বা যাঁরা উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, রানিমার বিপুল ধনসম্পত্তি, রাজবাড়ি, জমিজমা—সবকিছুরই মালিক হিসেবে ঘোষণা করা হবে তাঁকে বা তাদেঁর। যদি কেউ ভুয়ো প্রমাণাদি নিয়ে উত্তরাধিকারত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তবে তাঁকে সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তির নীচে জনৈক অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর। ট্রাস্টিবোর্ডের নিযুক্ত আইনজ্ঞ হিসেবে এই অ্যাডভোকেটকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিটি পড়েই গার্গী লাফিয়ে উঠল প্রায় ছেলেমানুষের মতো। যে প্রসঙ্গটি গত কয়েকদিন তার ভেতরে হাজারবার ঢালাউপুড় হয়েছে, সেই কাহিনিটিই হঠাৎ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এভাবে ফিরে আসবে তা ভাবতেই পারেনি। আগের দিন প্রকাশিত সংবাদটির সঙ্গে আজকের বিজ্ঞপ্তি যুক্ত করলে রাজবাড়ির রহস্যটি খুবই যে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠল তাতে সন্দেহ নেই। কীভাবে হঠাৎ এক অপরিচিত সাংবাদিকের হাতে খুন হলেন বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির রানিমা, তাঁর হত্যারহস্যের কী তদন্ত হল, তার জট এতদিনে খুলেছে কি না, এর কোনও কিছুই জানা হয়নি গার্গীর। তার আগেই উত্তরাধিকারী চেয়ে এই বিজ্ঞপ্তি দ্বিগুণ কৌতূহল উসকে দিল তার ভেতরে। তা হলে কি এই দাঁড়ায় যে, রানিমার কোনওভাবে মৃত্যু হলে তাঁর বিপুল ধনসম্পত্তি অন্য কারও হাতে বর্তাবে! তার মানে রানিমার খুনের পিছনে কারও সুনির্দিষ্ট মোটিভ কাজ করেছে! উত্তরাধিকারী হওয়ার মোটিভ! সে-মোটিভ তা হলে কার? সেই তথাকথিত সাংবাদিকের! না অন্য কারও!

সমস্ত বিষয়টি আরও কয়েকবার নিজের মনে নাড়াচাড়া করার পর ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল গার্গী। এ ধরনের কোনও রোমাঞ্চকর বা রহস্যঘন ঘটনা তার কানে এলে কিংবা সংবাদপত্রে পড়লে আজকার এক ধরনের টেনশন চারিয়ে যায় তার ভেতর। তা সে কোনও বস্তিবাড়ির একটি শিশুশ্রমিকের দৈনন্দিন লড়াইয়ের কথাই হোক, অথবা কোনও তরুণ খেলোয়াড়ের খুব সামান্য পরিবার থেকে দ্রুত উত্থানের কাহিনিই হোক, কিংবা তিরিশের দশকে লখনউ থেকে আসা কোনও বাইজির চমকপ্রদ স্মৃতিকথাই হোক। আর আশ্চর্য, রোজই কোনও না কোনওভাবে এই ধরনের 'স্টোরি' তার নজরে চলে আসে ঠিক। সঙ্গে-সঙ্গে সেই স্টোরিটিতে সাহিত্য মিশেল দিয়ে সে প্রতিদিন চমক দিতে চায় সংবাদপত্রের পাঠকদের।

তবে এর আগে কোনও খুনের ঘটনা তাকে আলোড়িত করেনি এভাবে। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, বীরভঙ্গপুরের কাহিনিতেও কোনও দারুণ চমক অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। জায়গাটা কলকাতা থেকে তিন সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। ওদিকে কখনও যায়ওনি গার্গী। একেবারেই অচেনা, অজানা জায়গা। অপরিচিত বলেই বীরভঙ্গপুর সম্পর্কে আরও কৌতূহল উসিয়ে যাচ্ছে তার মনে। সেখানে তার মতো একজন মেয়ের পক্ষে ঘটনার উৎস খুঁজতে যাওয়া সত্যিই কি সম্ভব! কীভাবে যাবে সেখানে! কী পরিচয়েই বা!

হঠাৎ এই আনকা ব্যাপারটা নিয়ে তার মাথায় জট পাকিয়ে যেতে কয়েকদিন রাতে ঘুমই এল না চোখে।

॥ ২ ॥

কলকাতা থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে একটি নৃশংস খুনের ঘটনার জের খুঁজতে যাওয়া, এ যেন প্রায় শার্লক হোমসের মতোই এক অ্যাডভেঞ্চার। গোয়েন্দা-

উপন্যাস পড়ার দিকে তার বরাবরের ঝোঁক। আগাথা ক্রিস্টি কিংবা আর্থার কোনান ডয়েলের কোনও বই তার হাতে পড়লেই সে গোগ্রাসে পড়ে ফেলে। শুধু পড়েই তা নয়, পড়ার পর খুনের মোটিভ, খুনির চালচলন, গোয়েন্দাপ্রবরের তদন্তের ধারা সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভাবে, আর মনে-মনে এও চিন্তা করে, সে গোয়েন্দা হলে এই হত্যারহস্যটির কিনারা করতে পারত কি না। তারপর নিজের মনে হেসেও ফেলে সে। তার এই অলীক, অদ্ভুত ভাবনার কথা ভেবেই। বীরভঙ্গপুরের রানিমার করুণ পরিণতির কথাও তাকে ভাবাল। খুবই ভাবাল। যত না খুনের মোটিভ নিয়ে, তার চেয়েও বেশি সেই সাংবাদিকটিকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান হল তার ভাবনার আবর্ত। গার্গী নিজেও ভবিষ্যতে কোনও বিখ্যাত কাগজের সাংবাদিক হওয়ার উচ্চাশা পোষণ করে। কোনও অভিনব সংবাদের পিছু-পিছু ধাওয়া করে তার ভেতরকার খুঁটিনাটি বার করার মধ্যে যে অদ্ভুত একটা থ্রিল আছে তা রেলিশ করে। অথচ একজন সাংবাদিক কিনা রাজবাড়ি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এক বিধবা বৃদ্ধা রানিমাকে খুন করে পালিয়ে এল চুপিচুপি। কী অদ্ভুত! কী আশ্চর্য!

কিন্তু গার্গী তখন এও ভাবতে শুরু করেছে, এক্ষেত্রে সাংবাদিক যুবকটির মোটিভই বা কী হতে পারে! সে কি রাজবাড়ির সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত! ভাবনাটা আরও গাঢ় হল এই কারণে যে, রানিমার খুনের সঙ্গে হয়তো তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্বের একটা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।

এরকম একটি অনুসন্ধিৎসা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করার ফাঁকে-ফাঁকে গার্গী কয়েকদিন ধরে খোঁজখবর নিতে লাগল, অশেষ রায় নামে কোনও সাংবাদিককে কোনওভাবে আবিষ্কার করা যায় কি না। নানান ধরনের ফিচার লেখার সুবাদে প্রায় সব সংবাদপত্রের অফিসেই তার অল্পস্বল্প যোগাযোগ আছে। সব অফিসেই কোনও-না-কোনও সাংবাদিক, অথবা বার্তা-সম্পাদক, কিংবা খোদ পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে মোটামুটি 'জান-পয়চান' হয়ে গেছে গত দু-তিন বছর যাতায়াতের ফলে। কিন্তু কয়েকদিন ফোনাফুনি ঘোরাঘুরি করার পর সে তার অনুমানমতো ব্যর্থই হল। সব কাগজের অফিস থেকে তার চেনাজানারা কেউ ঠোঁট উলটে অথবা কাঁধ শ্রাগ করে অথবা জিবে চুক-চুক করে জানিয়েছে, স্যরি গার্গী—।

অর্থাৎ যে যুবকটি বীরভঙ্গপুর রাজবাড়িতে গিয়েছিল, হয় সে আদৌ কোনও সাংবাদিক নয়, অথবা তার নাম হয়তো অশেষ রায় নয়, অন্য কিছু। এ ক্ষেত্রে নাম গোপন করাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য তার সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লুও পাওয়া গেছে খবরের কাগজের রিপোর্টিং থেকে। 'সাংবাদিক' যুবকটি বাঁ-হাতে লেখে, এবং আরও বড় কথা, ছবি-আঁকার অভ্যাসও আছে তার।

তা হলে যদি সাংবাদিক না হয়, এমন কোনও শিল্পী যে বাঁ-হাতে কলম ধরে বা ধরে নেওয়া যেতে পারে সে তুলিও ধরে বাঁ-হাতে।

সে যাই হোক, সেই রাজবাড়ির খুনের ঘটনাটি যতটা চমক দিয়েছে, ততটাই তাকে উসকে দিয়েছে সেই তথাকথিত সাংবাদিক-কাম-শিল্পীর ফিচারের বিষয়টি। গত দু-তিন বছরে গার্গী এত-এত ফিচারের পিছনে দৌড়েছে, তার ছোট্ট নোটবইটিতে সংগ্রহ করেছে কত না খুঁটিনাটি 'স্টোরি', কিন্তু কখনও এইসব পুরোনো রাজবাড়ি নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। এ যুগে রাজা নেই, তাদের রাজত্ব নেই, থাকবার কথাও নয়, কারণ সরকারি আইনবলে এইসব রাজা তথা জমিদারদের রাজত্ব অনেকদিন আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু অতীতদিনের ছায়া হয়ে পড়ে আছে তাঁদের আভিজাত্য ও গড়ে যাওয়া বিশাল অট্টালিকাগুলি। সেইসঙ্গে রাজবাড়ির বর্ণাঢ্য সব ইতিহাস।

ভাবতে-ভাবতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল গার্গী। মনে হল তার এক্ষুনি একবার বীরভঙ্গপুরে যাওয়াটা খুবই জরুরি। এহেন একটি নৃশংস খুনের ঘটনার পর রাজবাড়ির অতীত ইতিহাস টেনে বার করার পক্ষে এই হল উপযুক্ত সময়। কথার পৃষ্ঠে বেরিয়ে আসবে চমক-দেওয়া সব কাহিনি। হয়তো অনেক লোমহর্ষক গল্পও। অনেক বর্ণাঢ্য চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে সেই প্রাচীন অট্টালিকাটির চত্বরে।

কিন্তু যাওয়া বললেই তো যাওয়া নয়। অচেনা জায়গা, অচেনা পথঘাট। বিশেষ করে কলকাতা থেকে যখন এতখানি দূরে, সেখানে হুট করে একা গার্গী যায়ই বা কী করে। কলকাতার পথঘাট তার চেনা। এখানকার অলিতেগলিতেও সে অনেক রাত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে বেড়াতে পারে। হঠাৎ ফুটপাতে উবু হয়ে বসে নোট করে নিতে পারে কোনও ফুটপাত-বাসিন্দার জীবনকথা। কিন্তু অত দূরে, ঠিক মফস্‌সল শহরও নয় যে গিয়ে কোনও হোটেলে উঠে পড়বে!

কিছুক্ষণ নিজের ভেতর ডুব দিয়ে চক্কর দিতে-দিতে হঠাৎই মনে পড়ে গেল, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বান্ধবী শঙ্খলেখার কথা। খুবই শান্ত, মার্জিত স্বভাবের মাঝারি ধরনের রূপসি শঙ্খলেখা পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থেকে। কিছুকাল আগে কথায়-কথায় বলেছিল, তার বাড়ি ঝাড়গ্রামের দিকে কোথাও, কোনও এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে তারপর বাস ধরে আরও কিছুক্ষণ। জায়গাটার নাম এই মুহূর্তে গার্গীর মনে না পড়লেও সে জানে, প্রতি পনেরো দিন পরপর শনিবার হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে সেই গাঁয়ের বাড়িতে যায় শঙ্খলেখা। রবিবার কাটিয়ে সোমবার ভোরেই আবার কলকাতার ট্রেন ধরে। যতদূর মনে হচ্ছে বীরভঙ্গপুর জায়গাটা ঝাড়গ্রামের কাছাকাছি কোথাও হবে। তা হলে হয়তো শঙ্খলেখার কাছে হালহদিশ পাওয়া যেতে পারে বীরভঙ্গপুরের।

ঠিক যেমনটি মনে হওয়া, অমনি পরদিনই গার্গী হোস্টেলে গিয়ে পাকড়াও করল শঙ্খলেখাকে, হ্যাঁ রে, শঙ্খলেখা, তুই কি বীরভঙ্গপুর নামটা কখনও শুনেছিস?

গ্রন্থকীট মেয়ে শঙ্খলেখা, সারাক্ষণ অঙ্কের গভীর সব সমস্যার ভেতর ডুবে থাকতেই পছন্দ করে। গার্গীর আচমকা প্রশ্নে তার দীর্ঘ চোখের পাতা আস্তে করে তোলে, হঠাৎ বীরভঙ্গপুর নিয়ে তোর কী কাজ।

শঙ্খলেখার বলার ভঙ্গি দেখেই তৎক্ষণাৎ গার্গী অনুমান করে ফেলল, বীরভঙ্গপুর নামটা তার খুবই চেনা, সে উৎসুক হয়ে বলল, ওখানকার রাজবাড়ি নিয়ে একটা স্টোরি বেরিয়েছে কাগজে, নিশ্চয়ই দেখেছিস খবরটা?

শঙ্খলেখা মিষ্টি করে হাসল, এই রে, তোর মাথায় সেই রাজবাড়ির ভূত চেপেছে নাকি!

গার্গীর তখন আর তর সইছে না, আরে বলবি তো, তুই ব্যাপারটার কিছু জানিস কি না—

—একটু-একটু জানি বলেই তো তোকে ল্যাজে খেলাচ্ছি। তবে বীরভঙ্গপুর আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। কিন্তু গাঁ-গ্রামের ব্যাপার তো, দূরে হলেও রাজবাড়ির ব্যাপারস্যাপার বলে ওখানে খুব হই-চই পড়ে গেছে ঘটনাটা নিয়ে। তার ওপর একটা লোকাল নিউজপেপারে মাঝেমধ্যে স্কুপ নিউজ হিসেবে ঘটা করে ছাপছেও ব্যাপারটা।

—তাই! গার্গী ভীষণ উৎসাহিত হয়ে পড়ল শুনে, পড়েছিস খবরগুলো? খুব ইন্টারেস্টিং?

—মোটামুটি ইন্টারেস্টিংই বলতে পারিস। রাজবাড়ির ঘটনা তো, তাতে একটু কেচ্ছাকাহিনি থাকবেই।

—কেচ্ছা! গার্গীকে একটু ভুরু কুঁচকাতে দেখা যায়।

শঙ্খলেখা হাসল, আসলে কী জানিস, সাধারণ ঘরে যেটা আকছার ঘটে, সেই ঘটনাটাই রাজবাড়িতে ঘটতে থাকলে সেটা মুখরোচক হয়ে লোকের মুখে-মুখে ঘোরে।

গার্গী এবার ঝুঁকে পড়ল, তা হলে তো একদিন ওখানে যেতে হয়। নিয়ে যাবি আমাকে?

—তুই যাবি সেই বীরভঙ্গপুরে! শঙ্খলেখাকে বেশ আশ্চর্য হতেই দেখা যায়, কেন রে?

—তুই তো জানিস, আমার আবার এই ধরনের খবর সংগ্রহের একটা বাতিক আছে। কেন কে জানে, আমার ভারী ইচ্ছে করছে সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে জানতে। হয়তো দারুণ একটা স্টোরি বেরিয়ে আসবে ওর ভেতর থেকে।

শঙ্খলেখা খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গার্গীর মুখের দিকে। গার্গী মাঝেমধ্যে কী

যেন সব লেখে এ-কাগজে ও-কাগজে। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্খলেখার কোনও মাথাব্যথা হয়নি কখনও। তার একমাত্র চিন্তাভাবনা ম্যাথসের জটিল প্রবলেমগুলো নিয়ে। এখন গার্গী অত দূরে সেই বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ি যেতে চায় শুনে তার আশ্চর্য হওয়ারই কথা। কিন্তু গার্গীর আগ্রহে সে তৎক্ষণাৎ জল ঢেলে দিয়ে বলল, ধুর মাথা খারাপ নাকি তোর। একবার এক সাংবাদিক গিয়ে খোদ রানিমাকে খুন করে এসেছে। তারপর তার ওই রাশরাশ সোনার গয়না, টাকাকড়ি জমিজমা কে পাবে তা নিয়ে দিনরাত লাঠালাঠি চলছে ওখানে। সেই খবর ওখানকার এক স্থানীয় সাংবাদিক কাগজে ছেপেছে। তাই নিয়ে আরও হুলুস্থুল। সেই স্থানীয় সাংবাদিক দ্বিতীয়বার রাজবাড়িতে যেই খবর আনতে গেছে, রাজবাড়ির লোকজন তাকে ধরে বেদম পিটিয়েছে।

—সে কি! গার্গী বিস্মিত।

—হ্যাঁ। আবার তুই যদি সাংবাদিক হয়ে ওখানে যাস তো তোকেও—বলতে-বলতে শঙ্খলেখা হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসলে আবার শঙ্খলেখার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গালে দুটো চমৎকার টোল।

গার্গী একমুহূর্ত থমকায়। শঙ্খলেখাকে নিয়ে যদি স্পটে যায়, তাহলে সত্যিই কী ঘটতে পারে বোধহয় তাই-ই ভেবে নিল মনে-মনে। পরক্ষণেই হেসে ফেলে বলল, তবে মেয়ে সাংবাদিক তো, বোধহয় পিটুনি দেবে না—

শঙ্খলেখা কিন্তু তাকে নিরুৎসাহ করে ঠোঁট টিপে হেসে বলল, রাজবাড়ির ভূত তুই মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যাল। ওসব রূপকথা এখন কেউ শুনতে চায় না। জানতেও চায় না।

গার্গী অবশ্য একবিন্দুও নিরুদ্যম হতে নারাজ। তার স্বভাবই এই যে, কেউ যদি তাকে কোনওভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তো সে দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। শঙ্খলেখা আসলে ভীতু স্বভাবের। অধিকাংশ মেয়েই যেরকম হয়ে থাকে আর কী। যেহেতু এখানে বিপদের গন্ধ আছে—

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ কী মনে হতে সে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু একজন সাংবাদিক সেখানে গিয়ে পিটুনি খেল, এটা ভাবতে কিন্তু আমার আশ্চর্যই লাগছে।

শঙ্খলেখা তার চোখেমুখে একটা ভয়-ভয় অভিব্যাক্তি ফুটিয়ে তোলে, না রে, রাজবাড়িতে নাকি হরিশংকর চৌধুরি বলে একজন লোক আছে। এককালে রাজবাড়ির লেঠেল ছিল। এখন অবশ্য আর লেঠেলগিরি করার কোনও স্কোপ নেই। তাছাড়া লোকটার বয়সও হয়েছে। কিন্তু এখনও নাকি লোকটা ভয়ঙ্কর। তার যা বিশাল চেহারা—

—ও, গার্গী সেই ভয়ঙ্কর হরিশংকর চৌধুরির চেহারাটা মনে-মনে কল্পনা করে নেয়, তারপর একটু থিতু হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হুঁ, আর কী-কী জেনেছিস তুই?

—জেনেছি যে আপাতত রাজবাড়ির কোনও উত্তরাধিকারী নেই। হরিশংকর চৌধুরির মতো আরও বেশ কয়েকটি পরিবার দীর্ঘদিন রাজবাড়িতে রয়ে গেছে আশ্রিত হিসেবে। তারা এখন চাইছে, রাজবাড়ির উত্তরাধিকারত্ব তাদেরই ওপর বর্তাক। কিন্তু রাজবাড়ির ট্রাস্টিবোর্ডের যে উকিলবাবু আছেন, তিনি তা মানতে চাইছেন না। বলেছেন, প্রয়োজন হলে গভর্নমেন্টের ঘরে চলে যাবে এত বড় সম্পত্তি।

গার্গী এতক্ষণে জোরে-জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিকই তো বলেছেন উকিলবাবু। তাঁর হেডে মাথা আছে বলতে হবে। আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারবিহীন সম্পত্তি তো সরকারেই বর্তায়।

শঙ্খলেখা হাসল খুক-খুক করে কিন্তু সত্যি কথাটা বলে ফেলায় উকিলবাবুর হেডে আর মাথা থাকবে না। সেই হরিশংকর চৌধুরি নাকি উকিলবাবুর লাশ ফেলে দেবে বলে শাসিয়েছে। বলেছে, কর্তাবাবুর হুকুমে এরকম বহু লাশ এককালে ফেলেছি। না হয় আরও একটা ফেলব। কিন্তু এই সম্পত্তির হক ছাড়ব না। আমি না থাকলে রানিমার সাধ্যি কী ছিল এত বড় সম্পত্তি আগলে-আগলে রাখেন!

গার্গী থম মেরে গেল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, শঙ্খলেখা এবার কণ্ঠস্বর একটু খাদে নামাল, যেন তার কথা সেই বীরভঙ্গপুরের লোক শুনে ফেলবে, বলল, তার হুমকি শুনে এখন এলাকার লোক অন্যকথা বলাবলি করছে। বলছে, হরিশংকর চৌধুরি-ই বুড়ি রানিমাকে খুন করেছে। তারপর ওই সাংবাদিককে সে-ই গুম করে পাচার করেছে কোথাও, অথবা হয়তো মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। তারপর এমনভাবে প্রচার করছে যাতে লোকের ধারণা হয়, সেই সাংবাদিকটিই খুন করে পালিয়েছে।

গার্গী এবার যেন চিন্তায় পড়ল ধুর, তা হতে পারে নাকি!

—না হওয়ার কিছু নেই। কারণ সাংবাদিক পালিয়ে গেল, কিন্তু যাওয়ার সময় সে তার লেখার প্যাড আর কলমটা ফেলে গেল কেন।

গার্গী কিছুক্ষণের জন্য হাঁ হয়ে গেল, বাহ বেশ বলেছিস তো।

—আমি বলিনি। সেই স্থানীয় সাংবাদিকটিই এত সব কথা তার কাগজে লিখে ছাপিয়ে ছিল। তার ফলেই তাকে পিটুনি খেতে হয়েছে হরিশংকর চৌধুরির হাতে।

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গার্গী বলল, তাহলে তো তাকে পিটুনি খেতেই হবে। সরাসরি দুটো খুনের চার্জ। নিশ্চিত ফাঁসি হবে প্রমাণ হলে। যাই হোক, আমার তো তাহলে বীরভঙ্গপুরে না গিয়ে উপায় নেই, শঙ্খলেখা।

—তুই যাবি? শঙ্খলেখা সত্যিই আঁতকে উঠল। হয়তো সেই ভয়ঙ্কর হরিশংকর চৌধুরির কথা ভেবেই। তারপর বলল, ঠিক আছে, তাহলে বরং আমি পরেরবার বাড়ি গিয়ে সব খোঁজখবর নিয়ে আসি। যদি শুনি, কোনও ঝামেলা নেই আর, তখন না হয়—

—দ্যাটস রাইট, এতক্ষণে সহজ হয়ে নিশ্বাস নিল গার্গী, দ্যাটস লাইক অ্যা গুড গার্ল, বলে আজকালকার ছেলেমেয়েদের কায়দায় কাঁধ শ্রাগ করার ভঙ্গি করল। তার ভাবভঙ্গি দেখে তার সঙ্গে হেসে উঠল শঙ্খলেখাও।

গার্গী অবশ্য সেখানেই থামল না, কিছু একটা ভাবল, কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে, যেমন সে সারাদিনের মধ্যে হাজারবার ভেবে থাকে, তারপর বলল, কিন্তু সেই সাংবাদিকের গতি তাহলে কী হল? সে খুন করে পালিয়ে গেল, না তাকেই খুন করা হল! অবশ্য ভুয়ো সাংবাদিক যখন, তার হোয়ার-অ্যাবাউটস আর আমার পক্ষে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়, তবে—বলে, গার্গী হঠাৎ তার হাতের আঙুল তুলে তুড়ি মারার ভঙ্গি করল, দি আইডিয়া, সে তো আবার শিল্পীও ছিল নাকি। তাহলে এরকম কোনও তরুণ শিল্পী কলকাতার শিল্পজগৎ থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল কি না সে হদিশও তো নেওয়া যেতে পারে—।

শঙ্খলেখা গার্গীর টেনাসিটি দেখে অবাকই হয়ে উঠছে ক্রমশ নাহ। তোর মাথা থেকে সেই রাজবাড়ির ভূত আর নামানো যাবে না মনে হচ্ছে। তরুণ শিল্পীটির হদিশ তুই এখন পাবিই বা কী করে।

গার্গী মিটমিট করে হাসছে, দাঁড়া না, আমার এক নতুন বান্ধবী জুটেছে। তার নাম ডোনা। ডোনা চ্যাটার্জি। তার বাবা একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। তিনি নিশ্চয়ই কিছু হালহদিশ দিতে পারবেন। দ্যাটস দ্য আইডিয়া।

বলতে-বলতে গার্গী শঙ্খলেখাদের হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এল পথে। সত্যিই তার মাথায় এখন রাজবাড়ির ভাবনা বেশ গ্যাঁট হয়ে বসেছে। কতদিন থাকবে তা সে জানে না। এরকম এক-একটা বিষয় তার মগজে ভর করে প্রায়শ। তারপর সে অন্ধের মতো ছুটে চলে তার পিছু-পিছু। কয়েকদিন পরে একটা দুর্ধর্ষ লেখা সাদা পৃষ্ঠায় নামিয়ে তবে খালাস। তবে এরকম খুনের ঘটনা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি এর আগে।

বড়রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে প্রথম যে পাবলিক বুথটি তার নজরে এল, তার ভেতর ঢুকে ডায়াল ঘোরাল, হ্যালো—।

ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এল ডোনার মা বনানীর গলা, কে, গার্গী?

—আন্টি, ডোনাকে একটু দেবেন ফোনটা? খুব জরুরি কথা আছে।

—জরুরি! বনানী তৎক্ষণাৎ হতাশ করলেন তাকে, ডোনা তো বাড়িতে নেই। বন্ধুদের সঙ্গে আউটিঙে গেছে পরশু। কাল ফেরার কথা ছিল, কিন্তু বোধহয় আটকে গেছে কোনওভাবে।

—আউটিঙে? কোথায়, আন্টি?

—সে অনেকদূর। গুপ্তিপাড়ায়। হয়তো আজ রাতে ফিরতে পারে। ফিরলে তোমাকে ফোন করতে বলব।

—ঠিক আছে, আন্টি। আমি এখন পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছি। আমার বাড়ি ফিরতেও হয়তো একটু রাত হবে আজ। তখন যোগাযোগ করে নেব।

বলে ঝুপ করে রিসিভার রেখে দিল গার্গী। ডোনার সঙ্গে দিন চার-পাঁচ আগেই দেখা হয়েছিল তার। কই, তখন তো তাকে বলেনি আউটিঙে যাওয়ার কথা! বললে, সেও হয়তো তাদের সঙ্গে সামিল হত অভিযানে। পরক্ষণেই অবশ্য মনে হল, নাহ ডোনা হয়তো তার ছেলেবন্ধুদের সঙ্গেই ঘুরতে বেরিয়েছে। যা উড়নচণ্ডি স্বভাব ওর। তাহলে গার্গী যেতে পারত না। সে আবার একটু রক্ষণশীল। একেবারে ঠাকুমা-ঠাকুমা হয়তো নয়, তবু সমাজ-সংসারের নর্মস কিছুটা তো মেনে চলতে হয় বঙ্গসমাজে বাস করতে হলে। ডোনা অবশ্য এত সব মানে না।

আসলে ডোনাকে যা দেখেছে গার্গী, ও বেশ মড ধরনের। চুলের কারুকাজে, পোশাকের চমকে প্রায়ই বিপ্লব ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। হয় তো কোনওদিন ছেলেদের সঙ্গে সিগারেট খেতে শুরু করল দারুণ মেজাজে। কখনও ছেলেদের হোস্টেলে গিয়ে পানীয়ও। ক'দিন আগে এমন একটা মিনিস্কার্ট পরে ক্লাস করতে এসেছিল যে, সারা চত্বরে যেন একটা অস্বস্তি, একটা গুঞ্জন। কিন্তু ডোনার তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনিতে ডোনার গায়ের রং যাকে বলে সাদা-ফরসা, মেমসাহেবদের মতো তার শরীরের গড়ন, পোশাকেও কখনও তেমনি মেমসাহেব-মেমসাহেব ভাব। ডিজাইনও আমদানি করে প্যারিস কিংবা ফ্রাঙ্কফুর্ট ধরনের। এ-মেয়ের সঙ্গে গার্গীর বন্ধুত্ব হওয়াটাই আশ্চর্যের।

কিন্তু এত সব আশ্চর্য নিয়েই তো জীবন।

গার্গী নিজে দুঃসাহসী না হলেও অন্য কারও দুঃসাহস তাকে চমকে দেয়। সে অনেকবার ভেবেছে, এ-দেশে বাস করেও ডোনা কী করে বিদেশিদের ঢং-ঢাং আত্মীকরণ করল। সে অবশ্য শুনেছে, ডোনারা নাকি কিছুদিন আমেরিকায় বাস করে এসেছে। সেই সুবাদেই কি তার এহেন বোহেমিয়ান জীবনযাপন!

॥ ৩ ॥

পুরো কালনা রোড ড্রাইভ করে এসেছে মন্দার। দিল্লি রোড পড়তেই ডোনা তার কপালের ওপর উড়ে এসে পড়া চুলের রাশ বাঁ-হাতে সরিয়ে বলল, দাও, এবার আমিও চালাই—।

মন্দার তার ঘন ছাইরঙের মারুতি ভ্যান থামিয়ে সিট অদলবদল করতে-করতে বলল, দিল্লি রোড কিন্তু একটা খুনি রাস্তা। সেদিন যাওয়ার পথে দ্যাখোনি, পরপর তিন জায়গায় উলটে-পালটে পড়ে আছে ভারী-ভারী ট্রাকগুলো। একটা আম্বাসাডার তো দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে ছিটকে গেছে ধানখেতে।

ডোনা কোনও কথা না বলে অ্যাকসিলেরেটরে চাপ দিতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে, তারপর গিয়ার বদল করে গতিবেগ বাড়াতে শুরু করল দ্রুত। পরক্ষণেই একদমকে কিলোমিটারের কাঁটা ছুঁয়ে ফেলল আশির ঘর। তার স্টিয়ারিঙের এক আচমকা মোচড়ে টাল খেয়ে পড়তেই মন্দার আবার

বলল, একটু আস্তে চালিয়ো, ডোনা। সেদিন কোথায় যেন দেখলাম, রাস্তার পাশে একটা ফলকে লেখা রয়েছে, ইট্‌স বেটার টু বি মিস্টার লেট দ্যান টু বি লেট মিস্টার...।

অ্যাকসিলারেটরে আরও একটু চাপ দিয়ে কিলোমিটারের কাঁটা একশোর দাগে ছুঁইয়ে দিতে-দিতে ডোনা বলল, মিস্টার নয়, মিস। লেট মিস ডোনা চ্যাটার্জি, বলে খিলখিল করে শরীর দুলিয়ে হেসে মন্দারকে চমকে দিয়ে ঝড়ের মতো পার হয়ে চলল দিল্লি রোডের মসৃণ একঢালা পথ। সামনেই বিশাল শরীর নিয়ে একটা পাঞ্জাববডির ট্রাক আসছিল, তার মুখোমুখি হয়ে হঠাৎই কবজির এক মোচড়ে তাকে এমন ভড়কি দিল যে, ট্রাক-ড্রাইভার আর একটু হলেই মারুতি বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ধান খেতে নেমে পড়েছিল আর কী।

তার অবস্থা দেখে জিভে চুকচুক শব্দ করল ডোনা, আহা, বেচারি!

মন্দার প্রায় আঁতকে উঠল তার গাড়ি চালানোর রকম দেখে, নার্ভাসও বোধ করল খানিক, কিন্তু আর কিছু বলতে সাহস পেল না। বললেই হয়তো ডোনা আরও এমন কোনও কারিকুরি দেখাতে শুরু করবে যে, আজ আর তাদের কলকাতা না পৌঁছে ভরতি হতে হবে কোনও হাসপাতালের বেডে। কিংবা লোকালয় ছেড়ে আরও দূর অন্য কোনও লোকে।

ডোনার গাড়ি চালানোর হাত অবশ্য খুব ভালোই, লং ড্রাইভেও তার অভ্যেস আছে, কিন্তু তার অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তাই মন্দারের ভীত হয়ে ওঠার কারণ। কিছুকাল আগেও ডোনাদের একটা গাড়ি ছিল। সে সময় সে-ই গাড়িটা চালাত বেশিরভাগ সময়। কিন্তু ক্রমাগত পেট্রলের দাম বাড়তে থাকায় বছর দুয়েক হল গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন তার বাবা। তারপরও অবশ্য এর-ওর গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভিংটা রপ্ত রাখতে ভুল করেনি ডোনা। তবে যা ভাবনার বিষয় তা হল, তার গাড়ি-চালানোর ধরনটা বরাবরই বেপরোয়া। তার বেহিসেবি জীবনযাপন, পোশাকআশাক, চালচলনের মতোই তার উড়নচণ্ডি ড্রাইভিং। সব সময়ই সে নিজেকে এক এবং অদ্বিতীয় ভাবতে পছন্দ করে। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোয়নি, অথচ তার ভাবভঙ্গি, চাউনি, তুখোড় সংলাপ—সবই এত অসাধারণ যে, অন্যের দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারে অতিসহজেই। যখন তাদের বাড়ির ড্রইংরুমে সাদা ধবধবে হাউসকোটটি পরে বসে থাকে সোফায় গা এলিয়ে, তখন প্রায় রাজহংসীর মতোই তার শরীরে অহংকার। যখন ক্লাসে বসে থাকে সুবোধ বালিকার মতো নিষ্পাপ, যেন কিছুই জানে না এমন মুখভঙ্গি করে, তখন অধ্যাপকদের চোখ কিংবা পড়ানো সবই আবর্তিত হয় ডোনাকে ঘিরেই। আবার যখন উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটি শান্ত, নিরীহ প্রশ্ন করে বিভ্রান্ত করে দেয় স্বয়ং অধ্যাপককেই, তখনও ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক সবারই নজর আছড়ে পড়ে তারই ওপর। আবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, কিংবা কলেজের লম্বা করিডোর দিয়ে দারুণ মড-ফ্যাশনের কোনও পোশাক পরে হেঁটে যায় ছিপনৌকোর মতো অনায়াস ভঙ্গিতে তখনও সে-ই যেন সম্রাজ্ঞী, অন্য কেউ নয়। আবার এখন, এই যে তেলচুকচুকে, কোথাও বা হঠাৎ একটা স্পট-হোল আগলি-স্পটের মতো জেগে আছে এহেন থাকা দিল্লিরোডের বুকের ওপর দিয়ে তীব্রগতিতে মারুতি হাঁকিয়ে ছুটছে, তখনও সে-ই যেন রাস্তার একমাত্র চালক, একক অধিশ্বরী। দু-একজন ট্রাক-ড্রাইভার সত্যিই তার গতির কাছে সম্ভ্রম জানিয়ে তাদের দৈত্যকায় ট্রাক স্লো করে দিল সহসা। কিংবা হয়তো চালিকার রূপ ও সৌন্দর্য দেখে কুর্নিশ জানাল কয়েক লহমা।

মন্দার অবশ্য এনজয় করছিল বেশ। সে-ও গতি পছন্দ করে। গুপ্তিপাড়া থেকে বেরুতে একটু দেরিই করে ফেলেছে বলে গোটা কালনারোড সে-ও ঝড়ের গতিতে চালিয়ে এনেছে এতক্ষণ। এখন ডোনার পাশে বসে তার হাতে কবজির অনায়াস দক্ষতা, দু-পায়ে অ্যাকসিলেরেটরে, ব্রেক, ক্লাচের রিডে সা-রে-গা-মা বাজানোর মতো ক্রমান্বয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়ার ভঙ্গি, হঠাৎ আলতো আঙুলের ছোঁয়ায় গিয়ার বদলানো, তারই ফাঁকে-ফাঁকে তাঁর ডিম্বাকৃতি ফরসা মুখের ওপর থেকে ছড়ানো চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দেওয়া, সবই মন্দারের কাছে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। তবু আবার একসময় ফিসফিস

করে বলল, বি এলার্ট, ডোনা, মোমের পুতুলের মতো মারুতিটা যদি কোনও দৈত্যকায় ট্রাক একলহমা চুমু খেতে চায়—।

—কী আর হবে। বড়জোর কিমা হয়ে যাব তুমি, আমি, এবং তোমার মারুতি সব্বাই, বলে ডোনা অদ্ভুত রহস্যময়ভাবে হেসে উঠে বোধহয় আরও একটু চাপ দিল অ্যাকসিলেরেটর রিডে।

মন্দার অগত্যা ক্ষান্ত দিল। পাগলকে সাঁকো নাড়াতে না বললেই সে আরও বেশি করে নাড়াবে। ডোনা বরাবর এমনই জেদি, একগুঁয়ে, অবাধ্য কখনও-কখনও। কিংবা হয়তো তার হঠাৎ মনে হয়েছে এক্ষুনি কলকাতা ফেরার দরকার। এই মুহূর্তেই তাই এই ঝড়বৎ প্রস্থানের তাগিদ।

কলকাতা যাওয়ার তাড়া অবশ্য মন্দারেরই বেশি। বস্তুত পরশু সকালেই গুপ্তিপাড়া থেকে ফেরার কথা ছিল তাদের। মাত্র একরাত গুপ্তিপাড়ার আস্তানায় কাটিয়ে তারা কলকাতা ফিরবে এমন কড়ারেই সে ডোনার সঙ্গে কলকাতা থেকে বেরিয়েছিল দিনতিনেক আগের এক উমসুম ভোরে। বেরুবার দিন ঠিক এরকমই বলেছিল ডোনা, কিন্তু গুপ্তিপাড়ার সেই প্রায় পোড়োবাড়িটায় থাকতে গিয়ে হঠাৎ তার এমনই ভালো লেগে গেল যে, যাব-যাচ্ছি করে তিনদিন তিনরাত্রি দিব্যি থেকে গেল সেখানে। বেশ অবাকই হয়েছিল মন্দার। ডোনা অবশ্য দারুণ মড-ধরনের মেয়ে, এরকমই এলোমেলো, উদভ্রান্ত জীবনযাপন করাই তার পছন্দের। তার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে যাওয়াটা যেমন মন্দারের জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, তেমনই তার সঙ্গে এভাবে দ্রুত প্রেমে পড়াটাও। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় মন্দার ভাবতেই পারেনি এহেন বিচিত্র মেয়েটি তার প্রেমে হাবুডবু খাবে। এখন মন্দারেরও এমন হয়েছে ডোনাকে না দেখে সে একদিনও সুস্থির থাকতে পারে না।

তবে ডোনার সঙ্গে হঠাৎ করে এভাবে বেরিয়ে পড়াটা তার এই প্রথম। তাই সেটাই ছিল তার কাছে পরম বিস্ময়ের। ডোনাই ক'দিন আগে দিয়েছিল খবরটা, জানো, বাবার এক বন্ধুর একটা অদ্ভুত ধরনের বাড়ি আছে গুপ্তিপাড়ার কাছেপিঠে। বিশাল তিনতলা বাড়ি। তবে ভীষণ পুরোনো। অনেকটা মহেঞ্জোদাড়ো টাইপের। চলো না, একদিন আবিষ্কার করে আসি, তোমার ওই মারুতি করে—

ছাইরঙের এই মারুতিভ্যানটা সদ্য কিনেছে মন্দার, এখনও তেমন করে আউটিঙে বেরুনো হয়নি। তাই ডোনার প্রস্তাব কিছুটা বুঝে, কিছুটা না-বুঝেই লাফিয়ে উঠেছিল, ফাইন,—।

কতটা ফাইন তা ডোনার সঙ্গে এবার গুপ্তিপাড়া না গেলে সত্যিই বুঝতে পারত না। পুরোনো বাড়ি যে আসলে কতটা পুরোনো তা ওখানে না গেলে বোঝা সম্ভবই নয়। ডোনার বাবার বন্ধুও একজন ছবি-আঁকিয়ে এবং স্বভাবতই বোহেমিয়ান। তাই এমন একটা পোড়োবাড়ি হঠাৎ কিনে ফেলেছেন শখ করে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বাড়িটা কেনার পর রেখে দিয়েছেন প্রায় অ্যাজ-ইট-ইজ, মহেঞ্জোদাড়োর আদলেই। জঙ্গল, আগাছাও রয়ে গেছে তার সর্বাঙ্গে। মন্দার সে-বাড়ির দশা দেখে আঁতকে উঠেছিল প্রথমটায়। যখন তারা পৌঁছেছিল বাড়ির সামনে, তখন ঠা-ঠা দুপুর। চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল, আবর্জনার স্তূপ, সামনে-পিছনে ভাঙা পাঁচিল, ঢোকার মুখে খোয়া-ওঠা পথের দু-ধারে কয়েকটা বাজ-পড়া পামগাছ, এবং পাঁচিলের চারপাশে খাঁ-খাঁ শূন্যতা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। বাড়ির সিঁড়ি প্রায় পড়ো-পড়ো, তবু সিঁড়িটা এমনভাবে বাঁশের প্যালা দিয়ে ভেঙে পড়া ঠেকানো হয়েছে তার ধাপগুলো পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে যে, তাতে কোনওক্রমে তিনতলায় পৌঁছনো যায়। পুরো একতলা-দোতলা তো বটেই, তিনতলার বাকি ছ-সাতখানা ঘরও ডাহা অন্ধকার, শুধু তিনতলার দক্ষিণ প্রান্তে একখানা ঘর কী অলৌকিকভাবে রেনোভেট করে আধুনিক কায়দায় সাজানো হয়েছে বসবাসের জন্য।

এহেন অদ্ভুত বাড়িতে পৌঁছে বিহ্বল মন্দার বলে ফেলেছিল, খুবই বিদঘুটে টেস্ট তো তোমার বাবার বন্ধুর।

ডোনা কিন্তু একেবারেই অবাক হয়নি। তার তীব্র লাল-হলুদ রঙের স্কার্ট-ব্লাউজ পরা শরীরটা নিয়ে ঘুরপাক খেল এক মুহূর্ত, লাফিয়ে উঠে বলল, আহ, কী দারুণ। বলে ডানলোপিলো পাতা

খাটে ধাঁই করে শুয়ে ওলটপালট খেয়ে নিল একবার, পরক্ষণেই উঠে এসে বলল, আসলে এ-বাড়ির রহস্য কী জানো! মডার্ন সুযোগসুবিধের মধ্যে বাস করেও একটা পোড়োবাড়িতে থাকার রোমাঞ্চ উপভোগ করা। তাকিয়ে দ্যাখো, এই ঘরখানার মেঝেয় দামি ইটালিয়ান টাইলস, দেওয়ালে প্লাস্টার অব প্যারিস, ঘরের ভেতর পরপর সাজানো খাট-আলমারি-ওয়ারড্রোব, কিচেন গ্যাস, প্রেসার কুকার, ক্যাসারোল, ফ্রিজ, বাথরুমে গিজার, শাওয়ার, এমনকী কমোড পর্যন্ত। এ-বাড়ির মাত্র একটা ঘরেই ইলেকট্রিসিটি, ব্যস। বাকি সব ঘরে পুরোনো আসবাবপত্র, টিকটিকি, মাকড়সা আর চামচিকের বাসা, সবঘরেই পুরোনো মরচে-ধরা তালা লাগানো, ঠেললেই চাপ-চাপ অন্ধকার। রীতিমতো থ্রিলিং।

তা এই তিনদিন, মন্দারের জীবনেও এক স্মরণীয় থ্রিল এনে দিয়েছে ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে একলা-একা দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বাগানবাড়িটি। যেমন শতাব্দীর ধুলো জমে থাকা মহেঞ্জোদাড়ো-প্রতিম বাড়িটির ইট-কাঠ-কড়িবরগা আবিষ্কার করেছে, তেমনি আবিষ্কার করেছে নিজেদের। কয়েকদিন ধরে তারা ফিরে গিয়েছিল সেই মহেঞ্জোদাড়োর পৃথিবীতে, গুহামানবদের আদিম জীবনযাপন খুঁজে বেড়িয়েছে পাগলের মতো। ডোনা শুধু যে কথাবার্তায়, চালচলনে, বুদ্ধিতেই তুখোড় তা নয়, প্রেমের ছলাকলায় যে দুরন্ত পারদর্শী তা উপলব্ধি করেছে বারবার। তবু সব অভিজ্ঞতার পরেও মন্দারের মনে হয়েছে, ডোনাকে সে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। ডোনা অধরা, রহস্যময়ীই।

যেমন এই মুহূর্তে যে ডোনা ঝড়ের মতো ড্রাইভ করে চলেছে, সে-ও যেন মন্দারের চেনা নয়। হু হু করে তীব্রগতিতে কালো পিচরাস্তা পেরোতে-পেরোতে হঠাৎই ব্রেক কষে থমকালো হাইওয়ের পাশেই একটা ধাবার সামনে, বাঁই করে মারুতির মুখ ঢুকিয়ে দিল গোটা চার-ছয় দড়ির খাটিয়া-ঝিমোতে-থাকা খোলা চত্বরের ভেতব। মন্দারের দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলল, দাঁড়াও, একটু চায়ের হদিশ করি।

মন্দারের ফেরার তাড়া ছিল। হাতের কবজিতে ঘড়ির দিকে নজর রেখে বলল, নামার কী দরকার! এই তো, ফ্লাস্কে এখনও অনেকটা চা রয়ে গেছে। ঢেলে দিচ্ছি।

ডোনা ততক্ষণে দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙছে তার এতক্ষণের ক্লান্তি দূর করতে। মন্দারের প্রস্তাবকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, ধুর, ফ্লাস্কের চা তো আমার তৈরি করা। এর আগে দু-দুবাব খেয়েছি আসার পথে। এখন ধাবার চা না খেলে আর একটুও এনথু পাচ্ছি না। নামো-নামো শিগগির—।

মন্দার নেমে আসে অনিচ্ছুক পায়ে। অন্তত বেলা চারটের মধ্যেও কলকাতা পৌঁছুতে পারলে সে জনসন অ্যান্ড টেনিসন কোম্পানির টেন্ডারটা ধরতে পারবে আজ। ওখানে টেন্ডার জমা দেওয়ার আজই শেষদিন। গতকালও অন্য একটা কোম্পানির টেন্ডার জমা দেওয়ার কথা ছিল তার। কাল সকালে উঠে সে 'ফিরব' বলতেই ডোনা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে তাকে, ধুর, আজ তো কিছুতেই না। এ-বাড়িতে এসে কেমন একটা নেশা ধরে গিয়েছে। পোড়োবাড়িতে বাস করার যে এমন থ্রিল তা কে জানত! বাবার বন্ধু সত্যিই একটা জিনিয়াস। প্রায়ই নাকি এখানে চলে আসেন দু-তিনদিনের জন্য। একতাড়া অদ্ভুত-অদ্ভুত ছবি এঁকে নিয়ে যান কলকাতায়। কী বিশাল দামে নাকি বিকোয় ছবিগুলো।

থ্রিল অবশ্য মন্দারের কম হয়নি। বস্তুত ডোনার সঙ্গে বসবাসের প্রতিটি মুহূর্তই যেন এক অদ্ভুত উত্তেজনায় ভরপুর। ডোনা নামের এই ঝোড়ো হাওয়ার তরুণীটি যে প্রতিমুহূর্তে কী অবলীলায় নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তা তার সঙ্গে না মিশলে উপলব্ধি করাই সম্ভব নয়।

কিন্তু মন্দার আপাতত আপাদমস্তক ওতপ্রোত হয়ে আছে তার টেন্ডারের ভাবনায়। মাত্র বছর পাঁচ-ছয় হল সে সাকার হয়েছে একটি ইনটেরিয়র ডেকরেশনের ছোট্ট ব্যাবসায়ে নেমে। আর্কিটেকচারের একটি কোর্সে ভরতি হওয়ার দু-তিন বছর পরে সে হঠাৎই সিদ্ধান্ত নেয়, চাকরি নয়, স্বাধীন ব্যাবসা করে অর্থ উপার্জন করবে। সে জানত, সবসময়ই তার ভেতরে কাজ করে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যবোধ। কোনও একটি তরুণীকে দেখে যেমন সে চুলচেরা বিচার করে মেয়েটি

যথেষ্ট সুন্দরী কি না, সুন্দরী হলে তার সৌন্দর্যের চাবিকাঠি ঠিক কোনখানে। সুন্দরী না হলে ঠিক কোনখানে তার খুঁত। কোথায় কী প্রসাধন হলে সে আর একটু সুন্দরী হয়ে উঠতে পারত, এইসব, ঠিক তেমনই ইনটেরিয়র ডেকরেশনের প্ল্যান করতে গিয়েও সে সচেতন হয়ে পড়ে, কীভাবে একটি ঘরকে সাজিয়ে তোলা যায় আরও চমৎকারভাবে ছোট্ট স্পেসকে শুধু সাজানোর গুণে বাড়ানো যায় তার পরিসর, সৌন্দর্য—।

মাত্র ক'বছর ব্যাবসায়ে নেমেই সে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে ইতিমধ্যে। তার ছোট্ট কোম্পানি 'ইনডেক' শুধু তরতর করে ব্যাবসা বাড়িয়েই চলেছে তাই নয়, কলকাতার অনেক নামিদামি ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কোম্পনির সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে রীতিমতো। এর মধ্যে লিন্ডসে স্ট্রিটে ছোট্ট একটি অফিস খুলেছে, তাতে জনাতিনেক উৎসাহী যুবক-যুবতী বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। কখনও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে, কখনও বিভিন্ন অফিসে খোঁজখবর নিয়ে তারা টেন্ডারের কাগজ তৈরি করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাগজপত্রও জমা দেয়। টেন্ডার অ্যাক্সেপ্টেড হলে কাজ শুরু করে দেয় নিখুঁত জ্যামিতিক পদ্ধতিতে, কাজ শেষও করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। শুধু প্লাইউড, সানমাইকা, টাইলস, কাচের কারিকুরিতেই হাজার-হাজার টাকা লাভ।

ব্যাবসা এখন উঠতির মুখে। স্বভাবতই মন্দারকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় কোন সংবাদপত্রে কী টেন্ডারের খবর বেরুল। সেখানে যোগাযোগ করা, টেন্ডার খোলার দিন হাজির থাকা ইত্যাদিতে। বেশি কাজ ধরার তাগিদে কম লাভ রেখে টেন্ডার দেয় সে, তাতে কখনও 'ইনডেক' কাজ পায়, কখনও পায়ও না। বহুক্ষেত্রে নানান বাধাবিপত্তি দেখা দেয়। কত জায়গায় অসৎ আবদার এসে ভিড় করে, কতজনকে বিভিন্নভাবে তুষ্ট করতে হয়। কখনও নানা প্রলোভনের হাতছানিও না আসে তা নয়। এই পাঁচ-ছ বছরেই মন্দার জেনে গেছে, ইনটেরিয়র ডেকরেশনের এই জগৎ দারুণ কমপিটিটিভ, সারাক্ষণই এক টানাপোড়েনের ভেতর কাজ করতে হয়। এখানে টিকে থাকতে হলে প্রবল লড়াই চালিয়ে যেতে হবে সদা সতর্ক পা ফেলে। প্রতিপক্ষ প্রতিটি কনসার্নই রীতিমতো ধুরন্ধর, চোখের পলক না ফেলতে হঠিয়ে দেবে অন্যকে। কোনও একটি টেন্ডার ফেল করা মানেই প্রতিযোগিতা থেকে কয়েকধাপ পিছিয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে বেশ কয়েক হাজার, কখনও লক্ষ টাকার ক্ষতি।

অতএব প্রতিটি টেন্ডারের ব্যাপারেই মন্দারকে টান-টান সতর্ক থাকতে হয়। কোনওক্রমেই যেন তার আওতা থেকে ফস্কে না বেরিয়ে যায় কাজগুলো। অথচ তার জীবনে এই প্রথম, গুপ্তিপাড়া অভিযানে বেরুবার পর থেকেই, পরপর টেন্ডার মিস করার ঘটনাই ঘটে চলেছে। কালও তার অনুপস্থিতিতে নিশ্চিত তার সংস্থার ছেলেমেয়েরা টেন্ডার জমা দিতে পারেনি। প্রায় দু-লাখ টাকার টেন্ডার ছিল সেটা। আজও তাদের তিন লাখ টাকার টেন্ডার জমা দেওয়ার কথা। সম্ভবত এ টেন্ডারটিও মিস হয়ে যাবে স্রেফ ডোনার খামখেয়ালিপনার জন্যই। মন্দার বেশ কয়েকবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, প্লিজ ডোনা, তুমি ব্যাপারটার ইমপর্ট্যান্স বোঝো। একটা টেন্ডার মিস করা মানে—।

ডোনা প্রতিবারই খিলখিল করে হেসে উঠেছে, মন্দারকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছে, অদ্ভুত মানুষ তো তুমি। দু-একদিনের আউটিং-এ বেরিয়েছ, তাও এমন একটা রোমহর্ষক স্পটে, যেখানে রাতের বেলা তিনতলার বারান্দায় বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করলে অন্ধকারে হয়তো দু-একটা ভূতফুতের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যেতে পারে, আর তুমি কিনা টেন্ডার-টেন্ডার করে দু-চোখের পাতা এক করতে পারছ না!

শেষ পর্যন্ত রণে ক্ষান্ত দিয়েছে মন্দার। ডোনা সত্যিই অবুঝ, খেয়ালি, আনপ্রেডিক্টেবল। কখন ওর মগজে কী আইডিয়া ঘাই দিয়ে উঠবে তা বোধহয় ও নিজেও জানে না। এই যেমন এ মুহূর্তে দুরন্ত রোদ্দুর থেকে মারুতিটাকে বাঁচাতে পার্ক করল মস্ত একটা রেন-ট্রি গাছের এপাশে। তারপর দরজা খুলে নেমে এল বিজয়িনীর ভঙ্গিতে, রেন-ট্রি গাছের তলায় খোলা চত্বরে বিছোনো একটি খাটিয়ার গা এলিয়ে দিয়ে হুকুম করল, জলদি-জলদি দো গেলাস চায়ে—।

ধাবার মালিক মস্ত মোচওয়ালা এক হিন্দুস্থানি, দুপুরের অলস আরামে টাকা গুনছিল ক্যাশ-বাক্সের সামনে বসে। সারাদিন ট্রাক-ড্রাইভারদের সামলানো ছাড়াও এখন অজস্র ট্যুরিস্টের বায়নাক্কা মেটাতে হয় তাকে। এখনও দু-একটি ড্রাইভার মৌজ করে রুটি-তড়কা খাচ্ছে। ডোনার হুকুম শুনে চোখ ঘুরিয়ে তৎক্ষণাৎ তেরো-চোদ্দো বছরের এক রোগা পাতলা ঝাঁকড়াচুলো কিশোরের উদ্দেশে চালান করে দিল সেই নির্দেশটিই।

ডোনা তখন খাটিয়ার ওপর কাত হয়ে শুয়ে, একটা কনুই ভাঁজ করে সেই হাতের করতলে মাথার ভার রেখে মন্দারকে বলছে, এই ধাবার পাঞ্জাবি-চায়ের যা টেস্ট না, এক-এক চুমুকে এক-এক বছর বয়স কমিয়ে দেয়, বুঝলে?

মন্দারের চোখ তখন তার হাতের কবজির দিকে। এখনও রওনা দিলে হয়তো ডালহৌসি পাড়ায় পৌঁছুতে পারত শেষ মুহূর্তে। নিশ্চয়ই তার অফিসের কেউ-না-কেউ টেন্ডার পেপার তৈরি করে জনসন অ্যান্ড টেনিসন কোম্পানির গেটে অপেক্ষা করছে তার জন্য। সে টেন্ডার ফর্মে সই না করলে জমা দিতে পারবে না কাগজগুলো। হয়তো ভাবছে, মন্দার কাল না এসে পৌঁছুতে পারলেও আজ নিশ্চয়ই এসে পড়বে বেলা চারটের মধ্যে।

মন্দারের কোনও জবাব না পেয়ে ডোনা পুনর্বার বলল, শুধু এই ধাবার চা খেতে আমি কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে দিল্লি রোডে চলে আসতে পারি—।

ডোনা কী পারে আর কী পারে না, তার কিছুটা ইতিমধ্যে জেনেছে মন্দার, তবে অনেকটাই জানেনি এখনও। যেটুকু জেনেছে তা স্তম্ভিত করে দিয়েছে তাকে। মাত্র ক'মাস হল ডোনার প্রেমিক হয়েছে সে, শরিক হয়েছে ডোনার ভাবনাচিন্তার, তাতে তার এমন আশ্চর্য-আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, এর মধ্যেই সে একখানা মহাভারত লিখে ফেলতে পারে। ডোনার কথার মন্দার কোনও জবাব দেওয়ার আগেই চা এসে গেল তাদের হাতে।

প্রমাণ সাইজের কাচের গেলাসে গরম ধোঁয়া-ওঠা টলটলে ঘন চায়ে চুমুক দিয়ে ডোনা এবার অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল, তুমি কি এখনও টেন্ডার নিয়েই ভেবে যাচ্ছ, মন্দার?

মন্দার করুণভাবে হাসল, এখন আর কোনও কিছুই ভাবতে পারছি না। তোমার পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন কখন যে কলকাতায় পৌঁছুতে পারব, কিংবা আদৌ পারব কি না তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দিল্লি রোড শেষ হলে কলকাতার পথে টার্ন না নিয়ে তোমার স্টিয়ারিং হয়তো ঘুরে যাবে বোম্বে রোডের দিকে।

ডোনা সহসা খাটিয়ার ওপর সোজা হয়ে উঠে বলল, দি আইডিয়া, যাবে নাকি মন্দার, বোম্বে রোড ধরে? উলুবেড়িয়ার ওদিকে নদীর ধারে চমৎকার সব বাংলো আছে—।

মনে-মনে প্রমাদ গুনল মন্দার, তবু ডোনার কথায় হাসতে হল, গেলে মন্দ হয় না। ফুলেশ্বর কিংবা বাগনানের কোনও বাংলোয় আরও কয়েকদিন থেকে আসা যেতে পারে। চাই কি, ব্যাবসাপত্তর সব গুটিয়ে দিয়ে এভাবে বাংলোয়-বাংলোয় ঘুরে কাটিয়ে দিতে পারি জীবনটা। স্রেফ যাযাবরের মতো, কি বলো?

তার কথায় সূক্ষ্ম একটা খোঁচা ছিল। ডোনা তা একেবারেই গায়ে না মেখে হেসে উঠল শরীর কাঁপিয়ে, বাহ্, চমৎকার বলেছ কিন্তু। যাযাবরের জীবনযাপন আমার বরাবর ভীষণ পছন্দের। ভারী ইচ্ছে করছে, তোমাকে নিয়ে জিপসি হয়ে ঘুরে বেড়াই এক শহর থেকে আর এক শহরে—

দ্রুত পরপর কয়েকটা চুমুক দিয়ে হাতের গেলাস নিঃশেষ করে খাটিয়া থেকে উঠতে যাচ্ছিল মন্দার। হঠাৎ ডোনা তার কথা মাঝপথে থামিয়ে তাকে উঠতে নিষেধ করল, হাতের ইশারায় দেখাল ধাবার ডানদিকে মস্ত চৌবাচ্চাটার চাতালের দিকে, যেখানে তখন বালতি-বালতি জল ঢেলে স্নান করছে এক ট্রাক-ড্রাইভার। চেক-কাটা লুঙ্গি পরনে, আঁদুল গা। সে-আদুল শরীরে এমন অটুট স্বাস্থ্য ফেটে বেরুচ্ছে যে, সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ডোনা। তার প্রগলভ চাউনি মোটেই খুশি

করল না মন্দারকে। সে ভুরু কুঁচকে তাকাতেই ডোনা নীচু গলায় বলল, দ্যাখো, দূর থেকে দেখলে মনে হয় না, একদম সিলভেস্টার স্ট্যালোন?

মন্দার হাঁ হয়ে গিয়ে বলল, ধুর কীসে আর কীসে তুলনা? সামান্য একজন ট্রাকড্রাইভারকে দেখে—।

—আমি বলছি, লোকটার স্বাস্থ্যের কথা। প্রফেশন যাই হোক, কী রোবাস্ট চেহারা বলো ওর? মন্দারের বুকের কোথাও একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল। চেহারার ব্যাপারে তার সামান্য দুর্বলতা আছে। তার স্বাস্থ্য অটুট হলেও পুরুষদের নর্মাল হাইটের তুলনায় সে দৈর্ঘ্যে একটু খাটোই। পাঁচ-পাঁচের মতো তার উচ্চতা। অন্তত ছ'ফুট উচ্চতার বিশালদেহী ট্রাক-ড্রাইভারকে দেখে সে হয়তো কিছু হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকে। চায়ের গেলাসটা খাটিয়ার পায়ার কাছে নামিয়ে রাখতে-রাখতে বলল, পুরুষদের ফিগার খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার নয় কিন্তু। আসলে যা দরকার তা হল তার অকুপেশন, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স—এইসব। একটা সিনেমার কাগজে পড়েছিলাম কে যেন লিখেছিলেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাঙ্কের ফিগার, আর মেয়েদের দরকার ফিগারের ব্যাঙ্ক।

ডোনা হেসে উঠল ফের, বাহ্ সংজ্ঞাটি তো বেশ। কিন্তু সংজ্ঞাটি নিশ্চয়ই কোনও পুরুষের মাথা থেকে বেরিয়েছে। মেয়েরা পুরুষদের ফিগারকেও ইম্পর্ট্যান্স দ্যায় তা তোমরা জানো না—।

মন্দার ততক্ষণে ধাবার মালিককে চায়ের দাম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, ডোনার দিকে তাকিয়ে বলল, চলো এবার কুইক। ডোনা ফের চালকের আসনেই বসল। মন্দার তার পাশে এসে বসতেই একদমকায় অনেকখানি উড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, আমাদের এক অধ্যাপক মণীশ রায় ঠিক এ ধরনের কথাই একটু অন্য মোড়কে মুড়ে বলতেন মাঝে-মাঝে।

মন্দার ভুরু কোঁচকালো ফের, কী কথা?

—বলতেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে যা প্রধান তা হল মস্তিষ্ক, আর মেয়েদের হল শরীর।

মন্দারের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল, ওই একই হল আর কি। যার মস্তিষ্ক আছে, তারই টাকা হয়। ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়ে।

—উঁহু, মস্তিষ্ক অর্থে উনি মিন করেন প্রতিভা। ট্যালেন্ট। কমপ্যারেটিভ লিটারেচার পড়াতে-পড়াতে হঠাৎ বার্নার্ড শ'-এর প্রসঙ্গ উঠতে বলেছিলেন কথাটা। সেই যে বার্নার্ড শ-'এর প্রেমিকা ছিল, অভিনেত্রী, অপরূপা সুন্দরী, যে বার্নার্ড শ'-কে প্রস্তাব দিয়েছিল, এসো, আমরা বিয়ে করি। তোমার প্রতিভা আর আমার সৌন্দর্য, দুয়ে মিলে যে সন্তানের জন্ম হবে, সে হবে ভাবী পৃথিবীর এক অনন্ত বিস্ময়। খুবই কুৎসিত দেখতে ছিলেন বার্নার্ড শ'। প্রেমিকার কথা শুনে কী জবাব দিয়েছিলেন জানো? বলেছিলেন, কিন্তু যদি উলটোটা হয়? তোমার বুদ্ধি আর আমার রূপ। তা হলে, তাহলে কী হবে?

মন্দার হো-হো করে হেসে বলল, তোমাদের ওই মণীশ রায় যে-অর্থেই বলে থাকুন না কেন, আমার কথারই প্রতিধ্বনি ওটা। ট্যালেন্ট ব্রিঙস মানি—।

—উহুঁ, ডোনা সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, প্রতিভা থাকলেই যে টাকা হবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। তার সঙ্গে ভাগ্যও ক্লিক করতে হবে। এটাও কিন্তু মণীশ রায়েরই কথা।

মন্দার হঠাৎই কৌতুক করে বলল, তুমি মণীশ রায়ের ফ্যান বলে মনে হচ্ছে। সারাক্ষণ মণীশ রায়-মণীশ রায় করে চলেছ?

ডোনা একটা ভারী ট্রাককে অনায়াসে কাটিয়ে হেসে উঠল খিলখিল করে, তুমি কি আবার জেলাস হয়ে উঠছ নাকি? শুধু আমি নই, ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে মণীশ রায়ের ফ্যান। এত চমৎকার পড়ান উনি, এমন চমৎকার ভয়েস যে কী বলব। চল্লিশের ওপর বয়স, অথচ এখনও এমন চমৎকার দেখতে যে, মেয়েরা একবার দেখলেই ওঁর প্রেমে পড়ে যায়।

—তুমিও পড়েছ নাকি ওঁর প্রেমে?

—আমার আগে অন্তত আরও পঞ্চাশজনের লাইন আছে, ডোনা মজা করে হাসতে-হাসতে বলল, তবে তুমি বোধহয় জানো না, আমার মা-ও ওঁর সঙ্গে একই ইয়ারে পড়তেন।

মন্দার অবাক হয়ে বলল, তাই।

—হুঁ আমার মা-ও নাকি তখন ওঁর রূপমুগ্ধ ছিলেন। হয়তো মনে-মনে এখনও আছেন। এখন আবার আমিও। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, তোমার ফিগারটা সত্যিই ভালো।

—ও, ওঁর কথা শুনেই বুঝি তুমি মডেলিং-এ উৎসাহী হয়েছ?

—ঠিক তা নয়। তার আগে থেকেই ফিগার সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। কিন্তু মডেলিং-এর অফারটা এনে দিয়েছিলেন শিহরনদা।

—ও, তোমাদের বাড়ির পেয়িং গেস্ট! মেয়েদের দেখলেই যিনি তাদের সঙ্গে ফেবিকলের মতো সেঁটে থাকেন?

—ওহ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। শিহরনদাই তো 'রিক্রিয়েশন ফ্যান কোম্পানি' থেকে অফারটা এনে দিয়েছিলেন। আমিও চট করে রাজি হয়ে গেলাম। ভাবলাম, দেখিই না, ক্লিক করে কি না।

—ক্লিক করে গেল তো?

—হুঁ, বেশ নাম হয়ে গেল হঠাৎ। জানো, গত সপ্তাহেও এক সাবান-কোম্পানি থেকে একটা অফার এসেছে। ভাবতে পারো, মাত্র চার ঘণ্টা দাঁড়াতে হবে ক্যামেরার সামনে কয়েকটা পোজ দিয়ে। তাতেই তিন হাজার টাকা দেবে। ছবিগুলো ভালো হলে পরে ওদের অ্যাড-ফিল্মেও হয়তো আমাকে নেবে।

মন্দার ম্লান হেসে বলল, তারপর হয়তো, ফিল্ম থেকেও অফার আসবে, কী বলো?

—খারাপ কী, আই লিভ ফর ফান। জাস্ট ফর ফান, বলে ডোনা শব্দ করে হেসে উঠল।

ডোনাকে হঠাৎ বেশ নিষ্ঠুর মনে হল মন্দারের। সে গুম হয়ে রইল প্রবল ক্ষোভে। হয়তো তাই পরক্ষণে ডোনা প্রসঙ্গ বদলে চলে গেল অন্য আলোচনায়। স্টিয়ারিঙে মোচড় দিতে-দিতে বলল, কয়েকদিন আগে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে একটা অদ্ভুত ধরনের খুন হয়েছে, খবরটা তোমার চোখে পড়েছে, মন্দার?

মন্দার মাথা ঝাঁকাল, কই না তো।

—দেখোনি! একেবারে পঞ্চম পৃষ্ঠায় বক্স করে নিউজ করেছিল। অবশ্য তুমি দেখবেই বা কী করে! তুমি তো খবরের কাগজে একমাত্র টেন্ডারের পৃষ্ঠাটাই যা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ো। বাকি-পৃথিবী রসাতলে গেল কি গেল না তাতে তোমার মাথাব্যথা নেই।

মন্দার উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, এই খুনটার খবর রাখা কি খুব জরুরি, ডোনা?

ডোনা হেসে উঠে বলল, না। আসলে খুনি হিসেবে যার কথা লিখেছে কাগজে, সে একজন সাংবাদিক, আবার আর্টিস্টও। কী আশ্চর্য, আর্টিস্টরা আবার খুন করতে পারে নাকি?

মন্দার ঝুঁকে পড়ল ডোনার দিকে, আমি এক বছর আর্ট কলেজে পড়েছিলাম, কিন্তু আর্টিস্ট হতে পারিনি বলেই ইনটেরিয়র ডেকরেশনের ব্যাবসাটা খুলে বসেছি। তুমি কি তাই-ই আর্টিস্টের প্রসঙ্গ তুলে আমাকে টিজ করতে চাইছ, ডোনা?

ডোনা খিলখিল করে হেসে উঠল, না, তা নয়—।

—তবে কী ভাবছ, আমিই ওই খুনটা করেছি কি না?

ডোনা এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল, না। তবে এবার আমিই তোমাকে খুন করব, এই দ্যাখো না—।

বলেই ডোনা তার দিল্লি রোড পরিক্রমা শেষ করে বিবেকানন্দ সেতুর পথ না ধরে হঠাৎ ডাইনে বাঁক নিল বোম্বে রোডের দিকে। এতক্ষণ একটা খুনের গল্প ফেঁদে সে ইচ্ছে করেই অন্যমনস্ক

করে রেখেছিল মন্দারকে। মন্দার বুঝতেই পারেনি। সংবিত ফিরতেই চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এদিকে কোথায় চলেছ?

ডোনা হাসল মিটিমিটি, চলোই না। এখনই কলকাতা ফিরে কী হবে? এই বেহদ্দ দুপুরে?

—আমার অনেক কাজ আছে, তোমাকে কখন থেকে বলছি, তুমি কানেই নিচ্ছ না, মন্দারের গলায় উপচে উঠল ক্ষোভ।

—ঠিক আছে, সামনেই হাওড়া ব্রিজে ওঠার মোড় আছে, না-হয় ওখানে গিয়েই বাঁক নেব।

মন্দার ক্ষুব্ধ, বিস্মিত। ডোনা কিন্তু নির্বিকার, ঝোড়ো হাওয়ার মতো উড়ে চলেছে বোম্বে রোড ধরে। কখনও একলহমা মুচকি হাসি খেলা করে যাচ্ছে তার হালকা লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে। তারপর হঠাৎ মন্দারকে চমকে দিয়ে বলল, তুমি কখনও চুল্লু খেয়েছ, মন্দার?

—চল্লু? মুখ বিকৃত করল মন্দার, তুমি তো জানোই কোনও ড্রিঙ্কস পছন্দ করিনে আমি।

—মারিজুয়ানা।

—ধুর, কী আলফাল বকছ? গাড়ি চালাতে-চালাতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?

ডোনা আবার শব্দ করে হেসে উঠল, চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটা ধাবা আছে। ওখানে চুল্লু পাওয়া যায়। যাবে নাকি?

মন্দার রেগে গিয়ে বলল, এখন কোথাও যাব না। এক্ষুনি কলকাতা না পৌঁছুতে পারলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আমার।

—কী এত ক্ষতি হবে, মন্দার?

—টেন্ডারটা জমা না দিতে পারলে বিরাট লস হয়ে যাবে।

ডোনা তার দিকে তাকিয়ে ভুরুতে অদ্ভুত ভঙ্গি করল, আমার জন্য একদিন না হয় লসই হল তোমার। অনেক তো গেইন করেছ গত তিনদিনে?

—তুমি বুঝতে পারছ না ডোনা, ইনটেরিয়র ডেকরেশনের লাইনটা ভীষণ কমপিটিটিভ। একটা টেন্ডার মিস করা মানে শুধু টাকাটাই লস হবে তা নয়, আরও অনেক ক্ষতি। কন্ট্রাক্টর হিসেবে শিগগিরই আমার গ্রেড চেঞ্জ হবে। সে তুমি বুঝবে না। ভীষণ ভাইট্যাল সময় এটা আমার কাছে। এত কমপ্টিটিভ লাইন—।

—তাই নাকি? ডোনা তখনও নির্বিকার, কীরকম কমপিটিটিভ?

—ভীষণ, মন্দার ফের বোঝাতে চাইল, একটা কাজ পাওয়ার জন্য যে-কোনও কনসার্ন যে কোনও লেভেলে চলে যেতে পারে। ঘুষ, ব্যাক-বাইটিং, লেঙ্গি মারা—সবই চলে। দরকার হলে আমাকে খুন পর্যন্ত করতে পারে ওরা।

—তাই? ডোনা খিলখিল করে হেসে উঠল, ঠিক আছে, আজ না-হয় তোমাকে আমিই খুন করি। একেবারে ঠান্ডা মাথায়—।

বলে অ্যাকসিলারেটরে আর-একটু চাপ দিল ডোনা। বাঁ-দিকে বাঁকড়া-দাসনগর হয়ে হাওড়া সেতুর পথ। সেদিকে বাঁক না নিয়ে তীব্রগতিতে ডোনা সোজা এগিয়ে চলল বোম্বে রোড ধরে। মন্দার এবার মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল, এ কী করছ, কী করছ ডোনা, গাড়ি ঘোরাও, ঘোরাও—।

ডোনা হাসতে-হাসতে আরও চাপ দিল অ্যাকসিলারেটরে, প্রায় বিদ্যুতের মতো কালো পিচঢালা পথ বেয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মন্দারের ছাই রঙের মারুতিভ্যান। সামনে একটা লংরুটের বাস আসছিল গাঁকগাঁক করে, নিখুঁতভাবে তার পাশ কাটিয়ে চলল দূর থেকে আরও দূরে, তারপর কপালের ওপর উড়তে থাকা চুলের গুচ্ছ সরাতে-সরাতে বলল, ভয় নেই, মধ্যরাতের আগে নিশ্চয় কলকাতা ফিরে আসব আমরা। লেটস হোপ সো—।

মন্দারের মুখখানা বিকৃত হয়ে গেল, অসহায়ভাবে কেবল বিড়বিড় করল, আমার চারদিকে

এখন এত শত্রু, কেউই বোধহয় আমাকে আর বাঁচতে দেবে না।

ডোনা হাসল, নিষ্ঠুরের মতো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তাই! তা হলে তো তুমি এখন একজন ভি. আই. পি.।

সামানে তখন একটা ওভারলোডেড ট্রাক আসছে, ঝড়ের মতো।

॥ ৪ ॥

পাশের বাড়ির দোতলা থেকে মস্ত দেওয়াল-ঘড়িটা ঢং-ঢং করে একরাশ বাজনা শোনানো শুরু করতেই মণীশ সচকিত হয়ে তাঁর টেবিল-ক্লকের দিকে চোখ রাখেন। রাত এখন বারোটার মতো। এমন মধ্যরাত্রে দক্ষিণ কলকাতার এই শহরতলি এলাকা নাকতলা প্রায় ঘুমের দিকে ঢলে পড়েছে। একটু আগেই লোডশেডিং হওয়ায় অন্ধকারে ডুবে আছে এলাকা। মণীশের এই সময় শুতে যাওয়ার কথা। তাঁর চব্বিশ বছরের ভরা যুবতী বউ ঈষিতা অনেকক্ষণ আগেই তাঁকে তাড়া দিয়ে গেছে বিছানায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু মনীশের সামনে টেবিলের ওপর এই মুহূর্তে খুলে রাখা রয়েছে তাঁর সেমিনারের কাগজপত্র। ইনভার্টারের আলো জ্বেলে মুখ নীচু করে লিখেই চলেছেন একমনে। তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র দুদিন পরেই যে বিশাল সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাতে একটি অভিনব বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করবেন তিনি। বক্তৃতাটা শুধু বক্তৃতার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়। সেমিনারটির মূল্য মণীশের কাছে তার চেয়ে কিছু বেশিই। গত দু-সপ্তাহ ধরে বইপত্তর, লেখাজোকা নিয়ে তাই গভীর রাত পর্যন্ত তাঁকে সেঁটে থাকতে হচ্ছে তাঁর রিডিং-রুমের বাদামি রেক্সিন-ফিট-করা হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলে।

মণীশের লেখার বিষয়বস্তু বেশ নতুন ধরনের, একটু দুরূহও বটে। সেমিনারের আয়োজকরা অবশ্য প্রত্যেক অধ্যাপককে পইপই করে অনুরোধ করেছেন, আলোচনার বিষয় যেন খুবই আনকোরা এবং চমকপ্রদ হয়, যাতে আরও অনেক সেমিনারের মতো নিতান্ত দায়সারা বা ম্যাড়মেড়ে না হয়ে পড়ে। যাতে শ্রোতাদের ঘুম না পেয়ে যায়। যাতে শ্রোতারা টানটান হয়ে চার-পাঁচঘণ্টার আলোচনাচক্রের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। সাহিত্যের সেমিনার যখন, তাঁকে তো নানাভাবেই আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে।

মণীশও অবশ্য এহেন অদ্ভুত ধরনের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পেরে ভারী রোমাঞ্চিত। অনেক ভেবেচিন্তে একটি দুর্দান্ত বিষয়ও খুঁজে পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যে। তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন কবি-লেখকদের চমকপ্রদ জীবনী, তাঁদের কালজয়ী সাহিত্য তাঁর নখদর্পণে। তার সঙ্গে সাহিত্যের চমকপ্রদ খুঁটিনাটিও তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে থাকেন নিয়মিত। কী নিয়ে লিখবেন এমন ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ যে আইডিয়াটা পেয়েছেন তা শ্রোতাদের বেশ রহস্যেই ডুবিয়ে রাখবে। সেমিনারে তাঁর বিষয়বস্তু হবে, 'মিস্টিসিজম ইন লিটারেচার।' অনেকগুলো চ্যাপ্টারে ভাগ করে নিয়েছেন প্রবন্ধটিকে। প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারই ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আকর্ষণীয় করে লেখার চেষ্টা করছেন। আপাতত যে পরিচ্ছেদটিতে হাত দিয়েছেন, তার বিষয় হল, কোনও-কোনও লেখার জন্মরহস্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে অলৌকিক কোনও কাহিনি। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন লেখকের লেখার উৎস খুঁজতে-খুঁজতে কখনও জানা গেছে, কোনও লেখার বিষয় হয়তো স্বপ্নের ভেতর খুঁজে পেয়েছেন সেই কবি বা লেখক। অথবা দৈববলে লাভ করেছেন কোনও কবিতার পংক্তি। কিংবা অদ্ভুত কোনও রহস্য জড়িয়ে আছে লেখাটির জন্মকথায়।

বেশ কিছুক্ষণ বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে-করতে হঠাৎই মণীশের মনে পড়ে গেল ইংরেজ কবি কোলরিজের কথা। কুবলাই খান নামের বিখ্যাত কবিতাটি তিনি নাকি পেয়েছিলেন ভোর রাতের

স্বপ্নে। স্বপ্নের নীল রহস্যের ভেতর ঘটনাটি ঘটতে দেখছিলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে কবিতার পংক্তিগুলিও সাজিয়ে নিচ্ছিলেন মনে-মনে। ভোরে ঘুম ভেঙে উঠেই কবিতাটি লিখে চলেছিলেন দ্রুত, সেইসময় দরজায় হঠাৎ কড়ানাড়া শুনে গিয়ে দেখলেন, তাঁরই এক প্রিয় বন্ধু সামনে দাঁড়িয়ে। তৎক্ষণাৎ কবিতা লেখা ফেলে মেতে উঠলেন আড্ডায়। বহুক্ষণ পর বন্ধুটি চলে যাওয়ার পর দেখলেন, স্বপ্নের বাকি অংশের বিন্দু-বিসর্গও আর মনে নেই তাঁর। ফলে কবিতাটি রয়ে গেল অসমাপ্ত, সেই অবস্থাতেই ছাপতে দিয়েছিলেন কোলরিজ। ছাপা হতে বিখ্যাত হয়েছিল কবিতাটি।

এপিসোডটি মনে-মনে ভেঁজে যে-মুহূর্তে গুছিয়ে সাদা পৃষ্ঠায় লিখতে যাবেন মণীশ, তক্ষুনি ঈষিতা এসে ঢুকে পড়ল লিভিংরুমে, কী হল, শুতে যাবে না?

মণীশ হাসি-হাসি মুখে ঈষিতার দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, এই হয়ে গেছে আর কি। আর কুড়ি-পঁচিশ মিনিট।

—আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

ঈষিতার পরনে এখন দুধসাদা রঙের একটি চমৎকার নাইটি। কাঁধ থেকে দুটো সরু স্ট্রাইপ নেমে এসেছে তার ভরাট বুকের ওপর পর্যন্ত। তাতে তার ফরসা বুকের ওপরটা এবং নগ্নবাহুতে যেন আলাদা একটা সৌন্দর্য অবয়ব পেয়েছে। বুকের ওপর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত নাইটির গায়ে এমন দারুণ সব কারুকাজ, লেস-বসানো, চমৎকারিত্ব আর ঝলমলে ব্যাপার আছে, যা ঈষিতাকে প্রায় পরী করে তুলেছে। মণীশের খুব ইচ্ছে করছিল, তাঁর লেখার প্যাড, কলম ফেলে বিছানায় গিয়ে ঈষিতার পাশে শুয়ে পড়তে, কিন্তু তিনি আপাতত আটকে গিয়েছেন কোলরিজ সাহেবের স্বপ্নের ভিতরে। এমন অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্ন মণীশরাও দেখে থাকেন প্রতিনিয়ত, কিন্তু তাঁরা তো আর কোলরিজ নন যে, সেগুলো থেকে এমন দুর্দান্ত একটি কবিতার জন্ম হবে। এই যে ঈষিতার এমন নয়নাভিরাম সাজ, তা দেখেও তাঁর এখনই একটি কবিতা লেখার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু তাঁর কলমে প্রবন্ধ যা-ও বা খেলে, কবিতা নৈব-নৈব চ। সেই প্রবন্ধ লিখতেই এখন কলমের নিব ভাঙতে হচ্ছে তাঁকে। তাই না পারছেন ঈষিতার রূপের স্তুতি করতে, না পারছেন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে। আর দুদিনের মধ্যেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। কোনও উপায় নেই।

ঈষিতার আকর্ষণীয় শরীরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে টেবিলের প্যাডে নিবিষ্ট হতেই ঈষিতা ক্ষুব্ধ-ক্ষুব্ধ চোখ করে তাঁর টেবিলে দুই কনুই রেখে-ঝুঁকে পড়ল, এই বাইরে না ফাটাফাটি জ্যোৎস্না। চলো না, ছাদে যাই—।

—ছাদে! মণীশকে হঠাৎ খুবই বিপন্ন দেখাল।

—হুঁ, ছাদে। লোডশেডিং-এর সময়ই তো জ্যোৎস্নার কারিকুরি ফুটে ওঠে কলকাতায়। চলো না, কতদিন ভালো করে জ্যোৎস্না দেখিনি। বিয়ের আগে একবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দল বেঁধে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম জ্যোৎস্না দেখব বলে। পূর্ণিমার রাত ছিল সেদিন। সন্ধে থেকে চাঁদ উঠবে বলে উসখুস করছি, হঠাৎ কোত্থেকে একরাশ কালো মেঘ উড়ে এসে জুড়ে বসল সারা আকাশে। ইস, কী যে আফসোস হয়েছিল সেদিন।

টেবিলের ওপর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ায় এই মুহূর্তে ঈষিতার শরীরের কারুকাজ মণীশের সামনে উদ্ভাসিত। তার উপছানো স্তনবিভাজের দিকে একলহমা মুগ্ধদৃষ্টি রেখে মণীশ চোখ ফিরিয়ে বললেন, এই ঈষিতা, তোমার মনে আছে, রিলকে যখন তাঁর ডুয়িনো এলিজি লিখেছিলেন, তখন হঠাৎ দু-লাইন কবিতা দৈববাণীর মতো উপহার পেয়েছিলেন। তোমার তো তখন বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ মুখস্থ ছিল। সে লাইনদুটো কী ছিল বলো তো?

জ্যোৎস্না রাতে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে ছাদে যাওয়ার আমন্ত্রণ পরিহার করে হঠাৎ রিলকে প্রসঙ্গে চলে যেতে ঈষিতা ভীষণ রেগে গেল। ঝট করে টেবিল থেকে উঠে গিয়ে বলল, ধুর ছাড়ো তো তোমার ওই সেমিনার। রাত ক'টা বাজে সেটা খেয়াল আছে?

মণীশ তবুও নাছোড়। কোলরিজ হয়ে চলে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথে, রাজর্ষির তাতা ও হাসির ঘটনাটিও তো রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের ঘোরেই পেয়েছিলেন, সেটা নোট করে চলে এসেছেন রিলকের এপিসোডে, ঈষিতাকে ধরলেন ফের, তোমার স্মৃতিশক্তি তো দারুণ প্রখর। বলো না, মনে আছে পঙক্তি দুটো?

ঈষিতা তখন তার পরির মতো দুধসাদা শরীর নিয়ে ক্ষুব্ধমুখে পায়চারি করছে রিডিং রুমের মেঝেয়। মাত্র বছর তিনেক আগেও ঈষিতা মণীশের ছাত্রী ছিল। তুলনামূলক সাহিত্যে প্রতিবছরই একঝাঁক করে সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়ে এসে ভরতি হয়। প্রায় প্রত্যেকের চোখেমুখে আভিজাত্যের ছাপ, তুখোড় ব্যক্তিত্ব আর প্রবল সাহিত্যপিপাসা। প্রায় সবাই-ই মেধাবীও। তারই মধ্যে ঈষিতা নামের তরুণীটি ছিল একেবারেই অন্যরকম। যেমন অসাধারণ সুন্দরী, কাটাকাটা চোখমুখ, তেমনই চমৎকার তার পড়াশুনোর পরিধি। দীর্ঘ একযুগ অধ্যাপনা করেও মণীশ যখন একজন সুন্দরী তরুণী ছাত্রীরও প্রেমে পড়েননি, এবং তিনি একজন কনফার্মড ব্যাচেলর হতে যাচ্ছেন বলে সবাই ধরে নিয়েছে, ঠিক সে মুহূর্তে তাঁর জীবনে ঈষিতার আবির্ভাব। আটত্রিশ বছরের মণীশের সঙ্গে একুশ বছরের ঈষিতা কীভাবে যে লটকে গেল তা ক্লাসের কোনও ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপকরাই ধরতে পারেননি। শুধু দু-বছরের ক্লাস শেষ হলে, ফাইনাল পরীক্ষার আগে প্রিপারেটিভ লিভ-এর সময় একদিন ঈষিতাকে দেখা গেল লাইব্রেরি রুমে। তাকে দেখে তার এক সহপাঠী বিশ্ববন্ধু চমকে উঠে বলল, কী রে, ঈষিতা, তোর কপাল ফাটলো কী করে? কে-ই বা ফাটালো?

ঈষিতার সিঁথিতে তখন জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের সরু একটা রেখা। সে-রেখা এসে ছুঁয়েছে তার কপালের প্রায় মাঝখান পর্যন্ত। ঈষিতা শুধু রহস্যময়ীর মতো হেসেছিল, কিন্তু রহস্যটি ফাঁস করেনি। সে-রহস্য অবশ্য সবাই জেনে গিয়েছিল কিছুদিন পরে, ততক্ষণে তাদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ।

মণীশের প্রশ্নে ঈষিতা হঠাৎ থেমে গিয়ে চমৎকার করে আবৃত্তি করল ঃ

কে, আমি চিৎকার করে উঠি যদি, হবে শ্রোতা শ্রেণিবদ্ধ ওই দেবদূত-পর্যায়ের মধ্য থেকে?

রিলকে তখন ট্যাক্সিস-হোহেনলাহে নামের এক সুন্দরী রাজকন্যার আতিথ্যে আছেন তাঁদের ডুয়িনো দুর্গে। পাহাড়ের ওপর এক নির্জন বিশাল বাড়ি, পাহাড়ের পা ছুঁয়ে আছে চমৎকার অন্তহীন নীল সমুদ্র। সেই দুর্গের খোলা বারান্দায় বসে ঝোড়ো হাওয়ায় মাতাল হাওয়ায় মুহূর্তে এই পংক্তি দুটি যেন হঠাৎ শুনতে পেয়েছিলেন জার্মান-কবি রিলকে। তারপর অনায়াসে লিখে গিয়েছিলেন আরও অসংখ্য পঙক্তি, পঙক্তির পর পঙক্তি।

—থ্যাঙ্কু ঈষিতা, বলে মণীশ আবার ডুবে গেলেন তাঁর লেখার মধ্যে। কলকাতায় আপাতত লোডশেডিং-এর দাপট এত বেশি যে, জ্যোৎস্নারাতের ম্যাজিক এখন প্রায়শ দেখতে পায় কলকাতাবাসী। বছর কুড়ি আগেও লোডশেডিং-এর এমন বিদঘুটে প্রকোপ ছিল না। তখন একবার গ্রামে বেড়াতে গিয়ে মণীশ আবিষ্কার করেছিলেন, জ্যোৎস্নারাতে পৃথিবী এক অন্যরকম সাজে সেজে ওঠে। কলকাতা ফিরে এসে জনে-জনে গল্পও করেছিলেন, জানেন, মনে হচ্ছিল কোনও রূপকথার দেশে বেড়াতে গিয়েছি আমি। সে এমন চমৎকার সৌন্দর্য। যেন আকাশ থেকে সারবেঁধে নেমে আসছে কিন্নর-কিন্নরীরা। সে-গল্প শুনে অনেকেরই সাধ হয়েছিল গ্রামবাংলায় জ্যোৎস্না দেখতে যাওয়ার। তারপর গত কুড়িবছর অনেক জ্যোৎস্নার রাত এসে পৌঁছেছে কলকাতায়। জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যও তাই গা-সওয়া হয়ে গেছে কলকাতাবাসীর।

আর ইদানীং লোডশেডিং-এর ভয়াল আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে মণীশ তাঁর রিডিংরুম আর বেডরুম দুটো ঘরই ইনভার্টারের আলোয় আলোকিত করে রাখেন। ঘরের ভেতর লোডশেডিং আর বুঝতেই পারেন না। বুঝতে হলে ছাদে যেতে হয়। বিয়ের পর অনেক লোডশেডিং-এর অন্ধকার রাতে ছাদে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছেন ঈষিতাকে, অনেক জ্যোৎস্নাভেজা রাতে ছাদের আলসেয় বসে

গল্প করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু এই মুহূর্তে আর সে-সময় নেই। সেমিনারটি নিয়ে খুবই টেনশনে আছেন মণীশ।

টেনশনে থাকার অন্যতম কারণ হল সেমিনারের দিন সারাক্ষণ উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং ভাইস চ্যান্সেলর। যেসব অধ্যাপকেরা পেপার পড়বেন তাঁদের প্রত্যেকের বিষয়বস্তু, তার গভীরতা, লেখার বিশ্লেষণ, এ সবকিছুই নাকি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন উনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শিগগির রিডারের একটি পোস্ট খালি হচ্ছে। রিডারের পদ মনোনয়নের আগে এই সেমিনারটিকে তাই খুব গুরত্ব দিচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলর। স্বভাবতই একে সমীহ করছে সব অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকও। মণীশ তো গত পনেরো কুড়িদিন যাবত পাগলের মতো পড়শুনা করছেন, নোট নিচ্ছেন, অবশেষে গত দিনতিনেক ধরে প্রবন্ধটি একটা শেপে আনার চেষ্টা করছেন। কমদিন হল না তার চাকরি, এখন রিডার হওয়ার সব যোগ্যতাই তাঁর হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে সেমিনারটির গুরুত্ব তাঁর কাছে খুবই বেশি। বিশেষ করে তাঁরই বিভাগের রণজয় দত্ত একেবারে তাঁর ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছে। রণজয় কনটেম্পোরারি হলেও খুব সম্প্রতি তরুণ কবি হিসেবে বেশ নাম করে ফেলেছে। তরুণ কবি শব্দটা অবশ্য মণীশের কাছে ভারী গোলমেলে বলে মনে হয়। রণজয়ের বয়সও চল্লিশের মতো, লেকচারার হিসেবে বেশ সিনিয়রই বলা যায়, ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা তাকে রীতিমতো রেসপেক্ট করে, তা সত্ত্বেও সে কী করে তরুণ কবি হিসেবে অভিহিত হয় তা মণীশ বুঝতে পারেন না। আর এই খ্যাতির জন্য রণজয়ের মনে একটা চাপা অহঙ্কার আছে। কথাবার্তার মধ্যে তার এই নাক উঁচু স্বভাবটা কখনোই চাপা থাকে না। সেজন্য রণজয়কে বেশ অপছন্দই করেন মণীশ। সম্ভবত রণজয়ও মণীশকে।

দিনতিনেক আগেও এই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা আরও একবার যাচাই হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। যে বিষয়টি নিয়ে মণীশ তাঁর প্রবন্ধ লিখছেন, যথাসম্ভব সেটি তিনি গোপনই রেখেছিলেন অন্য সবার কাছ থেকে। তবু রণজয় কীভাবে যেন সেটি জেনে ফেলে একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার মণীশদা, আপনি নাকি কীসব অলৌকিক ব্যাপারসাপার নিয়ে পেপার তৈরি করছেন?

মণীশ অবাক হয়ে বলেছিলেন, হুঁ, ওই আর কী, কেন?

—আসলে আপনি তো মৌলিক লেখা লেখেন না। লিখলে জানতেন, সব সৃষ্টিশীল লেখাই একটা অলৌকিক ঘটনা। হঠাৎ কখন কবিতার কোন পঙক্তি কিংবা একটা গল্পের প্লট মাথার ভিতর স্পার্ক করবে তা কোনও কবি বা লেখকই আগে থেকে জানতে পারেন না। কোনও চিত্রশিল্পীর ছবি আঁকা, কিংবা কোনও মিউজিসিয়ানের মিউজিক কম্পোজ করার ব্যাপারেও ঠিক একই জিনিস খাটে। সুতরাং অলৌকিক উপায়ে সাহিত্যের জন্ম এই বিষয় নিয়ে আলাদা করে কোনও প্রবন্ধ লেখার মানে হয় না।

কথাটা শুনে মণীশ সেদিন বেশ গুম হয়ে গিয়েছিলেন। রণজয় দত্ত কীভাবে তাঁর লেখার বিষয়বস্তু জেনে গেল তা বুঝতে পারেননি। সম্ভবত দিনকয়েক আগে ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক সুশোভন চ্যাটার্জির সঙ্গে কোলরিজের লেখা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, সেখানেই কথাপ্রসঙ্গে কুবলাই খানের প্রসঙ্গ উঠেছিল। হয়তো সুশোভন চ্যাটার্জির কাছ থেকেই ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে রণজয়, আর তাই-ই প্রথম চোটে মণীশকে ঘাবড়ে দিতেই রণজয়ের এমন বক্রোক্তি।

আসলে রণজয় যেমন স্বার্থপর, তেমনই অহঙ্কারী। ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে চাকরির ব্যাপারে উমেদারিও করছে নাকি ও, এমন তথ্যও জানা গিয়েছে এর মধ্যে।

নিজের লেখার মধ্যে ডুবে গিয়েও এমন অনেক এলোমেলো কথা মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল মণীশের। ঈপ্সিতা বেশ কিছুক্ষণ তাঁর ঘরে ঘোরাঘুরি করার পর এখন আবার শোওয়ার ঘরে ঢুকে তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল আয়নায় তারই নাইটি পরা সুন্দর শরীরটা ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখছে। হঠাৎ নীচু হয়ে পাফে পাউডার মাখিয়ে নিয়ে হালকা করে প্রলেপ লাগিয়ে নিল তার ঘাড়ে-পিঠে। দু-হাত তুলে মসৃণ বগলের নীচেও এক ঝলক। তারপর হঠাৎ আলতো

করে বেঁধে রাখা খোঁপার চুল খুলে ছড়িয়ে দিল পিঠে। চুল খুলে এভাবে ছড়িয়ে দিলেই যে ঈষিতাকে অতিরিক্ত সুন্দরী লাগে তা মণীশ ওকে অনেকবার বলেছেন। হয়তো তাই-ই তার এমন আলুলায়িতকুন্তলা চেহারা। চুল ছড়িয়ে দিয়ে একবার বড় করে হাই তুলল, তারপর রিডিংরুমের দিকে গলা বাড়িয়ে গলায় খানিক বিরক্তি মাখিয়ে বলল, আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

মণীশ লেখার প্যাড থেকে মুখ না তুলেই বললেন, তুমি শুয়ে পড়ো না গিয়ে। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। হয়ে এসেছে প্রায়। আর এক পাতা।

বিরক্ত ক্ষুব্ধমুখে আর একটা হাই তুলল ঈষিতা। তারপর বিড়বিড় করে কিছু বলল একা-একা। ওপাশে সরে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আসলে এই মুহূর্তে একা-একা বিছানায় যেতে ইচ্ছে করছে না ঈষিতার। তিন বছর বিয়ে হয়ে গেছে তাদের, তবু মণীশের প্রতি তার এখনও এক তীব্র আকর্ষণ, তিন বছর আগেও যেমন ছিল। আসলে, মণীশের চেহারার মধ্যে এমন একটা গ্ল্যামার আছে, যা যে-কোনও মেয়েকেই ভীষণভাবে টানে। আজ বহু বছর ধরে এভাবেই মেয়েদের আকর্ষণ করে আসছেন মণীশ।

দোতলার জানালা থেকে দেখা যায়, ওপাশের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংটা বিশাল শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সব আলোই এখন লোডশেডিং-এর কল্যাণে নেভা। কেবল একটা জানালায় এখনও রাতের নীল আলো জ্বলছে। কী এক কৌতূহলে সেদিকে চোখ রেখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঈষিতা।

বিয়ের পর-পরই ঈষিতা বলে দিয়েছিল, এখনই দু-চার বছরের মধ্যে তার মা হওয়ার ইচ্ছে নেই। মা হলেই তো সন্তানের কাছে সমর্পণ করে দিতে হয় মায়ের বাকি জীবন-যৌবন সব। তার আগে একটু হালকা থাকলে জীবনটা উপভোগ করে নেওয়া যায়।

ঈষিতার যেমন ইচ্ছে, মণীশকে তেমনই মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটা ছিল ঠিক এর অন্যরকম। তাঁর বিয়ে হয়েছে অনেক দেরিতেই। আটত্রিশ বছরের মণীশের পাশে একুশের ঈষিতা, বয়সের হিসেবে বেমানান হলেও দেখতে তেমনটা লাগেনি। মণীশকে এখনও সদ্য তিরিশের যুবক বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়। শুধু তাঁর কোঁকড়ানো চুলে দু-চারটে রুপোলি চমক দেওয়া ছাড়া তাঁর চেহারায় বয়সজনিত কোনও অতিরিক্ত মেদ এখনও জমেনি। তবু হাজার হোক, তাঁর লেট ম্যারেজ। তাই এই একচল্লিশে পৌঁছে যদি তিনি সন্তানের জনক না হতে পারেন, তাহলে তো ছেলে-মেয়ে মানুষ করার কোনও সুযোগ কপালে জুটবে না। তবু ঈষিতা তার দাবিতে অনড়। সে তার শরীরের যত্ন একেবারে টায়টায় বজায় রেখেছে। শ্যাম্পু করা চুলের কেয়ারিতে, পোশাকের পরিপাটিতে, চোখের স্বপ্নালু চাউনিতে, কথার সুরেলা ধ্বনিতে এমন নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছে তার যৌবন যে, তার দিকে একবার নজর রাখলে যে-কোনও পুরুষের আর একবার তাকাতে ইচ্ছে করবে। তিন বছর বিয়ে হয়েছে, তবু মণীশের নিজেরই এখনও তাকিয়ে আশ মেটে না, অন্য পুরুষদের তো হবেই। তাঁরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হবে মেড ফর ইচ আদার।

বেডরুমের জানালা থেকে সরে এসে ঈষিতা ততক্ষণে বলছে, ধুর, তোমার ওই লেখার কাজও আর শেষ হবে না, তোমার শুতে আসারও আর সময় হবে না। রাত তো এদিকে ভোর হয়ে গেল। মণীশ অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, দাঁড়াও না, সেমিনারটা হয়ে গেলেই আমি ফ্রি। তখন দেখো—।

ঈষিতা ঝাঁঝিয়ে বলল, তুমি আর ফ্রি হয়েছ! সারা বছর হয় সেমিনার, না হয় কোনও রিসার্চ পেপার তৈরি করা। অথবা পরীক্ষার কোশ্চেন-পেপার সেট করা। অথবা অন্য ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বক্তৃতা করতে যাওয়া। এই তো দেখছি তিন বছর ধরে।

এতক্ষণে মণীশ মুখ ফিরিয়ে হাসলেন।

ঈষিতা সত্যিই চটে গিয়েছে তাঁর ওপর। একপশলা ফায়ারিং করে পায়ের স্লিপারে ফটফট

শব্দ তুলে চলে গেল খাটের কাছে। বেশ যত্ন করে সে বিছানা পাতে রোজ। প্রায়ই নতুন-নতুন বেডকভার। প্রায়ই নতুন বেডশিট। প্রতিটি চমৎকার সব রঙের আর কারুকাজের। ঈষিতার মতে রোজ বেডকভার বদলালে তাতে ঘরের চার্ম বদলে যায়। বিছানার একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়। রাতে শুতে যাওয়ার মোহ বেড়ে যায়। মণীশ তাই ঈষিতার নাম দিয়েছেন শয্যাবিলাসিনী। তবে সত্যি বলতে কি, ঈষিতার এই ব্যাপারটা মণীশও ভারী পছন্দ করেন। কখনও ঘরের ভিতর খাটটা এদিক-ওদিক করে ঘরের চেহারাটাই বদলে দেয় ঈষিতা। তখন মনে হয় তাঁদের বেডরুমটা যেন নতুন, হঠাৎ যেন বদলে গেছে কীভাবে।

আর শুধু বেডরুমটাই নয়, ঈষিতা নিজেকেও কখনও বদলে ফেলে বিছানায়। যত দিন যাচ্ছে, ততই ঈষিতা যেন নতুন করে ধরা দিচ্ছে মণীশের কাছে। প্রতিদিনই যেন তার বয়স কমে যাচ্ছে আরও। সে চায় মণীশের বয়সও যেন এভাবে কমে যায়।

তবু মণীশের বয়স যে বেড়েছে তা মোটেই ধরা যায় না। ক'দিন আগেই ডোনা নামের একটি ছাত্রী এসেছিল তাঁর কাছে। একটু অন্যরকম ব্যক্তিত্ব আছে মেয়েটির, বেশ কিছুটা অভিনব তার চালচলন। বলেছিল, স্যার, আজকাল কাগজগুলোতে মেয়েদের রূপচর্চা সম্পর্কে নানারকম টিপস দিয়ে থাকে, কীভাবে সাজবেন, কী দিয়ে সাজবেন, কী খাবেন—এসব তথ্য দিয়ে। কিন্তু পুরষদের বয়স কী করে ধরা যায়, আরও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, কীভাবে আরও হ্যান্ডসাম হয়ে ওঠা যায়, কীভাবে শরীর মেইনটেইন করা উচিত তা নিয়ে যেন কারও মাথাব্যথা নেই। আপনি একটা কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রস্তাব দিন, প্রতি সপ্তাহে পুরুষদের রূপচর্চার জন্য টিপস দেবেন। দেখবেন, কাগজের বিক্রি বেড়ে যাবে। পুরুষরাও প্রত্যেকেই আরও সুন্দর হয়ে উঠতে চায় সে-কথা কিন্তু কেউ ভাবে না। আপনি দেখতে এত সুন্দর বলে অন্য পুরুষরা মনে-মনে হিংসে করে আপনাকে, তা জানেন?

সে-কথা খুব ভালো করেই জানেন মণীশ। প্রসঙ্গটা মনে পড়তেই হঠাৎ ঈষিতাকে কিছু বলতে গিয়ে দেখলেন, সে শোওয়ার ঘরে গিয়ে বিছানায় ঢোকার তোড়জোড় করছে। ডোনার কথা তাকে বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। এক মেয়ে যে অন্য মেয়েদের কথা শুনতে পছন্দ করে না তা হাড়ে-হাড়ে জেনে গিয়েছেন বহুকাল। আজ দুপুরে একটা ফোন এসেছিল তাঁদের রুমে, ডোনার বাবাই ফোনটা করেছিলেন, পরশু নাকি বাড়ি ফেরার কথা ছিল ডোনার, কোন বন্ধুদে[illegible]ঙ্গে আউটিঙে গিয়েছে এখনও ফেরেনি বলে খোঁজ করছিলেন, ক্লাসের বান্ধবীরা কেউ যায়নি শুনে আশ্চর্য হয়ে রেখে দিয়েছেন ফোন।

মণীশ অবশ্য তেমন আশ্চর্য হননি, কারণ অল্প কিছুদিনের মধ্যে ডোনা তার বিচিত্র জীবনযাপনে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। সেই ডোনাই অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছিল, স্যার, অনেকেই কিন্তু হিংসে করে আপনাকে।

কথাটা ঠিকই, আরও বহুজনের চোখেই এমনই পরশ্রীকাতরতার ঝিলিক বহুদিন ধরেই দেখতে পাচ্ছেন মণীশ। সে বিদ্বেষের স্ফুরণ কখনও ক্ষীণ, কখনও তীব্র হয়ে ধরা দেয় তাঁর কাছে। কখনও শিউরেও ওঠেন তার ভয়াবহতা অনুমান করে।

দৃশ্যগুলো ভাবতে-ভাবতে লেখার টেবিলে মণীশ আর বসে থাকতে পারলেন না, আলো নিভিয়ে ধীরপায়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন তাঁদের শোওয়ার ঘরে। ততক্ষণে বিছানায় শরীর মেলে দিয়ে এটা হালকা নীল আলো জ্বেলে দিয়েছে ঈষিতা। সাদা ধবধবে মশারির ভিতর আজ ক্রিম-কালারের বেডশিট। তার ওপর শাদা নাইটিতে ওতপ্রোত হয়ে থাকা ঈষিতা কাত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে আছে এলায়িতভঙ্গিতে।

মণীশও মশারি তুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। ঈষিতা ঘুমোয়নি, জেগেই ছিল। তার চমৎকার মুখে ছড়িয়ে রয়েছে একরাশ অভিমান। বাইরে জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঈষিতা কথিত সেই ফাটাফাটি

জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার চাদরে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কলকাতার বাদবাকি মানুষ।

সে-দৃশ্যের দিকে কয়েক লহমা অপলক তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মণীশ। ঈষিতার পাশে শুয়ে তাকে কাছে টানতে-টানতে বললেন, জানো, আজকাল আমার যেন কীরকম ভয়-ভয় করে।

ঈষিতার মুখের মেঘ কেটে যাচ্ছিল। মণীশের কথায় সহসা বিস্ময় ঘনিয়ে এল তার চোখমুখ জুড়ে, সে কি, কীসের ভয়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মণীশ, তাকিয়ে ছিলেন ঈষিতার মুখের দিকেই, হঠাৎ সে-মুখ পেরিয়ে তাঁর চোখের সামনে সিনেমার স্লাইডের মতো পরপর ভেসে উঠতে লাগল অনেক দৃশ্য অনেক মুখ, অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত পটভূমিকা। যেন এই মুহূর্তে সেসব মনে পড়ার কথা ছিল না। হঠাৎ বিড়বিড় করে বললেন, মনে হচ্ছে মৃত্যুভয়। সবসময় মনে হয়, কেউ যেন আমাকে অনুসরণ করছে, আমাকে তাড়া করছে মারবে বলে।

ঈষিতা অবাক, কিছুই বুঝতে পারছিল না মণীশের কথা। এতদিন বিয়ে হয়েছে তাদের, কখনও মণীশ ও ধরনের কথাবার্তা বলেনি। বরং তার কথায় আত্মপ্রত্যয়ের ভাবই বেশি। একটা অন্যরকমের অহঙ্কার। এই মুহূর্তে অন্যধরনের কথা শুনে তার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। নাইটি সামলে ধড়মড় করে উঠে বসল, সে আবার কী কথা? কারা তাড়া করে বেড়াচ্ছে তোমাকে? তোমার কোনও শত্রু আছে নাকি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণীশ বললেন, কী জানি! আমি জানি না।

॥ ৫ ॥

চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়িতে লিভিংরুমটা বেশ বড়সড়ো এল-সেপের। এল-এর হরাইজন্ট্যাল বাহুতে চারজনের যাওয়ার মতো একটা ডাইনিং টেবিল পাতা। ঠিক তার পিছনেই কিচেন। ভার্টিকাল বাহুতে চিত্রদীপের একটা ছোট্ট লাইব্রেরি, তাতে পেইন্টিঙের বই-ই বেশি। তার একপাশে ছবি আঁকার একটা ক্যানভাস দাঁড় করানো। তাতে অর্ধেক আঁকা হয়ে রয়েছে একটি রমণী-শরীর।

প্রতিদিন সকালবেলা কিছুক্ষণের জন্য হলেও ক্যানভাসের সামনে রং তুলি হাতে নিয়ে দাঁড়ানো চিত্রদীপের অভ্যাস। দু-এক পোঁচ তুলি চালিয়ে কখনও সরে আসেন, কখনও মন লেগে গেলে সারাটা সকাল। আজ কিন্তু একবারও ক্যানভাসের সামনে যাননি, বসে আছেন পাশেই পড়ার টেবিলে। অবশ্য পড়ছেন না, চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে টুকটুক করে এঁকে চলেছেন একটি কমিক-স্ট্রিপ, আর মাঝেমধ্যে তাঁর ঠোঁটের ঘাড়-বাঁকানো পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়ছেন ফুরফুর করে।

কমিকটির বিষয় যেমন মজার, তেমনই মন দিয়ে তার বিষয়বস্তুটিতে প্রাণ সঞ্চার করে চলেছেন চিত্রদীপ। ত্রৈলোক্যনাথের একটি হাসির গল্পকে কমিকে রূপান্তরিত করছেন ক'দিন ধরে। প্রায় শেষ করে এনেছেন, হঠাৎ কিচেন থেকে মুখ বাড়ালেন বনানী, ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু—।

আর্ট-কলেজ থেকে পাস করে বেরুবার পর গত কুড়ি বছর ধরে ছবি আঁকার লাইনে রয়েছেন চিত্রদীপ, কিন্তু আর্টিস্ট হিসেবে এখনও কোনও খ্যাতি হয়নি। তাঁরই সমসাময়িক অন্য শিল্পীদের ছবির দাম যেমন চড়া, তেমনই তাদের ছবির জন্য রসিক মহলে বেশ ক্রেজ। অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের ছবি নাকি আঁকার অনেক আগেই বিক্রি হয়ে যায় চিত্ররসিকদের কাছে, তাঁদের পাশাপাশি কী কারণে যেন চিত্রদীপের ছবির বিক্রি নেই বললেই চলে। কখনও-কখনও দু-একখানা বিক্রি হয় বটে, কিন্তু তাতে একজন শিল্পীর পক্ষে শুধু ছবি এঁকে সংসার চালানো অসম্ভব।

ফলে বাধ্য হয়ে চিত্রদীপকে বেশির ভাগ সময়ই কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করতে হয়। প্রথমদিকে তো সিনেমার পোস্টার আঁকতেন, এখনও একটি বাচ্চাদের পত্রিকায় গল্প-উপন্যাসের ছবি এঁকে, কখনও ক্রমিক-স্ট্রিপ এঁকে, কখনও পত্রিকা বা বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে পয়সা রোজগার করতে হয় তাঁকে। চিত্রদীপ অনেক সময় ভাববার চেষ্টা করেছেন তাঁর ছবি বিক্রি না হওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলো, কিন্তু ভেবে বেশিদূর এগুতে পারেননি। এখনও তাঁর ছোট্ট বাড়ির এদিকে-ওদিকে কয়েকশো ছবি পড়ে-পড়ে নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় নতুন ছবি আঁকতে গিয়ে থমকে যান। কখনও আধখানা এঁকে ফেলে রাখেন অবহেলায়, মনে হয় এঁকে আর কী হবে, গ্যালারিতে শো দিলে তো অবিক্রীত অবস্থায় ফেরত আসবে আবার। তার চেয়ে খরিদ্দারের অর্ডারমাফিক কিছু বাণিজ্যিক আঁকাআঁকি করলে দুটো পয়সা আসবে ঘরে।

বনানী অবশ্য মাঝেমধ্যে উৎসাহ দিতেন, আঁকাটা একেবারে বন্ধ কোরো না তুমি। একদিন হয়তো তোমার ছবি কেনার জন্যেই লাইন পড়ে যাবে। কখনও উদাহরণ দেন, বিদেশের বহু বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর জীবনীতে লেখা আছে, যাঁরা জীবিত অবস্থায় প্রায় অখ্যাত ছিলেন, মৃত্যুর পর এখন তাঁদের একেকটি ছবি নীলামে উঠলে কয়েক কোটি টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। যেমন ধর পল গগ্যাঁর কথা, কিংবা ভ্যান গখ—।

চিত্রদীপ পাইপ দাঁতে চেপে ধরে ম্লান হেসে বলেন, উঁহু, আমার মধ্যে নিশ্চয় প্রতিভা নেই। নইলে দ্যাখো, সুহাস ভট্টাচার্যের ছবি লক্ষ-লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, আর আমার ছবি কেউ ছুঁয়েও দ্যাখে না।

এমন ভাবতে-ভাবতে কমিক-স্ট্রিপটা আঁকা শেষ করে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকেন। পত্রিকার সম্পাদক একটু পরেই লোক পাঠাবেন বলে ফোন করেছিলেন খানিক আগে। বাচ্চারা নাকি তাঁর এই কমিক-স্ট্রিপ দারুণ পছন্দ করছে। একটা বাচ্চা ছেলে চিঠিও লিখেছে এই বলে যে, হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে চিত্রদীপের কমিক-স্ট্রিপ পড়ে। চিত্রদীপ অবশ্য বুঝতে পারেন না কমিকের ম্যাজিকটা তাঁর আঁকার মধ্যে, না ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মধ্যে! এক-এক সময় মনে হয় ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মজার জন্যেই উতরে যাচ্ছে তাঁর আঁকা। কখনও অবশ্য ভাবেন, নিজেই গল্প তৈরি করে তা দিয়ে কমিক-স্ট্রিপ তৈরি করবেন কিনা। কিন্তু ভাবনাটা ভাবনার মধ্যেই থেকে যায়, আঁকতে সাহস হয় না। যদি তাতে বাচ্চারা খুশি না হয়!'

আসলে, চিত্রদীপ বুঝতে পারেন, ছবি বিক্রি না হওয়ার ফলে নিজের ওপর কনফিডেন্স ক্রমশ কমে যাচ্ছে তাঁর। এভাবেই বোধহয় অনেক প্রতিভার অকালমৃত্যু হয়ে থাকে।

ততক্ষণে ডাইনিং টেবিলের ওপর চমৎকার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে ফেলেছেন বনানী, সাজিয়ে ডাক দিচ্ছেন, শিগগির চলে এসো, নইলে, জুড়িয়ে যাবে।

কমিক স্ট্রিপটা সযত্নে একটা বই-এর মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়ালেন চিত্রদীপ। প্রায় ঘণ্টাখানেক টানা এঁকেছেন ভোরবেলা থেকে। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে আঁকলে তাঁর ঘাড়ে একটা টনটনে ব্যথা হয়। ডাক্তার বলেছে স্পন্ডিলাইটিস।

উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটা একটু পিছন দিকে বাঁকিয়ে দেখলেন, ঘাড়ের ব্যথাটা কমে কিনা, তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন ডাইনিং টেবিলের সামনে। টেবিলে সাদা কড়ির প্লেটে সাজানো আহার্যদ্রব্য দেখে তৃপ্তির স্বরে বলে উঠলেন, ফাইন।

প্রতিদিন সকালের ব্রেকফাস্টটি বেশ মনোযোগ দিয়েই বানান বনানী। সপ্তাহের সাতদিন সাতরকম মেনু নির্দিষ্ট আছে তাঁর। কখনও অবশ্য প্রথা ভেঙে নতুন কোনও রান্না তৈরি করে ফেলেন। আজ শুক্রবার, আজ অবশ্য প্রথামতো বড় এক প্লেট এগ-নুডলস, তার সঙ্গে শসাকুচি-বীট-গাজর-পেঁয়াজ কুচিয়ে স্যালাড। শেষে মস্ত একখণ্ড পুডিং।

চেয়ার টেনে বসতে-বসতে খেয়াল করলেন, মাত্র দুজনের জন্যেই আজ ব্রেকফাস্টের

আয়োজন। চামচ দিয়ে নুডলস মুখে তুলতে-তুলতে বললেন, ডোনা ওঠেনি ঘুম থেকে?

বনানী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, না। এগ নুডলস-এর দিকে মনোযোগ ছেড়ে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন চিত্রদীপ। কী একটা যেন ভাবছেন আনমনে। ভাবনার সময় তাঁর হাতে চামচ থেমে যায় রোজ। কিছুক্ষণ পরে আবার নিজে-নিজেই ধ্যান ভেঙে জিজ্ঞাসা করলেন, শিহরন ব্রেকফাস্টের টেবিলে এল না?

বনানী অবাক হয়ে বললেন, ওমা, শিহরন তো কাল রাতের ট্রেনে দিল্লি গেছে।

—তাই নাকি?

—বাহ, কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে-খেতে কত কথাই তো বলল। তুমি কি কিছুই শোনোনি।

এতক্ষণে চিত্রদীপের মনে পড়ল, কাল শিহরন এরকম কিছু বলেছিল বোধহয়। তিনি তখন অন্যমনস্ক হয়ে অন্যকিছু চিন্তা করছিলেন গভীরভাবে। ভাসা-ভাসা কথাটা কানে এসেছিল বটে। কাল দুপুরে খেয়ে-দেয়ে চিত্রদীপ বেরিয়েছিলেন অ্যাকাডেমিতে তাঁর এক বন্ধু মণিময়-এর ছবির একজিবিশন দেখতে। ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল। তার মধ্যে শিহরন কখন যেন বেরিয়ে গেছে তার ট্রেন ধরতে। তাই আর জানতেও পারেননি। মনেও নেই।

সেই কথাই আবার বললেন বনানী, ওদের অ্যাসোসিয়েশনের কী একটা জরুরি কাজে শিহরনকে দিল্লি যেতে হয়েছে।

—কবে ফিরবে?

—ফিরতে-ফিরতে তো দিন সাতেক লাগবে এরকমই বলল।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে খাবারের প্লেটে মনঃসংযোগ করলেন চিত্রদীপ। শিহরন রায়চৌধুরী তাঁদের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকে। তাঁদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা গেস্টরুম আছে, একখানা ঘর, তবে বেশ বড়ই, অ্যাটাচড বাথ। বছরখানেক হল চল্লিশ-পেরুনো এই প্রায়-যুবক ব্যাচেলরটি তাঁদের বাড়িতে থাকা-খাওয়া করছেন। তার বিনিময়ে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দিয়ে থাকেন চিত্রদীপদের। চিত্রদীপের অবশ্য এই ব্যবস্থাপনায় তেমন সায় ছিল না, হঠাৎ তাঁদের ছোট্ট নিরিবিলি পরিবারে বাইরের একজন আগন্তুককে ঠাঁই দিলে নিজেদের প্রাইভেসি তেমন থাকবে না এই ছিল তাঁর অভিমত। কিন্তু বনানী তখন যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, গেস্টরুমটা এ-বাড়ি থেকে বেশ বিচ্ছিন্নই, সেখানে একজন বাইরের লোক থাকলে কী আর এমন প্রাইভেসি নষ্ট হবে! সকালের ব্রেকফাস্ট, আর দু-বেলার লাঞ্চ-ডিনার ওর ঘরে ঠিক টাইমে পৌঁছে দিলেই তো কাজ শেষ। তার বিনিময়ে মাসে এতগুলো টাকার নিশ্চিন্ত আয় মন্দ কী। আমাদের বাড়িতে যখন মাস-পয়লার চাকরির কোনও বাঁধা আয় নেই।

শেষ কথাটা অবশ্য চিত্রদীপকে লক্ষ করেই বলা। এককালে বড় শিল্পী হবেন এমন আশা নিয়েই চিত্রদীপ কখনও চাকরির ধার ধারেননি। ফলে তাঁর বাঁধা আয় কোনওদিনই নেই। শুধু নিজের পরিশ্রম দিয়ে সংসার চালিয়ে যেতে খুব-একটা অসুবিধে তাঁর কোনওদিনই হয়নি। তবু সচ্ছলতার অভাব এখনও অনুভূত হয়। তাই নিজের অক্ষমতা মেনে নিয়েই শেষ পর্যন্ত বনানীর মত অনুযায়ী পেয়িংগেস্ট রাখতে রাজি হতে হয়েছিল তাঁকে। পরে জানতে পেরেছিলেন শিহরন একসময় বনানীরই ক্লাসমেট ছিল, কলেজে পড়াকালীন।

পেয়িংগেস্টের গতিবিধি অবশ্য শেষপর্যন্ত তার গেস্টরুমেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, শিহরন তাঁদের সংসারের একজনই হয়ে গিয়েছেন শেষপর্যন্ত। এই অবিবাহিত মধ্যবয়সি যুবকটি বেশ স্মার্ট সদালাপি এবং সমসময়েই হাস্যোচ্ছল। দু-একদিন ব্রেকফাস্টের সময় হাজিরা দিতে-দিতে এখন তিন বেলাই তিনি চিত্রদীপের ডাইনিং-টেবিলে খাওয়া-দাওয়া করেন।

তবে শিহরনের নাকি কিছু অতীত ইতিহাস আছে। অল্পবয়সে জড়িয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র

বিপ্লবের আন্দোলনে। এখন সে-ভূত অবশ্য মাথায় নেই, কিন্তু বিভিন্ন ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। আর আছে এক অদ্ভুত শখ, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। কলকাতা শহরে তার অনেক বান্ধবী আছে। প্রায়ই তাদের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যায় তাকে।

এ-বাড়িতেও যেমন বনানীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, তেমনি ডোনার সঙ্গেও। প্রায়দিনই খাওয়ার টেবিলে তর্কবিতর্ক-পরিহাসে জমজমাট করে তোলে ওরা। ডোনা আর শিহরনই এই বিতর্কসভার প্রধান আলোচক।

দুই প্রধানের অভাবে আজ ব্রেকফাস্টের আসর তাই চুপচাপ, শান্ত। চিত্রদীপ অবশ্য বেশিরভাগ দিনই নিস্পৃহ থাকেন, আজও তেমনি উদাসীন ভঙ্গিতে শেষ করলেন তাঁর পুডিং-এর প্লেট। বনানী তৎক্ষণাৎ বললেন, তোমাকে কি আর একটু পুডিং দেব? আজ অনেকটা বেশি আছে।

পুডিং-এর আসল পৃষ্ঠপোষক অবশ্য ডোনাই। খাওয়ার ব্যাপারে আজকালকার সব ছেলেমেয়েদের মতো ডোনাও ভীষণ চুজি। কোনও-কোনও খাবার সে ছুঁয়েও দেখে না। আবার কোনও-কোনও খাবার তার দারুণ পছন্দসই। বনানীর হাতের তৈরি পুডিং এরকমই ভীষণ পছন্দের খাবার ওর।

মৃদু ঘাড় নেড়ে হঠাৎই চিত্রদীপ বললেন, ডোনা কত রাতে ফিরেছে?

বনানী উত্তর দিলেন, প্রায় একটায়।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, একটা! কোথায় গিয়েছিল ওরা? সঙ্গে কে ছিল?

—সে তো তোমাকে বললাম, এবার মন্দারের সঙ্গে বেরিয়েছিল।

—আর কারা ছিল?

—আর কেউ তো নয়। অন্যবার দলবেঁধে আউটিঙে যায়। এবার কেবল ওরা দুজনেই গিয়েছিল। তোমারই বন্ধুর বাড়িতে সেই গুপ্তিপাড়ায়। তোমার টেলিফোন পেয়ে সে-ই তো ঘরের চাবি পাঠিয়ে দিয়েছিল, মনে নেই?

—শুধু মন্দার আর ডোনা। কথাগুলো বিড়বিড় করে বলে হঠাৎ কেমন যেন গুম হয়ে গেলেন চিত্রদীপ। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ফের বললেন, তা ওরা একদিন পরে ফিরবে বলে তিনদিন পরে কেন ফিরল, তা জিজ্ঞাসা করেছিলে?

বনানী ঘাড় নাড়লেন, অত রাতে ফিরেছে, এমনিতেই ঘুমে টলছিল তখন, অত-শত জিজ্ঞাসা করার সময় পাইনি।

—তাই বলে একটা ছেলের সঙ্গে তিন-চারদিন বাইরে কাটাতে হবে।

হঠাৎ চিত্রদীপের এহেন প্রশ্নবাণে বনানী কিছুটা হতভম্ব, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ও মা, তাতে কী হয়েছে? আমেরিকায় যদি এতদিন আমরা সেটল করতাম, তাহলে তো আর এ-প্রশ্ন তুলতে পারতে না। সেখানে দ্যাখোনি, ওখানকার মেয়েরা রোজ নতুন-নতুন ছেলেদের সঙ্গে ডেটিং করতে বেরিয়ে যায়। সেখানে ডোনা থাকলে আটকানো যেত! আর এ তো গেছে মন্দারের সঙ্গে। মন্দারের সঙ্গে ওর একটা কোর্টশিপ চলছে। তাতে আর আমাদের কী বলার আছে?

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন বনানীর দিকে, তারপর ঠোঁটের পাইপটা দাঁতে চিবোনোর ভঙ্গি করে বললেন, তোমরা কি তাহলে দেশটাকে আমেরিকা করে তুলছ?

—আমরা মানে! বনানী হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন।

—মানে, তোমার একটা অ্যাফেয়ার চলছে, তোমার মেয়ের একটা অ্যাফেয়ার চলছে, বেশ আছ তাহলে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছ বটে, কিন্তু আসার সময় দেশটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ।

চিত্রদীপের কথা শুনে তার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন বনানী। তাঁর চোখমুখ

সহসা বদলে কেমন হিংস্র হয়ে উঠল।' মনে হল, এর পরেই বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু তার আগেই ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে ওঠায় সেদিকে এগিয়ে গেলেন চিত্রদীপ। রিসিভার কানে দিতে শুনলেন, ওপাশ থেকে শুভব্রত চৌধুরির গলা, আপনার কমিকস্ট্রিপের পাতাটা কি শেষ হয়েছে চিত্রদীপদা?

—এই হয়ে এল, চিত্রদীপের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—তাহলে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

টেলিফোন রেখে দিয়ে চিত্রদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, বনানী আশেপাশে কোথাও আছে কিনা। যে বিস্ফোরণটি একটু আগেই হতে পারত, সেখানে এখনও বারুদ মজুত আছে কিনা সেটাই ভাবছিলেন মনে-মনে। কিন্তু বনানী সম্ভবত কিচেনে কিংবা ওপাশের শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ডোনা ক'দিন বাড়ি ফেরেনি দেখে হঠাৎই মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাকে আবার বনানী প্রশ্রয় দিচ্ছে দেখে হঠাৎই বলে ফেলেছেন কথাটা। আসলে শিহরনের উপস্থিতিটা কেন যেন আর পছন্দ হচ্ছে না চিত্রদীপের। প্রথম-প্রথম মনে হয়নি, এখন মনে হয় শিহরনের ওপর বনানীর কিছু দুর্বলতা জন্মেছে। শিহরনের বয়স অবশ্য বেশি না, চল্লিশ পেরিয়েছে। বনানীরও হয়তো তাই। তবু একদিন সন্ধের পর খেয়াল করলেন, বাইরের গেস্টরুমে শিহরন আর বনানী বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছেন নীচু স্বরে। তার পর থেকে প্রায়ই মনে হয়, শিহরনকে খুব বেশি পাত্তা দেন বনানী। এমনকী চিত্রদীপের সামনেই। এর আগে কখনও এভাবে বনানীকে বলেননি চিত্রদীপ, আজই রাগের মাথায় হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছেন তাঁর ক্ষোভ।

কমিক-স্ট্রিপটা ততক্ষণে হাতে নিয়ে তার ছবির মধ্যে কয়েকটা ডায়ালগ বসাচ্ছেন চিত্রদীপ। কথাগুলো আগেই ভেবে রেখেছিলেন, এখন চাইনিজ ইঙ্কে কলম ডুবিয়ে লিখে চললেন পরপর। লেখাটা তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎই বাড়ির ডোর-বেল বেজে উঠল। অবাক হয়ে ভাবলেন, সে কি, এর মধ্যে শুভব্রত চৌধুরি তার লোক পাঠিয়ে দিল! উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলতে যাবেন, হঠাৎ আবার টেলিফোনের ঝনঝনানি। দরজা আগে খুলবেন, না টেলিফোন আগে ধরবেন, ভাবতে-ভাবতে টেলিফোনটাই তুললেন আগে। হয়তো শুভব্রতই আবার ফোন করছে ভেবে বললেন, হ্যালো—।

—হ্যালো, আমি কি বিখ্যাত শিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলছি?

চিত্রদীপের ভুরুদুটোয় কোঁচ পড়ল, বললেন, হ্যাঁ, চিত্রদীপ চ্যাটার্জি বলছি।

—দেখুন, আমার নাম অলর্ক বোস। আমি 'এ টু জেড' নামে একটা ছোট্ট কোম্পানি খুলেছি। এই কোম্পানি কলকাতায় কয়েকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলবে শিগগির। সব ক'টা স্টোরই কলকাতার প্রধান-প্রধান রাস্তার মোড়ে। বেশ কয়েকটা স্পেসও পেয়ে গিয়েছি আমরা।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, তাতে আমার কী করার আছে?

—এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো হবে কলকাতার মার্কেটিং ওয়ার্ল্ডে একেকটি বিস্ময়। ভিতরে ছবির মতো করে সাজানো থাকবে সমস্ত পণ্যদ্রব্য। শো-রুমের ভিতরের লে-আউট থেকে শুরু করে তার দেয়ালে বিভিন্নরকম ম্যুরাল আঁকার জন্য আপনার সহযোগিতা চাই আমি।

চিত্রদীপ একটু কঠিন হয়ে বললেন, আয়্যাম স্যরি। দোকানের লে-আউট আমি করি না। ওটা আমার পেশা নয়।

—তা আমি জানি, মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি একজন বড় আর্টিস্ট। কিন্তু কখনও-সখনও কমার্শিয়াল কাজও তো করেন আপনি।

—মাপ করবেন, তাই বলে স্টেশনারি কিংবা মুদির দোকানের লে-আউট কখনও করব না।

—মিঃ চ্যাটার্জি, এই কাজের জন্য আপনি যেরকম পারিশ্রমিক চান, তাই-ই পাবেন।

তবু চিত্রদীপ আবার বললেন, আয়্যাম স্যরি মিঃ বোস, আপনি ভুল জায়গায় ফোন করেছেন।

—আমি দু-একদিনের মধ্যে আপনার কাছে ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে হাজির হচ্ছি, মিঃ চ্যাটার্জি। কাইন্ডলি আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন।

॥ ৬ ॥

বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির সেই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের ভূতটি তখনও পুরোপুরি নেমে যায়নি গার্গীর মাথা থেকে। তার মধ্যেই আর একটি ভূত হঠাৎ করে ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে। কয়েকদিন আগে কলকাতার সবচেয়ে দামি সংবাদপত্রটির সাপ্লিমেন্টের সম্পাদক তাকে ডেকে একটা ফিচার লেখার অর্ডার দিয়েছেন। সেই লেখাটার ভাবনা তার মগজে টোকা দিচ্ছিল বলে হাতের নোটবই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বর্তমান প্রজন্মের কিছু তরুণী ও কিশোরীদের ইন্টারভিউ নিতে। দু-চারদিন ঘোরাঘুরি করার পর তার নোটবইতে আপাতত অনেক সাক্ষাৎকার। সেই নোটগুলিতে চোখ বোলাতে-বোলাতে এখন মনে হচ্ছে, এই দেশটা খুব দ্রুত আমেরিকা হয়ে উঠতে চাইছে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে এই প্রজন্মের আচার-আচরণ, জীবনযাপন, কথাবার্তা—সব।

এভাবেই ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের ঘরে দেখা হয়ে গেল শঙ্খলেখার সঙ্গে। শঙ্খলেখা তখন দিব্যি ভালোমেয়ে-ভালোমেয়ে মুখ করে রিম্যানিয়ান ইন্টিগ্রালের অঙ্ক কষে গলদঘর্ম হচ্ছে। গার্গীকে দেখে বলল, কী ব্যাপার, তুই যে একেবারে নিপাত্তা হয়ে গেলি?

—আরে কী যে মুশকিলে পড়েছি। নতুন একটা ফিচার লেখার ঝামেলায় পড়ে খুব জেরবার হচ্ছি। তারপর, তুই তো এ-সপ্তাহে বাড়ি গিয়েছিলি শুনেছি। আমার জন্য কোনও খবর এনেছিস?

—খবর এনেছি বলেই তো তোর জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। ব্যাপারটা এত্ব ইন্টারেস্টিং যে, আমি নিজেও যেন থ্রিলড হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ।

শঙ্খলেখার নরম-নরম মুখখানায় হঠাৎ উত্তেজনার ঢেউখেলা দেখে গার্গী জাঁকিয়ে বসল তার পাশে, তার নোটবইয়ের সেই বীরভঙ্গপুরপর্বের পৃষ্ঠা ওলটাতে-ওলটাতে বলল, হুঁ বলতো, কী সন্দেশ এনেছিস আমার জন্যে—।

শঙ্খলেখা ততক্ষণে তার ছোট্ট দেরাজটি খুলে বার করেছে একটি ট্যাবলয়েড সাইজের সংবাদপত্রের কয়েকটি সংখ্যা। সপ্তাহে দুবার বেরোয় কাগজটা। তাতেই কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রকাশিত হয়েছে রাজবাড়িতে ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ও তার ফলো-আপ। প্রায় রুদ্ধশ্বাস কাহিনিই যেন একটি। গার্গী তার নোট বই সরিয়ে রেখে মুহূর্তে অন্তরিন হল বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির অদ্ভুত অভিনব ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

শহর থেকে অনেকখানি ভেতরে রাজবাড়ির বিশাল চেহারাটা সত্যিই নাকি দেখবার মতোই। পলেস্তারা খসে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে সরু পাতলা ধরনের পুরোনো যুগের ইঁট, তবু তার উঁচু-উঁচু গোলাকার থাম, চওড়া দেওয়াল আর উঁচু ছাদের কড়ি-বরগা বহন করছে রাজবাড়ির ঐতিহ্য। এককালে মস্ত জমিদার ছিলেন ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এদিককার লোক বড় জমিদারদের রাজা বলতেই অভ্যস্ত, সেই রাজার ছিল শ'-শ' বিঘে শালিজমি। এ ছাড়া সিন্দুক বোঝাই টাকা-পয়সা, সোনার গয়না। লোকে বলে, তাঁদের মেঝে খুঁড়লে এমন অনেক কলসি বেরুবে যার মধ্যে হীরে জহরত ভরতি। রাজার কোনও ছেলে ছিল না। কিন্তু দুটি কন্যা ছিল। দুজনেই নাকি ভারী রূপসি। এতদিন পর্যন্ত রাজবাড়ির ঐতিহ্য সবই ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু আজ থেকে আঠাশ তিরিশ বছর আগে পরপর দুটি ঘটনায়, দুর্ঘটনাই বলা যায়, বিপর্যয় ঘনিয়ে এল রাজবাড়িতে। রাজার দুই কন্যাই একে-একে রাজারানির অমতে বিয়ে করে বসল নিজেদের পছন্দ করা পাত্র। সেই যে চলে গিয়েছিল তারা রাজবাড়ি ছেড়ে, আর কখনও তাদের মুখ দেখা যায়নি বীরভঙ্গপুরে। রাজার হুকুমও ছিল নাকি

যে, তাদের দেখামাত্র যেন গুলি করে মেরে ফেলা হয়। রানিমাও এত আঘাত পেয়েছিলেন যে কোনও মেয়েরই আর মুখ দর্শন করেননি। তারপর বছর দশেক আগে মারা গেছেন ব্রজেন্দ্রলাল। এতদিন রানিমাই দেখাশুনো করেছেন সেই বিপুল সম্পত্তি। তারপর তিনি খুন হতে সেখানে এখন টালমাটাল অবস্থা।

একটার পর একটা পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছে গার্গী, আর তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে এ-যুগের এক রাজকাহিনি। পড়তে-পড়তে মুখ তুলল, আশ্চর্য হয়ে বলল, মেঝে খুঁড়লে সোনা হীরে জহরত ভরতি কলসি পাওয়া যাবে। খুব ইন্টারেস্টিং তো! যাই হোক, কিন্তু তারপর তো আর কোনও সংবাদ নেই! সেই উত্তরাধিকারত্বের ঝামেলাটা এখনও রয়ে গেল।

শঙ্খলেখা মিটমিট করে হাসল এবার, সেটাই তো সদ্য জেনে এলাম এবার বাড়ি গিয়ে। সে-খবর বাই-উইকলির যে সংখ্যায় ছাপা হয়েছে সেটা এমন হটকেকের মতো বিক্রি হয়েছে যে, অনেক কষ্ট করেও জোগাড় করে উঠতে পারিনি। একেবারে রুদ্ধশ্বাস কাহিনি—।

গার্গীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, কী খবর?

—রাজবাড়ির সাতকুলে কেউ আর বেঁচে নেই এমনই জানত সবাই। হঠাৎ একজন যুবক খবরের কাগজে তাদের বিজ্ঞাপন দেখে এসে হাজির হয়ে জানিয়েছে, সে-ই এই রাজবাড়ির উত্তরাধিকারী। অমনি তাদের ট্রাস্টিবোর্ডের উকিল নাকি মেনে নিয়েছে তাকে। সে-ই বিশাল সম্পত্তির মালিক এখন।

গার্গীও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, তাই?

—হ্যাঁ। কিন্তু রাজবাড়ির কেউ তাকে মানতে চাইছে না। বলছে, সে রাজবাড়ির কেউ নয়। ভুয়ো উত্তরাধিকারী।

—রাজবাড়িতে আর কারা থাকে?

—ও বাড়িতে যারা আশ্রিত হিসেবে থাকে, তারাই তো বুড়ি রানিমাকে দেখাশুনো করেছে এতদিন। ভেবেছিল, বুড়ি মরে গেলে তারা এ-বাড়ির সম্পত্তি ভোগ করবে।

—তাহলে সেই ছেলেটা কে?

—সে নাকি গিয়ে বলেছে, তার নাম অলক বোস। রানিমার এক মেয়ের ছেলে। কিন্তু চেহারা একেবারে সাহেবদের মতো। গায়ের রং লাল। চুল-দাড়ি সবই নাকি লালচে ধরনের।

গার্গী ঘটনাটা নিয়ে কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে ভাবল নিজের মনে। এসব ঘটনা যেন গল্প-উপন্যাসেই পড়া যায়। হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর এই শেষপাদে পৌঁছেও এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না। কে যেন বলেছিলেন সামটাইমস ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। ভাবতে-ভাবতে নিজের মনেই বিড়বিড় করল সে, অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত। তারপর হঠাৎ বলল, রানিমার সেই খুনের ঘটনা? তার কোনও তদন্ত হয়েছে কে খুন করল তাকে! কেনই বা!

—না। থানা থেকে একদিন এসে হরিশংকর চৌধুরিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার ছেড়ে দিয়েছে তাকে। তারপর আস্তে-আস্তে ধামা চাপা পড়ে গেছে এতদিনে। আসলে রাজবাড়ির ব্যাপার চিরকালই একটু রহস্যময় লাগত স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে। এখনও তার সবকিছুই রহস্যে ভরা। শুনলাম, সাহেবপানা যে ছেলেটা উত্তরাধিকারী হিসেবে সব সম্পত্তির মালিক হয়েছে, তার সঙ্গে ওদের বাড়ির হেড-লেঠেল হরিশংকর চৌধুরির তকরার হয়েছে।

—তকরার!

—মানে তর্কাতর্কি। তাতে দুজন-দুজনকেই শাসিয়েছে, পরে হেস্তনেস্ত করবে বলে।

—বাহ্, তাহলে তো বেশ জমেছে ব্যাপারটা, একদিন তাহলে যেতেই হচ্ছে ওখানে। গার্গী হাসতে-হাসতে বলল।

সত্যিই এক অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পেয়ে তার ভেতরে তোলপাড় হচ্ছে তখন। যে-ঘটনার

সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই, হয়তো খবরের কাগজ না পড়লে, জানতেই পারত না ব্যাপারটা, তেমন একটি ঘটনার সঙ্গে সে যেন ওতপ্রোত হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

কিন্তু যাই হোক, গার্গীর মাথায় তখন একই সঙ্গে অন্য চিন্তাও চারিয়ে যাচ্ছে এবার। নতুন ফিচারটির সন্ধানেও তো তাকে বেরোতে হবে। নইলে ওদিকে গোঁসা হবে সম্পাদকের। অতএব হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পায়ে-পায়ে ঘুরল সে। কিছু ভাবছিল, আবার ভাবছিলও না। ঘুরতে-ঘুরতে প্রায় আচমকা ধরা পড়ে গেল আর এক তরুণীর হাতে। তার পরনে বেশ মড-ধরনের পোশাক। গার্গীকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, হাই, তুই এখানে কেন? বিদেশি অনুপ্রবেশকে আমরা বেশ সন্দেহের চোখে দেখছি আজকাল—।

গার্গী চমকে উঠে দেখল, সে ঢুকে পড়েছে তুলনামূলক সাহিত্যের চত্বরে। তরুণীটি আর কেউ নয়, তার অতি সাম্প্রতিক বান্ধবী ডোনা।

গার্গী কিছু অবাক, কিছু দোলাচলভঙ্গিতে তাকাল ডোনার দিকে। ডোনা এই চত্বরে বেশ বিখ্যাত মেয়ে। তবে ছাত্রী হিসেবে নয়, সে প্রসিদ্ধ তার বোহেমিয়ানা স্বভাবের জন্য। পোশাকের ব্যাপারে সে যেমন সবচেয়ে দুঃসাহসী, তেমনই তার চোখা-চোখা কথাবার্তা, অদ্ভুত চালচলনের জন্যও সবার নজর কাড়ে অহরহ। আজও সে পরেছে লালরঙের একটি চাপা স্ল্যাকস। গায়ে ততোধিক চাপা স্লিভলেস জামা। হঠাৎ তার শরীরের দিকে তাকালে গা-টা শিরশির করে যেন। গার্গী নজর ফিরিয়ে বলল, কেন?

উত্তর না দিয়ে ডোনা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করল, নিশ্চয় তুই কারও দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছিস এখানে? কোনও অধ্যাপকের?

—উহুঁ, মনে কর, আপাতত তোর হৃদিশেই।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, আমার খোঁজে। নো, নো, মাই ফ্রেন্ড, গার্গী মুখার্জি আমার খোঁজে কমপ্যারেটিভ লিটারেচার ডিপার্টমেন্টে আসবে, এ-কথা মরে গেলেও আমার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু ম্যাথসের ছাত্রী হঠাৎ এ-দপ্তরে কেন তা জানতে ভারী আগ্রহ হচ্ছে।

গার্গী হাসল, তার হাসির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকে বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক, বলল, একটা ফিচার তৈরি করছি আমাদের প্রজন্মের মেয়েদের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে। তুই নিশ্চয় এ-কথা স্বীকার করবি, আমাদের মা-কাকিমা কিংবা মাসি-পিসিরা যেভাবে জীবনযাপন করত তাদের কৈশোর কিংবা যৌবনে, এখনকার মেয়েরা তাদের চেয়ে একেবারেই আলাদা!

—অফ কোর্স।

—আমার ফিচারের বিষয়বস্তু সেটাই। হঠাৎ এমন করে বদলে গেল কেন মেয়েরা, সে ব্যাপারে তোর মতামত নিতে চাই।

—গুড হেভেনস! তুই ম্যাথস পড়তে-পড়তে হঠাৎ সোসিওলজির ব্যাপারে এত আগ্রহী হলি কেন? ম্যাথসে এম. এস. সি করে সোসিওলজিতে ডক্টরেট করতে চাস নাকি?

—না, না, তা নয়। গার্গী হেসে উঠল, জাস্ট ফর কিউরিওসিটি। আমার এরকম হাজারো কৌতূহল থাকে চারপাশে যা-সব ঘটে যাচ্ছে তাই নিয়ে।

—সে তা ডিবেট-কম্পিটিশনে তোর চ্যাম্পিয়ন হওয়া দেখেই বুঝেছি। সেও তো তোর নিজের সাবজেক্ট নয়। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের বিষয় নিয়ে সেদিন যেভাবে লড়ে গেলি—। তা হঠাৎ আমার কাছে কেন?

—তোর বোহেমিয়ান জীবনযাপন এই চত্বরে আজকাল গসিপের বিষয়বস্তু। হঠাৎ কানে এল, তুই নাকি কার সঙ্গে ডেটিং করে ফিরেছিস, আর সেটা ফলাও করে বলে বেড়াচ্ছিস একে-ওকে। শুনে মনে হল, ব্যাপারটা আনলাইক বেঙ্গলিজ। তুই অন্য সবার থেকে আলাদা। দুঃসাহসী।

ডোনা খিলখিল করে হেসে উঠল, দ্যাটস জাস্ট ফর ফান। আই লিভ ফর ফান, বুঝলি?

হি-হি-হি-হি...সেদিন যখন মারুতি চালিয়ে ফিরছি, সেই ছেলেটা তার টেন্ডার মিস হয়ে গেল বলে কেবলই হাপসি কাটছিল। তা আমি বললাম, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তুলনায় টেন্ডার একটা ভারী সামান্য ব্যাপার। এই দ্যাখো সামনে একটা ট্রাক আসছে, একটা অ্যাকসিডেন্ট করি। তখন দেখবে টেন্ডার-ফেন্ডার সব আসলে মায়া। শুনে বুঝলি, ছেলেটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল প্রায়, বলল, মেরো না, মেরো না, প্লিজ—।

ডোনার বলার ভঙ্গিতে গার্গীর হাসি পেয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর হাসি-হাসি মুখে বলল, তুই পারিসও বটে। তা হঠাৎ বিদেশি অনুপ্রবেশ নজরে পড়লে তোরা সন্দেহের চোখে দেখছিস কেন?

ডোনা মিটমিট করে হাসল, তা হলে আয়, তোর ওই 'কিউরিওসিটি'র কাজে লেগে যাবে এমন কিছু তথ্য জোগাড় করে দিই। আধুনিক প্রজন্মের মেয়েরা ঠিক কীরকম—।

যে বিল্ডিংটিতে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ানো হয়, তার একতলার বারান্দায় এককোণে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে আনমনে। তরুণীটিকে গার্গী চেনে না, কিন্তু তার উদাসীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। পরনে চটলা-ওঠা নীল রঙের জিনস আর সাদা শার্ট। দূর থেকে দেখে মনে হল, চোখের চশমাটা সে উঠিয়ে রেখেছে মাথার ওপর, মাথার, চুলে। কানের দুপাশ থেকে চশমার কালো কার নেমে এসেছে গলার দুপাশে। দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, অথচ মৃদু-মৃদু দুলছে তার শরীর। যেন তালে-তালে পা নাচাচ্ছে—।

ডোনা গলা নামিয়ে বলল, এও কিন্তু বিদেশি অনুপ্রবেশ। ইংরেজির ছাত্রী।

তারপর বেশ সপ্রতিভভঙ্গিতে মেয়েটির কাছে গিয়ে বলল, হা-ই।

মেয়েটি কিন্তু শুনতেই পেল না ডোনার ডাক। বরং তার শরীর কী এক অদ্ভুত তালে দুলে-দুলে উঠছে। ডোনা ফের ডাকল, হাই ইলিনা—।

ইলিনা নামের মেয়েটি তখনও ভাবে বিভোর। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ডোনা একেবারে তার সঙ্গে কাছে গিয়ে কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, হোয়াট হ্যাপেনড ইলিনা, সো এ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড—!

ইলিনা এতক্ষণে হুঁসে ফিরে এল যেন। ততক্ষণে তার কানের কাছে ঝুলতে থাকা কালো কার টেনে সরিয়ে দিয়ে বলল, কিছু বলছিস, ডোনা?

ডোনা খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে, ও, তাই বল। তাহলে তুই বিভোর হয়ে ওয়াকম্যান শুনছিলি।

গার্গীর খেয়াল হয় এতক্ষণে। তাই তো, মাথার ওপর তোলা ডাঁটিটা তো চশমার নয়, ওয়াকম্যানের। দেখেই হাসি পেয়ে গেল তার। বেশ মজার মেয়ে তো।

ডোনা হাসি থামিয়ে বলল, কী ব্যাপার, ইলিনা, কার মিউজিক শুনছিস অত মন দিয়ে?

—কার আবার। মাইকেল জ্যাকসনের। কী দারুণ গেয়েছে। শুনবি-শুনবি বলে তাড়াহুড়ো করে তার ওয়াকম্যানটি পরিয়ে দিতে চায় ডোনার কানে।

ডোনা তাকে নিবৃত্ত করে আগের প্রশ্নটাই ফের করল, কিন্তু হঠাৎ ইংলিশ ডিপার্টের ছাত্রী কমপ্যারেটিভে কেন, মাদামাজেল?

ইলিনা হঠাৎ মুখটা সিরিয়াস করে বলল, আমি তো এম. আর-এর জন্য ওয়েট করছি।

ডোনা মুহূর্তে গার্গীর সঙ্গে চোখাচোখি করে নিল, তারপর বলল, কেন, এম. আর-এর জন্য কেন?

ইলিনা হাসি-হাসি মুখে বলল, উনি তো আমাকে শেক্সপিয়ার-এর ওপর লেখা একটা বই দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু সেই কখন থেকে এসে ওয়েট করছি। এখনও প্রফেসর্স রুমে ফেরেননি।

ডোনা ভুরু কুঁচকে বলল, ফেরেননি। মানে? আমাদের ক্লাস তো সেই কখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তুই নিশ্চয় অনেকক্ষণ ওপরে যাসনি।

ইলিনা আঁতকে ওঠে, তাই! এ হে, আমি আসলে গানের মধ্যে ছিলাম তো। বলেই হুড়মুড় করে ছুটল দোতলায়, যেন তার ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে।

তার ছোটার ভঙ্গি দেখে ডোনা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। গার্গী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এম. আর-এর ফ্যান বুঝি ও?

—শুধু একা ইলিনাই নয়। মণীশ রায়ের যে কত্ত ফ্যান তা তুই ভাবতে পারবি না। যেদিন মণীশ রায়ের ক্লাস থাকে, সেদিন আমরা বসার সিটই পাই না ক্লাসে। অন্য ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা এসে দলে-দলে ভিড় করে মণীশ রায়ের লেকচার শুনতে।

—তাই! খুব ভালো পড়ান বুঝি?

—পড়ান অবশ্য ভালোই। বিদেশি-সাহিত্য এত নিখুঁতভাবে পড়েছেন, আর তা এমন চমৎকারভাবে এক্সপ্লেন করেন যে, অবাক হয়ে শোনার মতোই। কিন্তু অন্য মেয়েরা তো ওঁর পড়ানো শুনতে আসে না, ওঁকে দেখতে আসে। এমন সুপুরুষ চেহারা এই চত্বরে চট করে দেখতে পাবি না।

—মাই গড। গার্গী অবাক হয়ে বলল, খুব ক্রেজি তো তাহলে মেয়েগুলো।

—তাহলেই দ্যাখ, ডোনা গার্গীর দিকে তাকিয়ে তার ভুরু নাচায়, এ ব্যাপারটা তোর কাছে একটা ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট। তোর ডায়েরিতে এই পয়েন্টটা অনায়াসে নোট করতে পারিস।

গার্গী হেসে বলতে যাচ্ছিল, ব্যাপারটা অবশ্যই নোট করব। এই ক্রেজটাই তো আমার কৌতূহলের বিষয়বস্তু, কিন্তু হল না, তার আগেই ডোনা তার ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে মুখে স-স-স-স শব্দ করে চুপ করতে বলল গার্গীকে। ততক্ষণে সেখানে হনহন করে এসে পড়েছে উজ্জ্বল হলুদরঙের শাড়ি পরে আরেক তরুণী। লবজ করা চুল কপালে লতিয়ে নেমেছে, কানে বড়-আকারের ঝুমকো দুল। চোখে পড়ার মতো সাজ। তাকে থামিয়ে ডোনা বলে উঠল, তুই কি এম. আর-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস, তিতির? উনি কিন্তু একটু আগে বেরিয়ে গেলেন।

তিতির নামের মেয়েটি হতাশ হয়ে বলল, তাই নাকি? উনি যে বলেছিলেন সোয়া একটা নাগাদ আসতে?

—হুঁ। কিন্তু হঠাৎ বাড়ি থেকে টেলিফোন এসেছে, ওঁর মিসেসের শরীরটা ভালো নেই। তাই-ই—।

—তাই? মেয়েটি গম্ভীর হল। সুপুরুষ পুরুষদের 'মিসেস' থাকার অস্তিত্ব কোনও প্রেমিকা বা ফ্যানই বোধহয় পছন্দ করে না। একমুহূর্ত অন্যমনস্ক থেকে সে আবার পা বাড়াল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই।

তিতির চোখের আড়াল হতেই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে ডোনা, বলল, আমার খুব মজা লাগে এইসব ক্রেজি মেয়েগুলোকে নিয়ে একটু নাচানাচি করতে। এই মেয়েগুলোর স্বভাবই এই যে, তারা কোনও-না-কোনও ছলছুতোয় মণীশ রায়ের কাছে যাবে, তাঁর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করতে পারলে কৃতার্থ বোধ করবে।

—আশ্চর্য, এতদিন হয়ে গেল এখানে পড়ছি, অথচ তোদের ডিপার্টে এমন একটি সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন আছে তা কেউ কখনও আমাকে বলেনি তো।

—এ তো কেউ কাউকে বলে না। সবাই ভাবে, এম. আরের সান্নিধ্য সে একাই উপভোগ করবে। যারা জানবার তারা ঠিকই খুঁজে নেয় এই দপ্তরের ঠিকানা। তোর এরকম কোনও ধান্দা থাকলে নিশ্চয় জেনে যেতিস।

—এম. আর. নিশ্চয়ই বিবাহিত?

—হুঁ, লেট-ম্যারেজ। এতদিন কয়েকহাজার মেয়েকে সান্নিধ্য দেওয়ার পর হঠাৎ কিছুদিন আগে ফেঁসে গেছেন। বিয়ে করেছেন ওঁর ক্লাসেরই এক ছাত্রীকে। কী করে আরও হাজারখানেক ছাত্রীকে

ওভারটেক করে সে এম. আর-কে বিয়ে করতে পারল, তা নিশ্চয়ই তোর কাছে এক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

—যা বলেছিস। তাহলে তো ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আলাপ করতে হয়।

ডোনা আঁতকে উঠে বলল, ওঁর সঙ্গে আলাপ করলে তুইও ফেঁসে যাবি কিন্তু। আর বেরিয়ে আসতে পারবি না। নারীদের মোহিনীশক্তি থাকে জানতাম, কিন্তু পুরুষদের আকর্ষণী-ক্ষমতা যে এত প্রবল হতে পারে তা ওঁকে দেখে প্রথম জানতে পারলাম।

—তোকে আকর্ষণ করেন না।

—যখন প্রথম পড়তে এসেছিলাম, তখন ওঁর রূপ, কথা বলার স্টাইল, পড়ানোর চার্ম আমাকেও মুগ্ধ করত। কিন্তু পরে মনে হল, আমি একজন মেয়ে, কোথায় আমাকে দেখে সবাই মুগ্ধ হবে, তা নয় তো আমিই মুগ্ধ হচ্ছি এক পুরুষকে দেখে। এ বড় অনাছিষ্টি ব্যাপার। এরকম হওয়া উচিত নয়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বদলে গেলাম। এখন অন্য মেয়েদের আদেখলেপনা দেখলে হাসি লাগে আমার। ওদের নিয়ে প্রায়ই এরকম মজা করি আমি।

গার্গী কয়েকমুহূর্ত ডোনার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ডোনা আসলে নিজেই সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন হতে চায়। সে চায়, অন্যে তাকিয়ে থাকুক তার দিকে। অন্যেরা ছুটুক তার পিছনে। সে কারও পিছনে ছুটবে না। বোধহয় তাই তার এমন অদ্ভুত পোশাক, এমন বোহেমিয়ানা জীবনযাপন। খানিক পরে বলল, একালের মেয়েরা সত্যিই আশ্চর্যের। ভেরি-মাচ ক্রেজি অ্যান্ড আনপ্রেডিক্টবল। বোধহয় মেয়েদের ষোল থেকে উনিশ কুড়ি বয়সটাই এমন। এই বয়সে মেয়েরা কাউকে-না-কাউকে পাগলের মতো ভালোবেসে ফ্যালে। কাকে ভালোবাসছে তা খতিয়ে দেখার সময় নেই তাদের। মনে নেই, মীরাকে বলা হয়েছিল পাথরের তৈরি কৃষ্ণমূর্তিটি তার স্বামী? ব্যস, বাকি জীবন সে পাথরের মূর্তিটিকে স্বামী বলে পুজো করে গেল। তবে আদ্যিকালের মেয়েরা বোধহয় এমন ভীষণভাবে ক্রেজি ছিল না, যা এখনকার মেয়েরা। আসলে পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশ যত ঘটছে, ততই চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে মেয়েদের। সামনে ঝলমলে যা-কিছু দ্যাখে, তার পিছনেই ছুটতে চায়। আজকালকার প্রায় সব ইয়াং মেয়েরাই ভাবে সাজগোজ করে এক-একজন ফিল্ম অ্যাকট্রেস হয়ে উঠবে। দামি কসমেটিকস মাখবে যেগুলো রোজ তারা টিভি-র বিজ্ঞাপনে দ্যাখে। ভালো বাড়িতে থাকবে, গাড়ি চড়বে, ভালো খাবার খাবে। যেমন আজকালকার সব ইয়াং মা-ই ভাবে তার ছেলে ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়বে। সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে। সি. এ. অথবা আই. এ. এস.। ফলে সবার সঙ্গে সবার এক অন্তহীন প্রতিযোগিতা।

ডোনা হেসে বলল, স্টাডি করার বিষয়বস্তু ভালোই বেছেছিস তুই।

—মাঝেমধ্যে দাদার বাচ্চাটাকে স্কুলের গেটে পৌঁছে দিয়ে আসতে কিংবা নিয়ে আসতে হয়। গেটের সামনে অপেক্ষা করার সময় কয়েক হাজার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে তাদের আলোচনা কানে আসে। সে যা ইন্টারেস্টিং আলোচনা, শুনতে-শুনতে মনে হয়, আমাদের শৈশবে আমাদের মায়েরা এসব ভাবেইনি কখনও। হঠাৎ দশ-পনেরো বছরের মধ্যে কয়েকযুগ এগিয়ে গেছি যেন আমরা।

গার্গীরা লম্বা বক্তৃতা শুনতে-শুনতে ডোনা অল্প-অল্প হাসছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল দূর থেকে হনহন করে হেঁটে আসছেন তাদের এক অধ্যাপক। সে ঠোঁটে হিসহিস শব্দ করে বলল, ইটস অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং কেস। আর. ডি. আসছেন।

আর. ডি.-এর পরনে ঘন ছাই রঙের প্যান্ট। গায়ের সাদার ওপর নীল সরু স্ট্রাইপের জামাটা প্যান্টের ভিতর বেশ নিখুঁত করে গোঁজা। দ্রুত হেঁটে আসা দেখেই বোঝা যায় এক্ষুনি তাঁর ক্লাস আছে। চলতে-চলতে হঠাৎই ডোনাকে দেখে থমকে গেলেন, ক্লাসে যাবে না?

—যাব, স্যার।

আর ডি-র হঠাৎ নজর পড়ল গার্গীর দিকে। এমনিতে চেনার কথা নয়, তবু চিনলেন, তুমি এবার ডিবেট কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলে না।

গার্গী খুব লজ্জা পেয়ে বলল, হ্যাঁ, স্যার।

—বাহ্। ভালো। তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন দুজনে।

ডোনা হঠাৎ ফস করে বলল, স্যার, এম. আর.-এর সঙ্গে আলাপ করার খুব শখ ওর। তাই অপেক্ষা করছে। ইলিনা বলে একটা মেয়ে প্রায় আধঘণ্টা আগে এম. আর এর কাছে গেছে শেক্সপিয়ার-এর ওপর একটা বই আনতে। কিন্তু এখনও ওঁর ঘর থেকে বেরোয়নি।

তৎক্ষণাৎ আর ডি-এর মুখটা শক্ত হয়ে গেল। মুখটা সামান্য বাঁকিয়ে গার্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী বই-এর দরকার?

ভীষণ বিব্রত, বিপন্ন দেখাল গার্গীকে, হঠাৎ ডোনা তাকে এমন অপ্রস্তুত করে দেবে তা সে একবারও ভাবতে পারেনি। আর ডি-র প্রশ্নের উত্তরে সে কী জবাব দেবে ভাবতে-ভাবতে একমুহূর্ত লাল হয়ে গেল। কিন্তু উত্তর দিতে হল না তাকে, তার হয়ে দ্রুত উত্তর দিল ডোনাই, স্যার গার্গী ম্যাথস-এর ছাত্রী, আইনস্টাইন-এর রিলেটিভিটির ওপর কী যেন একটা বই চাই বলছিল।

আর. ডি.-র মুখটা আবারও পাথর হয়ে গেল, চোয়াল দুটো ঘৃণায় বেঁকেও গেল একটু, বললেন, ও মণীশ আজকাল ম্যাথস-এর বইও সাপ্লাই করছে নাকি?

ডোনা হেসে বলল, স্যার, আপনার কাছে আছে নাকি বইটা? তাহলে আর ওকে এম. আর.-এর জন্য ওয়েট করতে হয় না।

আর. ডি. গম্ভীর হয়ে বললেন, না, ম্যাথস তো আমার সাবজেক্ট নয়। বলে হনহন করে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে।

আর. ডি অন্তর্হিত হওয়ার পরের মুহূর্তেই ডোনা আবার খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। গার্গী অপ্রস্তুত মুখে বলল, তুই ভারী অদ্ভুত তো?

—দেখলি, এম. আর.-এর নাম কানে যেতেই আর. ডি-র মুখখানা কীরকম স্টিফ হয়ে গেল?

—তা তো দেখলাম। দুজনের মধ্যে খুব রেষারেষি বুঝি?

—ভীষণ। আসলে এটাই তো হিউম্যান সাইকোলজি। সব মেয়েরা যেভাবে এম. আর, এম. আর. করে পাগল, তাতে তার সহকর্মীর তো ঈর্ষা হওয়ারই কথা।

—আর তার মধ্যে আবার তুই আমাকে লটকে দিলি?

ডোনা আর একদফা হেসে উঠে বলল, ভাগ্যিশ সেই মুহূর্তে আইনস্টাইন-এর রিলেটিভিটির কথা পট করে মনে পড়ে গেল। ব্যস, এক আইনস্টাইন-এর নামেই আর. ডি. কাত। সাহিত্যের বই-এর নাম মনে পড়লে হয়েছিল আর কি। তোকে টানতে-টানতে নিয়ে যেতেন ওপরে, বলতেন ওহো, ও-বইটা তো আমার কাছেই আছে—।

ফের আঁতকে উঠল গার্গী, ও মা গো—।

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল ডোনার, এ হে, আর. ডি.-র ক্লাসে যেতে হবে যে। একবার যখন দেখে ফেলেছেন, তখন ক্লাসে না গেলে পরের দিন ক্লাসেই ধরবেন, কী হল, ডোনা, এম. আর.-এর ক্লাস হলে নিশ্চয় এভাবে অফ দিতে না—।

॥ ৭ ॥

কালো রঙের একটা বিশাল কনটেসা চালিয়ে অলর্ক একদিন সকালে ঢুকে পড়ল যোধপুর পার্কের ভিতর। লক্ষ রাখছিল কেউ তাকে ফলো করছে কি না। রাস্তার দুপাশে লেটেস্ট ডিজাইনের রঙচঙে

দোতলা তিনতলা বাড়িগুলো ফেলে, কয়েকবার ডাইনে বাঁয়ে পাক খেয়ে, একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে সে এসে থামল চমৎকার, প্রায় ছবির মতো দেখতে একটা একতলা বাড়ির সামনে। এরকম নতুন সব পল্লী কলকাতার যেখানেই গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে যেমন এই যোধপুর, কিংবা আলিপুর, লেকটাউন বা সল্টলেক এলাকায়, সেখানেই আর্কিটেক্টদের এমন অভাবনীয় চোখ-ধাঁধানো, স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে অহঙ্কারীর মতো। কনটেসার ইঞ্জিন বন্ধ করে অলর্ক বেশ কিছুক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়িটার দিকে।

কয়েকদিন আগে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে ফোন করা মাত্র পত্রপাঠ রিফিউজড হয়েছিল সে। অবশ্য কর্কশ কণ্ঠের 'সরি' শুনেও বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায়নি। শিল্পীরা এমন রুক্ষমেজাজের, একগুঁয়ে হতে পারে এমন আভাস তার এক বন্ধু দিব্যজ্যোতি আগেই দিয়েছিল তাকে। যে-কোনও শিল্পীই তার আঁকাজোকার গণ্ডির বাইরে বেরুনোকে খুবই অপছন্দ করবেন সেটাই সম্ভব। কিন্তু চিত্রদীপ শুধুমাত্র শখের শিল্পী নন, কিছু-কিছু কমার্শিয়াল কাজও করে থাকেন এ খবর তার কাছে আছে। তাইই আজ তার হঠাৎ এই যোধপুর পার্কে অভিযান। চেনাগণ্ডির বাইরে তাঁকে যে-কোনও ভাবেই হোক বের করে আনতে হবে অলর্ককেই। তার জন্যে প্রস্তুতি দরকার, সময় চাই, শিল্পীকে সেভাবেই আস্তে-আস্তে আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে, তাকে রাজি করাতে হবে।

এককালের রকবাজ ছোকরা অলর্কের সামনে এখন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। যজ্ঞই বটে। সে যজ্ঞ সঠিকভাবে, এবং হ্যাঁ, দুরন্তগতিতে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে তাকে খুব হিসেব করে এগুতে হবে এখন।

রকের আড্ডাবাজ ছোকরা যে হঠাৎই এভাবে একইসঙ্গে রাজপ্রাসাদ ও রাজকোষের মালিক হতে পারে, তা কোনও গল্প-উপন্যাসে পড়া থাকলেও কখনও সত্যি হয় তা ভাবতে পারেনি। অলর্ক। কলকাতার রাসেল স্ট্রিটের এক পুরোনো বাড়িতে তার আশৈশব বসবাস। পিতৃদত্ত এই অদ্ভুত ধরনের প্রাচীন বাড়িটি ছাড়া তার আর কোনও সম্পত্তি ছিল মা ভূভারতে। তার বাবা ছিলেন আর্মেনিয়ান, কিন্তু মা এদেশি রমণী। সে কারণে তার জন্ম-রহস্যটি ভারী গোলমেলে। জন্মের কারণেই তার চোখর তারা নীলচে, চুল একটু সোনালি ধরনের, গায়ের রংও অসম্ভব ফরসা। তার ওপর চুল-দাড়ি লম্বা করে রাখায় তার চেহারাটা দেখায় প্রায় যিশুর মতো। তার মা হঠাৎ করে মারা যাওয়ায়, এবং বাবা এদেশ ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার পর এই পৃথিবীতে সে হয়ে গেল একেবারে ছন্নছাড়া, নিঃসঙ্গ। তার এমন কোনও যোগ্যতা ছিল না। যাতে সে নিজের ভরণপোষণের সংস্থানটুকুও করতে পারে। শুধু বাবার জমানো টাকার সুদ হিসেবে মাসে হাজার দেড়েক টাকা তার একমাত্র সম্বল। তাতেই তার একার জীবনযাপন চলে যাচ্ছিল কোনওক্রমে। বাড়তি রোজগারের জন্য কোনও চেষ্টাই করেনি। হঠাৎই তার জীবনে ঘটে গেল এক অলৌকিক ব্যাপার।

আকস্মিকভাবে তার কাছে খবর এসে পৌঁছুল তার কোনও এক দিদিমা নাকি সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। তিনি ছিলেন এক বিশাল সম্পত্তির মালিক, রাজৈশ্বর্যই বলা চলে, কিন্তু কোনও উত্তরাধিকারি ছিল না সেই অগাধ রাজকোষের। ছিল না নয়, সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তরাধিকারীর অভাবে যখন বীরভঙ্গপুরের সেই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা অন্যের করায়ত্ত হতে চলেছে, ঠিক সেসময়ে কোনও শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে একটা খবর তার কাছে এসে গেল অদ্ভুতভাবে। অলর্কই নাকি সেই উত্তরাধিকারী। সম্পত্তি বেহাত হওয়ার আগে তার এক্ষুনি পৌঁছনো দরকার সেখানে। এই মুহূর্তে। শুনে অলর্ক বিস্মিত, স্তম্ভিত। সে নিজে খুব অবহিত ছিল না এ-ব্যাপারে। এহেন কোনও দিদিমার কথা তার শৈশবে কৈশোরে কখনও শোনেওনি মায়ের কাছে। ইতিমধ্যে তার মা মারা যাওয়ায় এখন জানার কোনও প্রশ্নও ওঠে না। তবু খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে দেখল এক এলাহি কাণ্ড।

শুধু যে দিদিমার বাড়িটাই এক রাজপ্রাসাদের মতো তা নয়, বাড়িতে মজুত আছে ব্যাঙ্কের

আমানতের প্রচুর কাগজপত্র। তাছাড়া দু-তিনটে সিন্দুকভরতি সোনাদানা। দাদামশাই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর পূর্বপুরুষরা এককালে রাজা ছিলেন। এখন রাজত্ব গেছে, কিন্তু তিলতিল করে সঞ্চিত অর্থ তাঁরা যক্ষের মতো আগলে রেখে গেছেন আমৃত্যু। বছর দশেক আগে দাদামশাই মারা যাওয়ার পর বিধবা দিদিমাও সে অর্থ প্রাণ ধরে খরচ করে উঠতে পারেননি। শুধু একপাল পোষ্য পালন করে গেছেন প্রাসাদটিতে।

শেষে মৃত্যুর আগে একটি উইল করে তাতে নির্দেশ দিয়ে যান: আমার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই বংশের জীবিত নাতি। তার নাম অলি।

অলিই যে অলর্ক, সে কথা অলর্ক জানে না। তার ডাকনাম টৌটো, কস্মিনকালেও অলি ছিল না। কী ভাবে যে বহু বাধাবন্ধ ডিঙিয়ে দিদিমার মৃত্যুসংবাদও তার উত্তরাধিকারী হওয়ার সংবাদ তার কাছে পৌঁছুল সেটাও তার কাছে ভারী রহস্যজনক। আসলে সম্পত্তির অনেক দাবিদার জুটে গিয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই ছলে-বলে-কৌশলে হাতিয়ে নিতে চেয়েছিল এ বিপুল সম্পত্তির সিংহভাগ। তাদের মধ্যে যারা এই চাতুর্যের খেলায় হেরে যেতে বসেছিল, তাদের কেউ বা কারা খোঁজ করে আবিষ্কার করেছিল তাকে। নিজে যখন পাচ্ছি না, তখন অন্য দাবিদারও পেতে দেব না এমন ঈর্ষাজনিত কারণেই অলর্কের খোঁজ।

শুনে অলর্ক নিঃসন্দেহ হতে পারেনি এই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র সত্যিই তাঁর দাদামশাই ছিলেন কি না। তার মাকে প্রায় লোপাট করে নিয়ে এসে বিয়ে করেছিলেন তার বাবা এমন সংবাদ ভাসা-ভাসা শুনেছিল তার শৈশবে। মায়ের কুলপঞ্জিকা নিয়ে কখনও অতঃপর কেউই মাথা ঘামায়নি, ঘামানোর প্রয়োজনও ছিল না, কারণ সে তরুণী তখন ছিল এক লালমুখো বিধর্মীর হেপাজতে। এতদিন পর সেই তরুণীর গর্ভজাত সন্তানকে সন্ধান করবে তার পিত্রালয়ের কিংবা মাতুলালয়ের কেউ তা অলর্কের পক্ষে ভাবা অসম্ভব।

যাই হোক, তা নিয়ে মাথাব্যথা করার কোনও ফুরসতই তার হয়নি। সে রাজপ্রাসাদে পৌঁছুনো মাত্র বুঝতে পারল, তার উপস্থিতি সে-বাড়ির অন্য দাবিদারদের আশায় একমুহূর্তে জল ঢেলে দিয়েছে। রাজবাড়িতে দিদিমার অনেক পোষ্য। চাকর-বাকর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়রা বাস করতেন বহুদিন ধরে। অলর্ক পৌঁছুবার অনেক আগেই তারা নিজেদের মধ্যে সেই বিশাল সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে আলোচনা চালাচ্ছিল। রাজবাড়ির সব সম্পত্তির চাবি গচ্ছিত ছিল স্থানীয় একজন নামজাদা উকিলবাবুর কাছে। তিনি উত্তরাধিকারী সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে না পারায় আত্মীয়স্বজনদের আলোচনা আলোচনার স্তরেই থেকে যাচ্ছিল, ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্ভবপর হয়নি। অলর্ক যদি ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছত তাহলে কী হত বলা যায় না।

অলর্ক সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই পুরো আবহাওয়াটা বদলে গেল ভোজবাজির মতো। সবাই যেন আগে থেকে জেনেই গিয়েছিল তার অস্তিত্ব, কিন্তু তার ঠিকানা জানত না। শুধু ভয়ে-ভয়ে ছিল সে কখন পটভূমিতে আবির্ভূত হয়ে পড়ে। তারা হয়তো মনেপ্রাণে কামনা করেছিল, অলি নামের নাতিটির কাছে যেন এই সম্পত্তির খবর গিয়ে না পৌঁছয়। অথবা সে যেন জীবিত না থাকে। অথবা যে-কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। ফলে অলর্কের পৌঁছনোতে তারা প্রবল আশাহত, প্রত্যেকেই হতাশ, ক্ষুব্ধ, কিন্তু কেউই তা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারল না। কারণ সেই উকিলবাবু অলর্ককে দু-চারটে প্রশ্ন করেই নিঃসন্দেহ হলেন এই যুবকটিই বুড়ি দিদিমার উইল কথিত নাতি। অলিই অলর্ক।

দাবিদারদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন সেই হরিশংকর চৌধুরি নানা কুলপঞ্জিকা মুখে-মুখে শুনিয়ে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বহুকাল ধরে। হরিশংকরের বয়স ষাটের ওপর। কিন্তু বিশাল দশাসই চেহারায় তিনি তখনও কর্মক্ষম। তাঁর চোখদুটি সর্বদাই লাট্টুর মতো ঘুরছে, সারাক্ষণই অন্যদের দাবিয়ে কীভাবে গ্রাস করবেন এই ঐশ্বর্য, তার ছক কষে যাচ্ছিলেন নিখুঁতভাবে।

অলর্ক ঘটনাস্থলে হাজির হতে তিনি প্রথমেই তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, কে হে তুমি, ছোকরা? কোথাকার নেপো যে ফোকটে দই খেয়ে যাবে! এ-বাড়িতে আমাদের তিরিশ বছরের বাস।

অলর্ক তাকে একধরনের গা জ্বালানো হাসি উপহার দিয়ে বলেছিল, সেটা পরে বুঝবে চাঁদু। আপাতত আমার হিস্যা বুঝে নিতে দাও।

হরিশংকর দপ করে জ্বলে উঠে বলেছিলেন, খবরদার বলছি। এখানে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করবে না। তাহলে—।

—তাহলে? অলর্ক তার চোখে-চোখ রেখেছিল, দাঁতে-দাঁতও।

—তাহলে, বলে হরিশংকর চুপ করে গিয়েছিলেন, তাঁর ক্রুর চোখে তখন হাজার আগুনের দাপাদাপি। সে আগুনে অলর্ককে ভস্ম করে দিতেই বুঝি চাইলেন।

অলর্ক পরে এর ওর কাছে শুনেছিল, হরিশংকর এককালে ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের লেঠেল হিসেবেও কাজ করেছিলেন। তার লাঠিতে প্রাণ হারিয়েছে বহু গরিব মানুষ। লোকটা জহ্লাদের চেয়েও নাকি নিষ্ঠুর। তিনি হঠাৎ অলর্কের অলি হয়ে যাওয়াটা সহ্য করবেন কেন!

অলর্ক তার পিতাকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিয়েছিল তার নামকরণের জন্য। ভদ্রলোক চেহারায় সাহেব হলেও বাঙালি মেয়ে বিয়ে করার সুবাদে মেজাজে কিছুটা এদেশি হয়ে উঠেছিলেন। কোত্থেকে যেন জোগাড় করেছিলেন তাঁর ছেলের এই এদেশি নামটি যা শুনতে কিছুটা বিদেশি লাগে। অলর্কের ডাক নাম যে অলি হতে পারে তা বোধহয় কখনও ভাবেননি তিনি, অলর্কও নয়। অলি বড়জোর কোনও মেয়ের নাম হতে পারে।

সে-কথা চেপে গিয়ে সে এ-বাড়ির উকিলবাবু সঙ্গে জাঁকিয়ে বসল এই বিশাল ধন ঐশ্বর্যের হিসেব বুঝে নিতে। সঙ্গে-সঙ্গে এও বুঝতে পারল, তার বিরুদ্ধে ভেতরে-ভেতরে সংগঠিত হতে চলেছে এক বিপুল ষড়যন্ত্র। যে-কোনও মুহূর্তে সে খুন হয়ে যেতে পারে এমন ফিসফিসানিও তার কানে পৌঁছে দিয়ে গেল কোনও শুভানুধ্যায়ী। অলর্কও সতর্ক হয়ে গেল। অনুভব করতে পারল, হরিশংকর চৌধুরীর তীক্ষ্ণ নজর তাকে অনুসরণ করে চলেছে সদাসর্বদা। সে একটু অসাবধান হলেই—।

কয়েকদিন রাজপ্রাসাদে থাকার পর উকিলবাবুর সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে সে যখন পুরো সম্পত্তির হদিশ পেল তখন প্রথমটা তার বিশ্বাসই হয়নি। এত পরিমাণ অর্থ এখন তার হেপাজতে! কেবল তারই! এও কি কখনও সম্ভব! এ তো রূপকথার কোনও রাজপুত্রই পেতে পারে। এ তো আলাদিনের প্রদীপ হাতে পাওয়ার মতোই।

সেই প্রায়-ভিখারি অলর্ক হঠাৎই যখন দৈববলে রাজা হয়ে গেল, প্রথমে ভাবতেই পারল না এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কী করবে। সমস্ত সম্পত্তি তার হস্তগত হওয়ার পর সে সেই উকিলবাবুকে এই সম্পত্তি এতকাল আগলে রাখার জন্য একটা মোটা টাকার চেক দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তারপর প্রাসাদের অন্য বাসিন্দা, পোষ্য, আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে মিটিং করে জানিয়ে দিল, এই বাড়িতে দীর্ঘদিন যাবৎ যারা বসবাস করে আসছে, তারা আপাতত সেখানেই বাস করতে পারবে। কিছু-কিছু টাকাও সে প্রত্যেককে দিয়ে কিছুটা খুশি করে দিল। শুধু হরিশংকর চৌধুরিকে বলল, আপনি কালকের মধ্যেই বাস উঠিয়ে নিয়ে চলে যান অন্যত্র। তারপর ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, সিন্দুকের চাবি নিয়ে সে চলে এল কলকাতায়, অতঃপর সে কী করবে বা তার কী করা উচিত এমন এক প্রবল উদভ্রান্তি নিয়ে।

টাকাটা নিয়ে প্রথমে তার কিছু গুপ্তবাসনা চরিতার্থ করল একজন উচ্চবিত্ত মানুষের যা-যা উচ্চাকাঙ্খা থাকে সেই ভোগবিলাসের সব উপকরণ কিনে। তার সঙ্গে কিনল এই চমৎকার কনটেসা গাড়িটি, যার দিকে একবার তাকালে দ্বিতীয়বার তাকাতে ইচ্ছে হবে। দ্বিতীয়বার তাকালে তৃতীয়বার।

গাড়িটি কেনার তার অন্য একটি ছোট্ট কারণও ছিল। ছোট্ট, কিন্তু অলর্কের কাছে সেই মুহূর্তে

বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রথম যৌবনে সে হঠাৎ দুম করে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল এক সুন্দরী কিশোরীর। এই রাসেল স্ট্রিটের বাড়ি থেকে সাইকেলে খুব বেশি হলে দশ মিনিটের দূরত্বে তার বাস। রুবিনা নামের এই পাঞ্জাবি মেয়েটির সঙ্গে তার আলাপ একেবারে আচমকা, এক সন্ধেয়, নিবিড় বৃষ্টির মুহূর্তে। কী একটা কাজে অলর্ক গিয়েছিল ভবানীপুরে, বুকলবাগানের দিকে। ফেরার পথেই সহসা এমন দারুণ বৃষ্টি ঘনিয়ে এল যে, তাকে দাঁড়াতে হল একটা পুরোনো বাড়ির গাড়িবারান্দার নীচে। বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল রুবিনাও। জংলা স্কার্ট হলুদ টপে ওতপ্রোত হয়ে থাকা এই কিশোরীকে দেখে মুহূর্তেই অলর্কের মনে শুরু হয়ে গিয়েছিল চড়ুইয়ের কিচমিচ। বারবার তাকিয়ে দেখছিল ধারাবর্ষণের দৃশ্যে শঙ্কিত কিশোরীটির ডিম-ছাঁচের চমৎকার ফরসা মুখখানা। বেশ লম্বাটে চেহারা, হাতে একগোছা বই। নিশ্চয় টিউশন পড়ে ফিরছে। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা বব-করা সিল্কি চুলের গুচ্ছ ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে তার ঘাড় নাড়ছিল, ও মাই গড, এতনা বারিষ!

বৃষ্টি সেদিন খুব প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল কলকাতায়। সন্ধে পার হয়ে রাত্রিও নেমে এল ক্রমশ। জলও জমে গেল ভবানীপুরের এই অঞ্চলটিতে। সেই জলভারাক্রান্ত পথের দিকে তাকিয়ে রুবিনার মুখ শুকিয়ে আসছিল ক্রমশ, বৃষ্টি থামবার কোনও লক্ষণই ছিল না। জল বেড়েই চলেছিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন বৃষ্টি থামল, রুবিনা ভেবে পাচ্ছিল না, কীভাবে এত জল ভেঙে বাড়ি ফিরবে। তার ফরসা মুখখানা কালো দেখাচ্ছিল। অলর্ক কিন্তু অনায়াসেই তার কাছে একটি সমাধান প্রস্তাব দিল, ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলল, যদি কিছু মনে না করো, আমার সাইকেলের সামনে বসিয়ে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

রুবিনাও অনেকক্ষণ এই যুবকটির চেহারা দৈর্ঘ্য, মুখের সাহেবি-ধাঁচ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল মনে-মনে। অবলীলায় রাজি হয়ে গেল অলর্কের প্রস্তাবে।

প্রেমের শুরু সেই থেকে, তারপর একবছর ধরে রুবিনার সঙ্গ পেয়েছিল অর্লক। বেশ অনেকবার তার সাইকেলে সামনে বসিয়ে রুবিনাকে নিয়ে গেছে কখনও পার্ক সাকার্সের দিকে, কখনও গড়ের মাঠের দিকে, কখনও খিদিরপুর পর্যন্তও।

কিন্তু রুবিনা বোধহয় বুঝে গিয়েছিল, অলর্কের চেহারার মতো তার জীবনযাপন খুব লোভনীয় নয়। হঠাৎ একদিন তার অপেক্ষায় থেকে-থেকে আর দেখা পেল না অলর্ক। বেশ কিছুদিন পব হঠাৎ তাকে দেখতে পেল অন্য এক যুবকের স্কুটারের পিছনে। বেশ নিবিড় করে জড়িয়ে রয়েছে যুবকটিকে। তারপর আরও কয়েকদিন দেখতে পেল দৃশ্যটি। অলর্ক অবাক হল, কষ্টও পেল। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারল, রুবিনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার দিন শেষ। অপমানে, কষ্টে কয়েকদিন পাগলের মতো ছটফট করে বেড়িয়েছিল। সাইকেল নয়, স্কুটারের আকর্ষণই হয়তো রুবিনার কাছে বেশি।

কনটেসা কেনার পর একদিন অলর্ক বাবুঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড় করাল গাড়িটা। আকাশি নীল রঙের স্কুটারটা সে দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে। দেখেছিল, রুবিনা সেই যুবকের সঙ্গে বসে আছে স্কুটারের কাছেই। কনটেসা দাঁড় করিয়ে ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়েছিল অলর্ক, হাই রুবিনা—

রুবিনার চোখে স্পষ্টতই সে দেখেছিল একরাশ বিস্ময়। যে অলর্ক সাইকেলে চড়ে ঢনঢন করে ঘুরত, সে কিনা কনটেসায়! পরক্ষণেই রুবিনা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল, কী যেন ফিসফিস করে বলেছিল তার পাশে বসা যুবকটিকে।

অলর্ক আরও কাছে গিয়েছিল, লিফট চাই, রুবিনা?

রুবিনা কথা বলেনি। অলর্ক হাসতে-হাসতে কনটেসায় স্পিড তুলে চলে গিয়েছিল রাজার মতো।

এমন আরও দু-তিনদিন ক্রমাগত টিজ করল রুবিনাকে। প্রতিবারই সে দেখেছে, পাশে বসা যুবকটি দাঁত কিড়মিড় করছে রাগে।

আর একদিন আরও এক বড় অঘটন ঘটিয়ে ফেলল সে। দেখল, এক ঝালমুড়িওয়ালার

কাছে দুজনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঝালমুড়ি খাবে বলে। অলর্ক ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সেখানে। পকেট থেকে দুখানা একশো টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিল ঝালমুড়িওয়ালাকে, গম্ভীরস্বরে বলল, তোমার কাছে যত ঝালমুড়ি আছে, সব আমার গাড়িতে তুলে দাও।

এবং আক্ষরিক অর্থে তা নিয়েও ছিল।

রুবিনার সঙ্গী যুবকটি দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিল, শালা, এর বদলা আমি নেব।

পরে অলর্ক লক্ষ করেছিল, যুবকটি প্রায়শ তার দলবল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে তাদের পাড়ায়।

অলর্ক অবশ্য কয়েকদিন পরে ভেবেছিল, ব্যাপারটা তার পক্ষে খুব হাস্যকর। রুবিনার মতো সামান্য এক কিশোরীর জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করা তার উচিত হয়নি। তাছাড়া তার এই খামখেয়ালিতে ক্রমশ শত্রুর সংখ্যা বেড়েই যাবে দিনদিন।

সে তখন অন্যদিকে তার নজর ফেরাল।

যে উড়ো টাকা হঠাৎ অলৌকিকভাবে পেয়ে গেল অলর্ক, তাতে সে অনায়াসে পায়ের ওপর পা দিয়ে বাকি জীবন নবাবের মতো কাটিয়ে দিতে পারত। শুধু সে নয়, তার পরবর্তী কয়েক পুরুষও। কিন্তু অলর্কের মাথায় তখন অন্য এক ভাবনা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। বড় হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা ছোট্ট একটি বীজ হয়ে বরাবর ঘাই মারত তার স্বপ্নে-জাগরণে। ব্যাপারটা ভাবত একা-একা, কিন্তু সে জানত না, কীভাবে আস্তে-আস্তে বড় হয়ে ওঠে মানুষ। সে মাত্র একটাই পরীক্ষার গণ্ডি পেরোতে পেরেছিল তার বাবার দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে। তারপর গত আট-ন' বছর স্রেফ তার নামের মতোই টোটো-কোম্পানি। অথবা তার এমন কোনও শিক্ষা বা গুণাবলী নেই যা দিয়ে সে নিজেকে কেউকেটো প্রতিপন্ন করবে। তার পক্ষে সম্ভব নয় কোনও ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা। ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে যে প্রবল বুদ্ধি, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা টেকনিক্যাল নো-হাউ জানা দরকার তা একটুও তার নেই।

অলর্ক অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল, সে কোনও একটা ব্যাবসা করবে, কিন্তু সে ব্যাবসায়ের ধরন এমন হবে যা আর পাঁচজনের থেকে পৃথক। সে অনায়াসে ইলেকট্রনিকস সরঞ্জামের দোকান বা লোহালক্কড়ের ব্যাবসা করতে পারত যাতে লোকসান হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সে তো আর পাঁচজনও করে। তাকে এমন কোনও ব্যাবসায়ে হাত দিতে হবে যা কলকাতায় বেশ অভিনব বলে তো মনে হবেই, উপরন্তু তার মধ্যে থাকবে অন্য গ্র্যাঞ্জার।

এর-ওর কাছ থেকে বুদ্ধি নিয়ে, এর-তার সঙ্গে পরামর্শ করে অলর্ক ভাবল, সে কলকাতার প্রধান-প্রধান রাস্তার ধারে, অথবা জনবহুল জায়গায় বিশালসাইজের সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলবে। বিদেশে এমন সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কথা প্রায়শ শুনতে পাওয়া যায়। কলকাতায় এ-ধরনের দু-চারটে দোকান থাকলেও চোখে পড়ার মতো কোনও বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নাগালে পায় না কলকাতাবাসী।

খুব দ্রুত যোগাযোগ করে সে বড় ধরনের গোটা পাঁচেক ফ্লোর-স্পেস পেয়ে গেল, যে পাঁচটি জায়গাই কলকাতার সবচেয়ে প্রধান এলাকায়। শ্যামবাজার, হাতিবাগান এবং গড়িয়াহাট মোড়ের তিনটি ফ্লোর স্পেস পেয়েছে দুই থেকে তিনহাজার স্কোয়ারফুটের মধ্যে। লিন্ডসে স্ট্রিটে যে স্পেসটি পেয়েছে সেটি দোতলা-একতলা মিলিয়ে সাত হাজার স্কোয়ারফুট। অন্য জায়গাটি হল শিয়ালদহ স্টেশনের সামনেই। সেটিও কম বড় নয়। চার হাজার স্কোয়ারফুটের। আরও তিন-চারটি পেয়েও যাবে শিগগির।

কিন্তু শুধু স্পেস পেলেই তো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খোলা যায় না। তার জন্যে আলাদা প্ল্যানিং করতে হবে। প্রথমেই শো-রুমগুলির একটি জুতসই নাম দেয়া দরকার। তার পরিকল্পিত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি হবে এমন যাতে আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট সবই পাওয়া যাবে। অথবা সংক্ষেপে বলা যায় এ টু জেড। কিছু সুস্থির চিন্তাভাবনার পর সে ঠিক করল, তার শো-রুমগুলির প্রত্যেকটিরই নাম হবে, এ টু জেড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। সবক'টি স্টোরের নাম শুধু একই থাকবে

তাই নয়, তাদের একই ধরনের গ্লো-সাইন হবে, নিজস্ব একটি এমব্লেম থাকবে এবং প্রতিটি শো-রুমের সামনেটা হবে একই ডিজাইনের, একই রঙের, এমনকী প্রবেশ পথটিও হবে একরকম।

কিন্তু শো-রুমগুলির ভিতরটা হবে আরও চমকে দেওয়ার মতো। প্রতিটি দেয়ালে থাকবে নতুন ধরনের কারুকাজ, তার আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাও হবে অন্য পাঁচটা শো-রুমের থেকে পৃথক। এমনকী একে অন্যের থেকেও আলাদা হবে। কিন্তু শুধু ভাবলেই তো হবে না, এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ ইমপ্লিমেন্ট করাই হবে সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা।

সে ভেবে রেখেছে তার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে থাকবে সারা ভারতবর্ষের বিখ্যাত সমস্ত জিনিসপত্র। টুকিটাকি জিনিসগুলি তো অবশ্যই। তার জন্যে তাকে চুঁড়ে ফেলতে হবে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত গঞ্জ ও বাজার। আসাম থেকে গুজরাট পর্যন্ত সমস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে ঘুরে সেখানকার সমস্ত কারিগরি বৈশিষ্ট্য তাকে হাজির করাতে হবে একই ছাদের নীচে। যাতে কোনও ক্রেতাকেই তার দোকানে ঢুকে খালিহাতে ফিরে না যেতে হয়।

অলর্ক আরও ভেবে রেখেছে, প্রতিটি শো-রুমে থাকবে একজন করে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট। প্রতিটি কাউন্টারে শোভা পাবে একগুচ্ছ সুন্দর চেহারার যুবক ও যুবতী। প্রত্যেকের মুখেই থাকবে সুন্দরী এয়ারহোস্টেসদের মতো মন-জুড়োনো হাসি, সপ্রতিভ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের মতো চমৎকার ব্যবহার।

কিন্তু এর সবকিছুর পিছনেই চাই খুব স্থির মস্তিষ্কের প্ল্যানিং ও তার রূপায়ণ।

সে প্রথমেই ভাবল, বাইরের ও ভিতরের সাজসজ্জার জন্য চাই একজন প্রথিতযশা আর্টিস্টের সূক্ষ্ম তুলির ছোঁয়া। এমন শিল্পীর, যিনি তাঁর সৌন্দর্যবোধের চূড়ান্ত রূপটি রূপায়িত করবেন এই শো-রুমগুলিতে। কিন্তু শিল্পীদের সঙ্গে একের পর এক যোগাযোগ করে পরপর বেশ ধাক্কা খেল সে, কলকাতার প্রিয় সব বিখ্যাত শিল্পী এমন প্রবলভাবে ব্যস্ত যে, তাঁরা অলর্কের জন্য এক সেকেন্ড সময়ও ব্যয় করতে পারবেন না। কোনও-কোনও শিল্পী দিনপ্রতি একটি করে ছবি আঁকেন, যেগুলি তৎক্ষণাৎ বিক্রি হয়ে যায় পঞ্চাশ হাজার থেকে একলাখ টাকায়। কোনও-কোনও ছবির দাম নাকি আরও বেশি। কলকাতায় আর একজন শিল্পী দু-বছর পরে যে ছবি আঁকবেন তা নাকি এখনই বুকড় হয়ে যাচ্ছে লক্ষ-লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে। আর একজন শিল্পীর কয়েকটি মাত্র ছবি নীলাম হয়ে গেল কোটি টাকার বেশি দামে। ছবির বাজার ঠিক এরকম তা জানা ছিল না অলর্কের। সে যেমন বিস্মিত হল, তেমনি কৌতূহলী হয়ে উঠল শিল্পীদের সম্পর্কে।

তার শুভানুধ্যায়ীরা তাকে উপদেশ দিল, এমন এক শিল্পীর সন্ধান করো, যে ভালো ছবি আঁকে, কিন্তু এখনও বাজারে যথেষ্ট দর হয়নি। স্বভাবতই অলর্ক অনুসন্ধান করছিল তরুণ শিল্পীদের। প্রথম বয়সে সব নবীন শিল্পীই তার শরীরের শেষ ঘামবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেয় তাদের ক্যানভাসে। প্রথমদিকে টাকার লোভও তেমন থাকে না, আবার ছবির গুণমান যাতে চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছয় সেদিকেও যত্নবান থাকে।

খুঁজতে বেরিয়ে বেশ কয়েকজন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে অলর্কের। এই পরিচয়ের ফলে কয়েকদিনেই ছবি সম্পর্কে আশ্চর্য কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেশ অবাক হয়ে গেছে সে। শিল্পীরা বোধহয় সবসময়ই এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ হয়। তারা আর পাঁচজন মানুষের থেকে শুধু যে পৃথক স্বভাবের হন তাই নয়, তাদের জীবনযাপন, চলাফেরা চাউনি, জীবনবোধ সবই অন্যরকম। তাদের মুখমণ্ডল শোভিত থাকবে লম্বা দাড়ি-গোঁফে, পরনে থাকবে বিচিত্রধরনের পোশাক, কাঁধে থাকবে অদ্ভুত ধরনের ঝোলা ব্যাগ। বিচিত্র নকশায় ভরা থাকবে সে ব্যাগের দু-দিক। মুখে সিগারেট ধরাই থাকবে, কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্যে জ্বালানো হবে না বহুক্ষণ। আর চোখ দুটি থাকবে উদাসীন-উদাসীন।

এইসব তরুণদের ছবির বিষয়বস্তু, রঙের ব্যবহার, কারুকাজও অদ্ভুত লেগেছে অলর্কের কাছে।

তাদেরই একজন কাউকে মনোনীত করবে কি করবে না এমন দ্বিধায় যখন সে আন্দোলিত, সে সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল।

এক তরুণ শিল্পীর বেশকিছু ছবি দেখতে-দেখতে হঠাৎ অসতর্কভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, নাহ, এসব ছবি চলবে না।

তরুণ শিল্পীটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে। বেশ বলশালী চেহারা, মুখে বিশাল দাড়ি-গোঁফ, হাতের বাইসেপ চোখে পড়ার মতো। সে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলল, কী বললেন? এ-ছবি চলবে না! আপনি ছবির কী বোঝেন?

অলর্ক কথাটা ফিরিয়ে নিতে চাইল, কিন্তু শিল্পী ততক্ষণে ভীষণ খেপে গেছে। আর একটু হলেই অলর্ককে প্রবল একখানা ঘুঁসি ঝেড়ে দিয়েছিল আর কি। কোনওক্রমে অলর্ক সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছে।

কয়েকদিন হতভম্ব হয়ে যখন কী করবে ভাবছে, ঠিক তখনই তাকে কে একজন বলল, একটু প্রবীণ কোনও শিল্পীকে খোঁজ করো না। শিল্পের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে।

দিশেহারা অলর্ক বলেছিল, প্রবীণদের কাউকে ধরা আমার সাধ্যের বাইরে। তারা সবাই ভীষণ ব্যস্ত।

—দেন ট্রাই চিত্রদীপ চ্যাটার্জি। বেচারির লাক ফেবার করছে না। আদারওয়াইজ হি ইজ অ্যা গুড আর্টিস্ট।

সেই থেকে অলর্কের মাথায় চিত্রদীপ চ্যাটার্জির নামটা ঢুকে গিয়েছিল। আরও দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল, চিত্রদীপ খুবই প্রতিভাবান, কিন্তু ছবি বিক্রির দৌড়ে তাঁর সমকালীনদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। ইদানীং কিছু কমার্শিয়াল ছবিও আঁকছেন জীবিকার তাগিদে।

টেলিফোন ডিরেক্টরি হাতড়ে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির টেলিফোন নম্বর খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধে হল না তার। সেইসঙ্গে ঠিকানাও। কিন্তু ডায়াল ঘুরিয়ে টেলিফোন করতেই আবার সেই ধাক্কা চিত্রদীপ সরাসরি বলছেন অ্যায়্যাম স্যরি। দোকানের লে আউট আমি করি না। ওটা আমার পেশা নয়।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে অনেকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসেছিল অলর্ক। সে যে প্রত্যাখাত হবে এমন ভাবনা তার ছিল না তা নয়। এই কয়েক দিনে বহু শিল্পীর সঙ্গে কথোপকথন করে, তাদের বাড়িতে গিয়ে, ছবি দেখে, তার দরদাম করে অলর্ক এটুকু বুঝেছে, শিল্পীদের সম্পর্কে কোনওরকম অনুমান করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তার প্রিয় সবাই, যাকে বলে, আনপ্রেডিক্টেবল।

প্রাথমিক ধাক্কায় অনেকখানি পিছিয়ে এলেও অলর্ক হাল ছাড়ল না। এসব পরিস্থিতিতে হেরে পিছিয়ে গেলে তো তার এহেন বিশাল পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। অতএব লেগে থাকতে হবে। কীভাবে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে রাজি করানো যায় এ নিয়ে তাকে ভাবতে হবে আলাদাভাবে। সেদিন তাঁকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দেওয়ার অফার দিয়েও টলাতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরেছে কোনও শিল্পীকে এভাবে কিনতে চাওয়া উচিত হয়নি তার। এভাবে অফার দেয়াই শিল্পীর পক্ষে অপমানজনক।

সুতরাং অন্য কোনও পরিকল্পনার ছক কষতে হবে তাকে। তার শিয়রে যেন প্রতিমুহূর্তে এসে দাঁড়াচ্ছে শমন, কিন্তু কোনও কাজেই উৎসাহের কমতি নেই তার।

এমন ভাবতে-ভাবতেই যোধপুর পার্কের বর্ণাঢ্য পল্লীতে অলর্ক তার বিশাল কনটেসা চালিয়ে ঢুকে পড়েছে আজ। তার শার্টের পকেটে টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে টুকে নেয়া চিত্রদীপ চ্যাটার্জির ঠিকানা। সেই ঠিকানা অনুসরণ করে কয়েকবার এলোমেলো পাক খেয়ে সে এসে দাঁড়াল একটা বিশাল পুষ্করিণীর কোণে ছবির মতো বাড়িটার সামনে। ঠিকানা দেখে নিশ্চিন্ত হল তার গন্তব্য সম্পর্কে। তবে অবাক হল, একজন শিল্পী তাঁর বাড়ি তৈরির ব্যাপারে কতখানি শিল্পসম্মত হতে পারেন তার

নমুনা দেখে। যাকে বলে সুন্দর তাইই।

ইঞ্জিন বন্ধ করে, গাড়ির দরজা-জানালায় লক লাগিয়ে সে ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল বন্ধ দরজার সামনে। তারপর কলিং বেলে সামান্য আঙুল ছোঁয়াতেই টুং-টাং জলতরঙ্গের মৃদু শব্দ।

॥ ৮ ॥

ক্যানভাসের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছবির একদিকে ঘন লাল রং বোলাচ্ছিল চিত্রদীপ। যথারীতি কালোরঙের ঘাড় বাঁকানো পাইপটি তাঁর ঠোঁটে চেপে ধরা। ইদানীং লাল রং ভারী প্রিয় হয়ে উঠেছে তাঁর। প্রায় ছবিতেই ঘন লাল রঙের আঁচড় কেটে গোটা ছবিটিকেই ভীষণ তীব্র করে তুলতে চাইছেন। যেন শিল্পীর ভিতরকার এক প্রবল ক্রোধ লাল রং হয়ে ফেটে পড়ছে ক্যানভাসে।

ছবিটা গত সাতদিন ধরেই অর্ধেক আঁকা হয়ে পড়েছিল চিত্রদীপের স্ট্যাডিতে। তাঁর নিজস্ব স্টুডিও বলতে এই লিভিংরুমটিই। লিভিংরুমেই তাঁর লাইব্রেরি, স্টাডিরুম, স্টুডিও সবকিছুই। যখন উত্তর কলকাতার পুরোনো বনেদি বাড়িটি বিক্রি করে যোধপুর পার্কে খোলামেলা পরিবেশে এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন, তখন আলাদা করে স্টুডিও করার কথা মনে হয়নি। তাঁর বাড়িতে লিভিংরুম ছাড়া দুটো বেডরুম, যার একটি তিনি আর বনানী, অন্যটায় ডোনা। একটা গেস্টরুমের প্রভিশনও রেখেছিলেন বাড়ির বাইরের দিকে, যেটা এতদিন খালিই পড়েছিল। ইচ্ছে করলে সেই ঘরে তাঁর স্টুডিও করতে পারতেন, কিন্তু ছবি এঁকে তেমন নাম হল না, তাই আলাদা করে স্টুডিও করে কী হবে এমন ভাবতে-ভাবতে ছবি আঁকার সরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি ও-ঘরে। এর মধ্যে হঠাৎ শিহরণ রায়চৌধুরি এসে জুটে গেল পেয়িংগেস্ট হিসেবে। এখন ইচ্ছে করলেও আর সে-ঘরে স্টুডিও খোলা সম্ভব নয়। অথচ ইদানীং প্রায়ই মনে হচ্ছে এই লিভিংরুমে আঁকাজোকার কাজ করাটা বেশ ঝকমারি। কাজ করতে-করতে প্রায়ই অন্য লোকজন ঢুকে পড়ছে, সাংসারিক কাজকর্মের কথাবার্তা চলছে, আড্ডা-ইয়ার্কি শুরু হয়ে যায় চেনা লোকজন চলে এলে। এই পরিবেশে আঁকা যায় না।

বনানীকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেওছিলেন, যদি শিহরণকে অন্য কোথাও চলে যেতে বলা হয়, তাহলে তিনি নতুন করে স্টুডিও খুলে সিরিয়াসলি কাজ শুরু করতে পারেন। শুনে বনানী মুখ বাঁকিয়ে হেসেছেন। বলেছেন, আর এ বয়সে নতুন করে স্টুডিও খুলে কী লাভ। ছবি যখন বিক্রিই হয় না, তখন পেয়িংগেস্টের কাছ থেকে মাসে দেড়হাজার টাকার বাঁধা আয় ছেড়ে দিলে সংসার চালানোই মুশকিল।

চিত্রদীপ মনে-মনে ক্ষুব্ধই হয়েছেন কেবল, কিন্তু কিছু করে উঠতে পারেননি। তাঁর খুব ইচ্ছে, আর একটা বড় করে শো করবেন অ্যাকাডেমিতে, একটু বেশিরকমের পাব্লিসিটি দিলে যদি নাম হয়ে যায়—।

ভাবতে-ভাবতে আরও লাল রং তুলিতে মাখিয়ে নিলেন। ক্যানভাসে যে ছবিটি অনেকখানি অবয়ব পেয়েছে তা একজন গ্রাম্য রমণীর। তার গায়ে জামা নেই, বুকের আঁচলও বেশ ঢিলেঢালা, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে আছে দূরের কোনও দৃশ্যের দিকে। যেন তার গরু সকালে চরতে গিয়েছে, এখনও ঘরে ফেরেনি, অথবা অন্য কোনও কারণেও। সময়টা বিকেল বেলা। গোধূলিও বলা যায়। সূর্যাস্তের লাল আভা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার রক্তবর্ণ ফুলের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ আগেই খবরের কাগজওয়ালা জানলা দিয়ে ছুড়ে দিয়ে গিয়েছে আজকের কাগজ, কিন্তু চিত্রদীপ তখনও মেঝের ওপর থেকে তুলে নেননি সেটা। ছবিতে আরও দু-একটি তুলির পোঁচ

দিয়ে তারপর মন দেবেন খবরের কাগজে এমন ভাবছেন, এমন সময় কিচেন থেকে বনানী এসে চট করে তুলে নিলেন ভাঁজ করা কাগজ।

কাগজ খুলে দেখতে-দেখতে হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে দ্যাখো-দ্যাখো, ডোনার ছবি বেরিয়েছে কাগজে।

বেশ খানিকটা চমকে উঠলেন চিত্রদীপ। চমকে ওঠার ফলে তাঁর হাতের তুলি নড়েও গেল বেশ খানিকটা। হঠাৎ কী কারণে ডোনার ছবি খবরের কাগজে উঠতে পারে তা একেবারেই মাথায় ঢুকল না তাঁর। না কি বনানী অন্য কারও ছবি দেখে ডোনার ছবি বলে ভুল করছে!

চমকে ওঠারই কথা চিত্রদীপের। তিনি বিশ বছর ছবি আঁকার লাইনে থেকে আজ পর্যন্ত তেমন নাম করতে পারেননি যাতে তাঁর ছবি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বেরুতে পারে। মাঝেমধ্যে কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট বলে ক্যাপশনে তাঁর সমকালীন অনেক শিল্পীর ছবিই গ্রুপ ফোটো হিসেবে ছাপা হয়েছে কাগজে, কিন্তু তার মধ্যে কখনওই তাঁকে রাখা হয়নি। এ নিয়ে বরাবরই একটা চাপা ক্ষোভ রয়ে গেছে তাঁর ভিতরে। মনে হয়েছে ইচ্ছা করেই তাঁকে উঠতে দেয়া হচ্ছে না। আঁকাআঁকির লাইনে এত গ্রুপিজম, এত ল্যাংমারামারি শুরু হয়েছে আজকাল যে-কোনও সমকালীন শিল্পীই চান না অন্য আর একজন কেউ নাম করুক, বড় হোক কিংবা পয়সা উপার্জন করুক। অথচ বনানী এখন উল্লসিত হয়ে বলছে ডোনার ছবি—।

প্যালেটে তুলি রেখে সাগ্রহে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দেখলেন, হুঁ, ডোনার ছবি। বেরিয়েছে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে, একটা সাবান কোম্পানির মডেল হিসেবে।

ছবিটা দেখে প্রায় তাজ্জব হয়ে গেলেন চিত্রদীপ। ডোনা যে কোনও সাবান কোম্পানির মডেল হয়েছে তা জানা ছিল না তাঁর। বনানী নিশ্চয়ই জানতেন, তাই তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময় নেই, বরং উপচে পড়ছে উল্লাস। হইচই করে ডাকছেন ডোনাকে, ডোনা, এই ডোনা, শিগগির উঠে আয় বিছানা থেকে। দেখে যা—।

চিত্রদীপের চোখমুখ থেকে কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। ডোনাকে তিনি চিত্রশিল্পী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন প্রথমদিকে। রং, তুলি, আর্টপেপার সবই তার জন্য আলাদাভাবে কিনে দিয়েছিলেন যাতে সে তার আঁকার জগৎ গড়ে নিতে পারে। ছবি আঁকা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দিয়ে বলেছিলেন, এবার নিজের মতো করে আঁকো। আর আশ্চর্য, কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ করলেন, ডোনার আঁকার হাত ভারী চমৎকার। তার শিল্পবোধ যে শুধু অসাধারণ তাই-ই নয়, তার রঙের ব্যবহারও সংযত এবং যথাযথ। মনে-মনে ভেবেছিলেন শিল্পীর কন্যার শিল্পবোধ থাকবে না তো কার থাকবে।

কিন্তু ডোনার স্বভাব ছটফটে। সে কোনও বিষয়েই মন-সংযোগ করতে পারে না। যে-কোনও ব্যাপারেই সে কিছুকাল দারুণ ডিভোশন নিয়ে লেগে থাকে, তখন সেই বিষয়টিই তার কাছে পৃথিবীর একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু, তারপর হঠাৎই সেই বিষয় সম্পর্কে হারিয়ে ফেলে তার আগ্রহ। এভাবেই কলেজে সে তার পড়ার বিষয় বদলে ফেলেছে দ্রুত। কিছুদিন বিজ্ঞান পড়ে বলল, উঁহু, ভালো লাগছে না, আর্টসে ভরতি করে দাও। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনার্স পড়ে বলল, ভালো লাগছে না। ইংরেজি পড়ব না, অন্যকিছু। খুঁজে পেতে কমপ্যারেটিভ লিটারেচারে ভরতি করে দেওয়া হল। কিছুদিন খুব মন দিয়ে ক্লাস করার পর এখন তাকে দেখে বোঝা যায় তুলনামূলক সাহিত্যেও তার আর আগ্রহ নেই। এর মধ্যে কখন যে মডেলিং-এ ঝুঁকে পড়েছে তা জানতেই পারেননি তিনি।

ডোনার সন্ধানে বাড়ির এখানে ওখানে খুঁজে বিফল হয়ে ফিরে এলেন বনানী, নাহ্, ডোনা বোধহয় বেরিয়েছে।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, এই সাতসকালে কোথায় আবার বেরুল?

—নিশ্চয়ই জগিং করতে।

—জগিং! জগিং আবার কবে থেকে করতে শুরু করল।

বনানী হাসলেন, ওই যে, হঠাৎ মাথায় ঢুকেছে শরীরে নাকি মেদ জমতে শুরু করে এ বয়সে। অতএব তার আগেই জগিং শুরু করে দাও।

—তাই নাকি! এটা আবার মাথায় কে ঢোকাল ওর।

—কে আবার। ওই যে, শিহরন।

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ বিস্মিত হয়ে রইলেন। আজকাল তিনি শিহরনকে যে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না এই তথ্যটি বোধহয় মা-মেয়ে দুজনই জেনে থাকবে। তাই দুজনেই একযোগে শিহরনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে চলেছে ক্রমশ।

—ও, চিত্রদীপ বিড়বিড় করে বললেন, আর মডেলিং? এই আইডিয়াটা ওর মাথায় আবার কে ঢোকাল?

—কে আবার, ওই শিহরনই।

—ও, তাহলে শিহরনই আজকাল ওর গডফাদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বনানী ভুরু কুঁচকে বললেন, তা তুমি এতে রাগ করছ কেন? মডেলিং করা কি কোনও ব্যাড প্রফেশন? আজকাল এই প্রফেশনে যাওয়ার জন্য কী কমপিটিশন শুরু হয়েছে তার তো খবর রাখো না। শিহরনের জানাশুনো ছিল বলেই চট করে এমন নামকরা সাবান কোম্পানির কাছ থেকে পেয়ে গেল সুযোগটা। মেয়ের এমন চমৎকার ফিগার, যদি মডেলিঙে একবার নাম করা যায়—

চিত্রদীপ আরও গলা চড়িয়ে বললেন, মডেলিং কি একটা প্রফেশন হল? ওসব লাইনে কারা যায় তা খোঁজ নিয়ে দেখেছ? তারা আলটিমেটলি কোন লেভেলে নেমে যায় তা তো জানো না। যারা দেহ সর্বস্ব, রূপ আছে অথচ ব্রেন ডাল, তারাই ওসব লাইনে যায়, গিয়ে নামটাম করে। কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে ওখানে গিয়ে বেশিদিন টিকতে পারে না। কী যে নোংরা হয়ে গেছে ও-সব জগতের লোকজন তা ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে। এই তো সেদিন কাগজে পড়লাম, একটা মেয়ে মডেল হতে ঘোরাঘুরি করত ওইসব লোকেদের চারপাশে। শেষে তাকে সুইসাইড করতে হল—।

বনানী কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন, তারপর নরম হয়ে বললেন, সবাই-ই খারাপ নয়। এই যে জুহি চাওলা, আরও সব নামকরা-নামকরা আর্টিস্ট, তাদের এখন কত নাম, তারা সবাই-ই তো মডেল হিসেবেই প্রথমে এসেছিল, তার থেকে নায়িকা হয়ে গেছে। তাদের কত টাকা পয়সা এখন।

—বাহ্, শুধু টাকাপয়সা দেখলেই হবে? টাকাপয়সার মোহেই তো তোমরা সব ছুটছ। এভাবে টাকা রোজগার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মুনষ্যত্ব, বিবেক সব যে বিসর্জন দিতে হয়, তা খেয়াল করো না?

—রাখো তো তোমার ওসব বড়-বড় কথা। টাকাটাই এ-যুগে সব। যার টাকা আছে, লোকে তাকেই সমীহ করে। তারই পিছনে ছোটে। যার টাকা নেই, লোকে তাকে করুণা করে, পিছনে হাসাহাসি করে। এই যেমন তুমি, তোমার ছবি বিক্রি হয় না এর জন্যে তোমারই বন্ধুরা তোমার পিছনে কতরকম টিপ্পনী কাটে তা কি তুমি জানো?

চিত্রদীপ তখন ভিতরে-ভিতরে ভীষণভাবে ফুঁসছেন। যখনই তিনি বনানী বা ডোনার কোনও ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবেন, তখনই তারা তাঁর ছবি আঁকার ব্যর্থতার কথা তুলে তাঁকে দাবিয়ে রাখতে চায়। ওরা জানে, এই ব্যর্থতাই তাঁর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। ব্যর্থ মানুষরা চিরকালই উপহাসের পাত্র। তাদের ভেতরে যত প্রতিভাই থাক, যতক্ষণ না সেই প্রতিভার বিনিময়ে টাকা ঘরে না আসছে, ততক্ষণ লোকে তাকে করুণা করবে। প্রতিভার মূল্য তো দেবেই না, উপরন্তু তাদের ফেলে দেবে বাজে কাগজের ঝুড়িতে। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, টাকাটাই পৃথিবীতে সব নয়। বহু ধনকুবের আছে পৃথিবীতে, জীবনের শেষ মুহূর্তে তারা বুঝতে পারে তারা আসলে হেরেই

গেছে জীবনের খেলায়।

বনানী থামলেন না, বললেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে উপলব্ধি হল তো বয়েই গেল। সারাটা জীবন তো ভোগ করে গেছে তারা। শিহরন তো বলেই যে টাকা হল—।

—স্টপ, স্টপ ইট, চিত্রদীপ হঠাৎ যেন গর্জন করে উঠলেন, বারবার আমাদের কথার ভেতর শিহরনের নাম টেনে আনবে না। কথায়-কথায় শিহরন আর শিহরন। শিহরনকে একদিন আমি—

—কী করবে শিহরনকে তুমি? খুন করবে নাকি?

চিত্রদীপ সহসা থমকে গেলেন। তাঁর ভেতরে তখন যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটছে। শিহরনের নাম শুনলেই কী জানি কেন, তাঁর মাথায় যেন সত্যিই খুন চেপে যায়। বনানীর কথার উত্তরে সেরকমই বলে ফেললেন, হ্যাঁ দরকার হলে খুনই করে ফেলব কোনদিন। দিনদিন বড় বেড়ে যাচ্ছে ও। আমার সংসারের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে—।

—বাহ্-বাহ্ বনানী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন চিত্রদীপের দিকে, ফ্রাস্ট্রেটেড হতে-হতে তোমার মনোবৃত্তি এখন এই পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে নাকি।

—ঠেকেছে তো তোমাদের জন্যই, তোমরাই এ জন্যে দায়ী। দ্যাট ব্লাডি ফেলো এখন আমার মেয়েটাকে প্রলোভনের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বনানী ক্রমশই যেন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন চিত্রদীপের কথা শুনে। আজকাল শিহরনকে নিয়ে প্রায়ই তাঁদের কলহটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। চিত্রদীপ যে এতসব আজেবাজে কথা বলবেন তা যেন তিনি ভাবতেই পারছেন না। শক্ত চোখমুখে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর নিজেই নীরব হয়ে গেলেন হঠাৎ, বললেন, এটা প্রলোভনের ব্যাপার নয়। মডেলিং ইজ এ গুড প্রফেশন। তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাছেও জিজ্ঞাসা করে দেখো—।

চিত্রদীপ ততক্ষণে আবার গুম হয়ে গেছেন। ডোনার যে ছবিটা ছাপা হয়েছে, সেদিকে বাবা হয়ে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারলেন না। একটা বড় বাথটাবের মধ্যে শুয়ে আছে ডোনা, ফেনা-ওঠা জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে। তাঁর কাঁধ, বুকের ওপব পর্যন্ত কোনও পোশাক নেই। চিত্রদীপ জানেন, মডেলিঙে নামা মানেই শরীরের পোশাক নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। বিজ্ঞাপনের প্রযোজকদের খুশিমতো চলতে হয় মডেলকে। ব্যাপারটা তাঁকে ইরিটেট করার পক্ষে যথেষ্ট। বনানীর উদ্দাম উল্লাস দেখে তাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন, স্টপ ইট।

বনানী তৎক্ষণাৎ রুক্ষস্বরে বললেন, কেন, থামব কেন। নিজের দু-পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই, আর ও যে চারঘণ্টা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তিনহাজার টাকা ঘরে নিয়ে এল, তাতে অমনি গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছে—।

—তাই বলে এভাবে পোশাক না পরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে।

—বাহ, বিজ্ঞাপনটা তো সাবানের। টি. ভি.-তে রোজই দ্যাখো, কীভাবে সাবানের বিজ্ঞাপনের মডেলরা পোজ দেয়। ডোনা কি তার চেয়ে খারাপ কিছু করেছে? আর তা ছাড়া তোমার মতো একজন শিল্পীর কাছ থেকে এমন কনজারভেটিভ কথাবার্তা আশা করা যায় না। তোমরা যখন মডেলদের সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকো তখন! আমি কি কিছু জানি না ভেবেছ। বিয়ের পর আমাকেই একবার বলোনি ওভাবে তোমার ক্যানভাসের পাশে দাঁড়াতে? আর তোমার ছবিগুলোই বা তাহলে ওভাবে আঁকা কেন? অর্ধেক ছবিই তো ন্যুড—।

চিত্রদীপ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন বনানীর ক্রুদ্ধ, হিংস্র মূর্তির সামনে। বনানী তাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করবেন তা ভাবতে পারেননি। নিজে ছবি আঁকলেও, জীবন্ত মডেল বেশ কয়েকবার ছবি আঁকার সময় ব্যবহার করলেও, নিজের মেয়ে এমন অশ্লীলভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে এটা ভাবতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। আর বনানী নিজের মেয়ের কাজকে ক্রমাগত সমর্থন করে যাচ্ছে দেখে অবাক হচ্ছিলেন। আসলে শিহরন এই অফারটা এনে দিয়েছে বলেই বনানীর এমন

সমর্থন তাও বুঝতে পারছেন এখন।

হয়তো আরও কিছুক্ষণ বনানীর এই আক্রমণ অব্যাহত থাকত, হঠাৎই কলিংবেল বেজে ওঠায় দ্রুত চলে গেলেন দরজা খুলতে। নিশ্চয় শিহরন আর ডোনা ফিরেছে এমনই ভেবেছিলেন, দরজা খুলে অবাক হয়ে বললেন, কাকে খুঁজছেন?

—এটা কি শিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়ি?

—হ্যাঁ, আসুন।

বেশ লম্বা চওড়া গড়নের এক অচেনা যুবককে চিত্রদীপের খোঁজ করতে দেখে প্রথমটা বেশ অবাকই হলেন বনানী। লম্বা চুল, একমুখ দাড়ি গোঁফ দেখে ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোনও তরুণ ছবি-আঁকিয়ে হবে। কিন্তু তরুণ শিল্পীরা তো তেমন খোঁজ খবর রাখে না চিত্রদীপের। শিল্পী হিসেবে চিত্রদীপ তেমন নামি-দামি নন, শিল্পজগতে তেমন কোনও ক্ষমতা বা প্রভাবও নেই তাঁর, সুতরাং কীসের তাগিদেই বা খোঁজ করতে আসবে তাঁকে।

অচেনা যুবক ততক্ষণে চিত্রদীপের স্টাডিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্ধসমাপ্ত ছবিটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিস্মিত চোখে, খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে হঠাৎ আনমনে তার অবাক অনুভূতি ব্যক্ত করল মাত্র একটিই শব্দে, বাহ্। তারপর চিত্রদীপের সামনে গিয়ে বলল, আমার নাম অলর্ক বোস। কয়েকদিন আগে আপনাকে ফোন করেছিলাম, আপনার বোধহয় এই মুহূর্তে তা মনে নেই।

চিত্রদীপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, হঠাৎ মনে পড়ল কয়েকদিন আগেকার ফোনবার্তাটি, মনে পড়তেই শক্ত হয়ে এল তাঁর মুখ, বললেন, হুঁ, মনে আছে, কিন্তু আমি তো আমার ডিসিশন জানিয়েই দিয়েছি আপনাকে।

অলর্ক খানিকক্ষণ সময় নিল চিত্রদীপকে বুঝতে, একটু চুপচাপ থেকে হঠাৎ বলল, আমি সেজন্যে আসিনি। আমি এসেছি আপনার কয়েকটা ছবি কিনতে। আপনার ছবি দিয়েই আমার দু-একটা শোরুম সাজিয়ে দেখতে চাই—।

চিত্রদীপের শক্ত মুখে খানিক বিস্ময়ের ঢেউ খেলা করে গেল যেন, বুঝি নরম হল তাঁর অভিব্যক্তি, কিন্তু ভুরুর কোঁচ তবু রয়েই গেল কিছুটা; বললেন, আপনি আমার ছবি দেখেছেন?

—না, তবে এই যে ছবিটা আঁকছেন ক্যানভাসে, শুধু এটুকু দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনি কত বড় শিল্পী।

—ব্যস!

—তবে আরও ছবি দেখতে চাই। কোথায় গেলে আপনার ছবি দেখা যাবে যদি বলে দেন, তাহলে সেখানে যাব। যদি আগামী দিনে আপনার কোনও শো হয় সেখানেও যেতে পারি। অথবা আপনার বাড়িতে এখনও বিক্রি হয়নি এমন ছবি যদি থাকে তাও দেখব এখন।

চিত্রদীপ এতক্ষণে অবাক হচ্ছেন, হয়তো ঠিক বুঝতেও পারছেন না এই অচেনা যুবকের প্রকৃত উদ্দেশ্য। খানিক ভেবে বললেন, আপাতত কোনও গ্যালারি বুক করা নেই আমার নামে। দু-তিন মাস পরে একটা শো করার ইচ্ছে আছে। যদি ততদিন আপনি অপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে দেখতে পারবেন নিশ্চয়ই।

অলর্ক ইতস্তত করে বলল, বাড়িতে কোনও ছবি নেই আপনার?

—আছে, তবে এই মুহূর্তে দেখানোর একটু অসুবিধে আছে। ঠিকমতো সব সাজানো-গোছানো নেই।

বনানী এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে এই কথোপকথন শুনছিলেন। বাড়িতে খরিদ্দার যেচে এসে ছবি দেখতে চাইছে, আর চিত্রদীপ বেমালুম তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, দেখে রাগে গা-হাত-পা জ্বলছিল তাঁর। তাঁর স্বামীর যে বিন্দুমাত্র ব্যাবসায়িক বুদ্ধি নেই এ সংবাদ তাঁর অজানা নয়। বাধ্য হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কয়েকটা ছবি ঘরে পরিষ্কার করে রাখা আছে। আমি

এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

অলর্ক সাগ্রহে বলে উঠল, খুব ভালো হয় তাহলে।

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্ব হয়ে। হঠাৎ বোধহয় তাঁর খেয়াল হল অচেনা যুবকটিকে তিনি বসতে বলেননি তখনও। সম্বিত ফিরতে বললেন, আপনি বসুন। আমি দেখছি—

বনানীর পিছু-পিছু তিনিও ছুটলেন ভিতরের ঘরে, সেখানে তাঁর একরাশ ছবি ধুলো পড়ে বেঘোরে নষ্ট হচ্ছে বহুদিন ধরে। বনানী ঠিকমতো ছবি চেনে না। পাছে সে ভালো ছবিগুলো চিনতে না পারে, যে ছবি পছন্দ হবে না হয়তো সেগুলোই বেছে নিয়ে আসে এই আশঙ্কায় নিজেই হন্তদন্ত হয়ে চললেন ছবি বাছাই করতে। আসলে তাঁর ইচ্ছে ছিল না এমন অগোছালো অবস্থায় ছবিগুলো হাজির করতে কোনও ক্রেতার সামনে। কিন্তু বনানী নাছোড়বান্দা হয়েছে যখন—

চিত্রদীপ ভিতরে যেতে অলর্ক এবার থিতু হয়ে বসল স্টাডির মধ্যে বিছোনো মোড়ার একটিতে। মোড়াগুলো বেতের, প্রতিটির ওপর রঙিন কাপড়ের টুকরো জুড়ে ডিমের আকারের ছোট-ছোট গদি তৈরি করে রাখা। মোড়ায় জুত করে বসে সে স্টাডি কাম স্টুডিয়োর চারপাশে একবার নজর চালিয়ে দেখল আঁতিপাতি চোখে। তারপর পাশেই টেবিলের ওপর পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিল সময় কাটানোর জন্য।

খবরের কাগজের যে অংশটি টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় ছিল, সেখানেই ছাপা রয়েছে সেই সাবানের বিজ্ঞাপনটি। অলর্ক ডোনাকে চেনে না। সে অভ্যাসবশত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ডোনার খোলামেলা শরীরটার দিকে। মেয়েটার চাউনির মধ্যে যেন একটা উত্তেজক ব্যাপার আছে। যেন হঠাৎ এই গোলমেলে শহর ছেড়ে কোনও দূর তেপান্তরে উধাও হয়ে যেতে ডাক দেয় মেয়েটা। এই সাবানটায় পাতিলেবুর গন্ধ পাওয়া যাবে এমন আশ্বাস দিয়েছেন বিজ্ঞাপনদাতা। স্নান করে বেরুবার পর সমস্ত শরীরে, আবহাওয়ায় ভরে উঠবে তাজা পাতিলেবুর গন্ধ। ভাবতে-ভাবতে ডোনার অনাবৃত শরীর থেকে অলর্ক সেই পাতিলেবুর গন্ধ শুষে ওম হতে চাইল কিছুক্ষণ।

চিত্রদীপ আর তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ হল ভেতরের ঘরে ঢুকেছেন, এখনও বেরোননি। এতটা সময় একা বসে থেকে কিছুটা বোর লাগছে অলর্কের। হঠাৎ চমকে উঠল দরজার দিকে তাকিয়ে। চোখ কচলে দেখবে কিনা ভাবছে, তার আগে নিজের কণ্ঠস্বর থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল, কী অদ্ভুত!

দরজা খুলে ততক্ষণে লিভিংরুমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ডোনা। তার পরনে ভোরের জগিং করার ড্রেস, ধবধবে সাদা শার্ট ও সর্টস। বোধহয় অনেকখানি ছুটে আসার ফলে তার মুখে নাকে কপালে বিনবিন করছে ছোট-ছোট ঘামের ফোঁটা। ঘাড়ের অর্ধেক পর্যন্ত নেমে আসা ঝোপাচুলের রাশ এলোমেলো হয়ে কিছুটা উড়ে এসে পড়েছে তার চোখেমুখে।

ডোনা সুন্দরী বলেই যে অলর্ক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা নয়। সুন্দরী এবং তার সঙ্গে সকালের বিশুদ্ধ বাতাসে খানিকটা কেয়ারলেস বিউটিতে ভূষিত বলে ডোনা যেন এই মুহূর্তে প্রায় রূপকথার নায়িকা। কিন্তু আসলে অলর্কের মনে হচ্ছিল এই মেয়েটি তার ভীষণ চেনা। কোথায় দেখেছে কীভাবে দেখেছে তা মনে করতে পারছে না বলে তার দু-চোখে আরও বিস্ময় আরও আকুতি ঘনিয়ে উঠল মুহূর্তে।

· ততক্ষণে ডোনা এগিয়ে এসেছে অলর্কের অনেকটা কাছে। স্বাভাবিক সৌজন্যবশত অলর্ক তার মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ, কী বলবে ভেবে না পেয়ে এক চিলতে বোকার মতো হাসল।

ডোনা চোখে কৌতুক ফুটিয়ে, ভুরু কপালের ওপর তুলে বলল, অদ্ভুত। কে অদ্ভুত? আমি?

তক্ষুনি অলর্কের মনে পড়ে গেল, কোথায় সে ডোনাকে দেখেছে। তড়িঘড়ি হাতের খবরের কাগজটা তুলে আরেকবার দেখল বিজ্ঞাপনের মেয়েটিকে। দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেল আরও।

তারপর শব্দ করে হেসে বলল, খুব আশ্চর্য লাগছে আমার। সিনেমার নায়িকারা হঠাৎ পরদা ছেড়ে অডিয়েন্সের মধ্যে নেমে এলে যেরকম স্বপ্ন-স্বপ্ন মনে হয় ঠিক সেরকম।

ডোনার বিস্মিত হওয়ার পালা এবার, মানে? তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে অলর্কের হাত থেকে কেড়ে নিল খবরের কাগজখানা, কই, দেখি—।

ছবিটা দেখেই সে মুখে বিচিত্র শব্দ করে হেসে উঠল, আরে, আজই বেরিয়ে গেছে।

নিজের ছবি সংবাদপত্রের পাতায় দেখার যে আনন্দ, সেই খুশির হিল্লোল ততক্ষণে বয়ে যাচ্ছে ডোনার আকর্ষণীয় শরীরে। কিছুটা জগিং করার ফলেই হোক, কিছুটা বিজ্ঞাপনে নিজেকে দেখার থ্রিলেই হোক, ডোনা বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছে তখন। তার ভারী বুকের ওঠানামা, চোখমুখের অভিব্যক্তি, সরু কোমর, সর্টসের বাইরে সোনালি উরু দেখতে-দেখতে মুগ্ধ হচ্ছিল অলর্ক। আর মনে-মনে ভাবছিল, আজ সকালে কী এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি সে।

ইতিমধ্যে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন চিত্রদীপ ও বনানী। দুজনের হাতেই বেশ কয়েকখানা করে ছবি। কয়েকটা বড় সাইজেরও। ঘর থেকে বেরিয়েই বনানী ডোনাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, দেখেছিস ডোনা, কী দারুণ ছবিটা হয়েছে—।

চিত্রদীপ ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই দেখুন, ছবিগুলো কালের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করে এনেছি। আপনার পছন্দ হয় কিনা।

চিত্রদীপ আর বনানী দুজনে মিলে ততক্ষণে স্টাডির মধ্যে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখছেন ছবিগুলো। যেন এক্ষুনি এগুলো নিয়ে কোথাও 'শো' দিতে যাবেন। অলর্ক এতক্ষণে তার বিস্ময় ছেড়ে ঝুঁকে পড়ল ক্যানভাসে আঁকা বিচিত্ররঙের ছবিগুলোর ওপর। প্রতিটি ছবির আড়ালে রয়েছে একজন শিল্পীর অবিরত নিষ্ঠা আর শ্রম। রঙের কারুকাজে মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর এক-একটি ভাবনা। এ-ছবিগুলোতে অবশ্য ইদানীংকার মতো লাল রঙের প্রাচুর্য নেই। বরং সবুজ বা তুঁতে রঙেরই প্রাধান্য। বেশ অনেকক্ষণ এই 'গ্যালারি'তে ঘুরে-ঘুরে ছবিগুলো দেখল অলর্ক। সবসমেত আঠারোখানা ছবি সাজানো হয়েছে। ঝুঁকে পড়ে সেগুলো দেখতে-দেখতে হঠাৎ অলর্ক বলে উঠল, আর নেই?

—আর চিত্রদীপ খুবই অবাক হলেন। পরমুহূর্তে খানিক রুক্ষস্বরে বললেন, কেন, এগুলো একটাও পছন্দ হল না?

অলর্ক চোখ তুলে প্রথমে দেখল চিত্রদীপকে। এতগুলো ছবির সবকটাই বাতিল করলে একজন শিল্পীর চোখমুখের অভিব্যাক্তি কীরকম হতে পারে তা ক'দিন আগে এক তরুণ শিল্পীকে দেখে সে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এখন আরও একবার উপলব্ধি করল সে। ক্রমান্বয়ে সে তাকাল বনানী ও ডোনার মুখের দিকে। বনানী স্তম্ভিত হয়ে গেছেন অলর্কের কথা শুনে। ডোনার চোখেমুখে কিন্তু বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে কৌতুক, যেন ভাবখানা এমন যে, এইটুকু ছোকরা তার বাবার মতো মহান প্রতিভার শিল্পকর্মকে অনায়াসে বাতিল করছে।

—এর সবগুলোই আমি কিনতে চাই। প্রত্যেকটি ছবিই ভারী চমৎকার হয়েছে। আমি গত দু-তিনমাস ধরে বারো চোদ্দজন শিল্পীর স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি করেছি, কিন্তু এমন সুন্দর কাজ কারও কাছেই দেখতে পাইনি। আমি আরও কিছু ছবি কিনব।

অলর্কের কথার মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস গমগম করে উঠল যে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তার অনেক-অনেক গুণ বিস্ময় চারিয়ে গেল এ-বাড়ির তিন বাসিন্দার চোখেমুখে। ডোনা তো বিস্ময় চেপে রাখতেই পারল না, সব!

—হুঁ, সবগুলোই। আমাকে আরও কিছু ছবি দেখান।

চিত্রদীপ তার চোখের তারায় কিছু সন্দেহ নাচিয়ে বললেন, এতগুলো ছবির দাম সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে?

অলর্ক দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল, এই ক'দিনে সে বিষয়ে কিছু ধারণা নিশ্চয় হয়েছে। আমি সুহাস

ভট্টাচার্যের স্টুডিওতেও ঘুরেছি। অবিনাশ ঘড়াই-এর কাছেও গিয়েছি দু-তিনবার।

চিত্রদীপ কঠিন চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ও কে। আই উইল শো য়্যু সাম মোর। তারপর ডোনার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডোনা, প্লিজ হেল্প—।

চিত্রদীপ ডোনাকে নিয়ে ফের ভেতরের ঘরে ঢুকলেন ছবির সন্ধানে। বহুদিন অনাদৃত, অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা ছবিগুলোকে ধুলোর জঞ্জাল থেকে বার করে আনাটা সহজ কাজ নয়। অনেক ছবির রঙই চটে গেছে। কোথাও-কোথাও ভাঁজ পড়ে গেছে ক্যানভাসে। তার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দ্বিতীয় দফায় ছবি বাছতে বসলেন চিত্রদীপ।

ডোনা তার বাবাকে সাহায্য করতে-করতে বলল, হু ইজ দ্যাট ফেলো, ড্যাডি?

ডোনাকে বিস্মিত করে চিত্রদীপ বললেন, এ্যা শপকিপার। কলকাতায় কয়েকটা দোকান খুলছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, না কী যেন বলল। তার ইনটেরিয়র ডেকরেশনের লে-আউট করাতে চাইছিল আমাকে দিয়ে।

—ইনটেরিয়র ডেকরেশন। তোমাকে দিয়ে! লোকটা পাগল নাকি?

—পাগল বলেই তো মনে হচ্ছে। হঠাৎ পাগলের মতো এখন ছবি কিনতে চাইছে। কিন্তু লোকটা নভিস।

—নভিস!

—হুঁ, এর আগে ছবি কিনেছে বলে মনে হচ্ছে না। হঠাৎ কী কারণে আমার ছবি কিনতে চাইছে তাও বোধগম্য হচ্ছে না।

স্টাডিতে তখন বনানী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন অলর্ককে, আপনার বুঝি ছবি কেনার নেশা?

অলর্ক ঘাড় নাড়ল, আগে ছিল না, এখন হয়েছে।

—আপনার বাড়িতে গ্যালারি আছে?

—না, ছবিগুলো আমি কিনছি অন্য কারণে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর সাজাব বলে।

—ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।

অলর্ক খুব সংক্ষেপে তার ভেঞ্চারের কথা বনানীকে জানাল। প্রতিটি শোরুম সে যে চমৎকার করে সাজাতে চাইছে কোনও বড় শিল্পীর সহায়তায়, তাও বলল অকপটে। শেষে বলল, আপনি যখন একজন শিল্পীর স্ত্রী, তখন নিশ্চয় স্বীকার করবেন, কাস্টমার শো-রুমে ঢোকে যতটা তার দ্রব্যসামগ্রীর টানে, ততটাই তার আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার আকর্ষণে। হঠাৎ শো-রুমে ঢুকে যদি তার মনে হয়, এটা-কলকাতা শহর নয়, দাঁড়িয়ে আছি নতুন কোনও জায়গায়, তখন তার কেনার আগ্রহ বেড়ে যায় অনেকগুণ। তেমনই অভিনবভাবে সাজাতে চাইছি আমার শো-রুমগুলো—

ততক্ষণে চিত্রদীপ আর ডোনা বার করে নিয়ে এসেছে আরও কিছু ছবি। সেসব ছবি সাজাতে-সাজাতে ভরে গেল গোটা লিভিংরুমখানাই। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে অলর্ক বলল, সব ছবিগুলোই আমি বুক করে যাচ্ছি। কত দামাদাম হবে তার একটা হিসেব করে আমাকে জানাবেন। আপাতত একটা চেক দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। দশ লাখ। বাকিটা আমি নেক্সট দিন এসে দিয়ে যাব। আপনি যদি কাউকে দিয়ে ছবিগুলো প্যাকিং করে রাখার ব্যবস্থা করেন তো আমি সঙ্গে বড় গাড়ি নিয়ে আসব। আর হ্যাঁ—।

খসখস করে চেক লিখে তার নীচে লম্বা ধরনের সই করে সেটা তুলে দিল চিত্রদীপের হাতে। প্রায় বোবা হয়ে গেছেন চিত্রদীপ। বনানী আর ডোনাও দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে অলর্কের দিকে।

—আর হ্যাঁ, অলর্ক সেই তিন মুখ, তিন স্থির অবয়বের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, তবে আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আমার সব ক'টা শো-রুমের লে-আউটের ব্যাপারে আপনার মূল্যবান পরামর্শ চাই। এই ছবিগুলো কোনটা কোন শো-রুমে কোথায় রাখলে সবচেয়ে আকর্ষণীয়

হবে, সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভালো বুঝবেন। তা ছাড়াও যেসব দেওয়ালে ফাঁকা স্পেস থাকবে, সেখানেও আপনার পরিকল্পনা মতো সাজাতে চাই।

চিত্রদীপ আগের দিনের মতো প্রতিবাদ করতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। শুধু স্তিমিত গলায় বললেন, ভেবে দেখি—।

অলর্ক তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, কী যেন দেখল, তারপর বলল, কিন্তু খুব দ্রুত জানাতে হবে আপনাকে। কারণ আপনি হয়তো জানেন না, আমি খুব ডিস্টার্বেন্সের মধ্যে আছি।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, কেন?

—হঠাৎ কোনও মানুষের টাকা হয়ে গেলে তার অনেক শত্রু হয়ে যায়। আমারও এখন সেরকমই প্রচুর শত্রু। কয়েকদিন আগেই আমার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একটা মার্কেটিং কমপ্লেক্সে ঢুকেছিলাম। ঘুরে-ঘুরে দেখছিলাম, তাদের শো-রুমগুলো কীভাবে সাজিয়েছে, কোথায় কী রাখলে ভালো দেখায়। ফিরে এসে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় নেমেছি, হঠাৎ দেখি গাড়িতে ব্রেক ধরছে না। অথচ এরকম হওয়ার কথাই নয়। নতুন গাড়ি। শেষে মেকানিককে দেখাতে বলল, খুব পাকা হাতের কাজ, কেউ আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য এটা করেছে। আপনি সাবধানে থাকবেন।

—স্ট্রেঞ্জ! বাপ-মা-মেয়ে তিনজনেই যেন একযোগে আর্তনাদ করে উঠল।

—আরও আছে। সেদিন রাতের বেলা বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ দু-দুটো বোমা ফাটলো গাড়ির জানলার কাছেই। একটুর জন্যে বেঁচে গেছি।

—মাই গড! কারা করছে এ-সব?

—বুঝতে পারছি, আবার পারছি না। আসলে আমার অনেক শত্রু জুটে গেছে। সেসব পরে বলব একদিন। সেদিন এক আর্টিস্ট পর্যন্ত আমাকে ঘুসি মারতে গিয়েছিল। তার ছবি পছন্দ হয়নি বলেছিলাম বলে—।

শেষ বাক্যটি বলে অবশ্য হাসল অলর্ক, ঠিক আছে, চলি—।

অলর্ক বেরিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত তিনজনে বিস্ময়, আতঙ্কে নির্বাক হয়ে রইল। তারপর বানানী ও ডোনা প্রায় একসঙ্গে আছড়ে পড়ল চিত্রদীপের উদ্দেশে, কে লোকটা, তোমার চেনা?

—নাহ্, একেবারেই নয়।

—ওর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে শেষে তুমি আবার বিপদে পড়বে না তো!

চিত্রদীপ গম্ভীর হল, বুঝতে পারছি না।

এতক্ষণে তাঁর হাতে ধরা বিশাল অঙ্কের চেকটার দিকে একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে বনানী বললেন, চেকটা বাউন্স করবে না তো?

—কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে—।

॥ ৯ ॥

গতকাল থেকে অভিনন্দনের বন্যায় প্রায় ডুবে আছেন মণীশ রায়। পরশু শ্রোতায় পরিপূর্ণ হলের মধ্যে তাঁর পেপার পড়ার পর চারপাশে যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, তা মণীশের কাছে সত্যিই বিস্ময়কর। কয়েকজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেছেন, প্রবন্ধকারের ভাষ্য এককথায় প্রশংসনীয়। লেখাটির বিষয় যেমন অভিনব, লেখার স্টাইল তেমনই নতুন ধরনের। তুলনায় রণজয় দত্তের লেখায় কবিত্ব বেশি, তথ্য কম। ফলে সে প্রবন্ধটি জোলো হয়ে গিয়েছে। সেমিনারে আরও তিন-চারজন অংশগ্রহণকারীর লেখা সম্পর্কেও তেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়নি। শ্রোতাদের

মধ্য থেকে শিহরন রায়চৌধুরি নামে এক অধ্যাপক এসে চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন। মণীশ রায়ের লেখার প্রশংসা করে এবং রণজয় দত্তের লেখাকে তীব্র আক্রমণ করায় তিনিও কম হাততালি পাননি। শোনা গেছে, ভাইস চ্যান্সেলর নিজে কোনও বক্তব্য না রাখলেও একান্তে কারও কারও কাছে প্রশংসা করেছেন মণীশ রায়ের। বলেছেন, বিষয়টি কিন্তু বেশ বেছেছে মণীশ।

তবে ভাইস চ্যান্সেলরের, বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিদের, কিংবা শ্রোতাদের তরফ থেকে যত প্রশংসাই আসুক না কেন, সবচেয়ে বেশি প্রশংসা মণীশ পেয়েছেন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। ছাত্ররা যত না, তার চেয়ে ঢের বেশি উচ্ছ্বাস ভেসে আসছিল ছাত্রীদের কর্নার থেকে। মণীশের ডেইসে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল হাততালি শুনেই বোঝা গিয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অধ্যাপক খুবই পপুলার। তাছাড়া, তাঁর পাঠ চলাকালীন বেশ কয়েকবার তুমুল ক্ল্যাপ। মণীশ আড়চোখে দু-একবার দেখে নিয়েছেন, ঠিক কোন জায়গা থেকে উচ্ছ্বাস ও হাততালি ভেসে আসছে।

তার পাশাপাশি রণজয় দত্ত পড়তে ওঠার পর দৃশ্যপট গেল বদলে। ক্ল্যাপ তো নয়ই, কেবল দীর্ঘশ্বাস। আসলে মণীশ রায় নেমে যাওয়ার পর বোধহয় সেমিনার জমানো আর কারও পক্ষেই বেশ কঠিন ব্যাপার। মণীশের সুন্দর চেহারা, বাচনভঙ্গি, পড়তে-পড়তে ঠিক জায়গায় এক-এক মুহূর্তে পজ দেয়া, আর সর্বোপরি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। রণজয় দত্ত অনেক কবিত্ব করেও প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েও শুধু ভালো পড়তে না পারার জন্যই বোধহয় শেষ পর্যন্ত জমিয়ে তুলতে পারলেন না তাঁর আলোচনা। তেমন হাততালিও না পেয়ে ডেইস থেকে নেমে তাই বিড়বিড় করেছেন, সব বোগাস। এরা আলোচনা শুনতে আসেনি। নাটক শুনতে এসেছে—

ডেইস থেকে রণজয় দত্ত নামার পর শ্রোতাদের ভিতর থেকে হঠাৎ বিড়াল ডাকও শুনতে পাওয়া গেছে। সম্ভবত রণজয়ের সরু মিনমিনে গলাকে ব্যঙ্গ করেই এই ডাক। তিনি কটমট করে সেদিকে তাকাতেই দেখলেন, কয়েকজন অন্য ডিপার্টমেন্টের মেয়েও বসে আছে সেখানে।

এতসব বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে রণজয় দত্ত কাল ক্লাস নিতেই আসেননি। আজও এসে নিজের সিটে বসে আছেন গুম হয়ে। ক্লাস নিতে গিয়েও বুঝতে পেরেছেন কালকের ব্যাপারটা বেশ প্রচার হয়ে গিয়েছে মুখে-মুখে, সব ছাত্র-ছাত্রীই যে সেমিনার শুনতে গিয়েছিল তা নয়, কিন্তু যারা গিয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই এসে অন্যদের কাছে গল্প করেছে, জানিস, আর ডি. পেপার পড়ার পর খুব প্যাঁক খেয়েছে।

পরিস্থিতি বুঝে দুটোর ক্লাসটা আর নিতেই গেলেন না রণজয়। একটা মোটামতন বই মুখে দিয়ে বসে আছেন নিঃশব্দে।

একটু দুরে কোণের দিকে বসে থাকা মণীশ রায়ের অবস্থাটা ঠিক বিপরীত, ক্লাস নিয়ে ফিরে এসে সজনী দাশগুপ্ত নামের একজন অধ্যাপক বললেন, কী মণীশ, পরশু নাকি সেমিনারে ফাটিয়ে দিয়েছ একেবারে—।

মণীশ কাল থেকে এত প্রশংসা আর অভিনন্দন পেয়েছেন যে, এখন আর ভালো করে কিছু বলতেই পারছেন না। শুধু হাসলেন মৃদু।

—ভি. সি. নাকি বলেছেন, ছেলেটার ফান্ডা আছে বেশ!

মণীশ আর একবার শুধু হাসলেন সজনী দাশগুপ্তের দিকে তাকিয়ে।

—বাহ্, গুড। বলে সজনী দাশগুপ্ত তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রফেসরস-রুমটা বেশ বড়ই। প্রায় পনেরো-কুড়িজন অধ্যাপকের জন্য এই ঘরটা নির্দিষ্ট। যারা একটু সিনিয়র, তাঁদের জন্য আলাদা টেবিল-চেয়ার। জুনিয়রদের জন্য ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিলের দুপাশে খানদশেক চেয়ার পাতা। যখন সব অধ্যাপকই ঘরে থাকেন, তখন হইচইতে মুখর হয়ে ওঠে প্রফেসরস-রুম। তবে তেমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

আজও ঘরে বেশি অধ্যাপক নেই। জনাচারেক বসে আছেন মাঝখানের টেবিলে। তারা

নিজেদের মধ্যে আড্ডা-ইয়ার্কি মারছেন। মণীশ বসে আছেন তাঁর কোণের দিকের আলাদা চেয়ার-টেবিলে। তাঁর ক্লাস একটু আগেই শেষ হয়েছে। আপাতত পরপর দুটো পিরিয়ড অফ। রণজয় দত্ত বসে আছেন অন্যদিকের কোণায় সেরকম গম্ভীর মুখেই। সজনী দাশগুপ্তের মন্তব্য শুনে একবার কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আবার বইয়ের পাতায় মনসংযোগ করার চেষ্টা করলেন।

পরক্ষণেই প্রফেসরস রুমে ঢুকে পড়ল দুই তরুণী। তার মধ্যে একজন গার্গী। বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির ঘটনাটায় ক'দিন খুবই উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে সে, বিশেষ করে অলর্ক বোস নামের এক যুবক কীভাবে উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিপন্ন হল, তারপর এখন সে কোথায়, কী করছে, রাজবাড়ির অন্য পোষ্যদেরই বা কী হল, এহেন হাজার রোমাঞ্চকর প্রশ্ন এখন তার মগজে। তার মধ্যেই চলছে তার অন্য ফিচার লেখার প্রস্তুতি। এ-ঘরে তরুণীরা ঢুকে কোন অধ্যাপকের কাছে যায়, তা অন্য সবারই জানা। মণীশ রায়ও সাধারণত প্রস্তুত থাকেন অফ-পিরিয়ডে কেউ না কেউ তাঁর কাছে আসবেই। দুই তরুণীর একজন তাঁর চেনা। তাঁদের ডিপার্টমেন্টেরই ছাত্রী ডোনা চ্যাটার্জি। ডোনা মাঝেমধ্যেই তাঁর ক্লাসে অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রশ্ন করে রীতিমতো সোরগোল ফেলে দেয়।

এহেন ডোনা আজ হঠাৎ আর একটি তরুণীকে তাঁর কাছে নিয়ে এসে বলল, স্যার, এ হল গার্গী মুখার্জি, মাই ফ্রেন্ড। ম্যাথস-এর ছাত্রী। কিন্তু অঙ্কের বাইরে অনেক বিষয় নিয়ে ওর কৌতূহল। আপাতত একটা ফিচার লেখার কাজে খুবই ব্যস্ত। ফিচারটির বিষয় 'আধুনিক প্রজন্মের মেয়েরা।'

মণীশ তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন গার্গীর দিকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেয়েই ভিন্ন-ভিন্ন ছুতো নিয়ে তাঁর কাছে এসে থাকে। নিশ্চয় তেমন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এই মেয়েটি এসেছে। তবু গার্গী মুখার্জি নামটা কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল তাঁর। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করলেন, হুঁ, মনে পড়েছে, তুমিই সেই ডিবেট চ্যাম্পিয়ন, তাই না?

গার্গী লজ্জিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, সবাই আমাকে এই পরিচয়েই চেনে এখন। কিন্তু আপাতত আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। ফিচারটির বিষয়েই—।

মণীশ বললেন, ফিচারটি তো খুবই ইন্টারেস্টিং, কিন্তু এ বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে ডোনাদের মতো আধুনিক প্রজন্মের মেয়েদের কাছেই তোমাকে প্রশ্ন রাখতে হবে। আমার কাছে কেন?

—স্যার, এ পর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাটজন মেয়ের কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি আমি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, এই প্রজন্মের মেয়েদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন এমন পুরুষদের থেকেও কিছু জেনে নেয়া যায়।

মণীশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাই নাকি! কিন্তু প্রফেসরস-রুমে বসে সেসব প্রশ্নের উত্তর কি দেয়া যাবে? দেখছ না, মেয়েরা আমার কাছে এলে জোড়ায়-জোড়ায় চোখ আমাকে ফলো করতে থাকে।

ডোনা তৎক্ষণাৎ বলল, তাহলে স্যার, অন্য কোথাও আপনার সঙ্গে বসতে পারে গার্গী, ধরুন, কোনও রেস্তোরাঁ, কিংবা কফি-হাউসে—।

মণীশ সায় দিয়ে বললেন, চলো, তাহলে সামনের মোড়ে যে কফি-হাউসটা আছে, সেখানেই বসা যাক। আমার এখন অফ আছে।

গার্গী খুশি হয়ে বলল, চমৎকার প্রস্তাব। চলুন, স্যার—।

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই দেখল, চারপাশ থেকে অন্য সব অধ্যাপকেরা তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। বিশেষ করে রণজয় দত্ত। তিনি এমন হিংস্রচোখে তাকালেন মণীশ রায়ের দিকে যে, গার্গীর শরীরটা কেমন শিরশির করে উঠল। একজন অধ্যাপকের চাউনি কি এমন সাংঘাতিক হতে পারে!

বেশ অপ্রস্তুত বোধ করে তারা বেরিয়ে এল প্রফেসরস-রুমের বাইরে। মণীশ রায়ের তো রীতিমতো অস্বস্তি হয় আজকাল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে তিনজন হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল

কফি হাউসের ভেতর। কিছুটা এসেই ডোনা বলেছিল, তাহলে গার্গী, স্যারের সঙ্গে তোর তো পরিচয় হয়ে গেল, এবার অমি চলি—।

গার্গী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বলেছে, উঁহু, ওটি হচ্ছে না। ইন্টারভিউয়ের সময় তোকেও থাকতে হবে। তোরা, স্যারের ছাত্রীরা কী কারণে তাঁর এমন অন্ধ ভক্ত হয়ে তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করিস তাও জানতে হবে। সেদিন এ ব্যাপারটা তোকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

কফি-হাউসে ঢুকে মণীশ বললেন, বলো, কী খাবে তোমরা? কফির সঙ্গে আর কিছু?

—উঁহু, শুধুই কফি।

কফি-হাউসের সুবিধে এই যে, সামনে এককাপ কফি নিয়ে অনন্ত সময় ধরে কথাবার্তায়, আড্ডায়, আলোচনায় পার করে দেয়া যায়। উঠতি কবি-লেখকেরা, তরুণ শিল্পীরা তাদের ইনটেলেকচুয়াল কথাবার্তা আদানপ্রদান করার জন্য কফি-হাউসগুলোকেই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করে। নামিদামিরাও যে একেবারে আসেন না তা নয়। এককাপ কফিতেই সংস্কৃতির তুফান বয়ে যায় রোজ।

তবু মণীশ বললেন, তাহলে অন্তত পকৌড়া নেওয়া যাক। কফির সঙ্গে পকৌড়া থাকলে একটু গরম হতে পারে আলোচনা।

বলেই বেয়ারাকে ডেকে কফি আর পকৌড়ার অর্ডার দিয়ে বললেন, হুঁ, বলো তোমার কী প্রশ্ন? তবে দেখো, তোমার এই বান্ধবীটি, ডোনা চ্যাটার্জি কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস মেয়ে। ক্লাসে মাঝেমধ্যে অধ্যাপকদের এমন সব ঝামেলায় ফেলে দ্যায়। সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, পরকীয়াতত্ত্ব কবি-লেখকদের এত ফেবারিট কেন?

ডোনা হেসে বলল, স্যার, আপনিও কম ডেঞ্জারাস না। তার উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন, তাতে কান লাল হয়ে গিয়েছিল।

মণীশও হাসলেন, ডেঞ্জারাস মেয়েদের কাছে ডেঞ্জারাস না হলে তো এই কলেজে আমাকে আর অধ্যাপনা করতে হত না। যা সব বাঘিনীরা পড়তে আসে—

ততক্ষণে কফি আর পকৌড়া এসে গেছে তাদের সামনে। কফিতে চুমুক দিয়ে মণীশ বললেন, এসো, এবার তাহলে আমাদের মুল আলোচনায় ফিরে আসি। পৃথিবীর যাবতীয় ডিপ্লোম্যাটদের আলোচনা কিন্তু ডাইনিং টেবিলে হয়। আপাতত কফির টেবিলেই আলোচনা শুরু হোক।

খানিকক্ষণ ভেবেটেবে নিজেকে গুছিয়ে নিল গার্গী। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, স্যার, আপনি তো দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করছেন। ভালো অধ্যাপক হিসেবে যেমন আপনার সুনাম, তেমনই আরও একটি খ্যাতি ইতিমধ্যে এই চত্বরে বহুল প্রচারিত তা হল, মেয়েরা আপনাকে ভীষণ পছন্দ করে। ফলে এই দীর্ঘ সময়ে বহু তরুণীর সংস্পর্শে এসেছেন আপনি, তাতে মেয়েদের মধ্যে এই ক'বছরে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তাও গভীরভাবে লক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই আমার প্রথম প্রশ্ন, কুড়ি বছর আগে আপনি যে তরুণীদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের সঙ্গে হাল আমলের তরুণীদের কোনও মৌলিক পার্থক্য আছে কি না, থাকলে কোথায় সেই পার্থক্য?

মণীশ কিছুক্ষণ ভাবলেন প্রশ্নটি নিয়ে। তারপর বললেন, ভারী ইন্টারেস্টিং ডিসকাসন। তবে তুমি ফিচারিস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে ভেবেছ, আমি তো তাদের সেভাবে দেখিনি। কুড়িবছর আগেও মেয়েরা যে কারণে ছুটে আসত আমার কাছে, এখনও সেই কারণেই আসে। মেয়েরা পুরুষের কাছে আসে ভালোবাসার খোঁজে। যে পুরুষের ব্যক্তিত্ব আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, খ্যাতি আছে তাদের দিকেই সাধারণত ঝুঁকে পড়ে মেয়েরা। রূপের আকর্ষণেও কেউ-কেউ না আসে তা নয়। এই সবকিছু মিলিয়ে আমার হয়তো একটা চাহিদা তৈরি হয়ে যায় তাদের কাছে।

—এই ব্যাপারটা আপনি কীভাবে নেন? তারাই বা কী চায় আপনার কাছে?

মণীশ হাসলেন, অবশ্যই উপভোগ করি ব্যাপারটা। তারা কুড়িবছর আগেও যেভাবে আকারে ইঙ্গিতে, কখনও কেবলমাত্র চাউনি দিয়েই তাদের প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ করত, এখনও সেভাবেই

প্রকাশ করে থাকে। কোনও পার্থক্য নেই।

—বলতে চাইছেন কেবল প্রেম-ভালোবাসাই?

—তাই-ই। আসলে প্রেম-ভালোবাসা মেয়েদের এক চিরন্তন কাঙ্খিত বিষয়। কয়েক হাজার বছর আগে মেয়েরা যেভাবে ভালোবাসত পুরুষকে, আজও তেমনিভাবেই ভালোবাসে। শুধু পার্থক্য যেটুকু তা হল, এক নারীর সঙ্গে আর এক নারীর আচরণের মধ্যে, কিংবা এক পুরুষের সঙ্গে আর এক পুরুষের।

—আপনার মনে হয় না, এখনকার মেয়েরা অনেক বেশি ক্রেজি?

মণীশ রায় এ-প্রশ্নে খানিকক্ষণ থমকালেন, বোধহয় ভাবতে চাইলেন গার্গী আসলে কী বলতে চায়। এত বিচিত্র ধরনের তরুণী তাঁর কাছে প্রতিদিন আসে, এমন বিভিন্ন ছলছুতোয় তাঁর সাহচর্য উপভোগ করতে চায় যে, তাদের সবাইকেই তো তাহলে ক্রেজি বলতে হয়। এমনকী তাঁর স্ত্রী ঈষিতাকেও। ঈষিতাও তো পাঁচ বছর আগে তাঁর জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার আগে আরও অনেক তরুণী। তাঁদের সবাইকে একে-একে এড়িয়ে যেতে পারলেও শেষ পর্যন্ত ঈষিতাকে আর এড়াতে পারেননি। কিছুক্ষণ ভেবেটেবে বললেন, মেয়েদের পাগলের মতো ভালোবাসাকে যদি তাদের ক্রেজ বলতে চাও, তাহলে বেশিরভাগ মেয়েই ক্রেজি। যাকে ভালোবাসে, তার জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিতে পিছপা হয় না।

—উঁহু, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। এখনকার অনেক মেয়েই ঠিক আগের দিনের মতো নরমসরম, লাজুক কিংবা সনাতন ভারতীয় ধ্যানধারণায় আর বিশ্বাসী নয়। হঠাৎ ওয়েস্টার্নাইজড হয়ে উঠেছে তারা। প্রাচ্যের সংস্কৃতির গণ্ডি পেরিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেই আদর্শ মনে করছে। আপনার কি সেরকমই মনে হয় না?

মণীশ কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই বাধা দিল ডোনা, বলল, ওয়েস্টার্ন কালচার তো এখন আমাদের জীবনযাপনের মধ্যে দ্রুত ঢুকে পড়েছে অমনিই। তার জন্য শুধু মেয়েদেরই বা দায়ী করছ কেন, গার্গী?

—দায়ী করছি না। কিন্তু তাতে আমাদের জীবনযাপন থেকে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে সনাতন মূল্যবোধ।

—তা তো হবেই, গার্গী। মূল্যবোধের সংজ্ঞা কখনও থেমে থাকে না পৃথিবীতে। যত বদলে যেতে থাকে সিভিলাইজেশন, মূল্যবোধ বদলে যায়। পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষের মূল্যবোধ যেরকম ছিল, পরের শতাব্দীতে পৌঁছে নিশ্চয় তার আগের শতাব্দী থেকে ঢের বদলে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও তার প্রথম দিককার মূল্যবোধ বজায় থাকবে, নিশ্চতভাবে তা আশা করা সঙ্গত নয়। একবিংশ শতাব্দী যত এগুবে, মূল্যবোধের সংজ্ঞা নিশ্চয় তত বদলে যাবে।

মণীশও এবার অংশগ্রহণ করলেন আলোচনায়, ডোনা ঠিকই বলেছে, গার্গী। যেভাবে আমরা পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার কাছাকাছি আসছি, তত জীবনযাপনেব সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে আমাদের।

—কিন্তু স্যার, তাতে আমাদের জীবনে পিস নামক ব্যাপারটি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুকাল আগেও আমাদের সমাজে এত ডিভোর্স ছিল না, এত অশান্তি ছিল না সংসারে, পারস্পরিক অ্যাডজাস্টমেন্টের এত অভাব ছিল না—।

ডোনা ফোঁস করে উঠে বলল, কিন্তু পুরুষরা তখন অনেক বেশি দাবিয়ে চলত মেয়েদের ওপর। সেটা নিশ্চয় এখন টলারেট করা যায় না। ম্যারেড লাইফে দুজন-দুজনের লাইফ পার্টনার। দেয়ার মাস্ট বি ইকোয়াল শেয়ার। তার অভাব হলে ডিভোর্স আসবেই। আগের দিনের মেয়েরা সেসব অত্যাচার সহ্য করত নীরবে।

গার্গী মুচকি হেসে তার ডায়েরিতে নোট করে নিতে-নিতে বলল, চমৎকার জমেছে কিন্তু ডিবেটটা। যাই হোক, ডোনা যেভাবে রিঅ্যাক্ট করল, তাতে সমাজের এক শ্রেণির মেয়েদের মতামত

তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। আবার অন্যধরনের মেয়েও আছে, যারা পুরোনো ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তারা আবার এই ওয়েস্টার্নাইজড হওয়াটাকে মেনে নিতে পারছে না। তেমন মেয়ের সংখ্যাও আমাদের সমাজে কম নয়।

কফি ও পকৌড়ার প্লেট ইতিমধ্যে নিঃশেষ করে ফেলেছে তিনজনে। মণীশ ঘড়ি দেখে বললেন, আমার আর একটা ক্লাস আছে, গার্গী। আমাকে এখনই উঠতে হবে। তোমার যদি আরও প্রশ্ন থাকে, পরে একদিন সময়ে করে চলে এসো।

গার্গী ব্যস্ত হয়ে বলল, আমার প্রশ্নের তো সবে শুরু, স্যার। এখনও অনেক বাকি।

—ঠিক আছে মাঝেমাঝেই চলে এসো তবে। যখন যেরকম মনে হবে তোমার।

মণীশ রায় চলে যেতেই ডোনা হঠাৎ ধরল গার্গীকে, কি রে, তুই তো তাহলে পার্মানেন্ট ইনভাইটি হয়ে গেলি মনে হচ্ছে।

গার্গী অন্যমনস্কভাবে বলল, ইস, সবে আলোচনাটা জমে উঠেছিল, এমন সময়—।

ডোনা হেসে উঠে বলল, সব আলোচনা একদিনে কি শেষ করে ফেলতে হয়! রোজ একটু-একটু করে করতে হয়। কিন্তু দেখিস, তুই আবার ফেঁসে যাসনে যেন আলোচনা করতে-করতে।

—তুই জেলাস হচ্ছিস নাকি?

—না। তবে আরও অনেকে হবে। অনেকেই কাছে ভিড়তে চাইছে, পাত্তা পাচ্ছে না। তুই যেরকম পাত্তা পেতে শুরু করেছিস, অন্যেরা তোকে হয়তো মেরে গুম করে ফেলবে—।

ডোনার মজা করে বলা কথাটার উত্তরে প্রবলভাবে হেসে উঠতে যাচ্ছিল গার্গী, কিন্তু জায়গাটা কফি হাউস, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুম নয় মনে পড়তে ঝট করে উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে, চল তো, বাইরে যাই।

কফি হাউসের জমজমাট পরিবেশ ছেড়ে বাইরে আসতেই ডোনাকে চেপে ধরল গার্গী, কী ব্যাপার, তোর সেই গুপ্তিপাড়ার প্রেমিকের কী খবর? আবার কোথাও আউটিঙে যাচ্ছিস নাকি?

ডোনা অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে বলল, নাহ। তাকে আপাতত কোল্ডস্টোরেজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই মুহূর্তে আর এক রাজকুমার আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—।

গার্গী কিছুটা অবাক হল, আবার হলও না। ডোনার স্বভাবচরিত্র, হাবভাব তার এ ক'দিনে হাড়ে-হাড়ে চেনা হয়ে গিয়েছে। সে বড় বেশি বৈচিত্র্য আগ্রহী। সারাক্ষণ কোনও-না-কোনও বিপ্লব ঘটাতে খুবই উৎসাহ তার। তবু হঠাৎ রাজকুমার শব্দটি শুনে ঔৎসুক্য গোপন করতে পারল না, বলল, সে আবার কে?

—একজন ধনকুবের। সে হঠাৎ দশলক্ষ টাকা দিয়ে আমার বাবার আঁকা কয়েকখানা ছবি কিনে নিয়ে গেছে। আরও নাকি কিনবে। বিশাল একখানা কনটেসা হাঁকিয়ে সেদিন এসেছিল আমাদের বাড়ি। একদম সাহেবদের মতো চেহারা, কিন্তু বাংলায় কথা বলে।

গার্গী অবাক হয়ে দেখছিল, সেই রাজকুমার সম্পর্কে এতক্ষণ কথা বলতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ঘোর ঘনিয়ে আসছিল ডোনার চোখেমুখে। একেই তো ধনকুবের, তার ওপর সাহেবদের মতো চেহারা, ডোনা একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কী। ডোনার তো আবার একটা আমেরিকা-আমেরিকা ব্যাপার আছে কিনা। মুচকি হেসে বলল, তার সঙ্গেও আউটিঙে যাবি নাকি?

ডোনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নাহ। এখনও তো ইন্টিমেসি হয়নি। জাস্ট আলাপ হয়েছে। নামটাও কী অদ্ভুত। অলর্ক। অলর্ক বোস।

নাম শুনে এবার গার্গীরই ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, সে ছিটকে উঠে বলল, কী নাম বললি?

—অলর্ক বোস। কেন, তুই চিনিস নাকি তাকে।

গার্গী স্তব্ধ হয়ে গিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, চিনি, আবার চিনিও না। কিন্তু তাকে আমার

খুব দরকার। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি?

ডোনা হতবাক হয়ে গিয়েছিল গার্গীর এই আকস্মিক আচরণে। তার চোখে কী যেন পর্যবেক্ষণ করে জোরে-জোরে ঘাড় ঝাঁকাল, নো ম্যাডাম। আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর হিম। হি ইজ অ্যা নাইস গাই—।

গার্গী পুরোপুরি নিরুৎসাহ হল না। সে তো অলর্ক বোসের প্রেমে পড়বে বলে তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়নি। বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ি নিয়ে তার ভাবনাটা শেষপর্যন্ত ভাবনার স্তরেই রয়ে গেছে। অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও আজ পর্যন্ত বীরভঙ্গপুর পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। ক'দিন হল সেই রহস্যের জট খোলার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। হঠাৎ আচমকা অলর্ক বোসের সন্ধান পেতে একেবারে মুখিয়ে উঠল এবার। ব্যাপারটা অতএব চেপে গিয়ে গার্গী মৃদু হাসল ডোনার দিকে তাকিয়ে, তাহলে মন্দার মিত্রের এখন স্টার খারাপ যাচ্ছে বল—।

ডোনাও হাসল। তবে রহস্যময়ীর মতো।

॥ ১০ ॥

ঠিক দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে তার রিভলভিং চেয়ারে বসে একটা ইংরাজি কাগজের টেন্ডারের পাতায় চোখ রাখছিল মন্দার।

লিন্ডসে স্ট্রিটে ঢুকেই কিছুটা এগিয়ে গেলে এই চারতলা পুরোনো বাড়িটা। কলকাতার এই সব ব্যস্ত এলাকায় যখন পুরোনো বাড়ি ভেঙে মহামান্য প্রমোটাররা পটাপট মালটিস্টোরিড বিল্ডিং গজিয়ে তুলছে, তখন এই বাজাজ ম্যানশনটি কী করে তাদের নজর এড়িয়ে এখনও টিকে আছে, সেটাই মন্দারের কাছে ভারী বিস্ময়কর। পুরোনো বলেই দু-লাখ সেলামিতে দোতলার ওপর একটা ষোল বাই দশ ঘর পেয়ে গেছে সে। লোকেশনের তুলনায় টাকাটা খুবই কম হলেও মন্দারের কাছে আপাতত অনেক। দালালের হাতে দু-লাখ টাকা গুনে-গুনে দেওয়ার সময় তার বুকের ভিতরটা চিনচিন করছিল। তার বিজনেসে এখন লিকুইড ক্যাশের খুবই প্রয়োজন। এতগুলো টাকা ব্লকড হয়ে গেলে অসুবিধা হবে। মন্দারের কথা শুনে দালাল শিবরাম দস্তিদার বলছিল, মন্দারবাবু, অনেক কপাল করেছিলেন বলেই এত সস্তায় ঘরখানা পেয়ে গেলেন। একটু অপেক্ষা করলে তিন-চার লাখ টাকাও হয়তো অফার দিত কেউ। এখানে একটা ঘরের কীরকম ডিমান্ড জানেন! এই ঘরখানায় শুধু একটা টেলিফোন নিয়ে বসে থাকলে এক বছরে দু-লাখ টাকা ঘরে এসে যাবে। স্রেফ ব্রোকারি করেই—।

না, মন্দার দালালি করে বড়লোক হতে চায় না। একটা ভালো ব্যাবসা করেই সে তার ভাগ্য ফেরাবে। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা সম্বল করে নেমে এই চার-পাঁচ বছরে সে চোদ্দ-পনেরো লাখ টাকা ক্যাপিটাল করে ফেলেছে। সব টাকাটাই অবশ্য তার ব্যাবসায়ে খাটছে। বছর খানেক হল এই ঘরখানা পেয়ে যেতে সুবিধে হয়ে গেছে তার।

ষোলো বাই দশ ঘরে মন্দার ও তার তিন কর্মচারী মিলে খুলে বসেছে তাদের 'ইন-ডেক' কোম্পানি। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে দরজার ওপরে তাদের কোম্পানির নেমপ্লেটটি বেশ কায়দা করে বসানো। দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ-দিকে পরপর তিনখানা টেবিল। রজীত, নিখিলেশ ও সুমনা নামের তিন যুবক-যুবতীকে কোম্পানির কাজে নিয়োগ করেছে মন্দার। তিনজনই বেশ স্মার্ট, কাজেকর্মেও তুখোড়। সুমনা নামের মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরীও। তিনজনের টেবিল-চেয়ার যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটি প্লাইউডের পার্টিশন। তার ওপাশে একটা হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল নিয়ে বসে থাকে মন্দার। তার টেবিলের সামনে দু-খানা স্টিল-ফ্রেমের গদি আঁটা চেয়ার, ভিজিটরদের বসার জন্য।

প্লাইউডের পার্টিশনটা ইচ্ছে করেই রেখেছে মন্দার। তার কর্মচারীদের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার জন্য। তাতে একটু আড়ালও রইল, আবার ইচ্ছেমতো তিনজনকে ঠিকঠাক ইনস্ট্রাকশনও দেয়া যাবে।

টেন্ডারগুলো পরপর পড়ে যেতে-যেতে হঠাৎ একটা অ্যানাউন্সমেন্টের দিকে নজর আটকে গেল তার। বেশ বড় অঙ্কের একটা টেন্ডারের কল দিয়েছে একেবারে নতুন একটা কোম্পানি। টাকার অঙ্কটিই শুধু চোখে পড়ার মতো তাই নয়, টেন্ডারের বিষয়টিও ভারী অভিনব। বারকয়েক গড়গড় করে বিজ্ঞাপনটি পড়ার পর নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল মন্দারের, সে একটু জোরেই চেঁচিয়ে উঠল, রঞ্জীত, রঞ্জীত।

রঞ্জীতের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে। দশটা বাজার আগেই সে অফিসে পৌঁছে তার কাজকর্ম শুরু করে দেয়। আজও যথারীতি ফাইল খুলে 'বাড কোম্পানিতে' জমা দেওয়ার জন্য টেন্ডার পেপার তৈরি করছে। তার টেবিলে খোলা ফাইলের পাশে ছড়ানো-ছিটানো অনেকগুলো কাগজ, একপাশে একটি ক্যালকুলেটরও। মন্দারের ডাক শুনেই দ্রুত কাজ ফেলে চলে এল পার্টিশনের এপাশে, ইয়েস স্যার—।

খবরের কাগজের পাতা থেকে মুখ না তুলে মন্দার বলল, ক্যারিসমা সিন্ডিকেটের অফিস থেকে যে পেমেন্টটা পাওয়ার কথা ছিল সেটার কী হল?

—সেটা বোধহয় শিগগিরই পাওয়া যাবে, সুমনা তো কাল গিয়েছিল ওদের অফিসে।

—কবে পাওয়া যাবে কিছু বলেছে?

—সুমনা এখনও অফিসে আসেনি। কাল সকাল-সকাল বেরিয়ে গিয়েছিল ক্যারিসমা সিন্ডিকেটে যাওয়ার জন্য। বলেছিল, অ্যাকাউন্টস, অফিসারের সঙ্গে দেখা না হলে আজ অফিস আসার পথে দেখা করে আসবে।

ক্যারিসমা সিন্ডিকেটের পেমেন্ট নিয়ে বেশ কয়েকদিন চিন্তায় আছে মন্দার। প্রায় তিনমাস হয়ে গেল ওদের অফিসের ভেতরটায় রি-মডেলিং-এর কাজ করে 'ইন-ডেক' অথচ এখনও পেমেন্ট দেয়নি ওরা। প্রায় লাখদুয়েক টাকা আটকে যাওয়ায় খুবই অসুবিধে হচ্ছে। রঞ্জীতের কথা শুনে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ খবরের কাগজটা এগিয়ে দিল, 'এ টু জেড' কোম্পানির এই বিজ্ঞাপনটা দেখেছ?

রঞ্জীত ঘাড় নাড়ে, দেখেছি স্যার।

—আমরা কি টেন্ডার দিতে পারব?

খানিক ইতস্তত করে রঞ্জীত বলল, মনে হচ্ছে পারব না। শুধু আর্নেস্ট মানিই জমা দিতে হবে আড়াই লাখ টাকা। তারপর প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার কাজ প্রথম দফায়। আমাদের যা ক্যাপিটাল তাতে কুলোবে না।

মন্দার কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বলল, ওরা মোট পাঁচটা শো-রুমের জন্য টেন্ডার কল করেছে। আমরা যদি একটা শো-রুমের জন্য কমপিট করি?

—টেন্ডারের অ্যানাউন্সমেন্টে তা বলা নেই। বলেছে, একজন বিখ্যাত শিল্পীর বিশেষ লে-আউট অনুযায়ী সবক'টা শোরুমের ইনটেরিয়র ডেকরেশন করতে হবে, মাত্র একটি কনসার্নই সব ক'টা কাজের বরাত পাবে।

মাঝেমধ্যেই সংবাদপত্রে এরকম বড়-বড় কাজের টেন্ডার প্রকাশিত হয়। সমস্ত টেন্ডারগুলিই মন্দার খুঁটিয়ে পড়ে, কিন্তু প্রতিবারই তাকে হতাশ হতে হয় অর্থাভাবের জন্য। সে তার ছোট্ট কোম্পানিটিকে দ্রুত বড় করে তোলার জন্য প্রবল পরিশ্রম করে চলেছে। প্রতিটি মাঝারি টেন্ডারেই সে অংশগ্রহণ করে এবং এ পর্যন্ত যতগুলি কাজ তার 'ইন-ডেক' হাতে নিয়েছে, প্রতিটির পারফরমেন্সই চমৎকার। শুধু এ মাসে দু-দুটি ভালো টেন্ডার সে পায়নি তারই গাফিলতির জন্য। রঞ্জীতরা দুটো

টেন্ডারের কাগজপত্রই ঠিকঠাক প্রস্তুত করে রেখেছিল। মন্দার বিনা নোটিশে পরপর তিনদিন অফিসে না আসায় তারা জমা দিতে পারেনি টেন্ডার। তিনদিন পর অফিসে ফিরে এসে বুঝতে পেরেছিল, অফিস-মাস্টারের অনুপস্থিতির জন্য তার কর্মীরা মনে-মনে ক্ষুব্ধ, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তা প্রকাশ করেনি তারা।

মন্দার মনে-মনে লজ্জিত বোধ করেছিল, কিন্তু খুশিও হয়েছিল এই কারণে যে, তার কোম্পানির কর্মীরা তাহলে কোম্পানির জন্য মমত্ব অনুভব করতে শিখেছে। কোথায় অফিস-মাস্টার তার কর্মীদের গাফিলতির জন্য রাগারাগি করবে, তা নয়তো কর্মীরাই ক্ষুব্ধ হচ্ছে অফিস-মাস্টারের গরহাজিরায়। কিন্তু সেই একবারই না, এই নিয়ে দুবার। এর আগেও হঠাৎ এভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল তিন-চারদিনের জন্য, একাই অবশ্য। সেবার ফিরে এসে শুনেছিল, রঞ্জীত তার অনুপস্থিতিতে তারই নাম সই করে জমা দিয়েছে টেন্ডারের কাগজপত্র। সেবার রঞ্জীতকে খুব বকাবকি করেছিল মন্দার, এভাবে স্বাক্ষর জাল করায়। কিন্তু দু-লাখ টাকার কাজটা পেয়ে যেতে মনে-মনে খুশিই হয়েছিল, তবে রঞ্জীতকে তা জানায়নি, ইচ্ছে করেই। সেইজন্যেই এবার রঞ্জীত আর টেন্ডার পেপার জমা দেয়নি। যাই হোক, মন্দার তার কোম্পানির জন্য গত পাঁচ-ছ বছর জান লড়িয়ে দিচ্ছে। 'ডি' ক্লাস থেকে 'সি' ক্লাস কন্ট্রাক্টর হয়েছে। খুব শিগগির হয়তো 'বি' ক্লাসও হয়ে যাবে। কিন্তু তার টার্গেট 'এ' ক্লাস হওয়া। কবে কোটি টাকার টেন্ডার ধরতে পারবে সেদিনের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু আপাতত চল্লিশ লাখ টাকার টেন্ডারেও সে অংশগ্রহণ করতে পারছে না এই বোধটাই তাকে পীড়িত করছে। যে করেই হোক, কিছু টাকা তাকে সংগ্রহ করতেই হবে।

—এক কাজ করো রঞ্জীত। ক্যারিসমা সিন্ডিকেটের পেমেন্টটা পেয়ে গেলে আর্নেস্ট মানির টাকাটা জমা দিয়ে দাও। তারপর ওয়ার্ক অর্ডার পেলে কোনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

রঞ্জীত তবুও মাথা নাড়ল, ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না, স্যার। বিজ্ঞাপনে বলা আছে, যেসব কোম্পানি অন্তত এককোটি টাকার কাজ করার অর্ডার পেয়েছে, কেবল তাঁরাই পার্টিসিপেট করতে পারবে।

মন্দার বিস্মিত হয়ে বলল, কেন, এখনও এককোটি টাকার কাজ আমরা করিনি।

—না স্যার। আমি হিসেব করে দেখছিলাম, 'ইন-ডেক' কোম্পানি এ পর্যন্ত ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েছে মোট সাড়ে সাতানব্বই লাখ টাকার। মাত্র আড়াই লাখ টাকা শর্ট আছে এখনও।

—মাত্র আড়াই লাখ?

—হ্যাঁ, এ মাসে দু-দুটো অর্ডার হাতছাড়া না হয়ে গেলে হয়তো আমরা কমপিট করতে পারতাম।

মন্দার কয়েক মুহূর্ত অপরাধীর মতো তাকিয়ে রইল রঞ্জীতের মুখের দিকে। এত বড় একটা টেন্ডারে অংশগ্রহণ না করতে পারায় যাবতীয় দায়িত্ব কিনা তারই ওপর এসে বর্তাচ্ছে। সে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, এখন তাহলে থাক।

রঞ্জীত চলে যাওয়ার পর নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয়ে গেল মন্দারের। সেই রাগ পুঞ্জীভূত হতে-হতে অবশেষে আছড়ে পড়ল ডোনার ওপর। সেদিন ডোনা অমন নাছোড় না হলে তারা তো পরদিনই ফিরে আসতে পারত গুপ্তিপাড়ার সেই মহেঞ্জোদাড়ো স্টাইলের পোড়ো বাড়িটা থেকে। তাহলে তো 'জনসন অ্যান্ড টেনিসন' আর 'ট্রেড-টায়ার' নামে দুটো কোম্পানির প্রায় পাঁচ লাখ টাকার টেন্ডার তাদের হাতছাড়া হত না। পাঁচ লাখ টাকার মতো কাজ পেলে অন্তত সত্তর আশি হাজার টাকা লাভ হত এ-মাসে। সে টাকাটাও এখন তাদের কোম্পানির কাছে অনেক।

নাহ, ডোনা সত্যিই কেয়ারলেস, ইররেসপনসিবল। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ডোনার

কথাই ভাবতে বসল মন্দার। হয়তো কেয়ারলেস বলেই ডোনার মতো বোহেমিয়ান সুন্দরী তার মতো একজন ব্যবসায়ীর প্রেমে পড়ে গেছে হঠাৎ। হয়তো তাই-ই হঠাৎ তার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার করতে সে বেরিয়ে পড়েছিল গুপ্তিপাড়ার পোড়োবাড়ির উদ্দেশে। আর একদিনের বদলে তারা কীভাবে তিনদিন পার করে ফেলল তা বুঝতেই পারেনি। তার এই আঠাশ বছর বয়সে দু-একজন মেয়ের সঙ্গে একটু-আধটু ঘনিষ্ঠতা হয়নি এমন নয়। কিন্তু সে ওই চোখাচোখি, একটু হাসি, কিংবা অপালা নামের একটি মেয়ের হাতটাও হঠাৎ ধরে ফেলেছিল একদিন। কিন্তু সে ওই পর্যন্তই। তার বেশি প্রেম করার ধৈর্য বা ক্ষমতা তার ছিল না। তখনও পর্যন্ত সে ছিল বেকার, বাবা-মায়ের বাঁয়ে-এলেক-দেয়া ছেলে। তারপর ছোট্ট ব্যাবসায়ে হাত দেয়ার পর আর কোনওদিকে তাকানোর ফুরসত পায়নি। তরতর করে কেবল সাফল্যের মুখ দেখতে চেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ করেছে নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর সততা। এর মধ্যে কীভাবে যেন সে লটকে গেল ডোনার সঙ্গে। তার কয়েকদিনের মধ্যে তার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ল যে, সে অভিজ্ঞতা তার কাছে অদ্ভুত, প্রায় অসম্ভবের মতো। ডোনা বোহেমিয়ান তো বোহেমিয়ান। মাত্র তিনদিনের মধ্যে প্রেমে আনাড়ি মন্দারকে সে মন্ত্রের মতো পুরোপুরি সাবালক করে ছেড়ে দিয়েছে। মাত্র তিনদিনের জন্য সে আর ডোনা কাছাকাছি হয়েছিল। এই তিনদিনে তার মনে হল সে জয় করে এসেছে তাবৎ বিশ্ব। এভারেস্ট-শৃঙ্গ ডিঙিয়ে ফিরে এল এক্ষুনি।

তারপর কয়েকদিন তার সমস্ত শরীর ও মন জুড়ে কেবল ডোনা, ডোনা আর ডোনা। দু-দুটো টেন্ডার মিস করার শোকও সে অনায়াসে ভুলতে পেরেছিল, ডোনার কাছ থেকে যে স্বর্গীয় সুখ লাভ করেছিল তার আনন্দে, উল্লাসে, এক নিশ্চিন্ত ভাবনায়।

কিন্তু এখন আবার সেই শোকটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। রজীতের একটু আগের কথাগুলো কয়েকটা আলপিন হয়ে বিঁধে রয়েছে তার বুকের ভিতরে, 'এ মাসে দু-দুটো অর্ডার হাতছাড়া হয়ে না গেলে হয়তো আমরা কমপিট করতে পারতাম।'

কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে থেকে মন্দার হঠাৎ হাত দিল তার টেবিলের একপাশে রাখা টেলিফোনে, ডায়াল ঘোরাতেই ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ, কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝল, চিত্রদীপ চ্যাটার্জি।

—হ্যালো, আমি মন্দার বলছি। মন্দার মিত্র। ডোনাকে একবার ফোনটা দেবেন?

ওপাশ থেকে নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর, ডোনা বাড়ি নেই।

মন্দার জানে, চিত্রদীপ তাকে খুব একটা পছন্দ করেন না। করার কথাও নয়, কারণ ডোনার সঙ্গে ম্যাচ হিসেবে মন্দারের তেমন যোগ্যতা আছে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। চিত্রদীপ শিল্পী মানুষ। শিল্পী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট নাম না হলেও তাঁর বাড়ির আবহাওয়া, আদবকায়দা, পরিবেশ সবই একেবারে আলাদা ধরনের। একটা বিদেশি-বিদেশি ব্যাপারও আছে। আর সেটা বেশ উপভোগ করে মন্দার। ডোনা সুন্দরী, শিক্ষিতা, আদবকায়দায় অতীব আধুনিক, তবু সে যে কেন হঠাৎ পছন্দ করে ফেলল মন্দারকে তা তার কাছে অবোধ্য।

একটু থেমে, পরক্ষণে মন্দার আবার বলল, ডোনা কোথায় গেছে বা কখন ফিরবে বলতে পারবেন?

—কখন ফিরবে বলতে পারব না। কোথায় গেছে সেটা জানিয়ে গেছে আমাকে। মা-মেয়ে দুজনে মিলে একটা গাড়ি কিনবে স্থির করেছে। তার মডেল পছন্দ করতে বেরিয়েছে ঘণ্টাদুয়েক আগে।

মন্দারের বিস্ময় চাপা থাকল না, গাড়ি কিনতে? ইয়ে মানে কোন গাড়ি?

—ওই চার চাকার গাড়ি আর কি।

খুব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কথা বলছেন চিত্রদীপ, কিন্তু মন্দার ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। চিত্রদীপ মারুতি কিংবা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি কেনার কথা বলছেন কি না। ডোনাদের বাড়ির অবস্থা সে যতদূর

জানে, তা এই মুহূর্তে গাড়ি কেনার মতো নয়। তার শিল্পী-বাবার যা আয় তাতে হেসেখেলে সংসারটা চলে যায়, কিন্তু আবার একটা গাড়ি কেনার মতো হয়ে ওঠেনি। আগের সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িটাই তো বিক্রি করে দিয়েছে মেইনটেন করতে পারছে না বলে। তবু হয় তো—।

মন্দার আবারও বিস্মিত হয়ে বলল, তা ওরা মানে ডোনা আর তার মা গাড়ির মডেল পছন্দ করতে গেল! ওরা কি পারবে!

—না পারার কি আছে।

—মানে আপনি সঙ্গে গেলে ভালো হত না?

—আমার যাওয়ার আর কী দরকার। আই অ্যাম ওল্ড হ্যাগার্ড। ওদের সঙ্গে শিহরণ গেছে —দ্যাট বাস্টার্ড। বাস্টার্ড! আবারও থমকালো মন্দার, শিহরণ মানে ডোনাদের বাড়ি যিনি পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকেন। তিনি তো ইংরাজির অধ্যাপক বলে মন্দার জানে। তাঁর নিজের সংসার চালচুলো বলতে কিচ্ছু নেই। গাড়ির মডেল কি তিনি পছন্দ করতে পারবেন! কে জানে—

মনে-মনে খুবই রাগ হয়ে গেল মন্দারের। গাড়ি কিনবে ডোনারা, তা সেটা মন্দারকে একটু বলতে পারত না! এই কিছুদিন আগেই সে নতুন মারুতিটা কিনেছে। সেসময় সে কলকাতার যাবতীয় গাড়ির ডিলারদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়েছে, কোন মডেলের কত দাম, কোন গাড়ির সবচেয়ে ভালো পিক-আপ, কোন গাড়ির তেল-খরচ সবচেয়ে কম, কোন ডিলার সবচেয়ে বেশি কমিশন দিতে পারেন ক্রেতাকে। এ সমস্তই তার নখদর্পণে। যে মানুষটা সদ্য গাড়ি কিনেছে, ডোনা তো তার কাছ থেকেই পরামর্শ নিতে পারত। নিদেন একবার তাকে ফোনও তো করতে পারত।

না কি ডোনার একবারও মনে হয়নি মন্দারের কথা! তাছাড়া হঠাৎ গাড়ি কেনার মতো টাকাই বা ওরা পেল কোত্থেকে! এই তো ক'দিন আগে দিল্লি রোড দিয়ে তুমুল গতিতে গাড়ি চালাতে-চালাতে ডোনা বলেছিল, তার নিজের একটা গাড়ি থাকলে সে ওয়ার্ল্ড-ট্যুরে বেরুতে পারত। মন্দারের মুখে একবার এসে গিয়েছিল, তা চলো না, এই গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ি। এই গাড়িটার অর্ধেক তো তোমার। বলেনি অবশ্য কথাটা, কারণ তাতে ডোনা তৎক্ষণাৎ ওয়ার্ল্ড-ট্যুরে বেরুবার দিনক্ষণ ভাঁজতে বসবে। তার তো আর চারপাশের পৃথিবী নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা নেই। সে তো প্রায় জন্ম ভবঘুরে। কিন্তু এভাবে বেরিয়ে পড়লে মন্দারের তো চলবে না।

আসলে মন্দার বুঝতে পারে, অল্পবয়স থেকেই ডোনা ফাস্ট লাইফ লিড করতে অভ্যস্ত। তারা একসময় আমেরিকায় বসবাস করে এসেছে। দেশে ফেরার সময় সেখানকার বোহেমিয়ান জীবনযাপন, আদবকায়দা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। এহেন উড়নচণ্ডীকে কীভাবে শাসনে রাখবে মন্দার তা বুঝতে পারে না।

তা ছাড়া ক'দিন আগে খবরের কাগজে ডোনার যে ছবিটা বেরিয়েছে, তা মন্দারের কাছে রীতিমতো শকিং। এভাবে বেআব্রু হয়ে স্টুডিওতে সবার সামনে ছবি তুলেছে, তা ছাপাতে পেরেছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, এই ব্যাপারটা ভাবতেই পারে না মন্দার। যে-পরিবারে বড় হয়েছে মন্দার, তা রক্ষণশীল আর পাঁচটা বাঙালি পরিবারের মতোই। তার বাবা-মা ভেবে রেখেছেন কোনও নরমসরম বাঙালি মেয়ে তাদের ঘরে বউ হয়ে আসবে। তাঁদের চিন্তাভাবনার পথে ডোনার মতো মড মেয়েকে কেমন লাগবে তা ভেবে মন্দার দিশেহারা। অথচ ডোনার বেহিসেবি বাঁধন কাটিয়ে তার পক্ষে এখন ফেরাও কঠিন। ডোনা আসলে একটা নেশার মতো, তার ভালোবাসা উদ্দাম, উচ্ছল, যার বাঁধভাঙা তোড়ে উধাও হওয়া যায় অসীমের টানে। সে ভালোবাসা আবার কোনও বাঙালি ঘরের নরম মেয়ে দিতে পারবে না কখনও। ডোনা-নাম্নী সেই তুমুল নেশা ছেড়ে মন্দার তাহলে কীভাবে থাকবে।

বাস্টার্ড শব্দটি মনের ভেতর আর একবার নাড়াচাড়া করল সে। ক'দিন আগে ডোনাদের বাড়ি ঢোকার মুখে শুনতে পেয়েছিল, চিত্রদীপ আর বনানীর মধ্যে শিহরনকে নিয়ে প্রবল কলহ হচ্ছে।

সে সময় চিত্রদীপের মুখখানা কী বীভৎস দেখাচ্ছিল। কোনও পুরুষই বোধহয় তার স্ত্রীর জীবনে অন্য পুরুষকে সহ্য করে না।

বহুক্ষণ পর তার সহসা খেয়াল হল, শেষ বাক্যালাপটি দীর্ঘক্ষণ আগে করে চিত্রদীপ কখন যেন ওপাশে টেলিফোন রেখে দিয়েছেন, আর সেও দীর্ঘক্ষণ রিসিভার হাতে নিয়ে আবোলতাবোল ভেবে চলেছে।

লজ্জা পেয়ে রিসিভার রাখতেই শুনল, প্লাইউডের পার্টিশনের ওপাশে সুমনার উচ্ছ্বসিত গলা জানেন রঞ্জীতদা, ক্যারিসমা সিন্ডিকেট দু-মাস টলিয়ে তারপর আজ চেক ইস্যু করল। উহ, যা ধকল আর টেনশান গেছে না আমার ওপর দিয়ে!

রঞ্জীত সঙ্গে-সঙ্গে বলল, যাও, বসকে খবরটা দিয়ে এসো এক্ষুনি।

সুমনার সঙ্গে রঞ্জীতও চলে এল মন্দারের কাছে, স্যার গুড নিউজ। মন্দার হেসে বলল, থ্যাঙ্ক য়্যু সুমনা। তুমি কোম্পানির জন্য ক'দিন ধরে যা ট্রাবল নিয়েছ, তাতে আপাতত শুধু ধন্যবাদই জানাচ্ছি। পরে নিশ্চয়ই কোনও প্রেজেন্টস দিতে পারব তোমাকে। রঞ্জীত, তুমি তাহলে এ টু জেড-এর টেন্ডার পেপার তৈরি করে ফেলো—। কুইক।

রঞ্জীত বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাতেই মন্দার আবার বলল, আগে কম্পিটিশনে নামি তো, তারপর দেখা যাবে—।

॥ ১১ ॥

সকালে উঠেই চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়িতে যাওয়ার কথা অলর্কের, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবার মুখেই এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যা তাকে রীতিমতো চমকে দিল আজ। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই দেখল, সিঁড়ির গোড়ায় কুণ্ডলি পাকানো একখণ্ড কাগজ পড়ে আছে নিতান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে। হয়তো অদরকারি কাগজই, ফেলে দিতে হবে ওয়েস্ট পেপার ফেলার ঝুড়িতে, এমন ভাবতে-ভাবতে কাগজখণ্ডটি তুলে কী লেখা দেখতে গিয়েই তাজ্জব। তাতে হিজিবিজি অক্ষরে লেখা কয়েকটি শব্দ, যা অতিকষ্টে উদ্ধার করতেই সে উপলব্ধি করল সেগুলো শব্দ নয়, অ্যাটম বোমাই যেন। লেখা আছে তোমার আয়ু মাত্র আর কয়েকদিন।

মাত্র কয়েকদিন নিজের ভেতর সহসা প্রবলভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে গেল অলর্ক। সে এখন কলকাতার অন্যতম ধনী ব্যক্তি, বোধহয় বিলিওনেয়ার শব্দটাই তার নামের পাশে এখন দিব্যি খাপ খেয়ে যায়। তার মাথায় এখন অনেক পরিকল্পনা, সামনে লক্ষ কাজের পাহাড় যা রূপায়িত করতে দিবা-রাত্র পরিশ্রম করে চলেছে ভূতের মতো। এহেন মুহূর্তে তার আয়ু মাত্র কয়েকদিনের হলে চলবেই বা কী করে? ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল, তবু সে প্রতিমুহূর্তে আজকাল অনুভব করতে পারে, তার চারপাশে শত্রুর সংখ্যা এখন অনেক। বহু প্রতিহিংসার নজর সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর অক্টোপাসের মতো। কেউ বা কারা যেন সর্বক্ষণ তাকে অনুসরণ করে চলেছে ছায়ার মতো। যে-কোনও অসতর্ক মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার ওপর। কয়েকদিন ধরেই দেখছে, বিশাল একটা কালো রঙের মোটরবাইক তার গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর গতিতে। দু-তিনটি গগলস পরা যুবক তাতে বসে, সবই অচেনা, কিন্তু তারা এভাবে গুমগুম শব্দে বাইক চালিয়ে প্রতিমুহূর্তে তাকে ধমক দিয়ে চলেছে যেন। দেখলেই মনে হয় ভাড়াটে খুনি, কেউ বা কারা হয়তো তার পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে এদের।

অলর্ক খুবই সাহসী, এসব ধমক পরোয়া করে না তেমন, তাই পুলিশকে ব্যাপারটা জানায়নি এতদিন, আজ চিরকুটটা হাতে পেতেই মনে হল, একবার থানায় জানিয়ে রাখলে ভালো হত। কিন্তু

কী বলেই বা জানাবে। জানাতে গেলে হয়তো পুলিশই ফেউয়ের মতো লেগে থাকবে তার পিছনে। তার টাকার গন্ধে চকচক করতে থাকবে তাদের মুখগুলো।

অনেক ভেবেচিন্তে, যাতে ছোটখাটো প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারে, একটা বিদেশি পিস্তল জোগাড় করে ফেলেছে অলর্ক। খুবই আধুনিক মারণাস্ত্র, অনেক দূর থেকেও পেড়ে ফেলা যায় শত্রুকে। তা হাতে পেয়ে কয়েকদিন ধরে নাড়াচাড়া করে দেখেছে, শরীরে বেশ সাহস এনে দেয় যন্ত্রটা। চিরকুটটা বার দুই পড়ার পর তার অজান্তেই ডানহাতের আঙুলগুলো ছুঁয়ে ফেলল কোমরে গুঁজে রাখা নতুন পিস্তলের বাঁট। সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল তার শরীরটা। বুঝতে পারছে না, কে লাগিয়ে দিল এই ভাড়াটে খুনিদের! সেই রাজপ্রাসাদপ্রতিম বাড়ির হরিশঙ্করবাবু, না কি তার সেই একদা প্রেমিকার নবতম প্রেমিকটি! যে-ই হোক না কেন, তার সঙ্গে কি অলর্ককে শেষ পর্যন্ত একটা এসপার-ওসপার করতেই হবে!

পিস্তলটির শরীর ছুঁয়ে অলর্ক একমুহূর্তে যেন কেঁপে উঠল থরথর করে। 'আয়ু মাত্র কয়েকদিনের' শব্দগুলো তাকে বারবার প্রবলভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন। কার আয়ু—তার না তার প্রতিপক্ষের?

কয়েকদিন আগে হরিশংকর চৌধুরি তার বাড়িতে এসেছিল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে। বীরভ পুরের রানিমাকে খুন করেছিল যে সাংবাদিকটি, সে নাকি ঘোরাফেরা করছে অলর্কের বাড়ির কাছাকাছি। হরিশংকর চৌধুরি রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলেছিল, রানিমাকে আপনিই খুন করিয়েছেন ওই লোকটিকে পাঠিয়ে—

অলর্ক অবাক হয়ে বলেছিল, আমি!

—হ্যাঁ। লোকটাকে সেদিন আপনার অফিসেও দেখলাম। শুধু দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে এই যা। শুনে অলর্ক যেমন বিস্মিত, তেমনই শঙ্কিত। কেন তার আশেপাশে সর্বক্ষণ ঘুরছে লোকটা। কী মতলব তার!

পিস্তলটি নিয়ে এর মধ্যে বারকয়েক প্র্যাকটিসও করেছে সে। ঠিক কতদূর থেকে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে হবে এখনও জানে না। দুশো গজ, কিংবা দুশো বিঘৎ—দূরত্ব যাই হোক না কেন, তাকে জিততেই হবে সেই লড়াইয়ে। হয় এসপার, না হয় ওসপার।

কিন্তু হঠাৎ যদি চোরাগোপ্তা কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। অন্ধকারে, গোপনে, কিংবা পেছন থেকে। এমন ভাবতে-ভাবতে সে তার বিশাল ঝকঝকে গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। চিত্রদীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে তার এখন অনেক কাজ। পরপর অনেক আলোচনা সেরে নিতে হবে। লোকটি যেমন গুরুগম্ভীর, তেমনই ভারী আনপ্রেডিকেটবল। শিল্পীরা এমন অদ্ভুত ধরনের হয়, তারা আর পাঁচটা মানুষের থেকে যে আলাদা, তা ক'দিনে বুঝে ফেলার পর চিত্রদীপকে নিয়ে খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হচ্ছে তাকে। খুবই বড় শিল্পী চিত্রদীপ, বড় বলেই এরকম পাগলা ধরনের।

আর এরকম একজন বড় শিল্পীর সঙ্গে কাজ করা কী যে ঝকমারি ব্যাপার তা এখন হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছে অলর্ক। প্রথমে চিত্রদীপ সরাসরি প্রত্যাখান করেছিলেন তাকে। কিন্তু অলর্ক প্রথম থেকে ঠিক করে রেখেছে, তার প্রজেক্ট সে যেভাবে করবে বলে মনে করেছে, ঠিক সেভাবেই করবে। তা সে যে-কোনও মূল্যের বিনিময়েই হোক না কেন। সেই সঠিক লক্ষে এগিয়ে যাওয়ার পথে সে আপাতত সফল। এতগুলো ছবি একসঙ্গে বিক্রি হয়ে যাওয়ায় চিত্রদীপই শুধু অবাক হয়েছেন তাই নয়, তাঁর পরিবারের বাকি সবাইও তাজ্জব। তারা জেনেছে, তাহলে চিত্রদীপের ছবিও বিক্রি হতে পারে। তাহলে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিও একজন প্রতিভাবান শিল্পী।

তাঁদের এই আকস্মিক বিহ্বলতার মধ্যেই অলর্ক তার কাজ হাসিল করে নিয়েছে টায়েটায়ে। চিত্রদীপ শেষ পর্যন্ত অলর্কের প্রস্তাবে রাজি হয়ে এখন পুরোপুরি মগ্ন ইনটেরিয়ার ডেকরেশনের লে-আউট তৈরির কাজে। কাজটি তাঁর কাছে অদ্ভুত, কিন্তু দারুণ লাগছে আপাতত। কাজটা চ্যালেঞ্জিং

বটে। কিন্তু অলর্কের কোনও সাজেশনেই কর্ণপাত করেননি।

কয়েকদিনের মধ্যেই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলির জন্য একটি চমৎকার লে-আউট প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছেন চিত্রদীপ। আপাতত পাঁচটি শো-রুমের কাজ শুরু হবে, তার জন্য নকশা একটাই, শুধু রঙের আর দৃশ্যপটের তারতম্য করে প্রতিটি শো-রুমের বৈচিত্র্য আনতে চান তিনি। অলর্কের লিন্ডসে স্ট্রিটের স্পেসটাই বৃহত্তম, একতলা-দোতলা মিলিয়ে প্রায় সাতহাজার স্কোয়ার ফুট, তাই এই শো-রুমটির ভিতরে শুধু নীল আর নীল। তাঁর যে ছবিগুলোতে শুধু নীলরঙের ছড়াছড়ি সেগুলিই এই শো-রুমটিতে টাঙাবার পরিকল্পনা করেছেন। ছবির সঙ্গে রং মিলিয়ে প্রতিটি দেওয়াল। তার মাঝখানে নীলরঙের প্রাধান্য দিয়ে এখানে ওখানে ম্যুরাল।. শো-রুমের কোথাও প্লাইউডের পার্টিশন, কোথাও কাচের। প্লাইউডের ওপর কখনও হালকা নীল, কখনও ঘন নীলরঙের ঢেউ-ঢেউ ডিজাইনওয়ালা সানমাইকা। শো-উইনডোতে কয়েকটি ন্যুড মডেল। তার সঙ্গে যেখানে যেমন প্রয়োজন আলোর কাজ। ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কাজ শেষ হয়ে গেলে মনে হবে যেন কোনও সমুদ্রের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি। তার সেই অফুরন্ত জলরাশির ভেতর থেকে স্নান করে উঠছে ভেনাসের মতো নগ্ননারীরা।

হঠাৎ কোনও নতুন কাস্টমার শো-রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লে নিশ্চিন্ত দিশেহারা হয়ে পড়বে। এমন অলৌকিক পরিবেশে ঘুরে-ঘুরে জিনিসপত্র কেনার থ্রিলই তো অন্যরকম।

লিন্ডসে স্ট্রিটের শো-রুমে যদি নীল রঙের ছড়াছড়ি হয়, তাহলে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে শো-রুমটিতে হবে সবুজের প্রাচুর্য। এখানে এমন উপছানো সবুজের ঢেলখেল, যেন তা হবে প্রকৃতির এক চমৎকার ল্যান্ডস্কেপ। যেন কোথাও সবুজ ধানখেত, কোথাও ঘন বাঁশবন ঝুঁকে আছে ক্রেতার মাথার ওপরে, কখনও বা বিশাল শাল সেগুনের ছায়ায়-ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ক্রেতারা।

ঠিক তেমনই হাতিবাগানের শো-রুমে থাকবে ঘন ও হালকা খয়েরি রঙের ছড়াছড়ি। দূরে একটা গ্লোব এমনভাবে রাখা থাকবে যেন পৃথিবীটাই কেউ দেখতে পাচ্ছে পৃথিবীর বাইরে কোথাও দাঁড়িয়ে। আসলে শো-রুমটি করা হচ্ছে মানুষ চাঁদে গেলে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যপট দেখতে পাবে তারই আদলে। চাঁদের গায়ে যে অসংখ্য নগ্ন পাহাড়, ধু-ধু জলহীন সমুদ্র, গিরিখাত আছে, তাতে যে খয়েরি, কালচে-খয়েরি রঙের প্রাধান্য, চিত্রদীপ তাই-ই ফোটাতে চেয়েছেন এখানে।

পাশাপাশি শ্যামবাজারে মরুভূমির দৃশ্য। তার ভেতরে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটি যেন হবে একটি চমৎকার মরুদ্যান। কয়েকটি খেজুর গাছ এমন চমৎকার ভাবে এঁকেছেন যে, তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকার আরামই আলাদা। আর গড়িয়াহাটের শো-রুমে অন্য এক চমক, সেখানে সাদা রঙের কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বরফের দেশ। তার সঙ্গে থাকবে এয়ারকন্ডিশনের কৃত্রিম শীত। এস্কিমোরাই যেন বিক্রেতার ভূমিকায়।

চিত্রদীপকে যত দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে অলর্ক। প্রতিটি শো-রুমের জন্য মডেল তৈরি করে সেগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে চিত্রদীপ ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, এখন বলো, কেমন লাগছে এগুলো?

বিহ্বল অলর্ক শুধু বলতে পারল, সুপার্ব। আমি কিন্তু এর দশভাগের একভাগও এক্সপেক্ট করিনি। সত্যিই আপনার প্রতিভা এতদিন শুধু অপচয় হয়েছে।

—নাও য়্যু গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর প্রজেক্ট।

—আমি কিন্তু আপনার এই শিল্পকর্মের নমুনা সহ কাগজে আলাদা করে বিজ্ঞাপন দেব প্রতিটি শো-রুম ওপেনিং-এর সময়। এমন শৈল্পিকভাবেও যে শো-রুম সাজানো যায় তা এতদিন এই শহরের বাসিন্দারা জানত না। 'এ টু জেড ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস' দেখে সবাই নিশ্চিতভাবে চমকে যাবে। আর এ ব্যাপারে পাইওনিয়ার হবেন আপনিই।

চিত্রদীপ পাইপে খানিক ধোঁয়া উড়িয়ে হেসে বললেন, আগে কাজটা কমপ্লিট হোক—।

এবার খানিক ইতস্তত করে অলর্ক বলল, কিন্তু এই ডিজাইনের জন্য আপনার পারিশ্রমিক কত তা কিন্তু বলেননি এখনও—।

গত কয়েকদিন রাতদিন পরিশ্রম করে তাঁর স্টুডিওতে কাজগুলো করছেন চিত্রদীপ। এ ধরনের কাজ আগে কখনও করেননি, তাই ব্যাপারটা তাঁর মনে হয়েছিল চ্যালেঞ্জিং। তারপর কাজ করতে-করতে মনে হয়েছে এই ইনটেরিয়র ডেকরেশনের পুরো ব্যাপারটাই একধরনের শিল্প। শুধু প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন কমোডিটির জন্য র‍্যাক তৈরি করা, দামি সানমাইকা দিয়ে কাউন্টার বানানো, আর শো-উইন্ডোয় মডেল রেখে দিলেই তা ইনটেরিয়র ডেকরেশন হয় না। তাকে শৈল্পিক সুষমায়ও উন্নীত করে তোলা যায়। এক-একটি শো-রুম হবে এক একটি চিরস্থায়ী গ্যালারি। এ টু জেড-এর প্রতিটি শো-রুমেই থাকবে চিত্রদীপের প্রতিভার এ টু জেড স্বাক্ষর।

একটু ভেবে চিত্রদীপ বললেন, শিল্পী যখন ছবি আঁকে, তখন তা কত দামে বিকোবে তা ভেবে আঁকে না। এই কাজটা করার সময়ও শিল্পের কথা ভেবেই দিনরাত খেটেছি। টাকার কথা ভেবে করিনি। তবে আমার ছবিগুলোর দাম বাবদ তুমি যে টাকা এ পর্যন্ত দিয়েছ, তা এই মুহূর্তে আমার কাছে অনেক। আপাতত আর কিছু না হলেও চলবে।

অলর্ক চমকে উঠল রীতিমতো। একজন শিল্পী গত কয়েকদিন পাগলের মতো খেটে এতগুলো দুর্দান্ত মডেল, লে-আউট তৈরি করার পর এখন কিনা বলছেন, আপাতত কিছু না হলেও চলবে!

প্রাথমিক বিহ্বলতা কেটে গেলে অলর্ক বলল, ঠিক আছে, ও'টা আমার ওপর ছেড়ে দিন। তাহলে আপাতত মডেলগুলো আমি গাড়িতে তুলে নিচ্ছি। শো-রুমগুলোর জন্য ইনটেরিয়র ডেকরেটরদের কাছ থেকে টেন্ডার চেয়েছি। তারা দু-একদিনের মধ্যেই আসতে শুরু করবে আমার অফিসে-মডেল দেখে এস্টিমেট তৈরি করবে।

—তোমার অফিস কোথায়?

অলর্ক হেসে বলল, আমার বাড়িতেই অফিস করেছি আপাতত। রাসেল স্ট্রিটে।

—ও, চিত্রদীপ আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যেন। কথা বলতে-বলতে মাঝেমধ্যেই এমন হারিয়ে যান নিজের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সম্বিত ফিরে পান। তৎক্ষণাৎ ডেকে ওঠেন, ডোনা, ডোনা—।

ডোনা বোধহয় এতক্ষণ নিজের ঘরেই ছিল। বহুক্ষণ এ-বাড়িতে এসেছে অলর্ক, বেলা ন'টা নাগাদ, এখন দশটা পনেরো বাজে তার ঘড়িতে, এতক্ষণ ডোনাকে দেখেনি বলে তার একটু যেন আশ্চর্যই লাগছিল। চিত্রদীপের ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ডোনা, অলর্ককে দেখে চমকে বলে উঠল, আরে আপনি!

ডোনার পরনে একটা ঘন গোলাপি রঙের গাউন, পায়ের পাতা পর্যন্ত লুটিয়ে আছে গাউনের ফ্রিল, চুল হর্সটেল করে বাঁধা, তাতে তাকে দেখাচ্ছে কোনও ইউরোপিয়ান তরুণীর মতো। তার ফরসা রঙে, চোখের চটুলতায়, পোশাকের অভিনবত্বে ফুটে উঠেছে তার বিদেশিয়ানা। কিছুক্ষণ তাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখার পর অলর্ক হাসল, অনেকক্ষণ হল এসেছি, এখন যাওয়ার সময় হয়ে গেল।

—তাই! জানতে পারিনি তো, ও হো, এতক্ষণ শিহরনদার ঘরে জোর আড্ডা হচ্ছিল যে। নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে, কোথায় যাওয়া যায়, তারই প্ল্যান করছিলাম। শিহরনদা বলেছে সমুদ্র, মা বলছে পাহাড়, আমি বলেছি, উঁহু সমুদ্র পাহাড়, জঙ্গল কোনওটাই নয়। লোকালয়ের বাইরে কোনও আনকমন স্পটে। যে-স্পট আমরা হঠাৎ যেন এক্সপ্লোর করব।

—ফাইন, অলর্ক অনায়াসে অ্যাপ্রুভ করল ডোনার প্রস্তাব, কোনও আনকমন জায়গা আমারও পছন্দের। তা হবে আমার একান্তই নিজের, এক্সক্লিউসিভ।

ডোনা ততক্ষণে ঝুঁকে পড়েছে চিত্রদীপের টেবিলে হিপ হয়ে থাকা মডেলগুলোর দিকে। কয়েকদিন ধরে চিত্রদীপ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, তা নজরে পড়েছে ডোনার, কিন্তু ঠিক

খেয়াল করে দ্যাখেনি তার বাবা ছবি আঁকছেন, না অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত। এখন মডেলগুলো দেখে সেও বলে উঠল একরাশ উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে, ফাইন। এগুলো নিশ্চয় আপনার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের?

অলর্ক ঘাড় নাড়ে, অবশ্যই। প্রতিটি ডিজাইনই এক্সক্লিউসিভ, যা আমি পছন্দ করি।

ডোনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে আপনার আর কী-কী আছে এক্সক্লিউসিভ?

হাসল অলর্ক, অনেককিছুই, আমার এই যে যিশুখ্রিস্টপ্রতিম চেহারা, এটাও। যে প্রাচীন বাড়িটিতে আমি থাকি, তাও। যে রাজপ্রাসাদটি আমি দৈববলে উপহার পেয়েছি, সেটাও। আপাতত আরও একটি এক্সক্লিউসিভের সন্ধানে আমি আছি। সেটিও আমি চাই।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, কী সেটা?

—একজন সুন্দরী তরুণী, যাকে আমি আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগাতে পারি। শি উইল বি এক্সক্লিউসিভ ফর এ টু জেড।

ডোনা অপলক তাকিয়ে রইল অলর্কের মুখের দিকে, বলল, সেটা কীরকম?

—সেই মেয়েটি একান্তভাবেই 'এ টু জেডে'র জন্য কাজ করবে। 'এ টু জেড' তাকে সমস্ত সংবাদপত্রে এমনভাবে হাজির করবে, যাতে সে এবং 'এ টু জেড' এক ও অবিচ্ছিন্ন বলে মনে হবে। সি উইল বি অ্যান 'এ টু জেড' গার্ল। পারিশ্রমিক হিসেবে তাকেও আমি একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক দেব—।

ডোনা খিলখিল করে হেসে বলল, বাহ্, আইডিয়াটা তো চমৎকার। এ টু জেড গার্ল।

—আমার মাথায় আরও একটা আইডিয়া এসেছে। চিত্রদীপ চ্যাটার্জি যখন আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের জন্য এতটা পরিশ্রম করলেন, তার বিনিময়ে আমিও ওঁর জন্য কিছু করতে চাই। ভাবছি ওঁর একটা একজিবিশন আমি স্পনসর করব। কলকাতার সবচেয়ে বড় গ্যালারিতে সব চেয়ে বেশি পাবলিসিটি দিয়ে, সেখানে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বেস্ট কালেকশন দেখানো হবে।

চিত্রদীপ এতক্ষণে চমকে উঠে বললেন, সে কী!

—আমার মনে হয় এতবড় একজন আর্টিস্টকে আলোর কেন্দ্রবিন্দু থেকে এভাবে আড়ালে রাখা ঠিক নয়। সংবাদপত্রে অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে সমস্ত ক্রিটিকদের একটা পার্টিতে এনে খুব হই-চই করে জানাতে চাই এই শো-এর কথা। আর সেটা হবে আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর উদ্বোধনের আগেই।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, ফাইন। আমিও এরকম একটা কথা ভাবছিলাম।

চিত্রদীপ হঠাৎ বলে উঠলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও। সমস্ত ব্যাপারটা যে গুলিয়ে যাচ্ছে আমার—।

অলর্ক হেসে বলল, আপনি আবার নতুন করে আঁকা শুরু করুন, মিঃ চ্যাটার্জি। অনেক সময় শুধু প্রেরণার অভাবে, উৎসাহ না পাওয়ায় অনেক বড় প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায় আমাদের দেশে। আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনিও আঁকার প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু সেটা হতে দেব না আমি।

কিছু আর বলতে পারলেন না চিত্রদীপ, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন অলর্কের দিকে। ভালো করে একটা প্রদর্শনী করার তাঁরও অনেকদিনের ইচ্ছে। এর আগে যা দু-তিনটে শো করেছেন, শেষ পর্যন্ত উৎসাহের অভাবে কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেছে যেন।

এবার অলর্ক বলল, আমাকে কিন্তু এবার ফিরতে হবে। মডেলগুলো গাড়িতে তুলে নিতে হবে। ডোনা, উড য়্যু হেল্প মি?

ডোনা সাগ্রহে বলল, ওহ্ শিওর।

ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে অলর্ক একে-একে সমস্ত মডেলগুলো ভরে ফেলল তার গাড়িতে। এগুলো

এখন পৌঁছে দিতে হবে যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যেটি লাগবে। তারপর সেখানে গিয়ে চিত্রদীপ শুরু করবেন তাঁর আঁকাজোকার কাজ।

গাড়িতে চালকের আসনে বসে এবার অলর্ক তাকাল ডোনার দিকে, থ্যাঙ্কস অ্যা লট।

ডোনা চমৎকার করে হাসল। সে হাসির দিকে তাকিয়ে বিহ্বল অলর্ক মনে-মনে বলল, আমি আরও একটি এক্সক্লিউসিভ চাই, ডোনা। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইউ।

॥ ১২ ॥

উপাচার্য নীতিশ দে সরকার হঠাৎ এক জরুরি চিঠি পাঠিয়ে তলব করেছেন মণীশ রায়কে। প্রফেসরস-রুমে একা বসে ছিলেন মণীশ। তাঁর আপাতত পর-পর দুটি পিরিয়ড অফ থাকায় একটু জিরিয়ে নেবেন এমন ভাবছেন, সেসময়ে এহেন আচমকা তলবে বিস্মিত হয়ে পড়লেন ভারী। সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন, সেটা অ্যাশট্রের মধ্যে চেপে নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালেন দ্রুত। ওপাশে রণজয় দত্ত একটা খবরের কাগজ পড়ার ভান করে বসে আছে গা এলিয়ে, মণীশকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একটা চোরাহাসির স্রোত যেন ঝিলিক মেরে গেল তাঁর ঠোঁটের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত। সেটা মণীশের নজর এড়ালো না, আর তাই তাঁর মুখটা শক্ত হয়ে গেল মুহূর্তের ভিতর। ডিসগাস্টিং—।

এমনিতেই মণীশের মনমেজাজ খুব একটা ভালো নেই ক'দিন ধরে। ঈষিতা ক'দিন ধরেই অভিযোগ করছিল, মণীশ আজকাল নাকি তাকে আর সময় দিচ্ছেন না। আজকাল মণীশ ব্যস্ত থাকেন, বইপত্র, সেমিনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ানো নিয়ে। ঈষিতাকে নিয়ে অনেকদিন সিনেমায় পর্যন্ত যায়নি। মণীশ হেসে বলেছিলেন, এত ভালো কোয়ালিটি ভি. সি. পি. কিনে দিলাম, পাড়ায় দুটো বড়-বড় ভিডিও লাইব্রেরি হয়েছে, তাতেও কি তোমার সিনেমা দেখার শখ মিটছে না?

গতকাল রাতে কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠেছিল। কোথায় একা-একা মার্কেটিং করতে বেরিয়েছিল ঈষিতা, ফেরার পথে বাস থেকে নাকি দেখেছে, মণীশ একটা শালোয়ার কামিজ পরা মেয়ের সঙ্গে ভবানীপুরের একটা সিনেমা হল থেকে বেরুচ্ছেন।

মণীশ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, তুমি ভুল দেখেছ। কাল বিকেলে আমি লাইব্রেরিতে বসে নোট নিচ্ছিলাম—।

ঈষিতা তার বক্তব্যে অনড় থেকে মুখ লাল করে বলেছে, বাজে কথা বলো না। মেয়েরা তার স্বামীকে এক মাইল দূর থেকে দেখলেও ঠিক চিনতে পারে। হাজার ভিড়ের মধ্যেও একপলক নজর চালিয়ে বলে দিতে পারে তার স্বামী কোথায় আছেন।

—কিন্তু কাল যে তুমি ভুলই দেখেছ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দিল্লির একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে পেপার পড়তে ডেকেছে সামনের মাসে। সেটা নিয়ে এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত। হাতে একদম সময় নেই, আর আমি কিনা এখন যাব সিনেমা দেখতে।

প্রায় ধমক দিয়ে ঈষিতাকে কাল রাতে থামিয়ে দিয়েছেন মণীশ। কিন্তু বিছানায় শুয়ে রাতে অনেকক্ষণ একা-একা কেঁদেছে সে, বিড়বিড় করে অস্ফুটে বলেছে, তোমাকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। তুমি মেয়েদের নিয়ে সিনেমায় যাও কি না যাও আমার চেয়ে ভালো করে কেউ জানে না।

সেই থেকে বাড়ির আবহাওয়া গরম। সকালেও ঈষিতা তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। ক্লাসে পড়ানোর সময় স্বভাবতই আজ তেমন ফ্রি হতে পারছিলেন না। ক্লাসের ছেলেগুলোও হয়েছে তেমনি বিচ্ছু। পড়ানোর ফাঁকে স্পষ্ট শুনলেন, সেকেন্ড বেঞ্চের একটা ছেলে তার পাশের জনকে ফিসফিস করে বলছে, স্যারের বাড়িতে নিশ্চয় আজ রাগারাগি হয়েছে। দেখছিস না, স্যার আজ

ঠিক মুডে নেই। সেই ভুবনমজানো হাসিটিও নেই—।

উপাচার্যের চেম্বার মণীশদের ডিপার্টমেন্ট থেকে তিনটে বিল্ডিং পরে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে ঘুরেই তাঁর বিশাল রাজকীয় ঘরখানা। বেয়ারা দিয়ে খবর পাঠাতেই মণীশের ভেতরে যাওয়ার হুকুম হল।

মণীশ ভিতরে যেতেই মিঃ দে সরকার বজ্র গম্ভীর স্বরে বললেন, বসুন।

মণীশ আড়ষ্টভাবে বসলেও ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, উপাচার্য তাঁকে কী কারণে ডেকে পাঠিয়েছেন। ক'দিন আগেই সেমিনারে ভালো বক্তৃতা দেওয়ায় উপাচার্য নাকি মন্তব্য করেছিলেন, ছেলেটার বেশ ফান্ডা আছে তো। তাহলে কি সেই বিষয়েই কিছু বলবেন তিনি! শিগগিরই একটা রিডারের পদ খালি হচ্ছে মণীশদের ডিপার্টমেন্টে। এহেন ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে উপাচার্যের মতামত খুবই গুরত্বপূর্ণ এমন ভাবতেই টেনশনে টান-টান হয়ে উঠলেন।

মিঃ দে সরকারের চেম্বারটি আকারে বিশাল। পুব-দক্ষিণ খোলা এই ঘরে বসলে বাঁদিকের সবুজে উমসুম খেলার মাঠটি চোখে পড়ে। এতখানি নয়নাভিরাম খোলা জায়গা পাশেই থাকার ফলে ভি.সি.-র ঘরে সর্বক্ষণেই হুইহুই করে হাওয়া। এমন একটা খোলামেলা ঘর রেক্সিন-আঁটা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, সিংহাসনপ্রতিম রিভলভিং চেয়ার, চেয়ারের পিছনে দুটো আলমারি বোঝাই মোটা-মোটা বই—সব মিলিয়ে বেশ রাজসিক পরিবেশ। এমন পরিবেশে উপাচার্যের মতো একজন গম্ভীর মানুষের টেবিলের উলটোদিকে কিছুক্ষণ বসে থাকাটা নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর।

কতকগুলো ফাইল খুলে পর-পর সই করে যাচ্ছিলেন মিঃ দে সরকার। তাঁর সই বেশ লম্বা ধরনের, একটু অলঙ্কারময়ও বটে। সই হয়ে হঠাৎ ফাইলগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে মুখ তুলে বললেন, তুমিই তো সেদিন সেমিনারে ভালো বক্তৃতা করেছিলে, তাই না?

উপাচার্য কী বলতে চাইছেন ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে মণীশ আস্তে করে বললেন, একটা পেপার পড়েছিলাম, স্যার।

—সেদিন তোমার ওপর আমার ভালোই ইম্প্রেশন হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমার নামে প্রচুর কমপ্লেন এসেছে।

—কমপ্লেন! মণীশ চমকে উঠলেন।

—হুঁ। সহকর্মীদের সঙ্গে তুমি খুব ইলট্রিটমেন্ট করছ আজকাল, এমন অভিযোগ পেয়ে আমিও বিস্মিত।

মণীশ অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপারটা যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করে বলেন, স্যার, তাহলে কী ঘটেছে আমি বুঝতে পারি। কমপ্লেনটা কার কাছ থেকে এসেছে?

—দু-তরফের কমপ্লেনই এসেছে আমার কাছে। একদিকে ছাত্ররাও কমপ্লেন করেছে, অন্যদিকে একজন অধ্যাপকও এসেছিল কাল।

মণীশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর পিঠ দিয়ে একটা ঠান্ডা রক্তস্রোত দ্রুত নেমে গেল যেন। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। একটু পরে ঢোক গিলে বললেন, অধ্যাপকদের মধ্যে কে এসেছিলেন স্যার?

—রণজয় দত্ত। আমার কাছে অভিযোগ করেছে, দীর্ঘদিন ধরে তুমি তার বিরুদ্ধে নানান ধরনের ষড়যন্ত্র করছ, তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছ।

মণীশের বুকের ভিতর নিশ্বাস আটকে গেল কয়েক মুহূর্ত। প্রফেসরস রুম থেকে উঠে আসার মুহূর্তে রণজয় দত্তের মুখে একটা বাঁকা হাসির স্রোত খেলা করছিল তা লক্ষ করেছিলেন তিনি। উপাচার্যের তলবটি যে তার অভিযোগের জন্যই এটা রণজয় তাহলে বুঝতে পেরেছিল।

—অভিযোগটা কী ধরনের, যদি আর একটু স্পষ্ট করে বলেন, স্যার।

—সেদিন তোমার সঙ্গে রণজয়ও একটা পেপার পড়েছিল সেমিনারে। তার পড়াটা তেমন

ভালো হয়নি। কিন্তু সে ডেইস থেকে নেমে আসার পর শিহরন রায়চৌধুরি নামের একজন অধ্যাপক মাইকের সামনে গিয়ে রণজয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছে। রণজয়ের অভিযোগ, এই সমালোচনা আসলে তোমারই ইনস্টিগেশনে হয়েছে। গট-আপ।

মণীশ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, গট-আপ।

—হ্যাঁ, তুমি শিহরন রায়চৌধুরিকে ভালো করে চেনো।

মণীশ প্রতিবাদ করে বললেন, সে আজ কুড়ি বছর আগের কথা। একই ইয়ারে পড়তাম এইটুকুই। তারপর আমাদের মধ্যে আর যোগাযোগ নেই।

—তোমাদের ডিপার্টমেন্টে ডোনা চ্যাটার্জি নামে এক ছাত্রী আছে—।

—ডোনা চ্যাটার্জি! মণীশ বেশ অবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ তার নাম এই আলোচনার মধ্যে ঢুকে গেল কী করে তাও বুঝতে পারলেন না।

—শিহরন রায়চৌধুরি ডোনাদের বাড়িতেই পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকে। ডোনাই শিহরণ রায়চৌধুরিকে রণজয়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত করে। আর সেটা তোমার নির্দেশেই।

মণীশ প্রথমে কথাই বলতে পারলেন না। উপাচার্যের কথাগুলো তাঁর কাছে যেমন আশ্চর্যের তেমনি ভিত্তিহীন। প্রতিবাদ করে বলল, অ্যাবসার্ড, স্যার। শিহরন রায়চৌধুরি একটা নামি কলেজের অধ্যাপক। তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা, মতামত আছে, তিনি ডোনার কথায় এরকম একটা কাজ করবেন ভাবতেও অবাক লাগছে।

—কিন্তু রণজয় তাই-ই বলেছে।

—তা এ-ঘটনার পেছনে আমার ভূমিকা রয়েছে এ-কথা সে ভাবল কী করে?

—ডোনা নাকি তোমার ভীষণ অনুরাগী। ডোনাকে ইনস্টিগেট করেছ নাকি তুমিই।

—মাই গড! এও কি সম্ভব, স্যার? আপনি এ-কথা বিশ্বাস করলেন? ডোনা তো রণজয় দত্তেরও ছাত্রী।

উপাচার্য কিছুক্ষণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন মণীশের দিকে। উত্তেজিত মণীশের মুখ চোখ দেখে অনুমান করতে চাইলেন কিছু। তারপর বললেন, আরও একটা গুরুতর অভিযোগ আছে। তুমি নাকি তোমার ক্লাসে পড়ানোর সময় রণজয়কে সরাসরি কটাক্ষ করে কিছু বক্তব্য রেখেছ।

মণীশ উত্তরোত্তর আশ্চর্য হয়ে চলেছেন। তাঁর শরীরের ভিতর একধরনের প্রতিক্রিয়াও হয়ে চলেছে অনবরত। তাঁর ভিতরে ক্রোধ কম, কিন্তু এখন একধরনের উত্তেজনায় ঘাম ঝরে পড়ছে তাঁর সারা শরীর থেকে।

—কী বক্তব্য, স্যার?

—তুমি জানো, রণজয় একজন আধুনিক কবি। ক্লাসে পড়ানোর সময় তুমি বলেছ, পৃথিবীর অনেক কবি-লেখকদের মধ্যে একটা কিলিং ইনস্টিংকট আছে, অনেকেই খুনি, সমকামী।

—স্যার, এখানেও আমার বক্তব্যকে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে। আসলে আমি সেসময় র‍্যাঁবোর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। কথা প্রসঙ্গে এসে গেল কবি ভের্লেনের কথা। আপনি তো জানেন, এই দুই প্রথিতযশা কবি—র‍্যাঁবো ও ভের্লেনের বন্ধুত্ব ছিল প্রবাদপ্রতিম। শুধুমাত্র বন্ধুত্বের আকর্ষণেই ভের্লেন তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে র‍্যাঁবোর সঙ্গে ফ্রান্স ছেড়ে চলে আসেন লন্ডনে। লন্ডনে তখন আরও অনেক কবি-লেখকের সমাগম হয়েছে। দুই কবি লন্ডনের সাহিত্য পারিমণ্ডলে খুঁজে পেলেন অফুরন্ত আড্ডা, মজার খোরাক। তা ছাড়াও লেখার প্রেরণা। এখানেই ভের্লেনের 'রোমান্স' নামের সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার পর দারুন হই-চই পড়ে যায় সাহিত্যমহলে। তার কিছুদিন পর দুই বন্ধুতে হঠাৎ কী কারণে শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। যে বন্ধুর জন্য ভের্লেন তাঁর সংসার ভেঙে দিয়ে চলে এসেছিলেন লন্ডনে, সেই র‍্যাঁবোর কোনও উক্তিতে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে, রাগের মাথায় রিভলভার চালিয়ে গুলি করে বসলেন তাকে। র‍্যাঁবো

ভয়ঙ্কর রকমের আহত হয়েছিলেন। আর বিচারে দু-বছরের জেল হয়েছিল ভের্লেনের। র‍্যাঁবোও তো পরবর্তীকালে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে আফ্রিকার দুর্দান্ত চোরাকারবারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

উপাচার্য মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনও কথা না বলে শুধু উচ্চারণ করলেন, হুম!

—আর সমকামী বলতে অস্কার ওয়াইল্ডের কথা বলেছিলাম, স্যার। অস্কার ওয়াইল্ড জীবনযাপন করতেন লাগামছাড়াভাবে। লেখক হিসেবে সুনাম অর্জন করার কিছুকালের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় সমকামিতার। লর্ড আলফ্রেড ডগলাস নামে এক তরুণের সঙ্গে এক অস্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল ওয়াইল্ডের। ওয়াইল্ড নিজেই এমন দক্ষতার সঙ্গে মামলা লড়েছিলেন যে, জুরীরা প্রথমবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি। দ্বিতীয়বারের বিচারে অবশ্য তাঁর দু-বছরের জেল হয়।

উপাচার্য গভীর কৌতূহলের সঙ্গে মণীশের বাচনভঙ্গিমা লক্ষ করছিলেন। হয়তো কৌতুকও অনুভব করছিলেন কিছুটা, কিন্তু গম্ভীর মুখ করে বললেন, ঠিক আছে, এখন তাহলে তুমি যেতে পারো।

—কিন্তু ছাত্ররাও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছে বলছিলেন আপনি।

—ছাত্রদের অভিযোগ, তুমি ক্লাসের মেয়েদের নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত থাক।

মণীশ হেসে ফেললেন, হঠাৎ, আপনি একদিন ক্লাসে আমার পড়ানো দেখুন স্যার। আমি সবাইকেই সমানভাবে পড়াই।

—সে তো আমাকেই তুমি যেভাবে এতক্ষণ লেকচার দিয়ে শোনালে তাতেই বুঝে গেছি।

উপাচার্যের কথার মধ্যে এবার আর কৌতুক গোপন থাকেনি। মণীশ আবারও হাসলেন, তবে ক্লাসের বাইরে অনেকেই আমার কাছে নানারকম সাহায্য নিতে আসে। এমনকী অন্য দপ্তর থেকে কেউকেউ এসেও বইপত্র ধার নিয়ে যায়। প্রশ্নের উত্তর জানতে আসে।

—ও কে, দ্যাট উইল ডু।

মণীশ একরাশ উত্তেজনা নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন উপাচার্যের ঘরে। এক নাগাড়ে নিজেকে ডিফেন্ড করতে-করতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এতক্ষণে। রণজয় দত্ত যে সেমিনারের ঘটনার পরে এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তা ভাবতে পারেননি। তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে নালিশ করেছে, ছাত্রদের দিয়েও নালিশ করিয়েছে। কোন-কোন ছাত্ররা তাঁর নামে উপাচার্যের কাছে এসে বলেছে তা জানতে ভারী ইচ্ছে করছিল তাঁর। কিন্তু আর কথা বাড়ালেন না। উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু, স্যার।

বাইরে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায়। রণজয় দত্ত কতদূর ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তা ভেবে অবাক হচ্ছিলেন। রণজয়ের পূর্ব-ইতিহাস তো কিছুটা জানেন তিনি। সে ইতিহাস স্মরণ করলে গায়ে কাঁটা দেয়। সেরকম কাঁটা দিয়ে উঠল এই মুহূর্তে মণীশের সমস্ত রোমকূপে। মনে হল রণজয়ের সঙ্গে টক্কর দেওয়াটা বোধহয় ভুলই হয়ে গেছে তাঁর। অথবা তাঁর নিয়তিই হয়তো টেনে নিয়ে যাচ্ছে অন্য এক পরিণতির দিকে।

॥ ১৩ ॥

কাঠের স্ট্যান্ডে দাঁড়-করানো মস্ত ক্যানভাসে তুলি বোলাচ্ছিলেন চিত্রদীপ। তাঁর তুলিতে এখন নীল রং। কিছুটা সমুদ্র, কিছু আকাশ। তারই তারতম্য করতে নীল রং নিয়ে ঘনত্বের অদলবদল ঘটাচ্ছিলেন ভারী মনোযোগ দিয়ে।

গত কয়েকদিন যাবৎ ভীষণ এক ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে চিত্রদীপের। পাঁচ-পাঁচটা শো-রুমের ইনটেরিয়র ডেকরেশনের জন্য বড়-বড় দেওয়াল জুড়ে ছবি আঁকা। তার ওপর প্রায় একইসঙ্গে তাঁর বিশাল চিত্রপ্রদর্শনী শুরু হতে চলেছে। তার জন্যও প্রচুর ছবির প্রয়োজন। এতকাল প্রায় অকর্মা থাকার পর হঠাৎ তাঁর চাহিদা এভাবে দেখা দেবে তা ভাবতেও পারেননি। একজন প্রোমোটার তাঁর অনেকগুলো ছবি মোটা দামে কিনে নিয়ে গেছে এ-খবর বাজারে চাউর হওয়ার পর আরও প্রোমোটার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছে, ছবির দরদাম করছে। আরও কয়েকখানা ছবিও ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেল বেশ ভালো দামে।

ছবিতে রং বোলাতে-বোলাতে মাঝেমধ্যে দূরে সরে এসে চোখ রাখছেন ক্যানভাসে। দূর থেকে দেখলে ছবি আরও খোলতাই লাগে। দেখতে-দেখতে আরও খানিকটা পিছোলেন, আর তখনই তাঁর মনে হল, তাঁর এই স্টাডি-কাম স্টুডিওটা আকারে বড়ই ছোট। এত স্বল্প পরিসরে তাঁর আর কুলোচ্ছে না। অন্য শিল্পীদের স্টুডিওতে কখনও-সখনও গিয়ে দেখেছেন, তাঁদের স্টুডিওগুলো দেখবার মতো। আকারে বড় তো বটেই, তার ভিতরটা চমৎকার সাজানো গোছানো। সে তুলনায় তাঁর স্টুডিও প্রায় হাস্যকর।

ভাবনাটা মনে উদয় হওয়া মাত্র মনটা হঠাৎই বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তাঁর। একজন শিল্পীর বড় হয়ে ওঠা না-ওঠা অনেকখানি নির্ভর করে তার স্টুডিওর ওপর। এমন অপরিসর, অগোছালো স্টুডিওতে বসে কি ছবি আঁকা যায়। অথচ আজই 'এ টু জেড কোম্পানি'র বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয়েছে, মাত্র দু-মাস পরেও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বৃহৎ এক কপ্রদর্শনী।

ভাবতে-ভাবতে অলর্ক বসুর ভাবনাটাও কয়েক মুহূর্ত ঘাই মেরে গেল তাঁর মগজে। ছেলেটা লেখাপড়া না জানলেও তার ব্যাবসায়িক বুদ্ধিটা এর মধ্যে বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। প্রদর্শনীর পর-পরই তার দু-তিনটে শো-রুম খোলা হবে। কিন্তু সে-কথা আপাতত তার বিজ্ঞাপনে উল্লেখ নেই। আগে সে ফলাও করে প্রচার করতে চাইছে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির প্রদর্শনীকে। লোকে আগে শিল্পীকে চিনুক। শিল্পী বিখ্যাত হয়ে গেলে সেই শিল্পীর জাদু-আঙুলের কারুকাজ সমন্বিত শো-রুমের একটা আলাদা আকর্ষণ হবে। তখন 'এ টু জেড'-এর শো-রুমে যাওয়ার তাগিদও বাড়বে কাস্টমারদের।

অলর্কের এই ব্যাবসায়িক বুদ্ধির দৌলতে অবশ্য চিত্রীদেরও লাভ। হঠাৎ একজন শিল্পী প্রায় জিরো থেকে উঠে দৌড়ুচ্ছে চড়চড় করে। চিত্রদীপের ছবির বাজারও ক্রমশ শেয়ার মার্কেটের মতো লাফ দিয়ে উঠে যাবে অনেক দূর।

এতদিন পরে তাঁর মনে হল, সব শিল্পীরই বড় হওয়ার মূলে একজন ভালো প্রমোটার লাগে। সে যে অর্থেই হোক না কেন।

কিন্তু আপাতত তাঁর স্টুডিওটি আরও বড় করে তোলা দরকার। চারপাশে অসংখ্য ছবি, রং তুলির সরঞ্জাম এমন বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে রাখতে হয়েছে যে, তাতে ভালো করে ঘোরবার ফেরবার জায়গাই নেই।

সেই মুহূর্তেই কিচেন থেকে ঘেমেচুমে বেরিয়ে এলেন বনানী। মাঝেমাঝে চিত্রদীপের ক্যানভাসের দিকে চোখ রেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা তাঁর এখন অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদিন পর তাঁরও মনে হচ্ছে, তাঁর স্বামী-দেবতাটি ভালোই ছবি আঁকেন। এখন সেরকম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে চিত্রদীপ বললেন, এইটুকু স্টুডিওতে আর কাজ করা যাচ্ছে না।

বনানী চারপাশের অগোছালো ছবির পাহাড়ের দিকে নজর রেখে বললেন, ঠিক আছে, আজ দুপুরে সব গোছগাছ করে রাখব'খন। তাতে অনেকটা জায়গা বেরুবে। ডোনা ফিরুক।

—ডোনা কোথায় বেরিয়েছে?

—ডোনা তো বেরিয়েছে শিহরনের সঙ্গে। চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, এখন, এই সকালে?

—দুজনে ব্যাডমিন্টন খেলবে। তাই র‍্যাকেট-কর্ক-নেট ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনতে গেছে।

—তা তোমাকে বাদ দিল যে বড়?

বনানী চোখে অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন, আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি।

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ বললেন, শিহরনকে অন্য কোথাও ঘর খুঁজে নিতে বোলো। আমি ওই ঘরে স্টুডিও শিফট করব।

বনানী খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে চিত্রদীপের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, সে এখন কী করে হবে?

—কী করে হবে মানে? চিত্রদীপ হঠাৎ প্রায় রুখে দাঁড়ালেন, যখন আমাদের অতিরিক্ত ঘর ছিল, তখন তাকে আমরা থাকতে দিয়েছিলাম। এখন নিজেদেরই ঘরের সংকুলান হচ্ছে না। এখন তাকে অন্য ব্যবস্থা দেখে নিতে হবে।

—বাহ, এতদিন এ-ঘরে বসেই তো ছবি আঁকলে, এখন আর এখানে বসে ছবি আঁকা যাচ্ছে না?

চিত্রদীপ প্রায় গর্জে উঠে বললেন, না, যাচ্ছে না। এতটুকু জায়গায় ভালো করে চলাফেরা করাই যায় না। ছবি আঁকতে গেলে নিরিবিলি চাই, আলাদা পরিবেশ চাই, মনের কনসেনট্রেশন চাই।

বনানী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন চিত্রদীপের দিকে।

একটু পরে চিত্রদীপ আবার বললেন, তুমি যদি বলতে না পারো, তাহলে আমি বলে দেব।

বনানী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠলেন, না, বলতে পারবে না।

—ও, খুব যে তার ওপর তোমার দরদ দেখছি।

—দরদ যতটা আমার, তার চেয়ে তোমার মেয়ের এখন বেশি। সে এখন শিহরনদা বলতে অজ্ঞান।

চিত্রদীপ ভুরু কুঁচকে বনানীর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন, আবারও ঝেঁঝে উঠে কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল। বনানী তৎক্ষণাৎ সচকিত হয়ে বললেন, ওই বোধহয় ওরা এসেছে। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব।

বলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিলেন। কিন্তু শিহরন বা ডোনা নয়, দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দার।

বনানী মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন, ও তুমি, ভিতরে এসো—।

মন্দার ভিতরে আসতেই আবার দরজা লাগিয়ে দিলেন বনানী।

চিত্রদীপ মন্দারকে খুব একটা পছন্দ করেন না কোনওদিন। আজ তার এমনিতেই মুড খারাপ ছিল। হঠাৎ এহেন পরিস্থিতিতে মন্দারের দিকে একবার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আবার মনোনিবেশ করলেন তাঁর ক্যানভাসে।

অবস্থা সামাল দিতে বনানী মন্দারকে বললেন, তুমি সোফায় একটু বোসো। আমি ততক্ষণে চা করে আনি।

মন্দার ঘরের ভেতরে ঢুকে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। চিত্রদীপ এবং বনানী দুজনে যে একটু আগে কথা কাটাকাটিতে ব্যস্ত ছিলেন সেটুকু বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি। অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলল, ডোনা বাড়ি নেই?

বনানী চা করার উদ্যোগ নিতে কিচেনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, থেমে গিয়ে বললেন, না, ওরা একটু মার্কেটিং-এ গেছে।

মন্দার অবাক হয়ে বলল, ওরা মানে—।

—ডোনার সঙ্গে শিহরন গেছে। ওই যে, শিহরন—

—ও, মন্দার চুপ করে গেল। খানিকক্ষণ পর আবার বলল, তাহলে আমি এখন উঠি—

—উঠবে কেন। একটু বোসো না। ওরা বোধহয় এখনই এসে পড়বে। সেই আটটা নাগাদ বেরিয়েছে। ব্যাডমিন্টনের সরঞ্জাম কিনতে গেছে দুজনে। তুমি বোসো—।

বনানী কিচেনের মধ্যে ঢুকে যেতে মন্দার চুপচাপ বসে রইল। চিত্রদীপ চিন্তামগ্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁর ক্যানভাসের দিকে। ছবিটা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। সমুদ্রের ভিতর থেকে স্নান করে উঠছে ভেনাস, এরকম একটি থিম নিয়ে আঁকা হচ্ছে ছবিটা। ভেনাসের শরীর অবশ্য পুরো আঁকা হয়নি। কিন্তু যেটুকু ফুটে উঠেছে ছবির মধ্যে, তাতে বোঝা যাচ্ছে তার সুন্দর অনাবৃত দেহসৌষ্ঠব। সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই মন্দারের শরীরটা শিরশির করে উঠল। শিল্পীরা কেমন করে ঘরের মধ্যে সবার সামনে এসব ছবি আঁকেন তা সে বুঝে উঠতে পারে না। আসলে শিল্পীদের বাড়ির আবহাওয়া বোধহয় এরকম হয়। আর এজন্যই বোধহয় ডোনা অবলীলায় সাবানের বিজ্ঞাপনে নিজেকে প্রকাশ করে।

সেই সকাল থেকে নীল রং নিয়েই মগ্ন ছিলেন চিত্রদীপ। হঠাৎ তাঁর তুলি চুবিয়ে নিলেন লালরঙের মধ্যে। কখনও মন বিক্ষিপ্ত থাকলে কিংবা রাগ হলে তিনি লাল রঙের মধ্যে ডুবে থাকেন। এখন হঠাৎ সমুদ্রের প্রান্তে দিগন্তরেখায় ছড়িয়ে দিতে থাকলেন লাল রং। যেন সূর্য উঠবে এখনই, অথবা সূর্য এইমাত্র দিগন্তরেখা থেকে লাফ দিয়ে উঠে আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে রক্তাভ রশ্মি। সেই রশ্মি থেকে আবার প্রতিফলিত হচ্ছে লালাভা।

একটু পরেই কিচেন থেকে বনানী বেরিয়ে এলেন চায়ের কাপ হাতে। এ-বাড়ির চায়ের কাপগুলি চমৎকার রঙিন হয়। এই কাপটার রং প্রায় চায়ের রঙের সঙ্গে মেলানো। প্লেটের রং-ও তাই। সব মিলিয়ে ভারী সুন্দর।

সেন্টার টেবিলের ওপর চায়ের কাপপ্লেট রেখে বনানী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে ডোনার দেখা হয় না!

চায়ে চুমুক দিয়ে মন্দার চোখ তুলল, হয়। তবে এবার অনেকদিন হয়নি।

বনানী চুপ করে থেকে তারপর বললেন, তোমার হাতে বোধহয় এখন অনেক কাজ, তাই না?

—ঠিক তা নয়। তবে একটা বড় কাজের সন্ধান পেয়েছি। যদি টেন্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়, তাহলে প্রায় চারমাস লেগে যাবে শেষ হতে।

—বাহ্! তা কত টাকার টেন্ডার?

—অনেক। আমার অবশ্য অত টাকা নেই। তবু যদি কাজটার সিকিভাগও পাই তবে আপাতত আমার কোম্পানির একটা হিল্লে হয়ে যায়।

বনানী কিছু বলার আগেই বাইরে গাড়ি আসার শব্দ হল। একমুহূর্তে সেদিকে কান রেখে বনানী বললেন, ওই বোধহয় ডোনারা এল। তুমি একটু ডোনার ওপর নজর রেখো। মেয়েটা বড্ড উড়ু-উড়ু হয়ে যাচ্ছে কেমন।

তার কথা শেষ না হতেই গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হল বাইরে। তারপর দরজা খুলে ফের বন্ধ করল কেউ। পরক্ষণেই ডোরবেল বেজে উঠল।

বনানী দরজা খুলতেই দেখলেন, বাইরে ডোনা আর শিহরন। দুজনের হাতে দুটো বড় প্যাকেট। তাদের খেলার সরঞ্জাম। মন্দারকে দেখেই ডোনা বলে উঠল, হাই।

মন্দার হাসল। শিহরন ঘরে ঢুকে একমুহূর্ত মন্দারের দিকে তাকিয়ে বনানীকে বললেন, এই নাও। তোমার মেয়ে বোধহয় স্পোর্টসম্যান না হয়ে ছাড়ছে না।

শিহরনের কথার উত্তর না দিয়ে বনানী ডোনাকে বললেন, এই দ্যাখ। মন্দার কতক্ষণ ধরে এসে বসে আছে। তোর সঙ্গে আজকাল নাকি ওর দেখাই হয় না—।

ডোনা ঠোঁট উলটে বলল, দেখা আর হবে কী করে। হি ইজ নাউ অ্যা বিজি গাই। বিজনেস নিয়ে এত বিজি হয়ে পড়েছে—। তারপর শিহরনের দিকে তাকিয়ে বলল, প্লিজ শিহরনদা, গাড়িটা একটু গ্যারেজ করে দেবে?

শিহরন বাইরে চলে গেলে ডোনা এবার মন্দারের দিকে তাকায়, কাম ইন মিস্টার। তোমার সঙ্গে অনেক ঝগড়া জমে আছে। তোমার তো আজকাল দেখা পাওয়াই ভার।

—আমার, না তোমার?

ডোনা হেসে বলল, মা, একটু চা হবে? তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে—।

মন্দার আর ডোনার ঝগড়ার রকম দেখে বনানী হাসতে-হাসতে আবার কিচেনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

ডোনা তক্ষুনি বলল, চলো, আমার ঘরে যাই। এ-ঘরে বেশিক্ষণ আড্ডা মারলে ড্যাডি রেগে ফায়ার হয়ে যায়। ড্যাডি ইজ নাউ অ্যা ভেরি বিজি আর্টিস্ট।

শেষ কথাগুলো ডোনা তার বাবার উদ্দেশে ছুড়ে দিয়ে মন্দারকে নিয়ে এল তার ঘরে।

ডোনার ঘরখানা আকারে খুব বড় নয়। কিন্তু বেশ সাজানো-গোছানো, টিপ-টপ। ঘরে একপাশে একটা সিঙ্গল খাট। তার ওপর নরম গদির সঙ্গে চমৎকার ফুল-কাটা বেডকভার। ঘরের এককোণে ড্রেসিং টেবিল। অন্যকোণে শোকেস। শোকেসের ভিতর বইপত্তর, খাতা। শোকেসের ওপর একটা চিনেমাটির পরি। দেওয়ালে চিত্রদীপের আঁকা একখানা বিশাল ছবি। হঠাৎ দেখলে অজন্তার স্টাইলের কথা মনে পড়ে।

ঘরে ঢুকেই মন্দার বলল, তোমার বাবার একটা চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে দেখলাম।

—হ্যাঁ, আজকের কাগজে বেরিয়েছে বিজ্ঞাপনটা।

একটু চুপ করে থেকে মন্দার আবার বলল, 'এ টু জেড' থেকে স্পনসর করছে? কী করে আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে?

—ও, সে এক-ইতিহাস। ভদ্রলোকের হঠাৎই দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে বাবার পেইন্টিংস। এখন সে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির ব্লাইন্ড অ্যাডমায়ারার বলা যায়। হঠাৎ বাবার সব ছবি কিনে নিচ্ছে পটাপট। এখন একটা একজিবিশন করবে। তাছাড়া আরও একটা বড় খবর—।

—কী?

—'এ টু জেড'-এর অনেকগুলো শো-রুম খুলছে কলকাতায়। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। তার সমস্ত লে-আউট ড্যাডিকেই করতে হচ্ছে। সে প্রচুর কাজ।

মন্দার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তারপর বলল, তাহলে অলর্ক বোসের সঙ্গে তোমার ড্যাডির এখন খুব ক্লোজ রিলেশন?

—ভেরি ক্লোজ।

একটু পরে ইতস্তত করে মন্দার বলল, 'এ টু জেড' থেকে তাদের সমস্ত শো-রুমের ইনটেরিয়ার ডেকরেশনের জন্য টেন্ডার কল করেছে, বেশ মোটা টাকার টেন্ডার। আমার কোম্পানি তাতে কমপিট করছে—।

—তাই নাকি? ডোনা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল, ভারী ইন্টারেস্টিং তো।

—খুব একটা ইন্টারেস্টিং নয়। কারণ ওরা যা-যা শর্ত দিয়েছে, আমার কোম্পানি তা ফুলফিল করতে পারছে না।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন?

—'এ টু জেড' বলেছে, যেসব কোম্পানি এর আগে এককোটি টাকার ব্যাবসা করেছে কেবল

তারাই টেন্ডারে পার্টিসিপেট করতে পারবে। কিন্তু আমার কোম্পানি এ পর্যন্ত সাড়ে সাতানব্বই লক্ষ টাকার কাজ পেয়েছে, মাত্র আড়াই লক্ষের জন্য আমার 'ইন-ডেক' টেন্ডার পাচ্ছে না।

—ইস, তাই নাকি!

—হুঁ, তার জন্য তোমার কিছু কনট্রিবিউশনও রয়েছে।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল মন্দারের দিকে, বলল, আমার কনট্রিবিউশন?

—হুঁ, সেবার গুপ্তিপাড়ার আউটিঙে যাওয়ার ফলে দুটো টেন্ডার আমি মিস করেছি, যার পরিমাণ প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা। তোমাকে বলেছিলাম তখন, মনে পড়ে?

ডোনা স্তম্ভিত হয়ে গেল কথাটা শুনে। একটু পরে বলল, তখন তাহলে না গেলেই পারতে?

—তখন তো ভাবিনি, একদিনের জায়গায় তিনদিন ডিটেইনড হবে যাব।

—সেটা তো হতেই পারে। বাইরে বেরুলে ফেরার কোনও নিশ্চয়তা থাকে নাকি?

মন্দার আমতা-আমতা করল একটু, না, তা নয়। তবে বুঝিনি, হঠাৎ ডিটেইনড হয়ে যাব।

—না কি, আমাকে পাওয়ার লোভটা সামলাতে পারোনি?

ডোনা হঠাৎ এভাবে উলটে চার্জ করবে তা ভাবতে পারেনি মন্দার। থতমত খেয়ে বলল, সে কথা এখন থাক।

—তাহলে তোমার ক্ষতিটা আমি এখন কীভাবে কমপেনসেট করতে পারি?

এতক্ষণে উৎসাহিত হল মন্দার। তার চোখে চকচক করে উঠল একটা প্রত্যাশা। বলল, তোমার ড্যাডির সঙ্গে অলর্ক বোসের যখন খুব দহরম-মহরম, উনি যদি একবার আমার নামটা রেকমেন্ড করে দ্যান, তাহলে টেন্ডারটা আমি পেতে পারি। বিরাট টাকার টেন্ডার।

ডোনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। খানিকক্ষণ পর মুখটা কালো হয়ে গেল তার। সে যেন এইমুহূর্তে এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছে।

মন্দার আবার বলল, কাজটা যদি আমি পাই, তাহলে 'এ টু জেড'-এর সুবিধেই হবে। টেন্ডারে বলা আছে, যে শিল্পী এই শো-রুমগুলোর লে-আউট করছেন, তাঁর নির্দেশেই ইনটেরিয়ার ডেকরেশনের কাজ করতে হবে।

ডোনা আস্তে-আস্তে বলল, ড্যাডি কি রেকমেন্ড করতে রাজি হবেন?

মন্দার থমকে গেল হঠাৎ। ডোনার মুখ থেকে এ ধরনের উত্তর পাবে তা যেন সে আশা করেনি। হঠাৎ সাগ্রহে বলল, এ-বাড়িতে অলর্ক বোস কয়েকবার এসেছেন নিশ্চয়ই।

—এসেছেন।

—তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি?

—হয়েছে।

সাগ্রহে মন্দার বলল, তাহলে তুমি বলে দিলেই তো কাজটা আমি পেতে পারি। চলো না, কাল সন্ধেবেলা আমি ফ্রি আছি, এবার দুজনে মিলে ওঁর কাছে যাই।

ডোনা তার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে, বলল, কাল সন্ধ্যায় আমি ফ্রি নেই।

—কেন, কোথাও যাচ্ছ?

—আমার কাল একটা শ্যুটিং আছে।

—শ্যুটিং? কীসের, ছবিতে অভিনয় করছ নাকি?

—না, মডেলিঙের। হঠাৎ একটা দারুণ অফার পেয়েছি। একদিন শুটিঙের জন্য বারো হাজার টাকা দিচ্ছে আমাকে।

—বারো হাজার!

—এই রেটটা নাকি এখন কলকাতার শ্রেষ্ঠ এবং ব্যস্ততম নায়িকা নিয়ে থাকে মডেলিং করতে।

মন্দারের মুখটা কালো হয়ে এল, ও, তা কে ঠিক করে দিলেন? তোমার ওই শিহরনদা নাকি?

ডোনা হঠাৎ হাসল, একেবারে রহস্যময়ীর মতো। তার চিলতে হাসির স্রোত মন্দারকে বিমূঢ় করে বসিয়ে রাখে ডোনার ঘরের ভিতর।

॥ ১৪ ॥

শিহরন রায়চৌধুরি নয়, ডোনাকে এবারের মডেলিঙের অফার দিয়েছে 'এ টু জেড' কোম্পানির কর্ণধার অলর্ক বোস। ডোনার রূপ, সৌন্দর্য, স্মার্টনেস সে ব্যবহার করতে চায় তার কোম্পানির বিজ্ঞাপনে। তার নতুন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি যেমন কলকাতার বুকে এক অন্য চমক হবে, তেমনি ডোনার উপস্থিতি হবে ফ্যাশনের যুগে এক অন্য থ্রিল। যেখানেই 'এ টু জেড'-এর বিজ্ঞাপন থাকবে, সেখানেই ডোনার ছবি। ডোনা হবে 'এ টু জেড'-এর এক্সক্লিউসিভ গার্ল।

রীতিমতো মড গার্লের সাজে নিজেকে সাজিয়ে তাদের নতুন কেনা গাড়িটি ড্রাইভ করে স্টুডিওতে চলে এল ডোনা। ঠিক দশটায় তার আসার কথা, কাঁটায়-কাঁটায় ন'টা উনষাটে পৌঁছে গেল আনোয়ার শাহ রোডের ওপর ছোট্ট স্টুডিও 'ফোটোজিনিক' এর সামনে। গাড়ি পার্ক করে যখন স্টুডিও-র দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল তখন সেখানকার ঘড়িতে ঠিক দশটা। সামনের ঘরে অলর্ক আগেই এসে অপেক্ষা করছিল, ডোনাকে দেখে তার দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে হাসি বিস্তৃত করে বলল, দিস ইজ পাংচুয়ালিটি।

স্টুডিওটি বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার নারাণ ঘোষের। বাইরে থেকে দেখতে যত ছোট মনে হয় স্টুডিওটা, ভিতরটা সেরকম নয়। দরজা ঠেলে ঢুকেই একটা বসার ঘর, তিন-চারখানা বড় সোফা রাখা আছে একদিকে, অন্যদিকে শো-উইন্ডোতে নারাণ ঘোষের তোলা বিখ্যাত সব সিনেমাভিনেত্রী আর মডেলদের ছবি। বড়-বড় কাট-আউট। ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়, নারাণ ঘোষের ফোটেগ্রাফির হাত দুর্দান্ত। তাঁর ক্যামেরার কল্যাণে অভিনেত্রী বা মডেলরা প্রায় জীবন্ত হয়ে বসে আছে শো-উইন্ডোর ভিতর। এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর মেয়ের ছবিও শোভা পাচ্ছে সেখানে। দারুণ সেক্সি-পোজের। সেই ছবিটির দিকে ডোনার চোখ কয়েক সেকেন্ড বেশি থমকে গেল নিজের অজান্তেই।

—খুব সেজেছেন দেখছি আজ, অলর্ক তার স্বভাব-সিদ্ধ সারল্যে বলে উঠল। তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে সেই অসাধারণ, সরল, বিস্ময়-মাখানো হাসি।

ডোনা সামান্য হাসল তাতে। প্রায় বিদেশি ঢঙের ঝকমকে স্কার্ট-ব্লাউজ তার পরনে, চুল হর্সটেল করে বাঁধা, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, চোখে কালো চশমা। হঠাৎ দূর থেকে দেখলে তাকে মেরিলিন মনরো বলেও ভাবা যেতে পারে। প্রায় সেরকমভাবে সেজে এসেছে যাতে 'এ টু জেড'-এর বিজ্ঞাপনে দারুণ চনমনে দেখায় তাকে। কিন্তু অলর্ক বলল, তোমাকে কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি কন্যার সাজেই দাঁড়াতে হবে ক্যামেরার সামনে।

বাঙালিকন্যা শব্দটা কেমন অদ্ভুত শব্দে বেজে উঠল ডোনার কানে। অনিবার্যভাবেই তার চোখ চলে গেল ঘরের কোণে রাখা বিশাল সাইজের আয়নাটার দিকে, সেখানে এই মুহূর্তে ওই শব্দটির ঠিক বিপরীত অবস্থানে সে দাঁড়িয়ে। অলর্কের দিকে সামান্য বিস্মিতচোখে তাকিয়ে এবার সে তার চোখ থেকে রহস্যময় কালো চশমাটি খুলে ফেলল।

স্টুডিওর সময় চলে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। নারাণ ঘোষ এখন এই শহরের ব্যস্ততম ফোটোগ্রাফার। প্রতি আট ঘণ্টার জন্য তাঁর স্টুডিওর ভাড়া হাজার ছয়েক। কলকাতার বিখ্যাত সিনেমা ম্যাগাজিন, ফ্যাশন-ম্যাগাজিনের প্রতি সংখ্যায় তাঁর ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রকাশিত হয়। অনেক মডেল নারাণ ঘোষের ক্যামেরা ছাড়া অন্য কারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই রাজি হন না। এহেন নামি

ক্যামেরাম্যান ডোনার সামনে এসে চটপট তাড়া দিলেন, নিন, মেকআপ রুমে বসে যান। কুইক।

মেকআপ রুমে নামি বিউটিশিয়ান বেবি মিত্র দশটার আগেই তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে হাজির হয়েছেন। মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মেরিলিন মনরোকে এক আশ্চর্য কৌশলে তিনি বানিয়ে ফেললেন জয়াপ্রদার মতো এক মিষ্টি তরুণীতে। মেকআপ রুমে বসেই ডোনা বুঝতে পারল, কেন অলর্ক সেদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে তার ব্লাউজের মাপ জিজ্ঞাসা করছিল, তখন ডোনা ঠিক বুঝতে পারেনি, অলর্ক তার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে, না কি সে সত্যিই সরল আর বোকা। এখন বেবি মিত্র যখন তাকে মেক-আপ করে ম্যাচিং শাড়ি-ব্লাউজে সাজিয়ে বাইরে বার করে আনল, তখন ডোনা নিজেকে আর চিনতেই পারল না। ফুল সাইজের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

—বিউটিফুল, অলর্ক উচ্ছ্বসিত হয়ে তার ভালোলাগাটিকে মাত্র একটি শব্দে প্রকাশ করে ফেলল।

ডোনা নিজেও ভাবতে পারেনি, গাঢ় উজ্জ্বল আগুন রঙের শাড়ি-ব্লাউজ এহেন আগুন পারা রূপে উদ্ভাসিত করে তুলবে তাকে। সে বড় হওয়া ইস্তক শালোয়ার-কামিজ, স্কার্ট-ব্লাউজ, শার্ট-প্যান্ট-জিনসে অভ্যস্ত। শাড়ি পরে জবরজঙ হয়ে রাস্তায় বেরুনো, বাসে-ট্রামে ওঠা; এর-বাড়ি ওর-বাড়ি যাওয়া তার কাছে অসহনীয়। এখনকার যুগে শাড়ির ব্যবহার যে কতখানি অসম্ভব, এ নিয়ে তার কলেজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কতবার আলোচনা করেছে। তার মা বনানী তাকে কোনও উৎসবে কিংবা পার্টিতে শাড়ি পরবার জন্য জেদাজেদি করলেও সে অনায়াসে রিফিউজ করেছে। বলেছে, শাড়ি হচ্ছে তোমাদের জেনারেশনের মহিলাদের জন্য। এখনকার দিনে শাড়ি একেবারেই ব্যাক-ডেটেড। অথচ এখন তাকে কিনা সেই শাড়িতেই—।

অলর্ক হাসি-হাসি মুখে বলল, শাড়ি পরলেই যে বাঙালি মেয়েকে সবচেয়ে সুন্দরী দেখায়, তা তোমাকে দেখে আরেকবার বুঝতে পারছি, ডোনা।

ডোনা নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিল। অলর্কের কমপ্লিমেন্ট শুনে হেসে বলল, থ্যাঙ্কস।

ততক্ষণে নারাণ ঘোষ প্রস্তুত হয়ে গেছেন তাঁর ক্যামেরার সামনে। বারবার আলো জ্বালিয়ে, আলো নিভিয়ে অ্যাডজাস্ট করছেন লাইট। একবার ডোনাকেও দাঁড় করালেন ক্যামেরার সামনের ছোট্ট বেদিটার ওপর। ডোনার স্কিন কতটা আলো নেবে তা নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন।

আগেরবারে সাবানের বিজ্ঞাপনের জন্য ডোনাকে যখন অনেক খোলামেলা হয়ে বাথটাবে নামতে হয়েছিল, তখন তার শরীরে যে ধরনের থ্রিল হয়েছিল, আজ শাড়ি পরিহিতা হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো তার চেয়ে কিছু কম উত্তেজনাকর নয়। ডোনা বোধহয় তার জীবনে এই প্রথম জানল, শাড়ি পরলেই তাকে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী দেখায়।

ডোনার স্কিনে কতটা আলো লাগবে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর নারাণ ঘোষ বললেন, ও কে, এবার তাহলে টেক শুরু হবে।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ডোনার ঠিক কী-কী পোজের ছবি হবে তা অলর্ক আগে থেকেই ব্রিফ করে রেখেছিল নারাণ ঘোষকে। ঠিক সেইমতো স্টুডিওর ভেতর দৃশ্যপট তৈরি শুরু হয়ে গেল। ডোনা অবাক হয়ে দেখল, তার বাবা চিত্রদীপের আঁকা সমুদ্রের একটি বিশাল ছবি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দাঁড় করানো হল বেদির ওপর। সেদিকে কোণাকুণি মুখ রেখে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ডোনা। মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে নড়তে থাকবে তার ঠোঁটদুটো। একটু আগেই ডোনা জেনেছে, বীরভঙ্গপুরের সম্পত্তির ব্যাপারে খুবই টেনশনে আছে অলর্ক। তার জীবন বিপন্ন। কে বা কারা নাকি প্রতিনিয়ত খুনের হুমকি দিয়ে চলেছে তাকে। তবু কী আশ্চর্য, এত ঝড়ঝামেলার মধ্যেও কী নিস্পৃহভাবে, কোনও উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করেই তার প্রতিটি কাজ করে চলেছে নিখুঁত ছক অনুযায়ী।

প্রায় চিত্রপরিচালকের মতো এক-একটি দৃশ্য রচনা করেছে অলর্ক। ফোটোগ্রাফার এবং মডেল

দুজনকেই তার ভাবনার হদিশ বুঝিয়ে দিচ্ছে যাতে ক্যামেরায় ঠিক-ঠিক ধরা পড়ে ডোনার অভিব্যক্তি। নারাণ ঘোষ অনেকদিনের দক্ষ ফটোগ্রাফার, একটু বলতেই তিনি বুঝে নেন কোথায় বসাতে হবে তাঁর ক্যামেরা, পিছনের দৃশ্যপটই বা কীভাবে সাজাতে হবে। মডেলই বা কোন অ্যাঙ্গেলে মুখ করে কীভাবে দাঁড়াবে ক্যামেরার সামনে। মডেল হিসেবে ডোনা প্রায় নতুনই। তবু সে তার তুখোড় স্মার্টনেস দিয়ে চেষ্টা করছে অলর্কের চাহিদা অনুযায়ী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে। এ দফায় মোট পাঁচটি ছবি তোলা হবে, এক একটি ছবি তুলতেই লেগে যাচ্ছে একঘণ্টা কখনও দু-ঘণ্টাও। শো-রুমগুলির এক-একটি দৃশ্যপট এক-একরকম। বিজ্ঞাপনের ছবির দৃশ্যপটও সেভাবে বদলে যাচ্ছে প্রতিবারে। তার সঙ্গে আরও চমক হল এই যে, প্রতিবারেই ডোনার জন্য নতুনরঙের নতুন ধরনের শাড়ি-ব্লাউজ-শায়া চলে আসছে। আর বেবি মিত্র প্রত্যেকবার তার মুখের মেক-আপ বদলে তাকে নতুন এক-একটি তরুণী হিসেবে হাজির করছেন ক্যামেরার সামনে।

মাঝে আধঘণ্টার জন্যে ফুরসত পেতে ডোনা তারিফ জানাল অলর্ককে, আইডিয়াগুলো দারুণ।

অলর্ক হাসল, শুধু ফটো দেখেই সব কিছু বুঝতে পারা যাবে না। যখন কাগজে ছাপার জন্য পুরো লে-আউট তৈরি হবে, তখন আরও সব চমক থাকবে। অ্যাডভার্টাইজিঙের পুরোনো ধ্যানধারণা ভেঙে নতুন ঘরানা আনতে চাই।

—মডেল হিসেবে ছবি তুলতে এসে আমারই যা চমক লাগছে, তাতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাস্টমারদের কত যে চমক লাগবে তা বুঝতে বাকি নেই আমার। আমার ধারণা ছিল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর যখন বিদেশি ঘরানায় সাজানো হচ্ছে, তখন মডেলও নিশ্চয় বিদেশিনীর সাজে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে। হয়তো আমাকে কিছু বোল্ড পোজে ছবি তোলাতে হবে এমন ভেবে রেখেছিলাম।

মাথা নাড়ল অলর্ক, আমার আইডিয়া ঠিক তার উলটো। কলকাতার শো-রুমগুলো বিদেশি স্টাইলে করছি এই কারণে যে, তাতে এ দেশে থেকেও অন্য দেশের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢোকার অনুভূতি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার কাস্টমাররা তো সব এদেশি, অতএব মডেলকে হবে হতে দেশীয় ঘরানার। তাকে দেখেই তো কাস্টমারদের শো-রুমে ঢোকার সাহস বাড়বে।

আধঘণ্টার অবসরে কিছু চা ও স্ন্যাকসও এল। নারাণ ঘোষ এসব লাইনে ভারী সমঝদার লোক। ডোনাকে তিনি আগে কখনও দ্যাখেননি। চা খেতে-খেতে অলর্ককে বললেন, আপনি যে মডেলটি এনেছেন, তিনি নতুন হলেও ভারী ট্যালেন্টেড। ভবিষ্যতে খুবই শাইন করবে।

ডোনা চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ঠোঁট থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক য়্যু, মিঃ ঘোষ।

নারাণ ঘোষ আবার বললেন, আমার কাছে অনেক ক্লায়েন্ট আসে তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য নতুন মুখ খুঁজতে, আমি কি তাদের কাছে ডোনা চ্যাটার্জির নাম রেকমেন্ড করতে পারি?

ডোনা অবাক হল, খুব খুশিও হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে আরও অবাক করে দিয়ে অলর্ক বলে উঠল, নট নাউ, মিঃ ঘোষ। ডোনা ইজ নাউ ওনলি ফর 'এ টু জেড'। পরপর আরও অনেকগুলো ডেট ডোনার জন্য ব্যয় করতে হবে আপনাকে। এখন থেকে 'এ টু জেড'-এর যত বিজ্ঞাপন বেরুবে, সবগুলোতেই ডোনার ছবি থাকবে, শি উইল বি এক্সক্লুসিভ ফর 'এ টু জেড'।

নারাণ ঘোষ তাঁর জহুরি চোখ নিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন ডোনার দিকে, তারপর আরেকবার ঘাড় নেড়ে তারিফ করলেন, ইয়েস, এ গুড চয়েস।

সেদিন স্টুডিও-র কাজ মিটিয়ে বাইরে বেরুতে সন্ধে উতরে গেল। অলর্ক প্রতিবার শটের পর উদ্ভাসিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, একজ্যাকটলি, যা চেয়েছিলাম সেরকমই পোজ দিয়েছ, ডোনা। লাজুক হওয়ার দৃশ্যে লজ্জাবতী লতা, অহংকারী হওয়ার দৃশ্যে এ প্রাউড গার্ল। যখন নববধূর সাজে, তখন তোমাকে বিয়ের কনে ছাড়া আর কিছুই ভাবা যাচ্ছিল না।

স্টুডিও থেকে বাইরে বেরুতেই বলল, পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে?

—নো থ্যাঙ্কস। বলে ডোনা তার গাড়ির দরজা খুলে স্টিয়ারিঙে বসল। তারপর অলর্ককে ফের মেরিলিন মনরোর মতোই হাসিতে ভিজিয়ে বলল, আজ চলি।

—এক মিনিট প্লিজ, অলর্ক দৌড়ে স্টুডিওর ভিতরে গেল। এক মিনিটও লাগল না, তার নির্দেশে স্টুডিওর এক কর্মী বয়ে নিয়ে এল বিরাট একটা প্যাকেট, প্যাকেটে একরাশ শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ, যেগুলো এতক্ষণ পরে ডোনা ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছে।

ডোনা প্রায় আর্তচিৎকার করে উঠল, এগুলো আবার কেন? আমি কিন্তু একেবারেই শাড়ি ইউজ করি না।

অলর্ক তার মুখমণ্ডল দীর্ঘ সরল হাসিতে উদ্ভাসিত করে বলল, এবার থেকে পরবে। শাড়ি পরলে তোমাকে যে কী চমৎকার দেখায় তা নিশ্চয় আজ আবিষ্কার করেছ। নারাণ ঘোষের তোলা ফোটোগুলো দেখতে-দেখতে তা সবাই জানতে পারবে আরও।

ডোনা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে ফেলল তার শরীর, থ্যাঙ্ক য়্যু, মিস্টার।

পরক্ষণেই ডোনাকে অবাক করে দিয়ে অলর্ক বলল, বাট হু ইজ মন্দার?

ডোনা একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর হেসে বলল, একজন ভাগ্যান্বেষী যুবক।

তেমনই হাসি-হাসি মুখে অলর্ক বলল, এবার থেকে ডোনা কিন্তু একমাত্র অলর্কেরই, এক্সক্লুসিভ টু অলর্ক বোস।

ডোনা অবাক হয়ে তাকাল অলর্কের দিকে। দেখল, অলর্কের শ্মশ্রুগুম্ফময় মুখে খেলা করছে এক দৃঢ় প্রত্যয়। দু-চোখে প্রগাঢ় চাউনি। সে-দৃশ্য তার শরীরে সহসা কী এক শিরশিরানি স্রোতের মতো পাক খেয়ে গেল যেন।

একরাশ উত্তেজনা, উল্লাস আর একটুকরো বিস্ময় বুকে নিয়ে সেদিন অনেকটা রাত করে ঘরে ফিরল ডোনা। চমৎকার স্বপ্নের মতো একটা দিন তার জীবনে কেটে গেল আজ। উচ্ছ্বাসে ভরা নীল টইটম্বুর স্বপ্ন। গেটের কাছে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামতে-নামতে সে অবাকও হচ্ছিল। তাহলে মন্দার সম্পর্কে জেলাস হচ্ছে অলর্ক। খুবই অদ্ভুত আর আশ্চর্য লাগছে তার। অপ্রত্যাশিত যেন। প্রেমে পড়লেই এ ধরনের জেলাস হয়ে ওঠে মানুষ। তাহলে অলর্ক নিশ্চয়ই তার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কখন তার প্রেমে পড়ল অলর্ক। আজই কি! না কি সেই প্রথম দিনেই! যেদিন তার ছবি দিয়ে সাবান কোম্পানির বিজ্ঞাপনটা বেরিয়ে ছিল। তাহলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট!

উত্তেজনায় থরথর হয়ে ডোনা তাদের বাড়ির দরজার সামনে এসে দেখল, কী কারণে যেন দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকতেই দেখে, বনানী ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মতো শিহরনদার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। বলছেন, তুমি এরকম লম্পট, দুশ্চরিত্র, তা জানতাম না।

শিহরনও বলছেন, তুমিও কিসে কম যাও। এ ব্রুট ক্যারেকটারলেস উওম্যান। তোমাকে কি আমার চিনতে বাকি আছে?

বনানী দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, এখনও পুরোপুরি চেনোনি আমাকে। তোমাকে এমন শাস্তি দেব—।

ডোনার দিকে চোখ পড়তেই সহসা থেমে গেলেন বনানী।

॥ ১৫ ॥

সংবাদপত্রের পঞ্চম পৃষ্ঠায়, যে-পৃষ্ঠাটিতে পাঠকরা সাধারণত চোখ রাখে সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবরগুলির টুকিটাকির সন্ধানে, সেখানে একেবারে ডানদিকে পুরো তিনকলাম জুড়ে ছাপা

হয়েছে বিজ্ঞাপনটা। প্রথমে বেশ বড়-বড় অক্ষরে। এ টু জেড ইজ কামিং টু ক্যালকাটা। তার নীচে আরও একটু ছোট লেটারিং-এ ফ্রম প্যারিস উইথ লাভ, ফ্রম নরওয়ে উইথ বিউটি, ফ্রম ভেনিস উইথ নেচার, ফ্রম নিউইয়র্ক উইথ প্যাশন, ফ্রম লন্ডন উইথ থ্রিল।

তার ঠিক নীচে ডোনার হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। সুন্দরী বাঙালি ললনা বলতে যা বোঝায়, ডোনার ফোটোটি এখানে ঠিক সেরকমই।

বিজ্ঞাপনটা এমন গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে, এত বড় করে, আর এমন চমক দিয়ে যে, কেউই সেটি এড়িয়ে যেতে পারবে না। ডোনা সকালের খবরের কাগজ দেখেই বুঝে নিয়েছে, সে এই বিজ্ঞাপনটির পর রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে পড়বে।

'এ টু জেড'-এর সেই এক্সক্লিউসিভ গার্ল ডোনা চ্যাটার্জি কিন্তু এখন নিতান্ত নিরীহ মুখে হন-হন করে হেঁটে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর দিয়ে। তার চলনে স্পষ্টতই ব্যস্ততা। দ্রুত পায়ে সে এগুচ্ছিল তাদের তুলনামূলক সাহিত্যের দপ্তরের দিকে, হঠাৎ তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল অনিল কাপুরের মতো মুখে ক-দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি নিয়ে এক যুবক, মুখ হাঁ করে বলল, তুই কি ডোনা?

ডোনা মুখে সামান্য বিরক্তি দেখিয়ে বলল, ফাজলামি করিস না ঋজু, পথ ছাড়। ঋজুরেখ নামের যুবকটি তবুও পথ ছাড়ে না, বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল, তুই সত্যিই ডোনা?

—কেন, অন্য কেউ বলে মনে হচ্ছে?

—না, মানে, এরকম বেশে তোকে কখনও দেখিনি তো, যাকে বলে ফ্যান্টাস্টিক, তাই-ই—।

ডোনা হেসে ফেলল। সে আজ কচি কলাপাতা রঙের একটা সিফন শাড়ি পরেছে। সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। দৃশ্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অবাক করে দেওয়ার মতোই বটে। যে-ডোনা এই ক্যাম্পাসটিতে নতুন ডিজাইনের পোশাকের বিপ্লব ঘটায় রোজ-রোজ, সে কিনা আজ সনাতন বাঙালিয়ানার পোশাক শাড়ি-ব্লাউজে ভূষিত করেছে নিজেকে!

—কেন, পরতে নেই নাকি?

—নাহ্, পরতে থাকবে না কেন? বরং শাড়ি পরে তোকে যা সুন্দরী দেখাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এক্ষুনি তোকে ইলোপ করে পালিয়ে যাই।

—যাহ্, ডোনা ভ্রূকুটি করে হাসল।

—হ্যাঁ রে, তোকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে। আজ কাগজে একখানা দারুণ ছবি বেরিয়েছে তোর।

ঋজুরেখর হাত থেকে কোনওক্রমে নিষ্কৃতি নিয়ে পালাতে চাইল ডোনা। বেশ খুশিখুশি লাগছে তার। খানিক এগুতেই দেখা হয়ে গেল গার্গীর সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে উঠল, হাই।

—কী ব্যাপার, এমন হন্তদন্ত পায়ে কোথায় চলেছিস?

—বুঝলি গার্গী, আজ আমাদের দপ্তর থেকে এম. আরকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে।

—হঠাৎ? তাই বুঝি তুই এমন শাড়িটাড়ি পরে—। তা অকেশানটা কী?

—আমাদের দপ্তরে একটা রিডারের পোস্ট খালি হয়েছিল। পরশু সে পোস্টে মণীশ রায়কে প্রোমোশন দিয়েছেন ভি. সি.।

—তাই? তোদের এম. আর.-এর সময় এখন তাহলে ভালো যাচ্ছে, বল?

—যাচ্ছেই তো। ওঁর ফ্যানের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল কয়েকগুণ। যাবি নাকি?

—আমার একটা ক্লাস ছিল যে।

—অফ করে দে ক্লাসটা। চল না, দেখবি মেয়েগুলো এম. আরকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই না করবে। সম্বর্ধনার নাম করে এম. আরকে যদি একটু ছুঁতেটুঁতে পারা যায়। মেয়েরা দল বেঁধে ফুলের

মালা, বোকে সব আনতে ছুটেছে। কেউ গানের মহড়া দিচ্ছে সকাল থেকে। কেউবা আবার দামি প্রেজেন্টস কিনে আনছে।

গার্গী তার কবজিতে চোখ রেখে সময় দেখে নিয়ে বলল, চল তাহলে৷ এই রগড়গুলো দেখতে আমি বেশ পছন্দই করি। কিন্তু তাহলে তো তোদের আর. ডি.-র পজিশন বেশ খারাপ হয়ে গেল রে।

—সাংঘাতিক, পরশু খবরটা পাওয়ার পর সেই যে প্রফেসরস রুম থেকে বেরিয়ে গেছেন, আর ফেরেননি। শোনা যাচ্ছে চাকরিই ছেড়ে দেবেন নাকি। ডোনার বলার ভঙ্গিতে গার্গী হেসে ফেলল।

—তারপর তোর অলর্ক বোসের খবর কী রে? গার্গী আজকাল ডোনার সঙ্গে দেখা হলেই অলর্ক বোসের হালচাল গতিবিধি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে। ডোনা যে ইতিমধ্যে অলর্ক বোসের কাছ থেকে জেনেছে, হরিশংকর চৌধুরি অলর্ককেই দায়ী করেছে রানিমাকে খুনের ব্যাপারে, সে খবরটাও খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে জেনে নিল গার্গী। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, সাংবাদিকটি ভুয়ো পরিচয়েই গিয়েছিল বীরভঙ্গপুরে। এখন ডোনার কাছ থেকে সব শুনে বুঝে ফেলল, তার অনুমান সঠিক। কিন্তু অলর্কই সেই লোকটিকে পাঠিয়ে খুন করেছে, হরিশংকর চৌধুরির এহেন অভিযোগ শুনে দোনামনা হল। বুঝতে পারল না, এমন একটা ভয়ঙ্কর অভিযোগের কথাটা অলর্ক বললই বা কেন ডোনাকে! নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতেই নাকি!

দুজনে একটু পরেই পৌঁছে গেল দোতলায়, কমপ্যারেটিভ লিটারেচার ডিপার্টমেন্টে। গিয়ে দেখল, বেশ ভিড় জমে গেছে দপ্তরের চারপাশে। যথারীতি অন্য দপ্তরের মেয়েরাও এসে জুটেছে সম্বর্ধনার আয়োজন করতে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। অন্য দপ্তরের মেয়েরাই কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করেছে ডোনাদের ক্লাসের মেয়েদের হটিয়ে দিয়ে।

ডোনা হেসে বলল, দেখেছিস মজাটা?

—কিন্তু এম. আর. কোথায়?

—এম. আর. তো ঘেরাও হয়ে বসে আছেন। এখন তাঁর চারপাশে অজস্র হরিপরিদের ভিড়, তাদের নাগাল এড়িয়ে এম. আর.-এর দেখা পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থেকে মণীশ রায় ঠিকই দেখতে পেলেন ডোনাকে। দূর থেকে হাত নেড়ে ডাকলেন, ডোনা—।

ডোনাকে আজ সবাই তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে। শুধু যে শাড়ি পরেই সে আজ বিপ্লব ঘটিয়েছে তা নয়, আজ খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়ও সে দ্রষ্টব্যবস্তু। ভিড় ঠেলে গার্গীকে নিয়ে মণীশ রায়ের কাছে পৌঁছেই ডোনা বলল, কনগ্রাটস, স্যার।

মণীশ রায় হেসে বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু। তবে আজকের এই সম্মানপ্রাপ্তিতে পরোক্ষে হলেও তোমার কিছু কনট্রিবিউশন আছে, ডোনা।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন, স্যার?

—সেদিন সেমিনারে আমরা যে প্রবন্ধগুলো পড়েছিলাম, সেগুলো নিয়ে একটা বই বেরিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তার সঙ্গে শ্রোতাদের বক্তব্যও টেপ থেকে তুলে নিয়ে হুবহু ছাপা হয়েছে। সেখানে শিহরন রায়চৌধুরির বক্তব্য ছেপেছে ওরা।

—তাই নাকি? বইটা দেখতে হবে তো।

—শিহরন আমার বক্তব্যকে সাপোর্ট করেছে বলে, আয়্যাম গ্রেটফুল টু হিম। তার বক্তব্য আমার প্রোমোশন পেতে সাহায্য করেছে।

ডোনা হাসি-হাসি মুখে বলল, আমি শিহরনদাকে আপনার কথা জানিয়ে দেব, স্যার।

—আমি ভাবছি, একদিন তোমাদের বাড়ি গিয়ে ওঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আসব।

উৎফুল্ল হয়ে ডোনা বলল, তাহলে তো খুব ভালো হয়, স্যার। আমার মা-ও তো আপনার কনটেমপোরারি ছিলেন শুনেছি। মা-ও খুব খুশি হবে। তবে শিহরনদা আজই সকালে দিল্লি চলে গেলেন কী একটা জরুরি কাজে। ফিরতে-ফিরতে দিনসাতেক লাগবে। ঠিক ওই সময় আবার আমার বাবার একটা প্রর্দশনী শুরু হচ্ছে তাঁর নতুন ছবিগুলো নিয়ে। আপনি যদি একেবারে প্রদর্শনী দেখতে চলে আসেন, তাহলে প্রদর্শনী-ও দেখা হবে, শিহরনদার সঙ্গেও কথাবার্তা হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাগজে দেখছিলাম বটে। তোমার বাবার ছবি নিয়ে একেবারে অভিনব প্রদর্শনী হচ্ছে কোথাও।

—ঠিক তাই স্যার। অভিনবই বলা যায়, কারণ প্রদর্শনীটা হচ্ছে কোনও প্রচলিত গ্যালারিতে নয়, একটা অদ্ভুতদর্শনের বাড়ির ভেতর, যার ভেতর-বাইরে পুরোটাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো, পুরোনো ধরনের।

—বাহ্, সত্যিই অদ্ভুত। যেতে হবে তো।

মণীশ রায় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হঠাৎ দপ্তর থেকে ছুটতে-ছুটতে এল একজন বেয়ারা, ডোনাকে বলল, ফোন আছে, আপনার খুব জরুরি।

ডোনা খুবই আশ্চর্য হল। কলেজে হঠাৎ তার কাছে কে ফোন করবে, এত জরুরিই বা কেন, বুঝে উঠতে পারল না। এর আগেও অবশ্য বনানী কিংবা চিত্রদীপ কখনও দরকারমতো তাকে ফোন করেছেন। কিন্তু আজ তো মাত্র কিছুক্ষণ আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে।

ডোনা দ্রুতপায়ে প্রফেসরস' রুমে গিয়ে ফোন ধরতেই ওপাশে বনানীর গলা, ডোনা? যাক, তোকে পেয়ে গেলাম ফোনে। এদিকে ভীষণ একটা সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। আমি একটা নার্সিংহোম থেকে কথা বলছি। রডন স্ট্রিটের কাছেই নার্সিংহোমটা। মন্দার হঠাৎ ভীষণভাবে ইনজিওরড হয়েছে। তুই শিগগির চলে আয়। মাথা ফেটে—।

ডোনা উদ্বিগ্ন হল, সে কী? কী করে হল? কোথায় বলল নার্সিংহোমটা?

বনানী একটা ঠিকানা দিয়ে দিলেন ডোনাকে। নার্সিংহোমের লোকেশনটা বুঝে নিয়ে ডোনা এসে গার্গীকে বলল, এম. আর.-এর সম্বর্ধনায় আমার আর থাকা হল না রে। তুই এম, আর-কে বলে দিস।

গার্গী অবশ্য সব শুনে রীতিমতো বিস্মিত। তৎক্ষণাৎ বলল, চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে, এত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে যখন। হাজার হোক, ওর সঙ্গে তো তোর একটা—।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে বেরিয়ে দুজনে একটা ট্যাক্সি ধরে নিল। সন্ধের পর কলকাতার পথে আজকাল এত ট্রাফিক-জ্যাম বেড়ে গেছে যে নার্সিংহোমে পৌঁছুতেই লেগে গেল প্রায় একঘণ্টার মতো। বিপর্যস্ত হয়ে যখন রডন স্ট্রিটের কাছে হোয়াইট ঈগল নার্সিংহোমের সামনে এসে পৌঁছল, তখনও বনানী তাদের জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

বনানীকে দেখে আপাতত টেনশনমুক্ত মনে হচ্ছে। তবুও উদ্বিগ্নকণ্ঠে ডোনা জিজ্ঞাসা করে, এখন কেমন আছে?

—ডাক্তার বলেছে আউট অফ ডেঞ্জার।

—দেখা করতে দেবে?

—হ্যাঁ। দু-তিনটে এক্স-রে করেছে ইতিমধ্যে। তাতে বলল, ইনজুরি তেমন মারাত্মক নয়। তবে বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না। ইনটারনাল হেমারেজ যদি হয়ে থাকে—।

তিনজনে দ্রুত উঠে এল দোতলায় মন্দারের কেবিনে। মন্দারের জ্ঞান ফিরেছে বটে, কিন্তু চোখে এখনও ঘোর লেগে রয়েছে। ডোনাকে দেখে অবশ্য খুশি হল খুব। একটু হাসল। তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে দেখে বনানীই জানালেন, মন্দার একটা মালটিস্টোরিড বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে হেঁটে

আসছিল, হঠাৎই একটা পাথরের টুকরো এসে পড়ে তার মাথার পিছনদিকে। পাথরের টুকরোটা বেশ বড় আকারের। সুতরাং বলা যায়, অল্পের জন্য বড় রকমের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মন্দারের বক্তব্য ভারী অদ্ভুত। পাথরের টুকরোটা কেউ নাকি ছুড়ে মেরেছে।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, সে আবার কী কথা? কে তোমাকে পাথর ছুড়ে মারবে?

মন্দার ম্লান হেসে জড়ানো গলায় বলল, বুঝতে পারছি না।

—কারও সঙ্গে এর মধ্যে বড় রকমের কোনও ঝামেলা হয়েছে নাকি?

—টুকটাক তো হয়ই আমাদের এ ধরনের ব্যাবসায়ে। তবে এ ঘটনাটার পিছনে মনে হচ্ছে অন্য কোনও কারণ।

—কী কারণ? ডোনা অবাক হল।

—হঠাৎ কাল সকালে একটা অদ্ভুত টেলিফোন এল আমার অফিসে। রিসিভার তুলতেই বলল, ডোন্ট ডিস্টার্ব ডোনা। ডোনা ইজ মাইন।

মন্দারের কথা শুনে হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল ডোনা। মুহূর্তে চোখাচোখি করে নিল একবার গার্গীর সঙ্গে, একবার বনানীর সঙ্গে। তার মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না।

মন্দারই আবার বলল, হঠাৎ এরকম হুমকি কে দিল বুঝতেই পারিনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে বলছেন? তাতে উত্তর দিল, যেই হই না কেন। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং। দরকার হলে পথের কাঁটা সরিয়ে দেব। বলেই টেলিফোন রেখে দিল পট করে। পরদিনই এভাবে পাথর ছুড়ে মারল কেউ, তাতেই বুঝে নিয়েছি—।

ডোনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, এটা নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই। যে-ই কাজটা করে থাকুক, ভালো করেনি।

কিছুক্ষণ পর মন্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই গার্গী ধরল ডোনাকে, কী রে, আর কেউ তোর দিকে নজর দিয়েছে নাকি?

ডোনা বিব্রত হল, লাল হয়ে উঠল তার চোখমুখ, কোনওক্রমে বলতে পারল, বুঝতে পারছি না।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, বুঝতে পারছিস না? না কি চেপে যাচ্ছিস? তোর যা ব্যাপার স্যাপার—।

ঠিক এ সময় বনানী এগিয়ে এলেন হঠাৎ, ডোনার দিকে কীরকম কড়া চোখে তাকিয়ে হিসহিস করে বললেন, শিহরনের সঙ্গে তোর সম্পর্কটা একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু—।

ডোনা শুধু বলল, শিহরনদা নয়। মনে হচ্ছে অন্য কেউ।

॥ ১৬ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় লেখা কিছু বইপত্তর ঘাঁটাঘাটি করছিলেন চিত্রদীপ। তার সঙ্গে মুঘলযুগের এবং পরবর্তীকালের বাবু-কালচারের কিছু ছবিও দেখছিলেন বেশ মনোযোগ দিয়ে। কয়েকদিন আগে অলর্কের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর নতুন প্রদর্শনীর স্পটটি ঘুরেফিরে দেখতে। এই বাড়িটিতেই অলর্ক থাকে। রাসেল স্ট্রিটে এখনও কিছু পুরোনো আমলের সাহেবিকেতার বাড়ি অবশিষ্ট আছে। বাড়িটা দোতলা, কিন্তু আকারে বিশাল। বাইরে থেকে দেখলে প্রাচীন ঘরানার একটা গন্ধ পাওয়া যায়। অলর্কের ইচ্ছে, এই বাড়িটিতেই চিত্রদীপের প্রদর্শনী হোক। সেটা অভিনব হবে। তার আরও ইচ্ছে, এই বাড়িটির আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিত্রদীপ তাঁর নতুন

সিরিজের ছবিগুলো আঁকুন।

লিভিংরুমের স্টাডিতে এক গভীর ভাবনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন চিত্রদীপ, আর ওদিক সেন্টার টেবিলে কফির কাপ হাতে নিয়ে ডোনা তার মাকে বলছিল, বুঝতে পারছি নে মা, কী করে এতসব ম্যানেজ করব আমি। এক সঙ্গে দু-দুটো পারফরমেন্স—

ডোনার কাঁধে এখন জমা হয়েছে রাজ্যের ব্যস্ততা। চিত্রদীপের প্রদর্শনী সাকসেসফুল করে তোলার জন্য ঘোরাঘুরির আর অন্ত নেই তার। সে কয়েকদিন ধরে টালা থেকে টালিগঞ্জ, হাওড়া থেকে সল্টলেক ঘুরে-ঘুরে যোগাযোগ করছে শিল্পবোদ্ধাদের সঙ্গে, চিত্র সমালোচকদের সঙ্গে, তাদের পরিবারের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও। প্রবীণ ও তরুণ শিল্পীদের কাছেও সে জনে-জনে গিয়ে বলে এসেছে তাঁরা যেন চিত্রদীপের এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন।

একই সঙ্গে ডোনা জড়িয়ে পড়েছে আরও একটি থ্রিলিং অথচ ঝামেলাপূর্ণ কাজে। হঠাৎ তাদের ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা ঠিক করেছে, একটা ড্যান্সড্রামা করবে অ্যানুয়াল সোস্যাল ফাংশনে। ইংরেজি ড্যান্সড্রামা। তার রিহার্সাল হয়ে গেল একদিন। এখন প্রায় প্রতি একদিন অন্তর তাকে যেতে হবে মহড়ায়।

এমন দ্বিবিধ চাপে ডোনা ব্যস্ত, বিপর্যস্ত, তার এখন নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই। কফির কাপ নিঃশেষ করে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে সবে তার সারাদিনের প্ল্যান মনে-মনে চক-আউট করছে এমন সময় ডোরবেলে টুং নানা টুং নানা।

নিশ্চয়ই অলর্ক।

প্রদর্শনীর দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, ডোনাদের বাড়িতে অলর্কের যাতায়াত বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সেটা অবশ্য স্বাভাবিকই, কারণ প্রোমোটার ও শিল্পী দুজনের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া এতবড় প্রদর্শনী সফল করা সম্ভব নয়। প্রচুর ছোটাছুটি করতে হচ্ছে অলর্ককেও। তার মধ্যে বারবার আলোচনা করতে এ-বাড়িতে আসছে বটে, কিন্তু চিত্রদীপ তাঁর ছবি আঁকা নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকছেন যে অলর্কের সঙ্গে কথা বলার মতো তাঁর সময়ই নেই। কেবলই পাইপ দাঁতে কামড়ে রেখে রঙের নেশায় বিভোর হয়ে আছেন।

ফলে ডোনাকেই বেশিরভাগ সময় সঙ্গ দিতে হচ্ছে অলর্ককে। ডোনা অবশ্য বুঝতে পারছে, অলর্ক যত না চিত্রদীপের জন্য এ-বাড়িতে আসে, তারচেয়ে বেশি আসে ডোনার আকর্ষণে। ডোনার সঙ্গে প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা করতেই বেশি আগ্রহ। ডোনাও এই দীর্ঘকায় সরল যুবকটির সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়। তবু সেদিন মন্দারের কথা শোনার পর তার মনে একটা খটকা লেগে রয়েছে।

ডোরবেলের শব্দ শুনে বেতের চেয়ার থেকে আলসেমি-ভরা শরীরটা তুলে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে হাসল ডোনা, হাই।

অলর্ক ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, শিহরনদা আছেন?

ডোনা বিস্মিত হয়ে বলল, না তো। খুব দরকার? শিহরনদার ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে, আপাতত না হলেও চলবে। আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করে নেবখন।

গত কয়েকদিন যাওয়া আসার মধ্যেই একদিন অলর্কের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে শিহরনের। শিহরনের যা স্বভাব, একদিন আলাপেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন অলর্কের সঙ্গে। শিহরন একজন অধ্যাপক, তাছাড়া সাহিত্যরসিকও, এ-কথা জেনে ফেলার পর অলর্ক একদিন শিহরনকে বলেছিল, খুব ভালো হল, যদি আপনার কিছু সাহিত্যভাবনা আমার বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার জন্য লিখে দেন।

শিহরন তৎক্ষণাৎ আগ্রহী হয়ে বলেছিলেন, আমি কয়েকটা ক্যাপশন লিখে দিতে পারি—

যেদিন ডোনা ও অলর্কের আলোচনার সময় শিহরন উপস্থিত থাকে, সেদিন আড্ডাটা একটু বেশিই জমে। শিহরন হলেন কথার জাদুকর, টেবিল-টকে তিনি বরাবরই চমৎকার। কখনও গুরুগম্ভীর বক্তৃতায়, কখনও ঈষৎ হাস্যরসে, কখনও বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে আসর জমিয়ে তুলতে পারেন মুহূর্তে।

অলর্ক তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে ডোনা ভুরু তুলে বলল, কি হল, শিহরনদা বাড়ি নেই বলে বসবেন না মনে হচ্ছে?

অলর্ক ধপ করে বসে পড়ে বলল, না, তা নয়, তবে অন্যত্র যাওয়ার একটা তাড়া আছে।

—ঠিক আছে, আপাতত চা তো খাবেন, চা কিংবা কফি?

অলর্ক হঠাৎ বলল, তোমার এই খাবেন, বসবেন শব্দগুলি কিন্তু আমাকে বড্ড পর-পর করে রেখেছে এ-বাড়িতে। ঠিক যেন ফ্রি হতে পারছিনে—।

ডোনাও প্রথমটা ফ্রি হতে পারছিল না। তবু অলর্কের কথাবার্তা এতই সহজ, চাউনি এতই সরল যে তার সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা করতে ইচ্ছে করে না। ঘন-বেগুনি সুতোয় কাশ্মিরী-কাজ করা ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আলিগড়িতে ওতপ্রোত যুবকটির দিকে ভালো করে তাকাল ডোনা, তারপর রহস্যময়ীর মতো হেসে বলল, ও কে মিস্টার। এখন তাহলে বোসো। মা-কে কফি করতে বলি—।

কিচেন থেকে একপাক ঘুরে এসে ডোনা বেতের চেয়ারে বসতেই অলর্ক বলল, একদিন শিহরনদাকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর কাজ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

ডোনা জানত না, অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ঘুরে-ঘুরে দেখলেন সব। রঙের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এরপরই শুরু হবে ইনটেরিয়র ডেকরেশনের বাকি কাজ। দেওয়ালের ফাঁকা জায়গাগুলোতে আঁকা হবে ম্যুরল। নীচে এ-মুড়ো ও-মুড়ো জুড়ে র‍্যাক, কাউন্টার, বাইরে শো-উইন্ডো। প্লাইউড ম্যাসোনাইট কাচের আয়না বসানো হলে দারুণ দেখাবে কিন্তু—।

ডোনা অ্যাপ্রুভ করার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তেই অলর্ক আবার বলল, একত্রিশজন কন্ট্রাক্টর কমপিট করছে ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কাজ পাওয়ার জন্য। তা শিহরনদাকে বললাম, ডোনার ইচ্ছে, বিশেষ একজনকে কাজটা দেওয়ার। তা শিহরনদা, শুনে কী বললেন জানো?

ডোনা ভুরু কুঁচকে বলল, কী?

—বললেন, তাই নাকি। ভারী ইন্টারেস্টিং। ডোনা বিশেষ একজনকে যখন রেকমেন্ড করছে, তখন সে বিষয়টাতে নিশ্চয় গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাকে একদিন কাগজপত্তরগুলো দেখতে দিও তো—

ডোনা অবাক হয়ে বলল, শিহরনদা এসব কাগজও দেখছেন নাকি!

—আমি একা মানুষ। নিজস্ব কয়েকজন লোক রেখেছি সব কাজকর্ম দেখাশুনো করার জন্য। কিন্তু তারা কী করছে না করছে তা দেখার সময়ও আমার নেই। লে-আউট না হয় তোমার বাবা দেখছেন, কিন্তু তার বাইরেও হাজারো কাজ। শিহরনদাকে একদিন সব বলতেই তিনি বললেন, তা এত ভাবনার কী আছে। আমি কিছু সাহায্য করতে পারি, যদি তোমার দরকার মনে হয়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছি।

ডোনা খানিকটা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অলর্কের মুখের দিকে।

—বুঝলে ডোনা, একসময় আমি ছিলাম একদম বেকার, ভ্যাগাবন্ড। আর এখন একসঙ্গে এতরকম কাজে জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে যে, এক চিলতে অবসর বলে কিছু নেই। কখনও গম্ভীর রাতে ঘুমোবার আগে এতসব কর্মকাণ্ডের কথা ভেবে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। মনে হয়, এত কাজ সব আমিই করছি নাকি! এগুলো সব স্বপ্ন নয় তো! কিছুকাল আগেও চরম ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। বহু ভিখারিকে রাস্তায় যেমন দেখি, খাদ্যাভাবে, দুর্দশায় দিন কাটিয়ে যাচ্ছে ছন্নছাড়াভাবে, নিজেকে তেমনি মনে হত। ভাবতাম, এমন কর্মহীনভাবে কি বেঁচে থাকা চলে, না থাকা উচিত। অজস্র কুষ্ঠরোগী তিলেতিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে-যেতেও বেঁচে থাকে বছরের পর বছর। তারা সবাই ভাবে, একদিন তাদের সব দুঃখযন্ত্রণা শেষ হয়ে এসে পৌঁছবে সুসময়। কিন্তু

সবাই জানে, তা আর কখনও হবে না। আমিও বেঁচে ছিলাম ঠিক এদেরই মতো। কিন্তু কর্মহীন, বাউণ্ডুলে একজন যুবক কীসের জন্যই বা বেঁচে থাকবে। অথচ বেশ কিছু টাকা হাতে পেয়ে যাওয়ার পর এখন মনে হয়, পৃথিবীতে মানুষের কাজ না করে বেঁচে থাকাটাই এক সমস্যা। পৃথিবীতে কাজের অভাব নেই, সময়ের বড় অভাব।

ডোনা হেসে বলল, পার্থক্য একটাই। টাকা থাকা, আর না-থাকা।

—যাই হোক, অলর্ক হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেছে এমন ভাবে বলল, আমার অ্যাড-এজেন্সি বলেছে, তোমার আরও কিছু ছবি তুলতে হবে।

—আবার! ডোনা চোখ কপালে তুলে বলল, এরপর তো তোমার অ্যালবাম ছাপাছাপি হয়ে যাবে আমার ফোটোয়।

—সেটা খারাপই বা কী, অলর্ক অবলীলায় বলল, সুন্দর মুখ বারবার ঘুরিয়ে দেখলে মন ভালো থাকে। কিন্তু সারাক্ষণ তো একজন তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। সেটা অসভ্যতা বলেই ভাববে সবাই। শুধু তোমার কাছেই নয়, এই বিশ্বসংসারের সকলের কাছে সেটা এক অভব্য ব্যাপার। তার চেয়ে অ্যালবামে প্রচুর ফোটো থাকলে সেদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে বসে থাকা যায়।

ডোনা এমন অদ্ভুত স্বীকারোক্তি শুনে হাঁ করে থাকিয়ে থাকে অলর্কের দিকে। কেমন শিরশির করে ওঠে তার শরীরের ভিতর।

—তবে আপাতত তোমার ফোটো তুলতে চাই সে কারণে নয়। প্রায় সব শো-রুমগুলোর ভিতরে রঙের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। প্লাইউডের পার্টিশন শুরু হওয়ার আগে শো-রুমের এই মুহূর্তের ছবিগুলো ক্যামেরায় ধরে রাখতে চাই। কী চমৎকার হয়েছে ভিতরগুলো তা না দেখলে অনুমান করতে পারবে না। লিন্ডসে স্ট্রিটের শো-রুমের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়লে মনে হবে, দাঁড়িয়ে আছ একটা জাহাজের ডেকের ওপর। চারপাশে শুধু নীল সমুদ্র আর সমুদ্র। চারপাশে উত্তাল ঢেউ বিশাল হয়ে তোমাকে ভাসিয়ে রেখেছে অনন্ত জলরাশির ওপর। আবার শিয়ালদহ শো-রুমে গেলে মনে হবে দাঁড়িয়ে আছো কোনও সবুজ গাছগাছালি ভরা গাঁয়ের রাস্তায়। তেমনি—।

ডোনা হেসে বলল, তা না হয় দেখলাম, কিন্তু আবার ফোটো তোলা কেন?

—এই শো-রুমগুলোর মধ্যে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ফোটো তোলা হবে। এক-এক পটভূমিতে এক-এক রকমের পোশাকে। কখনও তোমাকে মনে হবে সমুদ্রকন্যা, কখনও গাঁয়ের বধূ, কখনও চাঁদের বুকে এক তরুণী মহাকাশচারী, কখনও মরুভূমির বুকে এক বেদুইনকন্যা। তুমি কাল সকালে তৈরি হয়ে থেকো। আমি এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। নারাণ ঘোষের সঙ্গে সেভাবেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে—।

এতসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডোনাও যেন আর থই খুঁজে পাচ্ছে না। এতদিন সে নিজেই ছিল একটি বিশাল সমুদ্র। কখন কাকে বানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক ছিল না। এখন অলর্কই তার অনন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুকুল প্লাবিত বন্যার মতো।

ডোনা আপ্লুত হয়ে বলল, ফ্যান্টাস্টিক। এই আইডিয়াটা নতুন মনে হচ্ছে, আগে তো কখনও বলোনি।

অলর্ক মিটিমিটি হেসে বলল, আইডিয়াটা আগেই ছিল মাথার মধ্যে। ঠিক ভরসা হচ্ছিল না। সেদিন শিহরনদাকে বলতেই বললেন, গুড আইডিয়া। এক্ষুনি শুট করে ফেলো—।

—বাহ, শিহরনদা তোমাকে আজকাল এসব বিষয়েও অ্যাডভাইস করছেন নাকি?

—ওঁর কিছু-কিছু আইডিয়া আমার দারুণ লাগে। সেদিন ওঁকে নিয়ে কয়েকজন বিগ সাপ্লায়ারের কাছে গিয়েছিলাম। তারা বিভিন্ন স্টেট থেকে বেস্ট কমোডিটিজ সাপ্লাই করে। শিহরণদা তাদের অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। দু-একজন সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিলেন পরে। বললেন,

দুনম্বরি মাল গছিয়ে দিতে পারে।

—বাহ, অধ্যাপককে তাহলে বিজনেসের লাইনে নিয়ে আসছ? সর্বঘটের কাঁঠালিকলা হয়ে উঠছেন দেখি।

অলর্ক হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, সেদিন শিহরনদাকে দেখলাম এক মহিলার সঙ্গে। রেস্তোরাঁয় বসে চাইনিজ খাচ্ছেন।

ডোনা হেসে উঠে বলল, কলকাতার এমন আরও অনেক তরুণীকে নিয়েই উনি ঘুরতে বেরোন, রেস্তোরাঁয় চা-কফি, চাইনিজ খান।

—হুঁ, আলাপও করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। নাম বললেন, ঈষিতা, ম্যারেড।

ডোনা চমকে উঠে বলল, সে কি?

—চেনো না কি তুমি ভদ্রমহিলাকে? খুব সুন্দরী কিন্তু।

ডোনা হঠাৎ শক খেয়েছে বলে মনে হল। মাত্র কিছুদিন আগেই শিহরনদা এসে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, 'জানো ডোনা। মণীশ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। কনগ্রাটস জানাতে। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। বেশ মিশুকে কিন্তু।' সেই ক্ষণিকের আলাপ যে শিহরন ইতিমধ্যে রেস্তোরাঁ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছেন তা ভেবে যতটা না অবাক হল ডোনা, তার চেয়ে কেন যেন উৎকণ্ঠিত হল। শিহরনদা সামান্য আলাপ আরও বহুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেন। সে ভালোই জানে ব্যাপারটা।

ডোনা খানিক পরে হেসে বলল, আমার চেনাজানার পরিধি তো খুব কম নয়। তবে শিহরনদার মতো নয়। শিহরনদা ছুঁচ হয়ে ঢুকে—।

অলর্ক ডোনার অভিব্যক্তি নিরিখ করতে-করতে বলল, আচ্ছা, শিহরনদার সঙ্গে তোমাদের কীরকম সম্পর্ক?

—সম্পর্ক! এহেন জটিল প্রশ্নে ডোনা এক লহমা বেশ হকচকিয়ে গেল। সম্পর্কের কথা ভেবে সে কি কারও সঙ্গে মেশে। সে তো মেশে জাস্ট ফর ফান। হেসে বলল, কীরকম আবার। আমাদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকেন।

—উঁহু। ওঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয় সম্পর্কটা তার চেয়েও একটু গভীর।

ডোনা তীক্ষ্ণ চোখে অলর্কের চোখের দিকে তাকাল। অলর্কের চাউনিতে অবশ্য যথারীতি সারল্য। ঠোঁটের কোণে সামান্য মিটিমিটি হাসি। সে ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বলল, আসলে উনি আমার মায়ের বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে পড়তেন প্রেসিডেন্সিতে।

—ও, আর তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা কী ধরনের? তোমার ওপর খুবই যে ডমিনেট করেন তা ওঁর কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায়।

ডোনা রীতিমতো বিচলিত বোধ করল এবার। শিহরনদা তার সম্পর্কে কী বলেছে অলর্কের কাছে তা সে জানে না। হয়তো এমন কিছু বলেছে যা শুনে এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছে অলর্ক। বোধহয় জেলাসও হয়েছে। ক'দিন আগেই ঠিক এমনই ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেছিল, হু ইজ মন্দার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল ডোনা, বোধহয় কয়েকমুহূর্তে জমে ওঠা চোরঘুর্ণির টানটুকু পেরিয়ে আসতে চাইল, বলল, কীরকম আবার। শিহরণদা আমারও ফ্রেন্ড।

—শুধু ফ্রেন্ড!

ডোনা আরও হতবাক হয়ে থমকে যায় হঠাৎ। এতদিন অলর্ককে মনে হত স্বপ্নের জগতের মানুষ হিসেবে, যে সারাক্ষণ তার স্বপ্নের ভেতর, তার একান্ত ভাবনায় লীন হয়ে থাকে। হঠাৎ যেন সে তার পারিপার্শ্বিক অন্য জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। হয়তো ডোনার জন্যই।

ডোনা নির্বিকারভাবে বলল, বলতে পারো, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। বলে তার মুখ উদ্ভাসিত করল এক রহস্যময় হাসিতে।

—এত! অলর্কের গোঁফ-দাড়ির ভিতর দিয়ে চিলতে হাসি ফুটে বেরুল। কিন্তু চোখদুটো হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে পরখ করতে লাগল, ডোনার চোখ-মুখ।

কেন যেন ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ডোনা। হঠাৎ ভারী অপরিচিত মনে হল অলর্ককে। খুবই অদ্ভুত আর অচেনা।

সেই মুহূর্তে অলর্ক হঠাৎ বলল, আজ সকালে বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়ে গেল, ডোনা।

ডোনা চোখ নরম করল, এত্ত বড় বিজনেসম্যান। ঝামেলা তো সারাক্ষণ লেগেই থাকবে।

—সে তো থাকবেই। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ পিছনে লাগলে মহা মুশকিল।

ডোনা চমকে উঠে বলল, পুলিশ কেন!

—আর বলো কেন। সেই যে বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ি, সেখানে হরিশংকর চৌধুরি বলে একটা লোক থাকত। সে নাকি এককালে মস্ত লেঠেল ছিল। আমার দাদামশাইয়ের রাজত্ব সামলাত তার বাহিনি নিয়ে। হঠাৎ সে-লোকটা খুন হয়ে গেছে।

ডোনা স্তব্ধ হয়ে গেল, খুন! কীভাবে?

—লোকটা মাঝেমধ্যে দরকার পড়লে কলকাতায় আমার কাছে আসত। দিনকয়েক আগেও এসেছিল টাকাপয়সা নিতে। টাকাপয়সা দিয়েও ছিলাম। তারপর শুনি আমার বাড়ি থেকে বীরভঙ্গপুর ফেরার পথে খুন হয়ে গেছে।

—কোথায় হয়েছে খুনটা?

—কোথায় হয়েছে তা বলতে পারব না। কিন্তু তার লাশ পাওয়া গেছে আমার বাড়ির খুব কাছেই। কে যেন খুন করে ফেলে গেছে এখানে। পুলিশ তাই নিয়ে খুব হুজ্জুতি করছে। বলছে আপনার বাড়ির কাছে যখন পাওয়া গেছে, তখন আপনিই খুন করেছেন। বোঝো অবস্থা। নিজেরা অপরাধী বার করতে পারে না, এখন উদোর পিণ্ডি চাপাচ্ছে বুধোর ঘাড়ে!

ডোনার নিশ্বাস আটকে গেল, তারপর?

—আমি বললাম, ভালো করে তদন্ত করুন। আমাকেই বলির পাঁঠা সাজিয়ে লাভ কী! হা-হা-হা—।

অলর্কের হাসি শুনে ডোনা থরথর করে কাঁপতে লাগল। তাকে একগলা কাঁপুনির মধ্যে দাঁড় করিয়ে অলর্ক স্টার্ট দিল তার গাড়িতে। হু-স করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তায়।

॥ ১৭ ॥

অলর্কের হাড়-কাঁপানো হাসি গোটা একটি দিন বেশ প্যানিকে রাখল ডোনাকে। সন্ধের পর গার্গীকে ফোন করে জানালও ব্যাপারটা। গার্গী শুনে এতটাই চমকে গেল যে, মৃদুকণ্ঠে বলল, খুব মিস্টেরিয়াস কিন্তু।

ডোনা সত্যিই বেশ কয়েকদিন ধরে অলর্ককে নিয়ে একটু ধন্দে আছে। তার ম্যানলি চেহারা, উদার, রাজা-রাজা স্বভাব যেমন তাকে আকর্ষণ করে, তেমনি ভাবনায় ফেলে তার অতীত জীবন, রহস্যময় কথাবার্তা।

গার্গী সাবধানবাণী উচ্চারণ করল, একটু এলার্ট থাকিস, ডোনা।

—ওহ, শিওর। ডোনা এরকম বহু পুরুষের ধকল বহন করতে পারে, গার্গী। ডোন্ট ওরি—, বেশ রেলা মেরে বলল বটে ডোনা, বেশ সাহস দেখিয়েই তবু কী একটা আলপিন তার গলার কাছটায় বেধে আছে ক'দিন ধরে। রাতেও গভীরভাবে ভেবে চলেছে ব্যাপারটা। মন্দারকে তবু বোঝা যায়, টেন্ডার-পাগল একটা লোক। কিন্তু অলর্ক রহস্যময়। আগাপাশতলা রহস্যে মোড়া

তার সমস্ত অস্তিত্বই। অলর্ককে নিয়ে এখন সে কী করবে।

দিনদুয়েক পরে বেলা এগারোটা নাগাদ দুপুরের খাওয়া সেরে ডোনা বেরিয়ে এল তাদের বাড়ির বাইরে। আজ তাকেই ঘর ইন্টারলক করে বেরুতে হবে। প্রায় সকাল থেকে বাড়িতে সে আজ একাই। চিত্রদীপ খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছেন শিয়ালদহের দিকে। আজই ওখানকার শো-রুমে রঙের ফাইনাল টাচ হবে। ওখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে রংকর্মীদের ঠিকঠাক নির্দেশ দিতে হবে, কখনও নিজেকেই মই-এ উঠে ব্রাশ চালাতে হবে ম্যুরালের কারুকাজ ফোটাতে। চিত্রদীপের পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন বনানীও, নিউমার্কেটের দিকে কিছু টুকটাক কেনাকাটি আছে তাঁর। ফেরার পথে ভবানীপুরে কার বাড়িতে যেন যাবেন। ফিরতে বেলা একটা-দেড়টা হয়ে যাবে। তার বেরুনোর সময় শিহরনও বেরুচ্ছিলেন তৈরি হয়ে। বনানীকে গাড়িতে উঠতে দেখে বললেন, তোমার গাড়িতে একটা লিফট দেবে, বনানী?

বনানী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে তুমি?

—বলতে পারো একটা ছোটখাটো আউটিঙে, অলর্কের সঙ্গে খড়্গপুরের দিকে।

—সে কি, হঠাৎ?

—ওখানে কয়েকজন বিজনেসম্যানের সঙ্গে অলর্কের একটা ডিল আছে। হয়তো আজ নাও ফিরতে পারি।

—তাই নাকি? কবে ফেরার কথা?

—কাল বিকেলের দিকে, কিংবা রাতও হতে পারে।

—পরশু ডোনাদের কলেজে ফাংশন আছে, সে খেয়াল আছে?

—খুবই আছে। কারণ ওদের নাটকে আমারও তো কিছু অবদান আছে।

বনানী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি তো তোমার লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, অধ্যাপক-সমিতি এ সব নিয়ে ভালোই ছিলে এতদিন। হঠাৎ অলর্কের ব্যাবসার মধ্যে মাথা গলাচ্ছ কেন?

শিহরন অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছিলেন, মাঝেমধ্যে মুখ বদলাতে কার না সাধ হয়।

শিহরনের বলার ভঙ্গির মধ্যে কেমন একটা অশ্লীলতার গন্ধ পেয়ে মুখটা বিকৃত করেছিলেন বনানী। হিসহিস করে বলেছিলেন, তুমি যে এতটা লম্পট তা আগে এভাবে বুঝতে পারিনি।

শিহরন বিশ্রীভাবে হেসে বলেছিলেন, বুঝতে পারলে কী করতে?

কথার উত্তর না দিয়ে বনানী বললেন, শেষ পর্যন্ত অন্য অধ্যাপকদের বউ নিয়ে টানাটানি করছ আজকাল?

শিহরন আবার হাসলেন, সে তো আমার বহুদিনের অভ্যাস।

ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরে বনানী প্রায় বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে উঠলেন, এর শাস্তি কিন্তু তোমাকে একদিন পেতেই হবে। আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এবার বোধহয় তুমি সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

—তাই নাকি? হঠাৎ আমার চরিত্র নিয়ে তুমি মাথা ঘামাতে শুরু করলে কেন? আমাকে তো তুমি বিশ বছর ধরে চেনো। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কত করেছি। আমার স্বভাবটাই যে এরকম, না মরা পর্যন্ত স্বভাব বদলাবে না। সেই যে একটা প্রবচন আছে না, অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। বাংলায় বলে, কয়লা না যায় ধুলে, স্বভাব না যায় মলে—।

বনানী দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিলেন, তোমার মরাই দরকার। তাহলে ঘরের মেয়ে-বউগুলো অন্তত বাঁচে।

এত ঝগড়াঝাঁটির পরও শিহরনকে সঙ্গে নিয়েই গাড়িতে উঠেছিলেন বনানী। সমস্ত কথোপকথন ঘটেছিল ডোনার সামনেই। ক'দিন ধরেই লক্ষ করছিল ডোনা, বনানীর সঙ্গে শিহরনের একটা কোল্ড-ওয়ার চলছে। কারণটা সে একেবারে না বোঝে তা নয়, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সে

তেমন মাথা ঘামায়নি।

শিহরন গাড়িতে ওঠার সময় আবার বলেছিলেন, খুব বেশিদিন তোমাদের আর জ্বালাব না, শিগগির এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

বনানী এবং শিহরনের মধ্যে যে একটা প্রবল টানাপোড়েন চলছে তাতে ব্যাহত হচ্ছে ডোনাদের বাড়ির আবহাওয়া, সে-টানাপোড়েনে ডোনারও যে একটা ভূমিকা আছে তা ডোনা জানে। শিহরনের সঙ্গে ডোনার ঘনিষ্ঠতা একেবারেই সহ্য করতে পারছেন না বনানী। ওদিকে কয়েকদিন আগে শিহরনদার সামনেই তাঁকে নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছে চিত্রদীপ আর বনানীর মধ্যে। চিত্রদীপ তখনই সরাসরি বলে দিয়েছেন, তিনি চান শিহরন তাঁদের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাক। শুধু যে তাঁদের ঘরই আটকে রেখেছেন শিহরন তা নয়, কয়েকদিন আগে শিহরন কোনও একটি শো-রুম দেখে এসে মন্তব্য করেছেন, লে-আউটটা যতটা ভাবা গিয়েছিল, তত ভালো হয়নি। শুনে চিত্রদীপের মুখ গনগনে হয়ে উঠেছিল রাগে। হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, হু ইজ হি টু কমেন্ট লাইক দ্যাট!

শিহরনের কোনও ধারণাই নেই, এহেন মন্তব্য করলে চিত্রদীপের সম্মান কতটা হানি হয়। না কি ইচ্ছে করেই মন্তব্যটা করেছেন শিহরনদা! চিত্রদীপ তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন, তাতে পালটা রাগ দেখাতেই।

এতসব টানাপোড়েন মন কষাকষির মধ্যে থাকতে চায় না ডোনাও। সে ভাবতে চায়, লাইফ ইজ জাস্ট অ্যা ফান, তবু এই ঘাত-প্রতিঘাতের আঁচে সামান্য ক্লান্ত বোধ করছে আজকাল। তার কাঁধেও এখন প্রচণ্ড ঝামেলা চেপে বসেছে। একদিকে চিত্রদীপের চিত্রপ্রদর্শনী, অন্য দিকে ড্যান্স-ড্রামার রিহার্সাল।

এমন সব ভাবনায় গেরো দিতে-দিতে যোধপুর পার্কের স্টপেজ থেকে একটা মিনিবাস ধরে নিল ডোনা। আজ মাত্র গোটা দুয়েক ক্লাস আছে, তারপর ড্যান্স-ড্রামাটার মহড়া শুরু হবে দোতলার একটা ঘরে। রিহার্সাল শেষ হলে তার ইচ্ছে মন্দারকে একবার দেখতে যাবে নার্সিংহোমে। হাজারো কাজের চাপে এতখানি স্যান্ডউইচড হয়ে আছে ডোনা যে, গত এক সপ্তাহের মধ্যে একবারও দেখতে যেতে পারেনি মন্দারকে দেখতে। খুবই ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়ে আছে মন্দার। নার্সিংহোম থেকে পরশু টেলিফোন করেছিল তাকে, তুমি কি আমাকে ভুলেই গেলে, ডোনা!

ডোনা বিব্রত হয়ে বলেছিল, তুমি বুঝতে পারছ না, আমার কাঁধে এখন দু-কোটি দায়িত্ব।

—আশ্চর্য, আমি মরে গেলেও বোধহয় তোমার দেখতে আসার সময় হবে না।

—ঠিক আছে, দু-একদিনের মধ্যে অবশ্যই যাব।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসটা আজ কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, শুনশান। নিশ্চয় আজ শনিবার বলেই। কিছু ছেলে-মেয়ে এদিকে-ওদিকে জটলা করছে, হয়তো তারাও বাড়ি ফিরবে বলে উদ্যোগ করছে মনে-মনে, আর একটু আড্ডা মেরে ফেরার বাস ধরবে। ক্যাম্পাস বরাবর হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎই ডোনার চোখ পড়ে গেল গার্গীর দিকে, বলল, হাই।

গার্গী তখন তার সামনে দাঁড়ানো এক বিশালকায় কাবুলিওয়ালার সঙ্গে বাতচিত করছে। আপাদগলা ঢোলা পোশাকে ঢাকা দৈত্যের মতো চেহারার কাবুলিওয়ালার পাশে সাধারণ মাপের বাঙালিকন্যা গার্গীকে দেখাচ্ছে প্রায় লিলিপুটপ্রতিম।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার গার্গী।

গার্গী হাসল, দ্যাখ না, হঠাৎ এই কাবুলিওয়ালাটাকে দেখে ভারী ইন্টারেস্ট জাগল। ওরা কোথায় থাকে, কবে আসে, কবে যায়, এখানে কী-কী ব্যাবসা করে, দেশে কে-কে থাকে, এইসব।

—বেশ মেয়ে বাবা। সঙ্গে-সঙ্গে ডায়েরিতে নোটও করে নিচ্ছিস। নিশ্চয় একটা লেখা তৈরি করে ফেলবি ওদের নিয়ে? তাহলে আমিও একটা পয়েন্ট সাপ্লাই করতে পারি। পয়েন্টটা হল, এ-দেশে রাস্তাঘাটে এতই তো কাবুলিওয়ালা দেখতে পায় সবাই, কাবুলিওয়ালার বউ কেউ

কখনও দেখেছে?

গার্গী হেসে উঠল, বেশ বলেছিস তো। শুনেছি খুব সুন্দরী হয় ওরা।

—সুন্দরী বলে সুন্দরী। লোকে বলে, একেবারে মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো সুন্দরী। সেইজন্যই নাকি ওরা বউ নিয়ে কখনও এ-দেশে আসে না, পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়।

—বাহ, উপমাটা বেশ দিলি যা-হোক। মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো সুন্দরী! একেবারে ছেলেরা যেমনভাবে বলে—।

ডোনা খিলখিল করে হাসল, মেয়েদের সম্পর্কে সব উপমা তো এ পর্যন্ত ছেলেরাই দিয়ে এসেছে। মেয়েরা মেয়েদের সম্পর্কে তেমন ভালো উপমা আর দিল কোথায়। মেয়েরা তো মেয়েদের শুধু হিংসেই করে।

—একজ্যাক্টলি। দাঁড়া, সাক্ষাৎকারটা শেষ করে নিই। বলতে-বলতে গার্গী আবার মন দেয় তার সামনে দাঁড়ানো কাবুলিওয়ালাটার দিকে। ডোনাও হাসতে-হাসতে এগোয় তাদের ডিপার্টমেন্টের দিকে। কাবুলিওয়ালাটা এতক্ষণ তাকে যেন হাঁ করে গিলছিল। হয়তো তার শরীরের পোশাক-বিপ্লবের জন্যই।

ডিপার্টমেন্টের দোতলায় উঠতেই তাদের ক্লাসের লোলিটার সঙ্গে দেখা। চাঁপাফুলের রঙের একটা স্কার্ট পরেছে লোলিটা, ব্ল্যাক টপ। মাথায় হর্সটেল করে চুল বাঁধা। তাতে বিদেশি সিনেমার নায়িকাদের মতো দেখাচ্ছে লোলিটাকে। ডোনা তার দিকে একনজর তাকিয়ে মনে-মনে হাসল। লোলিটা আজকাল পোশাকেআশাকে ডোনাকেই নকল করার চেষ্টা করে। ডোনার পরনেও আজ স্কার্ট-ব্লাউজ। তবে তার রং জেড-ব্ল্যাক। মুখে বলল, কী রে, লোলিটা, ক্লাস হবে না?

—না। আর. ডি. আসেননি আজ। তার পরের ক্লাসটাও নাকি হবে না।

—বাহ, বেশ। তাহলে চল, রিহার্সালটা সেরে নিই।

—রিহার্সাল কাদের নিয়ে হবে। দু-তিনজন ছাড়া কেউই তো আসেনি দেখছি।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, সে কী রে। কাল বাদে পরশু ড্রামা। আজ যদি রিহার্সাল না হয়, তাহলে ফাংশন হবে কী করে?

—দেবযানীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলল, এ নিয়ে কিছু ভাবিস না, দেখবি, ঠিক স্টেজে মেরে দেব।

—বাহ্, বেশ-বেশ, ডোনা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, হঠাৎ না-ক্লাস, না-রিহার্সাল, কোনওটাই না হওয়াতে বেশ ফাঁপরে পড়ে গেল সে। এখন এই লম্বা দুপুরটা সে কীভাবে কাটাবে, কোথায় যাবে তার কোনও কিনারা করতে পারল না। আপাতত তার হাতে একটাই কাজ, মন্দারকে নার্সিংহোমে দেখতে যাওয়া। সেও বিকেল চারটের দিকে।

লম্বা করিডোরে বেশ কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে-করতে তার মনে পড়ে গেল গার্গীর কথা। একলা-একা এভাবে কালক্ষেপ না করে বরং গার্গীর কাবুলিওয়ালাপর্ব এখন কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেটাই সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা যাক। কাবুলিওয়ালার বউ আছে কি নেই এ নিয়ে যে জোকটা প্রায়শ তারা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আলোচনা করে, গার্গী সে-রহস্যের কোনও উন্মোচন করতে পারল কি না দেখতে গিয়ে প্রায় তাজ্জব হল। দেখল কাবুলিওয়ালাটা তার ঝোলা পকেট থেকে বার করেছে সযত্নে রাখা একটা রঙিন ফোটো। একটি যুবতীরই ছবি, কালো বোরখা তুলে রেখেছে মাথার ওপর। মুখের যে অংশটুকু বোরখার বাইরে দৃশ্যমান, তাতে যুবতী যে অতীব সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই।

ডোনাকে দেখে গার্গী হেসে ফিসফিস করে বলল, এই দ্যাখ, তোর কথা শুনে যেই লোকটাকে বউয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ফেটোটা বার করে দিল। ছেলেদের চোখে পড়লে সত্যি পাগল হয়ে যেত কিন্তু—।

ডোনা গলাটা নীচে নামিয়ে ঠাট্টা করে বলল, তুই মেয়ে বলেই ফোটোটা বার করে দেখাল। যাই হোক, দেখিস, লোকটার চাউনি মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। তোকে বগলদাবা করে না নিয়ে যায় ওদের দেশে। আজকাল কলকাতার টিনএজাররা নাকি কাবুলিওলাদের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।

—সে হয়তো তোকে নিয়ে যেতে চাইবে, আমাকে নয়, বলে গার্গী হাসল। তার ইন্টারভিউ নেওয়া ততক্ষণে শেষ। কাবুলিওয়ালার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে ক্যাম্পাসের বাইরে চলে এল হাঁটতে-হাঁটতে। গার্গীর কী যেন মনে পড়তে হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তোর সেই ফিঁয়াসের খবর কী? সেই যে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, এখন কেমন আছে?

—ভালোই আছে মনে হয়। পরশু টেলিফোন করেছিল। আর দেখতে যাইনি বলে রেগে ফায়ার।

—সে কী রে। এতদিন হয়ে গেল, আর একবারও দেখতে যেতে সময় পাসনি? কীরকম প্রেম রে তোদের?

ডোনা রহস্যময়ীর মতো শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, একেবারে প্লেটনিক প্রেম। দূর থেকে, দেখা না-দিয়ে যতটুকু প্রেম করা যায়, ততটুকুই। তবে ইচ্ছে আছে, আজ বিকেলে একবার যাব নার্সিংহোমে।

—ছাড়া পায়নি এখনও?

—না। তবে এর মধ্যে আরও একটা ঘটনা ঘটেছে। কে যেন টেলিফোন করে বলেছে, একবার টার্গেট মিস করেছি বলে বারবার মিস হবে না। হাসপাতাল থেকে বেরুলেই তোমার মৃত্যু। তাই ছাড়া পেলেও চট করে রিলিজ নেবে না বলল।

গার্গী আঁতকে উঠে বলল, সে কী! কে এমন ফোন করল?

—তা বুঝতে পারেনি। তবে সন্দেহ করছে এর আগে যে লোকটা টেলিফোন করে বলেছিল ডোন্ট ডিস্টার্ব ডোনা, সি ইজ মাইন, এবারও সে-ই ফোন করেছিল।

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে, তোকে আরও কেউ চাইছে! কে সে! নিশ্চয় চিনিস তাকে?

ডোনা গম্ভীর হয়ে তার ঠোঁট কামড়াতে লাগল। তারপর উদাস হয়ে বলল, কী জানি, কে চাইছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

গার্গী ডোনার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, তোর অন্য কেউ প্রেমিক আছে? যে তোকে মনে-মনে পছন্দ করে—।

ডোনা এবারও শব্দ করে হেসে উঠল, সেরকম তো কতই আছে। তুই তো জানিসই আমি বিশ্বপ্রেমিকা। আমি বহুজনকে ভালোবাসি, অ্যান্ড ভাইসি ভার্সা।

—ইয়ার্কি নয়, আমি সিরিয়াসলি বলছি। প্রথমে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। পরে হুমকি, ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবা দরকার।

ডোনা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, দ্যাখ, যদি কেউ এভাবে পেছন থেকে মারতে চেষ্টা করে, তারপর টেলিফোনে হুমকি দেয়, আমি তাকে পুরুষ বলতে পারিনে। সাহস থাকে তো সামনে এসে ব্যাপারটা ফয়সালা করে নিক।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, কী ফয়সালা করে নেবে? ডুয়েল লড়বে নাকি?

—না, ডুয়েল লড়ার কথা বলিনি। আমি বলেছি, পেছন থেকে যারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারার চক্রান্ত করে, তারা কাপুরুষ।

গার্গী ডোনার মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ করছিল গভীরভাবে। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, কে ফোন করেছে মন্দারকে, কেনই বা, তা ডোনা জানে, অথচ এড়িয়ে যাচ্ছে সে প্রসঙ্গ। ভাবতে-

ভাবতে হঠাৎ বলল, তাহলে এখন কী করবি? তোদের এম. আর.-এর কাছে আমার আরও কিছু জিজ্ঞাসা ছিল যাবি নাকি একবার?

ডোনা ভুরু কোঁচকাল, মুখ টিপে হেসে বলল, ব্যাপারখানা কী বলত তোর? ফেঁসে গেছিস নাকি?

গার্গী হাসল, ফাঁসব কেন? সেদিন এম. আর. কে গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে দেখলাম। সস্ত্রীক হেঁটে আসছেন। কী সুন্দর দেখতে ঈষিতাদিকে, তাই না? ঈষিতাদির মতো বউ যার ঘরে আছে, তিনি আমার মতো সাধারণ মেয়ের দিকে তাকাবেন কেন?

—ঈষিতাদিকে দেখলি তাহলে? সেদিন একটা খবর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ঈষিতাদি নাকি আর ডি-র সঙ্গেও একটা অ্যাফেয়ার করবার চেষ্টা করছেন। এম.আর.-এর ওপর রাগ করেই।

—যাহ! কে বলল তোকে?

—শিহরনদাই হাসতে-হাসতে বলল সেদিন। শুনে আমি ভীষণ রাগারাগি করেছি শিহরনদার সঙ্গে। বলেছি, এটা কিন্তু ভারী অন্যায়. কেন শুধু-শুধু একজন মহিলাকে নিয়ে আপনারা এভাবে ঘুরছেন? তাতে হেসে বলল, আমার আর দোষ কী! একজন মহিলা যদি যেচে এসে আমার ঘাড়ে চাপতে চায় কার কী করার আছে?

গার্গী অবাক হয়, কেন, ঈষিতাদি এরকম করছেনই বা কেন?

—শুনলাম, এম. আর.-এর ওপর প্রতিশোধ নিতে। এম. আর.-এর তো অনেক ফ্যান। প্রায়ই তো এর-ওর সঙ্গে ঘোরেন। ঈষিতাদি নাকি বেশ ক'দিন নিজের চোখে দেখেওছে, কোন ছাত্রীকে নিয়ে সিনেমা দেখে বেরুতে।

গার্গী কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর বলল, এগুলো খুব খারাপ। এতে কার কতটা লাভ হয় তা জানিনে, কিন্তু জীবনযাপনে ক্রমশ জটিলতা বেড়েই যায়। নেশাটা ফিকে হয়ে এলে পস্তাতে হয় সারাজীবন।

ডোনা হাসল রহস্যময়ীর মতো। সে এসব জটিলতার প্রসঙ্গ যেভাবে এড়িয়ে যায় সেভাবেই এড়িয়ে গেল চুপচাপ থেকে। গার্গী একটু পরে বলল, চল, আমিও তোর সঙ্গে নার্সিংহোমে যাই। গিয়ে দেখে আসি তোর মিস্টারকে।

ডোনা উৎসাহিত হয়ে বলল, যাবি? কিন্তু বিকেল চারটের আগে বোধহয় ঢুকতে দেবে না।

—তাহলে কোনও রেস্তোরাঁয় বসে চা খেয়ে নিই দুজনে। সঙ্গে একটা কাটলেট-ফাটলেট নিলে কিছুক্ষণ সময় কেটে যাবে।

ঠিক ঘণ্টাখানেক আরও সব আগডুম-বাগডুম বকে তিনটে নাগাদ রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দুজনে চলে এল বড় রাস্তায়। একটা ট্যাক্সি পেয়ে যেতেই ডোনা ডাক দিল, অ্যাই, রোখখে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগল, ছোটখাটো জ্যামজোম, ক্রশিঙে পুলিশের হাত ইত্যাদি নানান বাধাবন্ধ পেরিয়ে রডন স্ট্রিটের নার্সিংহোমটিতে পৌঁছতে।

নির্দিষ্ট কেবিনটিতে ঢুকে দুজনে এক আজব দৃশ্য দেখল। বিছানায় আধশোয়া হয়ে তার সামনে রাখা একরাশ কাগজপত্র উলটেপালটে দেখছে মন্দার। তার হাতে একটা লাল রঙের ডটপেন। এতই চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল তাকে, যে হাতের পেনটা সে কামড়াচ্ছিল দাঁত দিয়ে। মাথায় চওড়া করে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ডোনাদের দেখেই কাগজগুলো একপাশে জড়ো করে রেখে ম্লান হাসল, এতদিনে মহারানির সময় হল আমাকে দেখতে আসার!

মন্দারের চোখমুখ জুড়ে থমথমে অভিমান, আর তা হওয়ারই কথা। ডোনা সামান্য হেসে অন্যভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করল, বাহ, হেড-ইনজুরি হয়ে যে মহারাজ নার্সিংহোমে ভরতি আছে, সে আবার অফিসের কাগজপত্র দেখে কোন নিয়মে। শিগগির সরাও ওগুলো—।

মন্দার যে খুব রেগে আছে তা বোঝাতে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বলল, যেরকম সিরিয়াস ইনজুরি হয়েছে মাথায়, তাতে এসব কাগজপত্রের জটিল হিসেবটিসেব দেখার কথা নয় ঠিকই, কিন্তু আমি তো তোমার মতো সুখী রাজকন্যা নই, একটা কোম্পানি অনেক কষ্ট করে চালাতে হয়। সেখানের একদিনের অনুপস্থিতি মানেই বিরাট লস। গত কয়েকদিন চুপচাপ শুয়েই ছিলাম। কিন্তু আজ একটু আগেই আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা দেখতে এসেছিল, তারা এই কাগজগুলো দিয়ে বলে গেল, আপনি যখন একটু ভালো আছেন, টেন্ডার পেপারগুলো দেখে সই করে রাখবেন। কালই জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট। তাই-ই—।

গার্গীও মৃদু ধমক দিয়ে বলল, সেদিন আপনাকে দেখে গেলাম প্রায় আনকনসাস, কথাই বলতে পারছিলেন না। এত বড় একটা হেড-ইনজুরি হয়েছে, তার মধ্যে এইসব কমপ্লিকেটেড কাগজপত্র মোটেই দেখা উচিত হচ্ছে না আপনার।

মন্দার বেশ খুশি হল গার্গীর ধমক খেয়ে। বিষণ্ণভাবে হেসে বলল, তবু যা-হোক আপনি ইনজুরির সিরিয়াসনেসটা বুঝতে পেরেছেন। অথচ আপনার বান্ধবী দেখতে আসার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি। ডাক্তার এক্স-রে রিপোর্ট দেখে বললেন, মাত্র একচুলের জন্য বেঁচে গেছেন। ইনটারনাল হেমারেজও নাকি সামান্য হয়েছিল। কনটিনিউ করলেই মারা যেতাম নির্ঘাত।

গার্গী আঁতকে উঠে বলল, কী ডেঞ্জারাস। তার পরও আপনি এসব জটিল কাগজপত্রে মাথা ঘামাচ্ছেন! উঁহু, মোটেই ঠিক হচ্ছে না। যাই হোক, যে কথাটা আমাকে ভাবাচ্ছে তা হল, আপনি তো বলেছেন, ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন?

মন্দার এতক্ষণে উৎসাহী হয়ে বলল, ঠিক বুঝতে পারিনি, কে আমার ক্ষতি চাইছে। আমার প্রফেশনাল লাইনে অবশ্য বহু শত্রু আছে। আমি যে দ্রুত সাইন করছি আমাদের প্রফেসনে, তা অনেকেই সহ্য করতে পারছে না। তবে এ ঘটনাটা খুবই মিস্টিরিয়াস। লোকটা এর মধ্যে ডোনাকে জড়াচ্ছে কেন বুঝতে পারছিনে।

হঠাৎ বিব্রত দেখাল ডোনাকে, মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, অ্যায়াম ভেরি স্যরি, মন্দার। আমার কারণেই যদি তোমার এই বিপদ হয়ে থাকে, তবে জেনে রেখো, যে তোমাকে আঘাত করেছে, তাকে আমি কখনও ক্ষমা করব না।

মন্দার যেন এই কথাটাই শুনতে চাইছিল ডোনার কাছ থেকে। এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, আমারও খুব খারাপ লাগছে। আমি অন্য কারও পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি এই ভাবনাটাই আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। যাক গে, এখন রিলিজ নিয়ে বাড়ি চলে যাব, তাতেও ঘাবড়ে যাচ্ছি। ডাক্তার অবশ্য বলছে, আরও দিনসাতেক থেকে যান। পুরোপুরি সুস্থ না করে ছাড়ব না আপনাকে। আমিও বাধ্য হয়ে রাজি হয়ে গেলাম। কারণ বলা যায় না, এখান থেকে বেরুবার পর হয়তো আবার একটা অ্যাটেম্পট হল আমার ওপর। তার চেয়ে সাতদিন পরে যাওয়াই ভালো। এই সাতদিনই হয়তো অতিরিক্ত আয়ু হয়ে গেল আমার।

গার্গী এতক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিল গভীরভাবে। এবার বলল, আপনার কিন্তু থানায় একটা এফ. আই. আর. করা উচিত মিঃ মিত্র।

প্রস্তাব শুনে মন্দার লাফিয়ে উঠল, ঠিকই বলেছেন। এখানে টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকে আমি তাই-ই ভাবছিলাম। কালই লিখে পাঠাব থানায়।

ডোনা ততক্ষণে তার কাঁধের ঝোলাব্যাগটি থেকে বার করেছে একগুচ্ছ রঙিন ছবিওয়ালা কার্ড। সুদৃশ্য ছবির একপাশে অলঙ্কারময় হস্তলিপিতে লেখা ডোনাদের ড্যান্স-ড্রামার বিবরণ। তারই একটি কার্ডে মন্দারের নাম লিখে ডোনা মৃদু হেসে এগিয়ে দিল, যেতে পারবে না তা তো বুঝতেই পারছি। তবু কার্ডটা দিয়ে গেলাম। শিহরনদারই লেখা নাটক। বললেন, নাটকটা লিখেছেন স্রেফ নাকি আমার কথা ভেবেই। আমার মাথায় একরাশ ফাঁপানো চুল আছে তাই। একেবারে নতুন ধরনের ড্যান্সড্রামা।

মন্দার তার হাতের ডটপেনটা কুটকুট করে কামড়াচ্ছিল। পেনটা দাঁতের ফাঁকেই আটকে রেখে ডানহাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে বলল, ইস, তাই নাকি? সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে যেতাম। তোমার অভিনয় দেখা সেটাও ভাগ্যের ব্যাপার। খুবই কৌতূহল হচ্ছে দেখার জন্যে।

ডোনা হেসে বলল, ব্যাড লাক। কী আর করবে। এখন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো।

—যদি নেক্সট টাইম কখনও স্টেজ হয়, বোলো কিন্তু।

—ওহ্‌, শিওর। ঠিক আছে। গুড লাক, বলে মন্দারকে গুডবাই করে ডোনা আর গার্গী বেরিয়ে এল নার্সিংহোমের বাইরে। বেরুবার সময় গার্গী দেখতে পেল, ডোনা চলে যাচ্ছে বলে মুখটা কালো হয়ে গেল মন্দারের। বাইরে এসেই তাই অনুযোগ করতে ছাড়ল না, এ তোর কিন্তু খুবই অন্যায়, ডোনা, অসুস্থরোগী তখনই দ্রুত সেরে ওঠে, যদি তার প্রিয়জনেরা ঠিকমতো দেখভাল করে তাকে, কিংবা সেবা করে মনোযোগ দিয়ে। আর তুই একবার তাকে দেখতে আসার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিস না!

আবারও কাঁচুমাচু হয়ে এল ডোনার মুখ, শেষ পর্যন্ত তুইও এরকম বললি, গার্গী? তুই তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিস, কীরকম বিজি হয়ে রয়েছি আমি। তারপর হেসে আবার বলল, আমার হয়ে বরং তুইই না-হয় আর একদিন এসে দেখে যাস—।

গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল, বেশ বলেছিস তো!

॥ ১৮ ॥

শিহরন রায়চৌধুরি যে ড্যান্স-ড্রামাটা লিখে দিয়েছেন ডোনাদের অভিনয়ের জন্য সেটা একেবারেই নতুন ধরনের। যে ইংরেজি গল্পটিকে তিনি নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়েছেন, সেটি সবারই পরিচিত, বিখ্যাত লেখক ও. হেনরির বিখ্যাত গল্প, দ্য গিফট অফ দ্য মেজাই। ডোনাদের ক্লাসের মেয়েরাই শুধু অংশগ্রহণ করবে এই ড্যান্স-ড্রামাটিতে। ডোনারা সাত-আটজন মেয়ে খুব খেটেখুটে মাত্র কয়েকদিনের রিহার্সালে কোনওরকমে দাঁড় করিয়েছে নৃত্যনাট্যটিকে। সাত-আটখানা ইংরেজি গানও আছে যেগুলি সবই শিহরনের নিজের লেখা। গানগুলিতে ডোনারা এমন চমৎকার সুর দিয়েছে যে, যেসব অধ্যাপক মাঝেমধ্যে সময় করে রিহার্সাল দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এর আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দু-একবার ইংরেজি নাটক না হয়েছে তা নয়, কিন্তু কখনও ইংরেজি ড্যান্স-ড্রামা হয়নি। ডোনা অনেকদিন হল নাচ ছেড়ে দিয়েছে। তবু বেশ চেষ্টাচরিত্র করে আবার নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে বিদেশিনীর ভূমিকায়। আগের বার 'ওথেলো' করেছিল তারা। ডোনা ডেসডিমোনার ভূমিকায় ফাটাফাটি অভিনয় করে প্রায় কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইউনিভার্সিটি চত্বর। এবার নতুন নৃত্যনাট্যটিতে তার ভূমিকা ডেলার।

কিন্তু এবারের অনুষ্ঠানটি রূপায়িত করতে যেমন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, তেমনি এই নৃত্যনাট্যটি নিয়ে তাদের দপ্তরে নাটকও হচ্ছে কম নয়। নাটকের রিহার্সাল দেখে প্রায় সব অধ্যাপকই যখন প্রশংসায় মুখর, তখন একা রণজয় দত্তই নাকি বলেছেন, বাহ্‌, এরা আর নাটক লেখানোর লোক পেল না? শেষ পর্যন্ত শিহরন রায়চৌধুরি। সে নাটক কি লোকে দেখতে আসবে? কেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি আর নাটক লেখানোর লোক ছিল না!

কথাটা কানে আসতে খুব ঘাবড়ে গিয়েছে ডোনা। এহেন তীব্র মন্তব্য তাকে দমিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, কেননা তাদের দপ্তরের এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত তার ভূমিকাই প্রধান। নাটকের মনোনয়ন থেকে শুরু করে তার কাস্টিং, পরিচালনা, রিহার্সাল, লাইটিং, স্টেজ, এমনকী আমন্ত্রণ—সবই সে একা হাতে করে। সব ব্যাপারে সে-ই প্রতিবার উদ্যোগী হয় বলে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানই সফল হয়। এবার তো আবার নৃত্যনাট্যটি লেখা তারই পরিচিতজনের। যদি দর্শক না

আসে, যদি অনুষ্ঠান ঠিকমতো না করতে পারে, যদি ফ্লপ করে গোটা ব্যাপারটা, তাহলে তো সব দায়িত্ব বর্তাবে ডোনারই ওপর।

কিন্তু শোয়ের দিন দর্শকদের ঢল দেখে সবাই বিস্মিত। অবিশ্বাস্যও মনে হল ব্যাপারটা। তাদের প্রেক্ষাগৃহটিতে যত সিট ছিল, ইচ্ছে করেই তার চেয়ে দশ শতাংশ কার্ড বেশি বিলি করেছিল, যাতে কিছু আমন্ত্রিতজন শেষ পর্যন্ত না এলেও (যা প্রতিবারেই হয়ে থাকে) যেন হলটা ভরতি হয়ে যায়। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সমস্ত সিট ভরতি হওয়ার পরও কিছু বাড়তি দর্শক এসে গেছেন। কিছু গুঞ্জন-হইচই শুরু হতেই দ্রুত তাড়াহুড়ো করে আরও কিছু ফোল্ডিং চেয়ার জোগাড় করে সামাল দেওয়া হল পরিস্থিতি, তবু কিছু বাড়তি দর্শক রয়েই গেল শেষ রো-এর পিছনে।

ওদিকে ডোনা ততক্ষণে নিজেকে প্রবিষ্ট করছে ডেলার চরিত্রে। বুকের ভেতরে মৃদু কাঁপুনি না আছে তা নয়, প্রতিবারই মঞ্চে নামার আগে এমন হয়ে থাকে, এবার যেন আরও একটু বেশি, কারণ মেক-আপ রুমে বসেই খবর পাচ্ছিল, হলে তিলধারণের জায়গা নেই, তবু পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা সাদা লেস বসানো ঝলমলে হলুদ গাউন পরে, চমৎকার মেক-আপ নিয়ে মঞ্চে নামার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল নিজেকেই যেন আর চিনতে পারল না। সে যেন এই মুহূর্তে আর ডোনা নয়, এক বিদেশিনী, যার নাম ডেলা, যার মাথায় একঢাল চুল আর চমৎকার মুখের ছাঁদ নজর কাড়ার মতো। তার ফরসা শরীরে হলুদ গাউনটা মানিয়েওছে সুন্দর। হলুদ রংটা তারই পছন্দ করা। মাত্র এই কিছুকাল আগে বিখ্যাত অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর যখন তাঁর অষ্টম বিবাহ করলেন, তখন বিবাহের আমন্ত্রণ পত্রে অনুরোধ ছিল, আমন্ত্রিতরা কেউ যেন হলুদ পোশাক পরে না আসেন বিবাহ অনুষ্ঠানে। কেন এই অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞা তা পরিষ্কার হল বিবাহের দিন, কেননা সেদিন এলিজাবেথ টেলর এমনই একটি হলুদ গাউনে নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন।

ডোনা যেন আজ সেই অপরূপ সুন্দরীর সাজে। আর মঞ্চে অভিনয়ও করল প্রায় এলিজাবেথ টেলরের মতোই। সে নিজেই অবাক হয়ে গেল তার নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণে, গানগুলি গাইল চমৎকার করে। এমনকী চলনে-হাবভাবেও সে অবিকল বিদেশিনীর মতো, শুধু নাটকের শেষদৃশ্যে একটি চুম্বন দৃশ্য ছিল, ঝামেলা বাধল সেই সময়েই। দেবযানী নামের যে মেয়েটি পুরুষ সেজে জিমির ভূমিকায় অভিনয় করছিল, রিহার্সালের সময় এই দৃশ্যটিতে ঝুঁকে পড়ে ভঙ্গি করত চুমু খাওয়ার। কিন্তু আজ মঞ্চে অভিনয় করতে গিয়ে সত্যিসত্যিই সে ডেলার ঠোঁটে-ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খেয়ে নিল, বেশ একটু সময় নিয়েই। ডোনা নিজেও কম অবাক হয়নি। চুমু খেতে-খেতেই ফ্রিজ হয়ে যাবে তারা, ধীরে-ধীরে নেমে আসবে পরদা, নাটকও শেষ, এরকমই পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু ঘটনা হয়ে গেল অন্যরকম। ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে একদল দর্শক দাঁড়িয়ে উঠে তুমুল হাততালি দিতে থাকল প্রযোজনাকে প্রশংসা করে, আর একদল দর্শক চেঁচিয়ে উঠল, স্টপ ইট, স্টপ ইট।

ডোনারা প্রথমে বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা। ভাবছিল, হয়তো জিমিবেশি দেবযানীকে দর্শকরা পুরুষ বলে ভেবে নিয়েছে, তাই এই চুম্বনের দৃশ্যটির প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা। দেবযানীর চেহারাটা বেশ বড়সড়, প্রায় পাঁচ-সাত হাইট, কোথায় যেন একটা পুরুষালি বলিষ্ঠতা আছে তার উপস্থিতিতে, সেটা ডোনাও বুঝতে পারছিল তাকে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে। দর্শকরা বোধহয় তাই বাড়াবাড়ি বলে মনে করেছে দৃশ্যটা।

স্টপ ইট, স্টপ, চিৎকারে হাততালি মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। মঞ্চের ওপর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ডোনা আর দেবযানী। পরদা নামাও বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। সেই মুহূর্তে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, আলো, আলো জ্বালাও শিগগির।

সে সময় স্বাভাবিক নিয়মে আলো জ্বলে ওঠারই কথা। আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল একেবারে সামনের রো-এর কাছে কে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে।

হইচই, চিৎকার, চেঁচামেচির মধ্যে শোনা গেল, খুন, খুন, মার্ডার।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ডোনারা চমকে উঠল তৎক্ষণাৎ, ততক্ষণে দর্শকদের মধ্যে প্রবল হইচই-হুড়োহুড়ি। সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যেতে চাইছে বাইরে। তার ভেতর প্রবল ঠেলাঠেলি, গুতোগুতি—কেউ-কেউ আহতও হল ভীষণভাবে।

মঞ্চের ওপর ডোনাদের এক অধ্যাপক ত্রিদিবেশবাবু মাইক নিয়ে বলতে লাগলেন, আপনারা অযথা হুড়োহুড়ি করবেন না। আস্তে-আস্তে একে-একে বাইরে যান। কোনও ভয় নেই। মনে হচ্ছে, এটা একটা দুর্ঘটনা।

ডোনারা সবাই পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে তখন। ভিড় একটু হালকা হলে দেখা গেল, একেবারে সামনের রোয়ের কাছে তখনও বেশ কিছু লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কেউ বলছে, শিগগির হাসপাতালে নিয়ে চল। কেউ বলছে, জল নিয়ে আয়।

ডোনারা কয়েকজন তাদের মেক-আপ করা অবস্থায়ই ছুটে গেল সেদিকে। ভিড় ঠেলেঠুলে কোনওক্রমে কাছে গিয়ে দেখল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক উপুড় হয়ে আছেন নিশ্চল হয়ে। তার সাদা পাঞ্জাবি রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। আরও একটু কাছে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখ তার চোখে পড়তে সে একদম নিশ্চল হয়ে গেল। খুন হয়েছেন শিহরন। একটা গুলি ভেদ করে চলে গিয়েছে তাঁর হৃৎপিণ্ড।

॥ ১৯ ॥

রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ এভাবে পড়ে আছে দেখে তখন প্রবল বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে। এভাবে জনাকীর্ণ জায়গায় অন্ধকারের মধ্যে কীভাবে খুন হলেন শিহরন তা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। ভয়ার্ত, আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে সবাই।

গার্গী গ্রিনরুমের ভেতরেই ছিল। হই-চই শুনে ছুটে এসে নীচে এহেন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল সেও। ওদিকে ডেলার পোশাক পরা ডোনার চোখ আতঙ্কে ছিটকে বেরুচ্ছে যেন। তারও চোখের সামনে ঝাপসা, অন্ধকার ঠেকছে সব। একটু পরেই কেউ যেন বলল, হাসপাতালে নিয়ে গেলে হত।

একজন কাছে গিয়ে শিহরনের নাড়ি টিপে ধরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, তার আর দরকার হবে না বোধহয়। হি ইজ ডেড।

ততক্ষণে গার্গী দেখতে পেল, সেখানে জড়ো হয়েছেন চিত্রদীপ, বনানী আরও অনেকে। চিত্রদীপ প্রায় পাগলের মতো মাথা নাড়ছেন, অ্যাবসার্ড, অ্যাবসার্ড। বনানী ভয়ার্ত, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন শিহরনের মৃতদেহের দিকে। যেন কারোরই বিশ্বাস হচ্ছে না এরকম ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা সহসা ঘটে যেতে পারে প্রেক্ষাগৃহের ভেতর। একটু দূরেই শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে অলর্ক। ভিড়ের ভেতর একপাশে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে মণীশ রায়। আরও অনেক চেনাজানা লোক দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে শঙ্কিত দৃষ্টি ছড়িয়ে।

তখনও টাটকা রক্ত চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে প্রেক্ষাগৃহের মেঝে। এহেন বীভৎস দৃশ্যের সামনে একজন মহিলা চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর স্বামী ঠিকঠিক সময়ে ধরে না ফেললে আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল শুশ্রূষা করতে।

দেখতে-দেখতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ডোনা। এমনিতেই সারাদিনই প্রবল টেনশনে, খাটাখাটুনিতে পরিশ্রান্ত হয়ে ছিল, তার ওপর এরকম একটা শক ভাবতেই পারছে না সে। তার একটু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল গার্গী, সে চট করে ডোনার কাছে গিয়ে বলল, এদিকে আয়, ডোনা

বাইরে যাই—।

তার পরের মুহূর্তগুলো তাদের জীবনে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। হাসপাতাল, থানা, পুলিশ—এদের কারোরই মুখোমুখি হওয়া কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে কাম্য নয়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ, জেরা, খুঁটিনাটি নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে-হতে প্রত্যেকেই জেরবার হয়ে গেল।

অভিনয়ের প্রবল পরিশ্রমের পর কোথায় ডোনারা স্বস্তির শ্বাস ফেলে একটু বিশ্রাম নেবে, পরিবর্তে সে রাতটা তাদের কাটল এক ভয়াল দুঃস্বপ্নের ভেতর। টেনশনে, শোকে, দুশ্চিন্তায় সারাটা রাত ছোটাছুটি করে যখন ভোর হল, তখন ডোনাদের বাড়ির তিনজন মানুষের চেহারা হয়ে দাঁড়াল বিধ্বস্ত, ঝোড়ো-কাকের মতোই।

শিহরন রায়চৌধুরির মৃত্যুর ঘটনায় যেমন শোকস্তব্ধ হয়ে গেছে ডোনাদের বাড়ির সবাই, তেমনই বিহ্বল হয়ে গেছে গার্গীও। পরের দিন পোস্টমর্টেমের ঝামেলা তো আছেই, তাছাড়া ডোনাদের বাড়ি অসংখ্য লোকের যাতায়াত, ফোন ইত্যাদিতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল সবাই। সারারাত ঘুম হয়নি কাল, ক্লান্তিতে, উত্তেজনায়, আতঙ্কে কেউ আর দাঁড়াতে পারছে না পায়ের পাতা মেলে। গার্গী সামান্য সময়ের জন্য বাড়ি গিয়েছিল, তার মা ও দাদা খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন, গার্গী অবশ্য মাঝরাতের দিকে একবার ফোন করে দিয়েছিল, সে রাতে ফিরতে পারবে না জানিয়ে। ভোরে বাড়ি গিয়ে চেষ্টা করল ঘুমোতে, কিন্তু ঘুমই এল না। দুপুরে খেয়েদেয়ে ফের চলে এল ডোনাদের বাড়ি। শিহরনের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয় হয়েছিল একদিন, না হওয়ার মতোই, কিন্তু সে এটুকু জানত, শিহরন ডোনাদের বাড়িতে পরিবারের একজনের মতোই বাস করতেন। সেই শিহরন হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের ভেতর ভিড়ের মধ্যে গুলিতে নিহত হয়েছেন এটা যেমন আশ্চর্যের, তেমনই রহস্যেরও।

ভোর রাতে থানা থেকে টেলিফোন এসেছিল ডোনাদের বাড়ি, পুলিশ-অফিসার তুষারশুভ্র মিত্র বিকেলের দিকে আসবেন ঘটনার তদন্ত করতে। ডিটেকটিভ বইয়ে এহেন তদন্তের কথা হাজারবার পড়া থাকলেও কখনও স্বচক্ষে খুনের তদন্ত দেখেনি গার্গী। তাই তার ভেতরে উসকে উঠছিল একটা প্রবল কৌতূহল। কলকাতা শহরে খুনের কিনারা আজকাল হয় না বললেই চলে। এখানে সেই অর্থে কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভও নেই যার নাম শহরবাসী একডাকে জানে। যা কিছু ইনভেস্টিগেশন তা কলকাতা-পুলিশেরই একচেটিয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চার্জশিট দিতে দিতেই তারা বছর পার করে দেয়। বহু ক্ষেত্রে চার্জশিটই দিতে পারে না। কোর্টে মামলা খারিজ হয়ে যায় প্রমাণের অভাবে। এখন এহেন একটি জলজ্যান্ত খুনের রহস্য কীভাবে উদঘাটিত হয় তা দেখার জন্য উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে গার্গী।

শেষ-দুপুরের একটু আগেই ডোনাদের বাড়ি পৌঁছে দেখল, গোটা বাড়ির পরিবেশ থমথম করছে। চিত্রদীপ পাগলের মতো মাথা নাড়ছেন মাঝেমাঝে, কী সব বকছেন বিড়বিড় করে, কখনও পায়চারি করছেন অস্থিরভাবে, কখনও স্টাডির চেয়ারে গিয়ে বসে থাকছেন অপ্রকৃতিস্থের মতো, আর বলছেন, আমার সব শেষ হয়ে গেল। বনানী তাঁর শোওয়ার ঘরে বসে আছেন গুম হয়ে। ডোনা বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল অন্যমনস্কের মতো। বোঝাই যাচ্ছে, পড়ার মতো মানসিক স্থৈর্য তার নেই। গার্গীকে দেখে ম্লান হেসে বলল, এসব কী হয়ে গেল বল তো?

গার্গী কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কাল থেকে ডোনার পাশে-পাশে থেকে ক্রমাগত সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। ঘটনাটা এতই আকস্মিক, এমনই অনভিপ্রেত যে, এখন কী ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে তা কেউই জানে না। গার্গীকে কোনও কথা না বলতে দেখে ডোনা আবার বলল, বাবা তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। বারবার বলছে, পুলিশ ঘরে ঢোকা মানে সমূহ সর্বনাশ। এখন কত যে ঝড় বয়ে যাবে এ-বাড়ির ওপর দিয়ে তা ভাবা যাচ্ছে না।

গার্গী আবারও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, দ্যাখ, এটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা। পুরোপুরি অন্ধকার

প্রেক্ষাগৃহে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, একজ্যাক্টলি কী হয়েছে তা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। অতএব অনর্থক ভাবনাচিন্তা করাটা ঠিক নয়। পুলিশ আসুক, ইনভেস্টিগেট করুক, ল উইল টেক ইটস ওন কোর্স। তবে ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের। কানায়-কানায় ভরতি হল, তার মাঝখানে হঠাৎ একজন লোকের পিঠে গুলি চালিয়ে হত্যাকারী কীভাবে গা ঢাকা দিল তাই ভেবে অবাক হচ্ছি।

ডোনার গলাটা ধরে এল, ব্যাপারটা আমার এখনও বিশ্বাস হয় না। হঠাৎ কে এমনভাবে শিহরনদাকে—।

ডোনার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় কলিং বেলের গুঞ্জন। ডোনাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই একজন স্মার্ট পুলিশ-অফিসার বুটের শব্দ তুলে ঢুকলেন লিভিংরুমের ভেতর। তার সঙ্গে জনা দুয়েক কনস্টেবল, তাদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে পুলিশ-অফিসারটি দৃপ্তভঙ্গিতে মুখোমুখি হলেন চিত্রদীপ চ্যাটার্জির, নমস্কার, আমার নাম তুষারশুভ্র মিত্র। কালরাতেই একবার আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বোধহয় মনে আছে।

স্টাডিতে কয়েকটি চেয়ার, কুশন-পাতা মোড়া ছড়ানো ছিটোনো, তারই একটায় মৃদুকণ্ঠে পুলিশ-অফিসারকে বসতে বলে চিত্রদীপ বললেন, হুঁ, বলুন, কী জানতে চান?

পুলিশ-অফিসার একটা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসলেন, হাতের ছোট্ট ডায়েরিটা খুলে কিছু যেন পড়লেন মন দিয়ে। হয়তো কাল রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে যা-যা দেখেছিলেন, বা শুনেছিলেন এর-ওর মুখে, তাই-ই নোট করা রয়েছে সেখানে। তারপর পকেট থেকে পেন বার করতে-করতে বললেন, কাল রাতে আপনারা সবাই তো ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন, তাই না?

চিত্রদীপ পাইপ দাঁতে কামড়ে এতক্ষণ তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে ছিলেন পুলিশ-অফিসারের দিকে। প্রশ্ন শুনে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, হুঁ, সবাই।

—সবাই মানে?

—আমি, আমার স্ত্রী বনানী। আমার মেয়ে ডোনা কাল নাটকে অংশ নিয়েছিল, নিশ্চয় শুনেছেন। এ ছাড়া শিহরণ।

ডায়েরিতে নোট করতে-করতে তুষারশুভ্র মিত্র আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, অন্য কোনও প্রশ্নে যাওয়ার আগে কাল রাতে ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছিল, একটু ডিটেলসে শুনতে চাই প্রথমে।

পাইপে কয়েকবার ফুকফুক করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কোন ঘটনা?

—শিহরন রায়চৌধুরি কীভাবে খুন হলেন কাল সন্ধেয়?

—কীভাবে খুন হলেন সেটা তো বলতে পারব না। তবে ওদের ড্যান্স-ড্রামার লাস্ট সিনে, শেষ দৃশ্যে আজকালকার নাটকে যেরকম হয়, হঠাৎ ফ্রিজ হয়ে যায় কুশীলবরা। দর্শকরা সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তুমুল অভিনন্দন দিচ্ছে, ঠিক সেসময় মনে হল, কেউ যেন ধপ করে পড়ে গেল মেঝেয়। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায়নি কী হল, কীভাবে হল। তারপর আলো জ্বালাতেই দেখা গেল, একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মেঝেয়, তার পিঠের দিকে পাঞ্জাবি রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

—শিহরন রায়চৌধুরি বোধহয় একেবারে সামনের রোয়েই বসেছিলেন?

চিত্রদীপ ঘাড় নাড়লেন, একেবারে ফ্রন্ট রোতেই। সে-ই কালকের ড্যান্স-ড্রামার স্ক্রিপ্ট লিখেছিল। তাই নাট্যকার হিসেবে এই সম্মানটুকু তাকে দিয়েছিল ওরা।

—ও, আর আপনারা কোথায় বসেছিলেন?

—আমরাও ফ্রন্ট রোতেই বসেছিলাম। শিহরনের বাঁ-পাশে বনানী, বনানীর পাশে আমি। ড্যান্স-ড্রামার হিরোয়িনের বাবা-মা হিসেবে আমাদের গেস্ট কার্ড দিয়েছিল।

—শিহরনবাবুর ডানপাশে কে ছিলেন?

—অলর্ক বোস নামের এক যুবক।

—তিনিও কি ওদের গেস্ট ছিলেন?

—হ্যাঁ। অলর্ক ওদের ফাংশনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিল। কালকের স্টেটসম্যান আর টেলিগ্রাফে ওদের ফাংশনের বিজ্ঞাপন স্পনসর করেছিল সে।

—ও, শিহরনবাবুর পেছনের রো-এ কি আপনাদের চেনা কেউ বসেছিল?

চিত্রদীপ একটু ভেবে বললেন, হলের প্রথম দুটো রোয়ে বেশিরভাগই ছিলেন ওদের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা আর ড্যান্সড্রামার কুশীলবদের পেরেন্টসরা। এর চেয়ে ডিটেলসে আমি বলতে পারব না।

—আচ্ছা, আপনারা যখন শিহরনবাবুর পাশেই বসে ছিলেন, তখন কোনও গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?

চিত্রদীপ একমুহূর্তে থমকে গিয়ে বললেন, না, শোনা সম্ভবও নয়। কারণ নাটক শেষ হওয়ামাত্র হলের সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিচ্ছিল। দু-একজন সিট ছেড়ে বেরিয়েও পড়েছিল ডান পাশের রো আর বাঁ-পাশের রোয়ের মাঝখানে প্যাসেজ। প্রশংসাসূচক কিছু ধ্বনিও ভেসে আসছিল চারপাশ থেকে। এত হট্টগোলের মাঝখানে আমি অন্তত কিছু শুনতে পাইনি। বনানী, তুমি কিছু শুনেছিলে?

বনানী বসেছিলেন একটু দূরে একটা মোড়া টেনে নিয়ে, ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

—শিহরনবাবু যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তা আপনারা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন?

চিত্রদীপ নয়, উত্তর দিলেন বনানীই, হ্যাঁ, আমার পাশেই বসেছিল শিহরন। হাততালি দিতে দাঁড়িয়েও উঠেছিল মনে হল। তারপরই মনে হল, কে যেন ওকে ঠেলে ফেলে দিল।

—পেছন থেকে কেউ?

—আসলে সেসময় ভিড়টা কয়েক মুহূর্তের জন্য এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সিনেমা বা থিয়েটারের শো ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে যেমন হয়ে থাকে। কিছু লোক দাঁড়িয়ে পড়ে, কিছু গেটের বাইরে বেরুবার জন্য হুড়মুড় করে এগিয়ে যায়, তেমনি কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে আবার পেছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিল অভিনন্দন জানাতে।

দ্রুত হাতে তাঁর ডায়েরিতে কিছু পয়েন্টস নোট করে নিতে-নিতে তুষারশুভ্র মিত্র এবার হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, আচ্ছা, শিহরনবাবুর সঙ্গে আপনাদের কতদিনের সম্পর্ক? উনি তো এ-বাড়িতেই পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকতেন?

উত্তর দিলেন চিত্রদীপ, তা প্রায় এক বছরের ওপর হয়ে গেল শিহরণ এ-বাড়িতে ছিল।

—হঠাৎ উনি কীভাবে পেয়িংগেস্ট হয়ে এলেন এ-বাড়িতে? আগে থেকে পরিচয় ছিল নাকি ওঁর সঙ্গে?

—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, 'পেয়িংগেস্ট চাই' বলে। তাতে শিহরন অ্যাপ্লাই করেছিল—।

· —হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি আপনাদের বাড়ি পেয়িংগেস্ট হিসেবে এন্ট্রি পেলেন? তার সম্পর্কে কোনও খবরাখবর নিলেন না?

কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন চিত্রদীপ, হঠাৎ বনানী বললেন, শিহরন আমার সঙ্গে এক কলেজে পড়ত। সে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগেকার কথা। আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তরে ও এসে দেখা করেছিল। চেনা লোক বলে আর আপত্তি করিনি।

—গত কুড়ি বছরের মধ্যে আপনার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ ছিল না? বনানী ঘাড় নাড়ালেন, না।

শিহরনবাবু কি কলেজে পড়াকালীন আপনার বন্ধু ছিল?

ইতস্তত করে বনানী বললেন, ওই আর কি। একসঙ্গে পড়তে-পড়তে যেরকম বন্ধুত্ব হয়ে

থাকে।

তুষারশুভ্র মিত্র এবার তাকালেন চিত্রদীপের দিকে, শিহরনবাবুর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কীরকম ছিল?

দ্রুত উত্তর দিলেন চিত্রদীপ, ভালো। খুব ভালো। শিহরন প্রায় আমাদের বাড়ির একজন হয়েই ছিল। আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতাম।

—ও আচ্ছা। স্ত্রীর পুরুষবন্ধু কোনও পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে এলে হঠাৎ কখনও-কখনও গোলযোগ দেখা দেয়। আপনাদের পরিবারে সেরকম হয়নি?

চিত্রদীপ দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, কখনওই না।

—শিহরনবাবু তো ব্যাচেলর ছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—এখানে আসার আগে শিহরনবাবু কোথায় থাকতেন?

চিত্রদীপ আর বনানী একবার নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে নিলেন। তারপর চিত্রদীপ বললেন, ঠিক কোথায় থাকত তা জানি না। তবে কোনও মেসে থাকত শুনেছি।

—ওঁর বাড়িতে কেউ নেই? বাবা-মা, ভাই-বোন?

—ঠিক জানা নেই।

—কখনও জিজ্ঞাসা করেননি?

—না, দরকার হয়নি।

—কেউ কখনও ওঁর সঙ্গে এ-বাড়িতে দেখা করতে আসত?

—আত্মীয়স্বজন কেউ কখনও এসেছে বলে দেখিনি। ও যে কলেজে পড়ায়, সেখান থেকে কখনও অধ্যাপক বা ছাত্রছাত্রীরা কখনও-সখনও এসেছে।

—কাল আপনারা সবাই একই সঙ্গে ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন?

চিত্রদীপ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, না। ডোনা দুপুরেই চলে গিয়েছিল। ও-ই ড্যান্স-ড্রামার ডিরেক্টর ছিল, অতএব প্রস্তুতির ব্যাপারে আগেই যেতে হয়েছিল ওকে। আমি আর বনানী সন্ধের সময় একসঙ্গে গিয়েছিলাম গাড়িতে।

—আর শিহরনবাবু?

—শিহরন কাল ভোরেই বেরিয়ে গিয়েছিল। ওর নানারকম কাজ থাকে। দুপুরে বোধহয় কলেজে কী একটা মিটিংও ছিল। সেখান থেকে সোজা এসেছিল ফাংশনে।

—হলে ঢোকার আগে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—হয়েছিল। কিন্তু ও বলল, আপনারা ভেতরে ঢুকে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

—কেন, পরে কেন?

—বোধহয় কারও জন্য অপেক্ষা করছিল।

—কার জন্যে, জানতেন?

—বোধহয় অলর্কের জন্য।

—অলর্ক কে?

—একজন ব্যবসায়ী। একটু আগেই আপনাকে বলেছি, সে ডোনাদের ফাংশনের বিজ্ঞাপন স্পনসর করেছিল কাগজে।

তুষারশুভ্র মিত্র আবার কীসব নোট করলেন ডায়েরিতে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, অলর্কবাবুর সঙ্গে শিহরনবাবুর সম্পর্ক কী?

—অলর্ক আপাতত আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। প্রায়ই আসে আমাদের বাড়ি। সেই সূত্রে শিহরনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে।

একটু থেমে কী যেন ভেবে হঠাৎ তুষারশুভ্র মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের বাড়িতে একটা পিস্তল আছে না?

চিত্রদীপ এতক্ষণে যেন বেশ নার্ভাস হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ।

—কই দেখি, একবার দেখান তো আমাকে?

চিত্রদীপ এতক্ষণ যথাসম্ভব শান্ত মেজাজেই কথা বলছিলেন, হঠাৎ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ মেজাজে বলে উঠলেন, কেন, পিস্তল দেখতে চাইছেন কেন? আপনি কি ভাবছেন, আমি মার্ডার করেছি?

—তা তো বলিনি। পিস্তলটা একবার দেখতে চেয়েছি মাত্র।

চিত্রদীপ বনানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, নিয়ে এসো তো পিস্তলটা। বেডরুমে আলমারির ভেতর রাখা আছে।

বনানীকে বেশ বিব্রত দেখাল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে উঠে গেলেন শোওয়ার ঘরের দিকে। একটু বেশিই সময় নিলেন খোঁজাখুঁজি করতে। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, ওটা কি আলমারির মধ্যেই ছিল?

চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, হ্যাঁ।

আবার থমকে গিয়ে বনানী বললেন, কই নেই তো—।

—নেই। চিত্রদীপ লাফিয়ে উঠলেন, অবিশ্বাসের চোখে কিছুক্ষণ বনানীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, কই দেখি—।

চিত্রদীপও ঘরে ঢুকে আলমারি টুঁড়ে ফেললেন আঁতিপাতি করে। তাক থেকে জিনিসপত্র ছুড়ে-ছুড়ে ফেললেন মেঝেয়, তবু কোথাও পিস্তলটির সন্ধান না পেয়ে বিভ্রান্তমুখে বেরিয়ে এলেন বাইরে। স্টাডির একোণ-ওকোণ খুঁজলেন, যাবতীয় ড্রয়ার টেনে-টেনে দেখতে লাগলেন কোথাও ভুলে রেখেছেন কি না। পিস্তলটা। তারপর আবার ঘরে গেলেন। খাটের বিছানা উলটেপালটে দেখলেন অনেকক্ষণ, তারপর বিড়বিড় করতে লাগলেন আপনমনে, স্ট্রেঞ্জ! কোথায় রাখলাম সেটা!

পুলিশ-অফিসার আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কী! খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পিস্তলটা?

চিত্রদীপ প্রায় বোবা হয়ে গেছেন যেন। অনেকক্ষণ থম হয়ে থেকে হঠাৎ বনানীর দিকে তাকালেন, তুমি জানো কিছু এ ব্যাপারে?

বনানী নার্ভাস হয়ে বললেন, না তো।

—ডোনা, তুই জানিস কিছু?

ডোনা অবাক হয়ে যাচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারস্যাপার দেখে। বলল, পিস্তল নিয়ে আমি কী করব?

—তা হলে কোথায় গেল সেটা? চিত্রদীপকে প্রায় ক্ষিপ্ত দেখায়।

ডোনা বিব্রত হয়ে বলল, নিশ্চয় কোথাও আছে ঘরের ভিতর যা এই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে।

পরের কয়েক মুহূর্ত ঘরের ভিতর এক থমথমে অবস্থা। চিত্রদীপ কিছুটা বিভ্রান্ত, কিছুটা ক্রুদ্ধ, কিছুটা অসহায়। ওদিকে পুলিশ-অফিসারের মুখ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে। হঠাৎ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু পিস্তলটার হোয়ার অ্যাবাউটস যে আমার চাই-ই, মিঃ চ্যাটার্জি।

চিত্রদীপ বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি কি ভাবছেন, কাল আমার পিস্তল থেকেই গুলি ছোড়া হয়েছে?

তুষারশুভ্র মিত্র মুচকি হাসলেন, এতক্ষণ তা না ভাবলেও আপাতত তাই-ই ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। জিনিসটা তো আর পাখি নয় যে ডানা মেলে উড়ে যাবে জানালা দিয়ে।

—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি হাতে পেয়ে গেছেন, মিঃ মিত্র?

তুষারশুভ্র মিত্র অবাক হয়ে বললেন, না, তা পাইনি।

—তাহলে কী করে সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন যে আমার পিস্তলই ব্যবহার হয়েছিল কাল?

—আপনার পিস্তল যে ব্যবহার হয়নি তা প্রমাণ করতেই এক্ষুনি সেটা আমার সামনে বার করে দেওয়া উচিত, মিঃ চ্যাটার্জি। দিলেই তো পরিষ্কার হয়ে যাবে, কাল সেটা ব্যবহার হয়েছিল, কি হয়নি। লুকিয়ে রেখেছেন বলেই তো সন্দেহ করছি।

—লুকিয়ে! বলতে-বলতে হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন চিত্রদীপ।

পুলিশ-অফিসার এবার উঠে দাঁড়ালেন, চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, আপনি ভালো করে ঘর সার্চ করে দেখুন। কাল সকালের মধ্যে খুঁজে বার করে দেখিয়ে আসবেন থানায়। নইলে আমরাই ঘর সার্চ করতে বাধ্য হব।

চিত্রদীপ প্রায় ক্রুদ্ধ-চোখে তাকালেন, তুষারশুভ্র মিত্রের দিকে, তারপর চোখে আগুন জ্বেলে তাকালেন বনানীর দিকে, হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয় জানো পিস্তলটা কোথায়? আমি এই সেদিন রেখেছি আলমারির ভেতর।

বনানী ততক্ষণে প্রায় হিম হয়ে গেছেন ভয়ে, ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে তাঁর, ঘর সার্চ হবে শুনে হঠাৎ বললেন, সেদিন অলর্কের সঙ্গে শিহরন যখন খড়্গপুরে গেল, আমাকে বলল, পিস্তলটা একটু দেখি। আমি বললাম, কেন? বলল, দরকার আছে। পিস্তলটা বার করে ওর হাতে দিতেই বলল, খড়্গপুর থেকে ফিরে এসেই দিয়ে দেব তোমাকে।

কথাটা শুনে চিত্রদীপ প্রায় অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে রইলেন, আর তুমি তাই দিয়ে দিলে?

পুলিশ-অফিসারের চোখেও তখন ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস। একটু আগেই বনানী বলেছেন, তিনি জানেন না কোথায় গেল পিস্তলটা, এখন আবার বলছেন—।

বনানী কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, কী করব। চট করে পকেটে পুরে নিল যে, বলল, খড়্গপুরে ঝামেলা হতে পারে। কাছে থাকা ভালো।

চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, কীসের ঝামেলা?

—অলর্ক যাদের ওখানে গিয়েছিল, সেটা খুব ভালো জায়গা নয়। ওর কোম্পানির সাপ্লায়ার হবে বোধহয়। ওরা নাকি সেখানে একটা ঝামেলা এক্সপেক্ট করেছিল।

—তা সত্ত্বেও সেখানে যাওয়ার দরকার কী ছিল?

—অলর্ক নাকি অনেক টাকা অ্যাডভান্স করে ফেলেছে ওদের। সেটা শিহরনের পরামর্শক্রমেই। কিন্তু তারপর সাপ্লায়ার ক্রমাগত ঘোরাচ্ছিল ওদের। তার আগের সপ্তাহে পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় তাদের সঙ্গে বেশ ঝগড়াও হয়ে গেছে। টাকাটা আদায় করার জন্যই নাকি গিয়েছিল ওরা।

চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন অদ্ভুত তো, এতসব ঘটনা ঘটে গেছে আর আমি কিছুই জানতে পারিনি। তা শিহরন খড়্গপুর থেকে ফিরে এসে আর ফিরিয়ে দেয়নি পিস্তলটা?

—আগের দিন অনেক রাতে ফিরেছিল। তখন আর জিজ্ঞাসা করতে মনে নেই। পরদিন সকালে উঠেই বেরিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সোজা ফাংশনে। এর মধ্যে কোনও কথা হয়নি আমার সঙ্গে।

—খড়্গপুরে কোনও গোলমাল হয়েছিল নাকি?

—বললাম তো, আমার সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি।

—আশ্চর্য!

চিত্রদীপ বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে নির্বাক হয়ে গেলেন হঠাৎ। বনানীর কথাগুলো কিছুই সেঁধুচ্ছে না তাঁর মগজে। যেন এক ভয়ঙ্কর খাড়াই পাহাড় থেকে সহসা তাঁকে গড়িয়ে দেওয়া হল নীচে।

চিত্রদীপের বিস্ময় কিন্তু একটুও প্রভাবিত করল না পুলিশ-অফিসারটিকে। গভীর কৌতূহলের সঙ্গে ভ্রুকুটি করে শুনছিলেন এতক্ষণের কথোপকথন। চিত্রদীপ 'আশ্চর্য' বলে চুপ হয়ে যেতেই হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, বাহ্, ভালো গল্প ফেঁদেছেন তো আপনারা! প্রায় রূপকথার মতোই

লাগছে শুনতে। কিন্তু এসব ছেঁদো গল্পে আমি ভুলছিনে। পিস্তলটা আমাকে দেখাতেই হবে। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো মিঃ চ্যাটার্জি, হঠাৎ কী এমন প্রয়োজন হল যার জন্য এই বয়সে পিস্তল কেনার দরকার হল আপনার?

চিত্রদীপ তখনও স্তব্ধ হয়ে আছেন। কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে কটমট করে তাকালেন তুষারশুভ্র মিত্র, আপনাকে একদিন সময় দিলাম, মিঃ চ্যাটার্জি। তার মধ্যে পিস্তলটা থানায় গিয়ে শো করে আসবেন। নইলে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

বলে আর দাঁড়ালেন না। বুটে গটগট শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

॥ ২০ ॥

পুলিশ-ইনস্পেকটর চলে যাওয়ার পর ঘরের ভেতরে প্রথমে কিছুক্ষণ পিনপতন নিস্তব্ধতা। তারপর চিত্রদীপের মুখচোখ হিংস্র হয়ে উঠল, যেন বনানীর ওপর লাফিয়ে পড়বেন বাঘের মতো। ডোনা দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিত হয়ে। কয়েকদিন আগে চিত্রদীপ একটা পিস্তল এনেছেন এইটুকুই জানত সে। কিন্তু তার ফল যে এমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে তা ভাবতেই পারছে না এখন। বনানী কেনই বা হঠাৎ শিহরনকে দিতে গেলেন কে জানে। তারপর সেটা এখন কোথায় তা একমাত্র শিহরনই জানতে পারেন হয়তো। কিন্তু সেই শিহরনই এখন সবাইকার ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ দু-একদিনের মধ্যে থানায় সেটা না দেখাতে পারলে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

গার্গী একপাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল। এইমুহূর্তে কিছু একটা না করলে ঘরের অবস্থা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তা অনুধাবন করে সে দ্রুত এগিয়ে গেল চিত্রদীপের কাছে, বলল, আঙ্কেল, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে পিস্তলটা। আপনি দু-একদিন অপেক্ষা করুন। ঘরের ভেতরটা একটু খোঁজাখুঁজি করি আমরা, বিশেষ করে শিহরনদার ঘর। না হলে, শিহরনদা, কাল কোথায়-কোথায় গিয়েছিলেন আমরা খবর নিয়ে দেখছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওটা পাওয়া যাবেই।

এমন জোর দিয়ে কথাগুলো বলল গার্গী যে, চিত্রদীপ কিছুটা আশ্বস্ত হলেন হয়তো। মুখের হিংস্রভাব কমে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল এক ধরনের অসহায়তা, কেবল বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, হোপলেস, হোপলেস, ইট'স অল হোপলেস, আমাকে এরা সবাই প্ল্যান করে ডোবাবে ঠিক করেছে। দ্যাট ডার্টি উওম্যান, ক্যারাকটারলেস, নিশ্চয় কোনও একটা কনস্পিরেসি করেছে—।

বলতে-বলতে প্রায় টলমল পায়ে ঢুকে গেলেন শোওয়ার ঘরে। গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেলেন বিছানায়। বোধহয় শকটা এত প্রবল হয়ে ধাক্কা দিয়েছিল যে, চোখ বুজে শুয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন নিজেকে।

গার্গী ডোনাকে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরে, বলল, কী ব্যাপার বল তো, ডোনা। আমার তো সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে অ্যাবসার্ড মনে হচ্ছে। ডোনা তখনও বিভ্রান্ত, আমারও তাই। মা হঠাৎ কেন যে শিহরনদাকে—। তা ছাড়া, শিহরনদা কেন পিস্তল নিয়ে গেলেন খড়গপুরে, তাও তো আমার মাথায় ঢুকছে না।

গার্গী কড়া চোখে তাকাল ডোনার দিকে, সবকিছুই এখন ভারী রহস্যময় মনে হচ্ছে। তোদের বাড়িতে পরপর এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটে গেল যা শুধু অদ্ভুত নয়, ভয়ঙ্কর। প্রথমে মন্দারবাবুর কথাই ধর। হঠাৎ কে বা কারা তাকে খুন করার চেষ্টা করল। বেচারি প্রাণে বেঁচে গেছে কপাল জোরে। তারপর এখন টেলিফোনে কেউ হুমকি দিচ্ছে তাকে এবং তার কেন্দ্রবিন্দু তুই-ই। তারপর

শিহরনদা খুন হলেন। এর পেছনে কারও কোনও মোটিভ আছে বলে তোর মনে হয়?

ডোনা ঠোঁট কামড়াতে লাগল অন্যমনস্ক হয়ে। তার মুখে চিন্তার ছাপও। গার্গী তার মুখের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ ধরে নিল ব্যাপারটা, একটু ধমক দিয়েই বলল, কোনও ঘটনা এখন একদম লুকোবিনে, ডোনা। কিছু চেপে যাওয়া মানে প্রথমেই বিপদে পড়বেন তোর বাবা। অন্তত পিস্তলটা যে করে হোক উদ্ধার করতেই হবে এই মুহূর্তে। যা তোর মনে আসছে, খোলসা করে বল তো—।

ডোনার মনে তবু দ্বিধা যায় না। কিছুক্ষণ দোনামোনা করে হঠাৎ বলল, দ্যাখ, অলর্ক বোসকে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

গার্গী চমকাল কম নয়। তবু একটি হত্যাকাণ্ডের পর কোনও তথ্যই অসম্ভব মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। ডোনার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কেন?

—আসলে পর-পর দুটো ঘটনা ঘটে গেল, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভাবনাটা মনে এল হঠাৎ। বুঝলি, অলর্ক হঠাৎ ভীষণ ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠেছে আমার সম্পর্কে। আমাকে তার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিজ্ঞাপনের এক্সক্লিউসিভ মডেল করেই সখ মেটেনি, সেদিন বলল, তার জীবনেও আমাকে এক্সক্লিউসিভ হিসেবে চায়—।

—তাই নাকি! গার্গী আবার চমকাল।

—তারপর একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হু ইজ মন্দার? তারপরই তার ওপর খুনের চেষ্টা হয়ে গেল। ক'দিন আগে আবার জিজ্ঞাসা করল, শিহরনদার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? ঠিক তার দিনকয়েকের মধ্যে শিহরনদা—।

বলতে-বলতে ডোনার গলা কাঁপতে শুরু করল, আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না, উনি এরকম করতে পারেন। কিন্তু এমনভাবে ঘটে গেল ঘটনাটা!

গার্গী খুবই অবাক হল, বিশ্বাস করতে তারও কষ্ট হচ্ছিল, তবু তার বিস্ময় মনের ভেতর চেপে রেখে বলল, অলর্কবাবু তো সেদিন ছিলেন প্রেক্ষাগৃহের ভেতর?

—ছিলেনই তো। শিহরনদার পাশেই বসেছিলেন শুনলাম।

—তাহলে তৈরি হয়ে নে। এখনই একবার অলর্কবাবুর ওখানে আমাকে যেতে যাই। ওঁর রি-অকাশনটা বোঝার চেষ্টা করি। তা ছাড়া পরশু খড়্গপুর থেকে ফিরে শিহরনদা কাল ভোরেই আবার কেন গিয়েছিলেন অলর্কবাবুর বাড়ি, সে সময় পিস্তলটা তাঁর কাছে ছিল কিনা এগুলো জানা দরকার।

ডোনা বিস্মিত হয়ে বলল, এখনই?

—হ্যাঁ, এখনই। কি কুইক।

ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে গার্গী যখন রাসেল স্ট্রিটে পৌঁছল, সন্ধ্যা পার হয়ে আলোয় ঝলমল করে উঠেছে কলকাতা শহর। কলকাতার এই সাহেব-পাড়াটিতে এখন চারপাশে উঁচু-উঁচু সব মালটিস্টোরিড বিল্ডিং। এহেন আধুনিকতার ছোঁয়াচ এড়িয়ে অলর্ক বসুর দোতলা বিশাল বাড়িটা সেই সাবেকি ধরনের। সাবেকি বলতে চৌরঙ্গির এপাশে এই অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই হয়ে একধরনের সাহেবিপনা বজায় রেখেছে চটলা-ওঠা হলুদবাড়িটা। চারপাশের বাকি সব দৃশ্য আঙুলে চেপে হঠাৎ এই বাড়িটা নজরে পড়লে যে-কোনও পথচারীর মনে হতে পারে, সে এসে পৌঁছেছে লন্ডনের কোনও শহরতলিতে। ইংরেজি সিনেমায় দেখা কোনও পুরোনো বাড়িই যেন। এমন একটি বাড়ির উঁচু পাঁচিলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে গার্গী মনে-মনে তারিফ জানাল বাড়ির নির্মাতাকে। সেইসঙ্গে এখন যিনি বাড়ির মালিক তার কথা ভেবে কিছুটা সম্ভ্রমও। কিন্তু আপাতত অলর্ক বসু সম্পর্কে গার্গীর মনে এক ঘোর সন্দেহ।

প্রাচীন এই বাড়িটিতে দোতালায় ওঠার সিঁড়িটি কাঠের। কিন্তু খুবই মজবুত আর কারুকার্যময়।

একতলা-দোতলা মিলিয়ে এ-বাড়িতে কতগুলো ঘর তা বোধহয় গুনে শেষ করা যাবে না। দারোয়ানের পিছু-পিছু দোতালায় উঠে এমনই অনেকগুলো ঘরের পাশ দিয়ে, এক লম্বা করিডোর পার হয়ে যে ড্রইংরুমটায় এসে পৌঁছল গার্গীরা, সেটাতে বোধহয় অনায়াসে লন টেনিসের কোর্ট বানানো যায়। বাকি ঘরগুলোর ক্ষেত্রফলও কম কিছু নয়। আর গার্গী শুনে আশ্চর্য হল যে. এই বিশাল বাড়িটিতে অলর্ক আর তার দারোয়ানটি ছাড়া কোনও তৃতীয় প্রাণী থাকে না।

অলর্কের কাছে এসে প্রথম প্রশ্ন যা গার্গীর মনে এল, এত বড় বাড়িতে এভাবে একা থাকতে আপনার ভয় করে না?

—ভয়! অলর্কের হাসি ছড়িয়ে পড়ে তার লম্বা দাড়ি গোঁফের অন্তরালে। একা থাকি আপনাকে কে বলল? এ-বাড়িতে তো অনেকগুলো ভূত থাকে। তারা আছে বলেই তো একলা মনে হয় না।

—সর্বনাশ। ভূত আছে কী করে বুঝলেন?

—বাহ! তারা তো সারারাত ফিসফাস করে কথা বলে। কখনও নিজেদের মধ্যে। কখনও আমাকে লক্ষ করেও। কখনও করিডোর দিয়ে খটখট শব্দ তুলে যাতায়াত করে। হি-হি করে হাসেও কখনও বা।

গার্গী আর ডোনা দুজনে একবার চোখাচোখি করে নেয়, আর?

—লোডশেডিঙের সময় মোমবাতি জ্বালালে ফস করে হঠাৎ নিভিয়ে দেয়।

—আপনি খুবই যে বীরপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই, গার্গী হাসতে হাসতে বলল, ডোনা বরাবরই বলত, আপনি একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। আজ মনে হচ্ছে, সত্যিই অদ্ভুত। যাই হোক, আপনার কাছে কতকগুলো দরকারে এসেছি।

অলর্ক যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল তার কাছে কেউ অনেক প্রশ্ন নিয়ে আসবে। হেসে বলল, সে তো দুই সুন্দরীর যৌথ অভিযান দেখেই বুঝতে পেরেছি। ভাবাই যায় না এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল আমাদের চোখের সামনে, অথচ কেউ কিছু বুঝতেই পারলাম না।

গার্গী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল অলর্কের মুখ। ডোনা ঠিকই বলেছিল ক'দিন আগে। যিশুর মতোই সরল-সুন্দর। কিছুক্ষণ অলর্কের অভিব্যক্তি নিরিখ করে বলল, আচ্ছা, মিঃ বোস, সেদিন আপনিও তো ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন ওখানে। ঠিক কোথায় বসেছিলেন আপনি?

—শিহরণদার ডানপাশেই ছিলাম। একেবারে ফ্রন্ট রোয়ে।

—অন্ধকারের ভেতর কী ঘটতে চলেছে তা কি বুঝতে পেরেছিলেন কিছু?

—ঠিক বুঝতে পারিনি বললে ভুল বলা হবে। শেষ দৃশ্যে যে মুহূর্তে ড্যান্স ড্রামার কুশীলবরা ফ্রিজ হয়ে গেছে, আমরা দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তুমুল হাততালি দিচ্ছি, অনেক দর্শক হুড়মুড় করে এগিয়েও এসেছেন অভিনন্দন জানাতে, সেসময় হঠাৎ আমার মনে হল কে যেন পিছন থেকে ঠেলে দিল আমাকে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম। সামলে নেওয়ার আগেই দেখি, পাশে দাঁড়ানো শিহরণদাও পড়ে গেলেন হঠাৎ।

—স্ট্রেঞ্জ, গার্গী অবাক হল, আর একবার চোখাচোখি করল ডোনার সঙ্গে, আচ্ছা, মিঃ বোস। শিহরনদার ঠিক পিছনে কে ছিলেন, মনে আছে আপনার?

—হ্যাঁ, মনীশ রায়।

—তাই নাকি? আর আপনার পিছনে?

—আমার পিছনে যিনি ছিলেন, তাঁকে চিনি না। দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক। চোখে চশমা।

আবারও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল গার্গী, তার আগেই অলর্ক হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠল, এই যা, শুধু কথাই বলে যাচ্ছি। এমনভাবে তখন থেকে জেরা করে যাচ্ছেন যে, আপনাদের সামান্য আপ্যায়নটুকু করার কথাও ভুলে গেছি।

তারপর একবার গার্গীর দিকে, একবার ডোনার দিকে তাকিয়ে বলল, বলুন তো, কলকাতার

দুই শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এখন কী পছন্দ করবেন? চা, না কফি, অথবা লস্যি?

—আপাতত কিছুই না, গার্গী বাধা দিয়ে বলল, আমরা কয়েকটা জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছি, সেটাই এখন মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট। আপনার সঙ্গে সেদিন শিহরনদা গিয়েছিলেন খড়্গপুরে। সেখানে সাপ্লায়ারদের সঙ্গে কোনও ডিসপুট হয়েছিল আপনাদের?

অলর্ক অবাক হয়ে বলল, না তো—।

—আচ্ছা, আপনি কি জানেন, শিহরনদার সঙ্গে একটা পিস্তল ছিল সে-সময়?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। গাড়িতে যেতে-যেতে উনি আমাকে পিস্তলটা দেখিয়েছিলেন। আমি তো বেশ অবাকই হয়েছিলাম ওটা দেখে। বুঝতে পারিনি কেন উনি সঙ্গে করে এনেছেন ওটা।

—পিস্তলটা কি উনি কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন?

অলর্ক একটু থমকে গিয়ে বলল, হ্যাঁ। তা তো নিশ্চয়ই।

—কিন্তু পিস্তলটা এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—তাই নাকি? কিন্তু যখন গাড়ি থেকে নামেন, তখনও কিন্তু পিস্তলটা ছিল ওঁর কাছে।

—কোথায় নেমেছিলেন গাড়ি থেকে?

—এসপ্লানেডেই নেমেছিলেন। আমি বলেছিলাম, বাড়ি পৌঁছে দিই। কিন্তু উনি রাজি হননি। বলেছিলেন, চৌরঙ্গিতে কী একটা দরকার আছে। সেটা মিটিয়ে উনি নাকতলা যাবেন।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, নাকতলা! অদ্ভুত তো! যখন গাড়ি থেকে নেমেছিলেন তখন ক'টা বাজে?

—সন্ধে ছ'টা নাগাদ।

—আশ্চর্য, সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন অনেক রাতে। ফিরে আমাকে বলেছিলেন, এক্ষুনি ফিরলাম খড়্গাপুর থেকে।

গার্গী ডোনার দিকে তাকাল, হঠাৎ নাকতলায় কেন?

ডোনা গম্ভীর হয়ে বলল, নিশ্চয় এম. আরের বাড়িতে। কিন্তু সেটা স্রেফ চেপে গিয়েছিলেন আমার কাছে। যাই হোক, বাড়ি ফিরে পিস্তলটা কেন ফেরত দেননি মার কাছে, সেটাই ভারী অবাক লাগছে আমার।

অলর্ক বলল, এমনও হতে পারে পরদিন হয়তো ওঁর কাজে লাগবে বলেই ফিরিয়ে দেননি ওটা। পরদিন ভোরেই অবশ্য প্রথমে আমার বাড়ি এসেছিলেন। তখন ওটা ওঁর কাছে ছিল কি না জানি না। বেলা এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে গেলেন খুব জরুরি মিটিং আছে এই বলে।

ডোনা অবাক হল, কীসের মিটিং?

—তা আমাকে বলেননি। তবে বলেছিলেন, আজকের মিটিংটা খুব ইমপর্ট্যান্ট, ভীষণ ফাটাফাটি হবে।

গার্গী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মিঃ বোস, দু-দিন আপনার সঙ্গে খড়্গপুরে ব্যস্ত থাকার পর হঠাৎ কী এমন কারণ ঘটেছিল যাতে পরদিন ভোরেই আবার আপনার বাড়ি আসতে হয়েছিল ওঁকে?

অলর্ক হেসে বলল, আসলে আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ব্যাপারে কিছু-কিছু অ্যাডভাইস দিচ্ছিলেন শিহরনদা। তারই কাগজপত্র দেখেছিলেন সারা সকাল।

—আপনার বিজনেস নিয়ে কি কোনও ঝামেলা চলছে, মিঃ বোস?

—বিজনেস মানেই হাজারো ঝামেলা। সে তো সারাক্ষণ কোনও-না-কোনও সমস্যা এসে পড়ছে সামনে।

—এমনও তো হতে পারে বিজনেসে উনি জড়িয়ে পড়ায় কেউ তা সহ্য করতে পারছিলেন না।

—তাতে টার্গেট হওয়ার কথা এই অলর্ক বোসের। কিন্তু অলর্ক বোস কাউকে তোয়াক্কা করে না।

—আচ্ছা, কী-কী ব্যাপারে আপনাকে অ্যাডভাইস করছিলেন শিহরনদা?

একটু ইতস্তত করে অলর্ক বলল, সে তো প্রায় সব ব্যাপারেই সাহায্য করছিলেন। খড়্গাপুরেও গিয়েছিলেন সাপ্লায়ারদের সঙ্গে কথা বলতে। কোন জিনিস কোন মার্কেটে সুবিধেমতো দরে পাওয়া যায়, কোন প্রভিন্স থেকে কোন প্রোডাক্ট আনলে সস্তায় পাওয়া যাবে, সবই লিস্ট করে দিয়েছিলেন একদিন বসে। তা ছাড়া—।

—তা ছাড়া?

ডোনার দিকে একমুহূর্তে তাকিয়ে অলর্ক বলল, এমনকী চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে দিয়ে আমি যেসব লে-আউট করিয়েছি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর জন্য, সে ব্যাপারেও বলেছিলেন, মাত্র একজন আর্টিস্টকে দিয়ে সব শো-রুমের লে-আউট কেন করাচ্ছি। বিভিন্ন আর্টিস্টকে দিয়ে করালে তার এফেক্ট হত অন্যরকম।

ডোনা স্তম্ভিত হয়ে বলল, তাই?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি ওঁর কথা শুনিনি। বলেছিলাম, এসব ব্যাপারে আমি একজনের হাতেই দায়িত্ব দিতে চাই।

গার্গী হঠাৎ প্রশ্ন করল, ডোনার বাবা এ ঘটনার কথা জানতেন?

ইতস্তত করে অলর্ক বলল, হ্যাঁ। একদিন চিত্রদীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে আলোচনার সময় আমি বলে ফেলেছিলাম। তাতে উনি ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছিলেন, স্কাউন্ড্রেলটাকে আমি জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে দেব।

ডোনার মুখখানা সহসা কালো হয়ে গেল। গার্গী তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিল, আচ্ছা, আর কী-কী ব্যাপার আপনাকে অ্যাডভাইস করেছিলেন শিহরনদা?

—সে অনেক ব্যাপার। সব বলতে গেলে একখানা বাইবেল হয়ে যাবে। বরং একদিন সকালের দিকে আসুন। এখন ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হয়ে গেল। আপনাদের বাড়ি ফিরতে হবে তো—

গার্গী এতক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকায়নি। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, সত্যিই তো। ডোনা, শিগগির ওঠ।

দুজনে ড্রইং ছেড়ে উঠতে গিয়েই হঠাৎ কী যেন নজরে পড়তে ডোনা চমকে উঠে বলল, ওটা পিস্তল নয়?

অলর্ক অবশ্য চমকাল না, হ্যাঁ, ওটা আমার পিস্তল।

—আপনার পিস্তল আছে নাকি? গার্গী বিস্মিত হল। তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছড়ে পড়ল ড্রইঙের কোণে যে দেরাজটা আছে তার কাচের ভেতর। পিস্তলের নলটাই শুধু দেখা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ। আমাকেও সম্প্রতি একটা লাইসেন্স করাতে হল। নইলে চলছিল না।

পরমুহূর্তে গার্গীর প্রশ্ন আছড়ে পড়ল, কেন?

—আর বলবেন না, কী যে সব বিপদের মধ্যে আছি। হাতে হঠাৎ অনেক টাকা এসে গেলে চারদিকে প্রচুর শত্রু হয়ে যায়। এই দেখুন না। ক'দিন আগেই একটা চিরকুট কেউ ফেলে গেছে বারান্দায়, ইয়োর ডে'জ আর নাম্বারড। তারপর হঠাৎ টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে আজ সকালেহ : সাবধান। তোমাকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব।

গার্গী ভুরুতে কোঁচ ফেলে তাকাচ্ছিল অলর্কের দিকে। গল্পগুলো কতটা সত্যি কতটা আষাঢ়ে তাই-ই বোধহয় মাপার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ কী মনে হতে বলল, পিস্তলটা একবার দেখব?

অলর্ক ঘাড় নাড়ল, না। খড়্গাপুরে নিয়ে গিয়েছিলাম ওটা। ওখান থেকে ফিরে এসে দেরাজে রেখেছিলাম ওভাবেই। তারপর কাল ওই ঘটনার পর আর ওটায় হাত দিইনি। পুলিশ হয়তো আসতে

পারে, খোঁজ করতে পারে পিস্তলটার এই ভেবে অ্যাজ ইট ইজ রেখে দিয়েছি। ছ'টা গুলিই ভরা আছে ওর ভেতর।

গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, কতদিন গুলি ছোড়েননি ওটা থেকে?

অবারও ইতস্তত করল অলর্ক, খড়্গপুরে গিয়ে একটা গুলি ছুড়তে হয়েছিল। তক্ষুনি অবশ্য আর একটা গুলি লোড করে রেখে দিয়েছি।

অলর্কের গলাটা হঠাৎ করেই কেন যেন কেঁপে গেল। গার্গীর চোখ এড়াল না। সে এবার মৃদুস্বরে বলল, আপনি কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন, মিঃ বোস।

রীতিমতো নার্ভাস দেখাল অলর্ককে, কেন! কেন?

গার্গী সঙ্গে-সঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, আচ্ছা, মিঃ বোস, আপনি তো বেশ কয়েকদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশছিলেন শিহরনদার সঙ্গে। নিশ্চয়ই অনেক বিষয়ে আলোচনাও করতেন কাজের ফাঁকে-ফাঁকে। কিছু অনুমান করতে পারেন, কে খুন করতে পারেন ওঁকে?

অলর্ক একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, সে আমি কী করে জানব। নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলতেন না উনি। একদিকে খুবই এক্সট্রোভার্ট সারাক্ষণ হইচই করে কথা বলতেন। অন্যদিকে ভীষণ ইনট্রোভার্ট, নিজের ব্যাপারে খুবই চাপা। শুধু একটা ব্যাপারে দুর্বলতা ছিল ওঁর। মেয়েদের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন খুব। সেদিন খড়্গপুর থেকে ফিরে, অতটা জার্নির পরও বললেন, নাকতলায় যাব। আমাকে কিছু না বললেও বুঝতে পেরেছিলাম, কোনও মহিলার সঙ্গে দেখা করাটা খুব দরকার ছিল ওঁর।

ডোনা আর গার্গী ফের চোখাচোখি করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আজ চলি। দরকার হলে আবার আসব কখনও।

—ওহ্, শিওর, অলর্ক তার দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভরিয়ে ফেলল হাসিতে। পরমুহূর্তে বলল, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি বরং গাড়িতে করে পৌঁছে দি।

ডোনা, গার্গী দুজনেই অবশ্য বাধা দিল, থ্যাঙ্কস অ্যা লট। তার দরকার হবে না। আমরা ট্যাক্সি ধরে নিচ্ছি একটা—।

বড় রাস্তা পর্যন্ত অলর্ক তাদের সঙ্গে এল। ট্যাক্সিও ডেকে দিল কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে। তারপর ডোনাকে বলল, শিহরনদা মারা যাওয়ায় আমি কিন্তু খুব বিপদে পড়ে গেলাম, ডোনা, আমার ব্যাবসার অনেকটাই ওঁর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন যে তার কী হবে কে জানে। কিন্তু তোমার বাবার চিত্রপ্রদর্শনীটা ঠিক সময়ে করে ফেলতে চাই।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, এর পর একজিবিশনের কথা আর ভাবতেই পারছে না কেউ। বাবার পিস্তল হারিয়ে যাওয়ায় যা বিপদে পড়ে গেছি আমরা।

ট্যাক্সি ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ অল[illegible] [illegible]ল, ওহো এবার মনে পড়েছে। কাল সকালে শিহরনদা যখন আমার বাড়ি এসেছিলেন, তখন বলেছিলেন, পিস্তলটা নাকি ভুলে ফেলে এসেছেন নাকতলায়।

গার্গী চমকে উঠল, তা সেটা এতক্ষণ বলেননি কেন?

॥ ২১ ॥

গতকাল সংবাদপত্রে শিহরন হত্যার ঘটনাটি ছাপা হয়েছিল ছোট্ট করে, পাঁচের পাতায় নীচের দিকে, অবশ্য বক্স করে ছাপিয়ে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছিল খবরটায়। সংবাদে বলা হয়েছিল, কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফাংশনে ইংরেজি ড্যান্স-ড্রামার অভিনয় চলাকালীন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি সংঘটি[illegible] হয়েছিল সুকৌশলে। পুলিশ তদন্ত করছে ঘটনাটির।

আজ কিন্তু ঘটনাটির ফলো-আপ রিপোর্ট ছাপা হয়েছে একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায়, মাঝখানে বেশ বড় করে, আর রিপোর্টটি খুবই চাঞ্চল্যকর। সাংবাদিক জানিয়েছেন, গতকালের রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁদের দপ্তরে হঠাৎই একটি উড়ো ফোন আসে, তাতে জানা যায়, কলেজের অধ্যাপক-সমিতির এক কর্মকর্তা ছিলেন শিহরন। হত্যার দিন দুপুরে সেই সমিতির মিটিং ছিল। সেখানে শিহরনের বক্তৃতার সময় তাঁর কোনও একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তুমুল বচসার সৃষ্টি হয়। সেই বচসার জেরেই এই হত্যাকাণ্ড। উড়ো-ফোনটি পাওয়ার পর সাংবাদিকটি অধ্যাপক-সমিতির অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জোগাড় করেছেন অনেক আশ্চর্য তথ্য। শিহরন রায়চৌধুরি প্রথম যৌবনে নাকি যুক্ত ছিলেন এক বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে। পরে অবশ্য কোনও কারণে সরে এসেছিলেন আন্দোলন থেকে। প্রত্যক্ষভাবে কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও পরবর্তীকালে সামিল হয়েছিলেন অধ্যাপক সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে। সামনেই কর্মসমিতির নির্বাচন। বহুদিন ধরেই বিরোধীপক্ষের সঙ্গে একটা ঠান্ডা লড়াই চলছিল তাঁদের। গত পরশু অর্থাৎ হত্যার দিন দুপুরে মিটিং চলাকালীন সেই বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। বক্তৃতা দিতে উঠে শিহরন এমন জ্বালাময়ী ভাষায় নির্মমভাবে আক্রমণ করেছিলেন বিরোধীপক্ষের কোনও-কোনও অধ্যাপককে, তাতে পিছনের দিকে বসা কোনও-কোনও সদস্য উত্তেজিত হয়ে শাসিয়েছিলেন, এরকম আলগা মন্তব্য করলে মেরে লাশ ফেলে দেওয়া হবে। অতএব এই শত্রুতার জের হিসেবে শিহরন খুন হতে পারেন এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

খবরটা বার-দু-তিন খুঁটিয়ে পড়ে খুবই আশ্চর্য হচ্ছিল গার্গী। তার ঘরের ছোট্ট জানালাটির পাশে বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে মনে-মনে কয়েকমুহূর্ত বিশ্লেষণ করে নিল ঘটনাটা। যে মুহূর্তে মনে হচ্ছিল চিত্রদীপের পিস্তল হারানো নিয়ে অদ্ভুত বাঁক নিচ্ছে শিহরন-হত্যার রহস্য, ঠিক সেসময় সংবাদপত্রের এই তথ্যাদি সমস্ত হিসেব যেন উলটে দিল।

শিহরন রায়চৌধুরি সম্পর্কে গার্গী যতটুকু খবর জেনেছে, তিনি ব্যাচেলর মানুষ, অধ্যাপনা নিয়ে যতটা ব্যস্ত থাকতেন, তার চেয়েও ব্যাপৃত থাকতেন তাঁর একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ নিয়ে। মাঝে মাঝে শৌখিন সাহিত্যচর্চা যেমন করতেন, তেমনই কোনও একটি আঁতেলমার্কা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্যও ছিলেন। কিন্তু তিনি অধ্যাপক-সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, থাকলে কতটা প্রত্যক্ষভাবে, এসব গার্গীর জানার বাইরে। ডোনা জানে কি না কে জানে। শিহরনের সঙ্গে ডোনার কখনও এসব ব্যাপারে আলোচনা হত কি না তা একসময় জেনে নেবে গার্গী। ডোনা প্রায়ই বলত, জানিস, শিহরনদা এমন সব বিষয় নিয়ে মাঝেমধ্যে আলোচনা করেন, যা শুনতে-শুনতে হেসে কুটপাট হতে হয়।

সত্যিই নানারকম কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকার ফলে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন শিহরন। টুকটাক এখানে-ওখানে ভ্রমণের ভীষণ নেশা ছিল, সেই সুবাদে তাঁকে থাকতে হত কখনও দূর-দূর প্রান্তের হোটেলে, কখনও জেলায় সার্কিট হাউস বা ডাকবাংলোয়। কোথায় কখন কোন ডাকবাংলোয় গিয়ে কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তা শুনতে-শুনতেই কাবার হয়ে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোন-কোন ডাকবাংলোয় ভূত আছে, সেসব ভূতেরা কে কীরকম, কে মাঝরাতে হা-হা করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে, কোন সার্কিট হাউসে মাঝরাতে শুধু ফিসফাস শব্দ শোনা যায়, কিন্তু ভূত দেখা যায় না। কোন ফরেস্ট বাংলোয় রাতে বাঘ এসে ঢুঁ মারে। কোথায় বাংলো-চত্বরে হরিণ এসে জিরোয় ভেড়া ছাগলদের মতো, এমন হাজারো সব গল্প তাঁর স্টকে গিজগিজ করত সারাক্ষণ। কখনও রাজনীতিবিদদের নিয়েও মজা করে গল্প বলতেন। আবার চমৎকার সব কার্টুনও আঁকতে পারতেন তাদের নিয়ে, তাদের কার কী ম্যানারিজম তাও হই-হই করে শোনাতেন প্রায়ই। এমনকী কোন বাস-কন্ডাক্টর কেমনভাবে টিকিট চায় যাত্রীদের কাছে, তাও নিখুঁতভাবে ক্যারিক্যাচার করে দেখাতেন।

এহেন শিহরনের যে কিছু শত্রু না ছিল তা নয়। যারা স্ট্রেটকাট কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে

কিছু মতামত তৈরি হয়ে যায় এমনিই। যাদের কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন হয়, তাদেরও কিছু-কিছু বিরোধীপক্ষ থেকে থাকে।

তবু গার্গী বুঝে উঠতে পারছে না, অধ্যাপক সমিতির নির্বাচন নিয়ে কী এমন সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে খুন হতে হল শিহরনকে।

তার আগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কে সংবাদপত্রে উড়ো ফোন করে জানাতে গেল খবরটি। অধ্যাপক-সমিতির কোনও সদস্য, না কি বাইরের কেউ। বিরোধীপক্ষের কেউ যদি খুন করেই থাকবে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা ফোন করে জানাতে যাবে না। আর শিহরনের পক্ষের কোনও সদস্য যদি হয়ে থাকে, তাহলে তারা পুলিশের কাছে না জানিয়ে হঠাৎ সংবাদপত্রে জানাল কেন? সে যাই হোক, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন, সেক্ষেত্রে শিহরনকে হত্যার জন্য হত্যাকারীকে নিশ্চয়ই শিহরনকে অনুসরণ করে ড্যান্স-ড্রামার হলে ঢুকতে হয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে এ প্রশ্নও জাগে, কোন-কোন অধ্যাপক সেদিন ড্যান্স-ড্রামা দেখার কার্ড পেয়েছিলেন অর্গানাইজারদের কাছ থেকে?

এইসব প্রশ্নে আলুথালু হতে-হতে গার্গী খবরের কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে দ্রুত তৈরি হল। সমিতির ব্যাপারে আজই একটা খোঁজখবর নেবে এমনও ভাবল মনে-মনে। মাকে ডেকে 'বেরুচ্ছি একটু' বলেই পাড়ার পথ পেরিয়ে ট্রাম-রাস্তার দিকে। নতুন একটা স্পেশাল-বাস চালু হয়েছে যেটা যাদবপুর থানা হয়ে এইট বি বাসস্ট্যান্ডের দিকে যায়। তাতে উঠলে সরাসরি গিয়ে নামা যায় যোধপুর পার্কের স্টপেজে। আনোয়ার শা রোড থেকে ডোনাদের বাড়ি সামান্য দূরে হলেও রাস্তাটি বেশ ছিমছাম। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে কলিংবেল টিপতেই জংলা-ছাপা শালোয়ার-কামিজ পরে বেরিয়ে এল ডোনা। অন্যদিনকার মতো লাফিয়ে উঠে বলল না 'হাই', শুধু গম্ভীর মুখে বলল, আয়।

ডোনাও এতক্ষণ খুঁটিয়ে পড়ছিল খবরের কাগজের সেই অংশ, যেখানে ফলাও করে ছাপা হয়েছে শিহরন-হত্যার সংবাদ। সেও এতক্ষণ ঘটনাটির আকস্মিকতায় বোধহয় চুরমুর হচ্ছিল একা-একা। গার্গীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, লোকটা কী অদ্ভুত ছিল তাই না?

গার্গী বুঝতে পারল না যেন, কেন, অদ্ভুত কেন?

ডোনা যে বেশ সংকটের মধ্যে আছে, তা বোঝাই যাচ্ছে তার মুখ দেখে। নিশ্চয়ই সেই পিস্তল সমস্যা এখনও মেটেনি, সেজন্য তার বাবা ও মায়ের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছে তার জের অবশ্যই ঝামরে পড়ছে ডোনার ওপর। গার্গীর কথার উত্তরে শুধু বলল, খুবই অদ্ভুত মানুষ। সারাদিন যেসব কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখতেন নিজেকে, তার মধ্যে অনেক ঝঞ্ঝাটের কাজও থাকত। কিন্তু কোনও টেনশনই ছিল না। এত কাজ কোনটার পর কোনটা করবেন, তা ওঁর মাথার মধ্যে ছক কষে রাখা থাকত, কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তার কিছুই বোঝার উপায় নেই। এই মুহূর্তে যে সামনে আছে, সে জানতেই পারত না পরের মুহূর্তে উনি কোথায় যাবেন, কিংবা কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এমনিতে মনে হয় দারুন দিল-খোলা, সারাক্ষণ মজা করছেন, অথচ আসলে ভীষণ চাপা।

গার্গী কৌতূহলী হল, যেমন—।

—যেমন পরশুর কথাই ধর না। তার আগের দিন সন্ধে নাগাদ খড়গপুর থেকে ফিরেছেন অলর্ক বোসের সঙ্গে, আমাদের এখানে না ফিরে সোজা চলে গেছেন এম. আর.-এর বাড়ি। রাতে বাড়ি ফিরেছেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বোঝাই যায়নি সারাদিন কী টেনশনে কাটিয়েছেন। কোনও আলোচনাও করেননি তা নিয়ে। পরশু ভোরে উঠেই চলে গেছেন অলর্ক বোসের বাড়ি। নিশ্চয়ই জরুরি কাজ ছিল নইলে অত ভোরে যাবেনই বা কেন। আমি জগিং করতে যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে হেসে বলেছিলেন, 'নো, মাই চাইল্ড, আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে। দুপুরে হয়তো ফিরব না।' অলর্ক বোসের বাড়ি থেকে সোজা চলে গেছেন অধ্যাপক-সমিতির মিটিংয়ে। সেখানে এত কাণ্ড হয়েছে তা কিন্তু সন্ধের সময় ফাংশন দেখতে এলে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেনি কেউ। মায়ের

সঙ্গে নাকি দারুণ খোশমেজাজে কথা বলেছেন। অথচ এত সব টেনশনের ব্যাপার থাকলে আমার তো ঘুমই হত না রাতে।

গার্গী সামান্য হাসল, কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করছিল ডোনার মুখের অভিব্যক্তি। তাকে আরও একটু উসকে দেওয়ার জন্য বলল, আর এমন কোনও ব্যাপার মনে পড়ছে তোর?

একটু ইতস্তত করে ডোনা বলল, সেদিন কী হয়েছে শোন। আমাকে বললেন, চলো ডোনা, তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করি আজ। গাড়ি নিয়ে দুজনে এখানে-ওখানে ঘুরে লাঞ্চ খেয়ে হইহই করতে-করতে ফিরছি, হঠাৎ বললেন, 'আমাকে একটু রবীন্দ্রসদনের সামনে নামিয়ে দিও, ডোনা।' 'কেন,' তা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'তিনটে নাগাদ এখানে একটা ফাংশন আছে। উদ্যোক্তারা জোর করে কার্ড গছিয়ে দিয়েছেন,—।' তা ওঁকে নামিয়ে দিয়ে ফিরছি, হঠাৎ দেখি ওঁর সিগারেটের প্যাকেটটা পড়ে আছে সিটের ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি-ঘুরিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রসদনের কাছাকাছি যেতে দেখি, ঈষিতাদির সঙ্গে গল্প করতে-করতে হাঁটছেন ভিক্টোরিয়ার দিকে। কী আশ্চর্য, বল। ঈষিতাদির সঙ্গে ওঁর যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তা আমার কাছে একবারও ভাঙেননি। গার্গী তার অবাক হয়ে যাওয়া চোখে হঠাৎ হাসি ভরিয়ে বলল, যাদের অনেক প্রেমিকা তাকে, তাদের এমন মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। কী আর করা যাবে। কিন্তু সে যাই হোক, কাগজে হঠাৎ যেভাবে লিখেছে, তাতে কিন্তু গোটা ব্যাপারটা ভারী রহস্যজনক মনে হচ্ছে আমার।

—তাই! কথা বলতে-বলতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ডোনা, কেমন অস্পষ্ট, জড়ানো গলায় বলল, আমারও কিন্তু অদ্ভুত লাগছে। হঠাৎ কী এমন শত্রুতার সৃষ্টি হল অধ্যাপক-সমিতির মিটিঙে যে, বলতে-বলতে থেমে গেল, তার পর হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, এতদিন জানতাম, স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নির্বাচনে মারামারি-খুনোখুনি হয়। এখন তাহলে সে অভ্যেসটা অধ্যাপক-সমিতির নির্বাচনেও সংক্রামিত হল!

গার্গী ঘাড় নেড়ে বলল, কাগজে লিখেছে বলেই সেটা সত্যি হবে তার কোনও মানে নেই। একটা উড়ো ফোনের খবরে নির্ভর করে সাংবাদিক একটা মোটিভ তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে যদি আমল দিতে হয় তাহলে জানা দরকার, অধ্যাপক সমিতির কোন-কোন মেম্বার ফাংশনের কার্ড পেয়েছিলেন সেদিন।

ডোনা ঠোঁট উলটে বলল, সে কি আর এক মুহূর্তে বলা যায়! আমাদের ডিপার্টমেন্টের সব ছাত্রীকেই কিছু-কিছু করে কার্ড বিলি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, তাতে কে কাকে কার্ড দিয়েছে, তা তো আর লেখাজোখা নেই। তাছাড়া একজনের কার্ড নিয়ে অন্য কেউ আসতে পারে।

গার্গী চিন্তিত হয়ে বলল, তাহলে কী করা যায়?

ডোনা গার্গীর মুখচোখ দেখে হেসে ফেলল হঠাৎ, কী ব্যাপার, তুই কি এই ব্যাপারটা নিয়েও কোনও আর্টিকেল লিখে ফেলতে চাস?

গার্গী আবার ঘাড় নাড়ল, না, তা নয়। কিন্তু চোখের সামনে এরকম মার্ডার কখনও দেখিনি তো। ঠিক কী পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ ধরনের মার্ডার করে তা জানতে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।

ডোনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বিষণ্ণ, জড়ানো গলায় বলল, জানিস, আমার ভীষণ ভয় করছে—।

গার্গী অবাক হল, কেন?

—আমার বাবাকে কয়েকদিন ধরে দেখছিলাম, শিহরনদার ব্যাপারে ভীষণ টেনশনে ছিলেন। শিহরনদা যে এ-বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হয়ে আছেন, মায়ের সঙ্গে আমার সঙ্গে যে এত খোলামেলাভাবে মেশেন তা যেন বাবা একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তার ওপর হঠাৎ এই বয়েসে কেনই বা একটা পিস্তল কিনে তার লাইসেন্স করালেন, কেনই বা সেটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার কিছু মাথায় ঢুকছে না আমার। মা বললেন, ফাংশনে যাওয়ার আগে কী একটা টেলিফোন পেতে

ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন বাবা। পুলিশ-ইনস্পেকটরের কথাবার্তা শুনে মনে হল, বাবাকেই এই মার্ডারের ব্যাপারে সন্দেহ করছে।

গার্গীও কিছুক্ষণের জন্য থম মেরে গেল। হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করল, তোর বাবাকে কি তোর সন্দেহ হয়?

ডোনা সজোরে ঘাড় নাড়াতে-নাড়াতে বলল, না, হয় না। আমার বাবা ভীষণ রাগি। রেগে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তাই বলে আমার বাবা শিহরনদাকে খুন করবেন---, বলতে-বলতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ডোনা।

গার্গী তৎক্ষণাৎ তাকে সান্ত্বনা দিতে বসল, শুধু-শুধু মন খারাপ করে লাভ নেই, ডোনা। বরং গোটা ব্যাপারটা ভালো করে খোঁজ খবর নিই। সেদিন শিহরনদা যখন ফাংশন দেখতে ঢুকেছিলেন। তুই তাঁকে দেখেছিলি?

—আমি কী করে দেখব। শুনলাম, উনি এসেছিলেন শো আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে। তখন তো আমি গ্রিনরুমে।

গার্গী কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল, তারপর হঠাৎ বলল, আচ্ছা, অধ্যাপক-সমিতির ব্যাপারে নিশ্চয় এম. আর খোঁজখবর রাখবেন?—হ্যাঁ, তা হয় তো রাখবেন।

—শিহরনদা যেখানে বসেছিলেন সেদিন, তার কাছাকাছি মণীশ রায়ও ছিলেন কিন্তু। হয়তো এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে কিছু জানা যেতে পারে। শিহরনদার আশেপাশে অধ্যাপক-সমিতির আর কে-কে বসেছিলেন, তাও হয়তো বলতে পারবেন।

ডোনা ঘাড় নাড়ল, ঠিক বলেছিস।---তা হলে আমি একবার এম. আর.-এর বাড়ি হানা দিচ্ছি দেখা যাক, কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় কিনা। বলে ডোনাদের যোধপুর পার্কের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গার্গী এসে দাঁড়াল বাসস্টপে। নাকতলা যদিও এখান থেকে তেমন দূরে নয়, তবু দক্ষিণ কলকাতার এই দুটো পল্লী বাসে যাওয়ার দূরত্ব হিসেবে অনেকটা। অন্তত দুটো বাসে না চড়লে কোনওভাবেই পৌঁছনো যাবে না মণীশ রায়ের বাড়ি। লেগেও গেল প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার ওপর। বাস থেকে নাকতলার স্টপে নেমে বাঁ-দিকের একটা লেন ধরে কিছু দূর এগোতেই ডানদিকে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাড়ির গেটে একটা ফুলন্ত মাধবীলতার আর্চ। আর্চ ছাড়িয়ে তার ডালপালা দোতলার ছাদ অভিমুখে ধাবিত। গেটের মুখে পৌঁছতেই মিষ্টি গন্ধটা গার্গীর নাকে চারিয়ে যেতেই কেমন রোমাঞ্চিত হল তার শরীর।

কিন্তু কলিংবেলে হাত দিতেই সেই রোমাঞ্চ কেটে গিয়ে তার শরীর জুড়ে দপদপ করে উঠল এক ধরনের অস্বস্তি। মিনিটখানেকের মধ্যে দরজা খুলে দাঁড়ালেন ঈষিতাদি। খুবই সুন্দরী যুবতী। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর ফরসা মুখখানা কেমন যেন শোকাহত। গার্গীকে দেখে অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করলেন কী চাই?

গার্গী তৎক্ষণাৎ বেশ আড়ষ্ট হল, এম. আর-এর সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল ঈষিতাদিকে, তবু গার্গীকে পরখ করলেন বেশ কড়া দৃষ্টিতে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গার্গীকে দেখে মোটেই খুশি হননি মহিলা। অবশ্য না হওয়ারই কথা। নিশ্চয়ই গার্গীকে তিনি ভেবেছেন মণীশ রায়ের অজস্র ফ্যানদের একজন। একটু পরে দরজা ছেড়ে দিয়ে বললেন, এম. আর. ওপরে আছেন।

পরনে ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি, মণীশ রায় তাঁর স্টাডিরুমে বসেছিলেন একটা ইংরাজি জার্নাল হাতে নিয়ে। বেশ রংচঙে পত্রিকাটি খুব সম্ভব এদেশি নয়। গার্গীকে হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকতে দেখে মৃদু হেসে বললেন, এসো। তোমার প্রশ্নের ঝুলি নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে এসেছ?

গার্গী লক্ষ করছিল, শিহরন রায়চৌধুরির মৃত্যুতে কতখানি শক পেয়েছেন মণীশ রায়। শিহরণ যে হঠাৎ করে মণীশ ঈষিতার সংসারে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তারপর দুজনের ওপর কীভাবে তাঁর

প্রভাব পড়েছিল তা গার্গী খুব খোলসা করে জানে না। কিছুটা তাঁদের অভিব্যক্তি দেখে, কিছুটা তাঁদের কথাবার্তা থেকে আঁচ করে নিতে হবে। মণীশের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে গার্গী সামান্য হাসল, স্যার, প্রশ্নের ঝুলি এনেছি ঠিকই, কিন্তু আমার এবারের টপিক অন্য।

—নতুন কোনও ফিচার লিখছ বুঝি?

—প্রায় সেরকমই, স্যার। তবে ফিচারটি ভারী মিস্টেরিয়াস। আজকের কাগজ পড়ে হঠাৎ কতকগুলো অদ্ভুত প্রশ্ন মগজে উদয় হয়েছে। সে ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করব।

মণীশ রায় ঠিক বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞাসুচোখে তাকালেন গার্গীর দিকে।

—স্যার, শিহরনদার ব্যাপারে কতকগুলো কথা জানতে চাই। আপনি যতটুকু জানেন, যদি আমাকে বলেন—

মণীশ রায় অবাক হয়ে বললেন, তুমি কি পুলিশে জয়েন করেছ নাকি?

—না স্যার, গার্গী হাসল, জাস্ট ফর কিউরিওসিটি। আজকের কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়, অধ্যাপক সমিতির মিটিঙে কী সব ঝামেলা হয়েছিল সেদিন। তারই জেরে শিহরনদা খুন হয়েছেন, এরকম সন্দেহ করা হয়েছে খবরে। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন?

মণীশ রায় হঠাৎ বেশ সতর্ক হয়ে গেলেন যেন, বললেন, আমি তো সেদিন মিটিঙে যাইনি। ফলে একজ্যাক্টলি কী ঘটেছিল তা বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে যেটুকু জানি, অধ্যাপকদের মধ্যে দুটো দল ইদানীং বৈরী হয়ে উঠেছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে। আর শিহরন তো বরাবরই এসব ব্যাপারে ভীষণ একরোখা।

গার্গী জিজ্ঞাসু হল, একরোখা?

—হ্যাঁ। আসলে শিহরনের অ্যাটাকের ধরন বরাবরই খুব সাংঘাতিক। ছাত্রজীবনে ও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল বিপ্লবি আন্দোলনের সঙ্গে। সভা সমিতিতে বেশ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিত বরাবর। ক্যাডাররা খুবই উদ্বুদ্ধ হত ওর ভাষণে। অনেক মিটিঙে ওকে নিয়ে যেত শুধু বক্তৃতা ভালো দিতে পারত বলেই। সেই টেম্পারামেন্টের কিছুটা বেশ এখনও ওর বক্তৃতার মধ্যে আছে তা নিশ্চয়ই এতদিনে তোমরাও জেনেছ। তাতে এখনকার বিরোধীপক্ষও মনে-মনে শত্রু হয়ে গিয়েছিল ওর।

—ওঁর বিরোধীপক্ষের কাউকে আপনি চেনেন?

কিছুটা ইতস্তত করে মণীশ রায় বললেন, আছেন তো অনেকেই। আলাদা করে কার আর নাম বলব? তবে একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ খটকা লেগেছে। হয়তো আমার অনুমান সত্যি নাও হতে পারে।

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, কীসের খটকা?

—তোমরা হয়তো জানো না, অধ্যাপক সমিতিতে এই যে রেষারেষি তার শিকড় নিহিত আছে আজ থেকে কুড়ি বছর আগের এক ঘটনায়।

গার্গী আরও অবাক হল, কুড়ি বছর?

—হ্যাঁ। শিহরণ আর রণজয় একই সঙ্গে পড়ত প্রেসিডেন্সিতে। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল একসঙ্গেই। কিছুকাল পর কোনও একটা ইস্যু নিয়ে গোলমাল বেধেছিল দুজনের মধ্যে। শিহরন বেরিয়ে আসে দল ছেড়ে। তারপর অবশ্য ও আর রাজনীতি করত না। এতকাল পর অধ্যাপক সমিতি করতে গিয়ে দুজনে যোগ দিয়েছিল দুই বিপরীত অ্যাসোসিয়েশনে।

—আপনি বলতে চাইছেন সেই পুরোনো ঝগড়ার জের হিসেবে?

—সম্ভবত। তবে ওদের মধ্যে বৈরিতার আরও একটা গূঢ় কারণ ছিল! তুমি তো ডোনার মা বনানী চ্যাটার্জিকে চেনো?

গার্গী অবাক হয়ে বলল হ্যাঁ—।

—বনানীও ওদের ক্লাসমেট ছিল। তখন অসাধারণ সুন্দরী হিসেবে বনানীর খ্যাতি ছড়িয়ে

পড়েছিল অনেক দূর। সেসময় খুবই আশ্চর্যের কথা, রণজয় আর শিহরন, দুজনে একই সঙ্গে বনানীর প্রেমে পড়েছিল। .

—তাই! এরকম ভীষণ একটা আশ্চর্যের ঘটনা মণীশ রায়ের কাছ থেকে শুনতে পাবে তা গার্গী স্বপ্নেও ভাবেনি। তার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল, স্ট্রেঞ্জ। আপনিও কি তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন?

না, আমি ওদের কনটেম্পোরারি ছিলাম, কিন্তু পড়তাম অন্য কলেজে। আমি স্কটিশের ছাত্র। স্কটিশে পড়লেও আমরা সবাই তাকিয়ে থাকতাম প্রেসিডেন্সিতে কী হচ্ছে তা জানার জন্য। সে লেখাপড়া সম্পর্কিত কোনও ব্যাপারেই হোক, আর কোন মেয়ে সুন্দরী, কে কার প্রেমে পড়ল সে বিষয়েই হোক, অথবা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারেই হোক। আসলে প্রেসিডেন্সিকে চিরকালই একনম্বর বলে গণ্য করত সবাই। আজও বোধহয় তাই-ই করে।

গার্গী উৎসুক হয়ে বলল, তারপর?

—বনানী তখন দুজনের সঙ্গেই একটা রিলেশন রেখে চলত। তারপর কলেজের পড়া শেষ হতে রণজয় চলে এল কমপ্যারেটিভ লিটারেচার পড়তে, আর শিহরন ভরতি হল ইংরেজি নিয়ে।

—সে সময় আপনি নিশ্চয়ই আর. ডি.-র সহপাঠী ছিলেন?

—হ্যাঁ, রণজয় আর আমি একই সঙ্গে পড়তাম। কমপ্যারেটিভ লিটারেচার নিয়ে, তবে রণজয় আমাকে মণীশদা বলত। সেসময় বনানী কী কারণে যেন আমার গুণগ্রাহী হয়ে পড়ে, তবে রণজয়ের সঙ্গে তার আর কোনও রিলেশন ছিল না।

—আর শিহরনদার সঙ্গে?

মণীশ রায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, শিহরনের সঙ্গে বনানীর একটা সম্পর্ক বরাবর থেকেই গিয়েছিল।

—তাহলে শেষ পর্যন্ত চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে হঠাৎ বিয়ে করলেন কেন উনি?

—সে অনেক ঘটনা। সবটা তোমার না জানলেও চলবে। হঠাৎ কেন যে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে পাত্র হিসেবে পছন্দ করেছিল বনানী, তা তখন কলকাতার অনেক মহলে দারুণ একটা আলোচনার বিষয় ছিল। চিত্রদীপ চ্যাটার্জি বরাবর একটু খ্যাপা ধরনের। যাই হোক, তার সঙ্গে বিয়ের এতকাল পর হঠাৎ শিহরন বনানীর বাড়িতে এসে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকছে জেনে আমরা কম অবাক হইনি। তাতে রণজয় হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলা যায়, আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল যেন।

—সেই জন্যে কি আপনাদের সেমিনারের দিন শিহরনদা হঠাৎ আগ বাড়িয়ে রণজয় দত্তের আর্টিকেলটির অমন নির্মম সমালোচনা করেছিলেন।

মণীশ রায় আবার একটু থমকালেন, হয়তো তা-ই। তবে অধ্যাপক সমিতির নির্বাচন নিয়ে ক্রমশ চূড়ান্ত শত্রুতা তৈরি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সেমিনারে বক্তৃতা সে কারণেও করে থাকতে পারে শিহরন।

গার্গী এবার স্পষ্ট চোখে তাকাল মণীশ রায়ের দিকে, তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, শিহরণদার হত্যার ব্যাপারে আর.ডি-র কোনও ভূমিকা আছে?

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মণীশ রায় এবার বললেন, রণজয়কে আমার কিছুটা সন্দেহ হয়—

ক্রমশ আশ্চর্য হচ্ছিল গার্গী। মণীশ রায় যে সরাসরি এভাবে রণজয় দত্তর নাম বলবেন তা সে ভাবতেই পারেনি। রহস্যের মোড়ক আঁট হয়ে উঠেছে যেন ক্রমে। কী যেন ভেবে হঠাৎ বলল, কিন্তু আর. ডি. তো সেদিন ফাংশন দেখতেই যাননি শুনলাম।

—কে বলল আসেনি? সেকেন্ড কিংবা থার্ড রোয়ের চেয়ারে বসেছিল রণজয়। তারপর ফাংশন শেষ হওয়ার সময় গন্ডগোলের মধ্যে দেখি, দ্রুত হল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—।

—তাই? গার্গীর ভুরুতে একটা ভাঁজ ঘনিয়ে এল স্বাভাবিকভাবে।

—শুধু তাই নয়। এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, অথচ রণজয়কে তারপর ওখানে আর দেখাই গেল না। সেইটেই আমার কাছে ভারী আশ্চর্য লাগছে—।

মণীশ রায়ের কথা শেষ না হতেই গার্গী হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করল, স্যার পরশুর আগের দিন, অর্থাৎ শিহরনদা যেদিন খুন হন, তার আগের দিন সন্ধের পর শিহরনদা বোধহয় এসেছিলেন আপনাদের বাড়িতে?

প্রসঙ্গ হঠাৎ ঘুরে যেতে প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেলেন মণীশ রায়। পরক্ষণে বললেন, হ্যাঁ, এসেছিল—।

—হঠাৎ খড়্গাপুর থেকে ফিরেই শিহরণদা কেন এসেছিলেন এখানে, তা একটু বলবেন?

মুহূর্তে মণীশ রায়ের মুখখানা শক্ত হয়ে গেল, বোধহয় ঈষিতার সঙ্গে কোনও দরকার ছিল।

—ও, গার্গীই এবার যেন থমকে গেল, আপনার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি?

—হ্যাঁ, হয়েছিল। খড়্গাপুরে গিয়ে নাকি একটা দারুণ রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা-ই শোনাল সাতকাহন করে।

গার্গী আশ্চর্য হল, কী রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা।

—বলল, যার সঙ্গে খড়্গাপুরে গিয়েছিল সে লোকটা এমন থার্ড ক্লাস তা আগে বুঝতে পারেনি।

—সে কী, কেন?

—সে লোকটা নাকি খড়্গাপুরের একজন ব্যবসায়ীর কাছে পাঁচ লাখ টাকার অর্ডার দিয়েছিল। অ্যাডভান্স করেছিল একলাখের মতন? কিন্তু লোকটা মালও দেয়নি, অ্যাডভান্সও ফেরত দিচ্ছিল না। তাই শিহরনকে নিয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা সেটল করতে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু ব্যাবসায়ীর সঙ্গে যখন কথাবার্তা চলছে, তখন সেই মিঃ বোস নাকি শিহরনকে বলে বসল, এ ধরনের কথাবার্তা আপনি বলবেন জানলে আপনাকে নিয়ে আসতাম না—।

—তাই নাকি? শিহরনদা কিছু খারাপ কথা বলেছিলেন নাকি ব্যাবসায়ীকে?

—হ্যাঁ, বলল, এ ধরনের চাপ না দিলে তো টাকা আদায় করা যাবে না। কিন্তু মিঃ বোস যে ও ধরনের কথা বলবেন তা ভাবতেই পারেনি শিহরন। ফেরার পথে গাড়িতে নাকি খুব ঝগড়া হয়েছে।

গার্গী আরও আশ্চর্য হয়, কী ধরনের ঝগড়া তা কি আপনাকে বলেছিলেন?

—তা বলেনি, তবে বলল, লোকটা ফ্রড। যে টাকা নিয়ে ফুটানি মারছে তা নাকি নিজের নয়।

—স্ট্রেঞ্জ! আর কিছু বলেছিলেন?

—না।

এবার গার্গী আসল কথায় চলে এল। অনেকক্ষণ ইতস্তত করছিল কথাটা কীভাবে পাড়বে এই ভেবে, এতক্ষণে বলতে পারল, স্যার, শিহরনদা সেদিন সন্ধেয় যখন এখানে এসেছিলেন, তাঁর কাছে কি একটা পিস্তল ছিল?

—পিস্তল। মণীশ রায় প্রথমে যেন আকাশ থেকে পড়লেন, তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনভাবে বললেন, ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, একবার দেখিয়েছিল বটে। বলেছিল, খড়গপুরে দরকার হতে পারে এই মনে করে নিয়ে গিয়েছিল।

—পিস্তলটা কি উনি আপনার বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন?

—ফেলে! মণীশ রায় খুবই অবাক হলেন, কই না তো! সঙ্গে-সঙ্গে তো কোমরে গুঁজেছিল। পাঞ্জাবির নীচে ধুতির সঙ্গে আটকে রাখা ছিল ওটা।

—পিস্তলটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, স্যার।

—তাই নাকি?

—শিহরনদা ডোনার মাকে বলেছিলেন, উনি কারও বাড়িতে ভুলে ফেলে এসেছেন।

মণীশ রায় তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, না-না, এখানে মোটেই পিস্তল ফেলে যায়নি। নিজেই কোথাও রেখেছে ভুলে। কিংবা হয়তো কোথাও রেখেছিল, যাতে পরে কাজে লাগানো যায়। ওর তো অনেক গুণ, বলতে-বলতে আবার শক্ত হয়ে গেল মণীশ রায়ের মুখ। এতক্ষণ যেন একটা রাগ চাপা ছিল ভেতরে, হঠাৎ তা প্রকাশ হয়ে পড়ল গার্গীর সামনেই।

—গুণ! যেন কথাটা বুঝতে পারেনি এমনভাবে জিজ্ঞাসা করল গার্গী।

রাগটা আর চেপে রাখতে পারলেন না মণীশ রায়, বললেন, মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করে বেড়ানোটাই তো ওর নেশা ছিল কি না—।

মণীশ রায়ের রাগের কারণ অবশ্য বুঝতেই পেরে গিয়েছিল গার্গী। শিহরন রায়চৌধুরি আজকাল ঘন-ঘন কেন আসতেন এ-বাড়ি তা তার অজানা নয়। মণীশ রায়ও নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই আক্রোশে ফুঁসছিলেন ভেতরে-ভেতরে। হঠাৎ তার বহিঃপ্রকাশ হয়ে যেতে হাসি পাচ্ছিল গার্গীর। মণীশ রায় নিজেও যে এই অদ্ভুত নেশায় আক্রান্ত তা নিশ্চয় এ সময় ভুলে গিয়ে থাকবেন। তাঁর নেশাটি এখন বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে তাঁরই সংসারে।

মণীশ রায়কে আর বেশি ঘাঁটিয়ে কাজ নেই বুঝতে পেরে গার্গী চট করে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে।

—ঠিক আছে, স্যার, আজ চললাম, বলেই ঘাড় ফেরাতেই দেখল স্টাডিরুমের জানালার ওপাশে এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঈষিতাদি। তাঁর মুখ গম্ভীর, দু'চোখ এক অদ্ভুত ক্রুরভঙ্গি। দৃশ্যটি নজরে পড়তে খুবই অবাক হল গার্গী। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন ঈষিতাদি! মণীশ রায়ের সঙ্গে তার কথোপকথন শুনছিলেন গোপনে! ছাত্রীরা তাদের অধ্যাপকের সঙ্গে কীভাবে প্রেম করে তা শুনতেই আড়ি পেতেছিলেন!

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে-ভাবতে গার্গী দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। দরজা খুলে বেরুতে যাবে, হঠাৎ পেছন থেকে নারী কণ্ঠে 'শোনো' শুনতেই থমকে দাঁড়াল অবাক হয়ে। তার পিছু-পিছু নেমে এসেছেন ঈষিতাদিও। গার্গী ঘুরে দাঁড়াতেই ফিসফিস করে, কিন্তু বেশ রাগতভাবেই ফুঁসে উঠলেন মণীশ রায়ের যুবতী স্ত্রী, উনি যা বলেছেন, সব কিন্তু মিথ্যে কথা।

এতক্ষণ যতটা চমকে উঠছিল, গার্গী তার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে গেল ঈষিতাদির কথা শুনে। অনুচ্চকণ্ঠে বলল, কোনটা মিথ্যে কথা?

—ওই যে, তোমাদের আর. ডি. সম্পর্কে যা-যা বললেন। আমিও তো মাত্র ক'বছর আগে আর. ডি.-র ছাত্রী ছিলাম। উনি আর যাই হোন, মানুষ খুন করতে যাবেন না।

—সে কথা আপনি কী করে জানলেন?

তেমনই ফিসফিস করে ঈষিতাদি বললেন, আমি জানি। তোমাদের এম. আর. এখন নিজেকে আড়াল করার জন্য সমস্ত দোষ আর. ডি.-র ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।

—নিজেকে আড়াল করতে? বিস্ময়ে গার্গীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেতে চাইছে যেন।

—তা ছাড়া আবার কী। তোমাদের শিহরনদাকে সন্দেহ করতেন উনি। আমাদের বাড়ি আসাটা একেবারেই পছন্দ করছিলেন না। আমি ইচ্ছে করেই ওঁর সঙ্গে মেলামেশাটা বাড়িয়ে দিলাম তোমাদের এম. আর. কে উচিত শিক্ষা দিতে। নিজে সারাক্ষণ মেয়েপরিবৃত হয়ে থাকবেন, আর আমি কারও সঙ্গে হেসে কথা বললেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল!

গার্গী লক্ষ করছিল ঈষিতাদির ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মুখখানা। রাগে লাল হয়ে উঠেছে পানপাতা ছাঁদের ফরসা মুখমণ্ডল। বড়-বড় নিশ্বাসে উঠছে-পড়ছে তাঁর ভারী বুক। অনেকদিনের জমে থাকা ক্রোধ হঠাৎ হুড়মুড় করে তাঁরও বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। গার্গী এই সুযোগটা

ছাড়তে চাইল না। তক্ষুনি গলা যথাসম্ভব নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনি জানেন, শিহরনদা সেদিন রাতের বেলা একটা পিস্তল এ-বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন কিনা?

ঈষিতাদি ঘাড় নাড়লেন, আমি দেখেছি পিস্তলটা।

গার্গীর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল, কোথায় সেটা?

—উনি তো শিহরনদার কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন সেদিন। জিজ্ঞাসা করছিলেন, কীভাবে চালাতে হয় পিস্তলটা। শিহরনদা দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে গুলি ভরতে হয়, কীভাবে ট্রিগার টিপতে হয়, লক্ষ্যবস্তু কোথায় থাকলে নলের মুখ কোথায় থাকবে—।

—তাহলে শিহরনদা এ-বাড়িতেই রেখে গিয়েছিলেন পিস্তলটা?

—আমার তো তাই মনে হয়। নইলে উনি পিস্তল কোথায় পেলেন?

গার্গী প্রবল আশ্চর্য হয়ে ঈষিতাদির মুখের দিকে ভালো করে দেখল। ঈষিতাদি যেন ধরেই নিয়েছেন মণীশ রায়ই এই খুনটা করেছেন। কিন্তু সে-কথা কেন হুড়মুড় করে গার্গীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন, তা ভেবে বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না তার। তার মানে শিহরনদা খুন হতে ঈষিতাদি এতটাই শক্‌ড হয়েছেন যে, মণীশ রায়কে খুনি সাব্যস্ত করতেও এতটুকু দ্বিধা করছেন না। গার্গী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করল, পিস্তলটা নিশ্চয় তাহলে এ-বাড়িতেই আছে?

ঈষিতাদি ঘাড় নাড়লেন, না, তারপর থেকে আমি আর পিস্তলটা দেখতে পাইনি। কাল সারাদিন খুঁজেছি ঘরে—।

—ও, গার্গী কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু হেসে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

॥ ২২ ॥

বাড়ি ফিরে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর প্রথমেই যে কথাটা মনে হল গার্গীর তা হল, সকালে মণীশ রায় উত্তেজনার বশে কিছু কথা বলে, কিছু কথা না বলে যে রহস্যটুকু চারিয়ে দিয়েছেন তার মনে, তার যদি কিনারা করতে হয়, তাহলে অধ্যাপক রণজয় দত্তর সঙ্গে গার্গীর কিছুক্ষণ বসা দরকার। রণজয় দত্তর সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ডোনা। সে আলাপ-পর্বটি অবশ্যই খুব সুখের ছিল না, কারণ ডোনা তার স্বভাবসিদ্ধ চটুলতায় হাসি-হাসি মুখে আর. ডি.-কে বলেছিল, গার্গী অপেক্ষা করছে এম. আর.-এর জন্য। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির ওপর একখানা বই নেবে বলে। কথাটা শুনেই শক্ত হয়ে গিয়েছিল রণজয় দত্তর ভারী, গোলগাল মুখখানা। এখন গার্গী যদি হঠাৎ গিয়ে রণজয় দত্ত সমীপে হাজির হয়, কীভাবে যে তাকে অভ্যর্থনা করবেন আর. ডি. তা কে জানে!

তবু এবম্বিধ কিছু দ্বিধায় আন্দোলিত হয়ে গার্গী দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়ল রণজয় দত্তর উদ্দেশে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরস রুমে থাকার কথা তাঁর। একই ঘরে বসেন মণীশ রায়, অতএব তাঁর নজর এড়িয়ে কীভাবে রণজয় দত্তর সঙ্গে কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসা যায় এমন ভাবতে-ভাবতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছে প্রফেসরস রুমে উঁকি দিল গার্গী। কিন্তু না, ঘরে আজ প্রায় কেউই নেই। খবর নিয়ে জানল, কী একটা জরুরি ব্যাপারে হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সব অধ্যাপকদের মিটিং চলছে কনফারেন্স রুমে। অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কারোর দেখা পাওয়া ভার।

সামান্য বিমর্ষ মুখে গার্গী যখন লম্বা করিডোরে মিনিট পনেরো পায়চারি করেও ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, কীভাবে বাকি সময়টা কাটাবে, সেই মুহূর্তে সে দেখা পেয়ে গেল যাকে খুঁজছিল সেই আর. ডি.-র। বোধহয় কনফারেন্স রুম থেকেই আসছেন হন্তদন্ত হয়ে। মুখে সামান্য বিরক্তির আভাস। হয়তো মিটিং থেকেই কোনও কারণে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

সে যাই হোক, গার্গী তার প্রার্থিত ব্যক্তিকে হঠাৎ পেয়ে যেতে যেমন খুশিও হল, তেমনই

দ্বিধান্বিত হল এই ভেবে, এহেন রাগত একজন লোককে এখন কীভাবে প্রশ্নগুলো করবে।

রণজয় দত্ত হনহন করে প্রফেসরস রুমে ঢুকে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসতেই সেদিকে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল গার্গী, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল—।

—আমার সঙ্গে। রণজয় দত্ত, বলাই বাহুল্য, ভারী আশ্চর্য হলেন। তাঁর অতিরিক্ত স্বাস্থ্য-ভালো চেহারাটা যে মোটেই তরুণী আকর্ষণকারী নয় তো বোধহয় এতকালে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

—হ্যাঁ, স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, আমার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রশ্নগুলো একেবারেই ব্যক্তিগত।

রণজয় দত্তর মুখ একটু গম্ভীর হল। হাতের ঘড়িতে চোখ রেখে বললেন, আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে। থানার ও. সি. ফোন করে জানিয়েছেন, উনি আমাকে ইন্টারোগেট করতে চান। কাগজে কী সব আলফাল রিপোর্ট বেরিয়েছে সেসব নিয়েই। হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্টকে ফোন করে জানিয়েছেন। আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই—।

কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটও পার হল না। গার্গী সবে মনে-মনে গুছিয়ে নিচ্ছিল নিজেকে কীভাবে শুরু করবে তার প্রশ্নগুচ্ছ, তার আগেই নীচে জিপ এসে থামার শব্দ, পরক্ষণেই প্রফেসরস রুমে এসে ঢুকলেন পুলিশ-ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র। দৈর্ঘে ততটা উচ্চ নন, কিন্তু বেশ স্টাউট চেহারা, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, তাতে ওঁর নিঁখুতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখখানায় ব্যক্তিত্বের ছাপ। রণজয় দত্ত সামান্য নিষ্প্রভ হয়ে বললেন, আসুন, মিঃ মিত্র।

আর. ডি.-র সামনে রাখা একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে তুষারশুভ্র মিত্র তাকালেন গার্গীর দিকে। তাঁর জিজ্ঞাসুচোখ দেখে সামাল দিলেন রণজয়, ও গার্গী, আমাদের এক ছাত্রী—

—ও, বলে তুষারশুভ্র মিত্র যেন তেমন আমল দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না গার্গীকে। রণজয় দত্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ দত্ত, আপনি নিশ্চয় জানেন, শিহরন রায়চৌধুরি নামে একজন অধ্যাপক খুন হয়েছেন আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে, এ ব্যাপারে আমরা তদন্ত করতে গিয়ে নানা রকম ক্লু পাচ্ছি একের পর এক। তার মধ্যে একটি তথ্য আমাদের নজর কেড়েছে। তা হল, আপনি আর শিহরন একসঙ্গে পড়াশুনা করতেন কলেজে। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে ছাত্র-আন্দোলন করেছেন, তারপর হঠাৎ কী কারণে আপনাদের মধ্যে বচসা হয়, তার জেরে শিহরন সরে আসেন আন্দোলনের পথ থেকে। সেসময় কী ধরনের মতভেদ হয়েছিল আপনাদের দুজনের মধ্যে, তা আমরা এখনও জানতে পারিনি। নিশ্চয় আপনিই একমাত্র জানেন—।

রণজয় দত্ত বেশ একরোখা, একটু জটিল ধরনের মানুষ, তবু পুলিশ ইনস্পেকটরের জেরার সামনে নার্ভাস হয়ে পড়লেন। একবার গার্গীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, দেখুন, সবাই জানে, আমাদের আন্দোলনের পথ খুব সহজ ছিল না। সেসময় আমাদের নেতৃত্বও ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছিলেন নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিতর্কে, এক-একজন এক-একরকম মত প্রকাশ করছিলেন আমাদের পার্টির বুলেটিনে, তাতে আমরা নীচুস্তরের ক্যাডাররাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম ক্রমশ। সেরকম একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে শিহরনের সঙ্গে আমার মতভেদ হয়। আসলে শিহরন ঠিক ডেডিকেটেড ছিল না। আমাদের মনে হচ্ছিল ও নিতান্তই অ্যামেচারিস্ট। শিহরনের বরাবরই একটু হিরোইজমের নেশা ছিল। আর সেই হিরো হওয়ার চেষ্টাটা ছিল শুধুমাত্র মেয়েদের চোখে একটা কেউকেটা হয়ে ওঠার অভিপ্রায়েই। পার্টিতে আসার কারণও ছিল তাই। অতএব তার যে অভিসন্ধি ছিল, তা পরিষ্কার হয়ে যেতেই ও নিজে থেকেই সরে যেতে চাইল পার্টি-লাইন থেকে।

তুষারশুভ্র মিত্রের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল, অভিসন্ধি পরিষ্কার হওয়া বলতে আপনি কী মিন করছেন?

রণজয় হাসলেন, আসলে আমাদের পার্টিতে বনানী নামে একটি মেয়ে ছিল যে সেসময়

খুবই সুন্দরী হিসেবে খ্যাত ছিল। তার নজরে পড়ার জন্যই শিহরন আমাদের পার্টিতে যোগ দেয়। তারপর যেই বনানীর চোখে ও হিরো হয়ে গেল, সেইমুহূর্তে নিছক একটা ফালতু কারণে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ও সরে গেল বনানীকে নিয়ে।

—বনানীকে নিয়ে! তুষারশুভ্র মিত্র যেন এ ব্যাপারটাও ঠিক বুঝতে পারলেন না।

—হ্যাঁ, রণজয় দত্ত এবার ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছেন নিজের বক্তব্যে, এতদিন কাউকে বলিনি, খুব একটা বেশি কেউ জানেও না ব্যাপারটা, তবে এখন যা পরিস্থিতি, তাতে বলা দরকার কথাগুলো। সেসময় শিহরন বনানীকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল। একসঙ্গে ছিলও মাস ছয়েকের মতো। কিন্তু বিয়েটা টেঁকেনি। হঠাৎই শিহরনকে অপছন্দ করতে শুরু করে বনানী করার কথাও, কারণ শিহরন, যাকে আপনারা বলেন উওম্যানাইজার, সেরকমই ছিল। বনানী ছাড়াও ওর আরও প্রেমিকা ছিল। তাদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়াত বনানীর সামনেই, অতএব—।

পুলিশ-ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র যতটা চমকে উঠলেন রণজয়ের কথায়, তার চেয়ে ঢের বেশি চমকে উঠল ওপাশে বসা গার্গী। এতবড় একটা ঘটনা সে এতদিন ডোনার সঙ্গে মিশেও জানতে পারেনি ভেবে ভারী অবাক লাগছে তার। কিংবা হয়তো এও হতে পারে ডোনাও জানে না ঘটনাটা।

পরক্ষণেই স্তম্ভিত তুষারশুভ্র মিত্র সেই প্রশ্নই করে বসলেন রণজয় দত্তকে, চিত্রদীপ কি জানেন, বনানী তাঁকে বিয়ে করার আগে শিহরনকে বিয়ে করেছিলেন?

রণজয় দত্ত ঘাড় নাড়লেন, সম্ভবত জানতেন না। তাহলে পরে শিহরন যখন তাঁর বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকতে এলেন, তখন নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। তা ছাড়া, রণজয় একটু ভেবে বললেন, ওদের বিয়েটা অনেক দিন গোপন করে রেখেছিল। রেজেস্ট্রি করার অন্তত একবছর পর দুজনে কলকাতার কোনও শহরতলির দুরূহ এলাকায় বাসাভাড়া নিয়ে থাকত। সে-খবর ওদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউই জানত না। তারপর কখন বনানী শিহরনের কাছ থেকে চলে এসে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে বিয়ে করল সে খবর আমি জানতাম না, জানার দরকারও বোধ করিনি তখন।

তুষারশুভ্র মিত্র এবার তাঁর হাতের ছোট্ট ডায়েরি খুলে কী সব দেখে নিলেন এক পলক। তারপর হঠাৎই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বনানীকে ভালোবাসতেন সেসময়?

রণজয় দত্ত মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেলেন, এক লহমা থেমে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, বনানী আমাদের পার্টিতে ছিল। খুব ডিভোটেড ওয়ার্কার, সেই হিসেবে তাকে পছন্দ করতাম—।

—পছন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমার যা খবর, আপনি তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু শিহরন আপনার কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। সেই ব্যর্থতা, সেই ক্রোধেই আপনি তুমুল ঝগড়া করেছিলেন শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গে। আপনার সুপারিশেই পার্টি থেকে এক্সপেল করা হয় তাকে, বলতে-বলতে রণজয় দত্তের দিকে বেশ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লেন পুলিশ ইনস্পেকটর, কী, ঠিক বলেছি কি না?

এহেন পুরোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে রণজয় দত্তও বেশ তেতে উঠেছিলেন। ইনস্পেকটর তাঁকে চার্জ করতেই হঠাৎ বেশ ক্রুদ্ধ দেখাল, তাঁকে, এসব মিথ্যে খবর আপনাকে কে দিল? শিহরন নিজেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, আমার চিন্তাভাবনা ভুল, আমি ভুলপথে চলেছি বলে নিজেই রিজাইন করে একদিন। আসলে, আগেই বলেছি, ঝগড়াটা একটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে সে পার্টি থেকে পালিয়ে যেতেই চেয়েছিল। কারণ পার্টি সে সময় খুব কঠিন পদক্ষেপ নিয়ে এগুবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাতে লাইফ রিস্ক ছিল। শিহরন সে রিস্ক নিতে চায়নি বলেই—

—চায়নি বলেই আপনি তাকে থ্রেট করেছিলেন, ইউ উইল হ্যাভ টু ফেস ইটস কনসিকোয়েন্সস, তাই না?

রণজয় দত্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর সংবিত ভেঙে বললেন, এত সব কথা

আপনাকে কে বলল?

তুষারশুভ্র মিত্র এতক্ষণে মুচকি হাসি হেসে বললেন, পুলিশের কানে সব খবরই চলে আসে, মিঃ দত্ত। শুধু তাই নয়, তারপর এই দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা শত্রুতা বজায় থেকেছে। সে শত্রুতা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে শিহরন রায়চৌধুরি অধ্যাপক সমিতিতে যোগ দেওয়ার পর। সমিতির মিটিঙে রীতিমতো লড়াই হত আপনাদের দুজনের মধ্যে। এমনকী শিহরনবাবু আপনাকে হেয় করার জন্য ক'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে তীব্রভাবে আক্রমণ করে আপনাকে। সেই আক্রমণের জের পড়েছে আপনার কেরিয়ারেও। রিডারের পোস্টে আপনার পরিবর্তে প্রমোশন পেয়েছেন মণীশ রায়।

রণজয় দত্তর চোখদুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন মণীশ রায়ের নাম শুনে। বললেন, তার মানে এই নয় যে, আমি শিহরনকে খুন করেছি। যদি আমার সেই মোটিভই থাকত, তাহলে শিহরন খুন হয়ে যেত আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। পার্টির সঙ্গে বিট্রে করায় তখন খুন হয়ে যেতে হয়েছিল অনেককেই। আমাদের পার্টির নির্দেশও ছিল তাই—।

পুলিশ ইনস্পেকটর খেয়াল করছিলেন রণজয় দত্তের অভিব্যক্তি, বললেন, শুধু পার্টির সঙ্গেই বিট্রে করেননি শিহরন, আপনার সঙ্গেও তো করেছিলেন। নইলে বনানী তো আপনারই ছিল সেসময়—

—উইল য়্যু প্লিজ স্টপ, ইনস্পেকটর, রণজয় দত্ত এবার স্থান-কাল ভুলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, পাস্ট ইজ পাস্ট। সেসব কথা তুলে শুধু-শুধু আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন না।

পুলিশ ইনস্পেকটর আবার মুচকি হাসলেন, তার মানে শিহরনের ওপর আপনি প্রবলভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন ভেতরে-ভেতরে?

—তার মানে এই নয় যে, আমি তাকে খুন করেছি। রণজয় আবার বললেন কথাটা।

—কিন্তু, পুলিশ ইনস্পেকটর আবার ঝুঁকে পড়লেন, সেদিন ফাংশনে আপনার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। শিহরন রায়চৌধুরি ড্যান্স-ড্রামাটির লেখক জানতে পেরে আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন, কেন, নাটক লেখার আর লোক পেল না ওরা? কার্ডও নাকি নিতে চাননি আপনি। তা সত্ত্বেও আপনি ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন। হত্যার মুহূর্তে শিহরন রায়চৌধুরির আশেপাশেই দেখা গিয়েছিল আপনাকে। তারপর উনি খুন হওয়ার পর আপনাকে আর দেখাও যায়নি। কেন বলতে পারেন, মিঃ দত্ত?

রণজয় দত্ত এবার যেন অবাক হলেন, ঠিক এজন্যই কি আপনাদের মনে হয়েছে, আমি তাকে খুন করতে পারি?

—আসলে বুঝলেন, হত্যাকারীর মোটিভ, তার চলাফেরা, হত্যার সময়ে তার অবস্থান, হত্যার পর তার প্রতিক্রিয়া, সব কিছুই খেয়াল রাখতে হয় আমাদের। আর আপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি মুভমেন্টই এত সন্দেহজনক ঠেকছে আমাদের কাছে—।

—বাহ চমৎকার বলেছেন, ইনস্পেকটর। এ ছাড়া শিহরনের আশেপাশে আর কাউকেই চোখে পড়ছে না আপনাদের?

তুষারশুভ্র মিত্র তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের সামনে, সতর্ক দৃষ্টি ফেলে বললেন, কার কথা বলতে চাইছেন আপনি?

—অনেকের কথাই। মণীশ রয়ের কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন কী করে! ঈবিত্রাকে নিয়ে ইদানীং শিহরন—তারপর চিত্রদীপ চ্যাটার্জির কথাই ভাবুন না। আপনি হয় তো জেনেছেন, শিহরণকে নিয়ে ইদানীং এক ঘোরতর পারিবারিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল ওঁদের বাড়িতে।

তুষারশুভ্র যেন ভালো করে জানেন না এমন ভঙ্গিতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, যেমন?

—চিত্রদীপ কখনও চাননি, শিহরন এ-বাড়িতে আর থাকুক। বনানীর ওপর চাপ সৃষ্টি

করছিলেন শিহরনকে চলে যেতে বলার জন্য। তার ওপর, তিনি সেদিনই জানতে পেরেছিলেন, বনানীর সঙ্গে আগে শিহরনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

—সে কথা আপনি কী করে জানলেন?

রণজয় দত্ত ইতস্তত করে বললেন, আমি জেনেছি ব্যাপারটা যে-করেই হোক।

পুলিশ ইন্সপেকটর দুম করে বলে উঠলেন, না কি ঘটনাটা আপনিই তাঁর কানে তুলেছেন, মিঃ দত্ত? শিহরন যে বনানীর কাছে এসে থাকছে, এটা বোধহয় আপনি একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই-ই আপনি ফোন করে সব জানিয়ে দিয়েছিলেন চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে?

রণজয় দত্ত প্রায় চুপসে গেলেন একলহমায়, একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, জানিয়েছিলাম। অধ্যাপক-সমিতির মিটিঙে ও এমন সব কথা আমাকে লক্ষ করে বলেছিল যে, তখনই মনে-মনে ঠিক করেছিলাম, ওর মুখোশ আমি খুলে দেব! সেদিন চিত্রদীপ ফোনে সব শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলেছিলেন, তাই নাকি? তারপরই ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

পুলিশ ইনস্পেকটর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু যেন চিন্তা করে নিলেন। তিনি কিছু বলার আগেই অবশ্য রণজয় দত্ত আবার বললেন, তা ছাড়া বনানী নিজেও শিহরনকে নিয়ে খুব শান্তিতে ছিল না। আমার সঙ্গে ফোনে কথা হত মাঝে-মাঝে। একদিন বলল, শিহরন ওর মেয়ে ডোনার সঙ্গেও একটা আনএথিক্যাল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। বনানী চেষ্টা করেও কাউকে নিবৃত্ত করতে পারছে না।

তুষারশুভ্র মিত্র ভুরু কুঁচকে বললেন, কীরকম সম্পর্ক বললেন?

—ওরা নাকি দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে যেত গাড়ি নিয়ে। ফিরত অনেক রাতে। মেয়ের মুখ দেখে বনানী সন্দেহ করত, ওদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও শুরু হয়েছে।

—মাই গড! পুলিশ ইনস্পেকটর বিড়বিড় করলেন মনে-মনে।

—বনানী নিজেও খুবই ফিউরিয়াস হয়েছিল ভেতরে-ভেতরে। আমার মনে হচ্ছিল, যে কোনওদিন আউটবার্স্ট হলেও হতে পারে।

—ঠিক আছে, মিঃ দত্ত, পুলিশ ইনস্পেকটর উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, তদন্তের প্রয়োজনে এর পরেও কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করতে হতে পারে। আপনি যতই অন্যদিকে আমাদের অ্যাটেনশান ডাইভার্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, আপনার ওপর কিন্তু আমাদের নজর থাকছে। ও. কে।

পুলিশ ইনস্পেকটর চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও বেশ গুম হয়ে রইলেন রণজয় দত্ত। হঠাৎ খেয়াল হল, এতক্ষণ স্ট্যাচুর মতো কাছেই বসে রয়েছে গার্গী। তার দিকে ফিরে হঠাৎ বললেন, তুমি কী যেন জিজ্ঞাসা করবে বলেছিলে?

গার্গী অবশ্য তার যা-যা জিজ্ঞাস্য তার উত্তর পেয়েই গিয়েছে এতক্ষণের প্রশ্নোত্তরের ভেতর। শুধু হেসে বলল, আপনি এখন খুবই ডিস্টার্বড আছেন, স্যার। আমি পরে কোনও এক সময় আসব।

॥ ২৩ ॥

বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে নামব-নামব করছে কলকাতার বুকে। ঠিক সেসময় গার্গী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে হাঁটতে-হাঁটতে ফিরছিল বড় রাস্তার মুখে। শিহরন হত্যার রহস্য ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে দেখে তার ভুরুতে মস্ত একটা ভাঁজ জাঁকিয়ে বসছিল। তার এই কুড়ি বছরের জীবনে এহেন চোরাঘূর্ণি কখনও ঘুলিয়ে ওঠেনি। ওঠেনি বলেই ঘটনাটার গভীরে ঢুকতে-ঢুকতে এক গভীর গভীরতর বিস্ময়ে আবর্তিত হচ্ছিল ক্রমশ। পুলিশ ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র নিশ্চয়ই সে-রহস্য

উদ্ধার করার চেষ্টায় তাঁর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি গার্গী এক নিদারুণ সন্ধিৎসায় এক ঠেক থেকে আর এক ঠেকে ঘুরপাক খাচ্ছে নিজের খেয়ালে।

শিহরন খুনের ঠিক দুদিন আগে ডোনার প্রেমিক মন্দারকে নার্সিংহোমে দেখতে গিয়ে শুনেছিল তাকেও নাকি কোনও অদৃশ্য-ঘাতক টেলিফোনে হুমকি দিয়ে বলেছে একবার টার্গেট মিস করেছি বলে বারবার মিস হবে না। হাসপাতাল থেকে বেরুলেই তোমার মৃত্যু। বেচারি ভয়ে নাকি নার্সিংহোম থেকে বেরুতেই সাহস পাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল, তাকেই বা কে শাসানি দিতে পারে এভাবে! শিহরন খুনের সঙ্গে মন্দারকে এই হুমকির কি কোনও আপাত সাযুজ্য আছে! দুজনের মধ্যে অবশ্য একজন কমন ফ্যাক্টর আছে, সে হল ডোনা। মন্দারও ডোনার প্রেমিক।

যতদূর মনে হচ্ছে শিহরনদার খপ্পরেও পা দিয়েছিল ডোনা, সেক্ষেত্রে ডোনার জীবনে তৃতীয় কোনও পুরুষ কি আবির্ভূত হয়েছে! সেদিন ডোনাকে সেভাবেই প্রশ্ন করাতে সে ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, কী জানি, সে চাইছে ঠিক বুঝতে পারছি না। তার ইতস্তত ভঙ্গিমার রকম দেখে মনে হয়েছিল ডোনা লুকোতে চাইছে কিছু? কিন্তু কাকে লুকোতে চাইছে ডোনা! কেনই বা! পরে অবশ্য বলেছিল, অলর্ক বোসকে সন্দেহ করছে। অলর্ক বোসকে নিয়েও অবশ্য তার নানান চিন্তা। হরিশংকর চৌধুরি লোকটা হঠাৎ খুন হয়ে গেল কেন, কেনই বা তার লাশ পাওয়া গেল অলর্ক বোসের বাড়ির ঠিক কাছেই। হরিশংকর চৌধুরির অভিযোগ ছিল, গীরভঙ্গপুরের রানিমার খুনি এখন দাড়ি কামিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে কখনও অলর্ক বোসের বাড়ির কাছে, কখনও তার অফিসেও। প্রশ্ন হল, তাহলে সে লোকটাই বা কে! সে কি সত্যিই অলর্ক বোসের নিজস্ব কোনও লোক, যাকে সে এইসব কাজের জন্য মাইনে দিয়ে রেখেছে! হরিশংকর চৌধুরিকে কি তাকে দিয়েই খুন করিয়েছে অলর্ক বোস! তাহলে অলর্ক বোসকেই বা হুমকি দিচ্ছে কে!

এমন নানান ভাবনায় আবর্তিত হতে-হতে ডোনা উঠে পড়ল এমন একটা বাসে, যা তাকে নিয়ে গেল রডন স্ট্রিটের কাছাকাছি। রডন স্ট্রিটের একটা নার্সিংহোমে কয়েকদিন ধরে ভরতি আছে মন্দার। দিনকয়েক আগে যখন ডোনার সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল মন্দারকে, কথা দিয়ে এসেছিল আর একবার দেখতে যাবে। ডোনাকে নিয়েই অবশ্য আসা উচিত ছিল তার, ডোনাকে বললে হয়তো, আসতও কিন্তু কেন যেন গার্গীর মনে হল, মন্দারের সঙ্গে কিছুক্ষণ একা কথা বলা দরকার, এবং আজই।

'হোয়াইট ঈগল' নার্সিংহোমের দোতলার কেবিনটিতে পরদা সরাতেই কিন্তু ভারী হতাশ হল গার্গী। ঘরে কেউই নেই। কেবিনের বেডটিতে অবশ্য ধবধবে চাদর পাতা, পাশের স্টিলফ্রেমের হোয়াটনটটিতে ওষুধ, হরলিকস ও অন্যান্য সরঞ্জাম সবই ঠিকঠাক আছে, যেমনটি ছিল সেদিন, কিন্তু পেশেন্টই নেই। না কি এ ক'দিনের মধ্যে রিলিজ হয়ে গেল মন্দার।

কাছেই সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন নার্সকে দেখতে পেয়ে সেদিকে দ্রুত এগিয়ে গেল গার্গী, শুনুন—।

নার্স দাঁড়াতেই গার্গী জিজ্ঞাসা করল, এই কেবিনে মন্দার মিত্র নামে একজন পেশেন্ট ছিলেন।

—উনি একটু বেরিয়েছেন। বলে গেছেন সাড়ে ছ'টার মধ্যেই ফিরবেন।

—বেরিয়ে গেছেন? গার্গী অবাক তো হলই, ভুরু কুঁচকে এও ভাবল, নার্সিংহোমটা বাড়ি নাকি যে, হঠাৎ কেবিন ছেড়ে বেরুনো যায়।

নার্স মেয়েটির তাড়া ছিল, মৃদু হেসে বলল, না, মানে ওঁর ইনজুরি তো প্রায় সেরে এসেছে, ডাক্তার ছেড়ে দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই দু-একদিন ওভারস্টে করছেন মিঃ মিত্র। হয়তো দু-তিনদিনের মধ্যেই রিলিজ পাবেন। আজ ডাক্তারকে অনেক করে রিকোয়েস্ট করলেন, কোথায় একটা টেন্ডার না কী আছে, একবার দু-ঘণ্টার জন্যে যেতেই হবে তাঁকে, তাই-ই—।

—টেন্ডার! গার্গীর মুখে একটা হাসি ঢেউ খেলে মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। ডোনা একদিন

বলেছিল, মন্দার টেন্ডার ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ডোনা কবে যেন তাকে কৌতুক করে বলেছিল, মন্দার মিত্রের নাম হওয়া উচিত টেন্ডার মিত্র। ভাবতে-ভাবতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল গার্গী, ছ'টা কুড়ি, অর্থাৎ আরও দশ মিনিট পরে টেন্ডার মিত্রের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এই দশ মিনিট মন্দারের জন্য অপেক্ষা করা যায়। এতদূর যখন এসেছে—।

কেবিনের বেডটির ওপর ছড়ানো-ছিটোনো কিছু কাগজপত্র, সম্ভবত অফিসেরই। বালিশের পাশে একটা মাঝারি আকারের নীল ডায়েরি, একটা টর্চ, কিছু কাগজ। কাগজপত্রগুলোর দিকে একলহমা ঝুঁকে পড়তেই একটা হাসির টুকরো আলোছায়া খেলে গেল গার্গীর মুখে। কাগজগুলো টেন্ডারেরই।

তারপর হঠাৎ কী খেয়াল হতে নীল ডায়েরিটি তুলে নিল হাতে। তেমন কিছু অবশ্য লেখা নেই ডায়েরিটায়। মাঝেমধ্যে কিছু হিসেব লেখা, টাকা পয়সার ডিটেইলস। কোথাও এক আধ লাইন নোট, তাতে কখনও লেখা ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেস, কখনও সুইনহো, স্ট্রিট, কখনও লিন্ডসে অ্যাট নাইন। চার লাইন ইংরেজি কবিতাও : 'ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়েট টিল / সি দ্যাট ফেলো, অ্যান্ড গেট থ্রিল / দেন ইউ চিল টিল ইউ কিল / অ্যান্ড আই টেক এ হট মিল।' কোনও পৃষ্ঠায় হিজিবিজি ছবি আঁকা, পাখি, নৌকো, কখনও একটি মেয়ের আদল। কোথাও লেখা, আই অ্যাম দ্য লর্ড অফ অল আই সি—।

হস্তাক্ষর মোটামুটি পরিষ্কার। বেশ স্টাইলিশ, অলঙ্কারবহুল। তবে অধিকাংশ পৃষ্ঠায় হিসেব, হিসেব আর হিসেব। লক্ষ-লক্ষ টাকার সব হিসেব। এ সবই কি মন্দার মিত্রের ব্যাবসার হিসেব! টাকা পয়সার চিন্তা ছাড়া কি তার মাথায় আর কিছুই নেই!

সম্ভবত কিছুক্ষণের জন্য এতসব ভাবতে-ভাবতে নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ কোথাও পায়ের শব্দ পেতেই চমকে উঠে ডায়েরিটা দ্রুত রেখে দিল যথাস্থানে। অন্যের ডায়েরি এভাবে পড়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু গার্গীর সব ব্যাপারেই অনাবশ্যক কৌতূহল। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে সে মুহূর্তে চলে গেল কেবিনের জানলাটির কাছে, যেখান থেকে রডন স্ট্রিটের অনেকখানি দেখা যায়। পরমুহূর্তে চটিতে শব্দ তুলে কেবিনের ভেতর যে ঢুকল, সে মন্দার মিত্র। ঘরে ঢুকেই গার্গীকে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ চমকে উঠল, আরে, কতক্ষণ এসেছেন? গার্গী সরে এল জানলা থেকে, এই তো মিনিট দশ। কিন্তু কী ব্যাপার। এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি, এর মধ্যে টেন্ডার না কী ধরতে বেরিয়েছিলেন।

মন্দার লাজুক-লাজুক মুখে হাসল, আর বলবেন না। টানা এতদিন নার্সিংহোমে থাকতে-থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আজ 'ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড গ্রিন কোম্পানি'র একটা বড় টেন্ডার জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট ছিল। প্রায় বারো লাখ টাকার কাজ। না গিয়ে আর থাকতে পারলাম না। ডাক্তারকে দিয়ে একটা পারমিশান করিয়ে নিলাম বাধ্য হয়ে। ডাক্তার বলল, দু-তিনদিনের মধ্যে রিলিজ তো হয়েই যাবেন, তাহলে যান ঘুরে আসুন। ব্যাবসার ব্যাপারে যখন—।

—তাহলে এখন ভালোই আছেন মনে হচ্ছে—।

—হ্যাঁ, ইনজুরি শুকিয়ে এসেছে ডাক্তার বললেন, এ সবই ডাক্তারের হাতযশ আর আমার কপাল। তা আপনি একা এলেন? আপনার বান্ধবী কই?

—ডোনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি আমার। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার আপনার খবর নিয়ে যাই। তা ছাড়া, ডোনা একটু সমস্যায় আছে। আপনি ওদের বাড়ির ঘটনা কি শুনেছেন!

মন্দারের মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে, হ্যাঁ, আজ সকালেই শুনলাম সব। ফোন করেছিলাম ডোনাকে, তখনই জানলাম। ভীষণ শকিং। এরকম একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে ভাবাই যায় না। ডোনা খুব ভেঙে পড়েছে দেখলাম।

—আপনি ফোন করেছিলেন? তাই নাকি?

—হ্যাঁ, দু-একদিন পরপরই তো করি। আজ ফোন করতেই এরকম শকিং নিউজ।

—সত্যিই শকিং দুদিন ধরে যা ঝড় যাচ্ছে ওদের ওপর।

—তা তো যাবেই। আর আমারও ব্যাড লাক, ঠিক এ সময়েই আমি ইনজিওরড হয়ে নার্সিংহোমে পড়ে আছি। না হলে ওদের একটু হেল্প করতে পারতাম।

—আপনি আর কী করবেন। আপনি নিজেই তো খুন হতে যাচ্ছিলেন। মন্দার একটু শিউরে উঠে বলল, এখন বুঝতে পারছি একটুর জন্য বেঁচে গেছি সেদিন। তবে শিহরনদাও যে টার্গেট হতে পারেন তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম।

গার্গী এবার নড়েচড়ে বসল, ভালো করে তাকাল মন্দারের মুখের দিকে, বলল, অনুমান করেছিলেন! কীভাবে?

মন্দার একটু হাসল, আসলে, আমার ওপর অ্যাটেম্পট হওয়ার পরই আমি সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে বসলাম। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎই মনে হল, কয়েকদিন ধরে যে-সব ঘটনা ঘটতে দেখেছি, তাতে অন্য একটা ইন্টারেস্ট প্লে করছে কারও।

গার্গী চোখ তীক্ষ্ণ করে তাকাল, কার ইন্টারেস্ট প্লে করছে?

—নাম এই মুহূর্তে বলা কি সঙ্গত হবে? পুলিশ নিশ্চয়ই ইনভেস্টিগেট করছে। হত্যাকারী খুঁজে বার করা তাদেরই কাজ। তবে ডোনার কাছে ফোনে যা শুনলাম, তাতে আমার অনুমান হত্যাকারী অসংখ্য ক্লু ফেলে গেছে সবার চোখের সামনে।

গার্গীর বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন, তাই নাকি? একটি ক্লু সম্পর্কে আমাকে যদি হিন্টস দেন?

মন্দার আবার হাসল, ঠিক আছে, বলছি। আপনি বলুন তো, শিহরনদা গত কয়েকদিন ধরে কাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি ইনভলভড ছিলেন?

—ইনভলভড! গার্গী হঠাৎ বেশ ফাঁপরে পড়ে গেল। শিহরনদা এত বিচিত্র রকমের সমস্যা নিয়ে এ ক'দিন ব্যস্ত রেখেছিলেন নিজেকে যে, ঠিক কার কথা বলতে চাইছে মন্দার তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। অধ্যাপক-সমিতির ব্যাপারে যেমন লিডিং পার্ট নিয়েছিলেন, তেমনই ব্যস্ত ছিলেন ঈষিতাদির সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার গড়ে তুলতে। ডোনাকে নিয়েও তাঁর উৎসাহের কমতি ছিল না। গত দুদিন রহস্যটির পিছু-পিছু তাড়া করে গার্গী যে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাতে শিহরনদার চরিত্রের অত্যাশ্চর্য সব দিক একে-একে উন্মোচিত হচ্ছে তার সামনে। এমনকী বনানী-শিহরনপর্বও তার কাছে আশ্চর্যতম বলে মনে হয়েছে। এতসব অভিজ্ঞতাবলী একলহমা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এসে হঠাৎ কেমন বোকার মতো মন্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গার্গী, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, মিঃ মিত্র।

—পারলেন না? মন্দার অদ্ভুতভাবে হাসল, অলর্ক বোসকে তো আপনি দেখেছেন? কেমন মনে হয়েছে লোকটাকে?

গার্গী আবারও বেশ ধাঁধায় ঘুরতে লাগল। অলর্ক বোস যে খুবই রহস্যময় পুরুষ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি হঠাৎ শিহরনকে খুন করতে উদ্যোগী হবেন কেন তা যেন প্রথম দমকায় সেঁধুল না গার্গীর মনে।

—যে লোকটা এই মুহূর্তে কোটি-কোটি টাকার মালিক, তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি কেউ জানে? তার পাস্ট হিস্ট্রি নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেনি কেউ।

—পাস্ট হিস্ট্রি! গার্গী যেন প্রবল ধাক্কা খেল কোনও ডুবো-পাহাড়ে, আপনি জানেন নাকি?

—বিজনেসের ব্যাপারে অনেক কিছুই খোঁজখবর রাখতে হয় আমাদের। হঠাৎ একটা লোক ঢুকে পড়ল বিজনেস ওয়ার্ল্ডে, কোটি-কোটি টাকা ক্যাপিটালসহ, তাকে নিয়ে সবার মুখেই তো

আলোচনা ঘুরছে। তাতে যেসব কথা কানে এল, সে তো সত্যিকারের রোমহর্ষক গল্প। এক কোটিপতি বিধবা কোনও উত্তরাধিকারী ছাড়াই হঠাৎ মারা গেলে প্রায় বেওয়ারিশ হতে বসেছিল তার সমস্ত সম্পত্তি। যখন বারোভূতে সে সম্পত্তি লুটেপুটে খাওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভুয়ো উত্তরাধিকারী সেজে সমস্ত সম্পত্তি নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয় অলর্ক বোস। সেই কোটিপতি বিধবার যারা আশ্রিত ছিল, যারা সেই সম্পত্তির ভাগীদার হবে বলে স্থির করে ফেলেছিল মনে-মনে, ভাগ বাঁটোয়ারাও প্রায় হয়ে গিয়েছিল মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে, ঠিক সেসময় অলর্ক বোস তাদের মুখের গ্রাস হঠাৎ ছিনিয়ে নিল এই ভুয়ো পরিচয়ের বিনিময়ে।

এ-গল্পটা কিছু-কিছু জানে গার্গী। মন্দারের কাছে এহেন একটি চমকপ্রদ গল্প শুনে তাই আশ্চর্য হল না, মুখে সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, রাসেল স্ট্রিটের এই বাড়িটি ছাড়া অলর্ক বোসের আর কোনও সম্পত্তিও ছিল না ভারতে। বলা যায় ফার্দিংলেস, ভ্যাগাবন্ড। অথচ আজ সে কোটি-কোটি টাকার মালিক। ওয়ান অফ দ্য টপ বিজনেসমেন অব ক্যালকাটা। ঘটনাটা প্রায় রূপকথার মতো নয়। কিন্তু রূপকথা কখনও-কখনও সত্যিও যে হয়, অলর্ক বোসই তার প্রমাণ।

গার্গী এবার তাকাল মন্দারের চোখের দিকে, কিন্তু তার সঙ্গে শিহরন হত্যার কী সম্পর্ক?

—শিহরন রায়চৌধুরি হঠাৎ ক'দিন ধরে খুবই মাথা ঘামাচ্ছিলেন অলর্ক বোসের ব্যাবসা নিয়ে। বিজনেস সম্পর্কে এটা-ওটা পরামর্শ দিতে গিয়ে জেনে ফেলেছিলেন অলর্কের সম্পত্তির উৎস। তারপর আমার ধারণা দুজনের মধ্যে কোনও ঝামেলা শুরু হয়েছিল—।

গার্গী চমৎকৃত হচ্ছিল। আজই মণীশ রায় তাকে বলেছিলেন, শিহরনের সঙ্গে অলর্কের কোনও ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে খড়্গাপুরে গিয়ে। সে কথা মনের মধ্যে রেখে মন্দারকে আবারও বাজাতে চাইল গার্গী, কী ধরনের ঝামেলা হয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

—সম্ভবত শিহরনদা ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিলেন অলর্ক বোসকে, যাতে তিনি ওই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির কিছুটা পান। হয়তো বলেছিলেন, সম্পত্তির ভাগ না পেলে তিনি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে দেবেন জনসমক্ষে।

গার্গী তার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল, হুঁ, তারপর?

—ডোনা বলল, মার্ডারের দিনদুই আগে অলর্ক বোস শিহরনদাকে খড়্গাপুর নিয়ে গিয়েছিল কোনও একটা অছিলায়। সম্ভবত বাইরে গিয়েই ব্যাপারটা ফয়সালা করতে চেয়েছিল অলর্ক বোস। হয়তো ওখানেই কোনও ভাবে শিহরণদাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। শিহরনদা সেটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। নইলে শুধু-শুধু হঠাৎ পিস্তল দরকার হল কেন তাঁর। হয়তো সেজন্যই খড়্গাপুরের অপারেশন সাকসেসফুল হয়নি অলর্কের, তাই ফিরে এসে আর অপেক্ষা করতে পারেনি। ফাংশনের রাতেই সুযোগ বুঝে—।

গার্গীর হঠাৎ মনে হল, মন্দারের অনুমান একেবারেই নিখুঁত, যা সে নিজেও ভাবতে পারেনি। হেসে বলল, থ্যাঙ্কু ফর দি ইনফরমেশনস। মনে হচ্ছে, শিহরন-হত্যার জট খুলতে আপনার বিশ্লেষণ কাজে লাগলেও লাগতে পারে। এত অসুস্থতার মধ্যে আপনি যে এতটা ভেবেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু যাওয়ার আগে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার ওপর যে অ্যাটেম্পট নেওয়া হয়েছিল, আপনি কি মনে করেন তার নেপথ্যেও অলর্ক বোস?

সহসা তপ্ত হয়ে উঠল মন্দারের মুখ, চোখ ক্রুদ্ধ করে বলল, তা নয়তো কী।

গার্গী তা বুঝল না যেন। জিজ্ঞাসু চোখে নিরিখ করতে লাগল মন্দারের অভিব্যক্তি, মুখে বলল, কেন?

মন্দার তখন নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে তার যুক্তিজালের ভেতর। তখন তার সামনে গার্গীও নেই যেন। নিজেই একটি হত্যাকাণ্ডের ক্লু খুঁজে চলেছে, উত্তেজিত হয়ে বলল, কারণ একটাই, সে ডোনা।

ডোনা যেহেতু আমাকে পছন্দ করে, ভালোবাসে, অতএব মন্দার মিত্রকে সরিয়ে দাও পৃথিবী থেকে। টাকা পেয়ে লোকটা এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। জীবনে যা-যা চায় তার সবই পেয়েছে। এখন ডোনাকেও চাই তার—।

গার্গী বেশ আশ্চর্য হল। মন্দারের উত্তেজনার কারণও বুঝল। হঠাৎ মনে হল, মন্দার ঠিকই বলেছে। ডোনা সেদিন যাকে আড়াল করতে চাইছিল, সে অলর্ক বোস। কেন আড়াল করতে চাইছে কে জানে। তাহলে কি অলর্কের সঙ্গেও ডোনার কোনও অ্যাফেয়ার চলছে। এ খবরটা গার্গী জানে না। মন্দারের পক্ষে সেটা অনুমান করা স্বাভাবিক। মন্দার ডোনার প্রেমিক, একজন প্রেমিকই ভালো বুঝতে পারে তার প্রেমিকার মনস্তত্ব। তার গতিবিধি, অন্য যুবকের প্রতি তার ব্যবহার, আসক্তি।

হঠাৎ গার্গী গাত্রোত্থান করার উদ্যোগ করল, বলল, আপনার সঙ্গে আরও একদিন আলোচনায় বসতে হবে, মিঃ মিত্র। আপনার অফিসের ঠিকানাটা দিন তো।

মন্দার খুশি হয়ে তার বালিশের তলা থেকে বার করল একটা নীল রঙের ডটপেন। পেনটার তলার দিকে দাঁতের দাগ। ডায়েরির ভেতর থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে বেশ গোটা-গোটা অক্ষরে মন্দার তার অফিসের নাম-ঠিকানা লিখে দিল। সঙ্গে ফোন নম্বরও, গার্গী শুধু আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, মন্দারের হাতের লেখা যেন কোনও বাচ্চাদের মতোই।

আরও আশ্চর্য হল, ডায়েরিতে তাহলে কার হাতের লেখা এই ভেবে।

॥ ২৪ ॥

বাড়ি ফিরে দীর্ঘ রাত বড় বিনিদ্র কাটল গার্গীর। হঠাৎই সমস্ত ঘটনা তার কাছে কেমন ধোঁয়াশা হয়ে নেমে আসছে টুপটুপ করে। তাতে তার শরীরময় একধরনের অস্থিরতা। ঠিক কোন অ্যাঙ্গেল থেকে উন্মোচন করবে জটিল ক্লু-গুলো তা ভেবেই পাচ্ছে না যেন। গত দু-দিন ক্লাসে যায়নি, গণিতের জটিল ভাবনাগুলো মাথার ভেতর থেকে উধাও হয়ে সেখানে হিসেবনিকেষ হচ্ছে অন্য এক অঙ্কের। বুঝতেই পারছে না, এহেন অদ্ভুত-পরিস্থিতির মধ্যে কার পক্ষে শিহরণ রায়চৌধুরিকে খুন করা সম্ভব।

পরদিন সকালে উঠেই সে আবারও বেরিয়ে পড়ল যোধপুরপার্কের উদ্দেশে। ডোনাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে ডোরবেল টিপতেই যে দরজা খুলে দিল, সে ডোনাই। গার্গীকে তার ঘরে নিয়ে যেতে-যেতে ফিসফাস করে বলল, ধুর, যা একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বাড়ি নয় তো যেন শ্মশান।

গার্গী এক্ফলহমা তার নজর ছুড়ে দিল চিত্রদীপ চ্যাটার্জির স্টাডির দিকে। মস্ত চেয়ারটায় কেমন ভাবলেশহীন হয়ে বসে আছেন চিত্রদীপ। এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে সাধারণত কমই বসে থাকেন উনি। সারাক্ষণ কোনও-না-কোনও কাজে যিনি সদাব্যস্ত থাকতেন, হঠাৎ এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন। বনানী কাছাকাছি নেই। হয়তো টয়লেটে, কিংবা হয়তো বা কিচেনেই অন্তরিন।

ডোনার কাছে কয়েকটা কথা জানার ছিল, সে কথাই জিজ্ঞাসা করল তার ঘরে ঢুকে, অলর্ক বোস লোকটিকে তোর কেমন মনে হয় রে, ডোনা?

ডোনা বোধহয় আশা করেনি এহেন প্রশ্ন, বলল, কী করে জানব বল? মাত্র কয়েকদিনের চেনাজানা। তবে টাকার ওপর কোনও মায়া-দয়া নেই। যখন যেটা করবে ভাবে, সেটা করবেই। অ্যাট এনি কস্ট।

গার্গী তাকাল তীক্ষ্মচোখে ডোনার দিকে, তোর সঙ্গে রিলেশন কেমন?

ডোনা একটু গম্ভীর হল, কেমন আবার? বন্ধুরা যেমন হয়ে থাকে আর কি?

—বন্ধু, না কি তার চেয়েও বেশি?

ডোনা হাসার চেষ্টা করল, বেশি তো নয়ই বরং কমই বলতে পারিস। তুই তো জানিসই, আমি তার কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মডেল। সুতরাং রিলেশন কিছুটা টাকারও বটে।

গার্গী এবার ঝুঁকে পড়ল ডোনার দিকে, নির্নিমেষে নিরিখ করল তার মুখ, কিন্তু তোকে টাকা দিয়ে কি পারচেজ করতে চেয়েছিল? তেমন কোনও প্রপোজাল দিয়েছে কখনও।

ডোনা হঠাৎ থমকে গেল। প্রায় জার্ক খেয়ে উঠল যেন। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই হঠাৎ তাদের লিভিংরুমে টেলিফোন বেজে উঠল সবাইকে চমকিত করে। এখন প্রতিটি টেলিফোনই যেন ভয়ঙ্কর। আগে টেলিফোন বাজলে ছুটে যেত ডোনাই। এখন গেল না। গেল না বলেই স্টাডি থেকে উঠে এসে টেলিফোন ধরতে হল চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকেই, হ্যালো।

ওপাশ থেকে কিছু কথা শুনলেন চুপচাপ। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, না, পাওয়া যায়নি। আবার ওদিক থেকে কিছু কথা, তারপর ঝট করে বেশ শব্দ তুলেই ক্র্যাডলের ওপর রেখে দিলেন ফোনটা, অর্থাৎ ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। পরক্ষণেই গলা চড়িয়ে ডাকলেন, বনানী—।

ডোনার ঘরের সমানে দিয়ে ফ্যাকাসে। মুখে এগিয়ে গেলেন বনানী, কাপড়ে হাত মুছতে-মুছতে তাঁকে দেখেই আবারও প্রায় গর্জন করে উঠলেন চিত্রদীপ, থানা থেকে ফোন করেছিল। পিস্তলটা আজকের মধ্যেই দেখিয়ে আসতে হবে ওদের। কোথায় রেখেছ পিস্তলটা বার করে দাও—।

বনানী ভীত, সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, আমি কোত্থেকে বার করব। সে তো শিহরন—।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল শব্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন চিত্রদীপ, একদম বাজে কথা বলবে না। পিস্তলটা শিহরন দিয়ে গিয়েছিল খড়্গপুর থেকে ফেরার পর। আমি দেখেছি, বইয়ের র‍্যাকের এপাশে ছিল ওটা—

বনানী আবারও সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, ঠিক দেখেছ? কবে বললে?

—যেদিন শিহরন খুন হয় সেদিন সকালেই।

বনানী হঠাৎ এবার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুললেন, যদি দেখেই থাকো, তাহলে তুমিই সে পিস্তল সরিয়েছ।

—আমি? আমি সরিয়েছি?

—হ্যাঁ, তোমার রাগ ছিল শিহরনের ওপর, তার শোধ তুলেছ।

চিত্রদীপ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর দ্বিগুণ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আমি শোধ তুলেছি, না তুমি?

—আমি কেন শোধ তুলতে যাব?

—তুমিই তুলেছ। তুমি সহ্য করতে পারোনি যে, শিহরন এখন তোমাকে ছেড়ে তোমার মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে। দুজনে একসঙ্গে বেরুত গাড়ি নিয়ে। সারা দুপুর-বিকেল-সন্ধে কাটিয়ে রাত করে বাড়ি ফিরত। তেমার সেসব সহ্য হয়নি—।

—চুপ করো, বনানী হিংস্র হয়ে উঠলেন, নিজের মেয়ের সম্পর্কে এতসব বাজে কথা বলতে তোমার আটকায় না?

—আটকাবে কেন? যা সত্যি তাই-ই বলছি। নিজে যেমন হয়েছ, তেমনি তোমার মেয়েও। পিস্তলটা কোথায় রেখেছ বার করে দাও—।

বনানী কিছুক্ষণ চুপচাপ হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, পিস্তল কোথায় আমি জানি না। নিশ্চয়ই তুমিই সরিয়েছিলে বইয়ের র‍্যাক থেকে—।

আবারও একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছিল লিভিংরুমের মধ্যে, সেই মুহূর্তে হঠাৎ

ভোরবেল বেজে ওঠায় কয়েক লহমা এক ভয়ঙ্কর নিঃস্তব্ধতা। হয়তো আবারও পুলিশ এসেছে এই আশঙ্কায় বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষই সিঁটিয়ে শীর্ণ হয়ে গেল। খুব ধীর পায়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিলেন বনানী। ডোনা, গার্গীও ঘরের মধ্যে থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিল, সত্যিই পুলিশ কি না। কিন্তু না, বাইরে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে অলর্ক।

অলর্কের মুখে হাসি দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে গেল সবাই, এহেন দুঃসহ পরিস্থিতিতে তার মুখে হাসি আসেই বা কী করে! লিভিংরুমে ঢুকে, যেন এ ক'দিন কিছুই ঘটেনি, ঘটে থাকলেও তাতে তার বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয়নি, এমন ভঙ্গিতে চিত্রদীপের কাছে এগিয়ে গেল অলর্ক, বলল, আজকের কাগজ দেখেছেন?

—কাগজ! চিত্রদীপ মুখ বিকৃত করলেন, কাগজ দেখার মতো মনের পরিস্থিতি আছে?

—আপনার একজিবিশনের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আজ। আগামী মাসের এক থেকে সাত তারিখ।

চিত্রদীপ লাফিয়ে উঠে বললেন, সে কী, কে বিজ্ঞাপন দিল কাগজে?

—আমিই দিয়েছি।

শুধু চিত্রদীপ নয়। বনানী, ডোনাও এমন চোখে অলর্কের দিকে তাকাল যেন সবাই ভূত দেখছে। ডোনাই তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল, এই পরিস্থিতিতে একজিবিশন হবেই বা কী করে। অসম্ভব।

চিত্রদীপ কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর ঘাড় নাড়তে-নাড়তেই বললেন, ঠিকই বলেছে ডোনা। এখন একজিবিশন করার মতো পরিস্থিতি নেই।

—সে কী! এবার অবাক হওয়ার পালা যেন অলর্কেরই, বলল, এতদূর এগিয়ে গিয়ে এখন কি আর ফেরা সম্ভব?

চিত্রদীপ তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অলর্কের দিকে। এপাশ থেকে ডোনা বলল, বুঝতেই পারছেন, আমরা সবাই ভীষণ আপসেট। এখন একজিবিশন করাই যাবে না।

—যাবে না মানে? অলর্ক তাদের কাউকেই পাত্তা দিল না যেন, বলল, এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা তো কেউ দায়ী নই। যে ঘটনাটি ঘটেছে, তার তদন্তের দায় পুলিশের। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করুক। যে দোষী তাকে শাস্তি দিক, তাতে আমরা আমাদের পরিকল্পনা মুলতুবি রাখব কেন?,

গার্গী খুবই বিস্মিত হচ্ছিল। কাল সন্ধেয় মন্দারের কথাগুলোর সঙ্গে অলর্কের ভাবলেশহীন মুখ মিলিয়ে নিচ্ছিল দ্রুত। এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনার মাত্র দুদিনের মধ্যে যে এমন নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে, এতটা নিস্পৃহ তাতে তার সম্পর্কে সন্দেহ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

অলর্ক অবশ্য থামল না, বলল, তা ছাড়া, আমি কয়েক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করেছি গোটা স্কিমটার জন্য। আপনার একজিবিশনের সঙ্গে আমার শো-রুমগুলো ওপেন করারও একটা সম্পর্ক আছে। এর মধ্যে অনেকগুলো শো-রুম প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। সেসব তো আপনি জানেনই। একজিবিশনে আপনি সাফল্য পেলে সেই গুডউইল আমি কাজে লাগাব শো-রুমের বিজ্ঞাপনে।

এমন অদ্ভুত সব কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়েই রইল। অলর্ক যে ব্যবসায়ী হিসেবেও বেশ দূরদর্শী, তা এর আগেও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। এখনও করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রদর্শনী করলে তা শিল্পী মহলে, কিংবা বুদ্ধিজীবি মহলে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, সে ভাবনাও তো ভাবা দরকার। হঠাৎ হুট করে এত বড় একটা কাজে নামা চলে কি না, তা অলর্ক না ভাবলেও চিত্রদীপকে নাড়িয়ে দিল বেশ। এমনও তো হতে পারে, সাংবাদিকরা এই চিত্র-প্রদর্শনীর সঙ্গে শিহরন খুনের ঘটনাকে জড়িয়ে দিয়ে একটা কেচ্ছা গল্প ফাঁদতে পারে তাদের কাগজে। চিত্র সমালোচকদেরও কিছু একটা আলগা মন্তব্য লিখে দিতেও বা বাধা কোথায়।

কিন্তু চিত্রদীপের কোনও যুক্তিই অলর্ক গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। সে তার সিদ্ধান্তে অনড়

রইল, দেখুন, এই দুর্ঘটনার জন্যে আমি যখন দায়ী নই, তখন আমার বিজনেস এই কারণে ডুবে যাবে সেটা আমি মানব না। আপনি যেভাবে কথা দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারেই আমার প্রোগ্রাম সেট করা আছে। সেই পরিকল্পনা মাফিক কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। আপনার ছবিও প্রায় প্রস্তুত। আমার বাড়িও নতুনভাবে সাজাতে হচ্ছে যাতে আপনার ছবির গ্যালারি হিসেবে সেটা ব্যবহার করা যায়। এখন আর কোনওভাবে পরিকল্পনাটা নষ্ট করে দেবেন না। যদি আপনার যাওয়ায় কোনও অসুবিধা থাকে, তাহলে ছবিগুলোয় ফাইনাল টাচ দিয়ে আমাকে দিন। একজিবিশন আমি একাই চালিয়ে দেব।

চিত্রদীপ এর পর আর কথাই বলতে পারলেন না। তাঁকে বিস্মিত, স্তম্ভিত করে অলর্ক যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেল তার গাড়ি হাঁকিয়ে।

অলর্কের ব্যবহারে-ভাবভঙ্গিতে সব্বাই প্রায় স্তব্ধ। ঘটনাটা কখন কোনদিকে মোড় নিচ্ছে তার কোনও খেই খুঁজে পাচ্ছে না। একটু আগেই চিত্রদীপ আর বনানীর কোঁদল যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাতে পিস্তলের হালহদিশ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মনে হচ্ছে, পিস্তল এ-বাড়িতেই ছিল, এই মুহূর্তে তা নিশ্চয় হয় বনানী কিংবা চিত্রদীপের হেপাজতে। সেদিন পুলিশের সামনে পিস্তল খুঁজে না পাওয়ায় বনানীর বিস্ময় প্রকাশ, সেইসঙ্গে চিত্রদীপের আকাশ থেকে পড়ার ভান করা—এ সবই পুলিশকে দেখানো। এদিকে অলর্কের এহেন নিস্পৃহ ভঙ্গিও সন্দেহের উদ্রেক করছে। বাড়ির প্রতিটি লোকই যখন এভাবে অনড়, সেইমুহূর্তে আবার ফোনের পিকপিঁকাপিঁক আওয়াজ। ডোনা এতক্ষণ স্টিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল, হ্যালো, ডোনা স্পিকিং—।

ওপাশ থেকে কথা বলছিলেন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তুষারশুভ্র মিত্র, হ্যালো, মিস চ্যাটার্জি, একটা খবর আছে। একটু আগেই আপনাদের খোয়া-যাওয়া পিস্তলটা পাওয়া গেছে।

ডোনা লাফিয়ে উঠতে চাইল, তাই নাকি? কোথায়?

—ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। একট বড় বিল্ডিং-এর পাশে কিছু ভাঙা ইঁটের টুকরোর আড়ালে পড়েছিল ওটা, ঠিক যে হলে আপনাদের ড্যান্স-ড্রামা হয়েছিল তারই কাছাকাছি। ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ খবর দিয়েছেন থানায়।

—পিস্তলটা দেখে কী মনে হচ্ছে? এই পিস্তল থেকেই কি গুলিটা ছোড়া হয়েছিল?

—পিস্তলের চেম্বারে পাঁচটা গুলি ভরা আছে, মাত্র একটা ফাঁকা। স্বাভাবিকভাবেই আমরা সন্দেহ করছি, এই পিস্তল থেকেই ছোড়া হয়েছিল গুলিটা, তবে পরীক্ষা না করে এই মুহূর্তে কিছুই কনফার্মড হওয়া যাচ্ছে না। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট পেলেই তবে জানা যাবে—।

ডোনার হৃৎপিণ্ড কয়েকমুহূর্তের জন্য যেন থেমে গেল। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ওটা যে আমাদেরই পিস্তল তা জানলেন কী করে?

ইনস্পেকটর জানালেন, সেটা কনফার্মড হয়ে তবেই টেলিফোন করছি। আপনি জানেন না বোধহয়, প্রতিটি থানা-এলাকায় যত আর্মস থাকে, স্মল-আর্মস বা বিগ-আমর্স যাই হোক না কেন, তার একটা তালিকা থানার রেজিস্টারে লেখা থাকে। বছর-বছর তার লাইসেন্স রিনিউ করতে হয়। রেজিস্টার দেখে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে এই পিস্তলের নম্বর। আপনার বাবা এসে পিস্তলটা আইডেন্টিফাই করে যেতে পারেন—।

চিত্রদীপ শুনে আঁতকে উঠলেন, পরক্ষণেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, থানায় গেলে নিশ্চয়ই অ্যারেস্ট করবে আমাকে—।

বলতে-বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফেসে হয়ে গেল। আর কিছু বলতেই পারলেন না। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে। শরীরটা টলে উঠল যেন।

গার্গী দাঁড়িয়েছিল একটু দূরেই। চিত্রদীপের টলায়মান শরীর, তাঁর অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বর—সব দেখেশুনে মনে হল এখনই সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবেন ভদ্রলোক। দ্রুত ছুটে গিয়ে তাঁর হাতদুটো ধরে আস্তে-আস্তে বলল, আপনি অযথা চিন্তা করবেন না। আমরা দেখছি কী করা যায়—।

॥ ২৫ ॥

চিত্রদীপের পিস্তল উদ্ধার-পর্ব শেষ হতে-না-হতেই আরও একটি যে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গেল থানা থেকে, তাতে দ্বিগুণ জট পাকিয়ে গেল ঘটনাটা। জানা গেল, ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলেন অলর্ক বোসের বাড়ি। ইন্টারোগেশনের পর তিনি দেখতে চেয়েছিলেন অলর্ক বোসের পিস্তলটি। অলর্ক বোস প্রথমে দেখাতে রাজি হয়নি। বলেছিল, পরে গিয়ে দেখিয়ে আসবে থানায়। ইনস্পেকটর একটু কড়া হতেই সে সুড়সুড় করে বার করে দিয়েছে পিস্তলটি। সেটি পরীক্ষা করে দেখার পর যে তথ্যটি সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে ইনস্পেকটরকে, তা হল অলর্ক বোসের পিস্তলটিতে ছ'টা গুলি ভরা, কিন্তু এই পিস্তলটি থেকেও একটি গুলি ছোড়া হয়েছে কয়েক দিনের মধ্যে। অলর্ক বোস অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে এই পিস্তলটি শিহরন হত্যার কাজে মোটেই ব্যবহৃত হয়নি। ফাঁকা আওয়াজ করেছিল একদিন। পুলিশ অবশ্য তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি, কিন্তু গ্রেপ্তারও করেনি এখনও।

সংবাদটি চমকে দিয়েছে চিত্রদীপদের। ফাঁপরে পড়েছে গার্গীও। শিহরন হত্যার রহস্য এতে আরও জটিলতর হয়ে উঠল সন্দেহ নেই। দু-বাড়ি থেকে দুটি পিস্তল পাওয়া গেল, যে পিস্তল দুটি থেকে ছোড়া হয়েছে একটি করে গুলি, এর মধ্যে কোন পিস্তলের গুলি শিহরনের হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তা এখন লাখটাকার প্রশ্ন।

সে প্রশ্ন অবশ্য আপাতত ঝুলেই থাকবে একটি সরল জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে। তার আগে গার্গীকে যে প্রসঙ্গ ভাবিত করল, তা হল, অলর্ক বোস ক্রমশ পরিণত হচ্ছেন একটি হেঁয়ালিতে। সুতরাং জানা দরকার অলর্ক বোসের প্রকৃত পরিচয় কী, কীভাবেই বা সে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হল। মন্দার মিত্র তাকে সেদিন যে কাহিনি জানিয়েছে তা কি সত্যি! সত্যি!! সে কি সত্যিই ভুয়ো উত্তরাধিকারী! কিন্তু কলকাতায় বসে এহেন তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা তো আদৌ সম্ভব নয়। অগত্যা কী আর করা। গার্গীকে অতএব প্রবল ঝুঁকি নিয়ে সেই সকালেই বেরিয়ে পড়তে হল কলকাতা থেকে ঘণ্টা আড়াই ট্রেন-জার্নির দূরত্বে এক মফস্সলে, যেখানে অলর্কের সেই তথাকথিত দাদামশাই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রকে এ-তল্লাটের সবাই রাজা বলেই জানত। এ-জেলায় এহেন পুরোনো রাজবাড়ি অবশ্য আরও অনেকই আছে। কিন্তু আজকাল কোনও রাজবাড়িতেই রাজাও নেই, রাজত্বও বহুকাল আগে এস্টেট অ্যাকুইজিশন আইনের আওতায় অন্তর্হিত। গোটা একটা দিন সেই রাজবাড়ি-প্রতিম অট্টালিকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে প্রভূত ভালো ও মন্দ অভিজ্ঞতা অর্জন করে গার্গী প্রায় গভীর রাতে ফিরে এল তার জুবিলি পার্কের বাড়িতে।

তার এ ক'দিনের এলোপাথাড়ি জীবনযাপনে সে নিজেও যেমন কিছুটা পরিশ্রান্ত, তার মা ও দাদাও যথাক্রমে বিচলিত ও বিরক্ত।

তবু এই মুহূর্তে তার উত্তেজনা এতই চরমে যে, পরদিন সকাল না হতেই সে আবার টুঁ দিল ডোনাদের বাড়ি। মাত্র একদিন ছিল না কলকাতা, কিন্তু তার ধারণা, এর মধ্যে নিশ্চয়ই আরও কিছু অঘটন ঘটে থাকতে পারে। আসলে পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে উঠছে ক্রমশ। তার ধারণা যদিও বা ঠিক হল, কিন্তু যে ঘটনাটা ঘটেছে তা কিছুটা অবিশ্বাস্যই যেন বা।

গার্গী ডোনাদের বাড়ি ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে ডোনা সন্ত্রস্ত গলায় বলে, জানিস গার্গী, কাল

অলর্ক বোসের ওপর অ্যাটেম্পট হয়েছিল।

—অ্যাটেম্পট। গার্গী বিস্ময়ের-চোখ রাখে ডোনার দিকে।

—হ্যাঁ, গুলি ছোড়া হয়েছিল তার দিকে। কাল গাড়ি চালিয়ে যে মুহূর্তে ঢুকছিল তার রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতে, ঠিক তখনই। সন্ধের অন্ধকারে সম্ভবত কোথাও লুকিয়ে ছিল আততায়ী।

গার্গীর ভুরুতে কোঁচ পড়ল, তারপর আস্তে-আস্তে বলল, অ্যাটেম্পট হওয়াই তো দরকার ছিল।

—দরকার ছিল? ডোনার কণ্ঠস্বরে অযাচিতভাবে একটা তীক্ষ্নতা ঝরে পড়ল, কী বলছিস কী?

—তাহলে আমার অঙ্কটা মিলে যায়।

—অঙ্ক। এর মধ্যে তুই অঙ্ক কোথায় পেলি? এটাও কি তোর ম্যাথসের ক্লাস নাকি?

গার্গী সামান্য হাসল। কিছু বলল না।

—কাল সারাদিন কোথায় ছিলিস তুই? এদিকে এত কাণ্ড ঘটে গেল, আর তোর পাত্তাই নেই।

—আরও কোনও ঘটনা ঘটে গেছে নাকি?

—হ্যাঁ, অ্যাটেম্পট হওয়ার পর পুলিশ অলর্ক বোসকে ইন্টারোগেট করতে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ ঠিক বিশ্বাস করছে না ঘটনাটা। গুলি করল, অথচ অলর্ক বোসের গায়ে তো নয়ই, গাড়িতেও গুলির আঁচড় লাগেনি এটা ভারী অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তাদের কাছে।

—এমনও তো হতে পারে, হত্যাকারীর টিপ ভালো নয়। দূর থেকে গুলি ছুড়লে নাও তো লাগতে পারে।

কিন্তু পুলিশ সাসপেকট করছে, অলর্ক বোসই মার্ডারার। সে নিজের অপরাধ ঢাকতে এখন এইসব গালগল্প তৈরি করছে। ইনস্পেকটর নিজে এ-বাড়িতে এসে বলে গেলেন।

—তাহলে অলর্ক বোসকে অ্যারেস্ট করছে না কেন?

—বলল, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কিছু গোলমাল আছে। তাতে এখনই অ্যারেস্ট করা যাচ্ছে না।

—তাই। গার্গী তৎক্ষণাৎ আগ্রহী হল, তাহলে তো পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা একবার দেখা দরকার। কী ধরনের গোলমাল তা কিছু বলল?

ডোনা ঘাড় নাড়ল। পরক্ষণেই আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কাল হঠাৎ সেই যে সকালে একবার দেখা দিয়ে নিপাত্তা হলি, কোথায় গিয়েছিলি তা তো বললি না?

গার্গীর চোখে এতক্ষণে ফুটে উঠল সেই রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করার আত্মপ্রসাদ। ঠোঁট টিপে হেসে বলল, গিয়েছিলাম অলর্ক বোসের সম্পত্তির হদিশ নিতে।

ডোনা আশ্চর্য হল, সে কী! পেলি তার হদিশ?

—পেলাম। সে এক রাজপ্রাসাদই বটে। ছোটবেলায় একবার মুর্শিদাবাদ গিয়ে হাজার দুয়ারী দেখে এসেছিলাম, অলর্ক বোসের রাজপ্রাসাদ প্রায় সেরকমই মস্ত এক অট্টালিকা। বিশাল-বিশাল গোলাকার থাম। পেল্লাই-পেল্লাই ঘর। ইয়া উঁচু ছাদ। ঘরে-ঘরে ঝাড়লণ্ঠন।

ডোনা চোখ কপালে তুলল, তাই।

—তবে এখন প্রায় সবই তার ধ্বংসাবশেষ। ঠিকমতো মেইনটেন্যান্স না হওয়ায় পলেস্তারা খসে পড়ছে এখান থেকে ওখান থেকে। দেওয়ালে, ছাদে সর্বত্রই লকলক করে বেড়ে উঠছে অশ্বত্থের চারা। এমনকী অলিন্দে ঘাস, গুল্মলতা। এ ছাড়াও যা অভিজ্ঞতা হল তা এক অদ্ভুত রহস্য।

—রহস্য! ডোনার চোখের পেয়ালা ক্রমশই উপচে পড়ছে কৌতূহলে।

—রাজপ্রাসাদে বেশ কয়েকটি পরিবার বাস করে যারা কেউই রাজবাড়ির লোক নয়, সবাই

আশ্রিত। বাড়ির মালিক, অর্থাৎ যাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজা বলে জানত, সেই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মারা যান তাঁর বিধবাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে। হঠাৎ কিছুদিন আগে এক দাড়ি-গোঁফওয়ালা যুবা সেখানে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে গিয়েছিল থাকতে। উদ্দেশ্য, রাজবাড়ি নিয়ে কিছু লেখালেখি করা। দিন তিনচার রাজবাড়িতে থাকার পর যুবকটি হঠাৎ উধাও হয়। সে চলে যাওয়ার পরই আবিষ্কৃত হল, সেই বিধবা মহিলা খুন হয়েছেন।

—মাই গড। ডোনা আঁতকে উঠল।

—সেই বিধবার কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না রাজবাড়িতে। তাই ট্রাস্টি বোর্ডের লইয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে জানায়, বিধবার কোনও উত্তরাধিকারী যদি কোথাও জীবিত থাকে, তাহলে এক্ষুনি যেন যোগাযোগ করে ট্রাস্টিবোর্ডের ল'ইয়ারের সঙ্গে।

—তারপর? যোগাযোগ করেছিল কেউ?

—হ্যাঁ। অলর্ক বোস। সে-ই নাকি বিধবার একমাত্র নাতি, যোগাযোগ করামাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছে রাতারাতি। যদিও তার উত্তরাধিকারের সত্যতা নিয়ে বাড়ির যারা আশ্রিত তাদের ঘোর সন্দেহ আছে।

ডোনা যেন রূপকথা শুনছে গোগ্রাসে এমন ভঙ্গিতে বলল, তারপর?

—কিন্তু ল'ইয়ার ভদ্রলোক নাকি অলর্ক বোসের কথায় কনভিনসড। কিন্তু আর একটি যে ঘটনা শুনে এলাম, সেটা খুবই রহস্যময়। যে যুবা আগে সাংবাদিক পরিচয়ে গিয়েছিল রাজবাড়িতে, সে নাকি বিধবার কাছে জানিয়েছিল, সে-ই বিধবার নাতি। সম্পত্তি তারই হওয়া উচিত। বিধবা তাকে স্বীকার করেননি, উলটে পুলিশে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে সে-ই বুড়িকে মেরে আসে।

ডোনা সামান্য আতঙ্কিত হল, তাহলে তো রীতিমতো রহস্যই। তা সেই সাংবাদিক আর ধরা পড়েনি?

—না। তবে আশ্রিতদের এখন কেউ-কেউ বলছে সেই যুবকটিই নাকি বিধবার আসল নাতি। অলর্ক বোসই নাকি ভুয়ো পরিচয় দিয়ে এতবড় সম্পত্তির মালিক হয়েছে।

ডোনা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, আশ্রিতরা কী বলল না বলল সেটা বড় কথা নয়। লইয়ার যখন কনভিন্সড হয়েছেন, তখন অলর্ক বোসই প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে ধরে নিতে হবে। তা সেই আসল নাতি কোর্টে মামলা করছে না কেন?

গার্গী হাসল, কোর্টে যাবেই বা কী করে। তার নামে তো খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। তাকে এখন গা ঢাকা দিয়ে থাকতেই হবে। এত সব গল্প শুনে আমি থানায় গিয়েছিলাম—।

ডোনা উত্তরোত্তর হতবাক হচ্ছে, থানায়ও গেলি?

—হ্যাঁ। যুবকটি সাংবাদিক বলেই আমার কৌতূহল হল। আমিও সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থানার ও.সি-কে অনুরোধ করতে যে দুটি জিনিস তিনি আমাকে দেখতে দিলেন, সেগুলো খুব কাজে লেগেছে আমার। সাংবাদিকটি খুন করে পালাবার সময় তাড়াহুড়োয় ফেলে গিয়েছিল সাংবাদিকদের দুটি মহাস্ত্র। একটি তার নোট নেওয়ার প্যাড, অন্যটি তার কলম।

—বাহ। বেশ সাংবাদিক তো সে!

—হ্যাঁ, ও. সি. সেগুলো কোর্টের একজিবিট হিসেবে রেখে দিয়েছেন। আমি তার প্যাডের পৃষ্ঠা উলটে অবাক। হাতের লেখাটা যেন চেনা-চেনা মনে হল। তবে সেই বিধবা ভদ্রমহিলার সঙ্গে সেই যুবক নাতি হিসেবে পরিচয় দেওয়ার আগে সাংবাদিক সেজে যেসব তথ্য নোট করেছিল, তার সঙ্গে তার নিজস্ব মতামত হিসেবে যা-যা লিখেছে, তা পড়ে কিন্তু আমারও মনে হয়েছে সে-ই বুড়ির আসল নাতি।

ডোনা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল গার্গীর মুখের দিকে, তারপর আস্তে-আস্তে বলল,

তাহলে অলর্ক বোস।

হয়তো ভুয়ো নাতি হতে পারে। তবে এখনই নিশ্চয় করে কিছু বলা যাচ্ছে না। অলর্ক বোসের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলা দরকার। তার সব ইতিহাস তো আমরা কেউই জানি না। হয়তো সেই সাংবাদিকের মতামতও ভুল হতে পারে। সেও তো চেয়েছিল, এত বিশাল সম্পত্তি কোনওক্রমে হাতাতে—।

গার্গীর কথা শেষ হওয়ার আগে হঠাৎ বেজে উঠল ডোরবেল। ডোনা দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই প্রায় চমকে উঠে বলল, আরে, তুমি?

মন্দার হাসতে-হাসতে বলল, বেশ সারপ্রাইজ দিয়েছি, তাই নয়? আজ ভোরেই নার্সিংহোম থেকে রিলিজ পেয়েছি। জিনিসপত্রগুলো ঘরে রেখে এককাপ চা খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি তোমাদের বাড়ি। কেমন যেন অস্থির-অস্থির করছিল মনটা—।

ডোনা ঠোঁট টিপে হাসল, কার জন্যে মন খারাপ করছিল! আমার জন্যে নাকি!

মন্দার হাসল বড় করে, তা আর বলতে।

বলতে-বলতে তার নজর পড়ল ডোনার পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকা গার্গীর দিকে। গার্গী ছাই-ছাই রঙের শালোয়ার-কামিজ পরেছে আজ। তাতে ওর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে দারুণ খুলেছে। তাকে দেখে মন্দার হাত তুলল, আরে, আপনি এখানে?

মন্দারের মাথায় সেই বড় করে বাঁধা ব্যান্ডেজটা নেই। তার পরিবর্তে বাঁ-দিকে কানের ওপর বেশ খানিকটা তুলো ব্যান্ড-এড দিয়ে আটকানো। গার্গী সেদিকে তাকিয়ে বলল, আসলে আমার মনটাও কেমন অস্থির-অস্থির করছিল—।

ডোনাদের বাড়ির আবহাওয়া বেশ থমথমে। তার বাবা চিত্রদীপ স্টাডিতে এতক্ষণ বসেছিলেন চুপচাপ। মুখে পাইপ, কিন্তু তাতে আঁচ নিভে গেছে। এতক্ষণে সকালের খবরের কাগজটি টেনে নিয়ে তাতে চোখ বুলোচ্ছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। তাতে আজও প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে বড় করে। বিজ্ঞাপনে এও লেখা রয়েছে, শিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির এই নতুন সিরিজের ছবিগুলি সম্পূর্ণ অভিনব।

মন্দার চিত্রদীপের দিকে একপলক তাকিয়ে চলে এল ডোনার ঘরেই। একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসতে-বসতে হঠাৎ গার্গীকে বলল, তাহলে আমার কথা মিলল তো! যে মার্ডারার, তার কাছেই পিস্তল পাওয়া গেছে শেষ পর্যন্ত।

ডোনা গার্গীর দিকে তাকিয়ে বেশ অবাকই হল। গার্গীর সঙ্গে মন্দারের যে আলোচনা হয়েছিল নার্সিংহোমের কেবিনে বসে, তা সে জানে না বলেই তার চোখে এহেন বিস্ময়। কী বুঝল সে কে জানে, মন্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, জানো তো, অলর্ক বোসের ওপরও পরশু সন্ধেয় অ্যাটেম্পট হয়েছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছে—।

মন্দার বিস্মিত হয়ে ভুরু কোঁচকাল, তাই! ইঞ্জিওরড নাকি? পুলিশ গিয়েছিল ইনভেস্টিগেশনে? কিছু জানা গেল, কারা অ্যাটেম্পট নিয়েছিল?

—না-না। পুলিশ ওর কথা বিশ্বাস করেনি। আসলে গাড়িতে বা ওঁর শরীরে গুলি লাগার চিহ্ন নেই তো।

মন্দার হো-হো করে হেসে উঠল, আসলে ঢপ দেয়া অলর্ক বোসের ছোটবেলার অভ্যেস। এটাও একটা ঢপ।

গার্গী আর ডোনা পরস্পর চোখাচোখি করল।

মন্দার পরক্ষণেই বলল, ওঁকে তোমরা অলর্ক বোস বলছ তো? ওঁর বাবা একজন আর্মেনিয়ান ছিলেন, তা জানো? তার ছেলে বোস হয় কী করে?

গার্গী ডোনা দুজনেই চমকে উঠল ভীষণভাবে। এ কথাটা এতদিন কেউই ভেবে দেখেনি,

মন্দার সত্যিই একটা বোমা ফাটিয়ে দারুণ হকচকিয়ে দিয়েছে দুজনকে। অলর্কের চেহারাটা এমনই যে, দেখলেই অনুমিত হয় তার রক্তে বিদেশি রক্তের মিশেল আছে। তার বাবা আর্মেনিয়ান সে-খবর ডোনারা ঠিকঠাক না জানলেও রাসেল স্ট্রিটের বাড়িটা যে কোনও বিদেশির বানানো তা সবাই জানে। অলর্ক সে বাড়ি পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রেই।

গার্গী হয়তো এই বোমাটির মোকাবিলা করতে কোনও জুতসই উত্তরের সন্ধান করছিল, ঠিক সে মুহূর্তে আবারও ডোরবেল। ডোনা ছুটে গিয়ে দরজা খুলতে আবারও এক চমক। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর কেউ নয়, সুদর্শন মণীশ রায়। তাঁর মুখ আপাতত গম্ভীর হলেও তাঁর চেহারায় এমনই একটি সৌম্যভাব আছে যাতে তাঁর অভিব্যক্তিতে উপছে পড়ছে একধরনের স্মিত প্রশান্তি। ডোনার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় লুকোনো রইল না, স্যার, আপনি!

মণীশ অপ্রস্তুত হলেন না, বললেন, ঘটনাটায় আমি এতই শকড যে, মনে হল একবার তোমাদের বাড়ি ঘুরে আসি। খবরাখবর নিই। তোমার বাবার শরীর ভালো আছে?

বলতে-বলতে ভেতরে ঢুকে এলেন মণীশ রায়। ডোনা অবশ্য এই মুহূর্তে চাইছিল না, মণীশ চিত্রদীপের কাছে কুশলাদি নিন, কিংবা জমিয়ে খোশগল্প করুন। চিত্রদীপ এমনিতেই রাগি মানুষ, তার ওপর আপাতত ভীষণ টেনশনে আছেন। হঠাৎ মণীশের এই অনাকাঙিক্ষত উপস্থিতি তাঁকে ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে। কায়দা করে মণীশকে বলল, স্যার, এ-ঘরে আসুন—।

মণীশ ডোনার ঘরে ঢুকে মোড়ার ওপর বসে থাকা মন্দারকে দেখে হঠাৎ হেসে বললেন, আরে, আপনি?

মন্দার অপ্রস্তুত হয়ে গেল মণীশের কথায়, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মানে, আপনি—।

ডোনা মুহূর্তে অনুমান করে নিল মন্দারের অবাক হওয়ার কারণ। সে মণীশকে বলল, স্যার, আপনি ওকে এর আগে দেখেননি বোধহয়। মন্দার মিত্র, আমার বন্ধু।

মন্দারকে চেনার কথা নয় মণীশের। এতক্ষণে লজ্জিত হয়ে বললেন, আমারই ভুল। কেন যে ওঁকে চেনা মনে হল বুঝতে পারছি না। বোধহয় অন্য কারুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি—।

মন্দার বোধহয় মণীশের উপস্থিতি পছন্দ করল না। তার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল হঠাৎ। হয়তো মণীশের কথা ডোনার মুখে আগেই শুনে থাকবে। নিঃসন্দেহে তা প্রশংসাই। সৌম্য চেহারার মণীশকে ডোনার কাছে আসতে দেখে মন্দার অতএব অপছন্দ করতেই পারে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আজ আমি উঠি, ডোনা।

ডোনা আশ্চর্য হল, তা কেন? এককাপ চা-ও তো আসেনি এখনও। দাঁড়াও—।

মন্দার অসহিষ্ণু হয়ে বলল, না-না, থাক। আমার কিছু জরুরি কাজ পড়ে আছে। ক'দিন নার্সিংহোমে বন্দি থাকায় অফিসের কাজ কিছুই তো করা হয়ে ওঠেনি। কী যে হচ্ছে আমার কোম্পানিতে কে জানে—!

বলতে-বলতে দ্রুত উঠে পড়ল মন্দার। মণীশের দিকে একবারও না তাকিয়ে বড়-বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল। গার্গী একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। মণীশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মন্দারবাবুকে আপনি এর আগে দেখেছেন নাকি, স্যার?

মণীশ ঠিক মনে করতে পারলেন না কোথায় দেখেছেন। কিছুক্ষণ ভাবার চেষ্টা করে বললেন, আসলে দু-একটা মুখ এমন থাকে না যে, দেখলেই মনে হয় কোথায় দেখেছি। হয়তো সেরকমই—।

যাই হোক, মণীশ হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, তোমাদের পিস্তলটা পাওয়া গেছে শুনলাম—।

—হ্যাঁ, স্যার। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। তবে এখনও আমরা ফেরত পাইনি। ইনস্পেক্টর জানালেন, ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হলে তবেই। হয়তো কোর্টের একজিবিটও হতে পারে—।

মণীশ রায় হঠাৎ হাসলেন, ইউনিভার্সিটি থেকে ফোন করে জানানো হয়েছিল, ওটা ইঁটের ভেতর ঝোপের মধ্যে রাখা আছে। কে ফোন করেছিল তা জানো?

ডোনা, গার্গী দুজনেই ঘাড় নাড়ল, না তো—।

—রণজয় দত্তই ফোন করে থানায় জানায়, পিস্তলটি ওভাবে লুকোনো আছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, রণজয় কীভাবে জানল ওটা ওভাবে রাখা আছে, ওরকম একটা গোপন জায়গায়!

ডোনা, গার্গী দুজনেই আশ্চর্য হল, আর. ডি.?

—হ্যাঁ। ওরকম একটা গোপন জায়গার হদিশ একমাত্র সেই বলতে পারে যে ওখানে লুকিয়েছিল। তাই কি না বলো!

গার্গীরা হতবাক হয়ে গেল একমুহূর্তে।

—তার মানে রণজয় খুন করার পর ওখানে ফেলে গিয়েছিল পিস্তলটা। তারপর সুযোগ বুঝে থানায় ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে ওটার হদিশ।

—কিন্তু আর. ডি. কী করে পাবেন পিস্তলটা?

—আমার অনুমান, সেদিন অধ্যাপক-সমিতির মিটিঙে বাদানুবাদ হওয়ার সময়, কিংবা তার আগে বা পরে। পিস্তলটা কোথাও পড়ে গিয়েছিল সেখানে। রণজয়ই কুড়িয়ে নিয়েছিল গোপনে। তারপর—।

ডোনা আর গার্গী আর-একবার চোখাচোখি করল পরস্পর, শুধু এই অনুমানটুকু জানাতেই কি মণীশ এসেছেন এ-বাড়ি। যাতে রণজয় দত্ত পুলিশের নজরে পড়ে যায়!

॥ ২৬ ॥

চিত্রদীপের প্রদর্শনী যে সত্যিই হবে তা অলর্কের কথায় সেদিন বিশ্বাস হয়নি কারও। কিন্তু অলর্কের প্রবল জেদে, তার উৎসাহ ও কর্মতৎপরতায় সামিল হতে হল ডোনাদের বাড়ির প্রতিটি সদস্যকেই। এমনকী ডোনা উদ্বিগ্নমুখে গার্গীকে বলল, তোকেও কিন্তু আমার সঙ্গে সারাক্ষণ থাকতে হবে। ভীষণ নার্ভাস লাগছে আমার।

গার্গীও কম উত্তেজিত বোধ করছে না। কিন্তু তার টেনশন তো আর প্রদর্শনী সফল করে তোলার জন্য নয়, সে অন্য এক জটিল আবর্তে পড়ে প্রায় হাবিডুবি খাচ্ছে ক'দিন ধরে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, হয়তো খুব শিগগির আরও অঘটন ঘটবে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি তুঙ্গে, যে-কোনও সময় হত্যাকারীর খাঁড়া নেমে আসবে প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায়।

গত কয়েকদিন সে আরও বহু জায়গায় হানা দিয়েছে খুঁটিনাটি কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে। একদিন মণীশ রায়ের বাড়িতেই গিয়েছিল, মন্দার মিত্রকে সত্যিই আগে কোথাও দেখেছেন কি না। ঈষিতাদিকেও গোপনে জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই মণীশ রায় এর মধ্যে জড়িত আছেন কি না। অলর্ক বোসকে জিজ্ঞাসা করল, শিহরনদার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল কি না শেষদিকে, ঘটে থাকলে কেনই-বা। সত্যিই কী ঘটেছিল খড়্গাপুরে গিয়ে। চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকেও সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই বইয়ের র‍্যাকের পাশে পিস্তলটা দেখেছিলেন কি না।

আর কী আশ্চর্য, কোনও প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর পেল না। যা পেল তা ভাসা-ভাসা। তাতে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত। পুরো ব্যাপারটাই সহসা ধোঁয়াশার ঘোরাটোপ হয়ে ঝুলে রইল তার সামনে।

প্রবল সন্ধিৎসায় তাকে এতসব ঘোরাঘুরি করতে দেখে ডোনা একদিন রহস্য করে বলল, কী ব্যাপার রে, তুই কি তাহলে শখের গোয়েন্দা হয়েছিস?

গার্গী চোখ কপালে তুলে বলল, ধুর সে-যোগ্যতা কি আমার আছে? আসলে আমি একটা জটিল অঙ্কের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। থিয়োরেমটা অদ্ভুত।

—তোর ম্যাথসের থিয়োরেম!

গার্গী রহস্যময়ীর মতো হাসল, একটা বৃত্তের মধ্যে কত অসংখ্য ত্রিভুজ আঁকা যায়, তারই হিসেব কষছি ক'দিন ধরে।

ডোনা বিষয়টা বোধহয় ঠিক বুঝল না।

গার্গী আবার বলল, সর্বশেষ যে-ত্রিভুজটির সন্ধান পেয়েছি, তা হল, ঈষিতাদি ইদানীং মণীশ রায়ের ওপর এতটাই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত যে, অধ্যাপক রণজয় দত্তের সঙ্গেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঘনিষ্ঠতা শুরু করেছিলেন। হয়তো এরই নাম প্রতিহিংসা। যে-রণজয় দত্তকে কেউই কোনও দিন পছন্দ করেনি, এড়িয়ে-এড়িয়ে থাকত, তাঁর সঙ্গেও ঈষিতাদি—, বলে একটু হাসল গার্গী। সব জানতে পেরে এর মধ্যে মণীশ রায় একদিন রণজয় দত্তকে বলেছেন, আই উইল সি ইউ—।

ডোনা চমকে উঠল, ইজ ইট?

গার্গী হাসল, কী যে জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি!

প্রদর্শনীর কারণে ইদানীং অলর্ক বোসের খুব যাওয়া-আসা বেড়ে গেছে ডোনাদের বাড়িতে। রোজই তাকে আরও উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। যেন তার নিজের ছবিরই প্রদর্শনী হচ্ছে এমন হাবভাব তার চোখেমুখে। শুধু সংবাদপত্রেই নয়, শহরে হোর্ডিং লাগাল কয়েকটা। কিছু রঙিন পোস্টারও। এমনকি তার বাড়ির সিঁড়ির কাছে দুটো ভিডিও ক্যামেরা বসানোর আয়োজন করেছে। চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে সে বিখ্যাত করে তুলেছে রাতারাতি। সেইসঙ্গে ডোনাকেও। ডোনার বেশ কয়েকটা ছবি প্রকাশিত হয়েছে কাগজে—অবশ্যই 'এ টু জেড'-এর শো-রুমের মডেল হিসেবে।

এতসব প্রস্তুতির ভেতর ডোনা খুব উত্তেজিত। গার্গীকে বলল একদিন, কেমন বুঝছিস বল তো লোকটাকে?

গার্গী হাসল, আপাতত খুবই মিস্টেরিয়াস। যাই হোক, লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি।

ডোনা কিছুক্ষণ গার্গীর অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করল, তারপর ভুরু নাচাল, তোর শখের গোয়েন্দাগিরি কদ্দুর? কে হত্যাকারী তার কোনও খোঁজ পেলি?

গার্গী আবার রহস্যময়ীর মতো হাসল, একটু-একটু অনুমান করতে পারছি। কিন্তু এখনও কনফার্মড হইনি—।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই!

এর মধ্যে অলর্ক বোস একদিন সন্ধেয় সেজেগুজে এল ডোনাদের বাড়ি। সত্যিই ম্যানলি চেহারা অলর্কের। তার লম্বা চুল আর গোঁফ-দাড়িতে বেশ অদ্ভুত লাগে তাকে। ডোনা কিছু একটা প্রশংসাসূচক বাক্য বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ অলর্ক একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠল, তোমার ওই মন্দার মিত্র। লোকটা একেবারে ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে আমার পিছনে। ডিসগাস্টিং।

ডোনা চোখ তুলল, শান্তভাবে বলল, কেন?

—আমার শো-রুমগুলোর ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর সব টেন্ডারই বাতিল হয়ে গেছে। তবু পিছু ছাড়ছে না।

—সবগুলোই বাতিল হয়ে গেল?

—হ্যাঁ, টেন্ডার জমা দেওয়ার যেসব শর্তাবলী ছিল, মন্দার সেগুলো পূরণ করতে পারেনি। তা ছাড়া, অলর্ক একমুহূর্ত থামল কিছু একটা ভেবে, তারপর বলল, তা ছাড়া শিহরনদা চাননি, যে, মন্দার কাজগুলো পাক।

ডোনা হতবাক হয়ে গেল, শিহরনদা চাননি?

—না, উনি বারবার চাপ দিচ্ছিলেন যাতে মন্দারকে কাজটা না দেওয়া হয়।

—মন্দার সে কথা জানত?

—না, কারণ আমাদের ডিসিশন নেওয়ার আগেই মন্দার ইঞ্জিওরড হয়ে নার্সিংহোমে ভরতি হয়েছিল। পরে নিশ্চয়ই তার কানে গেছে।

ডোনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, কাজটা এখন আর দেওয়া যায় না?

অলর্ক ইতস্তত করল ডোনার দিকে তাকিয়ে, তারপর হঠাৎ বলল, মন্দারের ওপর তোমার কি কোনও দুর্বলতা আছে? হঠাৎ তাকে কাজ দেওয়ার জন্য এত পীড়াপীড়ি করছ কেন?

অলর্কের শেষ কথাগুলোয় এমন প্রচ্ছন্ন ধমক ছিল যে, তাতে চমকে উঠল ডোনা। এই অলর্ক যেন তার অচেনা। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে-আস্তে বলল, তাহলে থাক।

চিত্রদীপের প্রদর্শনীটি ঠিক কী ধরনের হবে, তা অলর্কের পরিকল্পনা শুনে প্রথমে বোধগম্য হয়নি ডোনাদের। শিল্পীদের প্রদর্শনী সাধারণত কোনও আর্ট গ্যালারিতেই হয়ে থাকে। কিন্তু অলর্ক বলেছিল, তার মধ্য কলকাতার পুরোনো দোতলা বাড়িতেই সে চিত্রদীপের প্রদর্শনী করতে চায়। সেটাই হবে একজিবিশনটির সবচেয়ে বড় স্টান্ট। তাতে চিত্রদীপ ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

কিন্তু ক'দিন আগে চিত্রদীপ নিজে গিয়ে বাড়িটার একতলা-দোতলা ঘুরেফিরে দেখার পর বিস্মিত হয়ে এসে ডোনাকে বলেছেন, বাড়িটা সুপার্ব।

সত্যিই বাড়িটি প্রাচীন ধরনের হলেও তার গঠনপরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। ইংরেজ আমলে বিদেশিদের বসবাসের বাড়িগুলি যেমন হত, এ-বাড়িটাতেও তেমনি বিশাল-বিশাল ঘর, উঁচু ছাদ, সিলিঙে কড়িবরগা, এপাশে-ওপাশে উঁচু সিঁড়ি। অলকের বাবা বিদেশি, মা এদেশি। বিদেশি ধাঁচের এহেন বাড়িটা সে পেয়েছে বাবার উত্তরাধিকারসূত্রে। এই বাড়িটিরই গোটা দোতলা জুড়ে প্রদর্শনী হবে।

দোতলায় খানছয়েক বড়-বড় ঘর। কোনওটা ড্রইং, কোনওটা ডাইনিং, কোনওটা বেডরুম। প্রতিটি ঘরে, মস্ত-মস্ত বারান্দা জুড়ে রয়েছে পুরোনো আমলের আশ্চর্য ডিজাইনের সব দামি কাঠের ফার্নিচার। এ ছাড়াও সারা বাড়িতে ছড়ানো-ছিটানো বিচিত্র সব অ্যান্টিক কালেকশন।

এ-বাড়িতে প্রদর্শনী হলে, সেটি ছবির, না কি অ্যান্টিক কালেকশনের, তা ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে কেউ।

অলর্ক চিত্রদীপকে জানিয়েছে, এই ফার্নিচারগুলোর সবক'টিই তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়। কিছু পুরোনো আসবাবপত্র আগে থেকেই ছিল ঘরে, সেগুলো এত চমৎকার আর অভিনব যে, সেগুলোর মর্যাদা বাড়াতে সে এখন কোথাও পুরোনো বাড়ির ফার্নিচার বিক্রি হচ্ছে শুনতে পেলেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কোনও ফার্নিচারের অ্যান্টিকভ্যালু আছে বুঝতে পারলে তৎক্ষণাৎ কিনে নেয় যে কোনও মূল্যে। এভাবেই সে অনেক পুরোনো টেবিল-চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, কারুকাজ করা খাট, প্রায় ম্যান-হাইটের পিলসুজ, অ্যাশট্রে, এমনকী পুরোনো ঝাড়লণ্ঠনও কিনে সাজিয়েছে বাড়িটা।

তাই অলর্ক বলেছিল চিত্রদীপকে, তাঁর এবারের যে-প্রদর্শনীটি হবে, তার ছবিগুলো একটা নতুন সিরিজ হিসেবে আঁকুন। এই বাড়িটার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে।

প্রস্তাবটা সে-মুহূর্তে ভারী স্পর্ধার বলে মনে হয়েছিল চিত্রদীপের। একজন আর্টিস্টকে কিনা ডিকটেট করছে একটা দুদিনের ছোকরা, লেম্যান। পরে বাড়িটা দেখতে এসে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এহেন বাড়িতে ছবির প্রদর্শনী করতে হলে পুরোনো যুগের স্টাইলে চিত্রমালা হাজির করলেই তা মানানসই হবে।

অলর্কের সাজেশান অনুযায়ী এবারের আঁকা তার সমস্ত ছবিই ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায়। ছবিগুলো টাঙানো শুরু হয়েছে সিঁড়িতে ওঠার পাশের দেয়াল থেকেই। ওপরের ঘরগুলিতে যেখানে যে ফার্নিচার আছে তা বিন্দুমাত্র না সরিয়ে তার ফাঁকা দেয়ালগুলোতে পরপর ছবির সমাহার। ছ'খানা

ঘর, বিশাল বারান্দা, লম্বা করিডোরের দুপাশের দেয়াল, সিঁড়ি—সব জায়গা মিলিয়ে প্রায় সত্তরখানা ছবি। মাত্র দেড়মাসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অসাধ্য সাধন করেছেন চিত্রদীপ। প্রদর্শনীটি আরও চমৎকার হয়ে উঠতে পারত, যদি কয়েকদিন আগে সেই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডটি না ঘটত।

প্রদর্শনী সত্যিই তাহলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই সংবাদে চিত্রদীপ খুবই উত্তেজিত, তবু মাঝেমধ্যে হতাশ হয়ে বলছেন, কী হবে আর এসব করে। যে কোনওদিন পুলিশ এসে অ্যারেস্ট করবে আমাকে। তখন তো সব শেষ।

ডোনা তার বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবু তারও মনের কোণে একটা বড় খিঁচ।

গার্গীও অবাক হচ্ছিল কম নয়। দু-দুটো পিস্তলের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ, দুটো থেকেই গুলি ছোড়া হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কোনও পিস্তলের মালিককেই এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি। ব্যাপারটা খোলসা করতে সে একদিন দেখা করল ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্রের সঙ্গে। ইনস্পেকটর এড়াতে চাইলেন প্রথমটা, তারপর অনেক কথাই বললেন। গার্গী ঘটনাটার পরম্পরা নোট করছে শুনে অবাকই হলেন একটু, তারপর একসময় বললেন, কে মার্ডার করেছে তা আমাদের কাছেও এক প্রহেলিকা। এই দেখুন না, সেদিন এক বৃদ্ধ অধ্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে বললেন, তিনি এক যুবককে শিহরন রায়চৌধুরির পিছনে ওইসময় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তার চোখে চশমা, মুখময় কালো দাড়ি-গোঁফ।

গার্গী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ইনস্পেকটরের দিকে। কালো দাড়ি-গোঁফ শুনে কোনও থই পাচ্ছিল না। কেন কে জানে বীরভঙ্গপুরের সেই 'সাংবাদিক'-এর চেহারার বিবরণ চকিতে ঝলক দিয়ে উঠল তার মগজে। কিন্তু বৃদ্ধ অধ্যাপক-কথিত এই রহস্যময় যুবকই কি শিহরন-হত্যার জন্য দায়ী।

এতসব উৎকণ্ঠা, টেনসন, রহস্যের মধ্যেই উদ্বোধন হয়ে গেল চিত্রদীপ চ্যাটার্জির প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীটি উদ্বোধন হওয়ার পর হইচই পড়ে গেল সারা কলকাতায়। মধ্য-কলকাতার এইসব বিদেশি ধাঁচের বাড়িতে সচরাচর কেউ প্রবেশ করে না। অধিকাংশই হয় পরিত্যক্ত, নয় অপরিচ্ছন্ন। সেরকম একটা বাড়িতে এহেন ঝকমকে চেহারার একটা প্রদর্শনী করা যায়, তা ভাবনায় ছিল না কারও। শিল্পবোদ্ধাদের যে কয়েকজন প্রথমদিন প্রদর্শনী দেখতে এলেন, তাঁরা সবাই অকুণ্ঠ তারিফ জানালেন চিত্রদীপকে।

প্রদর্শনীর ব্যাপারে ডোনার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। সে সারা কলকাতা ঘুরে-ঘুরে অজস্র মানুষকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে প্রদর্শনীতে আসার জন্য। শিল্পরসিক, নামি-অনামি চিত্রশিল্পী, সংবাদপত্রের শিল্পসমালোচকদের তো বটেই, সে আরও আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে তার পরিচিত সবাইকেও। গার্গীকে বলেছে, রোজই আসা চাই তোর। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে একটা মস্ত টেবিলের ওপর ভিজিটরস-বুক রাখা থাকবে। যাঁরা প্রদর্শনী দেখতে আসবেন তাঁদের অনুরোধ করা হবে প্রদর্শনী দেখে মতামত জানানোর জন্য। তুই সেই ভিজিটরস বুকের কাছেই থাকবি।

গার্গীও এই ব্যাপারে ভারী উৎসাহ দেখিয়েছে, নিশ্চয়ই। সে আর বলতে।

একতলার ঘরে গেট-টুগেদার। দোতলায় প্রদর্শনী। প্রথমদিনেই চেনাজানা, অচেনা মানুষে উপছে পড়ল রাসেল স্ট্রিটের গায়ে লাগা প্রাচীন চেহারার বাড়িটিতে। বাইরে থেকে দেখা যায় দোতলার ছাদের আলসেয় একটা মাঝারি চেহারার অশত্থগাছ বেশ ডাঁটো হয়ে বড় হচ্ছে ক্রমে। অলর্ক গাছটা কাটেনি, তাহলে তো বাড়িটার প্রাচীনত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রদর্শনীর রিসেপশনে ডোনা নিজেই। প্রাচীন ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের রাজকুমারীদের মতোই পোশাক তার পরনে। মাথায় একটা বাঁকানো টুপি পরে আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে নিজেকে।

বনানী আছেন আপ্যায়নের দায়িত্বে। অলর্ক অতিথি অভ্যাগতের জন্য সরবত ও মিষ্টির আয়োজন রেখেছে একতলার একটি বিশাল হলঘরে। সেকালে হয়তো নাচঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হত ঘরটি।

সন্ধের মধ্যেই অজস্র অতিথিতে ভরে গেল প্রদর্শনীর কক্ষগুলি। চেনা-অচেনা মানুষ আসছেন, আর হই-চই করে উঠছে ডোনা, এই যে, এইদিকে আসুন—এই অনামিকা, এত দেরি করলি যে—। এই যে আন্টি, আপনি একা এলেন যে বড়, আঙ্কেলকে নিয়ে আসতে পারলেন না? আঙ্কেল কি খুব বিজি? ঠিক আছে, ছুটির দিন দেখে আরেকবার আসুন। এই যে মিঃ দত্ত, আপনাকে ধুতি-পাঞ্জাবিতে আজ কিন্তু দারুণ লাগছে। কী বললেন, এরকম উৎসবের পরিবেশে ধুতি-পাঞ্জাবিই একমাত্র মানায়!

কখনও গার্গীকে বলছে, এই গার্গী তুই একটু এদিকটা দেখিস তো! কাগজের অফিস থেকে দুজন ক্রিটিক এসেছে। আমি একটু ওদের সামলে আসি।

আবার কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সস্ত্রীক মণীশ রায়কে দেখে, এই যে স্যার, আপনি তাহলে শেষ পর্যন্ত সময় করে আসতে পারলেন! ঈষিতাদি, আপনি যে সত্যিই আসবেন তা ভাবতেই পারিনি। ইস ঈষিতাদি, আপনি কী সুন্দর সেজেছেন আজ!

একটু পরেই বিখ্যাত শিল্পী সুহাস ভট্টাচার্য এসে হাজির। চিত্রদীপ ভাবতেই পারেননি সুহাসের মতো ব্যস্ত শিল্পী তাঁর প্রদর্শনী দেখতে আসবে। সুহাস ভট্টাচার্য অবশ্য বললেন, আর না এসে উপায় আছে। তোমার মেয়ে কার্ড দিতে গিয়ে পইপই করে বলে এসেছে, কাকু, যেতেই হবে কিন্তু। না গেলে কিন্তু ভাবব, আপনি আমার বাবাকে শিল্পী বলেই মনে করেন না।

সেই সুহাস ভট্টাচার্য কিন্তু চিত্রদীপের ছবি দেখে নিজেই বিস্মিত। বারবার ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলেন। আর বললেন, ওয়ান্ডারফুল। চিত্রদীপের ছবি যে এতটা হাইটে উঠেছে—।

চিত্রদীপ বেশ অবাক হলেন। এ যুগে কোনও শিল্পী অন্য কোনও শিল্পীর প্রশংসা করেন না। সবাই সবাইকে এড়িয়ে যান। বরং আড়ালে নাক সিটকান। এহেন পরিস্থিতিতে সুহাস ভট্টাচার্যের প্রশংসার একটা অন্য মূল্য আছে।

প্রদর্শনীতে আসতে বেশ দেরি করে ফেলল মন্দার। তাকে দেখেই ডোনা প্রায় ঝামরে পড়ল, এই যে মিস্টার, তুমি কি আজ এই প্রদর্শনীতে গেস্ট হয়েই এসেছ নাকি! তোমাকে আসতে বলেছিলাম বেলা তিনটেয়, আর তোমার আসতে সন্ধে সাতটা হয়ে গেল! আমরা এদিকে অতিথি সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি—।

সত্যিই ডোনার এ ক'দিন নিশ্বাস ফেলার ফুরসতটুকুও ছিল না। অলর্ক আর চিত্রদীপ যেমন কয়েকদিন ধরে এই বাড়িতে সারাদিনরাত পড়ে থেকে ছবিগুলো টাঙিয়েছে, তেমনি ডোনা করেছে পাবলিক রিলেশনের কাজ।

একটু পরে ডোনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে হইচই করে এসে পড়ল প্রদর্শনী দেখতে। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন অধ্যাপকও। সরকারি আর্ট কলেজের ছেলেমেয়েরাও এসে গেল দল বেঁধে। কেউ-কেউ ছবির সঙ্গে অলর্কের অ্যান্টিক কালেকশনগুলো দেখে তারিফ করছে। একজন দর্শক দেখতে-দেখতে বললেন, এ যেন টু ইন ওয়ান। একইসঙ্গে দুটো প্রদর্শনী দেখার অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

সেই ভদ্রলোক গার্গীর কাছে গিয়ে ভিজিটরস-বুক টেনে নিয়ে সে-কথা লিখেও দিলেন বেশ ভালোটাষা দিয়ে।

গার্গী এক ফাঁকে ডোনাকে গিয়ে একটা অদ্ভুত সংবাদ দিয়ে এল, জানিস ডোনা, তোদের রণজয় দত্তও এসেছেন প্রদর্শনী দেখতে।

ডোনা তো প্রায় টলে পড়ে যায় আর কি, বলিস কী! ওঁকে আমি অবশ্য ইনভাইট করে

এসেছিলাম, কিন্তু ভাবতে পারিনি, উনি সত্যিই আসবেন। দাঁড়া, ওঁকে একটু স্পেশ্যাল খাতির করে আসি। আমার ওপর ওঁর বোধহয় রাগ আছে। গার্গী হেসে বলল, মনে হয় না। তা হলে উনি এমন হাসিহাসি মুখে ঘুরে-ঘুরে ছবি দেখতেন না।

এক বিদেশিনীও এসে ছবি দেখছেন প্রদর্শনীতে। মহিলা বয়স্কা, মাথার সব চুলই সাদা, তবু চেহারার মধ্যে বেশ একটা তারুণ্য ঝলমল করছে, হাতের একটা নোটবইতে কী যেন নোটও করছেন ছবি দেখতে-দেখতে। অলর্ক এসে পরিচয় করিয়ে দিল ডোনার সঙ্গে, ইনি মিসেস হোয়াইট, সম্পর্কে আমার পিসি হন। বোম্বের একটা কাগজের আর্ট-ক্রিটিক। আমার টেলিগ্রাম পেয়ে চলে এসেছেন।

রাত আটটা নাগাদ ভিড় উপচে পড়ল একেবারে। ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে একটা চমৎকার গেট-টুগেদারের আবহাওয়া। এমন একটা অদ্ভুত বাড়ির পরিবেশ পেয়ে সবাই বেশ খুশি। ছবি দেখতে-দেখতে গল্পগুজব করছেন এক-একটা দল বেঁধে। এক-একটা ঘরে এক-এক দলের ভিড়। আলো ঝলমল করছে ঘরগুলো। তার মধ্যে কোনও দল ড্রয়িঙের সোফায়, কেউ-কেউ ডাইনিং টেবিলের চারপাশের চেয়ারে গোল হয়ে বসে আড্ডা জুড়ে দিয়েছেন।

অলর্ক এসে হঠাৎ ডোনাকে ডেকে নিয়ে গেল, মাদামাজেল, মণীশ রায় তোমাকে খুঁজছেন, বলছেন, ডোনা এত বিজি যে, দেখা পাওয়াই যাচ্ছে না। উনি বাড়ি চলে যেতে চাইছেন।

ডোনা হাসতে-হাসতে বলল, আমি একা আর ক'জনকে সামলাব। প্রথমদিনেই যে এতজন আসবেন, তা আমার ধারণায় ছিল না, প্রদর্শনী চলবে তো সাতদিন ধরে।

ডোনা দ্রুত চলে গেল একেবারে উত্তরের ডাইনিং-হলের দিকে। মণীশ রায় তখন সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আরও দু-তিনজন মেয়ে। খুব জমিয়ে গল্প করছে সবাই মিলে, ডোনাকে দেখে বললেন, দারুণ হয়েছে কিন্তু একজিবিশনটা। আমি কিন্তু আরও দু-একদিন চলে আসব।

ডোনা খুশি হয়ে বলল, নিশ্চয়ই স্যার। সবাই এলে তবেই না ড্যাডির এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে। কিন্তু ঈষিতাদি কোথায়?

—ঈষিতা বোধহয় নীচের দিকে গেল। ওই যে তোমার বন্ধু মন্দার এসে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, সরবত আর মিষ্টি খাওয়াবে।

—আপনি গেলেন না?

—না, আমার বেশ ভালো লাগছে এখানে। ডাইনিং-হলের এই ছবিগুলোর কালার কম্বিনেশন দারুণ লেগেছে আমার। বারবার তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে ছবিগুলোর দিকে।

—জানেন আর. ডি.-ও এসেছেন একজিবিশন দেখতে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মণীশ রায় হাসলেন নাহ। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে অন্যদিকে চলে গেল। বোধহয় এ-বাড়ির ড্রইঙের দিকে ঘোরাঘুরি করছে।

—গার্গী কিন্তু আপনাকে খুঁজছিল, ভিজিটরস বুকে কিছু একটা লিখিয়ে নিতে চাইছে আপনাকে দিয়ে।

—আমি তো এইমাত্র লিখে দিয়ে এলাম।

ডোনা উৎসাহিত হয়ে বলল, কী লিখলেন, স্যার?

—লিখলাম, বিংশ শতাব্দীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উনবিংশ শতাব্দীকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হল। গার্গীর খুব পছন্দ হয়েছে মন্তব্যটা।

ডোনাও খুশি হয়ে বলল, থ্যাঙ্কু স্যার, গার্গী বলেছে, এই চিত্রপ্রদর্শনী আর খাতায় লেখা মতামতগুলো নিয়ে ও কাগজে একটা আর্টিকেল লিখবে।

একটু পরেই সেই ঘরে এসে ঢুকলেন চিত্রদীপ। চিত্রদীপ আজ একটা চকরাবকরা ঢোলা জামা, তার সঙ্গে জিনসের প্যান্ট পরেছেন।

ঢোলাজামায় অনেকগুলো বড়-বড় পকেট। সবক'টা পকেটেই ঠাসা জিনিসপত্র। তার কোনওটায় তামাকের প্যাকেট, কোনওটা থেকে গলা বাড়িয়ে রয়েছে বিশাল আকারের ঘাড় বাঁকানো পাইপটি। ক'দিন ধরে চিত্রদীপ কেন যেন আর পাইপ ধরাচ্ছেন না সর্বক্ষণ। মাঝেমাধ্যে দু-একবার টান দিয়েই নিভিয়ে ফেলছেন তামাক।

বরং তাঁর হাতে ধরা রয়েছে এক গোছা রংমাখানো তুলি। হঠাৎ-হঠাৎ দেয়ালে আঁকা ছবিগুলোয় টুকটাক রং বুলিয়ে দৃশ্যপট অদলবদল করে দিচ্ছেন। দিয়ে যেন ভাবছেন, হ্যাঁ, এবারই ছবিটা ঠিক হল। পরমুহূর্তে আবার অন্যরং চাপিয়ে দিচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে, বেশ অস্থিরতার মধ্যে আছেন আজ।

চিত্রদীপকে দেখে ডোনা বলল, ড্যাডি, তুমি একটু এঁদের সঙ্গে কথা বলো। আমি নীচে যাচ্ছি। আমাদের আরও কয়েকজন অধ্যাপক নীচে রয়েছেন।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার পথে দেখা হল ঈষিতার সঙ্গে। ওপরে উঠছেন। ঈষিতা প্রায় পরির মতো সেজে এসেছেন আজ। আর সবচেয়ে যেটা অবাক লাগছিল ডোনার, ঈষিতা এতক্ষণ রণজয় দত্তর সঙ্গে নীচুস্বরে কিছু যেন বলছিলেন। এই ভিড়ের মধ্যেও দুজনে হঠাৎ আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য।

উজ্জ্বল রোদ্দুর রঙের শাড়ি-ব্লাউজে ভূষিতা ঈষিতাকে দেখে ডোনা হাসল, ঈষিতাদি, আপনার জন্যে স্যার অপেক্ষা করছেন। ডাইনিং-এ আছেন।

—হ্যাঁ, এইবার আমরা ফিরব।

ঈষিতা দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল, আর ডোনা নেমে এল নীচে। ওর সহপাঠী আর অধ্যাপকদের নিয়ে তখন হিমসিম খাচ্ছেন বনানী। ডোনাকে দেখে ফিসফিস করে বললেন, শিগগির আয়, আমাকে একটু হেল্প কর।

অরুনাভ নামের একটি ছেলে ডোনাকে বলল, কোত্থেকে এ-বাড়িটা তোরা জোগাড় করলি বল তো? একজিবিশনের পক্ষে ফ্যান্টা—।

—জোগাড় হয়ে গেল। বলতে গেলে আকাশ থেকে পড়ে পেলাম—।

—এটাও তোদের বাড়ি নাকি?

অলর্ক কাছেই ছিল, তাকে দেখিয়ে ডোনা বলল, উঁহু। ইনি হলেন অলর্ক বোস। এ নিউ বিজনেসম্যান ইন ক্যালকাটা। বাড়িটা এঁরই। এই ক'দিনের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করতে-করতে কথা থামিয়ে হঠাৎ অলর্ক বলল, এক মিনিট। আমি একটু নীচে থেকে আসছি, বলে সিঁড়ির দিকে দৌড়ল।

সেই মুহূর্তে অমন আলোঝলমলে বাড়িতে পট করে লোডশেডিং হয়ে গেল।

এ-বাড়িতে লোডশেডিং মানে চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটু পরেই সিঁড়ি থেকে অলর্কের গলা শোনা গেল, যে-যেখানে আছেন সবাই চুপ করে দাঁড়ান। এক্ষুনি জেনারেটার চালানো হবে।

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফট করে একটা আওয়াজ, পরক্ষণেই হঠাৎ ভারী কিছু একটা পতনের শব্দ হল সিঁড়িতে। তার সঙ্গে আর্ত একটা চিৎকার। কিছু যেন গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি বেয়ে।

ঘটনাটা এমন অতর্কিতে ঘটে গেল যে, কয়েকমুহূর্ত ভীষণ একটা নীরবতায় ছমছম করে উঠল গোটা বাড়িটা। তারপরেই কেউ যেন সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দাড় করে নেমে এল নীচে। কিছু যেন ছুড়েও ফেলল কেউ। সিঁড়িতে তখনও সেই গোঙানির শব্দ। তৎক্ষণাৎ চারদিক থেকে সমস্বরে শব্দ ভেসে এল, কী হল? কী হল?

গোঙানির আওয়াজ তখনও থামেনি। ওপর থেকে কেউ যেন বলল, সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে। শিগগির আলো জ্বালাও, আলো জ্বালাও, টর্চ কোথায়?

দেড়-দু-মিনিটের মধ্যে জেনারেটারের শব্দ শোনা গেল বাড়ির বাইরে থেকে। তারপরই দপ করে আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। আর একরাশ আতঙ্ক চোখে নিয়ে অতগুলো মানুষ দেখল—।

সিঁড়ির মাঝামাঝি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন মণীশ রায়। মাথাটা নীচের দিকে, পা দুটো ওপরের দিকের সিঁড়িতে, চোখ দুটো খোলা, বুকের বাঁ-দিকে একটা বড় ক্ষত। তার থেকে প্রবলভাবে ভেসে আসছে রক্ত। সেই তাজা লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে সিঁড়ি বেয়ে।

কে যেন সেই রক্ত দেখে অস্ফুট আর্তনাদ করে টলে পড়ল হঠাৎ। মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা গার্গী, বলল, এই, শিগগির শুইয়ে দিন ঈষিতাদিকে। অজ্ঞান হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

চিত্রদীপ ততক্ষণে ছুটে এসেছেন সিঁড়ির কাছে। মণীশ রায়কে অমনভাবে পড়ে থাকতে দেখে মাথা চাপড়াতে লাগলেন, এ কী হল, অ্যাঁ। এ কী হল। কী সর্বনাশ।

কে যেন বলে উঠল, সিঁড়ি থেকে পা হড়কে নিশ্চয় পড়ে গেছেন অন্ধকারে—।

—সিরিয়াস ইনজুরি?

—শিগগির হসপিট্যালে নিয়ে চলুন, বলে মন্দার তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে ধরতে গেল মণীশ রায়ের শরীরটা।

গার্গী তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে বাধা দিল, এখন কেউ ওঁর গায়ে হাত দেবেন না। এখানে ডাক্তার কেউ আছেন, ডাক্তার?

ভাগ্যক্রমে একজন ডাক্তারও দেখতে এসেছিলেন চিত্রদীপের প্রদর্শনী। বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক অধ্যাপকের বন্ধু ডাঃ প্রবাল রায়। তিনি দ্রুত ছুটে এসে নীচু হয়ে পরীক্ষা করলেন মণীশ রায়কে। কিছুক্ষণ পর হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, স্যরি, হি ইজ ডেড। বুকে গুলি লেগেছে, মনে হচ্ছে—।

চিত্রদীপ আর্তনাদ করে উঠে বললেন, গুলি! মাই গড। ডেড। কী সর্বনাশ—!

—হ্যাঁ, বুকের বাঁ-দিকে একেবারে মোক্ষম জায়গায় গুলি করা হয়েছে ওঁকে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ওঁর। শিগগির পুলিশকে খবর দিন।

ভিড়ের মধ্যে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল সহসা। পুলিশ শব্দের উচ্চারণে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল সবার ভেতর। ডোনা ওপাশ থেকে মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল, আমরা তাহলে একেবারে শেষ হয়ে গেলাম।

মণীশ রায়ের নিথর শরীর ঘিরে তখন গোটা প্রদর্শনীর লোক। যেন কেউ ভাবতেই পারছে না, অমন সুদর্শন পুরুষটির শরীরে প্রাণ নেই। তাঁর দুটি চোখই ভয়ার্তভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন।

অলর্ক এতক্ষণ ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ফ্যালফেলে গলায় বলে উঠল, পুলিশে খবর দিন, এক্ষুনি—।

গার্গী দোতলায় ছুটে গিয়ে টেলিফোন করতে বসল পুলিশকে, হ্যালো, ইনস্পেকটর মিঃ মিত্র কথা বলছেন? আপনাকে এক্ষুনি একবার এ-বাড়িতে আসতে হবে। রাসেল স্ট্রিটে। আবার খুন—।

পরক্ষণে গার্গী ফোন করল স্থানীয় থানায়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে মন্দার বলে উঠল, নিশ্চয়ই আমাকে টার্গেট করে গুলিটা ছোড়া হয়েছিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েই স্যারের বুকে,—ওহ, কী সাংঘাতিক। নইলে কেউ স্যারকে খুন করতে যাবে কেন?

মন্দারের চোখেমুখে কিছুটা আতঙ্ক। তার মাথার বাঁ-দিকে এখনও তুলো লাগিয়ে সেলোফেন দিয়ে আটকানো। সেদিকে তাকিয়ে দৃশ্যটি কল্পনা করে শিউরে উঠল কেউ-কেউ। মন্দার ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে, কিন্তু মণীশ নিহত হলেন আততায়ীর গুলিতে।

ক্রমশ বিষাক্ত, ভারী হয়ে উঠল গোটা বাড়ির আবহাওয়া। পুলিশ আসা মানেই এখন হাজারো কৈফিয়ত চাইবে সবাইয়ের কাছে। কয়েকদিন আগেই একটি মৃত্যু হয়ে গেছে, আবার একটি মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল একটি তাজা শরীর।

চিত্রদীপ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন, কনস্পিরেসি, কনস্পিরেসি। আমার প্রদর্শনী বানচাল করার জন্য কেউ-কেউ উঠে পড়ে লেগেছে।

গার্গী তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, আপনি কিছু ভাববেন না, আঙ্কেল। যে অপরাধী সে কিছুতেই ছাড়া পাবে না। একটু ওয়েট করুন—।

বলে কাছেই দাঁড়ানো অলর্ককে বলল, আপনি দেখুন তো, কেউ যেন পুলিশ না আসা পর্যন্ত এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে না পারে—।

মন্দার তৎক্ষণাৎ সায় দিল তার কথায়, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হত্যাকারী এ-বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে অলর্ক জানাল, এ-বাড়ি থেকে বেরুনোর সব গেটই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আগে পুলিশ আসুক, জবানবন্দি নেওয়া হয়ে গেলে তারপর গেট খুলে দেওয়া হবে—।

ভিড়ের মধ্য থেকে দু-একজন অস্ফুটস্বরে বললেন, কিন্তু সে তো এখনও ঢের দেরি। আমাদের বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে যে—।

গার্গী হাত ঘুরিয়ে বলল, স্যরি। এখন আমাদের কিছুই করার নেই। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সবাইকেই কিছু-কিছু সাফার করতে হবে। কিন্তু অলর্কবাবু, আপনি দেখুন তো, মনে হচ্ছে এটা লোডশেডিং নয়। অন্য বাড়িতে, এমনকী রাস্তায়ও আলো আছে। হয়তো কোনও ফল্ট হয়েছে এ-বাড়িতে, কিংবা এ-বাড়ির মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছে কেউ।

অলর্ক ছুটে উঠে গেল সিঁড়ির ওপরে মেনি সুইচের কাছে। সেদিকে তাকাতেই বিস্মিত হয়ে বলল, ঠিকই বলছেন তো। মাই জেশাস, কে বন্ধ করল মেইন সুইচ?

গার্গী হাসল, যিনি গুলি চালিয়েছেন, তিনিই। আমাদের মধ্যেই কেউ।

॥ ২৭ ॥

আধঘণ্টার মধ্যেই এক বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে গেল রাসেল স্ট্রিটের মস্ত বাড়িটার গেটে। তখন রাত দশটার মতো, দ্রুত নিরিবিলি হয়ে আসছে গোটা কলকাতা। এতক্ষণে প্রদর্শনীর জায়গা থেকে কাউকেও একচুল নড়তে দেওয়া হয়নি। অনেকেই উসখুস করছিলেন, 'রাত হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি ফিরতে হবে' এই বলে। পুলিশ এসে গোটা বাড়িটা ঘিরে ফেলতেই গার্গী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

পুলিশবাহিনীর নেতৃত্বে স্থানীয় থানার ইনস্পেকটর ছাড়াও রয়েছেন শিহরন হত্যার দায়িত্বে থাকা তুষারশুভ্র মিত্রও। গার্গী বিশেষভাবে তাঁকে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিল টেলিফোনে। তাঁরা পৌঁছতেই সমস্ত দর্শককে হাজির করা হল নীচের বিশাল হলঘরটিতে। আপাতত পুলিশের হেপাজতে সবাই সাময়িকভাবে আটক।

তুষারশুভ্র মিত্র গার্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন কী ব্যাপার। আপনি বললেন, শিহরন-হত্যার সঙ্গে আজকের ঘটনার একটা যোগসূত্র আছে!

গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল, আছে মনে হয়েছে বলেই আপনাকে ডিসটার্ব করলাম, ইনস্পেকটর সাহেব। তার আগে আপনি পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিন। নিহত অধ্যাপক মণীশ রায়কেও একবার দেখে নিতে পারেন। তা ছাড়া একটা কিছু ছুড়ে ফেলে দেওয়ার শব্দও শুনেছি আমরা। হয়তো সেটা একটা পিস্তল।

পুলিশ অফিসাররা মিনিট দশেকের মধ্যে ঘুরেফিরে এসে একটা ঝকমকে পিস্তল রুমালে

মুড়ে এনে বললেন, কিন্তু আমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা কিছুই পরিষ্কার হয়নি। হঠাৎ মণীশ রায়ের মতো একজন অধ্যাপকের ওপর অ্যাটেম্পট হল কেন? সেই অধ্যাপক-সমিতির ব্যাপার নিয়েই নাকি? সিঁড়ির নীচে এই পিস্তলটাই বা কার।

পুলিশ অতঃপর তার নিজস্ব পদ্ধতিতে একে-ওকে জেরা করল কিছুক্ষণ, তার মধ্যে মণীশ রায়ের ডেডবডিও পাঠিয়ে দিল যথাস্থানে। অনেকেই উশখুশ করছিলেন বাড়ি যাবেন বলে। রাত ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে বলে অনেকেই বিরক্ত। তাদের কয়েকজনকে ছেড়েও দেওয়া হল প্রাথমিক জেরার পর।

গার্গী হেসে বলল, সবাইকে তো দরকার নেই আমাদের। যারা এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারেন, শুধু তাঁরা থাকলেই হবে।

পুলিশ ইনস্পেকটর অবিশ্বাসের গলায় গার্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী করে শিওর হচ্ছেন, খুনিকে আপনি চিনতে পেরেছেন! অন্ধকারে যে ঘটনাটা ঘটে গেল—।

গার্গী বলল, সবই একে-একে বলছি, ইনস্পেকটরসাহেব। সে এতক্ষণে পুরোপুরি গুছিয়ে নিয়েছে নিজেকে। হলঘরের সমস্ত লোক তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিছুটা অসহিষ্ণু, কিছুটা বিস্ময়ের চোখেও। তাদের জোড়া-জোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলতে শুরু করল, আজকের ঘটনাটা সত্যিই অদ্ভুত, কিন্তু এরকম একটা কিছু ঘটবে বলে আমি কয়েকদিন ধরেই আশঙ্কা করছিলাম।

তুষারশুভ্র মিত্র অবাক হয়ে বললেন, সে কী!

—হ্যাঁ, কারণ যিনি শিহরন রায়চৌধুরিকে হত্যা করেছিলেন, তিনি একইসঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন আরও অনেকগুলো ঝামেলায়। একটা থেকে আর-একটা তারপর আরও একটা। শেষদিকে তিনি ধরা পড়ে যাবেন এমন আশঙ্কা করেই হঠাৎ আজকের এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে ফেলেছেন। আজকের ঘটনাটার কথাই প্রথমে বলি। আমি ভিজিটরস বুক নিয়ে সারাক্ষণ বসে ছিলাম সিঁড়ির ওপরে ফাঁকা জায়গাটায়। যিনিই প্রদর্শনী দেখতে আসছেন, সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছিলাম, প্রদর্শনী দেখে এসে যেন তাঁর মতামত লিখে জানান ভিজিটরস বুকে। তার ফলে প্রত্যেক দর্শকের গতিবিধি আমার নজরে থাকছিল। এখানে একটা বিষয় লক্ষ করার মতো। হত্যার চেষ্টাটি ঘটেছে সিঁড়ি থেকে নামবার ঠিক মুখেই। যে মুহূর্তে আলো নিভে যায়, ঠিক তার পরের মুহূর্তেই ঘটে গেল ঘটনাটি। অর্থাৎ মণীশ রায় প্রদর্শনী দেখা শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরু করার পরের মুহূর্তেই। সেক্ষেত্রে আমরা যদি কোনও উপায়ে দেখতে পারি, সেই মুহূর্তে রায়ের পেছনে বা সামনে বা কাছাকাছি কে-কে ছিলেন—।

চিত্রদীপ হঠাৎ কর্কশকণ্ঠে বলে উঠলেন। কাছাকাছি কে বা কারা ছিল তা কি এখন আর প্রমাণ করা সম্ভব? তা ছাড়া তখন তো অন্ধকার।

মন্দার হেসে বলল, বোধহয় সেটা গার্গী মুখার্জির এক্স-রে আইতে ধরা আছে। গার্গী সব কথা উপেক্ষা করে বলে চলল, আমরা আরও লক্ষ করেছি, গুলির শব্দ হওয়ার পরের মুহূর্তে মণীশ রায়ের চিৎকার, সিঁড়িতে তাঁর গড়িয়ে পড়ার শব্দ। পরের মুহূর্তে কেউ যেন হুড়মুড় করে নীচে নেমে গেলেন। অর্থাৎ হত্যাকারী তাঁর কাজটি শেষ করে ওপর থেকে নীচে নেমে এসে প্রথমে ছুড়ে ফেললেন পিস্তলটি, তারপর নেমে মিশে গেলেন ভিড়ের মধ্যে, যাতে তাঁকে কোনওক্রমেই কেউ আর সন্দেহ না করতে পারে।

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে রণজয় দত্ত বলে উঠলেন, ঠিকই বলেছ, নামবার সময় কেউ যেন আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। আমি তখন সিঁড়ির একেবারে নীচের স্টেপে।

—তাহলে আমাদের দেখতে হবে, আলো নেভার পূর্বমুহূর্তে কার অবস্থান কোথায় ছিল, তারপর আলো জ্বলার পরমুহূর্তে কে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ এইটুকু সময়ের মধ্যে ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছিলেন কি না—।

মন্দার এই মুহূর্তে বলে উঠলেন, সেসব এখন আর কীভাবে প্রমাণ হবে! ফোটো তো আর কেউ তুলে রাখেনি—।

—সেই প্রসঙ্গেই আমি আসছি এবার। আপনারা বোধহয় অনেকেই জানেন না, এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধনের মুহূর্ত থেকেই দু-দুটো ভিডিও ক্যামেরা গোটা অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। একটা ক্যামেরা রয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে সিঁড়িতে ওঠার জায়গায়, ওপরের সিলিঙে, তাতে ছবি তোলা হচ্ছে আমাদের কোন-কোন অতিথি গেট পেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন ওপরে, কিংবা কে-কে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন নীচে। আর একটা ক্যামেরা দোতলার সিলিঙে আটকানো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আরও খানিকটা ওপাশে। তাতে রেকর্ডিং হচ্ছে, গোটা দোতলার বারান্দায় যাওয়া-আসা করছেন কারা, কারা নামতে যাচ্ছেন, তাও। এই দুটো ক্যামেরায় তোলা ছবি যদি আমরা আলো নেভার আগে থেকে আলো জ্বলে ওঠার পর পর্যন্ত দেখে নিই, তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে, ঘটনা ঘটার আগে ও পরে আমাদের অতিথিদের কার অবস্থান কোথায় ছিল। অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ঠিক আগে মণীশ রায়ের কাছাকাছি বা পিছনদিকে ছিলেন, তারপর আলো জ্বলার পর তাঁকে সিঁড়ির নীচে দেখা যাচ্ছে কি না!

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, ক্যামেরায় গোটা প্রদর্শনী রেকর্ডিং করে রাখা হচ্ছে, তা তো আমাকে জানানো হয়নি।

অলর্ক বলে উঠল, আপনাকে সারপ্রাইজ দেওয়া হবে বলেই ডোনা নিষেধ করেছিল বলতে।

রণজয় দত্ত অবিশ্বাসের গলায় বললেন, মাই গড! তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে কে এই মার্ডারটি করেছে?

গার্গী মাথা নেড়ে বলল, সম্ভবত না। তার আগে এই ঘটনার নেপথ্যে যে-জটিল কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছিল, সেগুলো বলা দরকার। আমি প্রথমে সেই কাহিনি বলে খুনের মোটিভ প্রমাণ করতে চাই। তারপর ভিডিও ক্যামেরার রেকর্ডিং দেখে শনাক্ত করব অপরাধীকে। তা ছাড়াও আমার হাতে আরও প্রমাণ আছে।

টুঁ শব্দটি শোনা যায় না এমন নিস্তব্ধ হলঘরের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করি। আপনারা অনেকেই জানে, কয়েকদিন আগেই অধ্যাপক শিহরন রায়চৌধুরি খুন হয়েছিলেন। একটি প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে। বীভৎস সে-খুন, কিন্তু তার খুনিকে ধরতে পারেনি পুলিশ। আমি গোপনে সমস্ত ব্যাপারটা স্টাডি করছিলাম বেশ কিছুদিন ধরে। কিছু-কিছু প্রমাণ আমার হাতে পৌঁছলেও আমি অপেক্ষা করতে চাইছিলাম চরম মুহূর্তের জন্যে। মনে হচ্ছিল হত্যাকারীকে খুব শিগগির হাতেনাতে ধরা যাবে। কিন্তু তাতে ক্ষতির মধ্যে এই হল যে, আমাদের একজন প্রিয় অধ্যাপককে হারাতে হল। তবে—, গার্গী একমুহূর্ত থেমে আবার বলল, তবে এই মণীশ রায়কে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটি ত্রিভুজ রহস্য, যা এই জটিল কেসটি সমাধানে অনেকগুলো ক্লু রেখে যায়—।

ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র এই সময় মুখ খুললেন, ত্রিভুজ রহস্য?

—হ্যাঁ, কয়েকদিন আগেই ডোনাকে বলেছিলাম একটা জটিল থিয়োরেম আমাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে ক'দিন ধরে। একটা বৃত্তের মধ্যে কত অসংখ্য ত্রিভুজ আঁকা যেতে পারে সেটাই আমার কাছে এক জটিল ধাঁধা। সত্যিই অসংখ্য ত্রিভুজ গড়ে উঠেছে এই হত্যারহস্যের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি চরিত্রকে ঘিরে। চরিত্রগুলো হল, শিহরন রায়চৌধুরি, মণীশ রায়, ঈষিতা রায়, অলর্ক বোস, রণজয় দত্ত, চিত্রদীপ চ্যাটার্জি, বনানী চ্যাটার্জি, ডোনা চ্যাটার্জি এবং মন্দার মিত্র।

ভিড়ের ভেতর থেকে যেন ধমকে উঠলেন চিত্রদীপ, ননসেন্স।

—শিহরন রায়চৌধুরি খুন হওয়ার পর সন্দেহভাজন হিসেবে প্রথমে আমি যে-দুজনের কথা মনে করেছিলাম, তাঁদের একজন হলেন রণজয় দত্ত, অন্যজন মণীশ রায়। হ্যাঁ, মণীশ রায়। কিন্তু

তাঁর কথায় পরে আসছি। প্রথমে শুরু করি রণজয় দত্তকে দিয়ে। একটি রিডার পোস্টের জন্য দাবিদার ছিলেন দুই অধ্যাপক মণীশ রায় ও রণজয় দত্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে মণীশ তাঁর চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়ার পর প্রতিযোগিতা থেকে হটে গিয়েছিলেন রণজয় দত্ত। কিন্তু তাতে হাল ছাড়েননি তিনি। অধ্যাপক হিসেবে মণীশ রায় ভীষণ জনপ্রিয় হওয়ায় তাঁর ওপর আগে থেকেই তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন, তার ওপর রিডারের পদটিও মণীশ পাচ্ছেন বুঝে তাঁর নামে নানান অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ং উপাচার্যের কাছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। রিডারের পোস্টটি পেয়েছিলেন মণীশ রায়ই। আর এ ব্যাপারে মণীশকে প্রবলভাবে সহায়তা করেছিলেন আর-এক অধ্যাপক শিহরন রায়চৌধুরি, এই সেমিনারে মণীশ রায়ের পক্ষে এবং রণজয়ের বিপক্ষে তাঁর শাণিত বক্তব্য রেখে। তা ছাড়া রণজয় ও শিহরনের মধ্যে ছিল দীর্ঘ কুড়ি বছরের শত্রুতা। স্বভাবতই এই খুনের ব্যাপারে প্রথমে যাঁর ওপর আমাদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে, তিনি রণজয় দত্ত।

রণজয় দত্ত চোখ কটমট করে গার্গীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ইউ আর অ্যা ফার্স্ট ক্লাস স্টুপিড।

—কিন্তু ইতিমধ্যে শিহরণ রায়চৌধুরি জড়িয়ে পড়েছিলেন অন্য একটি ব্যাপারে। আমরা জানি, শিহরন ছিলেন একজন তুখোড় ব্যক্তিত্বের মানুষ। তাঁর প্রচুর সদগুণ ছিল সন্দেহ নেই। তিনি ভালো লিখতে পারতেন, বলতে পারতেন, পড়াতেনও ভারী চমৎকার পড়ানোর বিষয়ের বাইরেও তাঁর অনেক জ্ঞান ছিল, টেবিল-টকেও ছিলেন বেশ এক্সপার্ট। কিন্তু তাঁর আর একটি হবি ছিল মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমানোয়। নারীর প্রতি ছিল তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ। তাঁর অনেক বান্ধবী ছিল, তাদের নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানোটা ছিল তাঁর অন্যতম হবি। এর মধ্যে একদিন শিহরন রায়চৌধুরি গেলেন মণীশ রায়ের বাড়ি, তাঁর প্রোমোশন পাওয়ার ব্যাপারে কনগ্রাচুলেশন রাখতে। সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল ঈষিতা রায়ের।

মাত্র তিন বছর বিয়ে হয়েছিল ঈষিতা-মণীশের। কিন্তু মণীশ রায়ের ইদানীংকার ব্যবহারে ঈষিতা ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড। মণীশ রায় সুপুরষ, আকর্ষণীয় ব্যাক্তিত্বের মানুষ। ঠিক যে-কারণে ঈষিতা ছুটেছিলেন তাঁর পিছনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন, একইভাবে বহুকাল ধরে ছুটেছে বা ছুটছে আরও বহু তরুণী। মণীশ তাদের প্রত্যেককেই প্রশ্রয় দিতেন, তাদের জন্যে সময় ব্যয় করতেন ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরে। তাতে আস্তে-আস্তে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন ঈষিতা। তাঁর মনের ভেতরকার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ হঠাৎ একদিন টার্ন নিল অন্যভাবে। হঠাৎ তিনিও অন্য পুরুষদের প্রতি আসক্ত হতে শুরু করলেন। শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গে পরিচয় হতেই তাঁর সঙ্গেও জড়িয়ে পড়লেন প্রবলভাবে। প্রায়ই তাঁদের দেখা যেতে লাগল এখানে-ওখানে, কখনও রেস্তোরাঁয়, কখনও হোটেলে, কখনও লেকে-পার্কেও।

মণীশ রায়ের পক্ষে ছিল এটা একটা বিরাট ধাক্কা। এতকাল তিনিই একচেটিয়া উপভোগ করেছেন নারীসঙ্গ, তাদের নিয়ে ঘুরেছেন, সিনেমা দেখেছেন, রেস্তোরাঁয় খেয়েছেন, এখন হঠাৎ তাঁর স্ত্রী ভোগ করছেন অন্য পুরুষ-সঙ্গ, এটা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। জীবনে সফলকাম একজন সুপুরুষ হঠাৎ আঘাত পেলে তার পরিণাম বড় ভীষণ হতে পারে। শিহরন রায়চৌধুরির হত্যার পর আমি তাই মণীশ রায়কে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম। যে-সন্দেহে আরও ইন্ধন জোগালেন ঈষিতা রায়ই। আমাকে বললেন, এম. আর. নিজেকে আড়াল করার জন্যে দোষ চাপাচ্ছে অন্যের কাঁধে।

এখানে 'অন্যকে' বলতে বুঝিয়েছিলেন রণজয় দত্তর কথা। এর মধ্যে রণজয় দত্তকে নিয়ে আর একটা ইতিহাস আছে। ঈষিতা যেমন শিহরনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তেমনি সঙ্গ দিচ্ছিলেন রণজয় দত্তকেও। এ ব্যাপারটাও হঠাৎ করে ঘটে যায়। ঈষিতা মণীশের ওপর শোধ তুলতে গিয়ে নিজে থেকেই একদিন রণজয় দত্তের সঙ্গে পুরোনো আলাপ ঝালিয়ে তুলতে চাইলেন। একদা ছাত্রী

ঈষিতা, তার ওপর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মণীশ রায়ের স্ত্রী, এমন সুবর্ণ সুযোগ হারালেন না রণজয়। তিনিও ঈষিতাকে নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে লাগলেন। আর তা অন্যকে দেখিয়েই। ফলে রণজয়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কলহ হল মণীশের, আবার শিহরনেরও। রণজয় আর শিহরনের কলহ অনেকদিনের, তা আবার অন্য চেহারায় ধরা দিল ঈষিতাকে কেন্দ্র করে। সুতরাং শিহরন-হত্যার পিছনে রণজয় দত্তের ভূমিকা আছে, আমার এই পুরোনো ধারণাটি উসকে উঠল আবারও। এদিকে মণীশ রায়ও আমাকে ঠিক একই কথা বললেন। তিনিও চাইছিলেন, এই সুযোগে রণজয় দত্তকে ফাঁসিয়ে দিতে।

কিন্তু ইতিমধ্যে শিহরন জড়িয়ে পড়েছিলেন আরও কয়েকটি ব্যাপারে। তার প্রথমটি হল অধ্যাপক-সমিতির নির্বাচন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন শিহরন। সে-সময় তাঁর সহপাঠী এবং বিপ্লবী-আন্দোলনের সহযোগী ছিলেন রণজয় দত্তও। পরে রণজয় পড়তে আসেন কমপ্যারেটিভ লিটারেচার। শিহরন থেকে যান ইংরেজিতে। কলেজে আন্দোলন চলাকালীন ম্যানিফেস্টো লেখা নিয়ে রণজয় দত্তর সঙ্গে প্রবল ঝগড়া হয়েছিল শিহরনের। শিহরন দল থেকে বেরিয়ে আসেন। রণজয় শিহরনের বিবাদ সেই শুরু। আর তার জের এখনও চলছিল অধ্যাপক-সমিতির দুই অ্যাসোসিয়েশনের লড়াইয়ে। এর সঙ্গে আবার জড়িয়ে আছে আর একটি প্রেমপর্ব।

শিহরন রণজয়ের সঙ্গে একই ইয়ারে পড়তেন বনানী, আর এই দুই পুরুষই ছিলেন বনানীর দুই প্রেমিক। দুজনেই বনানীর প্রেমে পাগল। কিন্তু বনানী হঠাৎ বিয়ে করে বসলেন শিহরনকে। সম্ভবত শিহরনের কিছুটা নারী আকর্ষণের প্রতিভা ছিল বলেই। বিয়েটা হয়েছিল কিছুটা গোপনে, বাসও করতেন একটু দূরে শহরতলি এলাকায়। কিন্তু শিহরন কোনওদিন এক নারীতে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই বনানীর সঙ্গে তাঁর বিয়েটা টিকল না। এর কিছুদিন পরেই বনানীর বিয়ে হল চিত্রদীপের সঙ্গে। এই পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু এর মধ্যে শিহরন হঠাৎ দীর্ঘকাল পরে চিত্রদীপের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় পুরোনো ত্রিভুজ শিহরন-বনানী-রণজয়ের মধ্যে যেমন নতুন মাত্রা পেল, তেমনি তৈরি হল শিহরন-বনানী-চিত্রদীপের মধ্যে নতুন ত্রিভুজ। শিহরন আর বনানীর মধ্যে যে একদা একটি সম্পর্ক ছিল তা আগে জানতেন না চিত্রদীপ, হঠাৎ ইদানীং সেটা জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, আর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বনানী-শিহরন দুজনেরই ওপর।

চিত্রদীপ বেশ কয়েকবার বিরক্ত হয়ে বনানীকে বলেছেন, শিহরনকে ঘর ছেড়ে দিতে বলো, আমি ও-ঘরে স্টুডিও করব। কিন্তু বানানী তাতে একবারও রাজি হননি। তাতে আরও জটিল হয়ে উঠল রহস্য। এ ছাড়া শিহরন যে চিত্রদীপের লে-আউট করা শো-রুম দেখে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তা সহ্য করাও কঠিন হয়ে উঠল চিত্রদীপের পক্ষে। শিহরন হয়ে উঠেছিল তাঁর পরম শত্রু। অতএব চিত্রদীপও হয়ে উঠলেন অন্যতম সন্দেহভাজন।

তার সঙ্গে কিন্তু বনানীও—।

কারণ ঘটনাটা হঠাৎই মোড় নিল অন্যদিকে, যখন শিহরন ওঁদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট থাকতে-থাকতে ঝুঁকে পড়লেন ডোনার দিকে। শিহরন যে তাকে নিয়ে প্রায়ই এখানে-ওখানে যাচ্ছেন এটা সহ্য করতে পারছিলেন না বনানী। বনানী শিহরনকে হাড়ে-হাড়ে চেনেন। শিহরন কতটা নারী-শরীরপিপাসু তা জানেন বলেই তাঁর ভেতরে জ্বলছে এক ভয়ঙ্কর ক্রোধ, কিন্তু তা প্রকাশও করতে পারছেন না, কারণ শিহরনকে তিনিই ডেকে এনে জায়গা দিয়েছেন বাড়িতে এবং জীবনের চরম ভুলটি করেছেন। ইতিমধ্যে বনানী এও জেনেছেন, শিহরন ঈষিতা রায়ের সঙ্গেও ঘোরাঘুরি করছিলেন ইদানীং। এসব নিয়ে গোপনে প্রায়ই কথা কাটাকাটি চলছিল বনানী আর শিহরনের মধ্যে।

এহেন প্রেক্ষাপটে হঠাৎ চিত্রদীপের পিস্তল খোয়া যাওয়ায় ঘটনার গতিবেগ ঘুরে গেল অন্যদিকে। পিস্তল পুনরুদ্ধার হতে আরও গাঢ় হল রহস্য, কারণ দেখা গেল তাতে একটি কার্তুজ কম। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়ল চিত্রদীপ বা বনানীর ওপর।

এই খোয়া যাওয়া পিস্তলটি নিয়েও কিন্তু ঘটে গেল অনেক নাটক। চিত্রদীপের অনুমতি না নিয়েই বনানী আলমারি থেকে বার করেছিলেন পিস্তলটা। তাঁর কাছ থেকে সেটা নিয়ে শিহরন গিয়েছিলেন খড়্গপুরের ট্যুরে। খড়্গপুর থেকে ফেরার পর পিস্তলটা ঠিক কার কাছে ছিল তা পরিস্কার বোঝা গেল না। প্রথমে ভাবা হল, শিহরন ফেলে এসেছেন অলর্কের বাড়িতে। অলর্ক জানালেন, ওটা শিহরনদা রেখে এসেছেন মণীশ রায়ের ওখানে। মণীশ রায় কিন্তু অস্বীকার করলেন ব্যাপারটা। অথচ ঈষিতা জানালেন, মণীশ রায়ের কাছেই পিস্তলটা দেখেছেন উনি। এদিকে চিত্রদীপ বললেন, শিহরন খড়্গপুর থেকে ফিরে আসার দিন রাতেই অথবা তার পরদিন সকালে বেরুবার আগে বইয়ের র‍্যাকের পাশে ওটা রেখে গিয়েছিলেন। তারপর বনানী, না কি চিত্রদীপ, কার কাছে ওটা ছিল শেষ পর্যন্ত তাও স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পিস্তলটা পাওয়া গেল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। আমার অনুমান, সেদিন খড়্গপুর থেকে ফেরার পর যখন শিহরনদা গিয়েছিলেন মণীশ রায়ের বাড়ি, তখনও তাঁর কাছে পিস্তলটা ছিল, সেটা দেখিয়েও ছিলেন মণীশ রায়কে, কিন্তু রাতে সেটা বাড়ি এনে ভুলে রেখে দিয়েছিলেন বইয়ের র‍্যাকের পাশে। পরদিন সকালে সেটা চিত্রদীপের চোখে পড়লেও কোনও কারণে তুলতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে বনানীই কোথাও রেখেছিলেন। কিন্তু পুলিশ এসে ঝামেলা শুরু করায় ভয়ে আর বার করেননি। কারণ, তাতে একটি কার্তুজ কম ছিল, শেষ পর্যন্ত ফেলে এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, যাতে পুলিশের নজর অন্যদিকে ঘুরে যায়।

কিন্তু এত সব ঝামেলার মধ্যে আর-একটি যে জটিলতা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, তা আর-এক ত্রিভুজ রহস্যের নায়ক অলর্ক বসুর বিশাল ব্যাবসাসম্পর্কিত কর্মকাণ্ড। ভবঘুরে, প্রায় কপর্দকহীন অলর্ক বসু ভোজবাজির মতো এক বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে গেলেন রাতারাতি। অত টাকা হাতে পেয়ে প্রথম দিকে তাঁর মাথা ঘুরে গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, ভালো একটি ব্যাবসায়ে নিয়োগ করবেন টাকাটা। সে-ব্যাবসার পরিধি এমনই বড় যে, একা অলর্কের পক্ষে তা সামাল দেওয়া অসম্ভব। এহেন অবস্থায় শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গে অলর্কের আলাপ, তাতে অলর্ক তাঁর ওপর কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। শিহরনও উপলব্ধি করলেন, অলর্ককে ঠিকমতো গাইড করার একজন লোক দরকার, নইলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এত বড় ব্যাবসায়। এই ভাবনাটাই তাঁর পক্ষে কাল হল, কারণ ব্যাবসায় নামলেই শত্রুর সৃষ্টি হয় চারপাশে। শিহরনও এমন-এমন সিদ্ধান্ত নিতে লাগলেন, তাতে কারও-কারও স্বার্থের হানি হতে শুরু হল। যেমন হল চিত্রদীপ, কিংবা মন্দারের। হয়তো আরও অনেকের। সিদ্ধান্তগুলো যদি অলর্ক নিজে নিতেন, তাহলে হয়তো এত শত্রুর সৃষ্টি হত না, যতটা হল শিহরনের নাক গলানোয়। অলর্ক নিজেও কখনও-কখনও বিরক্ত হতে লাগল শিহরনের এই অতিরিক্ত ফোঁপরদালালিতে। খড়্গপুরে একবার কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল দুজনের মধ্যে, এমনকী প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দুজন-দুজনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল যার পরিণতি হয়তো এই ঘটনায় এনে দিত অন্য এক বাঁক, কিন্তু তার ডিটেলস পরে বলছি। চ্যালেঞ্জের মূল কারণ ব্যাবসা-সংক্রান্ত হলেও আসল লক্ষ ছিল ডোনা। শিহরন যেমন ঝুঁকেছিলেন ডোনার দিকে, অলর্ক বোসও চেয়েছিলেন ডোনা হবে তাঁরই এক্সক্লুসিভ।

আসলে অলর্ক বোস একটু রোমান্টিক স্বভাবের যুবক, কিন্তু তাঁর রক্তে বিদেশি-ছোঁয়া থাকার ফলেই হোক, অথবা একা-একা নিঃসঙ্গভাবে বেড়ে ওঠার কারণেই হোক, তিনি অসম্ভব জেদি, একগুঁয়ে, যা ভাববেন, তাই-ই করতে হবে ওঁকে। ওঁদের কেন্দ্র করেও সৃষ্টি হয়েছিল তিন-তিনটি ত্রিভুজের। শিহরন-অলর্ক-ডোনা, শিহরন-মন্দার-ডোনা, এবং অলর্ক-মন্দার-ডোনা। আসলে ডোনা এমনই একটি মেয়ে যে একইসঙ্গে অনেক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে, তাদের সময় দিতে পছন্দ করে। তাদের ভালোবাসে কি বাসে না তা আমার আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু তার এই বোহেমিয়ানা অহেতুক সৃষ্টি করল প্রচুর জটিলতা। হঠাৎ একদিন আলাপ হওয়ার পর সে পছন্দ করে ফেলল মন্দার মিত্রকে। তাকে সময় দিতে লাগল, এমনকী তাকে নিয়ে তিনদিনের আউটিংও করে ফেলল

প্রেমিক-প্রেমিকার ধাঁচে। পাশাপাশি শিহরনের সঙ্গে গড়ে উঠল এক অসম অস্বাভাবিক সম্পর্ক। ঠিক সেই মুহূর্তে পটভূমিকায় অলর্ক বোসের দুর্দান্ত আবির্ভাব বদলে ফেলল সমস্ত ছক। অলর্ক হঠাৎ ডোনাকে তার 'এ টু জেড'-এর এক্সক্লিউসিভ গার্ল হিসেবে যেমন পাবলিসিটি দিতে লাগল বিপুলভাবে, তেমনই তার পিছনে খরচ করতে লাগল হাজার-হাজার টাকা, আবার এই আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করল, ডোনাই হবে তার জীবনের এক্সক্লিউসিভ নারী।

অতএব স্বাভাবিকভাবেই ঘনিয়ে এল শিহরন-মন্দার-অলর্কের ভেতরকার যুদ্ধ।

আর এটা তো জানা কথাই যে, যুদ্ধ যদি প্রেমঘটিত হয়, তবে তা হয়ে ওঠে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম লড়াই। যার মুখে পড়লে যে-কেউ কুটোর মতো ভেসে যেতে পারে। সুতরাং শিহরন-হত্যার এই জটিল রহস্যের মধ্যে মণীশ-রণজয়-চিত্রদীপ-বনানীর মতোই সম্ভাব্য খুনি হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি অলর্ক বা মন্দারকে।

কিন্তু এর মধ্যে আরও কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যা এই জটিলতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শুধু জড়িতই নয়, জটিলতাকে জটিলতর করে তুলল। দুর্ঘটনার প্রথমটি হল মন্দার মিত্রের আহত হওয়া, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে ভরতি করতে হল নার্সিংহোমে। শিহরন হত্যার কয়েকদিন পর পর্যন্ত তাঁকে নার্সিংহোমের কেবিনেই কাটাতে হল। দ্বিতীয়টি, অলর্ক বোসের ওপর হত্যার প্রচেষ্টা যা একটুর জন্যে লক্ষভ্রষ্ট হল। তৃতীয় ঘটনাটি হল, মণীশ রায়ের ওপর আজকের এই আক্রমণ।

আরও একটি ঘটনা এইসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হলেও কারও ঠিক নজরে পড়েনি, পড়বার কথাও নয়, তা হল, বীরভঙ্গপুরের এক রাজবাড়ির রানিমার খুন হওয়া, তার জের হিসেবে তাঁদের হেড লেঠেল হরিশংকর চৌধুরির মৃত্যু। হরিশংকরের লাশ আবার পাওয়া গিয়েছিল অলর্ক বোসের বাড়ির ঠিক কাছেই। পুলিশ সন্দেহ করেছে, এটা অলর্কের কাজ।

আমরা ভিডিও-রেকর্ডিং দেখার আগে একবার বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির ইতিহাসও শুনে নিই, তাতে এতগুলো খুনের মোটিভ সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

আপনারা লক্ষ করেছেন কি না জানি না, কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দুরত্বে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে সেখানকার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী বৃদ্ধা লাবণ্যপ্রভা মিত্র নাটকীয়ভাবে খুন হয়েছিলেন। সে-বাড়ির আশ্রিত-আশ্রিতারা, এমনকী, স্থানীয় পুলিশও খুনি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রাজবাড়িতে কিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের অছিলায় বেড়াতে আসা জনৈক সাংবাদিককে। সাংবাদিকটির বিশেষত্ব হল, তার মুখময় কালো দাড়ি-গোঁফ, চোখে চশমা, এবং লেখে বাঁ-হাতে। তার কাছে ছিল একটি সাইডব্যাগ, তার মধ্যে কিছু জামাকাপড়, লেখার প্যাড ও একটি কলম। সেই সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধার কাছে সে রোজই গিয়ে বসত রাজবাড়ির প্রাচীন ইতিহাস ও তার উত্তরাধিকারের গল্প শুনতে। তারপর হঠাৎ শেষ দিনে সে বৃদ্ধার কাছে প্রকাশ করে সে-ই বৃদ্ধার একমাত্র জীবিত নাতি, এই রাজবাড়ির শেষ জীবিত উত্তরাধিকারী, বৃদ্ধার এই যাবতীয় সম্পত্তি তারই প্রাপ্য। বৃদ্ধা কোনও কারণে তাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন। 'সাংবাদিক'টি আক্রোশে, ক্রোধে নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। বৃদ্ধাকে খুন করে সেই মুহূর্তে পালিয়ে আসে বীরভঙ্গপুর ছেড়ে। আসার সময় তাড়াহুড়োয় সে বীরভঙ্গপুরে ফেলে এল সাংবাদিকের মোক্ষম অস্ত্র, লেখার প্যাড আর কলম—যে-দুটি ক্লু থেকে হত্যাকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব। কিন্তু কলকাতার এই বিশাল জনসমষ্টির মধ্যে সেই সাংবাদিককে খুঁজে বার করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, যদি না সে তার কোনও ঠিকানা অথবা নিদেন কোনও হদিশ রেখে আসে রাজবাড়ির কোনও আশ্রিত-আশ্রিতার কাছে। তাকে চেনা আরও অসম্ভব হয়ে পড়ল, কেন না তার দাড়িটি ছিল নকল, সে চশমাও পরে না। শুধু যা লুকোতে পারেনি, তার লেখার প্যাড আর কলম।

যুবকটি হয়তো এভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই চলে যেত, যদি না তার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়ে যেত হরিশংকর চৌধুরির। তার চশমা, কালো দাড়ি-গোঁফ না থাকা সত্ত্বেও তাকে একদিন

চিনে ফেলেন হরিশংকর। যুবকটিকে চিনে ফেলাই কারণ হল হরিশংকরবাবুর জীবনের সমাপ্তির। তাঁকে খুন হতে হল সেই মুহূর্তে। কারণ হরিশংকরবাবু তাকে চিনে ফেললে সেই যুবককে ঝুলতে হবে ফাঁসির দড়িতে। শুধু তা-ই নয়, হরিশংকরবাবু বরাবর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁকে লাবণ্যপ্রভার নাতি হিসাবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে একটু দম নেওয়ার জন্য থামল গার্গী। মন্দার মিত্র হঠাৎ হেসে উঠে বলল, এত সব কথা আপনি জানলেন কী করে ভেবে আশ্চর্য লাগছে।

গার্গী হাসল, এর জন্যে এ ক'দিন কম ছোটাছুটি করতে হয়নি, মন্দারবাবু। এমনকী ক'দিন আগে একদিন বীরভঙ্গপুরেও ছুটতে হয়েছে আমাকে। যাই হোক, ইতিমধ্যে পুলিশ অলর্ক বোসের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে খুঁজে পেল আর-একটা পিস্তল, এটা আবার বিদেশি মেকারের। আশ্চর্যের কথা এই যে, সে-পিস্তলটির চেম্বারেও একটি কার্তুজ কম। অর্থাৎ, সেটা থেকেও একটি গুলি ছোড়া হয়েছে। তাতে ব্যাপারটায় আরও জট পাকিয়ে গেল। চিত্রদীপ ও অলর্ক দুজনের পিস্তলেই একটি করে কাতুর্জ কম, তাহলে কার পিস্তল সেদিন সন্ধেয় ব্যবহৃত হয়েছিল শিহরনকে খুন করতে! দুটো পিস্তল যেহেতু দুই মেকারের, তাহলে ব্যালিস্টিক রিপোর্ট দেখলেই তো বোঝা যাবে শিহরনের শরীরে কোন পিস্তলের গুলি ব্যবহৃত হয়েছে। সেটা তো পুলিশ ইনস্পেকটর জেনেই গেছেন। তাহলে তিনি কেনই-বা সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করছেন না? পুলিশের তরফ থেকে কোনও উচ্চবাচ্য না হওয়ায় আমি নিজেই একদিন যোগাযোগ করলাম ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্রের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে যা জানলাম তা আরও আশ্চর্যের। জানা গেল শিহরনের দেহ থেকে যে-গুলি পাওয়া গেছে তা এই দুটো পিস্তলের কোনওটা থেকেই ছোড়া নয়। সে-গুলি অন্য কোনও পিস্তলের। অর্থাৎ, আরও ঘোরালো হয়ে উঠল রহস্য।

হত্যাকারী কে, ততদিনে অবশ্য একটু-একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমার সামনে। বীরভঙ্গপুরের রানিমাকে যিনি হত্যা করেছিলেন, তাঁর ব্যবহৃত লেখার প্যাড আর কলম দেখে দুটি ক্লু আমার সামনে তখন পরিষ্কার। একটি, খুনি বাঁ-হাতে লেখে, কিন্তু তার হাতের লেখা চমৎকার, অলঙ্কারবহুল, আর তার ব্যবহৃত পেনটিতেও একটি বিশেষত্ব। সে-কথায় আমি পরে আসছি। আরও একটি ক্লু, তার মুখে কালো দাড়ি। কয়েকদিন আগে পুলিশ ইনস্পেকটর আমাকে জানালেন, এক বৃদ্ধ অধ্যাপক তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন, তিনি এক দাড়িওয়ালা যুবককে শিহরনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছেন। আবার সেদিন মণীশ রায়ও আমাকে বললেন, তাঁর পাশেই বসেছিল যে যুবক, তার মুখে দাড়ি ছিল, সে-ও শো-ভাঙার মুখে হঠাৎ তাঁর পাশ থেকে উঠে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। যুবকটিকে অবশ্য তিনি চেনেন না।

আমাদের চেনাজানা যতজন সন্দেহভাজন আছেন, তাঁদের মধ্যে এক অলর্ক বসুর মুখেই দাঁড়ি-গোঁফ ভরতি।

অলর্ক বোস এই সময় হেসে উঠে বলল, তাহলে কি আপনি ধরে নিয়েছেন যে, আমিই এই খুনগুলো করেছি।

গার্গী হাসল, আপনাকে হত্যাকারী হিসেবে ভাবার কিন্তু অনেকগুলো কারণ আছে, মিঃ বোস। তার কিছু-কিছু কথা আমি আগেই বলেছি। হয়তো আপনিই ছদ্মবেশে বীরভঙ্গপুরে গিয়ে উত্তরাধিকারত্বর লোভে হত্যা করেছিলেন লাবণ্যপ্রভাকে। তারপর হরিশংকর চৌধুরির সঙ্গে আপনার শত্রুতা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছিল তা নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। হরিশংকর বরাবর আপনার উত্তরাধিকারের দাবিকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন, এবং শাসিয়েও ছিলেন— আপনি যে সত্যিই উত্তরাধিকারী নন তা ফাঁস করে দেবেন সবার কাছে। দ্বিতীয়ত, শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গেও আপনি জড়িয়ে ফাঁস করে দেবেন সবার কাছে। দ্বিতীয়ত, শিহরন রায়চৌধুরির সঙ্গেও আপনি জড়িয়ে পড়েছিলেন অনেকগুলো ঝামেলায়। ডোনার সঙ্গে আপনার মেলামেশা যেমন উনি পছন্দ

করেননি, আপনিও সহ্য করতে পারছিলেন না শিহরণদার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করুক ডোনা। শিহরনদার সঙ্গে আপনার ব্যাবসা সম্পর্কিত ব্যাপারেও নানান জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছিল। হয়তো শিহরনদা চেয়েছিলেন আপনার এই বিশাল সম্পত্তির অংশও। সবচেয়ে বড় কথা, খড়্গাপুরে আপনারা দুজনই গিয়েছিলেন দুটি পিস্তল নিয়ে, সে-দুটি পিস্তলেরই একটি করে চেম্বারে কার্তুজ নেই। আপনি অবশ্য সেদিন স্বীকার করেছেন, খড়্গাপুরে দুজন-দুজনকে উদ্দেশ করে গুলি ছুড়েছিলেন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কারও গায়ে গুলি লাগেনি। হয়তো সে-উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটে ডান্স-ড্রামার শেষ দৃশ্যে পৌঁছে।

অলর্ক বোস হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, অদ্ভুত আপনার ব্যাখ্যা—।

—আমাদের সন্দেহভাজনদের মধ্যে আরও একজন আছেন তিনি মন্দার মিত্র।

মন্দার মিত্র আকাশ থেকে পড়লেন, আমিও?

—হ্যাঁ, ধরুন আপনিই ছদ্মবেশ ধারণ করে গিয়েছিলেন বীরভঙ্গপুরে, রানিমার নাতি বলে পরিচয় দেওয়ার পর তিনি আপনাকে মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে হত্যা করে পালিয়ে এলেন কলকাতায়। মনে করুন, দাড়ি এবং চশমা দুটোই ছিল আপনার ছদ্মবেশ। পরবর্তীকালে অলর্ক বসুর বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে ফেরার সময় হরিশংকর চৌধুরি চিনে ফেলেন আপনাকে। আপনি তখন অলর্ক বসুকে টার্গেট করতে ঘুরঘুর করছেন সেখানে, তাঁর অফিসেও। সুতরাং হরিশংকরকেও হত্যা করতে হল আপনাকে। শুধু তাই নয়, তার লাশ আপনি ফেলে এলেন অলর্ক বসুর বাড়ির কাছাকাছি, যাতে পুলিশের নজর পড়ে তারই ওপর। কিন্তু আপনার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী তখন অলর্ক বসু, যে কিনা রাজবাড়ি গিয়ে আপনার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন ক'দিন আগে, বীরভঙ্গপুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে। তাঁকে চিঠি দিয়ে শাসালেনও, ইয়োর ডেজ আর নাম্বারড। কিন্তু পরে বুঝেছিলেন, অলর্ক বসুকে মেরে আর লাভ নেই, তাতে তার দখল করা সম্পত্তি আর আপনার ভোগে আসবে না। বরং ইতিমধ্যে এ চেষ্টাও করতে লাগলেন, যাতে অলর্ক বসুর কয়েক লক্ষ টাকার ইনটেরিয়র ডেকরেশনের কাজটা হাতানো যায় কোনও ভাবে। কিন্তু তাতে আপনার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন শিহরন রায়চৌধুরি। তিনি বারবার চাপ সৃষ্টি করছিলেন অলর্ক বসুর ওপর, যাতে মন্দার মিত্রকে কাজটা না দেওয়া হয়। আপনি তা জানতে পেরে প্রথমেই ঠিক করলেন শিহরন রায়চৌধুরিকে সরিয়ে দিতে হবে এই পৃথিবী থেকে। সিদ্ধান্ত নেওয়ামাত্র আপনি হঠাৎ একদিন শরীরে একটা মাইনর ইনজুরি করে ভরতি হলেন নার্সিংহোমে। ডোনা আপনার সঙ্গে নার্সিংহোমে দেখা করতে গিয়ে ড্যান্স-ড্রামার একটি কার্ড দিয়ে আসে নিছক সৌজন্যবশত। আপনার সামনে এসে গেল সুবর্ণসুযোগ। ছদ্মবেশ ধারণ করে সেই কার্ড নিয়ে আপনি ফাংশনের দিন চলে গেলেন অডিটোরিয়াম হলে, বসলেন মণীশ রায়ের ঠিক পাশেই। আপনার ঠিক সামনের চেয়ারে ছিলেন শিহরন রায়চৌধুরি। যিনি শো শেষের ঠিক আগেই এগিয়ে গিয়েছিলেন সামনে, ডোনাদের অভিনয়কে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন বলে। ভিড়ের মধ্যে আপনিও সিট ছেড়ে এগোলেন আপনার কোমরে গোঁজা পিস্তলটি নিয়ে। তারপর—।

—বাহ্-বাহ্, মন্দার মিত্র ব্যঙ্গের সুর মিলিয়ে একটু গলা চড়িয়ে বলে উঠল গার্গীকে লক্ষ করে, ভালো বানিয়েছেন তো গল্পটা। আপনি একজন ভালো স্টোরি-টেলার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গল্পটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে অন্যের চোখে অপরাধী প্রতিপন্ন করবেন না। শিহরনদা মার্ডার হওয়ার সময় আমি নার্সিংহোমে অচেতন।

—কিন্তু মন্দারবাবু, নার্সিহোমের ব্যাপারটা একেবারে সাজানো। ওই নার্সিংহোম থেকে যে আপনি যখন-তখন বেরোতে পারতেন, তা আমার জানাই আছে। শিহরনদার মার্ডারের সময় আপনি নার্সিংহোম থেকে বেরিয়েছিলেন কি না তাও জানা গেছে ওই নার্সিংহোমে যোগাযোগ করে। ওদের রেজিস্টারে নোট করা আছে আমি দেখে এসেছি। যাই হোক, সেদিন ফাংশনের হলে যিনি আপনাকে

নজরে রেখেছিলেন এবং পরে ডোনাদের বাড়িতে চিনলেন তিনি মণীশ রায়। ফলে হত্যাকারীর পরবর্তী টার্গেট হলেন মণীশ রায়ই। এখন তাহলে আমরা ভিডিও রেকর্ডিঙের দুটি টেপই একবার চালিয়ে দেখে নিই, ছবি দেখে মণীশ রায়ের হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা যায় কি না। আমার এতক্ষণের অনুমান কিছু-কিছু মিলছে কি না তাও প্রমাণিত হয়ে যাবে—।

গার্গী সুইচ টেপার সঙ্গে-সঙ্গে হলঘরের এককোণে রাখা টি.ভি.-র স্ক্রিনের দিকে সবাই তাকিয়ে রইল রুদ্ধশ্বাসে।

স্ক্রিনে তখন দোতলার ক্যামেরার দৃশ্য দেখাচ্ছে। জমজমাট আলোর মধ্যে প্রদর্শনী কক্ষে যাওয়া-আসার ভিড়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একে-একে অতিথিরা চলেছেন প্রদর্শনীর দিকে। কেউ-কেউ ফিরে আসছেন তাঁদের দেখা শেষ করে। গার্গী তার ভিজিটরস বুক নিয়ে বসে আছে সিঁড়ির প্রায় কাছাকাছি। মাননীয় অতিথিদের ফিরে আসতে দেখলেই সে অনুরোধ করছে ভিজিটরস বুকে কিছু লিখে দেওয়ার জন্য। অনেকেই নীচু হয়ে দু-একটা লাইন লিখছেন, কেউ হেসে বললেন, এখনও সব দেখা শেষ হয়নি, পরে লিখছি। কেউ আবার লেখার অনুরোধ এড়িয়ে যাচ্ছেন। খানিক পরেই দেখা গেল মণীশ রায়কে। মণীশ রায় তার আগেই তাঁর মন্তব্য লিখে গেছেন, তাই তাঁকে আর অনুরোধ জানাল না গার্গী, পরিবর্তে মিষ্টি হেসে বলল, 'এখনই কি চলে যাবেন, স্যার?' মণীশ রায় হেসে বললেন, 'যাব, ঈষিতা কোথায় আছে আগে খুঁজে বার করি। সে বোধহয় ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে।' মণীশ রায়ের ঠিক পিছনেই ছিলেন একজন অপরিচিত মহিলা, তাঁকে এর আগে দেখেনি গার্গী, তাই শুধু মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনি কি কিছু লিখবেন? তিনি ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেলেন, তাঁর ঠিক পিছনে মন্দারকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসতে। তারপর রণজয় দত্ত। হঠাৎ অলর্ককে দেখা গেল উঠে আসতে।

তার একটু পরেই লোডশেডিং। লোডশেডিং পর্ব শেষ হলে দেখা গেল অনেকেই ছুটে আসছেন দোতলার ঘরগুলো থেকে। কিন্তু তার আগেই তো ঘটে গেছে সেই নৃশংস ঘটনাটি!

গার্গী উঠে এসে বদলে দিল ক্যাসেট। এরপর একতলার সিঁড়ির গোড়ায় যে-ক্যামেরা ছিল তার দৃশ্য ভেসে উঠল টি.ভি.-তে। সবাই আর-একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্ক্রিনের দিকে।

আবার সেই অতিথিদের ক্রমাগত সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার দৃশ্য। চমৎকার পোশাকে সেজেগুজে এসেছেন সবাই। প্রত্যেকেই দারুণ খুশির মেজাজে আছেন। কত যে দর্শক এই প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন তা সত্যিই গুনে শেষ করা যায় না, কেউ উঠছেন কেউ নামছেন। কেউ-কেউ পাশাপাশি গল্প করতে-করতে উঠছেন বা নামছেন। টুকরো-টুকরো শব্দও ধরা পড়েছে রেকর্ডিঙের সময়। 'চমৎকার, দারুণ হয়েছে।' 'এতদিন চিত্রদীপ চ্যাটার্জির একজিবিশন ঠিক ফলো করিনি আমরা', ইত্যাদি নানান সব মন্তব্য।

বেশ অনেকক্ষণ পর দেখা গেল সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে মণীশ রায়। তার পিছনেই সেই অপরিচিত মহিলা, তারপর আগে-পরে মন্দার ও রণজয় দত্ত। কাছাকাছি অলর্ক বসু। পরক্ষণেই নিভে গেল স্ক্রিনের ছবি। একটা বিরাট শব্দ, আর আর্ত চিৎকার। হুড়মুড় করে কেউ নেমে এল যেন নীচে। বেশ খানিকক্ষণ পর আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল সিঁড়ির ওপর অচেতন হয়ে পড়ে আছেন মণীশ রায়। তাঁর বাঁ-দিক থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। তারপর হুড়মুড় করে ওপর দিকে ছুটে আসছেন কেউ-কেউ, নীচ থেকেও অনেকে—তাদের মধ্যে মন্দারও।

দেখতে-দেখতে গার্গী বলে উঠল, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কে ওপরের দিক থেকে ছুটে নেমে আসছেন, কেই-বা নীচের দিক থেকে ছুটে ওপরে যাচ্ছেন। যিনি ওপরে ছিলেন আলো নেভার আগে, আলো জ্বালার পর কেন তিনি নীচে থেকে ওপরে ছুটে গেলেন সেটাই নিশ্চয়ই ভাববার বিষয়। মণীশ রায়কে কে খুন করতে পারেন, তা নিশ্চয় আপনারা অনুমান করতে পারছেন?

গার্গী মুখে না বললেও সবাই বুঝতে পারলেন, মন্দার মিত্রের কথাই বলতে চাইছে সে।

ভিডিও-রেকর্ডিং শেষ হতেই পুলিশ ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র বলে উঠলেন, ভিডিও-টেপে দারুণ ধরেছেন কিন্তু ব্যাপারটা। কিন্তু আপনারা কী করে জানলেন, আজই এরকম একটা মিসহ্যাপ হবে?

গার্গী হাসল, আমরা জানতাম না এরকম মিসহ্যাপ হবে আজ। ব্যাপারটা একেবারেই কাকতালীয়। অলর্ক বসু নেহাত খেয়ালবশেই এই রেকর্ডিঙের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইনস্পেকটর তবু আবারও প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে, বীরভঙ্গপুরের ঘটনার সঙ্গে কলকাতার ঘটনা আপনি মেলালেন কী করে?

গার্গীর কাছে সে-প্রশ্নের জবাবও তৈরি। হেসে বলল, তাহলে বীরভঙ্গপুরের কাহিনির আসল রহস্য পরিষ্কার করি এবার। বীরভঙ্গপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র বিপুল সম্পত্তির মালিক, তবু তাঁকে দুর্ভাগাই বলতে হবে। তাঁর অনেকগুলি পুত্রকন্যা হওয়া সত্ত্বেও শেষজীবনে প্রায় নিঃসন্তানের মতো জীবনযাপন করতে হয়েছে। বেশ কয়েকটি পুত্রকন্যা অল্পবয়েসে মারা যায়। তিনটি সন্তান জীবিত ছিল, তার মধ্যে একমাত্র পুত্র সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাওয়ার পর খবর এসেছিল সে-ও মারা গিয়েছে। বাকি দুটি কন্যা বড় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাদের বিয়ের কথা যখন ভাবাভাবি হচ্ছিল, দুটি কন্যাই পরপর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে এমন দুই যুবককে, যারা কেউ-ই রাজবাড়ির পছন্দের নয়। একজন রাজেশ্বরী, সে বিয়ে করেছিল রাজবাড়িরই আশ্রিত একটি লোককে যে একাধারে মাতাল ও লম্পট, শুধু তা-ই নয়, তার অন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিল। অন্যজন উর্বশী, সে কলকাতা বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ এক বিদেশি যুবককে পছন্দ করে, তার সঙ্গেই কোথাও উধাও হয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে এমন খবর এসেছিল রাজবাড়িতে। অতঃপর কোনও মেয়ের সঙ্গেই আর রাজবাড়ির সম্পর্ক ছিল না। রাজা জীবিত থাকতে তাদের নামও কখনও উচ্চারিত হয়নি রাজবাড়িতে। এমনকী রানিমাও কখনও মেয়েদের নাম মুখে আনতেন না।

আশ্চর্যের কথা এই যে, দীর্ঘকাল পরে যে-যুবক রাজবাড়িতে সাংবাদিকের ছদ্মবেশে সম্পত্তির লোভে হানা দিয়েছিল, সে রাজেশ্বরীরই পুত্র। কিন্তু রানিমা সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছিলেন রাজেশ্বরী এক বিবাহিত লম্পটের সঙ্গে পালানোয়। ফলে তার গর্ভজ সন্তানকেও ক্ষমা করতে পারেননি। তাতে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ সেই যুবক উত্তেজনার মাথায় খুন করেছিল রানিমাকে। তার পরের কাহিনিও কম রোমাঞ্চকর নয়। রানিমা খুন হওয়ার পরে অন্য যে-যুবক রাজবাড়ির উত্তরাধিকার দাবি করে হাজির হয়েছিল বীরভঙ্গপুরে, সে রানিমার আর-এক কন্যা উর্বশীর একমাত্র পুত্র।

আপনারা হয়তো অনুমান করেছেন, এই দুই যুবকের প্রথমজন মন্দার মিত্র, অন্যজন অলর্ক বোস।

গার্গী একটু থামতেই উপস্থিত শ্রোতাদের ভেতর কেউ-কেউ বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য!

কিছু গুঞ্জন, ফিসফাসও শুরু হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। মন্দার মিত্রকে হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠতে দেখা গেল।

আর-একটু বলার ছিল গার্গীর। কিছুক্ষণ দম নিয়ে সে বলল, মন্দার মিত্র একদিন একটা প্রশ্ন করে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন আমাদের। অলর্ক বোসের পিতা ছিলেন এক আর্মেনীয়, সেক্ষেত্রে তাদের পদবি বোস হল কী করে। অলর্ক তার উত্তর দিয়েছেন সেদিন। সেই বিদেশি ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী উর্বশীর রূপে, গুণে, ভালোবাসায় এমনই মুগ্ধ ছিলেন যে, নিজের বিদেশি পদবি বদলে কিছুটা মজা করেই উর্বশীর পালটি ঘর হিসেবে নিজের নামের পাশে বোস পদবি লিখতেন বরাবর। ছেলের নামও রেখেছিলেন সেভাবে। ঘটনাটি অভিনব সন্দেহ নেই।

অলর্ক এতক্ষণে তার মুখে সেই বিখ্যাত সরল হাসিটি ফুটিয়ে বলল, এত ইতিহাস কিন্তু আমিও জানতাম না, মিস মুখার্জি। আপনি আমাকেও সারপ্রাইজ দিলেন।

গার্গী হাসল, অবাক করার মতোই ঘটনা। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয়, পৃথিবীর সব

রাজবাড়িতেই এমন আশ্চর্য সব রূপকথা লুকিয়ে থাকে। এ-যুগের পরিত্যক্ত রাজবাড়িগুলো খুঁজলে আবিষ্কৃত হতে পারে এহেন দুর্ধর্ষ সব কাহিনি। এহেন অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা আরও উসকে দিয়েছে মন্দার মিত্রের বীরভঙ্গপুরে অভিযান। বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির কাহিনি খুঁজে বার করতে আমাকে আরও সাহায্য করেছেন সে-বাড়ির আশ্রিত-আশ্রিতারা, তার সঙ্গে সেই সাংবাদিক ওরফে মন্দার মিত্রের সংগ্রহ করা তথ্যাবলী, যা লেখা আছে ওখানকার থানায় একজিবিট হিসেবে রক্ষিত প্যাডটিতে।

বলতে-বলতে মন্দার মিত্রের ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া চেহারার দিকে তাকিয়ে গার্গী বলল, আপনি কিন্তু কোনওভাবেই বাঁচতে পারছেন না, মিঃ মিত্র। আপনি বরাবর বাঁ-হাতে লেখেন। আপনার প্যাডের সেই হাতের লেখার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছি নার্সিংহোমের বেডে রাখা আপনার ডায়েরির হস্তাক্ষরের সঙ্গে। তা ছাড়া আপনার যাবতীয় টেন্ডারের কাগজের লেখালেখি সব বাঁ-হাতে লেখা। শুধু সেদিন আমাকে আপনার অফিসের ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন যে-কাগজটিতে, তাতে ছিল ডানহাতের লেখা। গোটা-গোটা অক্ষরের সেই লেখা পড়ে আশ্চর্যই হয়েছিলাম সেদিন। কারণ ডায়েরির হস্তাক্ষরের সঙ্গে তার কোনও মিলই ছিল না। পরে বুঝেছিলাম, বীরভঙ্গপুরের ঘটনাটা গোপন করতে আপনি অন্যের সামনে ডানহাতে লেখার চেষ্টা করছিলেন ইদানীং। আপনার বিরুদ্ধে আর-একটি প্রমাণও আছে—তা আপনার কলমগুলি। ডটপেনই হোক, বা ফাউন্টেন পেনই হোক, তার পেছনদিকটা দাঁত দিয়ে চিবোনো আপনার অভ্যাস। এই মুহূর্তে আপনার পকেটে যে-কালো রঙের ডটপেনটি আছে, তাতেও নিশ্চিত দাঁতের দাগ থাকবে, যে-দাঁতের কারুকাজ আমি দেখে এসেছি বীরভঙ্গপুরের থানায় জমা রাখা ফাউন্টেন পেনটিতেও। সব মিলিয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আপনিই সেই অপরাধী। শুধু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম চিত্রদীপ চ্যাটার্জির খোয়া-যাওয়া পিস্তল, কিংবা অলর্ক বসুর পিস্তলটির জন্যে। পরে যখন জানতে পারলাম, শিহরনদাকে খুন করা হয়েছে তৃতীয় কোনও পিস্তল দিয়ে, তখনই নিশ্চিত হই, খুনি চিত্রদীপ, বনানী বা অলর্ক নয়, অন্য কেউ।

বলে একমুহূর্ত থামল গার্গী, আচ্ছা, মিঃ ইনস্পেকটর, আপনি একটু দেখবেন মন্দার মিত্রের ডটপেনটি? আর এ-বাড়িতে সিঁড়ির পাশে পড়ে থাকা পিস্তলটিতে ক'টা কার্তুজ আছে?

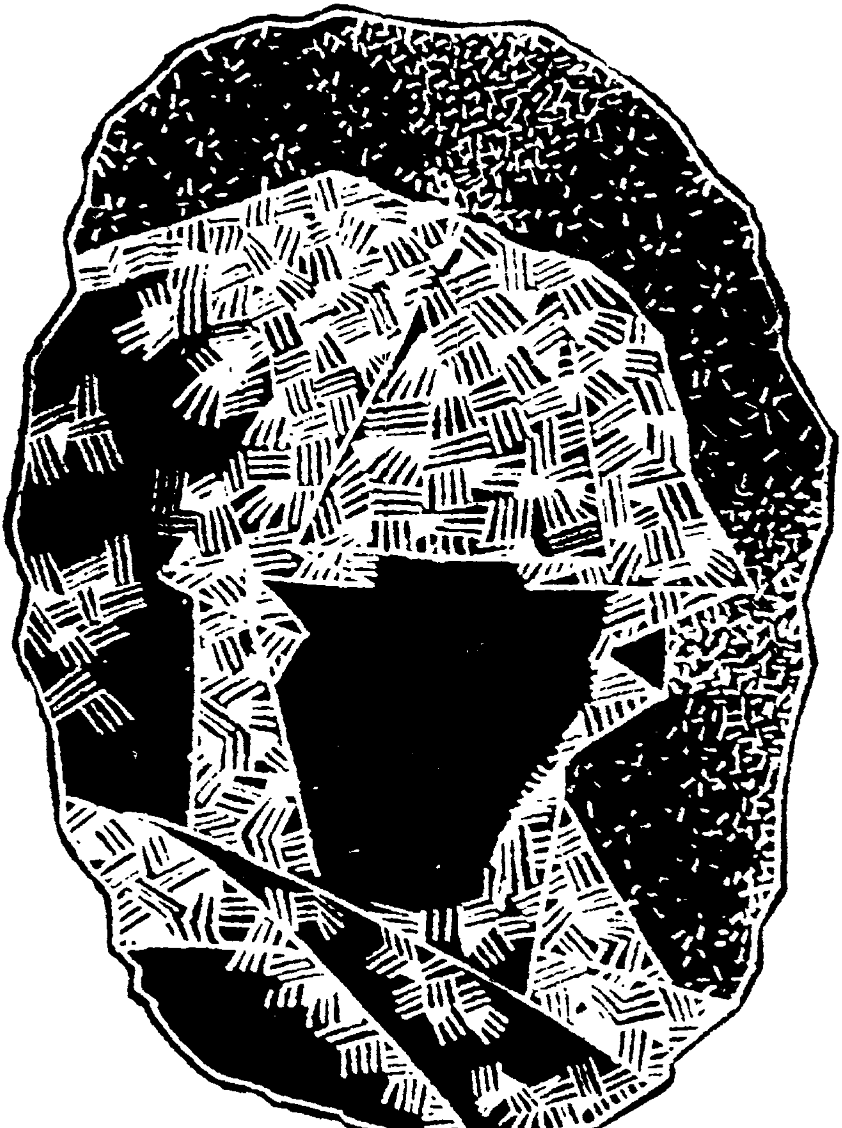
মন্দার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে তুষারশুভ্র মিত্র তার পকেট থেকে বার করলেন যে-কলমটি, তাতেও দাঁতের দাগ।

পিস্তলের চেম্বার খুলতে দেখা গেল, তাতে তিনটি গুলি কম। সম্ভবত শিহরন হত্যার পর অলর্ক বোসকেও ছোড়া হয়েছিল আর-একটি গুলি। এ ছাড়া আজ আর-একটি।

গার্গী বলে উঠল, তাহলে মন্দার মিত্রের সত্যিই দুর্ভাগ্য। অমন বিশাল সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা কিন্তু তাঁরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত উত্তেজনায় ভোগেন বলে তাঁকে খেসারত দিতে হল আজ। শেষ পর্যন্ত অলর্ক বোসই জিতলেন।

অলর্ক বোস উঠে দাঁড়াল সেইমুহূর্তে, তার সেই ভুবন-ভোলানো হাসি ছড়িয়ে বলল, এখনও পুরোপুরি জিতিনি কিন্তু। আই ওয়ান্ট ডোনা চ্যাটার্জি অ্যাজ মাই এক্সক্লিউসিভ—।

কুষ্ঠাপ্পার শিকে



অমিত মুখোপাধ্যায়

গত রোববার প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফেরার পথে বীরভদ্র রায়চৌধুরি আবার ওঁর বাড়িতে আমায় আমন্ত্রণ জানালেন। আগেও বেশ কয়েকবার উনি আমায় বাড়িতে ডেকেছেন, আর আমি 'পরে আসব' বলে এড়িয়ে গেছি। ভদ্রতার খাতিরে সেদিন ভেতরে যেতেই হল। প্রথমে সিঙাড়া সহযোগে চা পানের পরে বীরভদ্র আমায় বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখালেন—সত্যিই সুন্দর আর সাজানো বাড়ি। ওঁকে তা বলতে, প্রশ্ন করলেন, 'বাড়িটা তো ভালো লেগেছে বললেন, তা বাড়ির নামটা আপনার কেমন লাগল?'

বীরভদ্রের বাংলোটার নাম 'কৃষ্ণাপ্পা প্রসাদ'। প্রশ্নটাতে একটু আশ্চর্য হলেও বলি, 'কেন, ভালোই তো। তবে নামটায় যেন একটা দক্ষিণী ছাপ রয়েছে বলে মনে হয়।'

বীরভদ্র বললেন, 'আমি বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও আমার বাড়ির নামে দক্ষিণী ছাপ হল কেন বলুন তো?'

আর-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন। তাই পালটা প্রশ্ন করি, 'মনে হচ্ছে আপনার বাড়ির নামকরণের পিছনে একটা গল্প রয়েছে, তাই না?'

বীরভদ্র বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। তবে গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। অবিশ্বাস আর ঠাট্টা-তামাশার শিকার হতে হবে বলে এতদিন তা কাউকে বলিনি। এ ক'দিন আপনার সঙ্গে মিশে বুঝেছি যে, আপনি অন্যদের মতো নন, তাই ঘটনাটা আপনাকে শোনাব। তবে তা বলতে সময় লাগবে, তাই আজ দুপুরে চলে আসুন না।'

দুপুরে আসব কথা দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হই। বীরভদ্র রায়চৌধুরির সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র দেড় মাসের। এখানে উঠে আসবার পর, প্রাতর্ভ্রমণের সময় প্রতিদিনই ভদ্রলোককে রাস্তায় দেখতাম। শুরু থেকেই ওঁর ক'টি জিনিস আমার নজর কাড়ে। প্রথমটি হল, ভদ্রলোকের 'বাঘা' নামের বৃদ্ধ অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কুকুরের নামটাই শুধু খাঁটি বাংলা নয়, কুকুরের সঙ্গে ওঁর কথোপকথনও চলে বাংলা ভাষায়। মহারাষ্ট্রের এক শহরতলিতে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে বাংলা ভাষা শুনলে তা যে-কোনও বাঙালিরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দ্বিতীয়টি হল, ভদ্রলোকের হাতের ছড়ি। সেটা যে ওঁর কুকুরকে সামলানোর জন্য নেওয়া নয়, তা দেখলেই বোঝা যায়। ছড়িটা কাঠের—নানারকম বাহারি কাজ করা। এ-ধরনের ছড়ি সাধারণত নজরে পড়ে না। আমার ধারণা যে, সেটা খুবই পুরোনো—অ্যান্টিক জাতীয় কিছু। তৃতীয়টি আমার কাছে একটু হাস্যকর লাগলেও তা নিঃসন্দেহে নজরে পড়বার মতো। সেটি হল ওঁর বাড়ির নেপালি দারোয়ান—আসতে যেতে সে ওঁকে প্রকাণ্ড সেলাম ঠোকে।

ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও নিজের অমিশুক স্বভাবের জন্য আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করে উঠতে পারিনি। একদিন সকালে পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে ছিলাম। ভদ্রলোক নিজের থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। সম্ভবত আমাদের দুজনেরই পরস্পরকে বেশ ভালো লেগেছিল, তাই তার পরদিন থেকে আমরা একসঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতে শুরু করলাম। সেদিন থেকে বীরভদ্রের সঙ্গে আমার সকালটা কাটে। প্রতিদিনই আমাদের নানারকম গল্পগুজব হয় বটে, তবে ওঁর বাড়ি সম্বন্ধে কোনও কথা উনি আমায় আগে বলেননি।

সে যাই হোক, ঠিক দুপুর একটায় বীরভদ্রের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। ওঁর নিজস্ব বসবার ঘরে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসবার পর বীরভদ্র শুরু করলেন।

আজ থেকে বারো বছর আগেকার কথা। আমার চাকুরি জীবনের সেই সময় একটা অদ্ভুত জিনিস বেচতে হত আমাকে—শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লি। এই চুল্লি বেচতে দেশের এ-কোণ থেকে

ও-কোণ অবধি ছুটে বেড়াতাম। দৌড়োদৌড়ি থাকলেও কাজটা আমার ভালোই লাগত।

সেবার কেরলের একটা ছোট্ট শহর থিরুভাল্লা থেকে একটা চুল্লির অর্ডার পেয়েছিলাম। চুল্লির দামের কিছুটা অংশ যদিও অগ্রিম পাওয়া গেছে, কিন্তু তার সিংহভাগটাই বাকি। চুল্লিটা থিরুভাল্লার শ্মশানে বসিয়ে দিয়ে, একটি শব দাহ করে শহর কর্তৃপক্ষকে চুল্লির কার্যকুশলতার প্রমাণ দিয়ে তবেই বকেয়া টাকাটা পাওয়া যাবে। তাই চুল্লি বানানো শেষ হতেই সেটা নিয়ে থিরুভাল্লা রওনা হয়ে গেলাম।

সেখানে পৌঁছে দেখি, শহর-মিউনিসিপ্যালিটির আসন্ন নির্বাচনের জন্য শহরের অবস্থা থমথমে হয়ে রয়েছে। ভেবেছিলাম চুল্লিটা চালু করে দিয়ে চটপট ফিরে আসতে পারব। কিন্তু প্রথম দিনেই বুঝতে পারলাম যে, কাজটা সোজা হবে না। নির্বাচনের কাজে শুধু নেতারা নন, মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারাও ব্যস্ত।

প্রথম দিনটায় কোনও কাজই হল না। থিরুভাল্লা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার অতি সজ্জন ব্যক্তি। দ্বিতীয় দিনে তাঁর মধ্যস্থতায় শ্মশান বিভাগের কর্তারা একটু তৎপর হয়ে, তাঁদের নতুন শ্মশানে চুল্লিটি বসাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। শ্মশানটা নতুন তৈরি হচ্ছে, সেখানে তখনও শব দাহ হয় না। সেজন্য একদিক থেকে কাজের সুবিধে হলেও নানা জিনিসের অভাব আর যাতায়াতের অসুবিধের জন্য শুধু চুল্লি বসাতেই পুরো দুটো দিন গেল। ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন দিতে আরও একদিন।

চুল্লি বসাতেই চারটে দিন কেটে গেল। এবারে একটা শব ঠিকঠাকভাবে দাহ করে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের দেখিয়ে দিতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু সেটা করতে ক'দিন লাগবে কে জানে। দাহ করবার জন্য একটা বেওয়ারিশ লাশ দরকার। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের সহায়তা ছাড়া তা জোগাড় করা সম্ভব নয়। এমনিতেই তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া মুশকিল, তার ওপর নির্বাচনের জন্য এখন তাদের দর্শন মেলাই ভার।

আরও দুটি দিন কেটে গেল কিন্তু লাশ জোগাড় হল না। এই এক সপ্তাহে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় লড়াইয়ের পর্যায়ে নামায় আমাদের কাজটা আরও মুশকিল হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে এমন একটা খবর কানে এল যে, আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। চুল্লি বসানোর ব্যাপারটা নিয়ে বিপক্ষের রাজনৈতিক নেতারা না কি একটা গোলমাল পাকাবার তালে রয়েছেন। প্রচার চালানো হচ্ছে যে, এখনকার মিউনিসিপ্যালিটির নেতারা অনেক টাকাকড়ি নিয়ে অনৈতিকভাবে এ-কাজটা আমাদের পাইয়ে দিয়েছেন। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। ঠারেঠোরে চাওয়া সত্ত্বেও আমরা কাউকে ঘুষ দিইনি বলে মিউনিসিপ্যালিটির কিছু লোক আমাদের ওপর অখুশি ছিল। এই অপপ্রচারের পিছনে যে তারাই রয়েছে, তা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু বুঝলেই বা কী করবার আছে? এই ডামাডোলের মধ্যে এ-অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়া, ভস্মে ঘি ঢালার সমান।

কমিশনার সাহেবের পরামর্শ নিতে ওঁর অফিসে হাজির হয়েছিলাম। চুল্লি বসানোর ব্যাপার নিয়ে রাজনৈতিক অপপ্রচারটা ওঁর কানেও পৌঁছেছে। উনি বললেন, সে নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই—একটা শব দাহ করে চুল্লিটি কার্যকর হয়েছে দেখাতে পারলেই তিনি আমাদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তবে শব দাহের জন্য প্রয়োজনীয় বেওয়ারিশ লাশ জোগাড় করা যে এখন সহজ হবে না সে-কথাও তিনি বললেন। শুধু মিউনিসিপ্যালিটির ভরসায় না থেকে বেওয়ারিশ লাশ জোগাড়ের প্রচেষ্টায় আমাদেরও একটু তৎপর হতে বললেন উনি। জানা গেল যে, এখানকার সরকারি হাসপাতালের 'ডিন' ও মর্গের অধিকারী ডাক্তার, দুজনেই অতি সজ্জন ব্যক্তি ও কমিশনার সাহেবের বিশেষ পরিচিত। বেওয়ারিশ লাশ জোগাড় করবার

জন্য এঁদের দুজনের সঙ্গে উনি আমাদের সরাসরি আলোচনা করে দেখতে বললেন।

ওঁদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল, তাতে আমরা আরও মুষড়ে পড়লাম। প্রথম দুটো বেওয়ারিশ লাশ জেলার মেডিকেল কলেজে পাঠানোর জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সেদিনই ওঁদের কাছে নির্দেশ এসেছে। এ-নির্দেশ অনুসারে আমাদের লাশ পেতে তিন-চার সপ্তাহ লাগাও অসম্ভব নয়। ঘটনাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না বলা মুশকিল হলেও আমরা অসহায়। তবে একটা আশার কথা যে, মেডিকেল কলেজের কাজের জন্য লাশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো হওয়াটা জরুরি। আমাদের সে-প্রয়োজন নেই। তাই যেমন-তেমন লাশ এলেও তা আমাদের দিতে ওঁদের কোনও অসুবিধা নেই। তবে তার জন্য সেভাবে আমাদের একটা আবেদন থাকা দরকার।

আবেদনটা সঙ্গে-সঙ্গে লিখে দিলাম। ওঁরা যথাসম্ভব সাহায্য করবেন, এ-আশ্বাস দিলেও আমরা তেমন আশ্বস্ত হতে পারি না। কাজ চালানোর জন্য শুধু একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে সঙ্গে রেখে বাকি কোম্পানির সকলকে পরদিনই ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। আমাদের দুজনেরও আর চার-পাঁচ দিনের বেশি এখানে থাকা সম্ভব হবে না। এর মধ্যে লাশ জোগাড় না হলে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। তারপরে কবে লাশ জোগাড় হবে আর কখনই-বা চুন্নির কার্যকুশলতার প্রমাণ দেখিয়ে টাকাপয়সা উশুল করতে পারব তা ভগবানই জানেন! নির্বাচনের পর মিউনিসিপ্যালিটির নতুন নগরসেবকদেরই বা কীরকম মনোভাব হবে, তা কে জানে!

পরদিনও আমাদের উৎসাহিত হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। একঘেয়েমি কাটাতে বিকেলবেলা তাই একটু বেরিয়ে পড়লাম। বারকয়েক এখানে এলেও শহরটা ঘুরে দেখবার কখনও সুযোগ হয়নি। ভাবলাম, পায়ে হেঁটে আশপাশটা একটু ঘুরে আসি। হাঁটাও হবে, আর তার সঙ্গে শহরটাও একটু দেখা হয়ে যাবে।

শহরের যেদিকটায় লোকবসতি কম, সেদিকে হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পর খেয়াল হল যে, গত পনেরো মিনিটে একটাও বাড়ি-ঘর নজরে পড়েনি। এদিকটায় চারদিকেই শুধু গাছপালা আর ঝোপঝাড়। পিছনে চেয়ে দেখি বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা বাড়ি-ঘর ইতস্তত ছড়ানো। সন্ধ্যা নেমে আসছে, ঘরে ফিরতে থাকা পাখিদের কলকাকলিতে চারদিক ভরে গেছে। পাখিদের ঘরে-ফেরা দেখতে আর তাদের ডাক শুনতে এতই বিভোর হয়ে ছিলাম যে, সন্ধ্যাটা কখন গাঢ় হয়ে উঠেছে তা খেয়াল করিনি। খেয়াল হতে ঘড়িতে দেখি সাড়ে সাতটা বাজে। চটপট হোটেলের পথে পা বাড়াই।

বড়জোর ছ-সাত কদম চলেছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাকল, 'জরা সুনো না, বাবুজি।'

ফিরে দেখি, একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক আমায় হাত নেড়ে ডাকছে। লোকটার পরনে একটা ময়লা গোছের ধুতি। গায়ে কী আছে তা বোঝবার উপায় নেই, কারণ, তার মাথা থেকে হাঁটু অবধি একটা কালো কম্বলে ঢাকা। শীতকাল হলেও ঠান্ডা তো এখানে নেই বললেই হয়, তাই কম্বল জড়ানোটা একটু বেখাপ্পা ঠেকছিল। তা ছাড়া, ভাঙা-ভাঙা হলেও লোকটাকে হিন্দিতে কথা বলতে শুনে একটু অবাকও হয়েছিলাম, কারণ, হিন্দি ভাষাটা এখানে খুব কম লোকই বলতে পারে। মনে হয়, সে-কারণেই হয়তো লোকটির প্রতি একটু ঔৎসুক্যও জেগে উঠেছিল।

তাহলেও নিজের গলাটা নিজেরই যেন একটু রূঢ় শোনাল। বললাম, 'কী ব্যাপার, ভাই?'

'জরা সুনো না, বাবুজি। কুছ জরুরি বাত করনি হ্যায়।'—লোকটির গলায় অনুনয়ের সুর।

নিজের রূঢ়তায় নিজেই একটু লজ্জিত হয়েছিলাম। লোকটির অনুনয় সেজন্য কোনওমতেই অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। দু-পা এগিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার?' এর উত্তর সবই সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে দিয়েছিল। আমি অবশ্য তার বাংলা তর্জমা করেই বলব।

একটু এদিকে এসো না, বাবুজি। তোমার সমস্যার কথা আমার জানা আছে। একজন সাধারণ মানুষ হলেও আমিও হয়তো তোমার মুশকিল আসান করতে পারব।

লোকটার কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম তা বলাই বাহুল্য। আমার সমস্যার কথা তো এর জানবার কথা নয়—কিন্তু কে জানে, সত্যিই যদি কোনও উপকার করতে পারে। কথায় বলে, ডুবতে বসলে লোকে খড়কুটোও আঁকড়ে ধরতে চায়। তাই ভেবে আরও দু-পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'বলো তো আমার সমস্যাটাই বা কী, আর কীভাবেই বা তুমি তার সমাধান করতে পারো?'

'তোমরা নতুন শ্মশানে চুল্লি বসাতে এসেছ। চুল্লি বসানো হয়ে গেলেও, সেটা চালু না করে দিলে তোমাদের কাজ শেষ হচ্ছে না। এই সুযোগে, ভোটের জন্য ব্যস্ততা দেখিয়ে ও আরও নানারকমভাবে তোমাদের নাকাল করবার চেষ্টা চলছে। এসবের পিছনে যে কে আছে তা তোমাদের জানা নেই। এ সবই হচ্ছে চ্যারিয়নের ইশারায়। সবাই জানে, কিন্তু ভয়ে সকলের মুখ বন্ধ। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাব্যক্তিরা অনেকেই ওর হাতের মুঠোয়। তা ছাড়া, সব রাজনৈতিক দলেই ওর লোক আছে। ছ'মাস আগে যখন তোমাদের চুল্লি বসানোর কাজটা দেওয়া হয়, তখন মাসখানেক চ্যারিয়ন শহরে ছিল না। চুল্লি বানানোর জন্য কোনও কোম্পানির হয়ে সুপারিশও করেনি চ্যারিয়ন। চুল্লির অর্ডারটা তোমরা তাই সহজেই পেয়ে গেলে। ইতিমধ্যে এ-কাজটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য চ্যারিয়ন আর-একটা কোম্পানির থেকে পয়সা নেয়। ভেবেছিল, ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করবে। ফিরে এসে যখন শুনল যে, কাজটা তোমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন ও রেগে কাঁই হয়ে গেল। তা শুধু ওর আগাম নেওয়া টাকা ফেরত দিতে হল বলে নয়, ওর এতদিনের প্রতিপত্তি হেয় হয়ে গেল বলে। এ-ঘটনার পরে অনেকেই আর আগের মতো ওর ওপর ভরসা করবে না, তা চ্যারিয়ন ভালোমতোই বুঝেছিল। তোমাদের কাজটা পুরোপুরি পণ্ড করা যাবে না তা জানা থাকলেও, নানারকম বাধায় তোমাদের উত্যক্ত করে ও সকলকে জানাতে চাইছে যে-চ্যারিয়নের সাহায্য ছাড়া এ-শহরে কাজে নামলে কীরকম ভুগতে হয়।'

চ্যারিয়নের সম্বন্ধে এ-ধরনের কিছু কথা লোকের মুখে আগেই শুনেছিলাম, কিন্তু সে-ই যে আমাদের পিছনে লেগেছে সে-ধারণা ছিল না। এ থেকে অন্তত একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এ-লোকটা যে-ই হোক না কেন, আমাদের সমস্যাটা এর জানা।

বললাম, 'তোমার কথা তো বুঝলাম, কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কী, আর তুমিই বা কীভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারো? তা ছাড়া, কেনই-বা তুমি আমাদের সাহায্য করতে চাইছ?'

লোকটি বলে, 'তোমার যে একটু সন্দেহ হচ্ছে তা বুঝতে পারছি, বাবুজি। তাই তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিই। আমি শহরতলির একটা স্কুলে পড়াতাম। সেখানে একটা ঘোরতর অন্যায় চোখে পড়ায় তার প্রতিবাদ করি। অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া তো দূরের কথা, প্রতিবাদ জানানোর ফলে আমার চাকরিটাই চলে গেল। পরে জানতে পারি যে, আমার চাকরি যাওয়ার পিছনে ছিল এই চ্যারিয়নই। সেদিন থেকে আমি চ্যারিয়নের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছি। এতদিনে আমার সে-সুযোগ এসেছে। তা ছাড়া, তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমি

তো কোনও অন্যায় কাজ করছি না। তোমাদের সাহায্য করলে চ্যারিয়নের প্রতিপত্তি কমবে। এ-শহরের অনেক লোক তাহলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারবে।'

লোকটা কেন যে আমাদের সাহায্য করতে চাইছে, এবারে তা বোধগম্য হল। এবারে তার কথা অন্তত অনেক খোলা মনে শুনতে পারব। বললাম, 'তোমার উদ্দেশ্য তো বোঝা গেল, এবারে বাকিটা শুনি?'

সে বলল, 'হ্যাঁ, সে-কথাই এবার তোমায় বলব। আমি জানি যে, শ্মশানের চুল্লি কার্যকর করে দেখাবার জন্য তোমাদের একটা বেওয়ারিশ লাশ দরকার। সে-লাশ যাতে তোমরা না পাও তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে চ্যারিয়ন। একটা বেওয়ারিশ লাশ আমি তোমাদের জোগাড় করে দিতে পারি। তবে তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টেম করিয়ে সে-লাশ নেওয়ার দায়িত্বটা তোমাদের। খেয়াল রেখো যে, লাশটা তোমাদের হাতে আসার আগে ওটা যে তোমরা নিতে চেষ্টা করছ সে-খবরটা যেন যথাসম্ভব গোপন থাকে। চ্যারিয়নের লোক চারদিকে ছড়িয়ে আছে এ-কথাটা মনে রেখো।'

মেডিকেল কলেজে লাশ পাঠানোর নির্দেশটা না থাকলে হয়তো হাসপাতালের ডিন ডক্টর জেকব ও মর্গের ডাক্তার পিল্লেকে দিয়ে তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টেম করিয়ে লাশটা আমাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করানো যেত। কিন্তু এখন কি তা সম্ভব হবে? -আমার মনে এ সন্দেহটা উঁকি দেয়। আমাকে নীরব দেখে লোকটি তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে, তাকে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশের কথাটা বলি।

ঘটনাটা শোনবার পরে লোকটি বলল, 'কোনও চিন্তা নেই, বাবুজি। তিন দিন ধরে ও লাশ একটা কুয়োয় পড়ে পচছে। মেডিকেল কলেজের কাজে ও-লাশ আসবে না।'

বললাম, 'তাহলে আমার কী করা উচিত বলে মনে করো?'

'লাশটার হদিশ তোমায় পুলিশের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, বাবুজি।'

'সে-কাজটা তো তুমিও করতে পারতে।' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'অসুবিধে আছে, বাবুজি। আমি যে-লাশটার কথা তোমায় বলছি সেটা আমার বন্ধু মুরলীর। মুরলী ভালো লোক ছিল। চ্যারিয়নের অসৎ কাজে সে সবসময় বাধার সৃষ্টি করে এসেছে। তাকে অন্য কোনওভাবে কবজা করতে না পেরে শেষমেশ চ্যারিয়নের লোকেরা তাকে খুন করেছে। মুরলী ভালো লোক হলেও চ্যারিয়নের ভয়ে কেউ তার সঙ্গে মিশত না। মুরলী নিজেও কখনও কারও সঙ্গে মেশবার গরজ দেখায়নি। তার নিজের বলতে কেউ ছিল না। লোকালয় থেকে বেশ কিছুটা দূরে সে একাই থাকত। মুরলীর খুন হওয়ার ঘটনাটা তাই কারও নজরে পড়েনি। অবশ্য নজরে পড়লেও চ্যারিয়নের ভয়ে কেউ কিছুই করত না। মৃতদেহটা খুঁজে পেলেও আমার পুলিশে খবর দেওয়ার কোনও উপায় নেই। আমি যেখানে থাকি, তার আশেপাশে কোনও টেলিফোন নেই। শহরে গেলে চ্যারিয়নের লোকেদের নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করছি জানলে ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে। তাই এ-কাজটা তোমাকেই করতে হবে। খবরটা দেওয়ার সময় পুলিশকে শুধু তোমার পরিচয়টা জানিও না।'

আমি বললাম, 'পুলিশে খবর দিলেও তারা কতক্ষণে লাশটা তুলে তা লাশকাটা ঘরে পাঠাবে তার কোনও ঠিক নেই। তা ছাড়া, পুলিশের কাছ থেকে চ্যারিয়নের লোকেরা এ-খবর পেয়ে গিয়ে কোনওরকম গোলমাল বাধাবে কি না, তাই বা কে জানে?'

সে বলল, 'বাবুজি, তোমার তো ডক্টর জেকবের সঙ্গে আলাপ আছে। পুলিশ সুপারের সঙ্গে ডক্টর জেকবের খুবই সদ্ভাব। তাঁকেই বলো না পুলিশ সুপারের মারফত স্থানীয় থানায়

খবরটা দিয়ে লাশটা উদ্ধার করতে। পুলিশ সুপার সৎ লোক। তিনি নিজে এ-ব্যাপারে নির্দেশ দিলে কাজটাও তাড়াতাড়ি হবে, আর চ্যারিয়নের লোকেরাও কিছু করতে পারবে না।'

লোকটার বুদ্ধিটা আমার মনে ধরে। তবে ডক্টর জেকবকে জানানোর আগে মৃতদেহটা আমার নিজের একবার দেখে নেওয়া দরকার। লোকটার কথা ভুল হলে ওঁর তো হয়রানি হবেই, আমার ওপরেও উনি অখুশি হবেন। সে-কথা ভেবে বলি, 'কিন্তু তা করতে হলেও তো লাশটা ঠিক কোথায় আছে তা আমার জানতে হবে।'

'সে নিয়ে চিন্তা কোরো না, বাবুজি। আমি লাশটা তোমায় দেখিয়ে দেব।'

আমি বলি, 'দেখিয়ে তো দেবে বলছ, কিন্তু কখন? আমি এ-ব্যাপারে দেরি করতে চাই না।'

'তোমার কাছে যদি একটা টর্চ থাকে তো এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি।' সে বলল।

অন্ধকারটা যে এতটা ঘন হয়ে উঠেছে কথার মাঝে তা খেয়ালই করিনি। একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা আমার নিত্যসঙ্গী। এতে সবসময়ই একটা মালটিপারপাস ছুরি আর একটা টর্চ রাখি। টর্চটা ছোট হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। আমি বললাম, 'তাহলে দেখাবে চলো—টর্চ একটা আছে আমার কাছে।'

সে বলল, 'ঠিক আছে, চলো তাহলে। রাস্তা দেখার জন্য কিন্তু টর্চ জ্বেলো না—কারও নজরে পড়তে পারে। শুধু চুপচাপ আমায় অনুসরণ করো।'

এই বলে সে পিছন ফিরে এগোতে থাকল, আর আমিও তাকে অনুসরণ করে চলতে থাকলাম। রাস্তা বলতে একটা পায়ে-চলা শুঁড়িপথ এঁকেবেঁকে চলেছে। দুপাশে গাছের সারি আর ল্যানটানা ঝোপ। মিনিট পাঁচ-সাতেক হেঁটে চলেছি। গাছপালায় ঢাকা ঘন অন্ধকার পথে চলতে-চলতে হঠাৎই আমার ভয় করে উঠল। কে জানে লাশটা দেখতে চাওয়াটা হঠকারিতা হল কি না? লোকটা চ্যারিয়নের দলেরই কেউ কি না, তাই-বা কে জানে! আমাকে কোনও গন্ডগোলে ফাঁসাতে চাইছে না তো? এখন পিছন ফেরবারও উপায় নেই। এই শুঁড়িপথটা যে সোজা নয়, এতক্ষণ তা লক্ষ করেছি। পথে একের বেশি মোড় এলে আমার চলনদার যেদিকে চলেছে, আমিও তাকে অনুসরণ করে সেদিকে চলেছি। একলা ফিরতে হলে আমার পথ হারানোর সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ। তাই এগিয়ে চলাই মনস্থ করলাম।

আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পরে রাস্তার দুপাশের গাছপালাগুলো একটু পাতলা হয়ে এল। সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি। একটু ঢাল বেয়ে সামনের জমিতে নেমে পড়লাম আমরা। আরও দশ-বারো পা হাঁটবার পরে আমার সঙ্গী একটা কোমর সমান উঁচু কোনও জিনিসের সামনে থেমে গেল। তার কাছে পৌঁছতে বুঝলাম যে, সেটা একটা কুয়ো। তখনই নাকে একটা পচা গন্ধ পেলাম। আমার সঙ্গী লোকটি ততক্ষণে কুয়োটার অন্যদিকে পৌঁছে গেছে।

সে বলল, 'এই কুয়োটার মধ্যেই থলিতে ভরে মুরলীর মৃতদেহটা ফেলে দিয়ে গেছে চ্যারিয়নের লোকেরা। আলো জ্বাললেই দেখতে পাবে। টর্চটা কুয়োর ভেতরে নিয়ে তবেই জ্বেলো, যাতে বাইরে থেকে কেউ দেখতে না পায়।'

পচা গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। গন্ধটার তীব্রতায় পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকটা চাপা দিতে হল। তারপর লোকটির কথামতো টর্চটা জ্বেলে দেখি, ফুট তিরিশেক নীচে সত্যিই বস্তামোড়া কিছু একটা ভাসছে। বস্তা ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে দুটো পায়ের কিছুটা বেরিয়ে পড়েছে। মৃতদেহটা দেখে আমার বুকটা শিরশির করে উঠল। শেষ পর্যন্ত খুনের দায়ে ফেঁসে যাব না তো?

সংবিৎ ফিরল লোকটির কথায়।

সে বলছে, 'লাশটা তো দেখলে। এবারে চলো এখান থেকে। তোমায় এখন অনেক কাজ করতে হবে।'

ফিরতে আরও মিনিট পনেরো লাগল। শুঁড়িপথটার মুখে পৌঁছোনোর পরে আমার সঙ্গী বলল, 'তোমার সঙ্গে আগে যেমন কথা হয়েছে, ঠিক সেভাবে কাজ করবে। তাহলে তোমার চিন্তার কিছু থাকবে না। আমি এখন চলি। কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তবে এখানে নয়, এই ডানদিকের রাস্তাটা দিয়ে মিনিট কুড়ি গেলে একটা ছোট পুকুর পাবে। পুকুরটার পাশ দিয়ে বাঁদিকে আরও মিনিট তিনেক গেলে একটা ছোট একচালা কাঁচা বাড়ি আছে। আমি কাল সন্ধ্যাবেলা সেখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তোমার এই কাঁধব্যাগ আর টর্চটা যেন সঙ্গে আনতে ভুলো না।'

এতক্ষণে আমার খেয়াল হয় যে, লোকটির নামটাই জানা হয়নি। তাকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে সে বলে, 'আমায় সকলে আপ্পা বলে ডাকে, তুমিও সে-নামেই ডাকতে পারো। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা ভুলেও যেন কাউকে বলে বোসো না। জানাজানি হলে আমাদের দুজনেরই ক্ষতির আশঙ্কা।'

এমন সময় বড়সড় একটা বেড়াল শুঁড়িপথটায় ঢুকছিল। আমাদের হঠাৎ দেখতে পেয়ে সেটা চমকে উঠে 'ম্যাঁও-ও' বলে একটা বিকট আওয়াজ তুলে পালাল। আচমকা বেড়ালটার এই বিকট আওয়াজ শুনে আমিও এমন চমকে উঠলাম যে, ঝাড়া পাঁচ মিনিট আমার বুক ঢিপঢিপ করে চলল।

যাই হোক, আপ্পার কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম। হোটেলে পৌঁছে দেখি যে, মাত্র পৌনে ন'টা বাজে। এসে ডক্টর জেকবকে ফোন করে মৃতদেহটার হদিশ দিই। ওঁকে বলি যে, রাস্তায় একজন অচেনা লোক আমায় এ-খবর দিয়েছে। কথাটা সত্যি তো বটেই, কারণ, আপ্পার পরিচয় আমি সত্যিই জানি না। নিজের চোখে লাশটা দেখবার কথাটা গোপন করেছি বটে, তবে এতে কারও কোনও ক্ষতি নেই।

ডক্টর জেকবও আমাকে পুলিশকে খবরটা দিতে বারণ করলেন। বললেন, 'আপনি বাইরের লোক, ক'দিনের জন্য এসেছেন। শুধু-শুধু এ-ব্যাপারে পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন না। পুলিশ সুপার আমার বন্ধু, আমি তাকে খবরটা জানিয়ে দিচ্ছি। যা করবার তিনি করবেন।'

রাত সাড়ে এগারোটার সময় ডক্টর জেকব ফোন করে জানালেন যে, আপনার খবরটা ঠিকই ছিল। শহরের পশ্চিমদিকের একটি অব্যবহৃত পুরোনো কুয়োর মধ্যে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ লাশটা তুলে মর্গে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তবে মৃত ব্যক্তির শনাক্তকরণ করা হয়নি।

পরদিনের কাগজে মৃতদেহের ছবি ছাপিয়ে পুলিশ তার পরিচয় জোগাড় করবার চেষ্টা করবে। পরদিন সকালে কাগজ খুলে দেখি, সত্যিই মৃতদেহের ছবি ও বর্ণনা দিয়ে তার পরিচয় জানতে চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। বিকেলে ডক্টর জেকব ফোন করে জানিয়েছেন যে, গতকালের পাওয়া মৃতদেহের পোস্টমর্টেমের কাজ শেষ হলেও সেটির তখনও শনাক্তকরণ হয়নি। তা ছাড়া, লাশটায় খুবই পচন ধরেছে। ওঁর তাই ধারণা যে, এ-লাশটি আমরা পেলেও পেয়ে যেতে পারি। উনি জানালেন যে, পরশু রাতের মধ্যে কেউ মৃতদেহটি দাবি না করলে, সেটি বেওয়ারিশ বলে ধরে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে, তার পরদিন সকালে দাহ করবার জন্য মৃতদেহটি ওঁরা আমাদের দিতে পারবেন।

পরদিন বিকেলে যখন আমি হোটেল থেকে বেরোলাম সন্ধ্যা হতে তখনও খানিকটা দেরি আছে। খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরে সন্ধ্যার ঠিক মুখটাতে শহরের পশ্চিম সীমান্তের দিকে হাঁটা

দিলাম। আপ্পার কথামতো রাস্তা ধরে পুকুরের পাশের চালাঘরটায় পৌঁছনোর আগেই অন্ধকার নেমে এসেছে। আপ্পাকে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না। চালাঘরটার আশপাশটা আম, কলা আর নারকেল গাছে ভরতি। ঘরটার সামনের দিকটায় একটা দাওয়া মতো রয়েছে, আর তার সামনে খানিকটা জায়গায় একটু আঙিনা। ঘরের দরজাটা দেখলাম হাট করে খোলা। তবে ভেতরটা অন্ধকার বলে সেখানে কেউ আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। দাওয়াটায় বসব ভেবে একটু এগিয়েছি, হঠাৎ পায়ে কিছু একটা ঠেকল, আর পরক্ষণেই কুঁই-কুঁই করে আওয়াজ। টর্চটা জ্বেলে দেখি পায়ের কাছে ছোট্ট কুকুরের বাচ্চা, মাসখানেকও বয়স হয়নি বোধহয়। নীচু হয়ে সেটাকে তুলে নিতে যাচ্ছি এমন সময় পাশ থেকে আপ্পার গলা কানে এল।

'ওটাকে পরে দেখো, বাবুজি। এখন অন্য কাজ রয়েছে।'

মুখ তুলে দেখি আপ্পা দাঁড়িয়ে আছে। আজকেও সেই গতকালের বেশ, কম্বলে কান-মাথা থেকে হাঁটু অবধি ঢাকা। জিজ্ঞাসা করি, 'দেরি হল? সব ঠিকঠাক তো?'

সে বলল, 'হ্যাঁ বাবুজি, সব ঠিকঠাক। এখন চলো, আগে ঘরের ভেতরে যাই, তারপর কেন তোমায় এখানে ডেকেছিলাম তা বলব।'

দাওয়ায় উঠে আমরা দুজনে ঘরের ভেতরে ঢুকলাম—আগে আপ্পা আর পিছনে আমি। আমাদের পিছনে কুকুরের বাচ্চাটাও সমানতালে কুঁই-কুঁই করে ডাকতে-ডাকতে দাওয়ায় ওঠার নিষ্ফল চেষ্টা করতে লাগল।

ঘরে ঢোকবার পরে আপ্পা আমায় টর্চটা জ্বালতে বলল। তারপর বলল, 'আলোটা একটু ঘরের ডানদিকে ফেলো তো, বাবুজি। দেখো, একটা ছোট বাঁশের মই থাকবে।'

সেদিকে আলো ফেলে দেখি যে, সেখানে সত্যিই ফুট ছয়েক লম্বা একটা বাঁশের মই রয়েছে। এরপরে আপ্পা আলোটা সামনে ফেলতে বলে। তারপর বলে, 'তোমার সামনে দেখো একটা মাচা বাঁধা আছে। মাচাটার বাঁ-দিক ঘেঁষে মইটা লাগিয়ে ওটার ওপরে উঠে পড়ো।'

দেখি সামনের দেওয়ালে, মাটি থেকে আন্দাজ ফুট পাঁচেক ওপরে, ফুট তিনেক চওড়া, লফটের মতো একটা বাঁশের মাচা বাঁধা রয়েছে। মাচাটার একদিক বোধহয় সামনের দেওয়ালের ভেতরের খুঁটিগুলোর সঙ্গে বাঁধা, আর অন্যদিকটা বাঁধা ঘরের চাল থেকে নামা চারটে মোটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে। ঘরের চাল আর মাচাটার মাঝে প্রায় ফুট চারেক জায়গা, আর সেটা দেখতেও বেশ মজবুত। একজন লোক অনায়াসে মাচাটায় উঠে বসতে পারে। আপ্পা নিজে ওখানে না উঠে, আমায় কেন ওখানে ওঠাতে চাইছে জানি না। তবে সে-প্রশ্নটা করতে কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকল, কারণ, কম্বলে ঢাকা আপ্পার বয়েস বোঝা না গেলেও আমার ধারণা যে, তার বয়েস খুব একটা কম নয়। অন্তত আমার চাইতে তো ঢের বেশি। তাই কোনও প্রশ্ন না করেই আপ্পার কথামতো মাচাটায় উঠে পড়ি।

মাচাটা সত্যিই বেশ পোক্ত। আমি চড়ে বসতে সামান্য একটু ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ উঠল শুধু, কিন্তু একটুও নড়ল না।

আমি উঠে পড়তে আপ্পা আমায় বলল, 'এবারে মাচাটার বাঁ-ধার ঘেঁষে একটু ভেতরে ঢুকে পড়ে, দু-দিকের দেওয়াল থেকেই ফুটখানেক আলোটা ফেলো। একটু নজর করলে দেখবে বাঁশের একটা ছ'ইঞ্চি মতো অংশ অন্য জায়গার চেয়ে একটু বেশি কালচে রঙের। ওটার থেকে ফুট দেড়েক দূরে আবার ঠিক ওরকম একটা জায়গা পাবে। ওই কালচে অংশের জায়গা দুটোয় একটু টানলেই দুটো বাঁশের টুকরো খুলে আসবে। প্রথমে ও-দুটোকে খুলে ফেলো।'

কালচে অংশ দুটো পাওয়া গেলেও বাঁশের টুকরো দুটোকে খুলে নেওয়া খুব সহজ হল না। শেষে কাঁধব্যাগ থেকে পেনসিল-কাটা ছুরিটা বের করে বাঁশের ধারে চাড় দিতে তবে সেগুলো

খোলা গেল। বাঁশের টুকরো দুটো খুলে নিতে মাচার মধ্যে তিন ইঞ্চি বাই ছ'ইঞ্চিব দুটো ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সে-কথা আপ্পাকে বলতে সে বলল, 'ওই ফাঁকা জায়গা দুটোর মধ্যে হাত গলিয়ে দিয়ে বাঁশের পাটাতনটা ওপরে টেনে তোলো।'

একটু চেষ্টাতেই ওখানে থেকে একটা দু-ফুট বাই সাড়ে তিন ফুট মতো টুকরো উঠে এল। বাঁশের টুকরোটা উঠিয়ে ফেলতে দেখা গেল যে, ওখানে একটা দেড় ফুট মতো গভীর গর্ত রয়েছে। বোঝা গেল যে, গর্তটা করা হয়েছে চালাটার দেওয়ালে, সেজন্য বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। টর্চের আলোয় দেখা গেল, ভেতরে একটা সুটকেস আর একটা ছড়ি ছাড়া কিছু নেই। ছড়িটা বার করে মাচার সামনের দিকে বেখে, সুটকেসটা খুলতে বলল আপ্পা। সুটকেসের অবস্থা দেখলাম খুবই খাবাপ—শুধু তার হাতল আব তালাগুলোই নয়, পিছনেব কবজাগুলোও ভেঙে গেছে। সেজন্য খোলবার চেষ্টা করতে তাব ওপরের ডালাটাই সম্পূর্ণ উঠে এল।

সুটকেসটাতে পাওযা গেল শুধু দুটো ফাইল—একটা শক্ত কার্ডবোর্ড আব চটেব মতো মোটা কাপড়ের বানানো, আর অনাটা দড়ি-বাঁধা পাতলা মতো। কৌতূহলের বশে কার্ডবোর্ডের ফাইলটা একটু উলটে দেখে মনে হল যে, ওতে কিছু অফিসিয়াল চিঠিপত্র রয়েছে।

তাই দেখে আপ্পা বোধহয় একটু অধৈর্য হযে উঠেছিল। সে বলল, 'ফাইল পড়বাব অনেক সময় পাবে, এখন ও-দুটোকে তোমার ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলে বাঁশের টুকরোগুলো আগেকার মতো ঠিকঠাক ভাবে রাখো। তারপর মাচা থেকে নেমে পড়ে সিঁড়িটা আগের মতো রেখে, ছড়িটা নামিয়ে নাও।'

আপ্পার কথামতো সবকিছু করলাম। ছড়িটা নামিয়ে হাতে নেওয়াব সময ডানহাতে ধরা টর্চের ফোকাসটা দরজাব দিকে হয়ে যায়। আপ্পা আগে সে-দিকেই দাঁড়িযে ছিল, কিন্তু টর্চেব আলোটা পড়তে তাকে দেখতে পেলাম না। পরক্ষণেই তার আওযাজ ঘবের বাইরে থেকে ভেসে এল, 'টর্চের আলো সামলে, বাবুজি। আমরা যে মুবলীর ঘরে ঢুকেছি তা বুঝি সাবা দুনিযাকে জানাতে চাও?'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে টর্চের আলোটা জমির দিকে নামিযে ঘবেব বাইবে আসি।

আপ্পা বলে, 'এবারে আলোটা নিভিয়ে দাও। ফাইলগুলো আর ছড়িটা নিয়েছ তো?'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। কুকুবছানাটা তখনও সমানে কুঁই-কুঁই করে চলেছে।

আপ্পা বলে, 'বাবুজি, খুব ভালো জাতের এই কুকুবছানাটাকে মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগেই নিয়ে এসেছিল মুরলী। সে মনে করেছিল যে, ছানাটা বড় হলে তার একটু নিরাপত্তা বাড়বে। তা আর হল না। সে খুন হওয়ার পবে এটাকে দেখবার কেউ নেই। গত দু-দিন ধরে খিদে-তেষ্টায় এটা সমানে কেঁদে চলেছে। এটাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, তা নইলে বেচারা মরে যাবে।'

আমি বলি, 'তুমিও তো রাখতে পারো এটাকে?'

আপ্পা বলল, 'আমার নিজেরই কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, আমি কোথায় নেব বলো তো এটাকে?'

কথাটা হয়তো সত্যি, তাই আর বাক্যব্যয় না করে কুকুবছানাটাকে আমি হাতে তুলে নিই। ছড়িটা আর ফাইল দুটো কী করব, ফেরবার পথে আপ্পাকে তা জিজ্ঞাসা করি।

সে বলল, 'বাবুজি, এ-ছড়িটা মুরলীর বাবার। মহীশূরের রাজা একবার এক পণ্ডিতসভার আয়োজন করেন। সেই পণ্ডিতসভায় মুরলীর বাবার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা এ-চন্দনকাঠের ছড়িটা তাঁকে উপহার দেন। বাবার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে মুরলী আজীবন ছড়িটা সযত্নে রেখেছিল।

সম্ভব হলে ছড়িটা আমি নিজের কাছেই রাখতাম, কিন্তু আমার মতো বাউন্ডুলের কাছ থেকে এটা খোয়া যেতে পারে। ছড়িটা তাই তুমিই রাখো, বাবুজি।'

'ছড়ি দিয়ে আমি কী করব? এ-বয়সেই আমায় ছড়ি নিয়ে ঘুরতে দেখলে লোকে হাসবে না?' আমি প্রতিবাদ না করে থাকতে পারি না।

আপ্পা বলে, 'ছড়িটা তোমাকে নিতেই হবে, বাবুজি। চাইলে ওটা তুমি ঘরেও সাজিয়ে রাখতে পারো—কত কিছু দিয়েই তো শুনি আজকাল লোকে ঘর সাজায়। এ ছাড়া, আরও একটা জিনিস তোমায় নিতে হবে। ওই পাতলা ফাইলটায় কিছু শেয়ার সার্টিফিকেট আছে। মুরলীর এক মারাঠি ছাত্র রত্নাগিরিতে আমের পাল্প বানাবার একটা কারখানা খোলে। সে নাছোড়বান্দা হয়ে মুরলীকে ওই শেয়ারগুলো কিনিয়েছিল। তখন থেকে ওগুলো সেরকমই পড়ে আছে। তিন মাস আগে মুরলী ওগুলো বেচে দেবে ঠিক করলেও শেষ পর্যন্ত তা আর করে উঠতে পারেনি। অবশ্য শেয়ার ট্রান্সফার ফর্মগুলোতে সই করা রয়েছে। ওগুলো তোমার নামে ট্রান্সফার হতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'না, না, সে কী কথা! কথা নেই, বার্তা নেই, একজন অজানা অচেনা লোকের শেয়ার আমি নিজের নামে করে নিতে যাব কেন? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমায় বলিহারি আপ্পা, যা পাচ্ছ আমার ওপরেই চাপিয়ে দিচ্ছ। কুকুরছানা আর ছড়িটা নেওয়া, আর শেয়ার নেওয়া এক হল—আমি কি তোমার মুরলীধরের ওয়ারিশ না কি?' আপ্পার ওপর ভারী রাগ হয় আমার।

একটু চাপা হেসে আপ্পা বলে, 'তুমি শুধু-শুধুই রাগ করছ, বাবুজি। তোমায় তো আগেই বলেছি, মুরলীর আপনজন বলতে কেউ নেই। তাই তার ওয়ারিশও বা আসবে কোথা থেকে। সত্যি কথা বলতে কী, মুরলীর বন্ধুই বলো আর আত্মীয়ই বলো—আমি ছাড়া এ-দুনিয়ার তার আর কেউ ছিল না। সেই আমিই যখন তোমায় এই শেয়ারগুলো দিচ্ছি তখন তাতে কোনও দোষ নেই, বাবুজি।'

'তোমার কথা সত্যি হলে এই শেয়ারগুলোর ন্যায্য মালিক তো এখন তুমি নিজেই। তাহলে নিজে না নিয়ে এগুলো আমায় দিতে চাইছ কেন? এ তো কুকুরছানাও নয় যে, দেখাশুনো করতে হবে, বা ছড়িও নয় যে সামলে রাখতে হবে। যখন ইচ্ছে এগুলো বেচে তুমি টাকা নিতে পারো। এই শেয়ারগুলো তুমিই নেবে—' আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিই আপ্পাকে।

আপ্পা যেন নিমরাজি হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বাবুজি। তোমার যখন তা-ই ইচ্ছে তখন তাই হবে। তবে একটা উপকার তোমায় করতে হবে। শেয়ারগুলো এখানে বেচতে গেলে মুরলীর খুন হওয়ার ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন হয়তো আমাদের দুজনকেই অকারণ নাজেহাল হতে হবে। তার চেয়ে তুমি বরং ওগুলো তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও এখন। তারপর শেয়ারগুলো বেচে পয়সাটা আমায় পাঠিয়ে দিয়ো।'

আমি ভেবে দেখলাম যে, আপ্পার কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। তাই বললাম, 'ঠিক আছে, তাই হবে। তোমার ঠিকানাটা দিয়ে দাও।'

আপ্পা বলল, 'এক্ষুনি তো সেটা দিতে পারছি না। এতকাল আমার সবকিছুই মুরলীর ঠিকানায় আসত। এখন অন্য কোনও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে আর দেখা না হলেও মুরলীর দাহ সংস্কারের দিন তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব। সেদিনই তোমায় ঠিকানা দিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, সেদিন দিলেও চলবে, কিন্তু এই মোটা ফাইলটা নিয়ে কী করব তা কিন্তু আমায় এখনও বলোনি।'

আপ্পা বলল, 'ও-ফাইলটাতে এমন কিছু কাগজ রয়েছে যা থেকে চ্যারিয়ন আর তার সঙ্গীদের বেশ কিছু কুকর্ম সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। চ্যারিয়নের কুকর্মের সঙ্গীদের মধ্যে বেশ কিছু মিউনিসিপ্যালিটি ও সরকারি কর্মচারী, এমনকী ক'জন রাজনৈতিক নেতাও আছে। ও-ফাইলটা তুমি মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে দিয়ে দিয়ো। উনি সৎ লোক। দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা যদি তিনি করতে পারেন তো ভালোই, আর না পারলেও আমাদের কিছু করবার নেই।'

সেরকমই করব কথা দিয়ে আপ্পার কাছে বিদায় নিই। তার সঙ্গে আবার কোথায় আর কখন দেখা হবে জানতে চাইলে আপ্পা বলে যে, মর্গ আর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে খোঁজখবর নিয়ে মুরলীধরের দাহ-সংস্কারের দিন সে আমার সঙ্গে নতুন শ্মশানেই দেখা করবে। এর মধ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করতে সে আমায় বারণ করে।

দেখতে-দেখতে দুটো দিন কেটে গেল। কুকুরের বাচ্চাটা এর মধ্যেই ভারী পোষ মেনে গেছে। হোটেলে ওটাকে রাখতে আপত্তি করতে পারে সে-আশঙ্কা ছিল। ভাগ্যের কথা, হোটেলের মালিকেরও নাকি কুকুর পোষার শখ। উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হোটেল থেকে কুকুরছানাটারও খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন। ওঁর কাছেই জানা গেল যে, কুকুরছানাটা অ্যালসেশিয়ান।

এ দু-দিনে আরও কিছু কাজ সেরে ফেলেছি। প্রথমত, দরজির দোকান থেকে মাপসই একটা কাপড়ের খোল বানিয়ে ছড়িটাকে সেটায় পুরে ফেলেছি। ভাগ্যক্রমে সেদিন হোটেলে ফেরবার পরে কাউন্টারে কেউ না থাকায় ছড়িটা কারও নজরে পড়েনি। তা না হলে নানারকম কারুকার্য করা, চন্দনকাঠের এমন চমৎকার ছড়িটা লোকের চোখে পড়তই, আর এরকম একটা ছড়ি কোথায় পেলাম তার জবাবদিহি করা সহজ হত না।

দ্বিতীয়ত, শেয়ার সার্টিফিকেট আর ট্রান্সফার ফর্মগুলো ঠিকঠাক আছে তা দেখে নিয়েছি। শেয়ারগুলো দেখলাম 'আম্বাপাল্প' বলে একটা কোম্পানির—পুরো এক হাজার শেয়ার রয়েছে। কাগজ দেখে বোঝা গেল যে, সেগুলোর বেচাকেনা চলছে মাত্র এগারো-বারো টাকায়। এ-দামে আপ্পা শেয়ারগুলো বেচতে রাজি আছে কি না তা পরদিন জেনে নেব।

তৃতীয় কাজটা ছিল মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে চ্যারিয়ন ও তার সঙ্গীদের কুকীর্তির প্রমাণ জড়ো-করা ফাইলটা দেওয়া। আজ বিকেলে ফাইলটা কমিশনারকে দিতে যাওয়ার সময় একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ফাইলটা কী করে আমার হস্তগত হল সে-কথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ওঁকে বলা খুব সহজ ছিল না। সেটাই ছিল অস্বস্তির কারণ। সৌভাগ্যের কথা যে, কমিশনার সাহেব সে-সম্বন্ধে আমায় কোনও প্রশ্ন করলেন না। ফাইলটা উলটেপালটে দেখে উনি বললেন যে, কয়েকজন অসৎ লোককে প্রমাণের অভাবে এতদিন শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ-ফাইলটাতে যেসব কাগজ রয়েছে তা সেই লোকদের দোষ প্রমাণ করে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ-ফাইলটা জোগাড় করে দেওয়ার জন্য উনি আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। ধন্যবাদটা আসলে আপ্পার প্রাপ্য, কিন্তু সে-কথা কমিশনারকে বলবার উপায় নেই বলে চুপ করে থাকি।

যাই হোক, আপ্পার ইচ্ছামতো কাজটা ঠিকমতো সারতে পেরেছি বলে যথেষ্ট হালকা বোধ করছিলাম। ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে আমাদের চুন্নি চালু করবার জন্য বেওয়ারিশ লাশের কী হল তা জানতে চাইলেন কমিশনার। ওঁকে বলি যে, পরদিন সকালে একটা লাশ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সে-কথা শুনে উনি বললেন, 'সকালেই সরকারি হাসপাতালে চলে যান। লাশটা পাওয়া গেলে, সেটা আপনাদের কাজের জন্য ইস্যু করিয়ে নিয়ে আমায় একটা ফোন করে দেবেন। লাশটা পাওয়া গেছে জানালে কালকেই আপনাদের চুন্নির ট্রায়ালটা নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।'

কমিশনারের কথা শুনে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল। হোটেল থেকে রাত ন'টা নাগাদ

ডক্টর জেকবকে ফোন করে জানতে পারলাম যে, মুরলীধরের লাশটা তখনও কেউ দাবি করেনি। পরদিন সকাল সাড়ে ন'টায় বাহাত্তর ঘণ্টার মেয়াদ পুরো হবে। তখনও কোনও দাবিদার না এলে লাশটা বেওয়ারিশ হিসেবে দাহ করবার জন্য আমাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

পরদিন সকাল দশটায় সরকারি হাসপাতালে পৌঁছে জানা গেল যে, লাশটার কোনও দাবিদার আসেনি। তাই দাহ করবার জন্য সেটা সহজেই আমাদের জন্য ইস্যু করিয়ে নেওয়া গেল। তবে লাশটা যতক্ষণ আমরা নিয়ে যেতে না পারছি ততক্ষণ সেটা মর্গেই রাখা থাকবে। সেখান থেকেই ফোন করে কমিশনারকে লাশটা পাওয়ার কথা জানিয়ে দিলাম। উনি আমায় তখনই মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে চলে আসতে বললেন।

মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে পৌঁছে কমিশনার ও শ্মশান বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল যে, সেদিন সন্ধ্যা ছ'টার সময় চুল্লির ট্রায়াল নেওয়া হবে।

সবকিছু এত সহজে হয়ে গেল যে, আমার নিজেরই একটু অবাক লাগছিল। চ্যারিয়নের লোকেরা এত সহজেই হার মেনে নেবে, সে-কথা বিশ্বাস করতে পারা শক্ত। মনে হয়, খুনের ঝামেলায় ফেঁসে যাওয়ার ভয়েই তারা চুপচাপ রয়েছে। তবে কিছু একটা গন্ডগোল তারা পাকাতেই পারে, এ-আশঙ্কাটা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না।

হোটেলে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে আমাদের ইলেকট্রিশিয়ান দেশপাণ্ডেকে চুল্লির সব কানেকশন আর-একবার দেখে নিতে বলে মুরলীর লাশটা নিয়ে আসতে মর্গে চলে গেলাম। ডক্টর পিল্লে অবশ্য বলেছিলেন যে, একটা ফোন করে দিলেই লাশটা উনি নতুন শ্মশানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু বিরোধীপক্ষকে কোনও সুযোগ দিতে মন চাইছিল না।

সরকারি হাসপাতালে পৌঁছে ডক্টর পিল্লের অফিস থেকে লাশটা নিয়ে যাওয়ার চালান আর সার্টিফিকেট নেওয়ার পর, একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে সোজা লাশকাটা ঘরে চলে গেলাম। ডক্টর পিল্লে বললেন যে, আমরা লাশটা নিতে আসব সে-কথা থাপাকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। চালানের একটা কপিতে সই করে তাকে দিলে, বেওয়ারিশ লাশটা সে আমাকে দিয়ে দেবে। দিন দুয়েক দেখে মর্গের চৌকিদার থাপা আমায় চিনে গেছে, সেজন্য কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

স্বাভাবিক কারণেই লাশকাটা ঘরটা বাকি হাসপাতাল থেকে একটু তফাতে। ডক্টর পিল্লের অফিস থেকে সেটা মিনিট দুয়েকের হাঁটাপথ। সরাসরি দেখা না গেলেও গাছপালার ফাঁকে নজর করে দেখলে তার খানিকটা দেখা যায়। কয়েক পা সেদিকে এগোনোর পর লাশকাটা ঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো থাপা ও আরও তিনজন লোককে দেখতে পেলাম। থাপা এবং অন্য লোকগুলোর হাবভাব দেখে মনে হল যেন একটা বচসা চলছে। কেন যেন ব্যাপারটা ভালো ঠেকল না। ওদের দৃষ্টির আড়ালে থাকবার জন্য একটু ধারের দিকে সরে এসে হালকা পায়ে লাশকাটা ঘরের দিকে ছুট দিলাম।

লাশকাটা ঘরের বারান্দার যেদিকে থাপা আর অন্য লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, সেদিকটায় একটা থামের আড়াল থেকে ওদের কথা শুনে ঘটনাটা বুঝতে পারি। লোকগুলো আমাদের নাম করে মুরলীধরের লাশটা নিয়ে যেতে এসেছিল, কিন্তু চালান দেখাতে পারছে না বলে থাপা তাদের লাশটা দিতে নারাজ। লোকগুলো নানাভাবে থাপাকে বোঝাতে চাইছে, কিন্তু সে অনড়। শেষমেশ বিরক্ত হয়ে থাপা বলে যে, লাশটা দেওয়া যাবে কিনা তা সে ইন্টারকমে ডক্টর পিল্লের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, কথাটা শুনেই লোক তিনটের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। এবার একটা মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে বুঝতে পেরে চুপিসাড়ে বারান্দার দিকে এগোলাম। লোকগুলোর

দৃষ্টি এখন শুধু থাপার ওপরেই, সেজন্য আমার এগিয়ে যাওয়াটা তারা লক্ষই করল না। থাপা ইন্টারকমের রিসিভারটা তুলতে যেতেই একজন সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত চেপে ধরল। তারপর বলল, 'ফোনটা রাখ। আর যদি বাঁচতে চাস তো চুপচাপ মর্গের দরজাটা খুলে দে। নইলে নিজেই একটা লাশ হয়ে যাবি।'

থাপা ঘাবড়ে গেলেও সেটা তার মুখ দেখে বোঝা গেল না। উলটে সে বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে তোদের দরজা খুলতে দেব না। দেখি কী করে তোরা লাশটা নিয়ে যাস?'

থাপার কথা শুনে লোক তিনটে রেগে কাঁই হয়ে গেল। একজন তার দিকে একটা পেল্লাই চড় হাঁকাল। থাপা সেটা আটকে দিয়ে পালটা একটা ঘুসি চালাল। সেটা ঠিকমতো না লাগলেও লোকটা ভয়ানক খেপে গিয়ে পকেট থেকে একটা ছোরা বার করল। এদিকে আর-একটা লোকও ছোরা বার করেছে, আর তৃতীয় লোকটা হাতে নিয়েছে তার কোমরের বেল্ট। তিনটে লোকই আমার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে। এ-সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না। ছুটে গিয়ে প্রথমে বাঁ-দিকের লোকটার মাথার পিছনে একটা মোক্ষম ঘুসি মারলাম। তারপর ঠিক তার পাশের লোকটাকে একই ভাবে ঘুসি মারলাম। সে-দুজনেই তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেল। তিন নম্বর লোকটা ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, হাতের ছোরাটা একবার এলোমেলোভাবে চালিয়ে সে দৌড়ে পালাল।

থাপাকে বললাম হাসপাতালের মেন গেটের সিকিউরিটিকে খবরটা দিয়ে দিতে। থাপা প্রথমে আমায় একটা লম্বা সেলাম ঠুকল, তারপর ইন্টারকমে খবরটা জানিয়ে দিল সিকিউরিটিকে। তার দুই আততায়ী তখনও মাটিতে গড়াচ্ছে। থাপাকে দিয়ে মর্গের ভেতর থেকে খানিকটা মোটা দড়ি আনিয়ে দুজন মিলে লোকদুটোকে ভালো করে বেঁধে ফেললাম। তারপর ডক্টর পিল্লেকে ইন্টারকমে ঘটনাটা জানিয়ে দিলাম।

খানিক বাদেই ডক্টর জেকব ও ডক্টর পিল্লে আরও কয়েকজনকে নিয়ে মর্গে এসে উপস্থিত হলেন। ডক্টর জেকব জানালেন যে, পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা এখনই এসে পড়বে। ইতিমধ্যে মেন গেটের সিকিউরিটি থেকে খবর এল যে, তৃতীয় লোকটাও ধরা পড়েছে। দুজন গার্ড দিয়ে তাকে মর্গে পাঠিয়ে দিতে বললেন ডক্টর পিল্লে। মাটিতে পড়ে থাকা লোকদুটোর মধ্যে এবার একটু নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। বোঝা গেল যে, ওদের এবার জ্ঞান ফিরছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে উপস্থিত হল। তারা তৃতীয় লোকটাকে লাশ চুরি করবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেও সে কোনও উত্তর দিল না। আমাদের বক্তব্য লিখে নেওয়ার পর পুলিশ ইন্সপেক্টর লোক তিনটেকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেলেন। ডক্টর জেকবের অনুরোধে লাশটা নিয়ে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে একজন আর্মড গার্ড দিতেও রাজি হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর।

লাশটা নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ধরে অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আর দেরি না করে চালানের একটি কপি সই করে দিয়ে, লাশটা অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে বলি থাপাকে। রওনা হওয়ার আগে মিউনিসিপ্যালিটিতে ফোন করে কমিশনারকে এখানকার ঘটনাটা জানিয়ে দিই। সবকিছু শোনার পর উনি বললেন যে, তাহলে শ্মশানেও ক'জন পুলিশ মোতায়েন করবার ব্যবস্থা করে রাখবেন।

ডক্টর জেকব ও ডক্টর পিল্লের কাছে বিদায় নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে যাব, এমন সময় থাপা আবার একটা লম্বা সেলাম ঠুকল। আমি বলি, 'আরে করো কী, এত সেলাম ঠোকার কী হল?'

'না সাহেব, তা বললে কী হয়? আপনি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।' থাপা বলে।

এর পরে আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে! একটু হেসে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসলাম। ভাগ্যক্রমে রাস্তায় আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, তবে শ্মশানে পৌঁছতে প্রায় ছ'টা বেজে গেল। লাশটা নামাবার সময় দেখলাম, আরও দুজন আর্মড কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারলাম যে, কমিশনার সাহেবও দুষ্কৃতীদের কোনও সুযোগ দিতে চাননি।

দেশপাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। সকলের অনুমতি নিয়ে চুল্লিটা চালু করে দিলাম।

এতক্ষণ লাশটা ঢাকাই ছিল। চুল্লিতে ঢোকানোর আগে ভাবলাম যার লাশটা নিয়ে এত কাণ্ড হল, সেই মুরলীধরকে একবারে দেখে নিই। দেখলাম, লাশটার বেশিরভাগটাই পচন ধরে খুব খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, মুখটা তেমন নষ্ট হয়নি। মুরলীধরের বয়েস পঞ্চান্ন থেকে ষাটের বেশি ছিল বলে মনে হল না। মুরলীধরের মুখের যে ক'টা জিনিস আমার নজর কাড়ল তা হল তার পাতলা উন্নত নাক, বড়-বড় দুটো কান, আর কপালের বাঁ-দিকে ইঞ্চিদেড়েক লম্বা একটা নীলচে দাগ।

এর মধ্যে চুল্লির তাপমাত্রা থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক মিটারের রিডিং ইত্যাদি সবকিছু নোট করে নিয়েছেন দেশপাণ্ডে আর মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ার। ওঁরা দুজনে সঙ্কেত দিলে লাশটা চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ঘড়িতে দেখলাম তখন সাড়ে ছ'টা বাজে। লাশটা সম্পূর্ণ দাহ হতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে পঞ্চাশ মিনিট। কয়েকটা রিডিং নেওয়া ছাড়া এর মধ্যে অন্য কারও কোনও কাজ নেই। সেগুলোও দেশপাণ্ডে নেবে, তাই এ-সময়টা আমার কিছুই করবার নেই।

আশ্চর্য লাগছে যে, এখনও আপ্পার দেখা নেই। মিউনিসিপ্যালিটির লোকদের সঙ্গে এ-কথা সে-কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে চারদিকে দেখছি, কিন্তু আপ্পাকে কোথাও দেখা গেল না।

তখন সাতটা বেজে দশ, দাহ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এমন সময় শ্মশানের গেটের পাশে আপ্পাকে দেখা গেল। সেই রোজকার মতো মাথা থেকে হাঁটুর নীচ অবধি কম্বলে ঢাকা। আপ্পা ইশারায় জানাল যে, অন্য লোকদের সামনে সে আসবে না। সব কাজ মিটে গেলে সে আমাকে শ্মশানের পিছনদিকে আসতে বলল। শ্মশানের পিছনে খালের ওপর একটা ঘাট বাঁধানো আছে দেখেছি। ঠিক করলাম, সব কাজ মিটলে সেখানেই আপ্পার সঙ্গে দেখা করব।

মিনিট দশেকের মধ্যেই দাহ শেষ হয়ে গেল। দেশপাণ্ডের নেওয়া রিডিংগুলো দেখে মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ার আমাদের চুল্লিটা পাস করে দিলেন। ভালোয়-ভালোয় সব কাজ মিটতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। পরদিন সকালেই চুল্লির দামের বকেয়া টাকার চেকটা আমাদের দিয়ে দেবেন কথা দিয়ে কমিশনার সাহেব বিদায় নিলেন। তারপর দেশপাণ্ডে, পুরোহিত আর আমি ছাড়া একে-একে বাকি সবাই চলে গেলেন।

সকলে চলে যেতে মৃতদেহের চিতাভস্ম পাশের নালাটায় ভাসিয়ে দিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। ঘাট থেকে ওঠবার সময় আপ্পাকে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাকে ইশারায় জানালাম যে, আর খানিকবাদেই আসছি।

শ্মশান থেকে বেরোনোর সময় পুরোহিতমশাই বললেন উনিও আমাদের হোটেলের দিকেই যাবেন, কিন্তু মুশকিল হল যে, ওঁর স্কুটারে আমাদের একজনই যেতে পারি। আমার এতে ভারী সুবিধে হয়ে গেল। দেশপাণ্ডেকে ওঁর সঙ্গে চলে যেতে বললাম। দেশপাণ্ডের একটু ভূতের ভয় আছে জানি, তাই আমার কথা শুনে সে যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

ওদের দেখিয়ে আমিও শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু পুরোহিতের স্কুটার

দৃষ্টির সীমানা ছাড়াতেই আমি শ্মশানের দিকে ফিরলাম। ঘাটের কাছে পৌঁছতে একটা গাছের পিছনে আপ্পাকে দেখা গেল। বললাম, 'শেষ পর্যন্ত সব কাজ চুকল, আপ্পা। তোমার সাহায্য না পেলে আমাদের যে কী অবস্থা হত, কে জানে।'

আপ্পা বলে, 'সে-কথা কেন বলছ, বাবুজি তুমি না থাকলে মুরলীর শেষকৃত্যটুকুও হত না। তোমার জন্যই তার আত্মার শান্তি হবে। সেজন্য আমারই উলটে তোমার ওপর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

আমি বলি, 'যাকগে সে-কথা, আসল কথাটা আগে সেরে নিই। শোনো আপ্পা, চ্যারিয়নের কুকর্মের ফাইলটা কমিশনারকে দিয়ে দিয়েছি। উনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলেই আমার মনে হয়। এ ব্যাপারে আমার আর কিছু করণীয় নেই। শেয়ার বেচবার কাজটা আমি অবশ্যই করে দেব। মুরলীর শেয়ারগুলোর দাম এখন দশ থেকে বারো টাকা চলছে—বেচলে হাজার দশেক টাকা পেয়ে যাবে। বেচবে না রাখবে ভেবে বলো, আর তোমার ঠিকানাটা দাও।'

'শেয়ারগুলো এখন থাক না, বাবুজি। পরে হয়তো ওগুলোর দাম বাড়বে, তখনই বেচো। তা ছাড়া, এখনও আমার কোনও আস্তানা জোটেনি, তাই ঠিকানাটাও তোমায় আজ দিতে পারছি না। আর-একটা কথা তোমায় বলবার ছিল। অনেক ভেবে দেখলাম যে, ও-শেয়ারগুলো আমার কোনও কাজে লাগবে না। তাই ওগুলো আমি তোমাকেই দিয়ে দিলাম।'

এবারে বেজায় রাগ হয়ে যায় আমার। বলি, 'শেয়ারগুলো তোমার কাজে লাগবে না কেন শুনি? এমন একটা লোক দেখাতে পারো যার বেঁচে থাকতে পয়সার দরকার হয় না? এগুলো আমি যে নেব না তা সেদিনই তোমায় বলে দিয়েছি। তুমি যদি তোমার ঠিকানা না দাও তবে শেয়ারগুলো আমি মুরলীর চালায় ফেলে আসব বলে দিলাম।'

'শেয়ারগুলো কেন আমার কাজে লাগবার নয়, সে-কথা তোমার ভালো লাগবে না বলেই জানাতে চাইনি, বাবুজি। কিন্তু তুমি এত জেদ করছ যে তা না জানিয়ে আর উপায় নেই—' এ-কথা বলে মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলে আপ্পা।

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা হিমশীতল ধারা নেমে গেল। আপ্পার মুখটা চিনতে একটুও ভুল হয়নি আমার। এই উন্নত পাতলা নাক, বড়-বড় দুটি কান, আর কপালের বাঁ-দিকে ইঞ্চিদেড়েক নীলচে দাগটা আমি ঘণ্টা দুয়েক আগেই দেখেছি। হ্যাঁ, হুবহু এসবই দেখেছি মুরলীধরের মৃতদেহে।

ভয়ে আর চমকে আমার বোধবুদ্ধি সব কেমন গুলিয়ে গেল। আমি যেন একটা পাথরের মতো নিষ্পলক চোখে আপ্পার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ এভাবে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। সংবিৎ ফিরল আপ্পার কথায়।

'হ্যাঁ বাবুজি, আমিই মুরলীধর। সেটা আমার পোশাকি নাম, তবে ও-নামে আমায় খুব কম লোকই চিনত। ছোটবেলায় বাবা "কৃষ্ণা" বলে ডাকতেন। বড় হওয়ার পর তার সঙ্গে আপ্পা জুড়ে লোকে আমায় "কৃষ্ণাপ্পা" বানিয়ে দিল। আসল নামটা অনেকে জানতও না।

'আমি সারা জীবন শিক্ষকতা করেছি। নীতি আর আদর্শকেই জীবনে সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছিলাম বলে চ্যারিয়নের দুর্নীতিপরায়ণতাকে কখনও মেনে নিতে পারিনি। তাদের বিরুদ্ধে আমি অনেক প্রমাণ জড়ো করেছি জানতে পেরে চ্যারিয়নের লোকেরা আমাকে প্রথমে খোশামোদ করে, পরে ভয় দেখিয়ে সেগুলো আমার কাছ থেকে হাতাবার চেষ্টা করে। তাতেও অসফল হতে তারা আমায় খুন করে আমার মৃতদেহটা কুয়োটায় ফেলে চলে গেল।

'আমাকে মেরে ফেললেও ওরা ওদের কুকর্মের দলিলগুলো উদ্ধার করতে পারেনি। সেগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে না পারায় মরেও আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। এমন সময়

সেদিন তোমায় দেখতে পেলাম। একটা লাশ জোগাড়ের চিন্তায় ঘুরছ। ঈশ্বরই হয়তো তোমায় আমার সামনে পাঠিয়ে দিলেন। চ্যারিয়ন আর তার চেলারাই তোমার পিছনে লেগেছে, সেজন্য তোমার হাত দিয়ে ওদের কুকর্মের প্রমাণগুলো নিশ্চিন্তে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারা যাবে।

'তা ছাড়া, তোমার দরকার একটা লাশ—আমার দেহটার শেষকৃত্য হলে আমারও ভালো। আমাদের দুজনের কাজই সহজ হয়ে গেল। বাকিটা তোমার জানা আছে।

'এবার তো বুঝতে পারলে যে, এ-দুনিয়ায় কোনও কিছুতেই আমার আর প্রয়োজন নেই। এবার নিশ্চয়ই এ-শেয়ারগুলো নিতে আর আপত্তি করবে না? তুমি এগুলো নিলে আমার বড় ভালো লাগবে। কী, নেবে তো?'

মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম, নেব।

আপ্পা বলল, 'আমার সব কাজ শেষ। এবার আমায় যেতে হবে। চলি, বাবুজি।' বলে বিদায়ের ভঙ্গিতে ডানহাতটা তুলল আপ্পা। তার শরীরটা ধীরে-ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

আমার গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। দেরি না করে আমি ফেরার পথ ধরলাম। ফেরবার পথে ছমছমে ভাবটা কেটে গিয়ে কেন জানি না একটা প্রশান্ত ভাব আমার মনে ছেয়ে গেল।

পরদিন দুপুরেই চুল্লির দামের বকেয়া চেকটা পেয়ে গেছি। ভাগ্যক্রমে সন্ধ্যার একটা ট্রেনে রিজার্ভেশনও জুটে গেল আমাদের। ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় মনে হল প্ল্যাটফর্ম থেকে কেউ ডাকল। তাকিয়ে দেখি, থাপা। ওর চোখে চোখ পড়তেই আবার সেই প্রকাণ্ড সেলাম। বলল, আমি চলে যাচ্ছি শুনে দেখা করতে এসেছে। ট্রেন ছাড়বার আগে সে আমার ঠিকানা চাইল—পালাপার্বণে আমায় চিঠি লিখতে চায়। ঠিকানাটা তাকে লিখে দিলাম।

চেকটা নিয়ে ফিরে আসায় অফিসে আমার বেশ সুখ্যাতি হল। আপ্পার কথা কাউকে বলিনি। তার সাহায্য ছাড়া যে কিছুই করতে পারতাম না, তা শুধু আমিই জানলাম।

এর বছর খানেক বাদে থিরুভাল্লা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি আসে। আমার দেওয়া ফাইলের কাগজপত্রের দৌলতে চ্যারিয়ন ও তার আরও পাঁচজন সঙ্গীর দুই থেকে ছ'বছর অব্দি জেল হয়েছে—সেজন্যই আমায় এ-ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আবারও আপ্পার প্রাপ্য ধন্যবাদটা জুটল আমার কপালে।

গত এক বছরে আপ্পার দেওয়া ছোট্ট কুকুর মস্ত বড় হয়েছে। তার নাম রেখেছি বাঘা। প্রতিদিন তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় আপ্পার দেওয়া চন্দনকাঠের ছড়িটাও সঙ্গে নেওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

এরপরে বছর ছয়েক কেটে গেছে। থিরুভাল্লার স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছে। শুধু থাপার কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি পেতাম। প্রত্যেকটা চিঠিতেই তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমায় একটা সেলাম জানাত সে। একদিন হঠাৎ থাপা এসে হাজির। জানা গেল, থিরুভাল্লার গভর্নমেন্ট হাসপাতাল থেকে গতমাসে সে রিটায়ার করেছে। আপনার বলতে থাপার কেউ নেই, তাই সে আমায় দেখতে চলে এসেছে।

দু-দিনের জন্য এসেছিল, কিন্তু দেখি তার যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে নেই। আমায় বলে, সে আমার কাছে থেকে ফাইফরমাশ খাটবে। তখন একটা ফ্ল্যাটে থাকি। জায়গার একটু অভাব সত্ত্বেও তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারিনি। সেই থেকে সে আমার কাছেই আছে।

এই বাড়িটা বানানো শেষ হতে সে এখন এটার রাখোয়ালি করে। আমাকে দেখলেই তার ওই প্রকাণ্ড সেলাম করাটা তাকে অনেক বলেও ছাড়াতে পারিনি। থাপার সবই ভালো, তাই অস্বস্তি লাগলেও তার এই সেলাম করাটা মেনে নিয়েছি।

এবারে এ-বাড়ির কথায় আসি। বছর পাঁচেক আগে একদিন সকালে কাগজ খুলে এমন একটা খবর চোখে পড়ল যে-বুঝতে পারলাম কৃষ্ণাপ্পার যে-শিকে আমার ভাগ্যে ছিঁড়েছিল তা তখনও খালি হয়নি। খবরটা হল—কোঙ্কন রেলওয়ের দৌলতে 'আম্বাপাল্প' কোম্পানির ভাগ্য খুলে গেছে। এক মস্ত বিদেশি ফুড প্রসেসিং কোম্পানি তাতে মোটা অর্থ লগ্নি করবে বলে মনস্থ করেছে। শুধু তাই নয়, সেই বিদেশি কোম্পানিই 'আম্বাপাল্প'-এর সমস্ত উৎপাদন সারা বিশ্ব জুড়ে রপ্তানি করবার দায়িত্বও নেবে বলে ঘোষণা করেছে। 'আম্বাপাল্প'-এর শেয়ারগুলো আমার নামে ট্রান্সফার করিয়ে নেওয়ার পর, প্রথম কয়েক মাস ওই শেয়ারের দাম বাড়তে না দেখে ওগুলো যে আমার কাছে আছে সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। এই খবরটা পড়ে 'আম্বাপাল্প'-এর শেয়ারের দামের ব্যাপারে আমার একটু কৌতূহল জাগল। 'আম্বাপাল্প' বারকয়েক বোনাস শেয়ার ঘোষণা করায় বছর দুয়েকের মধ্যেই আমার সেই এক হাজার শেয়ার বেড়ে পাঁচ হাজারে দাঁড়ায়।

বছর দুয়েক আগে একদিন কাগজ খুলে দেখি যে, 'আম্বাপাল্প'-এর প্রতিটি শেয়ারের দাম হয়েছে দু-হাজার আটশো টাকার মতো। তখন সবক'টা শেয়ার বেচে দিই। রাতারাতি আমি সোয়া এক কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলাম।

সে-টাকা থেকে এই বাড়ি করবার পরেও আমার হাতে যা রইল তাতে আমার তিন পুরুষ বসে খেতে পারবে। আপ্পার কথা কেউ জানে না বলে সকলে ভাবে শেয়ার মার্কেটে আমার ভাগ্য খুলে যাওয়াতেই আমার এ-রমরমা অবস্থা। আমার সবকিছুই হয়েছে আপ্পার কল্যাণে, কিন্তু তার সমস্ত কৃতিত্বই পেয়েছি আমি। আপ্পার ওপর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জনাই বাড়ির নামটা রেখেছি "কৃষ্ণাপ্পা প্রসাদ"। অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও এভাবেই আপ্পাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

এতক্ষণ একটানা কথা বলবার পরে বীরভদ্র রায়চৌধুরি বোধহয় একটু দম নিতেই থামলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী মশাই, বাড়ির নামটা ঠিক রাখা হয়েছে কি না বলুন তো এবার? অবশ্য ঘটনাটা আপনার বিশ্বাস হল কি না তাও তো জানি না।'

আমি বললাম, 'ঘটনাটা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে দেখলে বাড়ির নামকরণটাও সার্থক হয়েছে বলতেই হয়।'

বীরভদ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি পা চালাই। তাড়া আছে বইকি—কৃষ্ণাপ্পার শিকে ছিঁড়ে যে-গল্পটা আমার ঝুলিতে পড়েছে, সেটাকে চট করে খাতাবন্দি করে ফেলতে হবে না!

বীজমন্ত্র



নীল মজুমদার

॥ ১ ॥

ইন্টারভিউয়ের শেষ প্রশ্নটি করলেন চেয়ারম্যান নিজেই। বললেন, মিস্টার সোম, এই চাকরিটা যদি আমরা আপনাকে অফার করি, আপনি কবে থেকে জয়েন করতে পারবেন?

ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে ঠিকই কিন্তু এতটা তন্ময়ও আশা করেনি। ভেতরের উত্তেজনা চেপে ও বলল, স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা যদি সত্যিই আমাকে এই পোস্ট-এর উপযুক্ত মনে করে থাকেন, আমি আজই জয়েন করতে পারি।

চেয়ারমান অসিত মুখার্জি বোর্ডের অন্য চারজন মেম্বারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, আজ নয়, আগামীকাল জয়েন করলেও চলবে। বাই দ্য ওয়ে, আপনার তো বাড়ি দেখছি নাগপুরে। আপনি এখানে আছেন কোথায়?

তন্ময় বলল, স্যার, আমি আজ সকালের ট্রেনে পুনে এসে পৌঁছেছি। রিটায়ারিং রুমে তৈরি হয়ে এখানে এসেছি ইন্টারভিউ দিতে। রাত্রে মহারাষ্ট্র এক্সপ্রেসে ফিরে যাওয়ার কথা।

আই সি,—অসিত মুখার্জির পাশে বসা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, আপনার, তার মানে, এখানে থাকার কোনও জায়গা নেই!

না স্যার,—তন্ময় মাথা নেড়ে বলল, পুনেতে আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। এখানে আমি কাউকে চিনি না।

চেয়ারম্যান ইন্টারকমে কাউকে ভেতরে আসতে বলে, বললেন, তাতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয় থাকার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে আশা করি।

বাইরের ওয়েটিং হলে বসে থাকা রিসেপশনিস্ট ভদ্রমহিলা সুইংডোর ঠেলে ভেতরে এসেছিলেন ইতিমধ্যেই। অসিত তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, অ্যালিস, তন্ময় সোমের নামে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তৈরি করে দাও।

কফি শেষ হয়ে এসেছিল। অভিনন্দন, ধন্যবাদ ইত্যাদির পাট চুকিয়ে বোর্ড মেম্বাররা সকলে উঠলেন এবার। হাতের ইশারায় তন্ময়কে বসতে বলে অসিত বাইরে গেলেন ওঁদের ছাড়তে।

তার মানে চাকরিটা আমার সত্যিই হয়ে গেছে! খালি ঘরে তন্ময়ের উচ্ছ্বাস জোরালো একটা নিশ্বাসের মতো বেরিয়ে এল এতক্ষণে। ইয়েস, আই গট ইট, আই গট ইট—নিজেকেই চাপা গলায় বলল তন্ময়। ডেকান অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের চাকরিটা এখন আমার। সতেরো জন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করে এই পোস্ট আমি জয় করেছি।

অসিতকে ফিরে আসতে দেখে তন্ময় উঠে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজি ছেড়ে পরিষ্কার বাংলায় উনি বললেন, বোসো বোসো। তুমি করে বলছি কিন্তু—।

তন্ময় বলল, নিশ্চয়ই।

অসিত বললেন, তোমার ওই রিটায়ারিং রুমের ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। এটার একটা হিল্লে করতে হবে।

তন্ময় হেসে বলল, স্যার, আপনি ব্যস্ত হবেন না—।

অসিত বললেন, ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। শোনো, আমাদের একটা ছোট গেস্টহাউস আছে, ফ্যাকট্রির পিছনদিকটায়। খালি থাকলে ওখানেই তুমি তিন-চার দিন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবে। আর ততদিনে, থাকার একটা—।

অ্যালিস কাগজপত্র নিয়ে ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকেছিলেন। দেখে বাঙালি মনে না হলেও বাংলা বোঝেন নিশ্চয়ই। অসিতের সই নেওয়ার পর বললেন, স্যার, মিস্টার পালিত সেদিন একটা অ্যাপার্টমেন্টের কথা বলেছিলেন আপনাকে—।

ও ইয়েস। খুব খুশি হয়ে অসিত বললেন, ঠিক সময় মনে পড়িয়েছ। আমি দেখছি।

টেবিলে রাখা ফোন তুলে ডায়াল করে অসিত বললেন, কী রে, কী খবর।

কার সঙ্গে কথা হচ্ছে, ওদিক থেকে কী উত্তর এল, কিছুই অবশ্য বুঝতে পারল না তন্ময়। এতক্ষণে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে এসে গেছে। কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের সুন্দর অক্ষরগুলির মধ্যে নিজের সৌভাগ্য ও সফলতার সূচনা অনুভব করতে-করতে পড়তে লাগল তন্ময়...মনে-মনে প্রতিটি অক্ষর, শব্দ উচ্চারণ করে।

ফোন রেখে অসিত বললেন, আমার এক ছোটবেলার বন্ধু থাকে পাশেই। ওর বাড়ির একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়ার কথা বলেছিল, কয়েকদিন আগে। ইউ আর লাকি। ওটা এখনও খালি আছে। কাল সকাল সাড়ে সাতটায় ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে। আর আজ,—ইন্টারকম উঠিয়ে অসিত বললেন, অ্যালিস গেস্টহাউসে স্যুট খালি আছে কি না দেখো তো। ওদিক থেকে জবাব শুনে বললেন, গুড। আজ তুমি যে-কোনও সময় তোমার তল্পিতল্পা নিয়ে রিটায়ারিং রুম ছেড়ে আমাদের গেস্টহাউসে চলে আসতে পার।

চেয়ারম্যান সাহেবের তৎপরতায় ও সহৃদয়তায় তন্ময় মুগ্ধ। উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, স্যার, আপনার এই ঋণ আমি—।

অসিত উচ্চৈঃস্বরে হেসে বললেন, ঋণ শোধ করবে কী করে, এই তো? কাজ করে, মন লাগিয়ে কাজ করে। অ্যালিসের কাছে ডিরেকশনটা বুঝে নিয়ো। পাশেই বাড়ি। আর হ্যাঁ, সাড়ে সাতটার যেন এক মিনিটও বেশি না হয়। তাহলে কিন্তু স্বয়ং ভগবানও গ্যাগির ওই ফ্ল্যাট তোমাকে দেওয়াতে পারবেন না। বুঝলে তো! আচ্ছা, এসো।

অফিসের বাইরে সবুজ লন। একপাশে পার্কিংয়ের জায়গা। ফ্যাক্টরি সম্ভবত অফিসের পিছনে। সবকিছুই বেশ ছিমছাম, সাজানো।

গেট দিয়ে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল তন্ময়, প্রায় সাড়ে চারটে। খুব কাছেই একসারি পাহাড় বিকেলের রোদ মাখছে গায়ে। কী করা যায় এখন! খিদে পেয়েছে, সবচেয়ে আগে কিছু খাওয়া দরকার। ফেরার রিজার্ভেশনও ক্যানসেল করতে হবে। তারপর! সিনেমা গেলে কেমন হয়! আর কোথাও তো যাওয়ার নেই, এমনকী এতবড় এই খবরটাও ফোন করে জানাবার মতো কেউ নেই তন্ময়ের। আহ্, সামনের ওই সবুজ পাহাড়ের ওপর চিত হয়ে শুয়ে যদি আকাশের সঙ্গে কথা বলা যেত!

দু-একটা মশার উপদ্রব ছাড়া গেস্টহাউসে রাতটা মন্দ কাটেনি। সকালে তৈরি হতে-হতে ভাবছিল তন্ময়। বাড়িটা পাওয়া যাবে কি না কে জানে! তা ছাড়াও আছে ভাড়ার ব্যাপার। চেয়ারম্যান সাহেবের বন্ধু বলে একটু কমসম হলেও হতে পারে। কিন্তু পুনেতে, তন্ময় শুনেছে, এমনিতেই বাড়ির ভাড়া আকাশছোঁয়া।

গেস্টহাউসের পাশেই একটা গেট। গেট দিয়ে বেরিয়ে তন্ময় দেখল এটা অফিসের সামনের সেই চওড়া রাস্তাটা নয়—সম্ভবত তারই একটা শাখা। লোক চলাচল সবে শুরু হয়েছে। একঝাঁক ফুলের মতো বাচ্চা নিয়ে চলে গেল স্কুলের একটি মিনিবাস। এদিকে বাড়ি-ঘরের সংখ্যা কম। বাড়ির মাঝখানের দূরত্ব ভরাট করে রেখেছে বড়-বড় গাছের বাগান। প্রতিটি বাড়িই যেন ছোট এক-একটা জঙ্গলের মধ্যে।

প্রায় পাঁচ মিনিট সোজা হেঁটে তন্ময় দেখল রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরেছে। বাঁক ঘুরতে চোখে পড়ল। অসিত মুখার্জি ট্র্যাক-স্যুট পরে জগিং করে এদিকেই আসছেন। সুঠাম ফরসা চেহারা, কপালে ঘাম, তন্ময়কে দেখে না থেমেই বললেন, আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁ-দিকে টিক নার্সারি দেখতে পাবে—একপাশে কম্পাউন্ডের গেট।

সাইনবোর্ড চোখে পড়ল দূর থেকেই। পাশে লোহার গেট। কেউ কোথাও নেই। কম্পাউন্ডের ভেতর দীর্ঘ, সবুজ সেগুন গাছ সারি-সারি। বিভিন্ন সাইজের টিন-শেড গোটাকয়েক। বাঁ-দিকে ছোট চারার অসংখ্য বেড। সিমেন্টের বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম। এইসব দেখতে-দেখতে গেট পার হয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে পৌঁছে তন্ময় দেখল—লেখা রয়েছে 'অফিস' এবং স্বাভাবিকভাবেই তালা ঝুলছে।

আমাকে তো অফিসে ডাকা হয়নি, ডাকা হয়েছে বাড়িতে। বাড়ি বা বাড়ির রাস্তা কি অন্যদিক দিয়ে? থমকে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছিল তন্ময়। ডানদিকে চোখ পড়তেই দেখল একটা বোর্ডে 'রেসিডেন্স' লিখে তির চিহ্ন দেওয়া আছে।

তিরের নিশানা লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে তন্ময় দেখল, বারান্দার গায়ে একটা দরজায় ভারী পরদা ঝুলছে। সিগারেটের গন্ধে জায়গাটা আমোদিত। না, দেরি হয়নি, ঘড়ি দেখল তন্ময়। এখনও সাড়ে সাতটা বাজতে প্রায় দু-মিনিট বাকি।

তন্ময়ের না হলেও দুলালের আজ অসম্ভব দেরি হয়েছে ঘুম ভাঙতে। কাল কেষ্টদাদের আড্ডায় যাওয়াটাই ভুল হয়েছে। ফিরতে দেরি, শুতে দেরি, খোয়ারি ভাঙতে দেরি। হুঁশ হল শেকলের ঝনঝন শব্দে। কুলুঙ্গিতে রাখা ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল দুলাল, সাতটা পঁচিশ। সর্বনাশ! সাহেবকে সকালের কফি দেওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখে ঝি বিমলা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দরজার শেকল বাজাচ্ছে।

দৃকপাত না করে, মুখে-চোখে জল দিয়েই ও এসে ঢুকেছে রান্নাঘরে। আজ কপালে দুঃখ আছে। দেবতার মতো মানুষটা সময়ের হেরফের দেখলেই একেবারে বদলে যায়। কিছুই বলবে না হয়তো, শুধু হিমশীতল চোখে দুলালের পা থেকে মাথা অবধি দেখবে। সে কী দেখা রে বাবা! যেন হাড় ফুটো হয়ে যায়!

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্লেটের ওপর কফি পড়ে গেল চলকে। এইভাবে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্লেটের কফি ফেলে পরিষ্কার করে আবার কাপ রাখল দুলাল। বিমলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। এ-বাড়িতে একজনের কাজে অন্যজনের সাহায্য করার নিয়ম নেই। তাই চুপচাপ মজা দেখছে। ওকে পরে দেখে নেবে দুলাল। এখন ক'টা বাজল কে জানে!

কফির কাপ-প্লেট ট্রেতে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হওয়ার আগেই ঝনঝন শব্দ।

আপনার কী হয়েছে, কী হয়েছে আপনার? উঠুন, উঠুন, বাড়িতে কে আছেন!

ঘর ফাটানো এইরকম চিৎকারে মাথা ঘুরে গেল দুলালের। প্রায় ছুটে সাহেবের বসার ঘরে এসে দেখল, সাহেব মাটিতে পড়ে আছেন, আর একটি অচেনা, অল্পবয়েসি ছেলে ওঁর পাশে বসে চিৎকার করছে, বাড়িতে কে আছেন!

দুলালের পা কাঁপতে লাগল। কফির ট্রে একপাশে রেখে সাহেবকে ধরে তুলতে গিয়েই বুঝল, সব শেষ। ততক্ষণে বিমলা পায়ের কাছে বসে তীক্ষ্ণস্বরে কাঁদতে শুরু করেছে।

চেয়ারে বসেই রবির চোখ লেগে এসেছিল। টেবিলের খাতাপত্রের ওপর মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেই জানে না। কান্নার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল। নীচের তলা থেকেই শব্দটা আসছে নাকি! দু-চোখে রাত জাগার ক্লান্তি করকর করছে। প্রায় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গগনদার স্টাডিরুমে এসে যেন দেওয়ালের সঙ্গে প্রবল ধাক্কা খেল রবি। গগনদা ঘরের একদিকে চিত হয়ে পড়ে আছে। দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, খোলা মুখ থেকে জিভটা লটকে বেরিয়ে আছে

বাইরে। বসে পড়ে গায়ে হাত দিয়ে চিৎকার করে ডাকল রবি, গগনদা—!

ওর গলা দিয়ে ভালো করে আওয়াজ বের হল না। উঠে ভেতরে গিয়ে ও ডাকল, বউদি, ও বউদি, তুমি কোথায়?

বিমলা রুদ্ধস্বরে বলল, বাঈসাহেব বাড়িতে নেই, ছোটবাবু।

জগিং করে ফিরে, লতা-পাতা ঘেরা বাড়ির পিছনের বারান্দায় বারবেল নিয়ে একটা ওয়ার্কআউট করছিলেন অসিত। বেতের টেবিলের ওপর রাখা মোবাইল ফোনটা সুর করে বাজল এইসময়।

বোতাম টিপে কানে লাগাতেই শুনলেন রবির গলা—অসিতদা, বাড়িতে ভীষণ বিপদ, মনে হয় গগনদা আর নেই।

বুকের ভেতর কোথায় বিরাট একটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, অনুভব করলেন অসিত। রবি তখনও বলে চলেছে, একটা অচেনা ছেলে, নাম বলছে তন্ময়, বলছে, তুমিই নাকি ওকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছিলে। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্যে—।

॥ ২ ॥

পুনেতে আসার আগে গগনরা কোথায় ছিল সেটা এখন আর মনে পড়ে না অসিতের। ওর বাবা সরকারি অফিসার ছিলেন। বদলি হয়ে এসেছিলেন পুনেতে আর গগন এসে ভরতি হয়েছিল অসিতদের স্কুলে।

প্রথম দিনেই লম্বা, কালো, রোগা, গম্ভীর কণ্ঠস্বরের এই ছেলেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অবলীলাক্রমে। সব থেকে পিছনের বেঞ্চে বসে ক্রমাগত কোর্সের বাইরের বই পড়ত যে-ছেলেটি, তাকে কোর্সের কূটকচালি প্রশ্ন জিগ্যেস করে কিন্তু প্যাঁচে ফেলতে পারেননি স্কুলের কোনও শিক্ষকই।

মেধা ছাড়া চরিত্রের অন্য দিকগুলো প্রকাশ পেয়েছিল আরও পরে। গগন অসম্ভব একরোখা, রাগী। গগন ভালো ফুটবল খেলে, গগন ভালো বলে, গগন মেয়েদের ব্যাপারে বেশ দুর্বল। অসিতের সঙ্গে খুব খাপ খেয়ে গিয়েছিল, প্রাণের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল কয়েকদিনেই। থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স-এর তৃতীয় জন, মানে তরুণ, কিন্তু বন্ধুত্ব সত্ত্বেও আড়ালে বলত, হি ল্যাক্‌স সফিস্টিকেশন।

ইন্টারমিডিয়েটের পর ওদের কলেজ আলাদা হয়ে গেল। তরুণ আর অসিত ভরতি হল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, আর গগন থেকে গেল সায়েন্স কলেজেই। দেখা-সাক্ষাৎ, আড্ডা অবশ্য একটুও কম হয়নি, বরং বেড়েছিল। মাঝে-মাঝে দু-দিন ছুটি পড়লে ওরা বেরিয়ে পড়ত—লোনাবালা, খান্ডালা বা মাথেরনের দিকে। এইরকমই একটা খামখেয়ালি ট্যুরে আলাপ হয়েছিল জার্নালিজমের ছাত্রী বর্ষা দেশপাণ্ডের সঙ্গে।

গগন যে অল ইন্ডিয়া সার্ভিসে যাবে, এটা মোটামুটি সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু বি.এসসি-র পর ও যখন আই.এ.এস-এর দিকে হাত না বাড়িয়ে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের জন্য তৈরি হতে শুরু করল, তখন অসিতরা অবাক হয়েছিল নিঃসন্দেহেই। কংক্রিটের জঙ্গল নয়, সত্যিকারের জঙ্গল হবে আমার কর্মস্থল,—এই ছিল গগনের বাঁধা উত্তর। তবে তরুণ অবশ্য আড়ালে বলেছিল, বর্ষার পর্যাবরণ নিয়ে লেখার আগ্রহ আর অনুসন্ধানের ইচ্ছে—এইগুলোই নাকি আসল কারণ। গগন 'ফরেস্ট অফিসার' হয়ে বর্ষাকে ইমপ্রেস করতে চায়।

দেরাদুনে গগন ট্রেনিং-এ চলে যাওয়ার পর ওদের সম্পর্ক একটু ক্ষীণ হয়েছিল সাময়িকভাবে।

কিন্তু ছুটিছাটায় পুনে এসে ও আগের মতোই হইহল্লোড় করত। ততদিনে বর্ষা আর ওর বোন উষাকে ভালোরকম বাংলা শিখিয়ে দিয়েছে অসিতরা, আর বর্ষাও নতুন শেখা বাংলায় এটা-সেটা পড়তে শুরু করেছে।

এই সময় একবার দেরাদুন থেকে পুনে এসে গগন বলল, 'তোমার লেখা প্রথম বাংলা চিঠি হবে আমার জন্যে। এটা শুনে তরুণ বাস্তবিক চটেছিল। অসিতরা তখন ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইনাল ইয়ারে। আর এটাও ততদিনে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, বর্ষার ব্যাপারে গগনের যতই উৎসাহ থাক, বর্ষা ভালোবাসে তরুণকে আর তরুণ বর্ষাকে। অসিত ছিল এই নাটকের নির্বাক দর্শক। কিন্তু সত্যিই নির্বাক ছিল কি?

এখন মনে হয়, এর মধ্যে কোথাও ভবিতব্যেরও বিরাট একটা ভূমিকা ছিল যেন। আই. এফ. এস. হয়ে গগন পেতেই পারত হিমাচল প্রদেশ বা কেরলের মতো একটা ক্যাডার। বিশাল এই ভারতের অন্য এক কোনায় থেকে, বর্ষার সঙ্গে সারা জীবনে আর একবারও দেখা না হয়ে কাটতেই পারত ওর জীবন। তা না হয়ে গগন কিন্তু পেল মহারাষ্ট্র ক্যাডার। আর তার কিছুদিন পরে পুনের ইন্ডিয়া কফি হাউসে বসে গগনের সেই অদ্ভুত ঘোষণা—এই ইঞ্জিনিয়াররা কিস্যু করতে পারবে না। বি-টেক করেই এরা ছুটবে ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রির দিকে, দেখে নিয়ো। বর্ষা, তোমার জীবনে যদি কেউ স্থিতি আনতে পারে, তো সে এই বান্দা, এই হার্ডকোর ফরেস্টার।

বর্ষা চটপট জবাব দিয়েছিল, স্থিতির জন্যে আমার যে তোমাদেরই একজনকে দরকার হবে এটা ধরে নিচ্ছ কেন?

একটা সিগারেট ধরিয়ে গগন জবাব দিয়েছিল, আমি ইস্যু ওপেন করে অফার দিয়ে গেলাম। জীবনটা তোমার—তুমি ভেবে দেখো। বলেই গটমট করে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এর পরের তিন-চারটে বছর একটু এলোমেলো। গগন ওই সময় পোস্টেড ছিল নাগপুরে, গন্দিয়ার দিকে। তরুণ গিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ায় ম্যানেজমেন্ট পড়তে। ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নিয়েছিল অসিতও, তবে দেশেই। আর বর্ষা এই সময় একটা বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিকে লিখতে শুরু করে হইচই ফেলে দিয়েছিল। তবু পুনে বা পুনের আশেপাশে ছিল বর্ষা আর অসিতই। গগন আর তরুণ এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে বর্ষাকে কেড়ে নেওয়ার চিন্তা অসিতের মনের কোনও স্তরে এইসময় কাজ করেনি। নাকি অসিত সাহস করেনি হেরে যাওয়ার ভয়ে!

এইসব চুলচেরা বিচারের সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না অসিত। বর্ষারও তো বোঝা উচিত ছিল, এটা আসলে প্রেমের ত্রিভুজ নয় চতুর্ভুজ, যার চতুর্থ কোণটা আঁকড়ে ধরে আছে সক্ষম অসিত। ওর মনে হয়, বর্ষা এটা বুঝেও না বোঝার ভান করেছে চিরকাল।

জীবন এইভাবে গড়িয়ে-গড়িয়ে কোথায় গিয়ে থামত কে জানে। এইসময় হঠাৎ একদিন চরম বোঝাপড়া হয়ে গেল অদৃষ্টের হাতে। গগন জুনারে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার হয়ে পোস্টেড হওয়ার পরের কথা। তরুণ ফিরে এসেছে, অসিতও পুনেতেই। গগন পুনে এসেছিল কী একটা কাজে। এসেই বলল, বর্ষা এখানে নেই তাতে বয়ে গেছে। চল, আমরা মহাবালেশ্বর ঘুরে আসি।

মাহিন্দ্রা জিপে, খাবারদাবার, থার্মোস, জলের বোতল নিয়ে ড্রাইভার বসেছে পিছনে। ড্রাইভ করছিল গগন নিজে। মাঝখানে অসিত, সবচেয়ে ধারে তরুণ। গগন আর তরুণই বক্তা, অসিত মূলত শ্রোতা। তরুণ বলছিল ক্যালিফোর্নিয়ার কথা আর গগন অরণ্যের অজানা তথ্য। সহ্যাদ্রির জিলিপির প্যাঁচ দেওয়া রাস্তায় সেপ্টেম্বরের এক সকালে জিপ ছুটছিল হু-হু করে। ঠিক এইসময় ঘটল ঘটনাটা। বাঁ-দিকে দাঁত বার-করা পাথুরে পাহাড় আর ডানদিকে অতলান্ত খাদ। একটা 'ইউ টার্ন' ঘুরতেই চোখে পড়ল, রাক্ষসের মতো একটা ট্রাক প্রবল গতিতে এগিয়ে আসছে মুখোমুখি, একেবারে কাছেই। গগন প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাল, ব্রেক কষল। আলোর চমক, প্রচণ্ড শব্দ, তারপর সব অন্ধকার।

তরুণ ছিটকে পড়েছিল বাইরে, মাথাটা চুরমার হয়ে গিয়েছিল পাথরের ধাক্কায়। আই. সি. ইউ.-তে সাতদিন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকার পর ও আর কাউকে কষ্ট দেয়নি।

তিন টুকরো ডানহাত নিয়ে অসিত কিন্তু বেঁচে উঠল খুব কমের ওপর দিয়ে।

গগনের বাঁ-পাটা হাঁটুর নীচে থেকে বাদ দিতে হল। বাঁ-দিকের চোখটাও অক্ষত নেই।

বাকি গল্পটা অসিত শুনেছিল গগনের কাছেই।

চোখ খুলে গগন দেখেছিল বর্ষার উৎকণ্ঠিত মুখ। বর্ষা জিগ্যেস করেছিল, তুমি কেমন আছ?

আমি বেঁচে যাব এ-যাত্রায়—গগন বলেছিল, ইঞ্জিনিয়ার দুটোর কী খবর?

এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয়নি বর্ষা। চোখে জল, অস্ফুট গলায় বলেছিল, আজ থেকে বছর চারেক আগে তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে বলেছিলে, মনে আছে? আমি ভেবে নিয়েছি, আমি রাজি।

কষ্টের মধ্যেও হেসে গগন জিজ্ঞাসা করেছিল, সহানুভূতি?

প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে গগনের বাড়িতে পৌঁছে অসিত দেখল, সেই গগন, এখন ইতিহাস হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। প্রবীণ ডাক্তার পাটিল এসে গেছেন, পরীক্ষা করছেন গগনকে।

সাব-ইন্সপেক্টার প্রসাদ, কনস্টেবল, ফটোগ্রাফার ইত্যাদির দলবল নিয়ে গগন পালিতের বাড়িতে পৌঁছে আকাশ দেখল, বাড়িতে গভীর শোকের ছায়া নেমেছে। ডাক্তার গগনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন—এমনকী অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা জানাতেও বাকি রাখেননি।

বর্ষা পালিত মন্দির থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। বিমলা ওঁকে ভেতরে নিয়ে গেছে। মন্দিরের থালা, ফুল, প্রসাদ ছড়িয়ে আছে মাটিতে।

মৃতদেহ একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। মাথার দিকে একটা চিনেমাটির ফ্লাওয়ার ভাস কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আছে। একটা সোফায় বসে ডাক্তার পাটিল আর অসিত খুব নীচু গলায় কথা বলছিলেন। অন্য একটা সোফায় তন্ময় বসেছিল একা। আকাশকে ঢুকতে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়ালেন।

প্রাথমিক আলাপের পর্ব চুকিয়ে অসিত সংক্ষেপে বললেন আনুপূর্বিক ঘটনা। শেষের দিকটা বলল তন্ময়। মৃতদেহের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে আকাশ বলল, প্রথম যখন দেখেছিলেন আপনি, তখন কি ঠিক এইভাবেই পড়েছিলেন?

তন্ময় একটু ভেবে বলল, না, বাঁ-হাতটা বোধহয় বুকের ওপর ছিল। আমি এই হাতটা ধরে ওঁকে ডেকেছিলাম, ঝাঁকানি দিয়েছিলাম। তারপর হাতটা নীচে মাটিতে রেখে ফেলেছি। ওই সময় আমারই কনুই-এ লেগে ওই ফ্লাওয়ার ভাসটা ওপর থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছিল।

আকাশ দেখল, গগন পালিতের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কাছাকাছি। মাথায় এলোমেলো বড় চুল, গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। কর্কশ মুখে ভয়, উত্তেজনা, কষ্ট আর ঘৃণার অনুভূতি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। সাদা খাদির পাজামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে গলায় সাদা সুতির স্কার্ফ। বাঁ-পাটা একটু অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় পরীক্ষা করে আকাশ বলল, ফলস লিম্ব?

—হ্যাঁ, অসিত জবাব দিলেন, প্রায় তেরো বছর আগে একটা অ্যাকসিডেন্টে ওঁর একটা পা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কোনাকুনিভাবে রাখা একটা সোফার পিছনে প্রায় দু-হাত জায়গা ছেড়ে পড়ে আছে গগনের শরীর। সোফার ডানদিকের হাতলে সুন্দর কাজ করা ওয়াকিং স্টিক ঠেস দিয়ে রাখা। সোফার নীচে মাটিতে একটা ভাঙা দোমড়ানো সিগারেট চোখে পড়ল আকাশের। সামনের পোড়া অংশটা দেখলেই বোঝা যায়, এটা জ্বালানো হয়েছিল, সম্ভবত খাওয়াও হয়েছিল। আকাশ জিজ্ঞাসা করল, এ-বাড়িতে

সিগারেট কে খান?

—গগনই খেত। আর তো কেউ, অসিত ইতস্তত করে বললেন, আমার মনে হয় না রবি সিগারেট খায়।

—গগনবাবু কি একটু বা অর্ধেকটা সিগারেট খেয়ে ফেলে দিতেন?

আকাশের প্রশ্নের উত্তরে একটু ভেবে অসিত বললেন, কখনও এরকম দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

—আর-একটা প্রশ্ন। গগনবাবুর কি যেখানে-সেখানে সিগারেট ফেলে দেওয়ার অভ্যেস ছিল?

—ঠিক তার উলটো। ওকে আমি অ্যাশট্রেতে ছাড়া সিগারেট ফেলতে দেখিনি কখনও। ইন ফ্যাক্ট, ও খুব মেথডিক্যাল আর ডিসিপ্লিনড ছিল। কথার শেষে অসিতের গলা ভারি হয়ে এল।

রক্তপাত বা আঘাতের কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না আপাতদৃষ্টিতে। প্রসাদের সাহায্য নিয়ে মৃতদেহ উপুড় করে দিতেই আকাশের চোখে পড়ল, সুপুরির চেয়েও ছোট সাইজের সম্ভবত কিছুর দুটো বীজ পড়ে আছে।

সাবধানে হাতে নিয়ে দেখল, গড়ন গোলাকার, গায়ে লাইনটানা দাগ।

এগুলো কী দেখুন তো, আকাশ বলল।

একটু মলিন হেসে অসিত বললেন, সম্ভবত সেগুনের বীজ। আমি এ-লাইনের লোক নই, রবি ভালো বলতে পারবে।

খানিকটা স্বগতোক্তির মতো আকাশ বলল, এগুলো এখানে কেন!

মাঝারি সাইজের এই ঘরে ঢোকার তিনটি দরজা, একটা বাইরের দিকে, অন্য দুটি ভেতরের দিকে। ভেতরের একটি দরজার কাছে রবি এসে দাঁড়িয়েছিল উদ্বিগ্নভাবে। ওকে ভালো করে দেখে আকাশ বলল, আপনিও কি মন্দিরে গিয়েছিলেন? না কি অন্য কোথাও?

—না তো, কোথাও যাইনি। রবি বলল।

—কোথাও যাননি? মানে ঘুম থেকে উঠে সোজা এই ঘরে এসেছিলেন, তাই তো?

—হ্যাঁ, কেন?

আকাশ বলল, আপনি কি জামা, প্যান্ট, জুতো—এইসব পরেই ঘুমোতে যান?

এতক্ষণে সকলের চোখে পড়ল রবি সত্যিই বাইরে যাওয়ার পোশাকেই আছে। থতমত খেয়ে রবি বলল, না, মানে...কাল রাত্রে একটু দেরি করে, মানে ইয়ে, তখন আর চেঞ্জ করা হয়নি।

ওই ঘরটাকে প্রথাসিদ্ধ ড্রয়িংরুম বলা চলে না, ড্রয়িং কাম স্টাডি। একপাশে রাইটিং টেবিল, চেয়ার, দুটি আলমারি ভরতি বই। ঘরের মাঝখানে একটা সেন্টার টেবিল ঘিরে গোটাকয়েক সোফা। সেন্টার টেবিলে একটা কাঠের অ্যাশট্রে, তাতে একটাই পোড়া কাঠি। সম্ভবত এই কাঠি দিয়েই জ্বালানো হয়েছিল সিগারেটটা।

লেখার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল আকাশ। বাঁশের কলমদানি, বাঁশ আর বেত দিয়ে তৈরি টেবিল ল্যাম্প, বাঁশের ফ্রেমে বাঁধানো ছোট টেবিল ঘড়ি। একপাশে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। পেপার ওয়েটের নীচে রাখা একটা টেলিগ্রাম তুলে নিয়ে আকাশ দেখল, জনৈক গায়কোয়াড়, আকোলার পোস্ট অফিস থেকে, ট্রাক ব্রেকডাউন হয়ে আটকে পড়ার কথা লিখেছে। গায়কোয়াড় নিশ্চয়ই গগনবাবুর ফার্মের কোনও কর্মচারী। টেলিগ্রামের কাগজের ওপর পেনসিল দিয়ে অন্যমনস্কভাবে আঁকিবুকি কাটা। আর-এক জায়গায় কয়েকবার লেখা কান্তিলাল, কান্তিলাল।

—এই হাতের লেখা কি গগনবাবুর? আকাশ জিগ্যেস করল।

মন দিয়ে লেখাটা দেখে অসিত বললেন—হ্যাঁ।

—আর কান্তিলাল কে?

যদিও ডাক্তারের বিষয়ের অন্তর্গত নয়, তবু যেন ভীষণ আশ্চর্য হয়েছেন এইভাবে ডাক্তার

পাটিল বললেন, সেকী, আপনি পুনেতে পোস্টেড আর কান্তিলালের নাম শোনেননি?

আকাশ হেসে বলল, আমি খুব অল্প দিন হল এখানে এসেছি। তবু আমার অজ্ঞতার জন্যে ক্ষমা চাইছি। আমি সত্যিই কান্তিলালকে চিনি না।

—কান্তিলাল এখানে একজন নামকরা বিজনেসম্যান। ওঁর—।

বাধা দিয়ে আকাশ বলল, ওঁর কীসের বিজনেস?

—ওঁর নানারকম বিজনেস আছে। বিড়ি পাতার, স-মিলের, নার্সারির। ইলেকশনে দাঁড়িয়ে দুবার হেরে গেছেন ঠিকই, তবে শুনেছি রাজনৈতিক মহলে বিশেষ যাতায়াত আছে। অসিত বললেন।

—গগনবাবুর সঙ্গে ওঁর কীসের সম্পর্ক?

—সঠিক সম্পর্ক কী তা তো বলতে পারব না। বিজনেস রাইভ্যালরি হতে পারে, কারণ কান্তিলালেরও নার্সারির বিজনেস আছে। তা ছাড়া, ভেবে দেখুন ওঁর অন্য যা কিছু বিজনেস তার সঙ্গেও জঙ্গলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। আর গগন ছিল ফরেস্ট অফিসার। আমার মনে হয়, বর্মা এ-বিষয়ে আরও কিছু বলতে পারবে।

তন্ময় এতক্ষণ চুপচাপ সকলের কথা শুনেছিল। অসিতের কথা শেষ হতেই ও হঠাৎ উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে বলল, আমি অবশ্য কাউকেই চিনি না, কিন্তু স্যার, এখন আমার একটা কথা মনে পড়ছে যেটা বলা দরকার। আমি যখন আজ সকালে পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে বললাম, মে আই কাম ইন, সাড়া পেলাম না। এদিক-ওদিক দেখছি, ভাবছি কী করব, এমনসময় একটা লোককে দেখলাম, সামনের গেটের ওপাশ থেকে ধাঁ করে সরে গেল।

আকাশ বলল, লোকটার চেহারা কেমন কিছু মনে আছে?

—কিছুটা মনে আছে। তন্ময় বলল, বেশ কালো গায়ের রং, দোহারা গড়ন, ধুতি আর শার্ট পরা, মাথায় সাদা টুপি।

॥ ৩ ॥

পকেট থেকে কাগজে মোড়া বীজ দুটি বার করে রবির হাতে দিয়ে আকাশ বলল, এগুলো কীসের বীজ আর গগনবাবুর মৃতদেহের নীচে কী করে এল, কিছু বলতে পারবেন?

রবির ঘর ওপরতলায় ছাদের পাশে।

সিঙ্গল বেডের খাটে সুন্দর নিভাঁজ বিছানা। জানলার পাশে টেবিল চেয়ার, দেওয়ালে আয়না লাগানো একটা ছোট ওয়ার্ডরোব। টেবিলের ওপরে স্তূপীকৃত মোটা-মোটা হিসেবের খাতাগুলো ছাড়া ঘরের আর সবকিছুই গোছানো, পরিপাটি।

বীজগুলো হাতে নিয়ে দেখে রবি বলল, এগুলো সেগুনের বীজ—কোনও নার্সারি থেকে এসেছে। কী করে এসেছে বলতে পারব না।

আকাশ বলল, পুনেতে সেগুন গাছের অভাব নেই। বীজগুলো যে নার্সারি থেকেই এসেছে তা কী করে বলছেন?

রবি বলল, সেগুনের গাছ থেকে যে-বীজ মাটিতে পড়ে, তাকে সাধারণ ভাষায় আমরা 'বীজ' বললেও আসলে সেগুলো সেগুনের ফল। ফলের ওপর একটা শক্ত শাঁসের মতো আবরণ থাকে। এই আবরণ বা খোলসটা সরিয়ে দিলে আঁটির মতো এই অংশটা বেরিয়ে পড়ে।

—খোলসটা কি নিজে থেকেই সরে যায়? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

রবি বলল, জঙ্গলে, ন্যাচারাল কন্ডিশনে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, ঘষা লেগে নিজে থেকেই সরে যায় ঠিকই, তবে তাতে অনেক সময় লাগে। যারা সেগুন নিয়ে কারবার করে, গাছ লাগায়,

নার্সারি করে, তাদের অত অপেক্ষা করলে চলে না। তারা নার্সারিতে কৃত্রিম উপায়ে এই খোলসটা সরিয়ে ফেলে। এই খোলস বা কভার সরিয়ে নেওয়াটাকেই আমরা বলি 'ট্রিটমেন্ট' করা। আর যেহেতু এই ফলগুলো 'ট্রিটমেন্ট' করা ফল তাই আমার ধারণা এগুলো এসেছে কোনও নার্সারি থেকে।

রবির টেবিলে অন্তত কুড়ি-বাইশটা ছোট-ছোট প্লাস্টিকের কৌটো—প্রত্যেকটার ওপর লেবেল লাগানো। একটা কৌটো তুলে আকাশ বলল, এতে কী রেখেছেন?

একটু ইতস্তত করে রবি বলল, ওর ভেতর তা-ই আছে যা আপনি দেখালেন।

ঢাকা খুলে হাতে নিয়ে আকাশ দেখল, গগনের মৃতদেহের নীচে পাওয়া বীজের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে কোনও তফাত নেই।

সব কৌটটাতেই কি সেগুনের বীজ?

রবি বলল, সেগুনেরই, তবে আলাদা ভ্যারাইটির বলতে পারেন। ভারতবর্ষের কয়েকটা রাজ্য সেগুনের জন্যে বিখ্যাত। আবার প্রত্যেকটা রাজ্যের একাধিক ভ্যারাইটিও আছে। আমরা এইরকম অনেকগুলো ভ্যারাইটির ক্লোনাল গার্ডেন তৈরি করেছি। এই বীজগুলো আমাদের বিভিন্ন ক্লোনাল গার্ডেন থেকে সংগ্রহ করা নমুনা।

—আপনাদের মার্কেট কি প্রধানত সেগুন বীজের? প্রসাদ প্রশ্ন করল।

রবি বলল, আজ থেকে সাত-আট বছর আগে আহমেদনগরে থাকতে গগনদা যখন চাকরি ছেড়ে বিজনেসে নামার কথা ভাবল তখন শুরু করেছিল বীজ দিয়েই। বিভিন্ন জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহ করে ট্রিটমেন্ট করে বিক্রি। তারপর এল সেগুনের স্টাম্প আর চারা। তবে আহমেদনগরের চেয়ে পুনের মার্কেট অনেক বড়, আর মুম্বই-এর সঙ্গে যাতায়াত, আদানপ্রদানও অনেক সোজা, তাই কয়েক বছরের মধ্যেই পাকাপাকিভাবে পুনেতে শিফট করল। এইখানে বীজের ট্রিটমেন্ট বাড়ল, শুরু হল বিভিন্ন ক্লোনের স্টাম্প, ক্লোনাল গার্ডেন, হাইব্রিড তৈরি। তা ছাড়াও, সেগুনের প্ল্যান্টেশন তৈরি করে দেওয়া। এখন তো আমাদের লাগানো সেগুন গাছও বেশ বড় হয়ে গেছে। গগনদার ইচ্ছে ছিল কয়েক বছরের মধ্যেই 'পোলক্রপের' বাজারে ঢুকে পড়ার।

—এই ব্যাবসায় কান্তিলাল আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই না? আকাশ প্রশ্ন করল।

—বলতে পারেন, না-ও বলতে পারেন।

—মানে?

—মানে, রবি বলল, সেগুনের ব্যাপারে আমরা যা করছি ও-ও তা-ই করে বা করতে চায়। তবে গগনদার মাথা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কোনওটাই ওর নেই। তাই ধারে-কাছে আসতে পারে না। তবে ওর অন্য আরও বিজনেস আছে। একটাতে না হলে আর-একটাতে পুষিয়ে নেয়। সেখানে আমরা নেই।

—আর গায়কোয়াড়?

—ও আমাদের ট্রাক ড্রাইভার।

—ওর টেলিগ্রামের কথা কি আপনি জানেন? ট্রাক ব্রেকডাউন হয়ে যাওয়ার কথা?

—জানি, গতকাল গগনদা বলেছিল।

—গায়কোয়াড় কি ট্রাকে কিছু নিয়ে আসছিল? প্রসাদ প্রশ্ন করল।

রবি বলল, হ্যাঁ। পূর্ব-দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে একটা জায়গা আছে—আলাপল্লী—একেবারে অন্ধ্র প্রদেশের গায়ে লাগানো। ওখানকার সেগুন জগৎ বিখ্যাত। ওখান থেকে বীজ নিয়ে আসছিল, মাঝপথে ব্রেকডাউন। রবিকে একটু বিচলিত মনে হল—ট্রাক খারাপ হতেই পারে। কিন্তু মালটা না এসে পৌঁছোনোয় আমাদের সুনামের ক্ষতি হয়ে গেল। করপোরেশনকে সাপ্লাই করার কথা ছিল—ট্রিটমেন্ট করে। খুব বড় কনট্র্যাক্ট।

—আপনারা এই কনট্র্যাক্ট কীভাবে পেয়েছিলেন, আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

ভ্রুকুটি করে রবি বলল, যেভাবে লোকে পায় সেভাবেই—টেন্ডার নোটিশে আবেদন করে।

—কান্তিলাল চেষ্টা করেনি?

—করেছিল বইকি, পারেনি।

আকাশ বলল, আপনাকে সোজাসুজি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার কি মনে হয় না, এটা একটা স্যাবোটাজ?

রবি বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে বলল, কী জানি!

—আর-একটা কথা, আকাশ বলল, একটু আগে আপনি বললেন, এগুলো বীজ নয়, ফল বা ফলের আঁটি। কৌতূহলবশে জিগ্যেস করছি, সেগুনের বীজটা তাহলে থাকে কোথায়?

—বীজ থাকে এর ভেতরে। বলে রবি একটা কৌটো খুলে হাতে একটা ফল নিয়ে টেবিল থেকে তুলে নিল একটা সুপুরি কাটার জাঁতি। জাঁতি দিয়ে ফলটা দু-ভাগে কেটে বলল, এর ভেতরে চারটে ছোট-ছোট চেম্বার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন? দুটো চেম্বারে দেখুন, সরষের চেয়ে একটু বড় সাদা দানার মতো রয়েছে—ওটাই বীজ। কখনও-কখনও চারটে চেম্বার খালিও থাকে। মানে বীজ থাকে না।

প্রসাদ উঁকি মেরে দেখে বলল, সেগুন গাছ লাগাবার সময় আপনারা এই সাদা বীজগুলো বের করে লাগান? সে তো খুব পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, মশাই!

—না-না, যারা গাছ লাগায় তারা নার্সারিতে ট্রিটমেন্ট করা এই আঁটিটাই লাগায়। বারবার জলে ভিজিয়ে, শুকিয়ে, মাটির নীচে গর্ত করে রেখে, এইরকম ট্রিটমেন্ট করার নানান প্রণালী আছে। তবে আমাদের নার্সারির কথা আলাদা। গগনদার কিছু নিজস্ব ইনোভেশন ছিল, ওটা ট্রেড সিক্রেট। আমরা ট্রিটমেন্ট করি মেশিনে। তাতে সময় লাগে অনেক কম আর রেজাল্ট হয় অনেক ভালো। সেইজন্যেই আমাদের ফার্মের বীজের দাম এত বেশি।

তন্ময় মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছিল, বিনীতভাবে বলল, যদি কিছু মনে না করেন, মিস্টার পালিত, এর মধ্যে ইনোভেশনের কোনও ব্যাপার নেই। ওই ধরনের ডিকর্টিকেশনের মেশিন বাজারে এসে গেছে অনেকদিন আগেই।

রবি কিছুক্ষণ দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তন্ময়ের দিকে। বলল, আমার নাম রবি বাসু, আমি পালিত নই। আর দ্বিতীয় কথা, আপনি এর কী বোঝেন? আপনি কি একজন সেগুন বিশেষজ্ঞ?

তন্ময় হাতজোড় করে বলল, ক্ষমা করবেন, আমি সেগুনের কিছুই বুঝি না। তবে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হিসেবে এই ধরনের মেশিন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি একটু। আর আপনি মিস্টার গগন পালিতের ভাই, তাই আপনাকে মিস্টার পালিত বলেছিলাম। আই অ্যাম সরি!

খুব তেতো হেসে রবি বলল, কে বলেছে, আমি গগন পালিতের ছোটভাই! আমার মেজদা তরুণ বাসু ছিল ওঁর বন্ধু। অ্যাকসিডেন্টের নামে ওকে মেরে ফেলে—।

—রবি।

উঁচু মেয়েলি গলার শব্দে চমকে আকাশ দেখল, দরজার পরদা সরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন গৌরবর্ণা একজন মহিলা, যাঁকে দেখে মেঘ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা মধ্যাহ্নের সূর্যের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। চোখে-মুখে স্পষ্টত কান্নার ছাপ, এলোমেলো চুল, কপালে আধমোছা সিঁদুর—কিন্তু বেদনার আড়ালে ঝকঝক করছে শাণিত প্রতিজ্ঞা। নিঃসন্দেহে শ্রীমতী বর্ষা পালিত।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই উনি বললেন, কোথায় কী বলতে হয় এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটাও কি তোমার লোপ পেয়েছে, রবি!

রবিও জেদি ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, না বউদি, আমাকে বলতে দাও! কুকুর-বেড়ালের মতো আমি তোমাদের আশ্রিত হতে পারি, কিন্তু—।

গলার স্বর আরেক পরদা ওপরে চড়িয়ে বর্ষা ধমক দিলেন।

—রবি। ওঁর দু-চোখের আগুন মনে হল রবিকে ভস্ম করে দেবে। রবি মুখ নীচু করে ওঁকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার আকাশের পালা। চোখের আগুন একটু নরম করে ওকে ভর্ৎসনা করলেন বর্ষা, ইন্সপেক্টর, আমাদের আজকের দিনটা কিন্তু সুখের দিন নয়। সওয়াল-জবাব বিকেলের দিকেও হতে পারে, আমরা কেউ পালিয়ে যাব না।

মুখে তিক্ত স্বাদ নিয়ে গগন পালিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আকাশ, প্রসাদ আর তন্ময়। হাত কচলে তন্ময় বলল, আমারই একটা বোকামির জন্যে এই অশান্তির সৃষ্টি হল, আর আপনাকে অপমানিত হতে হল।

—আরে ভাই, আমাদের চাকরিতে এসব রোজদিন হয়, আকাশ বলল, তুমি মন ছোট কোরো না।

বাড়ির সামনে সদর রাস্তার গেটের কাছে আকাশের জিপ দাঁড়িয়ে। সেদিকে হাঁটতে-হাঁটতে তন্ময় বলল, আসলে কী জানেন, ডিকর্টিকেশন জিনিসটা খুব একটা নতুন কিছু নয়। আর উনি দাবি করছিলেন ওটা ওঁর গগনদার ইনোভেশন।

আকাশ একটু হেসে বলল, বিজ্ঞান নিজেই নিজের সীমানা ভেঙে এগিয়ে যায়। প্রযুক্তির দুনিয়ায় কত কী যে হচ্ছে প্রতিদিন!

—তবে ওঁদের মেশিনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হল, তন্ময় বলল, শুধু শাঁস বা খোলসটাই সরায় না, তারপর আঁটির গায়ে হালকা আঘাত দিয়ে সামান্য ক্র্যাক করে দেয়। তাতে জল ঢুকে, আমার মনে হয়, জার্মিনেশন তাড়াতাড়ি হয়।

প্রশংসার দৃষ্টিতে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে আকাশ বলল, তুমি তোমার সাবজেক্টটা খুব মন দিয়ে পড়েছিলে, তাই না?

উত্তর না দিয়ে তন্ময় সলজ্জভাবে হাসল।

প্রসাদ বলল, মুখ্য ব্যাপার যা বোঝা গেল, রবি গগনবাবুর ভাই নয় মোটেই। বন্ধু মারা যাওয়ার পর বন্ধুর ভাইকে রেখেছেন ম্যানেজার করে। দ্বিতীয় কথা, রবির ধারণা, তরুণবাবুর অ্যাকসিডেন্টঘটিত মৃত্যুর মধ্যেও গগনবাবুর হাত ছিল। আর তৃতীয় কথা, সম্ভবত সেই কারণেই রবি ওর অন্নদাতাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না।

—কিন্তু, আকাশ হেসে বলল, অন্নদাত্রীকে ভয় করে বাঘের মতো।

॥ ৪ ॥

'কান্তিলাল পুনের ফরেস্ট ডিভিশনে বিট ইনচার্জ ছিল একসময় চুরির দায়ে আমার স্বামী ওকে ডিসমিস করেছিলেন। তখন থেকেই আমাদের সঙ্গে ওর শত্রুতা। এর অনেক পরে স-মিলের চোরাকারবারের কথা নিয়ে আমি একটা স্টোরি করেছিলাম, তাতে ওর মিলের নামধাম সবই ছিল। এরপর ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়ে ওর স-মিলের লাইসেন্স ক্যানসেল হয়ে গিয়েছিল দু-বছরের জন্যে।'

কান্তিলালের অফিস বাড়িতেই। খোঁজখবর নিতে যেতে-যেতে আকাশের খুব স্বাভাবিকভাবেই গতকাল বিকেলে দেওয়া শ্রীমতী পালিতের স্টেটমেন্টের কথা মনে পড়ছিল।

দোতলা বাড়ির দরজায় সশস্ত্র চৌকিদার। আকাশের ইউনিফর্ম দেখে সেলাম করলেও দরজা

ছেড়ে নড়ল না। পরিচয় ও আসার কারণ জানিয়ে খবর পাঠাবার কিছুক্ষণ পরে আকাশের ডাক পড়ল।

চার-পাঁচ ধাপ সিঁড়ি উঠে, গদির ওপর সাদা চাদর পাতা প্রশস্ত হলঘর। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে বসে আছে অন্তত কুড়ি-পঁচিশজন স্ত্রী-পুরুষ। দেওয়ালে জনপ্রিয় এক নেতার সঙ্গে কান্তিলালের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে-থাকার বিরাট ছবি। সঙ্গের চাকরটি এই হলঘর পার হয়ে অন্য একটি ঘরে নিয়ে এল আকাশদের। ডিভানের ওপর কোলে বালিশ নিয়ে বসে কান্তিলাল নীচু গলায় একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, আসুন-আসুন, দারোগাজি, গগনবাবুর খুন হওয়ার ব্যাপারে কিছু জানতে এসেছেন, তাই তো?

কান্তিলালের বয়েস পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন, গায়ের রং মিশমিশে কালো। পানের রসে রঞ্জিত ঠোঁট, পরনে সাদা ধুতি ও শার্ট, কপালে সাদা চন্দনের ফোঁটা। হাত নেড়ে বাকি সকলকে বিদায় করলেন।

একটা সোফায় বসতে-বসতে আকাশ বলল, খবর পেয়েছেন ইতিমধ্যেই?

ছাদ ফাটিয়ে হাসলেন কান্তিলাল, বললেন, এই তো পেপারে পড়লাম, মারাঠি, হিন্দি দুটোতেই আছে। তখনই মনে হল আপনি আসতে পারেন।

—কেন এইরকম মনে হল বলুন তো?

—গগন পালিত খুন হয়েছে আর পুলিশ আমার বাড়ি আসবে না, তা কি হয়, দারোগাজি? আমার সঙ্গে তো খুব 'পেয়ারের' সম্বন্ধ ছিল ওর। কী নেবেন, চা না ঠান্ডা কিছু?

আকাশ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতেই বললেন, না-না, সে কী! আজ প্রথমবার এসেছেন আপনি!

আকাশ বলল, দেখুন, আমি এসেছি কাজে। কয়েকটা কাজের কথা বলেই চলে যাব, আপনার সময় নষ্ট করব না।

—কিছু সময় নষ্ট হবে না। ভাজু!

হাঁক শুনে নিরেট মুখের চাকরটি এসে দাঁড়াতেই বললেন, ঠান্ডা লে আও। আর হ্যাঁ, বোতল এখানেই খুলবে।—লোকটি চলে যেতে বললেন, বোতল আপনার সামনে খোলাই ভালো। কী বলেন, আপনার মনে কোনও সন্দেহ থাকবে না, মানে জহর-উহর মিলিয়েছি কি না! হাঃ-হাঃ।—আবার অট্টহাস্য করলেন কান্তিলাল।

লোকটা দু-কান-কাটা নির্লজ্জ। মনে-মনে ভাবল আকাশ। সোজাসুজি কান্তিলালের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে একটু আগে আপনি বললেন, খুব 'পেয়ারের' সম্পর্ক ছিল, সেটা কী যদি একটু খোলসা করে বলেন—।

—আমার লাইফে হরদম প্রবলেম এনেছে ওই লোকটা, হরদম। আর হ্যাঁ, ওর আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু ভালো নয়।

—আমি যদি বলি প্রবলেমগুলো আপনারই তৈরি করা। ওঁরা শুধু সেটা প্রকাশ করেছেন ডিউটির খাতিরে, আকাশ বলল।

—আমি ডিউটি করা মানুষ অনেক দেখেছি, আমাকে আর ডিউটি দেখাবেন না দয়া করে। আপনি কি বলতে চান উনি ওঁর ডিভিশনের সমস্ত 'করাপশন' বন্ধ করতে পেরেছিলেন?

—দেখুন, আমি গগনবাবুদের উকিল নই।—আকাশ মুচকি হেসে বলল, তবে আপনার যুক্তিটা আমার একেবারেই টেঁকসই মনে হচ্ছে না। তিনটে চোর ধরতে পারিনি বলে, চতুর্থ চোরটাকে ধরতে পেরেও ছেড়ে দেব, এ কীরকম কথা? যাক, আপনি বলুন, গত দু-দিন কী করছিলেন, কোথায় ছিলেন?

পাশে রাখা ডায়েরি থেকে একটা ছাপানো কার্ড বার করে আকাশকে দিয়ে কান্তিলাল বললেন, আমাদের পার্টির কনফারেন্স ছিল। চিঞ্চবড়ে। কাল রাত্রে ফিরেছি।

চিঞ্চবড পুনে থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার। আকাশ কার্ড পড়ে দেখল চিঞ্চবডে দু-দিনের কনফারেন্সের তারিখ—গতকাল আর গত পরশুর। অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তাদের মধ্যে রয়েছে স্বয়ং কান্তিলালের নাম। কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে আকাশ জিগ্যেস করল, কনফারেন্সের রোজকার সময়সূচি কীরকম ছিল?

—এটা তো কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতেন। কান্তিলাল বললেন, সকাল দশটা থেকে দুটো, তারপর খাওয়ার ব্রেক। আবার সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে সাতটা। দু-দিনই তাই।

—পরশু রাত্রে, তার মানে, আপনি ওখানেই শিফট করেছিলেন?

—সেটাই তো স্বাভাবিক।

—ছিলেন কোথায়?

—রয়্যাল হোটেল, রুম নম্বর একশো তিন।

—আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আরও অনেকে ছিলেন?

—আমার রুমে আর কেউ ছিল না, অন্যান্য রুমে ছিল। আমার বাবুকে বলে দিচ্ছি, আপনাকে লোকজনদের লিস্ট দিয়ে দেবে।

—লোকজনরা তো আপনাকে সারারাত বা ভোরবেলায় দেখেনি। আকাশ বলল।

—সেটা অবশ্যই আমার একটা ভুল হয়েছে, দারোগাজি! খুব মোলায়েমভাবে বিদ্রূপ করে কান্তিলাল বললেন, আমি তো জানতাম না গগন পালিত খুন হবে আর আপনি আমাকে জেরা করতে আসবেন! নইলে একটা লোককে সারারাত বিছানার পাশে বসিয়ে রাখতাম।

খোঁচা গায়ে না মেখে আকাশ বলল, একটু আগে আপনি যে বললেন গগন পালিত আর মিসেস পালিত ভালো লোক নন। তা গগনবাবুর ভাই রবি এবং বন্ধু অসিত মুখার্জি সম্বন্ধে আপনার ধারণা কীরকম?

—রবি ওর ভাই নয়, বন্ধুর ভাই। বন্ধুর মারা যাওয়ার মধ্যেও গগনের হাত ছিল। —কান্তিলাল বললেন। রবি নিজের কাজটা ভালো বোঝে। আর অসিত লোকটাকে আমি ঠিক চিনি না। লোকে বলে, ও হচ্ছে ওই আওরাতটার পুরোনো আশিক। বলে কান্তিলাল গলার মধ্যে ঘড়-ঘড় শব্দ করে হাসলেন, এখনও শাদি করেনি, বুঝলেন তো?

পকেট থেকে বীজগুলো বার করে কান্তিলালের হাতে দিয়ে আকাশ বলল, এগুলো কী বলতে পারেন?

কোনও উৎসাহ না দেখিয়ে বীজ ফেরত দিলেন কান্তিলাল। বললেন, সাধারণ সাগবানের বীজ, দেখার মতো কিছু নেই।

আকাশ বলল, এগুলো পাওয়া গিয়েছিল গগনবাবুর বডির নীচে।

আবার ছাদ ফাটানো হাসি হেসে কান্তিলাল বললেন, খুনের জায়গায় নিজের কোনও পরিচয় চিহ্ন ফেলে যেত আগেকার ক্রিমিনালরা—গল্পে পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। আপনি কি দারোগাজি আমাকে ওই দলে ফেললেন না কি!

—আরে না-না, কী বলছেন! তা কি আমি পারি? বলে আকাশ উঠে দাঁড়াল, যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই। আপনার গেটে যে-দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, তাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন, পুলিশের লোককে বাধা দেওয়া বেআইনি তো বটেই, তাতে সন্দেহও বাড়ে। মারা যাওয়ার আগে গগনবাবু যে কারণেই হোক, একটা কাগজে আপনার নাম লিখে গেছেন। আপনার বাড়ির সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে যখন খুশি যেমন করে খুশি আপনার বাড়ি তোলপাড় করে সার্চ করাটা আমার জন্যে খুব একটা বড় কথা নয়, এটা আপনি নিশ্চিত জানেন।

প্রসাদ ভেবেছিল, আকাশের সেই হাড়-জ্বালানো কথায় কান্তিলাল নিশ্চয়ই আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন। এরকম কিন্তু কিছুই হল না। গুম হয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে উনি হাঁক দিলেন,

গোরেলাল, গোরেলাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গেটের সেই সশস্ত্র চৌকিদারটি এসে দাঁড়াতেই ওর দিকে আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে সশব্দে একটি চড় মারলেন ওর গালে। বললেন, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো গে যাও।

ফেরার সময় জিপে বসে প্রসাদ বলল, লোকটা এক নম্বরের শয়তান।

—সেইসঙ্গে স্মার্টও, ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্ট্রিট স্মার্ট।'

—আপনার কি মনে হয় স্যার, ও সব সত্যি বলছিল?

—অন্তত কাগজে-কলমে ও মিথ্যে বলছে এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে এটুকু বলতে পারি। তবে, প্রসাদ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই আকাশ বলল, ও সারারাত বা ভোরের দিকে নিজের ঘরে ছিল কি না এ-কথাটা হোটেলের রুমবয় বা ওয়েটারদের বশ করে জেনে নিতে হবে। গাড়িতে বা মোটর সাইকেলে চিঞ্চবড থেকে পুনে পৌঁছতে পঁচিশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।

॥ ৫ ॥

থলি হাতে গেট থেকে বেরিয়ে বাজারে যাচ্ছিল দুলাল। ক্যাঁচ করে গাড়ির ব্রেক কষার শব্দে পিছন ফিরে দেখল পুলিশের জিপ থেকে নামছে আকাশ আর প্রসাদ। পরশু সাহেব মারা যাওয়ার দিন সকালেই একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে এরা। এখন আবার কী চাই কে জানে! কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে ও একপাশে সরে দাঁড়াল।

—তোমাদের বাড়িই আসছিলাম, আকাশ বলল, কোথায় যাচ্ছ, দুলাল?

দুলাল বলল, আজ্ঞে বাজার। চা-পাতা, চিনি, এইসব দু-একটা জিনিস কেনার ছিল।

—তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি। আকাশ বলল, সেদিন রাত্রে রবিবাবু দেরি করে বাড়ি ফেরার পর দরজা কি তুমিই খুলে দিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুলাল চটপট উত্তর দিল।

—রবিবাবু কি প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরেন নাকি?

—না সাহেব, এই কখনও-সখনও। ঢোক গিলে দুলাল বলল।

—আচ্ছা, রবিবাবু রাত্রে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন ক'টা বাজে বলতে পারবে?

এই প্রশ্নটা সম্ভবত দুলাল আশা করেনি। ওর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। খুব ঘাবড়ে গিয়ে ও বলল, সাহেব, মানে আমি তো ঘড়ি দেখিনি, তবে—।

খুব কর্কশভাবে আকাশ বলল, দুলাল, পুলিশের কাছে মিথ্যে কথা বললে কিন্তু বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

দুলালের মুখের ভাব বদলে গেল একেবারে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বসে পড়ে, আকাশের পা ধরে বলল, সাহেব আমি গরিব মানুষ, আমি মরে যাব, আপনি আমাকে বাঁচান,—বলতে-বলতে সত্যিই কেঁদে ফেলল।

আকাশ শক্ত হাতে দুলালকে ধরে দাঁড় করিয়ে বলল, সত্যি কথা বললে তোমার কিছু হবে না।

দুলাল তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এদিকটা যদিও বেশ ফাঁকা তবু দু-একজন কৌতূহলী লোক উঁকিঝুঁকি মারছে দেখে আকাশ বলল, গাড়িতে এসে বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দুলাল বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ির পিছনে এসে বসল। গাড়ি বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর আকাশ জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছিল বলো, তুমি দরজা খোলোনি?

বেশ খানিক্ষণ চুপ করে থেকে, দুলাল বলল, আজ্ঞে না। রবিবাবু কখনও দেরি করে ফিরলেও এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসেন। সেদিন রাত্রে যখন বারোটা বাজার পরও ফিরলেন না, তখন আমি খিড়কির দরজা দিয়ে একটু বেরিয়েছিলাম। বলতে-বলতে দুলাল আবার কাঁদতে লাগল।

—বলো দুলাল, স্পষ্ট করে সত্যি কথা বলো, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

—আমাদের বাড়ির চারটে বাড়ির পরে একটা বাড়ির গ্যারেজে, মানে কেষ্টদাদের গ্যারেজে বসে আমরা কয়েকজন একটু গল্পগুজব করি, সেখানেই গিয়েছিলাম। দুলাল বলল।

—শুধু আড্ডা, না মদ-টদও?

জিভ কেটে দুলাল বলল, না-না, সাহেব, মদ নয়। তবে কখনও-সখনও ওই একটু তাস খেলি। ভেবেছিলাম, দু-হাত খেলেই চলে আসব, কিন্তু ফিরতে এক ঘণ্টা লেগে গেল।

—খিড়কির দরজা খোলা রেখে গিয়েছিলে? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

দুলাল হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। মাঝদরিয়ায় কোথাও কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছে না ও। বলল, সাহেব, বিশ্বাস করুন, আমার কোনও বদ মতলব ছিল না, শুধু তাসের নেশায়—। খিড়কির দরজায় বাইরে থেকে হুড়কো লাগিয়ে গিয়েছিলাম। এসে দেখলাম, হুড়কো খোলা। হয়তো রবিবাবু খিড়কির দরজা দিয়েই ফিরে এসেছিলেন! কিন্তু আর কেউ ঢুকে বসেছিল কি না—, সাহেব, আমারই দোষে সর্বনাশ হয়ে গেল। আপনি আমাকে ফাঁসি দিন।

—থামো! ধমক লাগাল আকাশ। খিড়কির দরজা দিয়ে যাওয়া যায় শুধু উঠোনে। কিন্তু উঠোন থেকে ডাইনিং স্পেসে ঢুকতে হলে আর-একটা দরজা পার হতে হবে, তাই না? সেটা কি তখন খোলা ছিল?

—না, সেটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল আমি ঠেলে দেখেছিলাম। তখন আমার অবাক লাগল। ভাবলাম রবিবাবু ফিরেছে কি ফেরেনি! বাইরে গিয়ে গ্যারেজে উঁকি মেরে দেখি রবিবাবুর মোটর সাইকেলটা নেই।

—আচ্ছা, তার মানে রবিবাবু তখনও ফেরেননি। অথচ খিড়কির দরজা খোলা, তার মানে কেউ ঢুকেছিল! প্রসাদ বলল।

—হ্যাঁ সাহেব। উঠোনের সঙ্গে লাগানো আমার ঘরটা। আমি আর কিছু না ভেবে খিড়কির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ না করেই শুয়ে পড়লাম। আর কিছু জানি না, সকালে বিমলার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল।

—আচ্ছা, আর দুটো কথার জবাব দাও। আকাশ জিজ্ঞাসা করল, বিমলা সাধারণত কখন আসে?

—এই ধরুন সকাল ছ'টা-সওয়া ছ'টা নাগাদ।

—এসেই প্রথমে কী করে বলতে পারবে?

—পারব সাহেব, দুলাল বলল, প্রথমেই ঘরে ঝাড়ু লাগায়, তারপর বাসন পরিষ্কার করে, তারপর—।

বাধা দিয়ে আকাশ বলল, ও কি রোজ খিড়কির দরজা দিয়ে আসে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পরশু সকালেও কি তাই এসেছিল?

দুলাল আবার চুপচাপ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। বলল, পরশু সকালেও ও রোজকার মতোই খিড়কির দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। আমাকে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেছিল। কিন্তু আমার ঘুম ভাঙেনি বলে ও ঘুরে সদর দরজা দিয়ে এসেছিল। ওকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন বাঈসাহেব।

—আচ্ছা। কিন্তু তুমি তো খিড়কির দরজা খুলেই শুয়ে পড়েছিলে।

দুলাল হাতজোড় করে বলল, সেটাই বুঝতে পারছি না সাহেব। পরে কে এল, এসে কেন

দরজা বন্ধ করে দিল, সে গেল কোথায় কিছুই বুঝতে পারছি না।

দুলালকে বাজারে নামিয়ে দিয়ে আকাশ ফিরে এল গগনবাবুদের বাড়িতে।

সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলে। সামনেই গ্রিল দিয়ে ঘেরা একটা গোল বারান্দা। গ্রিল ঘেঁষে মাধবীলতার গাছ উঠেছে। বারান্দার গায়ে ড্রয়িংরুম।

আকাশরা বেল বাজানোর আগেই, 'আমি তাহলে এখন আসি, বর্ষা' বলে বের হতে গিয়ে অসিত। আকাশ আর প্রসাদকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। ম্লান হেসে বললেন, গুড মর্নিং, ইন্সপেক্টর, আসুন।

ঘরে ঢুকে আকাশ দেখল, বর্ষা একটা সোফায় বসে আছেন। অনেকটা সামলে নিলেও, মুখে-চোখে এখনও শোকের গাঢ় ছায়া।

নমস্কার করে আকাশ বলল, আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

বর্ষা বললেন, বলুন। ওঁর কণ্ঠস্বর খুব ক্লান্ত মনে হল। অসিত যদিও যাওয়ার জন্যই বেরিয়েছিলেন, কী ভেবে কে জানে, বসে পড়লেন একটা সোফায়।

আকাশ বলল, সোমবার সকালে আপনি মন্দিরে কখন গিয়েছিলেন?

বর্ষা বললেন, ঘড়ি দেখিনি, সাড়ে ছ'টা-পৌনে সাতটা হবে।

—গগনবাবু তখন কোথায় ছিলেন? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—উনি তখন ওঁর স্টাডিরুমের সঙ্গে লাগানো বাথরুমে। আমি জলের শব্দ পেয়েছিলাম।

—আর বিমলা, দুলাল, রবিবাবু—এঁরা?

—বিমলার তখন ঝাড়ু লাগানো শেষ গেছে প্রায়। দুলাল বোধহয় তখনও জাগেনি। রবিও নিজের ঘরে ছিল নিশ্চয়ই, দেখা হয়নি।

—আপনি বাড়ি থেকে বেরুবার সময় গগনবাবুকে—।

—না, বিমলাকে বলে বেরিয়েছিলাম। বর্ষা বললেন।

—আপনি কোন মন্দিরে গিয়েছিলেন? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—ক্যাম্প এরিয়ার শিব মন্দিরে।

আকাশ জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি আপনাদের মেন গেট দিয়ে বেরিয়েছিলেন নাকি পিছনের, মানে নার্সারির, দিকের গেট দিয়ে?

—মেন গেট দিয়ে।

—হেঁটে গিয়েছিলেন?

বর্ষা বললেন, একটু হেঁটে গিয়ে অটো রিকশা নিয়েছিলাম।

আকাশ জিজ্ঞাসা করল, গাড়িতে যাননি কেন?

বর্ষা একটু বিরক্তভাবে বললেন, আপনার এইসব প্রশ্নের সঙ্গে আমার স্বামীর খুনের কী সম্পর্ক আছে জানি না, অত সকালে ড্রাইভার আসেনি। আর নিজেরও গাড়ি চালাতে ইচ্ছে করছিল না, তাই গাড়ি নিয়ে যাইনি।

আকাশ একটু সময় নিয়ে বলল, রবিবার রাত্রে আপনি দুবার উঠেছিলেন দরজা খোলার বা বন্ধ করার জন্যে, তাই না?

বর্ষা ভীষণ চটে বললেন, এইসব উদ্ভট প্রশ্নের জবাব আমি ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারি। দিচ্ছি, বিকজ আই হ্যাভ নাথিং টু হাইড। রবিবার রাত্রে রবি একটু দেরি করে বাড়ি ফিরেছিল। ওকে দরজা খুলে দিয়েছিলাম।

বাধা দিয়ে আকাশ বলল, তখন ক'টা বেজেছিল, ঘড়ি দেখেছিলেন?

—সাড়ে বারোটা, ডট্। বর্ষা বললেন।

—আর পরের বার, সে কি শেষ রাতের দিকে—।

—নো, খুব জোর দিয়ে বর্ষা বললেন, আমি আর উঠিনি।

—শিয়োর?

—নিশ্চয়ই। একটা কথা বলি ইন্সপেক্টর, বর্ষা বললেন, আপনি বোধহয় কাজ ছেড়ে অন্যদের পারিবারিক ব্যাপারে একটু বেশিই মাথা ঘামাচ্ছেন।

আকাশ উঠে দাঁড়াল। ওর চোখের দৃষ্টি অসম্ভব ধারালো এখন। বলল, আপনার স্বামীর খুন হওয়ার ব্যাপারটাকে যদি আপনি পারিবারিক একটা ঘটনা মনে করে থাকেন, তাহলে পুলিশে খবর না দিলেই ভালো করতেন। আমি এতক্ষণ নিজের কাজই করছিলাম। কাজের ফলাফলও আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই। আজ এইমাত্র আপনি আমার কাছে দুটো মিথ্যে কথা বলেছেন। এসো, প্রসাদ।

॥ ৬ ॥

আকাশ ওর নোট খাতায় জরুরি কয়েকটা কথা গুছিয়ে লিখে রাখছিল।

প্রথমত, আশানুরূপ পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কথা। রিপোর্টে লিখেছে, 'অ্যাসফিক্সিয়া, ডেথ ডিউ টু স্ট্র্যাংগুলেশন।' থাইরয়েড আর ক্রিকয়েড কার্টিলেজ ভাঙা। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে জলে ডোবা, গলায় ফাঁস ইত্যাদি সম্ভাবনাগুলো বাদ দিয়ে অনায়াসে গলা টিপে মারার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ডাক্তার।

লেখা থামিয়ে আকাশ বলল, প্রসাদ, একটু এদিকে এসো তো, তোমার গলা টিপে দেখি।

প্রসাদ দূরের একটা চেয়ারে বসে ওর প্রিয় কড়া চা খাচ্ছিল তারিয়ে-তারিয়ে। আঁতকে উঠে বলল, স্যার, কী বলছেন!

—ভয় নেই, এসো, বোসো এইখানে। ভালো করে ভেবে আমাকে বলো, তোমার গলার ঠিক এইখানে জোর পড়বে কখন, সামনে থেকে গলা টিপলে, না পিছন থেকে?—বলে আকাশ হালকা করে গলা টিপে দেখাল।

—স্যার, বুঝেছি। প্রসাদ বলল, পিছন থেকে গলা টিপলেই হাতের আঙুল দিয়ে জোর দেওয়া যাবে বেশি।

—ঠিক তাই। আকাশ সম্মতি জানায়।

—স্যার, গগনবাবু যেখানে ও যেভাবে পড়েছিলেন তাতে মনে হয়, ড্রয়িংরুম থেকে কেউ চুপিসাড়ে স্টাডিরুমে ঢুকে পিছন থেকে আচমকা ওঁর গলা টিপে—।

—ওয়েট, প্রসাদ, ওয়েট। আকাশ প্রসাদকে থামিয়ে বলল, গলা টিপে মারা এক সেকেন্ডের কাজ নয়, মানুষ ছটফট করে। সেই সময় বডির অ্যাঙ্গেল বদলে যেতে পারে। তা ছাড়া, আঘাতটা অতর্কিতে হয়েছে, এটাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? খুনির সঙ্গে গগনবাবুর কথাবার্তা হয়নি তার প্রমাণ কী? বলে, চায়ে চুমুক দিয়ে ও দেখল ঠান্ডা হয়ে গেছে।

—স্যার, ওটা ছেড়ে দিন, আমি গরম চা আনছি। বলে প্রসাদ চায়ের অর্ডার দিল।

বিড়বিড় করে আকাশ বলল, আচ্ছা, প্রসাদ, তোমার কি মনে হয় খুন করার জন্যে গলা টেপাটা খুব ভালো উপায়?

—আমি কী করে বলব বলুন।—প্রসাদ গোবেচারা মুখ করে বলল, আমি তো বাকি উপায়গুলো প্রয়োগ করে দেখিনি। আমার তো মনে হয়, রিভলভার, ছোরাছুরি, বিষ এসবের সুবিধে না থাকলে তবেই—।

আকাশের দুই চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, তার থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না যে, আগে থেকে প্ল্যান করা না থাকলে তবেই লোকে গলা টিপে মারে। বলেই আবার লেখায় মন দিল আকাশ।

সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই রাইটিং টেবিলে, একটা জ্বালানো কাঠি সমেত অ্যাশট্রে একটু দূরের সেন্টার টেবিলে, এবং ভাঙা সিগারেটটা নীচে সোফার পাশে পড়ে আছে। এই তিনটের মধ্যে যোগাযোগটা ঠিক কীরকম? উনি যেখানে-সেখানে সিগারেট ফেলতেন না এবং সবসময় পুরো সিগারেট খেতেন এটা আমরা জানতে পেরেছি। তার মানে, উনি সিগারেট অর্ধসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন কিংবা বলা যায় মারা যাওয়ার সময় সিগারেট খাচ্ছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল কীভাবে?

এক নম্বর সম্ভাবনা, উনি সেন্টার টেবিলের পাশে সোফায় বসে সিগারেট বের করে জ্বালালেন, খেতে শুরু করলেন, আততায়ী ঘরে ঢুকল, কথা বলল কিংবা বলল না, গলা টিপে মারল। এটা জুতসই মনে হচ্ছে না, কারণ, সে-ক্ষেত্রে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই থাকত সেন্টার টেবিলের ওপরে। গগনবাবু খোঁড়া পা নিয়ে আবার প্যাকেট আর দেশলাই রাইটিং টেবিলে রেখে আসবেন কেন?

অন্য একটা সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। উনি সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে ছিলেন রাইটিং টেবিলের কাছেই। সম্ভবত তারপর খেয়াল হয়েছিল অ্যাশট্রেটা আছে সেন্টার টেবিলে। তাই সেন্টার টেবিলের কাছে এসে আশট্রেতে কাঠিটা ফেলেছিলেন। এরপর যদি ওঁর আবার রাইটিং টেবিলে গিয়ে বসার থাকত তাহলে অ্যাশট্রেটা উঠিয়ে নিয়ে যেতেন রাইটিং টেবলে। তা যখন যাননি এবং ওয়াকিং স্টিকটাও যখন সেন্টার টেবিলের পাশে সোফায় হেলান দিয়ে রাখা তখন ধরে নেওয়া যায় চরম আঘাতটা এসেছিল সোফার কাছেই। এই থিয়োরিটা মন্দ নয় কিন্তু...লেখা থামিয়ে আকাশ বলল, প্রসাদ, তোমার কী মনে হয়, সিগারেট ভাঙা কেন?

—গগনবাবুর বা আততায়ীর পায়ের নীচে চেপে ভেঙে গেছে, এমন হতে পারে না কি? প্রসাদ বলল।

—না, হতে পারে না। পায়ের নীচে পড়লে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যেত, তা কিন্তু হয়নি।—আকাশ বলল, ভালো করে লক্ষ করলে দেখবে হঠাৎ চাপ দিয়ে, দুমড়ে ভাঙা সিগারেটের গোল ভাবটা কিন্তু আছে।

—এরপর আসছে বীজের কথা।—আকাশ লিখছিল, বিমলা যখন ঘরে ঝাড়ু লাগিয়েছিল গগনবাবু তখনও এসে বসেননি। বীজগুলো এসেছে ঝাড়ু লাগানোর পরে। কিন্তু মৃতদেহের নীচে পাওয়া। তার মানে বুঝতে হবে মৃত্যুর আগে বা মৃত্যুর সময় এসেছে, কিন্তু মৃত্যুর পরে নয়। তার চেয়েও বড় কথা, এল কী করে! বীজগুলো কি ওখানে কেউ রেখেছে, বিশেষ উদ্দেশ্যে? নাকি বীজগুলো এসেছে ঘটনাচক্রে, হঠাৎই?

যেন মনের কথা শুনতে পেয়েছে এইভাবে হঠাৎ প্রসাদ বলল, স্যার, আপনি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন নিশ্চয়ই। ছোট-ছোট কৌটোতে যেমন রবিবাবুর টেবিলে বীজ রাখা ছিল, অতগুলো না হলেও ঠিক ওইরকমই কয়েকটা কৌটো ছিল গগনবাবুর টেবিলেও।

—লক্ষ করেছি, প্রসাদ আমি ভাবছি, বীজগুলো মৃতদেহের নীচে পৌঁছল কী করে?

—এমনও তো হতে পারে, প্রসাদ বলল, বীজগুলো উনি হাতে নিয়ে দেখছিলেন। মৃত্যুর সময় হাত থেকে নীচে পড়ে গেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে আকাশ বলল, একেবারে অসম্ভব তা বলছি না, তবে খুব স্বাভাবিক নয়। কারণ, সেরকম হলে, বীজগুলো ওঁর হাত থেকে ছিটকে পড়ত ঘরের অন্য কোথাও। ঠিক মৃতদেহের নীচেই পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। মনে রেখো, ওঁকে গলা টিপে মারা হয়েছে, অর্থাৎ

মারা যাওয়ার সময় উনি স্ট্রাগল করেছিলেন।

—দুলাল যদি সত্যি কথা বলে থাকে তাহলে রবিবার রাত্রে খিড়কির দরজা কম করেও দুবার খোলা হয়েছিল। একবার, দুলাল তাস খেলে ফেরবার আগে। দ্বিতীয়বার, ও ঘুমিয়ে পড়ার পর। অবশ্য এমন হতেই পারে, দ্বিতীয় বারেরটা শুধুই বন্ধ করা, দরজা খোলা রয়েছে দেখে। কিন্তু সেটাও করা হয়েছিল নিঃসন্দেহে বিমলা আসার আগেই। শ্রীমতী পালিতের বয়ান অনুযায়ী উনি শুধু রবিকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সময় যা বলেছেন তাতে মনে হয় সেটা প্রথমবার। দ্বিতীয়বারের কথা উনি পরিষ্কার অস্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়বার দরজা তাহলে কে খুলেছিল এবং কার জন্যে? তা ছাড়া, রবি যদি প্রথমবার এসে থাকে, ওর মোটরসাইকেল ছিল না কেন? তাহলে কি রবি প্রথমবার আসেনি? তাহলে কে এসেছিল?

বিমলা যখন ঘরে ঝাড়ু লাগিয়েছে—অর্থাৎ, প্রায় সাড়ে ছ'টা নাগাদ, তখনও গগনবাবু ঘরে এসে বসেননি। আর তন্ময় ঘরে ঢুকে যখন ওঁর মৃতদেহ দেখেছে তখন সাড়ে সাতটা। খুনের সময় নিয়ে তাই কোনও দ্বিধা নেই। তা যখন নেই, তখন রাত্রে কে এসেছিল এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কী আছে! অবশ্য এ-ও হতে পারে, রাত্রে কেউ এসে বাড়ির ভেতর লুকিয়েছিল, সকালে খুন করে বেরিয়ে গেছে। কোনও সম্ভাবনাই বাদ দেওয়া চলে না।

—আপনার লেখা হয়ে গেছে, স্যার?

মুখ তুলে আকাশ দেখল প্রসাদ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে। পেনের ঢাকা বন্ধ করে ও বলল, হয়েছে, কেন বলো তো?

—মিসেস পালিতের এক নম্বর মিথ্যে কথাটা বুঝতে পেরেছি, দুবার দরজা খোলার কথা চেপে যাওয়া। অনেকক্ষণ ধরে আকাশ-পাতাল ভেবেও কিন্তু ওঁর দু-নম্বর মিথ্যে কথা কী সেটা বুঝতে পারলাম না।

হো-হো করে খানিকটা হেসে আকাশ বলল, সেদিন যে খুনের খবর পেয়েই আমরা সকলে তদন্ত করতে গগনবাবুদের বাড়ি গেলাম মনে আছে?

—হ্যাঁ স্যার, মনে আছে বইকি!

—বেশ। জিপ ওঁদের বাড়ির গেটের কাছে থামার পর কী-কী হল মনে করে বলো তো।

একটু চিন্তা করে প্রসাদ বলল, জিপ থামতেই ড্রাইভার হর্ন দিল, আমরা নামলাম। মেন গেটটা খোলা হল, আমরা ভেতরে ঢুকে বেল বাজালাম। দুলাল বেরিয়ে এসে সোজা আমাদের স্টাডিরুমে নিয়ে গেল। সেখানে, অসিতবাবু, ডাক্তার, তন্ময়—।

বাধা দিয়ে আকাশ বসল, ব্যস-ব্যস, হয়ে গেছে। এর মধ্যেই মিসেস পালিতের দু-নম্বর মিথ্যে কথাটা লুকিয়ে আছে।

—বলেন কী! মিসেস পালিত তো ওই সময় ধারে-কাছেই ছিলেন না—চোখ কপালে তুলে প্রসাদ বলল।

—মেন গেটের দুটো পাল্লা শেকল পরিয়ে তালা দেওয়া ছিল মনে আছে? আকাশ বলল, আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেটের কাছে আসতেই একজন দারোয়ান চাবি দিয়ে তালা খুলে, গেট খুলে দিল, মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ স্যার, মনে পড়ছে।

—আমরা যখন ওঁদের বাড়ি পৌঁছলাম তখন প্রায় আটটা কুড়ি হয়ে গেছে। তখন যদি মেন গেট খোলা হয়, তাহলে সাড়ে ছ'টা, পৌনে সাতটার সময় মিসেস পালিত ওই মেন গেট দিয়ে মন্দিরে গেলেন কী করে।

—যা বলেছেন। এইবার একগাল হেসে প্রসাদ বলল, শাড়ি পরে অন্তত পাঁচ ফুট উঁচু গেট টপকে উনি নিশ্চয়ই মন্দিরে যাননি!

—ঠিক তাই। যাওয়া ও আসার জন্যে দুবারই উনি পিছনদিকের, অর্থাৎ নার্সারির দিকের, গেটটা ব্যবহার করেছিলেন। সেইজন্যেই উনি জানতেন না সেদিন মেন গেটের তালা কখন খোলা হয়েছিল! চেয়ার থেকে উঠতে-উঠতে আকাশ বলল, আমার অবাক লাগছে এই ভেবে যে, এই কথাটা উনি আমার কাছে লুকোলেন কেন!

অফিসের আলমারি থেকে গগনবাবুর শেষবার ব্যবহৃত জামাকাপড়ের প্যাকেটটা নিয়ে এসে আবার বসল আকাশ। পাটভাঙা ধবধবে সাদা খাদির পাজামা। কলার দেওয়া ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির পকেটে কিছু নেই। সাদা সুতির স্কার্ফটা কিন্তু ভীষণ ভাবে কোঁচকানো। এমনকী, চোখের সামনে এনে লক্ষ করে দেখল আকাশ, সাদা স্কার্ফে একটা হলদেটে, গোল, পোড়া দাগ।

—প্রসাদ, আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবিগুলো আনো তো। আকাশ বলল।

বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা, মৃতদেহ, আসবাবপত্র, পারিপার্শ্বিক, উপস্থিত সকলের প্রায় গোটা কুড়ি ছবি টেবিলে সাজিয়ে রেখে, স্কার্ফটা হাতে নিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল আকাশ। তারপর বলল, প্রসাদ, একটা সিগারেট আনাও তো। অবাক হয়ে প্রসাদ বলল, আপনি সিগারেট খাবেন?

—খাব না, মুচকি হেসে আকাশ বলল, তুমি আনাও তো। হ্যাঁ, যে-কোনও ব্র্যান্ডের হলেই চলবে।

ছবিতে গগনবাবু যেভাবে স্কার্ফ নিয়ে ছিলেন, সেইভাবে স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে হাতে সিগারেট নিয়ে বারবার স্কার্ফের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখল আকাশ, মুখে-চোখে অসন্তোষের ছাপ। সিগারেট জ্বালিয়ে আকাশ অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরল তার ওপর। ছোট একটা ফুটো তার চারপাশে কালো পোড়া দাগ রেখে সিগারেটটা দুমড়ে ভেঙে নিভে গেল একটু পরেই।

সাদা স্কার্ফ আর রুমাল পাশাপাশি রেখে এইবার কথা বলল আকাশ। স্কার্ফের গোল দাগটা সিগারেটেরই, কিন্তু এটাই সিগারেট পিষে যাওয়ার কারণ হতে পারে না। তাহলে, দাগটা হচ্ছে আরও গভীর, তাই না প্রসাদ?

প্রসাদ উত্তর দেওয়ার আগেই টেলিফোন বাজল। প্রসাদ ফোন ধরে আকাশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, স্যার, চিঞ্চবড় থেকে সাব-ইন্সপেক্টর ভোঁসলের ফোন।

ফোন ধরে খানিকক্ষণ শুনেই চমকে উঠে আকাশ বলল, তুমি নিজে ভালো করে যাচাই করে নিয়েছ? কোনও সন্দেহ নেই? বলো কী! গুড, চলে এসো।

প্রসাদ জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে আছে দেখে আকাশ বলল, রবিবার রাত্রে বা সোমবার খুব সকালে কান্তিলাল ওর রুম থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়েছিল কি না সেটা এখনও জানা যায়নি, তবে রবিবার রাত্রে দুবার ওর রুমে দেখা করতে এসেছিল গেস্ট। এই দুজনের মধ্যে প্রথম জনকে আমরা চিনতে পেরেছি।

উত্তেজিত ভাবে প্রসাদ বলল, স্যার, এক মিনিট, লেট মি গেস। দেখা করতে এসেছিল রবিবাবু, তাই না?

আকাশ হাসল। বলল না, অসিতবাবু।

॥ ৭ ॥

অসিত মুখার্জি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন, ইন্সপেক্টর, আসুন।

অসিতের চোখেমুখে একটা ম্লান অন্যমনস্কতা এখনও লক্ষ করা যায়। বাল্যবন্ধুর অস্বাভাবিক

অকালমৃত্যু এখনও ওঁকে পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে দেয়নি।

আকাশ কোনও ভূমিকা না করেই বলল, অসিতবাবু, আমি আপনাকে গগনবাবুর খুনের ব্যাপারে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। আপনি যদি মনে করেন আপনার অফিস উপযুক্ত জায়গা নয়, আমি আপনার বাড়িতেও আসতে পারি, কিংবা আপনাকে থানাতেও ডাকতে পারি।

অসিতের শরীরের ভাষায় সহজাত স্মার্টনেস ফুটে উঠল। বললেন, এখানেও আমার কোনও অসুবিধে নেই। আপনি জিগ্যেস করুন। অবশ্য, আমার যা জানা ছিল, আমার স্টেটমেন্টে সবই বলেছি সেদিন।

—সবটা বোধহয় বলেননি, অসিতবাবু।—আকাশ খুব গম্ভীরভাবে বলল, যেমন ধরুন রবিবার রাত্রে আপনি যে চিঞ্চবড়ের একটা হোটেলে কান্তিলালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেটা কিন্তু আগে বলেননি।

—ইন্সপেক্টর, আমি মনে করিনি, এই ব্যাপারে ওই ঘটনাটা ইমপর্ট্যান্ট। অসিত খুব শান্তভাবে বললেন।

—বলেন কী! কান্তিলালের পরিচয় দিলেন, গগনবাবু নিজের হাতে টেলিগ্রামের ওপর ওর নাম লিখে গেছেন এটাও জানলেন, তবু এই কথাটা আমাকে বলার কথা আপনার মনে হল না! এটা খুব আশ্চর্য নয় কি!

অবিচলিতভাবে অসিত বললেন, ঠিক তাই। নইলে না বলার কোনও কারণই নেই। যাই হোক, শুরু থেকেই বলি, আপনি নিশ্চই জানেন, রবি আমাদের এক বাল্যবন্ধু তরুণের ভাই। গগন বিজনেস শুরু করার পর ওকে রেখেছিল নিজের কাছে, ম্যানেজার হিসেবে। রবি একটু শর্ট টেম্পারড ঠিকই তবে খুব কাজের ছেলে। গগন যাকে নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসত। তবে ইদানীং নার্সারির প্রফিট নিয়ে ওর মনে নানারকম সন্দেহ জেগেছিল এবং রবিকে ও এর জন্যে দায়ীও করেছিল।

—আপনি হয়তো জানেন, ছোটখাটো বিজনেসে একজন ম্যানেজারের পক্ষে কোম্পানি বদল করা খুব একটা বড় কথা নয়। কোম্পানিরাও একে অন্যের লোক টানার চেষ্টা করে থাকে। কান্তিলালও রবিকে নিজের ফার্মে রাখার অফার দিয়েছিল।

আমি জানতাম, কিন্তু কথাটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। রবিবার রাত্রে রবি যখন বাড়িতে এসে আমাকে বলল, ও যা পায়, কান্তিলাল তার ডবলেরও বেশি অফার দিয়েছে, আমি বুঝলুম কান্তিলাল এটা স্রেফ গগনের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যে করছে। শত্রুতা মিটে গেলে রবিকেও ঘাড় ধাক্কা দেবে। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চয়ই চাই না যে, রবি কান্তিলালের মতো একটা লোকের সঙ্গে কাজ করুক।

তাই রবি চলে যাওয়ার পর কনট্যাক্ট করলাম কান্তিলালের সঙ্গে। খবর পেলাম ও চিঞ্চবড়ে। ভাবলাম, এমন কিছু দূর নয়, যাই ওর সঙ্গে আলোচনা করে রবিকে কাজে নেওয়ার ব্যাপারে ওকে নিবৃত্ত করে আসি।

অসিতের এই দীর্ঘ বক্তৃতা মন দিয়ে শুনে আকাশ বলল, আপনার বিশ্বাস ছিল, কান্তিলাল আপনার কথা শুনবে?

—বিশ্বাস ঠিক নয়, তবে গগন এবং রবি এই দুজনের স্বার্থে আমার এরকম চেষ্টা করা উচিত, এই কথাটা মাথায় ছিল। খুব সততার সঙ্গে অসিত বললেন।

আকাশ বলল, পরদিন সকালেও ওর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। আই মিন, অত রাত্রে না গিয়ে—।

—এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে। এই ভুলটা তো আর শোধরানো যাবে না। অসিত দুঃখিতভাবে বললেন।

—আপনি যে সত্যি কথা বললেন এতক্ষণ, তার কোনও প্রমাণ আছে? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

অসিত বললেন, কান্তিলালকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

—উনি তো বলেন, আপনাকে ঠিকমতো চেনেন না।

এই প্রথম অসিতকে বিব্রত মনে হল। টাইয়ের নট ঢিলে করে বললেন, উনি কি তাই বলেছেন?

—ঠিক তাই বলেছেন।

টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসের জল ঢকঢক করে খেয়ে অসিত সম্ভবত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন।

ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে আকাশ বলল, অসিতবাবু, খুনের আগের রাত্রে আপনি গিয়ে দেখা করেছিলেন এমন একজনের সঙ্গে যার সঙ্গে গগনবাবুর পুরোনো শত্রুতা ছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তা যা বলেছিলেন, তার কোনও সাক্ষীসাবুদ নেই—।

—প্লিজ, ইন্সপেক্টর! ব্যাপারটাকে ওইভাবে সাজাবেন না, প্লিজ। আমি যখন কান্তিলালের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তখন জানতাম না গগন মারা যাবে—।

—গগনবাবুর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল কবে?

—শুক্রবারে—ওদের বাড়িতে ডিনারে ডেকেছিল আমাকে। এই একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার আর কী, তখনই। তারপর অবশ্য ফোনে কথা হয়েছে।

আর মিসেস পালিতের সঙ্গে?

এই প্রশ্নটা সম্ভবত অসিত আশা করেননি। তাই উত্তর দিতে একটু সময় নিলেন। বেশ জোর দিয়ে বললেন, ওই তখনই।

উঠে দাঁড়িয়ে আকাশ বলল, আর একটা প্রশ্ন করব, মনে করে জবাব দিন। গগনবাবু সাধারণত কোন হাত দিয়ে সিগারেট খেতেন?

অসিত একটু চিন্তা করলেন। পর্যায়ক্রমে দুটো হাতই মুখের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, যতদূর মনে করতে পারছি, বাঁ-হাত দিয়ে।

অসিতের চেম্বার থেকে বের হতেই আকাশদের দেখা হয়ে গেল তন্ময়ের সঙ্গে। ও সম্ভবত অসিতের কাছেই আসছিল কোনও কাজে।

অসিতবাবু, আকাশ বলল, এসেছি যখন আপনার কারখানাটাও যদি এইসঙ্গে দেখা হয়ে যেত—।

—নিশ্চয়ই। অসিত উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, আমার একটু কাজ রয়েছে। তন্ময় যদি আপনাদের দেখিয়ে দেয় কোনও আপত্তি নেই তো?

—না-না, আপত্তি কীসের! তন্ময় তো আপনার কারখানারই একজন—।

ইয়াং অ্যান্ড এনারজেটিক ম্যানেজার, হেসে কথাটা শেষ করলেন অসিত।

যে-কোনও নতুন ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা, নতুন বিষয় বোঝার বা জানার চেষ্টা করা আকাশের স্বভাব, প্রসাদ জানে। প্রসাদকে বুঝিয়েছে কয়েকবার, কখন যে কোন তথ্য কোথায় কাজে লাগে আগে থেকে বোঝা যায় না। তাই বিষয় অজানা হলেও বেসিক ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া ভালো।

এখনও লাঞ্চ ব্রেক হয়নি, ওয়ার্কশপে ব্যস্ততা। দু-একজন তন্ময়কে দেখে হাত তুলে 'হ্যালো' বলল। একজন মারাঠিও জিজ্ঞাসা করল, আজ খাবার খেতে ক্যান্টিনে যাবে তো?

মেশিনের শব্দে জায়গাটা গমগমে। একটু জোরে কথা বলতে হয়। আকাশ বলল, কেমন লাগছে, তন্ময়?

তন্ময় বলল, খুব ভালো। এখানকার ওয়ার্ক কালচারের তুলনা নেই। তা ছাড়া, আমাকে সবাই খুব ভালোবাসে।

—আপনি কোন সেকশনে কাজ করছেন? প্রসাদ প্রশ্ন করল।

তন্ময় বলল, এখানে চারটে সেকশন। র মেটিরিয়াল, প্রোডাকশন, মেইনটেন্যান্স আর মার্কেটিং। আমাকে সব সেকশনের কাজ শিখতে হচ্ছে। আপাতত রয়েছি মেইনটেন্যান্স-এ।

আকাশ বলল, কাজে উন্নতি করতে হলে সবকিছুই শিখতে হয়, এবং গোড়া থেকে।

তন্ময় ওর বয়েস অনুযায়ী খুব উৎসাহী। বলল, এই দেখুন না, আজকেই আমি এই ফ্লোর-এর গ্যাংওয়েটা ঠিক করাচ্ছিলাম।

প্রসাদ বলল, গ্যাংওয়ে মানে কী?

—পাশাপাশি যখন বেশ কয়েকটা মেশিন রাখা থাকে তখন প্রতিটি মেশিনের দুপাশে বেশ খানিকটা জায়গা, মানে ওয়ার্কিং স্পেস, ছেড়ে দিয়ে আমরা একটা হলুদ রঙের লাইন টানি। দুটো পাশাপাশি মেশিনের পাশ দিয়ে টানা এই হলুদ লাইনের মাঝখানে যে-জায়গাটা থাকল, সেটা দিয়ে লোড করার জিনিসপত্র আনা হয়। সেটাকেই বলে গ্যাংওয়ে। তন্ময় বুঝিয়ে বলল।

একজন বয়স্ক লোক এসে তন্ময়ের কাছে কিছু চাইতেই ও আকাশদের অপেক্ষা করতে বলে, একটা ছোট ঘরে ঢুকে একরাশ কাপড়ের টুকরো এনে দিল লোকটার হাতে। দর্জির দোকানে পড়ে থাকা নানা সাইজের, নানা রঙের কাপড়ের টুকরো যেমন হয়।

আকাশ বলল, ওই কাপড়গুলো দিয়ে ওরা কী করবে।

—রং করার কাজে মোছা-টোছার জন্যে দরকার হবে।—বলতে-বলতে তন্ময় এগিয়ে গিয়ে একজনকে ডেকে এই ফ্লোরটা আজকেই শেষ করতে বলল।

মানুষের স্বভাবে কী আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতা আছে। আজ থেকে কয়েকদিন আগে তন্ময় ছিল এখানে প্রথমবার আসা একজন অচেনা আগন্তুক। আর আজ ও এদেরই একজন।

কারখানার ঘেরা থেকে বেরিয়ে বাগান। রং-বেরঙের ক্রোটোনের ওপর দুপুরের রোদ পড়েছে চমৎকার। প্রসাদ বলল, আপনি এখনও গেস্টহাউসেই আছেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, তন্ময় হেসে বলল, এখনও গেস্টহাউসেই। প্রথম বাড়ি ভাড়া নিতে গিয়ে যা হল, তাতে আর দ্বিতীয় বাড়ি দেখতে যাওয়ার উৎসাহ জোটাতে পারিনি। বলা উচিত হবে কি না জানি না, যদি কোনও ছোটখাটো ফ্ল্যাটের সন্ধান জানা থাকে আমাকে বলবেন, প্লিজ।

প্রসাদ বলল, নিশ্চয়ই।

আকাশ জিজ্ঞাসা করল, গেস্টহাউসটা কোন দিকে?

—এই তো, আরও একটু হাঁটলেই ডানদিকে। যদি সময় থাকে চলুন না, পায়ের ধুলো দিন।

প্রসাদ বলল, গেস্টহাউসের চৌকিদাররা বললে চা-টা এনে দেয়?

তন্ময় হাসতে-হাসতে বলল, খুব তাড়াতাড়ি এনে দেয়। এখনও দেবে, আসুন।

চা-এ চুমুক দিয়ে প্রসাদ বলল, বাঃ, চমৎকার চা।

তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, স্যার, এই কেসের ব্যাপারে কতদূর এগোলেন?

আকাশ মাথা নেড়ে বলল, খুব একটা সুরাহা করতে পারিনি।

—এই কেসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি না জানি না, তন্ময় বলল, তবে আপনাকে একটা কথা বলার ছিল। কাল থেকে আমার মাথায় জমে আছে।

—বেশ তো, বলো না। আকাশ বলল।

তন্ময় বলল, লুকিয়ে কারও কথা শোনা আমার স্বভাব নয়, কিন্তু গতকাল হঠাৎ শুনে ফেললাম। আপনি তো দেখছেন আমার এই রুমটা একেবারে রাস্তার ধারেই। এই রাস্তাটাই এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে টার্ন নিয়ে গগনবাবুদের নার্সারির পিছন দিয়ে গেছে। কাল সন্ধেবেলায় লোডশেডিং

হয়ে গিয়ে চারদিক অন্ধকার। আমি চুপচাপ জানলার ধারে বসেছিলাম। হঠাৎ আমার স্যারের কথা শুনতে পেলাম, রবি অবুঝের মতো কাজ করেছে। কিন্তু তুমি দ্বিতীয়বার দরজা খোলার কথা চেপে গেলে কেন? সঙ্গে সম্ভবত মিসেস পালিত ছিলেন, বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না, তাতে প্রশ্ন উঠত রবি অত রাত্রে গিয়েছিল কোথায়। কেন গিয়েছিল। স্যার বললেন, তাতে লাভ কী হল? তোমার মুখের ওপর ইন্সপেক্টর বলে দিল, তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তোমরা পুলিশের সঙ্গে কোঅপারেট না করে—বলতে-বলতে জায়গাটা পার হয়ে চলে গেলেন।

আকাশ প্রসাদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, বলল, আজ উঠি।

॥ ৮ ॥

গেস্টহাউস থেকে বেরিয়ে গগনবাবুদের নার্সারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়ল, রবি দাঁড়িয়ে কথা বলছে কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে। জিপ থেকে নেমে আকাশ এগিয়ে এসে বলল, আপনি কি আমাকে ফোন করেছিলেন, মোবাইলে?

রবি নমস্কার করে বলল, হ্যাঁ, আপনাকে কিছু বলার ছিল।

—বেশ তো জিপে উঠে বসুন, আকাশ বলল।

থানায় পৌঁছে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল রবি। তারপর অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, আসলে আমি আজ এসেছি আমার আর বউদির তরফ থেকে ক্ষমা চাইতে।

আকাশ রবির মুখের দিকে তাকাল। রবি বলল, আমি সোমবার আমার স্টেটমেন্টে—।

—সত্যি কথা বলেননি।

—বলেছিলাম, পুরোটা বলিনি। আমি সেদিন রাত্রে আরও একবার বেরিয়েছিলাম। রবি বলল।

নির্লিপ্তভাবে আকাশ বলল, কান্তিলালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কি?

অবাক হয়ে রবি বলল, আপনি জানেন?

—কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি, আকাশ বলল, আর প্রথমবার কোথায় গিয়েছিলেন, অসিতদার বাড়ি?

রবি বলল, আপনি যখন সবই জানেন, তখন কিছু লুকিয়ে লাভ নেই। মাস দুয়েক হল গগনদার সঙ্গে আমার টাকাপয়সা নিয়ে একটু অশান্তি চলছিল। উনি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। এদিকে কান্তিলাল আমাকে অনেক বেশি টাকা অফার করছিল। এইসব নিয়ে অসিতদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেদিন রাত্রে অনেক দেরি হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে ডাইনিং স্পেসের দরজায় নক করতেই বউদি দরজা খুলে দিলেন। আমি ড্রয়িংরুম দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি, গগনদা ডাকলেন। উনি যে স্টাডিতে বসে আছেন তখনও, আমি বুঝতে পারিনি।

গগনদা আমাকে তক্ষুনি হিসেবের খাতা আনতে বললেন। পাঁচটা দিন আগেই অ্যাকাউন্টের তিন-চারটে গলদ বার করে আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিলেন। আমার ব্যাপারটা বুঝে ঠিক করে রাখা হয়নি। ফলে যা হওয়ার তাই হল। কাজ পুরো হয়নি দেখে দারুণ রেগে গেলেন গগনদা। আমাকে যাচ্ছেতাই বলতে শুরু করলেন। এমনকি কোনওদিন যা বলেননি তাও বললেন, 'আমার এখানে এইসব বেয়াদপি, বেহিসেবি চাল চলবে না, কাল থেকে অন্য রাস্তা দেখো।' রাগের মাথায় আমিও দু-এক কথা শুনিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আর ওপরতলায় নিজের ঘরে গেলাম না। যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেদিক দিয়েই বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

আকাশ বলল, খিড়কির দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় বাইরে থেকে হুড়কো লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন?

রবি অন্যমনস্কভাবে বলল, হয়তো। খেয়াল ছিল না। ঠিক করলাম এখানে আর নয়। কান্তিলালের অফার ছিলই। ভাবলাম, একটা হেস্তনেস্ত আজই করে ফেলব। মোবাইলে কান্তিলালের সঙ্গে কনট্যাক্ট করতেই ও চিঞ্চবড়ে ডাকল। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। এলোমেলো রাস্তায় ঘুরে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। শেষে ওর কাছে পৌঁছলাম। সব শুনে বলল, আগামীকাল থেকেই ওর ফার্মে জয়েন করতে। আর গগনদার সঙ্গে হিসেবে যত টাকার গন্ডগোল হয়েছে, ও আগামীকালই সব দিয়ে দেবে। বাড়ি ফিরতে প্রায় আড়াইটে-তিনটে বেজে গেল। নিজের রুমে হিসেবটা ঠিক করতে বসেছিলাম। সকালের দিকটায় চোখ লেগে এসেছিল।

আকাশ বলল, আপনার বউদি কি জানেন কান্তিলালের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা?

রবি একটু শঙ্কিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, পরদিন আমিই বলেছিলাম।

—উনি কী বললেন?

—ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন প্রথমে। পরে বললেন, যা হওয়ার হয়েছে। পুলিশের কাছে এইসব বলার দরকার নেই।—রবি বলল।

—আর কান্তিলালের ফার্মে জয়েন করার ব্যাপারে কী ভাবলেন? আকাশ জিজ্ঞাসা করল একটু হেসে।

রবির চোখ ছলছলে হয়ে এল, গাঢ় স্বরে বলল, কী বলছেন, এই অবস্থায় চলে যাব? শুধু এই অবস্থায় কেন, আর কোনওদিনই যেতে পারব না।—বলে হাত তুলে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল।

পুলিশের জিপে রবিকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করে আকাশ গুম হয়ে বসে রইল নিজের চেয়ারে।

প্রসাদ বলল, অসিতবাবুর উপদেশে মিসেস পালিতের একটু সুবুদ্ধি হয়েছে দেখা যাচ্ছে। আর এ-ও বোঝা যাচ্ছে, তন্ময় ওদের সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলেনি।

আকাশ বলল, সেটা তো তখনই বোঝা গিয়েছিল। ও কী করে জানবে মিসেস পালিতকে আমি মিথ্যে কথা বলার ব্যাপারে বলেছি!

—এই কেসটা কিন্তু স্যার, ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।—প্রসাদ বলল, আপনি কি পরিষ্কার কোনও ধারণা করতে পেরেছেন?

—না প্রসাদ, আকাশ বলল, ধোঁয়ার মতো একটা ছবি তৈরি হচ্ছে আর পরমুহূর্তেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

—আপনার কি মনে হয় বাইরের লোকের পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়?

—একেবারে সম্ভব নয় তা বলছি না, তবে ভেবে দেখো, আকাশ বলল, বাইরের কেউ, ধরো, কারুর ভাড়াটে গুন্ডা যদি খুন করে, সে বাড়িতে এসে মারবে কেন? আর গলা টিপেই বা মারবে কেন? তার পক্ষে অফিসে, সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারে খুন করাটা অনেক সুবিধেজনক। না ডাকলে সাধারণত গগনবাবুর চেম্বারে কোনও কর্মচারী ঢুকত না। অর্থাৎ, দেখা করতে আসার ছলে ওঁর চেম্বারে এসে ওঁকে খুন করে চলে যাওয়ার অনেক পরে হয়তো ব্যাপারটা জানাজানি হত। ততক্ষণে খুনি চলে যেতে পারত অনেক দূরে।

—তার মানে বাড়ির বা আশেপাশের চেনাশোনাদের মধ্যেই কেউ? এদের মধ্যে কে খুন করতে পারে? প্রসাদ বলল।

—পারে তো সকলেই। আকাশ বলল, গগনবাবুকে গলা টিপে মারার জন্যে যতখানি শক্তি বা সাহসের দরকার, আমার মনে হয়, অসিত, বর্ষা, রবি, দুলাল, সকলেরই তা আছে।

প্রসাদ গলা নামিয়ে বলল, আপনার কী মনে হয়, এই চারজনের মধ্যে কেউ একজন?

—তা বলিনি। আকাশ বলল, এর মধ্যে যড়ও থাকতে পারে। যেমন ধরো, অসিত-বর্ষা, অসিত-রবি, বর্ষা-রবি, রবি-দুলাল এইরকম। এমনকী এই টিম গেমে, কান্তিলালও প্লেয়ার হতেই

পারেন, কিংবা 'নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন'।

—খুনের মোটিভ কী?

—অসিতের ক্ষেত্রে জেলাসি, বর্ষার ক্ষেত্রে অর্থ এবং অসিতকে পাওয়া, রবির ক্ষেত্রে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ আর রাগ, কান্তিলালের ক্ষেত্রে পুরোনো হিসেবের ফয়সালা, মোটিভের আর অভাব কী! রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল অবধি আমাদের জানা ঘটনাগুলোকে পরপর সাজালে আর মাঝখানের ফাঁকগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে ভরাট করার চেষ্টা করলে, কী দাঁড়াচ্ছে?—আকাশ কিছুটা আত্মগত হয়ে বলতে লাগল, রাত প্রায় বারোটা, দুলাল বেরিয়েছে তাস খেলতে। অসিতবাবুর সঙ্গে আলোচনা সেরে রবি বাড়ি ফিরল। আর অসিতবাবু গেলেন কান্তিলালের কাছে। এদিকে গগনবাবুর সঙ্গে রবির হিসেব নিয়ে বচসা। এইসময় শ্রীমতী বর্ষা পালিত কী করছিলেন আমরা জানি না। হয়তো গগনবাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নরম করার চেষ্টা করছিলেন। তবে সফল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

ধরো, রবি গালাগাল খেয়ে আবার বেরিয়ে গেল। ফিরল প্রায় আড়াইটে-তিনটের সময়। শ্রীমতী পালিত প্রায় সারারাত ঘুমোলেন না। সকাল সাড়ে ছ'টা, পৌনে সাতটার সময় নার্সারির রাস্তা দিয়ে বের হলেন। এইখানে আমি ধরে নিচ্ছি নার্সারির গেটের কাছে বা কাছাকাছি রাস্তায় কোথাও 'জগিং ম্যান' অসিতবাবুর সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল বা দেখা করেছিলেন। ধরে নিচ্ছি, কারণ তা ছাড়া, নার্সারির গেট দিয়ে বাইরে যাওয়ার কথা আমার কাছে লুকোনোর অন্য কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। অসিতবাবুকে উনি নিশ্চয়ই রাত্রের ঘটনাবলির কথা বলেছিলেন। এমনকী অনুরোধও করে থাকতে পারেন গগনবাবুকে বোঝানোর জন্যে, যাতে রবিকে গলাধাক্কা না দেন। তরুণের ছোট ভাই রবির প্রতি শ্রীমতী পালিতের স্নেহ থাকাটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না আমার।

যাই হোক, আলোচনা সেরে উনি গেলেন মন্দিরে আর জগিং শেষ করে অসিতবাবু ফিরলেন ফ্যাকট্রির বা বাড়ির দিকে। ফেরার সময় রাস্তায় দেখা হয়ে গেল তন্ময়ের সঙ্গে। তন্ময় স্টাডিরুমে ঢুকল ঠিক সাড়ে সাতটার সময়। মাঝখানের প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাড়িতে ছিল রবি, দুলাল এবং বিমলা।

—স্যার, সেই সাদা টুপি পরা লোকটাকে কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি। প্রসাদ বলল।

—ও ভুলে যাওয়ারই যোগ্য। আকাশ বলল, ওর সঙ্গে এই খুনের কোনও সম্পর্ক নেই।

কাঁচুমাচু মুখ করে প্রসাদ বলল, এত জোর দিয়ে কী করে বলছেন?

—খুব সহজে। প্রসাদ, ধুতি আর শার্টের সঙ্গে সাদা টুপি পরে, যা কি না হাওয়ার এক ঝটকায় খুলে যায়, লোকে বরযাত্রী যেতে পারে, খুন করতে নয়! যাই হোক, আমি নিজেই স্বীকার করছি, বর্ষা-অসিতের আলোচনা কতক্ষণ চলেছিল এবং বর্ষা যাওয়ার পর অসিত কতক্ষণ জগিং করেছিলেন বা করেননি এই দুটি তথ্য জানা না থাকায় ছবিটা সাজাতে আমি কোথাও কিছু ভুল করছি। কিন্তু আর না, চলো, খোলা হাওয়ায় একটু হেঁটে আসি। শরীর ও মন দুই চাঙ্গা হবে।—বলে আকাশ উঠল। পিছনে প্রসাদ।

থানার বাইরে জিপ দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশ ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, রবিবাবুকে ছেড়ে এসেছ? ড্রাইভার সম্মতি জানাতেই বলল, ঠিক আছে, তুমি বাড়ি চলে যাও।

ড্রাইভার জিপের চাবি আকাশের হাতে দিয়ে পকেট থেকে কাগজের একটা মোড়ক বার করে বলল, স্যার, এক্ষুনি গাড়ি সাফ করার সময় পিছনের দিকে পেলাম।

মোড়ক হাতে নিয়ে খুলেই চমকে উঠল আকাশ। একটা ট্রিটমেন্ট করা সেগুনের বীজ। আকাশ জিগ্যেস করল, রবিবাবু ছাড়াও গাড়িতে আর কেউ বসেছিলেন নাকি?

ড্রাইভার বলল, না স্যার।

আকাশ বলল, ফেরত যাওয়ার সময় রবিবাবু পিছনে বসেছিলেন নাকি সামনে, তোমার

পাশের সিটে?

অবাক হয়ে ড্রাইভার বলল, সামনে বসেছিলেন।

—আই সি। তার মানে এখানে আসার সময়। প্রসাদ—।

প্রসাদ দেখল, আকাশের চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা।

প্রসাদ,—আকাশ বলল, রবি আজ কেমন জুতো পরেছিল মনে আছে?

—আছে স্যার,—প্রসাদ বলল, মোটা সোলের স্পোর্টস শ্যু। এই ধরনের জুতো আজকাল খুব চলছে।

—সোলের নীচে খাঁজ-কাটা গ্রিপ থাকে। একেকটা কোম্পানির খাঁজের ডিজাইন একেক-রকম। নার্সারি থেকে বেরিয়ে রবি যখন গাড়ির পিছনে উঠে বসেছিল, ওর জুতোর নীচের খাঁজে আটকে ওই বীজটা চলে এসেছে গাড়ির পিছনে।—গাড়ি স্টার্ট করে আকাশ বলল।

—তার মানে কি স্যার, রবিই? নীচু গলায় প্রসাদ জিজ্ঞাসা করল।

—সেটা বলার সময় এখনও আসেনি। আকাশ বলল, তবে জুতোর সোলের খাঁজে আটকে সুপুরির চেয়েও ছোট সাইজের এই সেগুন বীজের চলে আসাটা আমার সামনে বিরাট একটা সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। সেটা এই যে, বীজ কেউ ইচ্ছে করে না নিয়ে এলেও, অনায়াসে, এমনকী বাহকের অজান্তেই বেশ খানিকটা চলে আসতে পারে। তাই আপাতত দুটো কথা বলতে পারি। এক, খুনি সম্ভবত এই ধরনের জুতো পরেছিল। আর দুই, সে নার্সারির রাস্তা দিয়ে এসেছিল কিংবা খুন করার আগে একবার নার্সারির দিকে নিশ্চয়ই গিয়েছিল।—এতটা বলেই গাড়ি থামাল আকাশ, বলল, প্রসাদ, এসো, তুমি চালাও।

অবাক হয়ে প্রসাদ বলল, কী হল, স্যার?

—কিছু না। আমি তোমার সিটে বসে চোখ বন্ধ করে পুরো ছবিটা শুরু থেকে আবার একবার ভাবতে চাই। আর চোখ বন্ধ করে, আর যাই করা যাক, গাড়ি চালানো যায় না!

॥ ৯ ॥

একটা পার্কে গিয়ে ইতস্তত অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল আকাশ। একটা বেঞ্চে বসল কিছুক্ষণ। মোবাইল ফোনে কারুর সঙ্গে কথাও বলল, পরপর দুবার। প্রসাদ জানে, আকাশের মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা তোলপাড় চলছে। একটা ঘটনা যা আজ থেকে চার-পাঁচদিন আগে ঘটে গেছে, টুকরো কয়েকটা জানা তথ্যের সঙ্গে যুক্তি মিলিয়ে মাথার মধ্যে সেটাকেই আবার রচনা করছে আকাশ।

দিনের আলো শেষ হয়ে গেল। বাচ্চাদের ক্রিকেট বন্ধ হয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণপ্রিয় মানুষদের সংখ্যা বাড়ল একসময়। রাস্তার ও আশপাশের বাড়ির আলো জ্বলে উঠেছে। খুব উত্তেজিতভাবে প্রসাদের কাছে এসে আকাশ বলল, চলো।

কয়েকটা জরুরি নির্দেশ দিয়ে প্রসাদকে থানায় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আকাশ। হাতে দুটো পলিথিনের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে। একটা প্যাকেটের সঙ্গে চিঠি লিখে বড় একটা খামে সিল করে একটা কনস্টেবলের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিল কোথাও। তারপর লম্বা একটা ফ্যাক্স পাঠিয়ে বলল, আজকের কাজ শেষ। চলো, এইবার বাড়ি ফেরা যাক।

পরের সারাটা দিন পুরোনো ফাইল দেখে আকাশ এমন চুপচাপ কাটিয়ে দিল যেন গগন পালিতের নাম শোনেনি কখনও বা উনি খুন হননি আদপেই। প্রসাদের মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরঘুর করছিল, তবু অনেক কষ্টে সংযত করে রাখল নিজেকে। আকাশের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে, এটা হচ্ছে ঝড় ওঠার আগের নীরবতা। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের প্রস্তুতি।

এই সময় আলোচনা করা একেবারেই পছন্দ করে না আকাশ।

প্রতীক্ষা শেষ হল সন্ধের দিকে। ফ্যাক্স-এর জবাব এল ফ্যাক্স-এ। সঙ্গে একটা দূরপাল্লার টেলিফোন। উৎসাহিত হয়ে আকাশ বলল, এসো প্রসাদ, একটু চা খাওয়া যাক।

কিন্তু চা শেষ হওয়ার আগেই একটা লোকাল টেলিফোন কল এল। খানিকক্ষণ শুনেই, রিসিভার রেখে দিয়ে এমন গুম হয়ে গেল আকাশ, প্রসাদের সাহস হল না জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে!

পুনে শহর বা আশেপাশের পনেরো-ষোলো জন ডিলারের সঙ্গে কয়েকটি যন্ত্রপাতির চাহিদা ও বাজারদর নিয়ে আলোচনা করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়, তবে সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া, তন্ময় এই লাইনে এবং এই শহরে একেবারেই নতুন। অসিতের নির্দেশ অনুযায়ী এই কাজটা করতে ওর সারাটা দিন লেগে গেল। যা হোক, এও একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। সন্ধে প্রায় সাড়ে সাতটায় গেস্টহাউসে ফিরে জামাকাপড় বদলে আজকের কাগজটাই আবার দেখছিল তন্ময়। এই সময় দরজায় টুকটুক করে টোকা পড়ল। উঠে দরজা খুলে তন্ময় দেখল আকাশ আর প্রসাদ।

গুড ইভিনিং স্যার, আসুন, তন্ময় অভ্যর্থনা জানাল।

গুড ইভিনিং। বিরক্ত করলাম না তো?—একটা চেয়ারে বসতে-বসতে আকাশ বলল, তন্ময়, একটা কাজে তোমার সাহায্য দরকার।

নিশ্চয়ই, উৎসাহী হয়ে তন্ময় বলল, বলুন—।

তন্ময়ের পাজামা-পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে আকাশ বলল, একটু বেরোতে হবে আমাদের সঙ্গে, চেঞ্জ করে নাও।

বাথরুমে গিয়ে জামা-প্যান্ট পরে এসে তন্ময় বলল, চলুন, কোথায় যেতে হবে?

এসো, বলছি, আকাশ প্রসাদ আর তন্ময়কে নিয়ে গেস্টহাউসের পাশের গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল—তন্ময়, এই রাস্তাটা দিয়ে সোমবার সকালে গগনবাবুদের বাড়ি যাওয়ার সময় অসিতবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, মনে আছে?

—হ্যাঁ, আছে বইকি!

—ঠিক কোনখানে দেখা হয়েছিল? মানে, কোনখানে দাঁড়িয়ে উনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আমাদের দেখাতে পারবে?

—নিশ্চয়ই, চলুন।

তন্ময় হাঁটতে লাগল, পিছনে আকাশ আর প্রসাদ।

বেশ খানিকটা গিয়ে, রাস্তাটা ডানদিকে ঘোরার পর প্রায় পঁচিশ-তিরিশ মিটার গিয়ে থামল তন্ময়। বলল, এইখানেই দাঁড়িয়ে উনি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

—তখন ঠিক ক'টা বাজছিল বলতে পারবে? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—এই ধরুন প্রায় সাতটা বেজে কুড়ি বা দু-এক মিনিট কম।

—গুড,—আকাশ বলল, এবার তোমাদের দুজনকে একটা কাজ করতে হবে। তোমরা আলাদাভাবে জগিং করে নার্সারির গেট পর্যন্ত যাবে। গেট দিয়ে ঢুকে সাধারণভাবে হেঁটে গগনবাবুর স্টাডি অবধি গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত গুনবে মনে-মনে। তারপর ঠিক যেভাবে গিয়েছিলে সেইভাবে ফিরে আসবে এইখানে। আর অন্যজন এইখানে দাঁড়িয়ে স্টপ ওয়াচে টাইম দেখবে। এই নাও স্টপ ওয়াচ আর এই নাও একটা টর্চ, কাজে লাগতে পারে। ইচ্ছে ছিল, আমি আর প্রসাদ দুজনে এই কাজটা করে ফেলব। কিন্তু আমি একটা অন্য মুশকিলে পড়ে গেছি বলে থাকতে পারছি না।

—কী হল স্যার? তন্ময় জিজ্ঞাসা করল।

—আরে ভাই, কী বলব।—আকাশ বলল, দুলাল আমাকে ফোন করে জানিয়েছে, ও নাকি স্টাডিরুমের আলমারি থেকে চাবি নিতে ঘরে ঢুকেছিল। যেখানে গগনবাবুর বডি পড়েছিল, মাথার দিকটায় খুব অস্পষ্ট একটা ধুলোমাখা জুতোর সোলের ছাপ দেখেছে। আশ্চর্য, আমার সেদিন চোখে পড়ল না। এদিকে আমাদের থানার ফটোগ্রাফার আজ আবার ছুটিতে। আমি দেখতে যাচ্ছি অন্য কাউকে ম্যানেজ করে আনা যায় কি না। পেলে ভালো, নইলে কাল সকালে দেখা যাবে। এটা একটা জোরালো প্রমাণ, বুঝলে তো, ফেলে রাখা যায় না। যাই হোক, তোমরা কাজ করো। প্রসাদ, হয়ে গেলে গেস্টহাউসেই আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। বলতে-বলতে আকাশ গেস্টহাউসের গেটের কাছে রাখা জিপের উদ্দেশে ছুটল।

—পুলিশ অফিসার এইরকমই হওয়া উচিত। আকাশ চলে যাওয়ার পর যেন ঘোর ভেঙে তন্ময় বলল, স্যার খুব হার্ড ওয়ার্কিং, তাই না?

—ওরে বাবা! প্রসাদ পকেট থেকে একটা মৌরির কৌটোটা বের করে তন্ময়কে দিয়ে এবং নিজে খানিকটা মুখে ফেলে বলল, একটা কাজ ধরলে, একেবারে খাওয়া-দাওয়া ভুলে পিছনে লেগে যান। অগত্যা আমরাও লাগি।

—ভালো লাগে?

—সবসময় লাগে বললে মিথ্যে বলা হয়।—প্রসাদ হেসে বলল, মাঝে-মাঝে তো ওঁর সিরিয়াসনেস আমার প্রায় পাগলামো মনে হয়। এই ধরুন এই কাজটাই। আপনি ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়ার পর আমি একাই জগিং করে গিয়ে ফিরে এসে টাইম দেখে নিতে পারতাম। এই কাজটা আপনাকেও করতে বলার কোনও মানেই হয় না।

—আমার মনে হয়, উনি অ্যাভারেজ টাইম দেখতে চাইছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা। এটাকে পাগলামো বলা যায় না। তন্ময় বলল।

—ওঃ, আপনিও ওই দলেই।—বলে হাসল প্রসাদ, আসুন, কাজটা সেরে ফেলা যাক। প্রথমে আমি করছি, কেমন?

—বেশ তো, বলে তন্ময় ঘড়ির বোতাম টিপল প্রসাদ জগিং করতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে। ঘন অন্ধকারে একটু পরেই মিলিয়ে গেল প্রসাদ। শুধু ওর পায়ের শব্দ আরও কিছুক্ষণ শুনতে পাওয়া গেল।

হাওয়ায় নভেম্বর মাসের চোরা শীত। পাশের একটা ঝোপ থেকে পোকার কটকট শব্দ আসছে। আকাশে চাঁদ নেই। এদিকে স্ট্রিট লাইট আছে, কিন্তু যথেষ্ট দূরত্বে। স্কুটার চালিয়ে চলে গেল একজন, হাওয়ায় ঢেউ তুলে। এই চাকরি, ইন্টারভিউ, গগনবাবুদের বাড়িতে যাওয়া, খুন, ভাবলে এই সবকিছু কেমন অদ্ভুত লাগছে তন্ময়ের। যেন সিনেমার আলাদা-আলাদা কয়েকটা ফ্রেম। জীবন্ত হয়েও অলীক, অলৌকিক।

প্রসাদ ফিরে আসতে সময় দেখল তন্ময়, ন'মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড।

—এবার আমি, তন্ময় বলল।

—টর্চটা রাখুন।—প্রসাদ বলল, গেটের কাছটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

এই পরীক্ষার একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে, তন্ময় জগিং করতে-করতে ভাবল, সেদিন অসিতবাবুর কতটা সময় লেগেছিল সেটাই আন্দাজ করতে চায় আকাশ। তার মানে, আকাশের ধারণা, জগিং করে স্যার গগনবাবুর স্টাডিরুম অবধি গিয়েছিলেন। ওঁর চিন্তা কোন জটিল পথে চলেছে কে জানে। অসিতের জগিং করার ছন্দ মনে করে সেইভাবেই জগিং করতে-করতে নার্সারির গেট অবধি পৌঁছে গেল তন্ময়।

চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। গেট খোলার হালকা হলেও স্পষ্ট শব্দ পাওয়া গেল। শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দ তুলে এগিয়ে গেল তন্ময়। একটু দূরেই অফিস দেখা যাচ্ছে।

ঠিক এই সময় লাইট অফ হয়ে গিয়ে চরাচর ডুবে গেল মিশমিশে অন্ধকারে। তীব্র একটা হুইসেলের শব্দ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই, ধুপধাপ করে অনেক লোকের দৌড়নোর শব্দ পাওয়া গেল, মেন গেটের দিকে। বর্ষা পালিতের তীক্ষ্ণ গলা শুনল তন্ময়, 'হোয়াট ননসেন্স! ওকে ছেড়ে দিন, ওকে ছেড়ে দিন!' কয়েকটা টর্চ ঝলসাল আর তারপরেই দুম করে ফায়ার।

কী হল ঠিক বোঝা গেল না। না যাক, পরে বোঝা যাবেই। গগন পালিতের খুনের নাটকের যবনিকাপাত হল মনে হচ্ছে। নিজের অজান্তেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। এই তো স্টাডির দরজা, বাইরে থেকে পুলিশের লক। এইখানে দাঁড়িয়ে পঁচিশ অবধি গুনতে হবে।

তন্ময় টর্চ জ্বালিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। না থাকারই কথা। ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে গেল তন্ময়। কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ড্রয়িংরুমে ঢুকে আর-একবার টর্চ জ্বালাল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। এদিক দিয়ে স্টাডিতে ঢোকার দরজায় শুধু ল্যাচ লাগানো, তালা নেই। পুলিশের বুদ্ধি!

মেন গেটের কাছে তুমুল হট্টগোল চলছে। চলুক, এটাই সুবর্ণ মুহূর্ত। ড্রইংরুমের কার্পেটে ভালো করে জুতো মুছে, ল্যাচ খুলে স্টাডিতে ঢুকে পড়ল তন্ময়। মাটির দিকে নিশানা করে টর্চ জ্বালাল। এইখানে, ঠিক এইখানে পড়েছিল লোকটা। এইদিকে ছিল মাথা। এখানে এখনও ধুলোর দাগ আছে! আশ্চর্য! ঠিক আছে, আর থাকবে না। পকেট থেকে রুমাল বের করে বসে টর্চ জ্বেলে জায়গাটা মুছতে লাগল তন্ময়। আর কোনও প্রমাণ থাকবে না—ফটোগ্রাফারের অপেক্ষায়! থ্যাংকস, ইন্সপেক্টর। থ্যাংকস ফর দ্য ভাইটাল ইনফরমেশন!

ঠিক এই সময় মুখের ওপর অতর্কিতে জোরালো টর্চের আলো পড়ায় চমকে উঠল তন্ময়। সোফার পিছন থেকে বেরিয়ে আকাশ বলল, ওয়েলকাম, তন্ময়! আমি ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

বইয়ের আলমারির পিছন থেকে বেরিয়ে অসিত বললেন, তন্ময়, শেষ পর্যন্ত তুমি!

তন্ময় ক্ষিপ্রভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ তো ভারী অন্যায়, স্যার! ইন্সপেক্টর আমাকে বলেছিলেন এখানে আসতে। ওঁকে সাহায্য করেছি বলে আপনারা আমাকে—।

আকাশ বলল, আমি তোমাকে স্টাডিরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে পঁচিশ অবধি গুনে ফিরে যেতে বলেছিলাম। ঘরে ঢুকে রুমাল দিয়ে জুতোর দাগ তুলতে বলিনি।

এই সময় আলো জ্বলে উঠল। ঘরে ঢুকলেন বর্ষা, রবি, সাব-ইন্সপেক্টার ভোঁসলে ও তিন-চারজন কনস্টেবল।

তন্ময়ের মুখে অচেনা একটা হিংস্র, ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। ও বলল, জুতোর দাগ মুছলেই কি প্রমাণ হয় যে, আমি গগনবাবুকে খুন করেছি?

—না তন্ময়, তা ছাড়াও, অন্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। তুমি কি বলতে পারবে, যে-শার্টটা পরে সোমবার সকালে তুমি প্রথমবার গগনবাবুদের, মানে এই বাড়িতে, এসেছিলে সেই শার্টটা কোথায়?

—লন্ড্রিতে।

—তাই নাকি! লন্ড্রির রসিদ আছে? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—ছিল, হারিয়ে গেছে।

—হারাবারই কথা। কেন না, ওই শার্টটা লন্ড্রিতে কোনওদিন দেওয়াই হয়নি। ওই শার্টের কিছুটা অংশ এখন পুলিশের জিম্মায়।—বলে আকাশ হাঁক দিল, হাজারে—।

—জি সাব, বলে একজন কনস্টেবল পলিথিনের একটা প্যাকেট হাতে ঘরে ঢুকল। প্যাকেট থেকে হালকা নীল রঙের শার্টের পাঁচ-ছ'টা টুকরো বের করে আকাশ বলল, কী, চিনতে পারছ? আপনারা চিনতে পারছেন?

অসিত, রবি, বর্ষা সকলেই মাথা নাড়লেন।

এই টুকরোগুলো আমি অসিতবাবুর উপস্থিতিতে ওঁরই কারখানার স্টোর্স-এর একটা বড় বিন্ থেকে খুঁজে বের করেছি—যেখানে তুমি গ্যাংওয়ে ঠিক করাচ্ছিলে সেদিন। তুমি কি বলতে পারবে শার্টটা টুকরো-টুকরো করে কেটে অন্যান্য টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার কারণ কী?

তন্ময় নিরুত্তর।

সব টুকরোগুলো আমি খুঁজে পাইনি ঠিকই,—আকাশ বলল, তবে সৌভাগ্যক্রমে কলারের টুকরো আর লেবেলটা অটুট পেয়েছিলাম। সিটি টেলার্স, ধরমপেট, নাগপুরের নাম বেশ স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল। এই টুকরোটি নিয়ে কালই একজন কনস্টেবলকে নাগপুরে পাঠানো হয়েছিল। আজ একটু আগে নাগপুর পুলিশ আমাকে ফোন করে জানিয়েছে, মাত্র একমাস আগে সেলাই করানো এই জামা, আর জামার অর্ডার দেওয়া তন্ময় সোমের নাম খুঁজে বের করতে ওদের কোনও অসুবিধেই হয়নি।

॥ ১০ ॥

গগনবাবুর খুন হওয়ার সময়টুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়।—গরম চায়ে প্রথম চুমুক দিয়ে আকাশ ব লল।

পুলিশের গাড়িতে তন্ময়কে থানায় পাঠিয়ে দেওয়ার পর গগনদের বাড়ির ড্রয়িংরুম হাউসফুল। অসিত অনুরোধ করেছেন সবকিছু বিশদভাবে বোঝাতে। গল্পের টানে অন্য সকলের সঙ্গে চায়ের ট্রে একপাশে রেখে দুলাল, এমনকী বিমলাও দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

কথার জের টেনে আকাশ বলল, লক্ষণীয় কারণ, ওই সময়টায় অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল গগনবাবুকে খুন করা। আমার এই অনেকের তালিকায়, ক্ষমা করবেন, আপনারা প্রায় সকলেই ছিলেন।

কান্তিলালবাবুকে আমি প্রথমেই বাদ দিয়েছিলাম। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা লোকের পক্ষে নিজের হাতে খুন করা প্রায় অসম্ভব। ভাড়াটে গুন্ডা অবশ্যই পাঠাতে পারেন। কিন্তু তারা ঘরে ঢুকে গলা টিপে মারার ঝুঁকি নেবে কেন?

তারপর ধরা যাক অসিতবাবুর কথা। ঠিক ওই সময় জগিং করে উনি যে নার্সারির দিকে এসেছিলেন এ-কথা আমরা সবাই জানি। উনি নার্সারির গেট দিয়ে ঢুকে স্টাডিরুম পর্যন্ত এসে নিঃশব্দে কাজটা সেরে বেরিয়ে যেতে পারেন। গগনবাবু স্টাডিতে এসে বসার পর. শ্রীমতী পালিত যদি খুন করে বাড়ির বাইরে চলে যান, চমৎকার একটা অ্যালিবাই তৈরি হয় যে, খুনের সময় উনি বাড়িতেই ছিলেন না। কারণ, পোস্টমর্টেমে মৃত্যুর সময়ে দু-এক ঘণ্টার হেরফের ধরা পড়ে না। আবার উনি যখন মন্দিরে গেছেন, নিজের ঘর থেকে নীচে এসে রবিবাবুর পক্ষেও চুপিসাড়ে গগনবাবুকে খুন করে আবার নিজের ঘরে ফিরে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা অসম্ভব নয়। দুলাল এদের কোনও একজনের সহকারী হতেও পারে। অকুস্থলে পাওয়া দুটো সেগুনের বীজ আর একটা দোমড়ানো ভাঙা সিগারেট, এই নিয়ে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো, এটাই ছিল আমার কাজ।

রবিবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম বীজগুলো ট্রিটমেন্ট করা বীজ, এসেছে নার্সারি থেকে। কিন্তু এল কী করে? না কি কেউ ইচ্ছা করে রেখেছে, হদিশ পাচ্ছিলাম না। পরে রবিবাবুরই জুতোর সোলে আটকে আমার জিপের পিছনে আসা বীজ সম্ভাবনার একটা নতুন দরজা খুলে দিল। বুঝলাম, খুনির পায়ে ওই ধরনের জুতো থাকলে খুনির অজান্তেই বীজ চলে আসতে পারে। আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবিতে দেখলাম রবিবাবু সেদিনও ওই একই জুতো পরেছিলেন। অসিতবাবুও পরেছিলেন জগিং করার স্পোর্টস শু্য। পরেছিল তন্ময়ও। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ও সন্দেহের তালিকা

থেকে বাদ পড়ল।

সিগারেট জ্বালানো হয়েছিল নিঃসন্দেহে রাইটিং টেবিলের কাছে। কারণ দেশলাইটা ওখানেই রাখা। অথচ যতটা সিগারেট খরচ হয়েছে তাতে বোঝা যায় ওটা বেশিক্ষণ আগে জ্বালানো হয়নি। সিগারেট ভেঙে বা নিবে যাওয়ার সঙ্গে যদি আততায়ীর আঘাত হানার সম্পর্ক থাকে, তাহলে এ-কথা বুঝতে দেরি হয় না যে, আততায়ীর সঙ্গে বসে কথা বলার জন্যেই গগনবাবু একটু আগেই রাইটিং টেবিলের কাছ থেকে উঠে এসেছিলেন সোফার কাছে। যার সঙ্গে কাল রাত্রেই তুমুল বচসা হয়েছে, অর্থাৎ রবিবাবু, তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এই উঠে আসাটা স্বাভাবিক মনে হল না। যদিও অসিতবাবুর সঙ্গে কথা বলার জন্যে তা সম্ভব। তাই রবিবাবুর নাম অসিতবাবুর চেয়ে নীচে চলে গেল সন্দেহের তালিকায়।

সিগারেট যেভাবে দোমড়ানো, ভাঙা—তাতে বোঝা যায়, সামনের জ্বালানো অংশটার ওপরে আচমকা চাপ পড়েছিল বা ধাক্কা লেগেছিল। ওটা স্বাভাবিকভাবে অ্যাশট্রেতে ঘষে নেভানো সিগারেট নয়। তা যদি হয় তবে, কোথায় ধাক্কা লাগল? সোফার হাতলে, কুশনে কোথাও কোনও চিহ্ন নেই কেন? তাহলে কি আততায়ীর শরীর বা পোশাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল? লেগেছিল কি না বুঝব কী করে?

উত্তরের ইশারা পেলাম গগনবাবুর সাদা সুতির স্কার্ফে। স্কার্ফের মাঝবরাবর, যে-জায়গাটা গলায় জড়ানো হয়, সেখানে একটা গোল পোড়া দাগ পড়েছে। কিন্তু দাগটা এতই হালকা যে, এটা সিগারেট নিভে বা ভেঙে যাওয়ার কারণ কিছুতেই হতে পারে না। তার মানে কি স্কার্ফের কাছাকাছি কোথাও ছিল ধাক্কা লাগার আসল জায়গাটা? কিন্তু গলার কাছে কেন যাবে সিগারেটের জ্বলন্ত অংশটা?

ঠিক এইসময় গগনবাবু বাঁ-হাতে সিগারেট খেতেন শুনে বিদ্যুৎচমকের মতো আরও একটা কথা মাথায় এল। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টার মতো গগনবাবুও আততায়ীর হাতে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করেননি তো! যে-মানুষের গলা টিপে ধরে আছে কেউ তার পক্ষে এই ছ্যাঁকা দেওয়ার ব্যাপারটা অব্যর্থ লক্ষ্য নাও হতে পারে। হাতের বদলে স্কার্ফে, বা আততায়ীর মণিবন্ধে, ছ্যাঁকা লেগে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে খুনির হাতেও পোড়া দাগ বা ঘা থাকা উচিত। যদি সে ফুলস্লিভ শার্ট পরে থাকে তাহলেও শার্টের হাতায় দাগ বা ফুটো থাকবে। আবার ছবি দেখলাম। রবিবাবু সেদিন হাফ শার্ট পরেছিলেন। শ্রীমতী পালিত হাফ হাতা ব্লাউজ। দুলাল হাফ ফতুয়া। ফুলহাতা ট্র্যাকস্যুট পরেছিলেন অসিতবাবু। কিন্তু ওঁর স্লিভে কোনও দাগ নেই। বলা বাহুল্য, সন্দেহের তালিকা থেকে আবার ফুলহাতা শার্ট পরা তন্ময় বাদ পড়ল।

বস্তুত এই কেসের সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এটাই, তন্ময়ের উপস্থিতি। সিনেমার প্রতিটি দৃশ্যে ক্যামেরাম্যানের মতো ও থেকেও নেই। কেন? এর একটাই কারণ। যে আজ প্রথমবার দেখবে গগনবাবুকে, সে গগনবাবুর হত্যাকারী কী করে হতে পারে! এটাকেই যদি উলটো দিক থেকে ভাবা যায়, অর্থাৎ খানিকক্ষণের জন্যে এ-কথাটা যদি মন থেকে মুছে ফেলা যায় যে, তন্ময় ও গগনবাবু একে অন্যের অচেনা ছিলেন না, তাহলে ভেবে দেখুন, সবই সম্ভব। তন্ময়ের পায়েও ওরকম জুতো ছিল, তন্ময়ও নার্সারির রাস্তা দিয়েই এসেছিল, তন্ময়ও আগে থেকে প্ল্যান করে ছোরাছুরি বা রিভলভার নিয়ে আসেনি। তন্ময়ের আসা আর গগনবাবুর মারা যাওয়ার সময় একই।

আমার মনে হয়, বীজ সংক্রান্ত আলোচনা শুনে তন্ময় বুঝে গিয়েছিল, বীজ দুটো দিয়ে ওর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু শার্টটা নিয়ে ও সমস্যায় পড়েছিল। আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবিতে তন্ময় আছে। কিন্তু ফুলহাতা হালকা নীল শার্টের দুটো হাতই দেখলাম একটু করে গোটানো। আমার মনে পড়ল তারপরে ওকে ওই শার্ট পরে দেখিনি কখনও। কিন্তু

রাখবে কোথায়?

তন্ময় অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি ভাবার চেষ্টা করলাম ও শার্টটা নিয়ে কী করবে। নিজের কাছে গেস্টহাউসে বেশিদিন রাখা নিরাপদ নয়। ঘর সার্চ হলেই ধরা পড়বে। জ্বালিয়ে দিলে ধোঁয়া হবে, ছাই হবে, তা ছাড়া জ্বালানোর একটা জায়গা চাই। কেউ দেখে ফেললে সাক্ষী থেকে যাবে। রাস্তায় ডাস্টবিনে ফেলে দিলে অন্য কারোর, এমনকী পুলিশের হাতেও, পড়তে পারে। এমন একটা ব্যবস্থা কি হতে পারে যা ওর জন্যে খুব সহজ কিন্তু সাধারণ মানুষের বা পুলিশের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে? আমার ধারণা, তন্ময় নিজেও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিল প্রথম দু-দিন। তারপর বুধবার গ্যাংওয়ের কাজ করতে গিয়ে ও দেখল এইখানে অনেক ছোট-ছোট কাপড়ের টুকরো কাজে লাগে, আর সেগুলো রাখা থাকে স্টোর-এর এক কোণে একটা বড় পিচবোর্ডের বাক্সে। সেইদিনই, সম্ভবত আমাদের গেস্ট হাউস থেকে বিদায় জানানোর পরেই, তন্ময় এই সুন্দর সহজ উপায়টা কাজে লাগিয়ে ফেলল। শার্টটা আট-দশ টুকরো করে কেটে নিয়ে গিয়ে আরও অনেক টেলারিং ওয়েস্টের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এল।

এই কথাটা মাথায় এল গ্যাংওয়ের কাজ দেখার পর, সেইদিনই সন্ধেবেলায় পার্কে ঘোরার সময়। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, শুধু সন্দেহ করলে চলবে না, সন্দেহ সত্যি কি না যাচাই করে দেখা দরকার। কারখানার সময় শেষ হওয়ার পর আজই খুঁজে দেখা দরকার, দেরি করলে চলবে না। অসিতবাবুর অনুমতি নিয়ে এবং ওঁর উপস্থিতিতে কাজটা সম্পন্ন হল। শুধু সম্পন্নই নয়, সন্দেহ অনুযায়ী কয়েকটা টুকরো পাওয়াও গেল। তার একটা নমুনা নাগপুরের দর্জির কাছ থেকে যাচাই করা দরকার। তা ছাড়া, নাগপুরের এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতেও তন্ময় সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেওয়ার দরকার ছিল। এসবের জন্যে আমার দরকার ছিল অন্তত একটা দিন। কিন্তু পরদিন কারখানায় গিয়েই যদি তন্ময় বুঝতে পারে শার্টের টুকরো সরিয়ে নেওয়ার কথা, তাহলে সাবধান হয়ে যেতে পারে। তাই অসিতবাবু, আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম, তন্ময়কে কিছু একটা কাজ দিয়ে সারাদিন কারখানার বাইরে পাঠিয়ে দিতে। কারখানায় না পেলে, অবশ্যই ঘর সার্চ করতাম।

তবু তন্ময়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই স্টেজে সেট তৈরি করে আমি নাটক মঞ্চস্থ করে ফেললাম। তন্ময় প্রথম দিনেই ধুতি আর সাদা টুপি পরা কাল্পনিক লোকের গল্প শুনিয়ে আমাদের দিশেহারা করার চেষ্টা করেছিল। আমিও কাল্পনিক জুতোর ছাপের গল্প ওকে শুনিয়ে ফাঁদ পাতলাম। তারপর জিপ নিয়ে অন্যদিক দিয়ে এসে মেন গেট দিয়ে ঢুকে স্টাডিরুমে লুকিয়ে থাকলাম।

প্রসাদকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যাতে ও আগে জগিং করে। আমি ঠিকমতো লুকোতে একটু বেশি সময় পাব। টর্চটাও ইচ্ছে করেই দেওয়া, যাতে তন্ময়ের ড্রয়িংরুম বা স্টাডিতে পৌঁছতে কোনও অসুবিধে না হয়। এসব ক্ষেত্রে একজন বেসরকারি সাক্ষী থাকলে ভালো হয়। তাই অসিতবাবুর আলমারির পিছনে অবস্থান।

মেন সুইচ অফ করে, গেটের কাছে হট্টগোল, হুইসেল ও ব্ল্যাংক ফায়ারের নাটকটা সাব-ইন্সপেক্টর ভোঁসলে দারুণ জমিয়ে তুলেছিল। এই চাকরিতে আসার আগে ও যে পুনের একটি নাট্যসংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিল আজ তার প্রমাণ পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, মাত্র একটি সংলাপেই, ম্যাডাম, আপনিও চমৎকার অভিনয় করেছেন,—আকাশ বলল বর্ষার দিকে তাকিয়ে।

ঘরে সকলে চুপচাপ। আকাশের চুলচেরা বিশ্লেষণ আর তার নিষ্কর্ষ এখনও সকলের মন ছুঁয়ে আছে।

তবু, ইন্সপেক্টর,—বেশ খানিকটা সময় নিয়ে অসিতবাবু নীরবতা ভাঙলেন, দুটো প্রশ্নের উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাচ্ছি না। এক, তন্ময় গগনকে খুন করল কেন? আর দুই, ওকে যখন খুন করতে কেউ দেখেনি তখন ও চুপচাপ পালিয়ে গেল না কেন?

আকাশ বলল, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগে দিচ্ছি। আমার অনুমান, গলা টিপে মারার পর গগনবাবুকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়ার সময় তন্ময়ের কনুইয়ে লেগে চিনেমাটির ফ্লাওয়ার ভাসটা টিপয় থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙেছিল। এই শব্দে কেউ এসে পড়তে পারে ভেবে ও আর পালাবার চেষ্টা না করে গগনবাবুকে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠাবার ভান করতে থাকে। পরে অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে ঝাঁকানি দেওয়ার সময় ওটা পড়ে-যাওয়ার কথা আমার কাছে স্বীকার করে নেয়।

প্রথম প্রশ্নটাও আমাকেও কম ভাবায়নি। গগনবাবুর জীবদ্দশায় তন্ময়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়নি। ওঁদের পরস্পরের সম্বন্ধে ধারণা বা মতামত কী ছিল সে-বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল নই। কিন্তু গগনবাবু বা ওঁর কাজের ব্যাপারে তন্ময়ের করা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সব রকমের টীকা-টিপ্পনী, মন্তব্য হাতড়ে দেখে আমার মনে পড়েছিল দুটি কথা। প্রথমত, রবিবাবু বীজ ট্রিটমেন্ট করার মেশিনটির ব্যাপারে গগনবাবুর ইনোভেটিভ আইডিয়ার কথা দাবি করায় তন্ময় ভদ্রভাবে হলেও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তন্ময়ের এই প্রতিক্রিয়া ওর মৃদু স্বভাবের সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারিনি। দ্বিতীয়ত, রবিবাবুর টেবিলে রাখা বীজ হাতে নিয়েছিলাম আমি, তন্ময় নয়। তা সত্ত্বেও কিন্তু তন্ময় বলতে পেরেছিল, ওর ওপর হালকা ক্র্যাক আছে যেটা মেশিনে করা। এটা কি শুধুই মেধা, পূর্ব পরিচিতি নয়?

এই দুটি আনুষঙ্গিক থেকে মোটামুটিভাবে সন্দেহের একটা ভিত্তি তৈরি করে আমি নাগপুর পুলিশের সাহায্য চেয়ে ফ্যাক্স করেছিলাম। জবাবে, আমি জানতে পেরেছি তন্ময় ঠিক এই ধরনের একটি মিনিয়েচার মেশিন তৈরি করেছিল, ওর ছাত্রজীবনের শেষ দিকে। এ-বিষয়ে কোনও ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার উল্লেখ আছে ওর বায়োডেটায়। এ-বিষয়ে আরও অনুসন্ধান চলছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তন্ময় ও গগনবাবুর অতীতের অন্তত একটা অধ্যায় গাঁথা আছে ওই বীজ ট্রিটমেন্ট করার মেশিনটির পরিকল্পনায়।

পুনের ক্যাম্প এরিয়া পুলিশ স্টেশনে তন্ময় সোমের যে-স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছিল তার বাংলা অনুবাদ করলে কিছুটা এইরকম দাঁড়ায় ঃ

এই ঘটনার সূত্রপাত আজ বা চার-পাঁচদিন আগে হয়নি, হয়েছিল প্রায় ছ'বছর আগে। নাগপুরে সায়েন্স ও টেকনোলজির একটি প্রদর্শনীতে ছোট্ট একটি মোটর অপারেটেড, ডিকর্টিকেশন মেশিন বানিয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিল এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি ছাত্র। এই মেশিনটি ছোটখাটো ফলের বীজের খোসা ও শাঁস ছাড়িয়ে ফেলত। শুধু তাই নয়, শক্ত আঁটির গায়ে ঘা দিয়ে হালকা একটা ক্র্যাক করে দিতে পারত চক্ষের নিমেষে। প্রদর্শনীতে এসে একজন বুদ্ধিদীপ্ত, দাড়িওয়ালা, হ্যান্ডিক্যাপড লোক ওই ছেলেটির কাছ থেকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, ডিজাইনের ব্লুপ্রিন্ট দেখে সব জেনে নিয়েছিলেন।

এর প্রায় আট-দশ মাস পর কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে ছেলেটি অবাক। আহমেদনগরের কোনও এক 'ফিউচার স্টিক' নামের কোম্পানির তরফ থেকে বলা হয়েছে যান্ত্রিকভাবে সেগুনের বীজ ট্রিটমেন্ট করার কথা, যাতে শতকরা জার্মিনেশন বহুলাংশে বেড়ে যায়।

ছেলেটি সঙ্গে-সঙ্গে চিঠি লিখল, বলল, এ তো আমার তৈরি করা মেশিন! জবাব পেল না। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষা পাশ করে ও তখন বেকার। ও ছুটল আহমেদনগর। খুঁজে বার করল কোম্পানির অফিস, দেখা করল বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ইনিই এসেছিলেন প্রদর্শনীতে। এখন বিরাট ব্যাবসা ফেঁদে বসেছেন। ছেলেটি দাবি জানাল। অকৃতজ্ঞ লোকটি কর্কশভাবে বলল, তোমার কাছে কোনও প্রমাণ আছে যে, এটা তোমার তৈরি করা মেশিনের কপি?

ইন্সপেক্টর, ওই ছেলেটি তার সবজেক্টটুকু জানত ভালোই, কিন্তু পেটেন্ট অ্যাক্ট বা তার নিয়মাবলির নামই শোনেনি কোনওদিন। ও বুঝল, আইনের প্যাঁচে ওই মেশিনটির ওপর ওর সমস্ত দাবি এখন হাতছাড়া। অসহায়ভাবে ও বলেছিল, আমাকে ক্ষতিপূরণ দিন। ক্ষতিপূরণ না বলতে চান দাম বলুন, সাহায্য বলুন, এ আপনাকে দিতেই হবে।

লোকটি রাজি তো হয়ইনি, দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে বলেছিল। ইন্সপেক্টর, এই বেকার ছেলেটিই আমি। আর আমার বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে তৈরি করা একটা স্বপ্নকে জোর করে কেড়ে নিয়েছিল যে-ধূর্ত লোকটি সে-ই গগন পালিত। অবশ্য ওঁর স্টাডিতে ঢোকার আগের মুহূর্ত অবধি এই কথাটা আমি জানতে পারিনি।

উনি রাইটিং টেবিলে বসে কিছু লিখছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে অসিতবাবুর ফোনের কথা উল্লেখ করতেই হাতের ইশারায় আমাকে সোফায় বসতে বলে আরও প্রায় দু-মিনিট সময় নিলেন। উনি আমার মুখের দিকে লক্ষ করেননি, বা করলেও চিনতে পারেননি। আমি কিন্তু চিনলাম। শুধু চিনলাম তাই নয়, এই দু-মিনিট আমি ওঁকে দেখলাম জীবনের সমস্ত অপমান আর লাঞ্ছনা নিয়ে, ঘৃণা নিয়ে। আমার কী করণীয় ততক্ষণে আমি ভেবে ফেলেছি।

উনি উঠে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে লাঠি নিয়ে সোফার কাছে এলেন।

ওঁকে দাঁড়াতে দেখে সম্মান দেখিয়ে আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রেতে দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলে আমার দিকে পিছনে ফিরে সোফায় ঠেস দিয়ে লাঠিটা রাখলেন। আর ঠিক সেইসময়—!

সিগারেটের কথা আমার মনে ছিল, সরিয়েও নিতাম, কিন্তু শার্টের হাতা গুটিয়ে নিতে না নিতেই দুলাল এসে পড়ল। আর বীজদুটো যে আমার জুতোর সঙ্গে এসেছে, এ-কথা আমি বুঝেছিলাম অনেক পরে।

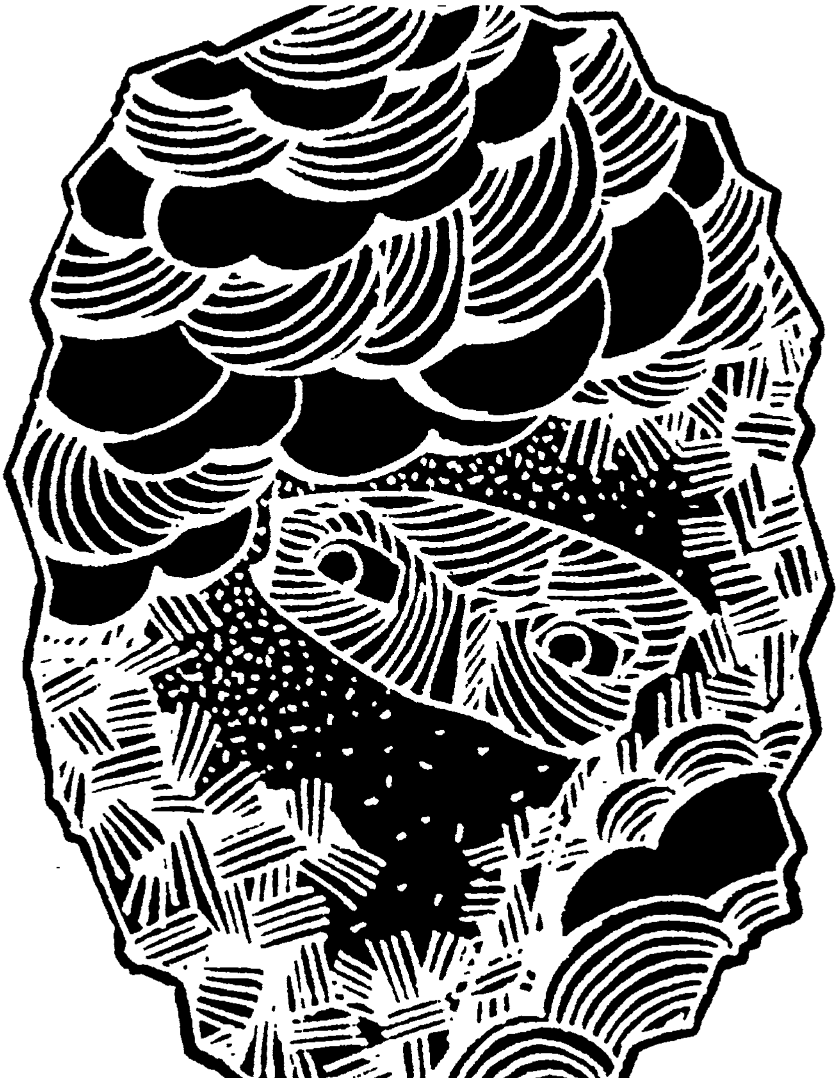
আগেও কয়েকবার পড়া, তবু অফিসে বসে আর-একবার লেখাটা আদ্যোপান্ত পড়ে প্রসাদ বলল, বীজগুলো কিন্তু স্যার, অহেতুক ধাঁধায় ফেলেছিল আমাদের। সত্যি বলতে কী, এই খুনের সঙ্গে বীজের কোনও সম্পর্কই নেই।

—কেন? আকাশ জিজ্ঞাসা করল।

—কেন না, এই বীজগুলো জুতোর নীচে আটকে চলে আসাটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার। বীজ না আটকালেও তন্ময় সেদিন খুন করতই। আবার এ-ও বলতে পারেন, যে খুনি নয় সে-ও ওই রাস্তা দিয়ে ওইরকম জুতো পায়ে দিয়ে এলে বীজ আটকাতে পারত।—প্রসাদ বলল।

—আপাতদৃষ্টিতে তুমি যা বলছ, তা ঠিক। জানলা দিয়ে উদাসভাবে বাইরে তাকিয়ে আকাশ বলল, তবে অনেক সময় অনেক ঘটনার পিছনে দেখবে সনাতন সত্যের গভীর কোনও ইঙ্গিত থাকে, যা সাধারণভাবে দেখলে অর্থহীন মনে হয়। এই কেসে বীজের প্রসঙ্গটা আমার তা-ই মনে হচ্ছে। ভেবে দেখো, ওই বীজ ওখানে না থাকলে, সেগুন বীজের এত অজানা তথ্য জানতে পারতাম না। মেশিনের ব্যাপারটাই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হত না। এমনকী 'গগন-তন্ময়'-এর অতীত সম্বন্ধটাই রয়ে যেত বোধের বাইরে। আবার এ-ও ভেবে দেখো, অত্যন্ত মেধাবী আর পরিশ্রমী গগনবাবু সারাজীবন সৎ পথে থেকে চাকরি করে হঠাৎ যেদিন বিপথে গেলেন, মেশিনটির আসল কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত করলেন তন্ময়কে, সেইদিনই ওঁর জীবনে অস্বাভাবিক এই মৃত্যুর বীজ প্রোথিত হয়ে গেল আশ্চর্য নয়?

গোধূলিতে মৃত্যুর ছায়া



সৌরভ মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

রাস্তাটা একেবারে রাবিশ। দেড়হাত অন্তর এক-একখানা গর্ত, ঝকাং-ঝকাং লাফাচ্ছে জিপটা। ঝাঁকুনিতে সারা শরীরের স্প্রিং ঢিলে হয়ে যাচ্ছে যেন। ঠক করে মাথাটা সলিড লোহায় ঠুকে গেল একবার। এতক্ষণ যা মনে-মনে বলছিলুম, ধাক্কা খেয়ে ফস করে ছিটকে বেরিয়ে এল—'ওফ, মেয়েটা আর মরার জায়গা পেল না শালা!'

কথাটা বেফাঁস বলে ফেলেই আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, ম্যাডামের মুখখানা শক্ত হয়ে উঠেছে। ম্যাডাম—মানে, সিনিয়র ইনভেস্টিগেটিং অফিসার মিস সুবর্ণরেখা সেন। সাত দিন হল জয়েন করেছেন, ঠিক আমার ওপরের পোস্টে—অর্থাৎ আমার ইমিডিয়েট বস। যেখানে-যেখানে ইনি তদন্তে যাবেন, আমাকে বশংবদের মতো পিছন-পিছন দৌড়তে হবে। শেষ অবধি একটা লেডিজের আন্ডারে!...আমি আসলে একটু যাকে বলে মেল শভিনিস্ট গোছের আছি। আগের বস ছিলেন ঘোষালসাহেব—গুঁফো, ভুঁড়িওয়ালা, খইনিখোর। কিন্তু পুরুষ মানুষ হাজার হোক। তার জায়গায় এই হালকা-পলকা বয়েজ কাট...একে দিনরাত্তির 'হ্যাঁ ম্যাডাম, জো ম্যাডাম' করা—ভারী হ্যাটা-হ্যাটা লাগে। তার ওপর এনার টাইপটা আবার হান্টারওয়ালি মার্কা। সেদিন আমায় কী ধাতানিই দিলেন! আমার একটু—ফ্র্যাঙ্কলি বলছি—ল্যাংগোয়েজের দোষ আছে। মেজাজ একটু চড়লেই পটাপট কাঁচা নামিয়ে দিই। ঘোষালসাহেব উৎসাহই দিতেন। বলতেন, খিস্তি দিতে না জানলে ভালো পুলিশ হওয়া যায় না। ও বাবা, এই সেদিন লক আপের একটা পাতি মস্তানকে একখানা পাঁচ অক্ষর বলে ফেলেছি—সঙ্গে-সঙ্গে এই মহিলা ফোঁস করে উঠলেন, 'নো আনপার্লামেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজ প্লিজ।' গলাটা একেবারে হিম ঠান্ডা, মাইরি—সেই থেকে শালা-টালা বলে ফেললেও জিভ কাটি।

তবে এই রাত্তির সাড়ে এগারোটায় ঠোক্কর খেতে-খেতে ডেডবডি দেখার জন্যে স্পটে যেতে হলে মেজাজ খারাপ হবে না তো কী? আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো হয়েছেও তেমনি—পান থেকে চুন খসল কী ব্যস, বেমক্কা পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলছে দুনিয়া থেকে। গলায় দড়ি-রেলে মাথা-পেস্টিসাইড খাওয়া এখন আবার ব্যাকডেটেড। নতুন ট্রেন্ড দেখছি এই উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়া। দশ-বিশতলা বাড়িও উঠছে দেদার, সুইসাইডের সুযোগও বাড়ছে দিন-দিন। ...তবে হ্যাঁ, আমার এও মনে হয়, আর পাঁচটা মেথডের চেয়ে এইটায় সুবিধে অনেক বেশি। ফাঁস লাগানোর হ্যাপা নেই, বিষ জোগাড় করার রিস্ক নেই, ট্রেন কখন আসবে তার জন্যে হাপিত্যেশ নেই। তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠো, সরসরিয়ে হাওয়া কাটতে-কাটতে নেমে এসো—খেল খতম। এই মেথডটা চয়েস করে যারা—আমি তো বলব, তারা অন্যদের চেয়ে ইনটেলিজেন্ট। এই যে মেয়েটা পাঁচতলা থেকে ঝাঁপিয়েছে—এও তাই।

জিপ থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে উঁচু খাঁচাবাড়িটার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখলেন ম্যাডাম সুবর্ণরেখা। এগিয়ে-পেছিয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে জরিপ করে নিলেন। নতুন-নতুন জয়েন করে এইসব মেয়ে হেভি কায়দাবাজি দেখায়। ইনিও এমন করছেন, যেন এক্ষুনি বিরাট একটা মিস্ট্রি সলভ করে ফেলবেন।

আমি মনে-মনে হাসলুম একটু। কিসসু নেই গো মহারানি, একেবারে রদ্দি কেস। বাড়িতে অশান্তি, পরীক্ষায় গুবলেট, নয়তো সেই আদি অকৃত্রিম ল্যাং। লাখো সুইসাইডের পিছনের গল্প মাত্তর এই তিন-চাররকম মালটিপল চয়েসের মধ্যেই ঘুরপাক খায়।

প্রায় কাঠা ছয়েক জমির ওপর উঠেছে এই 'মঙ্গলম' বিল্ডিং। আপাতত পাঁচতলা—নীচের তলাটা ফিনিশড হয়েছে। সারি-সারি দোকানঘর, অনেকগুলো বন্ধ, দু-চারটে খোলা রয়েছে। ওপরের চারটে তলায় ওনারশিপ ফ্ল্যাট বানানোর প্রজেক্ট। দোতলা আর তিনতলায় পিলার-টু-পিলার পার্টিশন ওয়ালগুলো গাঁথা শেষ হয়েছে সবে, টপ ফ্লোর দুটো এখনও খাঁচা হয়েই দাঁড়িয়ে। মেয়েটা

সম্ভবত একদম ওপর থেকেই ঝাঁপিয়েছে—অবশ্য একজ্যাক্টলি বলা মুশকিল। ঝাঁপটা রাস্তার দিকে দিলে সঙ্গে-সঙ্গেই জানা যেত...সেটা চায়নি বোধহয়, পিছন দিকটায় পড়েছে। ওদিকটায় এক চিলতে ওয়েস্টল্যান্ডের মতন রয়েছে, ঝোপঝাড় জঞ্জাল আর ইটপাটকেলে ভরতি। কেউ বিশেষ মাড়ায় না। মাঝেমধ্যে একটা দুটো ভবঘুরে বা ভিখিরি যায় হয়তো, কিংবা গাঁজাখোরেরা একটু নিরিবিলিতে দম দেবে বলে ঢোকে। আজও দুটো গেঁজেলই ঢুকেছিল অন্ধকার ঘন হওয়ার পর। বডি পড়ে আছে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে।

এই মাঝরাত্তিরেও ভিড় জমেছে মন্দ নয়। মেয়েছেলের লাশ—উৎসাহ আর কৌতূহল সুলসুলিয়ে উঠেছে লোকের। এখন ক'দিন জব্বর মুখরোচক আলোচনা চলবে। ভিড়টা ঠেলি, গম্ভীর গলায় ধমক-টমক দিয়ে সরিয়ে দিই সামনের ক'জনকে। পিছনে ম্যাডামকে দেখে একটা চাপা আওয়াজ গুনগুনিয়ে ওঠে ঃ 'মেয়ে-পুলিশ! মেয়ে-অফিসার!'

ভিড়টা পাতলা হল, ম্যাডাম এগোলেন।

জোরালো টর্চের আলোয় কাত হয়ে পড়ে-থাকা শরীরটা ঝলসে উঠল যেন। হলুদ চুড়িদার, সাদা ওড়না, একটা পায়ে চটি এখনও পরা। হাতে চুড়িটুড়ি কিছু নেই, জাস্ট একটা রিস্টওয়াচ। ছিমছাম চেহারা, ফরসা...সুন্দরী ঠিক বলা যাবে না, তবে অ্যাট্রাকটিভ। মাথার একটা দিক থেঁতলে বিচ্ছিরি হয়ে আছে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে জমাট বেঁধেছে। চোখের পাতাগুলো আধখোলা।...সিম্পটম সব পরিষ্কার, উঁচু থেকে পড়ে ইনস্ট্যান্ট ডেথ।

ঝুঁকে পড়ে, প্রায় ফুটখানেক ডিসট্যান্স থেকে মুখখানা খুঁটিয়ে দেখলেন ম্যাডাম। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল কেন হঠাৎ? যেন ভীষণ একটা গন্ডগোলের গন্ধ পেয়ে গেছেন! স্ত্রী-স্বভাব তো—সন্দেহবাতিক রক্তের মধ্যেই আছে, সোজাসাপটা জিনিসকেও জটিল করে দেখতে ভালোবাসেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বুঝছেন?'

বিজ্ঞের মতো হাসলুম, ঈষৎ তাচ্ছিল্য মিশিয়ে!—'বোঝার কী আছে ম্যাডাম? ক্লিয়ার কেস—ওয়ান টু থ্রি...ঝপাং!'

'ইজ ইট?'—একটু অন্যমনস্ক, চিন্তিত দেখাল মুখটা। বিড়বিড় করছেন নিজের মনে, 'ঠোঁটে লিপস্টিক, মুখে ফাউন্ডেশন, বডি স্প্রে-র গন্ধ রয়েছে এখনও—এত প্রসাধন করে সুইসাইড করতে আসা...?'

মুখে এসে গিয়েছিল, মেয়েমানুষ জাতটাই এরকম, মরতে গেলেও মেকআপ লাগে। সামলে নিলুম। একটু দার্শনিক হাসি টেনে এনে বললুম, 'ওই...শেষ সাজা সেজে নিয়েছে আর কী!'

বোধহয় মনঃপূত হল না কথাটা। উত্তর দিলেন না, চারপাশে ঝুঁকে আসা মুখগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু উঁচু গলায় বললেন, 'আপনারা কেউ এই মেয়েটিকে চেনেন?'

মৃদু একটা গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল। পাবলিক পুরো চুপ। একটু ঘাবড়েছে সবাই—পুলিশের আঠারো ঘা কে না জানে? এগিয়ে গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম—'মুখ না খুললে সব ক'টাকে নিয়ে গিয়ে থানায়...।'

মহিলা মাঝপথে থামিয়ে দিলেন আমায়। হঠাৎ নিজের গলাটাকে কেমন অদ্ভুতরকমের নরম করে ফেললেন—'দেখুন, আপনাদের সবার সাহায্যেই কিন্তু ইনভেস্টিগেশন চালাতে হবে আমাদের। একটি মেয়ে এইভাবে মরে পড়ে থাকবে, আপনারা কেউ কিছু বলবেন না? প্লিজ, যদি কারও কিছু জানা থাকে নির্ভয়ে বলুন।'

বলিহারি ট্যাকটিকস—গরম দেখিয়ে আমি যা পারতুম না, নরম দিয়ে এক সেকেন্ডেই করে ফেললেন, শ্রীমতী। দুটো ইয়ং ছেলে ফস করে এগিয়ে এসে বললে, 'আমরা চিনি ম্যাডাম। এর নাম টিনা। ট্রাম ডিপোর কাছে বাড়ি...।'

'আপনারা?'

'আমাদের সব দোকান আছে—ওই যে, ওইটা আমার...আমার নাম সমীর কর্মকার। পাশেরটা এর, এ হল মকবুল শেখ। সবে ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি গেছি—খবরটা পেলাম, দৌড়ে এসে দেখি, আরে—এ তো চেনা মেয়ে!'

'এর বাড়ি চেনেন? একটা খবর দিতে হবে।'

এবার একটা বুড়ো লোক ভিড়ের মধ্যে থেকে বলল, 'আমার ভাইপো চেনে আজ্ঞে, আমাদেরও ওই দিকেই বাড়ি—তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি বাইকে করে। বলেছি ওর মামা-টামা কাউকে চাপিয়ে নিয়ে চলে আসতে।'

'মামা...কেন? এ কি মামার বাড়িতে থাকে, মানে থাকত?'

'আজ্ঞে, বাবা নেই যদ্দূর জানি—মামার কাছেই মা-মেয়ে থাকত বলে খবর শুনেছি।'

'আচ্ছা...' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবলেন ম্যাডাম। ভুরু দুটো কিন্তু সোজা হয়নি এখনও। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্ন্যাপগুলো নেওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলুন, মিস্টার দাশগুপ্ত। আমি এদের সঙ্গে আরও দু-একটা কথা বলে নিই।'

বিভিন্ন অ্যাঙ্গল থেকে ফ্ল্যাশগান ঝিকিয়ে উঠতে থাকে। ওদিক থেকে টুকরো-টুকরো তত্ত্বতালাশ কানে আসছে। ওহ্, জিজ্ঞাসাবাদের যা ধরনধারণ—হাসি পাচ্ছে ব্যাপক। শ্রীমতী শার্লকরেখা...। ছোট নোটবুক বার করে আবার খসখস করে লেখা হচ্ছে। যেন মামুলি সুইসাইড কেস নয়—একটা দুরন্ত ইন্টারন্যাশনাল ষড়যন্ত্রের জাল এক্ষুনি ভুঁই ফুঁড়ে আবিষ্কার করে ফেলবেন! সব দড়িকেই সাপ ভাবছেন, সব ঝোপেই বাঘের গন্ধ...।

ভটভটিয়ে একটা বাইক এসে থামল। সামনের ছোকরাটিই খবর দিতে গিয়েছিল—পিছনে বসে পাজামা পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়েসি ভদ্রলোক একজন। গালে চাপ দাড়ি, মাথার সামনের চুল পাতলা। চাউনিটা উদভ্রান্ত, মুখ ব্লটিং পেপারের মতো সাদা। জানা গেল, ইনিই মেয়ের মামা—বিনোদবিহারী শাসমল।

বাইকের পিছন থেকে নেমে এত লোকের ভিড় এবং পুলিশ দেখে ভদ্রলোক রীতিমতো থরথর করে কাঁপছিলেন। মুখ দিয়ে বাক্যি সরছিল না।

ধরে-ধরে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেলুম। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল, 'দিদির সামনে গিয়ে কী বলব...' বলেই হাত-পা ল্যাতপেতিয়ে আমার ঘাড়ে এলিয়ে পড়লেন।

আইডেন্টিফিকেশন তো হয়েই গেল। এবার পোস্টমর্টেমে পাঠানোর পালা। ম্যাডাম বেছে ঘেঁটে জনাতিনেককে সঙ্গে নিয়ে নিলেন, সমীর-মকবুল, ছোকরা দুজন সমেত থানায় গিয়ে স্টেটমেন্ট রেকর্ড করতে হবে। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে বিনোদবাবুকেও ধাতস্থ করার চেষ্টা করা হল। ম্যাডাম স্বয়ং তাঁকে ধরে-ধরে জিপে বসালেন, সান্ত্বনা-টান্তনাও দিলেন কিছু।

জিপের দিকে পা বাড়াতে যাব, কী যেন একটা বুটে ঠেকল। ঝুঁকে দেখলুম, একটা মোবাইল। হাতে নিয়ে দেখি, ভেঙেচুরে বরবাদ হয়ে গেছে। ন্যাচারালি—পাঁচতলার ওপর থেকে পড়েছে ইটপাটকেলের ওপর। মোবাইল আর তার মালিক, থুড়ি...মালকিন—শেষ হয়ে গেছে একইসঙ্গে।

॥ দুই ॥

কলিংবেল টেপার চেয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই বেশি পছন্দ করি আমি। ব্যাপারটার মধ্যে বেশ পুলিশি টাচ আছে—'দরজা খুলুন, পুলিশ...' গম্ভীর গলায় শব্দ তিনটে গড়িয়ে দিতে হেভি ঘ্যাম লাগে।

দুটো ধাক্কার পরেই অবশ্য এখানে খুলে গেল দরজাটা। সবে ভোর হচ্ছে, এই সময় ছোকরা জেগে ছিল না কি? বেশ সন্দেহজনক। অবশ্য পরনে দেখছি বারমুডা-টি-শার্ট, পায়ে কেড্‌স—দৌড়তে বেরোচ্ছিল এমনও হতে পারে।

পেটানো লম্বা চেহারা, কাটা-কাটা চোখমুখ, এক কথায় হ্যান্ডসাম। একটু যেন অবাক, সাতসকালে বাড়ির সামনে পুলিশের জিপ—'কী ব্যাপার?'

গলায় কড়া দানাগুলো ফুটিয়ে তুলি।—'আপনি কমল বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'থানায় চলুন।'

'থানায়....? কী ব্যাপার?'

'গেলেই জানতে পারবেন। টিনা বলে কাউকে চিনতেন?'

'চিনতেন মানে? টিনা আমার বান্ধবী—কালকেও কথা হয়েছে ফোনে...!'

'ওহ্, শুধু ফোনে? সাক্ষাৎ হয়নি, তাই না!'—গলাতে একটু তরল ব্যঙ্গ মেশালুম, কিন্তু ফাইন টাচটা ধরতেই পারল না, কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'না, আসলে আমার একটু দেরি হয়ে গেছিল...।'

কথাটা শেষ করল না, হঠাৎ কী ভেবে এক ঝটকায় সোজা হয়ে তাকাল আমার দিকে—'কী ব্যাপার বললেন না তো, হঠাৎ টিনার কথা...?'

'জিপে উঠুন। টিনার বডি পাওয়া গেছে কাল।'

একটা পা বাড়িয়েছিল, সেই অবস্থায় স্ট্যাচু হওয়ার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে পড়ল ছোকরা। তারপর পাগলের মতো কেমন একটা অদ্ভুত গলায় চিৎকার করে উঠল, দু-হাতে আমার ইউনিফর্মটা খামচে ধরল, ঝাঁকাতে লাগল বেপরোয়াভাবে—'মিথ্যে কথা বলছেন, লায়ার...ফালতু বকছেন সকালবেলা...।'

খুব ঠান্ডা মাথায় হাত দুটো ছাড়ালুম, তারপর সপাটে একটা থাপ্পড়। এসব অ্যাকটিং দেখে-দেখে হাড় পেকে গেছে আমার এই লাইনে।—'থানায় চল শুয়োরের বাচ্চা। শালা খুনি...ন্যাকরাবাজি হচ্ছে, হারামজাদা!'

আহ কতদিন পর ফুল ফোর্সে একটু গালাগাল দেওয়া গেল! খোলসা হল গলার ভেতরটা।

থাপ্পড়টা মারতুম না হয়তো। কিন্তু কাল রাত্তিরে থানায় বসে দোকানদারগুলো যা সব স্টেটমেন্ট দিলে—তাতে মেজাজটা টক হয়ে গেছে। কেস হিস্ট্রি যা দাঁড়াচ্ছে, মার্ডারের গন্ধ পরিষ্কার। আর আমি কিনা গোড়া থেকেই কনফিডেন্টলি বলে আসছি, ক্লিয়ার সুইসাইড! এখন নিজের থুতুই গিলতে হচ্ছে ওই মহিলার সামনে। এই ছোকরাই হচ্ছে খুনি—তবে সেজন্যে অতটা রাগ হচ্ছে না। চোরডাকাত খুনি ঘেঁটে হাতে কড়া পড়ে গেছে। কিন্তু যেই ভাবছি এই ব্যাটার জন্যেই আমার প্রেস্টিজটা পাংচার হয়ে গেল, মনে হচ্ছে আর-একটা চড় কষাই।

হ্যাঁ, খুনি এই কমল বিশ্বাসই। এই ছেলে আর ওই মেয়ের মধ্যে একটা অ্যাফেয়ার ছিল অনেকদিন ধরে। ওই বিল্ডিংয়ের দোতলায় ছেলেটা একটা ঘর বুক করেছিল—মাঝে-মাঝেই কাজ দেখার অছিলায় ওপরে উঠে যেত। একই সময় বুঝে-পড়ে নিয়ে মেয়েও আসত। দুজনে মিলে সিঁড়ি বেয়ে চারতলা-পাঁচতলার নিরিবিলিতে উঠে ঘাপটি মেরে প্রেমালাপ করত—এমনই বয়ান পাওয়া যাচ্ছে।

কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মেয়েটা এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল। সমীর কর্মকার বলে যে-ছেলেটা স্টেটমেন্ট দেয়, তার দোকান সিঁড়ির ঠিক মুখটাতেই—তার মেমারি খুব শার্প। তার স্পষ্ট মনে আছে, একাই আসে মেয়েটা। ঠিক তার পরপরই একটা বাচ্চা জোগাড়ে ছেলে ওপর থেকে নেমে এসেছিল। একজন বোরখা পরা মহিলা বোধহয় ওপরে উঠেছিলেন,

কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনিও নেমে আসেন। কমল বিশ্বাস এসেছিল তারও মিনিট পাঁচ-সাত পরে। কিছুক্ষণ পরেই তাকেও নেমে আসতে দেখে সমীর। একা।

মেয়েটাকে নামতে দেখেনি কেউ।

এবং আরও দু-একজনের বয়ান অনুসারে, নীচে নামার সময় বারকয়েক ইতিউতি তাকিয়ে, অনেকটা যেন অপরাধীর ভঙ্গিতে দ্রুত বেরিয়ে যায় কমল বিশ্বাস। পকেট থেকে মোবাইল বার করে কাউকে ফোন করার চেষ্টা করছিল বারবার—এটাও চোখ এড়ায়নি কয়েকজনের।

মেয়ের মামা বিনোদ শাসমলকেও আলাদা বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা তথ্য দিয়েছেন। তাঁর বয়ানেও কমল বিশ্বাসের নামই উঠে আসছে। হ্যাঁ—তাঁরা জানতেন এদের মেলামেশার কথা, তেমন আপত্তিও ছিল না তাঁর বা তাঁর দিদির। কিন্তু ইদানীং এদের দুজনের মধ্যে কোনও একটা গোলমাল চলছিল। কাল দুপুরবেলা টিনা মোবাইলে খুব ঝগড়া করছিল—বিনোদ এবং তাঁর দিদি, অর্থাৎ টিনার মা, দুজনেই শুনতে পেয়েছেন। মনে হচ্ছিল কমলই ছিল উলটোদিকে।

অর্থাৎ এ-কেসটি জলবৎ তরল হয়ে এসেছে।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিরোধ, প্রেমিকাকে নিরিবিলিতে ডেকে এনে পাঁচতলা থেকে একটি মসৃণ ধাক্কা এবং প্রেমিকের পলায়ন। কী নিয়ে বিরোধটা ঘটেছিল সেটাই শুধু জানতে বাকি। এবং সেটাও খুব অভিনব কিছু হবে না—পাতি একটা ট্র্যাঙ্গলই খুঁজে পাওয়া যাবে সম্ভবত। এবার এই কেসটা সলভ করে বিস্তর হাততালি কুড়োবেন অগ্নিকন্যা। আমার শালা বরাতটাই খারাপ—বেফাঁস ডিসিশনটা আগেভাগে দিয়ে ফেলে এখন মুখ লুকোতে হচ্ছে!

খুনিটার কলার ধরে জিপ থেকে টেনে নামালুম। কলের পুতুলের মতো হেঁটে-হেঁটে ভেতরে এল। হেভি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে—এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি বোধহয়।

॥ তিন ॥

'কাল দুপুরে মোবাইলে ঝগড়া হয়েছিল আপনাদের?'

'হ্যাঁ...মানে, ঝগড়া নয় ঠিক, একটু কথা কাটাকাটি...।'

'কী নিয়ে?'—সুবর্ণরেখার গলাটা বেশ নরমসরমই।

'ও চাইছিল ওর টাকা নিয়ে আমি ব্যাবসা শুরু করি। আমি বলছিলাম, আমি নিজেই এসট্যাবলিশড হতে পারব, ওর টাকা নেব না।'

'একটু এক্সপ্লেন করে বলুন।'

বাঁ-হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছল কমল বিশ্বাস। শালা একেবারে অরিজিনাল চোখের জল বার করে ফেলেছে মাইরি! তবে আমাকে গলাতে পারবে না, ক্রোকোডাইল টিয়ার্স কম দেখিনি আমি। চুপচাপ শুনতে লাগলুম। মহিলা আবার গলে না যান!

কমল বিশ্বাস ফোঁপাতে-ফোঁপাতেই বলতে লাগল, 'আমি একটা কম্পিউটারের বিজনেস খুলব বলে ভেবেছিলাম। একটা ঘর বুক করেছিলাম, ওই বিল্ডিংয়ের দোতলায়। এখন সবে দেয়ালগুলো গাঁথা হয়েছে, প্লাস্টার হয়নি। আমার কিছু ক্যাপিট্যাল লাগবে তো...তাই এদিক-ওদিক লোন নেওয়ার চেষ্টা করছি—টিনা একদিন হঠাৎ বলল ওর হাতে রিসেন্টলি কিছু টাকা এসেছে কোনও একটা ফ্যামিলি-সোর্স থেকে। ও টাকাটা আমাকে দিতে চাইছিল।'

'কত টাকা?'

'আমার দরকার...সব মিলিয়ে আট-ন'লাখ টাকা।'

'পুরোটাই টিনা দিতে চেয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এত টাকা ঠিক কোন সোর্স থেকে পেতে পারে টিনা—কোনও ধারণা আছে আপনার?'

'ও একটু চাপা টাইপের ছিল, সব খুলে বলত না...। তবে যতদূর জানি ওর বাবা মারা যাওয়ার সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে ওকে দিয়ে যান—আঠেরো বছর বয়স হলে ওর হাতে আসবে এই কন্ডিশনে।'

'টিনার আঠেরো কমপ্লিট হয়েছে কবে?'

'এক সপ্তাহ আগে...।'

এই অবধি পৌঁছে কমল বিশ্বাস মুখে হাত চাপা দিয়ে টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

এতক্ষণ মিস সুবর্ণরেখার ইন্টারোগেশনের ভঙ্গি দেখে গা-টা চিড়বিড় করছিল আমার। এই কি তরিকা, খুনের আসামিকে প্রশ্ন করার? যেন 'রোজগেরে গিন্নির' ইন্টারভিউ, কিংবা রান্না শেখানোর ক্লাস।...একটি ধমকে জাঙিয়া ভিজিয়ে ফেলবে এমন গলা বার করতে হবে, মাঝে-মধ্যেই বাঘা থাবায় চেপে ধরতে হবে টুঁটিখানা—তবে না পুলিশি জেরা!

হতচ্ছাড়া ছেলেটা কান্নাকাটির পালা শুরু করতে আর বসে থাকা গেল না। বাজখাঁই গলায় গর্জে উঠলুম, 'অ্যাই...ঢং রাখ, ওঠ, উঠে বোস—রাস্কেল!'

ও হরি! অ্যাসিস্ট করছি বলে কোথায় প্রসন্ন হবেন—তার বদলে ম্যাডাম একটা গা-শিরশিরে হিম চাউনিতে তাকালেন আমার দিকে—'প্লিজ হোল্ড ইয়োর টেম্পার...দেখছেন তো আপসেট হয়ে পড়েছে ভদ্রলোক!'

'ভদ্রলোক, ম্যাডাম! খুনি শয়তান একটা...।'

'দ্যাট ইজ ইয়েট টু বি প্রুভড, সার!'—মহিলার গলায় বেশ একটা ব্যঙ্গের খোঁচা টের পেলুম—স্টিকিং প্লাস্টারের মতো হাসিটা আটকে রেখেছেন ঠোঁটে, তবুও।

আমিও ছাড়নেওয়ালা নই, গলাটাকে অমিতাভ বচ্চনের মতো ব্যারিটোন করার চেষ্টা করে বললুম, 'সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স তো যথেষ্টই রয়েছে...।'

'সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স ব্যাপারটা খুব গোলমেলে, মিস্টার দাশগুপ্ত। ওর মধ্যে বিস্তর ফ্যালাসির ফাঁকফোকর থাকে। যাক গে, আমরা ওটা নিয়ে পরে আলোচনা করব...। আপাতত আমার আরও কিছু জানার আছে, সেটুকুর মধ্যে প্লিজ আপনি ইন্টারভেন করবেন না।'

দেখলে! একটা খুনের আসামির সামনে কী রকম ইনসাল্ট করলে আমায়! ঠিক আছে, এই আমি মুখে কুলুপ দিলুম, এবার তোমার পাঁঠা তুমি ল্যাজায় কাটো মুড়োয় কাটো, যা তোমার মর্জি!

কমল বিশ্বাসের পিঠে একটু হাত চাপড়ে শ্রীমতী তাকে ফের উঠিয়ে বসালেন। তারপর বললেন, 'কালকের কথাকাটাকাটির ব্যাপারটা একটু ডিটেলস-এ বলুন দেখি।'

ধরা-ধরা গলায় ছোকরা বলতে শুরু করল, 'কাল টিনা দুপুরবেলায় আমার মোবাইলে ফোন করল। বলল, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় মঙ্গলম বিল্ডিংয়ে চলে আসতে। ওই টাকাপয়সাটার ব্যাপারে ফাইনাল ডিসিশন কালই নিতে চাইছিল ও। সেটা নিয়ে একটু তর্কাতর্কি হয়। তার ওপর আমি বলেছিলাম, সাড়ে পাঁচটায় হয়তো আমি পৌঁছোতে পারব না, দশ-পনেরো মিনিট দেরি হবে। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ওয়ান ডে-টা পুরো দেখে তবে যাব। তাতে ও একেবারে ফায়ার হয়ে ওঠে...।'

'কেন?'

'আসলে ও ভীষণ পাংচুয়ালিটি মেনটেন করতে চাইত...একটু ম্যানিয়াগ্রস্তের মতনও লাগত

অনেক সময়। অনেকবার এমন হয়েছে, জাস্ট দু-তিন মিনিট দেরি হয়েছে আমার—ও চলে গেছে সেখান থেকে। বলত, ওর ঘড়ি একদম সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মাপে ঠিক করা থাকে এবং সেটা ও ভীষণ জেদির মতো ফলো করত...।'

'তারপর বলুন।'

'আমি যত বলি তুমি ওটা পৌনে ছ'টা করো অন্তত আজকের জন্যে, কিছুতেই শুনবে না। আমি একটু রেগেমেগে বললাম...বেশ, খেলা দেখবই না তাহলে আজ...।'

'সত্যিই দেখলেন না?'

'না-না, ঠিক তার দশ মিনিটের মাথায় টিনা আমার মোবাইলে একটা এস. এম. এস. পাঠায়। পৌনে ছ'টাতেই টাইমটাকে ফিক্সড করে।...আমার অবশ্য পৌঁছোতে আরও তিন মিনিট লেট হয়েছিল, আর তাই ভেবেছিলাম রাগ করে চলে গেছে হয়তো—তখন কি জানি যে, ও বরাবরের মতো...।'

আবার নিজের বাঁ-হাতে মুখ চাপা দিল ছোকরা। বেড়ে অ্যাকটিং। তবে আমি কিন্তু স্পিকটি নট।

সুবর্ণরেখাও দেখলুম এবার আর সান্ত্বনা-টান্তনার দিকে গেলেন না। বরং যেন একটু অন্যমনস্ক, ভুরু দুটো কুঁচকে ভাবছেন কিছু।

'আচ্ছা, টিনা এই দ্বিতীয়বার সময় দেওয়ার সময় এস. এম. এস. করল কেন?'

'আমিও অবাক হয়েছিলাম। ও বড়-একটা এস. এম. এস. করত না, বলত বোতাম টিপতে-টিপতে হাত ব্যথা হয়ে যায়, তবে ও একটু খামখেয়ালি ছিল, ওর মতিগতি কখন যে কী হত...।'

টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে এলেন সুবর্ণরেখা। 'এস. এম. এস.-টা ডিলিট করে ফেলেননি নিশ্চয়ই?'

কমল বিশ্বাস মাথা নাড়ল,—'না, কোনওদিনই মুছব না ওটা, ওর শেষ মেসেজ...।' গলাটা আবার যেন বুজে এল।

ম্যাডাম সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপাতত এই অবধি থাক। মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি ওকে কাইন্ডলি একটু বাড়ি পৌঁছে দিন...আর ওর মোবাইলটা নিয়ে আসুন বাড়ি থেকে।'

এতটা অবাক লাগল যে, নীরব থাকার সংকল্পটা ভুলে গিয়ে বলে ফেললুম, 'ছেড়ে দিচ্ছেন...?'

হাসলেন শ্রীমতী—'আটকে রাখার মতো সলিড গ্রাউন্ড পেলেই আবার নিয়ে আসতে কতক্ষণ? তবে আমি মনে করি, উনি কোথাও পালাবেন না...কারণ, সেক্ষেত্রে ওঁর পোজিশনটা আরও খারাপই হয়ে দাঁড়াবে। কী কমলবাবু, ঠিক না?'

এর মধ্যেই কয়েক দফা কান্নাকাটিতে ছোকরার মুখচোখ ফুলে থমথম করছে। কথা না বলে ঘাড় নাড়ল শুধু।

॥ চার ॥

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কিন্তু কমল বিশ্বাসের পোজিশনটা সত্যি-সত্যিই আরও ল্যাজেগোবরে হয়ে উঠল দেখা যাচ্ছে। রিপোর্ট বলছে, মৃত্যুর আগে টিনার শ্বাসরোধ করা হয়েছিল—সম্ভবত পড়ার সময় চেঁচাতে পারে, এই সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যেই—এবং গলায় যে-হাতের ছাপটি পাওয়া যাচ্ছে সেটি বাঁ-হাত! ফিংগারপ্রিন্ট অবিশ্যি মেলেনি, দস্তানা পরা ছিল বলেই অনুমান।

কমল বিশ্বাস যে ন্যাটা সেটা সেদিন থানায় বসেই তার হাতের গতিবিধি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। ম্যাডামও লক্ষ করেছেন।

টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছিলেন শ্রীমতী, বেশ অস্থির দেখাচ্ছিল। আমি চুপচাপ সামনে বসে আছি। হঠাৎ যেন স্বগত ভঙ্গিতেই বলে উঠলেন, 'এই ছেলে যদি সত্যিই খুনি হয় তবে আমি আজ পর্যন্ত ম্যান-ওয়াচিং-এর কিচ্ছু শিখিনি, বুঝলেন?'

মনে-মনে বললুম, পথে এসো মহারানি। স্বীকার করো যে, তোমারও ভুল হয়। মুখে বললুম, 'এবার তাহলে অ্যারেস্ট করে আনি?'

চোখ বুজে দুই ভুরুর মাঝখানে তর্জনীটা রেখে পুরো দু-মিনিট ধ্যানস্থের মতো বসে রইলেন শ্রীমতী সুবর্ণরেখা। চোখ খুললেন যখন, দেখি চাউনিটা পুরো পালটে গেছে! কী যেন একটা খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনা চিকচিক করছে চোখে, গোটা মুখটাই যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে হঠাৎ।

লাফিয়ে উঠে আলমারিটার চাবি খুললেন, একটু ঘেঁটেঘুঁটে বার করে নিয়ে এলেন একটা ছোট্ট বাক্স। টিনার মোবাইল—যেটা আমি পেয়েছিলুম, আর সেদিনকার পরা সেই রিস্টওয়াচটা বার করলেন বাক্স থেকে। ঘড়িটা খুব যত্নে এবং সাবধানে মেলে রাখলেন টেবিলের ওপর।

দামি কোম্পানির ঘড়ি। বন্ধ হয়ে আছে। ছোট কাঁটাটা পাঁচ আর ছয়ের মাঝামাঝি, বড় কাঁটাটা ঠিক সাত ছুঁয়েছে। সেকেন্ডের কাঁটাটা একটার কাছাকাছি স্থির।

পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

সুবর্ণরেখা প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'কী বুঝছেন?'

বোকার মতো হাসলুম। কিছুই বুঝছি না যে!

'ওপর থেকে আছড়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়েছিল এই ঘড়ি...' নিরেট ছাত্রকে বোঝাচ্ছেন এমনভাবে বললেন ম্যাডাম, 'অ্যান্ড দ্যাটস দ্য একজ্যাক্ট টাইম অব হার ডেথ!'

এর থেকে কী সুবিধে হবে আমার মাথায় ঢুকছে না। কখন মেয়েটা মরেছে সেটা একজ্যাক্ট জেনে লাভ কী? ওই সময় নাগাদ মরেছে সেটা তো আগেই প্রমাণ হয়েছে। কমল বিশ্বাস এসেছে সাড়ে পাঁচটার কিছুক্ষণ পর, এ তো জানা কথা!

আমার চাউনিটা সম্ভবত আগের মতোই নিষ্প্রভ থেকে গিয়েছিল, সুবর্ণরেখা একটু অধীর গলায় বলে উঠলেন, 'আপনার মনে পড়ছে না কমল বিশ্বাস ক'টায় পৌঁছেছে বলে জানিয়েছিল?'

হ্যাঁ, মনে পড়ছে। পৌনে ছ'টারও তিন মিনিট পর, অর্থাৎ পাঁচটা আটচল্লিশ নাগাদ।

'তার মানে কমল পৌঁছনোর বারো-তেরো মিনিট আগেই...' বলতে গিয়েও মাঝপথে থেমে গেলুম।—'আচ্ছা, কমল তো মিথ্যেও বলতে পারে!'

মাথা নাড়লেন শ্রীমতী।—'পারে। সেটা ভেরিফাই করার দুটো স্টেপ আছে। প্রথমে টেলিকাস্টিং সেন্টারে একটা ফোন করে জানতে হবে, ঠিক কখন ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ম্যাচটা শেষ হয়েছিল সেদিন। আর তারপর...আচ্ছা, আগে প্রথমটাই হোক!'

ফোনের দিকে এগোলেন সুবর্ণরেখা। নাহ, সুতো একটা বার করেছেন ঠিক—ব্রেন আছে মানতেই হবে!

॥ পাঁচ ॥

নার্সিংহোমের কেবিনে ঢোকার আগে একজন ডাক্তার এগিয়ে এলেন। বললেন, 'বেশি এক্সাইটমেন্ট হলে ক্ষতি হবে কিন্তু...।'

সুবর্ণরেখা হাসলেন। হাসিটা অনেকভাবে ব্যবহার করতে জানেন মহিলা। এখন যে-স্মার্ট

হাসিটা প্রেজেন্ট করলেন তার মানেটা দাঁড়ায়—'ডোন্ট ওরি, আই নো মাই বিজনেস।'

মেয়ের মৃত্যুর খবরটা পেয়েই একটা অ্যাটাক হয়ে গেছে তপতী মিত্রর। হার্ট উইক অনেকদিন থেকেই, আচমকা ধাক্কাটা সামলাতে পারেননি। প্রায় এক সপ্তাহ অর্ধ-অচৈতন্য ছিলেন, আজই সবে ডাক্তাররা অনুমতি দিয়েছেন, খুব সংক্ষিপ্ত একটা জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নেওয়া যেতে পারে।

বিছানায় মিশে আছেন শীর্ণকায়া মহিলা। চোখের কোণে গভীর কালি, মুখের রেখায় অসীম হতাশা। জীবিত থাকার কোনও অর্থ খুঁজে না পেলে মানুষের যেমন হয়ে থাকে।

খুব ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না কমল এই কাজ করতে পারে...।'

একটু চুপ করে থেকে মৃদু গলায় সুবর্ণরেখা বললেন, 'আমিও করি না। কিন্তু তাহলে অন্য কে করতে পারে, সে ব্যাপারে যদি একটু অনুমান করেন...।'

মহিলার মুখের পেশিগুলো এই অবস্থাতেও একটু কঠিন হয়ে উঠল যেন। গলার আওয়াজেও পরিবর্তন এল একটা। একইসঙ্গে দুঃখ, ক্ষোভ এবং ঘৃণা মিশলে যা দাঁড়ায়, সেইরকম গলায় বললেন, 'আমার মেয়ের কোনও শত্রু ছিল না—শুধু একজন ছাড়া! ওর এক ক্লাসমেট, রেহানা।...ওকে অনেকবার বলেছে, তোর মৃত্যু দেখে ছাড়ব। শেষ করে ফেলব তোকে।...আমি আপনাকে বলছি অফিসার, ওই শয়তান মেয়েটা ছাড়া এ কাজ আর কারও নয়। ওই রাক্ষুসি রেহানাই ওকে...।'

তীব্র হয়ে উঠছিল তপতী মিত্রর গলার আওয়াজ সুবর্ণরেখা কপালে হাত বুলিয়ে ঠান্ডা করতে লাগলেন।

খুব শান্তভাবে প্রশ্নগুলো ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন সুবর্ণরেখা।

'রেহানা...কোথায় থাকে?'

তপতী বললেন,—'বাজার পেরিয়ে যে শেখপাড়া আছে, সেখানেই কোথায় বাড়ি শুনেছি...।'

'কিন্তু, কী এমন শত্রুতা থাকতে পারে যার জন্যে...।'

'ওই মেয়ের দারুণ হিংসে ছিল, কমলকে নিয়ে...। ও প্রপোজ করেছিল কমলকে, কমল রাজি হয়নি...। সেই থেকে আমার মেয়ের ওপর ওর আক্রোশ। বলেছিল, কিছুতেই পেতে দেবে না কমলকে...।'

সেই ট্র্যাঙ্গল। সত্যি, সেই এক ফুল দো মালির গপ্পো নিয়ে দুনিয়াভর যে কত খুনখারাপি হয়ে আসছে চিরটাকাল—এত দিন পুরুষরাই তাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে এসেছে বেশিরভাগ, এখন দেখছি মেয়েরাও কম যায় না! সত্যিই যদি এই রেহানা মেয়েটা টিনার পিছন-পিছন গিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে...।

হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে কী একটা চিড়িক দিয়ে উঠল। প্রায় লাফিয়ে উঠে বলতে যাচ্ছিলুম, 'ম্যাডাম, ওই সমীর বলে ছেলেটা কিন্তু বলেছিল টিনা ওপরে উঠে যাওয়ার পরই একজন...।'

সুবর্ণরেখা ঝটিতি থামিয়ে দিলেন মাঝপথে—'আচ্ছা-আচ্ছা, ওটা আমরা ভালো করে খাতিয়ে দেখব...কিন্তু মিসেস মিত্র, আমার আরও দু-একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল।'

'বলুন।'

'টিনার বাবা মারা গেছেন কতদিন হল?'

'সাত বছর।'

'ন্যাচারাল ডেথ?'

একটু নীরব থেকে আস্তে-আস্তে বললেন তপতী, 'না। স্লিপিং পিল খেয়েছিলেন।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ সুবর্ণরেখা। তারপর বললেন, 'এ-প্রশ্নটা কিন্তু ভীষণ ব্যক্তিগত।....আপনার

সঙ্গে কোনও মনোমালিন্য হয়েছিল কি? যতদূর জানি উনি সব সম্পত্তি মেয়ের নামে লিখে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, উনি আমাকে সন্দেহ করতেন। ভাবতেন, আমার কোনও এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ার আছে...। এক ধরনের মানসিক রোগ আসলে। শেষ দিকটায় চূড়ান্ত অশান্তি হত—। তারপর একদিন ওই কাণ্ড ঘটালেন...।'

'আপনি আপনার ভাইয়ের বাড়িতে এসে উঠলেন কবে?'

'তারও বছর তিন পরে। যখন থেকে আমার হার্টের অসুখটা ধরা পড়ল। মেয়েটাও বড় হচ্ছিল, অভিভাবকের মতো একজন কাউকে দরকার হচ্ছিল খুব...।'

'বাই দ্য ওয়ে, বিনোদবাবু বিয়ে-থা করেননি?'

'না, আর করবেও না বলেছে। বয়েসও তো হল চল্লিশের ওপর...।'

'উনি কী করেন? মানে, প্রফেশন...।'

'বাসস্ট্যান্ডের কাছে ওর দোকান, লন্ড্রি...। "স্ট্যান্ডার্ড ডায়ার্স অ্যান্ড ক্লিনার্স" নাম...।'

উঠে পড়লেন ম্যাডাম। উঠতে-উঠতে বললেন, 'শেষ প্রশ্ন। গত সপ্তাহে টিনা আঠেরোয় পড়েছিল। ওর বাবার রেখে যাওয়া সমস্ত টাকাপয়সা ওর অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই, ব্যাংক থেকে জেনেছি আমরা। অ্যামাউন্টটা আপনি জানেন কি?'

'জানি। সাড়ে আট লক্ষ টাকা। টিনা ওই অ্যাকাউন্টে আমার নামটাও ইনক্লুড করাতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। সেই মানুষটা যখন আমাকে বাদই দিয়েছেন, ও-টাকার সঙ্গে আমি সংস্রব রাখতে পারি না।'

'কিন্তু এখন তো নিয়ারেস্ট কিন হিসেবে আপনিই ওই টাকার...।'

থামিয়ে দিলেন তপতী। এই প্রথম তাঁর চোখে জল দেখলাম। ফোঁপাতে-ফোঁপাতেই বললেন, 'ও-টাকা আমি ছোঁব? তিনি উইলে কী কন্ডিশন দিয়েছিলেন জানেন? যদি আঠেরোয় পৌঁছোনোর আগে টিনার ভালোমন্দ কিছু হয়—ওই টাকা ভারত সেবাশ্রম সংঘে চলে যাবে!...এতখানি বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর আমার ওপর। ও-টাকা আমি ভারত সেবাশ্রমেই দিয়ে দেব... মেয়েই চলে গেল, টাকা নিয়ে আমি কী করব?'

আবার একবার তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করে দরজার দিকে এগোলেন সুবর্ণরেখা।

এই তপতী মিত্রর অবস্থাটা দেখে আমার সত্যিই ভারী দুঃখ হচ্ছিল। আহা—স্বামী ওইভাবে গেছেন, আর একমাত্র সম্বল মেয়েটা এইভাবে...।

দরজা থেকে আর একবার পিছন ফিরলেন মিস সেন।

'আচ্ছা, টিনা লেখাপড়ায় কেমন ছিল মিসেস মিত্র? বিশেষ করে ইংরেজি বা অঙ্কে...।'

একটু করুণ হাসি ফুটে উঠল যেন ক্লিষ্ট মুখটায়—'যে-দুটো নাম করলেন...ওই দুটোতেই ভীষণ কাঁচা ছিল। বলত অঙ্ক যেন আমার কাছে বাঘ, আর ইংরেজিতে তিনের কোঠা পেরত না...।'

সুবর্ণরেখাও দেখলাম কেমন অদ্ভুত একটা হাসি ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'ওহ্ হো, তাই? আচ্ছা, আজ আসি, নমস্কার।'

মাঝে-মাঝে এনার ভাবগতিক সত্যিই বেজায় দুর্বোধ্য লাগে আমার। কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে যান! কিছু বোঝা যায় না। অবিশ্যি পণ্ডিতেরা তো বলেইছেন, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম...!

জিপে বসে থানায় ফিরছি। ম্যাডাম সিটে হেলান দিয়েছেন, চোখ দুটো বোজা। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে অল্প-অল্প। এইরকম দু-একটা দুর্লভ মুহূর্তে ভারি নরমসরম দেখায় প্রোফাইলটা,

ঝাঁঝালো ডাঁটিয়াল ভাবটা অদৃশ্য হয়ে যায় ম্যাজিকের মতো।

মহিলাকে ইদানীং আর ততটা যেন অসহ্য লাগে না আমার। একটু-একটু পছন্দই হতে শুরু করেছে বুঝি-বা।...মেল শভিনিজমটা আর ততখানি ফুঁসে উঠছে না ভেতরে। একটা কারণ হতে পারে, মহিলা যে আমার থেকে অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন সেই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকেছে। পালটা চালবাজি দিয়ে এনাকে ডাউন দেওয়া যাবে না। আর নিজের কাজের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। ঘোষালসাহেবের থেকে অন্তত দশগুণ এফিশিয়েন্ট, স্বীকার করতেই হবে। আমার অ্যাটিটিউডের এই পরিবর্তন বোধহয় উনিও টের পান সিক্সথ সেন্স দিয়ে। আগের মতন অতটা তেরছাভাবে বা ঠান্ডা গলায় কথা বলেন না দেখি। মাঝেমধ্যেই হাসেন-টাসেনও আজকাল। চুপিচুপি বলছি—হাসিটা কিন্তু ভারী ঝকঝকে আর ইমপ্রেসিভ।...আরে না, এর মধ্যে অন্য কোনও মিনিং নেই, আমি সবসময় মনে রেখে চলি যে, শি ইজ মাই বস! যথেষ্ট বিনয়ও বজায় রাখি।

এখনই যেমন, খুব মোলায়েম গলায় বললুম, 'ম্যাডাম, একটা কথা বলব?'

চোখ মেললেন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

একটু গলাখাঁকরে বলি, 'এই রেহানা মেয়েটাকে তো একটু কালচার করে দেখতে হচ্ছে। সেই যে বোরখা-পরা মহিলার কথা শোনা গিয়েছিল...আর এই যে ইনফরমেশন আজ পাওয়া যাচ্ছে—এ দুটো তো লিংকড!'

'হতে পারে...' একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন সুবর্ণরেখা।

'কিন্তু তাহলে কমল বিশ্বাসের কেসটা...।'

'কমল যে ক্রিকেট ম্যাচটার কথা বলেছে, খবর নিয়ে দেখেছি সেটা শেষ হয়েছিল পাঁচটা চল্লিশে। সত্যিই যদি ও ম্যাচটা পুরো দেখে তবে বেরিয়ে থাকে...তাহলে ও ইনোসেন্ট। কারণ, খুনের সময়টা আমরা জেনেছি, পাঁচটা পঁয়তিরিশ। কিন্তু যদি...।'

'যদি ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে গিয়ে...।'

'হুম।'—চিন্তিত দেখাচ্ছে শ্রীমতীকে, 'কমলের মোটিভটা নিয়েও আমার ধন্দ লাগছে। টিনা অতগুলো টাকা ওকে দিতে চাইছিল, সেটা রিফিউজ করে কমল ওকে খুন করতে যাবে কেন?'

'রেহানার কিন্তু মোটিভ ছিল। জেলাসি...।'

'সেটা মেয়েটার মুখোমুখি না হয়ে, কথা না বলে, ডিসাইড করা যাবে না। আপাতত সমস্ত পসিবিলিটিই ওপেন রাখা চাই—কোনও প্রি-কনভিকশন নিয়ে এগোনো ঠিক নয়। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি যে, কেসটি সরল সিধে নয়। দ্য প্লট ইজ থিকেনিং!'

॥ ছয় ॥

এক-একজন মানুষকে দেখলেই মনে হয়, ইস—এই সামান্য খুঁতটুকু না থাকলেই এ একেবারে পারফেক্ট হত। হয়তো নাকটা একটু শুধু থ্যাবড়া, কিংবা নীচের ঠোঁটটা একটু বেশি পুরু, বা গায়ের রংটা যেন বড্ড চাপা...এইটুকুই যদি রেকটিফাই করা যেত—সর্বাঙ্গসুন্দর যাকে বলে, তাই হয়ে উঠতে পারত।

রেহানা সুলতানাকে দেখে প্রথমেই এরকম একটা আপশোসের অনুভূতি হল আমার। অসাধারণ সুন্দরী যাকে বলে, এ-মেয়েটি তাই। কাটা-কাটা চোখ-মুখ, চমৎকার ফরসা রং, চুলের কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দুই-ই একদম ফার্স্ট গ্রেডের। মুখে একটা দারুণ তেজিয়ান ভাব। কোনও কিছুতেই ঘাবড়ায় না এই মেয়ে। এক কথায় অনিন্দ্যসুন্দরী বলা যেত, যদি হাইটটা

স্ট্যান্ডার্ড হত।

হ্যাঁ, ওইটাই রেহানার মাইনাস পয়েন্ট। গড়পড়তার মাপেও বড্ড বেঁটে। হার্ডলি চার সাত কী চার আট!...ইঞ্চি চার-পাঁচ বেশি হলে ফিল্মস্টার হয়ে যেতে পারত অনায়াসে।

মুখের তেজিয়ান ভাবের কথা বলছিলাম। কথাবার্তাতেও সেই ঝাঁঝ প্রকট। ম্যাডাম যখন জিগ্যেস করলেন, 'ষোলো তারিখ বিকেলে আপনি কোথায় ছিলেন?'—চোখের পাতা না ফেলে স্ট্রেট তাকাল, 'বিছানায়। ভাইরাল ফিভার। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লাগলে দেখাতে পারি।'

বসে আছি রেহানাদের বৈঠকখানায়। রেহানার বাবা শেখ আবিদ আলি অতি সজ্জন ভদ্রলোক। চমৎকার শরবত খাইয়েছেন। মেয়েকে ভেতর থেকে ডেকে পাঠানোর আগে বারবার আমাদের বুঝিয়েছেন যে, তাঁর মেয়ে একটু মেজাজি, কিন্তু এই কাজ তার পক্ষে অসম্ভব। এখনও প্রত্যেক কথাতেই মেয়েকে ঢেকে-ঢুকে শান্ত করে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মেয়ে যেন জ্বলন্ত আগুনের শিখা, লকলকিয়ে উঠছে থেকে-থেকেই!

'আপনি টিনাকে খুন করবার হুমকি দিয়েছিলেন?' খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন সুবর্ণরেখা।

'হ্যাঁ। এবং তার জন্যে আমি অনুতপ্ত নই। ও আমাকে আমাদের জাত তুলে, ধর্ম তুলে, গালাগাল দিয়েছিল। অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির মেয়ে ছিল, কুটিল মন। শি ডিজার্ভড সাচ অ্যান এন্ড।'

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন আবিদ আলি—'আহ্, কীসব যা-তা বলছিস! ছেড়ে দে না, যা হওয়ার হয়ে গেছে...।'

সুবর্ণরেখার মুখে সেই স্টিকিং প্লাস্টারের মতো সাঁটা হাসি। স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, রেহানা, আপনি বোরখা পরেন?'

'হ্যাঁ, অকেশনে পরি। কেন?'

'নাহ্ এমনিই।' উঠে দাঁড়ালেন সুবর্ণরেখা। তারপরই অদ্ভুত একটা কাণ্ড করলেন। হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে নিজের বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

রেহানা একটু থতমত খেল, কোন হাতটা বাড়াবে ঠিক করতে পারল না। অবাক চোখে তাকাল ম্যাডামের দিকে।

ম্যাডাম একটু যেন অপ্রস্তুতের মতো হাসলেন, বললেন, 'ওহ্ হো, সরি...' তারপর ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন। এবার রেহানারও ডান হাতটা এগিয়ে এল। হ্যান্ডশেক করলেন সুবর্ণরেখা। আমার দিকে একবার তাকালেন। আমি একটু হাসলাম।

বেরিয়ে এসে বললুম, 'ন্যাটা তো নয় দেখলুম। তবে ম্যাডাম, ও-মেয়ে কিন্তু খুন করতেই পারে! কী ফোঁসফোঁসানি, বাপ্স!'

'হুম, সুন্দরী মেয়েরা রিফিউজড হলে, বা অন্যের কাছে হেরে গেলে, পাগল হয়ে যায়...', ম্যাডাম হাসলেন, '...তবে ওর অ্যালিবাই আছে একটা, অসুস্থ ছিল—বাড়ির লোক সাক্ষ্য দেবে। যদিও সেই সাক্ষ্যর ভ্যালিডিটি সম্পর্কে সন্দেহ করা যেতেই পারে।'

'তাহলে কী দাঁড়াল?'

কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন শ্রীমতী সুবর্ণরেখা, তারপর বললেন, 'আমি একটু এদিক-ওদিক ঘুরে থানায় যাব। দু-একটা জায়গায় খোঁজ নেওয়ার আছে। আপনি এক কাজ করুন, তপতী মিত্র কাল বাড়ি ফিরেছেন, বিনোদবাবুও বাড়িতে আছেন এখন নিশ্চয়ই—একবার ওঁদের দেখে আসুন।...আর হ্যাঁ, একটা ভাইটাল কথা মাথায় রাখবেন। এই যে বোরখা-পরা মহিলার কথা শোনা গেছে, এ ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করবেন না। সেদিন নার্সিংহোমে তো বলেই ফেলছিলেন প্রায়, থামিয়ে না দিলে কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। মনে রাখবেন, বোরখা-র "ব"-ও নয়!'

॥ সাত ॥

সন্ধে থেকেই লোডশেডিং আজকে। টেবিলের ওপর বসানো মোমবাতিটার মৃদু আলোয় ঘরটার মধ্যে অদ্ভুত একটা রহস্যময় পরিবেশ ঘনিয়ে উঠেছে যেন। আমার তো মাঝে-মাঝেই রোমাঞ্চ হচ্ছে রীতিমতো। এইরকম আলো-আঁধারিই বুঝি জটিল রহস্যের জাল খোলার জন্যে একদম আইডিয়াল সেটিং।

টেবিলের এপাশে বসে-থাকা সুবর্ণরেখার মুখখানা অবশ্য দেখছি আশ্চর্যরকমের প্রশান্তিতে ভরপুর, সামান্য টেনশনও নেই যেন। কিন্তু ওপাশে যারা?...খুঁটিয়ে ওয়াচ করলাম, এক-একজনের ভাব এক-একরকম—বেশ ইন্টারেস্টিং স্টাডি-মেটিরিয়াল।

দু-সারি চেয়ার পাতা হয়েছে টেবিলের ওপাশটায়। প্রথম সারিতে কমল বিশ্বাস, তপতী মিত্র এবং রেহানা সুলতানা। দ্বিতীয় সারিতে বসে আছেন এঁদের যাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন থানায়—কমলের বাবা নারায়ণ বিশ্বাস, টিনার মামা বিনোদবাবু এবং রেহানার বাবা আলিসাহেব। এঁদেরও পিছনে দুটো টুলের ওপর বসেছেন দুজন—একজনকে আমি ঠিক চিনি না, সুবর্ণরেখারই পরিচিত কেউ হবেন। অন্যজন 'মঙ্গলম' বিল্ডিংয়ের সেই তরুণ দোকানদার, সমীর কর্মকার।

মোমের আলো পড়েছে প্রথম সারির মুখগুলোতে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—কমল যেন কিছুটা সংকুচিত, তপতী মিত্র একটু বিহ্বল মতো, রেহানার মুখে বিরক্তি। তার পিছনের সারিতে....কমলের বাবার বেশ ভয়-ভয় ভাব। বিনোদ শাসমল বেশ ক্যাজুয়াল এবং আবিদ আলি—দৃশ্যতই উদ্বিগ্ন। একদম শেষে বসা দুজনের মুখ অস্পষ্ট আলোয় আবছা লাগছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

আজ এঁদের সকলকে বিশেষভাবে ডেকে আনা হয়েছে এখানে।

'এই কনফারেন্স-পদ্ধতিটা মাঝেমধ্যে খুব কাজ দেয়, ফেলুদার ফেভারিট স্টাইল—জানেন তো?'—ম্যাডাম হাসতে-হাসতে বলেছিলেন। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসলে নাকি পারস্পরিক বক্তব্যগুলোর ঠোকাঠুকিতে মিথ্যের খোলস ভেঙে সত্যির শাঁসটুকু সহজে বেরিয়ে আসে। ....আমি অবিশ্যি ব্যাপারটার মধ্যে যে সাসপেন্সের শিরশিরানি আছে, সেটুকুই এনজয় করছি আপাতত। এইটুকু বুঝতে পারছি শুধু, সুবর্ণরেখার একটা পরিষ্কার প্ল্যানিং আছে পুরো প্রোগ্রামটার ব্যাপারে—কিন্তু মহিলার মন্ত্রগুপ্তির ক্ষমতাটাও অসাধারণ! আমি হাজার হোক ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট তো বটে...কিন্তু নিপুণভাবে আমাকে অবধি অন্ধকারে রেখেছেন। না, তার জন্যে আমি অবিশ্যি অফেন্স নিচ্ছি না, শি নোজ হার বিজনেস।

সুবর্ণরেখা উঠে দাঁড়ালেন, দীর্ঘ ছায়া পড়ল পিছনের দেওয়ালে।

'আজ আমরা জানার চেষ্টা করব ঠিক কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল টিনার। প্রথমেই তপতীদেবীর কাছে আমি মাপ চাইছি, অসুস্থ শরীরে এখানে টেনে আনার জন্যে। এই ধরনের পরিস্থিতিগুলোতে মানসিক উত্তেজনাও তৈরি হয়—যা হার্ট পেশেন্টের পক্ষে হার্মফুল, আমি জানি। তাই আমি আমার বন্ধু ডাক্তার অনিমেষ চক্রবর্তীকে এখানে আনিয়ে রেখেছি ব্যক্তিগত অনুরোধে —ও একজন অভিজ্ঞ কার্ডিয়োলজিস্ট। আপনার মিনিমাম ট্রাবল হলেই, হি উইল অ্যাটেন্ড আপন ইউ।'

পিছনের টুলে চুপচাপ বসে ছিলেন যে-অচেনা ভদ্রলোকটি, তিনি তপতী মিত্রর দিকে তাকিয়ে হেসে নমস্কার জানালেন। আমি মনে-মনে ম্যাডামের বিবেচনার তারিফ করলুম। আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছেন শ্রীমতী।

আবার সুবর্ণরেখা। বাক্স খুলে বার করলেন টিনার ভাঙা মোবাইল, আর বন্ধ হয়ে যাওয়া হাতঘড়ি। 'মিসেস মিত্র, আপনি কি এই মোবাইলটা শনাক্ত করতে পারবেন? এটা আমরা স্পটে পেয়েছি, টিনার হতে পারে, অন্য কারোরও...।'

তপতী মিত্র একটু দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, ওইরকমই তো অনেকটা...আসলে আমি

মোবাইল ব্যবহার করি না, মানে ঠিকমতো জানিও না সবকিছু, আমার ভাই মোবাইল ইউজ করে, ও হয়তো...।'

'বিনোদবাবু কি একটু দেখে-টেখে বলতে পারবেন, এটা আপনার ভাগনির মোবাইল কি না?'

নেড়েচেড়ে দেখে বিনোদ শাসমল মাথা নাড়লেন। মোবাইল টিনারই।

'অনেক ধন্যবাদ, দুজনকেই—' হাসলেন সুবর্ণরেখা, 'ইন ফ্যাক্ট এই একটা তথ্যই আমার জানতে বাকি ছিল। এবার আমরা মূল পয়েন্টে চলে যাব।'

ঘরে থমথমে নিস্তব্ধতা। অনেকের নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে মনে হচ্ছিল।

'এই কেসের তদন্তে নেমে প্রথমে কমলকেই আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট মনে হয়। জানা গেছে, দুপুরে সে টিনার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। টিনা যে-সময়ে মারা গেছে, সেই সময় নাগাদ সে "মঙ্গলম" বিল্ডিংয়ে এসেছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল বলেও খবর পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা টিনার বন্ধ-হয়ে-যাওয়া এই ঘড়ির সাক্ষ্য থেকে খুব ভাইটাল একটা তথ্য জানতে পারি—টিনাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে পাঁচটা পঁয়ত্রিশে। আর ক্রিকেট ম্যাচ দেখে কমল তার পাড়ার ক্লাব থেকে বেরিয়েছে ঠিক পাঁচটা চল্লিশে। "ভাই-ভাই সংঘ"-এর অন্তত কুড়িজন মেম্বার সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এবং তারা শেখানো উইটনেস নয়। তাদের অনেকে কমলের প্রতি বেশ হোস্টাইল। তারা চায় কমলের পানিশমেন্ট হোক! কিন্তু ম্যাচ শেষ হতে তবেই সে ক্লাব থেকে বেরিয়েছে—এতে কারও দ্বিমত নেই। দ্যাট প্রুভস হিজ ইনোসেন্স।'

কমল এতক্ষণে মুখ তুলল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। সুবর্ণরেখা মৃদু হাসলেন।

'মিসেস মিত্রর বয়ান থেকে জানতে পারি, রেহানা টিনাকে "শেষ করে দেবে" বলেছিল। ট্র্যাঙ্গল লাভের ঘটনা। এবং আমাদের এক সাক্ষীর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী, ঠিক খুনের সময়টিতেই এক মুসলিম মহিলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠেন এবং কিছুক্ষণ পরে নেমে আসেন। এই দুই বয়ান একসঙ্গে রাখলে রেহানার ওপর স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ পড়ে। কিন্তু রেহানাকে চাক্ষুষ দেখামাত্র আমার সে সন্দেহ উবে গিয়েছিল।'

'কেন, উবে গিয়েছিল কেন?'—একটু যেন কঠিন স্বরে জানতে চান তপতী মিত্র।

'তার কারণ, সেদিন যে-মহিলাকে আমাদের সাক্ষী দেখেছে, তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকলেও তাঁর হাইটটা লুকোনোর মতো নয়! মেয়েদের হাইটের বিচারে তিনি যথেষ্ট দীর্ঘাঙ্গী। ...সমীরবাবু, রেহানার হাইটের সঙ্গে তাঁর হাইট মেলে কি?'

সমীর কর্মকার উঠে দাঁড়াল, 'না ম্যাডাম, অন্তত দশ-বারো ইঞ্চির তফাত।'

'এই হিসেব অনুযায়ী রেহানাও লিস্ট থেকে বাদ পড়ে যায়। তখন আমি ফোকাসটা চেঞ্জ করি। টিনার হত্যার পিছনে ট্র্যাঙ্গল লাভের বদলে অন্য কোনও মোটিভ কি থাকতে পারে না? ...হ্যাঁ, অন্য মোটিভও আছে এবং সেটা যথেষ্ট জোরালো। টিনার বাবার রেখে যাওয়া সাড়ে আট লক্ষ টাকা মাত্র কয়েকদিন আগে তার হাতে এসেছিল। সেই টাকা টিনা তার ভালোবাসার মানুষ কমলকে দিতে চায়। কিন্তু দেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হল, না, তাকে মেরে ফেলা হল?...এমন কি কেউ আছে, যে চায় না ওই টাকা অন্য কেউ পাক? টু বি প্রিসাইজ, কে লাভবান হচ্ছে টিনার মৃত্যুতে?'

হঠাৎ চুপ করে গেলেন সুবর্ণরেখা। টিক-টিক করে সেকেন্ডগুলো কাটছে, কারও মুখে কথা নেই। এমন সময় তপতী মিত্র খুব আস্তে-আস্তে বললেন, 'টাকাগুলো দাবি করতে পারে, আইনত সে ব্যক্তি একজন আছে। টিনার মা!...আপনি কি বলবেন, আমি মেরেছি আমার মেয়েকে?'

গম্ভীর গলায় সুবর্ণরেখা বললেন, 'রেয়ারেস্ট ক্রাইম, কিন্তু ইমপসিবল নয়। বাবা-মা'র

হাতে সন্তানের হত্যার নজির ইতিহাস ঘাঁটলে...।'

আচমকা উঠে দাঁড়ালেন বিনোদ শাসমল। 'অফিসার, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? একজন হার্ট পেশেন্ট, তার ওপর বিরিভিং মাদার—তার সম্বন্ধে আপনি...।'

'বিরিভিং...মাদার...!'—একটু কেটে-কেটে, ঈষৎ রসিকতার সুরেই যেন বিনোদবাবুর শব্দপ্রয়োগের প্রশংসা করলেন ম্যাডাম, 'আপনার ইংরেজি ভাষায় বেশ দখল আছে, তাই না মিস্টার শাসমল? লোকে বলে নরানাং মাতুলক্রমঃ...কিন্তু আপনার ভাগনি টিনা শুনেছি বেদম কাঁচা ছিল ওই সাবজেক্টে।'

প্রসঙ্গটা হঠাৎ ঘুলিয়ে যেতে একটু যেন হতভম্ব হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। 'হ্যাঁ...কিন্তু হঠাৎ এসব কথা আবার...।'

'হঠাৎ নয়। খুবই প্রাসঙ্গিক কথা এগুলো, মিস্টার শাসমল! খুন হওয়ার দিন দুপুরে, কমলের সঙ্গে মোবাইলে তর্কাতর্কির মিনিট দশেক পরেই, টিনার মোবাইল থেকে একটা এস. এম. এস. যায় কমলের মোবাইলে। শুনে থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আমার, কারণ টিনা এস. এম. এস. করতে পছন্দ করত না...তা ছাড়া একটু আগে তো কথাই বলেছে সে! পরে কমলের মোবাইলে সেভ করে রাখা মেসেজটা দেখে আমি নিঃসন্দেহ হই। ইংরেজিতে তিরিশ পাওয়া কোনও ব্যক্তি ওই ইংরেজি ফ্রেম করতেই পারবে না! ...অর্থাৎ টিনার মোবাইল থেকে ওই এস. এম. এস. গিয়েছিল—কিন্তু পাঠিয়েছিল অন্য লোক।'

'ক্-কী বোঝাতে চাইছেন?' প্রাথমিক বিহ্বলতাটা কাটিয়ে তেড়েফুঁড়ে উঠলেন বিনোদ শাসমল।

'সেটা আপনি ইতিমধ্যেই চমৎকারভাবে বুঝে গেছেন। টিনার সাময়িক অনুপস্থিতিতে ওই এস. এম. এস.-টি পাঠিয়েছেন হয় টিনার মা...নয়তো আপনি। এবং আজ সর্বপ্রথমেই আমি যাচাই করে দেখে নিয়েছি, তপতীদেবী মোবাইল ব্যবহার করতে জানেন না!'

নিজেকে সামলে নিয়েছেন বিনোদ শাসমল। বেশ আত্মবিশ্বাসী একটা হাসি ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'অতএব রইল বাকি এক। হাঃ হাঃ! আমি খামোখা টিনার লাভারকে মেসেজ পাঠাব কেন—আমার কি মাথা খারাপ হয়েছিল ওই দশ মিনিটের মধ্যে?'

'দশ মিনিট নয়, আজ চার বছর ধরে আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে আছে...' ইস্পাত কঠিন গলাটা যেন ঝনঝনিয়ে উঠল, ডান হাতের তর্জনী ইঙ্গিত করে বললেন সবুর্ণরেখা, 'লোভ! কয়েক লক্ষ টাকার লোভ আপনাকে উন্মাদ করে রেখেছিল, নাহলে এত ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে নিজের দিদির একমাত্র সন্তানকে...।'

অস্ফুট একটা শব্দ করে তপতী মিত্র ছটফটিয়ে উঠলেন। ডাক্তার অনিমেষ রেডি ছিলেন, ছোট্ট একটা ট্যাবলেট পুরে দিলেন জিভের তলায়, বললেন, 'ভয় নেই, কুল ডাউন!'

বিনোদ শাসমল ফুঁসে উঠলেন এবার। 'দেখছেন আপনাদের পাগলামির ফলে আমার দিদি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? আমরা এক্ষুনি চলে যাব এখান থেকে। আপনাদের এই ফার্স দেখার আগ্রহ নেই আমার!'

'সিট ডাউন অ্যান্ড ডোন্ট মুভ!' —গর্জে উঠলেন শ্রীমতী সুবর্ণরেখা (অনেকদিন পর আবার সেই হিম কণ্ঠস্বর!)—'চাইলেই কি যাওয়া যায়, মিস্টার শাসমল? আগে যে গল্পটা পুরো শুনতে হবে!'

'কী গ্রাউন্ড আছে আপনার, আমাকে ইনক্রিমিনেট করার?' বিনোদ তবু নুইতে রাজি নন।

'শুনুনই না পুরোটা, তারপর নিজেই ঠিক করবেন!' গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে ম্যাডাম শুরু করলেন, 'এ-গল্পের শুরু টিনার বাবাকে দিয়ে। ভদ্রলোক কোনও এক তীব্র অভিমানে সুইসাইড করেন, সমস্ত টাকাপয়সা মেয়ের নামে উইল করে দিয়ে। পাছে এ-টাকা অন্য কেউ হাতিয়ে নেয়—

সন্দেহটা অবশ্য তপতীদেবীকেই করেছিলেন ভদ্রলোক—উইলে শর্ত দিয়ে যান, আঠেরো বছরে পৌঁছোনোর আগে যদি টিনার মৃত্যু হয়, টাকা চলে যাবে ভারত সেবাশ্রমে। টিনা অবশ্য নির্বিবাদেই আঠেরোয় পৌঁছল, কিন্তু সে বা তার মা জানত না, এই টাকার ওপর রাহুর দৃষ্টি পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিনোদবাবু এই টাকাটাকে টার্গেট করে আছেন। তাঁর মতলব ছিল ভাগনির হাতে টাকা এসে পড়ার পর ভুলিয়ে-ভালিয়ে আস্তে-আস্তে সেটা গ্রাস করবেন। কিন্তু খেয়ালি টিনা হঠাৎই ঠিক করে, পুরো টাকাটা সে তার প্রেমিককে দিয়ে দেবে। আচমকা প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার উপক্রমে বিনোদবাবু মরিয়া হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন, আপাতত টিনাকে সরিয়ে দিয়ে টাকা বেহাত হওয়াটা রুখবেন। হার্ট পেশেন্ট দিদির ব্যবস্থা পরে ভেবে দেখলেও চলবে। এবং চমৎকার সুযোগও মিলে গেল। শুনতে পেলেন মোবাইলে তর্কাতর্কি চলছে—টিনা বলছে, সাড়ে পাঁচটার পর এক মিনিটও সে অপেক্ষা করবে না, চলে আসবে 'মঙ্গলম' বিল্ডিং থেকে।...বিনোদবাবু একটু পরেই ফাঁক পেলেন। টিনা ঘরে ছিল না—তার মোবাইলটা থেকে কমলকে এস. এম. এস. করলেন, পৌনে ছ'টায় এসো। মানে পরিষ্কার পনেরো মিনিটের একটা গ্যাপ তৈরি করে নিলেন!'

'বাঃ, বেড়ে কল্পনাশক্তি! রহস্য উপন্যাস লিখুন না, হটকেক হয়ে যাবে...' বিনোদ শাসমলের ঠান্ডা প্রতিক্রিয়া দেখে চমকে উঠলুম আমি। লোকটার নার্ভ আছে বটে!

'উপন্যাসের উপসংহারটা আগে শুনুন, তারপর হাততালি দেবেন!' ম্যাডাম ততোধিক হিমশীতল, 'সাড়ে পাঁচটার টাইম মেনটেন করবে বলেই টিনা বাড়ি থেকে বেরোয়। তার মিনিট দু-তিন পরেই, আপনিও তার পিছু নেন। পথের মধ্যে কোনও সুবিধেমতো নির্জন জায়গায় আপনি একটা ছদ্মবেশ পরে নেন, মহিলার পোশাক।...ওইখানটাতেই আপনার মাস্টার স্ট্রোক! আমি প্রথমে লম্বা মহিলার খোঁজে নেমে পড়েছিলাম। তারপর হঠাৎ খেয়াল হল, লম্বা মহিলার হাইট ইজ ইকুয়্যাল টু মাঝারি উচ্চতার পুরুষ! আপনার হাইট কত বিনোদবাবু? সাড়ে পাঁচ এর মতন, তাই না?'

'তাতেই প্রমাণ হল আমিই খুনি? সাড়ে পাঁচ হাইটের পুরুষ দুনিয়ায় কত কোটি আছে জানেন?'

'নিশ্চয়ই! কিন্তু উপন্যাস এখনও শেষ হয়নি যে! ছদ্মবেশ পরে, টিনার দু-মিনিট পরেই আপনি বিল্ডিংয়ের ওপরে উঠে যান এবং অতর্কিতে তার শ্বাসরোধ করে, নিঃশব্দে পিছনদিকের পরিত্যক্ত ঝোপঝাড় জঞ্জালে ফেলে দেন। বাঁ-হাতটির ব্যবহারও পরিকল্পনামাফিকই করেন, যাতে কমল ফেঁসে যায়; আপনি জানতেন আপনার ভাগনির প্রেমিকটি ন্যাটা। আর ছদ্মবেশের পোশাকটির জন্যেও আপনাকে খুব একটা মাথার ঘাম ফেলতে হয়নি। আপনার লন্ড্রিতে ওরকম বিস্তর জিনিস কাচতে দেয় লোকে...।'

'ডাহা মিথ্যে কথা!'—চিৎকার করে প্রতিবাদ করলেন বিনোদ, 'আজ পর্যন্ত একটা বোরখাও কাচতে দেয়নি কেউ আমার লন্ড্রিতে...।'

কথাটা বলে ফেলেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সুবর্ণরেখা স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে, ঠোঁটের কোণে একটা অদ্ভুত হাসি! যুদ্ধজয়ের ভঙ্গি যেন।

'তাহলে ভুলটা শুধরেই দিলেন, বিনোদবাবু! এবার তবে বোরখাটা কোন দোকান থেকে কিনেছিলেন সেটাও আপনিই বলুন।'

দাঁতে-দাঁত চেপে সম্ভবত নিজের নির্বুদ্ধিতাকেই একবার ধিক্কার দিলেন বিনোদ শাসমল। তারপর, ট্রেনারের চাবুকের সামনে বশীভূত বাঘের মতো, তাঁর মাথাটা নীচু হয়ে গেল। মুখ ঢাকলেন দু হাতে।

খেলাটা ততক্ষণে ধরে ফেলেছি আমি—বহু পুরোনো সাইকোলজিক্যাল ট্রিক, কিন্তু তুখোড়

শয়তানও চকিতে ফেঁসে যায় এই ছোট্ট চালে। অপরাধের গল্পটা শোনাতে-শোনাতে ইচ্ছে করেই একটা-দুটো ভুল ডিটেল বলেন গোয়েন্দা। অপরাধী মুহূর্তের অসতর্কতায় প্রতিবাদ করে ভুল ধরিয়ে দিতে চায় এবং সেখানেই ধরা পড়ে সে। ব্যাপারটাকে এই দিকে টেনে আনবেন বলেই শ্রীমতী সুবর্ণরেখা এতক্ষণের মধ্যে একবারও 'বোরখা' কথাটা উচ্চারণ অবধি করেননি। 'ছদ্মবেশ' 'পোশাক'—এইসব টার্ম ব্যবহার করেছেন খুব সযত্নে। পোশাকটা যে বোরখাই সেটা বিনোদ শাসমলের জানার কথা নয়—যদি সে নিজে দোষী না হত!

'আমাদের কাজটা সহজ করে দিলেন বলে ধন্যবাদ, মিস্টার শাসমল...' সুবর্ণরেখার গলা আবার খুব স্বাভাবিক, প্রশান্ত শোনাচ্ছে, 'অ্যাকচুয়ালি দুটো পয়েন্টে আপনি ফেঁসেছেন। প্রথমটা আপনার নিজের ভুল—এস. এম. এস.-টাতে চোস্ত নিখুঁত ইংরেজি ব্যবহার করা। আর অন্যটা দৈবকৃত। টিনার হাতঘড়িটা যে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাতেই কমল বিশ্বাস আলটিমেটলি সন্দেহমুক্ত হতে পেরেছে। এই ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়াটা নেহাতই নিয়তিনির্দিষ্ট। একে আপনি ভগবানের মারও বলতে পারেন—পাপ কর্মের শাস্তি-টাস্তি তিনিই দিয়ে থাকেন বলে শোনা যায় কিনা!'

একটু থেমে হাসলেন ম্যাডাম, 'আমি অবশ্য ভগবান-টগবান নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই না। আসলে এগুলো এক-একটা কো-ইনসিডেন্স। অপরাধের দুনিয়ায় এইরকম কো-ইনসিডেন্সগুলো, কেন কে জানে, অপরাধীর এগেনস্টেই যায় বেশিরভাগ।'

বলতে-বলতে হঠাৎই কারেন্ট চলে এল। এতক্ষণে অস্পষ্ট আলো-আঁধারি কেটে গিয়ে উজ্জ্বলতায় ভরে গেল সারা ঘর।

আমি ভাবছিলুম, রহস্য উদঘাটনের মুহূর্তেই এই যে আলোর ফিরে আসা, এটাও কি একটা আশ্চর্য কো-ইনসিডেন্স নয়!

শ্রীমতী সুবর্ণরেখা সেন, সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর—বোধহয় আমার মনের কথা পড়তে পারলেন। সেই ঝকঝকে হাসিটা হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—এটাও!'